নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGBG : ১ম পত্র 'ক'

এবং ১ম পত্র 'খ'

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায়

1 □ প্রাক-তুর্কী পর্ব : ১০ম-১২শ শতক

একক	1	সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত বাঙালির সাহিত্য	7-18
একক	2	চর্যাপদ	19-47
একক	3	চৈতন্য-পূর্ব কৃষ্ণকথার ধারা	48-95
একক	4	বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্য	96-102
একক	5	প্রাক্-চৈতন্য যুগের অনুবাদ সাহিত্য	103-131
একক	6	প্রাক্-চৈতন্য যুগের অনুবাদ সাহিত্য	132-148

পর্যায়

2 □ চৈতন্যযুগ : ১৬শ শতক-মধ্য, ১৭ শতক এবং চৈতন্যোত্তর যুগ : মধ্য ১৭শ-১৮শ শতক

একক	7	বাংলা সাহিত্য : চৈতন্য যুগ	151-195
একক	8	বাংলা সাহিত্য : চৈতন্যোত্তর যুগ	196-234

পর্যায়

3 □ রবীন্দ্রনাথ (সমগ্র)

একক 1	রবীন্দ্র সাহিত্য (কাব্য-কবিতা)	**237-257**
একক 2	রবীন্দ্রনাথ নাটক	**258-266**
একক 3	রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস	**267-288**
একক 4	রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও প্রবন্ধ	**289-307**

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৪ □ বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্য

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ মূল আলোচনা

৪.৩ অনুশীলনী

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্যের উদ্ভবের পটভূমি ও সুফীধর্মের সঙ্গে তার যোগ আবিষ্কার করতে পারবেন। হিন্দী-অওধী ও ফারসী ভাষায় লেখা অন্যান্য প্রণয়কাব্য কীভাবে বাঙালি কবিদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সে বিষয়ে জানতে পারবেন। রোমান্স প্রণয় কাব্যের প্রথম কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল ও ব্যক্তি পরিচয় সম্ভবন্ধে জানা সম্ভব হবে। সগীরের কাব্য ইউসুফ জোলেখার কাহিনী, প্রেমভাবনা, কবিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ ধারণা করতে পারবেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিস্রোত হল মুসলমান কবি রচিত বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্যের ধারা। এ ধারায় রচিত সাহিত্য পূর্বাগত সমস্ত ধর্মীয় সংস্কার বর্জন করে নির্ভেজাল মানুষকেই তার উপজীব্য করে তুললো। এতদিন বাঙালি হিন্দু কবিরা যা কিছু লিখে আসছিলেন তার সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে মিশে ছিল নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলির অনুষঙ্গ। কিন্তু সেই ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে একপাশে সরিয়ে রেখে কেবল মানবাশ্রিত কাব্য রচনার নজির গড়তে পারলেন মুসলিম কবিরা। এর পিছনে ইসলামের ভূমিচারী দৃষ্টির ও সুফীধর্মের আত্যন্তিক মানবপ্রীতির সদর্থক ভূমিকা ছিল। এটা তথ্যসমর্থিত ঘঠনা যে, শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দু কবিরা মুসলমান কবিদের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও তাঁদের লেখাতে মানুষেরা সামাজিক ও ব্যক্তিক অভিজ্ঞান তেমন স্পষ্টতা পায়নি। মনসামঙ্গলে চাঁদ পৌরুষের বলে দৈব-প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বামহাতে পূজা দিয়ে দৈবীমাহাত্ম্যেরই জয় ঘোষণা করেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যটি ছিল গভীরতর অর্থে মানবজীবনের ইতিকথা, কিন্তু তাঁকেও যুগধর্মের নীতিনিয়ম মেনে স্বীকার করে নিতে হয় ধর্মের বর্ম। রক্তে-মাংসে গড়া ক্ষুধা-তৃষ্ণাযুক্ত বাস্তব সংসারের মানুষ ছিলেন শচীদুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁকওে কি সময়ের আবেষ্টনী থেকে বের করে আনা সম্ভভব হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সেকালে লেখা সমস্ত চৈতন্যজীবনীতে বর্ণাশ্রমধর্মের যুগাযুগান্তব্যাপী গভীরতল সঞ্চারী শিকড়কে উপড়ে ফেলার দরুন তিনি সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে পরিগণিত হন ত্রাতা বলে। যুগের আবহ সেই সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা মানুষটিকে শাস্ত্রবচনের সঙ্গে মিলিয়ে কৃষ্ণের অবতার বলে নির্দেশ করেছে। অথচ এইসব সাহিত্য-প্রতীতির পাশাপাশি মুসলমান কবিদের রচিত প্রণয় আখ্যানধর্মী কাব্যের আত্মিক তফাৎ কত দুস্তর। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে মানুষকে দিলেন মুক্তি—সেই মানুষ যে দেহ ও মনের ক্ষুধায় কাতর, যার আছে প্রবৃত্তি, আসক্তি, বিবেক, নৈতিকতা, দয়া, ক্ষমা, লোভ, মোহ, যার কাছে প্রেম-মিলন-বিরহ কোন তত্ত্বের বিষয় নয়, জীবনের জ্বলন্ত বাস্তব। মনে রাখা প্রয়োজন হিন্দুধর্মের মতো ইসলাম ধর্মও প্রতিষ্ঠান নর্ভির, সেখানেও নানাবিধ কৃত্য, সংস্কার ও শাস্ত্রবিধি আছে। কিন্তু সে ধর্মের অনুশাসনে

মানুষের ভৌমচেতনা বেশ স্পষ্ট। ধর্ম প্রবক্তা হজরত মহম্মদ কোথাও দাবি করেননি যে তিনি ঈশ্বরকল্প কোন সত্তা, বরং তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা : 'আনা বাশারুম মিসলুকুম্'—অর্থাৎ আমি তোমার মতই একজন মানুষ। হয়তো এ পথ ধরেই মুসলমান কবিদের হাতে সাহিত্যে মানবতাবাদের সঞ্চার ঘটেছিল। তবে তার পাশাপাশি এটাও ঘটনা যে, যাকে আশ্রয় করে এইসব কবিরা রোমান্স কাব্য সাধনায় স্বতন্ত্র একটি ধারার জন্ম দিয়েছিলেন সেই মরমীয়া সূফীবাদ ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত ছিল। সূফীধর্ম নৈষ্ঠিক ইসলামেরই একটি শাখা, যাঁরা শরীয়তের বিধানকে শেষ গন্তব্য হিসেবে না দেখে মারিফতের মাধ্যমে আল্লাহের নৈকট্য লাভ করতে ও আত্মলীন হতে চেয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রেমময়। তাঁর প্রেম ও করুণা লাভ করাই সাধকজীবনের লক্ষ্য। আল্লাহের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠজীব মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণে তাঁরা যে আধ্যাত্মিক মার্গের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে আরব-ইরানে রোমান্স কাব্যধারা গড়ে ওঠে। সেই অর্থে মানবমানবীর প্রেমকাহিনী ছিল সূফী কবিদের কাছে রূপক। জালালুদ্দিন রুমী, আবদুর রহমান জামী, ফেরদৌসী প্রমুখ সূফী কবিগণ রাজা-বাদশাহ-আমীর-বণিক প্রভৃতি শাসক ও বণিক শ্রেণীর প্রচলিত প্রেমকাহিনীকে আধ্যাত্মিক প্রেমকাহিনীতে রূপান্তরিত করেন। অনেকের ধারণা, সামন্ত সমাজব্যবস্থায় ধার্মিকতার ও নৈতিকতার সাথে আপোষ করতে কবিদের এ পথ বেছে নিতে হয়েছিল। যাইহোক, পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সুফীদের আগমন ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং তাঁদের মারফত বাংলাদেশে এইসব প্রণয়বৃত্তান্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি মুসলমান কবিরা স্বসংস্কৃতির রসে নিজেদের মনের শিকড় ভিজিয়ে নেওয়ার তাগিদে আরবী ও ফারসীতে লেখা এইসব কিস্‌সার শরণাপন্ন হন। তবে তাঁদের কাব্যে এর ধর্মীয় বাতাবরণ ও তাত্ত্বিক নির্গলিতার্থটি যথাসম্ভব পরিত্যক্ত হয়েছে। তাঁরা খাঁটি মানুষকেই তার যাবতীয় ত্রুটি ও অম্পূর্ণতাসহ সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন। সাহিত্যের উপজীব্য যে মানুষ এবং ভক্তিরস ছাড়া সাহিত্য যে বিশুদ্ধ জীবনরসের উপর নির্ভর করতে পারে এই ধারণায় মধ্যযুগের বাঙালি পাঠককে দাঁড় করাতে সমর্থ হল এই বিশেষ কাব্যধারা। এ ধারার প্রথম সূচনাকার বলে যাঁকে দাবি করা হয়েছে তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর।

বাংলা রোমান্স প্রণয়-কাব্যের ধারাটি অনুবাদ শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ এতে ব্যবহৃত কাহিনীগুলি কবিদের নিজস্ব উদ্ভাবনা ছিল না, এদের উৎস লুকিয়ে ছিল অন্যত্র। সমালোচকেরা ভাষা, চরিত্র ও কাহিনী পটভূমির প্রেক্ষিতে সেই উৎসকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হিন্দী-অওধীতে লেখা ভারতীয় প্রেমকাব্যের ধারা, অন্যটি আরবী-ফারসীতে লেখা আরবীয়-ইরানীয় প্রণায়োপাখ্যানের ধারা। তবে এই দুই ধারাতেই লেখক হিসেবে যাঁদের পাই তাঁরা ধর্মে মুসলমান এবং কম-বেশি সূফীতত্ত্বের দ্বারা প্রাবিত। দ্বাদশ শতক থেকে হিন্দী অওধীতে যে রোমাণ্টিক প্রণয়-আখ্যান চলে আসছে তার প্রমাণ মেলে আবদুর রহমানের সংনেহয় রাসয়, চান্দ বরদাইয়ের পৃথ্বিরাজ রাসউ, আমীর খসরুর খিজির খান ও দেবলরানী, মুল্লা দাউদের চান্দায়ন, মিঞা সাধনের মৈনাসৎ, জায়সীর পদুমাবৎ প্রভৃতি কাব্য থেকে। ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে মুখ্যত হিন্দু চরিত্রের আশ্রয়ে মুসলমান কবিরা এ ধরনের ১৪/১৫টি বিশিষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। সমানভাবে ফারসীতে লেখা হয়েছে ইউসুফ-ওয়া-জোলায়খা, লায়লীমজনু, খসরু-শিরীন, সয়ফলমুলুক-বদিউজ্জমাল, হফ্‌ত পয়কর, সলমন-অবসাল, হানিফা-কয়রাপরী, জেল্লমুলুক-শামারোখ প্রভৃতি বই। বলা হয়ে থাকে যে, এগার শতকের কবি ফেরদৌসী ইউসুফ-ওয়া-জোলায়খা কাব্য রচনা করে এ শ্রেণীর কাব্যের দ্বার উন্মোচন করেন। যদিও সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন পনের শতকের কবি আবদুর রহমান জামী। এই গ্রন্থটিরই বাংলা অনুবাদ করেন শাহ মুহম্মদ সগীর। সগীরের কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা' ছিল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ মানবপ্রেমের রোমান্টিক আখ্যান। তাঁর এ পথেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিলেন মুহম্মদ

কবীর, শা বিরিদ খান, দৌলত উজির বাহ্‌রাম খা, দৌলত কাজি, সৈয়দ আলাওল, আবদুল হাকিম, নওয়াজিশ খান, মুহম্মদ মুকীম, শেখ সাদীর মতো খ্যাত-অখ্যাত কবিরা।

৪.২ মূল আলোচনা

মধ্যযুগের অন্যান্য অনেক কবির মতো শাহ মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তাঁর কাব্যে কোন সাল-তারিখের উল্লেখ করেননি। তার পরিবর্তে 'রাজ্যক ঈশ্বর' পৃথিবীর সার কোন এক 'মহা নরপতি গ্যেছ'-র কথা বলেছেন, তিনি 'রাজ-রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত। দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত।। মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার।' বলা বাহুল্য 'গ্যেছ' গিয়াসউদ্দনের সংক্ষিপ্ত কাব্যরূপ। এখন মুশকিল এই যে, মধ্যযুগে বাংলার শাহীতক্তে সূরবংশীয় একাধিক গিয়াসুদ্দিনকে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। 'বাংলাসাহিত্যের কথা' গ্রন্থে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন যে, বাংলার মসনদে একই নামধারী তিনজন সুলতান রাজত্ব করেছেন। যথা— গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৫৫-৬০), গিয়াসুদ্দিন জালাল শাহ (১৫৬০-৬৩) এবং তৃতীয় গিয়াসুদ্দিন (১৫৬৩-৬৪)। এঁরা ব্যতীত আর একজন গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ রাজত্ব করেছেন ১৩৮৯-১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে। অধিকাংশ গবেষক এই শেষোক্ত সুলতানের রাজত্বকালে মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল বলে নির্দেশ করেছেন। কেননা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বাইরে এই ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, গুণীর পৃষ্টপোষক, ধার্মিক এবং সজ্জন—যে তথ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কবির বর্ণনা। তাছাড়া সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী এই সুলতানের গুণকীর্তন করেছিলেন পারস্যের কবি হাফিজ ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। এইসব যুক্তির অবতারণা করে শহীদুল্লাহ কাল-পরম্পরায় সগীরের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—'মধ্যযুগের আদি লেখক বড়ু চণ্ডীদাস, তৎপরে শাহ মুহম্মদ সগীর এবং তৃতীয় লেখক কৃত্তিবাস।' বলিষ্ঠ বিরোধী তথ্য পাওয়ার আগে পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তকে মানতে বোধহয় বাধা নেই।

সগীরের কাব্যের নাম 'ইউসুফ-জোলেখা'। তিনি এর কাহিনীটি কোথা থেকে পেয়েছিলেন এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে ধন্দ আছে। অনেকের মতে, কাব্যটির উৎসে ছিল 'শাহনামা'-র রচয়িতা ফেরদৌসী তূসীর (৯৩৭-১০২০ খ্রি.) লেখা ফারসী কাব্য 'ইউসুফ-জোলেয়খা', যেটি একাদশ শতকের রচনা। এই গ্রন্থের আর একটি আদর্শের কথাও বলেছেন কেউ কেউ। সেটি হল আবদুর রহমান জামীর লেখা 'ইউসুফ-ওয়া-জোলয়খা', যার রচনাকাল ১৪৮৩ খিষ্টাব্দ। কিন্তু এই মতটিকে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে যে, সগীর এ কাব্য গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালের মধ্যেই (১৩৮৯-১৪১০ খ্রি.) লিখে ফেলেছিলেন। এছাড়া কবি নিজে আর একটি উৎসের কথা জানিয়েছেন তাঁর কাব্যের সূচনায় এবং আমাদের মনে হয় সেটাই পূর্বোক্ত দুইজন আরবীয় কবিরও কাব্য-উৎস। উৎসটি হল পবিত্র কোরাণ শরীফ। ঐ ধর্মগ্রন্থের 'সূরা ইউসুফ' অধ্যায়ে মোট ১১১টি আয়াতে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটির মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মোপদেশ দান। ধার্মিক এবং চরিত্রবান ব্যক্তিরা আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কৃত হন—এইরকম একটা নীতিকথা বেরিয়ে আসে কোরানে বর্ণিত আখ্যান থেকে। সগীরও ভক্তজনের 'শ্রুতি-ঘট' পরিপূরণের জন্য সেই কাহিনীকেই আশ্রয় করেছেন। কবির স্বীকারোক্তি—'কিতাব কোরাণ মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ। ইউসুফ জলিখা কথা অমৃত অশেষ।। কহিব কেতাব চাহি সুধারস পূরি।' ড. ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' গ্রন্থে সগীরের কাব্যাদর্শ প্রসঙ্গে আর একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন, সেটি কোরানের তফসীল বা ব্যাখ্যাপুস্তক, যার লেখক ইমাম গজ্জালী। এতে

দেখা যায়, জোলেখা পশ্চিমদেশের রাজা তাউমুসের কন্যা ছিলেন। কবিও কাব্যমধ্যে সেই তথ্য লিপিবন্ধ করেন। এছাড়া আরেও অনেক প্রসঙ্গের অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তফসীরের তুলনায় সগীরের বর্ণনা বর্ণাঢ্য, পল্লবিত, নাটকীয়, পারস্পর্যযুক্ত ও আবেগমধুর। আরো একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস্ অংশে যোসেফের যে কাহিনী আছে তার সঙ্গেও কাঠামোগত মিল আছে কোরানের ইউসুফ কাহিনীর। এবং এখানেই শেষ নয়। কবি সগীর নিজে তাঁর প্রয়োজন মতো বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত গল্পের খণ্ডাংশগুলি সংযুক্ত করে নিয়েছিলেন ও একটি আস্ত স্বকপোলকল্পিত কাহিনী গল্পের শেষাংশে জুড়ে দিয়েছিলেন। সেটি হল ইউসুফের ভাই ইবিন আমিনের সঙ্গে গন্ধর্বরাজ শাহাবালের কন্যা বিধুপ্রভার প্রণয়বত্তান্ত। মুসলমানী আখ্যানে হঠাৎ হিন্দু চরিত্রের আমদানি কেন, এ প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে। তার মীমাংসা খোঁজা যায় ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে—'এই বর্ণনাতে বুঝা যাইতেছে, ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান কবি পূর্বতন হিন্দু সংস্কার ভুলিতে পারেন নাই।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-৩য় খণ্ড)।

মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্য শুরু করেছেন আল্লাহ ও রসুলের বন্দনা দিয়ে। অতঃপর আছে মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজস্তুতি। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের দরবারের কর্মচারী ছিলেন। নইলে তাঁর রাজস্তুতি অত প্রগাঢ় হতো না। আখ্যানের সূচনায় আছে তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখার জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি এবং স্বপ্নদর্শনে এক রূপবান পুরুষের প্রতি রূপাসক্তি। কিন্তু জোলেখার সঙ্গে ভুলক্রমে আজিজ-মিশরের বিবাহ হয় এবং আজিজ সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ নয় জেনে জোলেখা হতাশ হয়ে পড়েন। এরপরে কোরান ও ফেরদৌসীর বর্ণনানুসারে ইউসুফের জন্ম ভ্রাতৃদ্রোহ বিড়ম্বনার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে। এক বণিক তাঁকে উদ্ধার করে। তাঁর নাম মনিরু। পরে তিনি তামার মুদ্রার বিনিময়ে ইউসুফকে বিক্রি করে দেন। নীল নদীর জলে ইউসুফ স্নান করলে তাঁর সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায় এবং অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দলে দলে লোক ভীড় করে। জোলেখা এই অপূর্ব রূপবান ইউসুফকে দেখ মুর্ছা যান এবং পরে নিজ ধনরত্ন দিয়ে ইউসুফকে কিনে নিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে যান। পরের ঘটনা বর্ণনায় তফসীবের অনুসরণ করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সগীর উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, বৃদ্ধা জোলেখার যৌবনপ্রাপ্তি এবং ইউসুফের সঙ্গে তাঁর ঘটনাপূর্ণ বিবাহ ও বাসর যাপনের বর্ণনা। ফারসী কাব্যের আখ্যানভাগে ইউসুফ-জোলেখার মিলন ও পরিশেষে মৃত্যু দেখানো হয়েছিল। কিন্তু সগীরের কাব্যে ইউসুফের ভাই ইবিন আমিনের সঙ্গে মধুপুরের রাজদুহিতা বিধুপ্রভার পরিণয়কে কেন্দ্র করে কাহিনী পল্লবিত ও প্রলম্বিত হয়েছে। এই অংশটি একেবারে কবির নিজস্ব কল্পনা। দ্বিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ইউসুফ একটি অদ্ভুত জন্তুর পিছনে অশ্ব চালিয়ে একা বিজন বনে এসে পড়েন। বনের এক সরোবরের পাড়ে সুরম্য পুরীর মধ্যে অপূর্ব সুন্দরী কন্যা বিধুপ্রভার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বিধুপ্রভার পিতা শাহাবাল গন্ধর্বদের রাজা। বিধুপ্রভা স্বপ্নদৃষ্ট এক নবীপুত্রের প্রতি তাঁর প্রণয়াসক্তির কথা বললেন। ইউসুফ স্বপ্নতত্ত্বভেদ করে জানালেন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিটি তাঁর ভাই ইবিন আমিন। অতঃপর বিধুপ্রভার পালিত ও সুশিক্ষিত শুকপাখীকে দূত করে পাঠানো হয় এবং ইউসুফ ভ্রাতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেন। শুকের কাছে গন্ধর্বরাজকন্যার কথা শুনে আমিন প্রেমবেদনা অনুভব করলেন এবং গন্ধর্ব মহামন্ত্রে খগচর বা পাখির রূপ নিয়ে রাজকন্যার কাছে এলেন। বিধুপ্রভা স্বয়ংবর সভার আয়োজন হল। বিধুপ্রভার বরমাল্য আমিনকে অর্পণ করলেন। গন্ধর্বরাজ শাহাবাল তাঁর রাজ্যে রাজপদে জামাতা আমিনকে অভিষিক্ত করলেন। ভাইকে মধুপুরে রেখে ইউসুফ ফিরে এলেন মিশরে। ইবিন স্বজনবিরহে পীড়িত হলে স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে বিধুপ্রভা মিশরে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন এবং তাঁরা যথাসময়ে মিশরে উপস্থিত হলে আনন্দের রোল পড়ে গেল।

শাহ মুহম্মদ সগীর মূলত মানবীয় প্রেমোপাখ্যানের কবি। কাব্যটিতে যে প্রেমের কিস্‌সা অনুসরণ করা হয়েছে তার প্রকৃতি রূপজ, মোহজ। জোলেখার ভালোবাসা সম্পূর্ণ দেহগত। স্বামীর নপুংসকত্ব তার অতৃপ্ত জৈবিক কামনাবহ্নিকে শত শিখায় উদ্দীপ্ত করেছে। হৃদয়ের অপরিসীম জ্বালা নিয়ে সে প্রণয়াস্পদকে কামনা করে। সমাজ সংসার ধনসম্পদ, ইহলোক-পরলোক, পাপ-পুণ্য সব কিছু তুচ্ছ করে সে এক কূলপ্লাবিত নদীর মতো সমুদ্রের পানে ছুটে চলেছে। জোলেখার প্রেমের তিনটি স্তর অতি স্পষ্ট। সে প্রথমে রূপ দেখে শিহরিত হয়, মুর্ছা যায়। পরে কামোন্মত্ত হয়ে পড়ে। সবশেষে প্রেমসাগরে সব কিছু ভুলে ভেসে যায়। তবে জোলেখা কলঙ্কিনী হলেও কলুষিতা নয়। সে কামোন্মত্তা হলে অন্য উপায়ে ভোগবাসনা নিবৃত্ত করতে পারতো। রূপতৃষ্ণা তার কামবোধের ইন্ধন যুগিয়েছে সত্য, তবে তার আত্মরতি একমুখী হয়েছে। যৌবন অপগত হলেও জোলেখা প্রেমাস্পদকে এক পলক দেখার জন্য রাজপথের পাশে অসীম প্রতীক্ষায় প্রহর গুণেছে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও জোলেখা কিসের সাধনা করে? সে কি কামের? না, এ চিরঞ্জীব শাশ্বত প্রেম। যখন তার কাম ব্যর্থ হয় তখন প্রেমিকাকে কারাগারে পাঠিয়ে প্রতিশোধ নেয়, কিন্তু যখন প্রেম ব্যর্থ হয় তখন জোলেখার মনে আত্মক্ষোভ জাগে। কবি জোলেখাকে রক্তমাংসের এক বাস্তব চরিত্র করে এঁকেছেন। অন্যদিকে ইউসুফ চরিত্রকে নীতিধর্মের শুষ্ক কাষ্ঠপুত্তলিকা বলে মনে হয়। সংযমশীলতায় তিনি একজন আদর্শবাদী পুরুষ। তাঁর হৃদয়ে প্রেমের কোন আসক্তি নেই, নেই কোন দ্বন্দ্বও। জোলেখার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে ইউসুফের অবস্থান।

কবি কি তাঁর কাব্যে কোথাও ধর্মের কোন অনুষঙ্গ রাখেননি? কাব্যটির সূচনাংশে 'পোথার কথন' পড়লে প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন একটা জবাব পাওয়া যায়। কবি প্রেমের আখ্যান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন 'ধর্মবাণী' প্রকাশের কারণে। তাঁর পূর্ববর্তী ইরানীয় কবিরা এ কাহিনীকে দেখেছিলেন ধর্মতত্ত্বের আলোয়। তাঁরা ইউসুফকে মাশুক তথা পরমাত্মা ও জোলেখাকে আশিক তথা জীবাত্মা হিসেবে গ্রহণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন। ইউসুফের রূপের প্রতি জোলেখার আসক্তি এই দৃষ্টিতে হয়ে দাঁড়ায় আশিক-মাসুকের মিলনকামনা। ইন্দ্রিয় সম্ভোগ বাসনার দ্বারা যে অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না, অন্তরের প্রেম দ্বারা তাঁকে পেতে হয়—এমন একটা গভীর দার্শনিক কথাও এই গল্পটির রূপকে বর্ণিত। সগীর এ তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কেননা তাঁর সূফীবাদে বিশ্বাস ছিল বলে অনেকে ধারণা করেন। 'শাহ' উপাধিটি পীরের প্রতিনিধিত্বের দ্যোতক। যাইহোক, সগীর সূফী ধর্মাদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে এ কাব্য রচনা করেছিলেন তার উল্লেখ তিনি নিজেই করেছেন। লিখেছেন—'শুনিয়াছি মহাজনে কহিতে কথন। রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন।।...ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা। ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা। ভাবক-ভাবিনী অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মা। এই স্বীকারোক্তির পর এ কাহিনী যে ধর্মীয় প্রেমোপাখ্যান তা নিয়ে আর কোন সংশয় থাকে না।

রোমান্স কাব্যের বৈশিষ্ট রচনাটির মধ্যে সগীর যথাযথভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রণয় আখ্যানের কবিদের লক্ষ্য ছিল গল্পের ঘনঘটায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা। সগীরও সেই পথের অনুগামী। গল্পরচনা কবির লক্ষ্য ছিল বলে ঘটনার গ্রহণ-বর্জনের কোন হিসেব করেননি। কোরান ও অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত ঘটনায় মৌলিকতা না থাকলেও একটা গতি লক্ষিত হয়। পাঠককে গল্প শোনানোর নেশায় তিনি ইবিন আমিন-বিধুপ্রভা প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন। অনেক সমালোচকের মতে, এতে বাইবেলের ও কোরানের গল্পের ঐতিহ্য নষ্ট হয়েছে। তবে তাতে যে রসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছে একথা মানা যায় না। রোমান্স কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হল অলৌকিক উপাদানের বাহুল্য। কেননা এ ধরনের কাব্যে imagination এর তুলনায় fantasy-র প্রাধান্য বেশি। এখানেও স্বপ্ন, আকাশ-বাণী, অবলা শিশুর মুখে বাক্‌ক্ষমতা, মূক পশুর মুখে মানববাণীর প্রয়োগ আছে। সমস্ত কাব্যটিতে স্বপ্নের যেন বন্যা বয়ে গেছে।

স্বপ্ন দেখেছেন ইউসুফ, জোলেখা, বণিক, মিশররাজ, ইবিন আমিন, বিধুপ্রভা। জোলেখার স্বপ্ন তার জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত বলে সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার যৌবনের ভোগাকাঙ্ক্ষাই স্বপ্নের মধ্যে রূপময় হয়ে উঠেছে। কাব্যের মধ্যে রয়েছে ছয়-সাতটি দৈববাণীও। এতে কাহিনীর বাস্তব রস তরল হলেও কবির রোমান্সসুলভ খেয়ালী কল্পনা ডানা মেলে ওড়বার সুযোগ পেয়েছে। বিধুপ্রভার সমগ্র আখ্যানটি রূপকথাধর্মী। তার শুক মন্ত্রসিদ্ধ পাখি। শুকের মন্ত্রগুণে আমিন খগচরে রূপান্তরিত হয়ে মধুপুর রাজ্যে গমন করে। এতেও বাস্তবের লেশমাত্র নেই। রয়েছে বারমাস্যা গীতও। ইউসুফের প্রতি জোলেখার প্রেমের আর্তির প্রকাশে বারমাস্যার করুণরস নিঃসৃত হয়েছে। সর্বোপরি কাম ও প্রেমের রূপচিত্রণে সগীরের কৃতিত্ব স্বীকার্য। তাঁর বর্ণিত প্রেম বাস্তবতার ঊর্ধে উঠে কোনো অলৌকিক ব্যঞ্জনায় ঠুন্‌কো হয়ে পড়েনি। প্রেমের মাহাত্ম্যও ঐ বাস্তবতার মদ্যেই ফুটে উঠেছে।

অনুবাদক কবি হিসেবে মুহম্মদ সগীরের আরো একটি মনোভঙ্গী প্রশংসার যোগ্য। হিন্দু কবিরা শাস্ত্রকথাকে সংস্কৃতির বন্ধনমুক্ত করতে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে যে দ্বিধায় পড়েছিলেন, বোধহয় মুসলিম কবিদের ক্ষেত্রেও সেরকম কিছু ঘটে থাকবে। তিনি গোঁড়া মুসলিমদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গবাণীতে লিখতে খুবই উৎসাহী ছিলেন। স্বভাষার প্রতি এই যে মমতা তিনি বাংলা সাহিত্যের আদি মুসলমান কবি হিসেবে দেখিয়েছিলেন তা সত্যিই স্মরণীয় ও গর্বের বিষয়। কবি লিখছেন,—'না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়। দুষিব সকল তাক ইহা না জুয়ায়। গুণিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহা ভয় মিছা। না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাঁচা।।' কাব্যকলার নিরিখে শাহ মুহম্মদ সগীর কেবল একজন মরমী কবি বলেই বিবেচিত হন না, মাতৃভাষা বাংলার প্রতি সীমাহীন দরদে একজন উচু দরের দেশপ্রেমিক বলেও তাঁকে গণ্য করা যায়।

সবশেষে উল্লেখ থাকে যে, মুহম্মদ সগীর ছাড়া ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের আরো পাঁচজন অনুবাদক কবি ছিলেন। এঁরা হলেন আবদুল হাকিম, ফকীর গরীবুল্লাহ, গোলাম সফাতউল্লাহ, সাদের আলী ও ফকির মহম্মদ। এঁদের মধ্যে আবদুল হাকিম ও গরীবুল্লাহের রচনা কিছু উৎকৃষ্ট। কিন্তু এঁরা আমাদের আলোচ্য সময়সীমার বাইরে বলে এঁদের কাব্য সম্বন্ধে আপাতত নীরব থাকা গেল॥

৪.৩ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। বাংলা রোমান্স প্রণয় কাব্য রচনার পটভূমিটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৩। ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের মধ্যে রোমান্স কাব্যের বৈশিষ্ট্য কতখানি রক্ষিত তা উদাহরণযোগে দেখিয়ে দিন।

৪। অনুবাদক হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীরের মূল্যায়ন করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। আরব-ইরানের রোমান্স কাব্যধারার সঙ্গে বাংলা রোমান্স কাব্যের সংযোগ কোন্‌খানে?

২। হিন্দী-অওধী ও ফারসীতে লেখা রোমান্স কাব্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। শাহ মুহম্মদ সগীরের ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৫। ইউসুফ-জোলেখায় কি কোন ধর্মের অনুষঙ্গ আছে?

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। রোমান্স কাব্যধারা প্রথম কোথায় গড়ে ওঠে?

২। রোমান্স কাব্যধারার সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় কি?

৩। শাহ মুহম্মদ সগীর কোন্ প্রশাসকের সময়ে আবির্ভূত হন?

৪। ইউসুফ-জোলেখার উৎস কি?

৫। ভাবক-ভাবিনী বলতে কি বোঝায়?

৬। সগীর ব্যতীত আর ক'জন কবি ইউসুফ-জোলেখা কাব্য অনুবাদ করেন?

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), ১৯৭৫

২. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ১৯৮৭

৩. আবদুল হাফিজ, বাংলা রোমান্স কাব্য-পরিচয়, ১৩৮৭

৪. আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, ১৩৯৯

একক ৫ □ প্রাক্-চৈতন্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ রামায়ণের অনুবাদের ধারা
৫.২.১ কৃত্তিবাসের ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল
৫.২.২ অনুবাদে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব
৫.২.৩ কাহিনী-গ্রন্থনে মৌলিকতা
৫.২.৪ চরিত্রসৃষ্টিতে অভিনবত্ব
৫.২.৫ রসসৃজনে দক্ষতা
৫.২.৬ কাব্যনির্মিতি কৌশলে বিশিষ্টতা
৫.২.৭ ভক্তিবাদ প্রচারে সফলতা
৫.২.৮ বাঙালিয়ানা প্রকাশে অনবদ্যতা
৫.৩ ভাগবত অনুবাদের ধারা
৫.৩.১ মালাধরের ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল
৫.৩.২ অনুবাদে মালাধরের কৃতিত্ব
৫.৩.৩ অনুবাদে মূলানুগত্য
৫.৩.৪ ভক্তিবাদ-প্রসঙ্গ
৫.৩.৫ বাঙালিয়ানা ও কবির কবিত্ব
৫.৪ মহাভারত অনুবাদের ধারা
৫.৪.১ কবীন্দ্র পরমেশ্বর
৫.৪.২ শ্রীকর নন্দী
৫.৪.৩ বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়
৫.৫ অনুশীলনী
৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বাংলা অনুবাদ সাহিত্য গড়ে ওঠার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক প্রণোদনার কথা জানতে পারবেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের ক্ষেত্রে কারা চৈতন্যপূর্ব যুগে বিশিষ্টতা দাবি করতে পারেন

এবং কেন সে বিষয়ে ব্যাপক ধারণা করতে পারবেন। রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝার ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল বিষয়ে বিশদ জানতে পারবেন। অনুবাদে কৃত্তিবাসের কৃতিত্বের নানা দিক (যেমন—কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ, রসসৃজন, কাব্যনির্মিতি কৌশল, ভক্তিতত্ত্ব প্রচার, বাঙালিয়ানা প্রকাশ) নিয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে পরেবেন। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর ব্যক্তিপরিচয় এবং আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কিছু ধারণা জন্মাবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর কতটা মূলকে অনুসরণ করেও নিজস্বতা দেখিয়েছেন, তৎকালীন সমাজে কৃষ্ণভক্তি প্রচারে সহায়তা করেছেন এবং তাঁর কাব্যে বাঙালি সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে সে বিষয়ে জানতে পারবেন। চৈতন্যপূর্ব যুগে মহাভারতের অনুবাদে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন সেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর ব্যক্তিজীবন ও কাব্য সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যে কয়েকটি বিশেষ শাখায় বিকশিত হয়েছিল, অনুবাদ সাহিত্য তাদের মধ্যে অন্যতম। এ শাখার সূচনা হয় চৈতন্যপূর্ব যুগে বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির মধ্যে। যদি সে-উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে এর গুরুত্ব আরো সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। কোন মূলকে আশ্রয় করে ভাষান্তরিত রচনাই হল অনুবাদ। 'অনু' পূর্বপদে ভাবাশ্রয়িতার বোধ খুব স্পষ্ট। এ শ্রেণীর রচনায় লেখক কোন মৌলিক কাহিনীর সষ্টা নন, কেবল ভাষান্তরীকরণের মাধ্যমে মূলের গল্প ও রস পরিবেশন করাই তাঁর লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এতে একদিকে যেমন সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হয়, তেমনি অন্যদিকে ঘটে ভাষার সমৃদ্ধি।

মধ্যযুগে নবগঠিত বাংলাভাষার আশ্রয়ে সংস্কৃতভাষার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে আবদ্ধ শাস্ত্রকথা জনসমাজে প্রচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বিশেষ কারণে। ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় তুর্কী-নেতা বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় এদেশের শান্ত-বৈচিত্রহীন নিরুদ্বিগ্ন জনজীবনকে ঘুলিয়ে দেয়। দেশব্যাপী অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার মানুষের মনে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে। তুর্কী আক্রমণের এ হেন প্রচণ্ড আঘাতে হিন্দু সমাজের ও সংস্কৃতির ভিত নড়ে ওঠে। এদেশের তথাকথিত নিম্নবর্গস্থ হিন্দুরা ভয়ে, লোভে, সাম্যের আশায় দলে দলে মুসলমান হতে থাকলে উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের টনক নড়ে। শ্রেণীস্বার্থেই তাঁদের মধ্যে জেগে ওঠে জাতিচেতনা। তাঁরা অচিরে অনুধাবন করলেন যে, হিন্দুসমাজের এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চাই ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি। ততদিনে রাজনৈতিক অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, তাই ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিন্ন চেতনায় বাঁধতে চাইলেন নড়বড়ে বৃহদায়তন সমাজকে। এই ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল সুপ্রাচীন আর্যশাস্ত্র ও কাব্যনির্ভর। অতএব সংস্কৃত ভাষার নিগড়ের মধ্যে তখনো পর্যন্ত পন্দী হয়ে থাকা শাস্ত্রকথা এবার দেশীভাষায় প্রচারের উদ্যোগ নিলেন তাঁরা। ঘটলো ঐতিহ্যপূর্ণ আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে আপামর বাঙালির চিত্তসংযোগ। নির্জিত হিন্দুর মানসিক শক্তি, সাহস ও উদ্যম সঞ্চারে অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা তাই অপরিসীম। প্রথম দিকে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয়, পরে নানা পুরাণ অবলম্ভবন করে অনুবাদকেরা পৌরাণিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটান।

পণ্ডিত সমাজের একাংশ মনে করেন যে, অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক অভিব্যক্তিক ঘটেছিল কথকতার মাধ্যমে। যাঁরা পুরাণকথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরা সাধারণের কাছে সেসব গল্প পাঁচালির আকারে পরিবেশন করতেন। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শূদ্র বা অন্ত্যজরা সেকালের সংস্কৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে অবতলবর্তীদের মধ্যে ধর্মপিপাসু মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে মধ্যবর্তী হিসেবে পালাগায়ক বা কথকের আবির্ভাব ঘটে। আবার সংস্কৃত ভাষাজালে আবদ্ধ শাস্ত্রকথাকে যাঁরা সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত করে দিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে গোঁড়া শাস্ত্রব্যবসায়ীদের ক্রোধ যে চাপা ছিল না তার প্রমাণ এই প্রবাদোপম পংক্তি—'কৃত্তিবেসে কাশীদেসে বামুনঘেঁসে/এই

তিন সর্বনেশে।' তবে অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত কবিরা তাঁদের কর্মের গুরুত্ব তথা ভূমিকা সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন। ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু লিখেছেন—'ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া। লোক-নিস্তারিতে যাই পাঞ্চালী রচিয়া।।' লোক-নিস্তারণ অর্থাৎ লোকশিক্ষাই অনুবাদের হেতু। কবি 'লোক' বলতে সেইসব মানুষকেই বুঝিয়েছেন যাঁরা সংস্কৃত বিদ্যা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, অথচ অবস্থাবৈগুণ্যে শাস্ত্রকথা যাঁদের অবধানের প্রয়োজন ছিল। প্রায় একই সুরে কথা বলেন ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবি পীতাম্বর দাসও সপ্তদশ শতকের কবি দ্বিজ হরিদাস। নল-দময়ন্তীর আখ্যান-সূচনায় কামতারাজসভার কবি পীতাম্বর লেখেন—'পুরাণাদি শাস্ত্রে যেই রহস্য আছয়। পণ্ডিতে বুঝয়ে মাত্র অন্যে না বুঝয়।। এ কারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার। নিজ দেশভাষা-বন্ধে রচিয়ো পয়ার।।' এ কথার প্রতিধ্বনি বাজে হরিদাসের কলমেও—'সংস্কৃত নাহি বুঝে সাধারণ জনে। ভাষাকথা কহি আমি তথির কারণে।।' আবার উদ্দেশ্য অভিন্ন হলেও অনুবাদ করতে গিয়ে সব রচনাকার একই আদর্শ ধরে অগ্রসর হয়নি। কবির প্রকৃতি অনুযায়ী কাব্যের চরিত্র গড়ে ওঠে। কবির প্রকৃতিও নির্ধারিত হয় তাঁর পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান, কবিত্বশক্তি প্রভৃতির দ্বারা। তাছাড়া তর্জমাকারীর সাহিত্যগত উদ্দেশ্যও লেখাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। কেবল বিশুদ্ধ গল্পরস পরিবেশনের তাগিদে মূলের অতিরিক্ত অনেক অপ্রধান, এমনকি অপ্রয়োজনীয় কাহিনীও কেউ যুক্ত করে দিতে পারেন। এ সবের কারণে অনুবাদের প্রকৃতি পাল্টে যায় এবং নানা অনুবাদ বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত হয়। যেমন—আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, ছায়ানুবাদ, সারানুবাদ ইত্যাদি। নানা গ্রন্থের অনুবাদে তো বটেই, একই গ্রন্থের বিভিন্ন কবির অনুবাদে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা অনূদিত ধর্মাশ্রিত কাব্যে দুটি বৈশিষ্ট্য খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১. রচনায় কম-বেশি বাঙালিয়ানার অনুপ্রবেশ ও ২. ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তি। প্রথমটি উদ্দিষ্ট পাটকবর্গের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তাঁদের পাঠরুচি-কেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয়টি সমকালের ধর্মভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাঙালি কবিরা সর্বভারতীয় কাহিনীকে বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী পাঠকের উপযুক্ত করে প্রকাশ করতে গিয়ে পটভূমি, চরিত্র, রসসৃষ্টি, নিসর্গপ্রকৃতি, কাব্যভাষা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্বতা দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন। এইসব অনুবাদের কোথাও কোথাও বাংলাদেশের ভৌমসত্তার হৃদস্পন্দন অনুভূত হয়। কিছু কবির অনুবাদ কালজয়ী হয়ে ওঠার এটাও একটা প্রধান কারণ। আর ভক্তিবাদের ক্ষেত্রে কবিদের দাসত্ববুদ্ধির অভিপ্রকাশ স্পষ্ট। অবশ্য যুগীয় পরিমণ্ডলের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা সেকালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন কবিদের ছিল না। তাঁরা ভক্তিবাদ প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ এ ধরনের অনুবাদ গ্রন্থ লিখে কালের দাবিকেই সম্মানিত করেছিলেন বলে মনে হয়। অনুবাদ সাহিত্যের ধারা পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চললেও আমরা এ পর্যায়ে প্রাক-চৈতন্যপর্বের তিনটি মুখ্য প্রবাহের বিশিষ্ট কবিদের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবো। ধারাগুলি হলো—রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারত।

৫.২ রামায়ণ অনুবাদের ধারা

ভারতবর্ষের আদিকাব্য রামায়ণ, আদিকবি ঋষি বাল্মীকি। ভারতীয় জীবন ও ভাবসত্তার সঙ্গে রামায়ণ গভীর আত্মীয়তার সূত্রে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নানা পরিবর্তনশলীতার মধ্যে ভারতবর্ষ যে তার আদি ও অকৃত্রিম চেহারা বজায় রাখতে পেরেছে তার মূলে রামায়ণের শিক্ষা ও আদর্শ বিপুলভাবে ক্রিয়াশীল। রামায়ণ জীবনরসের কাব্য। তাই এখানে দর্শন থাকলেও সে শুষ্ক বিদ্যা বিতরণ করে না। নরনারীর চিরায়ত প্রেম ভালোবাসা সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে গিয়ে হয়ে ওঠে উপভোগের এক সামগ্রী। এই মহাকাব্যের সঙ্গে জাতির হৃদয়ের নিগূঢ় সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথ অনুকরণীয় ভাষার ব্যক্ত করে 'রামায়ণ' প্রবন্ধে লিখেছিলনে, 'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের

কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ—রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।....গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।... বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্ত রসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' বস্তুত বাল্মীকি রামায়ণে রাম বিষ্ণুর অবতার নন, তিনি মনুষ্যকুলের শ্রেষ্ঠ 'নরচন্দ্রমা' স্বরূপ। রামচন্দ্রকে বাল্মীকি পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, সম্রাট প্রভৃতি সম্পর্কের আদর্শ স্থানীয় পুরুষ করে তুলেছেন। সর্বস্তরের ভারতবাসীর কাছে রামচন্দ্র অনুসরণযোগ্য এক মহান চরিত্র। যাইহোক, বাল্মীকির রচনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে আরো প্রায় ৬/৭টি রামায়ণ ও ২/৩টি সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনার ঘটনা প্রমাণ করে ভারতবর্ষের চিত্তলোকে এই মহাগ্রন্থ কত আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। রামকাহিনী শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ব্রহ্মদেশ-শ্যাম-কম্বোজ-চিন-ভিয়েতনাম-মালয়-ইন্দোনেশিয়াতে বিস্তার লাভ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েবার, ভিন্টারনিৎস্ মহাভারতের তুলনায় রামায়ণকে অপ্রাচীন বলে মন্তব্য করলেও অন্তবর্তী তথ্যে রামায়ণই সর্বাগ্রে রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত টানতে হয়। এছাড়া রামায়ণকে কেউ কেউ রূপক হিসেবেও বিবেচনা করেন। ভারতবর্ষের আর্য সভ্যতার বিস্তারের ইতিকথা নাকি এর মধ্যে সূচিত। 'সীতা' শব্দের অন্য অর্থ 'হল্যা ভূমি'। রামচন্দ্র কর্তক লঙ্কাপুরী থেকে রাবণহত্যা করে সীতা উদ্ধারের কাহিনী অনার্যপ্রধান অরণ্যঙ্কুল দক্ষিণ দেশে কৃষিসভ্যতা পত্তনেরই ইঙ্গিতবাহী। রামায়ণে অনুস্যূত জীবনবোধ যে চিরায়ত, তার উদ্‌ঘোষণা বাল্মীকি নিজেই করে গিয়েছেন এই মহাকাব্যে—'যাবদ্ স্থাস্যন্তি গিবয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। তাবদ্ রামায়ণীকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।।' এই মহৎকাব্যের অনুবাদ প্রাদেশিক ভাষায় শুরু হয় একাদশ শতকে। প্রথমে তামিলে, পরে হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষায়। পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলা ভাষায়। বঙ্গদেশে রামায়ণ অনুবাদের সূচনাকার ছিলেন কবি কৃত্তিবাস—'কীর্তিবাস কৃত্তিবাস কবি এ বঙ্গের অলঙ্কার।'

৫.২.১ কৃত্তিবাসের ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল

উনিশ শতকে বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাচীন পুথিসংগ্রহের আগ্রহ দেখা দিলে বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে যাঁর পুথির অনুলিপি সবচেয়ে বেশি মিলেছিল তিনি হলেন কৃত্তিবাস। এ ঘটনা কৃত্তিবাসের বিপুল জনপ্রিয়তারই স্মারক। লোকসাধারণের বোধের জগতে নতুন কিছু সংযুক্ত করতেই যে তাঁর লেখনী ধারণ এর আভাস মেলে। তাঁর উক্তিতে—'সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।' কৃত্তিবাসের কাব্য ধনীর রাজপ্রসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত পঠিত। অথচ এত বড় লোককান্ত কবির ব্যক্তিপরিচয় আজও পুরোপুরি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মধ্যযুগের লেখা দুটি গ্রন্থে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে একটুকরো করে তথ্য দেওয়া আছে। প্রসিদ্ধ কুলাচার্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের লেখা 'মহাবংশাবলী'তে বলা হয়েছে—'কৃত্তিবাস কবির্ধীমান সৌম্যঃশান্ত জনপ্রিয়', আর জয়ানন্দ মিশ্র চৈতন্যমঙ্গলে বলেছেন—'রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি। পাঁচালি করিল কৃত্তিবাস অনুভবি।।' শ্রীরামপুরে কর্মরত মিশনারীরা প্রেস স্থাপন করে বাইবেলের পাশাপাশি আর যে-গ্রন্থ ছাপিয়ে প্রকাশ করেন সেটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ। প্রকাশের সুবাদে কৃত্তিবাস সম্পর্কে গবেষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তেমন তথ্য মেলে না। ১৮৩৪ সালে যখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত হয়ে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আবার বেরলো তখনো কবির জীবনকথা বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। ১৮৫২-তে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতা

বিষয়ে যে-বক্তৃতা দেন বীটন সোসাইটিতে সেখানে কবির কাব্য নিয়ে অনেক কথা বলা হলেও তাঁর ব্যক্তিপরিচয় অনুল্লেখিত থাকে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিত'-এ (১৮৬৯) দুটি তথ্য দিলেন—'ফুলিয়ার কৃত্তিবাস' ও তিনি 'মুরারি ওঝার নাতি'। ১৮৭০-এ ঢাকা থেকে হরিশচন্দ্র মিত্র 'কৃত্তিবাস পরিচয় সংগ্রহ' -এ রামায়ণ গায়কদের খাতা থেকে কাব্যপংক্তি উদ্ধার করে ছেপে দিলেন। তাতে পাওয়া গেল কৃত্তিবাসের পিতা ও মাতার নাম, ভাইয়ের সংখ্যা ও নাম। অনেকেই কৃত্তিবাসের জন্মসন উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোনরকম প্রমাণ বা সূত্র ব্যতিরেকে। ১৮৯৬ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে কৃত্তিবাসের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও জীবনী বিষয়ে কিছু জানা যায় না। কিন্তু ১৯০১ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণে দীনেশচন্দ্র আত্মপরিচয় শীর্ষক একটি রচনাংশ ছেপে দেন। তিনি এটি পেয়েছিলেন বাঁকুড়া ও হুগলীর সীমান্তে অবস্থিত বদনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির কাছ থেকে। কিন্তু যে-পুথি দেখে এটি তিনি নকল করেছিলেন পরে সেটিকে তার লোকসমক্ষে আনা সম্ভব হয়নি। সে সময়ে মূলটি অপ্রাপ্ত হওয়ায় সকলেই ধারণা করেছিলেন এটি একটি জালিয়াতির ঘটনা। এর বহুবছর পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ভারতবর্ষ পত্রিকায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী নগেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে প্রাপ্ত কত্তিবাসের আত্মবিরণী প্রকাশ করলে বোঝা গেল দীনেশচন্দ্র প্রকাশিত অংশটি জাল নয়। ভট্টশালী সংগৃহীত পুথিতে কৃত্তিবাসরে আত্মপরিচয় বিস্তৃততর। উক্ত দুই বিবরণী মিলিয়ে আমরা কবি কৃত্তিবাসের জীবনের রূপরেখা এখানে আঁকতে পারি।

কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ ছিলেন নারসিংহ ওঝা। ইনি পূর্ববঙ্গে বেদানুজ রাজার পাত্র ছিলেন। একদা ঐ অঞ্চলে মুসলমান অক্রমণ ঘটলে তিনি গঙ্গার পূর্বতীর ফুলিয়াতে এসে বসবাস করতে লাগলেন। পূর্বে মালীদের বসবাস ছিল এই স্থানে। ফুলের চাষ ব্যাপক পরিমাণে হত বলে এর নাম ফুলিয়া। নারসিংহের বংশধর ছিলেন মুরারি। মুরারীর পুত্র বনমালী, যিনি কৃত্তিবাসের পিতা। তাঁর মায়ের নাম মালিনী। কৃত্তিবাসেরা ছয় ভাই, মতান্তরে সাত—কৃত্তিবাস, মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব শ্রীধর, বলভদ্র ও চতুর্ভুজ। আর ছিল এক ভগিনী। কৃত্তিবাস তাঁর জন্ম বার ও তিথির উল্লেখ করেছেন—'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥' কৃত্তিবাস তাঁর পিতামহ-প্রদত্ত নাম। বারো বছর বয়সে উত্তর দেশে পড়তে গেলেন বড় গঙ্গা পেরিয়ে। গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপ্ত করে রাজপণ্ডিত হওয়ার আশায় গৌড়েশ্বরকে পাঁচ শ্লোক পাঠালেন। দ্বারী হাতে শ্লোক দিয়ে রাজার অনুমতির অপেক্ষায় রইলেন। সপ্তঘটি বেলাতে রাজার আহ্বানে নয় দেউড়ি পেরিয়ে পৌঁছুলেন। রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর চারিদিকে পাত্রমিত্র। কৃত্তিবাসের উল্লেখ মতো এঁরা হলেন—জগদানন্দ, সুনন্দ, কেদার খাঁ নারায়ণ, গন্ধর্ব রায়, শ্রীবৎস্য, মুকুন্দ। চারিদিকে নৃত্যগীত সমারোহের মধ্যে রাজা মাঘ মাসের রৌদ্রতাপের আরাম ভোগ করছিলেন আঙিনায়, 'রাঙা মাদুরি' বিছিয়ে। রাজা হাতছানি দিয়ে ডাকতে কবি তাঁর নিকটে গেলেন। চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে সাত শ্লোক পড়লেন তিনি। দেবী সরস্বতী প্রসাদে সেই রমণীয় শ্লোকে রাজা মুগ্ধ হয়ে কবিকে পুষ্পমালা উপহার দিলেন। কেদার খাঁ চন্দনের জল ছিটোলেন। উপহার মিললো পাটের পাছড়া। সভাসদরা কবিকে রাজার কাযছ থেকে আরো কিছু চেয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কবি পার্থিব সম্পত্তিবিমুখ। তিনি এই ভিক্ষা করলেন—'যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে। আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥' একথায় রাজা সন্তুষ্ট হয় কবিকে রামায়ণ রচনা করতে আদেশ করলেন। কবি রাজসভা থেকে বহির্গত হলেন। সভার সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। অতঃপর কবি রামযণ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর আত্মপরিচয়ের শেষাংশে তিনি আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে লিখেছেন—'মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি। পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥ বাপ মায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান। রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥ সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস

পণ্ডিত ॥' রামায়ণে কিছু লোক মনোরঞ্জক গালগল্প ঠাঁই পাওয়ায় অনেকের ধারণা কৃত্তিবাস তেমন পণ্ডিত কবি ছিলেন না। কিন্তু কবির সাক্ষ্য মেনে নিলে এ ধারণা দূরীভূত হয়ে যায়। বিপুল পাণ্ডিত্য না থাকলে বাল্মীকির কবিত্ব অনুভব করে তাঁর প্রাঞ্জল ভাবানুবাদ রচনা করা সত্যই দুঃসাধ্য কর্ম।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীটি প্রাপ্তির সূত্রে পরবর্তীকালের গবেষকরা তাঁর আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে যত্নবান হয়েছেন। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, কবি তাঁর বিবরণে জন্মতিথি, মাস ও বার উল্লেখ করলেও শকাব্দ বা বঙ্গাব্দ কোন কিছুই উল্লেখ করেননি। তাছাড়া যে গৌড়েশ্বরের দরবারে তিনি সম্মানিত হন তাঁর সভাসদদের নাম উল্লেখিত হলেও রাজার নামটি অনুক্ত থেকে গেছে। ফলে গবেষক মহলে সৃষ্টি হয়েছে ধন্দ এবং তার সুত্রে বাদানুবাদ। আমরা সংক্ষেপে তার পরিচয় দিয়ে মোটামুটি একটা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার চেষ্টা করবো।

কবি আত্মবিবরণের সূচনাতেই পূর্ববঙ্গস্থিত কোন এক 'বেদানুজ' রাজার কথা বলেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, এটি হবে দানুজ রাজা। এখন, দানুজ নামধারী তিনজন রাজা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছেন পৃথক পৃথক স্থানে ও সময়ে। দনুজ মাধব বা দনুজ রায় ছিলেন একজন শক্তিশালী রাজা। আর একজন ছিলেন দনুজ মর্দন দেব, যাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৭-৯৮ খ্রিঃ। আর ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক দনুজ রায়। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা এই দনুজ রায়ের পাত্র ছিলেন।

এবার কবির উল্লেখিত বার-তিথির প্রসঙ্গ। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনানুসারে যে-বৎসর মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী রবিবরা পড়েছিল, কবির উল্লেখিত 'পূর্ণ' শব্দটিকে মর্যাদা দিয়ে সেই সালটি নির্ধারিত করেছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৩৫৪ শক বা ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি। কিন্তু নলিনীকান্ত ভট্টশালীর আবিষ্কৃত পুথিতে 'পূর্ণ' স্থলে রয়েছে 'পূণ্য' শব্দটি, যা মধ্যযুগের সাধারণ লিপি-বিভ্রান্তি বলে অনেকে মনে করেন। ভট্টশালীর অনুরোধে যোগেশচন্দ্র 'পূণ্য' শব্দটিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয়বারের জ্যোতিষ বিচারেপৌঁছন ১৩২০ শকে বা ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। এই দুই সালের মধ্যে কোন্‌টি সত্য? সে সিদ্ধান্তের জন্য অন্যান্য পরোক্ষ সূত্রের সাহায্য প্রয়োজন। এখন সেগুলির অনুসন্ধান করা যাক।

১. কুলপঞ্জিকা অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খান ও খুড়তুতো ভাইয়ের পৌত্র গঙ্গানন্দ ফুলিয়া মেলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ততদিনে কৃত্তিবাস পরলোক গমন করেছিলেন। নইলে তাঁর মতো খ্যাতিমান মানুষের জীবিতকালে কেমন করে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা বংশের প্রতিনিধিত্ব করেন?

২. জয়ানন্দর চৈতন্যমঙ্গলে আছে, মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যদেবের আহ্বানে ফুলিয়া নিবাসী হরিদাস আনুমানিক ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ স্বগ্রাম ত্যাগ করে নীলাচলে যাত্রা করেন। তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন তাঁর সুহৃদ সুষেণ পণ্ডিত। ইনি ফুলিয়ার বিখ্যাত কুলীন মনোহরের পুত্র, কৃত্তিবাসের খুড়তুতো ভাই লক্ষ্মীধরের পৌত্র, অর্থাৎ সম্পর্কে কৃত্তিবাসের পৌত্র। তখন তাঁর মধ্যবয়স। অতএব এর থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন এমন অনুমান করা বিধেয়।

উপরোক্ত দুই যুক্তির বলে সমৃদ্ধ হয়ে কৃত্তিবাসের জন্মসন ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ বলে অধিকাংশ পণ্ডিত মেনে নিয়েছেন। এবার প্রশ্ন তিনি কোন্ প্রশাসকের রাজসভায় সম্মানিত হন? কবির যে-বর্ণনা দেখা যায় তাতে সংবর্ধনায় হিন্দু রীতিরই প্রাধান্য। রাজার সভাসদরা সবাই হিন্দু। ইনি কি কোন হিন্দু রাজা? তাহলে কবি তাঁর নাম উল্লেখ করেন না কেন? ঐতিহাসিকেরা জানিয়েছেন, গৌড়ে ঐ সময়ে একজনই মাত্র হিন্দু রাজা ছিলেন, তিনি গণেশ। যিনি

১৪১৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁর সভাতে কবি পৌঁছুলে তখন তাঁর বয়স হয় বিশ বৎসর। তাছাড়া এতবড় কাব্য নিশ্চয়ই এক বৎসরের মধ্যে লিখিত হয়নি। ১৪১৮ সালে গৌড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। গণেশের পুত্র যদু জালালুদ্দিন নাম ধারণ করে সমস্ত হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের পক্ষে এইরকম অবস্থায় কাব্য লেখা সম্ভব হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

সেজন্য রাজা গণেশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সবাই গ্রহণ করেননি। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মণন্দ্রকুমারর বসু কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণকে নির্দেশ করেছেন। তাঁদের পক্ষে যুক্তি, কংসনারায়ণের পাত্রমিত্রের সঙ্গে কৃত্তিবাস উল্লেখিত গৌড়েশ্বরের পাত্রমিত্রের নামসাদৃশ্য আছে। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র ধরে কংসনারায়ণকে ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে স্থাপন করা যায় না। সেজন্য অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় নতুন কিছু তথ্যের সংযোগে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন যে গৌড়েশ্বরটি হলেন রুক্নুদ্দিন বরবক শাহ্। ইনি বিদ্যোৎশাহী, গুণীর প্রশংসাকারী ও বাঙালি হিন্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষক, এঁর রাজসভায় মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে বিরুদ্ধধর্মের স্পর্শ রাখবেন না বলে সমস্ত হিন্দু পাত্রমিত্রের নাম লিখলেও গৌড়েশ্বরের নামটি উহ্য রেখেছেন। তাছাড়া রাঙা মাজুরী পেতে রোদ পোহানো এই মুসলিম প্রশাসকের পক্ষেই বেশি সম্ভভব। অবশ্য এ ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত টানা এখনও সম্ভভব হয়নি। তবে অধিকাংশ গবেষক ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দকেই কৃত্তিবাসের জন্মসন বলে মেনে নিয়েছেন।

৫.২.২ অনুবাদে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব

বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ অনুবাদের কৃতিত্বের দাবিদার কৃত্তিবাস ওঝা। বাল্মীকির কাব্যের হুবহু অনুবাদ তিনি করেন নি, করেছেন ভাবানুবাদ। বাঙালির গল্পরসের চাচিহদার দিকে তাকিয়ে যেমন কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছেন, তেমনি শিশু মনোরঞ্জক গালগল্পের আয়োজন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ বা উৎস কেবল বাল্মীকি ছিলেন না, জৈমিনী রচিত মহাভারতও তাঁকে আখ্যান যুগিয়েছিল। মূল রামায়ণের কাহিনী-কাঠামো অটুট রেখে এইরকম গ্রহণ-বর্জন কৃত্তিবাসের রচনাকে স্বাদু ও উপভোগ্য করে তুলেছে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে মৌলিক ভাবনার পরিমাণও কম নয়। গল্পের ক্ষেত্রে, চরিত্রচিত্রণে, রসপরিবেশনে, প্রবাদ-প্রবচনে কৃত্তিবাস নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আসলে তিনি উদ্দিষ্ট পাঠক কিংবা শ্রোতার কথা ভেবে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে এইসব বিশিষ্টতা তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর বিশদ কৃতিত্ব পরিমাপে আমরা আলোচনাটিকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করতে পারি—

৫.২.৩ কাহিনী-গ্রন্থনে মৌলিকতা

আখ্যানধর্মী সাহিত্যে কাহিনী সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপাদান। কৃত্তিবাসরে সময়ে রচনাকর্মে চরিত্রের চাইতে বৃত্তের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো বেশি। কবিও রীতির বাইরে পা রাখেননি। কৃত্তিবাস যখন অনুবাদে হাত দিচ্ছেন সেই সময়ে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়ে গেছে রামভক্তিবাদ। তিনি যে বিষ্ণুর অবতার সে বিশ্বাসও প্রতিষ্ঠিত। তাই বিষ্ণুর চারি অংশে বিভক্ত হয়ে দশরথের চারপুত্র রূপে জন্মগ্রহণের কাহিনী দিয়ে সূচনা হয়েছে আদিকাণ্ডের। এরপর রামাদি চার ভ্রাতার সঙ্গে সীতাসহ অন্য তিন ভগিনীর বিবাহ, তাড়কাবধ ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন—এ কাণ্ডের মূলকাহিনী। এর মধ্যেও দু' একটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশ করেছেন কৃত্তিবাস। যেমন—চন্দ্র ও সূর্যবংশের বিবরণ। বাল্মীকি সূচনায় যে কাহিনী-সংক্ষেপ দেন সেটা ছেঁটে বাদ দিয়েছেন আমাদের কবি। অযোধ্যাকাণ্ডেও দু'একটি ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখা গেছে। যেমন—দশরথ কৈকেয়ীকে যে-দুটি বরের কথা

জানিয়েছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা একটি বররূপেই কথিত। বনগমনের পূর্বে রামের বনবাসের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণ যে যুক্তি প্রদর্শন করে বাল্মীকিতে তা তেমনভাবে পাওয়া যায় না। এই কাণ্ডের মূল উপজীব্য রামচন্দ্রের বনবাস এবং তার পিছনে কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধি ও মন্থরার প্ররোচনা। কৃত্তিবাস অন্যভাবে কৈকেয়ীর এই নিষ্ঠুরতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। কবির ব্যাখ্যা ঃ তাঁর ষড়যন্ত্রের ফলেই তো রামচন্দ্র বনবাসে যেতে বাধ্য হন এবং শেষ পর্যন্ত দুরাচারী রাবণধ্বংস সম্ভব। আসলে ভক্তিরসের কারবারী কৃত্তিবাস এভাবে একটি নৃশংস ঘটনাকে ধর্মতত্ত্বের মোড়ক দিয়ে পরিবেশন করেছেন। তাছাড়া বনবাসী রামচন্দ্রকে দেখে ভরদ্বাজমুনি যেভাবে তাঁর চরণবন্দনা করেন, তাও বাল্মীকি রামায়ণে দুর্লভ। বলা বাহুল্য যে, কৃত্তিবাস তাঁর রামচন্দ্রে দেবত্ব আরোপ করে তাঁকে সকলের পূজ্য করে তুলেছিলেন। নন্দীগ্রামে ভরতের কুস্বপ্ন দর্শনও বাল্মীকিতে মেলে না। দূতের দ্বারা নীত হয়ে ভরত যখন অযোধ্যায় এসে সমস্ত ঘটনা অবগত হলেন, তখন তিনি জননীর উপর চরম আক্ষেপে ও আত্মধিক্কারে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা কৃত্তিবাস করলেও মূলে নেই। অযোধ্যাকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সীতা কর্তৃক মৃত দশরথের অতৃপ্ত আত্মাকে বালির পিণ্ডদান এবং চারজন সাক্ষীর প্রতি সীতাবেদীর অভিশাপ ও আশীর্বাদ প্রদান। এটি পুরোপুরি কৃত্তিবাসের কল্পিত। ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গু ও বটবৃক্ষ নিয়ে বাঙালি সমাজে দীর্ঘদিন ধরে যে লোকসংস্কার প্রচলিত ছিল, কৃত্তিবাস এ ঘটনায় তার কাব্যিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অরণ্যকাণ্ডেও অত্রিমুণির পত্নী অনসূয়ার কাছে সীতা আপন জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করেছেন—যা আদৌ বাল্মীকিতে নেই। মূল রামায়ণে রাম কর্তৃক বিরাধ রাক্ষস বধের পর সুতীক্ষ্ণমুণির উপাখ্যান আছে, যা কৃত্তিবাস প্রায় পরিত্যাগ করেছেন। অগস্ত্য কর্তৃক ইল্বল নিধনের কৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। এভাবে কাণ্ড ধরে বিচার করে গেলে কৃত্তিবাসী রামায়ণে অজস্র পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিবর্জনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। আসলে বাঙালি পাঠকের উপযোগী করে কাহিনী পরিবেশনের দিকেই কৃত্তিবাসের নজর ছিল, মূলের বিচ্যুতি নিয়ে তাঁর শিল্পীসত্তায় কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। সেজন্য কার্তিকের জন্ম, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ, অম্বরীষ যজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়গুলি বাদ দিয়েছেন, পরিবর্তে সংযুক্ত করেছেন সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী, গণেশের জন্ম, গুহকের সঙ্গে রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব, হনুমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ, বীরবাহুর যুদ্ধ, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, সীতা কর্তৃক রাবণের মূর্তি অঙ্কন ইত্যাদি ঘটনা। এসব গল্প বলতে কবিকে হাতড়ে ফিরতে হয়েছে জৈমিনী ভারত, স্কন্দপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, কুর্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবী ভাগবত, অদ্ভুত রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, লক্ষ্মণের মূর্ছাভঙ্গ ঘটাতে হনুমান যে বিশল্যকরণী এনেছিল সে ঘটনা অদ্ভুত রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, লক্ষ্মণের মূর্ছাভঙ্গ ঘটাতে হনুমান যে বিশল্যকরণী এনেছিল সে ঘটনা অদ্ভুত রামায়ণে কথিত। জৈমিনী ভারত থেকে নিয়েছেন লব-কুশের দ্বারা ভরত-শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ পরাভূত ও নিহত হলে বাল্মীকির প্রসাদে তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ। দস্যু রত্নাকর 'মরা' 'মরা' বলে যে শাপমুক্ত হয়েছিল এ কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে গৃহীত। হরিশচন্দ্রের উপাখ্যানটি এসেছে দেবী ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে। ভগীরথের জন্মবৃত্তান্তের উৎস যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ। গঙ্গা আনয়নের কাহিনী মেলে স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে। ঐ পুরাণে রয়েছে দশরথের রাজ্যে শনির প্রকোপের কথা। কৃত্তিবাস কুম্ভকর্ণ হত্যায় সীতার দেহ থেকে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাবের কথা জানিয়েছেন, যার উৎস অদ্ভুত রামায়ণ। এইভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ হয়ে উঠেছে ভারতীয় পুরাণকথার সমাহার, তবে অবশ্যই বাল্মকি তাঁর মূলাশ্রয়।

৫.২.৪ চরিত্র সৃষ্টিতে অভিনবত্ব

যে কোন কবির কাব্য গড়ে ওঠে যুগীয় পরিমণ্ডলের জল-আলো-বাতাসে। চরিত্রও তার অন্তর্গত। যুগের বিশিষ্ট দাবি বহন করে জন্ম দিতে পারে কোন কোন চরিত্র। থাকতে পারে তাতে যুগের ত্রুটি, দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতাও।

কৃত্তিবাস তুর্কী আক্রমণোত্তর পঞ্চদশ শতকের বাঙালি সমাজের কবি। মুসলমান আগ্রাসনের ফলে বাংলাদেশ শুধু অন্য শক্তির করতলগত হয়নি, ভেঙে পড়েছে প্রাচীন নীতি-আদর্শের কাঠামো, বিপর্যস্ত হয়েছে সমগ্র হিন্দুসমাজ। এ হেন সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের উন্নত চরিত্র আশা করা অন্যায়। তাছাড়া কৃত্তিবাস লিখতে চেয়েছেন লোকমনোরঞ্জন পাঁচালী। মহাকাব্যের মহৎ, বৃহৎ সমুন্নত চরিত্রের অবস্থান সেখানে বড় বেমানান। ফলে তাঁর চরিত্রগুলি হয়েছে লোকজীবনানুগ। তাছাড়া বাল্মীকির তুলনায় বাঙালি কবির প্রতিভার আপেক্ষিক দীনতাও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। সব মিলিয়ে বাংলা রামায়ণের চরিত্রগুলি মূলের তুলনায় খর্বাকার, তেজোহীন অগৌরবান্বিত হয়ে গেছে। তবুও কৃত্তিবাস এতে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা সঞ্চার করে কিছুটা চোহারা দিতে সমর্থ হয়েছেন। ভক্তিবাদ কৃত্তিবাসের কাব্যে অতিরিক্ত এক উপাদান। মুখ্যত দেশজোড়া রাম ভক্তির উচ্ছাসের পটভূমিতে এ কাব্যের সৃষ্টি। রামচরিত্রে এই নতুন মাত্রা যোজিত হওয়ায় রঘুকুলবীরের স্বভাব বহুলাংশে পরিবর্তিতত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। রামচন্দ্র এখানে যতখানি ক্ষত্রিয় বংশের বীর নায়ক, তার তুলনায় বেশি প্রেমের দেবতা, ভক্তিরসের আশ্রয়, ভক্তবৎসল ভগবান। এ রামচন্দ্র রোদনপ্রবণ বাঙালির স্বভাবসাযুজ্যে মনের মানুষ। তাঁর চোখে বিরহ-অশ্রুর আবির্ভাব সীতাহরণে, সীতার বনবাসে, সীতার পাতাল গমনে। তিনি রাজকীয় আভিজাত্য ছেড়ে আবেগব্যাকুল হয়ে উঠেছেন কোথাও কোথাও। নীতিপ্রচারেও যথষ্ঠ আগ্রহী। রামের সঙ্গে সঙ্গতি রেকে কৃত্বিাসের সীতাও হয়ে ওঠেন অশ্রুমুখী বঙ্গকুলবধূ। নিতান্ত দু'একটি বিশিষ্ট জায়গা ছাড়া কৃত্তিবাস সীতাকে সমগ্র বঙ্গকুললক্ষ্মীর আদর্শ বা মডেল করে তুলতে চেয়েছেন। পতিভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন গড়ে তোলা হয়েছে সীতার সমস্ত কথাবার্তায় ও আচরণে। নারী পুরুষের ছায়ানুগামিনী—এই জাতীয় সামাজিক ধারণার পোষকতা করেন সীতা। অরণ্যকাণ্ডে রাবণ কর্তৃক অপহরণের আগে স্বামীপ্রীতিতে অন্ধ হয়ে দেবর লক্ষ্মণকে ভৎর্সনা করেছেন, তার কুটিরে স্থিতিকে দুরাত্মার ছল বলে বিবেচনা করে পুরুষ কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেছেন। লক্ষ্মণ চরিত্রেও পরিবর্তন সাধন করেছেন কৃত্তিবাস। তাঁর লক্ষ্মণ উদ্ধত, অবিনয়ী। ভরত সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ আছে। বনবাস যাত্রার পূর্বে যেভাবে লক্ষ্মণ যুক্তিবিন্যাস করেছে তাতে একদিকে পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি তীব্র ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া দশরথের স্ত্রৈণতা ও কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা বাল্মীকি রাময়ণ থেকে কৃত্তিবাসী পাঁচালিতে সংক্রামিত হলেও তা যেন বড়ই মাত্রাতিরিক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। দশরথ কৈকেয়ীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেও বাল্মীকির দশরথের মতো চরম রূঢ় কথা বলতে পারেননি। আবার কৈকেয়ী যেন নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করেন বনবাসযাত্রী রামলক্ষ্মণের হাতে বল্কল তুলে দিয়ে। এমকি যাত্রার পূর্বে রাম বিদায় প্রার্থনা ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করলে কৈকেয়ী বিমুখ হন। হনুমানের চরিত্রও অনেকাংশে বাঙালি ঘরের অনুত ভৃত্যের মতোই। রাবণ ও ইন্দ্রজিতের যে-পরিচয় ফুটে উঠেছে তা নিতান্ত রাক্ষসচরিত্র নয়। রাবণ ছদ্মবেশে রামেরই ভক্ত। তিনি শত্রুভাবে বিষ্ণুর কাছে মুক্তি পেতে চান। তাঁর রাম-বিরুদ্ধতার তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি হারিয়ে যায় যখন তিনি মৃত্যু পথযাত্রায় অগ্রণী হয়ে বলেন—'অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন। দয়া করি মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।। চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার। শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার॥' এইভাবে প্রায় সমস্ত চরিত্রের বঙ্গীয়করণে কৃত্তিবাস আপন কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। মহাকাব্যিক চরিত্রের আদিমতা, গাম্ভীর্য, সমুন্নতি কোনটিই বাংলা অনুবাদে রক্ষিত হয়নি, অথচ লৌকিক পাঁচালির উপযোগী চরিত্র হয়ে ওঠায় কৃত্তিবাসের রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-ভরত-কৈকেয়ী-দশরথ-রাবণ-মন্দাদরী এককভাবে বঙ্গীয় পাঠককুলের আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

৫.২.৫ রসসৃজনে দক্ষতা

কাব্য রসের আশ্রয়। কেননা আলংকারিকদের সিদ্ধান্ত : 'রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্'। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে তাঁদের বিধান এখানে নয়টি প্রধান রসের উপস্থিতি থাকলেও চারটি রসের মধ্যে যেকোন একটি অঙ্গীরস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। উক্ত চারটি রস হল—শৃঙ্গার, বীর, করুণ ও শান্ত। বাল্মীকির রামায়ণ করুণরসের কাব্য। অনুবাদক কৃত্তিবাসও মূলকে অনুসরণ করে করুণরসকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত রামায়ণের অধিকাংশ কাহিনীই বেদনাঘন। আখ্যানের সূচনায় রাজ্যাভিষেক থেকে রামকে প্রতিনিবৃত্ত করে কৈকেয়ী কর্তৃক বনে পাঠানো, পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু, রামের নির্বাসনে অযোধ্যাবাসীর ক্রন্দন, কৌশল্যার হাহাকার, অরণ্যে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, সীতার অদর্শনে রামের বিলাপ, রাম কর্তৃক বালীবধ, বালীর পত্নী তারার ক্রন্দন, রাম-রাবণের যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু, ইন্দ্রজিৎ এবং শেষ পর্যন্ত রাবণের পরাজয় ও মৃত্যু, মন্দোদরীর বিলাপ, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তিত সীতার বিরুদ্ধে অপবাদ ও সে কারণে সীতার বনবাসে প্রেরণ এবং সবশেষে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতালপ্রবেশে ঘটনা যথেষ্ট মর্মান্তিক ও করুণরসের আশ্রয়। কৃত্তিবাস এসব ঘটনার বর্ণনায় বাল্মীকিকে যথাসম্ভব অনুসরণ করে গেছেন। বাঙালি স্বভাবতই কোমলপ্রাণ। তারই উপযুক্ত করে আখ্যান পরিবেসিত হওয়ায় স্থানগুলিতে করুণরসের প্রবাহ কোথাও কোথাও তরলতায় পর্যবসিত। তবে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলে বাঙালি পাঠকের কাছে গৃহীত হওয়ায় করুণরসের মানবিক আবেদন কিয়ৎ পরিমাণে লঘু হয়ে গেছে।

প্রাচীন মহাকাব্য মাত্রেই যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা সম্বলিত আখ্যান। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অঙ্গীরস তাই বীররস রামায়ণে অনেকগুলি যুদ্ধের (রামলক্ষ্মণের তাড়কাবধ, খরদূষণের যুদ্ধ, বালিবধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, লবকুশের যুদ্ধ প্রসঙ্গ আছে। স্বভাবতই এ স্থানগুলিতে বীররসের ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু কৃত্তিবাস মূলকে অনুসরণ করলেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এর কারণ মুখ্যত দুটি বলে মনে হয়। প্রথমত, ভক্তিরসের অহেতুক অনুপ্রবেশ ও দ্বিতীয়ত, যুগীয় পরিমণ্ডলে বীর-আদর্শের অভাব। ভক্তিরসে কাহিনী ও চরিত্র দ্রবীভূত হওয়ার ফলে বীররসের গাম্ভীর্য ও সমুন্নতি দুইই নষ্ট হয়েছে। এই ব্যাপারটি বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় লঙ্কাযুদ্ধে রামের বিপক্ষে যারা সমরে অবতীর্ণ হয়েছিল সেই বীরবাহু, তরণীসেন, এমনকি রাবণের মধ্যেও। তারা ছদ্মবেশী রামভক্ত। ফলে তাদের আচরণে, উক্তিতে কোথাও কোন রৌদ্রস্বভাব ফুটে ওঠেনি। সমকালের বাংলাদেশেও নির্জিত হিন্দু বাঙালির অবস্থান। তাঁরা তখন শক্তিহীন, দুর্বল। অনন্যোপায় হয়ে অন্য ধর্মের মানুষের অধীনত্ব মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে এহেন পরিস্থিতিতে মানসিক দুর্বলতা ও নিয়তিবাদের প্রকোপ ঘটা স্বাভাবিক। এ দুইই বীররসের পরিপন্থী। কৃত্তিবাস তাঁর রচনায় বীররসের ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভে অক্ষম হন এই যুগীয় মানসিকতার দ্বারা পুষ্ট ছিলেন বলে। তাছাড়া ভক্তির আতিশয্যও বীররসকে তার স্বস্থান থেকে চ্যুত করেছিল।

অথচ কৃত্তিবাসের খ্যাতি মুখ্যত নির্ভর করেছে এমন একটি রসের সিদ্ধির উপর, যার অবস্থান আলংকারিকদের নির্দেশের বাইরে এবং যেটি রামায়ণ মহাকাব্যের অঙ্গরসের পরিপন্থী। সে রস হাস্যরস। বস্তুত রঙ্গব্যঙ্গ ও পরিহাস রসিকতায় কবি সব শ্রেণীর রসসৃষ্টির প্রয়াসকে অতিক্রম করে গেছেন। এর পিছনের কারণগুলি অনুধাবনযোগ্য। কৃত্তিবাস লোকরুচির অনুগত করে পাঁচালী লিখতে চেয়েছিলেন, বোধহয় বিদগ্ধ পাঠকের রসাস্বাদনযোগ্য মহাকাব্য রচনায় তাঁর তত বেশি আগ্রহ ছিল না। সেকালের পল্লীনির্ভর গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালির রসবোধ লগ্ন হয়েছিল ব্যঙ্গ, বক্রোক্তি ও পরিহাসপ্রবণ চটুলতায়। অন্তত কৃত্তিবাস নানা স্থানে মূল আখ্যানের বাইরে যেসব স্বাধীন কাব্যপ্রসঙ্গ যোজনা করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, তিতিন গ্রামীণ বাঙালির রুচিবোধকেই প্রাধান্য দিয়ে কলম হাতে এগিয়ে গিয়েছেন, মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যরক্ষার দায়বোধ তাঁর ছিল না। এত কিয়ৎ পরিমাণে করুণরস বিঘ্নিত হলেও তিনি অবলম্বিত আদর্শ থেকে সরে আসতে পারেননি। হয়তো এক্ষেত্রে লোকপ্রিয়তার হানি

ঘটার আশঙ্কা তাঁর ছিল। তবে তাঁর সৃষ্ট হাস্যরসের মধ্য দিয়ে সেকালের বাঙালির যথার্থ স্বরূপটি আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয়। তাঁর রচিত দু'একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা গেল।

কবি লঙ্কেশ্বর রাবণের শক্তিমত্তা নিয়ে উপহাস করেছেন হরধনু উত্তোলনের প্রসঙ্গে। সীতাকে বিবাহ করতে এসে বিপুল ওজনের ধনু তুলতে অসমর্থ হলে কবি বড়িম্বিত রাবণ সম্বন্ধে লিখেছেন—'কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে। মনে ভাবে, পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে॥' সীতা অন্বেষণে গিয়ে হনুমান লঙ্কাপুরীতে বন্দী হলে তাকে নিয়ে রাক্ষসীরা পরিহাস শুরু করলে সেও রসিকতা করে বলে—'রাবণ শ্বশুর হবে অদ্য বিভাবরী। সুন্দরী শাশুড়ি পাব রাণী মন্দাদরী।। ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর। আর কি হনুর ভাগ্যে হয় অতঃপর।। প্রমীলা শালাজ পাব পরমা রূপসী। রসরঙ্গে তাঁর সঙ্গে রব দিবানিশি।।' লঙ্কাকাণ্ডে 'অঙ্গদের রায়বার' একটি বিশিষ্ট অংশ। এতে উত্তরোল হাস্যরসের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের অনেক কবি কেবল ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে লোক হাসানোর জন্যে কাব্য লিখেছেন। যাইহোক, কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়েছেন অঙ্গদের বচনে। রাবণ ও অন্যান্য সভাসদরা যখন রাক্ষসী মায়ায় শত শত রাবণ মূর্তি ধরে অঙ্গদকে বিভ্রান্ত করতে চাইলো, তখন ইন্দ্রজিতের প্রতি অঙ্গদের বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি—'যে তোর দারুন পণ তেমন করে কে। কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে।।' তার গালির মধ্যে বালি কর্তৃক রাবণের বন্দীত্বের ঘটনাও টিপ্পনী সহকারে উল্লেখিত—'হিতোপদেশ কি বুঝিবি শুন্‌রে ব্যাটা গরু। তুই বাঁচিলে মোর বাপের কীর্তি কল্পতরু।। নৈলে তোরে বেঁচে থাকতে সাধ করে কি বলি। লোকে বলবে এই ব্যাটাকে বেঁধেছিল বালি।।' এইসব দৃষ্টান্ত সূত্রে বলা যায়, বাঙালির রসরুচি সেকালে খুব উন্নত ছিল না। একদিকে আদিরস ও অন্যদিকে হাস্যরস—এই দুইয়ের সীমার মধ্যে দুর্বলশক্তি, হীনবীর্য নিরুদ্যমী বাঙালি বসবাস করছিল। কৃত্তিবাস এদেরই জন্য কাব্য লিখতে গিয়ে মূল আদর্শ থেকে স্খলিত হয়েছিলেন। যুগের দাবির কাছে তাঁর এই আত্মসমর্পণ সেকালের কবিদের অনিবার্য ভবিতব্য ছিল।

৫.২.৬ কাব্যনির্মিতি কৌশলে বিশিষ্টতা

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্যের কাহিনী গঠনে অনুবাদকের তেমন কোনো নিজস্বতা থাকে না। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো মূলের ভাষারূপ বজায় রাখতে পারেন, যদি দুই ভাষার মধ্যে উৎসগত কোন যোগাযোগ থাকে। কৃত্তিবাস সংস্কৃত থেকে বাংলা করেছেন। ভাষার যোগ থাকা সত্ত্বেও বাল্মীকির কাব্যভাষা তিনি অনুসরণ করেননি। প্রাচীন কবির ভাষা উদাত্ত, গম্ভীর ও অলংকৃত। পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করতে গিয়ে কৃত্তিবাস ভাষার এইসব বৈশিষ্ট্য বর্জন করেছিলেন। তবে মোটের উপর কৃত্তিবাসের ভাষা সরল ও প্রসাদগুণযুক্ত। হাস্যরসের স্থানগুলিতে ভাষা তরল। তাঁর খেয়াল ছিল তিনি পাঁচালি লিখছেন। সেই অনুযায়ী সেকালের বিখ্যাত দুই ছন্দোবাহন পয়ার ও ত্রিপদী কৃত্তিবাসের অবলম্বন ছিল। অবশ্য সে সময়ে পয়ার তার নির্দিষ্ট ১৪ মাত্রায় নিয়মিত ছিল না। কোথাও বেশি, কোথাও কম। মনে রাখতে হবে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী লেখা হয়েছিল গেয় কাহিনী কাব্য হিসেবে। গানে অক্ষরের বা মাত্রার ন্যূনাধিক্য থাকতে পারে। সুরের টানে অক্ষর বা মাত্রার এই ন্যূনতা পূরণ করা হয়। বর্তমানে যেসব গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে তাতে খুব একটা পয়ারের চালে অসমতা দেখা যায় না। কারণ পুথি বারবার লিপিকরণের ফলে লিপিকরদের হস্তক্ষেপে ছন্দের ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে, বাকিটা পূরণ করে দিয়েছেন আধুনিক কালের কাব্যসচেতন সম্পাদকগণ। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে পয়ারের ছত্রে এখনও অধিকাক্ষর রয়ে গেছে। যেমন—'টলবল করিয়া উপরে পর্বতের ঘোড়া', 'দূর হইতে দেখে তারে কুম্ভকর্ণ মহাবলী', 'মুনির গায়ে সানার টোপর হইল খান খান', 'নখরের চিহ্ন দিল পর্বতের চারিভিতে', 'ওলটি পালটি চাহেন রাম গোদাবরীর তীর' ইত্যাদি। ত্রিপদীর

ক্ষেত্রে ৮/৮/১০ মাত্রার ত্রিপদী বেশি লিখেছেন কৃত্তিবাস। মুখ্যত ঘটনা বর্ণনায় পয়ার ও দৃশ্য বর্ণনায় ত্রিপদী তাঁর অবলম্বন। ছড়ার ছন্দ তখন ধামালী নামে পরিচিতি। এটি চারমাতার দ্রুতলয়ের ছন্দ। কৃত্তিবাসে তারও আভাস পাওয়া যায় অঙ্গদের রায়বারে। বিষয়ের লঘুতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ছন্দ যোজনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন কৃত্তিবাস।

কাব্যদেহের প্রসাধনে অলংকার প্রাচীনকাল থেকে নিয়োজিত। কবির ব্যবহৃত অলঙ্কারে তাঁর কাব্যের দ্বৈত প্রকৃতি আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট। বাল্মীকি শীলিত কাব্য তাঁর আদর্শ। সে সূত্রে কিছু সংস্কৃত অলংকার ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে গ্রামীণ শ্রোতার রসবোধের কাছে বিপুল আবেদন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম এমন সাধারণ অভিজ্ঞতাকেও উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর ফলে বৈচিত্র্যময় স্বাদ সঞ্চারিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কয়েকটি অলংকারের উপর চোখ রাখা যাক—

সংস্কৃতানুগ অলঙ্কার ঃ ১. নিদ্রায় আকুল রামা হল অচেতন।
চরণ পঙ্কজ ভ্রমে ধায় অলিগণ ৷৷
২. বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া।
৩. চরণে নূপুর বাজে রুনুঝুনু শুনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ৷৷

দেশী অলঙ্কার ঃ ১. তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী।
২. কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ৷৷
৩. জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।
৪. কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে।

বলা বাহুল্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ দেশী অলঙ্কারগুলিতে।

৫.২.৭ ভক্তিবাদ প্রচারে সফলতা

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক দেশ। এদেশের সাহিত্য-শিল্পকলায় ধর্মীয় অনুভূতির প্রাধান্য। জল-হাওয়া-মাটির গুণে এখানে রক্তমাংসের মানুষও দেবতায় পরিণত হয়। রামায়ণী কথা সর্বপ্রথম মানবকথার সারাৎসার রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। বাল্মীকির রাম সমস্ত মাবকুলের আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাবে তিনি হয়ে ওঠেন বিষ্ণুর এক অবতার। তখন তাঁকে ঘিরে সমগ্র ভারতে রামভক্তিবাদ প্রসার লাভ করে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যে রামচন্দ্র দেবালয়াশ্রিত দেবতা হিসেবে পূজা পেতে শুরু করেন। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম ও শেষ কাণ্ডে, অধ্যাত্ম, অদ্ভুত ও যোগবিশিষ্ট রামায়ণে রামের দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে একাদশ শতকে সন্ধ্যাকর নন্দী যে 'রামচরিত' লেখেন সেখানে রামকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত শিলালিপি, লেখমালা, মূর্তিশিল্পে ও মন্দিরসমূহে রামসীতার একত্র উল্লেখ ও অবস্থান এবং তাঁদের পূজাপ্রাপ্তি থেকে প্রমাণিত হয় চৈতন্যপূর্বযুগে রামচন্দ্র এদেশের মানুষের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। পনের শতকে কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ অনুবাদে হাত দেন তখন তিনিও এই ধর্মীয় সংস্কৃতির

ঐতিহ্য স্বীকার করে অনুবাদে অগ্রসর হন। কৃত্তিবাসীর রামায়ণে ভক্তির দুটি স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দুটি যথাক্রমে নামাশ্রয়ী ভক্তিবাদ ও পরাৎপরা আদ্যাশক্তির বাৎসল্যভাব। মনে রাখতে হবে, বাংলার মাটিতে তখনো চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেনি। আসলে এ ভক্তির উৎস লুকিয়ে ছিল অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণে। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভক্তিতত্ত্বের আকর। খুব সুন্দর মেধাবী বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদকে উল্লেখ করে লিখেছেন—'কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধর্মপাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাহার ভক্ত। রাবণ শত্রুভাবে তাহার কাছে হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।'

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিছু কিছু কাব্যপ্রসঙ্গ উদ্ধার করে কৃত্তিবাস কর্তৃক প্রচারিত রামভক্তিবাদের স্বরূপ লক্ষ করা যাক। দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হওয়ার প্রসঙ্গ বাল্মীকি রামায়ণে নেই, রয়েছে অদ্ভুত রামায়ণে। কবি সেই কাহিনী সংযুক্ত করে দেখালেন পাপী রত্নাকর কিভাবে 'মরা' 'মরা' বলতে বলতে 'রাম' নামে উদ্ধার পেয়ে আদিকবি বাল্মীকিতে পরিণত হলেন। রামনাম জগত্তারণের উপায়। একবার জপেই কোটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু বধ করার ফলে রাজা দশরথের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। মুনি তাঁকে অভিশপ্ত করেন। পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে রাজা বশিষ্ঠপুত্র বামদেবের নির্দেশে তিনবার রাম নাম জপ করেন। বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে বলেন, 'এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে। তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥' এমনকি পুত্রকে তিনি চণ্ডাল হওয়ার অভিশাপ দেন। লঙ্কাযুদ্ধে অনেক বানর সৈন্য ও রাক্ষস সৈন্য নিহত হয়। অথচ রামের পক্ষ অবলম্বন করেও বানরদের সদ্গতি হয়, মুক্তিলাভ করে রামের বিপক্ষদল রাক্ষসরা। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ইন্দ্র যে কথা বলেন তাতে স্পষ্টত নামভক্তিবাদের জয় সূচিত হয়েছে। ইন্দ্র বলেছেন, 'বারণের মার বলি কপিগণ মরে। উদ্ধার পাইবে বল কি রামের জোরে ॥ রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস। রাম নাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস ॥' হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের দাস। তার মধ্য দিয়ে কবি দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। হনুমান তার হৃদয় চিরে রামসীতার যুগল মূর্ত্তি দেখায়। দুর্বল হনুমানের শক্তি তো রামচন্দ্র। হনুমানের উক্তি—'দুর্বল হনুর তুমি একমাত্র বল। তোমা বিনা নাহি কিছ হনুর সম্বল ॥' রামচন্দ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রেমের দেবতা। তাঁর ক্ষত্রিয় পরিচয়, পৌরুষ, বীর্যবত্তা সেভাবে উপস্থাপিত নয়। কবি ভক্তির গঙ্গোদকে শত্রু পক্ষের মানুষ তরণীসেন, রাবণ প্রমুখকে স্নান করিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন। তরণীশেন সমস্ত দেহে রামনাম লিখে যুদ্ধে আসে। এ হেন ভক্তের দেহে রামচন্দ্র কিভাবে অস্ত্রাঘাত করবেন। সীতা উদ্ধারের ইচ্ছা তাঁর মুহূর্তে উবে যায়। তরণীসেন যুদ্ধে মারা পড়লে তার কাটামুণ্ড রামনাম করতে করতে স্বর্গলোকে উড়ে যায়। রাবণের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে অশুভ লক্ষণ দেখে মন্দোদরী স্বামীকে নিরস্ত করতে চাইলে রাবণের বক্তব্য—'মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে। যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে ॥ বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।' কবি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রায় সূচনাভাগে রামনামের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করেছেন। নিজে প্রণিপাত হয়েছেন দেবতার চরণে। ভবসিন্ধু পার হওয়ার ক্ষেত্রে রামনামই যে ভেলা একথা বলতে তিনি ভোলেননি। তিনি লিখেছেন, 'রাম নাম লৈতে ভাই না করিও হেলা। সংসার তরিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা ॥ রাম নাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়। ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥' পুরোপুরি ভক্তের দৃষ্টিতে লেখা এ কাব্যে সেকালের ভক্তিভাবুক বাঙালি আপন আধ্যাত্মজীবনের স্পর্শ খুঁজে পেয়েছিল। বাঙালির জীবনসাধনার সঙ্গে এ

পাঁচালির আত্মিক মিলের জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাংলার জাতীয় মহাকাব্যে পরিণত হতে পেরেছিল। আর ছিল এর বিশিষ্ট গুণ বাঙালিয়ানা, যাতে এ জাতির মর্মকথা উচ্চারিত। কবি কৃত্তিবাসের ছ'শো বছর ধরে টিকে থাকার সেটাই আসল রহস্য। সে প্রসঙ্গ এ অধ্যায়ের সমাপ্তি-প্রসঙ্গ।

৫.২.৮ বাঙালিয়ানা প্রকাশে অনবদ্যতা

বৃহত্তর ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন দেখা শুরু হয়েছিল আধুনিক যুগে রাজনৈতিক কারণে। প্রাচীনযুগের সম্রাটরা প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন করলেও সংস্কৃতি ও জীবনাচরণগত পার্থক্য রয়ে গিয়েছিল। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের এক ভুখণ্ড। এখানকার জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছে যে-বাঙালি জাতি তার নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই জাতিগত লক্ষণগুলিই বাঙালিয়ানা নামে কথিত। তার দৈনন্দিন জীবন, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠান, বারোমাসের পাল-পার্বণ, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, সুনির্দিষ্ট কর্মধারা, বাগ্‌ভঙ্গিমা এসব কিছুই বাঙালিয়ানার অন্তর্গত। বঙ্গের নিসর্গপ্রকৃতি, নদনদী, মাটি, গাছপালা, পশুপাখিও বৃহত্তর অর্থে বাঙালির বাঙালিয়ানাকে নির্মিত করে দিয়েছে। ফলে কোন কবির লেখায় যখন এর প্রসঙ্গ ওঠে, বুঝতে হবে তাঁর কলমে বাঙালির এই নিভৃত নিজস্ব জীবনভঙ্গিটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

কৃত্তিবাস সর্বভারতীয় রামায়ণী কথাকে বিশিষ্ট আঞ্চলিক রূপের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, যেমনটা দেখা যায় তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এ। কবির পাঁচলি কাব্যে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের ছায়াপাত খুব স্পষ্ট। সেকালের বাঙালি পরিবার ছিল একান্নবর্তী। পারিবারিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সেখানে যে নিবিড় টান অনুভব করা যেত, কৃত্তিবাসের লেখায় এর প্রতিফলন ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে। রাম-লক্ষ্মণের সৌভ্রাতৃত্ব, দশরথের প্রতি রামচন্দ্রের শ্রদ্ধা, বিমাতাদের প্রতি ভক্তি, ভরতের অগ্রজকে সম্মানদান, সীতার সর্বংসহ দুঃখময় বধূজীবন, হনুমানের দাস্যভাব সবই যেন বাংলাদেশের সমাজজীবনের প্রত্যক্ষিক সত্য। এমনকি এটাও ভাবা চলে যে, সেকালের বহুবিবাহজনিত সপত্নীপ্রথাও রূপায়িত হয়েছে কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রার জীবনাচরণে। সর্বভারতীয় চরিত্রগুলির এইরূপ আঞ্চলিক রূপপ্রাপ্তি একদিকে যেমন অনুবাদকের ক্ষীণশক্তির পরিচায়ক, তেমনি অন্যদিকে দীর্ঘকাল ধরে পাঠকসমাজে বেঁচে থাকার গূঢ় রহস্য। মহাকাব্যে যদি একটি জাতির সামগ্রিক জীবনচেতনার ফসল হয়, তাহলে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালির সমূহ জীববোধ যেভাবে উপস্থাপিত তাতে একে জাতীয় মহাকাব্যের সম্মান দেওয়া চলে। জাতির আত্মপ্রতিবিম্বনই হয়তো কবির লক্ষ্য ছিল এবং সেদিক থেকে তাঁর সফলতা প্রশ্নাতীত। এইভাবে স্বকীয়তার উপস্থাপনায় বামপাঁচালি বাল্মীকির মহৎ সৃষ্টির সমান্তরাল এক স্বতন্ত্র বঙ্গীয় মহাকাব্য হয়ে উঠেছে।

বস্তুত পক্ষে কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রে, আখ্যানে, পরিবেশ বর্ণনায়, সামাজিকতায়, নিসর্গ প্রকৃতিতে, দৈনন্দিন জীবনচর্যায় বাঙালিত্বের ও বাংলাদেশের নিবিড় স্পর্শ অনুভব করা যায়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ চয়ন করা যাক।

প্রথমত, চরিত্রগুলি সবই কমবেশি বাঙালি-প্রাণের রসে সঞ্জীবিত। ঘরোয়া আদর্শের ছাঁচে এগুলি তৈরি হওয়ায় পাঠক রামায়ণের গল্পকে বাইরের কাহিনী বলে মনে করার অবকাশ খুঁজে পায় না। বাঙালি বীরের শৌর্য ও দুর্বলতা দিয়ে রামচরিত্র তৈরি। তিনি পত্নীপ্রেমে দুর্বল এবং স্নেহে, মমতায় ও কোমলতায় সজল। সীতা বাঙালি গৃহবধূর মতো নতমুখী, সহিষ্ণু ও স্বামী-অনুগতা। রাবণকে মনে হতে পারে বাংলার দুর্বত্ত কোন জমিদার। কবি মুনিঋষিদের নির্মাণে পেটুক বামুন ঠাকুরদেরকেই আদল করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিকতার ক্ষেত্রে কবির আদর্শ বাংলাদেশের সমাজ। বাল্মীকিতে নেই এমন ঘটনাও কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন কেবল বাঙালি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। যেমন, বনবাস যাত্রার প্রাক্কালে রামচন্দ্রকে বিমাতা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করে যাত্রার অনুমতি ভিক্ষা করতে দেখা যায়, যা মূলে অনুপস্থিত। অরণ্যকাণ্ডে বিদেহী দশরথের অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যে সীতার বালির পিণ্ডদান সমধর্মী আর একটি বিষয়। নির্দোষ ভরত রামের বনগমনের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে তার জননী কৈকেয়ী ও দুষ্ট পরামর্শদাত্রী মন্থরার সঙ্গে যে আচরণ করে তা অনেকাংশে বাঙালি যুবকের চরিত্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। লক্ষ্মণের ঔদ্ধত্য ও গোঁয়ার স্বভাব কবি তাঁর সমাজ থেকেই আহরণ করেছিলেন বলে মনে করি। বাঙালির আবেগপ্রবণতা, কোমলতা, দার্ঢ্য পরশ্রীকাতরতা তাঁর কাব্যে এভাবে নানা দিকে থেকে বাঙালিত্বের মুদ্রাচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

তৃতীয়ত, বাঙালির দৈনন্দিন জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক কৃত্তিবাস অবিকল তুলে ধরেছেন। যেমন, রামচন্দ্রের জন্মকেন্দ্রিক নানা আচার-অনুষ্ঠান (পাঁচুটি, ষষ্ঠীপূজা, অষ্টকলাই, নত্তা, জননাশৌচান্ত, অন্নপ্রাশন), পূজা-পার্বণ, ব্রত-উপবাস ইত্যাদি বর্ণনা আছে কাব্যে। রাজ্যাভিষেকের পূর্বদিন রাত্রে রাম ও সীতা সংযম অবলম্ভবনপূর্বক উপবাসী থাকেন। পুত্রের মঙ্গলকামনায় কৌশল্যা শিবের পূজোয় রত হন। দশরথ ও রাবণের অন্ত্যেষ্ঠি সংস্কার বাঙালি হিন্দুর মতো।

চতুর্থত, বঙ্গদেশের বিবিধ স্থাননামের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কৃত্তিবাস অযোধ্যার কাহিনীকে রাসরি বাংলার মাটিতে নামিয়ে এনেছে। গঙ্গা অবতরণের প্রসঙ্গে তিনি নদীয়া, নবদ্বীপ, মেড়াতলা, সপ্তগ্রাম, আকনামাহেশের কথা লিখেছেন, যেগুলি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল।

পঞ্চমত, বাঙালির খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপক উল্লেখ মেলে কৃত্তিবাসের পাঁচালিতে। রামচন্দ্রের অন্বেষণে বহির্গত ভরতকে নারিকেল, কলা, আম, কাঁঠাল, দুধ, দই, কইমাছ, চিতলমাছ ইত্যাদি বাঙালির অভ্যস্ত খাদ্যসামগ্রী দিয়ে অভ্যর্থনা করে গুহক চণ্ডাল। ভরতের আহারের জন্য ভরদ্বাজমুনিও যেসব পিঠে পায়সের ব্যবস্থা করেন বাঙালির রসনায় তারা চির আস্বাদিত হয়ে এসেছে। কবির বর্ণনায় মেলে—‘চন্দ্রাবতী বড়া পীঠে মুগের সামলী। সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারিকেল পলি ॥’ কবি বানর বাহিনীকে মানবীয় আকার দিয়েই এঁকেছেন। ফলে তাদের ভোজন দ্রব্যও বাঙালির ন্যায়। তারা খায় লুচি, কচুরি, ছানাবড়া, ছানাভাজা, জিলাপি, মণ্ডা, মতিচুর, রসকরা, সরুচাকুলি, গুড়পিঠা, পাঁপড়, পায়েস ইত্যাদি ভক্ষ্যদ্রব্য। বাঙালির পাকশালার বর্ণনা পাওয়া যায় উত্তরকাণ্ডে সীতার রন্ধনে। তিনি দীর্ঘকাল অভুক্ত দেবর লক্ষ্মণকে দুর্দান্ত সব ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত করেছেন। একটু উঁকি দেওয়া যাক সীতার রন্ধনশালে—‘প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ। তার পরে সুপ আদি দিলেন সানন্দ ॥ ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাল ব্যঞ্জন। ....শেষে অম্বলান্তে হল ব্যঞ্জন সমাপ্ত।’

সবশেষে নিসর্গবর্ণনার কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের সজলাশ্যামলা প্রকৃতি রামায়ণে উপস্থিত। পশুপাখিরা বর্ণনায় বাংলার জীবজন্তু ও পাখিরা খুব বর্ণবন্ত। সারস, কাদাখোঁচা, শকুন, কোকিল, চিল, কালপেঁচা, কাকাতুয়া, মাছরাঙা, হরিতাল, পায়রা, বাজপাখি, বাদুড়, বক, টিয়া, চামচিকি, কাঠঠোকরা—কার নাম না উল্লেখ করেছেন কবি। বোঝা যায় কবি বঙ্গদেশের জীবনধর্ম ও পরিবেশের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে এ রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে অত্যন্ত যথার্থ মূল্যায়ন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙালির হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মকাকাব্যে

বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালি সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।' কৃত্তিবাসী রামায়ণে পরিস্ফুট বাঙালিয়ানা সম্পর্কে এটাই সারকথা, শেষকথা।

৫.৩ ভাগবত অনুবাদের ধারা

বেদ-উপনিষদাদির পর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে যে-জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা সুবিপুল সেগুলি হল পুরাণ। পুরাণগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কৃষ্ণকথাকেন্দ্রিক পূরাণ শ্রীমদ্ভাগবত। পন্ডিতগণের মতে, পুরাণগুলির জন্ম হয়েছিল কোন বিশেষ ধর্মনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে। বলা হয়ে থাকে, নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের অভিঘাতে বৈদিক ধর্মের যে নবরূপান্তর ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ আছে পুরাণে। এই হিসাবে সংস্কৃত লেখা ১৮টি মহাপুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণের জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পর। পুরাণে পৌরাণিক দেবতাদেরই জয়জয়কার। প্রতিটি পুরাণে পাঁচটি লক্ষণ আবশ্যিকভাবে লক্ষ করা যায়। এগুলি হল—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। পৌরাণিক দেবতারাই পরবর্তীকালের ধর্মবিশ্বাসে জাঁকিয়ে বসেছেন। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে পৌরাণিক সংস্কৃতিরই আধিপত্য দেখা যায়। পুরাণে, বলাবাহুল্য, কাব্যরস কম, তার পরিবর্তে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গল্পকথা, পূজার্চনাবিদি, প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস এবং প্রচুর পরিমাণে ধর্মতত্ত্ব বা দার্শনিকতা। তাই পুরাণের আবেদন রামায়ণ-মহাভারতের মতো রসপরতান্ত্রিক নয়। পুরাণ থেকে আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক চূর্ণসূত্র মেলে। মোট ছত্রিশটি পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণের প্রভাব জনজীবনে সবচেয়ে বেশি। কারণ এ পুরাণে বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় বিষ্ণু তথা তাঁর অবতার কৃষ্ণের জীবনকথা ও বাণী লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে এই পুরাণ প্রধান ধর্মগ্রন্থ রূপে বিবেচিত। ভারতবর্ষে ভক্তিধর্ম প্রচারে ভাগবতের ভূমিকা অসামান্য। চৈতন্যোত্তর যুগে তো বটেই, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও যে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ভাগবতের সুবিপুল জনপ্রিয়তা ছিল তার প্রমাণ এই গ্রন্থের অনুবাদে দৃষ্ট হয়। ভাগবতকে কেন্দ্র করে কবি জয়দেবই প্রথম বড়মাপের কৃষ্ণকথাকাব্য গীতিপ্রবন্ধে লেখেন। কিন্তু তার ভাষা ছিল সংস্কৃত। বাংলা ভাষায় কৃষ্ণকেন্দ্রিক আখ্যান প্রথম লেখার কৃতিত্ব দাবি করতে পারনে বড়ু চণ্ডীদাস। তবে তাঁর কাব্যের প্রকৃতি বিশুদ্ধভাবে পৌরাণিক ছিল না। তিনি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তিটিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর প্রেমিক তথা কাম বিহ্বল মূর্তিটি পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। এর পিছনে বোধ হয় লোকরুচির আনুগত্যটাই ছিল প্রধান প্রণোদনা। তিনি ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে কৃষ্ণের জীবনের কিছু কিছু কাহিনী গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখলেও তাকে অনুবাদগ্রন্থের মর্যাদায় ভূষিত করা চলে না। তিনি তা দাবিও করেননি। তাছাড়া অনুবাদ সাহিত্যের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল 'লোক নিস্তারণ'। বড়ু সে আদর্শের ধারে-কাছে পৌঁছুবার চেষ্টা করেননি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে মালাধর বসুই সর্বপ্রথম ভাগবতকে মূলে অনেকটা আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ঐ কালপর্বের ভাগবতীয় কৃষ্ণকথার সেরা অনুবাদ। পরবর্তীকালের কবিরা মালাধরকেই আদর্শ ধরে এগিয়ে ছিলেন, যদিও অনুবর্তীদের রচনায় প্রেমভক্তিবাদের ব্যাপক প্রভাব সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

৫.৩.১ মালাধরের ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল

মধ্যযুগের অধিকাংশ কবির ব্যক্তি-পরিচয় অজ্ঞাত। মালাধর সম্পর্কে যতটুকু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া গেছে তাতে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা করা চলে। কবির নিজের দেওয়া বিবরণটি এইরকম—'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিনেল প্রভু ব্যাস ॥ তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।

বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন ॥' কবির কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে নাকি গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। কাব্যে কবির স্বীকারোক্তি—'গুণ নাই অধম মুই নাই কোন জ্ঞান। গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান ॥' গ্রন্থ রচনার সময়ও নির্দেশ করেছেন কাব্য মধ্যে—'তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন ॥' কবির জন্মস্থান কুলীনগ্রামে তাঁর কুলপরিচয় সংগ্রহ করতে যান কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ। তা থেকেও কিছু অতিরিক্ত তথ্য মেলে। সবদিক মিলিয়ে মালাধর সম্পর্কে কিছু কথা এখানে বিবৃত করা গেল। মালাধর বসুর জন্ম বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। কিংবদন্তি অনুসারে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন। তাঁদের সাথে আসেন পাঁচ কুলীন কায়স্থও, যাঁদের মধ্যে অন্যতম দশরথ বসু। মালাধর সেই আদি কায়স্থের ত্রয়োদশ পুরুষ। কবির জন্মসন জানা যায়নি। তবে অন্যবিধ প্রমাণে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে বলে অনুমান করা হয়েছে। কবির পুত্র সত্যরাজ খান। এঁর পুত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যদেবের পার্ষদ ছিলেন বলে কথিত। কেউ কেউ আবার সত্যরাজ ও রামানন্দকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেন। কবির শিক্ষাদীক্ষার কথা কিছু জানা যায় না। তবে যেমন বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন তাতে তাঁকে যথেষ্ট পণ্ডিত বলেই মনে হয়। কবি তাঁর কাব্য শুরু করেন ১৩৯৫ শক বা ১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। শেষ হয় ১৪০২ শ অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি এক গৌড়রাজের কথা উল্লেখ করেছেন, নাম নির্দেশ করেননি। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে, ১৪৭৩ সালে নাগাদ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহ। ইনি বিদ্যানুরাগী, গুণীর সমজদার ও হিন্দুধর্মের প্রতি অনকূল ছিলেন। রুকনুদ্দিন রাজত্ব করেন ১৪৫৯-৭৪ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরবর্তী প্রশাসক ছিলেন সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ। তাঁর অধিকাংশ সময় কেটেছে যুদ্ধবিগ্রহে। সেজন্য অনেকেই সঙ্গতভাবে অনুমান করেছেন যে, কবির 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন সুলতান রুকনুদ্দিন। কবির পুত্রের নাম 'সত্যরাজ খান'। এটি কি প্রকৃত নাম না উপাধি বিশেষ? কেউ কেউ বলেন, মালাধরের পুত্র লক্ষ্মীধর বসুই এ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহাপ্রবু রামানন্দ বসুকে খুব প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কারণ তাঁর বংশের গুণী, কৃতী মলাধর বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভাগবতীয় ভক্তিরসের স্নিগ্ধ প্রস্রবণে সমগ্র বাঙালিকে আপ্লুত করে ভক্তিধর্মের গোড়াপত্তন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বিনয়োক্তিটি ছিল এইরকম—'তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহো মোর প্রিয় অন্য জল রহু দূর ॥' রামানন্দকে যে মহাপ্রভু কতটা সম্মান দিতেন তার প্রমাণ মেলে রথযাত্রার সময় নীলাচলে প্রতি বৎসর পট্টডোরী আনবার অনুরোধে।

৫.৪.২ অনুবাদে মালাধরের কৃতিত্ব

সংস্কৃত ভাবগত একটি সুবিশাল গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মোট ১২টি স্কন্ধ আছে। অধ্যায় আছে ৩৩৫টি এবং শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০। ভাগবতের রচয়িতা কে এ নিয়ে সংশয় বর্তমান। কথিত আছে যে, মহাভারতকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণগুলির স্রষ্টা। পদ্মপুরাণে উক্ত হয়েছে, সতেরটি পুরাণ রচনা করে তার সারৎসার শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করেন। ভাগবতে কৃষ্ণকথা প্রাধান্য পাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে এ গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হয়েছে। অনুমতি হয়, ভক্তিধর্মের প্রধানকেন্দ্র দক্ষিণ ভারতে ভাগবতের জন্ম হয়। সেখানকার ভক্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা মাধবেন্দ্র পুরী পূর্ব ও উত্তর ভারতে ভাগবত প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধগুলিতে অবশ্য কৃষ্ণকথা নেই। এর দশম স্কন্ধের ৯০টি অধ্যায়ে এবং একাদশ স্কন্ধের ৩১টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম, বিংশ ও একবিংশ—এই তিনটি অধ্যায়ে কৃষ্ণের জীবন উপস্থাপিত হয়েছে। মালাধর এই দশম ও একাদশ স্কন্ধকে অবলম্বন করে অনুবাদে অগ্রসর হন। তাঁর অনুবাদের লক্ষ্য ছিল 'লোক নিস্তারণ' অর্থাৎ জনশিক্ষা।

ভাগবতের কাহিনীর বাইরেও মালাধর পদচারণা করেছেন। অন্যান্য পুরাণের কৃষ্ণকথায় সেখানে প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় কিছু পেয়েছেন, কাব্যে তাকে ঠাঁই দিয়েছেন। তবে ভাগবতের প্রেমিক কৃষ্ণকে সেভাবে উপস্থিত করেননি তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ঐশ্বর্য গুণান্বিত কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন। এটা ঘটনা যে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির আদর্শ প্রচারের পূর্বে বৈধীভক্তির প্রাবল্যে সমস্ত দেশ ভেসে গিয়েছিল। মালাধর তাঁর সময়ের ভাবনায় আবদ্ধ ছিলেন। তবে তিনিই মধুর পন্থার ভজন সম্পর্কে সম্যক্ অবগত ছিলেন, যার স্মারক 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই বাক্য। এই প্রেমময় বাক্যে মধুর ভজনের সংকেত পেয়ে উল্লসিত মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ'। মহাপ্রভুর প্রশংসাধনা মালাধরের কাব্য এর পর থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। আমরা এখন কাব্যটির নানা দিক নিয়ে বিশদ আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

৫.৩.৩ অনুবাদে মূলানুগত্য

মালাধর দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনীসূত্র অবলম্বনে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত ঘটনা আছে মূল ভাগবতে। একাদশ স্কন্ধে মেলে যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগের কাহিনী। অবশিষ্টাংশে কৃষ্ণ-উদ্ধবের কথোপকথনে মুক্তি, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি, যতিধর্ম ইত্যাদি তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে। মালাধর এই দুই স্কন্ধের মূল কাহিনী-কাঠামো এবং কিছু তত্ত্বাংশ তাঁর অনুবাদে অনুসরণ করেছেন। এছাড়া তিনি হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের কিছু কিছু আখ্যান গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যটিতে। মালাধর যে মূল ভাগবতের সব কটি স্কন্ধ তাঁর কাহিনীতে গ্রহণ করেননি, এতে তাঁর সহজাত পরিমিতিবোধ প্রমাণিত হয়েছে। আসলে অনুবাদ করতে গিয়েও কবি সবসময় নজর রেখেছেন কৃষ্ণকেন্দ্রিক নিটোল একটি গল্পের দিকে। সেটি যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য প্রয়োজনে অন্য উৎসের কাছে হাতও পেতেছেন। তত্ত্বকথা যতটা সম্ভব বর্জন করেছেন। তাঁর রচনাটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ড তিনটিতে কাহিনীসজ্জার ক্রমটি এইরকম :

১. আদ্যকাহিনী (বৃন্দাবন লীলা) : এখানে কংসের অত্যাচারে প্রপীড়িতা বসুমতীর ক্রন্দনপূর্ণ অভিযোগ থেকে কৃষ্ণের জন্ম-অঙ্গীকার, জন্ম, বাল্যলীলা, পূতনাবধ, শকটভঙ্গ, তৃণাবর্তবধ থেকে রাসলীলা ও শেষ পর্যন্ত বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

২. মধ্যকাহিনী (মথুরালীলা) : এই পর্বে কংস নিধন, কুব্জা-সংবাদ থেকে শুরু করে উগ্রসেনের সেবক হয়ে কৃষ্ণের প্রজাপালন, পরে মথুরা ত্যাগ এবং পশ্চিম সমুদ্রতীরে জলদুর্গের মধ্যে দ্বারকাপুরী স্থাপনের জন্য কৃষ্ণ-বলরাম মন্ত্রণা পর্যন্ত কাহিনীর বর্ণনা আছে।

৩. অন্ত্যকাহিনী (দ্বারকালীলা) : এখানে বিশ্বকর্মা কর্তৃক দ্বারকাপুরী নির্মাণ, মথুরাবাসীদের দ্বারকায় আশ্রয় গ্রহণ, বলরাম-রেবতী বিবাহ, বসুদেব যজ্ঞ, সুভদ্রাহরণ থেকে শুরু করে ঋষিদের অভিশাপ, উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণের সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা, দ্বারকাপুরী ধ্বংস, যদুবংশ বিনাশ, জরাব্যাধের দ্বারা বাণবিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মালাধর বসু যে নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী ভাগবতীয় কৃষ্ণকথাকে কখনো সংক্ষিপ্ত, কখনো বিস্তৃত, আবার কখনো বা পুরোপুরি বর্জন করেছেন, তা তাঁর অনুবাদের ভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে। ভাগবতে যেখানে কৃষ্ণ-বলরাম ও গোপসখাদের বাল্যলীলা তথা গোচারণ প্রসঙ্গ দুটি অধ্যায় জুড়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, কবি সেখানে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে এটি তুলে ধরেছেন। বরং বেশি কলম বুলিয়েছেন কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশক অংশে। কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সে অংশে ভাগবতে গোপীদের ক্রন্দন বেশ বড় জায়গা নিয়েছে। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। একই প্রবণতা দেখা যায় শাল্ববধের বিবরণেও। মালাধর এখানেও বিস্তৃত কাহিনীকে সংক্ষেপ করেছেন। কবি অভিনবত্ব সঞ্চারের জন্য অথবা কোন কারণে কাহিনীর কিছু পরিবর্তন বা অন্যতর বিন্যাসও ঘটিয়েছেন। যেমন, ক্রুদ্ধ কংস যখন মহামায়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাথরে নিক্ষেপ করলেন, তখন কবির মহামায়া জানান কংসকে হত্যা করার জন্য যিনি আসবেন তিনি গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাগবতে এভাবে স্থাননির্দেশ করা হয়নি। মালাধরের নিজস্ব কল্পনা যুক্ত হয়েছে স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনাতেও। নাটকীয়তা সৃষ্টি জন্য কবি ঘটনার ক্রম কোথাও কোথাও উল্টে দিয়েছেন। যেমন ভাগবতে আছে কালযবন বধের পর জরাসন্ধের মথুরাপুরী আক্রমণের ঘটনা। মালাধর পুরী আক্রমণের ব্যাপারটি আগে এনেছেন। বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন বলরাম-রেবতীর বিবাহের, মূলে যা ভীষণ সংক্ষিপ্ত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচনায় কবি কেবল ভাগবতের উপর নির্ভর করেননি। তিনি গল্পের ও চমৎকারিত্বের প্রয়োজনে গীতা, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, এমনকি সংস্কৃত সাহিত্যেরও দ্বারস্থ। দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক। নবজাত কৃষ্ণকে নিয়ে যখন বসুদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন তখন এক শৃগালী তাঁকে পথ দেখায়। কবির দেওয়া এ তথ্য ভাগবতের নয়, ভবিষ্যপুরাণের। উদ্ধবের বিশ্বরূপ দর্শন তো প্রত্যক্ষভাবে গীতার প্রভাব। মহাভারত থেকে সংযুক্ত হয়েছে সুভদ্রাহরণের কাহিনী। পারিজাত হরণের কাহিনীকে বিশদ করে বলতে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে আখ্যান গ্রহণ করেছেন কবি। মহাভারতের গল্প অনুসরণ করেন জরাসন্ধ ও শিশুপালের জন্মকাহিনীতে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের আলোচনায় অনেকে মনে করেন যে, নৌকালীলা, দানলীলার অংশগুলি পরবর্তীকালে এ কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এমনকি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অর্বাচীন পুথিতে রাধার পাশাপাশি ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের উল্লেখও চৈতন্য-পরবর্তী যুগের প্রক্ষেপ। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই অংশের পিছনে সেদিনের সর্বভারতীয় ভক্তিবাদী প্রবণতাই কাজ করে গিয়েছিল। অবশ্য এটা ঘটনা যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে-ভক্তিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি নয়, তা ভগাবতে বর্ণিত বৈধী ভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনুবাদে আরো একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা গেছে। সেটি হল, এই রকম বিশুদ্ধ বৈষ্ণবভাবাশ্রিত কাব্যে শাক্ত প্রভাবের অজস্র নিদর্শন। যেমন—স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনায় রুক্মিণী দেবকীকে বলেছেন, 'পূজ দেবী চণ্ডিকা ভবানী।' নরকাসুরের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের সময় বন্দিনী রাজকুমারীরা ঘট পেতে মহেশ্বরীর 'পূজার সংবাদ দিয়েছেন মালাধর—যা মূল ভাগবতে নেই। রাসমণ্ডলে গোপিনী পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের বর্ণনায় কবি তন্ত্রের প্রভাব স্বীকার করেছেন। উদ্ধবের কাছে কর্মযোগের তত্ত্ব বলার সময় কবি তন্ত্রের বিস্তৃত বর্ণনার জন্য যোগবাশিষ্ট, গেরণ্ড সংহিতা, লিঙ্গপুরাণ, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের শরণাপন্ন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরি তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই ব্যাপক শাক্তপ্রভাব বাংলাদেশের মূল ধাতু ধর্ম্মকেই প্রকাশ করেছে। বৈষ্ণব কাব্য রচনা করতে গিয়েও মালাধর তাই শক্তি সাধনার বিশেষ প্রকরণকে তাঁর কাব্যে বর্জন করতে পারেননি। পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথা সাহিত্যে তন্ত্রনির্ভর যে শাখাটি লক্ষ্য করা যায় তার পূর্বসূচনা মালাধরের কাব্যেই—এ মন্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না।' যাইহোক, অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি যে অনেক স্বাধীনতা নিয়েছিলেন সেটা বোঝা যাচ্ছে ভাগবত-বহির্ভূত প্রসঙ্গ সংযুক্তিতে। আক্ষরিক অনুবাদে যে-ধরনের যান্ত্রিকতা দেখা যায় কবির রচনা তার থেকে মুক্ত। তবে রচনাসৌকর্যের

দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রামায়ণের মতো সুললিত হতে পারেনি। যেখানে তাঁর স্বকীয়তা প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে রচনা কল্পনাশক্তির পরশমণিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একজন জীবনসচেতন শিল্পীর দেখা মেলে সমগ্র অনুবাদ কর্মটিতে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে সাহিত্য ঐতিহাসিক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'এই কাহিনী অনুসরণ করলে দেখা যাবে, মালাধর যতটা নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে ভাগবতের কাহিনী অনুসরণ করেছেন, সে যুগের আর কোনো কবি ততটা ঐকান্তিকতা দেখাতে পারেননি। দু'একটি প্রসঙ্গ বাদ দিলে কবি মূল কাহিনীকে যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন, তাতে কোন সংশয় নেই।'

৫.৩.৪ ভক্তিবাদ-প্রসঙ্গ

মালাধরের কাব্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তির একটি বিশিষ্ট দিক উপস্থাপিত। চৈতন্য পূর্ববর্তীযুগে ভাগবতীয় কৃষ্ণকথা প্রচলিত থাকলেও অহৈতুকী প্রেমভক্তির ধারণা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মূর্তিকে ঘিরে বৈধী ভক্তির প্রবল প্রতিষ্ঠা সর্বত্র বিরাজমান ছিল। মালাধর তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। এছাড়া কাব্যটি 'গোবিন্দবিজয়', 'গোবিন্দমঙ্গল' ও 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম' নামেও অভিহিত হয়েছ। 'বিজয়' শব্দটি এখানে কৃষ্ণের কীর্তিকথা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম' নামে কবি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি অনেকাংশে পরিষ্কার হয়ে গেছে। গ্রন্থটি যে রসাস্বাদনের চাইতে ভক্তির সূত্রে পুণ্যার্জনের পথেই অনেক সাহায্য করবে কবির প্রাক্-ভাষণ থেকে সেটা বোঝা যায়। কবি লেখেন—'গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার। শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার ॥' এই প্রসঙ্গে একথা ভাবা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাক্-চৈতন্য পর্বে মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈতাচার্য, ঈশ্বরপুরী প্রমুখ ভক্তিপথের সাধকগণ বাংলাদেশে যে-ভক্তিবাদী ভাবনার সূচনা করেছিলেন, জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলিতে যে-কৃষ্ণকথা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল বিদগ্ধ সমাজে, তার দ্বারা কোনভাবে উদ্দীপিত হয়ে মালাধর অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের প্রেমময় মূর্তি থাকা সত্ত্বেও কবি কেন তাঁর অনুবাদে সেদিকটিকে প্রাধান্য দিলেন না তা অনুধাবনযোগ্য। অনেকে এই ক্ষেত্রে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে দায়ি করেছেন। তাঁরা বলেন, মুসলমান প্রশাসকদের অত্যাচার ও ইসলামধর্মের আক্রমণে নির্জিত হিন্দুসমাজে যে বলিষ্ঠ ও বীর্যবান মানুষের আবির্ভাব ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠছিল, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সেই ঐশ্বর্য ও প্রতাপের মূর্তিমান বিগ্রহ। একটু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষ্ণ যেন জাতীয় বীরের প্রতিমূর্তি। তাই কৃষ্ণকেন্দ্রিক গল্পে আদিরসের স্থলে ঐশ্বর্যগণের প্রাধান্য। আবার কারও মতে, কবির পৃষ্ঠপোষক রাজসভার ঐশ্বর্যশক্তির প্রভাব তাঁর উপর পড়ায় কৃষ্ণের মধুর ভাবাশ্রিত গোপীজনবল্লভীয় প্রেমরসের তুলনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে তাঁর দেবত্ব ও শাস্ত্রীয় মহিমা। তবে এ প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায় যে, যে-ভাগবত কবির অনুবাদের আদর্শ তাতে ঐশ্বর্যমিশ্রিত কৃষ্ণলীলারই প্রাধান্য। ফলে মালাধরের কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে বৈধীভক্তির প্রথাসিদ্ধ রূপটি দুকূলপ্লাবী আত্মনিবেদনের ভাবোচ্ছ্বাস সেখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট একটি চরণকে ('নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ') মহাপ্রভু তাঁর দার্শনিক ভাবনার দিক থেকে খুবই মূল্যবান বলে মনে করতেন। এই কাব্যপংক্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে রাগানুগা সাধনার মূল ভাবনাটি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন, 'পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত শ্রীচৈতন্যের উক্তিটির জন্য বৈষ্ণব সমাজে ইহার বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। তাহা না হইলে ভাগবতের ঐশ্বর্যাশ্রিত বীররসাত্মক কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের যে পৌরুষব্যঞ্জক বিরাট চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মাধুর্যভাবের সাক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট কিরূপ বোধ হইত, তাহা সংশয়ের

বিষয়।'

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় সত্তাই যে কবির অন্যতমত লক্ষ্য ছিল, তার কিছু কাব্যগত প্রমাণ এখানে দাখিল করা যেতে পারে। ব্রজলীলার মধ্যে কৃষ্ণ কয়েকটি অসুর বধ করেছিলেন। এর বর্ণনাতে কবির কলম যেন উল্লসিত হয়ে উঠেছে। উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা ভাগবতে নেই, কিন্তু মালাধরের কাব্যে আছে। বীররসের বর্ণনায় কবি খুব স্বচ্ছন্দ। অবিষ্টাসুরের বর্ণনা এর অন্যতম। কৃষ্ণ যেভাবে অবলীলায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করেছেন, তাতে কবির অনন্ত শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ভাবাত্মক রূপটি খুব স্পষ্টমাত্রায় ধরা পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, জয়দেবের পরে মালাধর আইবর্ভূত হলেও তাঁর কাব্যে কোথাও কৃষ্ণপ্রেয়সী রাধার নাম উল্লেখ করেন না।

৫.৩.৫ বাঙালিয়ানা ও কবির কবিত্ব

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাব্যমূল্য বিচারে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যা বাঙালির জীবনাচরণ ও ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ, করার ফলে মালাধরের মধ্যে সংগুপ্ত হয়েছিল। কবি মূলের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকেও বাঙালি মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন কোথাও কোথাও। ভাগবতের পটভূমি মথুরা-বৃন্দাবন-দ্বারকা। সেখানকার নিসর্গপ্রকৃতি, জনজীবন কিংবা লোকাচার বাংলাদেশের তুলনায় অবশ্যই আলাদা। অথচ কবি এমন ভাবে কাহিনী বর্ণনা করেন যাতে পাঠক এই সত্য বিস্মৃত হয়ে নিজের চারপাশের প্রতিবেশকে তাঁর মনের পর্দায় দেখতে পান। জননী যশোদা ও বাঙালি ঘরের মায়ের মধ্যে আমরা কোন পারিবেশিক ভেদ খুঁজে পাই না, যখন তিনি পুত্রদ্বয়কে ডেকে বলেন, "আইস বাপু বলরাম কানাঞিত লইয়া। ভাত খ্যায়্যা পুনরপি খেলাহ আসিয়া ॥' অঘাসুর বধের পর কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত বালকদের খাদ্য বণ্টন করেছেন এ চিত্রও নিতান্ত বাংলাদেশের। কাব্যের নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা ভাত খাওয়ার এইসব সংবাদ কি বাংলার খদ্যাভ্যাসকেই স্মরণ করায় না?

খাদ্যাভ্যাস ছাড়া কাব্যে মেলে বাংলাদেশের অতি পরিচিত বৃক্ষাদির বর্ণনা। কবি মথুরার রস্তার ধারে গুয়া, জলপাই, কামরাঙার গাছ দেখতে পেয়েছেন, বৃন্দাবনের বনে রয়েছে তাল, তমাল, আমলকী, বাসক, পাকুড়, পলাশ প্রভতি গাছ। আবার কবি যখন কৃষ্ণের জন্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন, 'পুত্রের জনম দিনে/কাজর দিলা নয়নে/শূন্য ঘরে আছেন শ্রীহরি' তখন একান্ত বাংলারই এক সদ্যোজাত শিশুর চিত্র ফুটে ওঠে। এর সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের প্রসঙ্গে যশোদা যখন বলেন, 'মিথ্যা না দুসিয় পুত্রখানি' তখন বাংলাদেশের মাতৃহৃদয়ের অভিমানই রূপ পেয়ে যায়। এর পাশাপাশি বাংলার বর্ণবিভাজন, ফুল, ফল, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি—সব কিছুই কাব্যক্ষেত্রে উঠে আসে। কবির উপমা চয়নেও বঙ্গদেশের অনুষঙ্গ উপস্থিত। কৃষ্ণ যখন কেশী দানবের দেহ বিদীর্ণ করে মাটিতে ফেললেন, তার বর্ণনায় কবি লেখেন, 'ফুটি কাঁকুড়ি যে হৈল খান খান'। এতো একান্তভাবে বাংলাদেশেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা সজাত।

মালাধরের কবিত্বের আলোচনায় অনেকেই হত্যাশাব্যঞ্জক উক্তি প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁদের ভাবনায় অগোচরে কাজ করে গেছে কবি কৃত্তিবাসের সিদ্ধি। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলা প্রয়োজন যে, রামায়ণ কিংবা মহাভারতের গল্প সাধারণ্যে যতটা পরিচিত ভাগবতের কাহিনী ততটা নয়। সেদিক থেকে জনপ্রিয়তায় ঐ দুই মহাকাব্যের গল্পের কাছে ভাগবত দাঁড়াতে পারে না। এইরকম আপেক্ষিক দুর্বল স্থানে দাঁড়িয়ে মালাধরের যাত্রাসূচনা হয়েছিল। ফলে জনপ্রিয়তার নিরিখ দিয়ে তাঁর কাব্যের সিদ্ধি ব্যাখ্যা করাটা অনুচিত। অন্যদিকে, কাব্যরচনায় তাঁর মুখ্য অভিপ্রায় ছিল লোক-নিস্তারণ। ফলে বিশুদ্ধ কবিত্বের জন্য কবিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর ছিল না। আর তাছাড়া

'কবিত্ব' শব্দের অর্থ যদি হয় দ্যুলোক-ভূলোক সঞ্চারী কল্পনাশক্তির ক্রিয়া তাহলে বলতে হবে মালাধর কেন কোন অনুবাদকের সেই ক্ষমতা প্রকাশ পায়নি তাঁদের সৃষ্টিতে। বরং কবিত্বের অর্থকে সংকীর্ণ করে যদি প্রয়োগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে কাব্যটিতে কবি একটি পূর্বকথিত গল্পের নিটোল ভাষান্তর ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'কাহিনী বয়নে যেমন তিনি মাঝে মাঝে মৌলিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তেমনি বর্ণন সৌকর্যে ও অনুভূতি প্রকাশের আন্তরিকতায় কখনও তাঁর কাব্য প্রাণময় হয়ে উঠেছে।' বর্ণনার সৌকুমার্য ফুটেছে যশোদার গর্ভ থেকে যোগমায়ার জন্মের মুহূর্তটিতে—'উঙা উঙা করিয়া কান্দএ কন্যাখানি। চিয়াইল প্রহরি সব ক্রন্দন শুনি ॥' এছাড়া কৃষ্ণপ্রেমতদ্‌গত গোপীদের চিত্রাঙ্কণে কোমলভক্তি নিস্নাত মাধুর্যের স্পর্শ মিলবে কৃষ্ণের চারপাশে ভীড় করে আসা গৃহত্যগিনী গোপিনীদের বর্ণনায়—'এতেক বিপ্রিয় যবে গোবিন্দ বলিল। হেট মাথা করি গোপী কাঁদিতে লাগিল ॥ স্তন বাহিয়া আঁখির জল পড়ে ভূমিতলে। বসন মলিন হৈল নয়ানের জলে ॥' কৃষ্ণের বংশীনাদে জীব ও জড় জগতের যে আনন্দিত প্রতিক্রিয়া কবি বর্ণনা করেন তার কবিত্ব মূল ভাগবতকে বোধ হয় ছাপিয়ে গিয়েছে। এর এক ঝলক—'কদম্বের তলে জবে বংসি নাদ দিল। তা শুনি ময়ূর পক্ষ নাচিতে লাগিল ॥ সুখান জতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে। বংসির নাদে ফুল ফল ধরে তরুগণে ॥' মথুরাগামী কৃষ্ণের সংবাদ বন্দাবনে প্রচারিত হলে সমস্ত গোপিনীরা যে-ভাষায় বিলাপ করতে থাকে তার আবেগ ও আন্তরিকতা সত্যই অপূর্ব সঙ্গীতধর্মে কাব্যমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—

'আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব দামোদরে ॥

আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্ভবন ॥

আর না যাইব সখী কল্পতরু মূলে।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে ॥

কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥

অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কান হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥

তবে কবিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে অলংকার ও ছন্দ-প্রয়োগে তিনি সৃজনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর ব্যবহৃত অধিকাংশ অলংকার গতানুগতিক ও ভাগবত অনুসারী। যেমন—'পূর্ণিমার চান্দ জিনি বদলকমল। খঞ্জন জিনিএগ্রা সোভে নয়ান যুগল ॥' অবশ্য এরই ফাঁকে কোথাও কোথাও বাঙালি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবি অলংকার নির্মাণের কাজে লাগিয়েছেন। যেমন—পুতনার বর্ণনায়, 'লাঙ্গলের ঈষ যেন দন্ত সারি সারি। গিরিসম কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি ॥' তাঁর কলমে মূর্ছিতা রুক্মিনী—'কদলির গাছ যেন পড়ে অল্প ঝরে।' সব শেষকথা এই যে, বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর নেতৃত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণ ধর্মের উত্তাল তরঙ্গ জেগে ওঠবার বেশ কিছু সময় আগে মালাধর প্রায় অপরিচিত কৃষ্ণকথাকে সাধারণের ভোগ্য এক সামগ্রীতে পরিণত করেছিলেন। সেখানে তাঁর কেউ দোসর ছিল না, ছিল না প্রতিদ্বন্দ্বীবও। মনে রাখা জরুরী যে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত প্রথম রচনা। এই কাব্যের ধর্মীয় গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে মহাপ্রভু যখন মালাধরের বংশধর বসু রামানন্দকে সশ্রদ্ধায় বলেন, 'তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥' তখন শ্রীচৈতন্যের এই অভিব্যক্তিই হয়ে ওঠে কাব্যটি সম্পর্কে সবচেয়ে সেরা মূল্যায়ন। মহাপ্রভুর আস্বাদনধন্য গ্রন্থটি তাই চৈতন্যোত্তর কালে নৈষ্টিক বৈষ্ণব সমাজে স্থান ককের নিতে বিশেষ বিলম্ব করে না।

৫.৪ মহাভারত অনুবাদের ধারা

রামায়ণের মতো কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পর্বে বিন্যস্ত মহাভারতও ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য এক অঙ্গ। একটি জাতির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সামগ্রিক পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে। রামায়ণে ছিল দুই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সংঘাত, আর মহাভারতে আছে একই সংস্কৃতির অভ্যন্তর ভাগের নীতিগত সংঘর্ষ। স্বজনঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, পাশব প্রতিহিংসা, আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ বীরত্ব, দেবোপম ক্ষমা ট্র্যাজেডির হাহাকার পর্বে পর্বে বিন্যস্ত করে মহাকাব্যের কাহিনীকার মানবভাগ্যের যে করুণ পরিণতির চিত্র অঙ্কন করেছেন তা কাব্য হিসেবে যেমন অতুলনীয়, তেমনি তা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিভূমিও বটে। মহাকবি বেদব্যাস কুরু পাণ্ডবের কাহিনী বর্ণনার সূত্রে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বিশদ পরিচয় রেখেছেন ভারতকথার প্রতিটি পৃষ্ঠায়। তাই এ গ্রন্থ একাধারে পুরাণ, মহাকাব্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ। আর ধর্মাদি চতুর্বর্গে সন্ধান দেয় বলে মহাভারত 'পঞ্চম বেদ' নামেও কথিত। মহাভারত যেন একটি বিশাল জীবন নাট্যের প্রদর্শন শালা, যার প্রারম্ভিক সূচনায় ভারতকথার উন্মোচন, অগ্রগতির পর্বে জিগীষা ও জিঘাংসার কুটিল ইন্ধন, চরমোন্নতিতে রণরঙ্গমুখর অস্ত্রের ঝনৎকার, অবনয়নে ক্রোধশান্তি ও উপান্তে গৈরিক বৈরাগ্যমণ্ডিত এক গভীর ট্র্যাজিক বেদনা। আয়তনিক বিচারে মহাভারত বিশাল এক গ্রন্থ। আঠারো পর্বে বিন্যস্ত ও লক্ষাধিক শ্লোকে সমাপ্ত। অনেকের ধারণা, মহাভারত-বর্ণিত ঘটনা বাস্তব ও ঐতিহাসিক। আর্যভট্টের মতে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বরাহ-মিহিরের মতো, জ্যোতিষশাস্ত্রে কিংবদন্তিরা মনে করেন প্রায় খ্রি. পূ. ২৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অনেকগুলি লিখিত প্রমাণের দ্বারা বর্তমানে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, খ্রিঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দীর মধ্যেই মহাভারত বর্তমানে আকারে গড়ে উঠেছে এবং খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মহাভারতের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর যবদ্বীপ ও কম্বোজে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। আদিপর্বের শ্লোক থেকে অনুমিত হয়, বেদব্যাস ছাড়া তাঁর পঞ্চশিষ্য সুমন্ত, পৈল, জৈমিনী, বৈশম্পায়ন ও শুকদেব (পুত্র) পৃথক পৃথক ভারত-সংহিতা রচনা করেন। তার মধ্যে মহামুনি জৈমিনীর অশ্বমেধপর্বের কাহিনীটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। সপ্তম শতকের মধ্যে যে এই মহাগ্রন্থ শিক্ষিত ভারতবাসীর ধর্মজিজ্ঞাসা ও রসপিপাসাকে তৃপ্ত করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল, সে আভাস পাওয়া যায় বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ। শুধু আর্যাবর্তেই নয়, দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম প্রভৃতি দ্রাবিড়ী ভাষাতেও মহাভারতের কাহিন সাঙ্গীকরণের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদেও হয়েছিল অল্পবিস্তর। বাংলায় এর সূচনা ঘটে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে। ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, সুলতান হসেন শাহের কর্মচারী চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতাতেই সর্বপ্রথম এর চর্চা শুরু হয়। তাঁর পুত্র ছুটি খানের রাজত্বকালেও এ চর্চা অব্যাহত থাকে। এ দুজন কবি চৈতন্য-পূর্ব যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর একজন কবির কথা জানিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। তাঁর নাম সঞ্জয়। প্রাক্-চৈতন্য পর্বে এঁদের সাহিত্যকৃতির আলোচনা তাই পরবর্তী খণ্ডাধ্যায়গুলির বিষয়।

৫.৪.১ কবীন্দ্র পরমেশ্বর

বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। ইনি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসক (লস্কর) পরাগল খানের আজ্ঞায় কাব্য রচনা করেন। পরাগল ধর্মে মুসলমান হলেও বিদ্যোৎসাহী ও কলারসিক ছিলেন। তিনি হিন্দু পুরাণের গল্প শুনতে ভালবাসতেন, কিন্তু গল্পরস

নিবৃত্তির প্রধান বাধা ছিল সংস্কৃত ভাষা। সেজন্য পৃষ্ঠপোষিত কবি পরমেশ্বরকে নির্দেশ দিলেন ভারত কাহিনী রচনার, যাতে একদিনের মধ্যেই সমগ্র কাব্যটি শুনে উঠতে পারেন। কবি তাঁর ভণিতায় 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস', 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর', 'কবীন্দ্র' প্রভৃতি শব্দকে ব্যবহার করেছেন। কোন কোন সমালোচক অপর এক মহাভারত অনুবাদক শ্রীকর নন্দীর সঙ্গে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্ব নির্দেশ করেছেন। কবিদ্বয়ের অভিন্নতা বিষয়ে যাঁর কলম সবচেয়ে বেশি উচ্চকিত, তিনি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই মত সমর্থন করেন শহীদুল্লাহ ও সুশীল কুমার দে। বস্তুত পরাগলী মহাভারতে প্রাপ্ত একটি ভণিতায় 'শ্রীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া' চরণটি এঁদের ধারণার মূলে কাজ করেছে। কিন্তু এ মত নানা কারণে মানা যায় না। প্রথমত, আমরা জানি, প্রাক্-উপনিবেশ পর্বের পুথিসাহিত্য গায়েনদের মুখেই বেঁচে থাকতো। সেক্ষেত্রে গায়েনদের মুখে দুই কবির নাম এক স্থানে চলে আসাটা অসম্ভব কিছু নয়। দ্বিতীয়ত,শ্রীকর-নন্দী'-কে যদি কবির নাম এবং 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর'-কে যদি উপাধি বলে ধরে নিই, তাহলে তা যুক্তি হিসেবে দাঁড়ায় না। 'কবীন্দ্র'-এর সঙ্গে 'পরমেশ্বর' সংযোগের ফলে প্রথমটি উপাধিতে পরিণত হয়েছে। অতএব শ্রীকর নন্দী নাম প্রক্ষেপ মাত্র। তৃতীয়ত, 'শ্রীকর নন্দী' যদি কবির নামই হতো তাহলে ছুটি-খানী মহাভারতে তিনি বার বার ঐ নাম ব্যবহার না করে 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' ভণিতা ব্যবহার করতেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের বক্তবই যুক্তিযুক্ত—'অতএব সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস' এবং ছুটি-খানী মহাভারতের রচয়িতা 'শ্রীকর নন্দী' ভিন্ন লোক।'

কবন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যের নাম 'পাণ্ডব বিজয়', যদিও পৃষ্ঠপোষকের অনুমতিক্রমে লিখিত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'পরাগলী মহাভারত'। এই কাব্যে বাংলার দুইজন শাসকেরক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—হোসেন শাহা ও নসরৎ খান। নসরৎ হোসেনের পুত্র। প্রথম জন রাজত্ব করেন ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রি. এবং দ্বিতীয় জন ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত। যেহেতু কাব্যের বর্ণনায় দু'জন প্রশাকই উল্লেখিত তাই কবির কাব্যের রচনাকাল ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। কাব্য শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে যে লস্কর পরাগল কবিকে 'কবীন্দ্র' উপাধি দিয়েছিলেন এটি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু একজন মুসলমান প্রশাসকের হিন্দু কাব্যকাহিনী শোনার এরূপ বাসনার কারণ কি? এক্ষেত্রে অনুমান ছাড়া পথ নেই। যতদূর মনে হয়, যোদ্ধৃ মনো ভাবের মানুষ ছিলেন পরাগল। অথচ যুদ্ধবিগ্রহমূলক ইসলামী কাহিনীর সাক্ষাৎ বাংলাভাষায় তখনো পাননি। সেজন্য মহাভারতের কূট ষড়যন্ত্র, বিবদমান দুই শক্তির যুদ্ধবিগ্রহ, সৈন্যাপত্য কৌশল এই তুর্কী শাসককে মুগ্ধ করেছিল। সেজন্য তিনি কবিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'এইসব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া। দিনেকে শুনিতে পারি পাঞ্চালী রচিয়া ॥' কবিও অন্নদাতার মর্জিমাফিক মহাভারতের মূল কাহিনী অনুসরণ করে অতি সংক্ষিপ্ত এক অনুবাদ পেশ করলেন। কবি তাঁর ইচ্ছামতো রচনা কার্যে স্বাধীনতা পাননি বলে রচনাটিতে প্রতিভার বিশেষ কোন ছোঁয়া মেলে না। শিল্পগুণের দিক থেকেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা। তবুও এ রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা মহাভারতের মতো দীর্ঘ আয়তনিক কাব্যের অনুবাদ এর আগে সাহস করে করতে কেউ অগ্রসর হননি। কবি সুদূর চট্টগ্রামে বসে এ কাব্য লিখেছিলেন। সেদিক থেকে রাঢ় বঙ্গে লেখা পূর্বসূরীদের কাব্যের কোন আদর্শ পাননি। নিজেকেই ভাষাপথ খনন করে পয়ার-ত্রিপদির চালে কথাকে দুলিয়ে রসগ্রাহী অন্নদাতা প্রভুর মনোরঞ্জন করতে হয়েছে। অনুবাদটির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—১. পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে কবি কোন পল্লবিত বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে মূলকে দৃঢ়বাবে অনসুরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ২. মুসলমান প্রশাসকের জন্য রচিত হলেও কাব্যভাষায় আরবী-ফারসীর বিরল ব্যবহার করেছেন। তুলনায় প্রাধান্য পেয়েছে তৎসম শব্দের প্রয়োগ। ৩.

রাজসভার পাঠের উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করলেও সুযোগ থাকা সত্ত্বও কবি উৎকট প্রসাধন বা নাগরিক বিলাসকে প্রশ্রয় দেননি, যা পরবর্তীকালের সভাকাব্যগুলির অন্যতম লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরাগলী মহাভারত তেমন শিল্পগুণান্বিত রচনা নয়। তবে কবির রচনাশৈলীতে যথেষ্ট প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতার দেখা মেলে। যার ফলে পুরো রচনাটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। যেমন, কবি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন—'পরিধান পীতবাস কুসুম বসন। নব মেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন ॥' পয়ারের পাশাপাশি ত্রিপদী ব্যবহারে কবি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, যেমন—'ক্রুদ্ধ হৈল দুর্যোধন/আদেশিলা দুঃশাসন/দ্রৌপদী আনহ চুলে ধরি। রাজার আদেশ পাইআ/দুঃশাসন গেল ধাইআ/সভাতে আনিল একেশ্বরী ॥' বর্ণনায় নাটকীয়তা ও চিত্ররূপ সৃষ্টির দক্ষতাও ছিল পরমেশ্বরের। যেমন—'যেন দুই অগ্নি আসি একত্রে মিলিল। ভীষ্ম ধনঞ্জয় দুই মেশামিশি হৈলে ॥' মহাভারতের প্রথম অনুবাদ হিসেবে এ ধরনের সিদ্ধি যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

৫.৪.২ শ্রীকর নন্দী

বাংলা ভাষায় মহাভারতের দ্বিতীয় অনুবাদক শ্রীকর বা শ্রীকরণ নন্দীকে পাওয়া গেল ঐ একই রাজসভাতে। এই কবি খুব সম্ভব পরাগলের পুত্র ছুটি খানের রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে মহাভারতের বিশেষ এক পর্বের অনুবাদ করেন। কবি কাব্যের সূচনায় লিখছেন, 'লস্কর পরাগল কানের তনয়। সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয় ॥' কেউ কেউ ছুটিখানের প্রকৃত নাম নসরৎ খান বলে নির্দেশ করেছেন। আবার এদিকে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের পুত্রও নসরৎ। তিনি অবশ্য কবির লেখনীতে নসরৎ 'শাহ' বলে উল্লেখিত হয়েছেন। কবির অন্নদাতার প্রভু হিসেবে শ্রীকর নন্দী একই সঙ্গে হুসেন ও নসরৎ শাহের নাম সমস্থানে উল্লেখ করেছেন—'নসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজা। রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা ॥ নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি। পঞ্চ গৌড়েত যার পরম যে খ্যাতি ॥' পিতা-পুত্রের একত্র নামোল্লেখ থেকে সুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকরের অনুবাদটির রচনাকাল ১৫১২ থেকে ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বলে অভিমত দিয়েছেন।

যতদূর মনে হয়, শ্রীকর নন্দীর কাব্য রচনাকালে লস্কর পরাগল জীবিত ছিলেন না। তাঁর পুত্র নসরৎ খান 'ছোট খান' হিসেবে সাধারণ প্রজাবৃন্দের কাছে 'ছুটি খান' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ইনি পিতার মৃত্যুর পর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হন। তিনি তাঁর পিতার মতোই সুদক্ষ শাসক, বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যানুরাগী ছিলেন। মহাভারতের অনুবাদে তিনিও শ্রীকর নন্দীকে আদেশ দেন—'শুনিব ভারতপোথা অতি পুণ্য কথা। মহামুনি জৈমিনীর পুরাণ-সংহিতা ॥ অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়। সভাখণ্ডে আদেশিলা খান মহাশয় ॥' আমাদের মনে হয়, ছুটিখান কেবল রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিষয় নির্বাচন করেছিলেন কবি নিজে। শ্রীকর আগের অনুবাদ সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত ছিলেন বলে কাহিনীতে নূতনত্ব সঞ্চারের তাগিদে কেবল জৈমিনী বিরচিত অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করেন। ঐ পর্বটিতে যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ বীররসের বাহুল্য আছে। মুসলমান সেনাপতির মনোভাব বুঝে যে কবি বিষয় বেছেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাব্যটি রচনায় যে ছুটিখানের অন্য আর এক উদ্দেশ্য ছিল, কবি তারও উল্লেখ করেছেন পোষ্টা প্রভুর উক্তি উদ্ধৃত করে। নসরৎ খান নাকি বলেছিলেন, 'দেশী ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার। সঞ্চারিবে কীর্তি মোর জগৎ সংসার ॥' একথা যদি সত্য হয় তাহলে মুঘল-পূর্ব স্বাধীন সুলতান কিংবা প্রশাসকরা যে বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক দরদ দেখিয়েছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের তুলনায় শ্রীকর নন্দী যে অনেক স্বাধন ছিলেন তা কাব্যের কাহিনী সূত্রে বলা যায়। মূল মহাকাব্যের একটি মাত্র পর্বকে অনুবাদের জন্য বেছে নেওয়ায় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য অনেক নতুন কাহিনী অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে সেইসঙ্গে মূলকেও বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন। যুবনাশ্ব, অনুশাল্ব, নীলধ্বজ, জনা, প্রমীলা, বভ্রুবাহন, চন্দ্রহাস, হংসধ্বজ, চণ্ডিকা, সুরথ ইত্যাদি উপাখ্যান কবি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কবিত্বের বিচারে কবীন্দ্রকে অতিক্রম করার সামর্থ্য ছিল শ্রীকরের। রচনার যথেষ্ট সরলতা দেখা যায়। রাজসভার কবি হওয়া সত্ত্বেও কবি পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা বর্জন করেছেন। অশ্বমেধ পর্বের কাহিনীতে বীররসের প্রয়োগ সুপ্রচুর। কবি মূলের রস বজায় রেখেও অনাবিল হাস্যরসের সঞ্চার ঘটিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ভীমের একটি উক্তির কথা স্মরণ করা চলতে পারে। অশ্বমেধের ঘোড়ার সঙ্গে ভীমের যাওয়ার কথা উঠলে কৃষ্ণ পরিহাস করে বলেন যে, তাঁর মতো স্থূলোদর পেটুকের এ থেকে বিরত থাকা ভালো। তার প্রত্যুত্তরে ক্ষিপ্ত ভীম ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন,

‘মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল ॥
তোহ্মার উদরে যত বৈসে ত্রিভূবন।
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন ॥
তুমি স্থূলোদর নহ, আমি স্থূলোদর।
বিমর্ষিয়া চাহ কৃষ্ণ দেব দামোদর ॥
সংসার উপাড়িয়া সৃষ্টি খাইলা তুহ্মি।
তোহ্মা হতে বহু ভক্ষ হইল কি আহ্মি ॥’

এভাবে জৈমিনী ভারতের রসিকতা ও ব্যঙ্গের প্রসঙ্গগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন শ্রীকর নন্দী। কাব্যের বর্ণনা অংশ কবিত্বের দ্বারা সমৃদ্ধ না হলেও স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত। ছুটি খানের নির্দেশে কাব্যটি রচিত বলে এবং একই রাজসভায় স্বল্পকাল ব্যবধানে দুটি একই ধরনের রচনা সৃষ্টি হয় বলে তাদের পৃথকীকরণের কারণেও শ্রীকর নন্দীর অনুবাদকে অনেকে ‘ছুটি খানের মহাভারত’ বলেও নির্দেশ করেছেন।

৫.৪.৩ বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়

আদিপর্বের মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে আরো দুটি নাম পণ্ডিত ও গবেষক মহলে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এঁরা হলেন বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়। প্রথমজনের আবিষ্কর্তা প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও দ্বিতীয়জনের আবিষ্কর্তা শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন। বসু মহাশয় বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত সম্পর্কে এত উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন যে, বহু পরিশ্রমে কুলজী গ্রন্থ ঘেঁটে এই বিস্মৃতনামা কবির পরিচয় উদ্ধারের দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। অথচ বিব্রত হয়ে পড়লেন যখন বিজয় পণ্ডিতের রচনার সঙ্গে পরাগলী মহাভারতের পাতায় পাতায় বিপুল সাদৃশ্য দেখতে পেলেন দীনেশচন্দ্র এই মিল বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও সম্পূর্ণ রহস্যের কিনারা করলেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরাগলী মহাভারতের ভণিতা অংশ উদ্ধার করে দেখালেন যে, ‘বিজয় পাণ্ডব কথা’ বাক্যাংশটি লিপিকর প্রমাদে ‘বিজয় পণ্ডিত কথা’-য় পরিণত হয়েছে।

বিজয় পণ্ডিতের অস্তিত্বগত সংকট এত সহজে সমাধান করা গেলেও সঞ্জয়ের ব্যাপারে কিছু ধোঁয়াশা এখনও রয়ে গেছে। এর আবিষ্কর্তা দীনেশচন্দ্র সেনের দাবি ছিল সঞ্জয়ই বাংলা ভাষায় আদি মহাভারত অনুবাদক। কবীন্দ্র পরমেশ্বর নাকি তাঁর রচনাকেই আত্মসাৎ করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সঞ্জয়ের পুথিতে একস্থানে আছে 'সঞ্জয়ে পয়ারে কথা গহিল যেন মত। হেন মতে কেহ নাহি রচয়ে ভারত ॥' এই কথার উপরে ভিত্তি করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সঞ্জয়ের মহাভারত'-এর সম্পাদক মুণীন্দ্রকুমার ঘোষও সঞ্জয়কেই মহাভারতের আদি অনুবাদক বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু সঞ্জয়ের নামে প্রচলিত পুথি আর পরগলী মহাভারতের পাঠ তুলনা করলেই বোঝা যায় কবীন্দ্রের রচনাটিই অল্পস্বল্প পরিবর্তনসহ সঞ্জয়ের নামে চলে গিয়েছে। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় সঞ্জয়ের ভণিতাগুলি বিচার করে বলেন যে, গ্রন্থের উপাদেয়তা ও উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্যে কোন গায়ক বা সংকলক দ্ব্যর্থবোধক 'সঞ্জয়' নাম ব্যবহার করেছিলেন। দু' একটি ভণিতা এইরকম মিলেছে—'সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়' কিংবা 'সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা'। দীনেশচন্দ্র ও মুনীন্দ্র কুমারের মতে, এই ভণিতাই নাকি প্রমাণ করে সঞ্জয় নামে পৃথক কবির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষকরা ঐ ভণিতা থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাচ্ছেন। তাঁরা বলেন, 'সঞ্জয়ের মহাভারত'-এ যে-ভণিতা ব্যবহার করা হয়েছে তা আদৌ সংশয়মুক্ত নয়। মূল লেখক যদি কেউ থেকে থাকেন তিনি মহাভারতের পৌরাণিক 'সঞ্জয়' চরিত্রের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছেন। আবার কারো কারো মতে, পূর্ববঙ্গের ভারত-পাঁচালি রচয়িতাদের কাব্যপ্রবাহে মিলিত হয়ে তথাকথিত সঞ্জয়-মহাভারতের সৃষ্টি করেছে। এই হিসাবে 'সঞ্জয়' একটি যৌথ নাম। অন্যদিকে অনুবাদটিতেসঞ্জয় তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় দাখিল করতে গিয়ে বলেছেন—'ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জনম। সঞ্জয়ের ভারতকথা কহিলেক মর্ম ॥' এবং 'দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার। সঞ্জয় রচনা কৈল পাঁচালী প্রকার ॥' এর থেকে দু' একজন গবেষক মনে করেন যে, এই কবি বিজয় পণ্ডিতের মতো একেবারে কাল্পনিক কোন চরিত্র ছিলেন না। তাছাড়া সঞ্জয়ের নামে যে-মহাভারত পাওয়া গেছে তা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের তুলনায় আকারে বড় এবং ভাষাও তুলনামূলকভাবে আধুনিক। খুব সম্ভবত কোন গায়েন পরাগলী মহাভারতকে সামনে রেখে তার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু অংশ যোজনা করে গানের উদ্দেশ্যে এ মহাভারত রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—"সঞ্জয়" কোন কবির নামও নয়। হরিনারায়ণদেব নামে জনৈক ভরদ্বাজবংশীয় ব্রাহ্মণ মহাভারতের অন্যতম চরিত্র 'সঞ্জয়' -এর নামের আড়ালে নিজেকে গোপন করে এই পাঁচালী গান করতেন।" অতএব সঞ্জয় নামের আড়ালে আলাদা কোন রচনাকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে এর রচনাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'চার কথা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

সঞ্জয়ের মহাভারত আয়তনে বাকি দুটি মহাভারতের তুলনায় বড়। কাব্যটিতে মূল মহাভারতকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণের চেষ্টা আছে। তবে রচনাচাতুর্যে সঞ্জয়ের লেখা উল্লেখযোগ্যতা দাবি করতে পারে না। তবে বিষয়ের অভিনবত্ব দেখা যায় দ্রোণপর্বের পুথির অন্তর্গত 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' শীর্ষক রচনায়। মহাভারত বহির্ভূত এই উপকাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হলে দ্রৌপদী, সত্যভামা, রুক্মিনী, জাম্ববতী, সুভদ্রা, রেবতী প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় অন্তঃপুরিকারা অভিমন্যু হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রণক্ষেত্রে যাত্রা করেছিলেন—এই রকম একটি কল্পিত কাহিনী গৃহীত হয়েছে 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ'-এ। এতে পাণ্ডবপক্ষীয়দের হাতে কৌরবরা যথেষ্ট নাকাল হয়। অবশ্য পালাটির শেষে ভণিতা দেওয়া হয়েছে রামকৃষ্ম দাসের। ইনি লিপিকর না পাঁচালী গায়ক তা এখনও অনির্ণীত ॥

৫.৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় যে বিষয়ে আলোচনা করুন।

২। রামায়ণ অনুবাদক কবি কৃত্তিবাসের প্রদত্ত আত্মপরিচয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। কৃত্তিবাসের কাহিনী গ্রন্থনে মৌলিকতা বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৪। কৃত্তিবাসের রচনায় রামভক্তিবাদের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। কৃত্তিবাসের কাব্যে বাঙালি জীবন কতটা উপস্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে উদাহরণ যোগে আলোচনা করুন।

৬। ভাগবত অনুবাদক মালাধর বসুর ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

৭। অনুবাদে মালাধরের কৃতিত্ব পরিমাপ করুন।

৮। শ্রীকৃষ্ম বিজয়ে বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের ছাপ কতটা ফুটে উঠেছে এ বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৯। প্রথম পর্বের মহাভারত অনুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা সম্ভবন্ধে আলোকপাত করুন।

২। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল বিষয়ে সংক্ষেপে আপনার অভিমত দিন।

৩। বাংলা অনুবাদে কৃত্তিবাস চরিত্র সৃষ্টিতে যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তার পরিচয় দিন।

৪। হাস্যরস ও করুণরস সৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের দক্ষতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। কৃত্তিবাসের ব্যবহৃত অলংকারগুলির বিশিষ্টতা কোথায় তা বুঝিয়ে দিন।

৬। শ্রীচৈতন্যদেব মালাধরের কাব্যের প্রতি কেন আসক্ত ছিলেন তা আলোচনা করুন।

৭। অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর ভাগবতকে কতটা অনুসরণ করেছে তা বিভিন্ন কাহিনী উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

৮। কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত 'পাণ্ডব বিজয়' কে 'পরাগলী মহাভারত' বলার কারণ কি? কাব্যটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৯। শ্রীকর নন্দীর অনুবাদের বিশিষ্টতা কোথায় তা দেখিয়ে দিন।

১০। বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়ের মহাভারত অনুবাদ সম্ভবন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। অনুবাদের মুখ্য কারণটি কি ছিল?

২। বাংলায় অনূদিত ধর্মাশ্রিত কাব্যে দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য কী কী?

৩। ‘কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাস কবি এ বঙ্গের অলংকার’—এটি কার কথা?

৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রথম কোথায় ছাপা হয়?

৫। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান কোথায়?

৬। বাল্মীকি ছাড়া কৃত্তিবাসের অন্য একটি আদর্শের নাম বলুন।

৭। বিভীষণের পুত্রের নাম কী?

৮। ‘হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোনরে ব্যাটা গরু’—উক্তিটি কার?

৯। তুলসীদাস রচিত গ্রন্থটির নাম কি?

১০। ভাগবতে মোট কত স্কন্ধ ও অধ্যায় আছে?

১১। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্য নামগুলি কী কী?

১২। শ্রীচৈতন্যের কাছে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন্ ছত্রটি প্রিয় ছিল?

১৩। ‘পঞ্চম বেদ’ কোনটি?

১৪। কবীন্দ্র পরমেশ্বর কার রাজসভায় আবির্ভূত হন?

১৫। শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কোন্ পর্বটিকে আশ্রয় করেছিলেন?

১৬। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের আবিষ্কর্তা কে?

১৭। সঞ্জয়ের কাব্যের প্রধান সমর্থক কে?

১৮। ‘দ্রৌপদীর যুদ্ধ’ অংশটি কার রচনায় আছে?

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. **সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৯১**

২. **অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৯৫**

৩. **ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৮৮**

৪. **শ্রীমন্তকুমার জানা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৯৪**

৫. **সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, ১৯৮৮**

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৬ □ প্রাক্-চৈতন্যযুগের মঙ্গলকাব্য

গঠন

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ মূল আলোচনা

৬.৩ মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা

৬.৩.১ কানা হরিদত্ত

৬.৩.২ বিজয় গুপ্ত

৬.৩.৩ বিপ্রদাস পিপিলাই

৬.৩.৪ নারায়ণ দেব

৬.৪ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা

৬.৪.১ মানিক দত্ত

৬.৫ অনুশীলনী

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন। 'মঙ্গল' নামের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। দীর্ঘ চারশ' বছর ধরে কত রকমের মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছে সে বিষয়ে হদিস করতে পারবেন। দেবী মনসার উত্থান ঘটলো কীভাবে তা জানা যাবে। চৈতন্যপূর্ব যুগে কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিলিলাই ও নারায়ণ দেব যে মনসামঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন তাঁদের ব্যক্তি পরিচয়সহ কাব্যগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনা করতে পারবেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাব কেমন করে ঘটলো এবং বাংলা মঙ্গলকাব্যে কবে থেকে তিনি বন্দিত হতে লাগলেন এ বিষয়ে জানতে পারবেন। প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বলে অনুমতি একমাত্র চণ্ডীমঙ্গলকার মানিক দত্ত সম্বন্ধে ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে স্তািরিত জানতে পারবেন।

৬.২ মূল আলোচনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠতর ধারা। অনুবাদ কাব্যের মতো এরও প্রধান নির্ভর আখ্যান, তবে এর কোনো সংস্কৃত-মূল কাহিনী উৎস নেই। গ্রাম-বাংলার ব্রতকথাগুলি যেমন লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃন্তমূল থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছিল একদিন, তেমনি অগণিত বাঙালির ঐহিক কামনা-বাসনার রূপায়ণ ঘটেছে মঙ্গলকাব্যগুলির পাতায়। বস্তুত লৌকিক দেবদেবীদের পূজাপ্রাপ্তি ও মাহাত্ম্য প্রচারের গল্পের কোনো জড় খুঁজে পাওয়া যাবেনা কোন প্রতিষ্ঠিত পুরাণে। বরং এগুলির মধ্য দিয়ে সেদিনের বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচর্যার অনেক হদিস খুঁজে পাওয়া যায়। কাহিনী, চত্রি, পটভূমি, মেজাজ—সব কিছুতেই মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ বাংলাদেশকে

এমনভাবে পাওয়া যায় যা আর কোন মধ্যযুগীয় সৃষ্টিতেই মেলে না। এজন্য মঙ্গলকাব্যকে অনেকে প্রাচীন বঙ্গের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ফসল বলেও গণ্য করেন। সমকালীন সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তারে এটি একমাত্র তুলিতে হতে পারে বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণের আপার্থিব প্রেমকথা ভাবালু বাঙালির রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা যেভাবে পূরণ করেছিল, সেভাবে মঙ্গলকাব্যে দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মিলন তার বস্তুমুখী জীবনতৃষ্ণাকে অনেকাংশে মেটাতে সফল হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলির শেষ গন্তব্যস্থল ছিল মরমীয়া অতীন্দ্রিয়বাদে, আর মঙ্গলকাব্য পৌঁছে দিয়েছিল অলৌকিকতা-সংস্পৃক্ত বস্তুবাদে।

প্রসঙ্গত 'মঙ্গল' নামের উৎপত্তি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যেতে পারে। কেউ বলেন, শব্দটি তৈরি হয়েছে সুভাষণরীতি থেকে। ভয়ঙ্কর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ দেবতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে কিংবা তাঁদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে সমাজমন তৈরি করে নিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ 'মঙ্গল'। অন্য কোন পণ্ডিত শব্দটি উৎস খোঁজেন দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে, যা বিবাহ-সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলে মনে করা হয়। কারণ মালয়ালম্ ভাষায় 'মঙ্গল্যম্'-এর অর্থ বিবাহ, তামিল ভাষায় বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ক্ষৌরকর্মের জন্য ব্যবহৃত ক্ষুর, আর তেলুগুতে 'মঙ্গল' বলতে বোঝায় ক্ষৌরকার। এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে, কুর্গ অঞ্চলে নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানকেই 'মঙ্গল' শব্দে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আবার অন্য ভাবনার সমালোচকেরা 'মঙ্গল' শব্দের উৎস খুঁজে পান রাগসঙ্গীতের নামাবলীর মধ্যে। নারদের মতে, ভৈরব রাগের পুত্রবধূ হল 'মঙ্গলকৌশিকী', আর ক্ষেমকর্ণ পাঠকের মতে মঙ্গলরাগ হিন্দোল রাগেরই অন্তর্গত একটি উপরাগ। তবে একথা সত্য যে, মঙ্গলকাব্য সব সময় মঙ্গলরাগে গীত হতো না। 'মঙ্গল' নামের হদি পেতে কেউ কেউ কাব্যটির সময় নির্ভর গীতি-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এক মঙ্গলবার থেকে অন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত এটি গান গাওয়া হতো বলে এর অভিধা নাকি মঙ্গলকাব্য। কিন্তু তথ্য হিসেবে মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ধর্মমঙ্গল পালা বারো দিনে উপস্থাপিত হতো সূর্যের সংখ্যা দ্বাদশ আদিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে। উপরোক্ত সমূহচিন্তায় বোধহয় কাব্যের প্রকৃতিকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই কোন কোন সমালোচক ভিন্ন ভাবনার কথা বলেন। তাঁদের মতে, মর্ত্যভূমিতে নিজ মাহাত্ম্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং ভক্তগণের মঙ্গল বিধানের জন্য যেসব লৌকিক দেবদেবীর অলৌকিক মহিমার কথা একদা ব্রত পাঁচালির আকারে প্রচারিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাদের কাব্যরূপগুলিই 'মঙ্গলকাব্য' নামে সাধারণ্যে পরিচিত হয়। কোন যুগপ্লাবী বিশেষ ঘটনা ও বিপন্ন মানবচৈতন্যের তাগিদ এর সঙ্গে যুক্ত আছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, সমাজে প্রসারিত শৈব প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তির উত্থানই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রেরণা, তবুও সব মঙ্গলকাব্যে এই ছকটিকে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। M. N. Srinivas-এর মতে, আর্যসভ্যতার ক্রমিক বিস্তারের ফলে যে সংস্কৃতায়নের সূচনা ঘটে, মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীদের উচ্চবর্ণভুক্তির চেষ্টা নাকি তারই স্মারক। কিন্তু এর বিপরীত ভাবনাটিও সমানভাবে বিবেচ্য। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের দিক থেকে নিম্নতলস্থ দেবদেবীদের জাতে তোলার চেষ্টা ব্যাপারটি বিচার সাপেক্ষ বিষয়, যেখানে তথাকথিত উচ্চ অভিজাতরাই মঙ্গলকাব্য নিয়ে উক্ত দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারে সাহায্য করেছেন, বিপরীতটা নয়। একথা এখন খুব স্পষ্ট যে, অন্ধতা-অজ্ঞতা-অদৃষ্টবাদ-ভীতিবোধ তথা আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস যখন দৃঢ়ভাবে চেপে বসেছিল বাঙালি জনমানসে, তখন সেই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলকাব্য সমূহের উদ্ভব। যে প্রয়োজন ও আততির সঙ্গে বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলোর যোগ তা একান্তভাবে সেকালের বাস্তব সমস্যা ছিল। তুর্কী আক্রমণের কালে নতুন শক্তির অত্যাচার ও বলাৎকৃতির সামনে বাঙালির জাতীয় জীবন বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দরকার পড়ছিল উদ্ধত ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুর একত্র

সংহতির অথচ সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষরা বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বর্ণাশ্রমী ব্যবস্থার শাসনে-শোষণে কেবল নির্যাতন ভোগ করছিল। তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষের মানসিক যোগাযোগ আদৌ ছিল না। নতুন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় হিন্দুসমাজে বড় ফাটল দেখা দিলে স্বার্থনির্ভর জাতিচেতনায় উদ্বুদ্ধ অভিজাত হিন্দুরা নীলরক্তের উন্নাসিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে এতকালের অবহেলিতদের পাশে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। বর্ণাশ্রমীদের কঠোর অনুশাসন এই পরিপ্রেক্ষিতেই শিথিল হতে শুরু হয়, আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে অপৌরাণিক দেবদেবীদের স্বীকৃতি দিতে থাকেন পৌরাণিক সংস্কৃতির অন্তর্গত বিদগ্ধ জন।

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত লাগাতার মঙ্গলকাব্য অনুশীলিত হওয়ায় এর রচনাভঙ্গিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। যেমন, বন্দনা, গন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে সব মঙ্গলকাব্য বিভক্ত হবে। তাতে থাকবে চৌতিশা, বারমাস্যা, ফলফুলবৃক্ষ বিহঙ্গের তালিকা, ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা, বিবাহের বিশদ বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা ইত্যাদি। দেবতারা স্বর্গলোক থেকে কাউকে শাপভ্রষ্ট করে পাঠাবেন মর্ত্যভুমিতে। অতঃপর নানা প্রতিকুলতা জয় করে উক্ত দেব কিংবা দেবীর পূজা প্রচার করে আবার ফিরে যাবেন স্বর্গলোকে। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, পৌরাণিক দেবদেবীর বর্ণনা, দিগ্বন্দনা, নারীগণের পতিনিন্দা ইত্যাদি বিষয়ও মঙ্গলকাব্যের আবশ্যিক উপাদান বলে গণ্য। রচনার ঐতিহাসিক কালানুক্রম বিচার করলে দেখা যায়, অনার্য-মূল দেবদেবীদের পূজা প্রচারের কাহিনী দিয়ে মঙ্গলকাব্যধারার সূচনা ঘটলেও অচিরে তা বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হয়। অবশ্য সার্বিকভাবে এরা সকলেই 'মঙ্গল' নামযুক্ত হলেও প্রভাব ও প্রাচুর্যের দিক থেকে সমগ্র মঙ্গল সাহিত্যকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় :

ক. প্রাথমিক তথা প্রধানস্তরের মঙ্গলকাব্য—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল।

খ. মধ্যস্তরের জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য—কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গৌরীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল।

গ. গৌণস্তরের মঙ্গলকাব্য—অনাদিমঙ্গল, কমলামঙ্গল, কিরীটিমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, জীমূতমঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যের রূপাঙ্গিক এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, লৌকিক, পৌরাণিক ও বৈদিক দেবতাদের পাশাপাশি বৈষ্ণবদেবতাকে ঘিরেও মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচেষ্টা চলে। এর প্রমাণ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, গোপালমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, ব্রজমঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থে। প্রাক-চৈতন্যযুগে প্রধানস্তরের মঙ্গলকাব্যগুলিই কেবল বিকশিত হয়েছিল। ঐ তিনটি বলিষ্ঠ ধারার মধ্যে আবার মনসা ও চণ্ডীকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ধর্মমঙ্গলের সূচনা বোধহয় শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর ষোড়শ শতকে। অতএব আমাদের নির্ধারিত পর্বে আলোচ্য হয়ে ওঠেন মনসামঙ্গলের কবি কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও নারায়ণ দেব এবং অন্যদিকে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মাণিক দত্ত।

৬.৩ মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা

সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচলনের কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রতিষ্ঠা। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সর্প হিংস্র বিষধর এক প্রাণী। তার এক মোক্ষম ছোবলেই মানুষের প্রাণান্ত। এই আধিভৌতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এককালে বিপন্ন মানুষ সর্গের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর কল্পনা করেছিল, যিনি বঙ্গদেশে কালক্রমে মনসা নামে

পরিচিতা হয়েছে। পণ্ডিতগণের অভিমত, সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতে সর্পপূজা প্রচলিত থাকলেও সর্প-সংস্কৃতির সূচনা ঘটেছিল প্রাচীন মিশরে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। ইউফ্রেটিস তীরবর্তী তুরানী জাতির মানুষি নাকি প্রথম সর্পপূজার প্রচলন করে। তারপর এই জাতির শাখা বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হলে সেইসব অঞ্চলে সর্পপূজা বিস্তৃত হয়। ভারতে আর্যরা আসার পূর্বে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষরাই সাপকে ঘিরে নানারকমের ধারণা ও সংস্কার গড়ে তোলে। পরে এর প্রভাব এসে পৌঁছয় পৌরাণিক হিন্দুশাস্ত্রে। মনসা কোথাও সর্পাভরণা, কোথাও সর্পধিষ্ঠাত্রী দেবী, আবার কোথাও বা নিজেই সর্পরূপিনী। বাংলাদেশে একাদশ শতকের আগে ভাস্কর্য শিল্পে দেবী মনসার চিহ্ন মিলেছে। চৈতন্য ভাগবতে পঞ্চদশ শতকের শেষবাগে বাঙালি সমাজে বিষহরি পূজার কথা উল্লেখিত।

মনসামঙ্গলের কাহিনী বাংলার আদিম লোকসমাজের সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। বৈদিক আর্যদের সঙ্গে সর্পের পরিচয় প্রথমাবধি ছিল না বলে মনে হয়। যজুর্বেদের কাল থেকে তাঁদের মধ্যে সর্পজ্ঞান ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলিক মনসার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। জাঙ্গুলি প্রকৃতপক্ষে বিষবিদ্যা। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে আরো একজন সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম পাওয়া যায়। ইনি হলেন কুরুকুল্লা— সর্প ও সর্পবিষের নিয়ন্ত্রী। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সর্পদেবী 'মন্‌চা অম্মা'। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, এই দেবী পরে 'মনসা মা'-তে পরিণত হয়েছেন। মনসাকে যাঁরা পৌরাণিক দেবীর রূপান্তর বলে মনে করেন ড. সুকুমার সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মনে করেন নানা দেব ভাবনা ও রপকল্পনা বিভিন্ন সময়ে মিলেমিশে গিয়ে মনসার পরিচিত মূর্ত্তি গঠন করেছে। এই উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে বৈদিক ইলা, সরস্বতী শ্রী, বৈদিক বাক্, গৌরী, বৈদিক সর্পরাজ্ঞী বা বসুন্ধরা, পরবৈদিক কমলাসনা, দেবী, পরবৈদিক নাগলাঞ্ছন দেবী এবং লৌকিক বাস্তুদেবতা। মহাভারতের যুগে মনসাকে নিয়ে জরৎকারু ও আস্তিককেন্দ্রিক গল্প রচিত হয়। দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতো অর্বাচিন পুরাণগুলিতে মনসার বিস্তারিত উল্লখ দেখা যাচ্ছে। মনসামঙ্গলের গল্পসূত্রে যেটা মনে হয় সেটা হল, মনসার পূজা প্রথমে অভিজাত হিন্দু সমাজ মেনে নেয়নি। জেলেও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে তিনি পূজা পেতেন। মহিলাদের দ্বারা বন্দিত হওয়ার কারণে তাঁকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দেবী বলে ধারণা করতে হয়। অবশেষে এই দেবী বৃহত্তর হিন্দু সমাজে পূজা হয়ে উঠলেন চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায়। অতএব সিদ্ধান্ত করতে হয়, সর্পধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনা পৃথিবীর আদিমতম ধর্মসংস্কারগুলির অন্যতম। ইনি একই সঙ্গে পশু-পূজা, বৃক্ষপূজা, নদী উপাসনা এবং মাতৃকা আরাধনার ধারাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছেন। শিব-কন্যা হিসেবে ইনি গৃহীতা হলে অনার্যদেবীর আর্যীকরণ ঘটে এবং তখনই শিবের কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে সমীকৃতা হন। তাঁর জন্ম সংক্রান্ত দুটি কাহিনীই প্রাগার্য উৎসের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে। বর্তমানে মনসাপূজার মন্ত্র পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দান হলেও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় উপাচারের উপস্থিতি সেই প্রাগার্য ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মনসামঙ্গল গান এই মনসপূজারই অঙ্গ। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা সময়ে আবির্ভূত কবিরা একই কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করলেও সকলে সমান প্রতিভা সম্পন্ন কবি ছিলেন না। তাঁদের লেখায় আখ্যান, চরিত্র, বক্তব্যে, উপস্থাপনায় বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সকলের শিল্পচেতনা অভিন্ন না হওয়ায় স্বাদবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কবিদের আলোচনায় মুখ্যত সেইসব পার্থক্যগুলি অন্বেষণের চেষ্টা করবো।

৬.৩.১ কানা হরিদত্ত

পারিপার্শ্বিক বাহ্য প্রমাণসূত্রে যতদূর অনুমান করা যায় তাতে মনে হয় মনসামঙ্গলের কাহিনী প্রথম কাব্যরূপ লাভ করে কানা হরিদত্তের হাতে। পূর্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে কাব্য লিখতে গিয়ে উল্লেখ

করেছিলেন কানা হরিদত্তের নাম। বেশ কড়া সমালোচনার সুরে বলেছিলেন—

'মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥'

কবির কাব্য সম্ভবন্ধে একথা বলার মতো জোরালো কিছু আমাদের হাতে নেই। তাঁর কাব্য আমাদের কালে এসে পৌঁছয়নি, এমনকি বিজয় গুপ্তের সাক্ষ্য যদি সঠিক হয় তাহলে পনের শতকের শেষভাগে তা লুপ্ত ছিল। অতএব যে-কাব্য সমালোচক নিজে দেখেননি, তার বিরুদ্ধে এ ধরনের কটুকাটব্য কতটা যুক্তি সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে পড়ে। পক্ষান্তরে এটা হতে পারে যে, বিজয় গুপ্ত নিজের কাব্যকে গৌরান্বিত করে তোলার জন্য এ হেন ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় মেতে ছিলেন। যাইহোক, বিজয় গুপ্তের কাছ থেকে একটা খাঁটি খবর পাওয়া গেছে যে, কানা হরিদত্তই মনসার প্রথম গীত রচয়িতা। নারায়ণ দেবের একটি পুথিতেও হরিদত্তকে এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হরিদত্ত সম্ভবন্ধে আর একটু তথ্য মেলে পুরুষোত্তম নামক গায়েনের উল্লেখ থেকে, যিনি হরিদত্ত রচিত লাচাড়ির ছন্দ গান করতেন। গায়েনের ভণিতাটি এইরকম—'কানা হরিদত্ত/হরির কিঙ্কর/মনসা হইক সহায়। তার অনুরুদ্ধ/লাচাড়ীর ছন্দ/লাচাড়ীর ছন্দ/শ্রীপুরুষোত্তম গায়।'

হরিদত্ত সম্বন্ধে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। ময়মনসিংহের দিগ্‌পাইৎ গ্রাম থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় একটি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ পুথিতে কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামধেয় একটি শিকলি পাওয়া গিয়েছে। সেইসূত্রে গবেষক মহলে ধারণা যে, কবি ময়মনসিংহের মানুষ ছিলেন। এ কবির কাল নির্ধরণেরও চেষ্টা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন''র সেনের মতে ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং সম্ভবত তুর্কী আক্রমণের আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এমত নানা কারণে মেনে নেওয়া যায় না। নানার প্রধানতম বাধা এর ভাষা। দক্ষিণারঞ্জনবাবু প্রাপ্ত পুথিটির যে-অংশ নকল করে দীনেশচন্দ্রকে পাঠান তার মুদ্রিত রূপ দেখে পণ্ডিত মহলেই সংশয় জেগে ওঠে। কারণ সে ভাষায় আধুনিকতার ছাপ যথেষ্ট। আবার বিজয়গুপ্তও যে-ধরনের সমালোচনা করেন তা আদৌ সমর্থিত হয় না ঐ রচনায়। মুদ্রিত কাব্যাংশের কিয়দংশ এইরকম—

'দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী॥
সুতলিয়া নাগ কৈল গলার সুতলি।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥'

বিজয় গুপ্তর কাব্যরচনাকালে (১৪৮৪ খ্রিঃ) যদি হরিদত্তের গীত সত্যসত্যই লুপ্ত হবার মুখে পড়ে তাহলে চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে এই কবি আবির্ভূত হতে পারেন বলে অনুমান করা যায়। আর এই সময়েই ব্রতকথার

সংকীর্ণ ভূমি ছেড়ে কাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাহিনীগুলি যে রূপ পাচ্ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ মিলেছে চৌতিশাস্তবের সংযুক্তিতে। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে স্মরণীয় যে, চৌতিশার সংস্কৃত অবয়বটি প্রথম উপস্থাপিত হয় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংকলিত বলে অনুমিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে।

৬.৩.২ বিজয় গুপ্ত

পূর্ববঙ্গে পদ্মাপুরাণের বিশিষ্ট জনপ্রিয় কবি হলেন বিজয় গুপ্ত। তাঁর কাব্য একদা বরিশাল অঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন গায়েনের মুখে মুখে বিজয় গুপ্তের রচনা এতটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে কবির নিজের লেখা রূপটি তাঁর থেকে উদ্ধার করা শক্ত। তাঁর লেখায় আধুনিক শব্দ, নতুন পালা, আকর্ষণীয় বর্ণনা যে পরে সংযুক্ত হয়েছে এবং সেটা কাব্যটির বিপুল জনপ্রিয়তার জন্যই সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। বিজয় গুপ্তের পুথি প্রথম সম্পাদনা করেন বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্যারীমোহন দাশগুপ্ত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে। সেই গ্রন্থ থেকে কবি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। গ্রন্থসূচনায় কবি আত্মপরিচয় বিবৃত করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, মুলুক ফতেহাবাদের অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটির পশ্চিমে ঘাসর ও পূর্বে ঘণ্টেশ্বর নদী। কবির জন্ম শিক্ষিত বৈদ্যবংশে। ফুল্লশ্রী পরে গৈলা-ফুল্লশ্রী নামে পরিচিত হয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যের নাম ‘পদ্মাপুরাণ’। এর রচনাকাল নিয়ে বিতণ্ডা আছে। একাধিক পুথিতে তিনটি সময় হেঁয়ালির ভাষায় উল্লেখিত। এগুলি যথাক্রমে ‘ঋতু শশী বেদ শশী’, ‘ছায়াশূন্য বেদশশী’ ও ‘ঋতু শূন্য বেদ শশী’, যাদের থেকে ১৪৯৫, ১৪৭৮ ও ১৪৮৪ খিস্টাব্দ পাওয়া যায়। কবি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুলতান হুসেন শাহার নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু কে এই হুসেন শাহ? ইনি যদি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হয়ে থাকেন তাহলে ১৪৯৩ সালে সিংহাসনরোহন করেন এবং মাত্র এক বছরের মধ্যেই তাঁর রাজ্যশাসনের খ্যাতি সুদুর বরিশালে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। বরং মুলুক ফতেহাবাদের সূত্রে কেউ কেউ এক্ষেত্রে জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের সময়কে নির্দেশ করতে চান। ইনি প্রজাসাধারণের কাছে হোসেন শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। রাজত্ব করেছেন ১৪৮১-১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর নামেই মুলুক ফতেহাবাদ চিহ্নিত হয় ও এখানকার টাঁকশাল থেকে তাঁর কতকগুলি মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়। ‘ঋতু শূন্য বেদ শশী’ পাঠ যে পুথিতে মিলেছে সেটি কবির নিজের গ্রাম গৈলা ফুল্লশ্রীতে প্রাপ্ত। এই গ্রামে বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মনসার মন্দির ও মন্দিরে পিতলের মনসামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কবির দেওয়া তথ্যানুযায়ী তাঁর পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম রুক্মিনী।

বিজয় গুপ্তের কাব্য বেস আয়তনবিশিষ্ট। তিনি সমস্ত কাহিনীকে মোট আঠাশটি পালায় বিভক্ত করেছেন। বিজয় গুপ্তের রচনাসূত্রে আমরা পুরা মনসামঙ্গল কাহনী সম্পর্কে সার্বিক ধারণা করতে পারি। তাঁর বর্ণিত কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম—নারদের কৌশলে চণ্ডী রচিত নন্দন কাননে শিব একদা প্রবেশ করলে পুষ্প সৌরভে আমোদিত হয়ে মনে মদন পীড়া অনুভব করলেন। তাঁর বীর্য স্খলিত হলো। তিনি তা নিক্ষেপ করলেন পদ্মবনে। পদ্মের মৃণাল বেয়ে সেই বীর্য পাতালে নামলো। সেখানে জন্ম হল মনসাকুমারীর। তিনি অযোনীসম্ভূতা শিবকন্যা। একদা শিব তাকে লুকিয়ে গৃহে আনলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন চণ্ডী। শিবের অনুপস্থিতিতে চণ্ডী প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে মনসার এক চোক কানা করে দিলেন। মনসাও তাঁকে দংশন করে অচৈতন্য করে ফেললেন। অবশেষে শিবের অনুরোধে মনসা বিষ শোধন করলে চণ্ডীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হল। মনসার বয়সকালে শিব কন্যাকে পাত্রস্থ করলেন জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে। মুনিও বিবাহের পরেই ক্রোধী মনসাকে পরিত্যাগ করে যান। মুনির আর্শীবাদে মনসার আস্তিকসহ অষ্টনাগ সন্তান জন্মালো। চণ্ডীর পরামর্শে শিব মনসাকে রেখে এলেন সান্তালি পর্বতে। নেতা তার রক্ষয়িত্রী। এই নেতারই পরামর্শে মনসা প্রথমে রাখালদেরকে বিপদে ফেলে পূজো আদায় করেন। পরে

মনসাপূজক রাখলদের সঙ্গে হাসান-হোসেনের বিবাদ বাধলে দেবী হাসানের পুরীর সবাইকে হত্যা করেন। সেখানেও তাঁর পূজা মেলে। অতঃপর জালু-মালুকে অনুগ্রহ করলেন। তাদের সমৃদ্ধি ঘটলো। এবার চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হলেন তিনি। শৈব চাঁদ মনসাকে পূজা দিতে সম্মত হল না। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চাঁদের গুয়াবাড়ি ধ্বংস করলেন। বন্ধু শঙ্কর গারড়ির সাহায্যে গুয়াবন বাঁচালে মনসা কৌশলে শঙ্করকে হত্যা করলেন। নটী বেশ ধারণ করে চাঁদের মহাজ্ঞানও হরণ করে নিলে। চাঁদ চললেন বাণিজ্যে। কিন্তু সেখানেও মনসার চক্রান্তে সপ্ত ডিঙা মধুকর সমুদ্র ডুবে গেল, কোনক্রমে প্রাণে বাঁচালেন চাঁদ। যথেষ্ট নাকানি-চোবানি খেয়ে ঘরে ফিরে সংবাদ পেলেন সপ্তম পুত্র লখীন্দর জন্মগ্রহণ করেছে। কিছুকাল পরে তার বিবাহ দিলেন সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে। মনসা অনুচরী কালনাগিনীকে প্রেরণ করে বাসর ঘরে দংশন করিয়ে লখীন্দরকেও হত্যা করলেন। মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে বেহুলা গাঙুড়ের জলে ভেসে চললো নানা প্রলোভন জয় করে। পরে নেতার সাহায্যে গিয়ে পৌঁছল স্বর্গলোকে। সেখানে নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করে মনসার দ্বারা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে নিতে সমর্থ হল। শর্ত একটাই দাম্ভিক শৈব চাঁদকে মনসার পূজা দিতে হবে। স্বর্গলোক থেকে ফিরে বেহুলা সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে শ্বশুর চাঁদকে পূজা দিতে অনুরোধ জানালো। আপ্লুত চাঁদ বাম হাতে মনসার পূজা দিতে সম্মত হলেন। পূজার ফলে চাঁদের হৃত সম্পদ, মৃত সন্তানেরা প্রাণ ফিরে পেল। সেই থেকে মর্ত্যে মনসার পূজা ও মহিমা প্রতিষ্ঠিত হলো।

বিজয় গুপ্তের কাব্যবোধ যে যথেষ্ট ছিল তা তাঁর রচনাটি পড়লে বোঝা যায়। তবে তিনি গবীর ভাবানুভূতির তুলনায় বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন। এর ফলে রচনা কিয়ৎ পরিমাণে নীরস হয়ে গেছে। তিনি আখ্যানটিকে একটি সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। সূত্রটি হল দেবী মনসার মহিমা কীর্তন এবং পূজাপ্রাপ্তি। রাখালিয়া, জেলে-মালো, মুসলমান প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নীচুবর্গের জনসম্প্রদায় পেরিয়ে উচ্চবিত্ত অভিজাত সমাজে কীভাবে মনসা স্বীকৃতি লাভ করলো তারই গল্প এখানে বিবৃত হয়েছে। গল্পে অলৌকিকতা যথেষ্ট থাকলেও কবি কাহিনীতে সমকালীন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দেবী মনসা যেভাবে সমগ্র কাহিনীতে চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছেন তার সঙ্গে চৈতন্যপূর্ব পাঠান আমালের রাজকীয় ষড়যন্ত্রময় পরিস্থিতির তুলনা চলে। মুসলমান কাজিরা হিন্দু প্রজার উপর যে-ধরনের অত্যাচার করতো তার আভাস যে মেলে হাসান-হোসেনের পালায়। এছাড়া টুকরো টুকরো আখ্যানে খুঁজে পাওয়া যাবে ধনীর বিলাসিতা, জমিদারী সংঘর্ষ, বাল্যবিবাহ প্রথা, গুপ্তহত্যা, সমকালীন বিবাহ রীতি ইত্যাদির প্রসঙ্গ। বিজয় গুপ্তের সবচেয়ে কৃতিত্ব বোধহয় এইটাই যে তিনি ধর্মমূলক আখ্যান বিবৃতিতে সমাজসচেতন প্রখর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করেননি। দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের গল্প উপস্থাপনায় সেযুগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার, রন্ধন প্রণালী ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেছেন। কাব্যে বাস্তবধর্মিতার এতটা প্রভাব থাকায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ পাঠককে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেশি মাত্রায় যুক্ত করে ফেলে। হয়তো, তাঁর রচনা জনপ্রিয় হয়ে ওঠবার এটা একটা লুকোনো রহস্য।

চরিত্রসৃষ্টিতে বিজয় গুপ্তের পৈুনণ্য যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। দেব ও মানব দুই শ্রেণীর চরিত্র রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এক নিরিখে বিচার করলে বলতে হয়, বিজয় গুপ্ত প্রকৃতপক্ষে মা্নবজীনরেই কবি। তিনি স্বর্গের দেবতাকেও দোষেগুণে মানুষের মতো প্রবৃত্তিতাড়িত রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছেন। উদাহরণ—মনসা, শিব, চণ্ডী। মনসা তাঁর কাব্যে গোত্রপরিচয়ে দেবী বটে, কিন্তু স্বভাব-পরিচয়ে রাক্ষসী, দানবী। তাঁর মতো ক্রুর প্রতিহিংসাময়ী খল ষড়যন্ত্রকারিণী কোন দেবীকেই ভারতীয় পুরাণে পাওয়া যায় না। মঙ্গল কাহিনীতেও দেখা যায় তিনি ছলে-বলে কৌশলে পূজা আদায় করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন নীতিবোধ, বিবেকের দংশন তাঁর

পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি। কবি দেখিয়েছেন যে দেবীর বিড়ম্বিত জীবনের নানা ঘটনার মধ্যেই ছিল এই ক্রুর প্রতিহিংসার বীজ। যিনি আকস্মিক বীর্যপতনের ফল, যাঁর শৈশবে মাতৃস্নেহ কপালে জোটে না, বিমাতা একচক্ষু কানা করে দেন রোষে, দেবকন্যা হয়েও বিবাহ হয় মুনি তনয়ের সঙ্গে, যাঁর ভাগ্যে স্বামীসুখ সয় না, দেবসমাজে ঠাঁই না পেয়ে বাস করতে হয় নির্জন পর্বতে—তাঁরগ মনে ক্ষোভ, রোষ, দুঃখ, অভিমান, বেদনা জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। এর থেকে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা এবং সে সংগ্রামে তাঁর কোনো বৈধ রণনীতি নেই। অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি এইভাবে চরিত্রটির বাস্তব প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় মনসা হয়ে উঠেছেন বিজয় গুপ্তের কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিন্দু। শিবও সমানবাবে কবির কাব্যে দেবত্ব পরিহার করে রক্তমাংসের মানুষে পরিণত। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য রঙ্গপটুত্ব, স্ত্রৈণতা তাঁকে সাধারণ মানুষের স্তরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চণ্ডী পৌরাণিক মহিমা থেকে স্খলিত হয়ে বাঙালি পরিবারের স্বার্থকুটিল গৃহবধূতে পরিণত। কবির চাঁদ চরিত্রে বীর্যবত্তার অভাব নেই, কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। সনকার পুত্রহারানোর হাহাকার যথেষ্ট আবেদনময়। এদের তুলনায় আরো ভালো ফুটেছে বেহুলা। সতী নারীর আদর্শে কবি তাকে এঁকেছেন। অবিচলিত চিত্তে সমস্ত আঘাত বরণ করায় তার প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিজয় গুপ্তের পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর কাব্যে তাই বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও আলংকারিক কলাকৌশলের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। তাঁর কয়েকটি বিদগ্ধ বাচনভঙ্গী আজও বাংলার জনজীবনে প্রবচনের মর্যাদালাভে সমর্থ হয়েছে—'যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে খসে' কিংবা 'অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর। অতি বড় গাঙ্ হইলে ঝাটে পড়ে চর ॥' রসসৃষ্টিতেও বিজয় গুপ্ত স্বাদবৈচিত্র্যের পরিচয় রেখেছেন। মনসামঙ্গলের মূল আখ্যানটি করুণ রসে অভিসিক্ত। কবির বর্ণনায় তার উচ্ছলন লক্ষ করা যায়। কিন্তু তার পাশাপাশি হাস্যরসের একটি স্মিত প্রবাহ সমগ্র কাব্যশরীরে বয়ে চলেছে। চণ্ডী ও শিবের কপট প্রণয়, ডোম নারীকে দেখে শিবের কামাসক্তি, পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিবদুর্গার রহস্যালাপ, গণকের ছদ্মবেশে নারদের ভূমিকা, ভাসান পালায় মর্মস্পর্শী কারুণ্যের মধ্যেও গোদার আকৃতি, উক্তি ও আচরণ যথেষ্ট হাস্যরসের আমদানি করে। কবি রঙ্গরস পরিবেশন করতে গিয়ে কোথাও কোথাও শোভনতার বেড়াও টপকে গিয়েছেন। আদিরসের প্রতি বিজয় গুপ্তের আকর্ষণ ছিল এবং সেটা বোধহয় যুগরুচির দাসত্বের কারণেই। কেউ কেউ তাঁর কাহিনী বিন্যাসে দেখেছেন সামঞ্জস্যের অভাব। এর কারণ বোধহয় জীবনের বহির্ভাগের খণ্ড খণ্ড কাহিনীর উপর তাঁর অধিক নির্ভরতা। এ বি,য়ে ড. ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন, 'বিজয় গুপ্তের আগাগোড়া কাব্যে সামগ্রিকতাবোধজনিত ভাবসাম্যের অভাব রয়েছে বলে মনে করি। আসলে বিজয়গুপ্ত ছিলেন যুগসন্ধির কবি। বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধরনের উপাদানকে একই চরিত্রের মধ্যে সংহতি দান করা বা বিভিন্ন চরিত্রকে ভাবৈক্যে নিবিষ্ট সামগ্রিকতা দান করবার মতো সংসক্ত জীবনাবাণীর সঞ্চয় কবির ছিল না। তাই ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের প্রতি, সংহত অখণ্ডতার চেয়ে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংপূর্ণতা সৃষ্টির প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল সর্বাধিক। এই জন্যেই দেখি, বিজয় গুপ্তের কাব্যের বিভিন্ন পালা বিভাগের যেন আর অন্ত নেই—আর প্রতিটি পালাই এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী।' তবে ছন্দের ক্ষেত্রে বিজয় গুপ্তের কাব্য প্রশংসার দাবি রাখে। দলবৃত্তের চারমাত্রায় চাল বজায় রেখে পয়ারেরই দ্রুত লয়ের কিছু পংক্তি রচনা করে কবি ছন্দোবৈচিত্র্যের আভাস দিয়েছিলেন। যেমন—'প্রেতের সনে/শ্মশানে থাকে/মাথায় ধরে/নারী। সবাই বলে/পাগল পাগল/কত সৈতে/পারি ॥' দেশী শব্দের প্রয়োগেও কবির কুশলতা প্রশ্নাতীত। মনে রাখতে হবে, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ সমগ্র মঙ্গলসাহিত্যের ধারার মধ্যে প্রথম সনতারিখযুক্ত রচনা। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, তিনি মঙ্গল কাব্যের যে চাহারা ও চরিত্র বেঁধে দিয়েছিলেন অল্পবিস্তর রূপান্তরসহ সেটাই দীর্ঘ চারশো বছর ধরে অনুসৃত হয়ে এসেছে। কবির এই কৃতিকে খাটো করবার মতো অন্য কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ সংশয়বাদীদের হাতে এখনও এসে পৌঁছয়নি।

৬.৩.৩ বিপ্রদাস পিপিলাই

পূর্ববঙ্গে পদ্মাপুরাণের বিশিষ্ট কবি হিসেবে যেমন বিজয় গুপ্ত উল্লেখিত হন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা হিসেবে বিবেচিত হন বিপ্রদাস পিপিলাই। ড. সুকুমার সেনের মতে, বিপ্রদাসই মনসামঙ্গলের সবচেয়ে পুরনো কবি। কিন্তু তাঁর দাবি অনেকেই মানতে চাননি, কারণ কাব্যের মধ্যে স্থাননামে ও ভাষায় যে আধুনিকতা প্রত্যক্ষ করা যায় তা প্রাচীনত্বের পরিপন্থী। যাইহোক, ড. সেন এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে বিপ্রদাসের কাব্যটি সম্পদনা করে বের করেছিলেন। বিপ্রদাস তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছেন 'মনসাবিজয়'। কাব্যের মধ্যে গ্রন্থ রচনার সময়কালও নির্দেশিত হয়েছে। কবি লিখছেন—'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ। নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের সুলতান ॥ হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত। শুনিয়া বিবিধ লোক পরম পীরিত ॥' এই হেঁয়ালীধর্মী নির্দেশ থেকে ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়, যে-সময়ে বাংলার মসনদে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ অধিষ্ঠিত। কবির কাব্যের যে-তিনটি পুথি পাওয়া গিয়েছে তার প্রত্যেকটিতে এই একই সন তারিখ পাওয়ায় এটা তর্কাতীতভাবে ধরে নিতে হচ্ছে যে কবি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগেই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেবল কাব্যরচনার কাল নয়, কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে কবি সামবেদীয় পিল্পলাদ শাখার বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। বাস করতেন নাদুড়্যা বটগ্রামে। এটি বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত। কাব্যে ব্যবহৃত কিছু অঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ থেকেও ঐ স্থান কবির জন্মস্থান রূপে সনাক্ত করা যায়।

বিপ্রদাসের কাব্যের কাহিনী বিজয় গুপ্তের তুলনায় বেশ স্বতন্ত্র, বিশেষ করে এর সূচনাংশ। প্রথমেই রয়েছে শিব-গঙ্গার বিবাহ প্রসঙ্গ। দৈত্যবধে আনন্দিত দেবতারা দৈত্যসূয় যজ্ঞে রন্ধনের জন্য শান্তনু ঋষির পত্নী গঙ্গার ডাক পড়ে। শর্থ থাকে যে, যজ্ঞশালায় গঙ্গা রাত্রিবাস করতে পারবে না। শিব সেই শর্তেই নিয়ে এলেন গঙ্গাকে। কিন্তু কাজকর্মের চাপে শর্ত রক্ষা করা সম্ভব হয় না। শান্তনুও স্ত্রী গঙ্গাকে আর ফেরত নিতে চাইলেন না। তখন অগত্যা শিবই বিয়ে করলেন গঙ্গাকে। শিবের পিতা ধর্ম। সেই ধর্মের দেখা পাওয়ার জন্য শিব বল্লুকা নদীর তীরে বারো বছর ধরে তপস্যা করে তবে পিতার দেখা পান। ধর্ম আদেশ দেন শিব যেন পদ্মফুল তুলতে কালীদহে যান। চণ্ডী শিবের সঙ্গে কালীদহে যেতে চাইলে শিব নানা কৌশলে তাঁকে নিরস্ত করেন। একদিন ফুল তোলবার সময়ে মদনপীড়া অনুভব করায় শিবের বীর্যপাত হলো। একটি কাক তা উদরস্থ করতে গিয়ে অপারগ হয়ে উগরে দিল। সেটি জলে পড়ে পাতাল ভেদ করে পৌঁছল বাসুকী নাগের জননী নির্মাণির মাথায়। তিনি ঐ ক্ষীরের মতো দ্রব্য দিয়ে একটি পুতুল গড়ে তার জীবন্যাস করে বাসুকীর কাছে দিলে মনসা নাগেদের বিষভাণ্ডারের অধিকারিণী হয়ে উঠলেন। এরপর বাসুকী তাকে রেখে এলন কালীদহে। এখানেই পিতা শিবের সঙ্গে দেখা হল মনসার। শিবকে দেখে মনসা জেদ ধরলেন পিত্রালয়ে যাবার। কিন্তু শিব চণ্ডীর ভয়ে প্রথমে রাজি হলেন না, পরে ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে আনলেন বাড়ীতে। ফল যা ঘটবার তাই ঘটলো। চণ্ডীর সঙ্গে মনসার বিবাদ শুরু হলো। এরূপ কবি মূল কাহিনীটিতে তাঁর কল্পিত শাখা কাহিনীটি জুড়ে দিয়েছেন। মূল গল্পের মধ্যে মধ্যে আরেও কিছু নতুন প্রসঙ্গ আছে। তবে সেগুলি এতটা অভিনব নয়। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে পুরো ঘটনাধারা বিবৃত করে মন্তব্য করেছেন, 'মনসার কাহিনী সম্পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিপ্রদাসের কাব্যেই মিলে। অন্য মনসা-মঙ্গল কাব্যে হয় কোন কোন আখ্যান মোটেই নাই, নয় কোন কোন আখ্যান অপেক্ষাকৃত অল্পতর অথবা বৃহত্তর আয়তন লইয়াছে। বিপ্রদাস ছাড়া সব কবি—যাঁহাদের রচনা পুরা মিলিয়াছে—বেহুলা-লখিন্দরের আখ্যানেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন। তাই তাঁহাদের রচনায় পূর্ণ আখ্যানগুলি অনাদৃত এবং সেগুলির যোগসূত্র অতীব

ক্ষীণ।' অর্থাৎ গল্পে সঙ্গতিবিধানের দিক থেকে বিপ্রদাস অন্য কবিদের তুলনায় এগিয়ে। বর্ণনায় কবি উৎকট আতিশয্যকে বর্জন করেছেন, ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। হাসান-হোসেন পালাটি বিজয় গুপ্তের তুলনায় বেশী দীর্ঘ এবং সুপরিকল্পিত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর আগে মুসলমান সমাজের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কেবল এ কাব্যেই লভ্য। এ কবি পণ্ডিত হলেও কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে গিয়ে কাব্যকে অযথা গুরুভারবিশিষ্ট করে তোলেননি।

চরিত্রসৃষ্টিতেও বিপ্রদাস কিঞ্চিৎ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। দেবতাকে নিয়ে মানুষ গড়ার চেষ্টা করেননি। তারা আগাগোড়া স্বাভাবিক সুসঙ্গত। মনসার চরিত্রে কঠোরতা নির্মমতা থাকলেও স্থানবিশেষে করুণা ও স্নেহমমতার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। তবে কবি সমালোচিত হবেন চাঁদ চরিত্রের জন্য। চাঁদের পৌরুষ সেভাবে দীপ্তিমান নয়। বরং কাহিনীর শেষে চাঁদকে অনতপ্ত করে যেভাবে মাতা নত করিয়ে দেন তাতে চাঁদ চরিত্রে সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়। এমকি চাঁদ মনসার কাছে শাস্তিপ্রার্থনা করে বলেছে, 'মস্তক উপরে করো চরণ প্রহার। দোষ নিন্দা এবে শাস্তি হউক আমার।।' বিপ্রদাসের মনসা ছলনা করে বেহুলাকে বাসরঘরে বিধবা হওয়ার অভিশাপ দেয়। বেহুলা ও সনকা চরিত্র অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্য সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে করুণ ও হাস্য দু'প্রকার রসে কবির অনায়াস দক্ষতা দেখা গেছে। লখীন্দরের মৃত্যু হলে মনসার শোক কবির কলমে এইরকম—'চিয় রে প্রাণের পুত্র দেও সম্ভোধন। পড়িল ধরণীতলে হরিয়া চেতন।। উঠ উঠ লখিন্দর সোনার পুতলি। পূর্ণিমার চন্দ্র পুনি কারে দিনু ডালি।।'

বিপ্রদাসের কাব্যটির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ উঠেছে এর আধুনিকতাকে ঘিরে। ড. সেনের প্রাচীনত্বের দাবি সেইসব কারণে নস্যাৎ হয়ে যায়। কবি চাঁদের বাণিজ্যত্রার প্রসঙ্গে যেসব স্থান নামের উল্লেখ করেচেন তার মধ্যে বেশ কিছু ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সৃষ্টি। যেমন—নিমাইতীর্থ শ্রীপাট খড়দহ। বাকি কয়েকটি স্থাননামও সংশয়ের বাইরে নয়। যেমন—ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, ইছাপুর, রিষড়া, কোন্নগর, এড়েদহ, চিৎপুর, কলকাতা। কাব্যের ভাষাতেও কেউ কেউ দেখেছেন আধুনিকতার ছাপ। যৎকিঞ্চিৎ উদাহরণ—'তপত কাঞ্চন জিনি দেহের বরণ। পট্টবস্ত্র পরিধান সূর্যের কিরণ।। চরণে নূপুরধ্বনি বাজে রুণুঝুণু। নানা রত্নে মণিময় দীপ্ত করে তনু।।' এগুলি কি প্রক্ষিপ্ত বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত হবে? সমস্ত দিক বিবেচনা করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বিপ্রদাসের মনসাবিজয়কে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলে গণ্য করেছেন।

৬.৩.৪ নারায়ণ দেব

নারায়ণ দেবের কাব্য কোন্ সময়ে লেখা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলেও অধিকাংশ সাহিত্য-ঐতিহাসিক তাঁকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের কবি বলে নির্দেশ করেছেন। এই কবির কাব্যের অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ পুথিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। কবির বিবরণের নিষ্কর্ষ এই—একদা কবির পিতামহ উদ্ধারণদেব রাঢ় দেশ ত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির পিতার নাম নরসিংহ, মাতা রুক্মিনী। তাঁর মাতামহ প্রভাকর। কবিরা জাতিতে কায়স্থ এবং গোত্রে মৌদ্‌গল্য। পূর্ব্ববঙ্গের কবি হিসাবে তিনি পদ্মাপুরাণই লিখেছেন। এঁর লেখা গ্রন্থ শ্রীহট্টেও বেশ প্রচলিত। এজন্য শ্রীহট্টের অধিবাসীরা বলে থাকেন যে কবির জন্মস্থান শ্রীহট্টেই। আসলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে বোরগ্রাম একদা শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বাংলাদেসের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে একমাত্র যে-কবির কাব্য অন্য রাজ্যে অন্য ভাষাভাষীর মধ্যে বিপুল প্রচার লাভ করেছে তিনি হলেন এই নারায়ণ দেব। এঁরকাব্য আসামে অসমীয়াদের মধ্যে সুপ্রচলিত। অবশ্য তার ভাষা অসমীয়া। দুটি রচনা পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায় একটি আর একটির ভাষান্তরিত রূপমাত্র। আসামে বহু প্রচলনের কারণে সেখানকার সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা নারায়ণ দেবকে তাঁদের কবি বলে দাবি করেছেন।

সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে নারায়ণ দেবের যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল সেটা তাঁর কাব্য পাঠ করলে বোঝা যায়। তাঁর পদ্মাপুরাণে লৌকিক উপাদানের চাইতে পৌরাণিক উপকরণ বেশি মেলে। কবি কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ , মহাভারত, কুমারসম্ভভব প্রভৃতির দ্বারা কল্পনার ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কোথাও কোথাও কালদাসের বর্ণনাভঙ্গিও অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছে। তবে, বলাবাহুল্য, সবক্ষেত্রে সফলকাম হতে পারেননি। লৌকিক পৌরাণিক সংস্কৃতির সমন্বয় চেষ্টা, যা কিনা তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল, নারায়ণ দেবের রচনার সেটা সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। কবির কাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাবও কম নয়, যার নিদর্শন ধুয়াতে বৈষ্ণবপদের ব্যবহার।

নারায়ণ দেবের কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটিতে কোন আখ্যান নেই, কেবল আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা। দ্বিতীয় খণ্ডে আখ্যান থাকলেও চাঁদবণিকের গল্প সেখানে নেই, রয়েছে বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যান। আখ্যানগুলি তিনি বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আর তৃতীয় খণ্ডে জায়গা পেয়েছে চাঁদ মনসা-বেহুলা-লখিন্দরের পরিচিত গল্পটি। কবির কাব্য অন্যান্য মনসামঙ্গলকাব্যের তুলনায় বড় হলেও দেবলীলার তুলনায় নরলীলা সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অত্যধিক পুরাণনির্ভরতার খেসারত দিতে হয়েছে চরিত্র রচনাতেও। কবি মানবচরিত্রগুলির প্রতি যত্নশীল হতে পারেননি। তবে তাঁর চাঁদ ও বেহুলা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে। মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিরা চাঁদ চরিত্রে অনমনীয় পৌরুষ ও দেবীর কাছে আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। এদিক থেকে নারায়ণ দেব খুবই সতর্ক ও সম্পন্ন শিল্পচেতনার পরিচয় রেখেছেন। চাঁদ মনসাকে পূজা দেয় বটে তবে দেবীর কাছে কবুল করে—'পিচ দিয়া বাম হাতে তোমারে পূজিব।' সাড়ম্বরে পূজার পরিবর্তে বাম হাতে পিছন ফিরে ফুলজল দেওয়া চাঁদের দৃঢ় মনোভাবের সঙ্গে পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে চাঁদের মুখে কোন অনুতাপ বাক্য বসাননি কবি। বেহুলার ক্ষেত্রে কবি দেখিয়েছেন যে, সে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার পর জননী সুমিত্রার কাছে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে তাঁর চোখের বাইরে চলে গেছে। একটি পত্রে সে আত্মপরিচয় লিখে রেখে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গারোহন করেছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই বিষয়টিকে রূপক হিসেবে দেখবার পক্ষপাতী। তিনি লিখেছেন , 'যেদিন বেহুলা প্রথম গাঙ্গুরের ভাসানে মৃতের সহযাত্রিনী হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সে চিরতরে জীবিতের সমাজের বাইরে চরিয়া গিয়াছে। সেইদিন তাহার সহমরণ হইয়াছে। অতএব তাহার প্রত্যাবর্তন একটা রূপকের মতো। কবি নারায়ণ দেব ইহাই কল্পনা করিয়া প্রত্যাগত বেহুলাকে মুহূর্তের জন্য মাত্র সমাজের কল্পনা চক্ষুর সম্মুখীন করিয়া পুনরায় স্বর্গলোকে নিরুদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।' কবির কাব্যে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিশেছে সরলতা ও স্বভাবিকতা। চরিত্রে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে তিনি ঘটনাবর্ণনার মাঝে মাঝে বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। করুণ রসের উপস্থাপনায় নারায়ণ দেব বিশেষ প্রশংসার অধিকারী। মনসা ও বেহুলার অন্তর্ভেদী হাহাকার তাঁর কাব্যে উচ্চ স্বরগ্রামে গিয়ে পৌঁচেছে। তাঁর বেহুলা ব্রীড়াশীলা নারী হয়েও নির্মম দৈবশক্তির বিরুধে সংগ্রামশীলা। মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় তার মর্মস্পর্শী বিলাপ করুণরসে পাঠকের মনকে আর্দ্র করে দেয়। স্বামীর মৃতদেহকে সম্বোধন করে সে বলে—'জাগ প্রভু কান্দী নিশাচরে। ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে।। তুমি ত আমার প্রভু আমি যে তোমার। মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার।।' ড. ভট্টাচার্যের মতে, 'করুণরসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণ দেবের সমকক্ষ বড় কেহ নাই।' কিন্তু কবি করুণরসের সমান দক্ষতায় হাস্যরসও সৃষ্টি করেছেন। রঙ্গব্যঙ্গমূলক বক্রোক্তি রচনাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ডোমনী বেশিনী চণ্ডীর সঙ্গে শিবের রঙ্গপরিহাস তো সব কবির তামাসা প্রকাশের এক প্রিয় কাব্যপ্রসঙ্গ। নারায়ণ দেবের কলমও সেখানে হাসির ছটায় ঝিকমিক করে উঠেছে। একটু দৃষ্টান্ত :

ডুমুনি বলে দাড়ি পাকাইলা কি কারণ ।
নারীর উপরে এখন হে দেহ মন।।
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দিব্য পাকা বেল।।
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকী মাত্র সার।
তোমার মুখে চাহ আমাক বশ করিবার।।

কোন কোন সমালোচক কবিকে অভিযুক্ত করেছেন আদিরসের স্থূলতার জন্য। বিবাহবাসরে সমাগতা নারীগণের পতিনিন্দা মঙ্গলকাব্যের এক অত্যাবশকীয় উপদান। এখানেও কবি বেহুলার বিবাহে উপস্থিত বৃদ্ধাগণের নির্লজ্জ কামাসক্তি প্রকাশের হাস্যকর বর্ণনা করেছেন। এছাড়া কাব্যের অনেক জায়গায় কামাবেশের উপস্থাপনা আছে। নাবালক লখিন্দরের মধ্যেও আদিরসের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। এজন্য কেউ কেউ নারায়ণ দেবের রুচির প্রশ্ন তুলেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, কবি পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আদিরসের উতরোল বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাছাড়া ছিল যুগরুচি। এর কাছেও কবিকে হার মানতে হয়েছে।

কোন কোন সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ দেবকেই মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপা দিতে চান। তাঁদের যুক্তি, এ কবির কাব্যে কাহিনী, চরিত্র, রস সৃষ্টি, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি বিষয় সুচারুভাবে মিলে মিশে চমৎকার কবিত্বে পরিণত হয়েছে। এজন্যই কি এ কবির কাব্যের অনুলিপি এত বেশি? ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে বাস্তবিক মহাকাব্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যুগধর্মের জন্য তাহা ততটা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।' পরবর্তীকালে যাঁরা পদ্মপুরাণ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নারায়ণ দেব কর্তৃক প্রভাবিত হন। দ্বিজ বংশীদাস এঁদের মধ্যে অন্যতম। নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গে ও আসামে 'সুকবিবল্লভ' নামে পরিচিত। কবির পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের যে বংশ লতিকা মিলেছে তার সূত্রে নারায়ণদেবকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের কবি বলে নির্দেশ করা সঙ্গত।

৬.৪ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা

চণ্ডীমঙ্গলের আরাধ্যা দেবী হলেন চণ্ডী। এই দেবীর উদ্ভবের ইতিহাসও মনসার মতো বিচিত্র। লৌকিক এবং পৌরাণিক উভয় সংস্কৃতির সঙ্গে চণ্ডীর যোগ আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। সভ্যতার কোন্ পর্বে চণ্ডী উদ্ভূত হয়েছিলেন সে নিয়েও গবেষক মহলে সংশয় বর্তমান। সাপের সঙ্গে মনসার যেমন প্রত্যক্ষ যোগ আছে, সেভাবে চণ্ডীকে সরাসরি কোন টোটেমের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। কালকেতুর আখ্যানে তিনি অরণ্যপশুর রক্ষয়িত্রী দেবী, ধনপতি-পালায় তিনিই আবার হারানো-প্রাপ্তির দেবতা, তাঁর বরে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সদাগরের গৃহ। চণ্ডীমঙ্গলে দেবী ছলনা করার জন্য নানা সময়ে নানা রূপ ধারণ করেন—কখনো মৃগী, কখনো গোধিকা, আবার কখনো বা ষোড়শী বামার মূর্তি। তাই এই দেবীর উৎস নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। তবে চণ্ডীর সঙ্গে যে অরণ্যের যোগ ছিল তা দুটো আখ্যানেই পরিস্ফুট হয়েছে।

পৌরাণিক সাহিত্যে ও বাংলার স্থাপত্যকলায় চণ্ডীর আবির্ভাব বহু প্রাচীন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১-৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত যা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে খ্যাত তা খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন।

অর্বাচীন কালের পুরাণ বলে বিবেচিত স্কন্দপুরাণ, দেবীপুরাণ, বারাহীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, দেবী ভাগবত, বামন পুরাণ, বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রভৃতিতে চণ্ডীর দেবীত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ গবেষকের ধারণা, দশম শতকের পূর্বেই চণ্ডীদেবীর প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, এই দেবীর সঙ্গে গোধিকা উপস্থিত, কোথাও আবার গজলক্ষ্মীর মতো দুটি হস্তীও আছে। এর তাৎপর্য নির্ধারণ করতে গিয়ে চণ্ডীর আবির্ভাবের উৎসে পৌঁছে গিয়েছেন কেউ কেউ। সবাই যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা নয়, তবুও তাঁদের ভাবনাগুলির সারাৎসার এখানে পেশ করা যেতে পারে।

ড. সুকুমার সেনের মতে, ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই স্ত্রীদেবতা ও মাতৃকামূর্তির পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে শক্তি সম্পকিচ্ছুত তত্ত্বচিন্তা প্রথম প্রকাশ করেছেন আর্য ঋষিগণ অম্ভভূণ ঋষির বাক্নাম্নী কন্যার উক্তিতে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৬ সংখ্যক সকূক্তে যে অরণ্যানীর উল্লেখ আছে তিনিই 'বহু শত শতব্দীর ইতহাস বাহিয়া নানা কবিকল্পনার রঙে ডুবিয়া ও বিচিত্র লোকভাবনার পাকে জড়াইয়া পুরনো বাঙ্গালা সাহিত্য চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গলচণ্ডী রূপে দেখা দিয়াছিলেন।' এছাড়া ড. সেন মনে করেন, দুর্গার দুটি রূপ প্রাচীনকাল তেকে পাশাপাশি চলে আসছে। একটি রূপে তিনি পর্বতদুর্গের অধিষ্ঠাত্রী যোদ্ধ্রী, অন্যরূপে মরুকান্তারবাসিনী পালয়িত্রী। অবশ্য প্রথম রূপটিরই বাহন রূপে গোধাকে লক্ষ্য করি আমরা। অধ্যাপক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ও সমানভাবে চণ্ডীর পৌরাণিক উৎসের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বিশ্বসারতন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর রূপ, ধ্যান ও পূজাবিধির প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে সংকলিত বলে অনুমিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনীর আখ্যান যে বীজরূপে পাওয়া যায় তাও জানিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে—

"ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছল গোধিকাসি/যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।

শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজং সসূনো/রক্ষোহম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তি।।

কিন্তু যে সমস্ত গবেষকগণ অনার্যদের নারীদেবতাকেন্দ্রিক ধর্মভাবনার মধ্যে চণ্ডীর উৎস সন্ধান করেন তাঁরা উপরোক্ত মত অস্বীকার করেন। চণ্ডীর এই অপৌরাণিক উৎসের অন্যতম প্রবক্তা হলেন নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়। তিনি বলেন, ছোটনাগপুরের ওঁরাও সমাজের দেবী 'চাণ্ডী' বাংলায় এসে চণ্ডী নাম ধারণ করেছেন। ওঁরাও যুবকদের পশুশিকারে সাফল্য ও যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে চাণ্ডীবোঙ্গার পূজো করে। কালকেতু উপখ্যানে চণ্ডীর বারবার রূপ-পরিবর্তনের কথা মনে রেখে আশুতোষ ভট্টাচার্যও মনে করেন যে, চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ কাহিনীর চণ্ডী ও ওঁরাও সমাজের দেবী চাণ্ডী অভিন্ন। এ দুই দেবীই অরণ্য পশুর হিতাকাঙ্খী। গবেষক-অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত চণ্ডীর অনার্য উৎসের সন্ধানে প্রাচীন পৃথিবীর আদিম ধর্মচিন্তার দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি প্রাচীন মিশরের আইসিস, মেসোপটেমিয়ার ইশ্‌তার, গ্রীসের দিমিতর প্রমুখ প্রধান মাতৃকাদেবীদের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধেছেন 'শাকম্বরী' দুর্গাকেও। ভারতবর্ষে এই শস্যদায়িণী মাতৃকাদেবীর আবির্ভাব আর্যানুপ্রবেশের পূর্বে। পৌরাণিক দুর্গার বোধনে নবপত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পূজা এই প্রাচীন শস্যদেবীর পরিচয় বহন করে। ড. সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'দুর্গা তথা চণ্ডিকা যে একদা অরণ্যমণ্ডলেরই কোনো দেবী ছিলেন তার আরো একটি প্রমাণ হল তাঁর 'কোকমুখা' নামটি। কোক অর্থে ব্যাঘ্র (মতান্তরে বন্য কুকুর বা শৃগাল) স্পষ্টতই এই পশু ও মানবের সমন্বিতরূপ সংবলিত দেবীর কল্পনা সম্পূর্ণভাবে মানবিক মূর্তিসম্পন্ন দেবকল্পনার চেয়ে পূর্ববর্তী।'

চণ্ডীর উৎস সম্পর্কে প্রয়াত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীয়মান মহাযানী বৌদ্ধধর্মের একটি দেবীমূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, বজ্রযানী বৌদ্ধরা 'বজ্রতারা' নামে যে দেবীর কল্পনা করেন, তিনিই হিন্দু রূপান্তরে চণ্ডী। বজ্রতারার নামে যে-ধ্যান পাওয়া গিয়েছে, তার একটি বৈশিষ্ট্যই শুধু মেলে মঙ্গলচণ্ডীতে। সেটি হল, দুই দেবীই অষ্টবাহুবিশিষ্টা।

এখন উপরোক্ত মতসমূহের মধ্য থেকে আমরা গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। তার আগে কয়েকটি সম্ভাব্য অনুমান—১. মূল দেবী চণ্ডী এবং তাঁর নামটি যে অনার্য উৎসজাত এমন অনুমানের বিরোধী তথ্য এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। ২. বেদে চণ্ডী নামটি অনুপস্থিত। ৩. কাব্যে দেখা যাচ্ছে, গোধিকারূপে কালকেতুর গৃহে প্রবেশ করেছেন চণ্ডী এবং গোধিকা কালকেতুর ভক্ষ্য এবং শেষ পর্যন্ত পূজ্য। টোটেমতত্ত্বের একটি মূল সূত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে বলে এর অনার্য উৎস বেশি করে ধরা পড়ে। ৪. ইনি অরণ্য পশুদের রক্ষা করেন ও এঁকে তুষ্ট করলে শিকারীদের সাফল্য আসে—এ দুটি ঘটনাও দেবীর আরণ্যক প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে। ৫. চণ্ডী ধনদাত্রী বটে। ৬. ধনপতির কাহিনীতে দেবী আরণ্যক প্রকৃতি বিসর্জন দিয়ে যোষিতামিষ্ট দেবীতে পরিণত। ৭. মশান তেকে ডাকিনী-যোগিনীর সহায়তায় চামণ্ডারূপিনী দেবী শ্রীমন্তকে যেভাবে উদ্ধার করেন সে-রূপের মধ্যে চণ্ডীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। অতএব সিদ্ধান্ত, চণ্ডীর রূপ, ভাব এবং ঐশ্বর্য কল্পনায় আর্য-অনার্য হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-লৌকিক দেবপরিকল্পনার প্রভাব পড়েছে ইতহাসের বিভিন্ন ধাপে—বিভিন্ন সূত্রে। পৃথিবীর আদিম মাতৃকাদেবী শস্যশালিনীরূপে প্রথমে গৃহীতা হয়েছিলেন ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তায়। অনার্য সংস্কৃতিতে ইনি অরণ্যজন্তুর রক্ষাকর্ত্রী ও সেইসূত্রে শিকার-সাফল্যেরও দেবী। ঋগ্বেদে এই বনদেবীই অরণ্যানী, যিনি অভয়া ও পশুমাতা। এরপর পৌরাণিক যুগে সুসংস্কৃত হয়ে ওঠেন, পৃথক পৃথক দস্যুবিনাশের গল্প গড়ে ওঠে তাঁকে ঘিরে। ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবী ভাগবতের একটি বিশিষ্ট উল্লেখ থেকে হিন্দু সমাজে চণ্ডীর অনুপ্রবেশের ক্রমটিকে অনুধাবন করা যায়। গ্রন্থদুটিতে বলা হয়েছে—চণ্ডী 'কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্ট দেবতা'। অর্থাৎ চণ্ডী নারী-সমাজেরই দেবতা। এই তথ্য আরো দুটি প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয় আমাদের। চণ্ডী 'অনার্য-মূল' দেবী বলেই কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোকচক্ষুর আড়ালে নারীদের প্রশ্রয়ে ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে হয়েছে তাঁকে? খুব সম্ভব তাই। তিনি যদি প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক দেবী হবেন তাহলে তাঁকে ঘিরে মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠবে কেন? মনসা যেমন হয়ে ওঠেন শিবের কন্যা, চণ্ডী তেমনি রূপান্তরিত হন শিব-পত্নীতে। পরবর্তীকালে দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয়কন্যা পার্বতীর সঙ্গে মিশে যান তিনি। চণ্ডীমঙ্গলে সেই সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

৬.৪.১ মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্ত। এই কবির নাম জানা যায় ষোড়শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনা-সূত্রে। তিনি তাঁর কাব্যে বেশ কয়েকটি স্থানে মাণিক দত্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—'মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। যারা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়॥' কিংবা 'আদ্য কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস। মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।।' মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গলের দুটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে। তার একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ও অন্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার ওঝা 'মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। সেই সূত্রে কাব্যটি সম্ভবন্ধে সবিশেষে জানতে পারা যায়।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কোন্ সময়ের রচনা তা এখনো নিঃসংশয়িত ভাবে স্থিরীকৃত হয়নি। এর প্রথম কারণ, যেসব পুথি পাওয়া গেছে সেগুলিতে কোথাও গ্রন্থরচনার সময়কাল নির্দেশ করা নেই। দ্বিতীয়ত, কাব্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরদের বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও এর সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় এমন প্রাচীনত্ব (বৌদ্ধ ও নাথধর্মের প্রভাব) লক্ষিত হয় যে, যে-কারণে আশুতোষ ভট্টাচার্য ধারণা করেন 'এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে মাণিক দত্তের কাহিনী রচিত হইয়াছিল।' অবশ্য কাব্যের ভাষা বিচার করে একে কখনোই ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী বলে নির্দেশ করা যায় না। বাংলাদেশে চণ্ডীপূজার ঐতিহ্য কত প্রাচীন? বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের সাক্ষ্যে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে একে স্থাপন করা যায়। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যপূর্ববর্তীকালের নবদ্বীপের ধর্মচর্চার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'ধর্মকর্ম লোকে সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।' সময়টা পঞ্চদশ শতকের চতুর্থপাদ। অনুমান করা যায়, ঐ সময়েও সমাজে চণ্ডীমঙ্গল প্রচলিত ছিল, নইলে এর 'জাগরণ' পালার উল্লেখ এভাবে স্পষ্টতা পেতো না। মাণিক দত্ত এই সময়কালের কবি হতেও পারেন।

মাণিক দত্ত কোথাকার লোক ছিলেন তা নিয়েও পণ্ডিতগবেষকরা অনুমান করেছেন। কবির নিবাস মালদহের ফুলবাড়ী গ্রামে ছিল বলে অধিকাংশ গবেষকের ধারণা। তাঁদের অনুমানের পিছনে কিছু বলিষ্ঠ যুক্তিও আছে। প্রথমত কবির যে দুটি পুথি মিলেছে তা মালদহ জেলা থেকেই। মালদহে এখনও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই কাব্য পঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, কবি কাহিনীর সূত্রে যেসব গ্রাম, নদনদী, মঠ-মন্দিরাদির নাম করেছেন তার বেশির ভাগ মালদহ জেলাতেই মেলে যেমন—ঝাড়গ্রাম, বড়গাছা, কাঞ্চন নগর, সন্ন্যাসী পাটন, ছাত্যাভাত্যার বিল,কেন্দুয়ার নালা, গৌড়েশ্বরীর মন্দির ইত্যাদি। তৃতীয়ত, পুথির ভাষায় মালদহের বাক্‌রীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। কবির আত্মবিবরণী থেকে আর একুট তথ্য মেলে যে, কবি প্রথমজীবনে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। পরে দেবীর কৃপায় তিনি এর থেকে মুক্ত হন। দেবী চণ্ডী তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পুথি লিখতে স্বপ্নাদেশ দেন। দেবীর প্রসাদে কবিত্ব লাভ করে কাব্য রচনায় কবি আত্মনিয়োগ করেন। এরপর বোধহয় কবি গানের দল বাঁধেন রঘু ও রাঘব এই দুইজন দোহারকে সঙ্গে নিয়ে। এদের নিয়ে কবি কলিঙ্গদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কলিঙ্গরাজের কুনজরে পড়ে কারারুদ্ধ হন। পরে চণ্ডীর কৃপায় মুক্তি লাভ করেন।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু ও ধনপতির দুটি আখ্যানই আছে, তবে সংক্ষিপ্তাকারে এবং ধনপতির আখ্যানটি খণ্ডিত। সূচনায় রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা। কবির যাবতীয় কৃতিত্ব কিন্তু ঐ প্রথম অংশেই। ধর্মমঙ্গল ও নাথসাহিত্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেছেন যে তাঁর রচনাটি প্রাচীন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত গম্ভীরার গানে ঐ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কবি গতানুগতি দেববন্দনা পরিহার করে হস্ত-পদ-মস্তকহীন ধর্মগোঁসাইয়ের জন্মকথা দিয়ে কাব্য শুরু করেছেন। ধর্ম গোলোকের ধ্যান করতে তাঁর মুণ্ড সংযোজিত হল। ক্রমে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ইত্যাদির সৃষ্টি হল। এরপর উৎপত্তি হল জলের। জলে ভাসতে লাগলেন নিরঞ্জন। নিরঞ্জন থেকে আদ্যার উৎপত্তি। মাণিক দত্ত এই আদ্যাকেই চণ্ডীতে পরিণত করেছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করলে ধর্মের আদেশে মহাদেব আদ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। এরপর কাহিনী মোড় নিয়েছে আদ্যা-চণ্ডীর পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্য প্রখ্যাপনের দিকে।

মাণিক দত্তের কালকেতু ও ধনপতি পালার কাহিনী কিংবা চরিত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, শিবনিন্দায় দক্ষপত্নী প্রসূতিও পঞ্চমুখ ছিলেন। ধনপতির গল্পে লহনা ও খুল্লনার সম্পর্ক বর্ণনায় কবি বেশ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সেকালের সতিনীকোন্দলের যথার্থ রূপটি

এখানে ধরা পড়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, আখেটিক খণ্ডের তুলনায় কবির বণিক খণ্ডটি সুপরিকল্পিত, 'কিন্তু পুথির রচনা সর্বত্রই অত্যন্ত শিথিলবন্ধ, ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে সর্বত্রই দায়িত্বহীনতা দেখা যায়।' মাণিক দত্তের চরিত্রসমূহ কোন অভিনবত্বের দাবিদার নয়। কেবল ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি সামান্য পরিমাণে উজ্জ্বল। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'কাব্যটি জনসাধারণের জন্য লেখা বলিয়া ছড়াবহুল'। মন্তব্যটি সঠিক। কবির বিভিন্ন বর্ণনায় ছড়াধর্ম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যেমন জরতীবেশিনী চণ্ডী হেঁয়ালি করে বলেছে—

'আমারে বোল ডানরে বুড়িয়ে আমার বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান॥
ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদোষী।
দ্বারে বসে খাইনু মুঞি চৌদ্দ ঘর পড়শী॥...
ডাইন বলিঞা মোরে বোলে বার বার।
আজিকা হৈনু ডান তোমা খাইবার॥'

সবশেষ কথা এই যে, মাণিক দত্তের কাব্যে সুষম ঐক্যের অভাব আছে, এর ভাষা ও ছন্দ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কাব্যে দু'একটি স্থানে মুকুন্দের ভাষাভঙ্গির নকল থাকলেও তা পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলে ধারণা করা সঙ্গত।।

৬.৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। মঙ্গালকাব্যগুলি উদ্ভবের পিছনে কারণসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২। মনসামঙ্গাল কাব্যধারা বিষয়ে আপনার অভিমত দিন।

৩। পদ্মাপুরাণের কবি বিজয়গুপ্তের কবিত্ব বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৪। মনসামঙ্গাল কাব্যধারায় বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন।

৫। মনসামঙ্গালকার নারায়ণদেব সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৬। দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্ধারণ করে চৈতন্য-পূর্ব যুগের চণ্ডীমঙ্গালকার মানিক দত্ত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। 'মঙ্গাল' নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২। মঙ্গালকাব্যের স্বরূপ-লক্ষণগুলি উপস্থিত করুন।

৩। মঙ্গালকাব্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। দেবী মনসার উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত করুন।

৫। প্রথম মনসামঙ্গালকার কানা হরিদত্ত বিষয়ে আলোচনা করুন।

৬। চরিত্রসৃষ্টিতে কবি বিজয়গুপ্তের কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৭। বিপ্রদাসের কাব্য বিজয়গুপ্তের তুলনায় কতটা স্বতন্ত্র সে বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৮। চণ্ডীর উৎস বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত দিন।

৯। মানিক দত্তের কাব্যের বিশিষ্টতা কোন্‌খানে আলোচনা করুন।

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা কোন্ বর্গের?

২। মনসা তথা সর্প-সংস্কৃতির সূচনা কোন্ দেশে?

৩। 'মন্‌চা আম্মা' কোন্ গোষ্ঠীর দেবী?

৪। কানা হরিদত্ত কোথাকার লোক?

৫। বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল কত?

৬। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যের নাম কি?

৭। নারায়ণ দেব আসামে কি নামে পরিচিত?

৮। মাণিক দত্ত কোন্ অঞ্চলের কবি?

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীমন্তকুমার জানা, ১৯৯৪

৩. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৯৮

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড—সুকুমার সেন, ১৯৯১

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

করেছিলেন কানা হরিদত্তের নাম। বেশ কড়া সমালোচনার সুরে বলেছিলেন—

'মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥'

কবির কাব্য সম্ভবন্ধে একথা বলার মতো জোরালো কিছু আমাদের হাতে নেই। তাঁর কাব্য আমাদের কালে এসে পৌঁছয়নি, এমনকি বিজয় গুপ্তের সাক্ষ্য যদি সঠিক হয় তাহলে পনের শতকের শেষভাগে তা লুপ্ত ছিল। অতএব যে-কাব্য সমালোচক নিজে দেখেননি, তার বিরুদ্ধে এ ধরনের কটুকাটব্য কতটা যুক্তি সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে পড়ে। পক্ষান্তরে এটা হতে পারে যে, বিজয় গুপ্ত নিজের কাব্যকে গৌরান্বিত করে তোলার জন্য এ হেন ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় মেতে ছিলেন। যাইহোক, বিজয় গুপ্তের কাছ থেকে একটা খাঁটি খবর পাওয়া গেছে যে, কানা হরিদত্তই মনসার প্রথম গীত রচয়িতা। নারায়ণ দেবের একটি পুথিতেও হরিদত্তকে এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হরিদত্ত সম্বন্ধে আর একটু তথ্য মেলে পুরুষোত্তম নামক গায়েনের উল্লেখ থেকে, যিনি হরিদত্ত রচিত লাচাড়ির ছন্দ গান করতেন। গায়েনের ভণিতাটি এইরকম—'কানা হরিদত্ত/হরির কিঙ্কর/মনসা হইক সহায়। তার অনুরুদ্ধ/লাচাড়ীর ছন্দ/লাচাড়ীর ছন্দ/শ্রীপুরুষোত্তম গায়।'

হরিদত্ত সম্বন্ধে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। ময়মনসিংহের দিগ্‌পাইৎ গ্রাম থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় একটি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ পুথিতে কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামধেয় একটি শিকলি পাওয়া গিয়েছে। সেইসূত্রে গবেষক মহলে ধারণা যে, কবি ময়মনসিংহের মানুষ ছিলেন। এ কবির কাল নির্ধরণেরও চেষ্টা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন''র সেনের মতে ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং সম্ভবত তুর্কী আক্রমণের আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এমত নানা কারণে মেনে নেওয়া যায় না। নানার প্রধানতম বাধা এর ভাষা। দক্ষিণারঞ্জনবাবু প্রাপ্ত পুথিটির যে-অংশ নকল করে দীনেশচন্দ্রকে পাঠান তার মুদ্রিত রূপ দেখে পণ্ডিত মহলেই সংশয় জেগে ওঠে। কারণ সে ভাষায় আধুনিকতার ছাপ যথেষ্ট। আবার বিজয়গুপ্তও যে-ধরনের সমালোচনা করেন তা আদৌ সমর্থিত হয় না ঐ রচনায়। মুদ্রিত কাব্যাংশের কিয়দংশ এইরকম—

'দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী॥
সুতলিয়া নাগ কৈল গলার সুতলি।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥'

বিজয় গুপ্তর কাব্যরচনাকালে (১৪৮৪ খ্রিঃ) যদি হরিদত্তের গীত সত্যসত্যই লুপ্ত হবার মুখে পড়ে তাহলে চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে এই কবি আবির্ভূত হতে পারেন বলে অনুমান করা যায়। আর এই সময়েই ব্রতকথার

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

চণ্ডীর উৎস সম্পর্কে প্রয়াত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীয়মান মহাযানী বৌদ্ধধর্মের একটি দেবীমূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, বজ্রযানী বৌদ্ধরা 'বজ্রতারা' নামে যে দেবীর কল্পনা করেন, তিনিই হিন্দু রূপান্তরে চণ্ডী। বজ্রতারার নামে যে-ধ্যান পাওয়া গিয়েছে, তার একটি বৈশিষ্ট্যই শুধু মেলে মঙ্গলচণ্ডীতে। সেটি হল, দুই দেবীই অষ্টবাহুবিশিষ্টা।

এখন উপরোক্ত মতসমূহের মধ্য থেকে আমরা গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। তার আগে কয়েকটি সম্ভাব্য অনুমান—১. মূল দেবী চণ্ডী এবং তাঁর নামটি যে অনার্য উৎসজাত এমন অনুমানের বিরোধী তথ্য এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। ২. বেদে চণ্ডী নামটি অনুপস্থিত। ৩. কাব্যে দেখা যাচ্ছে, গোধিকারূপে কালকেতুর গৃহে প্রবেশ করেছেন চণ্ডী এবং গোধিকা কালকেতুর ভক্ষ্য এবং শেষ পর্যন্ত পূজ্য। টোটেমতত্ত্বের একটি মূল সূত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে বলে এর অনার্য উৎস বেশি করে ধরা পড়ে। ৪. ইনি অরণ্য পশুদের রক্ষা করেন ও এঁকে তুষ্ট করলে শিকারীদের সাফল্য আসে—এ দুটি ঘটনাও দেবীর আরণ্যক প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে। ৫. চণ্ডী ধনদাত্রী বটে। ৬. ধনপতির কাহিনীতে দেবী আরণ্যক প্রকৃতি বিসর্জন দিয়ে যোষিতামিষ্ট দেবীতে পরিণত। ৭. মশান তেকে ডাকিনী-যোগিনীর সহায়তায় চামণ্ডারূপিনী দেবী শ্রীমন্তকে যেভাবে উদ্ধার করেন সে-রূপের মধ্যে চণ্ডীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। অতএব সিদ্ধান্ত, চণ্ডীর রূপ, ভাব এবং ঐশ্বর্য কল্পনায় আর্য-অনার্য হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-লৌকিক দেবপরিকল্পনার প্রভাব পড়েছে ইতহাসের বিভিন্ন ধাপে—বিভিন্ন সূত্রে। পৃথিবীর আদিম মাতৃকাদেবী শস্যশালিনীরূপে প্রথমে গৃহীতা হয়েছিলেন ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তায়। অনার্য সংস্কৃতিতে ইনি অরণ্যজন্তুর রক্ষাকর্ত্রী ও সেইসূত্রে শিকার-সাফল্যেরও দেবী। ঋগ্বেদে এই বনদেবীই অরণ্যানী, যিনি অভয়া ও পশুমাতা। এরপর পৌরাণিক যুগে সুসংস্কৃত হয়ে ওঠেন, পৃথক পৃথক দস্যুবিনাশের গল্প গড়ে ওঠে তাঁকে ঘিরে। ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবী ভাগবতের একটি বিশিষ্ট উল্লেখ থেকে হিন্দু সমাজে চণ্ডীর অনুপ্রবেশের ক্রমটিকে অনুধাবন করা যায়। গ্রন্থদুটিতে বলা হয়েছে—চণ্ডী 'কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্ট দেবতা'। অর্থাৎ চণ্ডী নারী-সমাজেরই দেবতা। এই তথ্য আরো দুটি প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয় আমাদের। চণ্ডী 'অনার্য-মূল' দেবী বলেই কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোকচক্ষুর আড়ালে নারীদের প্রশ্রয়ে ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে হয়েছে তাঁকে? খুব সম্ভব তাই। তিনি যদি প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক দেবী হবেন তাহলে তাঁকে ঘিরে মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠবে কেন? মনসা যেমন হয়ে ওঠেন শিবের কন্যা, চণ্ডী তেমনি রূপান্তরিত হন শিব-পত্নীতে। পরবর্তীকালে দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয়কন্যা পার্বতীর সঙ্গে মিশে যান তিনি। চণ্ডীমঙ্গলে সেই সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

৬.৪.১ মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্ত। এই কবির নাম জানা যায় ষোড়শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনা-সূত্রে। তিনি তাঁর কাব্যে বেশ কয়েকটি স্থানে মাণিক দত্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—'মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। যারা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়॥' কিংবা 'আদ্য কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস। মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।।' মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গলের দুটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে। তার একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ও অন্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার ওঝা 'মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। সেই সূত্রে কাব্যটি সম্বন্ধে সবিশেষে জানতে পারা যায়।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

পর্যায়-২

একক ৭ □ বাংলাসাহিত্য ঃ চৈতন্যযুগ

গঠন

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ বাংলাসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

৭.৩ মঙ্গলকাব্য

৭.৩.১ মনসামঙ্গল

৭.৩.২ চণ্ডীমঙ্গল

৭.৩.৩ ধর্মমঙ্গল

৭.৩.৪ শিবায়ন

৭.৩.৫ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

৭.৪ বৈষ্ণবপদাবলি

৭.৫ চরিতকাব্য

৭.৫.১ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত

৭.৫.২ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

৭.৫.৩ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

৭.৫.৪ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

৭.৫.৫ চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়

৭.৫.৬ গোবিন্দদাসের কড়চা

৭.৬ অনুবাদকাব্য

৭.৬.১ অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ

৭.৬.২ চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

৭.৬.৩ কাশীরাম দাসের মহাভারত

৭.৬.৪ রঘুনাথ আচার্যের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গনী

৭.৬.৫ মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

৭.৬.৬ দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দমঙ্গল

৭.১ প্রস্তাবনা : মধ্যযুগের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ও যুগলক্ষণ (১৬শ শতক-মধ্য ১৭শ শতক)

মধ্যযুগের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংসকৃতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনীতির প্রসঙ্গ। সুলতানি আমলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। সুলতানদের সিংহাসন সবসময় অনিশ্চিত ছিল বলে দেশের অর্থনীতির দিকে মনোনিবেশ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অধিকৃত অঞ্চলের রাজস্ব ভোগ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র কাম্য। সেনানায়কদের জায়গীরের নির্দেশ দিয়ে ভূ-স্বামীদের নিজেদের জায়গায় রাখাটাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এর কারণ হল—নদী, খাল, বিল আর জঙ্গলে ঘেরা বাংলার দুর্গম ভৌগোলিক পরিবেশ। সেকালের রায়তদের অধিকারের কথা বিশেষভাবে জানা যায় না। কিন্তু সুলতান তথা নবাবের অনুগৃহীত একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজে গড়ে উঠেছিল। এঁদের নাম ছিল চৌধুরী বা ক্রোড়ী। সেকালে বাংলাদেশে সর্বত্রই প্রচুর কার্পাসের চাষ হত। নদীমাতৃক বাংলায় কার্পাস উৎপাদনের উপযুক্ত জমি ছিল। এছাড়া ধান আর আখ প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হত। সুলতানি আমলে বাংলায় স্বর্ণমুদ্রা অত্যন্ত বিরল ছিল।

বাংলাদেশে ১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আলাউদ্দিন হুসেনশাহ ও তাঁর বংশধরেরা রাজত্ব করে। তারপর বাংলা শাসিত হয় শেরশাহ ও তাঁর বংশধরদের দ্বারা। আমাদের আলচ্য সময় শেরশাহের রাজত্ব থেকে শুরু হলেও পূর্ববর্তী কিছু প্রসঙ্গ এখানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আলোচনা করা হল—

শেরশাহের আগে বাংলার মুদ্রানীতিতে কিছু ত্রুটি ছিল। এর কারণ ধাতু দুষ্প্রাপ্যতা, মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রা প্রচলন ও সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর অনুপাতের অনির্দিষ্টতা। শেরশাহ সম্রাট হয়ে কৃষি ও মুদ্রানীতি দুইয়েরই সংস্কার করলেন। স্বর্ণমুদ্রা-রৌপ্যমুদ্রা ছাড়াও তিনি নতুন এক ধরনের তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। সেকালে বাংলাদেশে বর্হিবাণিজ্যের প্রসঙ্গও পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে। ইটালীয় বার্থেমা ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় আসেন। ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে আসেন পর্তুগীজ পর্যটক বার্বোসা। এঁরা বাঙ্গেলা নামে বর্ধিষ্ণু বন্দরের কথা বলেছেন। আরবী, পারসিক, আবিসীনীয় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বণিকেরা এখানে এসে সমবেত হতেন। বাংলাদেশের সুন্দর ও সূক্ষ্ম বস্ত্র বাইরে পাঠানো হত। শেরশাহ বাণিজ্যের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনেকটা অবাধ হয়েছিল। শেরশাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজ বণিকেরা অত্যন্ত বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। ভারতসমুদ্রে মুসলমান বাণিজ্যকে নষ্ট করার জন্য তাঁরা প্রায় হিংসাত্মক নীতিই নিয়েছিল। ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সপ্তগ্রাম হয়ে উঠেছিল পর্তুগীজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র।

এই সময় তাঁর বাংলার বয়নশিল্প, সুগন্ধি আতর তৈরি, জাহাজ তৈরি ও নুন তৈরি বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল।

আকবরের শাসনকাল থেকে বাংলাদেশ একটি পৃথক রাজনৈতি সুস্থির পরিবেশের মধ্যে থাকল। এই সময় প্রত্যেক প্রদেশকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে তার মধ্যে এক একজন ফৌজদারকে শান্তিরক্ষার ভার দেওয়া হল। এক-একজন কাজীকে বিচারের কাজে নিযুক্ত করা হল ও বড় শহরে এক-একজন কতুয়ালকে পুলিশের কাজে রাখা হল। সারাদেশে চাষবাস, কেনাবেচা, কারিগরদের শিল্পদ্রব্য তৈরি ও পড়াশোনার কাজ নির্বিঘ্নে চলল।

মধ্যযুগের এই সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোতে আন্তর্জাতিক শক্তির ক্রমবিকাশও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ বণিকেরা এদেশে এই সময়ে ক্রমাগত তাঁদের বাণিজ্য বিস্তার করতে থাকে। আকবর টোডরমলদের সাহায্যে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এই রাজস্ব দেওয়ার পরও বাংলার সুবাদাররা প্রজাদের শোষণ করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতেন। শায়েস্তা খাঁ আঠারো বছর সুবেদারি করে ন-কোটি টাকা সঞ্চয়

করেছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত কম ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আসা ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ের বাংলার ফল ও ফসলের প্রাচুর্য্যের কথা বিশেষভাবে বলেছেন।

এই বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যেই গড়ে উঠেছে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। সমাজে কৃষিকাজ থেকে শুরু করে কারুশিল্প, দারুশিল্প ও চারুশিল্পের বিভিন্ন বৃত্তিজীবীগোষ্ঠী ছিল। কামার, কুমার, ছুতা, নাপিত, তাঁতি, ধোপা, মোল্লা, পুরুত সবারই সবাইকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল বাঙালিসমাজ।

মধ্যযুগে বাংলায় দাসশ্রেণীর ও নিম্নবর্ণ বৃত্তিজীবীর শিক্ষার অধিকার ছিল না। প্রথমদিকে হিন্দুদের শাস্ত্র আর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল মিথিলা। পরে নবদ্বীপই হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র সংস্কৃতি চর্চা আর বিদ্যা অর্জনের কেন্দ্র। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় টোল চতুষ্পাটি ছিল। উচ্চবিত্ত মুসলিম অধ্যুষিত মাদ্রাসা ছিল। সেযুগ চাকরী পাবার জন্য বাংলা, ওড়িয়া, নাগরী ও ফার্সী এই চারটি ভাষা জানতে হত। ব্যতিক্রমী হলেও দু-চারজন মহিলাও মধ্যযুগে লেখাপড়া শিখেছিলেন।

সেযুগে বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ছিল ডাল-মাছ-শাক-তরকারি ও ভাত। চণ্ডীমঙ্গলে ও অন্য কয়েকটি কাব্যে রান্নার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এছাড়াও চালভাজা, মুড়ি, মোয়া, চিঁড়ে, বাতাসা প্রভৃতি খাবারেরও প্রচলন ছিল। নিরামিষভোজী বৈষ্ণবদের প্রভাবেই বিশেষভাবে নানা ধরনের মিষ্টান্ন মধ্যযুগে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির খাদ্য তালিকায় ছিল।

সেযুগের বাংলাসাহিত্য থেকেই জানা যায় মেয়েরা নানা ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করত। হিন্দুসমাজে গৌরীদান প্রথা, আবার অন্যদিকে কৌলীন্য প্রথার প্রচলন বহু নারীর জীবনকেই দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

মধ্যযুগে টোলে আর মক্তব মাদ্রাসাতেও সাধারণত শাস্ত্র শিক্ষার দিকেই বেশি নজর দেওয়া হত। আকবর ধর্মসংস্কারের সঙ্গে শিক্ষাসংস্কারেরও চেষ্টা করেন। এসম্পর্কে বলা হয়েছে—“His Majesty orders that every school-boy should first learn to write the letter of Alphabet and also to trace there several forms.”

হিন্দুদের শাস্ত্র আর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল মিথিলা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই সংস্কৃত ছাড়াও অন্যান্য ভাষা শিখতে হত। সেকালে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়েই গঠিত ছিল সুবাহ বাঙলা। তাই চাকরি পাবার জন্য বাঙলা, উড়িষ্যা, নাগরী (হিন্দুস্থানী) ফরাসী-এ চার ভাষা জানতে হত। ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসুর (১৭১৪ খ্রীঃ) পিতামহী তাঁকে ‘বাঙ্গালা, পারসী, উড়্যা, পড়াল্যা নাগরী।’ অপর কবি প্রভুরাম (১৭৪২-৩৩ খ্রীঃ) বলেন ঃ

কাছেতে কায়স্থ কত করে লেখাপড়া
বাঙ্গালা সভার শোভে কাগজের গড়া।
বাঙ্গালা পড়ায়ে উড়্যা নাগরী সুন্দর
লেখায় উত্তম সব যার যে দপ্তর।

এই সময়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, তমলুক, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে পৃথিবীর নানাদেশ থেকে বাণিজ্যতরি এসে ভিড় জমাত। ধানই ছিল প্রধান সম্পদ। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে তুলার চাষ হত, কাঠও পাওয়া যেত। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল গুড়, চিনি, বস্ত্র ও লবণ। নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ করা হত।

সেযুগে সামন্তসমাজে গোমস্তা বেনেরাই ছিল মধ্যবিত্ত ও মধ্যশ্রেণীর মানুষ। আর বাকি সবাই ছিল প্রান্তিক চাষী, ক্ষেতমজুর ও দাসশ্রেণীর লোক। এছাড়া কামার, কুমার, তাঁতি, নাপিত, ধোপা, হাড়ি, ডোম, বাগদি, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্ত মানুষের সংখ্যাই সমাজে বেশি ছিল। এই বিভাজন ছিল বৃত্তিভিত্তিক। চৈতন্যপরবর্তী যুগে দেশজ মুসলিমসমাজের মধ্যে পেশাভিত্তিক প্রায়ই ছল, যেমন—জোলা, বেদে, বারুই, হাজাম, নিকেরি, কুমার প্রভৃতি।

মধ্যযুগের বাংলায় গ্রাম্যসমাজই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতো। কারণ নগরের সংখ্যা ছিল খুবই কম। গ্রামে গোষ্ঠীপতির নির্দেশে ও পরামর্শে এক-এক গোষ্ঠীর লোক পরিচালিত হত। গেড়াপাড়ায় বা একটি গ্রামেও একজন সর্দ্দার বা মাতব্বর থাকতেন। এঁরাই গ্রামের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতেন। বিচার করে শাস্তিও এঁরাই দিতেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানও এঁদেরই কর্তৃত্বে আর নেতৃত্বে সম্পাদিত হত। বিদ্রোহী কিংবা অপরাধীকে নাপিত, ধোপা, আর মোল্লা, পরুত বন্ধ করে দিয়ে সমাজপতিত অর্থাৎ একঘরে করে রাখা হত। এটি ছিল মধ্যযুগের গ্রামসমাজে চূড়ান্ত অপমানজনক ও অসুবিধাজনক শাস্তি। পতিত বা একঘরে লোকের সঙ্গে কেউ সহযোগিতা করত না। তার পক্ষে কোথাও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করাও হত অসম্ভব। নাপিত, ধোপা, বদ্যকার, কামার, স্বর্ণকার প্রভৃতি হিন্দু-মুসলিমসমাজের যোগসূত্র স্বরূপ ছিল। এদের মধ্যে নাপিতের ভূমিকা ছিল বহু বিচিত্র। সে অনেক রোগের চিকিৎসক ও নানা খবরের ভাণ্ডারী ছিল। নাপিত, ধোপা এবং মোল্লা পুরুতকে বার্ষিক ধান্য দানের বিনিময়ে নিযুক্ত রাখা হত।

কিন্তু একথাও ঠিক যে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে যথার্থ কিংবা পূর্ণাঙ্গ বাস্তব সমাজচিত্র পাওয়া যায় না। অনেক সময়েই আদর্শায়িত বা অতিকথন দুষ্ট কল্পনাপুষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

৭.২ বাংলাসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

এসময়ের বাংলাসাহিত্য বলতে বোঝায় বিভিন্ন ধরনের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলি, চরিতকাব্য, অনুবাদকাব্য ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি। প্রথমে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

৭.৩ মঙ্গল কাব্য

৭.৩.১ মনসামঙ্গল

দেবী মনসার পূজার প্রচার মনসামঙ্গল কাব্যগুলির উদ্দেশ্য। এধরনের কাব্যগুলিতে দেবী মনসার মাহাত্ম্য কীর্তিত।

লৌকিক দেবী মনসা অভিজাত সমাজে স্বীয় পূজা প্রচারের অভিলাষে বণিকশ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগরের দ্বারস্থ হন। কিন্তু চাঁদ মনসাকে পূজা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি মনসাকে দেবীর মর্যাদা দিতে নারাজ। ফলে চাঁদের সঙ্গে মনসার বিরোধ বাঁধে। মনসা নানাভাবে চাঁদের ক্ষতি করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত চাঁদ কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলার কাতর আবেদন উপেক্ষা করতে না পেরে নিতান্ত অনিচ্ছায় বাঁ হাতে মনসাকে পূজা দেন। উচ্চতর সমাজে মনসা স্বীকৃতি পান।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই সুপরিচিত এই বিষয়বস্তু নিয়ে কবিরা মনসামঙ্গল কাব্য লিখে আসছেন। ষোড়শ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যাঁরা মনসামঙ্গল কাব্য লিখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেতকাদাস, মেঘানন্দ ও দ্বিজ বংশীদাস। তাঁদের কবিপ্রতিভার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য এখন নির্দেশ করা যেতে পারে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ চৈতন্যপরবর্তী যুগের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে এঁর গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে রচিত মনসামঙ্গলের প্রথম কবিও তিনি। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন "তাঁর বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" মনসামঙ্গল কাব্যকারদের মধ্যে কেবলমাত্র ক্ষেমানন্দের উল্লেখ করেছেন। পূর্ববঙ্গেও ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের পুঁথি প্রচলিত ছিল। তাঁর কাব্যে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের অনুকৃতিও লক্ষ করা যায়। ক্ষেমানন্দ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, তিনি তাঁর কাব্যে দেবীর কাছে প্রার্থনায় সমস্ত কায়স্থ জাতির মঙ্গল কামনা করেছেন—"কেতকার বাণী। রক্ষ ঠাকুরানী।

কায়স্থ যতেক আছে।" কবির বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে দেবী প্রথমে মুচিনীর বেশে ও পরে ভূজঙ্গভূষিতা ব্রাহ্মণীর বেশে দেখা দিয়ে কেতকাদাসকে কাব্যরচনার নির্দেশ দিয়েছেন। কবির আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় দুজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম। এরা হলেন বারা খাঁ ও ভারমল্ল রায়। ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে বারা খাঁ মুকুন্দের পুত্র শিবরামকে বিশ বিঘা জমি দানপত্র করেছিলেন। আর ভারমল্ল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সুতরাং কেতকাদাস সপ্তদশ শতকের শেষপাদের কবি।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যকাহিনী বিশ্লেষণ করে মনে হয় তিনি তাঁর প্রতিভার তুলনায় বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তাঁর কাব্যের দেবখণ্ডে কবি খিলহরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। নৌযাত্রা পথের বর্ণনায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও তার চারপাশের অঞ্চলের গ্রাম ও নদনদীর নাম যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। পশ্চিমবাংলার গ্রামীণজীবনের ছবিও তাঁর কাব্যের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে জুঝাটি, গোবিন্দপুর, বর্ধমান, গাঙ্গপুর, কেজ্যা, মণ্ডলগ্রাম, দেপুর, জেয়াদা, আদমপুর (বা আমদপুর), হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, পিড়তলী (বা পিরতলী), গহরপুর, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের নাম পাওয়া যায়। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় সরলতা ও সহৃদয়তা বিশেষ মাধুর্যের সঞ্চার করেছে। যেমন ছদ্মবেশে পিতৃগৃহে বেহুলা পৌঁছলে যোগীর শিঙ্গাধ্বনি শুনে ভিক্ষা দিতে এসে যোগিনীর ছদ্মবেশে বেহুলাকে দেখে তার মায়ের মনে পড়ল হারানো কন্যার কথা—

> "তোমা দেখিয়া শোকে কান্দে মোর প্রাণ
> মোর কন্যা এক ছিল তোমার সমান।
> না বলিয়া কোথা গেল মড়া লৈয়া কোলে
> যোগিনী জাগালে শোক বেহুলা বদলে।"

কেতকদাসের কাব্যে পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদের বিলাপের বর্ণনায় তিনি প্রায় অবিকল মুকন্দের অনুকরণ করেছেন। তাঁর কাব্যে বেহুলার স্নিগ্ধ করুণ কোমলতা ও পাতিব্রত্যের দৃঢ়তা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। চাঁদ চরিত্রকে প্রথমে একটি সুদৃঢ় পৌরুষ হিসেবে গড়ে তুললেও কবি শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর চাঁদ শেষপর্যন্ত মনসার কাছে পরিপূর্ণভাবে নতি স্বীকার করেছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি, নিদর্শনা প্রভৃতি অলংকার ব্যবহারেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিদের প্রেরণাই তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে কাজ করেছে বলা যায়।

দ্বিজ বংশীদাস ঃ দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতোয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের বিশিষ্ট মহিলা কবি রামায়ণ রচয়িতা চন্দ্রাবতী, দ্বিজ বংশীদাসেরই কন্যা। বংশীদাস তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন—

> "জলধীর মাঝেতে ভুবন মাঝে দ্বারা।
> শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।।"

এই শ্লোক থেকে ১৪৯৭ শক বা ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বংশীদাস এঁর কাব্যের অন্যপ্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এ সর্বপ্রথম এই কবির কিছুটা পরিচয় দেন। ময়মনসিংহ গীতিকার গ্রাহক চন্দ্রকুমার দে বংশীদাসের বিস্তারিত পরিচয় সংগ্রহ করেন।

বংশীদাসের পদ্মপুরাণের আয়তন বৃহৎ। তাঁর কাব্যের দেবখণ্ডে সৃষ্টি বর্ণনা, দক্ষযজ্ঞ, সতীর তনুত্যাগ, মহাদেবের তপস্যা, মদনভস্ম, শিব ও উমার বিবাহ ইত্যাদি কুমারসম্ভব কাব্যের অনুরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তবে দেবখণ্ডের

পরবর্তী আখ্যানে তিনি বিশুদ্ধ পৌরাণিক প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছেন। এই অংশে পদ্মাবতী, নেত্রবতীর জন্ম, পদ্মার প্রথম পূজা লাভ, শিবের পদ্মাসহ গৃহে গমন, পদ্মাবতী ও নেত্রাবতীর বিবাহ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

মানবখণ্ডে কাজীর সঙ্গে মনসার বিরোধের পর ধন্বন্তরী বধের পালায় পরীক্ষিতের সর্পযজ্ঞেরও বর্ণনা আছে। পরবর্তী চাঁদ সদাগরের কাহিনীতে কবি তাঁর কাব্যে চাঁদকে চণ্ডীর উপাসক রূপে দেখিয়েছেন।

৭.৩.২ চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমণ্ডল কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সূত্রপাত। আলোচ্য কাল পর্বে এ ধারার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন দ্বিজ মাধব, মুকুন্দ চক্রবর্তী ও দ্বিজ রামদেব।

দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল ঃ দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি তাঁর কাব্যকে বলেছেন 'সারদাচরিত'। এই কাব্যটি শুরু হয়েছে মঙ্গল দৈত্য বধ কাহিনীর পরে গণেশ বন্দনা দিয়ে। এতে মনে হয় যে মঙ্গল দৈত্য বধ কবির কাব্যে পরে সংযোজিত হয়েছে। দ্বিজমাধব পূর্ববঙ্গের খুবই জনপ্রিয় কবি ছিলেন। ভোলা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর কাব্য পাওয়া গেছে। দেবী চণ্ডী মঙ্গল দৈত্যকে বধ করেছিলেন, এই প্রসঙ্গ মুকুন্দে নেই, কোন পরিচিত পুরাণে বা তন্ত্রেও এই প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। সম্ভবত দ্বিজমাধব কালিকাপুরাণের নরকাসুরকে মঙ্গল দৈত্য বলেছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যে সৃষ্টি পত্তন বর্ণনা ধর্ম ঠাকুরের পুরাণ অনুযায়ী—

না আছিল রবি শশী   সন্ন্যাসী তপস্বী ঘনষি
না আছিল সুমেরু মন্দার
না আছিল সুরাসুর   রাক্ষস কিন্নর নর
কেবল আছিল শূন্যাকার।....

শিবের বরে ক্ষমতাবান মঙ্গলদৈত্যের অত্যাচার থেকে দেবতাদের রক্ষা করার জন্য দেবীর নাম হোলো মঙ্গলচণ্ডী। এরপর মর্ত্যে পূজা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সখী পদ্মাবতীর উপদেশে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে কলিঙ্গদেশে দেউল নির্মাণ করিয়ে রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। এরপরই দ্বিজমাধবের কাব্যে কালকেতু প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। তবে তাঁর কাব্যে কালকেতুর প্রজাস্থাপন বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। তিনি তাঁর কাব্যে পুরাণের সঙ্গে তন্ত্রের প্রসঙ্গও প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। দ্বিজমাধব মুকুন্দের মতো চৈতন্য বন্দনা করেননি। তিনি তাঁর কাব্যকে ১৪টি পালায় বিভক্ত করেছেন।

কোনো কোনো সময় দ্বিজমাধব মুকুন্দের তুলনায় তাঁর কাব্যে বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কালকেতুর পিতা ধর্মকেতুর পরিণাম বর্ণনায় মুকুন্দর ব্রাহ্মণ্য সংস্কার তাঁকে কাশীবাসী করিয়েছে। কিন্তু দ্বিজমাধব এখানে স্বাভাবিক সঙ্গত একটি পরিণামের কথা বলেছেন। তাঁর ধর্মকেতু শিকার করতে গিয়ে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। বার্ধক্যজীর্ণ ধর্মকেতুর খেদও দ্বিজমাধবের কাব্যে তাই অপ্রধান চরিত্রটিকে একটি আলাদা মাত্রা দেয়—'দুখিত কলি হরি/তিনজন পুষিতে নারি/কেমনে পুষিব চারিজন।।/তুহ্মি জান ভালে ভাল/দুঃখে গেল সর্বকাল/আর দুঃখ না সয় শরীরে।

মুকুন্দের কাব্যে দেবী চণ্ডী মঙ্গলদায়িনী। অনুগৃহীত কালকেতুকে নিজেরই দেওয়া ঐশ্বর্য নিজেই তিনি বয়ে নিয়ে যান। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতুর কুটিরে ছদ্মবেশিনী চণ্ডী রীতিমতো কলহকুশলা মধ্যযুগীয় নারী। ফুল্লরা দেবীকে কোনোমতেই বোঝাতে না পেরে তীব্র ক্রোধে বলে—দেবীর মাথার সে মাংরে পসরা তুলে দেবে, আর যত অলংকার তাঁর গায়ে আছে সমস্ত বিক্রি করে খাবার জোগাড় করবে। দেবীও সমান তেজে উত্তর দেন— "কি বোলিলা বোল আরবার।/কেশেতে ধরিয়া লাঘব করিমু তোমার।'

দ্বিজমাধবের ভাঁড়ুদত্ত মুকুন্দের ভাঁড়ুদত্তের মতো অভিজাত কুলীন নয়, ইদিলপুর থেকে আসা ষোলশ প্রজার একজন। এরা লোক ঠকিয়ে খায়, আর এদের 'জাতির উদ্দেশ' না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের কুলীন বলে।

ভাঁড়ুর পরিচয় দিতে গিয়ে দ্বিজমাধব মধ্যযুগের সামাজিক গতিশীলতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। শাস্ত্র থেকে সমাজে জাতিবর্ণ প্রথাকে যতটা স্থাণু বলে মনে হয়, মধ্যযুগীয় সমাজ আসলে তেমনটি ছিল না। গোষ্ঠীগত বৃত্তি পরিবর্তেনের সঙ্গে সঙ্গে জাতি কাঠামোয় স্থান পরিবর্তন ঘটতো। নিম্নজাতির মানুষ উচ্চজাতির গোষ্ঠীতে প্রবেশ করতে পারতেন। এইভাবেই মৌলিকরা কুলীন গোষ্ঠীতে প্রবেশ করেন। এছাড়া ভূমিহীন কৃষকেরা অনাবাদী জমি চাষ করে জমিদার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করেছে। কিন্তু দ্বিজমাধবের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় এরা ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছ থেকে খুব একটা মর্যাদা পেতো না।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ঃ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্টতম কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। দেবীচণ্ডীর মহিমা নিয়ে রচিত তাঁর এই কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মঙ্গলচণ্ডীও অভয়া দুর্গা।

মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে মুকুন্দই সর্বপ্রথম তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁক কাব্যে দেশ ও সমাজের চিত্র বিশদভাবেই পাওয়া যায়। আত্মপরিচয়ে কবি আসরের শ্রোতাদের সম্বোধন করে বলেছেন যে স্বয়ং চণ্ডীর আদেশে তিনি এই কাব্য রচনা করেছেন। কবি ছিলেন সেলিমাবাজ (সেলিমাবাদ) গোপীনন্দীর তালুক দামিন্যা গ্রামের বাসিন্দা। কিন্তু প্রজার পাপের ফলে অধর্মী রাজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁর গ্রামে। কর্তা হলো মামুদ সরিফ। খাজনার চাপে প্রজারা দেশ ছেড়ে পালানোর উপক্রম করলো। মুকুন্দও দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রাম ছেড়ে তিনি প্রথমে পৌঁছোলেন ভালিএ্যা গ্রামে। সেখানে রূপ রায় তাঁর সমস্ত সম্বল কেড়ে নিল। মুকুন্দ আশ্রয় পেলেন যদু কুণ্ডু তেলের বাড়িতে। তারপর আবার পথযাত্রা। গোচড়িয়া গ্রামে পৌঁছোনোর সময় মুকুন্দ নিঃসম্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত এক ব্যক্তি। সেখানে পুকুরপাড়ে কবি গৃহদেবতার পূজা করেন 'শালুক-নাড়া'র নৈবেদ্য দিয়ে। ক্ষুধার্ত শিশুপুত্রকেও সেই 'শালুক-নাড়া' খেতে দেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত শিশু ভাত খেতে চায়। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল হয়ে ওঠে তার অন্য সমস্ত আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে এক ভাগ্যবিপর্যস্ত পিতার আর্ত অসহায়তার দলিল। সেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার পর সচ্ছল সামন্তের নিরাপত আশ্রয়ে লেখা তাঁর কাব্যে কবি উপহার দেন দেবমহিমার আড়ালে মানবজীবনের মরমী ইতিবৃত্ত। তার আগে ঐ পুকুর পাড়েই দেবী চণ্ডী স্বপ্নে মায়ের মূর্তি ধরে শিয়রে বসেন—

আশ্রম পুখুরি আনা নৈবেদ্য শালুক-নাড়া
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
মা কৈলা পরম দয়া দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব

এরপর কবি শিলাই পেরিয়ে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের আরড়া গ্রামে উপস্থিত হলেন। সেখানে কবি রাজপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। পরে রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে কবি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কোনো কোনো চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দের কাব্যের রচনা কালজ্ঞাপক তথ্য আছে—

শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্কগণিতা
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।

রস রস বেদ শশাঙ্ক অর্থাৎ ১৪৬৬ শকাব্দে (১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে)-র পর কবি মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

মুকুন্দের কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—(১) দেবখণ্ড, (২) আখেটিকখণ্ড, (৩) বণিকখণ্ড। প্রথম খণ্ডে আছে দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয় দুহিতা উমার পরিচিত পৌরাণিক গল্প।

দ্বিতীয় আখেটিক খণ্ডে দেখা যায়. দেবীচণ্ডী নিজের পূজা প্রচারের জন্য শিবভক্ত নীলাম্ভবরকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে দেবীমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পাঠালেন। নীলাম্বর ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতু হয়ে জন্ম নিল। পরে কালকেতুর সঙ্গে বিবাহ হলো ফুল্লরার। কালকেতুর পিতামাতা বৃদ্ধ বয়সে বারাণসী চলে গেল। একসময় দেবীচণ্ডীর কৃপায় কালকেতু রাজা হল। কালকেতু উপাখ্যানে দেখা যাচ্ছে দেবীচণ্ডী নিজের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের কাছে। অন্যদিকে বণিক খণ্ডেও স্বর্গভ্রম নর্তকী রত্নামালা ও তার পুত্র শ্রীমন্ত দেবীর পূজা প্রচারের মাধ্যম হলো। এই অংশে দেবী ব্রাহ্মণ্যসমাজ সংস্থায় অধিকার লাভ করেছেন। আর সেখানে প্রচলিত সমৃদ্ধ দেবতা শিবকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডে কালকেতুর গুজরাট নগরপত্তন উপলক্ষে কবি একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই নগরে হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ছবি উজ্জ্বল। গুজরাট নগরে মুসলমানরাও হিন্দুদের অন্যান্য বর্ণের মতো স্থান পেয়েছেন একটি স্বতন্ত্র পল্লীতে। নগরের পশ্চিমদিকে এই পাড়ার নাম হলো হাসনহাটি। কালকেতুর মুসলমান প্রজারা শান্ত ও ধর্মনিষ্ঠ। তারা "ফজর সময়ে উঠি/বিছায়া লোহিত পাটি/পাঁচ বেড়ি করয়ে নমাজ।/ছিলিমিলি মালা ধরে/জপে পীর পেগাম্বরে/পীরের মোকামে দেই সাঁজ।" এছাড়া এই প্রসঙ্গে সমাজে কোন্ কোন্ জাতি কি কি কর্মে নিযুক্ত থাকতো—তারও সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলঙ্কারে মুদুন্দের পাণ্ডিত্যের পরিচয় যেমন তাঁর কাব্যের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে— তেমনি লোকব্যবহার, ছেলে ভুলানো, শিশুদের খেলা, মেয়েদের আচার-অনুষ্ঠান, গেরস্থালি, রান্নাবান্না ইত্যাদি সামাজিক ও সাংসারিক ব্যাপারেও তিনি আশ্চর্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। নিপুণ পর্যবেক্ষণ, সহৃদয়তা, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্য মুকুন্দের রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। নারীর সামাজিক অবস্থানকেও তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তিনি যথার্থভাবেই তুলে ধরেছেন। সপত্নী-সমস্যা মুকুন্দর চণ্ডীমঙ্গলের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। তাঁর কাব্যে সপত্নী ক্রান্ত চারটি পৃথক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এক, ফুল্লরার সপত্নী আশঙ্কা। দুই, গঙ্গা ও চণ্ডীর কলহ। তিন, লহনা ও ঘুল্লনার সপত্নী দ্বন্দ্ব. চার, শ্রীমন্তের দ্বিতীয় বিবাহে ঘুল্লনার প্রতিবাদ। এই চারটি প্রসঙ্গেই কবি ফুল্লরা, ঘুল্লনা, দুর্বলা প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। এছাড়াও তাঁর কাব্যে অপ্রধান চরিত্রগুলি, যেমন—ভাঁড়ুদত্ত, মুরারি শীল, মুরারি শীলের স্ত্রী, বুলান মণ্ডল, কালকেতুর অত্যাচারে বিপন্ন পশুকুল সবাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের মধ্যযুগের বাঙালির এমন পরিপূর্ণ ছবি বাংলাসাহিত্যের আর কোথাও মেলে না। আরো উল্লেখ করার বিষয় তাঁর ধর্মসম্পর্কে উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী। ব্রাহ্মণ সন্তানত হয়েও তিনি নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমান সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন। মুকুন্দ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব ভাব ও বিশেষ রসের সঞ্চার করেছে। এই রস হলো স্নিগ্ধ কারুণ্য, আর ভালোবাসা। অনেক দুর্দশা ভোগ করে সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে নিজের আবল্য সেবিত গৃহদেবতাকে ছেড়ে তিনি চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ছেড়ে আসা দেশ, আরগ গৃহদেবতার জন্য এক করুণ ভক্তি স্নিগ্ধ ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে—

দামুন্যা নগরে প্রভু রামচক্রাদিত্য
শিশুকাল হৈতে যার সেবা কৈল নিত্য।
সে প্রভু-চরণ মনে ভাবি অনুক্ষণ
চণ্ডিকামঙ্গল রচে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

আবার অন্য দিকে আড়রা নগরে তাঁর বাসস্থান সম্পর্কেও কবির যথেষ্ট, প্রীতি, মমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে মুকুন্দ মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি।

দ্বিজ রামদেবের 'সারদাচরিত' ঃ চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যধারায় সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল'। এই কাব্য ধারার একটি কাব্য আবিষ্কার ও সম্পাদনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেছিলেন ড. আশুতোষ দাস। কাব্যটির নাম 'সারদাচরিত', রচয়িতা দ্বিজ রামদেব। ত্রিপুরায় দ্বিজ রামদেবের ভণিতা যুক্ত দুটো পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কাব্যটির ভাষায় চট্টগ্রাম ঞ্চলের প্রচলিত শব্দ ও বাগ্‌ধারার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজমাধবের কাব্যের সঙ্গে রামদেবের কাব্যের সাদৃশ্য আছে। বিষয় বিন্যাস উপাখ্যান অংশের পালাবিভাগ, শ্লোকে শ্লোকে শব্দ ও রচনা ভঙ্গিগত অনুকরণ লক্ষ করা যায়। এবিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—"মঙ্গলকাব্য রচনায় পুচ্ছগ্রাহিতা কিংবা পরানুবর্তনের যে নিদর্শনই পাওয়া যাক না কেন, এই প্রকার অনুকরণের দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।"

দ্বিজ রামদেবের কাব্যের এক মুখ্য সম্পদ তাঁর বৈষ্ণব আবেগ। কাব্যটি প্রকাশের আগে পুঁথির অনুলিপি পড়ে ক্ষুদিরাম দাস লিখেছিলেন "রামদেবের গ্রন্থে শতাধিক উৎকৃষ্ট পদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে রচিত।" অধ্যাপক দাস তখন অন্যরকম অনুমান করলেও আসলে রামদেব দ্বিজ মাধবের দ্বারা প্রভাবিত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গ সূচনার পূর্বে একই ভাব প্রকাশক 'বিষ্ণুপদ' রচনার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। অনেক স্থানেই মূল কাব্য প্রসঙ্গের বদলে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়কথা অধিকতর রস নিবিড়তা লাভ করেছে। কবির রচনায় মৌলিকতা খুবই কম, বেশিরভাগই মাধবের কাব্যের অন্ধ অনুকরণ। যেটুকু মৌলিকতা আছে, তাতেও রামদেব মৌলিক পরিকল্পনা শক্তির কোনো উৎকর্ষ গৌরব দাবি করতে পারেন না। এই তথ্যের এক নিশ্চিত নিদর্শন সুশীল উপাখ্যান—মুকুন্দ যাকে বলেছেন মুরারি শীল, দ্বিজ মাধবের কাব্যে সে বণিক সোমদত্ত।

গ্রন্থশেষে রচনার পুঞ্জিকা থেকে জানা যায় "ইন্দু বাণ রিসি বাণ বেদ মন জিত" অব্দে দ্বিজরামদেবের কাব্য রচিত হয়েছিল। এই পর্বে কোথাও লিপি প্রমাদ আছে। "ইন্দু বাণ রিসি বাণ" অংশে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গেলে ১৫৭৫ পাওয়া যায়। একে শকাব্দ বলে ধরে নিলে ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কবির কাব্য রচনার সমাপ্তিকাল নির্দেশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কালনির্দেশক শ্লোকগুলিতে ডান দিক থেকে বাম দিকে গণনা করাই প্রচলিত রীতি। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসৃত বলে কোনো অর্থযুক্ত অব্দের দির্দেশ পাওয়া যায় না।

ভণিতায় কাব্যটিকে 'সারদাচরিত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর পিতার নাম কবীন্দ্র অথবা বিধু ছিল। চট্টগ্রাম অথবা ত্রিপুরা অঞ্চলে কবির নিবাস ছিল বলে মনে হয়।

৭.৩.৩ ধর্মমঙ্গল কাব্য

রামাই পণ্ডিত্যের 'শূন্যপুরাণ' ঃ ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে রামাই পণ্ডিত সংকলিত 'শূন্য-পুরাণ' নামে একটি বই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মপূজা উপলক্ষে যে গাজন হয়ে থাকে, তাতেও তার বিবিধ অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। এই গাজন উপলক্ষে শিবের চাষবিষয়ক যে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি ঐ 'শূন্য-পুরাণে' সংকলিত হয়েছে। মনে হয়, এটাও প্রাচীন শিব-গীতিকার একটি অংশ—যখন আছেন গোসাঞি হয়া দিগম্বর/ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বলেন ঈশ্বর ॥/রজনী পরভাতে ভিঙ্ক্‌খার লাগি যাই।/কুথাএ পাই কুথা এ না পাই।।/হর্তুকী বত্রড়া তাহে করি দিন পাত/কত হরস গোসাঞি ভিঙ্ক্‌খাএ ভাত।।/আহ্মার বচনে গোসাঞি পুক্ষি চষ চাষ।/কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।।/পুখরি কাদাএ লইস্ব ভূমখানি/আরসা হইলে ছিচএ দিব পানি।।/আর সব কিষাণ কাঁদিব মাথায় হাত দিয়া।/পরম ইচ্ছায় ধান্য আনিব দাইআ।।/ঘরে অন্ন থাকিলেক পারভু

সুখে অন্ন খাব।/অন্নের বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব।।/ কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।/কত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘের ছড়।।/তিলষ সরিষা চাষ কর গোসাঞি বলিতব পাত্র।/কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাত্র।।/মুগ বাটলা আর চষিহ ইখু চাষ।/তবে হবেক গোসাঞি পঞ্চামর্ত্তর আশ।।/সকল চাষ চস পরভু আর রুই ও কলা/সকল দব্ব পাই যেন ধর্মপূজার বেলা।।/এতেক সুবিধা হর মনেতে ভাবিল/মনপবস দুই হেলএ সিজন করিল।।/সুনার যে লাঙল কৈল রূপার যে ফাল।/আগে পিছু লাহলেতে এ তিন গোজাল।।/আগে জোতি পাশজোতি আভদর বড় চিন্তা।/দুদিকে দুসলিদিআ কুআলে কৈল বিন্ধা।।/সকলসাজ হইল পরভুর আর সাজ চাই।/গটাদশ কুআ দিয়া সাজাইল মই।।/তাকর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।/চাষ চষিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি।।/সাঠ মাসে গোঁসাই পিথিবি মইলিল।/যতগুলি ভুম পরভূ সকলি চষিল।।

এর সঙ্গে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত এই পদটির তুলনা করা যেতে পারে। এখান থেকে বুঝতে পারা যাবে শিব সম্পর্কিত এই বিশ্বাস মিথিলা থেকে উত্তরবঙ্গ পথে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচার লাভ করে ছিল। কিম্বা প্রাচীন বাংলাদেশ থেকেও তার মিথিলায় যাওয়া অসম্ভব নয়—

বেরি বেরি অরে শিব মোঞে তোকেঁ বোলঞে
কিরিষি করিয় মন লাই

খেলারামের ধর্মমঙ্গল ঃ খেলারাম ধর্মমঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি। খেলারামের কাব্য কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তা নীচে উদ্ধৃত করা হলো—

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভভন।।
হে ধর্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম।।

'ভুবন' অর্থে ১৪, আর বায়ু ঊনপঞ্চাশ সুতরাং ১৪৪৯ শক অর্থাৎ ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে খেলারাম তাঁর কাব্যরচনা শুরু করেন। কাব্যের একস্থানে তিনি লিখেছেন—

তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অহী মঙ্গলময় দিব আত্মপরিচয়।।

কিন্তু তাঁর কাব্যের শেষভাগ অর্থাৎ অহীমঙ্গলা পাওয়া যায়নি।

রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল ঃ রূপরাম ধর্মমঙ্গলের একজন বিশিষ্ট কবি। মুকুন্দ রামের জন্মস্থানের কিছু দূরে বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। তাঁর পিতা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। রূপরামের আরো তিন ভাই ছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁর অবহেলা দেখে ভ্রাতা রত্নেশ্বর তিরস্কার করায় তিনি রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে ভর্তি হন। একদিন গুরুর সঙ্গে তর্ক হয়। তিনি পথে বেরিয়ে মায়ের কাছে যাচ্ছিলেন সেইসময় ধর্মঠাকুর পথের মধ্যে তাঁর সামনে আবির্ভূত হন। রূপরাম তাঁর কাব্যের আত্মবিবরণী ও গ্রন্থোৎপত্তি অংশে এসম্পর্কে লিখেছেন—

সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল।।
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর দুর।
আপুনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠাকুর।

আমি ধর্ম ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বারদিনের গীত গাও শুন রূপরাম।।
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজে বুলি।।

এরপর গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে নানা জায়গায় ঘোরার পর কবি অবশেষে গোপ ভূমের রাজা গণেশের কাছে এসে উপস্থিত হন। রাজা গণেশ কবিকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়ে গানের দল বেঁধে দেন। সেই থেকে রূপরাম ধর্মের আসরে গান গাইতে শুরু করেন।

রূপরাম নিজের কাব্যের সময় সম্পর্কে বলেছেন—

তিন বাণ চারি যুগে বেদে যত রয়।
শাকে সনে জড় হৈলে কত শাক হয়।
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কইরা লেহ।।

অর্থাৎ রূপারামের গ্রন্থরচনার কাল ১৫১২ শকাব্দ বা ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ।

ভট্টাচার্যের টোলে লেখাপড়া শেষ না হলেও তিনি যে পণ্ডিত তাঁর রচনা থেকেই তা বোঝা যায়। জামতী পালায় কুলটা নয়ানীর রূপসজ্জার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে।

কপালে সিন্দূর পরে তপন-উদয়।
চন্দন-চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়।।
চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ।।
এক ঠাঞি রবি শশী তারাগণযুতা।
আনন্দ অম্বুদকুলে বিজুরীর লতা।।

তাঁর বর্ণনা সরল, রচনা ও শ্রুতিমধুর। অনায়াস স্বচ্ছন্দ গতিতে কাব্যের কাহিনী এগিয়ে গেছে। জীবনবোধ, রসানুভূতি ও কবিদৃষ্টি রূপরামের কাব্যকে উজ্জ্বলতা দান করেছে। আত্মবিবরণীর রচনার অংশে কবি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সে সম্পর্কটি তুলে ধরেছেন তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এর মধ্যে কবির সুগভীর আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রূপরামের কাব্যে অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের মতো পৌরাণিক প্রসঙ্গ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭.৩.৪ শিবায়ন

রামকৃষ্ণ রায় ঃ খ্রিষ্টিয় সপ্তদশ শতব্দীর মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ রায় শিব বিষয়ক বিভিন্ন পৌরাণিক আর লৌকিক আখ্যান অবলম্বন করে তাঁর সুবৃহৎ শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ‘শিবায়ন’ রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত এই গ্রন্থ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত। রামেশ্বরের শিবায়নকে শিব বিষয়ক একটি কোষ-গ্রন্থ (encylopaedia) বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শিব প্রসঙ্গের এমন সুনিপুণ সংকলন বাংলাসাহিত্যে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যখানির

একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রামকৃষ্ম তাঁর কাব্যকে সর্বত্র ‘শিবায়ন’ অথবা ‘শিবেরমঙ্গল’ বলে উল্লেখ করেছেন এবং মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বপ্নাদেশে যে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছে তাও এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

‘ভারতী দিলেন উক্তি নহে মোর নিজ শক্তি
স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুগ্রহ।’

কবি তাঁর কাব্যমধ্যে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, পিতামহ রায় যশশস্ত্র মহামতি/তাঁর পদাম্বুজে মোর অশেষ প্রণতি।।/ পিতামহী বন্দি লাভ নাম নারায়নী।/সরস্বতী বন্দিলাভ তাঁহার সতিনী।।/মাতামহ বন্দিলাভ নাম সূর্য মিত্র।/ তেয়জ কুলীন। তিঁতো পবিত্র চরিত্র।।/পিতা কৃষ্ম রায় বন্দা সর্বশাস্ত্রে বীর।/যাহার প্রসাদে এই মনুষ্য শরীর।।/মাতা রাধাদাসীর চরণে দণ্ডবৎ/যাঁর গর্ভবাস হইতে দেখিল জগৎ।।/কায়স্থ দক্ষিণ রাঢ়ি বংশেতে উৎপত্তি।/ গোত্র কাশ্যপ আমার দেবতা প্রকৃতি।।/নিরাম বন্দিন্যু বস্তু রসপুর দেশ।/এতদূরে বাইরে বন্দনা হইল শেষ।।/রামকৃষ্ম দাস গান শিবের মঙ্গল/ভক্তজনে প্রভু তুমি করিবে কুশল।।

রামকৃষ্মের ‘নিবাস’ রসপুর গ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার অধীন। আমতা থেকে মাত্র তিন মাইল উত্তরে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। কবির বংশধর আজও সেই গ্রামে বসবাস করছেন। কবির পিতামহ যশশচন্দ্র পাঠান আমলে মুসলমান নবাব প্রদত্ত রায় পদবী লাভ করেন, তিনি উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এই বংশের আভিজাত্যের ধারা আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। কবি রামকৃষ্ম তাঁর নিজের পিতাকে ‘সর্বশাস্ত্রে বীর’ বলে উল্লেখ করেছেন। শিবমঙ্গল কাব্য রচনায় রামকৃষ্ম যে বিস্তৃত শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষার ফল বলে মনে করা যেতে পারে। বিষয় বৈভবের সঙ্গে সুভীগর শাস্ত্র জ্ঞানের যোগাযোগ সর্বত্র সুলভ নয়—পিতাপুত্র উভয়েই এই দুর্লভ গণের অধিকারী ছিলেন।

বিনু সমরে হর ভিখিত্র পত্র মাগিয়
গুণ গৌরব দূর নাই।।
নিরধন হয় বোলি সবে উপহাস এ
নাহি আদর অনুকম্পা।
তোঁহে শিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফল চাম্পা।
খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল
ত্রিশুল ভাঁগয় কারু ফারে।
বসহা ধুরন্ধার ছর লএ জোতিঅ
পাত্রট স্যুর সরিধারে।।
ভগই বিদ্যাপতি সুনহ মহেশর
ই জানি কইলি তুতন সেবা।
এতএ জেবরু সে বরু হোঅও
ওতএ সরণ দেবো।।[১]

অর্থাৎ 'হে শিব, বার বার তোমাকে আমি বলি, কৃষি কাজ কর। হে হর, তুমি নির্লসু না হয়ে ভিক্ষা চাও, তাতে তোমার গুণ গৌরব দূর হয়। নির্ধন বলে সকলে উপহাস করে, সমাদর কিংবা অনুকম্পা প্রকাশ করে না; হে শিব, তুমি আকন্দ ও ধুতুরা ফুল পেলে, হরি চাঁপা ফুল তোল। হে হর, খটাঙ্গ কেটে লাঙ্গল বানাও, ত্রিশূল ভেঙে ফাল কর। হে হর, ভালো দেখে (ধুরন্ধর) বৃষ নিয়ে জুতে দাও। তোমার জটায় যে গঙ্গার ধারা আছে তা দিয়ে (ক্ষেতের) পাট কর। বিদ্যাপতির বলে, শোন মহেশ্বর, এই জেনে তোমার সেবা করলাম। ইহলোকে যা হবার তা হোক, পরলোকে শরণ দিও।

৭.৩.৫ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর নামেও পরিচিত। এতে কাঞ্চীর রাজকুমার কালী উপাসক সুন্দরের সঙ্গে বর্ধমান রাজকন্যা বিদ্যার প্রেম ও বিবাহের বর্ণনা আছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবতার মতো এই কাব্যে দেবী কালিকার প্রাধান্য নেই। বিদ্যাসুন্দরের প্রেমই এর মূল বিষয়।

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রেম নিয়ে সংস্কৃতেও অনেক কাব্য, উদ্ভট কবিতা আর শৃঙ্গার রসের শ্লোক রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কাশ্মীরের কবি বিল্‌হনের 'চৌরপঞ্চাশিশ' নামে পঞ্চশী শ্লোকে গ্রথিত সুন্দরের বিদ্যারূপবন্দনা ও তীব্র প্রেম তৃষ্মার কাব্য রূপটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ধারার উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন দ্বিজ শ্রীধর ও সা বিরিদ খাঁ।

দ্বিজ শ্রীধর

গবেষকদের মতে কবি দ্বিজ শ্রীধর ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ এঁর কালিকামঙ্গলের কয়েকখানি মাত্র পৃষ্ঠা আবিষ্কার করেছিলেন। তবে তাঁর কাব্যের যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে—তাতে কালিকার উল্লেখ নেই। কবি কাব্যের মধ্যে হুসেন শাহের পুত্র শসরৎশাহ্ এবং তাঁর পু ত্র যুবরাজ ফিরুজ শাহের নাম করেছেন। ফিরুজ শাহের নির্দেশেই কাব্যটি রচনা করেছিলেন দ্বিজ শ্রীধর। কাজটি ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কাব্যটি বোধহয় পুরোপুরি রোমান্টিক ধরনে রচিত হয়েছিল, এতে কালিকার বিশেষ কোনো প্রসঙ্গ না থাকাই সম্ভব, কারণ, পাঠান সুলতানকে প্রীতির জন্য এই কাব্য রচিত হয়েছিল, সুতরাং তাতে বোধ হয় হিন্দুর দেবী মাহাত্ম্য ছিল না।

সা বিরিদ খাঁ

সা বিরিদ খাঁর তিনটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে—বিদ্যাসুন্দর, রসুল, বিজ., হাজিফা কয়রাপরী।

সা বিরিদ খাঁ-র বিদ্যাসন্দর কাহিনী সংক্ষেপে এরূপ—রত্নাবতীর রাজা গুণসার সুখে প্রজাপালন, পূজাকর্ম, দানধ্যান করেন। রানী কলাবতী ধর্মপ্রাণা ও পতিব্রতা নারী। তাঁদের দুঃখ, কোনো সন্তান সন্ততি নেই। "বিষবৎ ভবসুখ ভাবে নয়পতি/বিষাদে বিকল পুত্রকন্যা হেতু নিতি।" কলাবতী রাজাকে যাগযজ্ঞ ও ধর্মকর্ম করতে বললেন, রাজা তাই করলেন। দেবী পার্বতী কলাবতীকে পুত্র সন্তানের বর দিলেন। কলাবতী গর্ভবতী হলেন এবং যথাসময়ে পুত্র সন্তান লাভ করলেন। পুত্র সন্তানের নাম রাখা হল সুন্দর, ছেলেবেলা থেকে রাজা সুন্দরের উত্তম লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেন, দেবীর আশীর্বাদে সুন্দর বারো বছর সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠল। নানা দেশের পন্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে সুন্দরই জয়পত্র লাভ করল। বিদ্যাজয়ী সুন্দরের নাম হল বিদ্যাপতি, এরপর সে "মহেশ অম্বিকা সেবা কর এ সতত।/মহাকাব্যে বিরচিল শ্লোক পঞ্চাশত।।"

কাঞ্চিপুরের রাজা বীর সিংহ ও রানী শীলার একমাত্র কন্যা বিদ্যাবতী পাঁচ বছর বয়সে তার হাতে খড়ি হল এবং সে অল্পকালেই পাণ্ডিত্য অর্জন করল। রাজা কন্যার স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করলেন। বিদ্যাচলল "প্রতিজ্ঞা মোহর হৃদে/ যে

জিনত্র শাস্ত্রবাদে/সেই যোগ্য পতিক ভজিমু।” রাজা কন্যার প্রতিজ্ঞা শুনে দিকে দিকে ভাট পাঠালেন। মাধব ভাট রত্নাবতীতে এল সুন্দরকে বিদ্যার রূপ ও পাণ্ডিত্যের কথা বলল, সুন্দর বিদ্যাকে পাওয়ার জন্য “কক্ষে দুই পুথি/কান্ধে লই ছাতি/ধরিআ বৈদেহি বেশ। বিদ্যা অন্বেষণ/করিলা গমন/নগরে কৈলা পরবেশ।” এখানে এক মালিনীর গৃহে সে আশ্রয় নিল। মালিনী বিদ্যাকে মালা জোগায়। মালিনী প্রথমে তাকে রাজভয়ে আশ্রয় দিতে নারাজ হয়, কিন্তু সুন্দর তাকে অর্থে বশীভূত করে। মালিনীর কাছে সুন্দর বিদ্যার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে। মালিনী বলল, নানা শাস্ত্র, কাব্য ও অলংকার গ্রন্থ পাঠ করে বিদ্যা জ্ঞান অর্জন করেছে। (এরপর পুথি খণ্ডিত)

এখানে বিদ্যা কঞ্চীপুরের রাজকন্যা ভরতচন্দ্রের কাব্যে বিদ্যাকে বর্ধমানের রাজকুমারী বলা হয়েছে। এরূপে কাশ্মীরী সংস্করণের মহিলাপত্তনের বীর সিংহ তনয়া বিদ্যা বররুচির কাব্যে উজ্জয়িনী, বারিদ খানের কাব্যে কাঞ্চীপুর ইত্যাদিময় ভারতচন্দ্রের জাতে বর্ধমানের রাজ দুহিতা হয়েছে।

কবি স্বয়ং বিদ্যাসন্দর কাব্যকে নাটগীতি বলেছেন। এ শ্রেণীর রচনায় অভিনয় ধর্ম থাকে। সংলাপ ও ক্রিয়া দ্বারা তা প্রকটিত হয়। শ্রীকৃষ্ম কীর্তণের অনেক পদে এই গুণ আছে। সা বারিদ খানের কাব্যে মঞ্চ নির্দেশ পর্যন্ত আছে। কবি প্রতিটি ঘটনার সূচনায় সংস্কৃত দৃশ্য সংকেত ও রূপ সজ্জার বর্ণনা দিয়েছেন। কাব্যে উক্তি প্রত্যুক্তি আছে। সুন্দর মাধব ভাট ও সুন্দর মালিনীর সংলাপ বেশ উজ্জ্বল। সুন্দর মালিনীর শতিদীর্ঘ সংহত সংলাপ নাটকোচিত হয়েছে। অবশ্য এতে নাট্যক্রিয়ার অভাব আছে। শ্রীকৃষ্ম কীর্তণের সংলাপে নাটকীয়তা পুরো মাত্রায় বর্তমান। সংলাপের সংগীত ধর্ম সম্পর্কে যা বারিদ খানের জ্ঞান ছিল। তিনি কয়েকটি স্থলে রাগ ও ছন্দের উল্লেখ করেছেন। মালিনী সুন্দরের আলাপের অংশটি ‘দেশাগ’ রাগে রচিত হয়েছে। ‘সুন্দরের কাঞ্চিপুরে যাত্রা’ অংশ পঞ্চালি’ ছন্দে লেখা। নাট্যিক ও সংগীতিক সংলাপ থাকা সত্ত্বেও বিবৃতিধর্মঙ্গী আখ্যান কাব্যের স্বাদ নষ্ট হয়নি। কবি নাট্যকাব্য রচনা করেছেন নাটক রচনা করেননি। কাব্যের শুরুতে আখ্যানের মত সাধারণ বর্ণনা আছে। সংলাপের মধ্যে মধ্যে কবি নিজের কথা দিয়ে ঘটনা প্রসারিত করেছেন। মাধব ভাট ও সুন্দরের বাক্যালাপ শেষে কবি লেখেন—বিদ্বান কুমার বোলে তুষ্ট ভেল ভাট।/বৃষ্টি জলে যেহেন পবিত্র হত্র বাট।।/সুন্দরের বাক্য লেশ অমৃত সমাজ।/শুনিয়া মাধব ভাট শান্ত হৈল প্রাণ।” কবির এ বর্ণনা পদ্ধতি বিবৃতিধর্মী, নাটকে সংলাপ দ্বারাই কাহিনীর বিস্তার ও বিবর্তন ঘটে।

সাহ বারিদ খান ও দ্বিজ শ্রীধর একই উৎস থেকে আক্ষরিক অনুবাদ করেন, উভয়ের রচনা পাশাপাশি পাঠ করলে তা বোঝা যায়। সংস্কৃত ভাষার কোনো এক কাব্য তাঁদের রচনার উৎস চরিত্র ও ঘটনাজ্ঞাপক সংস্কৃত উদ্ধতি গুলোতে যথেষ্ট মিল আছে। সা বারিদ খাঁ-র ভাষা সংস্কৃতানুগ, বিশুদ্ধ এবং পরিমার্জিত স্থান বিশেষ ভাষার আবেগ আছে। কিন্তু গতি ও ব্যঞ্জনা তেমন নেই। খণ্ডিত পুথি দিয়ে প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় নির্ণয় করা যায় না। প্রান্ত অংশের নিদর্শন বিচার করে বলা যায়, শাহ বারিদ খানের কবিত্বে কৃত্রিমতা ছিল না।

৭.৪ বৈষ্ণব পদাবলি

নরহরি সরকার

আলোচ্য কালপর্বে বেশ কয়েকজন পদকর্তার আবির্ভাব ঘটেছে। একদিকে আছেন চৈতন্য-সমসাময়িক পদকর্তারা অন্যদিকে রয়েছেন চৈতন্য--পদকর্তারা। এঁদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁদের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

চৈতন্য-সমসাময়িক কবি নরহরি সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ হোলো—গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে/ভাবের আবেশে বাধা রাধা বলি ডাকে/সুরধনি হেরি গোরা যমুনা ভাণে/ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে,

নরহরি নিত্যানন্দের বর্ণনা করে পদ লিখেছেন। তাঁর এই নিত্যানন্দ চৈতন্যলীলা বিষয়ক পদগুলি ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। নরহরি সরকার কবি লোচন দাসের গুরু ও গৌরনাগরী সাধনার এক বিশেষ ধারার প্রবর্তক।

নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পরিবকরদের মধ্যে নরহরি সরকার ছিলেন অন্যতম। তিনি চৈতন্যদেবের জন্মের চার-পাঁচ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরনারায়ণ, মাতা গোয়ী দেবী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ। নরহরি সরকার নবদ্বীপে টোলে পড়ার সময় চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরিচিত হন। চৈতন্যের প্রিয় সহচর গদাধরও এঁর বন্ধু ছিলেন। নরহরি যে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—এ উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে। বৈষ্ণবদেব মধ্যে সুপরিচিত এই শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় গোপালমন্ত্রের পরিবর্তে গোবিন্দমন্ত্রে শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন। চৈতন্যের নরভাববৈশিষ্ট্যও এঁদের সৃষ্টি। নরহরিও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদ রচনাতেই অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে রাধা কৃষ্ণলীলা নিয়েও তিনি কিছু পদ রচনা করেছেন বলে অনুমান করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫ সংখ্যক পুঁথিতে নরহরির একটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। পদটি খণ্ডিতা নায়িকা রাধার উক্তি। যারা কৃষ্ণকে ভালোবাসে (শ্যামধন যার হিয়ায় জাগে) তাদের সাবধান করে দিয়ে রাধা বলেছেন—কেউ যদি প্রেম করতে চায়, তাহলে সুজন কুজন বুঝে যেন প্রেম করে। কারণ কৃষ্ণের প্রেম, বিষে ভরা সোনার কলস। অথচ তার মুখটি দুগ্ধ পূর্ণ। বিচার না করে যদি কেউ পান করে—তাহলে পরিণামে তাকে দুঃখ পেতে হবে। নরহরির আর একটি পদ, সাহিত্য পরিষদের ৯৬৮ সংখ্যক পুঁথিতে পাওয়া যায়। পদটি আক্ষেপানুরাগের। এখানে রাধার আক্ষেপ বিধাতার প্রতি উচ্চারিত। বিধাতার এমনই বিধান যে পৃথিবীতে কৃষ্ণকে নিয়ে রসার মত একটু নিভৃত স্থান, একটি নিভৃত রজনীও রাধার ভাগ্যে জোটে না। নরহরির রাধা শেষ পর্যন্ত বিধাতাকে বেরসিক বলে তিরস্কার করেছেন। কারণ—

> বিধি যদি রসের রসিক হত্য।
> এসব কখন করিতে দিত।।

পদকল্পতরুতে নরহরির ভণিতায় ৩৬টি পদ রয়েছে। তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ ছ'টি। পাঁচটি ঝুলনের ও একটি খণ্ডিতার সতীশচন্দ্র রায় এগুলিকে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলেই মনে করেন। গৌরপদতরঙ্গিনীতে নরহরির ভণিতায় পাওয়া যায় ৩৮২টি পদ। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোন কোনটিয়ে নরহরি সরকারের রচনা তা নিশ্চিতভাবে নিরূপিত নয়। কারণ পরবর্তী কালের কবি 'ভক্তি রত্নাকর' রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গে সরকার ঠাকুরের রচিত পদ মিশে গেছে। আমাদের ধারণা, নরহরি সরকার কৃষ্ণকথা নিয়ে অতি অল্পই পদ লিখেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ মনে করে গৌরনাগরী ভাবের উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। অতএব নিছক কৃষ্ণকতা নিয়ে তাঁর কাব্য রচনার তেমন প্রয়োজন নাও হতে পারে।

পদামৃতসমুদ্রের ২৭ পৃষ্ঠায় নরহরির একটি আক্ষেপানুরাগের পদ সংকলিত হয়েছে। এই পদে কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুলা রাধা কাতরভাবে সখীকে বলেছেন—"নিরবধি প্রাণ মোর কানুলাগি ঝুরে।' রাধার মতে, প্রেমের এই রস যে জানে না—সে ভালোই আছে। কারণ রাধার হৃদয়ে কানুর প্রেম যেন শেলের মতো বিঁধে আছে। শ্যাম অনুরাগে রধার চিত্ত আর কোনমতে ধৈর্য মানছে না। কিন্তু এই পদটিতে যে নরহরির কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কারণ পদামৃতসমুদ্র কিংবা সাহিত্যে পরিষদের ৯৮২ সংখ্যক পুঁথিতে পদটি নরহরির ভণিতায় পাওয়া গেলেও কীর্তনানন্দে পদটির ভণিতা চণ্ডীদাসের। আবার শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পদটিকে কোথাও দেখেছেন বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায়, কোথাও চণ্ডীদাসের ভণিতায়, আবার কেথায় জ্ঞানদাস ঠাকুরের ভণিতায়।

পদকল্পতরুর ৮৩৩ সংখ্যক বামকসজ্জিকার পদটি নরহরি সরকারের। এই পদে কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষামানা বাসকসজ্জিকা রাধা নারীর যৌবনকে ধিক্কার দিয়েছেন। কারণ তিনি প্রেম করেছেন শধ ব্যক্তির সঙ্গে। রাধা এই বলে

দুঃখ করেছেন, যার জন্য তাঁর প্রাণ সর্বদাই পীড়িত হয়—সে কিন্তু তাঁর দিকে ফিরেও তাকায় না। নিজেই নিজের প্রেম বাড়িয়ে তিনি পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল, উভয়কুলেরই কলঙ্কলেপন করলেন।

নরহরির আর একটি পদ মাথুর পর্যায়ের। বিরহিনী রাধার করুণ অবস্থার কথা শুনে রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ম গদগদভাবে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি নিজেই গৃহত্যাগ করে রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চললেন। যেতে যেতে বার বা কৃষ্ম তাঁর নাসা স্পর্শ করতে লাগলেন, দ্রুতবেগের খাওয়ার জন্য তাঁর নাক দিয়ে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল। তিনি চরণের মণিনূপুরের কথা ভুলে গেলেন। তাঁর অলঙ্কার খুলে পড়তে লাগল, মাথার চূড়াও খুলে যেতে লাগল। গভীররাত্রে রাধার গৃহে চন্দনের গন্ধে দশদিক আমোদিত হল। এবং—

লালস দরশ   পরশে দুহুঁ আকুল

চিরদিনে মিলন কুঞ্জে।।

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রসাধন ও গৃহকর্ম অসমাপ্ত রেখে ভাগবতের গোপিনীরা পথে বেরিয়েছেন। কিন্তু চৈতন্যসমসাময়িক এই কবির পদে কৃষ্ণই বিপর্যস্ত ব্যাকুলতায় রাধার জন্য পথে নেমেছেন।

মুরারি গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত শ্রীকৃষ্ম চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই গ্রন্থটি প্রথম চৈতন্য জীবনী, কিন্তু এছাড়াও তিনি শ্রীচৈতন্যের লীলা সম্বন্ধে অন্তত দুটি পদ রচনা করেছিলেন। গৌরপদ তরঙ্গিনীতে মুরারি গুপ্তের একটি বিখ্যাত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়—সকি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোহে/জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া/বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে।। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তিনি শ্রীচৈতন্যের বয়ো-জ্যেষ্ঠ ও সহপাঠী ছিলেন। শ্রীহট্টের বৈদ্যবংশ সম্ভূত মুরারি ধর্মমতে রাম উপাশক ছিলেন। এই কবির রচিত অল্পকিছু রাধাকৃষ্ম লীলা বিষয়ক পদও পাওয়া যায়। বিশেষত তাঁর আপেক্ষানুরাগের একটি পদ অবিস্মরণীয়। কৃষ্মপ্রেমোন্মাদিনী রাধা ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। সখী এসেছেন তাঁকে ফেরাতে। কিন্তু রাধা তাঁকে বললেন তিনি আর ঘরে ফিরবেন না। তাঁকে বললেন তিনি আর ঘরে ফিরবেন না। তাঁকে ফিরে যাওয়ার যুক্তি দেওয়া বৃথা। প্রেম করে তিনি যে সব বিসর্জন দিয়েছে, এমনকি নিজের অহংবোধকে পরিত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণের মোহন রূপ তাঁর নয়নের পুতুল, তাঁর হৃদয়ের মাঝখানে সযত্নে রাখা প্রাণ। আর রাধা তাঁর প্রেমের আগুনে জাতি, কুল, শীল এবং অভিমান সব পুড়িয়ে ফেলেছেন। যারা মূঢ়, জীবনে যারা প্রেমের আস্বাদ পায়নি, তারা নানা কথা বলে, কিন্তু রাধা তাদের কথা কানেও তোলেন না। ‘স্রোত বিথার’ প্রেমের নদীতে রাধা তাঁর শরীর ভাসিয়েছেন, সুতরাং ‘কি করিবে কুলের কুকুরে?’ করি মুরারি গুপ্ত পদের শেষে এই অনন্য সাধারণ প্রেম সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেছেন—‘পিরিত এমতি হৈলে/তাঁর গুণ তিনলোকে গায়।’ মুরারি গুপ্তের রাধা চণ্ডিদাসের রাধার মতোই ‘জাতিকুল শীল অভিমান’ বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা যেখানে লোক গঞ্জনার দায় এড়ানোর জন্য মৃত্যুবরণ করতে চান, সেখানে মুরারি গুপ্তের রাধা কুলাচার ও লোকাচারকে দৃপ্তভাবে তুচ্ছ করেছেন। জীবনেই মৃত্যুকে আহ্বান করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন এবং তাঁর প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখাকে কালজয়ী করে তুলেছেন।

গোবিন্দ মাধব ও বাসু ঘোষ

গোবিন্দ ঘোষ মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ—এই তিন ভ্রাতাই মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাঁর কৃপাধন্য। এঁরা তিনজনেই ছিলেন কীর্ত্তনিয়া ও কবি। কৃষ্মদাস কবিরাজ বলেছেন, মহাপ্রভু এঁদের কীর্ত্তন শুনে নৃত্য করতেন, তিনজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ ঘোষের কোন কৃষ্ম লীলা বিষয়ক পদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

কিন্তু গোবিন্দ ঘোষের গৌরাঙ্গ লীলার পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্য প্রথমবার বিবাহের পর যখন পূর্ববঙ্গে যান, তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্লিষ্ট গোবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন—গোরা গেল পূর্ব্বদেশ—নিজগান পাই ক্লেশ।/বিল পয়ে কত পরকার।/কান্দে দেবী লক্ষ্মী প্রিয়া শুনিতে হিয়া/দিবসে মানয়ে অন্ধকার/পুন সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ/এখন পরান যদি রহে।।

কবি শুধু শ্রী গৌরাঙ্গে সঙ্গেই নয় তাঁর জননী শচীদেবী ও শচীদেবীর সখী শ্রীবাস পত্নী মালিনী দেবী সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষের মোট সাতটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে সন্ন্যাসের ঘটনা নিয়ে লেখা দুটি পদ। এই দুটি পদের একটি মর্মস্পর্শী অথচ গভীর আন্তরিকতায় যথার্থ কবিতা হয়ে উঠেছে—হেদে রে নদীয়া বাসী কার মুখ চাও।/বাহু পাসরিয়া গোরা চাঁদের ফিরাও।/ তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে। কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।

মাধব ঘোষেরও সাতটি পদ পদকল্পতরুতে আছে। তার মধ্যে চারটি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসজীবন নিয়ে আর তিনটি শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে। এই তিনটির মধ্যে ত্রুটি হল শ্রীকৃষ্ণের স্নান যাত্রার পদ। গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপও মাতা যশোমতীর আনন্দ বাড়িয়ে তুলেছে। কারণ এখন তিনি মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাতে পারবেন। যশোমতীর জননী হৃদয়ের স্নেহ আর তারই সঙ্গে সম্পন্ন গোপগৃহের সন্তানের জন্য স্নানের আয়োজন যেন চোখের সামনেই ঘটে যাচ্ছে মনে হয়। মাধব ঘোষের এই চিত্ররচনার কৃতিত্ব অন্য একটি পদেও প্রকাশিত হয়েছে। পদটি রাধাকৃষ্ণের মিলনান্তিক রসালসের। মাথুরের পদে দূতী মাধবের কাছে গিয়ে দশমী দশায় উপনীতা বিরহাতুরা রাধার করুণ বর্ণনা দিয়েছেন। রাধা এত ক্ষীণ হয়ে গেছেন যে ওঠার চেষ্টা করে উঠতে না পেরে তিনি কাতর হয়ে সখীর মুখের দিকে তাকান। আবার কখনও কৃষ্ণের মুখ মনে করে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন। কখনও মথুরাগামী পথিকের চরণ ধরে ক্রন্দন করতে থাকেন। এখন কোনোমতে রাধার শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে। তাই দূতী কৃষ্ণকে সকাতরে অনুরোধ করেছেন—

একবেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এদুহু পদ দরশাই।।

মাধভ ঘোষের এই স্বল্পসংখ্যক পদেরও মূল বৈশিষ্ট্য নিরাভরণ আন্তরিকতা।

বাসুদেব ঘোষ ছিলেন নবদ্বীপে নিমাই-এর মুখ্য কীর্তনিয়া বা প্রধান গায়েন। গৌরাঙ্গ বিষক পদ কর্তা হিসেবেও তিনি তিন ভ্রাতার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁর পদের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন—

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।।

বাসুঘোষ নিতান্ত দু-একটি কথায় শচীমাতার আর বিষ্ণুপ্রিয়ার অপরিসীম দুঃখের যে বর্ণনা দিয়েছেন—তা নিঃসন্দেহে তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। নিমাই গৃহত্যাগ করেছেন শুনে শচীদেবী—

আউদড় কেগশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা।

অন্যদিকে তরুণী বিষ্ণুপ্রিয়া একটি মাত্র কথায় তাঁর গভীর বেদনার কথা জানান—

শয়ন-মন্দিরে ছিলা নিশিভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।

বাসু ঘোষ এরপর তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন—

গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে।

নদীয়ার নারীরা মন্তব্য করেছেন—

আমরা পরের নারী পরান ধরিতে নারি
কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া।

রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়েও কয়েকটি পদ ইনি রচনা করেছেন। আক্ষেপানুরাগের একটি পদে তিনি রাধার প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। রাধা বলেছেন না জেনে শুনে কৃষ্ণের সাথে প্রেম বাড়িয়ে এখন আষাঢ় শ্রাবণ মাসের মেঘ বর্ষনের মতো তাঁর চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে। পাকানো পাটের দড়ি আগুনে পুড়ে গেলে তার বাইরের আকার ঠিক থাকে আর ছুঁয়ে দিলেই ঝরে যায়। আজ মনের আগুনে পুড়ে রাধাও সেই অবস্থাতেই রয়েছেন। এঁদো পুকুরে মাছ নিঃশ্বাস নিতে জায়গা পায় না—তেমনি করে কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনও রাধার জীবন ধারণের পক্ষে দুঃসহ। কৃষ্ণের প্রেম যেন ডাকাতের প্রেম। সবলে সমস্ত লুণ্ঠন করে নিয়ে রাধাকে নিঃস্ব রিক্ত করে ফেলে গেছে। পদটি অনুভূতির আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। অনুভূতির অকৃত্রিম উত্তাপকে রূপ দিতে গ্রাম জীবনের কতগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবি অলঙ্কার ও চিত্রকল্প নির্মিততে কাজে লাগিয়েছেন। পাকানো পাটের দড়ি, এঁদো পুকুরের মাছ ও ডাকাতিয়া পীরিতি কবির বাস্তব জীবনাভজ্ঞিতা সজ্ঞাত রূপনির্মিতি।

বর্ষাভিসারিকা রাধার অনুভবে কৃষ্ণ মিলনের ঔৎসুক্য বর্ণিত হয়েছে এই কবির একটি পদে। আকাশে নবীন মেঘ দেখে রাধার চিত্ত আনন্দে নেচে উঠেছে। তিনি মেঘকে সম্বোধন করে বলেছেন—মেঘ যেন বর্ষন করে, তাহলে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মিলন হবে। বৃষ্টি যেন অল্প অল্প অথচ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় (বরিষ মন্দ ঝিমানি)। তাহলে রাধা সুখে রাত্রিযাপন করবেন। দাদুরি দুন্দুভি বাজারে আর ময়ূরীর সুর শোনা যাবে। এই পদটি যেন বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহের পদের পরিপূরক। সেখানে রাধা প্রকৃতির উতরোলমত্ত আনন্দের মাঝখানে নিজের বিরহ বেদনাকে স্থাপিত করেছেন, আর এখানে একই পরিবেশে রাধা ভাবী মিলনের আনন্দে অধীর। পদটির পরিবেশ বিদ্যাপতিরই। কিন্তু 'মন্দ ঝিমানি' বৃষ্টির জন্য রাধার বাসনা তাঁকে যেন বাংলাদেশেরই একটি মেয়ের গূঢ় আকঙ্ক্ষার গভীর ডুবিয়ে দিয়েছে।

দানলীলা নিয়েও বাসু ঘোষ পদ বা পালা রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করি। কিন্তু অখণ্ড পালাটি পাওয়া যায় নি। পদ কল্পতরুতে এর একটিমাত্র ছিন্ন পদ (পদ সংখ্যা ১৩৬৯) আমরা পাই। এই পদেও বাসু ঘোষ কৃষ্ণ কথাকার রূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাধা দাসীদের মাথায় চাপিয়ে মথুরার হাটে দধি, দুগ্ধ বিক্রয় করতে চলেছেন। শ্রীরূপ ও রঘুনাথ গোস্বামীর দানকেলি কৌমুদী ও দান কেলিচিন্তামণি নামের দুটি নাটকে এই ধরনের বর্ণনা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাসু ঘোষ যে সময়ে কাব্যরচনা করেছিলেন, তখনও বাংলাদেশে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর পুস্তকাদি এসে পৌছায় নি।

বাসু ঘোষের একটি পদে রাধা কৃষ্ণের কথা বলতে বলতে এবং কৃষ্ণের প্রেমে আকুল হয়েই পথ চলেছেন। আর তখনই সামনে কৃষ্ণকে দেখে অবাক হয়ে বলেন—কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।/তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে।। রাধার এই মুগ্ধতা জড়িত বিস্ময়টুকু পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই পদগুলি ছাড়াও বাসুদেবের ভণিতায় একটি পুঁথিও পাওয়া গেছে। পুঁথিটিতে পরপর কয়েকটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কাহিনী সুবল সংবাদ। দ্বিতীয় কাহিনী ননীচুরির। তৃতীয় কাহিনী ভান পূজা। চতুর্থ কাহিনীটি মনের। পঞ্চম কাহিনীটি নৌকালীলার। অবশ্য পুঁথিতে লেখা রয়েছে 'দানখণ্ড'। নৌকালীলার কাহিনীটি গতানুগতিক, শেষ কাহিনীটি দূতী সংবাদ।

শিবানন্দ সেন

বৈদ্যকুলজাত শিবানন্দ একজন সম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে শিবানন্দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।/প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ প্রতিবর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।/নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া।।

কবিকর্ণপুর শিবানন্দ সেনেরই কনিষ্ঠপুত্র। পদ কল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মতে 'শিবাই' নামের কবি আসলে পৃথক কেউ নন, শিবান্দের সংক্ষিপ্ত নাম শিবাই। শিবানন্দ সেনের তিনটি পদকল্পতরুতে তিনটি পদ পাওয়া যায়। দুটি গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক ও একটি মাথুর বিরহের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুঁথিতে শ্রীরাধার বংশী শিক্ষার একটি চমৎকার পদ আছে। রাধা কৃষ্ণেরই অনুকরণে ত্রিভঙ্গ হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন। অনভিজ্ঞা রাধার হাতে বাঁশি কখনও বাজে, কখনও বাজে না। কৃষ্ণই রাধার অধরে বাঁশিটি ধরে রয়েছেন। কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাকে বংশী শিক্ষাদান রাধাকৃষ্ণ প্রেমেরই কৌতুক তরল একটি দিক। এছাড়াও এই কবি রচিত রাধার আক্ষেপানুরাগ এবং বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের পুন-মিলনের একটি পদ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ প্রেমের সমর্পিত রাধার লোকনিন্দার জন্য বেদনা এবং বন্দাবনে মিলনের ব্যাকুল আনন্দ এই পদদুটিতে ফুটে ফুটে উঠেছে। শিবানন্দের সঙ্গে শিবাইকে যদি অভিন্ন ধরা হয়, তাহলে আরও কিছু কৃষ্ণলীলার পদ এই কবির রচিত বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার তিনটি পদ এই কবির রচনা হিসেবে পাওয়া যায়। একটি পদে নন্দের জননীর উল্লেখ আছে—'নন্দের জননী নাচে বুড়িয়ারে' অন্য একটি পদে পৌর্নমাসীর প্রসঙ্গ শ্রীরূপ গোস্বামীরচিত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। গোষ্ঠলীলার পদগুলি গতানুগতিক।

রামানন্দ বসু

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচয়িতা মালাধর বসু পদাবলিকার রামানন্দের পিতামহে, মতান্তরে পিতা শ্রী গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে থাকাকালীন রামানন্দ বসুর সহচর ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'বসুদেবসুও কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' লিখে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন—এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত? /তোমার কা কথা তেমার গ্রামের কুক্কুর/সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর।

রমানন্দ বসুর ভণিতায় পদকল্পতরুতে সাতটি পদ আছে। এর মধ্যে একটি নবদ্বীপ লীলায় গৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ বিরহের, একটি সন্ন্যাস শ্রীচৈতন্যের ভাব বর্ণনা, একটি নিত্যানন্দের নৃত্য বর্ণনা আর চারটি পদ শ্রীকৃষ্ণলীলার পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, কুঞ্জভঙ্গ ও যুগলমিলন বিষয়ক।

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন রামান্দ বসু।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও সখ্যরসের পদরচনায় ও রামানন্দ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রামানন্দ রচিতশ্রীধারার পূর্বরাগের একটি পদে রাধা স্বপ্নেশ্রীকৃষ্ণের দেখা পেয়েছেন। শ্রাবণ রজনীর বর্ষণসজল মোহময় অন্ধকারের পটভূমিতে বিস্রস্তবাসা শ্রীরাধার কাছে স্বপ্নে এসেছেন এক শ্যামল পুরুষ। রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের সঙ্গ পাওয়ার বাসনা এইভাবেই স্বপ্নে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পদটিতে রাধার মধুর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে হতাশা জড়িত বেদনা বড় চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শ্যামল পুরুষ স্বপ্নে রাধাকে চুম্বন করে প্রেমধন ভিক্ষা করেন। জেগে উঠে রাধা কাঁপতে কাঁপতে দেখেন, তাঁর স্বপ্ন স্বপ্নই, সত্য নয়। তখন—আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর/কহিলে কে যায় পরতীতি।।

স্বপ্নের মধ্যেই রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম নিবেদনে বিশেষত্ব রয়েছে—আপনা করেয় পণ সবে মাগে প্রেমধন/বলে কিন যাচিয়া বিকাই। রাধার স্বপ্নে দেখা এই শ্রীকৃষ্ণ রামানন্দের চোখে দেখ শ্রীচৈতন্য। যিনি প্রেমধন মেগে বেড়ান সবার কাছে, আর তার বিনিময়ে নিজেকে সেধে সেধে বেচে দেন।

স্বপ্নে নায়কের দেখা পাওয়ার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু পাওয়া যায়। কবি বসুকল্প রচিত একটি একটি শ্লোকে নায়কের প্রতি নায়িকার অনুরাগ বর্ণনা করতে গিয়ে দূতী বলেছে, স্বপ্নে তাঁকে দেখতে পেলে হরিণ নয়ন। নায়িকার শরীর ঘন রোমাঞ্চে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। আর প্রচুর ঘর্মজল যেন তাকে স্নান করিয়ে দেয়। (নায়ককে) জোরে টানতে গিয়ে স্খলিত বলয়ের ঝঙ্কারে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তারপর অনবরত চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে।

মান ও মাথুর পর্যায়ে রামানন্দের পদগুলি গতানুগতিক। তবুও সব মিলিয়ে বলা যায়, চৈতন্য সমসাময়িক ভক্ত কবি হিসেবে রামানন্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও তাঁর পদাবলিতে কৃষ্ণকথা গতানুগতিকতা মধ্যেও কিছুটা বৈচিত্র্য লাভ করেছে।

বংশীবদন

বংশীবদন জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়া পাহাড় গ্রামে। ১৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দের চৈত্র মাসে বাসন্তী পূর্ণিমার দিনে কবির জন্ম হয়। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি রত্নাকারে উল্লেখ আছে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কিছুদিন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষকরূপে তাঁর বাড়িতে থাকতেন। গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ক পদ ইনিই রচনা করেছেন। এঁর গৌরাঙ্গলীলার বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়, প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতাকে কবি তাঁর পদগুলিতে রূপ দিতে পেরেছেন। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলিতেও কখনও কখনও কবি মৌলিকত্ব দেখাতে পেরেছেন। এবং কথা অংশেও বৈচিত্র্য এনেছেন। সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই তিন প্রকারের পদই ইনি সমকৃতিত্বের সঙ্গে রচনা করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের পরিকর এই কবি গৌরাঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করে যে পদ লিখেছেন তা তাঁর ভণিতা থেকেই বোঝা যায়। চৈতন্যজীবনীর উপাদান হিসেবেও তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ খুবই মূল্যবান—

নির্দ্দয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
বাহির নদীয়া মাঝ।
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে
বংশী গড়াগড়ি যায়।

বংশীবদন কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, গোষ্ঠলীলা পূর্ব অনুরূপ পর্যায়ের পদ রচনা করেন। তাঁর নৌকাবিলাসের কয়েকটি পদও পাওয়া যায়। এছাড়া শ্রীরাধার আপেক্ষানুরাগ শ্রীরাধার অভিসার, রাধার মান ও মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণকর্তৃক নারীবেশধারণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক পদ বংশীবদনের নামে পাওয়া যায়।

বলরাম দাস

বৈষ্ণব পদাবলিতে চৈতন্যপরবর্তী কবি হিসেবে বলরাম দাস তাঁর নিজস্বতায় দীপ্ত কবিসত্তা। কিন্তু এঁকে নিয়েও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের সেই মহাকাব্যের যুগ থেকেই দেখা যায়, ব্যাস-বাল্মীকির

ছত্রছায়ায় বহু অজ্ঞাতনামা স্রষ্টা তাঁদের সাহিত্য কীর্ত্তির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করে গেছেন। অনুরূপ মন্তব্য করা যায় কালিকাদের ক্ষেত্রেও।আর বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাস, কাশীরামের রামায়ণ মহাভারতের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং আমাদের আলোচ্য বলরাম দাসের ক্ষেত্রেও অনরূপ ব্যাপার ঘটেছে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক বলরাম ও বলরামদাসের নাম পাওয়া যায় কিন্তু এরা সবাই আলাদা লোক ছিলেন বলে মনে হয় না। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় নিত্যানন্দ প্রভুর গণ, একজন বলরাম দাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—সঙ্গীতকারক বন্দো বলরাম দাস/নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস।। নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেছেন—বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদী/নিত্যানন্দ নামে হয় অধিক উন্মাদী।

কাটোয়া এবং খেতুরির উৎসবে সম্মানিত অতিথিদের তালিকায় একজন বলরাম দাসের উল্লেখ আছে। মনে হয় ইনিই সেই ব্যক্তি। এই বলরাম দাস নিত্যানন্দের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের বাসস্থান কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ দোগাছিয়া গ্রামে গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য-এই নিয়েও সংশয় আছে। এঁর বংশধর শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার দোগাছিয়া গ্রাম থেকে বলরামের দু একটি উৎকৃষ্ট বাৎসল্য রসের পদ আষ্কিার করেছিলেন। এই পদগুলো সর্ব প্রথম পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীশ চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়। বলরাম দাসের গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা থেকে মনে হয়, তিনি বাৎসল্য রসের মাধ্যমেই কৃষ্ণ উপাসনা করতেন, বাৎসল্য রসই তাঁর পদাবলিরও মুখ্য উপজীব্য ছিল। এছাড়া আরও কয়েকজন বলরাম দাসেরও নাম পাওয়া যায়।

ড. সুকুমার সেনের মতে পদাবলিকার হিসেবে দুজন বলরামের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। একজন বলরামদাস বাংলায় পদ লিখেছেন এবং তিনি প্রাচীনতর। আর একজন ব্রজবুলিতে পদ লিখেছেন, তিনি গোবিন্দদাসের পরবর্তী। আমাদের আলোচ্যকবি প্রাচীনতর বলরামদাস। বলরাম দাসের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি ও সহজ সরল ও আন্তরিক। জননী শচীর বেদনাকে তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী রূপ দিয়েছেন তাঁর পদে—এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি/ঘরে ঘরে যাবে ভিক্ষা মাগি।/জীয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়/করে বোলে হইলা বৈরাগি।।/ গোরা চান্দের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে/আর তাহে শচীর করুণা/কহে বলরাম দাস গোরা চান্দের সন্ন্যাস/জগভরি রহিল ঘোষণা।

কিন্তু বলরাম দাসের সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বাৎসল্য রসের পদ রচনায়। শ্রীরূপ তাঁর 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে' শ্রীকৃষ্ণের বয়সকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত কৌমার, দশ বছর বয়স পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোর। বলরাম দাস কৃষ্ণের কৌমার বয়স থেকে কৈশোর বয়সের বিভিন্ন লীলার বর্ণনা করেছেন। এই কৃষ্ণলীলার অবলম্বন সখ্য ও বাৎসল্য রস। সখ্য রসের বর্ণনায় শ্রীরূপ বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলেও পদাবলি সাহিত্যে এর প্রভাব খুব একটা পড়ে নি। তার কারণ শ্রীরূপ নিজে এর উদ্ভাবয়িতা হলেও মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন এই কারণেই গোড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তারাও সখ্যরসকে গৌন করে ফেলেছেন। তবুও যে, সখ্যরস নিয়ে কিছু রসোত্তীর্ণ পদ রচিত হয়েছে, তার মূলে নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ নদীয়ায় অনেক সময়ই গোষ্ঠলীলার অনুষ্ঠান করেছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তাঁর শিষ্য পদকর্তারা সখ্য রসের পদরচনায় অগ্রসর হয়েছেন। পুরুষোত্তম, সুন্দর দাস ও বলরাম দাস এর দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণের জন্ম সময় অর্থাৎ কৌমার কাল থেকেই বলরাম দাস বাল্যলীলার পদ রচনা করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে কৃষ্ণের জন্মোৎসব বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্য পরবর্তী কবিরা এটিকে অনুসরণ করে নন্দোৎসব বর্ণনা করেছেন। বলরাম দাসও তাই করেছেন।

নিজ গ্রামে বালগোপাল মুর্তি প্রতিষ্ঠাতা গোপাল পূজারী বলরাম দাস, তাঁর পদাবলি চর্চায়ও বাৎসল্যের নিপুণ রূপকার। বালক কৃষশ্ণ ও জননী যশোদার স্নেহে, আবেগে, অভিমানে, কৃষ্ণের বাল্যকালীন নানা মধুর চাপল্যে তাঁর

পদগুলি অমৃতরস সিঞ্চিত। বলরামের বাৎসল্যের পদগুলিতে কৃষ্ম অথবা যশোদার মধ্যে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ বিন্দুমাত্র নেই। বন্দাবনের নয়, যেন বাংলা দেশেরই পারিবারিক পরিবেশের আবেষ্টনীতে মাতা ও সন্তানের চিরকালীন মমত্ব বিজড়িত সম্পর্কে সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য কবির কাব্যপটে উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ তুলিতে আঁকা।

বালক কৃষ্মকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা যান গৃহকাজে। ঘুম ভাঙার পর ক্ষুধাতুর কৃষ্ম মায়ের কাছে আহার প্রার্থনা করে। আর একটু দেরি হলেই মন্থন দণ্ড ভেঙে ফেলবে বলে। দুরন্ত দামাল ক্ষুৎকাতর শিশু এবং সেই সঙ্গে এক গৃহকর্মবিব্রতা জননীর ছবিই এখানে ফুটে উঠেছে। 'দধি মন্থন ধ্বনি/শুনইতে নীলমণি/আওল সঙ্গে বলরাম' শীর্ষক পদটিতে দেখা যায় দধি-মন্থনের ধ্বনি শুনেই বালক কৃষ্ম বলরামের সঙ্গে মায়ের কাছে চলে আসে। মা যশোদা শিশুকে বলেন, তিনি গোপালকে ক্ষীর ননী দেবেন, কিন্তু আগে তাকে মায়ের সামনে নাচতে হবে। মায়ের কথা শুনে—নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি/কর পারি নবনীতে মাগে।।

এই শিশু কৃষ্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা অথবা ঐশ্বর্যভাব আরোপের কোন চেষ্টাই কবি করেননি। রানী পুত্রের দু-হাতে নবনী ভরে দিলেন, সে খেয়ে নাচতে লাগল। সেই নৃত্য দর্শনে মায়ের মনেও আনন্দের সঞ্চার হল। তিনি মন্থন দণ্ড ছেড়ে সঘনে করতালি দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, রোহিনীকে ডেকে তাঁর পুত্রের নাচ দেখাতে লাগলেন। এমন অকৃত্রিম বাৎসল্যের চিত্র সমগ্র পদাবলি সাহিত্যেই দুর্লভ।

আবার কখনও ননী চুরি করে খাওয়ার জন্য জননী গোপালকে শাস্তি দিলে, অভিমানী বালক নন্দরাজার সামনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে—না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে/মা হইয়া বলে ননীচোরা।। গোপাল এই দুঃখের মধ্যেও নিজের দোষ স্খলনে তৎপর। বলরামই ননী খেয়েছে। অথচ মা তার নামে দোষ দিচ্ছেন। রানী ভালোমন্দ কিছুই বিচার করলেন না। অন্য মায়ের ছেলেরাও কত ননী খায়, কিন্তু অন্য কোনো মা-ই ছেলেকে এভাবে বেঁধে রাখে না। বালক কৃষ্মের আত্মসম্মান বোধও বড় তীব্র। রানী তাঁকে ছাঁদন দড়িতে বেঁধে রেখেছেন। তাই দেখে—"আহীরা রমনী হাসে দাঁড়াইয়া চারিপাশে" এই দুঃখ কৃষ্ম সহ্য করতে পারবেন না, তিতিন তাই তাঁর অঙ্গের সব অলঙ্কার খুলে নিতে বলেছেন। এই দুঃখে তিনি যমুনা নদী পার হয়ে চলে যাবেন। মা যশোদা পরের সন্তান পেয়েই তাঁর ওপর এত অত্যাচার করছেন। বালক কৃষ্মের এই অশ্রুসজল অভিমানস্ফুরিত বাক্য বড় মধুর ও চিত্তাকর্ষক। শিশু মানসের এমন বাস্তব রূপায়ণ বলরামের গভীর অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের সত্যতাই প্রমাণ করে। কিন্তু 'পরের ছাওয়াল পাইয়া" কথাটিতে এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে যেন শিশু কৃষ্ম তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানেন। এটুকু না থাকলে পদটির কাব্যসৌন্দর্য আরও গভীর হতো।

বলরামের গোষ্ঠলীলার পদেও বালক কৃষ্ম ও জননী-যশোদার পারস্পরিক মাধুর্যময় মমতার ছবি। কৃষ্ম গোপ বালক, বংশানুক্রমিক বৃত্তির প্রয়োজনেই তাঁকে অন্যান্য গোপ বালকদের সঙ্গে গোষ্ঠে যেতে হবে। কিন্তু পুত্রকে গোষ্ঠে পাঠাতে জননী যশোদার মন চায় না। নাা বিপদের আশঙ্কা করে পুত্রের ভাবী বিরহ দুই-ই জননীর মনকে ব্যাকুল করে তোলে। তাই একজনের ওপর দায়িত্ব দিয়ে মায়ের মন নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। বলরাম কৃষ্মের মতোই শিশু। তবু সেই বালকের হাতেই কৃষ্মের ভার দিয়ে জননী যশোদা যেন নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চান। কৃষ্মকে নিয়ে মায়ের আশঙ্কার শেষ নেই। তাই মা বলেন—'কত জন্মভাগ্য করি আরাধিয়া হরগৌরী/পাইলাম এ দুখ পাসরা/কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে/বনে যাও এ দুগ্ধ কোঙরা।।' বলরাম দাসের বাৎসল্য রসের পদে প্রধান চরিত্র দুটি—স্নেহ বিমুগ্ধা জননী যশোদা আর মাতৃস্নেহ সিঞ্চিত বালক কৃষ্ম। পটভূমিতে বলরাম জননী রোহিনী, বলরাম শ্রীদাস সুদাম প্রভৃতি চরিত্র। বলরাম দাসের পদগুলিতে গভীরতা সব সময় প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু আমাদের মনকে এক স্নিগ্ধ অনুভূতিতে ভরে দেয়। মা আর সন্তানের যে সম্পর্ক শাক্ত পদাবলিতে চিত্রিত, তার বিপরীতে আছে নিষ্ঠুর সমাজের বিধিবিধান; সমাজ তার বিধি বিধানে জননী হৃদয় থেকে সেখানে রক্ত ঝরায়। তাই শাক্ত পদাবলির মাতৃহৃদয়ের বেদনা একটা জায়গায় আর পারিবারিক গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। দেশকাল নির্বিশেষে নানা বিচিত্র বিধিবিধানের যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত

অসংখ্য মানুষের আর্তনাদের সঙ্গে মিশে যায়। আর অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলির জননীর বাৎসল্য দেশকাল নির্বিশেষে হলেও বিশেষ করে বাঙালি পরিবারের মাতা ও সন্তানের সহজ স্বাভাবিক প্রাত্যহিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর মাধুর্য, এর স্নিগ্ধতাকে আমরা দেখেও দেখি না। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলি কারগণ অভ্যাসের তুচ্ছতায় আকীর্ণ এই বাৎসল্যকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। মমতার স্নিগ্ধ তুলি বুলিয়ে যেমন করে বহু পরবর্তীকালের বিভূতিভূষণ আর জীবনানন্দ রূপসী বাংলার অবহেলিত অজস্র রূপসম্পদকে এক স্নিগ্ধ সুষমায় অভিষিক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বলরাম দাসের পদে এই বাৎসল্য বর্ণনায় যেন অনায়াস মাধুর্য নির্গলিত। সেই মাধুর্যের প্রকাশ জননী যশোদার উদ্বেগে, চঞ্চল বালকের অজস্র অসঙ্গত আচরণ সত্ত্বেও তার প্রতি সশঙ্ক স্নেহে। কৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে ফিরে এলে মা যশোদা প্রথমেই অনুযোগ করে বলেন—

নন্দদুলার বাছা যশোদা দুলাল।/এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল।।

সন্তানকে বাইরে পাঠিয়ে সারাদিন যে তীব্র উদ্বেগে মায়ের কেটেছে, সেই উদ্বেগ আর উদ্বেগমুক্তির আনন্দ—দুটিই যেন এই অনুযোগে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে জননী যশোদার াহত মাতৃত্বের অভিমানও পরোক্ষ ভাবে ফুটে উঠেছে। যে ছেলে মায়ের 'বসন ধরিয়া হাতে' মায়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সেই ছেলে এতক্ষণ মাঠে কাটিয়ে এল কি করে? যশোদার এই অনতিস্ফুট অভিমান এক মর্তমানবীর স্নেহগৌরব সচেতনতাকেই প্রকাশ করেছে।

বাঙালী কবি বলরাম দাসের আঁকা এই জননী যশোমতী একান্তভাবেই এক বাঙালী মা। স্বামী-সন্তান, স্বজন পরিজনে ঘেরা তাঁর একান্ত মমতায় গড়া সংসারের সীমাতেই তাঁর প্রাত্যহিক দিন যাপন।। তিনি সীমা স্বর্গের ইন্দ্রানী। এর বাইরে কোন বড় আদর্শ, কোনো মহৎ ভাব, সন্তানের কোন মহৎ কীর্তির ঔজ্জ্বল্য তাঁকে স্পর্শ করে না। তাই সন্তানকে বাইরে যেতে না দিয়ে উপায় নেই জেনেও তিনি তাকে স্নেহাঞ্চল ছায়ায় ঘিরে রাখতে চান। অথচ মহাকাব্যকার বাল্মীকির আঁকা জননী সুমিত্রা। সপত্নী পুত্র রামের সঙ্গে বনবাসে যেতে ইচ্ছুক একমাত্র পুত্র লক্ষণকে বাধা তো দেনই নি, বরং বলেছিলেন—

এষ লোক সতাং ধর্মো সজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ। এখানে শেষ নয়, তারপরও—'সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তাম।" সুমিত্রা বারবার লক্ষ্মণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বনে যেতে বললেন। অন্যদিকে মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও আমরা অলর্ক জননী মদালসাকে দেখেছি, যিনি পুত্রকে ধর্মমার্গ গ্রহণ করে সংসার ত্যাগী যোগী হওয়ার উপদেশ দেন। মহাকাব্যের এই মহীয়সী জননীরা তাঁদের চরিত্রের মহান আদর্সে উজ্জ্বল কিন্তু আমাদের দূরবর্তিনী। অন্যদিকে জননী যশোদা আমাদের পরিচিত গৃহাঙ্গনের একান্ত আপন এক মাতৃমূর্তি।

বাৎসল্য রসের মত সখ্যরসের পদরচনায় ও বলরাম দাস কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'নটবর নব কিশোর রায়' পদটিতে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার সঙ্গে মধুর রসের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ছন্দেও অভিনবত্ব আছে। বলরাম দাসের বাল্যলীলা বর্ণনায় একটি কালিয়া দমনের পদও আছে। পদটিতে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ কালীয় দমনের জন্য জলে ডুব দিয়েছেন। তাই ব্রজবাসী সমস্ত মানুষ ও পশুপাখী কৃষ্ণের মৃত্যু আশঙ্কা করে হাহাকার করছে। কবি বলরাম, ভণিতায় সবাইকে প্রবোধ দিয়ে স্থির থাকতে বললেন। চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলি সাহিত্যে, বাৎসল্যলীলার পদ যেমন ছিল না, তেমনি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশক এই সমস্ত লীলার আভাস থাকলেও এগুলিকে নিয়ে পদ রচিত হয় নি। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগে ঐশ্বর্যে মাধুর্যে বিমিশ্র কিছু কিছু পদ দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বলরামদাস যে পদগুলি রচনা করেছেন, তাতে পরিকল্পনার মৌলিকতা খুব একটা নেই। কিন্তু নিতান্ত সহজ ভাষায়, নিরাভরণ ভঙ্গীতে তিনি তাঁর পদগুলির মধ্যে মাধুর্যের সঞ্চার করতে পেরেছেন। সারল্যস্নিগ্ধ এই পদগুলিতে কবির হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হয়ে এগুলিকে আধুনিক পাঠকেরও মনোধর্মের নিকটবর্তী করে তুলেছে।

জ্ঞানদাস

চৈতন্য পরিমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে পদকর্তা জ্ঞানদাস অন্যতম। ইনি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখায় জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়। জ্ঞানদাস যেভাবে নিতানন্দের লীলা বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় কবি নিত্যানন্দ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কিন্তু এঁকে নিত্যানন্দের গণ বলে মনে করা হলেও ইনি আসলে ছিলেন জাহ্নবী দেবীর অনুচর। নিত্যানন্দের দেহত্যাগের বেশ কিছু সময় পর জাহ্নবী দেবী ব্রজধামে গেলে, তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিলেন জ্ঞান দাস। জ্ঞানদাস ভণিতায় প্রাপ্ত পদের সংখ্যা বহু। কিন্তু একাধিক জ্ঞানদাসের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং জ্ঞানদাসের নামে যত পদ পাওয়া গেছে সব একজনের বলেই মেনে নিতে হয়। জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দলীলা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ক পদই তিনি রচনা করেছিলেন।

জ্ঞানদাসের সমস্ত পদগুলি পড়লে বোঝা যায়, প্রথম দিকে তাঁর কবি, প্রতিভা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বসু রামানন্দের অনুকরণে নিজের যথার্থ প্রবণতার সন্ধান করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত কবি জ্ঞানদাস বিদ্যাপতির পদের আলঙ্কারিক রীতি বাদ দিয়ে চণ্ডীদাস ও নরহরি সরকারের সহজ সরল রীতিকেই গ্রহণীয় মনে করেছেন। চণ্ডীদাসের মধ্যে শরীর অতিক্রমী অনুভূতিরই প্রাবল্য। অন্যদিকে জ্ঞানদাস কিন্তু শরীরকে অস্বীকার করেন নি, শরীরের সঙ্গে মনের যে নিবিড় সংযোগ তা জ্ঞানদাসের পদগুলি ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ।

জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দলীলা বিষয়ক পদগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই পর্যায়ের পদগুলি পড়ে মনে হয়, তিনি নিত্যানন্দলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন—

দেখরে ভাই; প্রবল মল্লরূপ-ধারী
নাম নিতাই বায়া বলি রোয়ত
লীলা বুঝই না পারি।
ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢর ঢর
দিগ বিদিগ নাহি জান।
মত্ত সিংহ যেন গরজে ঘনে ঘন
জগ মাহ কাহু না মান।।

জ্ঞানদাস কৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোর নিয়ে পদ রচনা করলেও তাঁর অনন্যতা শ্রীরাধার শৈশব, কৈশোর বর্ণনা বিষয়ক পদে। এই বিরল পর্যায়ে জ্ঞান পদরচনা মৌলিকতারই পরিচায়ক। শিশু কন্যাটিকে দেখে প্রতিবেশিনী, রাধার জননীকে বলেন—

এ তোর বালিকা চাঁদের কলিকা
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি।
হেন মনে লয় এ হেন রূপক
পদুকা করিয়া রাখি।

আর একটি পদে রাধার কন্যাবৎসলা জননী-মাতৃ হৃদয়ের আশঙ্কা ও মমত্ব বড় চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সকাল থেকে বালিকা রাধা খেলা করতে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে খুঁজে ন পেয়ে মা বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাই কন্যা গৃহে ফিরে এলে তিনি ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন—প্রাণনন্দিনী, রাধা বিনোদিনী/ কোথা গিয়াছিলা তুমি/এ গোপ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে/খুজিয়া ব্যাকুল আমি।।

মা তাঁর বালিকা কন্যাকে প্রশ্ন করেন, তাঁর আঁচলে তে খাবার কে বেঁধে দিল? অগুরুচন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম, মাথায় বিনোদ বেণী আর নব মল্লিকার মালা দিয়েই বা কে রাধাকে সাজাল? উত্তরে সরলা বালিকা বলে, খেলতে যাওয়ার সময় পথ থেকে এক গোয়ালিনী তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে সাজিয়ে দিয়েছেন। তার পুত্রের রূপের ছটায় বালিকা প্রাণ মোহিত। গোয়ালিনী রাধাকে সেই পুত্রের বামে বসিয়ে দুজনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন এবং রাধার গৌরবর্ণ শরীরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। মেয়ের কথা শুনে রাধার মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। পদ দুটিতে রাধার জননীর অকৃত্রিম বাৎসল্যে সঙ্গে সঙ্গে মধুর রসেরও সূক্ষ্ম কোমল প্রলেব পড়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলি সাহিত্যে বলরাম দাস বাৎসল্যের ও সখ্যরসের সুনিপুণ রূপকার। জননী যশোদার স্নেহ শঙ্কাতুর মাতৃ হৃদয়ের উদ্বেগ,কৃষ্ণের প্রতি সখাদের সনির্ভরতাময় গভীর ভালবাসার চিত্র অঙ্কনে বলরামের লেখনী অজস্র রসবর্ষণ করেছে। কিন্তু এই পর্যায়ের পদরচনায় জ্ঞাদাসের কৃতিত্বও কম নয়। সখ্যরসের পদবর্ণনায় কবিত্ব ছাড়াও কথা অংশে জ্ঞানদাস কিছু কিছু অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বারো জন প্রিয় সখার নাম করেছেন। এঁরা হলেন শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুন্তরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক। প্রিয়নর্মসখা শ্রীরূপের বর্ণনায় পাঁচজনঃসবল, অর্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বল। এই সতের জনের মধ্যে জ্ঞানদাসের বর্ণনায় শ্রীদাম, সুদাম বসুদাস, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশুমান, সুবল, অর্জুনও উজ্জ্বল—এই নয়জনের মাত্র নাম রয়েছে। তবে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে নেই—এমন জ্ঞাত জনের নাম জ্ঞানদাসের পদে পাওয়া যায়। এই নামগুলি হল—দেবদত্ত, সুনন্দ, নন্দক, বিষয়া, সুবাহু, বরূথপ এবং বিশালা। শেষের দুজন সখার নাম অবশ্য ভাগবতে পাওয়া যায়।[৮৭] এক্ষেত্রে জ্ঞানদাসের কল্পনা শ্রীরূপকে অতিক্রম করে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছে।

সখ্য ও বাৎসল্যরসযুক্ত গোষ্ঠলীলার পত্র বর্ণনায় কবি হিসেবে জ্ঞানদাসের অপর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে যেন গোষ্ঠীলীলায় অংশ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ নিজেকে তিনি এক গোপবালকরূপে কল্পনা করেছেন। গোষ্ঠলীলার প্রতি কবিরএই আকর্ষণের কারণ হিসেবে বলা যায়, সম্ভভবত নদীয়ায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গোষ্ঠলীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কারণ জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দলীলা বিষয়ক পদগুলি কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত বলে মনে হয়। সম্ভভবত বলরাম দাস, পুরুষোত্তমদাস প্রভৃতি মত নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিধিভুক্ত হয়ে জ্ঞানদাস গোষ্ঠলীলার পদ রচনা করেছিলেন।

কিন্তু জ্ঞানদাসের প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে পূর্বরাগ, অনুরাগ, রূপানুরাগ ও রসোদগারের পদে। এছাড়াও আক্ষেপানুরাগ, দান ও নৌকাবিলাসের পদেও জ্ঞানদাস তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। স্নিগ্ধ মাধুর্যের অবিরল উৎসারণ জ্ঞানদাস রচিত পদের বৈশিষ্ট্য। এই মাধুর্যস্নিগ্ধতা শুধু পূর্বরাগ, অনুরাগে নয়, খণ্ডিতা কলহান্তরিতা ও প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়েও উৎসারিত। প্রথম দিকে অবশ্য জ্ঞানদাস-বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস উভয়কেই অনুসরণ করেছিলেন। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, নবোঢ়া মিলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত পদের মধ্যে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাপতির প্রভাব দেখা যায়। এমনকি ঘটনাক্রমও বিদ্যাপতির অনুকরণে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাপতির পদে যেখানে শুধুমাত্র রাধার রূপের বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে, জ্ঞানদাস সেখানে সুকৌশলে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের চিত্রটিকেও মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে উপস্থিত করেছেন—

পরখে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।

রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও রসোদগার পর্যায়ে কৃষ্ম রূপমুগ্ধা রাধার উচ্ছলিত আনন্দ ও গভীর প্রেমানুভূতির প্রকাশে, সেই নিবিড় গভীর অথচ কোমল মধুর প্রেমের অলঙ্কার বিরল ভারতন্ময় বর্ণনায় জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভা যেন মত্ত ময়ূরের মত শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাসে কলাপ বিকাশ করেছে। বিদ্যাপতির অলঙ্কারবৈচিত্র্য ও চণ্ডীদাসের ভাবোচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করে ভাবের সংহত রূপকে ভাষায় আয়ত্ত করার বৈশিষ্ট্য এখন জ্ঞানদাসের পদে প্রকাশ পেয়েছে।

এই পর্যায়ের পদগুলি জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিদ্যাপতি নায়কের রূপানুরাগ নিয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন। অন্যদিকে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদে নায়িকার রূপানুরাগই বেশি। এর কারণ বিদ্যাপতির প্রেমে কাম ও লালসা মিশ্রিত। তাই পুরুষের কামনা দিয়ে দেখা নারীরূপ বর্ণনাই তাঁর পদে বেশি, আর অন্যদিকে চণ্ডীদাস অনুভূতিসর্বস্ব। দেহ এবং মন, উভয়ের নিবিড় সম্পর্ক রূপলাভ করেছে জ্ঞানদাসের পদে। রূপ এবং গুণ উভয়ই জ্ঞানদাসের রাধার অনুরাগকে বাড়িয়ে তোলে। দেহমনের এই নিবিড় গভীর সম্পর্কে প্রেমের যে পূর্ণাবয়ব সুচারু রূপ জ্ঞানদাসের কাব্যে গড়ে উঠেছে, তা অন্য কোন বৈষ্ণব কবির মধ্যে দেখা যায় না। কৃষ্ণরূপের অতল বিস্তারে সমুদ্রে রাধার চোখ ডুবে যায়। রূপ দেখার আর প্রশ্ন থাকে না। কৃষ্ণের যৌবন যেন শ্যমল অরণ্য, সেখানে রাধার মন হারিয়ে যায়। যমুনার ঘাট থেকে ঘরে যাওয়ার পথটুকু আর শেষ হয় না (১৫৮)। কখনও কৃষ্ণকে দেখার অপরিমিত উল্লাসে ব্যাকুলা রাধা সখীকে বলেন—'এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে'। দেহের সীমানা ছাড়িয়ে, ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে রাধার এই উল্লাস তখন স্পর্শ করে রূপাতীত অনুভূতিকে। কৃষ্ণরূপমুগ্ধা রাধার মুগ্ধতার অভিব্যক্তিতে সেই রূপ বর্ণনাও মাধুর্য রস নিষ্মাত হয়ে ওঠে—

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরণে না যায় মোর হিয়া
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখখানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া।।

অনুরাগ ও আপেক্ষানুরাগ পর্যায়ের পদেও জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব অতুলনীয়। কিন্তু অভিসার পর্যায়ের পদে এই কবি ব্যর্থ। অন্যদিকে আবার দানলীলা ও নৌকাবিলাসের পদগুলি জ্ঞানদাসের উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর নৌকাবিলাসের পদে আবার শ্রীরূপ গেস্বামীর 'দানকেলীকৌমুদী' নাটকের প্রভাব আছে। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্য গোস্বামী প্রভাবের এটি এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বংশীশিক্ষা পদগুলিতে ও জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব অসাধারণ। এছাড়া রাধা-কৃষ্ণের বসন্তবিহার ও দললীলার বর্ণনায় জ্ঞানদাস বসন্তকালে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, তরুলতা ও পশুপাখির উন্মাদনার মাঝখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে স্থাপিত করেছেন।

মান পর্যায়ের পদ নিয়ে জ্ঞানদাস খুব বেশি পদ রচনা করেননি। কিন্তু এখানেও গোস্বামীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মানিনী রাধার ক্রোধ দূর হওয়ার পর তিনি সখীদের বলেন যমুনার জল এনে কৃষ্ণকে স্নান করিয়ে দিতে ও কৃষ্ণের সখা বিদূষক ভোজনপ্রিয় মধু মঙ্গলকে দধি ও ওদন ভোজন করাতে। মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে কবি জ্ঞানদাস রাধার হৃদয় বেদনা ও বিরহ যন্ত্রণা বর্ণনায় একদিকে আলঙ্কারিক রীতি ও অন্যদিকে চণ্ডীদাসের সহজ সরল অন্তরিক রীতির মিলন ঘটিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি জ্ঞানদাস সম্পর্কে বলা যায়—তিনি মধ্যযুগের বাংলা পদাবলি সাহিত্যে শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যেরই এক বিশিষ্ট কবি।

অনন্ত দাস

এই কবি অদ্বৈত শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি পদ ইনি রচনা করেছেন। এঁর রচিত দুটি গোষ্ঠলীলার পদ রয়েছে। একটিতে গোষ্ঠবেশে সজ্জিত কৃষ্ণের জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে। অন্যটিতে কৃষ্ণ এবং তার সখাগণের নানাবিধ ক্রীড়ার যে বর্ণনা রয়েছে তা ভাগবতের বর্ণনার অনুরূপ।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় কবির দক্ষতা অনস্বীকার্য। শ্রীরাধা অপরিতি কৃষ্ণকে প্রথম দিন দেখেই বলেন—

কি হেরলুঁ কদম্বতলাতে
বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে

শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় কবিকল্পনা বৈচিত্র্য লাভ করেছে। যখন রাধা বলেছেন—'হাসির হিল্লোলে মোর পরাণপুতলী দোলে।' কৃষ্ণের মধুর হাসি যেন তরল হয়ে রাধার অস্তিত্বের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। আর সেই হাসির তরঙ্গ দোলায় নব অনুরাগিনী রাধার হৃদয় দুলে দুলে ওঠে। কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় প্রথাসিদ্ধতার মাঝখানেই কবি একসময় বলে ওঠেন—

নীরে নিরখি রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর।।

তখন নিজ রূপের মাধুর্যে বিভোর এই কৃষ্ণের সাথ ললিত মাধব নাটকের কৃষ্ণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই কবির রাধারূপ বর্ণনা এত জীবন্ত নয়। এর কারণ হয়ত রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের প্রতি কবি অধিকতর আকর্ষণ।

এই কবির অভিসারের পদগুলির মধ্য দিয়ে অনরাগিনী প্রেমবর্তী নায়িকার আর্তি ও ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে নি। কবি রাধার রূপ ও চলনভঙ্গিমার বর্ণনাতেই ব্যপ্ত হয়ে পড়েছেন। অন্ধকার বর্ষণমুখর রাত্রিতে, বহু কষ্ট স্বীকার করে রাধা যখন দেখেন কৃষ্ম নেই, তখন বিপ্রলব্ধা নায়িকার বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তিনি সমগ্র পুরুষ জাতিকেই নিষ্ঠুর বলে অভিহিত করেন। এরপর কৃষ্ম এসে রাধার কাছে মিনতি করলে খণ্ডিতা রাধা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করলেন। এখানে রাধার মান সহেতু। প্রিয়জনের গাত্রে রতি চিহ্ন দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় কবি শ্রীরূপের উজ্জ্বল নীলমণিকে অনুসরণ করেছেন। কবি মহারাস, রাসান্তে জলবিহার ও বসন্তরাস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বসন্তরাসে জয়দেবের প্রভাব পড়েনি। কবি একটি পদে মিলনান্তে রাধাকৃষ্ণের নৃত্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ভাবোন্মত্ত সপার্ষদ গৌরাঙ্গের কীর্তনলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কবির শীতকালীন মাথুরে রাধার বিরহবেদনা তুহিন পবনের সাথে মিশে রাধার হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলেছে। ভাবোল্লাসের পদে রাধার ভাবী মিলনের চিত্রকল্পনা বড় করুণ। তারপর সখী যখন আবার রাধাকে মিলনানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন রাধার আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নির্ভরতাময় ঐকান্তিক ভালবাসা প্রকাশিত হয় প্রকৃতি জগৎ থেকে সংগ্রহ করা একটি উপমায়—

দারুণ শিশিরে পদুমিনী জনু
জীবনে মরিয়াছিল।
প্রবল রবির কিরণ পাইয়া
জনু বিকশিতভেল।।

যদুনন্দন (দাস)

যদুনন্দন দাস সপ্তদশ শতকের অনুবাদাশ্রয়ী কবিদের মধ্যে প্রধান। ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মালিহাটির বৈদ্য পরিবারে এর জন্ম হয়। শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর কাছে দীক্ষা নিলেও শ্রীনিবাসকেই ইনি গুরু বলে মনে করতেন। যদুনন্দন রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের, 'দানকেলি কৌমুদী' নামক ভাণিকার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' মহাকাব্যের এবং বিশ্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যের অনুবাদ করেন। এগুলির নাম তাঁর অনুবাদে যথাক্রমে রসকদম্ব, দানলীলা চন্দ্রামৃত, গোবিন্দবিলাস ও কৃষ্ণকর্ণামৃত' এছাড়জ্ঞাও তিনি 'কর্ণামৃত' নামে একটি বিখ্যাত জীবনীজাতীয় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হরেকৃষ্ম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলিতে সঙ্কলিত পদসমূহকেই আমরা এক্ষেত্রে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি।

যদুনন্দন রচিত শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে ললিতা রাধার বিষণ্ণমুখ, ম্লান শরীর ও অন্যমনস্কতা দেখে জিজ্ঞাসা করেন—

এমন হইলা কি লাগিয়া।
ন কহিলে ফাটি যায় হিয়া।

বৈষ্ণবসাহিত্যে সখীদের যে ভূমিকা, এখানে তারই প্রকাশ ঘটেছে। সখীরা নিছখ সাহায্যকারিনী নয়। রাধার প্রতি সখীর ভালবাসাও সুগভীর ও আন্তরিক। ললিতার প্রশ্নের উত্তরে রাধা কাদম্ববন থেকে আসা মধুর শব্দের কথা বললে, ললিতা বললেন যে এটি মোহন বাঁশীর শব্দ। এতে এত বিমোহিত হওয়ার কারণ কি? উত্তরে রাধা বংশীধ্বনির প্রতিক্রিয়ার যে বর্ণনা দেন, তা কবির গভীরতম অনুভূতি ও উচ্চতর কাব্যপ্রতিভার পরিচায়ক—

রাই কহে কেবা হন মুরলী বাজায় সেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া।।
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ম অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর।।'

বংশীধ্বনি শ্রবণে পূর্বরাগ একটি পুরাতন বিষয়। এটিকে অবলম্বন করে বহু শক্তিশালী কবি পদ রচনা করেছেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে রাধার মানসিক অনুভূতির সমত্ব ও রাধার বিভ্রান্ত ব্যাকুলতার বর্ণনায় কবি মৌলিক। এইভাবে বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই প্রথানুগত পকরণের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়েও কৃষ্ণকথায় নানাভাবে বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছেন।

এছাড়াও যদুনন্দন কৃষ্ণের নাম শ্রবণে ও চিত্রপট দর্শনে শ্রীরাধার পূর্বরাগের কথা বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার একটি পদে রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত পদাবলির একটি শ্লোকের ভাব বিস্তৃত হয়েছে।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পদে সখি কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার অবস্থা বর্ণনা করেন। কৃষ্ণনুরাগিনী রাধা কখনও হাসেন কখনও কাঁদেন। আবার কখনও কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। কখনও সহচরীকে জড়িয়ে ধরে 'হরি, হরি' বলেন। রাধার এই অবস্থা কিছুটা গীতগোবিন্দের ষষ্ঠ সর্গের বিরহিনী রাধার অনুরূপ। বিশেষত 'দিশি দিশি হেরেই তোয়'; পশ্যতি দিশি দিশি রহমি ভবন্তম্'—এরই অনুবাদ।

এই কবির পদে রাধা যেমন কৃষ্ণের নামটুকুই শুনে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই কৃষ্ণ ও রাধার নাম শুনেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত। প্রেমের আর এক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, সারা পৃথিবীতে এমনকি আকাশেও সর্বত্রই কেবল রাধামুখ প্রত্যক্ষ করেছেন। কৃষ্ণের রাধাপ্রেম চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। কিন্তু কৃষ্ণের এই সর্বত্র রাধাকে দেখতে পাওয়া যদুনন্দনের মৌলিক সৃষ্টি। যদুনন্দনের পদে রাধার প্রতিপক্ষ নায়িকা চন্দ্রবলীর উল্লেখ আছে। উৎকণ্ঠিতা, মলিনমুখী রাধা বসে বসে কৃষ্ণ বিরহে চোখের জল ফেলছেন। সেখানে গিয়ে দূতী বললেন, যার নাম রাধা সহ্য করতে পারেন না, সেই চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কৃষ্ণ বিহার

করছেন। শ্রীরাধার মান ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁর মানভঞ্জন এই কবির পদে গতানুগতিক। গোষ্ঠলীলার একটি পদে কবির যমুনা বর্ণনা বড়ো মনোরম ও গতানুগতিকতামুক্ত—

ভাগ্যবতী যমুনা মাঈ।
যার এ কুলে ও কূলে ধাওয়া ধাই।।
শ্বেত শাঙল দোন ভাই।
যার জলে দেখে আপন ছাই।।

যদুনন্দন দানকেলিকৌমুদির কিছু বিষয় নিয়েও পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীসৃষ্ট পৌর্ণমাসী চরিত্রকে নিয়ে যদুনন্দন একটি পদ রচনা করেছেন। পদটিতে বর্ষীয়সী স্নেহময়ী দেব পৌর্ণমাসীর চরিত্রটি বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বড়াই-র ছায়ানুসরণে চরিত্রটি সৃষ্ট হলেও, স্বরূপত কতখানি পৃথক তা যদুনন্দনের পদ থেকে বোঝা যায়।

এই কবির অন্য একটি পদে দেখা যায়, জটিলার গৃহে পূজা হবে, জটিলা পুরোহিত আনতে বললেন। কৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা সুভদ্রের স্ত্রী কুন্দলতা ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে পুরোহিত সাজিয়ে আনলেন। কৃষ্ণ পূজা করার পর জটিলা দক্ষিণা দিতে চাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ—

তেঁহো কহে কার্য্য নাই
তোমা সভার প্রীতি চাই
এই মোর দক্ষিণা হইল।।

এই কাহিনীতেও অভিনবত্ব কিছু নেই। এটিও রূপ গোস্বামীর নাটকে ও গোবিন্দ লীলামৃতে রয়েছে। যদুনন্দনের একটি পদে রাধাকৃষ্ণের বসন্তলীলা বর্ণিত। এছাড়া রাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা নিয়েও কবি পদ রচনা করেছেন। মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে অভিনবত্ব কিছু নেই। তবে একটি পদে রয়েছে, কৃষ্ণ প্রিয়তম দাম, শ্রীদাম আর হলধরের সঙ্গে মথুরা যাবেন। সম্ভবত রূপ গোস্বামীর নাটক ও গোবিন্দলীলামৃত অনুবাদ করার জন্য তাঁর পদাবলিতেও এগুলির প্রভাব বেশি পরিমাণে পড়েছে।

মাধব আচার্য্য (দাস)

কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতাকে কেউ শ্রীচৈতন্যের শ্যালক, কেউবা খুড়তুতো শালা বলেছেন। কিন্তু মাধব আচার্য্য স্বয়ং লিখেছেন—"সব অবতার শেষ করিল পরবেশ।/শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র গুপ্ত যতিবেশ।/ প্রেমভক্তিরস করেন প্রকাশ।/কহে দ্বিজ মাধব তাহার দাসের দাস।।"

দাসের দাস বলতে শ্রীচৈতন্যের কোন পরিকরের শিষ্য বোঝায়। দেবকীনন্দন তাঁর বৈষ্ণবন্দনায় এঁর উল্লেখ করে লিখেছেন—"মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।/যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।।"

বঙ্গবাসী সংস্করণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মধ্যে রঘুনাথ ভগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ও পরমানন্দ নামক এক কবির রচনা ঢুকে গেছে। মাধব আচার্য্যের কয়েকটি গীত খুব সুন্দর।

৭.৫ চরিতকাব্য

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চরিতকাব্যগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একদিকে জীবনীমূল্য, অন্যদিকে কাব্যমূল্য। এগুলি নিছক Biography নয়, Hagiography, অর্থাৎ সন্ত জীবনী শ্রেণীর। রক্তমাংসের সাধু নিমাই পণ্ডিতের পাশাপাশি

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ ভাবব্যাকুল শ্রীচৈতন্যকেও এসমস্ত গ্রন্থে পাওয়া গেল। এগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও অসাধারণ। সমাজ-ইতিহাসের বহু উপাদানে এগুলি পরিপূর্ণ। এধরনের চরিতকাব্য রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস, চূড়ামণি দাস প্রমুখকবি। গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

৭.৫.১ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রামাণ্য জীবনী লিখেছিলেন বৃন্দাবন দাস। এঁর কাব্যের নাম প্রথমে ছিল চৈতন্যমঙ্গল। পরে সে নাম পরিবর্তন করে রাখা চৈতন্যভাগবত। এ সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাস' নামক বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক কাব্যে বলা হয়েছে—

চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।/বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল।। নতুন নামটিই কাব্যভাবের সঙ্গে সু-প্রযুক্ত। কারণ বৃন্দাবন দাস চৈতন্যলীলার কাহিনী বিন্যাসে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা বর্ণনার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের ব্যক্তি পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাব্যের মধ্যে তিনি তাঁর জননী এবং গুরুর নামোল্লেখ করেছেন। এর থেকে জানা যায়, নারায়ণী ছিলেন তাঁর মাতা, আর কবি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর শেষজীবনের শিষ্য। নারায়ণী চৈতন্য পার্ষদ শ্রীবাদ পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন।

কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। সম্ভবত ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর কাব্যরচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতে পারেননি। তাই তিনি সখেদে বলেছেন—হৈল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।/হইয়াও বঞ্চিত সে লীলা দরশনে।

তহলেও বৃন্দাবনের রচনায় মহাপ্রভুর গৌড়লীলার একটি একান্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায়, কারণ অন্তরঙ্গতম প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তথ্য আহরণের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। কবি জানিয়েছেন—নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশেই তিনি চৈতন্য জীবন বৃত্তান্ত রচনায় ব্রতী হন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, জননী নারায়ণী এবং শ্রীবাস প্রভৃতির কাছ থেকে বৃন্দাবন দাস তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের কাব্যে গৌড়লীলা বর্ণনা যেমন প্রামাণ্য হয়েছে, তেমনি হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ। তাছাড়া গৌর জীবন কেন্দ্রেই চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃন্দাবনের প্রতিভার মধ্যে ঐতিহাসিকোচিত পরিবেশ সচেতনতা ছিল গভীর। ফলে চৈতন্যলীলার পটভূমি স্বরূপ নবদ্বীপের অবস্থান, এবং সেখানকার সামাজিক ও নৈতিক আচার অনুষ্ঠানেরও খুঁটিনাটি পরিচয় তিনি দিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর চৈতন্যপূর্ব নবদ্বীপ বর্ণন বিশেষ মূল্যবান। তৎকালীন বাংলার সমাজ জীবনের একটি অখণ্ড প্রতিরূপ যেন চুম্বক আকারে চিহ্নিত হয়েছে এখানে—নবদ্বীপ সম্পাত্তিকে বর্ণিবারে পারে।/এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ থেকে লোক স্নান করে।/কৃষ্ণ নামভক্তিশূন্য সকল সংসার।/প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার।।/ধমকর্ম লোকসভে এই মাত্র জানে।/মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।/দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনজন।/পুত্তলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহুধন।।/ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।/এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের মোহানায়, বিশেষ করে হোসেন শাহার রাজত্বকালের প্রথম বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের অ-রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসের দুর্লভ উপাদান এখানে অনেকটাই পাওয়া যায়। নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাসের ঘরে অথবা নিজের ঘরে ভক্তদের নিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত নামকীর্ত্তন করেন। তাতে পাড়ার লোকের অনেকের বিরক্তি জন্মেছিল। বৃন্দাবন দাস তাঁর বর্ণনাও দিয়েছেন। নবদ্বীপের লোকেরা এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করেছিল। তাদের রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাতের জন্য বিরক্ত হয়েছিল। আবার কেউ কেউ মুসলমান রাজার অত্যাচারের ভয়েও সন্ত্রস্ত হয়েছিল। মুসলমান শাসকদের

হিন্দু বিদ্বেষও এই গ্রন্থে প্রকাশিত। চৈতন্যের ভক্ত হরিদাসের প্রতি মুলুক পতির উক্তি—কত ভাগ্যে তুমি দেখ ইয়াছ যবন/তবে কেন হিন্দুর দেহ মন।/আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত/তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত।।

বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যটি আবৃত্তি ও গান করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। তাই মাঝে মাঝে রাগ রাগিনীর উল্লেখ আছে। এই কবির সংস্কৃত জ্ঞান ছিল এবং তিনি ভাগবত খুব ভালো করেই পড়েছিলেন। ভাগবত ও অন্যান্য দু-একটি পুরাণ থেকেও তিনি শ্লোক উদ্ধৃত করেছিলেন। চৈতন্য নিত্যানন্দকে বৃন্দাবন দাস কৃষ্ণ বলরামের অবতার রূপে দেখেছিলেন। এবং সেভাবেই এঁদের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। নিত্যানন্দের সমালোচকদের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। নিত্যানন্দ অনেক অব্রাহ্মণকে নিজের অনুচর করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও জাতিবিচার করতেন না বলে অনেকেই তাঁকে পছন্দ করতেন না। এঁদের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন—এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে/তবে লাথি মারো তাঁর শিবের উপরে।

চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার বর্ণনায় কবির সহজ সরল বাস্তবস্পর্শী বর্ণনা ভঙ্গী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সভায় প্রত্যেকদিন গীতা ভাগবত পড়তে যেতেন। বিশ্বরূপের আসতে দেরি হলে শচী শিশু চৈতন্যকে পাঠাতেন ভাত খাওয়ার জন্য ডেকে আনতে। এই ধরনের একটি দিনের শিশু বিশ্বম্ভরের ছবি বৃন্দাবনের তুলিকায় উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত—রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে/ তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে।/মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়/প্রভু আইসেন জৈষ্ঠ নিবার ছলায়।/দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর/হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর।/ ভোজনে আইসহ ভাই ডাকয়ে জননী।/অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি।

চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস খুব সংক্ষেপেই দিয়েছেন। কিন্তু সেই বর্ণনাও মানুষ চৈতন্যের পরিচয় দীপ্ত। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ, শচীদেবী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ—এই কজনের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে খোলাবেচা শ্রীধর তাঁকে একটি লাউ উপহার দিয়েছিল, সেই লাউ তিনি শচীমাতাকে রন্ধন করতে বলেন। গৃহত্যাগের আগে অশ্রুমুখী জননীকে তিনি বলেন—দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার/আমি কোটি কল্পেও নারির শোধিবার। কিন্তু মা শচীদেবী প্রবোধ মানেন না—যত কিছু বোলে প্রভু সব শচী শুনে/উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে।

এইভাবে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণে মায়ের মর্মান্তিক বেদনা বৃন্দাবন দাসের কাব্যে নিবিড় আন্তরিকতায় চিত্রিত।

অবশ্য অবতার শ্রীচৈতন্যের অতিলৌকিক কিছু কিছু ব্যাপারও তাঁর কাব্যে ভক্তির অনিবার্য আবেগেই এসে গেছে। যেমন—নিমাইর বরাহ অবতার ধারণ প্রসঙ্গ। চৈতন্য ভাগবতের সমাপ্তিতে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার বর্ণনা নেই। পরবর্তী চৈতন্যজীবনী রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজই বিস্তৃতভাবে অন্ত্যলীলা বর্ণনা করেছেন।

৭.৫.২ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

লোচনদাসের চৈনত্যমঙ্গাল কাব্যটি সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন—চারিখণ্ড কথা সায় করিল প্রকাশ।/বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোরম নিবাস।/মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।/যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।।/কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।

১৫৫০-৬৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে চারটি খণ্ড আছে—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড। এটি এগার হাজার ছত্রে রচিত। অল্পশিক্ষিত সমাজে গান করার জন্যই কবি এটি রচনা করেছেন। এর রাগরাগিনীর ব্যবহার আছে কিন্তু সর্গবিভাগ নেই। এটির রচনা ধারা অনেকটা মঙ্গলকাব্যের মত। সূত্র খণ্ডটি মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের মতো। এতে স্বর্গের কাহিনীও চৈতন্যাবতারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে মঙ্গলকাব্যের মতো গণেশ,

হরপার্বতী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবী বন্দনা ও গুরু নরহরি দাসের বন্দনা করা হয়েছে। কৃষ্ণের স্বয়ং চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ ও অন্যান্য অনুচরদের বর্ণনাও এখানে আছে। চৈতন্য অবতারের পটভূমি প্রমাণ হিসেবে কবি ভাগবত ব্রহ্ম সংহিতা, ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র মহাভাগবত প্রভৃতি অনুসরণ করেছেন। লোচনদাসের গুরু নরহরি দাস নদীয়া নাগর ভাবের প্রবর্তক ছিলেন। লোচনের কাব্যেও শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া নাগর ভাবের বর্ণনা রয়েছে।

মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের নদীয়ালীলা ও উৎকললীলা বর্ণিত। নবদ্বীপে মহিমাপ্রকাশ, ভক্তদের আগমন ও চৈতন্যের সঙ্গে মিলন বর্ণিত। এখানে চৈতন্যদেব ভাগবতের কৃষ্ণের মতো লীলা করেছেন। এই সমস্ত বর্ণনায় লোচনদাস ইতিহাসকে অস্বীকারই করেছেন বলা যায়।

শেষখণ্ডে মহাপ্রভুর দক্ষিণ যাত্রা, রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন, সেতুবন্ধ পর্যন্ত ভ্রমণ এবং পুরীতে প্রত্যাবর্তন, পরে একবার গৌড় ঘুরে আবার নীলাচলে অবস্থান এবং অবশেষে চৈতন্যের অলৌকিক তিরোধান বর্ণিত।

গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্যজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা এই অংশে আছে। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে কবি বলেছেন যে ইনি জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে যান। চৈতন্যজীবনী ছাড়াও লোচনদাস দুর্লভসার, আনন্দলতিকা, বস্তুতত্ত্বসার প্রভৃতি পুস্তিকায় সহজিয়া ধরনের রাগানুগা পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে উড়িয়া কবি মাধবের চৈতন্যবিলাস অবলম্বনে লোচনদাস চৈতন্যের সন্ন্যাস সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৭.৫.৩ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রথম এই গ্রন্থের পরিচয় দেন। ১৩১২ সনে কালিদাস নাথের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। কাব্যের সন্ন্যাসখণ্ডে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতার নাম রোদনী। তাঁর জন্ম বর্ধমানের কাছাকাছি আমাইপুরা গ্রামে। সম্ভবত ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কবি তাঁর কাব্যরচনা করেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবসমাজে এই গ্রন্থ নানা কারণে জনপ্রিয় হয়নি। এই কাব্য নয়টি পালাগানে বিভক্ত। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সব রকমের গণশ্রোতার উদ্দেশ্যে রচিত ও গেয়। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য নিয়মে গণেশবন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু। জয়ানন্দ চৈতন্যলীলা বর্ণনায় পূর্বসুরী হিসেবে 'চৈতন্যসহস্র নাম' স্তোত্র প্রণেতা সার্বভৌম ভট্টাচার্য, চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাস। চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা, গোপাল বসু (অপ্রাপ্ত) এবং 'গোবিন্দ দাস বিজয়গীত' রচয়িতা (অপ্রাপ্ত) পরমানন্দ গুপ্তর উল্লেখ করেছেন।

চৈতন্যমঙ্গল শোনা কথা ও বানানো গল্পের আকর। সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক অবাস্তব কথা বলা হয়েছে। আদি খণ্ডে সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক চিত্র—

> বৃক্ষলতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
> মৎস-মাংসে প্রিয়. হৈল বিধবা যুবতী।।
> রাজা নাহি পালে প্রজা ম্লেচ্ছের আচার।
> দুই তিন চারি বর্ণে হইল একাকার।।

নদীয়া খণ্ডে চৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্টের বর্ণনা, নীলাম্বর চক্রবর্তী ও জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপে বাস্তুনির্মাণ, নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমান সুলতানের কিছু অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে।

এরপর বৈরাগ্য খণ্ড। এর মূল ঘটনা চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়াস। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে ধ্রুবের আখ্যানের বিস্তৃত বর্ণনা অনেকটা অংশ অধিকার করে আছে। এই অংশেই বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীমাতার বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা বর্ণনায় কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। 'সন্ন্যাসখণ্ডে' কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে গৌরাঙ্গের

সন্ন্যাস গ্রহণের বর্ণনা এবং কাটোয়া থেকে শান্তিপুর যাত্রার কথা এবং 'উৎকলখণ্ডে' নীলাচলে মহাপ্রভুর উপস্থিতির কথা বর্ণিত হয়েছে। 'প্রকাশখণ্ড' ও 'তীর্থখণ্ডে' জগন্নাথের সঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কন্যা সত্যবতীর বিবাহের আখ্যানের বিস্তৃত পরিচয় আছে। 'বিজয়খণ্ডে' পতিব্রতা পত্নীতুলসী এবং বিষ্ণু কর্তৃক তুলসীকে ছলনার গল্পটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুমাহাত্ম্য, অজামিল, মহাপ্রভুর নদীয়ায় আগমন এবং পুনরায় উৎকলে প্রত্যাবর্তন—পরে নিত্যানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণিত।

জয়ানন্দ কিছু কিছু নতুন তথ্যও তাঁর কাব্যে দিয়েছেন। (১) চৈতন্যের জন্ম সন্ধ্যায় চাঁদের পূর্ণগ্রহণ ছিল। (২) চৈতন্য তিরোভাব ঘটেছিল 'আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা'তে। (৩) যবন হরিদাসের নিবাস ছিল বুঢ়ণ পরগণার ভাটকলাগাছি গাঁয়ে পিতার নাম মনোহর, মাতার নাম উজ্জ্বলা। (৪) যবন হরিদাসের মৃত্যু হয় ১৪৫৫ শকের 'ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দশীর উদয় লগ্নে (৯ই মার্চ, ১৫৩৩)। (৫) চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য নিয়েছিলেন ১৪৩৭ শকের জৈষ্ঠমাসে। (৬) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যে সব স্থান জয়ানন্দ পর্যটন করেছিলেন, তাদের সঠিক বিবরণ মেলে এই কাব্যে। (৭) চৈতন্য জন্মের অব্যবহিত আগে গৌড় নবদ্বীপে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। (৮) উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে গৌড়ের সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র শত্রুতা ছিল। প্রতাপরুদ্রকে গৌড় সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত করেছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। (৯) এছাড়া জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর লৌকিক কারণ বর্ণনা করেছেন—আষাঢ় পঞ্চমী রথবিজয় নাচিতে/ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে।/...চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে/ সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে।/পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।

চৈতন্যচরিত গ্রন্থের মধ্যে কেবল জয়ানন্দই বিচ্ছেদ কাতরা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে 'বারমাস্যা' বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে শচীর বিলাপ ও স্ত্রীর বারমাস্যা কারুণ্য নির্ভর।

চৈতন্যের আবির্ভাব মুহূর্তে দেশের ও সমাজের যে অবস্থা ছিল, তাও জয়ানন্দের কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ পীড়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লএ তারে জাতিনাশ করে।।
****
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার সুটে তার লৌহ পাশে বান্ধে।।

৭.৫.৪ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যচরিতামৃত কেবল চৈতন্যলীলার বর্ণনা গ্রন্থ হিসেবে নয়, বৈষ্ণব তত্ত্ব গ্রন্থ হিসেবেও সমাদৃত। তত্ত্বশাস্ত্রের আকররূপে একটি ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব আর মর্যাদা পেয়েছে। এই গ্রন্থে অবতার চৈতন্যের মর্তলীলা, চৈতন্যতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব উচ্চ দার্শনিক সূক্ষ্মতায় বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। চৈতন্যদেবের বস্তুগত তথ্যবহ ও ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী সংকলন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ তাঁর আগে চৈতন্যদেবের অন্তত তিনটি বাংলা জীবনীকাব্য এবং তিনখানি সংস্কৃত জীবনী (কাব্য ও নাটক) রচিত হয়েছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থেই নিজের পরিচয় কিছুটা দিয়েছিলেন, বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নৈহাটি গ্রামের কাছে ঝামটপুরে কবির বাস ছিল। কবি তাঁর বাড়ীতে নাম সংকীর্তন করতেন। কৃষ্ণদাস, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়ের প্রতিই ভক্তিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছোটভাই নিত্যানন্দ বিরোধী ছিলেন। চিরকুমার কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন।

আদি ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সে অনুমান করেছেন ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়। কিন্তু এই সাল তারিখ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের সব ঘটনা প্রামাণ্য নয়। তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ, মতাদর্শ ও উক্তি অবলম্ববনে চৈতন্য জীবনীকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এর ফলে তাঁর কাব্যে চৈতন্যজীবনী ও চৈতন্যজীবনাদর্শ বর্ণনায় ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষিত হয়নি। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর এই মহাগ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ রচনারকাল নিয়েও আবার নানা বিতর্ক আছে। চৈতন্যচরিতামৃতের ছাপা সংস্করণের শেষ গ্রন্থ—সমাপ্তিসূচক একটি সংস্কৃত শ্লোক—

শক সিন্ধ্যাগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠ বৃন্দাবনান্তরে।

সূর্যেহহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং ্রন্থোহয়ৎ পূর্ণতাংগত।।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই শ্লোক থেকে স্থির করেছেন যে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের অর্থাৎ ১৫৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে পঞ্চমী কৃষ্ণাতিথিতে রবিবার বইটি শেষ হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন গ্রন্থ রচনা করেন, তখন বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। বৃন্দাবনের গ্রন্থ থেকে ভক্ত বৈষ্ণবদের চৈতন্যজীবনী সম্পর্কে কৌতুহল চরিতার্থ হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়নি। কৃষ্ণদাস সেই অন্ত্যলীলাকেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবনকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃত দিয়েছেন।

কৃষ্ণদাস বলেছেন যে, বৃন্দাবন দাসের "নিত্যানন্দলীলা বর্ণনে হৈল আবেশ" আর সেই কারণেই "চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ"। এই অন্ত্যলীলা শোনার জন্যেই বৃন্দাবনের ভক্তরা কৃষ্ণদাসকে অনুরোধ করলে তিনি কাব্যরচনায় ব্রতী হন।

এই মহাগ্রন্থ রচনায় স্বরূপ দামোদর ও মুরারিগুপ্তের গ্রন্থের বহু উপাদান কৃষ্ণদাস ব্যবহার করেছেন। বৃন্দাবন দাস যে সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন কবি সেগুলিকে খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

কৃষ্ণদাস বিবৃতিমূলক জীবনী রচনা করতে চাননি। চৈতন্যজীবনের তাৎপর্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূলতত্ত্ব। চৈতন্য শাখা নির্ণয় এবং মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা সমার্কেই তিনি বেশি আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের নয়, ভক্ত দার্শনিক কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনটি খণ্ড আছে। আদিলীলা মোট সতেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা ও কৈশোরকাহিনী সূত্রাকারে বর্ণিত।

মধ্যলীলায় মোট পঁচিশটি পরিচ্ছেদ আছে। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ, রাঢ়দেশে ভ্রমণ, নীলাচলে গমন, সার্বভৌমকে নিজের মতে আনা, দক্ষিণ-ভারতে যাত্রা, রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব আলোচনা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর আবার নীলাচালে প্রত্যাবর্তন, বৃন্দাবন ধামকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করা, এই লীলায় বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বর্ণনা প্রায় নেই বলা যায়, আর বৃন্দাবন পরিক্রমাও খুব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের এই ঘাটতিগুলো পূরণ করেছেন।

মধ্য পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার ও তাঁকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আনা, অষ্টম পরিচ্ছেদে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদেবের বিভিন্ন বৈষ্ণব রসতত্ত্ব আলোচনা, এছাড়াও বিংশ-চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনকে উপদেশের ছলে মহাপ্রভু কর্তৃক জীবতত্ত্ব, ঈশ্বতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় রয়েছে। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, ঘটনাগুলি সেভাবে ঘটেছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে বাসুদেব সার্বভৌমের ঘটনা সম্পর্কে বলা যায় যে বাসুদেব তর্কে পরাস্ত হয়েই চৈতন্যের মত গ্রহণ করেছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। চৈতন্যদেবের শেষ বারো বছরের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করাই এই অংশটি রচনার উদ্দেশ্য। এই খণ্ডের কুড়িটি অধ্যায়ের মধ্যে শেষে সাতটি অধ্যায়ে এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণব ভক্তদের মনে চৈতন্যের শেষ জীবনের আপার্থির লীলাকাহিনী শোনার যে বাসনা ছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে বাসনা পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করেছেন। চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, ভাববিকার আর কৃষ্ণপ্রেমে সমস্ত সত্তার বিলুপ্তি বর্ণনার জন্য প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার প্রয়োজন। কৃষ্ণদাসের মধ্যে সেই প্রতিভা ছিল।

চৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাসের একমাত্র গ্রন্থ নয়। এর আগে তিনি আরও দু'খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি ছিল রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা সংক্রান্ত কাব্য গোবিন্দলীলামৃত এবং আর একটি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা'। চৈতন্যচরিতামৃত কবির একেবারেই বৃদ্ধ বয়সের রচনা। এর মধ্যে বহু উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ আছে, বিশেষ করে আবেগ-ব্যাকুল ত্রিপদীগুলির কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য। কবির অলঙ্কার ব্যবহার ও স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ভক্তিরসে স্নাত—

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে নালুকায় অন্য দাগে—
শুক্ল বস্ত্র যৈছে মসীবিন্দু।।

এছাড়াও গদ্যভাষার সাহায্য না নিয়ে ছন্দে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা কৃষ্ণদাসের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। দুরূহ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যার সময় তিনি যথাসম্ভব পরিমিত, স্বল্পাক্ষর, গাঢ় বাক্ বন্ধ ব্যবহার করেছেন। সব মিলিয়ে বলা যায় বাঙালির মনন, দর্শন, তত্ত্বজ্ঞান ও রসবোধের এমন বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগেও দুর্লভ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে বৈষ্ণব বিনয়ের বহু পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরধর্মের অপকর্মও তিনি দেখিয়েছেন। ইসলামের, বৌদ্ধধর্মের এবং শংকর, মাধব প্রভৃতির মতবাদের নিন্দায় তিনি মুখর। চৈতন্যবতারে অবিশ্বাসী পামর-পাষণ্ডের তিনি দৈত্য ও অসুর বলেও গাল দিয়েছেন। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মতে কৃষ্ণদাসের গোবিন্দলীলামৃত ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে মনে হয় ভক্ষ্যদ্রব্য বর্ণনা করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। ভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপনের সময়েও কৃষ্ণদাস কবিরাজ আহার্য বিষয় থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন, অদ্বৈত গৃহে, জগন্নাথের প্রসাদরূপে এবং সার্বভৌমগৃহে চৈতন্যের ভোজ্যদ্রব্যের দীর্ঘ তালিকা আছে। মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মত কৃষ্ণদাস কবিরাজও মুসলিম শাসকদের হিন্দুপীড়নের কথা অথবা হিন্দুর ধর্মের প্রতি তাদের অবজ্ঞার কথা বলেছেন। কিন্তু মনে হয় সাধারণ মুসলমানসমাজ ও হিন্দুসমাজের সম্পর্ক এমন ছিল বলে মনে হয় না।

৭.৫.৫ চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ড. সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু পুরো পুঁথিটি পাওয়া যায় নি। এটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। এই গ্রন্থের লেখক চূড়ামণিদাস ৯টি বৈষ্ণব পদও রচনা করেছিলেন।

অন্যান্য চৈতন্যজীবনীর মতো এটিতেও চৈতন্যের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা আছে। কবি বলেছেন—

আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড কহিব
গৌরাঙ্গবিজয় তিনখণ্ডে পূর্ণ হৈব।

এতে ভক্তির আবেশ ও আতিশয্য প্রায় নেই বললেই চলে। তাই হয়তো সমকালীন বৈষ্ণবসমাজে এটি সমাদৃত হয়নি এবং এর প্রচারও ঘটেনি।

চূড়ামণি দাস ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কাব্যরচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। ধনঞ্জয় পণ্ডিত তাঁর গুরু ছিলেন। নিত্যনন্দের যে বারোজন ভক্ত দ্বাদশ গোপাল নামে বিখ্যাত ছিলেন—ধনঞ্জয় পণ্ডিত তাঁদের অন্যতম। চূড়ামণি দাস তাঁর গুরুর কাছ থেকেই চৈতন্য ও নিত্যানন্দের জীবনীবিষয়ক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

কাব্যের সামান্য অংশ থেকে অল্প কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। যেমন—মাধবেন্দ্র চৈতন্যের উপনয়ন সংস্কার করেছিলেন। চৈতন্যদেবের পিতা একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু এগুলি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

চৈতন্য জন্মগ্রহণ করায় বৌদ্ধরা আনন্দিত হয়েছিল বলে চূড়ামণি দাস উল্লেখ করেছেন। সেজন্য কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তখন বাংলাদেশে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। আসলে যক্ষ, বাশুলী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দেবতার পূজারীদের, আর সেইসঙ্গে যোগী তান্ত্রিকদেরই তিনি বৌদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন বলে মনে হয়।

৭.৫.৬ গোবিন্দদাসের কড়চা

জয়গোপাল গোস্বামী নামে অদ্বৈত আচার্যের বংশধর একজন শিক্ষক ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক একটি চৈতন্যজীবনী প্রকাশ করেন। কিন্তু এরপর দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শস্ত্রী, মতিলাল ঘোষ, জগদ্বন্ধু ভদ্র, নলিনীকান্ত ঘোষ, বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তি 'গোবিন্দদাসের কড়চা'-কে অকৃত্রিম চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ বলে মানতে চাননি। কারও কারও মতে এটি জাল গ্রন্থ।

জীবনীগ্রন্থে আছে গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের খড়ী খড়ম বাহক অনুচর ছিলেন।

৭.৬ অনুবাদকাব্য

আলোচ্য কালপর্বের অনুবাদকাব্যের শাখাটিও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ত্রয়ী কাব্যের অনুবাদকর্মেই অনুবাদকদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের অনুবাদ করেছেন অদ্ভুত আচার্য ও চন্দ্রাবতী। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাসের আবির্ভাব ঘটেছে। তুলনায় ভাগবত অনুবাদকদেরই সংখ্যাধিক্য।

৭.৬.১ অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ

কবি কৃত্তিবাসের পর চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট কবি অদ্ভুতাচার্য। আদ্যকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে কবি জানিয়েছেন তিনি রামচন্দ্রের নির্দেশে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—

"প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ।/অদ্ভুত নাম হইল সে কারণ।।" নানা সূত্র থেকে পাওয়া পুঁথির পাঠ মিলিয়ে জানা যায়—আত্রেয়ীর উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিমে সোনাবাজু পরগণার বড়বাড়ি বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে কবির জন্ম হয়েছিল। স্থানটি বর্তমানে বাংলাদেশের পাবনা জেলায় অবস্থিত। কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার্য (মতান্তরে কাশী আচার্য), মাতা মেনকাদেবী। কথিত আছে সাত বছর বয়সে কবি রামচন্দ্রের কাছ

থেকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ পান, এবং হস্তস্থিত শরাগ্রে তাঁর জিহ্বায় মহামন্ত্র লিখে দেন। কবি অল্প বয়সে রচনা সমাপ্ত করেন, এই অদ্ভুত কৃতিত্বের জন্য তাঁর নতুন খ্যাতি হয় অদ্ভুতাচার্য।

নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্যের আবির্ভাব কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ইনি আকবরের সমসাময়িক ষোড়শ শতব্দীর কবি। সুকুমার সেনের মতে, "সাঁতোলির রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য! সুতরাং কবির জীবৎকাল সপ্তদশ শতকের শেষ।" অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করেছেন, কবির ভ্রাতা, বেদানন্দের প্রপৌত্রী শর্বানীর স্বামী ছিলেন রাজা রামকৃষ্ণ। আবার ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে শর্বানী অন্ধ হয়ে পড়ায় রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। এবিষয়ে দলিলগত প্রমাণ মণীন্দ্রমোহন বসু দিয়েছেন। তিনপুরুষে এক শতাব্দী হিসেব করে তিনি অনুমান করেছেন। কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়নি। ১৩২০ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ থেকে কবির রামায়ণের আদ্যকাণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন কাণ্ডের বিচ্ছিন্ন পুঁথি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী একসময়ে অদ্ভুতচার্যের কাব্যমূল্য নির্ণয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে তুলনার চেষ্টাও করেছিলেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে কৃত্তিবাসের অনুবাদ বাল্মীকি অনুসারী, অপরপক্ষে অদ্ভুতাচার্য বৈচিত্র্য রসপিয়াসী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'বশিষ্ঠ রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ইত্যাদি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া বাঙালি জীবন বাসনার অনুকূল বিচিত্র গল্পও তিতিন রচনা করেছিলেন। আজ কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার মূলে আছে ঐ বৈচিত্র্য এবং জীবনানুগত্য। ড. ভট্টশালী সিধ্বান্ত করেছিলেন কৃত্তিবাসের জনচিত্তহারী সংবেদনার একমুখ্য অংশ অদ্ভুতাচার্যের দান।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রাপ্ত অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য উপাদান অদ্ভুতাচার্যের পুঁথিতেই পাওয়া যায়। হতে পারে, অদ্ভুতাচার্যের পুঁথিতে বাঙালি জীবনরস ও বিচিত্র সংস্কৃত কাব্যকথার যে সমন্বয় দেখা যায়, তার অনেকখানিই পূর্ব ঐতিহ্য রূপে এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু তার পুঁথিগত নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। অদ্ভুতাচার্য বাংলা রামায়ণের সেই অবিস্মরণীয় কবি, যাঁর কাব্যপুঁথিতে বাঙালির চিরপ্রিয় বাংলা 'রামায়ণে'র রস-উপাদান প্রামাণিক আকারে সঞ্চিত আছে। দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। কৃত্তিবাস সুমিত্রা বিবাহের বর্ণনা করেছেন সংস্কৃত 'রামায়ণ' কাব্যের অনুসরণে। পূর্ববিবাহিতা শ্রেষ্ঠা দুই মহিষী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর কাছে মৃগয়ার ছল করে রাজা দশরথ সুমিত্রা বিবাহে যাত্রা করেন। পরে যখন বিবাহের যথার্থ সংবাদ পাওয়া গেল, কৃত্তিবাসের কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তখন—"নিরবধি পূজে দোঁহে পার্বতী-শঙ্কর।/সুমিত্রা দুর্ভগা হৌক মাগে এই বর।।" কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর এই আচরণ সপত্নী জনোমচিত স্বাভাবিকতায় মণ্ডিত। ঠিক এই ধরনের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির বশেই কৌশল্যা ও কৈকেয়ী সুমিত্রাকে চরুর ভাগ দেবার সময়ে আগে থেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, চারু ভাগ থেকে সুমিত্রার যে দুই সন্তান জন্মাবে, তারা যথাক্রমে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর পুত্রদের দাসত্ব করবে।

অদ্ভুতাচার্য কিন্তু কৌশল্যাকে অন্যরকমভাবে চিত্রিত করছেন। বাঙালির ভাবপ্রবণ স্বভাবের গভীরে অতিলৌকিক যে মাতৃমহিমাবোধ সদা অনুস্যূত হয়েছে তার সঙ্গে কবি কল্পনায় হয়ত মা যশোদার ভাবদর্শের প্রভাবও যুক্ত হয়েছিল। তাই এ যুগের রামচন্দ্র যেমন কানু কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত রাম-জননী কৌশল্যাও তেমনি কানু জননী যশোদার ঢল ঢল স্নেহ সুধা সম্মুক্ত হয়েছিলেন, কৌশল্যাকে অদ্ভুতাচার্য জননী মূর্তিতেই অঙ্কন করেছিলেন। সদ্যোবিবাহিতা নববধূ-দুর্ভাগা সুমিত্রা দেহ-মনে শরীত্বের শ্রেষ্ঠ লজ্জা বহন করে কৌতুহলী জনতার উপেক্ষিত দৃষ্টির সম্মুখে যখন আড়ষ্ট

হয়েছিলেন, তখন জননী-কৌশল্যাই বাঙালি মায়ের অসহায় মোহক্ষণ স্নেহষ্টির দ্বারা অভিবিক্ত করে তাঁকে বরণ করে আনলেন লোক-লজ্জার অতীত বাৎসল্য-মধুর অন্তঃপুরে। স্বামী কর্তৃক সুমিত্রার নিগ্রহে ব্যথিতা কৌশল্যা প্রতিজ্ঞা করলেন

"যদি রাজা নিতে পারি সুমিত্রা সদন।
তবে যে দেখিব আমি স্বামীর বদন।
যদি রাজা নাহি শুনে আমার বচন।
ইহ জন্মে স্বামী সঙ্গে শৈব দাশন।।"

সতী শরীর এই আত্মত্যাগের মহিমা অনির্বচনীয়। নিরুপায়ের প্রতি বাৎসল্য-বশেই কৌশল্যা অত বড় স্বার্থ ত্যাগ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করতে পেরেছিলেন। অবশ্য নিজের প্রতিজ্ঞা তিনি রাখতে পেরেছিলেন। দশরথের সঙ্গে সুমিত্রামিলনের সেই পরম-মুহূর্তে কৌশল্যাকে অদ্ভুতাচার্য-নবরূপ দান করেছেন। সুমিত্রাকে নিজের হাতে সাজিয়ে স্বামিসম্মিলনে পাঠিয়েই কৌশল্যা ক্ষান্ত হননি। বাঙালি শরীর কৌতুক ও কৌতুহল বসে সপত্নীর বাসর ঘরে উঁকি দিতেও গিয়েছিলেন। বাঙালি চেতনার সার্বিক আদর্শ-মহিমাঙ্কনে, বাঙালি জীবনের চাপল্য তরল মহিমাঙ্কণে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছ্ন। 'রামায়ণ' কাহিনীর আর একটি রূপান্তর "শতস্কন্ধ রাবণবধ" নামক পুথি অদ্ভুতাচার্যের ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে।

৭.৬.২ চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষ, অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথমে ময়মনসিংহের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী 'রামায়ণ' রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। চন্দ্রবতী ছিলেন মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। ময়মনসিংহ গীতিকার 'চন্দ্রাবতী' পালায় চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচনার উল্লেখ আছে—"শিব পূজা কর আর লেখ রামায়ণে"। বাল্যের খেলার সাথী জয়ানন্দের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন চন্দ্রাবতী। জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিবাহও স্থির ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জয়ানন্দ মুসলমান কন্যা আসমানীর প্রণয়াসক্ত হন, ব্যর্থ-প্রণয়ের পরিমাণে চন্দ্রাবতী কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করেন। জয়ানন্দ পরবর্তীতে অনুতপ্ত চিত্তে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে মিলনের জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। কিন্তু চন্দ্রবতীর চিত্তের কঠিন বহিরাবরণে প্রতিহত হয় জয়ানন্দের প্রয়াস। জয়ানন্দ নদীর জলে প্রাণ সমর্পণ করেন। চন্দ্রাবতী শিবের আরাধনায় দেহ ত্যাগ করেন।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের লিখিত কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নি। চন্দ্রনাথ দে ময়মনসিংহের মহিলা কণ্ঠ থেকে চন্দ্রাবতীর নামে প্রচলিত গান সংগ্রহ করেন। ময়মনসিংহে যখন বর বাসর ঘরে কনের সঙ্গে পাশা খেলে, তখন চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গাওয়া হয়। আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন যবদ্বীপের রামায়ণের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এই রামায়ণের সীতার জন্ম কাহিনী অদ্ভুত রামায়ণের অনুরূপ। বিষপান করে মন্দোদরী ডিম্ব প্রসব করলে তা থেকে সীতার জন্ম হয়।

"এই ডিম্বের কন্যা এক গো লভিবে জনম।
তাহা হইতে রাক্ষস বংশ, হইবে নির্ধন।।

রামের জন্ম কাহিনীও আলাদা। অপুত্রক রাজা দশরথ এক মুনির কাছে থেকে একটি ফল পেয়েছিলেন। সেই ফল রানীরা ভক্ষণ করলে তাদের সন্তান জন্মায়। রামের হরধনু ভঙ্গ থেকে রাবণ বধ-পর্যন্ত কাহিনীর সীতার বারমাস্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। সীতা নির্বাসনের কাহিনীটিও অভিনব। কৈকেয়ীর কন্যা কুকুয়াকে

রাবণের পরিচয় দেওয়ার সময় সীতা মাটিতে রাবণের চিত্র অঙ্কন করেন। চিত্রের পাশে শান্তি বশত সীতা ঘুমিয়ে পড়লে কুকুয়া রামচন্দ্রকে বলে

"শুন শুন দাদা ওগো কহি যে তোমারে।
বলিতে পাপের কথা গো, বাক্য নাহি সরে।।
বিশ্বাস না কর দাদা দেখ গো আসিয়া।
তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো, রাবণ বুকে লইয়া।।"

এই বলে সীতার বনবাসের কারণ। কুকুয়ার কাহিনীর পর আর কোনো অংশ পাওয়া যায় না।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। রামকাহিনীর সুষ্ঠু বিবরণ দেওয়া চন্দ্রাবতীর রামায়ণের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। অনুমিত হয়, বিভিন্ন মেয়েলী অনুষ্ঠানে গান করে শোনানোর জন্য রামায়ণটি রচিত হয়েছে। 'চন্দ্রাবতী' পালা অনুসারে আমরা জানতে পারি প্রণয় জনিত শোকের ভার কমানোর জন্য মানসিক শান্তিলাভের আশায় চন্দ্রাবতী রামায়ণ লিখেছিলেন। তাঁর ট্র্যাজিক জীবন এবং অকালমৃত্যুও রামায়ণটি অসম্পূর্ণ থাকবার অন্যতম কারণ হতে পারে।

সীতার জন্ম কাহিনীর অদ্ভুত রামায়ণের অনুকরণে বিবৃত হলেও কবির মৌলিকতার ছাপ আছে। যেমন—মন্দোদরী গর্ভ থেকে ডিম্ব জন্ম, রাবণ কর্তৃক ডিম্ব সাগরে নিক্ষেপ, জালিয়া পত্নী 'সতা' নামের সাদৃশ্যে সীতা নামকরণ ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে অলৌকিক ও যুক্তি বিহীন ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

কাব্যটির ভাষা আধুনিক। বিষয়বস্তুতে অর্বাচীনতার ছাপ আছে। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের ছায়াও কাব্যটিতে সমালোচকরা দেখতে পান। রাময়ণটি 'চন্দ্রাবতী'র রচনা কিনা, সে বিষয়েও সমালোচক প্রসাদ কুমার মাইতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৭.৬.৩ কাশীরাম দাসের মহাভারত

মহাভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। যদিও তিনি আঠারো পর্ব বিশিষ্ট মহাভারতের মাত্র সাড়ে তিনটি পর্বে স্বাধীন অনুবাদ করেছিলেন। তবু কথক, গায়েন ও লিপিকরের আনুকূল্যে তিনি লোকপ্রিয় গোটা মহাভারতের রচয়িতা হিসেবেই গত চারশো বছর ধরে বাঙালি সাধারণের কাছে পরিচিত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কাশীরাম দাসের কাব্য হিসেবেই প্রথম বাংলা মহাভারত মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন।

কাশীরাম দাস কৃত্তিবাসের পরবর্তী কবি হলেও তাঁর কাল ও পরিচয় নিয়ে কৃত্তিবাসের মতই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কবি মহাভারতের দু এক জায়গায় নিজের সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি করেছেন, তাঁর অগ্রজ-অনুজেরাও কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের কাব্য থেকেও কাশীরাম দাস সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কবিরা তিনভাই ছিলেন—কৃষ্ণরাম, কাশীরাম ও গদাধর। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। কেউ কেউ আবার এই গ্রামকে সিদ্ধি গ্রাম বলেন। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত, কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের পুত্রের নাম নন্দরাম দাস। কাশীরামের দু-একটি পুথিতে সাল তারিখ জ্ঞাপক পয়ারের নির্দেশ আছে। তা থেকে যোগেশচন্দ্র''র রাম বিদ্যানিধি ১৬০৪ ও ১৬০২-০৩ খ্রিষ্টাব্দের ইঙ্গিত পেয়েছেন। ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দ করা মহাভারতের পুথিও পাওয়া গেছে। সুতরাং মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকেই কাশীরাম তাঁর মহাভারত রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন।

কিন্তু কাশীরাম যখনই কাব্যানুবাদ শুরু করুন না কেন, তিনি সম্ভবত গোটা মহাভারত অনুবাদ করেন নি। কারণ কাশীরামের কোন কোন পুথিতে আছে—

আদি, সভা, বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেলা-স্বর্গপুর।।

সেখানে আরও বলা হয়েছে— কাশীরাম তাঁর কাব্য সম্পূর্ম করার ভাব নিয়ে যান ভ্রাতুস্পুত্র নন্দরামের হাতে। কাশীরাম যে অংশটুকু রচনা করেছেন তার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য থাকলেও পরের দিকে অন্যেরা লিখেছেন বলে অনুবাদের মধ্যে নানা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাহলেও কাশীরামের মহাভারত কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতোই খ্যাতি লাভ করেছে।

কারও কারও মতে কাশীরামের সংস্কৃতজ্ঞান ছিল না, সেজন্য তিনি মূল মহাভারত পড়েন নি, কথকদের মুখ থেকে মহাভারতের গল্প শুনে তাই-ই পয়ার ত্রিপদী ছন্দে লিপিবন্ধ করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ একান্তই অসঙ্গত বলে মনে হয়। কবির অনুবাদের সঙ্গে মূল মহাভারত মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় কবি সংস্কৃত ভালই জানতেন। এছাড়া মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক যেভাবে তিনি বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে রূপায়িত করেছেন, তাতে তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী বলেই মনে হয়। তবে বড় বেশি সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছে বলে তাঁর কাব্য কখনও কখনও অত্যন্ত কৃত্রিম ছাপ পড়েছে।

কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতে প্রথম চার পর্বে খুব সংক্ষেপে কাহিনী অনুসরণ করেছেন। কখনও কখনও নিজেও দুচারিটি গল্প বানিয়ে দিয়েছেন। যেমন শ্রীবৎসচিন্তার গল্প মধ্যযুগের অন্যান্য অনুবাদকদের মত কাশীরামের মহাভারত মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ বলা চলতে পারে। কবি প্রসন্ন ভঙ্গিতে পরিচ্ছন্নভাবে কাহিনীটির বিবৃত করেছেন। তবে তাঁর ভাষায় কখনও কখনও সংস্কৃত রীতির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর এই অনুবাদকের মহাভারত অনুবাদেও মধ্যযুগের সর্বব্যাপ্ত চৈতন্যপ্রভাব অনুভব করা যায়। কায়স্থ "দেব" বংশে জন্ম নিয়েও কাশীরাম নিজেকে 'দাস' —কৃষ্মভক্ত দাসানুদাস রূপে পরিচিত করেছেন। তাঁর হৃদয়ের রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই সবিনয়ে আত্মনিবেদনে, সমগ্র কাব্যে কবিপ্রাণের এই প্রেমানুরক্তির স্পর্শ বিকীর্ণ হয়েছে,—ফলে মহাভারতের বীর্যগাথা সবারুণ মূর্চ্ছনায় নবীন মধুর রূপ লাভ করেছ। কাশীরামের রচনা চৈতন্যোত্তর বাংলা প্রেম ভক্তি-রসে সমাকুল বলেই, বাভালির আনন্দের হাসি এবং বেদনার অশ্রুকে তা একসূত্রে গেঁথে তুলেছে। কাশীরামের তাঁর ভাষাভঙ্গিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দাঢ্য গ্রন্থন নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংনীয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে অর্জুনের রূপবর্ণনা উল্লেখ করা যায়—

অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।
সিংহগ্রীর বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।।
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি আনন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর।।

এছাড়াও তাঁর কাব্যের দু একটি জায়গায় বাঙালির ঘরের কথা যেন দু একটি রেখার টানে ফুটে উঠেছে। সভাপর্বে দ্রৌপদী, আর হিড়িম্বার যে কলহ বর্ণিত হয়েছ, তা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের দু সতীনের কলহের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

৭.৬.৪ রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ম প্রেমতরঙ্গিণী

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে মালাধর বসু একমাত্র ভাগবত অনুবাদক। আর চৈতন্যের কালে ভাগবত অনুবাদকের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ম প্রেমতরঙ্গিণী' রচয়িতা রঘুনাথ ভগবতাচার্য্য অগ্রগণ্য।

গ্রন্থের মধ্যে রঘুনাথ আত্মপরিচয় বিশেষভাবে কোথাও দেননি। ভণিতায় বেশির ভাগ সময়েই ব্যবহার করেছেন ভাগবতাচার্য উপাধি। মাঝে মাঝে দু-এক জায়গায় নিজের রঘুপণ্ডিত নামটি ব্যবহার করেছেন।

চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায়, চৈতন্যদেব গৌড় থেকে পুরীধামে ফেরার সময় বরাহনগরে রঘুনাথ নামে এক বৈষ্ণব বিপ্রের ঘরে কিছু সময় ছিলেন। তাঁর মুখের ভাগবত পাঠ শুনে মহাপ্রভু নিজেই তাঁকে ভাগবতাচার্য উপাধি দেন। রঘুনাথ গদাধরের শিষ্য ছিলেন। সম্ভবত চৈতন্যের দেখা পাওয়ার পরই তিনি ভাগবত অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী সম্পর্কে বৈষ্ণব মহাজনদের সশ্রদ্ধ উক্তি রয়েছে। কবি কর্ণপুর তাঁর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বলেছেন—

'নির্মিত পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যে গৌরাঙ্গাত্যন্ত বল্লভঃ।

যদুনন্দন দাসের 'শাখনির্ণয়ামৃত' গ্রন্থে রয়েছে—

বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ প্রিয় পাত্রকম্।
যেনাকারি মহা-গ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী।।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী অন্যান্য ভাগবত অনুবাদের মতই পয়ার ত্রিপদীতে লেখা কাব্য। বিষয়সূচি বিন্যাসে ও অনুবাদ কর্মের পরিপাট্যে এই গ্রন্থে কবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বারোটি স্কন্ধে তিনশো বত্রিশটা অধ্যায়ে আঠারো হাজার শ্লোকে নিবন্ধ ভাগবতের যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ সাধারণ মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা যে বেশ কঠিন হবে, তা বুঝেই রঘুনাথ ভাগবতকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার সুপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধকে সংক্ষেপিত করে তিনি শুধু মর্মানুবাদই করেছেন।

ভগবাতের এই কাহিনী অনুবাদের বিশ্বসততার মাঝখানেই শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যখন দেখি ষষ্ঠস্কন্ধের অজামিল-উপাখ্যানের উপক্রমণিকারূপে মঙ্গলাচরণে কবি পদ্যাবলির নাম মাহাত্ম্যমূলক ২০ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এটি চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিধর্মেরই নিদর্শন। এছাড়া চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভাগবতের দশম স্কন্ধের অসামান্য গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কবি এই স্কন্ধের প্রারম্ভে নতুনভাবে মঙ্গলাচরণ করেছেন।

এবার ভাগবতীয় কৃষ্ণকথার অনুবাদক হিসেবে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃতিত্ব আলোচনা করা যেতে পারে। দশম স্কন্ধের কৃষ্ণ জন্ম প্রসঙ্গই ধরা যাক। ভাগবতের কবি কৃষ্ণের জন্মলগ্ন বর্ণনায় শান্ত সুন্দর স্নিগ্ধতার সঞ্চার করেছেন— 'নদ্যঃ প্রসন্ন সলিনী হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ। দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ/ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ/অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত।।"

রঘুনাথের অনুবাদ—নদনদী সরোবর বিমলিত জল/বিকশিত উতপল কুমুদ কমল।/খগভৃঙ্গ নিনাদিত স্তবাকিত বল।/সুললিত পুণ্যগন্ধ সুমন্দ পবন/শান্ত হৈয়া জ্বলিল দ্বিজের হুতাশন।।

মূলানুগত্য সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ভাষাকে কবি নিজের মতো ব্যবহার করেছেন। যেমন প্রসন্নসলিলা তাঁর অনুবাদ 'বিমলিত জল' হয়ে বাংলা ভাষার প্রবহমানতাকে রক্ষা করেছে। আবার 'জল রুহশ্রিয়ঃ' শব্দকে বিস্তৃত করে তিনি করেছেন 'বিকসিত উতপল কুমুদ কমল।'

আবার কখনও কখনও ভাগবতের কাব্য সৌন্দর্য সুরভিত পদ থেকে কবি কেবলমাত্র ভক্তিরস কাহিনীটুকু ছেঁকে নিয়ে অনুবাদের যথার্থ্যকে বজায় রাখতে চেয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ভাগবতের দশম স্কন্ধে পড়ে ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীযুগল গীতের একাংশের তুলনা করা যেতে পারে।

মূলের কাব্য সৌন্দর্য্য ও ধ্বনিমাধুর্য তাঁর তাঁর অনুবাদে কিছুই সঞ্চারিত হয়নি। কিন্তু কথা অংশ অবিকৃতভাবে

পরিবেশিত হয়েছে। আবার কখনও কখনও তাঁর অনুবাদ কাহিনীকে অবিকৃত রেখেও মূল কাব্যের সৌন্দর্যের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে।

দেখা যাচ্ছে ভাগবতের কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুবাদক হয়েও ভাগবতাচার্য এই কাব্যে তাঁর মৌলিক কবি প্রতিভার পরিচয়ও রেখেছেন। রঘুনাথের সময়ে পৌরাণিক কৃষ্মকথার সঙ্গে লোকায়ত কৃষ্ম কথার মিশ্রণ বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেব দানলীলা, নৌকালীলার গভীর অন্তরঙ্গ জীবনরসকে আধ্যাত্মিক মহিমায় মন্ডিত করে গ্রহণ করেছেন। তার প্রমাণ চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদগণ কর্তৃক এর অভিনয়। কিন্তু এরই মাঝখানে রঘুনাথ চেষ্টা করেছেন বিশুদ্ধ ভাগবতীয় কৃষ্মকথা প্রচারের এবং তারও উদ্দেশ্য লোক সাধারণের 'অশেষ দুরিত' হরণ। অর্থাৎ এর থেকে আমরা স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, লৌকিক কৃষ্মকথার মধ্যে অনাবৃত গ্রাম্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার যে প্রবণতা, তাকে সব বৈষ্মব মনে প্রাণে সে দিনও গ্রহণ করতে পারেন নি।

৭.৬.৫ মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্মমঙ্গল

মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্মমঙ্গল কাব্যটির স্বীকৃতি পাওয়া যায় বিভিন্ন বৈষ্মব মনিষীর শ্রদ্ধা নিবেদনে। শ্রী চৈতন্যের সমসাময়িক কবি দেবকীনন্দন মাধবাচার্যের বন্দনা করে বলেছেন—'মাধব আচার্য্য বন্দা কবিত্ব শীতল।/যাঁহার চরিত গীত শ্রীকৃষ্ম মঙ্গল।।/'

চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

তবে তা বন্দনা কৈল মাধব আচার্য্য।
কৃষ্ম গুণ বর্ণন সদাই যাঁর কার্য্য।
যে কৃষ্মমঙ্গল কৈল ভাগবতামৃতে।
যে গীত বিদিত হইল সকল জগতে।।

কিছু কিছু বৈষ্মব গ্রন্থের সাক্ষ্যে এই মাধবাচার্যকে বিষ্মপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা বলা হয়েছে। কিন্তু এর বিরুধ্বে অন্য গ্রন্থের সাক্ষ্য থেকেই শ্রীকৃষ্মমঙ্গল রচয়িতা মধবাচার্যকে পৃথক ব্যক্তি বলে ধরে নিতে হয়। আবার এই শ্রীকৃষ্মমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজমাধব ও চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধব একই ব্যক্তি কিনা তা নিয়েও নানা বিতর্ক আছে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তাঁর মতে দ্বিজ মাধবের নামে প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ম-মঙ্গল একই ব্যক্তির লেখা। আমার দেখেছি শ্রীকৃষ্ম মঙ্গলের বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও পুঁথিতে এই দুটি ছত্র পাওয়া যায়—পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার/মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার।। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৭৭ সংখ্যক পুঁথিতেও এই দুটি ছত্র রয়েছে। সাহিত্য পরিষদকে প্রদত্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুঁথিতেও (পুথি সংখ্যা ১৯৫৯, লিপিকাল ১২০৪) পরাশরের প্রসঙ্গ আছে—পরাশর নামেতে আছিল দ্বিজবর/নানা গুণে পরিপূর্ণ তার কলেবর/কবিবল্লভ বলি ক্ষাতী হইল তাহার/তাঁর দুই চরণে হইলুঁ নমস্কার। আর চণ্ডীমঙ্গলের সমস্ত পুথির উপক্রমে পাওয়া যায়—পরাশর স্যূত হয় মাধব তার নাম/কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপাম।। গঙ্গামঙ্গলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্মমঙ্গলের ভণিতার মিল খুব বেশি। গঙ্গামঙ্গলের আছে—চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল/দ্বিজমাধব কহে শ্রীকৃষ্ম মঙ্গল। সুতরাং এই গুলি থেকেই অনুমিত হয় তিনটি কাব্য একই ব্যক্তির লেখা। দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনা কাল দিয়েছেন ইন্দু বিন্দু বাণধাতা শক নিয়োজিত/দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত। অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯-৮০ খিষ্টাব্দ। অন্যদিকে দৈবকীনন্দনের বৈষ্মব বন্দনায় মাধবাচার্য্যের উল্লেখ আছে। দৈবকীনন্দন নিত্যানন্দের প্রিয়পাত্র পুরুষোত্তমের শিষ্য। তাই তাঁর বৈষ্মববন্দনার রচনাকাল ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী নয়। সুতরাং দ্বিজ মাধব অনেক আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন ধরে নিতে হয়। তাহলে উপরোক্ত তারিখটির সঙ্গে আর বিরোধ থাকে না। অতএব এই তারিখটিকেই আমরা মাধবচার্যের কাল বলে গ্রহণ করেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দই কবির প্রধান অবলম্ভবন। কিন্তু তা হলেও ভাগবতের অন্যান্য স্কন্দ থেকে এবং ভাগবত ছাড়াও অন্যান্য কিছু কিছু পুরাণ থেকে যে কবি উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তা তাঁর নিজেরাই স্বীকৃতি থেকে জানা যায়

(১) রাজ রাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে/বিস্তারি কহির তাহা হরিবংশ মতে। (২) পারিজাত হরণ ঈষৎ ভাগবতে/বিস্তারি কহিব বিষ্ণু পুরাণের মতে। এছাড়াও আলোচনার মুখে দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের মত বিষয় বস্তুও আমরা এর মধ্যে দেখতে পাব। দ্বিজমাধবের কাব্য কেবল পয়ার ত্রিপতীতে রচিত একটি কাব্য নয়, রঘুনাথের মত এঁর কাব্যেও মাঝে মাঝে পদ রয়েছে। কবি সেই পদগুলিতে রাগরাগিনীর উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলের প্রথম অংশের গণেশ বন্দনায় কবি গণেশকে পরম বৈষ্ণব বলে অভিহিত করেছেন এবং চৈতন্য দেবের বন্দনা করেছেন। চৈতন্য পরবর্তী কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট প্রবণতাই এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কাব্য রচনার উদ্দেশ্যও সর্বসাধারণের মধ্যে ভাগবতের প্রচার ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্বজনে/ লোকভাষা রূপেতে কহিব পরমাণে। মঙ্গলাচরণে কবি দ্বাবিংশতি অবতারের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গৌরাঙ্গ অবতার।

কংসের অত্যাচারে পীড়িতা পৃথিবীর দেব সন্নিধানে কাতর আবেদন থেকে অর্থাৎ দশম স্কন্ধের একেবারে গোড়া থেকে কাহিনীর শুরু। ভাগবতের মধ্যে শিশু কৃষ্ণ বলরামের চাপল্যময় বাল্যলীলার নানা বর্ণনার সঙ্গে কখনও কখনও মাধবাচার্য বাঙালি মায়ের বাৎসল্য সঞ্চার করতে পেরেছেন এগুলি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। যেমন মাতা যশোদার কৃষ্ণ বলরামকে স্নান করানো, ঘুমপাড়ানোর দৃশ্যটি এবং পরিচিত ও জীবন্ত যে, একেবারে আমাদের চোখের সামনেই ভেসে ওঠে মনে হয়।

দ্বিজমাধবের অনুবাদ যেখানে সম্পূর্ণ মূলাযুগ, সেখানেও কাহিনীর যথার্থ বজায় রেখে তা স্বচ্ছন্দ ও স্পষ্টার্থক। ভাগবতের কবি ঐশ্বর্যময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিপুল বিভূতি প্রদর্শন করেছেন, আরকবি দ্বিজ মাধব সেই ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণকথাকে বাঙালি সাধারণের ভক্তিভাবুকতা জাগানোর জন্য তুলে ধরতে গিয়ে বাংলার সজল মৃত্তিকার রং তাঁর উপর বুলিয়েছেন। এইভাবে ভাগবতের মত বিশুদ্ধ ধর্মীয় পুরাণ বর্ণিত কৃষ্ণকথা ধীরে ধীরে বাঙালির প্রাণের কথা হয়ে উঠেছে। তবে এই কবি তাঁর কাব্যে প্রথমে রাধাকৃষ্ণের বন্দনা করলেও কালীয় দমন লীলায় শোকার্ত গোপীগণের মধ্যে রাধার নাম করেননি, অথচ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই প্রসঙ্গে রাধার নাম রয়েছে। ভাগবতের বস্ত্রহরণ লীলা প্রসঙ্গেও কবি রাধার নাম করেননি। কিন্তু এই পর্যন্ত এসে, বস্ত্রহরণলীলার পর কবি সুকৌশলে তাঁর কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মত দানলীলার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের দান খণ্ডের সঙ্গে এই কাহিনীর হুবহু মিল নেই। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বড়াই রাধার শাশুড়ীকে বলেছেন রাধাকে দিয়ে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করানোর কথা। কিন্তু এখানে গোপিনীরা নিজেরাই শাশুড়ী ও স্বামীর কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছে, এবং এদের মধ্যে রাধাও রয়েছেন। এছাড়াও কবি তাঁর কাব্যে রাধাকে প্রধানা গোপিনী বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী রাধারই আর এক নাম। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে চন্দ্রাবলী রাধার একজন সখী। এখানেও বড়াই চরিত্রটি উপস্থিত। তবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মত তাঁর ভূমিকা এখানে সক্রিয় নয়। বরং যেটুকু ভূমিক রয়েছে তাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিপরীত। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা ও গোপীদের মিলনের সময় বড়াই বাধা দিয়েছে। কোন প্রকার সহায়তা করেনি। দানলীলার সঙ্গে নৌকালীলার ও এই কবির কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। নৌকালীলার কাহিনীতে এখানে একটু নতুনত্ব আছে। ঝড়ের সময় গোপিনীরা নৌকার ভার হাল্কা করার জন্য কৃষ্ণের পরামর্শে বস্ত্র অঙ্কার জলে ফেলে দিলেন। কিন্তু তারপর গোপিনীরা কৃষ্ণের কাছে বস্ত্র অলঙ্কার ফেরত চাইলে তিনি যমুনাকে সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। কৃষ্ণের আদেশে যমুনা সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার ফিরিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডে এই প্রসঙ্গ নেই। নৌকালীলা বর্ণনার পর কবি আবার ফিরে গেছেন ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলা বর্ণনায়।

ভাগবতকার রাসলীলার তীব্র আদিরসকে সমুচ্চ আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত করেছেন এবং এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যেরও চরম প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যে নিজেই বিবৃতিকার। তাই রাসলীলা যে লৌলিক দৃষ্টিতে বিচার করা চলবে না তা তিনি নিজেই বলেছেন। শুকদেবের মুখ দিয়ে বিবৃত করেননি।

কৃষ্ণের কাছে রুক্মিনীর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ ও কৃষ্ণের রুক্মিনী হরণের বিবরণে দ্বিজমাধব বিশ্বাস্তভাবেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ভাগবতের দশম স্কন্ধে চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়ের শেষ দিকে কৃষ্ণ রুক্মিনী বিবাহ প্রসঙ্গ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। অথচ দ্বিজমাধবের কাব্যে এর সুবিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। বাঙালি হিন্দু-বিবাহের একটি চমৎকার

পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই উপলক্ষে কবি দিয়ে ফেলেছেন। ভাগবতানুসারী কৃষ্ণ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তারই মাঝখানে বাঙালি পরিবারের একটি অপরিহার্য বিষয়কে অবলম্বন করে গার্হাহ্যরস পরিবেশন করেছেন। তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার মূলে এটি নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী উপাদান।

বাৎসল্য রস সৃষ্টিতে বিশেষ করে পুত্রহারা জননীর বেদনা বর্ণনায় কবি বিশেষভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য অংশেও যেমন হরিবংশের বজ্রনাভ প্রসঙ্গ বর্ণনায় কবি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই কবির ভণিতায় চৈতন্যদেবের উল্লেখ বহুবার রয়েছে। যেমন-

(১) কলিযুগে শ্রীচৈতন্য প্রেমরসে ধন্য,/দ্বিজ মাধব কহে সার।।

(২) চৈতন্য চরণ ধন শিরে করি আভরকণ,/ভূদেব মাধব ভাসে।।

(৩) চৈতন্য চরণে মাধব গান

(৪) অবতার শেষ চৈতন্যপ্রকাশ,/মাধব কহে সঙ্গীতি।।

(৫) শেষ অবতার শ্রীচৈতন্য শ্রীপাদে/অনন্ত মূরতি গোসাঞি হয় যুগভেদে।। যাহার প্রাসাদে নৃত্য কীর্তন প্রচার/কহে দ্বিজ মাধব সেই জগতনিস্তার।

(৬) কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার/দ্বিজমাধব কহে বিঙ্কর তাহার।।

এর আগে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীতে ভাগবতের অবিকল বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু দ্বিজ মাধবের ভাগবত অনুসরণে বিশুদ্ধিরক্ষার সেই প্রয়াস নেই। আরও পাঁচটা পুরাণ থেকে এক্ষেত্রে তনি যেমন কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। তেমনি লৌকিক উপাদান থেকেও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু আহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কবি কৃষ্ণকথাকে সর্বতোভাবে লোক সাধারণের উপযোগী করে তোমার সচেতন চেষ্টা করেছেন।

৭.৬.৬ দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দ মঙ্গল

দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দ মঙ্গল কাব্যটিও ভাবতেরই অনুবাদ। মাধবাচার্যের মত ইনিও প্রধানত ভাগবতের দশম স্কন্ধকে অবলম্ভবন করেছেন এবং প্রথম দুটি স্কন্ধ ও শেষের স্কন্ধ থেকে দরকার মত কথাবস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। মাধবাচার্য যেমন স্বল্প হলেও তাঁর কাব্যে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের কথা অংশ গ্রহণ করেছেন, তেমনি দুঃখী শ্যামাদাসও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ থেকে কোন কোন কাহিনী গ্রহণ করে তাঁর কাব্যের কৃষ্ণকথায় বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন।

কবি শ্যামদাস জন্মগ্রহণ করেন মেদিনীপুর জেলার কেদারকুণ্ড পরগনার হরিপুর গ্রামে। কবি শ্যামদাসের মত তিনি দে উপাধিধারী কায়স্থ বংশীয় অবশ্য কাব্যের মধ্যে তিনি সব জায়গাতেই দাস উপাধি ব্যবহার করেছেন। সম্পাদক ঈশান চন্দ্র বসু ভূমিকায় বলেছন, উনবিংশ শতব্দীর শেষ দিকেও কবির বাস্তুতে তাঁর একাদশ অধস্তন পুরুষ সীতানাথ অধিকারী বাস করতেন। স্বাভাবিকভাবে প্রতি তিনি পুরুষে একশ বছর ধরা হলে, কবির আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হয়। ড. সুকুমার সেনের মতে, কবির পিতা শ্রীসুখ, কাশীরাম দাসের খুলল-পিতামহ। তিনি পুরুষে একশো বছরের হিসাব ধরে ড. সেন কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে, কবি শ্যামদাস ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে তাঁর কাব্য রচনা করেন।

কাব্যের প্রতম দিকে কবি ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ থেকে পরীক্ষিতের কাহিনী রচনা করেছেন। পরে ভাগবতের মতো শুকদেবের মুখ দিয়ে কৃষ্ণকথা বলানো হয়েছে পরীক্ষিতের শোনার জন্য। এখানে দ্বিজমাধবের সঙ্গে দুঃখী শ্যামদাসের পার্থক্য। দ্বিজমাধব তাঁর বক্তব্য শুকদেবের মুখ দিয়ে বর্ণনা না করে সরাসরি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি ভাগবতকে অনুসরণ করলেও কৃষ্ণকথাই যে তাঁর একমাত্র উদ্দিষ্ঠ তা এভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে দুঃখী শ্যামদাস ভাগবতের আবহটিকেই তাঁর কাব্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। তবে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে যে সব অংশ তাঁর গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, সেগুলির আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করেননি। নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী সংক্ষেপিত,

বিস্তৃত অথবা পরিবর্তিত করেছেন। যেমন কলি ও ধর্মের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ও কলি দমন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায় থেকে গৃহীত। ভাগবতে আছে, কলির হাতে নিগৃহীত একপদধারী বৃষরূপী ধর্মকে পরীক্ষত তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় না দিয়ে রাজাকে বুঝে নিতে বলেছেন। কিন্তু দুঃকী শ্যামদাসের কাব্যে ধর্ম নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

শুন রাজা বিবরণ আমি ধর্ম নিরঞ্জন
কলিভয়ে পাইল তাড়না।

পুতনা বধ প্রসঙ্গে কবি ভাগবতকে হুবহু অনুকরণ করেননি। নিজস্ব কল্পনা প্রয়োগ করে কাহিনীটিকে বাস্তব করে তুলেছেন। ভাগবতে আছে, পুতনাকে দেখে জননী যশোদা ও রোহিনী এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে, সে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলে তাঁরা নিবারণ করতে পারলেন না। কিন্তু শ্যামদাসের কাহিনীতে আছে, পুতনা—'যশোদার কাছে কহে সকরুণ হেয়া।।" আমার দুঃখের কথা না যায় কথন/পুত্রশোকে তেয়াগিনু আপন ভবন।।.....

শুন গো সুন্দরী তব আছয়ে কুমার/স্তনপান দিয়া থাকি যদি দেহ ভার।।"

পুতনার এই কথা শুনে যশোদা রোহিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন—'যাদুয়ার ধাত্রী কবি রাখিব ইহারে।"

এই কাহিনী অনেক বেশি মানবিক ও বাস্তব সমত। নিঃসন্দেহে এই কবিরও বৈশিষ্ট্য বাঙালি প্রবণতারই পরিচায়ক। ভাগবতের অনুসারী কৃষ্মমঙ্গলগুলির অবলম্ভিবত কৃষ্ণকথা ধীরে ধীরে কেমন বাঙালির নিজস্ব প্রবণতায় অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে, উদাহরণটি তারই সাক্ষ্য দেয়।

কৃষ্মের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে কবি রাধার প্রতি বালক কৃষ্মের আদিরসাত্মকআচরণের ভাগবত বহির্ভূত চিত্র অঙ্কন করেছেন—"কবরী খসায় কৃষ্ম পাইপ কৌতুকে।/কাঁচলি চিরিয়া নখে কুচযুগ দেখে।।/রাধার বলে না জানিয়া কোলে কৈনু কেনে।/শিশু মূর্তি দেখিতে এমন কেরা জানে।।"

বরুনাল থেকে নন্দের উদ্ধার প্রসঙ্গের পর কবি রাধাকৃষ্ম মিলন প্রসঙ্গ এনেছেন। রাধা এবং কৃষ্মের প্রথম সাক্ষাতের চিত্রটি মনোরম—"রাধা কানু আঁখি আঁখি হৈল দরশন।/মুখে মৃদু হাসি রাধা ঝাঁপিল বসন।।"

কবির এই কাব্যে বড়াই, শ্রীকৃষ্মকীর্তনের বড়াইর মত রাধা কৃষ্মের প্রেমে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তার বর্ণনাও প্রায় শ্রীকৃষ্মকীর্তনেরই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্মকীর্তনের মত এখানেও বড়াই কৃষ্মের দূতী হয়ে রাধার কাছে গমন করেছে। রাধা বড়াইকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বটে, তবে শ্রীকৃষ্মকীর্তনের রাধার মত অপমান করে তাড়িয়ে দেননি, এবং অবশেষে বড়াইর প্ররোচনাতেই তিনি কৃষ্মের সঙ্গে মিলিত হতে রাজি হয়েছেন।

কবি রাধাকৃষ্মলীলা কথার এই লোকরঞ্জক অংশকে সুকৌশলে যেন ভাগবতের মধ্যেও টেনে এনেছেন। তাঁর কাব্যের এই অংশটিরও শ্রোতা পরীক্ষিত এবং বক্তা শুকদেব।

দুঃখী শ্যামদাস তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্মের মামী ও ভাগিনের সম্পর্কটি বজায় রেখেছেন। তবে এই রাধা শ্রীকৃষ্মকীর্তনের রাধার মত সাগর গোপাল কন্যা নন, ইনি "বৃষভানু রাজার নন্দিনী"।

নৌকালীলার বর্ণনাও কবি শ্রীকৃষ্মকীর্তনের অনুসারি তবে শ্রীকৃষ্মকীর্তনের নৌকাখণ্ডে গোপিনীরা কৃষ্মানুরক্তা ছিলেন না। কিন্তু এখানে কৃষ্ম রাধা সহ জলে ডুবে গেলে, গোপনীরা এই বলে আক্ষেপ করেছেন—"কামনা করিপ পূর্বে গোপিকা হয়েছি এবে/সাধ আছে ভক্তির মুরারি।/আমা সবা ভাগ্যে নাই সৌভাগ্যে সুন্দরী রাই/ সেই সে নিদানে পাইল হরি।"

রাধাকৃষ্মের লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি পদ্মপুরাণের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। কবি যে যোগপীঠরে বর্ণনা দিয়েছেন তা পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের অনুকরণে

দ্বিজমাধবের ভণিতায় বারবার চৈতন্যপ্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু দুঃখী শ্যামদাসের পদে তা না থাকলেও আখ্যান বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে পদরচনা বৈশিষ্ট্যই চৈতন্য পরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের প্রভাব বিষয়ে আমাদের নিঃসংশয় করে। ভাগবতের কৃষ্মকথা আপামর বাঙালি জনসাধারণকে পরিবেশন করতে গিয়ে এঁরা ভাগবতের সরল বঙ্গানুবাদের সঙ্গে মিশিয়েছেন লোকসমাজ প্রচলিত রাধাকৃষ্ম প্রেমকাহিনী, আর তারই সাথে যুক্ত করেছেন পদাবলি গীতরস ও ভাবগভীরতা। এইভাবে কেবলমাত্র বিবৃতিধর্মিতা পরিহার করে কৃষ্মকথা হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের আস্বাদনীয়।।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৮ □ বাংলাসাহিত্য ঃ চৈতন্যোত্তর পর্ব

গঠন

৮.১ প্রস্তাবনা
৮.২ বৈষ্ণবপদাবলি
৮.৩ বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন
৮.৪ চরিতকাব্য
৮.৫ মনসামঙ্গল কাব্য
৮.৬ ধর্মমঙ্গল
৮.৭ অন্নদামঙ্গল
৮.৮ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
৮.৯ শিবায়ন
৮.১০ অনুবাদকাব্য
 ৮.১০.১ শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ
 ৮.১০.২ রামানন্দ ঘোষের রামায়ন
 ৮.১০.৩ দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত
 ৮.১০.৪ গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত
 ৮.১০.৫ নন্দরাম দাসের মহাভারত
 ৮.১০.৬ শঙ্কর কবিচন্দ্রের ভাগবত
 ৮.১০.৭ দীন বলরাম দাসের ভাগবত
 ৮.১০.৮ দ্বিজ রমানাথের ভাগবত
৮.১১ শাক্তপদাবলি
৮.১২ নাথসাহিত্য
৮.১৩ মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা
৮.১৪ চট্টগ্রাম রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয়বাক্য
৮.১৫ অনুশীলনী
৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ প্রস্তাবনা

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে এপর্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলি, চরিতকাব্য, অনুবাদ কাব্য প্রভৃতি পুরানো ধারাগুলি যেমন এ পর্বে বজায় রয়েছে, তেমনি নতুন কয়েকটি ধারারও আবির্ভাব ঘটলো। যেমন শাক্ত পদাবলি, নাথ সাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা এবং চট্টগ্রাম-রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয় কাব্যের ধারা।

৮.২ বৈষ্ণব পদাবলি

★ রাধামোহন ঠাকুর

বিশ্বপতি চক্রবর্তীর সমসাময়িক কালেই রাধামোহন ঠাকুরেরও আবির্ভাব হয়। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রাধামোহন অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইনি জয়পুর রাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত করে পরকিয়া মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। "পদামৃতসমুদ্র" তাঁর বিখ্যাত পদসংকলন গ্রন্থ। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ খিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাধামোহনের বেশিরভাগ পদই উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত বিভিন্ন ভাবের উদাহরণ দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। কথিত আছে, গোবিন্দ দাস যে সমস্ত ভাব নিয়ে পদ রচনা করেননি, ইনি সেইগুলি নিয়েই পদ রচনা করেছেন এবং এইভাবে কীর্তন গানের চৌষট্টি রসকে পূর্ণতা দান করেছেন। রাধামোহন তাঁর সংকলিত পদামৃতসমুদ্রের 'মহাভাবানুসারিনী' নামে টীকাও রচনা করেছেন।

রাধামেহান ঠাকুর সংস্কৃত এবং ব্রজবুলি, উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবে শব্দের হিল্লোলিত বিলাস রয়েছে—

"মরকত মঞ্জুল কান্তি যশোহর/মানিনি-মান-বিমোহ।
মাথহিঁ মোর মুকুট ধর সুন্দর/ মোহন পিত পট
শোহ।।/মাধব মধুর মুরতি জনু কাম।।/মাধবি-মল্লি-
মুকুলবর-মাধরীৎমালতি-মিলু ধাম ধাম।।"

এই শব্দবিলাস গোবিন্দ দাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পূর্বরাগের দশ অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায় নিয়েই রাধামোহন পদরচনা করেছেন, একটি পদে রাধা পূর্বরাগের দশমী অবস্থার চরম পর্যায়ে পৌঁচেছেন। সখী কৃষ্ণের কাছে রাধার অবস্থা জানিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণ রাধার কাছে আসেননি। সখী একা ফিরে এলে রাধা বলেছেন, কৃষ্ণ যদি রাধাকে উপেক্ষা করেন, তাহলে—

"তুহুঁ কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়াসি/কিয়ে পুন কয়লি অকাজ।" এরপর মৃত্যু দশার দ্বারপ্রান্তে উপনীতা রাধা সখীকে সম্ভোধন করে বলেন—

"ইহ বন্দাবনে দেহ উপেখব/মৃতু তনু রাখবি হামার।/কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পায়র/তবহুঁ মনোরথ পূর।।"

সখীর কাছ থেকে রাধার এই অবস্থার কথা জেনে কৃষ্ণ রাধার অভিসারে চললেন। কৃষ্ণের অভিসার বর্ণনায় রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণের যে ভাবরূপ অঙ্কন করেছেন, তা চৈতন্যদেবেরই মূর্তি। "চলতেই খলই চলই শাহি পারই/কত কত ভাব বিথারি।" বাসক সজ্জিকা রাধার সঙ্গে মিলনের শেষ কৃষ্ণ রাধার বেশবাসও বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, এছাড়া কবি ধীরা মধ্যাখণ্ডিতা এ অধীরা মধ্যাখণ্ডিতা রাধাকে নিয়েও পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি বর্ণিত নানা পর্যায়, যেমন মানান্তে মিলন, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, মান প্রকারান্তর অকারণমান, শ্রীরাধার স্বয়ং দৌত্য, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য প্রভৃতি পর্যায় নিয়ে কবি পদ রচনা করেছেন। রসালসের পদে উভয়ের সদ্যবিচ্ছেদ ভারাক্রান্ত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন—"একহি পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন/অতয়ে সে মানয়ে দুখ।।" শ্রীরাধার হিমকালের অভিসারও এই কবির পদে রয়েছে। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের গৌরী আরাধনা ছলে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনপ্রসঙ্গ পদাবলি সাহিত্যের একটি পরিচিত কথাবলম্বন। রাধামোহন তা নিয়েও পদ রচনা করেছেন। মিলন পর্যায়ের একটি পদে কবি কৃষ্ণের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ভাবের আন্তরিকতায় অতুলনীয়। "নূপুর কলরব

শুনইতে মাধব/কুঞ্জকে হোই বাহার।/চলইতে খলই বলই সব আভরণ/অম্বর হত সম্ভার।।" প্রকৃতপক্ষে রাধামোহন রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়গুলি নিয়ে সাত্ত্বিকভাবেই পদ রচনা করে গেছেন। কথাবস্তু বা ভাববস্তুর দিক দিয়ে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তাঁর পদে লক্ষ করা যায় না। গ্রীষ্মকালে রাধাকৃষ্ণের সরোবর মন্দিরে মিলনের প্রসঙ্গও কবি বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আছে, কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে যাচ্ছেন, তখন রাধা তার রথের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেইসময় রাধার অবস্থা বর্ণনা করে বৃন্দা বলেছেন, শ্রীরাধা কখনও বা বিলাপ করতে করতে রথের সামনে লুটিয়ে পড়ছেন, কখনও বা সজল চোখে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, কখনও বা দন্তে তৃণধারণ করে বলরামের সামনে আছড়ে পড়ছেন। হায়, এ দেখে কার না অত্যন্ত দুঃখ হয়।

রাধামোহন এই প্রসঙ্গ নিয়েই রাধার ভবন বিরহের পদ রচনা করেছেন—"খেনে খেনে কান্তি লুঠই রাই রথ আগে/খেনে খেনে হরি মুক চাহ।/খেনে খেণে মনহি করত জানি ঐছন/কানু সঞে জীবন যাহ। ***** খেণে তৃণ মুখে ধরি রথক আগুসরি/আছড়ি পড়ল নজ অঙ্গে।" পদের প্রথম চরণে কবি মূলকে অনুসরণ করে, পরের চরণেই বলেছেন, রাধা ক্ষণে ক্ষণে এমন মনে করেছেন যে, কৃষ্ণ চলে যাওয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণও বুঝি চলে যাবে। অর্থাৎ কৃষ্ণের বিরহে রাধা মৃত্যু মুখে উপনীত হয়েছেন। এই অংশ পদকর্তার নিজের মৌলিক সংযোজন, এটি খুব সঙ্গতভাবেই পদের মধ্যে এসেছে। রাধা ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন, আবার বিরহের তরঙ্গে ডুবে যাচ্ছেন। সমস্তই কবির নিজস্ব কল্পনা, পদের শেষে কৃষ্ণের মথুরা গমনের সময় শ্রীরাধার অচৈতন্য হয়ে পড়া এবং অক্রুরের রথ নিয়ে প্রস্থান রামমোহনের নিজস্ব কল্পনা। শুধু তাই নয়, কবির কল্পনা আরও অগ্রসর হয়ে অপর একটি পদে রাধার পরবর্তী অবস্থার বর্ণনাও দিয়েছে।

শ্রীরূপের "হংসদূত" কাব্যের প্রভাবেও রাধামোহন ঠাকুর কিছু পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের কাব্যে ললিতা হংসকে সহৃদয় বলে সম্বোধন করে নিজের বিরহদুঃখের বিষয় জানিয়েছেন। এই কবির পদে সেই ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে—'সজনি অদভূত প্রেমক রীত/তিরযক জঙ্গম ইহ নাহি জানত/কহতাহি কত বিপরীত।।/তুহুঁ অতি নিরমল অন্তর কোমল/পরম-হংস দয়াশীল।" কিন্তু শুধু নিজেদের দুঃখের কথা নয়, মথুরায় গিয়ে হংসকে তো আগে কৃষ্ণকে চিনতে হবে। তাই শ্রীরূপের 'হংসদূত'-এ ললিতা হংসের কাছে কৃষ্ণের পরিচয়ও বিস্তৃত ভাবে দিয়েছেন। রাধামোহনও এইভাবের একটি পদ রচনা করেছেন—"যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ/যো অবধারবি যদুকুল চন্দ।।/শুন তভু কহি কিছু নিরুপম রূপ।/জগজনলোচন-অমিয়া স্বরূপ।/লাবণি-লহরি ললিত সব অঙ্গ।/ভ্রু বধূ-নটন মদন ধনু-ভঙ্গ॥"

এখানে কবি শ্রীরূপের পদের অনুসরণেই কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপের 'হংসদূত' বর্ণিত ঘটনার পরেও রাধামোহন নিজের কল্পনায় পরবর্তী ঘটনা ভেবে নিয়ে তাকে বিষয় বস্তু করে পদ রচনা করেছেন। অবশ্য এটি তাঁর মৌলিক কল্পনা নয়, এক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরী গোবিন্দ দাসের দ্বারা প্রভাবিত। রাধামোহনের পদে রয়েছে, ললিতার কথা শুনে হংস উড়ে চলে গেলে, যেখানে রাধা কিশলয় সজ্জায় শয়ন করে আছন, ললিতা সেখানেই ফিরে গেলেন, চতুর্দিকে সখিরা সবাই রাধাকে ঘিরে ধরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন—"হেরি ললিতা সবুহুঁ পরবোধই/কহতাহিঁ মৃদু মৃদু ভাষ॥/এ দুখ কহিতে বর দূত পাঠায়লুঁ/মধুপুব কানুক পাশ/এত শুনি বিরহিনি চেতন পাওল/হোয়ল জিবনক আশ।" এখানে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য সখীদের তুলনায় ললিতা অনেক বেশি পরিমাণে চিত্তস্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, শ্রীরূপের বর্ণনায় ললিতার চরিত্রের এই দিকটির উল্লেখ নেই। এটিও কবি নিজেই কল্পনা করে নিয়েছেন এবং এটি অত্যন্ত সঙ্গত কল্পনা। কারণ, সখীদের মধ্যে একমাত্র ললিতাই তাঁর দুঃখের কথা হংসের কাছে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। ফলে তার বেদনার ভারও অনেকখানি কম হয়েছে। সেই কারণেই তিনি স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। রাধামোহন সখীর মুখ দিয়ে শ্রীরাধার বারো মাসের বিরহ বেদনা বর্ণনা করেছেন। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলিকারেরা কল্পনা করেছেন যে, বিরহিনী রাধাকে দেখার জন্য কৃষ্ণ মথুরায় ফিরে এসেছিলেন। রাধামোহন সেই ঘটনাকে গ্রহণ করে একটি পদে কৃষ্ণের মথুরা থেকে ব্রজে আগমন ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা নিয়েও কবি কিছু পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের বিদগ্ধ মাধবের কোন কোন শ্লোক অনুসরণেও রাধামোহন পদ রচনা করেছেন।

এই কবি দানলীলার ঘটনাকে অবলম্বন করেও পদ রচনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রেও তিনি অনুসরণ করেছেন শ্রীরূপের দানকেলিকৌমুদী নামক ভণিকাটিকে। শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদীতে শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের কথা বলেছেন। এর অর্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে রাধার মনে একই সঙ্গে গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটি ভাব প্রকাশ পেয়েছে। রাধামোহন ঠাকুর শুধু এই ভাবের দ্বারাই নয়, 'কিলকিঞ্চিত' শব্দের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন—"গরবরি সুন্দরী চললহ আনত/শগর পন্থ আগোর/কহতহিঁ বাত দান তেহ মঝু হাত/আন ছলে কাঁচলি তোড়।।/অপরূপ প্রেমতরঙ্গ/দান-কেলি-রস কলিত মহোৎসব/বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ।।/অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল/তহিঁ জলবাণ পরকাশ।/ধুশইত ভুরু ধনু পুলকে নুরল তনু/অলিখিত আনন্দ-হাস।।" শ্রীরূপ তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রবাস-বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহের দশ দশার কথা বলেছেন, যা পূর্বরাগের দশ দশার অনুরূপ, অর্থাৎ চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তাজব বা কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু। রাধামোহন বিরহের বেশ কিছু পর্যায় নিয়েও পদ রচনা করেছেন। তাই বলা যায়, এই কবির কৃষ্ণকথায়ও গোস্বামীদের অনুসরণ ও শব্দবিলাস ছাড়া আর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই।

- **চন্দ্রশেখর**

অষ্টাদশ শতাব্দীর দুজন বিশিষ্ট পদকর্তা হলেন চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর। অনেকের মতে চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর হলেন দুভাই এবং আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাঁদড় গ্রামের গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র। এরা 'নায়িকা রত্নামালা' নাম দিয়ে নায়িকার ৬৪ রকমের বৈশিষ্ট্যসহ ৬৪টি পদ সংকলন করেন। চন্দ্রশেখর বিভিন্ন রসপর্যায় নিয়ে পদ রচনা করেছেন। যেমন—অভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনায় কবি শ্রীরাধার দিবাভিসার, কুজ্বটি-অভিসার, চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসার প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসারের পদে অভিনবত্ব রয়েছে। এছাড়া বাসকসজ্জিকা রাধার বর্ণনায় কবি কিছুটা শ্রীরূপের অনুসারী। বাসকসজ্জিকা রাধার প্রতি সখীর উপদেশ চিত্তকর্ষক। তিনি বলেছেন, কৃষ্ম কাছে এলে রাধা যেন কপট নিদ্রার ভান করে পড়ে থাকেন। তাহলে—হম সব বোলব রাই ঘুমায়ল/আজি অনত যাহ চলিয়া। কিন্তু তাহলেও কৃষ্ম যাবেন না। তিনি প্রদীপ নিয়ে নিদ্রিতা রাধার মুখ দেখতে বসলে, রাধা যেন দুটি পা প্রসারিত করেন, যাতে কৃষ্ম যাবেন না। তিনি প্রদীপ নিয়ে নিদ্রিতা রাধার মুখ দেখতে বসলে, রাধা যেন দুটি পা প্রসারিত করেন, যাতে কৃষ্ম তাঁর পদসেবা করবেন। সখীদের এই কথা শুনে বাসকসজ্জিকা রাধা—'বিহসি মুখ ঝাঁপল/অন্তরে উপজল লাজ' উৎকণ্ঠিতা রাধার বর্ণনায় কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর গীতাবলীর পদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিপ্রলব্ধা রাধার উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদয়ের ক্ষোভ ও অপমানবোধের জ্বালা ফুটে উঠেছে। রাধার বলার ভঙ্গীও এই কবির পদে অভিনব—'কুসুমিত শেজহিঁ ভেজহ আগুনি/অরু কিয়ে দেখহ চাই। মালতি-মাল সুবাসিত তাম্বুল/এদুঁহু দেহ জালাই।।' এর আগে কবিদের পদে বিপ্রলবন্ধা রাধার ক্ষোভ নানাভাবে প্রকাশ পেলেও রাধা ফুলের বিছানায় আগুন লাগিয়ে দিতে বলেননি। কোকিলের রবে কৃষ্ম সংকেত করলে রাধা তাঁর গৃহের অর্গল খুলে বাইরে আসতে চাইলেন, কিন্তু বলয়ের ঝঙ্কারে জরতী জেগে উঠে বলল—কো উহনিকসই/কহু কিয়ে বাহির ভেলি। তখন রাধা বাধ্য হয়ে হুঁ হুঁ করে নিজের মন্দিরে আবার প্রবেশ করলেন। রাধার বাড়ীর প্রাঙ্গণের কোনে একটি বদরী তরু অবস্থিত। কবি বলেছেন রাধার পরিবর্তে—রজনি পোহায়ল/হরি কোরে করি সোই গছে।

এখানে কবির স্মিত কৌতুক চমৎকারভাবে রূপ লাভ করেছে। এটি রবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত একটি পরিচিত পদের অনুবাদ। শ্লোকটির ভাব নিয়ে ইতিপূর্বে অন্যান্য বহু কবি পদ রচনা করেছেন। এই কবির পদে খণ্ডিতা রাধার কৃষ্মের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গোক্তিও কবির শক্তিমত্তা প্রমাণ করে। রাধা বলেন—বন্দে বরজ-রাজ-কুল-নন্দন/বিজয় বারহ হরিজী। বন্দনা করার কারণ স্বরূপ রাধা বলেন—

কবুহুঁ নীলাম্বর কবহুঁ পিতাম্বর/কবহুঁ চন্দন চাঁদ ভালে। কবহুঁ সিন্দর সমূহ বিরাজই অজ্ঞান/অজ্ঞন পুঞ্জ মিশালে॥

অপর একটি পদে অন্য নায়িকার কাছে থেকে প্রত্যাগত কৃষ্ণকে দেখে ক্রোধে রাধার স্বাভাবিক বাক্যস্ফূর্তিও ব্যাহত হয়েছে। খণ্ডিতা রাধার ক্রোধ প্রকাশের এই পদ্ধতি কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অতঃপর কলহান্তরিতা রাধাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাধার সখী কৃষ্ণের অন্বেষণে গোবর্ধন, যমুনাকানন প্রভৃতি খুঁজেও দেখতে পেলেন না। অবশেষে দেখলেন কৃষ্ণ নির্জন প্রান্তরের মাঝখানে পড়ে আছেন। এবং একটি স্বনবর্ণ পদ্ম হাতে নিয়ে—রাই রাই করি শিরে কর হানই/ধুলি ধূসর সব গায়। মানিনী রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণের এই চিত্রটিও কবির মৌলিকতার নিদর্শন। এর আগে বিরহী কৃষ্ণের নানা মূর্তির সঙ্গে পরিচয় থাকলেও শূন্য প্রান্তরে রাধার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হেম পদ্ম হাতে হা-হুতাশারত কৃষ্ণকে আমরা এই প্রথম দেখলাম।

অপর একটি পদে কলহান্তরিতা রাধার সখী কৃষ্ণকে খুঁজতে বেরিয়ে দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে যান। কৃষ্ণ তাঁকে ডেকে করুণা করে তাঁর দিকে চাইতে বলেন। কিন্তু চতুরা সখী বলে, 'মাধব তুমি কি বলবে বল, আমি অন্য কাজে যাব, তোমার সঙ্গে কথা বললে সখীরা আমার দোষ দেবে।' কৃষ্ণ বলেন 'রাধা আমায় পরিত্যাগ করেছে, তুমিও যদি ত্যাগ কর, তবে আমি বিষ পান করব।' এর উত্তরে সখী তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে বলেন—আহিরিনি কুরুপিনি গুনহিনী ভাগি হিনি/তাহে লাগি কাহে বিষ পিয়বি/চন্দ্রাবলি -মুখ চন্দ্র-সুধা-রস/পিবি পিবি যুগ যুগ জিয়বি।

প্রসঙ্গ পরিচিত হলেও এখানে উপস্থাপনায় নাটকীয়ত্ব, বাক্যবিন্যাসে তির্যকতা ও তীক্ষ্ণতা সঞ্চারিত হয়ে পুরাতন কৃষ্ণকথাকে নব রূপ দান করেছে। কৃষ্ণেরগ কাতরতা দেখে সখী ফিরে এসে রাধার কাছে কৃষ্ণের হয়ে করুণা ভিক্ষা করেছেন। ললিতা বলেছেন—আঁবর পাতি হম তুয় পাশে মাগিয়ে/মান-রতন দেহদান।।

মাথুরের পদগুলি গতানুগতিক। রঘুনাথের মক্তাচরিত্রে বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীরাধার অভিষেক পরবর্তীকালের বহু কবিকে পদ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। চন্দ্রশেখরও রাইরাজার প্রসঙ্গ নিয়ে পদরচনা করেছেন। চন্দ্রশেখরের পদাবলির উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় কবি সূক্ষ্ম সামান্য কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন।

● শশিশেখর

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শশিশেখরও বেশ কিছু পদ রচনা করেছেন। এঁর গোষ্ঠবিহারের পদগুলি উল্লেখযোগ্য। এই গোষ্ঠবিহারের পদে কবি সুবল, অর্জুন, অংশুমান, দাম, বসুদাম প্রভৃতি ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণ সখাদের নাম করেছেন। এই পর্যায়ে মত্ত বলরামের যে চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন, তা উজ্জ্বল এবং জীবন্ত হলেও পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণনা থেকেই গৃহীত।

শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে কবি ব্রজবুলির সঙ্গে সংস্কৃতেরও আভাস দিয়েছেন। পদটি সাক্ষাৎ দর্শনে পূর্বরাগ সঞ্চারের পদ। রাধা নীপমূলে কৃষ্ণকে দেখে এসে সখীকে বলেছেন—নবহুঁ রুচি মেহ সখি নীপহুঁ মূলে পেখলুঁ/নয়ন মন ভলল মঝু ভরমং/তরুণ তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী অম্বরে/লখিতে নারিনু সখি গৌর কিয়ে শ্যামং।। জ্যোৎস্নাভিসারিকা ও তিমিরাভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনা করেও কবি পদরচনা করেছেন। এর মধ্যে তিমিরাভিসারের পদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—আজি অদভূত তিমরি রঙ্গ/আপনি না চিনি আপনঅঙ্গ/নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ/অংকুনা নাহি মানরি।

সমস্ত পদটিতে চিত্র রচনা, ধ্বনি ঝঙ্কার ও ছন্দ-হিল্লোল, অভিসারিকা রাধার আসন্ন মিলনের আনন্দ ও অভিসারের আবেগকে যেন উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। পদটির শিল্প সৌকর্য অতুলনীয়।

খণ্ডিতা রাধার কাছে অন্য নায়িকা উপভোগকারী কৃষ্ণের মিথ্যা কৈফিয়ৎও জয়দেবের সময় থেকেই চলে আসছে। এই কবির পদে, উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তিতে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার এই অংশ নাটকীয় হয়ে উঠেছে। রাধা-কৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন—নীল উৎপলের মত সুন্দর তাঁর মুখ ম্লান হল কি করে? কৃষ্ণ উত্তরে বলছেন, রাধার বিরহে রাত্রিজাগরণ করতে গিয়ে তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেছে। রাধা বলছেন, কৃষ্ণের কপালে সিঁদুরের দাগ এল কি করে? কৃষ্ণ বললেন গোবর্ধনে গৌরিক গেবি/সিন্দুর তখি লেল।। এইভাবে কৃষ্ণ বক্ষে নখ ক্ষতের ব্যাখ্যা দিলেন, রাধাকে খুঁজতে

গিয়ে কণ্টকে তাঁর বক্ষ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। রাধা প্রশ্ন করলেন—নীলাম্বর কাহে পহিরিল/পিতাম্বর ছোড়ি। কৃষ্ণ বললেন বলরামের সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্তিত হয়েছে। রাধা যখন প্রশ্ন করলেন—অঞ্জন কাহে খন্ড-স্থলে/খঞ্জন কাহে অধরে। তখন কিন্তু কৃষ্ণ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। অপর একটি পদও খণ্ডিতা মানিনী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে রচিত। এখানে কৃষ্ণের উক্তি সংস্কৃতে এবং রাধার উত্তর বাংলায়। কথাবস্তু ও ভাববস্তুতে নতুনত্বের সঞ্চার করতে না পেরে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা কেমন করে ভঙ্গি সর্বস্ব হয়ে যাচ্ছিলেন, পদটি তারই প্রবল উদাহরণ। কৃষ্ণের বাজীকর ছদ্মবেশে কলহান্তরিত। রাধার কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়েও এই কবি পদরচনা করেছেন। এছাড়া অহেতুক মান, মুরলী শিক্ষা ও মাথুর বিরহকে বিষয়বস্তু করেও কবি কয়েকটি পদ রচনা করেছেন।

৮.৩ বৈষ্ণবপদ সংকলন

আলোচ্য কালপর্বে প্রস্তুত বেশ কয়েকটি বৈষ্ণবপদ সংকলন পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির গুরুত্ব কম নয়। এ সমস্ত পদ সংকলনের সুবাদেই প্রাচীন বহু পদ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। পদ সংকলনগুলিতে সংলকদের মর্জিত মেজাজের স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। এখন পদ সংকলনগুলির পরিচয় দেওয়া যাক।

- **ক্ষণদাগীত চিন্তামণি**

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্তত সাতখানি পদ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হচ্ছে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত ক্ষণদাগীত চিন্তামণি। রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে চক্রবর্তী মহোদয় ৪৫ জন কবির লিখিত ৩০৯টি মাত্র পদ এই গ্রন্থে স্থান দেন। তার মধ্যে ৫১টি পদ তাঁর নিজের রচনা। তিনি আরও পদ হয়তো সংকলন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কেননা প্রত্যেক ক্ষণদার নীচে "শ্রীগীত চিন্তামণৌ পূর্ববিভাগে" লেখা দেখে মনে হয় যে তিনি গ্রন্থের একটি উত্তর বিভাগও সংকলন করবার সংকল্প করে ছিলেন। কিন্তু হয়তো দেহান্ত হওয়ার জন্য আর তা পারেননি। তিনি ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভগবতের টীকা শেষ করেন। সম্ভবত এর কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষণদাগীত চিন্তামণি সংকলিত হয়। এতে ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলির ধারা দেখানোর কোন চেষ্টাই নেই।

- **গীতচন্দ্রোদয়**

পদামৃত সমুদ্রের পরই উল্লেখ করা যায় গীতচন্দ্রোদয়ের নাম। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্তী (আঁর এক নাম ঘনশ্যাম) গীত চন্দ্রোদয় নাম একটি বিশাল পদ সংকলন নামে একটি গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। ঐ গ্রন্থের মাত্র পূর্বরাগ সম্বন্ধীয় ১১৬৯টি পদ হরিদাস দাস প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যে ক্ষণদাগী চিন্তামণির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন—"সামান্যতর প্রথমেতে গাব গৌর গীত।/চিন্তামণি যৈছে তৈছে এ গীতের রীত।।"

গীত চন্দ্রোদয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় "আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ চন্দ্র করতলে বদন সঘন অবলম্ব' ইত্যাদি পদটির ভণিতায়. দেখি—'পুলক মুকুল ভরু সব দেহ/রাধামোহন কছু না পাওল সেহ।"

এই রাধামোহন রাধামোহন গোস্বামী। এই পদটি পদকল্পতরুতে ৬৮ সংখ্যক পদরূপে ধৃত হয়েছে। সুতরাং গীতচন্দ্রোদয় সংকলনের সময় রাধামোহন ঠাকুরের কবি খ্যাতি প্রচারিত হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তী গীত চন্দ্রোদয়ে লিখেছিলেন—'মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা কিঞ্চিৎ ঘুচাইয়া।/অভিসারিকাদি অষ্ট গাব বিস্তারিয়া।/প্রথমে মুগ্ধাদি নায়িকাভেদ গীত।/তারপর গাব রাগানুরাগা কিঞ্চি/ইহার পরেতে গীতে হইব প্রকাশ।/পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস।।

পূর্বরাগেই ১১৬৯টি পদ আছে, সুতরাং তাঁর সংকল্পিত গ্রন্থে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি পদ থাকবে এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পূর্বরাগ ছাড়া আর কোন অংশ এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

● **গৌরচরিত চিন্তামণি**

এটি নরহরি ঘনশ্যাম রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টাকালীয় লীলা গ্রন্থ, এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাতকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিবিধ লীলা বর্ণিত। এই গ্রন্থটির পদে উদাহরণ ঃ—দুগ্ধ সায়র মধ্যচারু সুমেরুশৃঙ্গ-সামন গৌর কিশোর দেহ সুলেহমণ্ডিত চন্তকর-মদভঞ্জনা। শ্রীগদাধর ধীর পরম উলস অন্তর তরল পুলকিত হেরি অনিমিখ অক্ষি রঞ্জিত লক্ষ স্মরকৃতগঞ্জনা।। এই গ্রন্থে উল্লেখিত কয়েকটি ছন্দ উল্লেখ করা যেতে পারে—ললিত, শ্যামা, তারা, কুমারী, কান্তা, পার্বতী, সাবিত্রী, রজনী, রঙ্গমালা, দ্বিপদী, ত্বরিতগতি, মধুমতী, সুরঙ্গ, মোদক, মুক্তা কেশরী ইত্যাদি।

● **পদামৃতসমুদ্র**

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্র গ্রন্থটির সঙ্কলনের সঙ্গে “মহাভাবানুসারিনী” টীকাও সংযোজক করেছেন। পদামৃত সমুদ্রে পার ৭৬০টি পদ আছে। তাতে ২২৮টি পদ স্বরচিত বলে জানা যায়। রাধামোহন তৎকালীন পণ্ডিত সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন, কথিত আছে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ নিয়ে যখন তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন রাধামোহন ছয়মাস ধরে প্রতিবাদ করে পরকীয়া বাদ স্থাপক করেন এবং সকল পণ্ডিত সমাজের দস্তখত যুক্ত এক জয়পত্র মুর্শিদাকুলি খাঁর দরবারে ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন রেজিস্ট্রি করা হয়। তিনি মালীহাটিতে থাকতেন এবং মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন।

রাধামোহন ব্রজভাষা, হিন্দি, মৈথিলী ও বাংলা গানের সংস্কৃত ভাষায় টীকা রচনা করে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করেন। যদিও আগেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চৈতন্য চরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা লিখেছিলেন। কিন্তু তা দুষ্প্রাপ্য এবং অসম্পূর্ণ। তিনি যে মহাসঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তা তান, লয়, বয়স, ভাব, ছন্দ, অলংকার এবং প্রসাদগুণ গুম্ফিত তদীয় গীতাবলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

● **পদকল্পতরু**

বৈষ্ণব সমাজে পদামৃত সমুদ্রের পরই গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস সংগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ ‘পদকল্পতরুর’ স্থান। বৈষ্ণবদাস নিজে একজন ভাল কীর্তন গায়ক ছিলেন। তিনি যে অনেক স্থানে ভ্রমণ করে ভাল ভাল পদ সংগ্রহ করেছিলেন সে কথা নিজের সঙ্কলনের শেষে বলেছেন—

আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধা মোহন/ কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন।/গ্রন্থ কৈল পদামৃত-সমদ্র আখ্যান।/জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।/নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।/তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া।/ সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে হইা কৈল।/প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।।

তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে ৩১০১টি পদ সংগ্রহ করেছিলেন বলে বহু কবির কীর্তি রক্ষা পেয়েছে। এক একটি লীলার ওপর তিনি যতগুলি ভাল পদ পেয়েছেন তা দিয়েছেন। পদগুলি ঐতিহাসিক কালানুযায়ী সাজাবার তিনি কোন প্রয়াস করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর কলহান্তরিতা পদগুলি নেওয়া যায়। তিনটি পল্লবে তিনি যথাক্রমে ১৯, ১২ ও ১৩টি মোট ৪৪টি পদ সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে কীর্তনীয়া নিজের রুচি ও শ্রোতাদের অভিপ্রায় অনুসারে যে কোন ৮/১০টি পদ গাইতে পারেন। প্রথমেই রাধামোহন ঠাকুর কৃত গৌরচন্দ্রিকা, তারপর গোবিন্দ দাসে কয়েকটি পদ, পরে বিদ্যাপতির পদ, জ্ঞানদাসের পদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর কীর্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাসের পদ এবং তারপর ষোড়শ শতাব্দীর জ্ঞানদাস এবং দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের পদ স্থান পেয়েছে। ৬০০ বছরের মধ্যে ভাব, ভাষা ও সাহিত্যরীতির যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল তার প্রতি কোনোরূপ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বৈষ্ণবদাস এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো সঙ্কলনকারীই মনে করেননি। ধর্মের বা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখানো তাঁদের কাজ ছিল না। তাঁর রসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য পালা সাজিয়ে ছিলেন। পদকল্পতরুতে ও যে কবির রচনা সর্বপেক্ষা বেশি স্থান অধিকার

করে আছে তিনি হচ্ছেন গোবিন্দ দাস কবিরাজ। গোবিন্দদাসের ৪৬০টি পদ, জ্ঞানদাসের ১৮৫টি ও রাধামোহন ঠাকুরের ১৮২টি পদ এতে স্থান পেয়েছে।

৮.৪ চরিতকাব্য

● **অকিঞ্চন দাস**

অকিঞ্চন দাস শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকের পদ্যানুবাদ করেন।

● **প্রেমদাস**

প্রেমদাস গঙ্গাদাস মিশ্রের পুত্র। তিনি ১৬৩৪ সালে কবিকর্ণসুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বাংলায় পদ্যানুবাদ করেন ও 'বংশী শিক্ষা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। বালুঘোষের মত গৌরলীলা বর্ণনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'বংশী শিক্ষা' গ্রন্থে শ্রীপাট বাখ্‌নাপাড়ার ইতিবৃত্ত কবিতাকারে লিপিবন্ধ করেছেন।

● **নরহরি চক্রবর্তী**

নরহরি চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা রেঙাপুর গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য জগন্নাথ। তাঁর রচিত গ্রন্থ—(১) ভক্তি রত্নাকর, (২) নরোত্তমবিলাস, (৩) শ্রীনিবাসচরিত্র, (৪) গীতচন্দ্রোদয়, (৫) ছন্দ—সমুদ্র, (৬) গৌরচরিত চিন্তামণি, (৭) নামামৃত সমুদ্র, (৮) পদ্ধতি প্রদীপ, (৯) সঙ্গীত কার সংগ্রহ প্রভৃতি। ইনি একধারে সুপাচক, সুগায়ক, সুবাদক, সঙ্গীতভক্ত এবং পরম ভক্ত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সকল ভক্তের কাহিনী লিপিবন্ধ হয়নি। শ্রীলোকনাথ, শ্রী প্রবোধানন্দ, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নরোত্তম প্রভুর কথা কোথাও নেই। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্তী যুগে গৌড়ীয় আচার্যদের এবং তৎকালীন ভক্তবৃন্দের অপ্রকাশিত পূর্ব জীবনবৃত্তান্ত ভক্তিরত্নকার, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবন্ধ করেছন। ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডলের এবং দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ পরিক্রমার যে সুবৃহৎ ও পরিচ্ছন্ন মানচিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে স্থান বিলুপ্ত হলেও সহৃদয় ভক্তচিত্তে ও কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিকতত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিক বিচারে গ্রন্থটির মূল্য অত্যল্প হলেও স্থানাসূচক বিবরণে গ্রন্থটি অমূল্য।

৮.৫ মনসামঙ্গল কাব্য

● **কবি তন্ত্রবিভূতি**

কবি তন্ত্রবিভূতির আসল নাম বিভূতি। তিনি তান্ত্রিক ছিলেন বলেই তন্ত্রবিভূতি নামে পরিচয় লাভ করেন। ইনি উত্তরবঙ্গের কবি। তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের নাম 'মনসা-পুরাণ'। কিন্তু কবির নামেই অর্থাৎ তন্ত্রবিভূতি নামেই কাব্যটি বেশি পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

মঙ্গলকাব্যের কবিদের রীতি অনুযায়ী দেববন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু হয়েছে। মনসার আবাহন, ধর্মদেবতার স্মরণও বন্দনা। মনসার বন্দনা ও বাহনসহ দেবদেবীদের বন্দনায় কবি কাব্যকুশলতার পরিচয় রেখেছেন—

তোতালা সর্বেশ্বরী নমো দেবী বিষহরি—
বালকের যদি কর দয়া।

নাট নাটেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী

তুয়া গতি পদে দেহ ছায়া॥

চতুর্ভুজ মূর্তি সুন্দরী মনসার অষ্টনাগসজ্জায় অষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনায় পদ্মার প্রচণ্ড মনোহর রূপ উদ্ভাসিত— "চতুর্ভুজ মূর্তি পদ্মা দেখিতে সুন্দর।/নানা আভরণ সর্প অঙ্গের উপর।।/... সিন্দুরয়িা নাগ দেবীর সিন্দূর উজল।/পুঞাচিঞা নাগ দেবীর নঞানে কাজল।/....দশনিঞা নাগ দেবীর দশন হইল।/দন্তমধ্যে ভ্রমর যেন গুজরিতে নাগিল"।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী দেবীর স্বপ্নাদেশে তন্ত্রবিভূতি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যে ক্ষীরোদ সাগরের উদ্ভব বর্ণনা পুরাণকে অনুসরণ করলেও কবির নিজস্বতার পরিচয়ও এখানে আছে। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহে দেবতাদের উপহার ও বিবাহে নানা উপঢৌকন দানের বর্ণনায় সমকালীন সমাজের বিবাহ প্রথারই জীবন্ত ছবি পাওয়া যায়।

● **জগজ্জীবন ঘোষাল**

জগজ্জীবনের কাব্য ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। ৫. আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। কবি জগজ্জীবন দিনাজপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি পিতার নাম রূপরায় চৌধুরী ও মা-বেরতী।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্য ও অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যের মত দেবখণ্ড ও বাণিয়াখণ্ড এই দু'ভাগে বিভক্ত। কবি বানিয়া খণ্ডে তন্দ্রবিভূতিকেই বিশেষ করে অনুসরণ করেছেন। মতের দিক থেকে তিনি শাক্ত ছিলেন। তাঁর কাব্যে দেবখণ্ডের প্রথমে কবি ধর্মমঙ্গলের মতই সৃষ্টিপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যের কাহিনীতে কিছুটা বৈচত্র্য আছে।

কবির বানিয়াখণ্ডের চরিত্রে অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যের থেকে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। বেহুলার একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য চাঁদের প্রচণ্ড বিরোধী মনোভাব, পরে আবার ভক্তির আতিশয্য, সমকার স্নেহ ব্যাকুলতা প্রভৃতি বর্ণনা প্রায় গতানুগতিক। মানবমানবীর চরিত্র বর্ণনায় স্নিগ্ধ কোমলতা বজায় রেখেছেন, তাঁর কাব্যে ঘরোয়া সুর মন্দ হয়নি। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জীবনচিত্র, পরিবেশ, সমাজের ভাষা, রীতিনীতির প্রভাব কাব্যটিতে স্পষ্ট। তাই কাব্যটির একটি আঞ্চলিক মূল আছে। তবে দেবদেবীর চরিত্র বর্ণনায় ক্ষেত্রে তিনি যেন রোখ করে গ্রাম্য পাশব ও অনাগরিক রুচির আশ্রয় নিয়েছেন।

জগজ্জীবনের কাব্যে অশ্লীল বর্ণনা থাকলেও রসে কৌশল প্রশংসার দাবি রাখে। কবি যে সংস্কৃত পুরাণ, অলংকার শাস্ত্র জানতেন তার প্রমাণ কাব্যের মধ্যেই আছে। ছন্দ, শব্দপ্রয়োগ এবং উপমাদি অলংকার প্রয়োগেও তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, বুদ্ধি ও মনন বিশেষবাবে প্রশংনীয়। পয়ার ত্রিপদী ও তিনি অক্লেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ভাষায় উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক প্রভাব থাকলেও বাক্‌রীতি অনেক জায়গায় তৎসম শব্দের অনুকূল। বেহুলা সনকার বিলাপ এবং চাঁদের শুষ্ক কঠিন বেদনা প্রকাশের ভাষা যথোপযুক্ত হয়েছে। 'হারামখোর'-দের প্রসঙ্গে কবি দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাব্যটি মুদ্রিত হওয়ায় এর মধ্যে অঞ্চল বিশেষের সমাজ জীবনের বাস্তবচিত্র এবং মনসাকাল্টের অভিনব পরিচয় লাভ করে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

● **জীবন মৈত্র**

মনসামঙ্গল কাব্যধারার একজন অপ্রধান কবি জীবন মৈত্র। বাগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে কবির জন্ম। তাঁর পিতার নাম অনন্ত, মা স্বর্ণমালা, কবিরা পাঁচ ভাই।

কবির উপাধি ছিল কবিভূষণ, কবি তাঁর কাব্যে কাব্য রচনা কালের নির্দেশ দিয়েছেন—

মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্নিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।

অর্থাৎ ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে জীবন মৈত্রের মনসামঙ্গল রচিত হয়। কাব্য মধ্যে কবি নিজেকে রানী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলে উল্লেখ করেছেন।

সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও লাজুক প্রকৃতির লোক হওয়ায় জীবন মৈত্র নিজের প্রচার করতে পারেননি। নাটোরের জমিদারের কাছ থেকে তিনি কোনো সম্মানে ভূষিত হননি।

কবির সংসার স্বচ্ছল ছিল না। এই অস্বচ্ছলতা ভুলিবার জন্য তিনি কল্পনার রাজ্যে বিতরণ করতেন, সংসার অনভিজ্ঞ বলে তিনি 'পাগ্‌লা জীবন' নামে পরিচিত ছিলেন।

জীবনের মনসামঙ্গল দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড দুভাগে বিভক্ত। দেবখণ্ডে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ গৌরচন্দ্রিকাসমূহ মনসার জন্ম, বিবাহ কাহিনী বর্ণিত। বণিকখণ্ডে আছে চাঁদ সদাগর ও বেহুলা কাহিনী।

জীবন মৈত্রের ভণিতায় 'ঊষা হরণ' নামে একটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে। অনুমিত হয় এই অংশটি তাঁর মনসামঙ্গলেরই বিচ্ছিন্ন অংশ।

অন্যান্য মনসামঙ্গলের সঙ্গে জীবনের মনসা মঙ্গলের কিছু পার্থক্য আছে। এখানে বেহুলার পিতা বাহো সদাগর, মা মেনকা, ভাই শঙ্খধর, এবং বেহুলার নাম বেললি, কাব্যটির দু'একটি উপকাহিনী অন্যান্য মনসা মঙ্গলের থেকে আলাদা যেমন—'কাজল রেখা'-র কাহিনী অনুসরণে বেললি মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় ভাই শঙ্খধরের সঙ্গে দেখা হয়। শঙ্খধর বেললিকে চিনতে না পেরে প্রণয় নিবেদন করল। বেললির পরিচয় জানার পর শঙ্খধর লজ্জিত হয় এবং তাকে গৃহে ফেরার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু বেললি সে অনুরোধ উপেক্ষা করে দুর্গম কর্তব্য পথে এগিয়ে যায়।

সংস্কৃত পুরাণের অশ্লীল অংশ গ্রহণ করার ফলে জীবনের কাব্য আদিরসাত্মক। পাণ্ডিত্যের ভারে অনেক সময় রচনা শৈলী জটিল হয়ে গিয়েছে। কাব্যে সংস্কৃত উপমা অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। রচনা অনেক সময় লালিত্যবর্জিত। অবশ্য কোথাও কোথাও তিনি পাণ্ডিত্যমুক্ত হয়ে সহজ সরল ভাবে ভাব প্রকাশ করেছেন।

অনেক অনাবশ্যক অবান্তর রচনা কাহিনীর গতিকে রুদ্ধ করে তুলেছে। কবি কাব্যটিতে প্রত্যক্ষ সংসারের প্রত্যেকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই স্তূপীকৃত উপকরণের নিচ থেকে তাঁর কাব্যের মূল বক্তব্য সহজে স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনি।

৮.৬ ধর্মমঙ্গলকাব্য

- **রামদাস আদক**

সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের একজন বিশিষ্ট কবি হলেন রামদাস আদক। ১৩১১ সালে সাহিত্য সংহিতায় (১০ম-১১শ সংখ্যা) মধুসূদন অধিকারীর লেখা 'অনাদিমঙ্গলের কবি' নামক প্রবন্ধে সর্ব প্রথম রামদাস আদকের পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর ১৩৪৫ সালে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদ থেকে রামদাসের অনাদি মঙ্গল কাব্য সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই কবির কাব্যের আত্মপরিচয় অংশ গতানুগতিক। ভুরশুট পগণার রাজা ভারতচন্দ্রের পূর্ব পুরষ প্রতাপনারায়ণের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের কাছাকাছি হায়াৎপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। তাঁরা জাতিতে চাষী কৈবর্ত্ত। চাষবাসই তাঁদের বৃত্তি ছিল। অতি অল্পবয়সে কবির পিতাবিয়োগ হওয়ার কালে বাল্যকালে

তিনি লেখা পড়া শেখার বিশেষ সুযোগ পাননি। চৈতন্য সামন্ত নামক এক রাজকর্মচারী কবিকে বাকী খাজনার দায়ে আটকে রাখে—

"তিন দিন রামদাস ছিল বন্দিখানা।

শিশুমতি বড় দুঃখ পাইল যন্ত্রণা।

এরপর তিনি কোনমতে মুক্তিলাভ করে মামার বাড়ীর দিকে ত্রা করলেন পথে এক সিপাহির সঙ্গে দেখা। রামদাস মনেমনে ভাবলেন—

দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই

বিদেশে বেগারি বুঝি লইবে সিপাই

সিপাই রামদাসের মাথায় মোট চাপিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কবি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তৃষ্মার্ত কবি কামদীঘিতে জল খেতে গেলে দীঘির জল শুকিয়ে গেল। আর রামদাস দেখলেন—ঝারি হাতে ঘাটে এক নবীন ব্রাহ্মণ। তিনি আসলে ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম। তিনি রামদাসকে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করতে বললেন।

নানা প্রমাণ থেকে মনে হয় কবি ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে অনাদিমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

রামদাসের কবিত্ব শক্তি প্রশংসার যোগ্য। কাহিনীও চরিত্রসৃষ্টিতে সংহত রচনা কৌশল, পরিচ্ছন্ন প্রবাহ, ক্লাসিক গঠন এবং স্নিগ্ধ পদলালিত্য এর মধ্যে দুর্লভ নয়। এই ধরনের কিছু পদের উদাহরণ প্রমাণে দেওয়া যেতে পারে—

(১) চিনিতে রোশিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে।

জগতে স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনো।।

(২) নলিনীদলের জল জীবনচঞ্চল।

জলেতে বিচম্বাক যেন বারে টলমল।।

(৩) যশকীর্তিহীন জীবন অকারণ।

যশ যার নাই তার জীবন্তে মরণ।।

তবে রামদাসের কাব্যের সঙ্গে রূপরামের কাব্যের অনেক সাদৃশ্য আছে।

● **সীতারাম দাস**

সীতারাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলকাব্যের আর একজন কবি। তাঁর কাব্যটি ১৬৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে রচিত হয়েছে। এই কবির আত্মজীবনী থেকেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে মাতুলালয়ে কবি সীতারামের জন্ম হয়। কবি জাতিতে রাঢ়ীয় কায়স্থ। কবির পিত্রালয় সুখসাগর গ্রামে। পিতার নাম দেবীদাস, মাতার নাম কেশবতী। স্বপ্নে আদেশ পেয়ে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর আত্মকাহিনী সহজ ও সাবলীলভাবে বর্ণিত।

কবি কাব্যের শুরুতে ময়ূরভট্টের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁরই পদটি অনুসরণ করে তিনি কাব্য লিখেছেন, একথাও স্পষ্টভাবে বলেছেন। এ পর্যন্ত তাঁরকাব্যের যতগুলি পুথি পাওয়া গেছে সবই খন্ডিত। তাঁর রচনা বিবৃতিমূলক, পরিচ্ছন্ন এছাড়া অন্য কোনও অভিনবত্বের পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিরা হলেন যদুনাথ ও শ্রীশ্যাম পণ্ডিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তত দশজন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এঁদের মধ্যে দুজন হলে বিশিষ্ট ঘনরাম ও মানিকরাম।

● **ঘনরাম চক্রবর্তী**

অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিশালী কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত। ঘনরামের কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ছাপা হয়ে যাওয়ার পর জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার পায়।

ঘনরামের কাব্যের ভণিতা থেকে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কইমড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে, দামোদরের দক্ষিণতীরে বর্ধমান থেকে প্রায় চার ক্রোশ দক্ষিণে। তাঁর পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতা। পিতামহ ধনঞ্জয়, মাতামহ রায়না-নিবাসী। হরি ঘনরামের চার পুত্রের নাম হল রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত অর্থাৎ বৃত্তিভোগী ছিলেন। এছাড়াও ঘনরামের ভণিতা থেকে জানা যায় ঘনরামের গুরুর নাম ছিল শ্রীরামদাস। ঘনরামের কাব্য ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দের শেষে সমাপ্ত হয় বলে মনে করা হয়।

নানা পুরাণ উপপুরাণ ও কাব্যকাহিনী থেকে গল্প উপমা ইত্যাদি সংগ্রহ করে ঘনরাম তাঁর কাব্যকে মহাকাব্যোচিত বিশালতা দিয়েছেন। এটি ২৪টি পালায় বিভক্ত—

(১) স্থাপনা পালা (দেবদেবী বন্দনা, অম্ভুবতী অপ্সরীর তালভঙ্গ, ধর্মপূজা প্রচারে মর্ত্যধামে রঞ্জাবতীরূপে জন্ম) (২) ঢেকুর পালা (ইছাই ঘোষের কাহিনী, (৩) কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ, (৪) হরিশ্চন্দ্র পালায় হরিশচন্দ্র ও লুইসেনের কাহিনী, (৫) রঞ্জাবতীর শানে ভর দিয়ে ধর্মঠাকুরের কাছে পুত্রবর লাভ, (৬) লাউসেনের জন্ম, (৭) অখড়া পালায় দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক লাউসেনকে পরীক্ষা, (৮) ফলা নির্মাণ পালায় দেবী প্রদত্ত অস্ত্রের দ্বারা ফলা নির্মাণ (৯) গৌড়যাত্রা পালায় লাউসেন ও কর্পূরের গৌড়যাত্রা (১০) কামদল পালা-এর বিষয়বস্তু হল লাউসেন কর্তৃক কামদল বাঘ বধ, (১১) জ্যামতি পালাতে আছে অসতী নারীদের কবল থেকে লাউসেনের আত্মরক্ষা, (১২) গোলাহাট পালায় সুরিক্ষার কবল থেকে লাউসেনের উদ্ধার, (১৩) হস্তীবধ পালায় লাউসেন কর্তৃক হস্তী বধ, (১৪) কাঙুর যাত্রা পালায় লাউসেনের কামরূপ যাত্রা, (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালায় লাউসেনের কামরূপ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজকন্যা কলিঙ্গার সঙ্গে বিবাহ, (১৬) কানাড়া স্বয়ম্ভর পালায় রাজা হরিপালের কন্যা কলড়ীর সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ, (১৭) কানাড়া বিবাহ পালায় লাউসেন কর্তৃক লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিতকরণ (১৮) মায়ামুণ্ড পালায় মহামহের কুটিল চক্রান্তে লাউসেন পত্নীদের বিভ্রান্ত করার কাহিনী। (১৯) ইছাই বধ পালায় লাউসেন কর্তৃক ইছাই ঘোষ নির্ধন, (২০) আঘোর বাদল পালায় গৌড়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি, (২১) পশ্চিমে উদয় পালায় লাউসেন কর্তৃক পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানোর আয়োজন, (২২) মহাময় কর্তৃক লাউসেনের রাজধানী আক্রমণ করতে এসে যথাযোগ্য শাস্তি পেয়ে পলায়ন, (২৩) পশ্চিমে উদয় পালায় কঠোর সাধনার দ্বারা, লাউসেনের অসাধ্যসাধন (২৪) স্বর্গারোহন পালায় লাউসেনের স্বর্গারোহণ এবং মহামদের উচিত শাস্তি লাভ—এই খানেই সমাপ্ত হয়েছে।

এই মহাকাব্যে বিশালায়ন কাব্যে ধর্মের সেবিকা রঞ্জাবতী। তাঁর পুত্র ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেন। লাউসেনের বীরত্ব ব্যঞ্জক নানা কাহিনী এবং ধর্মের কৃপায় অসাধ্য সাধন প্রভৃতি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি থেকে নানা গল্প কাহিনী পুরাণের ছাঁটেই গ্রহণ করেছেন। ঘনরামের কাব্যে ধর্মের পূজা প্রচারের চেয়ে কৃচ্ছসাধন এবং লাউসেনের অদ্ভুত বীরত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ঐতিহাসিক নামধামের সঙ্গে অল্প স্বল্প সাদৃশ্য রেখে এবং ধর্মমঙ্গলের পুরাতন ধারার অনুকরণ করে ঘনরাম এই কাব্যে সত্যই বীররসাত্মক

মহাকাব্যের বিশাল সৌধ রচনার চেষ্টা করেছেন। রঞ্জার বাৎসল্য, ব্যাকুলতা, লাউসেনের অদ্ভুত বাহুবল, মহামদের প্রচণ্ড বৈরিতা, গৌড়েশ্বরের দোলাচল মনোবৃত্তি, ধর্মের কৃপায় লাউসেনের অলৌকিক অনৈসর্গিক কৃতিত্ব প্রদর্শন—এ সমস্ত কাহিনীই কবি বেশ দীর্ঘ আকারেই বর্ণনা করেছেন। নারীর বীরত্ব বর্ণনায় কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর শৌর্য বীর্যের প্রকাশ একমাত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। লাউসেনের চরিত্র পরীক্ষা অংশেও ঘনরামের কৃতিত্বের অবিসংবাদী পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরামের কাব্যে ঘটনা উপস্থাপনা ও বর্ণনার গুণে তাঁর চরিত্রবল ও নৈতিক শুদ্ধাচার বেশি প্রশংসা দাবি করতে পারে। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে ঘটনা বর্ণনা, চরিত্র শ্রেষ্ঠ মহৎ আদর্শের রূপায়ণ এবং মঙ্গল কাব্যের অলৌকিক পরিবেশ। সৃজনেও কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মৃদু হাস্যকৌতুক, করুণরস ও বীররসের বর্ণনায় তিনি সমসাময়িক অনেক কবির তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্য কাহিনী পয়ার ত্রিপদীর স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় প্রবাহিত হয়েছে। তিনি ভারতচন্দ্রের মত অলঙ্কারসৃষ্টি ও মণ্ডলকলানৈপুণ্য দেখাতে পারেননি, আবার মুকুন্দরামের মত প্রসন্ন জীবনচিত্রও তিনি ততটা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। শিরায়নের কবি রামেশ্বরের বাস্তব চিত্রণের কৃতিত্বও তিনি দাবি করতে পারেন না। কিন্তু তাহলেও ধর্মমঙ্গলের কবি হিসেবে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারেন।

- **মানিকরাম গাঙ্গুলি**

মানিকরাম ধর্মমঙ্গলের পরিচিত কবি হলেও তাঁর কাব্যরচনার সাল তারিখ ইত্যাদি নিয়ে বাগম্বিতণ্ডা দেখা দিয়েছে। বাংলা ১৩১২ সালে হরপ্রসাদশস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ থেকে মানিক গাঙ্গুলির শ্রীধর্মমঙ্গল প্রথম মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন এইকাব্যরচনাকাল নির্ণয় করেছেন ১৪৬৯ শকাব্দ বা ১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ দত্ত এর কাল নির্ণয় করেছেন ১৮৮৭ অব্দ অর্থাৎ এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পদের কবি। এর অন্যতম প্রমাণ হল তার কাব্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন উল্লেখ আছে—

বিষ্ণুপুর বন্দির শ্রী মদনমোহনে।
পূর্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে॥

৮.৭ অন্নদামঙ্গল

- **কবি ভারতচন্দ্র**

ভারতচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা মঙ্গলকাব্যের গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যেও নতুনত্বের সৃষ্টি করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দশবছর ধরে পরিশ্রম করে অন্যান্য প্রাচীন কবিদের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী সংকলিত করে তার সম্পাদিত ‘সংবাদপ্রভাকর’ পত্রিকায় তার প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সম্পর্কে আরও নানা ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে।

ভারতচন্দ্র ১১০০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে হাওড়া হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগনার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে বা রাধানগর গ্রামে এক জমিদার পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে বিবাদে তাঁর পিতা নরেন্দ্ররায় হৃতস্বর্বস্ব য়ে পড়েন। ভারতচন্দ্র চোদ্দ বছর বয়সে সংস্কৃত টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন এবং মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তাজপুরের কাছাকাছি সারদা গ্রামের কেশরকুনি আচার্যদের একটি বালিকা কন্যার পানিগ্রহণ করেন। এরপর ভারতচন্দ্র হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তাঁর কাছে ফার্সি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় একদিন রামচন্দ্র মুন্সির গৃহে সত্যনারায়ণ পাঁচালী পাঠ করেন। এইটিই তাঁর প্রথম রচনা। এতে তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছে—

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাতে হতকংশ, ভুরসুটে বসতি
নরেন্দ্ররায়ের সুত ভারতভারতীযুত
ফুলের মুখুটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি।

১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র পারসীভাষা শিক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরে এলে তাঁর অগ্রজেরা সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে তদ্বির করার জন্য তাঁকে বর্ধমান রাজসরকারে পাঠান। কিন্তু বর্ধমান রাজ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে ভারতচন্দ্র কারাগার থেকে পালিয়ে যান এবং উড়িষ্যার কটকে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল এক নাপিত ভৃত্য, তার নাম রঘুনাথ। ১৭৪২ থেকে ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতে থাকেন। এই সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় তিনি হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর শালিকাপতির নিবাস ছিল। তিনি ভারতচন্দ্রকে চিনতে পেরে তাঁকে সেখানে থাকতে অনুরোধ করেন। এরপর ভারতচন্দ্র স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনিয়ে কিছুদিন সেখানেই বাস করতে থাকেন। তারপর স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রেখে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তখন ফরাসডাঙায় প্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসী সরকারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ভারতচন্দ্র তাঁরই শরণাপন্ন হন। ইন্দ্রনারায়ণ ভারতচন্দ্রের কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে ১৯৫৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠালে তিনি ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন। তাঁরই আদেশে ভারতচন্দ্র তাঁর প্রসিদ্ধ 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি দিয়ে গঙ্গাতীরের মূলাজোড় গ্রামে তাঁকে সামান্য খাজনায় ইজারা দেন। কিন্তু রামদেব নাগ নামে এক ব্যক্তির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দেন। কৃষ্ণচন্দ্র এর অর্থ উপলব্ধি করে রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করার ব্যবস্থা করেন। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্রের সময় অষ্টদশ শতাব্দী যুগসন্ধিক্ষণকে ধারণ করেছে। ভারতচন্দ্র ও তাঁর কাব্যে সেই নতুন যুগের রূপটি ধারণ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দেশ থেকে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটেছে। মুসলমান আমলের সেই চাকচিক্যময় বিলাসী সমাজ-সভ্যতার পতনের শেষ ক্ষীয়মান দীপ্তি তৎকালীন সমাজের ওপর নিজের বিলীয়মান প্রভাবে অন্তিম প্রহর ঘোষণা করছে। অন্যদিকে ইংরেজ বণিকের অনুগ্রহ পুষ্ট হয়ে দেশে এক নতুন অভিজ্ঞতা ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে লাগল। সমাজে তখনও পুরাতন ধারার বেশ রয়েছে, কিন্তু ভাঙনের মুখে সমাজের শাসন নেই। চারদিকে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলা, প্রবৃত্তির অবারিত উন্মত্ততা রাজত্ব করছে। প্রবৃত্তির এই নিম্নাভিমুখী গতি ভারতচন্দ্রকেও গ্রাস করেছিল। তাই তাঁর মহৎ প্রতিভা তিনি উপযুক্ত সৃষ্টিতে নিয়োগ করতে পারেননি। তৎকালীন জনরুচির কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

'অন্নদামঙ্গল' রচনার আগেই ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি পরিণত বয়সে ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন—

বেদলয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই তিন খণ্ড তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য। প্রথম খণ্ডের নাম 'অন্নদামঙ্গল বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গলা'। দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে প্রথমেই পঞ্চদেবতা ও লক্ষী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণার বন্দনা। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা, সতীর দক্ষালয়ে গমনে উদ্যোগ, সতীর দক্ষালয় গমন, শিবানন্দয়ে সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ, একান্নপীঠের বর্ণনা, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহসম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতিবিলাপ রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ ইত্যাদি। এই অংশেই আছে কুবেরের পুত্র বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের প্রতি বরদান, বসুন্ধরের জন্ম, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম। অন্নদার ভবানন্দভবন যাত্রা ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী পৌরাণিক অংশ ও অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য আছে, অন্নদামঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশমাত্র। এতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাঁকে বরদান ও পরে তাঁকে অন্যায় ভাবে পরিত্যাগ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুর্বপুরুষ ভবানন্দের ভবনে যাত্রা ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকুর মধ্যে কাহিনী অথবা চরিত্র কোনোটিই সুপরিস্ফুট হয়নি।

পৌরাণিক অংশে কবি সংস্কৃত কাশীখণ্ড ও অন্যান্য শিবপুরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। ব্যাসপ্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে নেই। বুদ্ধিহত বৃদ্ধ ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার কাশীর মহিমা ক্ষুণ্ণ করে নতুন কাশী নির্মাণ করতে গিয়ে কি রকম নাকাল হয়েছিলেন কবি তারই বর্ণনা ব্যাপ্রসঙ্গে দিয়েছেন।

ভারতচন্দ্র নানা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার নিয়োচিত করেছিলেন। তবুও এই কাব্য রচনায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। প্রথমত তিনি একান্নপীঠ বর্ণনায় 'মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রে'র সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন,—

একমত না হয়ে পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচুড়ামণিতন্ত্র মত।

ব্যাসের শিবানন্দার কাহিনী কবি গ্রহণ করেছেন স্কন্দপুরানের কাশীখণ্ড থেকে।

অন্নদামঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে স্বল্প পরিসর জুড়ে থাকলেও সবচেয়ে বিশিষ্টতার দাবি রাখে ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র। সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙালির প্রতিভূ হয়েই সে এই কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সহজ সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচন ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রথম খণ্ডের কিছু কিছু প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে,—

১। নগর পুড়িয়ে দেবালয় কি এড়ায়ে?

২। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া

৩। খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাতে।

৪। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।

৫। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ইত্যাদি।

তাঁর ভাষার ঐশ্বর্যও অতুলনীয়, সংস্কৃত, পারসী ও প্রকৃত বাংলা শব্দের সুন্দর সমন্বয়ে তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করেছেন, তা নয়—তাঁর অপূর্ব শব্দবিন্যাস নৈপুণ্য দ্বারা তার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করেছেন। ভারতচন্দ্রের হাতেই বাংলাভাষা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত হয়ে উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষা হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে যে রুচিদোষের জন্য সাধারণত ভারতচন্দ্রে নিন্দা শুনতে পাওয়া যায় 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে তা নেই। কাব্য শরীর গঠনের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচেতন শিল্পী—যিনি সচেতন ভাবে শিল্পরীতির অনুসরণ করেছেন। কাব্য রচনা রসের প্রাধান্যকে তিনি স্বীকার করেছেন। ভারতচন্দ্রের আগে তাঁর মত নির্দোষ অন্ত্যানুপ্রাস আর কেউ ব্যবহার করতে পারেননি। এ বিষয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ছন্দের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ছন্দ তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দকে তিনি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতচন্দ্রকে ব্যঙ্গরসের কবিও বলা যায়। সামাজিক কুপ্রথার প্রতি বক্রোক্তি তাঁর হাস্যরসের মূল। দাসুবাসুর বর্ণনায় ও কোটালের ভীতিতে তদানীন্তন বাঙালির জাতীয় জীবনের কাপুরুষতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কাব্যে ভক্তির জায়গা দখল করেছে ব্যঙ্গ আর অবিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষ্য করে কবি কৌশলে এটি মূলকাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এটির আর এক নাম 'কালিকামঙ্গল'। সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামে একটি শ্লোক সংগ্রহ এবং পূর্ববর্তী কবিদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে ভারতচন্দ্র এটি রচনা করেছেন। রাজকুমারী বিদ্যাও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, বিদ্যার পিতা মহারাজ বীরসিংহ কর্তৃক চোর ধরা। শিরচ্ছেদের জন্য মশানে নিয়ে যাওয়া। কালিকার প্রসাদে তাঁর অবলম্ভবন। তবে হীরামালিনী বিদ্যার মা, নগরপাল—কোটল ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রগুলি তাঁর কাব্যের এই অংশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসুন্দর সম্পর্কে অনেকে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র আদিরসকে অলঙ্কৃত শিল্পসুষমা দান করেছেন।

অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশের নাম মানসিংহ কাব্য। এটি অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য বলেই অভিহিত করা যায়। এর রচনার সময় হল ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে রচিত হলেও 'মানসিংহ-কাব' কাব্যই, ইতিহাস নয়। তবে এই কাব্যে মানসিংহ ছাড়াও জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ প্রমুখ ঐতিচহাসিক চরিত্রেরও উপস্থিতি আছে। মানসিংহ কাব্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমাকীর্তন। নবদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্যই মর্ত্যধামে তাঁর আগমন—এটিই মানসিংহ কাব্যের বিষয়বস্তু। তাই কাব্যটির নাম মানসিংহ না হয়ে ভবানন্দ হলে ঠিক হত। এই কাব্যের উপসংহার ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজবংশাবলী ও তার রাজাদের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তার মধ্যে তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হলেও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—চণ্ডীমঙ্গলে পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি কাহিনী অন্যদিকে এতে আছে পরস্পর স্বাধীন

তিনটি কাহিনী। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা দেবতার প্রতি আন্তরিক ভক্তি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই ধরনের ভক্তিভাবের বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। ধর্মের গোঁড়ামি সবসময়ই পরিত্যাজ্য ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে শিবের মুখ দিয়ে ব্যাসের প্রসঙ্গে তা বলিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের ধর্মবোধের যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় আর কারো মধ্যে তা দেখা যায় না। এর কারণ সম্ভবত অন্যান্য কবি নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্মবোধের প্রেরণায় কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র অন্যের আদেশে পৃষ্ঠপোষকের পারিবারিক গৃহদেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

সমাজজীবন সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায় বিদ্যাসুন্দরে কাব্যের 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশ থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন যে কুলীনসর্বস্ব নাটক রচনা করেছিলেন, ভারতচন্দ্রের নারীগণের পতিনিন্দা থেকেই তিনি তার প্রেরণা পেয়েছিলেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়—

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তরে বড়দিদি হই।
* * * * *
দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার
সূতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারিতায়
তবে মিষ্ঠ মুখ নহে রুষ্ঠ হয়ে যায়॥

অসম বিবাহে দাম্পত্যজীবনে কি সুগভীর দুঃখের কারণ হয়, তা সমাজ সেদিন অনুভব করেনি। কারণ নারীমনের দুঃখ বেদনার অনুভূতি সেদিন অব্যক্ত ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র নারীমনের এই অব্যক্ত বেদনার অবরুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। অসমবিবাহই সে যুগের সমাজে নারীজীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল। বিদুষী নারী তার কালা স্বামী সম্পর্কে বলেছে—

সাধ করে শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হল হত॥

হাস্যরসের আড়ালে মধ্যযুগীয় কৌলীন্য প্রথার বীভৎসতাকে কবি এইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অন্নদামঙ্গল' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।"

ভারতচন্দ্রের নাগাষ্ঠক শিখারিণী ছন্দেরচিত। অন্যান্য কাব্যে ও তার ছন্দকুশলতার পরিচয় আছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এক বাস্তব মানুষের ক্ষণিক আবির্ভাব সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই অমর হয়ে আছে। চরিত্রটি ঈশ্বরী পাটনীর। ঈশ্বরী পাটনী চিরকালের নিরন্ন বাঙালির প্রতিনিধি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দরিদ্র বাঙালি মাঝি দেবীর পায়ের স্পর্শে সোনা হয়ে যাওয়া সেঁউতির অলৌকিকতায় ভুলে যায়নি। সে তার দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিজের জীবনে আলো আর পাবে না জেনেই দেবীর কাছে বর চেয়েছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"।

নাগাষ্টক, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা আরঅমর সৃষ্টি অন্নদামঙ্গল ছাড়াও ভারতচন্দ্র রচনা করেছেন রসমঞ্জরী। এটি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নায়িকা প্রকরণ অবলম্বনে লেখা।

এছাড়াও আছে ভারতচন্দ্রের লেখা টুকরো কবিতা। ঋতুবিষয়ক দুটি কবিতা হল বসন্ত বর্ণনা ও বর্ষার বর্ণনা। এর মধ্যে বর্ষা বর্ণনায় আছে কৃষ্ণনগর প্রসঙ্গ—

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস   নিদাঘের পরকাশ,
কৃষ্ণনগরেতে বাস   গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা   রাজঘরে দশভূজা
দেখিনু মৈনাকানুজা   জগতের হর্ষা।

এছাড়া হাওয়া বর্ণনা, বাসনা বর্ণনা, কৃষ্ণের উক্তি, রাধিকার উক্তি নামের টুকরো কবিতাও তাঁর রয়েছে। ভারতচন্দ্র মিশ্র ভাষায় চণ্ডীনাটক রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি শেষ হলে সাহিত্যরীতির অন্যন্য নিদর্শন হোতো। কিন্তু এর সামান্য সূচনা হয়েছিল মাত্র। এতে কবি সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা তিনটি ভাষা ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় মলিনী ছন্দে লেখা 'গঙ্গাষ্টক' ও ভারতচন্দ্রে কবিপ্রতিভার নিদর্শন।

৮.৮ বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গাল

● **কৃষ্ণরাম দাস**

কৃষ্ণরাম দাস ছিলেন নিমতার কবি। কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ছায়ায় তাঁর যশ অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ কে দিলে কৃষ্ণরাম দাসই বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখযোগ্য কবি।

কাব্যে কলি জ্ঞাপক হেঁয়ালি থেকে বোঝা যায়, ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাব্য সমাপ্ত করেন। কাব্যের মধ্যে ঔরঙ্গজেব ও সুবাদার শায়েস্তা খাঁয়ের নাম আছে। কবি বলেছেন মাত্র ২০ বছর বয়স তিনি কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। কাব্যের সুচনায় পৌরাণিক আখ্যান থেকে থাকতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু যে পুথি পাওয়া গিয়েছে তাতে লৌকিক আখ্যানটুকু আছে। মনে হয় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর জনপ্রিয়তার জন্য পুথি লেখকরা পৌরাণিক অংশ বাদ দিয়ে লৌকিক নায়ক-নায়িকার আখ্যানটি নকল করেছিলেন।

কাব্যের কাহিনী গতানুগতিক। দু-একটি জায়গায় ও চরিত্রে যৎসামান্য নতুনত্ব আছে। রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণরাম অশ্লীল শব্দ লিখতে সঙ্কোচবোধ করেননি। কলাবতী শন্নী ব্রাহ্মণীকে বিদ্যা যে ভাষায় লাঞ্ছিত করে সে ভাষায় অশ্লীল। দু একটি চরিত্র বর্ণনায় এবং পরিমিত ভাষা ব্যবহারের পরিণত কবিবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তার কাব্য প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, তিনি মাটির ঢেলা দিয়ে বিরাট ইমারত গড়তে গিয়েছিলেন। আর ভারতচন্দ্র তাই দিয়ে বিরাট সৌধ নির্মাণ করতে গিয়েছিলেন। হতে পারে, অপরিণতি বয়সের রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তী রায়মঙ্গাল, ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যগুলিও দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা।

● **রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর**

রামপ্রসাদ কালিকামঙ্গলের মোড়কে আদিরস প্রধান বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিতে আদিরসের সঞ্চারের কারণ মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য। কৃষ্ণচন্দ্র কর্তক রামপ্রসাদকে প্রদত্ত জমির দলিল দেখে মনে হয় তাঁর বিদ্যাসুন্দর ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের পর রচিত হয়েছিল।

রামপ্রসাদ তাঁর বিদ্যাসুন্দরে কৃষ্ণরাম দাসকে অনুকরণ করেছিলেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র সমসাময়িক কবি হওয়ার এবং একই ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় সম্ভবত কেউ কাউকে বড় একটা অনুসরণ করেননি। ভক্তকবি

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কিছু উল্লেখযোগ্য। চরিত্র পরিকল্পনায় রামপ্রসাদের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। যদিও ভারতচন্দ্রের মত কবিত্ব ও রচনাকৌশল তাঁর ছিল না। তাই সমাগুণ সত্ত্বেও কাব্যটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। কাব্যটিতে দু একটি স্থানে অশ্লীল বর্ণনা আছে। এই অশ্লীলতা শিল্পের দ্বারা সংযত তিনি করেননি। কাব্যটিতে যত্রতত্র কালী সাধনার উল্লেখ করেছেন এবং বৈষ্ণবদের তীব্র নিন্দা করেছেন। যাই হোক, যুগধর্ম ও রাজপৃষ্ঠ পোষকতা রামপ্রসাদের এতটা প্রভাবিত করেছিল যে এই ভক্তকবি বিদ্যাসুন্দরের আদিরসের কামকূপে ডুবতে বিশেষ দ্বিধা বোধ করেননি।

● **কবি শেখর বলরাম চক্রবর্তী**

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী কে বিদ্যোৎসমাজের সামনে নিয়ে এসেছেন। কবি ভারতচন্দ্রের আগে ১৭শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে বিশুদ্ধ মঙ্গল কাব্যের ছাঁচে কলিকামঙ্গল রচনা করেছিলেন। কাব্যটির শেষাংশে নষ্ট হয়ে যাওয়ার রচনাকাল জানা যায় না। তবে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। কারণ তিনি কাশীজোড়ার জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণের (১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ ছিলেন। এঁর কাব্যে রাঢ়ের দেবদেবীর উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় কবি রাঢ়ের কবি। রচনা ও কাহিনী গ্রন্থনে অল্পস্বল্প নতুনত্ব থাকলেও এতে কবির বিশেষ কোনো প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়নি। সুন্দরকে তিনি উৎকলের রাজপুত্র বলেছেন। কবি সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাব্যের শেষের অপ্রাসঙ্গিক আজগুবি গল্পের অবতারণা অপাঠ্য হয়ে উঠেছে। কাব্যটি নীরস হওয়ায় জনসমাজে প্রচলিত ছিল না। তবে দেবদেবীদের কৌতুকাবহ চরিত্র বর্ণিত হওয়াতে খানিকটা চিত্তাকর্ষী বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে।

৮.৯ শিবায়ন

● **রামেশ্বর ভট্টাচার্য**

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়ন কাব্যের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্পতম। এর মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিব সংকীর্তন' খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রামেশ্বর ভারতচন্দ্রের পঞ্চাশ বছর আগে ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের দেড়শো বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবন চিত্র, কাব্যকলা প্রভৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে মুকুন্দ ও ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কবি বলতে হবে। তবে রামেশ্বর মুকুন্দের মতো প্রথম শ্রেণীর কবি নন, আবার ভারতচন্দ্রের রচনাবৈদগ্ধ্যও তাঁর ছিল না।

রামেশ্বর কাব্যের মধ্যে তাঁর গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন। মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের অন্তর্গত বরদা পরগনার অন্তর্ভূক্ত যদুপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। রামেশ্বরের পিতা লক্ষ্মণ, মাতা রূপবতী। কবির দুই পত্নী সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবি ১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের গ্রাম যদুপুর ত্যাগ করে কবি কর্ণগড়ের জমিদারদের সভায় পুরাণ পাঠকরূপে বসবাস করেন। তিতিন তাঁর কাব্যে কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ওতাঁর পুত্র যশোবন্দ সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন—

রাজা রামসিংহ সুত যশোবন্দ নরনাথ
তস্য পোষা দ্বিজ রামেশ্বর

রামেশ্বরের দুখানি কাব্যগ্রন্থই প্রমাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। (১) শিবসংকীর্তন বা শিবায়ণ (২) সত্যপীরের ব্রতকথা। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য নিঃসন্দেহে শিবায়ন।

রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন সাতপালা ও জাগরণ আর পালায় সমাপ্ত। প্রথম থেকে তৃতীয় পালায় পুরাণাশ্রিত কাহিনী অনুসৃত হয়েছে। শিবের বিবাহ পর্যন্ত কাহিনী এতে আছে। কবি পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নন্দিকেশ্বরপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি পৌরাণিক ও ক্লাসিক সাহিত্য থেকে এই অংশের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

হর পার্বতীর বিবাহের পর থেকে পৌরাণিক ও কাহিনীর পরিবর্তে কবি ক্রমশ লৌকিক শিবের কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বরবেশী শিবকে দেখে মেনকার বিলাপ, শিবের মোহন মূর্তিধারণ, হরগৌরীর বিবাহ দিয়ে তৃতীয় পালা শেষ হয়েছে। চতুর্থ পালায় শিবের গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এতে মহাদেবের ভিক্ষা উপজীবিকা, হরগৌরীর কলহ ইত্যাদি বর্ণিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় যথাক্রমে কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ ও বিবাহ উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী এবং সপ্তম পালায় শিবরাত্রির আখ্যান বর্ণিত। যথার্থ লৌকিক কাহিনী ষষ্ঠ, সপ্তম ওজাগরণ পালায় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ পালায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকার্য গ্রহণ এবং সপ্তম পালায় বাগ্‌দিনী বৈশিনী মহামায়ার সঙ্গে শিবের মৎস্য ধরা, শিবকে ছলনা করে দেবীর কৈলাসে প্রস্থান এবং শিবেরও কৈলাসে যাত্রার কাহিনী বর্ণিত। জাগরণ পালায় নারদের প্ররোচনায় পার্বতীর স্বামীর কাছে শাঁখা পরবার বাসনা, শিবের অসামর্থ্যে অভিমানিনী পার্বতীর পিতৃগৃহ গমন ও শিবের কৈলাসে যাত্রা, শাঁখা পরিয়ে বৃদ্ধ শিবের পত্নীর মানভঞ্জনের চেষ্টা এবং অবশেষে হরপার্বতীর পুনর্মিলনে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। কাব্যে কবির সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে শিবের গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনায়। এই লৌকিক কাহিনীগুলি কোনও প্রামাণ্য পুরাণে পাওয়া যায় না। কেবল নন্দিকেশর পুরাণে কিছু পরিমাণে শিবের কৃষিকার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই লৌকিক কাহিনীতে দরিদ্র শিবের গার্হস্থ্য জীবন, দাম্পত্য কহল, চাষবাস ও মাছধরা প্রভৃতি বর্ণনায় পুরোপুরি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষিত। বিশেষ করে শিবের কৃষিকার্য ও ধন্য রোপণের কাহিনীতে ব্রাহ্মণ কবির কৃষিকর্ম বিষয়ে নিপুণ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ইন্দ্রের কাছ থেকে শিবের জমির পাট্টা নেওয়া আর কুবেরের কাছ থেকে বীজধান কর্জ করার বৃত্তান্তে মধ্যযুগে শোষণ আর বঞ্চনার শিকার সাধারণ বাঙালি কৃষাণের জীবন চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর বাংলা সাহিত্যের ভূমিকায় বলেছেন—"এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরানীর জীবনকাহিনী।"

আবার পার্বতীর মান-অভিমান, দারিদ্র্যের সংসার, পুত্র কন্যাদের জন্য চিন্তা, নিষ্কর্মা স্বামীর ভিক্ষুক বৃত্তি ও চারিত্রদুষ্টি তাঁকে চিন্তাভার পীড়িত সাধারণ গৃহিনীতে পরিণত করেছে। অন্যদিকে শিবের লাম্পট্য দোষও যেন সমকালীন এক শ্রেণীর মানুষে চিরত্রে শিথিলতার প্রকাশ।

রামেশ্বরের কাব্যের হাস্য কৌতুকে ভারতচন্দ্রের মতো মার্জিত নাগরিকতার চাকচিক্য নেই, আছে গ্রাম্য কৃষাণ জীবনের স্থূলতা ও সারল্য। পুত্র সহ মহাদেবের ভোজন এবং দুর্গার পরিবেশনের বর্ণনা খুবই চমৎকার—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী
দুই সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি॥
* * * * *
কার্তিক গণেশ বলে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরি খা॥

সকলের ভোজনের শেষে দেবী অন্নগ্রহণ করলেন। মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালির দৈনন্দিন জীবনই যেন এখানে প্রতিফলিত। ঈশ্বরী পাটনী দেবীর কাছে সন্তানের "দুধে ভাতে" থাকার বর প্রার্থনা করেছিল। আর রামেশ্বরের কাব্যে সদ্যোবিবাহিতা কন্যার বিদায়ের সময় শাশুড়ী জামাতাকে অনুরোধ করেছেন—

কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি॥
আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।
প্রীত কর্য্য যেমন জানকী রঘুনাথ॥

রামেশ্বরের কাব্যের কিছু কিছু বাক্য বিন্যাসও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন—

(১) দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্রে গলা কাটা

(২) পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

(৩) দারিদ্রে দোষের পর দোষ নাই আর।

(৪) শমের নিমিত্তে লোকে নানা কর্ম করে।

অনুপ্রাসের ব্যবহারে করিব শব্দালঙ্কার নির্মাণ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে—

(১) খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।

(২) চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া জিরন্তর।

ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

তবে কবি অনেক সময় শ্রুতিকটু অপ্রয়োজনীয় অনুপ্রাসও ব্যবহার করেছেন।

রামেশ্বরের কাব্য পাঠ করে মনে হয় তিনি হিন্দু ধর্মের এক উদার অসাম্প্রদায়িক মনের অধিকারী ছিলেন। শিব শক্তির বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি কবির গভীর নিষ্ঠা ছিল। কাব্যের নানা জায়গায় নিজের বৈষ্ণব ধর্মানুরক্তি তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন—

শুদ্ধভাবে হরিনাম সদা যেই স্মরে।
বন্দ তার পাদপদ্ম মস্তক উপরে॥

এমনকি মহাদেবের মুখ দিয়েও তিনি হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় তিনি চৈতন্যদেবের উল্লেখও করেছেন, রামেশ্বর দেবদেবীর জীবন নিয়ে কিছু রঙ্গ কৌতুক করেছেন বটে, কিন্তু তাদের প্রতি কবির বিশ্বাস শিথিল হয়নি।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি রামেশ্বর পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীকে মিলিয়ে, উজ্জ্বলতম অনুপ্রাসের সঙ্গে সরল গ্রাম্য বর্ণনায় খাদ মিশিয়ে গ্রামীণ জীবন ও সংস্কারের পটভূমিকায় যা রচনা করেছেন, তা একযুগের জীবন্ত সমাজচিত্রই হয়ে উঠেছে।

৮.১০ অনুবাদ কাব্য

৮.১০.১ শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রামায়ণ কাব্যের একজন বিখ্যাত কবি। রামায়ণ কাব্য ছাড়াও ইনি শিবায়ণ, বাগবতামৃত, মহাভারত, মনসামঙ্গল ইত্যাদি বহু কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুনিরাম চক্রবর্তী। বাসস্থান মল্লভূমির নিকট। ইনি একাধিক মল্লরাজের প্রসাদ লাভ করেছিলেন। রাজার প্রচলিত ‘রামায়ণ’-এ অঙ্গদ রায়বার’, তরণীসেন বধ’ ইত্যাদি স্থানের অনেক স্থলেই এই কবির সরল রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৮.১০.২ রমানন্দ ঘোষের রামায়ণ

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ তাঁর ‘রামায়ণ’ কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থটির বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য নেই। কিন্তু ভূমিকাংশে লেখা আত্মবিবরণী কৌতুকপ্রদ। নিজেকে তিনি বুদ্ধাবতার বলে প্রচার

করেছেন—ম্লেচ্ছাচারের আধিক্য থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য কালীর শাপে 'বুদ্ধদেব' নাকি স্বয়ং রামানন্দ ঘোষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থে কবির ব্যক্তিপরিচয় প্রায় কিছুই নেই। কোথাও তিনি নিজেকে দ্বিজ-অংশ-সম্ভূত, কোথাও বা আবার শূদ্রকুল জাত বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে দারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথদেব এবং রামচন্দ্র উভয়ে এক ও অভিন্ন, এবং উভয়েরই বুদ্ধদেবের রূপান্তর।

৮.১০.৩ দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত

কাশীরামের পুত্র পরিচয়ে যাঁদের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, দ্বৈপায়ন দাস তাঁদের একজন।—

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।/অবহেলে গুণে যেন সকল সংসার।"/

আবার

"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন/এতদূরে পাওয়ার স্বর্গ আরোহণ।।"

ইত্যাদি কিন্তু দ্বৈপায়ন দাস সাথে মোটেই কোনো কবি ছিলেন, অথবা 'মহাভারত' কার ব্যাসদেবের (দ্বৈপায়ন) 'দাস' এর অভিধার অন্তরালে আত্মগোপন করে এক বা একাধিক কবির কবিকীর্তিলাভের এ প্রয়াস যে কথা সঠিক বলা চলে বা। দ্বৈপায়ন দাসের ভণিতায় প্রধানত বনপর্ব, গদাপর্ব এবং স্বর্গারোহণ পর্বের পুথি পাওয়া গেছে।

৮.১০.৪ গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত

সঞ্জয় মহাভারতের সবচেয়ে পুরোনো যে পুথি দুটি পাওয়া গিয়েছে, তার একটিতে অশ্বমেধ পর্বে গঙ্গাদাস সেনের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় গঙ্গাদাস সেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করে থাকতে পারেন।

৮.১০.৫ নন্দরাম দাসের মহাভারত

নন্দরাম দাস কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। নন্দরামের ভণিতায় উদ্যোগ পর্ব ও দ্রোণ পর্ব পাওয়া গিয়েছে। ভণিতা থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিল নারায়ণ। একটি ভণিতায় ক্ষেমানন্দ দাসের নাম আছে। ইনি নন্দরামের পুত্র অথবা অনুরূপ স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। নন্দরামের ভণিতায় ভক্তিপরায়ণতার বেশ পরিচয় আছে।

৮.১০.৬ শঙ্কর কবিচন্দ্র এর ভাগবত

শঙ্কর কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের কবি। তবে "ভাগবতামৃত" সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেভই রচিত। ভাগবতামৃতের সর্ব দেবদেবী বন্দনায় কবি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের নবরত্ন মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন।

এই মদনমোহন মন্দর নির্মাণ করেছিলেন দুর্জনসিংহ। মন্দির নির্মাণের কাল 'মল্লাব্দ ফণিরাজ শীর্ষ গণিতে" (১০০০ মল্লাব্দ) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। অতএব এ ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয় যে মন্দির নির্মাণের পর কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কাব্য রচনার কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক, একথা বলা যায়।

কবিচন্দ্রের কৃষ্ণকথা প্রধানত ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে সংকলিত কাহিনী। তবে অন্যান্য স্কধের জনপ্রিয় কিছু কিছু উপাখ্যানও তিনি পালা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর ভাগবতের দশম স্কন্ধে কাহিনীকে কবি যথাযথ ভাবেই অনুসরণ করে কবি কাব্য রচনা করেন।

তবে কবি যে আক্ষরিক অনুবাদ করতে চাননি, তা তিনি নিজেই বলেছেন—

কেবা ব্যাসদেবের বুঝয়ে অভিপ্রায়।
ভাবর্থ ভাবের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র গায়।

কবির এই ভাবার্থ ব্যাখ্যায় অনেক সময়ই ব্যাসদেব ঢাকা পড়ে গেছেন এবং কালের হাওয়ায় বৈষ্ণব ভাপুকতার যে পরিমল প্রবাহিত হচ্ছিল, তাই-ই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এর উদাহরণ দেওয়া যায়। উদূখলের বন্ধনে বাঁদা পড়ে কৃষ্ণ যমলার্জুন উদ্ধার করলেন। এই হল ভাগবতীয় কাহিনী, পরে পরম বিস্ময়ে নন্দ এসে কৃষ্ণকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু কবিচন্দ্রের বর্ণনায় দেখি শ্রীদাম, সুদাম, প্রভৃতি সখার অনুরোধে বলরাম এসে ওজর ধরলেন, কৃষ্ণকে মুক্ত করে দেওয়া চাই। এতে ভাগবতের ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলার বাৎসল্য ও সখ্য ভাবতরেক যুক্ত হয়েছে। মল্লরাজসভার বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে বাস করে এবং রাজসভার উপযোগী কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবিচন্দ্র খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাগবত কাহিনীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত—ভাগবতের সামান্য ইঙ্গিতকে আশ্রয় করেই কবি অনেক নতুন কাহিনী গড়ে তুলেছেন। যেমন কবি বর্ণিত গেড়ুঁ খেলার পল্লবিত কাহিনীটি 'ক্ষেপণের ক্ষিপতর ক্বচিৎ' অথবা "ক্বচিৎ বিল্বৈর ক্বচিৎ কুম্ভৈভরর ক্ব চামলকমুষ্টিভির"-র মত শ্লোকাংশে সামান্য ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। এইভাবে গেঁড়ু অন্তর্হিত করার কাহিনী 'মিলায়নৈর' শব্দের ইঙ্গিতে, লুকা লুকী খেলার কল্পনাসূত্রে 'অস্পৃশ্য নেত্র বন্ধাদৈর'-তে, হাড়ু-ডু খেলার সূত্র 'দর্দুর প্লবৈঃ" রাখাল রাজা খেলার সূত্র "কর্হিচিন্নপচেষ্টায়"-র মধ্যে নিহিত আছে। ফল ভোজন, কিরাতীয় উদ্ধার ও কিরাত সহ কিরাতিনীর অন্তে স্বর্গ প্রাপ্তি প্রভৃতি উপাখ্যানের উৎসও ভাগবতের মাত্র দুটি শ্লোকের সামান্য ইঙ্গিতকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের ফল ভক্ষণের কাহিনী কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির একটি পরিচিত প্রিয় প্রসঙ্গ। পূর্ববর্তী শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গলকাদের কাব্যেও আমরা ভাগবতের দুটি শ্লোককে অবলম্বন করে কাহিনী বয়নের চেষ্টা দেখেছি। কিন্তু কবিচন্দ্র বেশ একটি পূর্ণাঙ্গ উপাখ্যান নির্মাণ করেছেন। এই নির্মিতিতে কবির যথেষ্ট কৃতিত্বও প্রকাশিত হয়েছে।

ফল ভক্ষণ কাহিনীতে বৃদ্ধ ফল বিত্রোত্রীর যুবতীতে রূপান্তিরত হওয়া, গৃহে প্রত্যাবর্তন ও তার স্বামীর তাকে অপরিচিতা রমনী ভেবে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনা পূর্ববর্তী কোনো কৃষ্ণমঙ্গলের নেই। এগুলি কবির নিজস্ব কল্পনা। আর কিরাতের কৃষ্ণপ্রেমের আবেশ মদনমোহন মন্দিরে কীর্তন নৃত্যরত আবিষ্ট বৈষ্ণব ভক্তের ছবিই যেন তুলে ধরে। কবি তাঁর পারিপার্শ্বিক লব্ধ প্রত্যক্ষ জীবনের ছবিই এখানে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন বলে মনে হয়।

এ সমস্ত প্রসঙ্গ ছাড়াও ভাগবত পুরাণ বহির্ভূত কিছু কিছু কাহিনীও কৃষ্ণ কথার বর্ণনায় কবি গ্রহণ করেছেন। যেমন কর্ণমুনর পারণ, কোকিল সংবাদ ও দিবা রাসের কাহিনী ভবিষ্যপুরাণ থেকে গৃহীত বলে কবি উল্লেখ করেছেন, যদিও বর্তমান প্রচলিত মুদ্রিত ভবিষ্যপুরাণে এসব কাহনী নেই। অধিকাংশ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মত এই কবিও পারিজাতহরণ হরিবংশ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী, নারদ পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কপোত কপোতী সংবাদও ভাগবতের কাহিনী নয়। এর কোনো পৌরাণিক উৎসত্ত জানা যায় না। কাহিনীটিতে শত্রু ব্যাধ ক্ষুধাতুর হলে, তার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কপোত কপোতী নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অতিথি পরায়ণতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রেখেছে।

কলঙ্ক ভঞ্জনের নষ্টচন্দ্রদর্শড় প্রসঙ্গটি সম্ভবত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকেই গৃহীত। তবে পদ্মপুরাণেও এই কাহিনীটি রয়েছে।

চতুর্থত—এই কবির কাব্যের কিছু কাহিনী প্রত্যক্ষভাবেই গোস্বামীদের কৃষ্ণকথার উত্তরাধিকার। যেমন মুক্তা চাষের কাহিনী। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'মক্তাচরিত্রের' প্রভাব এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু কবি মুক্তাচরিত্রের প্রাথমিক ঘটনাটুকুমাত্র এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, পুরো কাহিনীটি বর্ণনা করেননি। কৃষ্ণকালী সংবাদ, রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধবের কাহিনী-কৃষ্ণের গৌরী মূর্তি ধারণের প্রসঙ্গজাত বলেই মনে হয়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতেও আমরা এই ধরনের কাহিনী পেয়েছি।

আবার এমন কিছু কিছু কাহিনী কবিচন্দ্র বর্ণনা করেছেন, যা হয় তাঁর কপোল কল্পিত, নয় কোন লৌকিক উৎস সঞ্জাত। যেমন কাঠুরিয়া ভক্তি কাহিনী, মূষিক মার্জার লীলা প্রভৃতি। দাতা কর্ণের কাহিনীও মহাভারত কিংবা জৈমিনীয় সংহিতায় নেই, প্রসঙ্গটি জন্ম বাংলাদেশেই।

ভাগবতবতের 'গোবিন্দমঙ্গল' সম্পাদক যে গুরুদক্ষিণা পালাটি সংকলন করেছেন, তা কবিচন্দ্র শংকর চক্রবর্তীর রচনা নয়। কারণ কবিচন্দ্র লেগোর দক্ষিণে অবস্থিত পানুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পানুয়ায় বসতি॥

কিন্তু যে শঙ্কর কবিচন্দ্র গুরু দক্ষিণা পালাটি রচনা করেছেন, তাঁর বাস বর্ধমান জেলার কুলচন্ত গ্রামে—"শঙ্কর রচিল যার কুলচন্ত বাস"। এই পালাটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৫তম অধ্যায়ের কাহিনী অবলম্ভবনে রচিত। গুরুদক্ষিণার কাহিনী অবশ্য অগ্নিপুরাণ বিষ্মুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতেও দেখা যায়। কিন্তু ভাগবত পুরাণের কাহিনীতে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, অন্য পুরাণের কাহিনী থেকে একে সহজেই পৃথক করা চলে। যেমন শঙ্করের বর্ণনায় শঙ্খানুর হরিবংশ অনুযায়ী তিমি মাছ নয় শঙ্খ। ভাগবতের কাহিনীতে যমরাজ ভক্তিতেই কৃষ্মের গুরু পুত্রকে প্রত্যার্পণ করেছিলেন, কিন্তু হরিবংশে ও বিষ্মুপুরাণে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রত্যর্পণ করেন। শঙ্কর এখানে ভাগবতকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কাহিনী বয়সে ভাগবতকে অনুসরণ করলেও কিছু কিছু প্রসঙ্গে কবি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। যেমন—শ্রীকৃষ্মের উপস্থিতি হেতু যমলোকে বন্দী সমস্ত পানীয় উদ্ধার প্রসঙ্গটি অভিনব। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংকলিত এই পালাটির আরও একাধিক পুথি পাওয়া যায়। যেমন সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩০৬/প্রথম সংখ্যা) প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রসঙ্গে ২৪৬ সংখ্যক পুথিটি শংকরের গুরুদক্ষিণা পালার।

৮.১০.৭ দীন বলরাম দাসের ভাগবত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বলরাম দাস' অন্য বহু সমস্যার মতই এখনো পর্যন্ত সমাধানহীন একটি সমস্যা। গৌরপদ তরঙ্গিনীর সম্পাদক জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় সর্বাধিক সংখ্যক ১৯ জন বলরামের দাবি উথাপন করেছিলেন। ড. সুকুমার সেন মহাশয় তাকে কিছুটা কমিয়ে (৫ জনে) আনার গবেষণা করেছেন। কৃষ্মলীলামৃত রচয়িতাকে তিনি অন্যদের থেকে পৃথক ব্যক্তি বলেই চিহ্নিত করেছেন। ইনি নিজেকে ভণিতায় 'দীন' বলে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য সব সময় যে করেছেন, এমন নয়—"কৃষ্মলিলামৃত কহে বলরাম দাসে" ও ভণিতা হিসেবে দেখা যায়। এই দীন চিহ্নিত বলরাম দাস যে অন্যদের থেকে পৃথক, তা স্বীকার করা যেতে পারে। দীন বলরামের নামে যে দু'একটি পদ পাওয়া যায়, তাও হয়ত এঁরই রচনা হতে পারে।

বলরাম দাসের কৃষ্মলীলামৃত একটি কৃষ্মলীলামূলক কাব্য, হেঁয়ালিতে কবি কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন—"অজমুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনী যকায়/এই পরমাণে সকাদিত্য এক জায়।।" (অজমুখ = ৪, ভুজ = ২, অঙ্গ = ৬, অশ্বিনী = ১) অর্থাৎ ১৬২৪ শকাব্দ বা ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দ কবির কাব্য রচনা কাল।

বন্দনাদির পর বৈষ্মবোচিত বিনয়ের সঙ্গে কবি কাব্য আরম্ভ করেছেন। দেখা যায় কাব্যের মধ্যে কবি গদাধর দাসের চরণ বন্দনা করেছেন—"শ্রীযুত গদাধর চরণ ভরসে।/কৃষ্মলিলামৃত কহে বলরাম দাসে।।"

কৃষ্মমঙ্গল কাব্যের ধারায় বলরাম দাসের কাব্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কাব্যটির গঠনই অন্য সমস্ত কাব্যগুলোর থেকে কবিকে স্বতন্ত্র করে তোলে। সাধারণত শুক, শরদ জনমেজয়ের মুখ দিয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে পৌরাণিক রীতির অনুবর্তন করেই কৃষ্মমঙ্গল কাহিনীসমূহ বয়ন করা হয়েছে। কিন্তু বলরাম গ্রন্থারম্ভে একটি অভিনব কাহিনী

উপস্থাপন করেছেন— "মগদ্য দেশেতে এক রাজার কুমার/শুদ্রেতে কুলীর ছিল মহা অধিকার/ভুঞ্জিয়া বিসয় বাস তিক্ত হৈএগা মনে।/সকল ছাড়িয়া তিঁহো গেলা বৃন্দাবনে।।/ব্রজেতে কলি বাস বরিস দশেক।/সর্বশাস্ত্র পড়ি গ্রন্থ দেখিল অনেক।।/ইষ্টদেব স্থানে তিহোঁ বিদায় লইয়া।/প্রতি দেশে দেশে তিহোঁ বেড়ান ভ্রমিয়া।/ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মৎস রাজার দেশে।/পাঞ্চাল নগরে রাজার করিলা প্রবেশে।।/জমুনার হেন কথা দুকুলে নগর।/তটের উপরে দিৰ্ব্ব স্থান মনোহর।/

****

নদির তীরেতে এক বটবৃক্ষ আছে।/পথশ্রম পাএগা তেহো গেলা তার কাছে।/পরম সিতল ছায়া স্থান মনহর।/দেখিয়া হরিন বড় হইলা অন্তর।/বসিলা বিবেক গ্রন্থ রাখিয়া ভুমিতে।/বেলা অবসান দেখি লাগিল ভাবিতে।/

****

এই মতে বসিয়া করেন আলোচনা।/দিবর্ব এক নিতাম্বিবনী তথা আগোমন॥"

ইনি আত্ম পরিচয় দিলেন—

শোকুলেতে জন্ম মোর নাম সত্যবতী।/শিশুকাল হৈতে করি গোবিন্দয-ভকতি॥/

****

আমার বাসাতে চল বৈষ্ণব গোসাই।/করিবে তোমার সেবা মোর জেষ্ঠ ভাই॥

আর এক আছে মোর কনিষ্ঠা ভগিনী।/অলপ বত্রসে রাড়ি সেই অভাগিনী।/

যাই হোক বিবেকী শেষ পর্যন্ত সত্যবতীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলেন। এই পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়। সন্ধ্যাকালে সত্যবতীর অনুরোধে বিবেকী কৃষ্ণকথা আরম্ভ করলেন। বর্ণনায় খণ্ডিতা, বাসকসজ্জিকা, কলহান্তরিতা, প্রভৃতি রূপ নির্দেশিত রস পর্যায় যে বিবেকীর ভালভাবেই রপ্ত, তা বোঝা যায়। একটি দৃষ্টান্ত উৎকলিত হতে পারে—

"যেহেতু কলহ জন্মে কহিত্র তোমারে।/নাম না জন্মিলে রস পুষ্টি নাহি ধরে॥/

নাইকা ছাড়িয়া অন্য নাইকার ঘরে। রসের লালসে যদি নিরসক্তি করে॥/

সে কথা বেক্ত যদি হয় তার আগে।/মাণিনীর ভক্ত যদি হয় অনুরাগে॥'

এছাড়া কাব্যে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসেবে চিত্রণও রূপ গোস্বামী প্রভাবিত। সমস্ত কাব্যটির বুনুনী এই বিবেকী সত্যবতীর প্রশ্নোত্তর গ্রথিত। গঠনের দিক থেকে কাব্যটি যে অভিনব তা স্বীকার করতেই হবে। এছাড়া কাব্য কাহিনী সম্পূর্ণ প্রেম ভক্তির ডোরে গাঁথা ব্রজলীলার উপাখ্যান। ঐশ্বর্য বর্ণনা কবি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীদের খেদে কাব্য শেষ হয়েছে। কাহিনীর উৎস নির্দেশ করে বলা হয়েছে—"ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে জে কহিল ভাগবতে/তাহা আমি করি বিরেচন।" বর্ণনার ক্ষেত্রে করিব ক্ষমতা নিতান্ত মন্দ নয়। নায়িকার মানে কৃষ্ণের বিরহ অবস্থার একাংশ প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়—

"বিরহে ব্যাকুল কৃষ্ম হইএগা হৃদএ তৃষ্মা
ঘন ঘন ছাড়েন নীশাস।
মাগধী তলাতে বসি ফেলাএগা হাতের বাশি
নি(া) রক্ষণ করে দিগ পাষ॥

পথে রাধা না দেখিয়া পড়ে মূর্ছাগত হৈঞা
পুন উঠে পথ পানে চায়।
মুণ্ডে (?) পানি হানি কহে আজি প্রাণ নাহি রহে
কি হইল করে হায় হায়॥”

৮.১০.৮ দ্বিজ রমানাথ-এর ভাগবত

এই কবির কাব্যের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’। কাব্যটিতে পৌরাণিক কাঠামোর অনুসরণে শুক, নারদ, অথবা পরীক্ষিত জনমেজয়-এর কথোপকথনে কাহিনী বিকৃত হয়নি। কাহিনীর বক্তা কবি নিজই অবশ্য এর আগেও কখনও কখনও স্বয়ং কবিকে বিবৃতিকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি। কাব্য প্রারম্ভে দেবকী ও যশোদার সাধনা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাওয়ার জন্য তাঁরা কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেন, সেই তপস্যার সময়—

—ধরিল শিশুর বেশ দেব নারায়ণ।
দেবকী নিকটে আসি দিলা দরসন॥
দেবকী আছেন চক্ষু মুদ্রিত হইআ।
ছল করি কৃষ্ণ তোথা দাণ্ডাইল গিয়া।
নিজরূপ ধরি প্রভু দৈবকীরে কন।
কি হেতু করহ তপ থাকিআ নির্জন॥

তখন দৈবকী বর চাইলেন “তুমা হেন পুত্র জেন এই জন্মে পাই।।” যশোদাও সেই প্রার্থনা করলেন।

ধরা দ্রোণ, সুতপা, পৃশ্নির তপস্যার প্রসঙ্গ ভাগবতেও বর্ণিত হয়েছে। এঁরাই পরে যথাক্রমে যশোদানন্দ ও বসুদেব দেবকী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কবি সেই প্রসঙ্গ পরিবর্তিত করে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। এরপর কাহিনী যথারীতি ব্রহ্মার নিকট পৃথিবীর দুঃখ জ্ঞাপনে আরম্ভ হয়েছে। দেবকীর বিবাহ, কংসের প্রতি দৈববাণী ইত্যাদি ভাগবত নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের ভণিতাংশে কবির নাম বেশ কয়েকবার পাওয়া যায়। যেমন—

(১) দ্বিজ রমানাথ বলে গোবিন্দ কৃপায়॥
(২) দ্বিজ রমানাথ বলে কৃষ্ণের কৃপায়॥
(৩) অঘাসুর বধ করা শুনে জেই জনে।
তার সত্রু নাস জায় রমানন্দ ভনে॥

পুথিতে ভাগবতের কাহিনী, পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, মুখব্যাদনকারী কৃষ্ণের মুখ গহ্বরে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন, গর্গের নামকরণ, উদুখলে বন্ধন, বৎসাসুর বধ, বকাসুর ও অঘাসুর বধ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য প্রসঙ্গের তুলনায় কালীয়দমন প্রসঙ্গ দীর্ঘ। এছাড়াও কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পেতে চেয়ে গোপীগণের কাত্যায়নী পূজার কাহিনীও এখানে আছে— “নন্দের নন্দনে দুর্গাস্বামী করি দিব।” কবি বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গও বর্ণনা করেছেন। যজ্ঞস্থানে রাখালদের অন্নপ্রার্থনা, ঋষি পত্নীদের কৃষ্ণকে ভোজন করানো, গোবর্ধন, ধারণ, কুক্ষণে, স্নানের সময় বরুণের অনচর কর্তৃক নন্দকে হরণ ও কৃষ্ণের নন্দ উদ্ধার প্রভৃতি ভাগবতীয় কাহিনী বর্ণিত। এছাড়াও অবিষ্টাসুর বধ, ব্যোমাসুর বধ ও অক্রুরের ব্রজে আগমন, কৃষ্ণ বলরামের মথুরা যাত্রা, গোপীগনের বিলাপ, পথে যমুনায় স্নানকালে

অক্রুরের জলের মধ্যে রামকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন, কৃষ্ণের মথুরায় আগমন রজক হত্যা ও শিশুগণকে বস্ত্র বিতরণ পর্যন্ত কাহিনীর পর পুথি খণ্ডিত হয়েছে।

এই সমস্ত পৌরাণিক প্রসঙ্গ ছাড়াও এই কাব্যে দানলীল, নৌকালীলা ও জলক্রীড়ার কাহিনী আছে। দানলীলার বর্ণনায় কবি বলেছেন—

'আর রপে গেলা কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে।
দানছলে রহিলেন কদম্বের তলে॥
হোথা সে শ্রীমতি গিয়া সখি ডাকে বলে।
বিধাতা কলি যদি গো গোয়ালার জাতি।
দধিদুগ্ধ বিকিকিনি এই মোদর বিত্তি।

রাধা সঙ্গে বড়াইকেও নিলেন, এরপর রাধা কৃষ্ণের কাছে উপনীত হলে, কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

নিতি নিতি জাহ বিকে দান দেহ কোন লোকে
ভুলিইয়া গেছ বহু দানি॥

গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দানলীলার বড়াই র ভূমিকাটি খুবই সক্রিয়। দানী দান চাইলে সমস্যায় পড়েছেন গোপীরা। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল বড়াই এবং সমস্যার সমাধানও করল।

নৌকালীলার বর্ণনাও রয়েছে। নৌকালীলার পর রাস, কাত্যায়নী ব্রত ও শঙ্খাসুর বধের পৌরাণিক প্রসঙ্গের পর কৃষ্ণ ও গোপীদের জলক্রীড়া বর্ণিত হয়েছে। জলক্রীড়া প্রসঙ্গে চন্দ্রাবলী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চন্দ্রাবলী এখানে রাধার সঙ্গে এক নয়, পৃথক চরিত্র। জলক্রীড়ার সময় চন্দ্রাবলীর নূপুর হারিয়ে যাওয়ায়, কে চুরি করেছে জানার জন্য সবার বস্ত্র আভরণ ঝেড়ে দেখা হল। জলক্রীড়ার প্রসঙ্গ পরিচিত হলেও চন্দ্রাবলীর নূপুর হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি কবির কপোলকল্পিত।

এ কাব্যে দু একটি রাগিনীসহ কিছু প্রদত্ত পাওয়া যায়। যেমন কালীয় দমন বর্ণনাকালে একটি করুণারাগের পদাংশ—

কোথাকারে গেলিরে প্রাণের কানাই রে
তোমা বিনে সখা কেহো নাঞি রে।

অপর একটি পদের রাগ মালসি, গোবর্ধন ধারণ লীলায় যুক্ত হয়েছে। মল্লার রাগে আর একটি পদ আছে। এছাড়াও ধনশ্রী, কামদ, বিভাস প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে। এই পুথিটি ঠিক বিশুদ্ধ আকারের পাওয়া যাচ্ছে না। একটি ভণিতায় আছে—

হেন বেলে কোকিলের কলরব শুনি
গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণরস বাণি।

এরপর রাসের বর্ণনা রয়েছে। অথচ চৈতন্যোত্তর কালের পরিচিত বৃন্দাদূতীর চরিত্রটি এখানে উপস্থিত—

এত যদি বলিলেন রাই বিনোদিনী।
কান্দে কান্দে বলে বৃন্দা আধ আধ বাণী।

পুথিটি যদি নির্ভেজাল হত, তাহলে রমানাথের পরিচয় স্পষ্ট হত।

৮.১১ শাক্ত পদাবলি

● **রামপ্রসাদ সেন**

বাংলা ভক্তি সংগীতের ধারায় শ্যামাবিষয়ক পদরচনার ঐতিহ্যের প্রবর্তক রামপ্রসাদ। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত কবির পদগুলি লোকমুখে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, নতুন গড়ে ওঠা কলকাতা শহরের ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে রামপ্রসাদের পদের অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হয়েও রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন ঃ— "ব্রহ্মণে আমরা একটি ধর্মসঙ্গীত রচয়িতা সাধু পুরুষের নিকট আগমন করিতেছি। তাঁহার গীতগুলি অতি সহজ ভাষায় রচিত এবং বঙ্গদেশে সর্বস্থানে পরমার্থ সাধক বলিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। তাঁহার নাম কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাতভিখারিদিগের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে, তাহা বজলা যায় না।"

ভক্তির এই সহজ উৎসারণেই রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ তিন তান্ত্রিক সাধক, এইরূপ পরিচিতি তাঁর ভক্তি ভাবনাকে যেন সঠিকভাবে চিহ্নিত করে না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন—

"(রামপ্রসাদ) সাধকরূপে প্রাচীন তন্দ্র সাধনা পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কবি রূপে তাঁহার প্রকাশরীতি ও অনুভুতির স্বকীয়তা আধুনিকত্বের পরিচয় বহন করে। তাঁহার পদাবলিতে রূপবর্ণনা ও সাধনাক্রম নির্দেশ প্রাচীন সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। কিন্তু মাতৃরূপিনী বিশ্বশক্তির সহিত পরিচয় স্থাপনের প্রচেষ্টা মধ্যে তাঁহার যে মানবিক আবেগ-আকৃতি ও দুরূহ তত্ত্বে অনুপ্রবেশ শীলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আধুনিক।" রামপ্রসাদের পদে তান্ত্রিক উপাসনার সাধন সংকেত থাকলেও প্রকৃত ভক্ত কবি কোথাও উপচার বা মন্ত্র তন্ত্রের যান্ত্রিকতাকে সহজ ভক্তির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেননি। পুনরায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণ করা যায়—

"তন্দ্রসাধনায় সুকোমল হৃদয় বৃত্তির বিশেষ কোনো স্থান নাই—বরং সাধারণ প্রবৃত্তির উৎপাদনের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। নারী লইয়া সাধনা, মদ্যমাংসের উপচার, নরবলি, কৌমার্যহরণ প্রভৃতি নৃশংসাচার। শ্মশানের ভয়াবহ পরিবেশে পূজানুষ্ঠান এ সমস্তই সহজ জীবনযাত্রা ও ভক্তি নিবেদন প্রণালির বীভৎস ব্যত্ক্রিম। এই কঠোর তপসচর্চা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দয়া মায়া প্রীতি মান অভিমান আত্মনিবেদন প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়াবেগের উৎসারণেই রামপ্রসাদের মৌলিকতা। বীভৎসের মধ্যে মধুরের আবিষ্কার প্রলয়ংকারী ধ্বংসলীলায় উন্মত্তা কালীমূর্তির নৃশংসতার অন্তরালে স্নেহ মমতাময়ী মাতার স্পর্শ, জীবনের সমস্ত জটিলতার পিছনে এক মায়াময়ীর রহস্যজাল বিস্তারের অনুভূতি, ইহার সমস্ত বিভ্রান্তি বঞ্চনার মধ্যে পরম সান্ত্বনার নিশ্চিত আশ্বাস—এই মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে। এছাড়া রামপ্রসাদ দেবী ও মানবের সম্পর্ক রহস্যকে এক সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন।"

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, কলকাতা তখনও এমন কিছু নগর অভিধা পায়নি। তবু রাজসভার অস্তিত্বে, নায়েব দেওয়ান প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ও রাজপুরুষদের অবস্থান গৌরবে, দেশের বহমান অর্থনীতির কেন্দ্রীভবনে, উচ্চশ্রেণীর শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্যবোধে, বিলাসব্যসনে ও শ্রেণী বৈষম্যের কারণ সৃষ্টিতে এক জাতীয় সামাজিক নাগরিকতা বা সোশ্যাল আরব্যানিটি গড়ে উঠেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্য সেই অর্থে নাগরিক কিন্তু রামপ্রসাদের পদ সেই তুলনায় সম্পূর্ণ কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণসমাজের সৃষ্টি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছিলেন ঃ-"রামপ্রসাদের ভক্তিসাধনার পদগুলিতে বাংলার গ্রামীণ চিত্রের সমগ্রতা প্রতিবিম্বিবত হইয়াছে। ইহা কিন্তু সত্যকার গ্রাম জীবন, ইহার মধ্যে কোনো

ভাবাদর্শগত রূপান্তর কল্পনাবিলাস নাই। এই গ্রামজীবন অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতীক, কিন্তু ইহা স্বধর্ম হারায় নাই, ইহার অঙ্গবিন্যাসে রক্তমাংস উবিয়া যায় নাই।”

রামপ্রসাদের আগমনী, বিজয়া, ভক্তের আকুতি পর্যায়ের গান বাঙালির চিরকালের সম্পদ। তিনি নিজে তন্ত্র সাধক ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্র সম্মত আবার নিষ্ঠ কর্ম কাণ্ড পরিহার করে সাধারণ মানুষের কর্মক্লিষ্ট জীবনের সহজ মাতৃ ব্যাকুলতায় ভক্তিকে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবৎকাল মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ। এই সময় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজ বন্ধন ব্যক্তিতান্ত্রিকতার আঘাতে ভেঙে যাচ্ছে। বিশ্বাসের জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে সংশয়। রামপ্রসাদের গান এই সংশয়পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে আলোর সংকেত। তাঁর আগমনী ও বিজয়াগানে বাঙালির একটি সামাজিক প্রথা রূপায়ণ। কন্যা বিরহাতুরা মেনকার বেদনায় এই পদগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে—

গিরি এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝঘড়া জামাই বলে মানব না।

আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের গান বাংলা ভাষায় প্রথম কে রচনা করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে প্রাপ্ত লিখিত পদের মধ্যে রামপ্রসাদই সম্ভবত প্রাচীনতম কবি। রামপ্রসাদের এই আগমনী বিজয়া পদগুলি গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ-মমতা বাৎসল্য রসে সিঞ্চিত। তবুও কবি কখনও কখও পাঠককে মনে করিয়ে দেন গৃহাগত কন্যা আসলে জগজ্জননী বিশ্বপালত্রী মহামায়া, নিছক লীলা বসে তাঁর মানবীরূপ কন্যারূপ ধারণ করা। রামপ্রসাদ তাঁর একটি আগমনী, বিজয়াপদে ব্রজবুলিমিশ্রিত ভাষায় বৈষ্ণবপদাবলির গোষ্ঠলীলার অনুসরণে উমাকে বৈষ্ণবীয় গোষ্ঠপদের কৃষ্ণের মত বেণুবাদীকা ও ধেনুচারণরত মূর্তিতেও দেখেছেন।

উপাস্যতত্ত্বের পদেও রামপ্রসাদ বৈষ্ণবপদাবলির প্রভাবে শ্যামাজননীকে দিয়ে রাসলীলার শাক্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। আবার কখনও রামপ্রসাদ তাঁর পদে স্থূল মূর্তিপূজার বিরোধিতা করে বিশ্বব্যপ্ত বিমূর্ত মহাশক্তির মহিমা কীর্তন করেছেন—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
মা বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে ঘাটি মাটি নিয়ে।
করে অসি মুণ্ডমালা সে মা-টি কি মাটির বালা
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে।

কখনও কখনও রামপ্রসাদ তাঁর পদে প্রত্যহের পরিচিত বস্তু বা বিষয়ের নিপুণ রূপক ব্যবহার করে তাঁর দেহাধীন জীবনের কর্মভার ও সংসার গ্লানিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শক্তি উপাসনার ক্ষেত্রে তিনি একটি উদারনৈতিক চেতনার প্রবর্তন করেন। রামপ্রসাদের এই ধর্মীয় উদারতারই মূর্ত রূপ দেখা যায় পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

- **কমলাকান্ত**

বাংলার শাক্তপদ সাহিত্যের আর একজন কবি ও সাধক প্রায় রামপ্রসাদের মতই গৌরভ লাভ করেছেন। ভক্তিরস, সঙ্গীতরস ও কবিত্বে তিনি প্রায় রামপ্রসাদেরই সমতুল্য। তিনি বর্ধমান নিবাসী সাধক ছিলেন। বর্ধমানের রাজারা তাঁকে বিশেষভাবে ভক্তি করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বর্ধমান রাজবাটী থেকেই তাঁর প্রামাণিক পদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাঁর

পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা গ্রাম। তাঁর চরিত্রেও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমান রাজেরা তাঁকে সভাপণ্ডিতও করেছিল। রামপ্রসাদের মতই তাঁর জীবনও নানান অলৌকিক গল্পে পূর্ণ। মৃত্যুকালে যখন তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়, তখন মুমূর্ষ কবি ঘোরতর প্রতিবাদ করে বলেন যে যেহেতু গঙ্গা দুর্গার সপত্নী তাই তিনি গঙ্গার তীরে যাবেন না। তাঁর জীবনের সাল-তারিখ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে প্রায় ৫০ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় ৩০০ পদ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর শাক্ত সঙ্গীতগুলিকে রামপ্রসাদের সাধকসঙ্গীতের উত্তরাধিকার বলে মনে করা হয়। কমলাকান্তের আগমনী পদগুলি অবশ্য সেই তুলনায় ঠিক ভক্তিগীতি নয়, বরং কবিওয়ালাদের মত মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। কমলাকান্তও যথারীতি মেনকাকে দিয়ে শরৎপ্রভাতে কন্যার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সেই স্বপ্নে দুর্গা-রূপের সঙ্গে কমলাকান্ত উপাসিত কালিকারূপের স্মৃতি মিশে গেছে। কমলাকান্তের একাধিক পদে মেনকার স্বপ্ন দর্শন কাব্যের বিষয় হয়েছে। স্বপ্ন ব্যথিতা জননী মেনকা আপাত নিশ্চিন্ত গিরিরাজকে কন্যা আনয়নের জন্য নানা ভাষায় অনুরোধ, অনুনয়, তিরস্কার ও গঞ্জনা জানিয়েছে—

কবে যাবে বলো গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হইয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছ ঘরে
কী আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি তেই হে তোমারে সাধি
নারীর জমন কেবল যন্ত্রণা সহিতে।

বাঙালি মায়ের কন্যাবিরহের বাস্তব বেদনা আগমনী বিয়জা পর্যায়ের গানগুলিকে একটা স্বতন্ত্র মানবিক মাধুর্য দান করেছে। এছাড়াও কালিকার স্বরূপ এবং কবির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা সংক্রান্ত কয়েকটি গান রামপ্রসাদের থেকে কোনো দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়, বরং কবিত্ব বিচারে উৎকৃষ্ট। যেমন—

১. সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা,
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি॥

২. তাই শ্যামারূপ ভালোবাসি।
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী॥

এ সমস্ত গানের ভাষা ও বিন্যাসপদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও দৃঢ় সংবদ্ধ। বরং রামপ্রসাদের ভাষা কিছুটা শিথিল ধরনের। কবির মনোভাবও খুব উদার ছিল। শ্যাম ও শ্যামাকে একীভূত করে তিনি লিখেছেন—

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥

হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি

দনুজতনয়ে করে সভয়

কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী

ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥

আবেগ, কল্পনা, ভক্তিভাব ও রচনারীতির এরকম সুষ্ঠু সমন্বয় রামপ্রসাদকে ছেড়ে দিলে আর কোন শাক্তপদকারের রচনার মধ্যে পাওয়া যাবে না। কবি কিছু কিছু বৈষ্ণবপদও লিখেছিলেন, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বিচারে তার মূল্য বেশি নয়।

৮.১২ নাথসাহিত্য

নাথ সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল থেকে সাধনভজন করে আসছিল এবং এখনও এরা বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতি ছড়া গান ও আখ্যানকাব্য বাংলাসাহিত্যের আদিপর্ব অর্থাৎ দশম দ্বাদশ শতব্দীর দিকে রচিত হয়েছিল। কিন্তু আদিনাথ-মীননাথ কাহিনীর শুরু অষ্টম শতকে। গোপীচাঁদের গান সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীতে। কিন্তু ময়নামতীর গান লোকসাহিত্য হিসেবে বিংশ শতাব্দীতেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হয়েছে।

মৌখিক নাথ সাহিত্যের ভাষা আঞ্চলিক ও আধুনিক। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে হাজার বছর আগেকার জীবনচেতনার, জীবনযাত্রার, সমাজের ও সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন ও আভাস মেলে।

নাথ সাহিত্য বলতে আমরা নিম্নলিখিত রচনাগুলিকেই বুঝি—

(১) গোরক্ষ বিজয় (২) মানিকচন্দ্র রাজার গান (৩) ময়নাবতীর গান (৪) গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস (৫) যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত (৬) চৌরঙ্গীনাথ (৭) সাধন মাহাত্ম্য (৮) যোগীর গান (৯) যোগীকাচ (১০) যোগ চিন্তামণি।

হিন্দি-মারাঠী-উড়িয়া-তিব্বতী ভাষায়ও এইসব কাহিনী প্রচলিত আছে। বিশেষ করে মীননাথ গোরক্ষনাথ কাহিনী সর্বভারতীয় এবং নেপালে তিব্বতেও প্রচলিত।

এই নাথপন্থীরা নানা ধরনের যৌগিক, তান্ত্রিক, রাসায়নিক, আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত ভিষগ্‌বিদ্যার সাহায্যে জড়দেহকে পরিশুদ্ধ বা পরিপক্ক করে তার সাহায্যে মোক্ষমুক্তি নির্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষা করতেন। এক কথায় এঁদের যোগী সম্প্রদায় বলা হয়। কারণ এঁদের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি পতঞ্জলির যোগ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নাথ ধর্মে যে নজন গুরুর কতা জানা যায় বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও তাঁদের পূজা করতেন। চর্যার পদে ও টীকায় নাথ ধর্ম ও নাথ গুরুর উল্লেখ আছে।

নাথ সাহিত্যে সমস্ত কাহিনীর মধ্যে দুটি কাবিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) গোরক্ষনাথের মহিমা বিষয়ক কাহিনী এবং (২) ময়নামতী-গৌপীচন্দ্রে গান।

গোরক্ষনাথকে নিয়ে শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশেই নানা ধরনের গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে আবার অনেকে ঐতিহাসিক পুরুষও বলতে চান।

অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় তাঁর কাল বলা হয়। তিনি উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম ভারতেই কোন সময় বর্তমান ছিলেন। পরে শিব-মৎসেন্দ্রনাথের পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে তাঁর কাহিনী জুড়ে গিয়ে তিনি পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

গোরক্ষ বিজয়ের তিনখানি পুঁথি পাওয়া যায় (১) ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি শ্যামদাস সেনের মীনচেতন (২) মুন্সী আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষ বিজয় (৩) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ভীমসেনের গোর্খ-বিজয়। যোগী সম্প্রদায়ের গায়কেরা এই তিনজনের রচনাকেই একসঙ্গে গ্রথিত করে গান করে থাকেন।

গোরক্ষ বিজয় মীন চেতননের আখ্যানে নাথ সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ গোরক্ষনাথ কিভাবে তাঁর পথভ্রষ্ট গুরুকে নারীমোহ থেকে উদ্ধার করলেন একাব্যের মূল কাহিনীতে তারই পরিচয় আছে। আদিপুরুষ নিরঞ্জনের মুখ থেকে শিব, নাভি মীননাথ, হাড় থেকে হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদ, কান থেকে কানুপা এবং জটা থেকে গোরক্ষনাথের জন্ম হল। নিরঞ্জনের সর্বশরীর থেকে জন্মালেন গৌরী। গৌরীকে শিব বিয়ে করলেন নিরঞ্জনেরই আদেশে। এরপর মীননাথ ও হাড়িপা মহাদেবের শিষ্য হলেন, গোরক্ষনাথ মীননাথকে গুরু বলে বরণ করলেন এবং কানুপা হলেন হাড়িপার শিষ্য।

এরপর তাঁরা সবাই যোগী হে তপস্যায় বসলেন। একদিন শিব গোপনে গৌরীকে "মহাজ্ঞান" তত্ত্ব বোঝানোর সময় মীননাথ মাছের রূপ ধরে তা শুনে নিলে ক্রুব্ধ শিব তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি যা শুনেছেন তা ভুলে যাবেন। এরপর একদিন শিবের শিষ্যদের চরিত্র শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পার্বতী তাঁদের নিমন্ত্রণ করে অন্ন পরিবেশন করতে লাগলেন। অন্য সবাই তাঁর অসামান্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ তাঁকে জননীরূপে কল্পনা করলেন। তখন দুর্গা অন্য সবাইকে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথকে তিনি আরও কঠোর পরীক্ষায় ফেললেন। এতেও গোরক্ষনাথ সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। এরপর শিবের অনুরোধে বিবাহ করেও গোরক্ষনাথ পথে বেরিয়ে পড়লেন এবং একসময় শুনতে পেলেন যে তাঁর গুরু মীননাথ কদলীরাজ্যে গিয়ে জপধ্যান বিসর্জন দিয়ে ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর বিন্দুনাথ নামে একটি পুত্রও জন্মেছে। গোরক্ষনাথ তাঁর গুরুকে সংসার মোহ থেকে নির্গত করে আবার যোগ সাধনার পথে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। গোরক্ষনাথ এজন্য প্রথমে বিন্দুনাথকে মেরে ফেললেন। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। তখন তিনি বিন্দুনাথকে বাঁচিয়ে দিয়ে কদলীরাজ্যের সব রমনীকে বাদুড় করে উড়িয়ে দিলেন। এরপর মীননাথ ও তাঁর পুত্র বিন্দুনাথ উভয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে শিবের অন্যতম শিষ্য গোরক্ষনাথের চরিত্র মহিমাই প্রধান হয়ে উঠেছে। গোরক্ষনাথের অবিচল মায়ামোহ বর্জিত নিরাসক্ত সন্ন্যাস জীবনের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। আবার কদলীরাজ্যে নরীসঙ্গে মুগ্ধ মীননাথের চিত্রও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এই কাহিনীতে উচ্চতর কাব্যসৃষ্টির উপাদান থাকলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কারণ কবিরা ছিলেন বেশির ভাগই অল্পশিক্ষিত আর শ্রোতারাও ছিল নিরক্ষর। এই কাব্যধারার সর্বাধিক পরিচিত কবি হলেন শেখ ফরজুল্লা। কাব্যের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মহিমা যে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি, শিবদূর্গার চরিত্রচিত্রণ থেকেই তা বোঝা যায়। কিন্তু এই কাহিনী মধ্যযুগে সারা বাংলাদেশেই জনপ্রিয় হয়েছিল।

ময়নামতী গোপীচন্দ্রের গান এই ধারার আরগ এক জনপ্রিয় কাহিনী। বাংলাদেশের নানা জায়গায়, এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস জীবন নিয়ে নানা সকরুণ কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই কাহিনীটির আদি উৎস বঙ্গভুমি এবং এখান থেকেই এটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনেকের ধারণা।

রাজা গোপীচন্দ্রে সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনীটি এই কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়। রানী ময়নামতী অদ্ভুত শক্তি মহাজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তাঁর সেই দিব্যশক্তি বলে বুঝলেন যে রাজা মানিকচন্দ্রের তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে। কিন্তু

মহাজ্ঞান গ্রহণ করলে মৃত্যু হবে না। রানী ময়নামতী রাজাকে তাঁর কাছ থেকে মহাজ্ঞান গ্রহণ করতে বললে রাজা তাতে স্বীকৃত হলেন না। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। যমদূতের সঙ্গে ময়নামতী তুমুল যুদ্ধ করা সত্ত্বেও রাজার প্রাণ বাঁচাতে পারলেন না। রাজার মৃত্যুর অল্পদিন পর ময়নাবতী পুত্র গোপীচন্দ্র জন্মগ্রহণ করল। গোপীচন্দ্রের বিবাহ হল অদুনা-পর্দুনা নামের দুজন রাজকন্যার সঙ্গে। ময়নামতী যখন তাঁর দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে জানতে পারলেন যে তাঁর পুত্রেরও স্বামীর মতই অকাল মৃত্যু হবে,তখন তিনি তাকেও হাড়িপার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বারো বছরের জন্য সন্ন্যাসী হতে বললেন। কিন্তু তরুণ যুবক গোপীচন্দ্র তাঁর স্ত্রীদের ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে রাজী হলো না। অদুন-পর্দুনাও শাশুড়ীর বিরুধে গোপীচন্দ্রর সহায়তায় কলঙ্ক লেপন করলে। নিজের কলঙ্কহীনতা প্রমাণের জন্য ময়নামতী ছেলের কাছে পরীক্ষা দিলেন। এরপর বাধ্য হয়েই গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হল। ময়নামতীর গুরু হাড়িসিদ্ধা তাকে হীরানটির বাড়ীতে বাঁধা দিয়ে চলে এলেন। দেখতে দেখতে সন্ন্যাসের কাল শেষ হল। হাড়ি সিদ্ধা তাকে হীরানটির বাড়ী থেকে উদ্ধার করে মহাজান মন্ত্র দান করলেন। গোপীচন্দ্রে আর অকাল মৃত্যু হলো না। দুই স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পরম সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

এই কাহিনীর যে পুঁথি পাওয়া যায়, তাতে দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস, সুকুর-মাহমুদ প্রভৃতি বিভিন্ন কবির ভণিতা পাওয়া যায়। পুঁথিতে অবশ্য কাহিনীকে অল্প কিছু পরিবর্তিত করা হয়েছে।

গোপীচন্দ্রের কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে লোকের মুখে মুখে গীত হয়ে আসছে। এই কাহিনীর মানবিক আবেদন সম্পন্ন অংশগুলি বেশ বাস্তবতার সঙ্গেই বর্ণিত। বিশেষ করে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভাবনা জানতে ওপরে অদুনা-পদুনার কান্নার মধ্যে একটি করুণ বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। অনেকে গোপীচন্দ্রকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলেও মনে করেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ার্সন সাহেব রংপুর থেকে স্থানীয় গায়কের কাছ থেকে গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন এবং 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে দেবনাগরী হরফে ঐ বছরের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। উত্তরবঙ্গের রংপুরেই এই গানের সর্বাধিক প্রচলন আছে। এছাড়া এই গোপীচন্দ্রের গানের আরও না়া পুঁথি পাওয়া গেছে। কিন্তু সেগুলিকে ঠিক প্রামাণ্য বলা যায় না। মৌখিক সাহিত্য হিসেবেই এটি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাসাহিত্যে চলে আসছে।

৮.১৩ মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা

মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক পূর্ববক্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে গীতিকা সংগ্রহ করে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে প্রকাশ করেন।

এই কাব্যগুলি আসলে লোকসাহিত্য। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে নামে একজন লোকসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কয়েকটি লোকগাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। দীনেশচন্দ্র তাঁকে উৎসাহ দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে চন্দ্রকুমার দে, জলীমুদ্দিন ও আরও কয়েকজনকে বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে বিভিন্ন গীতিকা সংগ্রহ করেন। গীতিকাগুলির মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতী, কমলা, কঙ্কও লীলা, মদিনা, দস্যু কেনারাম ইত্যাদি পালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপর এর আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয় 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে।

এই গীতিকা হল কবিতায় বা গানে বিবৃত লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাস্তবজীবনের সুখদুঃখের কাহিনী। গ্রামের একেবারে সাধারণ মানুষ নরনারীর প্রেমঘটিত কোনো রোমান্টিক আখ্যান, জমিদারদের দলাদলি বা ঐ জাতীয়

লোকজীবনের অন্য কোনো কৌতুহলপ্রদ ঘটনা নিয়ে ছড়া পাঁচালীর ঢঙে মুখে মুখে আখ্যানকাব্য রচনা করতেন। আর গায়েনরা তাতেই সুর দিয়ে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন।

এই গীতিকাগুলিতে যে জীবন ও যে সাজের ছবি উদঘাটিত হয়েছে, তা মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্যের থেকে পৃথক। এখানে সমাজ কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রতিনিধি নয়। দুষ্ট কাজী, চিকণ গোয়ালিনী, নেতাই কুটনী, ভাটুক ঠাকুর ও দুর্বলচিত্ত চাঁদ বিনোদ সমাজের একেবারেই পরিচিত চোখে দেখা মানুষ। এখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিচিত্তের যে সংঘর্ষ তাতে প্রথার যান্ত্রিক মূঢ়তাই প্রধান উপাদান, ধর্মান্ধতা নয়। সংগৃহীত পালাগানের মধ্যে যেগুলোতে প্রেমপ্রণয়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো কাব্য হিসেবে উৎকৃষ্ট। এই প্রসঙ্গে মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি পালার উল্লেখ করা যেতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিরপেক্ষ প্রেম বর্ণনা গীতিকাগুলির সম্পদ। এর রচনা সরল আবেগ, উচ্চতর প্রেমের আদর্শ, প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ প্রভৃতি গ্রাম্য কাহিনী কৃত্রিম সাহিত্যের মধ্যে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করেছে। বিশেষত জাতি সম্প্রদায়হীন মানবপ্রেমের মহিমা বর্ণনার জন্য কৃষককবিরা পাঠকের প্রশংসা লাভ করেছেন। গাথাকেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের মধ্যে গীতিকাগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য গাথার থেকে বাংলা গাথাগুলি আবেগ, পবিত্রতা, ত্যাগ, সরলতার দিক থেকে অধিকতর প্রশংসনীয়। আবার বিপুল সংগ্রহের মধ্যে কিছু কিছু পালার কাব্যগুণ বিশেষ উৎকৃষ্ট নয়, নগণ্য। উদাহরণ হিসেবে হাতীধরা, জমিদারের বিরোধ, তীর্থ স্থান নিয়ে কলহ পালাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রণয়বিষয়ক পালাগুলিই উৎকৃষ্ট। এবং এই ধারার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পালা 'মহুয়া' তুলনাহীন এই পালাটিতে বেদে প্রতিপালিত 'মহুয়া'-র সঙ্গে উচ্চকুলোদ্ভব জমিদার নদ্যার চাঁদের বেদনামধুর লিরিক আবেগে কম্পমান প্রেমের গল্প বলা হয়েছে। এই লোকগাথাটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গাথা-সাহিত্যের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তথাকথিত ভদ্রসমাজে ঠিক এই ধরনের বিশুদ্ধ প্রেমের চিত্র এবং উদার সাম্প্রদায়িক মিলনের রূপ বিরল। ভদ্রসাহিত্যে অনেক পাণ্ডিত্য, কারুকার্য থাকতে পারে, কিন্তু গাথার অনাবৃত সন্দৌর্য এবং নিরাভরণ ঐশ্বর্য মধ্যযুগের পুঁথিজীবি সাহিত্যে পাওয়া যায় না বললেই চলে।

মৈমনসিংহগীতিকার ও পূর্ববঙ্গগীতিকায় রূপকথাসুলভ শব্দ ও বাক্যাংশ কবিদের প্রকৃতি বর্ণনার মৌলিকতা আর রূপ মুগ্ধতাকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করেছে। এই জাতীয় কাব্যে আজল কাজল মেঘ, দাগলদীঘল কেশ, আগল ভাগল আঁখি, তেল ফুরাণ্যা বাতি, লীলারি বাতাস, আবের চাক্কামাখা পরভাত প্রভৃতি দ্বৈতশব্দ ও বাক্যাংশগুলি সজীব কল্পনার নিদর্শন এবং রূপচাঞ্চল্যের দ্যোতক।

এই কাব্যের প্রণয়লীলার যে পরিবেশ তা আগাগোড়া নিসর্গসৌন্দর্যমণ্ডিত। কিন্তু এছাড়াও জীবনের সাধারণ, অসুন্দর অংরে প্রতিও কবিদের পর্যবেক্ষণশক্তি কম তীক্ষ্ণ নয়। কেনারাম ডাকাতের চোহারা, যৌবনরিক্তা নারীর রূপহীন কুশ্রীতা, কবিরাজের ছোট চোখ ও থমথমে চলনভঙ্গী, সাঁওতাল হাঙ্গামায় উদ্বাস্তু নর-নারীর পলায়ন ত্রস্ততা প্রভৃতি তুচ্ছ সাংসারিক কথাও কাব্যটিতে স্থান পেয়েছে। দু'একটি গ্রামজীবন উপমার প্রয়োগ প্রমাণ করে যে কবির দৃষ্টি শুধু সৌন্দর্য সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র জীবন ক্ষেত্রেই প্রসারিত ছিল।—

মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উছে।
হরা (সরা) চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুটে॥
(নুরন্নেহা ও কবরের কথা)

কোন মার্জিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কবির এই ধরনের উপমা ব্যবহার করতেন না। রূপকথা ও পল্লীগীতির ধূয়া ও বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী এই বাক্যগুলির মধ্যে সুষ্ঠু ভাব-ব্যঞ্জনার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে—

অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ সাঁ করে পানি।
তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গাখানি॥ (ভেলুয়া)

প্রভৃতি বাক্য সংযোজনারীতি লোকসাহিত্য বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে আধুনিক ভাষার ব্যবহার প্রচ্ছন্ন আছে তা বোঝা যায়। তা দিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা বাগিউত্তাত্ত আছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্ষিতীশ মৌলিক যে পালাগুলি সংগ্রহ করেন সেগুলির ভাষা একেবারেই যথাযথ রেখে প্রকাশ করা হয়েছে, এছাড়া তিনি অনেকগুলি নতুন পালাও আবিষ্কার করেছেন। সম্পাদনার জন্য রচিত তাঁর নিবন্ধগুলিও গীতিকার স্বরূপকে বুঝতে সাহায্য করে।

৮.১৪ চট্টগ্রাম রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয়কাব্য

মধ্যযুগে বিশুদ্ধ মানববিষয়ক কাব্যের অবতারণা প্রধানত করেছিলেন চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমান কবিরা। মনব-মানবীর প্রেমবিরহ মিলনের যে রোমান্টিক চেতনা তাঁদের কাব্যের বৈশিষ্ট্য তা তাঁর আয়ত্ত করেছিলেন আরবী-ফারসী ভাষার প্রণয় কথার মাধ্যমে। চট্টগ্রামের কবিরা যে সমস্ত হিন্দীকাব্য থেকে তাঁদের কাব্যরচনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, তাদেরও উৎস আরবী-ফারসী ভাষার কাব্য।

বৃহত্তর বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে চাটিগাঁ রোসাঙের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এই অঞ্চল তখন আরাকানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরাকান পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ব্রহ্মদেশের নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ। আরাকানীরা বর্মী হলেও আরাকান রাজসভায় প্রথম থেকেই বর্মী ও বাঙালি সংস্কৃতির সম্মেলনের এক সহজ পরিবেশ প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছিল। আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা ধর্মসূত্রে যেমন পালি প্রাকৃতভাষার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলনে, তেমনি তাঁদের রাজসভাসদ ও প্রজাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী। অতএব রোসাঙ রাজসভাতে একাধারে আর্যভারতীয় এবং মুসলমানী সংস্কৃতির চর্চা সুপ্রচলিত ছিল। কবি দৌলত কাজীর বর্মনায় আছে যে রোসাঙ রাজসভায় বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য-বিভিন্নতার মধ্যেও বাংলাই ছিল রোসাঙের দেশি ভাষা সাহিত্য। এর ফলে ঐ অঞ্চলের গড়ে ওঠা সাহিত্য বিচিত্র ভাব ও সংস্কৃতির চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করলেও তা হল বাংলা সাহিত্য।

- **দৌলৎ কাজি**

দৌলৎ কাজি একখানি মাত্র কাব্যরচনা করেছিলেন। কিন্তু সেটিকেও তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তবুও তিনিই চট্টগ্রাম রোসাঙের শ্রেষ্ঠ কবি। রোসাৎ শহরে বসে কাব্য লেখার সময় কবি রোসাঙের অবস্থান নির্দেশ করেছেন—

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসান্দ-নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।

কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি খবরও কবি দিয়েছেন। 'রোসাঙরাজ শ্রীসুধা'র "ধর্মপাত্র" ছিলেন আশরফ খার এঁরই নির্দেশে কবি দৌলৎ তাঁর কাব্য রচনান্ত করেছিলেন। তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। আশরফখান গোছারী ঠেট ভাষা ছেড়ে সহজবোধ্য ভাষায় কবিকে কাব্যরচনার নির্দেশ দেন। কবি সাধন রচিত "মৈনা সত" কাব্যের অনুসরণেই কবি তাঁর কাব্যটি রচনা করেছেন। কিন্তু দৌলতের কাব্য হুবহু অনুসৃতি নয়। সাধনের কাব্যকাঠামোকে আশ্রয় করে দৌলৎ কাজির কবিমানস ভাব-কল্পনার সৌন্দর্যলোকে অবাধ সঞ্চরণ করেছে।

দৌলত কাজির কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়। রাজপুত্র লোরকের সঙ্গে অপূর্ব সুন্দরী ময়নামতীর বিবাহ হয়েছিল। একদিন লোরকের অরণ্যবিহারের ইচ্ছা হল। তিনি রানী ময়না ওবং বৃদ্ধ পাত্রদের ওপর

রাজ্যভার দিয়ে বলে গেলেন। সেখানে এক যোগীর কাছে অপূর্ব রূপবতী গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রানীর প্রতিষ্ঠিত দেখে লোর মুগ্ধ হলেন। চন্দ্রানীর স্বামী মহাবীর বামন গোহারী রাজ্যকে শত্রুর সর্বশঙ্কামুক্ত করেছিল। কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল ব্যর্থ। এদিকে লোর তো চন্দ্রানীর সন্ধানে গোহারি রাজ্যে এলেন এবং বামনের অনুপস্থিতির সুযোগে চন্দ্রানীর সঙ্গে তাঁর গোপনে মিলন হল। কিন্তু ইত্যবসরে বামন ফিরে এলে তাঁরা দু'জন পালিয়ে গেলেন। কিন্তু গভীর বনে বামন গিয়ে তাঁদের পলায়নে বাধা দিলে লোরের সঙ্গে চন্দ্রানীও সাপের কামড়ে মারা গেল। কিন্তু এক ঋষি এসে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন গোহারি রাজও লোরের সঙ্গে শত্রুতা না রেখে সাদরে গ্রহণ করলেন।

এদিকে স্বামীবিরহিনী সতী ময়নামতীকে ছাতনকুমার নামক এক রাজপুত্র কামনা করল। দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করল রতনা মালিনীকে। ময়নামতীর বিরহবেদনার মুহূর্তে ইমালিনী তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চাইল, কিন্তু সতীত্ব ও দৃঢ় মনোবলে ময়নামতী তা উপেক্ষা করলেন। অবশেষে বারোমাসের শেষে সতী ময়না তাঁকে বিদায় করেন শাস্তি দিয়ে। কিন্তু ময়নামতীর এই 'বারমাস্যা' দৌলত কাজী শেষ করে যেতে পারেননি। জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বর্ণনার আরম্ভেভই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এরপর কাব্য শেষ করেছেন পরবর্তী কবি আলাওল। আলাওলের কাব্যে দেখা যায় ময়নামতী রাজা লোরের কাছে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দূতরূপে পাঠালেন। ইতিমধ্যে লোর চন্দ্রানীর একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। লোর গোহারি রাজ্যের ভার চন্দ্রানীকে দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ বয়সে লোরের মৃত্যু হলে দুই রানীই সহমৃতা হল।

দৌলৎ কাজীর রচনাংশের তুলনায় আলাওলের কবি ধর্ম,—অন্তত সতী ময়নামতী কাব্যে অনেক নিষ্প্রভ। আলাওলের সব রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদে তাঁর ব্যাপক পাণ্ডিত্য। দৌলৎ কাজিও পণ্ডিত ছিলেন। এদিকে মুসলিম ও সুফী ধর্মশাস্ত্রে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান ও ভক্তি আর অন্যদিকে বেদ-পুরাণ-জয়দেব-বিদ্যাপতি, এমনকি কালিদাসের কাব্যকেও তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। কিন্তু দৌলৎ কাজির পাণ্ডিত্য কোথাও ভার হয়ে যায়নি। বরং তাঁর রচনা সরল, প্রাঞ্জল ও সরস।

তাঁর কাব্যে চরিত্রগুলিও প্রায় স্বাভাবিকরূপেই চিত্রিত হয়েছে। ময়নামতী ও চন্দ্রানী চরিত্র নারীস্বরূপের দুটি দিককে প্রকাশ করেছে। একদিকে আদর্শবাদ আর অন্যদিকে জীবনবাদ। ময়নামতী আদর্শবাদের কাছে—শাস্ত্রনীতির ও সমাজরীতির কাছে জীবনকে বলি দেয়। আর একজন জীবন ভোগের নামে আদর্শকে পদদলিত করে। আদর্শবাদ ও ভোগবাদ, সংযম ও স্বৈরাচার, সতীত্ব নারীত্ব, মর্যাদা ও লালসা, ত্যাগ ও ভোগ, লোভ ও ক্ষান্ত প্রভৃতির দ্বন্দ্বই কবি এই চরিত্র দুটিতে সুনিপুণভাবে পরিস্ফুট করেছেন।

এছাড়াও উপমা, রূপক, উৎপেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের ও সুভাষিত বুলির প্রয়োগে ও বহুলতায় মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কাজী দৌলতের বিরল ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় মেলে। রোসঙ্গরাজের প্রশস্তি উপলক্ষ্যে তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসনের চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি হিন্দুপুরাণ থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন—

মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
রাজভয়ে মাতল না যায় তারে ঠেলি॥
*　　*　　*　　*
সীতা সম সুন্দরী যদি রহে সে বনে।
রাজভয়ে না নিরক্ষে সহস্রলোচনে॥

আবার মহম্মদ প্রশস্তিতে তাঁর অপার শক্তিদ্যোতকে উপমাপ্রয়োগও ভাষায় ও ভাবে কিছুটা অভিনব—

অঙ্গুল-ইঙ্গিত শরে শশী দুই খণ্ড বারে
প্রলয়-সমান তান দাষা॥
মুসলমানী মূল বাতি যার তেজে জ্বলে নিতি
না নিবায়ে বায়ু-বৃষ্টি-জলে॥

দৌলত কাজির সুভাষিতাবলীর প্রাচুর্য তাঁর সমাজ অভিজজ্ঞতা ও মননের উৎকর্ষ আর অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কবিপ্রতিভার সাম্যের পরিচয় বহন করে।

● **আলাওল**

দৌলৎ কাজির পরেই রোসাঙ রাজসভার দ্বিতীয় কবিশ্রেষ্ঠ আলাওল। আলাওল প্রতিভা বিচিত্র কাব্যরচনায় সব সময়েই ব্যাপৃত। কিন্তু কবির নিজের জীবনও কম চিত্তাকর্ষক নয়। 'মুল্লুক ফতেহাবাদের জামালপুর গ্রামে কবির আদিনিবাস ছিল। কারও কারও মতে এই ফতেহাবাদ চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ফতেহাবাদ অর্থে প্রাচীন ফরিদপুরকেই বোঝায়। কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মান ও ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আলাওলের পিতা নবাব কুতবের সভাসদ ছিলেন। একবার নৌকাযাত্রার সময় আলাওল ও তাঁর পিতা পর্তুগীত জলদস্যুদের হাতে পড়েন। আলাওলের পিতা জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। আলাওল বহু দুঃখ ভোগ করে রোসাঙে এসে উপস্থিত হন। এখানে তিনি প্রথমে অশ্বারোহী রাজসৈনিকের কাজগ্রহণ করেন। রোসাঙ্গের প্রধান অমাত্য মগন ঠাকুর কবির প্রতি অনুরক্ত হন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কবির বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' রচিত হয়। এরপর কিছুকাল তাঁকে আরাকানের কারাগৃহে বিনা দোষে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। তবে অল্পদিনের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আনুকূল্যে তিনি তাঁর পূর্বগৌরব ফিরে পান। মগন ঠাকুর ছাড়াও অর্থমন্ত্রী সুলেমান, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সৈয়দ মুসা ও আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুবর্মার নির্দেশে তিনি অনেকগুলি কাব্য অনুবাদ করেন।

মুসলমান সমাজে আলাওলের জনপ্রিয়তার কারণ হল তিনি ইসলামী কাহিনী ও ধর্মতত্ত্বের নানা গ্রন্থ মূল আরবী ও ফারসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—(১) সয়ফুলমুলুক বদি উজ্জমাল (১৬৫৮-৭০), (২) সপ্ত (হপ্ত) পয়কর (১৬৬০), (৩) তোহফা (১৬৬৩-৬৯), (৪) সেকান্দার নামা (১৬৭২) এগুলি সমস্তই ইসলামী বিষয় অবলম্বনে মুসলিম সমাজের জন্য লেখা—তাই এই কাব্যগুলি হিন্দুসমাজে আদৌ প্রচার করায়নি।

কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধ অনুবাদকাব্য 'পদ্মাবতী' হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এটি মালিক মুহম্মদ জায়গীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। এই পদুমাবত কাব্যটি ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কবি রচনা করতে আরম্ভভ করেন। এটি সূফী সাধনতত্ত্বের রূপক। রূপককাব্যের কাহিনী হল রাজপুতানায় বহুল প্রচলিত। একটি লোকগাথা, রত্নসেন-পদ্মিনী দেওপাল ও পদ্মিনী সংক্রান্ত কাহিনী এতে বর্ণিত। জায়গীর কাব্যে উত্তর-ভারতীয় উপভাষার একটা সহজ লালিত্য ও মাধুর্য আছে। এছাড়াও ভাবুকের কাছে এটি জীবাত্মা-পরমাত্মাবিষয়ক তত্ত্বের আকর।

এই কাব্যে চিতোর অর্থে মানবদেহকে বোঝায়, রত্নসেন অর্থে জীবাত্মা, আবার পদ্মিনী হচ্ছেন বিবেক, শুকপাখি ধর্মগুরুর প্রতীক।

আলাওল এই অধ্যাত্মরূপকটিকে তাঁর কাব্যে চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। কবি প্রেম ও বিরহের যে বর্ণনা দিয়েছেন,তা দৃশ্যত লৌকিক হলেও প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্ম রসব্যঞ্জক। পদ্মিনীর রূপ বর্ণনাতে কবি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসরণ করেছেন। এছাড়াও কবি তাঁর এই কাব্যে হিন্দু অলঙ্কার, পিঙ্গলাচার্যের অষ্টমহাগণতত্ত্ব, আয়ুর্বেদ চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্যোতিষবিদ্যা, স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিষয়েও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, শিকার রাজসভার ঐশ্বর্য। ঘোড়া ও হাতীর নানা ধরনের খেলা ও কবির কাব্যে স্থান পেয়েছে। এসমস্ত কিছুই কবির কাব্যে এক উদার

ধর্মনিরপেক্ষতার সৃষ্টি করেছে। কবির সুভাষিতবলী ও প্রবাদবাক্য রচনা ও তার বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণ করে—

(১) পরশী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।
নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাই ঠাঁই।
(২) তীক্ষ্ণ খড়গ দেখিয়া জলের কিবা ভয়
ছেদিলে শতেক বার দুইখণ্ড নয়॥

পদ্মিনী রূপ বর্ণনায় কবি রোমান্টিক আবেগও সৃষ্টি করতে পেরেছেন—

সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি।
পদ-পরশন হেতু করায় লহরী।

পদ্মাবতীর তুলনায় আলাওলের অন্যান্য কাব্য দুর্বলতার মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কবি সৈফুল মুলুক বদি উজ্জমান রচনা করেন ১৬৫৮-৬০ খ্রিষ্টাব্দ। এটি ইসলামী রোমান্টিক প্রেম শহিল অবলম্বনে লেখা।

'হপ্ত পয়কর' ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। এঁতে আরবের রাজকুমার বাহরামেক যুন্ধ জয় ও সপ্ত পত্নীর গল্প বর্ণিত হয়েছে। এর কাহিনীও কবির নিজস্ব নয়। ইরানি কবি নেজামি সমরকন্দের ফারসী ভাষায় লেখা আখ্যানই কবির মূল অবলম্বন। তোহফা ইসলামী শাত্রসংহিতার উপদেশে পূর্ণ নীতি গ্রন্থ। এটি ১৬৬৩-৬৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। আলাওলের সর্বশেষ কাব্যের নাম সেকান্দার নামা। এটি নেজামি সমরকন্দীর ফারসী কাব্য 'ইসকান্দারনামার' সরল অনুবাদ। এর উপজীব্য আলোকজাণ্ডারের বিজয়কাহিনী।

সপ্তদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন অল্পখ্যাত কবি হলেন 'চন্দ্রাবতী' রচয়িতা মাগন ঠাকুর, ইউসুফ জুলেখা রচয়িতা আবদুল হাকিম গুলের কাওলী রচয়িতা নওয়া জিস খান, মুক্তালহোসেন রচয়িতা মোহাম্মদ খান প্রভৃতি।

এছাড়াও সৈয়দ সুলতান রচনা করেছিলেন নবিবংশ, মুহম্মদ খান রচনা করেছিলেন 'সত্যকলিবিবাদ সংবাদ'।

পদুমাবৎ এর কাহিনী—কাহিনীটি সংক্ষেপে এই রকম। চিতোরের রাজা ছিলেন রত্নসেন তাঁরপত্নীর নাম নাগমতী। সিংহল রাজ-দুহিতা পদ্মাবতীর রূপ গুণের খ্যাতি শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং সুশিক্ষিত শুক পাখি নিয়ে। সিংহল যাত্রা করেন। শুকের সাহায্যে রত্নসেন পদ্মিনীকে লাভ করেন। দুই পত্নী নিয়ে তাঁর সুখে দিন কাটতে থাকে। কিন্তু দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি শুনে তাঁকে পাওয়ার জন্য চিতোর আক্রমণ করে ও রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী ফিরে যায়। রত্নসেন সুকৌশলে পালিয়ে আসেন। এদিকে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে রাজা দেওপাল পদ্মিনীকে বিপথগামী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রত্নসেন ফিরে এসে তাকে মেরে ফেলেন এবং নিজেও আহত হয়ে মারা যান। পদ্মাবতী ও নাগবতী অশুমৃতা হন। আলাউদ্দিন আবার চিতোর আক্রমণ করতে এসে সেই জ্বলন্ত চিতায় প্রমাণ করে ফিরে যান।

৮.১৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। চৈতন্য পরবর্তী যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট মনসামঙ্গল কাব্যকারের কবিকৃতির পরিচয় দিন। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যে কিভাবে ফুটে উঠেছে?

২। চৈতন্য পরবর্তী যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট ধর্মমঙ্গাল কাব্যকারের কবিকৃতির পরিচয় দিন। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যে কিভাবে ফুটে উঠেছে, আলোচনা করুন।

৩। চৈতন্য পরবর্তী যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যকারের কবিকৃতির পরিচয় দিন। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যে কিভাবে উঠে এসেছে?

৪। চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের বিবরণ দিন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সময়কার পদাবলির গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৫। মধ্যযুগ রচিত যে কোনো চারটি চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের বিশেষত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৬। আরাকান রাজসভার সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট কবির পরিচয় দিন।

৭। চৈতন্য পরবর্তী অনুবাদ সাহিত্যের বিশিষ্টতা আলোচনা করুন। যে কোনো দুটি ধারার দু'জন কবির রচনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৮। কালিকামঙ্গালের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করুন। মঙ্গালকাব্যের বিশষত্ব এই কাব্যগুলির মধ্যে কতটা আছে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। রামপ্রসাদ সেনের কালিকামঙ্গাল

২। যে কোনো দুটি বৈষ্ণব পদ সঙ্কলন সম্পর্কে আলোচনা—গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত চিন্তামণি, পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু।

৩। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের বিশেষত্ব কী?

৪। শঙ্কর কবিচন্দ্র কোন্ সময়ের কবি? তাঁর ভাগবত অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখণ্ড)/সুকুমার সেন, ১৪০১

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৬

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/প্রথম পর্যায়/ভূদেব চৌধুরী, ১৯৯৫

৪. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা/প্রথম খণ্ড/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা/প্রথম খণ্ড/ গোপাল হালদার, ১৯৫৭

৬. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস/আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৩৬

৭. যোড়শ শতাব্দীর পদাবলি সাহিত্য/বিমানবিহারী মজুমদার

৮. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস/ক্ষেত্রগুপ্ত, ১৯৯২

৯. সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য/জনার্দন চক্রবর্তী

১০. বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১. বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য/আহমদ শরীফ/বাংলা একাডেমী ঢাকা/১৯৮৩

১২. বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ/সত্যবতী গিরি, ১৯৮৬

১৩. মৈমনসিংহ-গীতিকা : পুনর্বিচার/মুনমুন চট্টোপাধ্যায়, ২০০৩

১৪. বাংলা নাথ সাহিত্য/সুখময় মুখোপাধ্যায়

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

৮.২ বৈষ্ণব পদাবলি

★ **রাধামোহন ঠাকুর**

বিশ্বপতি চক্রবর্তীর সমসাময়িক কালেই রাধামোহন ঠাকুরেরও আবির্ভাব হয়। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রাধামোহন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইনি জয়পুর রাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত করে পরকিয়া মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। "পদামৃতসমুদ্র" তাঁর বিখ্যাত পদসংকলন গ্রন্থ। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ খিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাধামোহনের বেশিরভাগ পদই উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত বিভিন্ন ভাবের উদাহরণ দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। কথিত আছে, গোবিন্দ দাস যে সমস্ত ভাব নিয়ে পদ রচনা করেননি, ইনি সেইগুলি নিয়েই পদ রচনা করেছেন এবং এইভাবে কীর্তন গানের চৌষট্টি রসকে পূর্ণতা দান করেছেন। রাধামোহন তাঁর সংকলিত পদামৃতসমুদ্রের 'মহাভাবানুসারিনী' নামে টীকাও রচনা করেছেন।

রাধামেহান ঠাকুর সংস্কৃত এবং ব্রজবুলি, উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্মের রূপ বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবে শব্দের হিল্লোলিত বিলাস রয়েছে—

"মরকত মঞ্জুল কান্তি যশোহর/মানিনি-মান-বিমোহ।
মাথহিঁ মোর মুকুট ধর সুন্দর/ মোহন পিত পট
শোহ।।/মাধব মধুর মুরতি জনু কাম।।/মাধবি-মল্লি-
মুকুলবর-মাধরীৎমালতি-মিলু ধাম ধাম।।"

এই শব্দবিলাস গোবিন্দ দাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পূর্বরাগের দশ অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায় নিয়েই রাধামোহন পদরচনা করেছেন, একটি পদে রাধা পূর্বরাগের দশমী অবস্থার চরম পর্যায়ে পৌঁচেছেন। সখী কৃষ্মের কাছে রাধার অবস্থা জানিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ম রাধার কাছে আসেননি। সখী একা ফিরে এলে রাধা বলেছেন, কৃষ্ম যদি রাধাকে উপেক্ষা করেন, তাহলে—

"তুহুঁ কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়াসি/কিয়ে পুন কয়লি অকাজ।" এরপর মৃত্যু দশার দ্বারপ্রান্তে উপনীতা রাধা সখীকে সম্ভেবাধন করে বলেন—

"ইহ বন্দাবনে দেহ উপেখব/মৃতু তনু রাখবি হামার।/কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পায়র/তবহুঁ মনোরথ পূর।।"

সখীর কাছ থেকে রাধার এই অবস্থার কথা জেনে কৃষ্ম রাধার অভিসারে চললেন। কৃষ্মের অভিসার বর্ণনায় রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্মের যে ভাবরূপ অঙ্কন করেছেন, তা চৈতন্যদেবেরই মূর্তি। "চলতেই খলই চলই শাহি পারই/কত কত ভাব বিথারি।" বাসক সজ্জিকা রাধার সঙ্গে মিলনের শেষ কৃষ্ম রাধার বেশবাসও বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, এছাড়া কবি ধীরা মধ্যাখণ্ডিতা এ অধীরা মধ্যাখণ্ডিতা রাধাকে নিয়েও পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি বর্ণিত নানা পর্যায়, যেমন মানান্তে মিলন, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, মান প্রকারান্তর অকারণমান, শ্রীরাধার স্বয়ং দৌত্য, শ্রীকৃষ্মের স্বয়ং দৌত্য প্রভৃতি পর্যায় নিয়ে কবি পদ রচনা করেছেন। রসালসের পদে উভয়ের সদ্যবিচ্ছেদ ভারাক্রান্ত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন—"একহি পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন/অতয়ে সে মানয়ে দুখ।।" শ্রীরাধার হিমকালের অভিসারও এই কবির পদে রয়েছে। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের গৌরী আরাধনা ছলে কৃষ্মের সঙ্গে রাধার মিলনপ্রসঙ্গ পদাবলি সাহিত্যের একটি পরিচিত কথাবলম্বন। রাধামোহন তা নিয়েও পদ রচনা করেছেন। মিলন পর্যায়ের একটি পদে কবি কৃষ্মের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ভাবের আন্তরিকতায় অতুলনীয়। "নূপুর কলরব

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে প্রথমেই পঞ্চদেবতা ও লক্ষী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণার বন্দনা। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা, সতীর দক্ষালয়ে গমনে উদ্যোগ, সতীর দক্ষালয় গমন, শিবানন্দয়ে সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ, একান্নপীঠের বর্ণনা, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহসম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতিবিলাপ রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ ইত্যাদি। এই অংশেই আছে কুবেরের পুত্র বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের প্রতি বরদান, বসুন্ধরের জন্ম, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম। অন্নদার ভবানন্দভবন যাত্রা ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী পৌরাণিক অংশ ও অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য আছে, অন্নদামঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশমাত্র। এতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাঁকে বরদান ও পরে তাঁকে অন্যায় ভাবে পরিত্যাগ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুর্বপুরুষ ভবানন্দের ভবনে যাত্রা ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকুর মধ্যে কাহিনী অথবা চরিত্র কোনোটিই সুপরিস্ফুট হয়নি।

পৌরাণিক অংশে কবি সংস্কৃত কাশীখণ্ড ও অন্যান্য শিবপুরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। ব্যাসপ্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে নেই। বুদ্ধিহত বৃদ্ধ ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার কাশীর মহিমা ক্ষুণ্ণ করে নতুন কাশী নির্মাণ করতে গিয়ে কি রকম নাকাল হয়েছিলেন কবি তারই বর্ণনা ব্যাপ্রসঙ্গে দিয়েছেন।

ভারতচন্দ্র নানা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার নিয়োচিত করেছিলেন। তবুও এই কাব্য রচনায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। প্রথমত তিনি একান্নপীঠ বর্ণনায় 'মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রে'র সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন,—

একমত না হয়ে পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচুড়ামণিতন্ত্র মত।

ব্যাসের শিবানন্দার কাহিনী কবি গ্রহণ করেছেন স্কন্দপুরানের কাশীখণ্ড থেকে।

অন্নদামঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে স্বল্প পরিসর জুড়ে থাকলেও সবচেয়ে বিশিষ্টতার দাবি রাখে ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র। সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙালির প্রতিভূ হয়েই সে এই কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সহজ সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচন ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রথম খণ্ডের কিছু কিছু প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে,—

১। নগর পুড়িয়ে দেবালয় কি এড়ায়ে?

২। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

৩। খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাতে।

৪। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।

৫। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ইত্যাদি।

তাঁর ভাষার ঐশ্বর্যও অতুলনীয়, সংস্কৃত, পারসী ও প্রকৃত বাংলা শব্দের সুন্দর সমন্বয়ে তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করেছেন, তা নয়—তাঁর অপূর্ব শব্দবিন্যাস নৈপুণ্য দ্বারা তার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করেছেন। ভারতচন্দ্রের হাতেই বাংলাভাষা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত হয়ে উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষা হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে যে রুচিদোষের জন্য সাধারণত ভারতচন্দ্রে নিন্দা শুনতে পাওয়া যায় ‘অন্নদামঙ্গল’-এর প্রথম খণ্ডে তা নেই। কাব্য শরীর গঠনের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচেতন শিল্পী—যিনি সচেতন ভাবে শিল্পরীতির অনুসরণ করেছেন। কাব্য রচনা রসের প্রাধান্যকে তিনি স্বীকার করেছেন। ভারতচন্দ্রের আগে তাঁর মত নির্দোষ অন্ত্যানুপ্রাস আর কেউ ব্যবহার করতে পারেননি। এ বিষয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ছন্দের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ছন্দ তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দকে তিনি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতচন্দ্রকে ব্যঙ্গরসের কবিও বলা যায়। সামাজিক কুপ্রথার প্রতি বক্রোক্তি তাঁর হাস্যরসের মূল। দাসুবাসুর বর্ণনায় ও কোটালের ভীতিতে তদানীন্তন বাঙালির জাতীয় জীবনের কাপুরুষতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কাব্যে ভক্তির জায়গা দখল করেছে ব্যঙ্গ আর অবিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষ্য করে কবি কৌশলে এটি মূলকাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এটির আর এক নাম ‘কালিকামঙ্গল’। সংস্কৃত ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ নামে একটি শ্লোক সংগ্রহ এবং পূর্ববর্তী কবিদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে ভারতচন্দ্র এটি রচনা করেছেন। রাজকুমারী বিদ্যাও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, বিদ্যার পিতা মহারাজ বীরসিংহ কর্তৃক চোর ধরা। শিরছেদের জন্য মশানে নিয়ে যাওয়া। কালিকার প্রসাদে তাঁর অবলম্বন। তবে হীরামালিনী বিদ্যার মা, নগরপাল—কোটল ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রগুলি তাঁর কাব্যের এই অংশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসুন্দর সম্পর্কে অনেকে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র আদিরসকে অলঙ্কৃত শিল্পসুষমা দান করেছেন।

অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশের নাম মানসিংহ কাব্য। এটি অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য বলেই অভিহিত করা যায়। এর রচনার সময় হল ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে রচিত হলেও ‘মানসিংহ-কাব’ কাব্যই, ইতিহাস নয়। তবে এই কাব্যে মানসিংহ ছাড়াও জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ প্রমুখ ঐতিচহাসিক চরিত্রেরও উপস্থিতি আছে। মানসিংহ কাব্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমাকীর্তন। নবদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্যই মর্ত্যধামে তাঁর আগমন—এটিই মানসিংহ কাব্যের বিষয়বস্তু। তাই কাব্যটির নাম মানসিংহ না হয়ে ভবানন্দ হলে ঠিক হত। এই কাব্যের উপসংহার ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজবংশাবলী ও তার রাজাদের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তার মধ্যে তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হলেও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—চণ্ডীমঙ্গলে পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি কাহিনী অন্যদিকে এতে আছে পরস্পর স্বাধীন

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

করেছেন—ম্লেচ্ছাচারের আধিক্য থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য কালীর শাপে 'বুদ্ধদেব' নাকি স্বয়ং রামানন্দ ঘোষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থে কবির ব্যক্তিপরিচয় প্রায় কিছুই নেই। কোথাও তিনি নিজেকে দ্বিজ-অংশ-সম্ভূত, কোথাও বা আবার শূদ্রকুল জাত বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে দারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথদেব এবং রামচন্দ্র উভয়ে এক ও অভিন্ন, এবং উভয়েরই বুদ্ধদেবের রূপান্তর।

৮.১০.৩ দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত

কাশীরামের পুত্র পরিচয়ে যাঁদের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, দ্বৈপায়ন দাস তাঁদের একজন।—

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।/অবহেলে গুণে যেন সকল সংসার।"/

আবার

"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন/এতদূরে পাওয়ার স্বর্গ আরোহণ।।"

ইত্যাদি কিন্তু দ্বৈপায়ন দাস সাথে মোটেই কোনো কবি ছিলেন, অথবা 'মহাভারত' কার ব্যাসদেবের (দ্বৈপায়ন) 'দাস' এর অভিধার অন্তরালে আত্মগোপন করে এক বা একাধিক কবির কবিকীর্তিলাভের এ প্রয়াস যে কথা সঠিক বলা চলে বা। দ্বৈপায়ন দাসের ভণিতায় প্রধানত বনপর্ব, গদাপর্ব এবং স্বর্গারোহণ পর্বের পুথি পাওয়া গেছে।

৮.১০.৪ গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত

সঞ্জয় মহাভারতের সবচেয়ে পুরোনো যে পুথি দুটি পাওয়া গিয়েছে, তার একটিতে অশ্বমেধ পর্বে গঙ্গাদাস সেনের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় গঙ্গাদাস সেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করে থাকতে পারেন।

৮.১০.৫ নন্দরাম দাসের মহাভারত

নন্দরাম দাস কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। নন্দরামের ভণিতায় উদ্যোগ পর্ব ও দ্রোণ পর্ব পাওয়া গিয়েছে। ভণিতা থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিল নারায়ণ। একটি ভণিতায় ক্ষেমানন্দ দাসের নাম আছে। ইনি নন্দরামের পুত্র অথবা অনুরূপ স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। নন্দরামের ভণিতায় ভক্তিপরায়ণতার বেশ পরিচয় আছে।

৮.১০.৬ শঙ্কর কবিচন্দ্র এর ভাগবত

শঙ্কর কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের কবি। তবে "ভাগবতামৃত" সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রচিত। ভাগবতামৃতের সর্ব দেবদেবী বন্দনায় কবি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের নবরত্ন মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন।

এই মদনমোহন মন্দর নির্মাণ করেছিলেন দুর্জনসিংহ। মন্দির নির্মাণের কাল 'মল্লাব্দ ফণিরাজ শীর্ষ গণিতে" (১০০০ মল্লাব্দ) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। অতএব এ ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয় যে মন্দির নির্মাণের পর কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কাব্য রচনার কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক, একথা বলা যায়।

কবিচন্দ্রের কৃষ্ণকথা প্রধানত ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে সংকলিত কাহিনী। তবে অন্যান্য স্কধের জনপ্রিয় কিছু কিছু উপাখ্যানও তিনি পালা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর ভাগবতের দশম স্কন্ধে কাহিনীকে কবি যথাযথ ভাবেই অনুসরণ করে কবি কাব্য রচনা করেন।

তবে কবি যে আক্ষরিক অনুবাদ করতে চাননি, তা তিনি নিজেই বলেছেন—

কেবা ব্যাসদেবের বুঝয়ে অভিপ্রায়।
ভাবর্থ ভাবের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র গায়।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

পর্যায়-৩

একক ১ □ রবীন্দ্রসাহিত্য

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা
১.২ প্রস্তাবনা ঃ রবীন্দ্র কাব্য-কবিতা
১.৩ পাঠ ও আলোচনা
১.৩.১ প্রথম পর্ব
১.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব
১.৩.৩ তৃতীয় পর্ব
১.৩.৪ চতুর্থ পর্ব
১.৩.৫ পঞ্চম পর্ব
১.৩.৬ ষষ্ঠ পর্ব
১.৩.৭ সপ্তম পর্ব
১.৩.৮ অষ্টম পর্ব
১.৪ রবীন্দ্রনাথের গান
১.৫ অনুশীলনী
১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রস্তাবনা

বাংলাসাহিত্যের কালানুক্রমিক বিচারে আধুনিক যুগলক্ষণের সূত্রপাত ১৯ শতক। মধুসূধনের মধ্য দিয়ে নবজাগ্রত বাঙালিসমাজের সাহিত্যবোধ আধুনিকতার আলোকে উদ্দীপ্ত হল। সেই পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ক্ল্যাসিক রীতির পরিবর্তে রোম্যান্টিক গীতিময়তার যে সূচনা বিহারীলালে, তার পূর্ণ পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। প্রথমত ও প্রধানত কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোকসামান্য প্রতিভার সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রেখে গেছেন স্বর্ণালী স্বাক্ষর। কবিতা, গান, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ এমনকি চিঠিপত্রেও তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও মনীষার বিচ্ছুরণ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের সাহিত্যসভায় মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বিংশশতাব্দীর প্রথম থেকে যে সাহিত্যযুগ শুরু তাকে বলতে পারি রবীন্দ্র-রেনেসাঁস সমৃদ্ধ রবীন্দ্রযুগ।

১.২ প্রস্তাবনা : রবীন্দ্র কাব্য-কবিতা

'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয় আমি কবি মাত্র।"

এই উক্তির প্রেক্ষিতেই আমাদের মনে পড়তে পারে রসজ্ঞ সমালোচক অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায়ের উক্তি—"কাব্য সাধনাই রবীন্দ্রনাথের আজন্ম সাধনা এবং কাব্য সাধনাই তাঁহার জীবন সাধনাও বটে।" একারণেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বীকারোক্তি আবারও মনে পড়ে যায়—

"কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী"

তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত কালপর্বে এই 'বহুকালের প্রেয়সী' কবিতা বারবার নানা রূপে-রূপান্তরে ধরা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক গীতিকবি। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির প্রতি নিবিড় আকর্ষণ, গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, মর্ত্য ধূলির প্রতি মমতাময় আসক্তি ও মানবজীবনের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা প্রকাশিত, সেইসঙ্গে রোম্যান্টিক বিষাদ ও বেদনার অনুভব যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে শ্রেষ্ঠ কাব্যের। কল্পনা ও অনুভূতির রসসঞ্চারে তাঁর কাব্য যথার্থই রসাত্মক কাব্য হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রপূর্ব যুগে মধুসূদনের মধ্য দিয়ে যে ক্ল্যাসিক রীতির মহাকাব্য রচনার ধারা শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে এসে তা অন্য ধারায় প্রবাহিত হল। প্রাথমিকভাবে বিহারীলালের কাব্যেই সেই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম দেখা মেলে এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তার পূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে।

সৌন্দর্য ও প্রেমের মিষ্টিক কবি বিহারীলালের কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম অনুভব করেছিলেন কাব্যের অন্তর্লীন সুর ও আবেগ। তাঁর কাব্যেও আমরা উপলব্ধির ক্রমপর্যায়ে দেখি রোম্যান্টিক চেতনা তেকে প্লেটোনিক ভাবনা ছুঁয়ে গিয়ে মিষ্টিক ভাবকল্পনায় কবিতা মুক্তি পেয়েছে এবং এভাবেই তা সীমা থেকে অসীমে, রূপ থেকে ভাবে বিকশিত হয়েছে।

তাঁর প্রথম কৈশোর থেকে পরিণত বয়স অতিক্রম করেও তিনি নিত্য নবভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন—তাঁর কবিতার মধ্যে রয়ে গেছে নবনব সৃজনশীলতার স্বাক্ষর। তাঁর তেরো বছর বয়স থেকে মৃত্যুকালীন আশি বছরের প্রাপ্ত সীমায় পৌঁছেও তিনি কাব্য রচনার অক্লান্ত পথিক।

১.৩ পাঠ ও আলোচনা

১.৩.১ প্রথম পর্ব

তাঁর কাব্যের আদিপর্বে আছে কবিকাহিনী, বনফুল, শৈশবসঙ্গীত।

কবিকাহিনী রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এ কাব্য সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন

"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা।"

এটিকে ট্র্যাজিক রোম্যান্স আখ্যা দিয়েছেন সমালোচকবৃন্দ। কবির মতে "ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে।"

'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা, তাঁর তেরো বছর বয়সে রচিত এ কাব্য অবশ্য গ্রন্থাকারে 'কবিকাহিনী'র পরে প্রকাশিত হয় (১৮৮০ খ্রিঃ)। এরও আগে কিশোর কবি রচনা করেছিলেন "পৃথ্বীরাজ পরাজয়"—যদিও নিজেই সেই রচনাকে সাহিত্যপদবাচ্য করতে পরে অস্বীকার করেন। 'বনফুল' কাব্যে রচিত একটি গল্প, বিশ্বজীবন ও মানবজীবনের সুগভীর বন্ধনকে রবীন্দ্রনাথ বারবার নানাভাবে তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্য কোরকেই সেইভাবে প্রকাশিত। প্রাথমিক পর্যায়ের এই রচনার মধ্যেই ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ লীরিক কবির রোমান্টিক মন্ময়তা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। এই আবেগধর্মী, গীতিময় ভাবনারই প্রকাশ পরবর্তী 'শৈশবসঙ্গীত'। হৃদয়-উচ্ছ্বাসের তীব্র মধুর রোম্যান্টিক বেদনাভরা এ গ্রন্থের গাথাগুলি

প্রায় সবই ট্র্যাজেডি। এগুলিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের লীরিক রচনার প্রয়াস বলা যায়। বনফুল থেস্কে শুরু করে এ পর্যায়ের সব রচনাতেই এই সুরের আভাস।

'বনফুল' কাব্যে দেখেছি বনপ্রকৃতিতে পালিতা কমলার প্রেমের বেদনাঘন পরিণতি। বনাঞ্চলের বালিকা লোকালয়ে নিজেকে মেলাতে না পেরে ব্যর্থ প্রণয় বেদনা বুকে নিয়ে বনপ্রকৃতিতে ফিরে এসেও জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেল না। মৃত্যুতেই তার প্রেমের সমাপ্তি। কমলা, বিজয়, নীরদ, নীরজা ভালোবাসার আলো আঁধারিতে চারটি বেদনাম্লান চরিত্র। বিবাহিত জীবনের সঙ্গে মুক্ত প্রেমের এই সংঘাত, যা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের রচনায় বহুবিচিত্ররূপে প্রকাশিত তার সূচনা 'বনফুল' কাব্যের কমলা চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। মানবজীবন ও প্রকৃতি—সীমা ও অসীনের মিলন সাধনের এই পালাই রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শের মূলসুর। এই সংযোগ সার্থকতা হওয়ার বিষাদমগ্ন এক তত্ত্বময়তা এ পর্যায়ের কাব্যগুলিতে প্রকাশিত।

> "নিশীথে আঁধার নাই, আলোকে তীব্রতা নাই
> 　　কোলাহল নাইক দিবায়
> আশায় নাইক অন্ত, নূতনত্বে নাই অন্ত
> 　　তৃপ্তি নাই মাধুর্য শোভায়"

বনফুলের মত 'কবিকাহিনী'র মধ্যেও রোম্যান্টিক বেদনার তীব্রতা অকারণ বিষাদ ও শূন্যতাবোধ, অতৃপ্তির যন্ত্রণাবোধ লক্ষ্য করি।

> "এখনো কহিছে কবি 'আরো দাও ভালোবাসা
> 　　আরো ঢালো ভালোবাসা হৃদয়ে আমার'
> প্রেমের অমৃত ধারা এত যে করেছ পান
> 　　তবু মিটিল না কেন প্রণয় পিপাসা?"

'কবিকাহিনী'র কবি যেন রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ পরিবর্তিত ছায়াভাস। একাব্যের নায়িকা নলিনীর মৃত্যুতে কবির মনে এসেছে সংশয়। এই সময় থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে রবীন্দ্রমানসে, জীবনের ট্র্যাজেডি ও দুঃখবোধের জিজ্ঞাসা জেগেছে মৃত্যুতেই কি শেষ না দুঃখ উত্তীর্ণ এক অতীন্দ্রিয় চেতনার বিকাশ সম্ভব—এই দোলাচল প্রশ্ন প্রেমিকার মৃত্যুতে কবি উচ্চারণ করেছেন—

> "গিয়াছে কি আছে বসে
> 　　জাগিল কি ঘুমাল সে
> কে দিবে উত্তর?"

'শৈশবসঙ্গীতের কবিতাগুলিতেও এই অকারণ বিষাদ অনুত্তর প্রশ্ন Ramantic Agony-র সুর ধ্বনিত,

> "ওগো দেবী, ওগো বনদেবী
> বল মোরে কি হয়েছে মোর
> কি ধন হারায়ে গেছে, কি সে কথা ভুলে গেছি
> 　　হৃদয় ফেলেছে ছেয়ে কি সে ঘুম ঘোর"

শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থাকারে প্রকাশকালের হিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের অনুজ হলেও রচনাকালের দিক দিয়ে অগ্রজ। এর অধিকাংশ কবিতাই ১২৮৪-১২৮৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৭৮-৮৯) ভারতীতে মুদ্রিত হয়েছিল।

১.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যাসংগীত'। এই কাব্যটিকে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা বলা যেতে পারে। 'সন্ধ্যাসংগীত' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

> "আমার কাব্য রচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব, সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।"

এ কাব্যের কবিতাতেও বিষাদের সুর ধ্বনিত। কবিতাগুলির নামকরণেই বেদনা ও দুঃখের ছায়াপাত ঘটেছে—সন্ধ্যা, আত্মহারা, আশার নৈরাশ্য, পরিত্যক্ত দুঃখ আবাহন, তারকার আত্মহত্যা ইত্যাদি। এই সময়কার অস্থির বেদনাই কবিতাতে ধ্বনিত। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে রোম্যান্টিক বিষাদের ভাবোচ্ছ্বাস ও বেদনাব্যাকুল দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পথহারা পথিকের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন হৃদয় অরণ্যে।

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রভাতসংগীত' যেন সন্ধ্যাসংগীতের পরিপূরক। এক দুর্লভ প্রভাতীক্ষণে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটলো—সন্ধ্যার ছায়াম্লান হৃদয়ের বেদনার আঁধার থেকে আনন্দের দিব্যবিভায় কবির মুক্তি ঘটলো। প্রভাতসংগীতের জ্যোতির্ময় প্রভাতে সন্ধ্যায় ম্লানিমা দূর হলো। বাহির ও অন্তর যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে কবির অন্তরে ছিল, ততদিন তাঁর উপলব্ধি পূর্ণ ও সার্থক হয়নি। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই কবিচিত্তে বিষাদ ও বেদনা ঘনীভূত হয়েছিল। যতদিন না নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটলো, ততদিন এই বেদনার আঁধার তাঁর চিত্তের সংশয় মোচন করতে দেয়নি। যে আঁধার আলোর অধিক,সেই বেদনার অন্ধকারে সন্ধ্যাসংগীতের সৃষ্টি আর সেই বেদনার আঁধার থেকে যে আলোর জন্ম সেই দিব্য প্রভাতের পরম প্রজ্ঞায় প্রত্যয়দৃঢ় 'প্রভাতসংগীতে'র প্রকাশ। সন্ধ্যাসংগীতের হৃদয়-অরণ্য থেকে প্রভাতসংগীতে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে আপনসত্তার অনুভব উচ্চারিত হল।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, যদিও এটি কবির ষোলো বছর বয়সের রচনা। কিশোর রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের রোম্যান্টিক মন্ময়তা অনুরাগী ও অনুসারী ছিলেন। তাঁর কথায় বিহারীলালের আত্মগত লীরিক ধর্মিতা প্রকাশিত—

> "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ
> সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই।"

এই রোম্যান্টিক ভাবগত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রমানসে বৈষ্ণবপদাবলীর-ও সুগভীর প্রভাব ছিল। তারই প্রকাশ—ভানুসিংহের পদাবলী। বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুকরণে ব্রজবুলির অনুসারী এক কবিভাষায় এই কাব্যের পদগুলি রচিত। এর কয়েকটি পদ কিশোর কবির অনুপম সৃষ্টি, যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজে উত্তরকালে এর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

> "ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নই, তাহা আজকালকার সস্তা অর্গানের বিলাতি টুংটাং মাত্র।"

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—'ছবি ও গান'। শৈশব ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে রচিত এই কবিতাবলীতে কবির নিজের কথায়—"ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে দিন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না,রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে।" তাই 'ছবি ও গান'-এ আছে চিত্রধর্মিতা ও গীতিধর্মিতা। এতে আছে যৌবনচাঞ্চল্যের ছবি, আছে যৌবনবেদনার গান, রূপ নিয়ে ছবির সৃষ্টি আর ভাব নিয়ে সৃষ্টি হয় গান। যৌবনের রক্তিম কামনার সঙ্গে মিশে যায় সুরের মুর্ছনা। তাই 'ছবি ও গানে'র কয়েকটি কবিতা যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা নিখুঁত ছবি—

'সুখস্বপ্ন', 'পূর্ণিমায়', 'সুখের স্মৃতি' তার বিশিষ্ট নিদর্শন। আবার 'জাগ্রতস্বপ্ন', 'স্মৃতিপ্রতিমা' কবিতায় অস্ফুট গীতিমূর্ছনার বেদনা আভাসিত। দূর থেকে দেখা ছবি আর দূর থেকে শোনা গানকে তিনি ব্যাকুল ভাষায় বাঁধার প্রয়াসী হয়েছেন—

"কেহ কি আমারে চাহিবে না
কাছে এসে গান গাহিবে না?
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
কবে না প্রাণের আশা?"

স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে এ কাব্যের কবিতাগুলি ললিত মধুর। এরগ মধ্যে নবযৌবনের উল্লাস যেন বাণীমূর্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন—"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কী মাতাল হয়ে লিখেছিলুম—আমি তখন দিনরাত পাগল হয়েছিলুম। সত্য কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।"

'বনফুল', 'কবিকাহিনী' থেকে ছবি ও গান পর্যন্ত কাব্যরচনার ইতিহসকে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কাব্য। প্রেম ও প্রকৃতিচেতনা তখন এক আত্মগতভাবে লীন হয়েছিল। প্রেম কেবল যেন এক আত্মিক অনুভূতি। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে একটা তাত্ত্বিক আবরণ দেবার প্রয়াস এই প্রথম পর্ব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই তত্ত্বময়তা অবশ্যই বিহারীলালের প্রভাবসঞ্জাত। প্রথম পর্বের এই একান্ত আত্মগত ভাবের শেষে 'কড়ি ও কোমলে' কবি যেন আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ উপলব্ধি করলেন।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হজ্বায়। এর একদিকে আছে সন্ধ্যাসংগীত পর্বের আধো আলোছায়া, অন্যদিকে আছে 'মানসী'র স্বচ্ছ অরুণাভা। একদিকে নবযৌবনের উন্মেষ অন্যদিকে প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ—তাই প্রথম পর্যায়ের শেষ অথবা নবপর্যায়ের সূচনা হিসেবে 'কড়ি ও কোমল' বিশিষ্ট এক মিশ্ররসের কাব্য। কবির নিজের ভাষায় 'আত্মপ্রকাশের প্রবল আবেগ' আর 'বহির্দৃষ্টিপ্রবমতা' এই প্রথম তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। এই প্রবল আবেগ থেকেই তীব্র বাসনা রঙীন সনেটগুচ্ছ লেখা হয়েছে। নারীদেহ-সৌন্দর্যকেন্দ্রিক কবিতাগুলি রবীন্দ্রসৃষ্টি সম্ভভারে এক নতুন সংযোজন। অনুভূতির তীব্রতার উষ্ম আবেগচঞ্চল এই দেহাশ্রয়ী সনেটগুচ্ছেও কিন্তু দেহাতীত গভীরতরে স্পর্শ অনুভব করা যায়। প্রকৃতির বিশালতায় ব্যক্তিমানসের মুক্তি আভাসিত 'যৌবনস্বপ্ন' কবিতায়—

"আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ" সৌন্দর্যকে এভাবেই কবি বিশ্বলীলার ছন্দে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। নবযৌবনের স্বাভাবিক আবেগ উচ্ছ্লতায় নারীদেহাশ্রয়ী সনেটগুচ্ছেও এই মুক্তির কথা প্রচ্ছন্ন। প্রেমের তীব্রতাকে তিনি 'পূর্ণিমা রাত্রি' বলে তারগ থেকে মুক্তি চাইছেন ঊষার আলোকে মুক্তির আকাশে—

"কোথায় ঊষার আলো, কোথায় আকাশ
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক অবসান"

'কড়ি ও কোমলে' এই যৌবন চাঞ্চল্যের সঙ্গে আর একটি বিষয় ধরা পড়েছে—সেটি জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। কবি বলেছেন—"যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

মৃত্যুর আঘাতে কবিচিত্তের বেদনা উৎসারিত, কিন্তু তাঁর ভাবনার বৈশিষ্ট্যই জীবনের সচলছন্দে তাল মেলানো। তাই দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি অন্তত প্রাণপ্রবাহে জীবনের স্পন্দন উপলব্ধি করতে চান। 'কড়ি ও কোমলে' মর্ত্যপ্রীতি, জীবনবোধ ও যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।

এতদিনকার কাব্যে যে অকারণ বেদনার আভাস ছিল—এবার তাই খুঁজে পেয়েছে উৎসমুখ। মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে কবি যেন জীবনের পাত্রকে পূর্ণ উপলব্ধি করলেন। তাই মৃত্যুর তরঙ্গঘাতে যে কবিতার জন্ম, তার নাম দেন 'প্রাণ'।

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্য সভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার"

১.৩.৩ তৃতীয় পর্ব

রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম সার্থক সৃষ্টি' বলে সমালোচকবৃন্দ বন্দিত করেছেন 'মানসী'-কে ১৮৮৭ থেকে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এর কবিতাগুছ গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে। গাজিপুরের নির্জনবাসে এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা রচিত। এছাড়া কলকাতা, শান্তিনিকেতন, সোলাপুর ও লণ্ডনে রচিত একটি কবিতাও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'মানসী' বাংলাকাব্যের আনন্দ বিস্ময়। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ এ কাব্যেই স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে। 'মানসী'-কে রবীন্দ্রনাথের মানস পরিণতির প্রথম সার্থক প্রকাশ বলা যায়। তাঁর সাহিত্য সাধনার মূলভাব মানসীতেই প্রথম প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে।

'মানসী' নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। কবি মানসের প্রেমকল্পনাই মানসপ্রতিমা। তার অধিষ্ঠান কবির মনোলোকে। ভাবকল্পনায় গড়া সেই মানসী সীমার বন্ধন-উত্তীর্ণ অতীন্দ্রিয় ভাবমাধুরী। সীমার মধ্যে অসীমের প্রতিভাস 'মানসী' কাব্যের মর্মবাণী। কবি বলেছেন—

"আমি ভালোবাসি অনেককে, কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি, সে মানসেই আছে,
সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কী?"

"আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের"—এই পরম উপলব্ধি 'মানসী' কাব্যের প্রেমকবিতাকে ঘিরে আছে প্রেমের রূপ নয়, তার আত্মার অনুসন্ধান মানসী মূল কথা। তাই বাস্তবের সঙ্গে আদর্শায়িত প্রেমকল্পনার বিরোধাভাসের চকিত চমক—

"সমগ্র মানব তুই পেতে চাস
একী দুঃসাহস
কী আছে বা তোর
কী পারিবি দিতে
আছে কি অনন্ত প্রেম?"

'মানসী'র 'নিষ্ফলকামনা' কবিতাটিতে সমগ্র কাব্যের ভাব বিধৃত বলে মনে হয়। আদর্শায়িত প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্ব জনিত বেদনার তীব্র মধুর বাণীরূপ 'নিষ্ফলকামনা'। দেহাতীত প্রেমভাবার মুক্ত মাধুরী এ সময়কার বিভিন্ন রচনায় ধরা পড়েছে।

প্রেমের এই কামনাহীন অনুভবের গান— 'সুরদাসের প্রার্থনা'। এ কবিতার পূর্ব নাম ছিল 'আঁখির অপরাধ'। মোহময় দৃষ্টি দিয়ে প্রেমের রূপারতি যথার্থ প্রেম নয়, তাতে আছে ভোগের স্থূলতা। সেই অপরাধ থেকে মোহমুক্ত উদার দৃষ্টিতে প্রেমের প্রকাশ ঘটুক এই প্রার্থনাই কবিতাটিতে ধ্বনিত।

"আঁখির সহিত আঁখির পিপাসা
লোপ করো একেবারে"

—স্বদেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবনের অনুভূতি ও ভাবনা সঞ্জাত কিছু কবিতাও 'মানসী'তে আছে। 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'গুরু গোবিন্দ, 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমলাপ' ইত্যাদি কবিতাগুলি এই পর্যায়ভুক্ত।

'মানসী'র নিসর্গ কবিতাগুলিতে কবিমানসের সার্থক সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। 'একাল ও সেকাল', 'মেঘদূত' 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় পুরাণ প্রতিমা থেকে কালিদাসের কাল ফিরে এসেছে পাঠকের মনোলোকে।

অন্তরঙ্গ কাব্যভাবনার সঙ্গে 'মানসী'তে বহিরঙ্গ প্রসাধনাও নবরূপে প্রকাশিত। কবির নিজের কথায়—"মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল"।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে "সোনারতরী" কাব্যের স্মরণীয় প্রকাশ। এই কাব্য থেকেই শুরু হলো তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির বৈচিত্র্য। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনের কাব্য সোনারতরী। এর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।.....আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

জমিদারির কাজে পদ্মাবিধৌত বঙ্গে শিলাইদহ-পতিসর-পাবনা অঞ্চলে কবি এসময় বোটে করে ভ্রাম্যমান।

বাংলাদেশের উদার প্রান্তর, অসীম অম্বর, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের বরণচাতুরী—তাঁর এসময়ের লেখায় ধরা পড়েছে। ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিতে যে নিসর্গ মাধুরী মর্ত্যপ্রীতির প্রকাশ, সমকালীন গল্পগুচ্ছে মানুষের নিবিড় পরিচয়ের আভাস—তারই ছায়াপাত 'সোনারতরী' কাব্যের কবিতাবলীতে।

প্রকৃতির সঙ্গে জন্মান্তরের বন্ধনের কথা, আত্মিক যোগের কথা 'বসুন্ধরা' কবিতায় ধ্বনিত। এছাড়া একাব্যেই একাধারে রয়েছে মরণপীড়িত চিরজীবী প্রেমের অমরভাষ্য 'যেতে নাহি দিব', সীমা-অসীমের তত্ত্বপ্রকাশক 'দুই পাখী', চিরঅন্বেষাময় জীবনসাধনা 'পরশপাথর' অসামান্য মৃত্যুচেতনা ঋদ্ধ 'প্রতীক্ষা' ও 'ঝুলন' এবং কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় 'সোনারতরী' ও 'নিরুদ্দেশযাত্রা'। এই সঙ্গে রয়েছে বিশুদ্ধ প্রেমকবিতা 'দুর্বোধ', 'লজ্জা', 'হৃদয়যমুনা' এবং কবির আজন্মসাধনার ধন—'মানসসুন্দরী'। সমালোচকের ভাষায়—"মানসীতে যে ছিল অস্পষ্ট ও অন্তরালবর্তিনী, মানসসুন্দরীতে তারই প্রতিমা রচিত হল।" বিশ্বপ্রকৃতির অন্তত সৌন্দর্য মধুরিমাই কবির মানসসুন্দরী। এই মানস প্রতিমাই তাঁর কাব্যলক্ষী। তাঁর আজন্মসাধনার ধন। একে কেউ বলেছেন সৌন্দর্য দেবতা, কেউ বা কাব্য দেবী, কেউ বা মানস প্রতিমা। এ কবিতা কবির সঙ্গে কবিতার প্রেমলীলার ছন্দবাণী। কবিতাকে উদ্দেশ করে কবিতা রচনার এই রীতি পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। শেলীর 'হিম টু ইনটেলেকেচুয়াল বিউটি'-র কথা এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে আসবে। শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন' এ-ও এই অন্তরতমা আপন মানসলোকবাসিনী সত্তার সঙ্গে কথোপকথন।

'সোনারতরী' কাব্যের প্রথম কবিতার নামেই সমগ্র কাব্যের নামকরণ। সুতরাং নাম-কবিতাটির তাৎপর্য সমধিক। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় 'তরী বোঝাই' শীর্ষক রচনায় বলেছেন—

> "সোনারতরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম। এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে। মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করে চলেছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মত, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত। ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফসল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু মানুষ যখন বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো—তখন সংসার বলে—তোমার জন্য জায়গা

কোথায়? প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকে চিরন্তন করে রাখতে চাইছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।"

এর প্রথম কবিতা 'সোনারতরী' রচিত হয়েছিল ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে এবং শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশযাত্রা' রচিত হয় ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। দুটি কবিতাতেই নৌকাযাত্রার কথা, দুটিতেই তরণীর নেয়ে আছে, তবে 'সোনারতরী'-তে সে আড়ালে আর 'নিরুদ্দেশযাত্রা'য় সে কবির পথ নির্দেশিকা—অজানা সুন্দরী। রোম্যান্টিক কবিমানসের অকুলযাত্রাই এখানে সূচিত।

'সোনারতরী' লৌকিক প্রেমের কাব্য বলে পরিচিত। কবি সুগভীর প্রীতির বন্ধনে ধরণীর সঙ্গে আপন অস্তিত্বের বন্ধনকে উপলব্ধি করছেন। 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব', 'অক্ষমা', 'আকাশের চাঁদ', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'দরিদ্রা' প্রভৃতি কবিতায় নানাভাবে এই মর্ত্যপ্রীতি সঞ্চারিত, 'বসুন্ধরা' কবিতায় একদিকে বসুন্ধরা, অন্যদিকে মানুষের মুখপাত্র কবি। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার একদিকে বিদায়কামী পিতা, অন্যদিকে তাঁর শিশুকন্যা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয় দুটি ভিন্ন হলেও এদের অন্তর্লীন সুর একই। দুটিতেই লৌকিক প্রেম, মর্ত্যপ্রেমের অমলিন মাধুরী প্রকাশিত। লৌলিক জীবনের চরমতম সত্য—বিদায় গ্রহণ। এই বিদায় কখনো সাময়িক বিচ্ছেদ, কখনো বা মৃত্যু। এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে সবচেয়ে গভীরকথা 'যেতে নাহি দিব'। এই ভালোবাসার বন্ধন ও আকুল আর্তি সত্ত্বেও একদিন চলে যেতে হয়। সেই বেদনাই 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির অবয়বে করুণ লাবণ্যের মত ছড়িয়ে আছে।

মর্ত্যপ্রীতির নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে 'আকাশের চাঁদ' কবিতায়। অলৌকিক অবাস্তব বস্তুর জন্য, অপ্রাপনীয়ের জন্য মানুষের অনন্ত তৃষ্ণা, ক্ষ্যাপা যেমন পরশপাথরের সন্ধানে ঘুরে মরে—জীবনের মধ্যে লুকোনো অমৃতপরশের সন্ধান পায়না, তেমনি বাস্তব সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে অমর্ত্যমাধুরীর সন্ধানে মানুষের জীবন ব্যর্থ পরিক্রমায় শেষ হয়ে যায়।

'সোনারতরী' পর 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যে প্রেমের সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রকাশিত। 'সবুজপাত্র' রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে।

"আমি সত্যি বুঝতে পারিনা আমার মনে সুখদুঃখ বিরহ-মিলন পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী"

—এই নিরাকার সৌন্দর্যতত্ত্বই রূপ পেয়েছে 'চিত্রা'র 'উর্বশী' কবিতায়। ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব সৌন্দর্যের অখণ্ড অনন্ত সতার প্রতীকিত বাণীমূর্তি উর্বশী।

চিত্রা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের স্মরণীয় প্রকাশ। কবি সমগ্র কাব্যযুগ ধরে যে অন্তরতমের সন্ধান করেছেন, কবির সেই অন্তরতম সত্তাই তাঁর জীবনদেবতা। 'সোনারতরী' থেকে যে নিগর্স অনুভূতি তাঁর চৈতন্যলোকে প্রবাহিত ছিল, তাকেই চিত্রায় এনে পরিপূর্ণরূপে কবি অনুভব করলেন। সেই প্রত্যয় তাঁর অন্তরকে ঐশ্বর্যদান করলো, সেই সত্যই তাঁর অন্তরতম জীবনদেবতা অন্তর্যামীর সন্ধানে তাঁর যে মানসযাত্রা তা-ই পরিণতিতে এসে পৌঁছলো জীবনদেবতা তত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যে কবি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।"

নিজের জীবনের মধ্যে যে আবির্ভাবকে তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন, তিনিই তাঁর জীবনদেবতা। চিত্রাকাব্যের অন্তর্যামী, কৌতুকময়ী, অন্তরতম—সবই সেই জীবনদেবতার বিভিন্ন ও বিচিত্র লীলা। এই জীবনদেবতা ভাবনার সঙ্গে মিশে রয়েছে নিসর্গ প্রকৃতি। নিসর্গের অপার রহস্যময়তা জীবনদেবতা তত্ত্বে মিশে গেছে—তারই

প্রকাশ 'সিন্ধুপারে' কবিতা। 'সিন্ধু'—জীবনসমুদ্র, তারই পারে—অর্থাৎ জীবন উত্তীর্ণ মৃত্যুলোকে জীবনদেবতার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

চিত্রার সৌন্দর্যবিষয়ক কবিতাগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির অনুভবে বিচ্ছেদের বেদনাতেই প্রেমের মধুরিমা, প্রেমের পূর্ণতা। তাই স্বর্গীয় প্রেমে নয়, অলৌকিক সৌন্দর্যে নয়, দুঃখময় পার্থিব প্রেমে ও লৌকিক সৌন্দর্যে কবির অনুরক্তি। চিত্রা সেই লৌকিক সৌন্দর্যের কাব্য। এই সৌন্দর্যমূর্তি একাধারে বিচিত্ররূপিনী অথচ অন্তরব্যাপিনী রূপে কবিমানসে লীন হয়ে আছে সৌন্দর্যকে কবি সকল মানব সম্বন্ধের বিকার থেকে সংকীর্ণ সীমার প্রয়োজন থেকে বিশুদ্ধ অখণ্ড মূর্তিতে দেখতে চান। উর্বশী ও বিজয়িনী কবিতায় তার চরম প্রকাশ, ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য মুগ্ধতা ও ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যধ্যান একে দেহে মিলে গিয়ে পূর্ণ সৌন্দর্যের অখণ্ড মঙ্গলমূর্তি সৃষ্টি করেছে। 'চিত্রা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যেন Beauty mystic কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

'জ্যোৎস্নারাতে' ও পূর্ণিমা কবিতা দুটিও কবিচিত্তের সৌন্দর্য লীলাকেই বাঙ্ময় করেছে। অন্তর্জগতে অনুভূত সৌন্দর্যসত্তাকে জ্যোৎস্নারাতে কবিতায় করি আহ্বান করেছেন।

'বিজয়িনী' কবিতায় সৌন্দর্যানুভূতি রমণীমূর্তিতে আভাসিতা। এই মূর্তি যেন সৌন্দর্যের আদিসত্তা—Eternal Beauty। এই সৌন্দর্যসত্তা চিরদিনই অপ্রাপনীয়া, তাই সৌন্দর্যভাবনায় বেদনার ভাব মিশে আছে। আর এই অপ্রাপনীয় বেদনার অনুভব থেকেই দুর হয় ভোগবিলাস, দূর হয় কামনাবাসনার সংরাগ। তাই সেই আদি সৌন্দর্যের নগ্নমূর্তির মহিমার কাছে মদনদেবেরও পরাজয় ঘটে। অখণ্ড সৌন্দর্যের এই বিজয়িনী সত্তাকেই কবি প্রকাশ করেছেন।

'এবার ফিরাও মোরে' চিত্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা—যেখানে কবি বাইরের কর্মচঞ্চল প্রবাহে নিজেকে মেলাতে চাইছেন। শুধু কাব্যময়, আত্মমগ্ন কল্পনা-লালিত রোম্যান্টিক মানসের অন্তরলোকেই নয়—তিনি ফিরতে চাইছেন বিচিত্র কর্মময় পৃথিবীতে, দৈনন্দিন আবর্তের মধ্যে। সংসারের ব্যথাবেদনা পীড়িত মানুষের মাঝে তিনি একাত্মতা অনুভব করতে চান।

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ি। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়"

এভাবেই চত্রিাকাব্যে কবির নিভৃত অন্তর্লোক ও কর্মময় বহির্লোক সমন্বিত হয়েছে। তাই এ কব্যের নাম কবিতা সার্থক তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী"

১.৩.৪ চতুর্থ পর্ব

চিত্রার পরবর্তী কাব্য—চৈতালি। বঙ্গাব্দে ১৩০২ সনে প্রকাশিত এ কাব্যে মানুষের হৃদয়কে বড়ো কাছাকাছি দেখার কথা কবি লিখেছেন। আবেগ উচ্ছ্বলতার পরিবর্তে তাঁর দেখার মধ্যে এখন এসেছে প্রশান্তি। অন্তর ও বাইরের মধ্যে একটা সমন্বয় যেন এ কাব্যের সনেটগুলিতে ক্ল্যাসিক সংযমে স্থিতি লাভ করেছে। 'চৈতালি'র ব্যক্তিগত প্রেম কবিতার মধ্যেও এক সুগভীর প্রশান্তির আভাস। সেকারণেই রোম্যান্টিক কবিকল্পনা ক্ল্যাসিক রীতিতে সনেটে সংহত হয়ে দেখা দিয়েছে। একাব্যে মানবমহিমা, মর্ত্যধূলির প্রতি আকর্ষণ প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুরক্তি প্রকাশিত। সুগভীর শান্তি, স্নিগ্ধ দীপ্তর সমাহিত লাবণ্যে চৈতালির কবিতাগুলি উচ্ছ্বল।

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হল ক্ষুদ্রায়তন কবিতার সংকলন—'কণিকা'। এক ধরনের নীতিমূলক কাব্যকণা কণিকার মধ্যে স্থান পেয়েছে।

'চৈতালি'র পর উল্লেখযোগ্য কাব্য ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ। অতীতচারণা ও সুদূরের আকঙ্ক্ষা জনিত বেদনার আভাস বিজড়িত এ কাব্য রবীন্দ্রনাথের অতীত ভারতে মানসভ্রমণের রূপচিত্র। রোম্যান্টিক স্বপ্নাচারণার মধ্য দিয়ে প্রেমভাবনার প্রকাশে এ কাব্যের রূপ নির্মিতিতে এসেছে অসামান্য সৌন্দর্য। অতীতচারণার সূত্রেই এ কাব্যে ফিরে এসেছে কালিদাসের কাল। স্বপ্ন কল্পনা আশা আর অনুভূতির সমন্বয়ে এ কাব্য সার্থক নামা। রোম্যান্টিক মনোভঙ্গি সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন—

"It is the rewakening of middle ages"—অর্থাৎ মধ্যযুগের পুনর্জাগরণ। তাই একাব্যে মধ্যযুগমুগ্ধতা ও কালিদাস প্রিয়তার প্রতিভাস। কালিদাস-প্রভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে স্বপ্ন মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পরে ও বর্ষামঙ্গল কবিতায়। কুমারসম্ভব কাব্যের পঞ্চমসর্গে ধূর্জটির পদতলে পার্বতীর আত্মনিবেদনের অংশে কালিদাসের অসামান্য সৌন্দর্যলোক থেকে সূত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'মদনভস্মের পূর্বে ও পরে' কবিতাদুটির রূপ নির্মাণ করেছেন।

আবার 'স্বপ্ন' কবিতায় উজ্জয়িনীর প্রসঙ্গ মহাকালের মন্দির, শিপ্রা নদী যেন কালিদাসের কালের মিথকে প্রত্নপ্রতিমায় চিত্রিত করেছেন। অতীত স্মৃতিবাহিত ঐতিহ্যকে কাব্যের ঐশ্বর্যে কল্পনার সৌন্দর্যে কবি বেঁধেছেন ছন্দবন্ধনে। 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা 'ভ্রষ্টলগ্নে'র মত কবিতাতেও পুরাণ প্রতিমাকে নতুন কল্পনায় উজ্জীবতি করেছেন।

কল্পনার সমকালে (১৯০০) প্রকাশিত 'ক্ষণিকা' বিস্ময়কর কাব্য। কল্পনা কাব্য থেকে পরবর্তী 'নৈবেদ্য' কাব্যের মধ্যে আছে এক ক্রমাভিব্যক্ত স্তর। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝখানে 'ক্ষণিকা' যেন ক্ষণকালের দ্যুতি। শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গাইবার আনন্দ এই কবিতাগুচ্ছে ধ্বনিত। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মতে

"ছোটখাটো সুখদুঃখ ও সহজ সরল প্রেমের কাহিনীর কাব্য এই ক্ষণিকা"—

অতীত চারণার মুগ্ধতা নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্ভাবনা নয়—বর্তমানের ক্ষণমুহূর্তের আনন্দ বেদনার সত্যরূপকে কবি মূর্ত করেছেন এ কাব্যে। ক্ষণকালের ছন্দে বাঁধা এই সহজ ভাবই ক্ষণিকার প্রাণ। বাস্তবজীবনে প্রেমের একটা সীমা আছে, সব কিছুর মধ্যেই তার স্থান—এই মানস পরিণতির কথা 'ক্ষণিকা'র প্রেমকবিতায় আভাসিত।

ক্ষণিকায় যেন ক্ষণকালের জন্য কবি নেমেছেন সহজ সাধনার লঘু পথে। হালকা ভাব ও ছন্দের সঙ্গে গভীর তত্ত্বের সমন্বয় দেখা দিল ক্ষণিকাতে। এর চটুল ছন্দের বাঁধনে জীবনের সুগভীর প্রত্যয় কৌতুক রসাস্নিগ্ধ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। স্মিত-কৌতুকের আড়ালে কখন যেন গভীর গোপন হৃদয়ের উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়েছে মধুর বেদনা-ধারা।

"আমারে পাছে সহজে বোঝো
তাই কি এত লীলার ছল
বাইরে থাকি হাসির ছটা
ভিতরে তার আঁখির জল"

রবীন্দ্রকাব্য ধারায় প্রেরণাদাত্রী যে কাব্যলক্ষ্মীর দেখা বারবার মেলে কখন যেন তিনি মিশে যান জীবনদেতা তত্ত্বের মধ্যে 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'অন্তরতম' কবিতাটিতে এই প্রেরণাকেই বাণীমূর্তি দান করেন কবি। জীবনের ক্ষণকালের আঙিনা থেকে আসা বাস্তব নায়িকা চিত্র ও এই ভাবকল্পনায় মিশে আছে। ক্ষণকালের আভাস থেকে কখন যেন চিরকালের তার সেই রূপকল্পনা কবি হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেছে। এই অনুভবই 'সমাপ্তি' নামে কাব্যের শেষ কবিতাটিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। জীবনের ক্ষণমুহূর্ত থেকে লীলাসঙ্গিনী যেন জীবনশেষের অচঞ্চল মুহূর্তেও কবির অন্তরের সাথী হয়ে রইলেন। যিনি প্রেরণা, তিনিই লীলাসঙ্গিনী, তিনিই অন্তরতমা আবার তিনিই

জীবনদেবতা। ক্ষণিকার ক্ষণকালের লীলার পরই কবি চিত্তে এক আধ্যাত্মিক ভাবনার, অলোকচারণার অস্ফুট পদসঞ্চার শোনা যায়, মধ্যবর্তী 'স্মরণ' ও 'শিশু'র পরই কবি বিরহপারের খেয়ায় ভেসে গিয়ে পৌঁছে যান 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য'র অধ্যাত্মচেতনার উপকূলে।

কল্পনা, ক্ষণিকার সমকালে রচিত হয়েছিল কথা ও কাহিনীর নাট্যকাব্য ও কবিতাবলী। কাহনীতে সংকলিত নাট্যকাব্যগুলি নাটক পর্যায়ে আলোচিত। 'কথা' গ্রন্থের উপাদানও প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে আহরিত কথা ও কাহিনী গ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথকৃত মন্তব্যটি উদ্ধার করলে এর আন্তরধর্মের পরিচয় পাওয়া যাবে।

"এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে,
যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তার"

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নৈবেদ্য প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি ঔৎসুক্য ও আনুগত্যের পরিচয়বাহী। এর প্রথম পর্বের কয়েকটি কবিতায় ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতি বাণী পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু এর চতুর্দশপদী কবিতাগুলি ভিন্ন স্বাদবাহী। উনিশ শতকের রক্তসন্ধ্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর উন্মত্ততা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের অত্যাচারিত মানবাত্মার বেদনায় বিদীর্ণ চিত্ত কবি এই সাম্রাজ্যবাদের চরম বিরোধিতা করেছেন।

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অবস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসাধনা একসময় মিলে গেছে তাঁর অধ্যাত্মভাবনায়। এর চরণতম প্রকাশ ঘটেছে নৈবেদ্যর সনেটগুলিতে। প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শকে কবি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন ভোগবাদী মানবসমাজে। একদা এ ভারতের কোন বনতলে যে উদাত্ত অমৃতবাণী উচ্চারিত হয়েছিল তাকেই তিনি হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর মৃত আত্মায় সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত ব্যবহার করেছেন—

"রে মৃত ভারত
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ"।

আত্মশক্তিতে জাগ্রত হতে, উপনিষদের ভাবনায় প্রাণিত হতে প্রার্তনা জানিয়েছেন কবি—

"তবে কাছে এই মোর শেষ নিবেদন
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর"

কবি পত্নী মৃণালিনীদেবীর অকাল প্রয়াণের স্মৃতিতে রচিত কাব্য 'স্মরণ' (১৯০৩)। এখানে যে শোক—তা তত্ত্বগত বা ভাবগত নয়—একান্ত ব্যক্তিগত। কবির ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনের শূন্যতার উপলব্ধি 'স্মরণ' কাব্যে ধরা পড়েছে। মৃত্যু রবীন্দ্র প্রেমচেতনায় এক বিষ্টি স্থান অধিকার করে আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যু জীবনের রসকে নিবিড়তর করে এবং যথার্থ প্রেম ও অনুভূতির প্রকাশে মৃত্যু আমাদের চিত্তে অমৃতের স্পর্শ এনে দেয়। তাই তিনি বলেন—"তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী"।

১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৯০৩) 'শিশু' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ, স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর শিশুপুত্র ও কন্যাকে ঘিরে কবির যে জীবন তারই বাৎসল্য ধারা নিঃসৃত কাব্য রস উৎসারিত 'শিশু'-র কবিতাবলীতে। কিন্তু কেবল স্নেহ বাৎসল্যরসই 'শিশু' কাব্যের একমাত্র রস নয়, সমালোচক বলেছেন—"শিশুর কবিতা শিশুর মুখের কথা নয়,

শিশুমনের কথাও নয়, শিশুকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্যরস যাহার মধ্যে মূর্তি লইয়াছে, তাহার মুখের কথা, মনের কথা।”

‘উৎসর্গ যদিও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল—এর অধিকাংশ কবিতাই ১৯০১ থেকে ১৯০৩ এর মধ্যে রচিত। মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন তাতে কবিতাগুলি ভাবানুযায়ী এক একটি গুচ্ছে বিন্যস্ত ছিল। প্রতিটি গুচ্ছের ভূমিকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ একটি করে কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। মুখবন্ধ স্বরূপ সেই কবিতাগুলিই একত্রে ‘উৎসর্গ’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

‘খেয়া’ কাব্য রবীন্দ্রসাহিত্য ধারায় এক বিশিষ্ট অধ্যায়। বহির্জীবনের সংঘাত ও অন্তর্জীবনের বেদনার অভিঘাতে ‘খেয়ার’ রচনাকাল কবি জীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমাহিত চিত্তে ভাবগভীর প্রশান্তিতে অন্তর ও বাইরের আলোড়নকে আত্মস্থ করে কাব্য রচনা করে চলেছেন।

এই সময় বঙ্গদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে এক প্রবল আবেগও আন্দালন ক্রিয়াশীল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে সারা দেশ চঞ্চল। প্রবল ভাববন্যায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথও সেই প্রাণবন্যায় যোগ দিলেন উদাত্ত গানে, কবিতায়, বক্তৃতায়। বহির্জগতের কর্মপ্রবাহে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যুক্ত করলেন। ‘খেয়া’ সেই সময়ের সাহিত্যফল।

কিন্তু এই দেশব্যাপী উত্তেজনার কালে কবির ব্যক্তিজীবনেও নেমে এসেছিল মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাত। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে কবি হারালেন তাঁর পিতা, স্ত্রী এবং দুই পুত্র-কন্যাকে। বাইরের কর্মপ্রবাহে সক্রিয় কবির অন্তর জীবনের এই বিরহবেদনা ‘খেয়া’ কাব্যে এক অন্যতর মাত্রা এনেছে।

এক অধ্যাত্মগভীর ভাবে ‘খেয়ার’ কবিতাগুলি বিশিষ্ট ভাবদ্যোতক হয়ে উঠেছে। কর্মজীবনের চাঞ্চল্য ও ব্যক্তিজীবনের একাদিত্বের মাঝে কবি যেন আলো আঁধারি প্রদোষ বেলায় উপনীত। বিরহপারের খেয়ায় ভেসে তিনি যেতে চান জীবন নদীর ওপারে। তাই তাঁর অকুল অপেক্ষার অনন্ত আহ্বান—

‘ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়”

‘খেয়া’ পরবর্তী কালে রবীন্দ্রজীবনের যে অলোকচারণা পর্ব শুরু—তারই আভাস যেন এ কাব্যে শোনা গেল। ‘আগমন’ কবিতার মধ্যে ঝড়ের রাতে যে দুঃখরাতের রাজার দেখা পাই—তিনিই রবীন্দ্রজীবনের অসীম অরূপরতন রাজাধিরাজ, প্রভু।

“ওরে দুয়ার খুলে দেরে
বাজা শঙ্খ বাজা
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা”

খেয়াতে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক নবতর রূপের প্রকাশ ঘটলো। ভাষার সলতার সঙ্গে যুক্ত হল রহস্যময়তা ও অতীন্দ্রিয় সাংকেতিক ব্যঞ্জনা। ‘খেয়া’ কাব্য থেকেই রবীন্দ্রমানসে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নবতর রূপের আভাস দেখা গিয়েছিল, তা পরিণতির পূর্ণতায় পৌঁছলো ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বে। এসময়কার গীতাখ্য তিনটি কাব্য গ্রন্থ (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি) রবীন্দ্রনাথের অলোকচারণার পরিচয় বহন করে। এই তিনখানি কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই গান—এদের নামকরণেই সেই গীতিময়তা পরিস্ফুট।

১.৩.৫ পঞ্চম পর্ব

গীতাঞ্জলি ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—যদিও এর কবিতাগুলি তার আগেই কিছু কিছু রচিত হয়েছিল, অধ্যাত্মসাধনার বেদনা, তার বিভিন্ন স্তর ও বিরহের অস্ফুট ক্রন্দন গীতাঞ্জলিতে ধ্বনিত। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতে গীতাঞ্জলিতে ঈশ্বর বিষয়ক কোনো তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে একজন কবির অনুভবকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে রোম্যান্টিক প্রেমের এবং প্রকৃতি অনুরাগের গান আছে, যাতে লেগেছে ভক্তির ছোঁয়া—'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা'।

খেয়া এবং গীতাঞ্জলি পর্বের তিনটি কাব্যের অধিকাংশ কবিতার লগ্ন হয় গোধুলি, নয় আঁধার রাত্রি, নির্জন নদীতীর। কখনো ঝড়ের রাতে আসেন দুঃখ রাতের রজা, কখনো রাত্রি এসে দিনের পারাবারে মিশে যায় আবার কখনো করি অনুভব বেদনার গান হয়ে ওঠে—

"আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে"। গীতাঞ্জলিতে সাধনার এই মধুর বেদন ও বিরহের ব্যাকুল রোদন ধ্বনিত।

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' (Song offering) উপলক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পান। ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে নৈবেদ্য ও খেয়ার অনেক কবিতা, গীতিমাল্যর কিছু গান ও গীতাঞ্জলির অনেক গান অনূদিত হয়ে স্থান পেয়েছে।

"গীতাঞ্জলি'র অধ্যাত্ম অনুভূতি পূর্ণতার রূপে প্রকাশিত হয়েছে গীতিমাল্য ও গীতালিতে। গীতাঞ্জলির বিরহ বেদনার দহনজ্বালার শেষে গীতিমাল্য ও গীতালিতে জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ আলাপন।

"কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কানে কানে
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে"

১.৩.৬ ষষ্ঠ পর্ব

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বলাকা' কাব্যে এক নতুন সুর ধ্বনিত হল। রবীন্দ্রমানসে সঞ্চারিত উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্র এবং ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর গতিতত্ত্ব মিলে এক সমন্বিত তত্ত্বের দেখা পাওয়া গেল। মানুষের অবিরাম গতিশীলতা ও জগতের প্রতিটি মুহূর্তের নবরূপে সৃষ্টি হওয়াকে বের্গসঁ তাঁর রচনায় তুলে ধরলেন।

"We change without ceasing and the state itself is nothing but change"
রবীন্দ্রমনোধর্মে এ সময় পরিবর্তনবাদের তত্ত্বটি নূতনরূপে উপলব্ধি হয়। তবে রবীন্দ্রচেতনা পুরোপুরি বের্গসঁর প্রভাব সঞ্জাত ছিল না। ছিল না বলেই পরিবর্তনবাদ ও গতিশীলতার মধ্যেও প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণার শাশ্বত আবেদনকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। 'বলাকা'-র ছবি কবিতায় জীবনচাঞ্চল্যের সঙ্গে প্রেমের অচঞ্চল স্মৃতি মহিমা আলোচিত।

জীবনচাঞ্চল্যের বৈশিষ্ট্য রূপেই 'বলাকা' কাব্যে এসেছে যৌবনবন্দনা। 'সবুজের অভিযান' কবিতায় সেই নবীন প্রাণবন্যার প্রবাহকেই উপলব্ধি করা যায়। কবিতার এই যৌবনদীপ্ত চাঞ্চল্যকে যথাযথ প্রকাশ করবার জন্যই বলাকায় কবি নতুন ছন্দের প্রয়োগ ঘটালেন। এর মুক্তক ছন্দ কবিতার অন্তরধর্মের চাঞ্চল্যকে সার্থক প্রকাশ করলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার মধ্যেকার দহনযজ্ঞর বীভৎস রূপ, বিশ্বসৃষ্টি ও গতিবাদের দার্শনিকতা, যৌবনের জয়গান, কবির ব্যক্তিগত প্রেম-প্রীতি-ঈশ্বর উপলব্ধি নানা বিষয়ের কবিতা নিয়ে 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থ রবীন্দ্রকাব্যধারায় এক বিশিষ্ট সংযোজন।

পরবর্তী কাব্য 'পলাতকা' ১৯১৮-তে প্রকাশিত। গল্পরসের মিশ্রণ দিয়ে গড়া এ কাব্যের কবিতাগুচ্ছ। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম অনুভূতির পরমতম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু 'পলাতকা'-য় আবার তাঁর দৃষ্টি পড়লো মর্ত্য ধুলির দৈনন্দিন জীবনরঙ্গে। তাই মানবজীবনের সুখ-দুঃখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কবি গেঁথে তুলেছেন হাসি কান্নার হীরাপান্নার মালায়। তাই অতি তুচ্ছ রেল স্টেশনের কুলী বউয়ের বেদনা কিংবা মুক্তি ও নিষ্কৃতির দুই সাধারণ মেয়ের মধ্য দিয়ে চিরচেনা ঘরোয়া জীবনছবি অনুভবগভীরতায় সুমুদ্রিত হয়ে যায়। নারীর মূল্য সম্বন্ধে সমাজদৃষ্টির সমালোচনা এ কাব্যের অনেক কবিতাতে রূপ নিয়েছে।

'শিশুভোলানাথ' ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আমেরিকা ভ্রমণের পর মানসিক শান্তি পেতেই যেন শিশুর স্বপ্নরাজ্যে ফিরতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ।

> "আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম।
> ......শিশুলীলার মধ্যে ডুবদিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম মনটাকে
> স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে মুক্ত করবার জন্য"

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ থেকে যেন রবীন্দ্র কাব্যধারায় লেগেছে শেষবেলাকার সুর। এর নামকরণেই প্রদোষ বেলার রাগিনীর ছোঁয়া। ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু সরকারের আমন্ত্রণে কবি তাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করে চারমাস পরে দেশে ফেরেন। পূরবীর অধিকাংশ কবিতাই সেসময়ের রচনা আগের লেখা কবিতাগুচ্ছ 'পূরবী' নামে ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রবাসকালের কবিতাগুচ্ছ 'পথিক' নামে সংকলিত।

এই কাব্যগ্রন্থটি 'বিজয়ার করকমলে' উৎসর্গীকৃত। আর্জেন্টিনা বসবাসকালে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামে যে বিদূষী মহিলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল তাঁকেই কবি 'বিজয়া' নামকরণে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

একাব্যের কবিতায় এক ব্যথাম্লান করুণতার আভাস। জীবনের শেষ বেলাকার স্মৃতিচিহ্নিত বেদনার ভাবে কবিতাগুলি অপরূপ স্নিগ্ধকরুণ।

> "দেখ নাকি হায় বেলা চলে যায় সারা হয়ে এলো দিন
> বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ"

জীবনের সাঁঝবেলাতে কবি চিত্তে দোলা দিয়ে যায় ফেলে আসা যৌবনবাসনার স্মৃতিলগ্ন দিন। অতীতের সৌন্দর্যরসভরা দিনগুলোকে একমাত্র স্মৃতির মধ্য দিয়েই ফিরে পাওয়া যায়। তাই 'খেলা', 'কৃতজ্ঞ', 'কিশোর প্রেম', 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতি কবিতায় লেগে আছে সেই বেদনমধুরিমা।

এই বেদনার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায়। 'পূরবী' কাব্যকে কবির ' দ্বিতীয় যৌবনের' কাব্য বলা যায়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কবির হাতের লেখা কবিতা 'কণিকা' প্রকাশিত হয়েছিল 'লেখন' নামে। যখন চীন-জাপানে গিয়েছিলেন কবি, তখন প্রায় প্রতিদিন স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে গিয়ে রচিত হয়েছিল এই 'কবিতিকা'।

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মহুয়া' রবীন্দ্র কাব্যধারায় এক বিশিষ্ট সংযোজন। কবি চিত্তে যে নববসন্তের আবির্ভাব দেখা গিয়ছিল 'পূরবী' রচনাকালে, 'মহুয়া' যেন সেই বসন্তের অনুচর হয়ে নবপ্রেম উন্মাদনার রস সঞ্চারে যুক্ত হল। বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের চরমতম প্রকাশ মহুয়া। প্রেমের মধ্যে যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল, সাধারণ মানুষকে অসামান্য করে দেখার মায়াঞ্জন আছে সেই মায়ালোক কেই 'মহুয়া কাব্যে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রেমের বহিরঙ্গ প্রসাধনকলা ও অন্তরঙ্গ সাধনার সমন্বিত প্রকাশে 'মহুয়া'র কবিতাগুলি অপরূপ। 'মহুয়া' কাব্যে সংকলিত কয়েকটি কবিতা লেখা হয়েছিল 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের জন্য। ভাবের সাযুজ্য থাকায় সেগুলি 'মহুয়া'তে স্থান পেয়েছে। এই কবিতাগুলিতে একটি তত্ত্বের ছোঁয়া আছে। যে প্রেম বন্ধ করে না, মুক্তির মাঝেই খুঁজে পায় সার্থকতা, গতিময় প্রেমের সেই সক্রিয়তাই 'শেষের কবিতায়' ব্যক্ত। এর কবিতাতেই তাই জীবনবেগের স্পন্দনের সঙ্গে জীবনাবেগের সার্থক যোগ ঘটেছে।

'মহুয়া'র পর প্রকাশিত হয় 'বনবাণী' (১৯৩১) বৃক্ষলতায় এক প্রাণের লীলার সৌন্দর্য এ কাব্যের কবিতায় প্রকাশিত। কবি বলেছেন—

"ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের ডালে
ডালে পাতায় পাতায় এক ছন্দের নাচন।"

রবীন্দ্রমানসে নিসর্গচেতনার যে বোধ আবাল্যযুক্ত—তাই নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় বন্দিত। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় তাঁর ঘরের আশেপাশে যে সব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে—তাদের ডাক তাঁর মনের মধ্যে পৌঁছে এক মিতালির বন্ধনে জড়িয়েছে। বনবাণী বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে কবি চিত্তের সেই মিতালীর গান। পরিশেষ কাব্য ১৯৩২ সালে প্রকাশিত। এর নামকরণেই কবি এক সমাপ্তির আভাস দিতে চেয়েছেন। এ কাব্যের কিছু কবিতা কলকাতার উপকণ্ঠে রচিত। অবশিষ্টগুলি জাভা-বালীদ্বীপে ভ্রমণকালে লিখিত।

সমালোচক এ কাব্যকে বলেছেন কবির আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপরিচয়ের কাব্য। সত্তর বছরের প্রান্তে এসে কবি যেন তাঁর সারাজীবনের ক্রমাভিব্যক্ত স্তরকে নিজেরই দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে উপলব্ধি করছেন—

"দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে, একের চরণে রাখিলাম বিচিত্রের
নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম"

১.৩.৭ সপ্তম পর্ব

কিন্তু দিনান্তের পরেও আবার নতুন প্রভাত আসে। রবীন্দ্রকাব্য তাই পরিশেষ হয়েও সমাপ্ত হয় না—তাই ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়—'পুনশ্চ'। রবীন্দ্র কাব্যধারায় যে ভাবপ্রবাহ 'পরিশেষ' পর্যন্ত বহমান সেই ধারায় নতুন সংযোজন 'পুনশ্চ'। এই নতুনত্ব ধরা পড়েছে বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে। তাই পুনশ্চ রবীন্দ্রকাব্যে পালাবদলের কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ সর্ব অর্থেই আধুনিক মানুষ, সময়ের প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুগলক্ষণকে স্বীকার করে সাহিত্যে সমকালীন বাস্তবকে মেনে নেন। রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পপ্নময়তা সত্ত্বেও জীবনকে দেখার গভীর সত্য দৃষ্টি তাঁর ছিল। তাই মনন কল্পনার নবীকরণ তাঁর পক্ষেই করা সম্ভভব। মননের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে রীতি পরিবর্তনও ঘটেছে এই কাব্যে।

'লিপিকার'ও আগে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে মুক্তক ছন্দের সৃষ্টি হয়েছিল। 'লিপিকা'য় গদ্য কবিতা লেখার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। তার সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্তি ঘটলো 'পুনশ্চ'তে এসে, দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বকে রূপ দেবার মাধ্যম হিসাবে এখানে এলো গদ্যছন্দ পূর্ণরূপে।

ভাষা পরিবর্তন ছাড়া কবিতার রস বিচারেও পরিবর্তন এসেছে। এর গদ্যভাষা সহজ, আটপৌরে, ছন্দোরীতি বাঁধনভাঙা আর মনোভঙ্গীতে ধরা পড়েছে আধুনিককালের ভঙ্গুরতার ছবি। বিড়ম্বিত তুচ্ছ মানুষের প্রতি সহমর্মিতার কবিতা যেমন আছে (ছেলেটা, সহযাত্রী, বালক, সাধারণ মেয়ে) আছে কীটের সংসার-এর মতো তুচ্ছ বিষয়ও। সেই সঙ্গে অস্পৃশ্যতা আন্দোলন বিষয়ক কয়েকটি কবিতার রূপায়ণে সমসাময়িককালে গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনের প্রভাব মুদ্রিত। অবশ্যই রবীন্দ্রচেতনার অন্তর্লোকে এই মানবতাবাদী চেতনা পূর্বেই ছিল। 'পুনশ্চ'তে যে প্রেমের কবিতার দেখা মেলে তা রবীন্দ্রসাহিত্যে অভিনব। প্রেমের উর্ধায়ন বা Sublimation কিংবা বিরহতত্ত্ব নয়—পরিবর্তে বস্তবের নির্মম সত্যকে যথাযথ উপস্থিত করা হয়েছে। মানুষী প্রেমের দুর্বলতার বাস্তব ছবি বর্ণরিক্ততায় চিত্রিত এ কাব্যে।

আবার বিদেশী প্রভাবজাত কিছু কবিতাও এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। ১৯৩০ সালে জার্মানিতে অবস্থানকালে The Child নামে কবিতার অনুবাদ করেন 'শিশুতীর্থ'। এছাড়া টি. এস. এলিয়টের "Journey of the Magi" কবিতার অনুবাদ 'তীর্থযাত্রী', 'পুনশ্চ' কাব্যতেই স্থান পেয়েছে।

পরবর্তী দুটি কাব্য ‘শেষসপ্তক’ ও ‘বীথিকা’ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শেষসপ্তকে বিচিত্রধর্মী কবিতার দেখা পাই—অতীত স্মৃতি মৃত্যুরহস্য, জীবন সম্পর্কে তত্ত্বভাবনা ও অসামান্য কিছু, প্রেকবিতা। ‘পুনশ্চ’র ভেঙে যাওয়া প্রেমের নির্মমতা এখানে নেই, কিন্তু বাস্তব জীবনের শূন্যতাবোধে রিক্ত অথচ স্মৃতিমাধুর্যে পরিপূর্ণ অসামান্য প্রেমানুভব আছে। তারই অনবদ্য স্বীকারোক্তি মেলে এর ৪৫নং কবিতায়—

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে
পূবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছু ডাক
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে....
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা
....
তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে
—শেষ কথা বলে যাব
‘দুঃখ পেয়েছি অনেক
কিন্তু ভালো লেগেছে
ভালো বেসেছি।’

‘বীথিকা’ কাব্যেও বিস্মৃত-চিরস্মৃত প্রেমের দুইরূপ ধরা পড়েছে। ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতায় কৌতুকস্নিগ্ধ সংলাপে আমন্ত্রণী পত্রটি কবির ব্যক্তিগত গৃহস্মৃতির মাধুর্যে মনকে ভরিয়ে দেয়।

আবার ‘পোড়ো বাড়ি’ কবিতাতে স্মৃতির সুখাবেশ নয়—দেখি অন্যতর রূপের আভাস।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘পত্রপুট’ গদ্যছন্দে রচিত। কবির আত্মভাবমূলক নানা কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলি যেন গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধের সংহত কাব্যরূপ। ‘পৃথিবী’, ‘ওরা অন্ত্যজ’ প্রভৃতি এ কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা।

কবির শেষবেলাকার বাসার নাম ‘শ্যামলী’। “এই যে কালো মাটির বাসা, শ্যামল সুখে ভরা”—সেই বেলাশেষের মাটির ঘরের নামেই তাঁর বেলাশেষের এক কাব্য ‘শ্যামলী’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে।

গদ্যছন্দে রচিত এ কাব্যের কয়েকটি কবিতা কথিকাধর্মী। এগুলিতে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশের ছবি দেখা যায়। ‘হঠাৎ দেখা’, ‘কণি’, ‘অমৃত’—তিনটি অসামান্য প্রেমকবিতা যার মধ্যে প্রেমের সহজ আলো বিকীর্ণ অথচ কোনো তত্ত্ব বা দার্শকিতার প্রলেপ নেই।

উদ্ভট কল্পনা ও কৌতুকরসের মিশ্রণে রচিত ছোট কবিতার সংকলন ‘খাপছাড়া’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। কবির স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্রে শোভিত এই গ্রন্থটি ভিন্ন স্বাদ বহন করে।

একই বছরে প্রকাশ পায় ‘ছড়ার ছবি’—নন্দলাল বসুর কিছু স্কেচ অবলম্বনে এর কবিতাগুলি রচিত। অনেক কবিতাই গল্পধর্মী।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ কবিজীবনের শেষ পর্যায়। এই গোধূলিবেলার কাব্যে ধরা আছে তাঁর শেষবেলাকার ভাবনা, চেতনা, বোধ, প্রত্যয় ও অনুভব।

প্রথম কাব্য—প্রান্তিক। অসুস্থতাজনিত আকস্মিক চৈতন্যলুপ্তি ও আরোগ্যলাভের পর এর কবিতাগুচ্ছ রচিত। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ‘অন্ধকারের ভীষণ শক্তির সঙ্গে’ প্রাণ শক্তির সংগ্রাম—অধিকাংশ কবিতার বিষয়। চেতন-অচেতনের প্রান্তে এসে যে কবিতার জন্ম তার নাম সঙ্গত কারণেই কবি দিয়েছেন ‘প্রান্তিক’।

আত্মার চরম মুক্তি আস্বাদনের জন্য কবি যেন মহা অনন্তের মধ্যে লীন হতে চান। এই গভীর আত্মমগ্ন প্রশান্তির কালে যখন বিশ্বজুড়ে রণদামামার হুঙ্কার তখন মানুষের অপমানে ক্ষুব্ধ করি লিখনের প্রান্তিকের শেষ দুটি কবিতা—অন্যতর ভাবনাবাহী।

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস'—ঈর্ষাকতর, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব কবলিত পৃথিবীর বিকৃতরূপে বিক্ষুব্ধ কবি চিত্তের যন্ত্রণা এখানে মূর্ত।

১.৩.৮ অষ্টম পর্ব

সেঁজুতি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি নিজের জীবনসন্ধ্যায় যেন নিজ হাতে জ্বেলেছেন সাঁজের বাতি। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে যেন জীবনের দিবাবসানের হিসেব মেলাতে চায় কবিরহৃদয়। যাবার মুখে, পরিচয়, জন্মদিন—সব কবিতাতেই বিদায়বেলার সুর লেগেছে। এই আত্মভাবনামূলক জীবনশেষের বোধে উজ্জ্বল সেঁজুতির কবিতাগুচ্ছ—যেখান পড়েছে অস্তগামী রবির বিদায় বেলার বিষণ্ন ছায়া।

'প্রহাসিনী' ভিন্ন স্বাদের কাব্যগ্রন্থ। "সেজুঁতি'র পরেই প্রকাশিত (১৯৩৯) এই কবিতাগুচ্ছ হাস্যরসাত্মক। কবির জবানিতে বলা হয়েছে—"আমার জীবনকক্ষে জানি না কি হেতু/মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু"

কবির শেষ বেলার গান—আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি বলেছেন—এর কবিতাগুলি "স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা"। শেষ বয়সে মানুষ স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চায়। ঘরের মাঝে যখন চেনামুখের মেলা সাঙ্গ হয়ে আসে, ঘনিয়ে আসে সাঁঝের বেলা—তখন স্মৃতিই মানুষের আশ্রয়। এই অতীত স্মৃতি স্বপ্নের আলোছায়ার মায়া ঘেরা 'আকাশপ্রদীপ' কাব্য। এ আকাশ কবির মনের আকাশ যেখানে সাঁঝবেলায় স্মৃতির নক্ষত্র খচিত।

স্মৃতিসুরভিত অসামান্য কয়েকটি কবিতায় গভীর অনুভবের বাণী উচ্চারিত। 'শ্যামা', 'কাঁচাআম', 'বধূ', 'সময়হারা' প্রতি কবিতাই স্মৃতি মাধুরী ঘেরা। অতীতের স্মৃতিস্বর্ণিমা আজ ধূসর জীবনের গোধূলিতে ফেলেছে ছায়ামাধুরী। এই বেদনা বিধূর অনুভবেই শেষ হয়েছে 'আকাশপ্রদীপ', তবে কবির স্থির প্রত্যয় মিলনদিনে সাক্ষী ছিল যারা—"আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা"। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে নতুন ধরনের কাব্য 'নবজাতকের' সূচনায় কবি বলেছেন—

> "আমার কাব্যে ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে।.... এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা
> হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মনভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য"

কবি জীবনের প্রৌঢ় ঋতুর এই নবজাত কবিতায় ধরা পড়েছে নতুন সমাজ চেতনা, ইতাহস চেতনা। দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব এ কাব্যের নামকরণের সার্থকতাকে প্রমাণ করে। কবি নিজের মনন কল্পনাকে বিস্তৃত করে বর্তমানযুগের নতুন বিষয়কে কাব্যের উপাদান করেছেন—এরোপ্লেন, রেডিও, রেলগাড়ি।

পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বর্তমান সভ্যতার আত্মক্ষয়ী ধ্বংসাত্মক রূপের নিষ্ঠুর ছবি। এই সভ্যতার ধ্বংসকামনা করে কবি নতুন জীবনের আশায় জাগ্রত থাকতে চান। বর্তমানের ধ্বংসকামনা ও নবসৃষ্টিতে বিশ্বাসই 'নবজাতকে'র কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে।

একই বছরে প্রকাশিত হয়—'সানাই' কাব্যগ্রন্থ। গীতিকাব্য হিসেবে 'সানাই' সম্ভবত এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কাব্যে ভালোবাসার রাগিনী যেন ধরা পড়েছে সানাই-এর সুরে। এর নামের মধ্যে যে মিলন দিনের প্রতীকদ্যোতনা তার মধ্যেই ধরা আছে এর ভাবকল্পনা। 'সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত'—কবির এই উচ্চারণের অনিবার্য স্বাক্ষর 'সানাই'।

এ কাব্যের অনেকগুলি কবিতা পরে সঙ্গীত রূপান্তরিত হয়েছে—অনেক গান থেকে আবার ছোটো কবিতা রচিত হয়েছে। বিশেষভাবে রোম্যান্টিক মন ও প্রেমানুভব এ কাব্যের কবিতায় প্রকাশিত।

দীর্ঘ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় স্মৃতিবেদনার যে মালা গাঁথা হয় মনের নিভৃতে, তারই সৌরভ যেন কবির মনে রচনা করে এক মানসী মায়া, যুগান্তরের প্রিয়াকে লোকান্তরের নির্বাসন থেকে হৃদয়ে অনুভব করেন তিনি।

"আজ এ মনের কোন সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া
দূরে উড়ে যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া
কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া"

এভাবেই সানাই কাব্যের গানের সুর লেখা কবিতাতে তাঁর বাসনা ও বেদনাকে অনুভব করতে পারি। প্রণয়স্মৃতির সঙ্গে এতখানি বেদনা এমনভাবে কবিকে আগে ঘিরে ধরেনি। সানাই সেই প্রেমবেদনার মধুরতম উচ্চারণ।

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কবি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে প্রকাশিত হল 'রোগশয্যায়'। নামকরণের মধ্যেই এর সুরটি ধরা পড়েছে। কালিম্পঙে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কবি ফিরে আসেন কলকাতায়। রোগ যন্ত্রণার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিতে যুক্ত হয়েছে আরোগ্য লাভের প্রাণশক্তির অনুভব। এজন্যই এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম 'আরোগ্য'। মাত্র দুমাসের ব্যবধানে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৪০-এর শেষে 'রোগশয্যায়' ও রোগমুক্তির পর ১৯৪১-এর প্রথমে 'আরোগ্য।'

'রোগশয্যায়' জীবন-মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির এক তত্ত্ব বা দর্শন যেন কবিচিত্তকে অধিকার করেছে। ফলে রোগজর্জর যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি নয়, নির্ভীক সহিষ্ণু মননশক্তির প্রকাশে কবিতাগুলি উদ্দীপ্ত। দেহ যন্ত্রণা যত তীব্র, যত সত্যই হোক—তা প্রাণেরই সঙ্গী। তাই কবির রচনায় মানুষের দুঃখবিজয়ী প্রাণসত্তার জয়গানই ধ্বনিত।

"অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান"

একই সঙ্গে ব্যক্তিগত দুঃখ ও রোগের প্রসঙ্গ কবিকে বৃহত্তর জনগণের বিচিত্র দুঃখবেদনার সহমর্মী করে তুলেছে। সর্বজনের দুঃখ যন্ত্রণা যেন নিজের রোগ যন্ত্রণার উর্ধে উঠে তাঁকে করে তুলেছে সর্বমানবের ব্যথাবেদনার অংশীদার। 'আরোগ্য'-র কবিতাগুলিতে 'রোগশয্যার' কবিতার সুর ধ্বনিত। তবে এখানে আরোগ্যোত্তর চিত্তে ধরা পড়েছে সত্যের অমৃতরূপ। তাই তাঁর আত্মসমাহিত প্রশান্ত চিত্তের নিবেদন—

"শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরনীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি"

মর্তধূলির তিলক মানুষের ভালোবাসার প্রতীক। তাই যাবার আগে ধূলার ধরণীর প্রীতস্নিগ্ধ দান সর্ব অঙ্গে ধারণ করতে চান কবি। মৃত্যুর পটভূমিকার অস্তিত্বের সত্যকে উপলব্ধি করে কবি জীবন ও সৃষ্টির অনিঃশেষ প্রবাহে মিলতে চান।

'জন্মদিনে' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (ইং-১৯৪১)। জন্মমৃত্যুর সন্ধিলগ্নে উপনীত হ'য়ে কবি রচনা করেন যে কাব্য তার নাম দিলেন 'জন্মদিনে'। আসন্ন মৃত্যুর পদসঞ্চারে তাঁর জীবন ভাবনা শান্ত-সমাহিত, প্রশান্ত।

"যে রহস্যসূত্রে এসেছিনু আশি বর্ষ আগে
চলে যাব কয় বর্ষ পরে'

মৃত্যুর করাল ছায়া নয় যেন তার অমৃত স্পর্শই কবি জীবনে অনুভব করতে চাইছেন। তাই জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের মুখোমুখি বসে তিনি সত্য সুন্দরের অমৃতময় মূর্তিকে উপলব্ধি করতে চান।

যাবার বেলায় নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতার বেদনাকেও কবি অনবদ্য রসরূপে প্রকাশ করেছেন। তাই বলেন—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"

তাই আগামী দিনের কোনো কবির জন্য তিনি কান পেতে আছেন—তাকেই জানান আহ্বান—

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের"

উদার কবিচিত্ত তাই আপন অসম্পূর্ণতার বেদনাকে লিপিব্ধ করেন 'জন্‌দিনে'র অসামান্য এই কবিতায়।

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী"

কিন্তু কবি জানেন সর্বমানবের সুখদুঃখের রূপকার হতে গেলে অন্তরের পরিচয়েই তাদের কাছে যেতে হ'বে।

"সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়"

কবিমানসের এই অন্তরতম প্রীতিময় জীবনবোধই তাঁর যাবার বেলাকে স্নিগ্ধসুষমায় ভরে দিয়েছে। 'জন্মদিনে' সেই আন্তরিক উচ্চারণ ধ্বনিত।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ—'শেষলেখা', তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে—ইং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর নামকরণ কবিকৃত নয়—সর্বশেষ রচনা বলেই এটি 'শেষলেখা' নামে আত্মপ্রকাশ করে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথঠাকুর জানিয়েছিলেন যে শেষ শয্যায় কবি এর অনেক কবিতাই মুখে মুখে বলেছিলেন—অন্য কেউ তা লিপিবদ্ধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই কাব্যের কবিতাগুলিতে মৃত্যু চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। মৃত্যু চেতনার ক্রমাভিব্যক্ত স্তর এক পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে শেষপর্যায়ের কাব্যে।' 'প্রান্তিক' থেকে 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' হ'য়ে জীবনমৃত্যুর স্বরূপ সম্ভবন্ধে কবির অনুভূতি চরমপর্বে 'শেষলেখা'য় এসে প্রকাশিত হ'য়েছে সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ সরল সংহত উচ্চারণে। মন্ত্রের মতো হ্রস্ব, কঠিন, তেজোগর্ভ এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিরূপে নন ভাস্বর হ'য়ে উঠেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি রূপে। এখানে তিনি দুঃসহ তেজে মৃত্যুকে পরাভূত করে আত্মস্বরূপের পরিচয় লাভ করেছেন। মৃত্যুর বিভীষিকা নয়, তার প্রশান্তরূপের উপলব্ধিই কবির চেতনাকে ঋদ্ধ করেছে। তাই তিনি বলেছেন—মৃত্যুর ছলনা ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রতারণা যে বুঝতে পারে—সে-ই শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করতে পারে। কবি এ-ও বুঝেছেন যে এ জগৎ স্বপ্ন নয় মায়া নয়। জীবনের অমৃতকে গ্রাস করার ক্ষমতা নেই মৃত্যুরূপী রাহুর। এই সত্যকে অন্তরে ধ্রুব বলে জেনেছেন বলেই এখনও পাখির গান তাঁর অন্তরে সুধাবর্ষণ করে, সত্যের অন্তিম প্রীতিরস জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। মৃত্যু যে সত্য নয়, ধ্রুবতারকার চিরজ্যোতিই অনির্বাণ এই সত্য উপলব্ধি করেই কবি বলেন—

"মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি"

তিনি জেনেছেন প্রকৃত দুঃখে নয়—'দুঃখের পরিহাসে ভরা' এ জীবন। তখনই দেখেছেন ভয়ের বিচিত্র ছবির মধ্যে "মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে"। তাই শান্তি পারাবারের উদ্দেশে তাঁর আসন্নযাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত।

'শেষলেখা' পর্বে যখন জীবনসীমায় অন্তরবির বর্ণমাধুরী দিব্য বিভায় বিচ্ছুরিত, যখন আঁধার নামছে জীবনবেলায় তখনও মৃত্যুর মধ্যে তার পূর্ণ প্রশান্তি—মৃত্যুর প্রসন্ন করপুটে নিজেকে অঞ্জলি দিয়ে কবি সার্থক সম্পূর্ণ হ'তে চান।

কৌশোরের দিন থেকে অন্তিম প্রহর পর্যন্ত সুদীর্ঘ কবিজীবনের যাত্রা পথে রচিত হয়েছে অনন্য কাব্য সম্ভার।

কবি কাহিনী, বনফুল থেকে যাত্রারম্ভভ করে কবি 'শেষলেখা' পর্যন্ত উচ্চারণ করেছেন তাঁরগ অনুভবঋদ্ধ প্রত্যয়দীপ্ত বাণী। রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণের চেষ্টা নয়, শুধু ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়াসী আমরা। অসীম যেমন সীমার বাঁধনে ধরা পড়ার নয়, রবীন্দ্র কাব্যাকাশের অসীম দ্যোতনা তেমনই সংকীর্ণ পরিধিতে বাঁধার নয়।

তাঁর বিশাল কাব্যসম্ভভারের কালানুক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এখানে দেওয়া হ'ল।

তাঁর "বহুকালের প্রেয়সী' ছেলেবেলাকার, বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী" কবিতাই যে তাঁর আজন্মসাধনার ধন, তাঁর জীবনসাধনা—তার ক্রমাভিব্যক্ত পরিচয় এখানে সূত্রাকারে দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

১.৪ রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের কাছে পরমবিস্ময়। তাঁর রোম্যান্টিক গীতিকবিতার মধ্যেই আছে সুরের ব্যঞ্জনা। তাঁর বিশাল ব্যপ্ত জীবনে বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভারে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্য ভুবন। এই বিচিত্র ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর রচিত গান।

জীবনস্মৃতির আত্মকথনে জেনেছি তাঁর পরিবারে অশৈশব সাংগীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তারই সার্থক প্রকাশ তাঁর সঙ্গীতে দেখেছি। সারা জীবনে নানা পর্বে, নানা অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, নিজে গান গেয়েছেন। নানা পর্যায় উপপর্যায়ে বিন্যস্ত তাঁর রচিত আড়াই হাজার গানের সম্ভভার পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য সঙ্গীতের পরম সমাদরের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবন গড়ে উঠেছে লৌকিক, বিদেশী ও মার্গসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গমে। অবশ্যই সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অনুভব মিলে তৈরি হ'ল রবীন্দ্রসঙ্গীত, যা এতদিনের প্রচলিত সঙ্গীতধারায় এক নতুন সংযোজন। গানের মধ্যেই কবি খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির ব্যঞ্জনা, যে মুক্তি উদার প্রকৃতিতে, আকাশে বাতাসে আলোয় ধূলায় ব্যপ্ত। তাই তিনি বলেছেন যে কথা জিনসটা মানুষের আরগ গান প্রকৃতির। কথা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, গান প্রয়োজনাতীতের আনন্দ। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখি কুমুদিনীকে তার দাদা বিপ্রদাস বলছে—

> "সংসারে ক্ষুদ্রকালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, চিরকালটা থাকে আড়ালে, গানে
> চিরকালটাই আসে সামনে ক্ষুদ্রকালটা যা. তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়"

রবীন্দ্রসঙ্গীত এই মানসমুক্তির গান। তাঁর গানের সংকলন গীতবিতানের পর্যায় ভাগ এই রকম—পূজা, স্বদেশ, প্রকৃতি প্রেম, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। প্রতিটি পর্যায় াবার বিভিন্ন উপপর্যায়ে বিভক্ত।

আবার প্রকৃতিগতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি ভাগ—মৌলিক ও ভাঙা গান। ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ যেসব গান নিজে বা অন্য কারুর কাছে শুনে সেগুলির সুর কাঠামো অনেকটাই রেখে তাতে বাণী বসিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকেই বলে ভাঙা গান। এরমধ্যে আছে প্রথমজীবনে শোনা বিলিতি গান, হিন্দী শাস্ত্রীয় গান এবং মধ্যবয়সে বাংলা গ্রাম্য গান। লোকসঙ্গীত ভেঙেই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্বদেশসঙ্গীত। বাউল গান, ভাটিয়ালী গান, সারী গানের সুরের প্রভাব রয়ে গেছে এরমধ্যে। আবার প্রথমজীবনে পাশ্চাত্য আইরিশ মেলোডির অনসুরণে গড়ে উঠেছিল গীতিনাট্যের গানের মালা।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানও বিশষভাবে উল্লেখ্য। কাব্যনাট্য বা কমেডি জাতীয় নাটক (রাজা ও রাণী, চিরচকুমার সভা) ছাড়া অপেরাধর্মী মায়ার খেলা বা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যগুলিতে সঙ্গীতের উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর গানের সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে ঘটেছে। রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা, অরূপরতন, অচলায়তনে অসামান্য ব্যঞ্জনায় গানগুলি মানসমুক্তির গান হ'য়ে ওঠে।

সাধারণভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার সঙ্গে নানা উপলক্ষে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে—আনন্দে, অনুষ্ঠানে, উৎসবে, শোকে, দুঃখে বেদনায়, বিরহে, স্মরণে রবীন্দ্রসঙ্গীত অপরিহার্য। তাঁর গানে স্বদেশচেতনার উদ্দীপনা আছে, আছে প্রকৃতির রূপবিভোরতার মুগ্ধতা, আছে প্রেমের মাধুরী, আছে পূজার নিবিড় নিবেদন। সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধন—যা রবীন্দ্রসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য—তা তাঁর গানের বাণীতেই সার্থকভাবে উচ্চারিত। তাই তিনিই বলতে পারেন—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাবো
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো নাগো
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো"

১.৫ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্র কাব্যের আদিপর্বের বৈশিষ্ট্য কী?
২। রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয়পর্বের অন্তর্গত কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
৩। 'সোনারতরী' কাব্যের কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার পরিচয় দিয়ে এই পর্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৪। 'চিতার' কাব্যের জীবনদেবতা বিষয়ক কবিতাগুলির তাৎপর্য নির্দেশ করুন।
৫। 'খেয়া' কাব্য থেকে শুরু হয়ে গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতাগুলির অধ্যাত্মভাবনার পরিচয় দিন।
৬। 'বলাকা' কাব্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।
৭। 'কবির শেষ রাগিণীর বীণ' পুরবী কাব্যে কিভাবে ধ্বনিত হ'য়েছে তার পরিচয় দিন।
৮। 'পুনশ্চ'কে রবীন্দ্রসাহিত্যে পালাবদলের কাব্য বলার কারণ কী?
৯। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।
১০। রবীন্দ্রকাব্য ধারায় মৃত্যুচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করুন।
১১। রবীন্দ্রকাব্য কালিদাসের প্রভাব প্রসঙ্গে 'কল্পনা' কাব্যের কয়েকটি কবিতার পরিচয় দিন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—১৩৯২।
২. রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়—প্রকাশকাল ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
৩. রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাস।
৪. পান্থজনের সখা—আবু সয়ীদ আইয়ুব (দে'জ)।
৫. কবি রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব বসু (দে'জ)—১৯৮০।
৬. রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়—শুদ্ধসত্ত্ব বসু।
৭. রবীন্দ্র কবিতালোক—জ্যোতির্ময় ঘোষ (দেজ পাবলিশিং)।
৮. রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা ঃ মানবিক প্রেম বনাম তাত্ত্বিকতা—মীনাক্ষী সিংহ (পুস্তক বিপনি)১৯৯৫।
৯. রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
১০. রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

যাবার বেলায় নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতার বেদনাকেও কবি অনবদ্য রসরূপে প্রকাশ করেছেন। তাই বলেন—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"

তাই আগামী দিনের কোনো কবির জন্য তিনি কান পেতে আছেন—তাকেই জানান আহ্বান—

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের"

উদার কবিচিত্ত তাই আপন অসম্পূর্ণতার বেদনাকে লিপিদ্ধ করেন 'জন্‌দিনে'র অসামান্য এই কবিতায়।

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী"

কিন্তু কবি জানেন সর্বমানবের সুখদুঃখের রূপকার হতে গেলে অন্তরের পরিচয়েই তাদের কাছে যেতে হ'বে।

"সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়"

কবিমানসের এই অন্তরতম প্রীতিময় জীবনবোধই তাঁর যাবার বেলাকে স্নিগ্ধসুষমায় ভরে দিয়েছে। 'জন্মদিনে' সেই আন্তরিক উচ্চারণ ধ্বনিত।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ—'শেষলেখা', তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে—ইং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর নামকরণ কবিকৃত নয়—সর্বশেষ রচনা বলেই এটি 'শেষলেখা' নামে আত্মপ্রকাশ করে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথঠাকুর জানিয়েছিলেন যে শেষ শয্যায় কবি এর অনেক কবিতাই মুখে মুখে বলেছিলেন—অন্য কেউ তা লিপিবদ্ধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই কাব্যের কবিতাগুলিতে মৃত্যু চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। মৃত্যু চেতনার ক্রমাভিব্যক্ত স্তর এক পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে শেষপর্যায়ের কাব্যে।' 'প্রান্তিক' থেকে 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' হ'য়ে জীবনমৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবির অনুভূতি চরমপর্বে 'শেষলেখা'য় এসে প্রকাশিত হ'য়েছে সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ সরল সংহত উচ্চারণে। মন্ত্রের মতো হ্রস্ব, কঠিন, তেজোগর্ভ এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিরূপে নন ভাস্বর হ'য়ে উঠেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি রূপে। এখানে তিনি দুঃসহ তেজে মৃত্যুকে পরাভূত করে আত্মস্বরূপের পরিচয় লাভ করেছেন। মৃত্যুর বিভীষিকা নয়, তার প্রশান্তরূপের উপলব্ধিই কবির চেতনাকে ঋদ্ধ করেছে। তাই তিনি বলেছেন—মৃত্যুর ছলনা ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রতারণা যে বুঝতে পারে—সে-ই শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করতে পারে। কবি এ-ও বুঝেছেন যে এ জগৎ স্বপ্ন নয় মায়া নয়। জীবনের অমৃতকে গ্রাস করার ক্ষমতা নেই মৃত্যুরূপী রাহুর। এই সত্যকে অন্তরে ধ্রুব বলে জেনেছেন বলেই এখনও পাখির গান তাঁর অন্তরে সুধাবর্ষণ করে, সত্যের অন্তিম প্রীতিরস জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। মৃত্যু যে সত্য নয়, ধ্রুবতারকার চিরজ্যোতিই অনির্বাণ এই সত্য উপলব্ধি করেই কবি বলেন—

"মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি"

তিনি জেনেছেন প্রকৃত দুঃখে নয়—'দুঃখের পরিহাসে ভরা' এ জীবন। তখনই দেখেছেন ভয়ের বিচিত্র ছবির মধ্যে "মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে"। তাই শান্তি পারাবারের উদ্দেশে তাঁর আসন্নযাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত।

'শেষলেখা' পর্বে যখন জীবনসীমায় অন্তরবির বর্ণমাধুরী দিব্য বিভায় বিচ্ছুরিত, যখন আঁধার নামছে জীবনবেলায় তখনও মৃত্যুর মধ্যে তার পূর্ণ প্রশান্তি—মৃত্যুর প্রসন্ন করপুটে নিজেকে অঞ্জলি দিয়ে কবি সার্থক সম্পূর্ণ হ'তে চান।

কৌশোরের দিন থেকে অন্তিম প্রহর পর্যন্ত সুদীর্ঘ কবিজীবনের যাত্রা পথে রচিত হয়েছে অনন্য কাব্য সম্ভার।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

কবি কাহিনী, বনফুল থেকে যাত্রারম্ভ করে কবি 'শেষলেখা' পর্যন্ত উচ্চারণ করেছেন তাঁরগ অনুভবঋদ্ধ প্রত্যয়দীপ্ত বাণী। রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণের চেষ্টা নয়, শুধু ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়াসী আমরা। অসীম যেমন সীমার বাঁধনে ধরা পড়ার নয়, রবীন্দ্র কাব্যাকাশের অসীম দ্যোতনা তেমনই সংকীর্ণ পরিধিতে বাঁধার নয়।

তাঁর বিশাল কাব্যসম্ভারের কালানুক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এখানে দেওয়া হ'ল।

তাঁর "বহুকালের প্রেয়সী' ছেলেবেলাকার, বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী" কবিতাই যে তাঁর আজন্মসাধনার ধন, তাঁর জীবনসাধনা—তার ক্রমাভিব্যক্ত পরিচয় এখানে সূত্রাকারে দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

১.৪ রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের কাছে পরমবিস্ময়। তাঁর রোম্যান্টিক গীতিকবিতার মধ্যেই আছে সুরের ব্যঞ্জনা। তাঁর বিশাল ব্যপ্ত জীবনে বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভারে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্য ভুবন। এই বিচিত্র ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর রচিত গান।

জীবনস্মৃতির আত্মকথনে জেনেছি তাঁর পরিবারে অশৈশব সাংগীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তারই সার্থক প্রকাশ তাঁর সঙ্গীতে দেখেছি। সারা জীবনে নানা পর্বে, নানা অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, নিজে গান গেয়েছেন। নানা পর্যায় উপপর্যায়ে বিন্যস্ত তাঁর রচিত আড়াই হাজার গানের সম্ভার পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য সঙ্গীতের পরম সমাদরের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবন গড়ে উঠেছে লৌকিক, বিদেশী ও মার্গসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গমে। অবশ্যই সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অনুভব মিলে তৈরি হ'ল রবীন্দ্রসঙ্গীত, যা এতদিনের প্রচলিত সঙ্গীতধারায় এক নতুন সংযোজন। গানের মধ্যেই কবি খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির ব্যঞ্জনা, যে মুক্তি উদার প্রকৃতিতে, আকাশে বাতাসে আলোয় ধূলায় ব্যপ্ত। তাই তিনি বলেছেন যে কথা জিনসটা মানুষের আরগ গান প্রকৃতির। কথা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, গান প্রয়োজনাতীতের আনন্দ। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখি কুমুদিনীকে তার দাদা বিপ্রদাস বলছে—

> "সংসারে ক্ষুদ্রকালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, চিরকালটা থাকে আড়ালে, গানে
> চিরকালটাই আসে সামনে ক্ষুদ্রকালটা যা. তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়"

রবীন্দ্রসঙ্গীত এই মানসমুক্তির গান। তাঁর গানের সংকলন গীতবিতানের পর্যায় ভাগ এই রকম—পূজা, স্বদেশ, প্রকৃতি প্রেম, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। প্রতিটি পর্যায় আবার বিভিন্ন উপপর্যায়ে বিভক্ত।

আবার প্রকৃতিগতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি ভাগ—মৌলিক ও ভাঙা গান। ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ যেসব গান নিজে বা অন্য কারুর কাছে শুনে সেগুলির সুর কাঠামো অনেকটাই রেখে তাতে বাণী বসিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকেই বলে ভাঙা গান। এরমধ্যে আছে প্রথমজীবনে শোনা বিলিতি গান, হিন্দী শাস্ত্রীয় গান এবং মধ্যবয়সে বাংলা গ্রাম্য গান। লোকসঙ্গীত ভেঙেই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্বদেশসঙ্গীত। বাউল গান, ভাটিয়ালী গান, সারী গানের সুরের প্রভাব রয়ে গেছে এরমধ্যে। আবার প্রথমজীবনে পাশ্চাত্য আইরিশ মেলোডির অনসুরণে গড়ে উঠেছিল গীতিনাট্যের গানের মালা।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানও বিশষভাবে উল্লেখ্য। কাব্যনাট্য বা কমেডি জাতীয় নাটক (রাজা ও রাণী, চিরচকুমার সভা) ছাড়া অপেরাধর্মী মায়ার খেলা বা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যগুলিতে সঙ্গীতের উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর গানের সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে ঘটেছে। রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা, অরূপরতন, অচলায়তনে অসামান্য ব্যঞ্জনায় গানগুলি মানসমুক্তির গান হ'য়ে ওঠে।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ২ □ রবীন্দ্রনাটক

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ পাঠ ও আলোচনা

২.২.১ প্রথম পর্ব

২.২.২ দ্বিতীয় পর্ব

২.২.৩ তৃতীয় পর্ব

২.২.৪ চতুর্থ পর্ব

২.২.৫ পঞ্চম পর্ব

২.২.৬ ষষ্ঠ পর্ব

২.২.৭ সপ্তম পর্ব

২.৩ অনুশীলনী

২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে নাট্যরচনার প্রচেষ্টা প্রধানত সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্যেই সীমিত ছিল। প্রথমযুগের নাট্যপ্রয়াস ছিল এই ধারার অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের আগে মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধুমিত্র, গিরিশিচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সমকালীন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়র নাটকে সেই পথ ধরেই বহিরঙ্গ ঘাত-প্রতিঘাত বহুল প্রকাশধর্মিতা দেখা গিয়েছিল। সংস্কৃত ঐতিহ্যের ভাবানুসরণ ও পশ্চাত্য নাটকের আদর্শের সমন্বয়ে বাংলা নাটক বিকাশের পথে এগোচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে উন্মোচিত করলেন অন্তর্জগৎ। তাঁর নিজস্ব দর্শন ও প্রত্যয়জাত বৈশিষ্ট্যে নাটক হ'য়ে উঠলো নতুনতর এক সাহিত্যমাধ্যম, যেখানে অনুভূতির গভীরতা ও ভাবের প্রাধান্য। এজন্যেই এডওয়ার্ড টমসনের মন্তব্যটি যথাযথ বলেই আমাদের মনে হয়—

> "His dramatic work is the vehicle of
> ideas, rather than the expression of action"

রবীন্দ্রনাটকে এই ভাবময়তারই প্রাধান্য, তাঁর কবিসত্তার অনির্বাণ আলোতে তাঁর নাটকগুলিও আলোকিত হ'য়ে ওঠে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান। শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠার কালে পারিবারিক নাট্যাভিনয় দেখার সুযোগ তাঁর হ'য়েছিল এবং অলক্ষ্যে সেই ধারা তাঁর মনে সঞ্চারিত হ'য়ে পরবর্তীকালে সার্থক প্রকাশগৌরবে অভিনন্দিত হ'য়েছিল।

রবীন্দ্রনাটক পর্ব থেকে পর্বান্তরে নবরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তবু সামগ্রিকভাবে তাঁর নাটকে এক গীতময়তা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়র উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে।

—"রবীন্দ্রমানস একান্তভাবে গীতধর্মী। এই গীত ধর্মী মানস যে কাব্যেই শুধু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়, ছোট গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে সর্বত্রই ইহার প্রকাশ দেখা যায়, নাটকেও তাহাই।"

২.২ পাঠ ও আলোচনা

২.২.১ প্রথম পর্ব

প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাটকে এই লীরিক্যাল বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা—এই পর্বের রচনা। তবে তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক—'রুদ্রচণ্ড'। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'রুদ্রচণ্ড' তারই নাট্যরূপ বলে অনুমিত।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও ১৮৮৮ তে প্রকাশিত 'মায়ার খেলা' অনেকটাই পাশ্চাত্য-অপেরাধর্মী নাট্যপ্রয়াস। কবির নিজের ভাষায় 'বাল্মীকি প্রতিভা' গানের সূত্রে নাট্যের মালা' এবং মায়ার খেলকা 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা।' ১৮৮২-তে প্রকাশিত 'কালমৃগয়া'-র অনেকখানি অংশ 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ এই গীতিনাটিকার বিষয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় দস্যুরত্নাকরের মানস উত্তরণের দিকটি প্রকাশিত। তার হৃদয়দ্বন্দ্ব সূক্ষ্ম ও ভাবময়। বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অসামান্য অভিনয়ের কারণেও নাটকটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছ। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবী সরস্বতীর ভূমিকায় ছিলে। বাল্মীকি প্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রয়ে গেছে।

সখীসমিতির অনুরোধে 'মায়ার খেলা' রচিত হয় এবং বেথুন কলেজে প্রথম অভিনীত হয়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য প্রয়াস যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ মৌলিক। এখানেই আমরা প্রথম একটি বিশিষ্ট নাটকীয় রসের আস্বাদন লাভ করি। টমসন সাহেবের মতে এটিই রবীন্দ্রনাথের "first important drama".

এই নাটিকার নায়ক একজন সন্ন্যাসী। তিতিন সমস্ত আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে নির্জন গুহায় সাধনরত। একদিন এক পিতৃমাতৃহীন সর্বজনঘৃণিত অসহায় বালিকার প্রতি মমতাবশত তিনি তাকে আপনার কাছে আশ্রয় দেন। সর্ববন্ধনরিক্ত এই সন্ন্যাসীকে ক্ষুদ্র বালিকা তার ভালবাসা দিয়ে সংসারের স্নেহবন্ধনের মধ্যে কিভাবে ফিরিয়ে আনলো—তাই নাটকের বিষয়। শেষপর্যন্ত কন্যাটিকে হারিয়ে সন্ন্যাসী বিশ্বচরাচরে তাকেই অনুভব করলেন, সীমা ও অসীম একাকার হ'য়ে গেল।

২.২.২ দ্বিতীয় পর্ব

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলি রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি ও রবীন্দ্রনাট্য ধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০) ও মালিনী (১৮৯৬) এই পর্বের প্রখ্যাত কাব্যনাট্যত্রয়ী। ভাবকল্পনার ধারায় এই তিনটি নাটক সমধর্মী তিনটি নাটকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আঙ্গিক রচনায় মিলেছে পাশ্চাত্য ধারা। গ্রীক ট্র্যাজেডি ও শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির প্রভাব তিনটি নাটকেই লক্ষ্য করা যায়।

'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জনে'র সমকালে রচিত কাব্য 'মানসী' (১৮৯০)। মানসীর নিষ্ফল কামনা কবিতাটিতে আদর্শায়িত প্রেমের সঙ্গে বস্তবের দ্বন্দ্ব জনিত বেদনার তীব্র মধুর প্রকাশ। প্রেমের এই সীমা-অসীম তত্ত্বই প্রধানত 'রাজা ও রাণী' নাটকে রূপ লাভ করেছে। ড. সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"হৃদয়ের ধনকে দেহে আঁকড়িয়া ধরিবার বাসনা,
সমগ্র মানবকে পাইতে চাহিবার দুঃসাহস
রাজা ও রাণীর ট্র্যাজেডি।"

এই নাটকটি ঐতিহাসিক ঘটনার কাঠামোয় একটি কল্পিত কাহিনী। রাজা বিক্রমদের ও রাণী সুমিত্রার যুগল প্রাধান্য নামকরণে প্রকাশিত। তাদের উভয়ের রাজা ও রাণী সত্তার সংঘর্ষ ও সংঘাতে দ্বন্দ্ব জর্জর ক্ষতবিক্ষত আত্মানুসন্ধান নাটকটির প্রতিপাদ্য।

এ নাটকে শেক্সপীরীয় প্রভাবের পূর্ণ পরিচয় পাই। 'জীবনস্মৃতি'র ভগ্নহৃদয় পর্বে নিজেই বলেছেন—শেক্সপীয়র ছিলেন তখনকার আদর্শ। পরবর্তীকালেও 'মালিনী' নাটকের ভূমিকাতে লিখেছেন—

"শেক্সপীয়র -এর নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। এর বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকে আমাদের মনকে অধিকার করেছে"

'রাজা ও রাণী' নাটকের প্রদান চরিত্রে প্রবৃত্তির প্রবল আলোড়ন শেক্সপীয়রকেই মনে করায়। বিক্রমদেব একটি অসামান্য নাটকীয় চরিত্র। ঈর্ষা ও আত্মদানে কিছুটা 'ওথেলো'র ও প্যাশনের তীব্রতায় অ্যান্টনীর (অ্যান্টনী এ্যন্ড ক্লিওপেট্রা) সঙ্গে তার সাদৃশ্য পাই। তার তীব্র আবেগপ্রবণ, প্রবৃত্তি পরায়ণ চিত্তদাহ শেক্সপীরীয় আবেগের আতিশয্যকে মনে করায়। প্রেম ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বিক্রম চরিত্র যথার্থই আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে দীর্ণ এক নাটকীয় চরিত্র। তবে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বোধের মহিমাও এ চরিত্রে প্রকাশিত। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে নাটকীয় দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে অনেক সময়ই গীতি ধর্মী আবেগ উচ্ছ্বসিত হওয়ায় নাটকটি মাঝে মাঝে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে।

পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। বহু আলোচিত ও জনপ্রিয় এই নাটক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমালোচক টমসন বলেছেন—

"Sacrifice is the greatest drama in Bengali literature"

এই নাটকের বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছিলেন—"বিসর্জন নাটকে বরাবর দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ।" তিনি দেখিয়েছেন প্রথা প্রেমকে বিনাশ করতে চাইলে প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই প্রথার অভ্যাস থেকে রঘুপতি চরিত্রে এসেছে প্রতাপের অহংকার। সেই প্রতাপ চূর্ণ হ'ল প্রেমের শক্তির কাছে—এটিই নাটকের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সব দ্বন্দ্বের অবসানে প্রেমের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পূর্ববর্তী 'রাজা ও রাণী'-তে আসক্তির বিরুদ্ধে প্রেমের জয় ঘোষিত—এ নাটকে প্রথার বিরুদ্ধে প্রেমের সংগ্রাম চিত্রিত, যেখানে শেষপর্যন্ত প্রেমই জয়ী হ'য়েছে।

ত্রিপুরা রাজপরিবারের প্রেক্ষিতে দেবী মন্দিরে জীব বলিদানের বিরুদ্ধে নাট্যকারের মানবতাবাদী মতাদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। রাজা গোবিন্দ মাণিক্য প্রেমের ধ্রুব আদর্শে অবিচল এক চরিত্র। রাজপুরোহিত রঘুপতি প্রথা ও আচার-সর্বস্ব ধর্ম আচরণের অন্ধ আনুগত্যে বিশ্বাসী। এই দু'জনের দ্বন্দ্ব সংকটের মাঝখানে জয়সিংহ যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়ক আবার দোলাচল আত্মসংকটের আবর্তে সে যেন শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির আদর্শ প্রতিভূ।

এই দু'টি পঞ্চাঙ্ক নাটকের পর রচিত হয় 'মালিনী' ক্ষুদ্র নাটিকা—যার মধ্যে নাট্যকার ট্রেভেলিয়ন খুঁজে পেয়েছিলেন গ্রীক নাটকের প্রতিরূপ—"সংযত, সংহত ও দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন"।

এ নাটকেও সনাতন প্রথা ও ধর্মের সঙ্গে নবধর্মের বিরোধ চিত্রিত। 'বিসর্জন' নাটকের বলিদান প্রথা বন্ধের সঙ্গে কোথাও যেন বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ব্রত জড়িত। আবার মালিনীতেও দেখেছি নবধর্মে এই অহিংসার তির্যক প্রতিফলন, এই নাটিকাতে—প্রধান তিনটি চরিত্র—ক্ষেমংকর, সুপ্রিয় ও মালিনী। মাত্র চারটি দৃশ্য সম্বলিত এ নাটিকাটি সত্যই সংহত ও সংযত—যা ক্ল্যাসিক গ্রীক নাট্য পদ্ধতিকে মনে করায়।

তিনটি নাটকই ট্র্যাজেডির সার্থক নিদর্শন। চরিত্র চিত্রণে ও রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দক্ষতা লক্ষণীয়।

২.২.৩ তৃতীয় পর্ব

পরবর্তী চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ও বিদায় অভিশাপ নাট্যরূপের আশ্রয়ে কাব্য। সমালোচক বলেন "ইহাদের ভাববস্তু একটা নাট্যরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলেও মূলত ইহারা নাট্য নহে।" এগুলি বিশেষ ধরনের শ্রুতিনাটক বা Reading drama-র সমপর্যায়ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র কাহিনী অংশের অন্তর্গত বিখ্যাত কয়েকটি কাব্য-নাট্য হ'ল—গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, লক্ষীর পরীক্ষা ও কর্ণকুন্তী সংবাদ।

এগুলির কাব্যমূল্য অসাধারণ, তবে এদের নাট্যগুণ ও বৈশিষ্ট্যও উল্লেখের দাবি রাখে। 'সতী' কাব্যনাট্য-তে সমাজ, ধর্ম ও চিরাচরিত সংস্কারের সঙ্গে বাৎসল্য রসের সংঘাতে নাটকীয়তা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। মিস ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকাওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ থেকে এর কাহিনী গৃহীত।

'নরকবাস' পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। রাজা সোমকের পিতৃধর্ম ক্ষাত্রধর্মের গর্বের নিকট আহত ও অবমানিত। তবে এ পর্যায়ে নাটকীয় শ্রেষ্ঠত্ব তার চরম সীমা স্পর্শ করেছে 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কাব্য নাট্য দুটিতে। মহাভারতের চরিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এ দু'টিতে অসামান্য নাট্যমুহূর্ত' রচনা করেছেন। গান্ধারী চরিত্রে নারীর স্বামীভক্তি ও পুত্রস্নেহের সঙ্গে শাশ্বত নিত্য মানবধর্মের সংঘাতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।

'কর্ণকুন্তী সংবাদ' এদু'টি চরিত্র দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জর ট্র্যাজিক মহিমাদীপ্ত। বিশেষত কর্ণ চরিত্রে মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষু সত্তার সঙ্গে মানবধর্মের সংঘাতে যে দোলাচলতা সৃষ্ট তা তাকে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নায়কের মহিমা দান করেছে। কুন্তী চরিত্রের অকথিত বেদনাকেও রবীন্দ্রনাথ মরমী দৃষ্টি প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোতে উদ্ভাসিত করেছেন।

উনিশশতকের রেনেসাঁসের দীপ্ত চেতনালোকে নবমানবতা-বাদের স্পর্শে চরিত্রগুলি নব রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে।

এদের মধ্যে 'লক্ষীর পরীক্ষা' কিছুটা স্বতন্ত্র। লঘু সুর তালে ছন্দে ঘেরা এই কাব্যনাট্যে অনাবিল হাসির স্রোত প্রবাহিত। তাই মধ্যে মানবমনের নিগূঢ় রহস্য আভাসিত।

২.২.৪ চতুর্থ পর্ব

পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্র নাট্য ধারায় কৌতুকস্নিগ্ধ সরসতার ছায়া পড়েছে। 'ব্যঙ্গ কৌতুক' ও হাস্যকৌতুক (১৯০৭), গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শেষরক্ষা (১৯২৮) ও তাসের দেশ (১৯৩০) এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

হাস্যকৌতুকের ভূমিকায় কবি বলেছেন—"এই ক্ষুদ্র কৌতুক নাট্যগুলি হেঁয়ালি নাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'-তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড (Charade) নামক একপ্রকার নাট্য খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়"।

এর সবকটি নাটকই অতি ক্ষুদ্রকায়। কৌতুকাবহ বিষয় ও সংলাপের মধ্য দিয়ে এগুলি অনাবিল হাসির রস সঞ্চার করে। 'রোগীর বন্ধু', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'গুরুবাক্য' প্রভৃতি ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি উল্লেখযোগ্য।

ব্যঙ্গ কৌতুকের অন্তর্গত দুটি নাট্য—'স্বর্গীয় প্রহসন' ও 'বশীকরণে'র মধ্যে শেষোক্তটি সাহিত্যবিচারে অতি উচ্চমানের।

'গোড়ায় গলদ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটক, প্রথম প্রহসন—সুতরাং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার্য। এর

কৌতুকের মূলে আছে ভ্রান্তিবিলাস—যাকে বলতে পারি 'Comedy of errors'। এটিকে প্রহসন বলা চলে না, পুরোপুরি রোম্যান্টিক কমেডি। নামের ভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে ঘটনাবর্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে চরিত্রের অন্তর্লোক উদঘাটিত হ'য়েছে এবং নির্ভেজাল কৌতুকস্নিগ্ধ নির্মল হাস্যরসে নাটকটি দীপ্ত উজ্জ্বল। অনেক পরে ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এর পরিমার্জিত অভিনয়োপযোগী রূপ দেন, সেটি 'শেষরক্ষা' নামে জনপ্রিয় ও পরিচিত।

চিরকুমার সভা প্রথমে উপন্যাসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরে এর নাম হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', কিন্তু শেষপর্যন্ত কবি উপন্যাসটির পরিমার্জিত নাট্যরূপ দেন—তখন এটি 'চিরকুমার সভা' নামেই পরিচিতি লাভ করে। 'ভারতী'র সম্পাদিকা ভাগিনেয়ী সরলাদেবীর অনুরোধে সামাজিক প্রহসন হিসাবে কবি এটি রচনা করেন। সেসময় বিবেকানন্দের আদর্শে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথ এই সংসার বীতস্পৃহ সন্ন্যাসের আদর্শকে মন থেকে মাতে পারেননি। সমসাময়িক কাব্য 'ক্ষণিকা'র কবিতাতেও লঘু কৌতুকের চালে বলেছেন—

"আমি হবো না তাপস, হবো না হবো না
যেমনি বলুন যিনি
আমি হবো না তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী"

অসামান্য রস মধুর সংলাপ, কৌতুকাবহ পরিস্থিতি ও অনবদ্য সঙ্গীত সহযোগে 'চিরকুমার সভা' বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' অন্য দু'টি প্রহসনের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের। তিনটি দৃশ্য সম্ভবলিত ক্ষুদ্র এই নাটিকা হাসি অশ্রুধারায় অনবদ্য প্রহসন। এর বিশুদ্ধ 'হিউমার' একে high comedy-তে উত্তীর্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ নাটকে কেদার চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বৈকুণ্ঠ চরিত্রে যে সকরুণ মাধুর্য ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায় তা' সাধারণ লঘু স্তরের প্রহসনে নয়, অতি উচ্চমানের কমেডিতেই সৃষ্টি সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের পুরোনো গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম—'একটা আষাঢ়ে গল্প'। বহুদিন পরে এই গল্পকেই কবি রূপান্তরিত করেন 'তাসের দেশ' নাটকে। আপাত ব্যঙ্গরসাত্মক এই নাটকে আছে এক অন্তর্লীন তত্ত্ব। আমাদের সমাজের জড় প্রাচীনপন্থী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাতে নূতন প্রাণের বন্যাধারা আনার কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ তাসের দেশের অচালয়তনে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র নিয়ে এল মুক্তির গান, অনিয়মের কূল ছাপানো আনন্দ হিল্লোল। নতুন প্রাণের প্রতীক সুভাষচন্দ্র বসুকে কবি এই নাটক উৎসর্গ করে প্রাণময় চাঞ্চল্যের জয়গান করলেন। এই নাটকটি অনেকাংশেই রূপক নাট্যকে স্পর্শ করেছে।

২.২.৫ পঞ্চম পর্ব

রবীন্দ্রনাট্য ধারায় রূপক-সাংকেতিক নাটক এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এগুলিকে সামগ্রিক ভাবে তত্ত্বনাটক বলা যুক্তিসঙ্গত। রবীন্দ্রমনোলোকের এক গভীর পরিচয় এই নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। সমালোচক টমসন যে রবীন্দ্রনাটক সমূহকে আইডিয়া বা ভাবের প্রকাশক বলেছেন, তা এজাতীয় নাটকগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্বনাট্যধারায় ক্রম পর্যায়ে এসেছে—শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১১), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), রথের রশি (১৯৩২), তাসের দেশ (১৯৩৩)।

বাংলা সাংকেতিক নাটকের পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশে অবশ্য রূপকের ব্যবহার দীর্ঘকালের। সাংকেতিক নাটকের সঙ্গে রূপকের নিবিড় যোগ থাকলেও দুটি ভিন্ন প্রকরণ। কিন্তু দুটিতেই প্রতীকের ব্যবহার এবং তত্ত্বের প্রাধান্য থাকায় অনেক সময় রূপক সাংকেতিক একই সঙ্গে উচ্চারিত ও আলোচিত হ'য়ে থাকে। পাশ্চাত্য আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই সাংকেতিক নাটকের জন্ম সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় নাটকে ভারতীয়

অধ্যাত্মদর্শনের অতীন্দ্রিয়বাদ মিলেছে। সীমার সঙ্গে অসীমর রূপের সঙ্গে অরূপের মিলন সাধনের মধ্যেই আছে লীলারহস্য প্রকাশের সংকেত। সেই লীলাপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষার অক্ষমতাই সংকেতের জন্ম দিয়েছে। অতীন্দ্রিয় রহস্যের প্রতীকী আভাসই সংকেতের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের অলোকচারী মানসে অরূপতত্ত্ব যখন প্রকাশের পথ খুঁজছে, তখনই সংকেতের মাধ্যমে তা' খুঁজে পেয়েছে। রবীন্দ্রজীবনে আলোকচারণার যুগে এই শ্রেণীর নাটকের আত্মপ্রকাশ।

এই শ্রেণীর প্রথম নাটক-শারদোৎসব (১৯০৮)। শরৎ ঋতুর আনন্দাৎসবের মধ্য দিয়ে প্রেমের দ্বারা প্রকৃতির অকৃপণ দানের ঋণশোধ করার কথা এ নাটকে আভাসিত।

বৌধ্ব আখ্যান 'কুশজাতক' থেকে গৃহীত কাহিনীকে নবরূপ দান করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন নাটক 'রাজা' যা পরে (বঙ্গাব্দ ১৩২৬) 'অরূপরতন' নামে সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত। গীতাঞ্জলির আলোকচারিতার যুগে রবীন্দ্রনাথের অরূপতত্ত্ববিষয়ক নাটক রাজার আত্মপ্রকাশ। রাজার মধ্যে দুটি তত্ত্ব—এক, অরূপের মধ্যেই রূপের সার নিহিত। দুই, দুর্গম পথ পেরিয়েই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া যায়।

'অচলায়তন' নাটকে প্রথাগত আচার সর্বস্বতা ও সংস্কারের বিরুধ্বে রবীন্দ্রমানসের প্রতিবাদ ধ্বনিত। মহাপঞ্চক যে অচলায়তন গড়ে তুলেছে সত্যবোধের আঘাতে তার প্রাচীর খসে পড়ে। আচারের মরুবালুরাশিতে ঢাকা পড়া অচলায়তনে গানের ঝর্ণাধারা ভেসে আসে।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাট্যধারার শ্রেষ্ঠতম ও জনপ্রিয়তম নাটক—ডাকঘর (১৯১২)। নিখিল মানবাত্মার বন্ধনমুক্তির সংকেত এ নাটকে দ্যোতিত। এখানে বালক অমলের আসন্ন মৃত্যুছায়ার প্রেক্ষিতে প্রতীক ও সংকেত আভাসের মাধ্যমে মানবাত্মার মুক্তির বাণী ঘোষিত। পার্থিব জীবন শত নিষেধের বেড়াজালে বন্দী করে রাখে মানবাত্মাকে, যার থেকে মুক্তি মেলে মৃত্যুতে। তাই ঈশ্বরের অমৃতবার্তা। এই অনুভবকে 'ডাকঘর' নাটকে রাজার চিঠির প্রতীকে বোঝানো হ'য়েছে। এ নাটকে অমলের ঘুমিয়ে পড়াকে অনেকে মৃত্যু বলতে চান। প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার ইহজীবন অতিক্রম করে আলোকতীর্থে উত্তরণের সাংকেতিক কাহিনীই 'ডাকঘর' নাটক।

'বলাকা' কাব্যের যুগে 'ফাল্গুনী' রূপক নাটকের সৃষ্টি। কবি দেখাতে চান যে মানবজীবন ও প্রকৃতিতে গতিময়তাই প্রাণস্বরূপ। প্রাণশক্তি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারবার নিজেকে নবরূপে আবিষ্কার করছে।

যান্ত্রিকতার বন্ধন থেকে মুক্তির ইশারা ধ্বনিত হ'য়েছে 'মুক্তধারা' নাটকে। যুবরাজ অভিজিৎ প্রাণ দিয়ে যন্ত্রকে ভেঙে ফেলেছে, মুক্তধারাকে করেছে মুক্ত।

'রক্তকরবী' আর একটি বহু আলোচিত নাট্য নাম। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে রচিত এই নাটকে পাশ্চাত্য যান্ত্রিকতা জড়বাদ ও বিজ্ঞানশক্তির অপপ্রয়োগ মানবজীবনে কেমন করে অকল্যাণ বয়ে আনে, রবীন্দ্রনাথ তাই দেখাতে চেয়েছেন।

এর প্রধান চরিত্র 'নন্দিনী' একটি প্রতীকী চরিত্র। তার ভূষণ রক্তকরবী, যা প্রাণের প্রতীক, তার মনের মানুষ-রঞ্জন, যে মনকে রাঙায়। এভাবেই যক্ষপুরীর প্রাচীরে কোন ফাঁকে আসে প্রাণের হাওয়া, কাঁপিয়ে দেয় মকররাজার যক্ষপুরীর জালকে। রক্তকরবী মুক্ত প্রাণের মুক্তির গান।

'কালের যাত্রা'র মধ্যে সংকলিত দুটি রচনা—'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'। 'রথের রশি' সম্পর্কে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন—"আধুনিক গণসচেতন ভারতীয় মানসের ম্যানিফেস্টো"। সমাজে উপেক্ষিত মানুষের অধিকার বঞ্চিত শূদ্রের উত্থান এ নাটকে দেখানো হ'য়েছে। এ নাটিকার পূর্ব নাম ছিল 'রথযাত্রা'। পরিবর্তিত 'রথের রশি' নামকরণে এরগ অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা অধিকতর দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রসাংকেতিক নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বারবার এসেছে। এ প্রসঙ্গে ইয়েটস্, সিঞ্জ, মেটারলিংক হাউপ্ট ম্যানের নাম মনে পড়ে। এসব প্রভাব ও আত্মীকরণ অতিরিক্ত এক অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র তত্ত্ব নাটকে পাই যা তাঁর নিজস্ব দর্শন ও প্রত্যয়জাত। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভাবের প্রাধান্য, অনুভূতির গভীরতা তাঁকে নিয়ে গেছে অতীন্দ্রিয়

লোকে যা আভাসে, সংকেতে প্রকাশ করেছে জীবনের সত্য। তাঁর সাংকেতিক নাটক তাই মূলত ভাবের বাহন, তাদের আবেদন বোধের কাছে।

ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের ভিত্তিতে যে রবীন্দ্রমানসের অধিষ্ঠান তার প্রকাশ পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের চেয়ে স্বভাবতই ভিন্নতর। কিশোর কবির যে দীক্ষা হিমলায়ের কোলে উপনিষদের দর্শনের আলোয় উজ্জীবিত হয়েছিল—তাঁর সমগ্র জীবন ছিল তারই সাধনা। সেই অধ্যাত্মচেতনার ইঙ্গিত প্রথম ধরা দিল ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'খেয়া' কাব্যে। কবি যেন রূপের জগৎ থেকে অরূপলোকে যাত্রা করলেন 'খেয়া' কাব্যের মাধ্যমে। তাঁর মানসসংকট ও বেদনার অভিঘাতে কবি অন্তর্লোকে মগ্ন হলেন। তখন থেকেই শুরু হল মনে মনে অসীম অরূপলোকে মানসাভিসার। তারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ 'গীতাঞ্জলি'র কাল (১৯১০-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

'খেয়া' কাব্যে "ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখ রাতের রাজা" বলে যাকে আবাহন করেন, 'গীতালি' কাব্যে তাঁকে উদ্দেশ করেই গানের মালা গাঁথেন রবীন্দ্রনাথ—

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো-"

আবার এই ইন্দ্রিয়াতীত অন্তরতমকে অনুভব করেছেন 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালায়—

> "মানুষের একটি অন্তরতম ইন্দ্রিয় আছে। চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্য একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।"

তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক রাজার মধ্যে এই ইন্দ্রিয়াতীত প্রাপ্তির কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

"আমার মনে হচ্ছে, যা পাবার জিনিস, তাকে হাতে পাবার জো নেই। যা সকলের চেয়ে বড় পাওয়া তা' ছুঁয়ে পাওয়া নয়"—এই অধরা মাধুরীর উপলব্ধিই সংকেতের মাধ্যমে প্রতিভাত। রূপের জগৎ থেকে অরূপলোকে রবীন্দ্রনাথের মানস পরিক্রমার প্রকাশ সাংকেতিক নাট্যগুচ্ছে। সেই সময় থেকেই কবি খুঁজে ফিরেছেন রূপাতীত, সীমাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত এক সত্তাকে। রূপকে রূপান্তরে প্রকাশ করা রূপক নাট্যের বৈশিষ্ট্য, আর অরূপকে রূপের মধ্যে ধরার প্রয়াস সংকেতের বৈশিষ্ট্য। বর্ণনায় অবর্ণনীয় এই ভাবই সাংকেতিকতার বৈশিষ্ট্য যা দৃশ্যত প্রতীকে আভাসিত হয়েও অধরা থেকেই যায়। এই সাংকেতিক রহস্যময়তার অতীন্দ্রিয় প্রকাশে তাঁর নাটকগুলি বিশিষ্ট ভাববাহী হ'য়ে উটেছে। তাঁর প্রথম তত্ত্বাশ্রয়ী নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে—

"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।"

—রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক সীমার সঙ্গে অসীমের সেই প্রেমমুক্তির গান।

২.২.৬ ষষ্ঠ পর্ব

পরবর্তী পর্যায়ের নাটকের মধ্যে আছে—গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), শোধবোধ (১৯২৬), পরিত্রাণ (১৯২৯), তপতী (১৯২৯), কালের যাত্রা (১৯৩২), চণ্ডালিকা (১৯৩৩) ও বাঁশরি (১৯৩৩)।

এর আগে চিরকুমার সভার অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে কবি তাঁর আরো কয়েকটি গল্প ও নাটককে নতুনভাবে নাট্যরূপ দিতে আগ্রহী হ'লেন। তারই ফলস্বরূপ দেখা গেল পূর্ব প্রকাশিত 'কর্মফল' নাটকের রূপান্তরিত নাট্যরূপ 'শোধবোধ' এবং 'শেষের রাত্রি' গল্পের নবনাট্যরূপ 'গৃহপ্রবেশ'।

'শোধবোধ' একটি সামাজিক নাটিকা। নগরনির্ভর উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বাস্তব চিত্রায়ণ এখানে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে ও তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংকটে কাহিনী পরিণতির দিকে পৌঁছে যায়। তবে এ নাটকে মহত্তর কোনো জীবনবোধ বা দার্শনিক তত্ত্বের অবরতারণা নেই, বরং নাগরিক জীবনের বাস্তব চিত্রকে উপযুক্ত সংলাপের সাহায্যে একটি মিলনান্ত কাহিনীতে পৌঁছে দেওয়া হ'য়েছে।

তুলনায় 'গৃহপ্রবেশ' নাট্যগুণ বর্জিত। গল্প হিসাবে 'শেষের রাত্রি'তে যে করুণ মাধুরী ছিল তার লীরিক গুঞ্জন ও বিষাদ বেদনা পাঠকের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। কিন্তু এতে নাটকীয়তার অবকাশ কম। মৃত্যুপথযাত্রী বেদনাম্লান প্রেমবঞ্চিত যতীনের দুঃখের ভার যেন পাঠকচিত্তে পাষাণ ভার হ'য়ে থাকে। কেবল মাসীর অন্তর্লীন হাহাকার ও হিমির গানের সুর গীতি মূর্চ্ছনায় নাট্য পরিবেশকে ঘিরে থাকে। ফলে দর্শক চিত্তে কোনো নাটকীয় আলোড়ন সাড়া জাগায় না। ছোটগল্পের করুণ মাধুরীই নাটকটিকে ঘিরে থাকে।

এই দু'টি নাট্যরচনার পর পুরোণো নাটকের নব নির্মিতিতে মন দেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বে রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রায় কুড়ি বছর পরে ১৯২৯ সালে নবরূপে 'পরিত্রাণ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৯ সালে রচিত 'রাজা ও রাণী' নাটকটিও 'তপতী' নাম নিয়ে পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালেই। গল্পবস্তু অভিন্ন হলেও 'তপতী' 'রাজা ও রাণী'র থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ও নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাজা ও রাণীর গঠন শৈথিল্য, অকারণ শাখায়িত বিস্তারকে সংহত ও সংযত করে 'তপতী' রচিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছিলেন—

> "অনেকদিন ধরে 'রাজা ও রাণী'র ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।....এটিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে এক অভিনয় যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম।"
>
> এই ইচ্ছা থেকেই নাটকটি আগাগোড়া পুনর্লিখিত হয়েছিল।

কালের যাত্রা (রথের রশি ও কবির দীক্ষা) নিয়ে আগেই আলোচনা হ'য়েছে তত্ত্বনাটক ধারায়। প্রায় সমকালে রচিত 'চণ্ডালিকা' (১৯৩০) নাটকেও একটি বিশেষ ভাব ও তত্ত্বকে কবি রূপ দিতে চেয়েছেন। মানবিকতার উষ্ম আলোকে রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনার বিশিষ্ট বোধ এখানে সঞ্চারিত।

রবীন্দ্রনাট্য ধারায় 'বাঁশরি' এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। নাগরিক চেতনাঋদ্ধ এই সামাজিক নাটক তার সংলাপ ও শাণিত বাক্যে মাঝে মাঝেই 'শেষের কবিতা' কে মনে করায়। তবে নাটক হিসাবে 'বাঁশরি' কিছুটা দুর্বল। পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক রহস্য জটিলতা অনেক সময়ই প্রত্যাশিত তীব্রতা লাভ করেনা, ফলে নাটকীয়তা তেমতন দানা বাঁধে না। তবে বাঁশরিতে যে প্রেমতত্ত্ব আরোপিত তা' অকেটাই 'শেষের কবিা'র মুক্তি-বন্ধন তত্ত্বকে মনে করায়। নায়ক সোমশংকর বাঁশরিকে ভালোবেসেও বিয়ে করে সুষমাকে। কিন্তু বাঁশরির হৃদয়ে তার চির অধিষ্ঠান। প্রাত্যহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রেমকে অসীমে মুক্তিদানের তত্ত্বই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

২.২.৭ সপ্তম পর্ব

প্রচলিত রীতি আশ্রয়ী নাটক হিসাবে 'বাঁশরি'ই শেষতম বলা যেতে পারে। এর পর রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা সবই গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য। এই নতুন বর্গ (Genre) বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই অবদান। এই পর্যায়ে বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ থেকে ১৩৪৩ (ইং ১৯২৬-৩৬) পর্যন্ত বিস্তৃত দশবছরে লেখা হয়—

শেষবর্ষণ, বসন্ত, সুন্দর, নটীর পূজা (১৯২৬), নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (১৯২৭), নবীন (১৯৩০), শাপমোচন (১৯৩১), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৫) ও পরিশোধ (১৯৩৬)।

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে বলেছিলেন—"বাক্যের সৃষ্টির ওপর আমার সংশয় জন্মে গেছে"—তাই বাক্য রচনার প্রয়াস থামিয়ে মেতে উঠেছিলেন ছবি আঁকার বিমূর্ত শিল্পকলায়। নাটকেও তাই কেবল সংলাপ ব্যবহার না করে তাকে মুক্তি দিয়েছেন গানের বন্যাধারায়। তিনি বলেছিলেন—"গান জীবনকে সুন্দর করে তুলবার একটা প্রধান উপাদান"। সত্যিই তাঁর এই অভিনব নাট্যপ্রয়াস গানের ঝরণাধারায় সঞ্চিত। আবার এদের মধ্যে অধিকাংশই ঋতুনাটক হওয়াতে গান সেখানে আলাদা ভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। শেষবর্ষণ, নাটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, নবীন প্রভৃতি নাট্যে গান এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর 'নটরাজ' ভাবনা বিশেষ তাৎপর্যবাহী। নটরাজের নৃত্যরূপকে তিনি দেখেছেন মহাকালের বিরাট নৃত্যচ্ছন্দ হিসেবে। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় একাত্মতা যেন বিশ্ববীণার ছন্দে অবিরাম স্পন্দিত হ'য়ে চলেছে। তাঁর নিজের উক্তির মধ্যে দিয়েই এই প্রকৃতি তন্ময়তা সার্থক প্রকাশিত।

—"হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন সার্থক হয়" 'শাপমোচন' গদ্য ছন্দে রচিত কথিকা—বৌদ্ধ আখ্যায়িকা কুশজাতক থেকে সংগৃহীত। এই আখ্যানই 'রাজা' ও 'অরূপরতন' নাটকের উৎস। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের নৃত্যগীতময় নূতন রূপান্তর 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য নাট্য। 'পরিশোধ' কথা ও কাহিনীর একটি কবিতার নাট্যরূপ, যা পরে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যরূপে প্রকাশিত।

এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা—নটীর পূজা। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবির শ্রদ্ধার মধুর প্রকাশ এই নাট্য। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব দিনটিকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাবর্ত সেখানে শ্রীমতীর তনুত্যাগ এর প্রধান বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত নাট্যধারায় নবনব প্রয়োগ পরীক্ষা করে গেছেন। সামাজিক, ঐতিহাসিক্য, রোম্যান্টিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, রূপকাশ্রয়ী, সাংকেতিক—বিভিন্ন বিষয় য়ে তাঁর নাট্য-কাহিনী রচিত। আবার কাব্য নাট্য ও গদ্য নাট্য দু'য়েরই শিল্পিত প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখেছি। দেখেছি প্রহসন বা কমেডি রচনায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা, দেখেছি ট্র্যাজিক রস সংবেদনায় তাঁর নিবিড় চরিতার্থতা। এমন সামগ্রিক প্রয়াস সত্যই সুদুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের বহুকোণিক হীরকখণ্ড সদৃশ প্রতিভার পক্ষেই এমন বিচিত্র ও সর্বত্র প্রসারী শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছিল।

২.৩ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যসমূহ আলোচনা করুন।

২। "শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির আলোকে রবীন্দ্রনাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাবের পরিচয় দিন।

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে অন্তত একটি প্রহসনের পূর্ণ পরিচয় দিন।

৪। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তাঁর এ জাতীয় নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫। রবীন্দ্রনাটকে বৌদ্ধপ্রভাব ও প্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৬। 'ডাকঘর গদ্যে লীরিক' এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৭। 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৮। 'বিসর্জন' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৯। সাংকেতিক নাটকে গানের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করুন।

১০। রবীন্দ্রনাথকে 'রাজা' ও 'ঠাকুরদা' চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী

২. রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা—অশোক সেন

৩. কালের মাত্রা ঃ রবীন্দ্রনাটক—শঙ্খ ঘোষ

৪. বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ

৫. মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ—পুলিন দাস

৬. কবির অভিনয়—অবন্তীকুমার সান্যাল, ১৯৯৬ (রবীন্দ্রভারতী)

৭. রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী

৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) ১৯৯৮-সুকুমার সেন

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৩ □ রবীন্দ্র উপন্যাস

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)
৩.৩ রাজর্ষি (১৮৮৭)
৩.৪ চোখের বালি (১৯০২)
৩.৫ নৌকাডুবি (১৯০৫)
৩.৬ গোরা (১৯১০)
৩.৭ চতুরঙ্গ (১৯১৬)
৩.৮ ঘরে বাইরে (১৯১৬)
৩.৯ যোগাযোগ (১৯২৯)
৩.১০ শেষের কবিতা (১৯২৯)
৩.১১ দুইবোন (১৯৩০)
৩.১২ মালঞ্চ (১৯৩৩)
৩.১৩ চার অধ্যায় (১৯৩৪)
৩.১৪ অনুশীলনী
৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের সূচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমের স্থান ও মহিমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার নিয়েই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভাবনার সূত্রপাত। সেই সময় ঐতিহাসিক ও সামাজিক—দুধরনের উপন্যাসরচনতেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান শীর্ষে। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন। উপন্যাস রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্রভেদী অবস্থান সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং প্রথম দুটি উপন্যাস রচনাকালে হয়তো আপন অগোচরেই বঙ্কিমপ্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনার প্রয়াস হিসাবে করুণাকে মেনে নিলেও তাকে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কোনো গুরুত্ব দিতে চাননি। তাই বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ও রাজর্ষিকেই (১৮৮৭) তাঁর প্রথম পর্বের যুগল উপন্যাস বলে স্বীকার করতে হয়। ইতিহাস-আশ্রিত এই দুই উপন্যাসের মধ্যেই অলক্ষ্যে ছায়া ফেলে গেছে বঙ্কিমীপ্রভাব। ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে বিধৃত এই দুই উপন্যাসেই বঙ্কিমী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ অনুসৃত হ'য়েছে, যদিও তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ভাবনা ও ভঙ্গির চকিত কিরণ চোখে পড়ে। তারই অনিবার্য ফসল রাজর্ষির

ষোলো বছর পরে লোখা 'চোখের বালি' উপন্যাস যার মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা গেল এবং বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা ঘটালো চিত্ত মুক্তি। এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ধারায় উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন, বঙ্কিমী প্রভাবের নির্মোক ভেদ করে স্বকীয় স্বরূপ ও মহিমায় প্রোজ্জ্বল হলেন ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর তেরোটি (করুণা সহ) উপন্যাসের কালানুক্রমিক সূচি ঃ-

১। করুণা (১৮৭৭-৭৮)

২। বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)

৩। রাজর্ষি (১৮৮৭)

৪। চোখের বালি (১৯০২)

৫। নৌকাডুবি (১৯০৬)

৬। গোরা (১৯১০)

৭। চতুরঙ্গ (১৯১৬)

৮। ঘরে বাইরে (১৯১৬)

৯। যোগাযোগ (১৯২৯)

১০। শেষের কবিতা (১৯২৯)

১১। দুই বোন (১৯৩৩)

১২। মালঞ্চ (১৯৩৩)

১৩। চার অধ্যায় (১৯৩৪)

এই তালিকায় দৃষ্টি দিলে এটা স্পষ্ট হ'বে যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মাঝেমাঝেই সাময়িক বিরতি দিয়েছেন। অথচ কাব্য, কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ রচনায় একটি ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় ছিল।

রাজর্ষির ১৬ বছর পরে 'চোখের ব্যালির' প্রকাশ। এই দীর্ঘ সময় সম্ভবত ছিল তাঁর মানস প্রস্তুতির কাল বঙ্কিমী ধারা থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে আপন পথে খুঁজে নিতে তিনি এই সময়টুকু নিয়েছিলেন। তাই রাজর্ষির পর 'চোখের বালি' এক নতুন ধারার সৃষ্টি—রবীন্দ্র সৃষ্টিতে এবং বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও। রোমান্স ধর্মী, ইতহাসাশ্রয়ী কাহিনীর ছত্রছায়া থেকে সমাজবাস্তবতার কঠিন পথে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পরিক্রমা শুরু হলো, বাংলাসাহিত্যও আধুনিক উপন্যাসের ধারার সঙ্গে পরিচিত হলো। উপন্যাসের চলার পথে আবারও সাময়িক বিরতি এসেছিল একই বছরে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' রচনার পর। ১৯১৬-তে যুগল উপন্যাস প্রকাশ হবার পর দীর্ঘ বিরতির পর আবার ১৩ বছরের নীরবতার শেষে ১৯২৯-তে প্রকাশিত' হল 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা'। শেষ উপন্যাস 'চারঅধ্যায়' প্রকাশ পেলো ১৯৩৪-এ। এবং এখানেই থামলো রবীন্দ্রউপন্যাসের যাত্রা। আশ্চর্য এই যে ১৯৪১-এ মৃত্যুর অব্যবহিত আগে পর্যন্ত তাঁর কবিতা রচনার ধারা ছিল অব্যাহত। প্রবন্ধও রচিত হ'য়েছিল ১৯৪১-তে। দীর্ঘ গল্প হিসাবে তিনসঙ্গীর তিনটি বিখ্যাত গল্প শেষ বছরেই রচিত হ'য়েছিল, কিন্তু উপন্যস রচনার ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণযতি টেনে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ১৫ বছর বয়সে। শেষ প্রবন্ধ লিখেছেন আশি বছরেও। কবিতা তো তাঁর 'চিরকালের প্রেয়সী'—শৈশব থেকে অস্তমিত যৌবন বেলা পেরিয়ে প্রাহ্ন প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্ধক্যেও ছিল তাঁর নবীন কাব্য-সৃষ্টির আন্তর প্রেরণা, কিন্তু দীর্ঘ মাপের উপন্যাস রচনায় তিনি শেষপর্যন্ত কোনো আগ্রহ বোধ করেননি, যদিও বাংলা উপন্যাসকে আধুনিক যুগচেতনার সিঞ্চিত করে তিনিই প্রথম তাকে যুগোপযোগী মনস্তাত্ত্বিক করায় সার্থক হ'য়েছিলেন।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রীতি প্রয়োগ করেছিলেন। তবে তাঁর প্রযুক্ত এই রীতি ছিল সরাসরি, কিংবা নাটকীয় রীতির সঙ্গে যুক্ত। কখনো বা অলৌকিকতার সাহায্যেও এগিয়েছেন, ফলে মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ অনেকাংশেই সরলীকৃত হ'য়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি ছিল অন্যতর। বিশিষ্ট সমালোচক ড. ক্ষেত্রগুপ্তের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে।

“রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি থেকে প্রত্যক্ষ অ্যানলিটিক রীতির পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হ'ল ঘটনার সুর চড়াননি, বাইরে উত্তেজনাকে তীব্র করে তোলেন নি। প্রতিদিনের ছোটখাট ঘটনার একেবারে মামুলি প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে চিত্তলোকের বৃহৎ আলোড়ন ও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।”

ফলে বঙ্কিমের উপন্যাস যেখানে অনেকটাই নাটকের মত চমকপ্রদ ও উত্তেজক—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সেখানে অনুগ্র, অনাটকীয় এবং নাট্য আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাধীন রীতির। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কালের মধ্যে বাংলার সামাজিক যে বিবর্তন ঘটেছিল, তা-ই তাঁদের রচনার রীতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে—উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রতিষ্ঠা ছিল না। এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ রবীন্দ্রনাথের মনোদর্পণে যথার্থ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় সমারোহের অবসান ঘটলো এবং প্রাত্যহিক জীবনের সমাজ বাস্তবতা উপন্যাসে নিজস্ব জায়গা খুঁজে পেলো। ফলে বঙ্কিমযুগের রোমান্স অনেকটাই স্তিমিত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হ'ল। রবীন্দ্র মানস রোম্যান্টিক হ'য়েও একান্তভাবেই অন্তর্মুখী, ফলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসে তীব্র গভীর হ'য়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ বাস্তব ও বিশ্বাস্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব সমস্যা, বিরোধ-মিলন, কর্মপ্রবাহ একান্ত বাস্তবনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্র উপন্যাসে উপস্থাপিত। রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ উপন্যাসেই তৎকালীন পরিবার জীবনের ছবি আছে। আবার সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনও সেখানে অনিবার্য ছায়া ফেলে গেছে। তিনি নিজে বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দেশের রাজনীতি প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং তার প্রকাশ তাঁর উপন্যাসগুলিতে অনেক সময়ই দেখা গেছে। তবে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা প্রায়ই প্রথাসিদ্ধ পথে না গিয়ে নিজস্ব এক রূপ নিয়েছে। এরই ফলস্বরূপ ‘বউঠাকুরানীর হাট’ বা ‘রাজর্ষি’র মত প্রথম যুগের উপন্যাস ছাড়াও পরবর্তী ‘গোরা’, ‘ঘরে-বাইরে’ বা ‘চারঅধ্যায়ে’ তাঁর নিজস্ব প্রত্যয়দীপ্ত জাতীয়তাবোধ, স্বাদেশিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটকের মতে তাঁর উপন্যাসকেও অনেকে তত্ত্বের বাহক বলতে চান। একথা সত্য যে তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে, হয়তো কিছুটা সচেতনভাবেই, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁর উপন্যাসে জীবনের রহস্যজটিল গভীরতা ও বাস্তবদৃষ্টির পরিচয়ই প্রকাশিত। বাংলা উপন্যাসে যথার্থ আধুনিকতা, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই প্রথম এলো। শরৎচন্দ্রের উক্তিতে এর পরিচয় মিলবে।

> “তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়—নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।”

করুণা ঃ (১৮৭৭-৭৮) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস ‘করুণা’। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে রচিত ছোট আকারের এই উপন্যসটিকে রবীন্দ্রনাথ নিজে পূর্ণ মর্যাদা দিতে চাননি বলেই এটি রচনাবলীতে গ্রন্থিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের

লেখা প্রথম উপন্যাস বলেই সাহিত্যের ইতিহাসে এর আলোচনা হয়ে থাকে—না হলে এর কোনো মূল্য নেই। কাহিনীর সূত্রে অবশ্য ক্ষীণভাবে 'চোখের বালি'-র কথা মনে আসে। একারণে অনেকে বলেন 'করুণা'-র মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল 'চোখের বালি'-র বীজ যা পঁচিশ বছর পরে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ উপন্যাসের অন্যতম নায়ক মহেন্দ্র দাম্পত্য সম্পর্ক বহির্ভূত প্রেমবাসনার জটিলতায় আকৃষ্ট হয়েছে বিধবা মোহিনীর প্রতি—কাহিনীর এই অংশটুকু 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র-বিনোদিনীর কথা মনে পড়ায়। কিন্তু 'চোখের বালির' পরিণতমনস্ক ভাবনা ও মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ কিছুই এই অপরিণত রচনায় প্রকাশ পায়নি। বরং 'করুণা'র কাহিনী ও চরিত্র বয়নে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৩.২ বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)

'বউঠাকুরাণীর হাট'-কেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেকালের বারভুঁইয়াদের অন্যতম যশোরের প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে এই কাহিনীর বিস্তার। স্বভাবতই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এখানে আছে। ১৮৬৯-তে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকেই 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের উৎস বলে মনে হয়। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে ধারা প্রবহমান ছিল, রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে সেই ধারারই সংযোজন। তবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে স্বাধীনতা স্থাপনে আগ্রহী প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্তার চেয়ে প্রজাপীড়ক নিষ্ঠুর রূপে পরিচয়ই তাঁর রচনায় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে—

> "আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মত অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না"

ইতিহাসের এই তথ্যকে গুরত্ব দিয়েছিলেন বলেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের প্রচলিত দেশাভিমানী সত্তাকে উজ্জ্বল করে দেখাননি।

এ উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য কর্তৃক দিল্লীর বাদশাহের বিরোধিতা, পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা, জামাই রামচন্দ্রকে হত্যার পরিকল্পনা ইতিহাস-সমর্থিত ঘটনা। অন্যদিকে বউঠাকুরানী বিভা, উদয়াদিত্য, সুরমা ইত্যাদি চরিত্র ও কাহিনী লেখকের কল্পনাসঞ্জাত। সর্বোপরি প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের বিরোধের মধ্যে প্রতাপ ও প্রেমের দ্বন্দ্ব ও তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। উপন্যাসে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের মধ্যে সংসার সীমায় আবদ্ধ এক পারিবারিক কাহিনী চিত্রণই ঘটেছে। সাধারণ বাঙালি জীবনের অন্দরমহলের রূপটি এখানে প্রকট। শাশুড়ীর বধূ নির্যাতন থেকে ভাইবোনে প্রীতি, ননদ-বৌদিতে মধুর সম্পর্ক, দাসীদের ষড়যন্ত্র সবই পরিচিত ছকের ছবি। সেইসঙ্গে উদয়-বিভার দাদামশাই বসন্ত রায়ের স্নেহ-মধুর রসিক ভূমিকাটিও উপভোগ্য। পাশাপাশি প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে পুত্র উদয়াদিত্য ও জামাই রামচন্দ্রের বিরোধ ঘনিয়ে তুলেছে পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ। শ্বশুর-জামাইয়ের বিরোধের মধ্যে দুই জমিদার বংশের মর্যাদার লড়াই পারিবারিক সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক স্তরে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে প্রতাপাদিত্যর দিল্লীর বাদশাহের প্রতি আক্রোশ ও বিদ্রোহ রাষ্ট্রিক আন্দোলনের চেহারা নেয়। ফলে সাধারণ পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে উপন্যাসটি ইতিহাসের আশ্রয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। তবে আন্তরধর্মে রচনাটিকে সামাজিক পারিবারিক উপন্যাস বলাই সঙ্গত।

বাঙ্গালি পারিবারিক ছবিটি এখানে পুরোপুরি উপস্থিত। শাশুড়ির পুত্রবধূর প্রতি ঈর্ষা, পুত্রবধূর পিত্রালয়ের প্রতি অবজ্ঞা থেকে শ্বশুর প্রতাপাদিত্যের পুত্রবধু সুরমার উপর ক্রোধ বাঙালি পরিবারের পরিচিত চিত্র। বাড়িতে দীর্ঘদিন পর জামাই আসার আনন্দ উৎসবের ছবিটিও স্বাভাবিক।

পাশাপাশি বঙ্কিমী রোম্যানস রচনার সূত্রে কাহিনীতে এসেছে রুক্মিনী-মঙ্গলার প্রসঙ্গ, যেটি পাঠককে মনে পড়ায় বিষবৃক্ষর হীরা-কাহিনী। প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা হীরা কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু কামনা করেছিল, এখানে উদয়াদিত্যের কাছে প্রত্যাখ্যাত প্রতিহিংসাপরায়ণা রুক্মিনী সুরমার মৃত্যু ঘটিয়েছে। উদয়-রুক্মিনীর প্রথম যৌবনের ক্ষণিক সম্পর্ক উপন্যাসে আভাসিত, কিন্তু তারই জন্য সুরমাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। প্রথম যৌবনের কামনাদগ্ধ অপরাধে অনুতপ্ত উদয়াদিত্যের কাছে সুরমার মৃত্যু প্রবল আঘাত। কিন্তু উদয়াদিত্য চরিত্র হিসাবে অনেকটাই নিষ্প্রাণ। তাই স্ত্রীর প্রতি প্রেমে নিষ্ঠ অবিচল থেকেও সে নিজের মার বধু নির্যাতনের কোনো তীব্র প্রতিবাদ করেনি। লেখক অবশ্য তার চরিত্রে অন্যভাবে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। বিভার স্বামী রামচন্দ্র এবং দাদামশাই বসন্ত রায়কে পিতার ক্রোধের কোপ থেকে বাঁচাতে সে চেষ্টা করেছে। দরিদ্র প্রজাদের হিতসাধন কার্যে পিতার বিরাগ ভাজন হয়েছে। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাকে তাঁর মুক্তিতত্ত্বের বাহন করে নির্লিপ্ত রাজ্যত্যাগী করে দেখিয়েছেন। প্রতাপাদিত্যের উগ্র ভোগবিলাসী নিষ্ঠুর বিবেকহীন প্রজাপীড়ক চরিত্রের পাশে পুত্র উদয়ের বীর প্রশান্ত চরিত্র যেন বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্যই রচিত। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় প্রেম-প্রতাপের দ্বন্দ্ব হিসাবে পিতাপুত্রের এই বিরোধকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বসন্ত রায় চরিত্রটি রবীন্দ্রভাবনার বাণীমূর্তি। তার মধ্যে কবিত্ব, সঙ্গীত ও সহজ সারল্য রবীন্দ্রনাথেরই পরিকল্পিত 'ঠাকুরদা' চরিত্রকে মনে করায়।

প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভার নামেই 'বউঠাকুরাণীর হাট' নামাঙ্কিত। কিন্তু উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্র হিসেবে প্রত্যাশিত গুরুত্ব তার চরিত্রে নেই। সব মিলিয়ে কোমল স্বপ্নমধুর এক চরিত্র যা শেষ পর্যন্ত স্বামী প্রেমবঞ্চিত বেদনায় এক ত্যাগব্রতী মহিমা লাভ করেছে।

উপন্যাসটিতে অবশ্য রোম্যান্সধর্মিতার জন্যই মাঝে মাঝেই নাট্যরস প্রযুক্ত। বিষপ্রয়োগ, কারাদণ্ড, প্রাণনাশ গুপ্তহত্যা, অগ্নিসংযোগ—ঘটনার ঘনঘটা পারিবারিক পরিমণ্ডলে রোম্যান্স রস সৃষ্টি করেছে।

৩.৩ রাজর্ষি (১৮৮৭)

এটিও ইতিহাসশ্রিত উপন্যাস এবং বঙ্কিমী পরিমন্ডলের ছত্রছায়ায় লিখিত, যদিও এর মধ্য থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় রীতির আভাস মেলে। এ উপন্যাসেও তাঁর বিশিষ্ট তত্ত্বভাবনা রূপায়িত, তাকে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করা হয়েছে। তিনি নিজেই এই গ্রন্থ রচনায় কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত 'ত্রিপুরার ইতিহাস' এবং 'স্টুয়ার্ট কৃত বাংলার ইতিহাস' থেকে উপাদান সংগ্রহের কথা বলেছেন। উপন্যাসে ত্রিপুরার রাজপরিবার, মোগল সৈন্যের আক্রমণ, শাহসুজার উপপ্রসঙ্গ ইতিহাসের অনুমোদনপুষ্ট সন্দেহ নেই কিন্তু আসলে, 'রাজর্ষি' রবীন্দ্রনাথের প্রেমপ্রীতিপূর্ণ মঙ্গল ভাবনারই আদশায়িত প্রকাশ। গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রের মধ্য দিয় আপন আদর্শবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করত চেয়েছেন।

ধর্মসম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট প্রত্যয় গোবিন্দমাণিক্যের মধ্য দিয়ে আভাসিত। ইতিহাসে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্য ধর্মপ্রাণ হিন্দুনৃপতি বলে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে এই চরিত্রে মানবিক প্রেমধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। দেবী মন্দিরে জীব বলিদান প্রথা বন্ধ করার জন্য রাজার ঘোষণার মধ্য দিয়ে অহিংস ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রমননে বৌদ্ধধর্মের প্রেম মৈত্রী অহিংসার প্রতি যে সশ্রদ্ধ অনুরক্তি ছিল, তার প্রকাশ তাঁর নানা রচনায় প্রতিবিম্বিত। রাজর্ষি-তেও তার ছায়াপাত ঘটেছে। এই ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে ধর্মাদর্শের বিরোধকে কেন্দ্র করে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও রাজ পুরোহিত রঘুপতির ধর্মাদর্শের সংঘাতই এই মূল বিষয়। এটি আরো সংহত রূপে প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গাব্দ ১২৯৬-এ রচিত 'বিসর্জন' নাটকে। রাজর্ষি উপন্যাসে ধর্মাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা। মুঘল বাদশাজাদা সুজার কাহিনী পুষ্ট করেছে এর ইতিহাস অংশকে, সুজার প্রসঙ্গে ইতিহাসের হাত ধরে কিছু রোম্যান্সধর্মী কল্পনাও এসেছে, তবে ইতিহাসের আনুগত্যও স্বীকার করতে হয়।

বিদেশী সৈন্যের আক্রমণে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগ করে নির্বসনে যাত্রার অংশও ইতিহাস সমর্থিত। তবে সেখানে তাঁর ভীরুতাকেই দেখানো হয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে নিরাসক্তি ও আদর্শবাদ বলে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রমননে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগের কথা সবিদিত। সেই আদর্শ বারবার তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। গোবিন্দমাণিক্য চরিত্র রচনায় সেই শান্ত, সমাহিত, অহিংস, স্থিতপ্রজ্ঞ, সর্বত্যাগী আদর্শকে তিনি ব্যবহার করেছেন। সেই প্রাচীন ভারতের তপোবন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁর গোবিন্দমাণিক্য রাজা থেকে 'রাজর্ষি' হয়ে উঠেছেন। রাজারর শক্তিসত্তা ও অধিকারবোধের চেয়ে তাঁর হাসি-তাতা-কেন্দ্রিক বাৎসল্য, নক্ষত্রের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম ও রাজ্যত্যাগের মহিমাই উপন্যাসে লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শেষপর্যন্ত তাঁর পাঠশালা স্থাপন ও পরিবর্তিত হৃদয় রঘুপতির সেই কার্যে যোগদানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহতী ভাবাদর্শকে জয়ী করেছেন। প্রতাপের চেয়ে প্রেমের শক্তি বেশি—এই মানবিক বোধ উপন্যাসটিতে সঞ্চারিত।

প্রতিনায়ক রঘুপতি লেখকের সৃষ্টিকুলশলতার নিদর্শন। এই চরিত্রটিকে বৃত্তাকার চরিত্র বলা যায়, যার মধ্যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব ও বিবর্তন আছে। গোবিন্দমাণিক্য আদর্শে অবিচল ধ্রুব চরিত্র। রঘুপতি কিন্তু প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, উগ্র ধর্মান্ধতায়, প্রতিহিংসায় ক্ষতবিক্ষত এক চরিত্র। রাজার প্রতি তার বিরূপ ক্রোধোন্মত্ততার পাশাপাশি পালিত পুত্র জয়সিংহের প্রতি আন্তরিক স্নেহ তার চরিত্রে এক আলাদা মাত্রা এনেছে। সেইসঙ্গে দেবীমন্দিরে ধর্মাচরণে তার অদিকারবোধ ও ক্ষমতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে উগ্র ধর্মান্ধতা। পুরোহিত তন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার সংঘাত অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য নিপুণতার চিত্রিত হয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্যর সৎ বিবেকী মানবতাবাদী আদর্শায়িত চরিত্রের বিপরীতে রঘুপতির উগ্র ধর্মান্ধ ষড়যন্ত্রপ্রবণ চরিত্র উপস্থাপিত। এমনকি পুরোহিত ধর্মাশ্রয়ী রঘুপতির ধর্মবিশ্বাসও সেই অর্থে হৃদয়ের বস্তু নয়। তাই অধিকার রক্ষার জন্য সে মিথ্যাচারণ করেছে, রাজা ও ধ্রুবকে হত্যার ব্যর্থ পরিকল্পনা করেছে, স্বভাবদুর্বল রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে রাজ্যলোভ দেখিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছে। এর কোনোটিই রাজপুরোহিতের আদর্শ ধর্মবোধের পরিচয়বাহী নয়। তার চরিত্রের সদর্থক দিক—জয়সিংহের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহ বাৎসল্য। তবু, জয়সিংহের আত্মদানেও তার চরিত্রে পরিবর্তন আসেনি—এসেছে অনেক পরে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে জয়সিংহের মৃত্যুতে যে ট্র্যাজিক রূপান্তর রঘুপতি চরিত্রে প্রত্যাশিত ছিল—তা এসেছে চল্লিশ অধ্যায়ে। সম্ভবত পত্রিকার চাহিদানুযায়ী এই দীর্ঘ বিস্তার সম্ভব হয়েছে। কারণ একই বিষয়াশ্রয়ী 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুতেই নাটক শেষ হয়েছে এবং রঘুপতি চরিত্রে এসেছে বৈপ্লবিক রূপান্তর ও ট্যাজিক পরিণতি। এই উপন্যাসে কিছুটা চেষ্টাকৃত ভাবে রঘুপতির গোবিন্দমাণিক্যের কাছে মঙ্গলবোধে আশ্রয় নেবার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

জয়সিংহ একটি সুপরিকল্পিত চরিত্র। নাটক 'বিসর্জন'-এ তার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, তবু 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও তার ট্র্যাজিক পরিণতি বেদনাদায়ক। পিতৃসম রঘুপতির প্রতি তার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা কিন্তু রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা-ভক্তিকে টলাতে পারেনি। গোবিন্দমাণিক্য তার জীবনে ধ্রুব আদর্শ। তাই রাজহত্যার চক্রান্ত তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। তার অন্তরের সংকটে দ্বিধাজর্জর জয়সিংহ আত্মহনন ছাড়া অন্য কোনো পথ খুঁজে পায়নি। 'বিসর্জন' নাটকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে নাটকীয় উৎকর্ষ লাভ করেছে। কিন্তু 'রাজর্ষি' উপন্যাসে এই চরিত্রের আত্মিক অবক্ষয়ের দ্বন্দ্বজটিল মানসিকতা সম্পূর্ণ প্রকাশিত নয়। তবে এই চরিত্রকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাবনা আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রমনোধর্মে এই সহজ প্রাণের সৌন্দর্য, আবেগ ও কোমলবৃত্তির প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন। তাই সমালোচক ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন—

> "রঘুপতি, নক্ষত্র রায় অপেক্ষা গোবিন্দমাণিক্য ও কোমলহৃদয় হাসি ও তাতার, জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের সৌন্দর্যের প্রতই কবির পক্ষপাত। এই স্বচ্ছ কোমল সুকুমার মুক্ত উদার জীবনপ্রবাহই রবীন্দ্র কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে"

নক্ষত্র চরিত্রসৃষ্টি হিসেবে সফল। ব্যক্তিত্বহীন দুর্বল স্বভাবের নক্ষত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দমাণিক্য ও রাজপুরোহিত রঘুপতির ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্বসঙ্কুল আবর্তে সংকটাপন্ন। দুই ব্যক্তিত্বের প্রাবল্যে তার ভীরুতা অধিকতর প্রকটিত। রাজা হবার লোভে সে রঘুপতির চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে আবার দাদা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি তার অন্তর্লীন শ্রদ্ধাবশত মন থেকে তাকে পুরোপুরি মানতে পারেনি। কিন্তু সে মানুষ হিসেবে অতি বাস্তব ও সাধারণ। তাই রাজা হবার পর তার চরিত্রে এলো পরিবর্তন এমনকি রঘুপতির কর্তৃত্বকেও সে অস্বীকার করলো।

বিল্বন চরিত্রটিও আদর্শবাদের প্রতীক। তবে রবীন্দ্রনাথ তাকে সক্রিয় দেখিয়েছেন, তাই সে রাজাকে বলেছে প্রয়োজনে বিদ্রোহী নক্ষত্রকে বধ করতে। বিপন্ন রাজ্য বাঁচাতে সে সৈন্য সংগ্রহ করেছে। তার চরিত্রে সেবাধর্ম মানবিকবোধে উজ্জ্বল, কিন্তু সে গোবিন্দমাণিক্যের মত প্রতীকিত আদর্শবাদ নয়—তার চরিত্রে প্রতিবাদ আছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের শক্তিও আছে। হাসি ও তাতা—দুটি শিশুচরিত্র উপন্যাসে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছে। যে অহিংস আদর্শবাদ ছিল ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য তাকে স্বপ্নে দেখা কাহিনীর আদলে বিন্যস্ত করে রবীন্দ্রনাথ হাসি ও তাতাকে উপস্থাপিত করেছেন।

> "স্বপ্নে দেখলুম—একটা পাথরের মন্দির। ছোট মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়। কী বেদনা। বাপকে সে বারবার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন!"

এই স্বপ্নকে কাজে লাগালেন রবীন্দ্রনাথ—ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির বিরোধের অদৃশ্য হাতিয়ার হয়ে উঠে এলো বলিদান প্রথা বন্ধের আদেশ। স্বপ্নে দেখা বালিকা হাসি ও তার ভাই তাতা—উপন্যাসে দেখা দিল রাজার স্নেহবাৎসল্য ও আদর্শের প্রতীক রূপে।

উপন্যাসটি আয়তনে বিশাল। মোট চুয়াল্লিশটি অধ্যায় ও উপসংহারে বিন্যস্ত কাহিনী অকারণেই দীর্ঘায়িত। 'বিসর্জন' রচনার সময় এই বহুশাখায়িত ব্যাপ্তি কমিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে সংহত রূপে প্রকাশ করেছেন। তবে নাটক মূলত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার স্ফুরণ, কিন্তু উপন্যাসে একটি ক্রমাভিব্যক্ত ধারাবাহিকতা থাকে। ফলে 'রাজর্ষি' সেই দৈর্ঘ লাভ করেছে এবং ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করায় কাহিনী এক বিশাল ব্যপ্তি লাভ করেছে। তবে ইতিহাস নয় আদর্শবাদে প্রতিষ্ঠাই এই উপন্যাসের লক্ষ্য।

৩.৪ চোখের বালি (১৯০২)

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'চোখের বালি' এক স্মরণীয় ও বিশিষ্ট নাম। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করে এই আধুনিক উপন্যাসের প্রকৃতি নির্ধারণ সহজ হবে।

> "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধইত হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তার আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ এই উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার পথ উন্মুক্ত করে দিল। নর-নারীর প্রেম-অপ্রেম, বাসনা-বিভ্রম, চিত্তের দহন ও দীপ্তির যে জটিল দুরধিগম্য রূপায়ণ চোখের বালিতে ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এযাবৎ অপরিচিত ও অভাবনীয় ছিল। নৈতিকতার প্রশ্নে উত্তাল নিষিদ্ধ প্রেমের এই বিষয়কে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বাস্তব করে তুলেছেন। চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের আরোপও এমনভাবে প্রথম দেখা গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ ছিল। 'চন্দ্রশেখরের' শৈবলিনী ও 'রজনীর' লবঙ্গলতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনোরহস্য নিঃসন্দেহে বঙ্কিম দেখিয়েছিলেন। 'বিষবৃক্ষের হীরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের'

রোহিনী ও ভ্রমর—সকলেই জীবনানুরাগ ও বিষামৃত জ্বালার শিকার। তবু বিনোদিনী এদের সকলকে অতিক্রম করে গেছে, সে আদ্যন্ত আধুনিক নারী। একবিংশ শতকেও এই নারী বাংলা উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যজটিল প্রেমানুভবের নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই এ উপন্যাসের অন্দরমহলকে স্পষ্ট আলোকিত করতে সাহায্য করে। তিনি বলেছেন চোখের বালিতে তিনি প্রবেশ করেছেন—

> "মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির
> পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।....যেন পশুশালার দরজা
> খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে"

মানবপ্রবৃত্তির বিচিত্র লীলা চোখের বালিতেই প্রথম এমন আবরণহীন বাস্তবতায় দেখা দিল। বঙ্কিমী রোম্যান্সের আড়াল ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথের নর-নারী প্রত্যক্ষ বাস্তবমূর্তিকে উপস্থিত হল।

বাংলা উপন্যাসের ঘটনা নির্ভর কাঠামোর পরিবর্তে চরিত্র নির্ভর কাহিনী রচনার সূত্রপাত ঘটলো এই উপন্যাসে। শুধু তাই নয় চরিত্রের রহস্য জটিল অন্তর্লোক উদঘাটিত হল নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। 'মানববিধাতার নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়া'র নগ্নরূপ সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হল। প্রকৃত অর্থেই বাংলা উপন্যাস হয়ে উঠলো আধুনিক ও প্রাপ্তবয়স্ক।

এর প্রধান চরিত্র নায়িকা বিনোদিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সমস্যার কেন্দ্রে ছিল পুরুষ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ নারীকে আনলেন সমস্যার কেন্দ্রে। ফলে 'চোখের বালিতে' মহেন্দ্রর চেয়ে প্রধান হ'য়ে উঠলো বিনোদিনী। এবং নারীর সমস্যা বলেই তা হল জটিলতর। বিধবা নারীর মনোজগতের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে হলো বিনোদীনী চরিত্রে, বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ যথাক্রমে কুন্দনন্দিনী ও রোহিনীকে এনেছিলেন—বিধবার হৃদয়গত জটিল সমস্যা সেখানেও ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী চরিত্রদীপ্তিতে আলাদা জাতের। তাঁর আত্ম আবিষ্কার আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার ফলশ্রুতি। নরনারীর হৃদয়ঘটিত সমস্যা এখানে শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে এবং চতুষ্কোণ প্রেম জটিলতা কাহিনীতে এনেছে অন্যমাত্রা। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রণয় ও মোহপাশের পাশাপাশি এসেছে আশা ও বিহারী চরিত্র। চারটি চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র লীলা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, প্রেম, ঘৃণা, শ্রদ্ধা, ঈর্ষা আশ্চর্য দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে।

বিবাহিত মহেন্দ্রর সুখী দাম্পত্য জীবনে অশান্তির বীজাকারে প্রকাশ ঘটে মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষীর ঈর্ষায়। সেই বীজ ধীরে ধীরে মহীরুহ-তে পরিণত হয় সংসারে বিধবা বিনোদিনীর আগমনে। বহ্নিময়ী বিনোদিনীর কামনাবহ্নিতে আকৃষ্ট পতঙ্গ মহেন্দ্রর সংরাগ রক্তিম বিহ্বলতায় সুখের সংসার হয়ে ওঠে উত্তাল অশান্ত। পুত্রবধু আশার প্রতি বিরূপ জননী রাজলক্ষী সেই অনলে ইন্ধন জোগায়। স্বয়ং ঔপন্যাসিকের মন্তব্য আমাদের ধারণাকেই অনুমোদন করে।

"'চোখের বালি'র গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা" কামনা ও ঈর্ষার অনলে জ্বলে ওঠা সংসারের ছবিটি পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিধবা বিনোদিনী তার প্রতিকূল ভাগ্যের বঞ্চনাকে যেন চ্যালেঞ্জ জানাতেই নিরপরাধ আশাকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে মহেন্দ্র বিজয়ের খেলাতে মত্ত হয়। আশা তার সখী—তার 'চোখের বালি'। দুই সখীর এই পাতানো নামকে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য দক্ষতায় কাহিনীর নামকরণে ব্যবহার করেছেন। শেষপর্যন্ত দেখা যায় প্রধান চারটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে একে অপরের চোখের বালি।

মহেন্দ্রর বন্ধু বিহারী এ কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্র যাকে ঘিরে উপন্যাসের চতুর্ভুজ সম্পূর্ণ হয়েছে। মহেন্দ্রর অসংযমী, অস্থিরচিত্ততার পাশাপাশি বিহারী শান্ত-সমাহিত আদর্শায়িত চরিত্র। তার মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর তত্ত্বাদর্শকে প্রকাশ করেছেন। আশার সঙ্গে বিহারীর বিবাহ স্থির হবার পর মহেন্দ্রর জেদের প্রাবল্যে তা ভেঙে যায়—স্বয়ং মহেন্দ্র আশাকে বিয়ে করে। দুই বন্ধুর অন্তর্বিরোধ সম্ভবত তখনই শুরু হয়েছিল, তবে লেখক কখনো সে বিষয়ে সোচ্চার হননি। মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবনে এ ঘটনা কোনো সমস্যাও সৃষ্টি করেনি। যদিও বিহারীর অন্তরে আশা সম্বন্ধে এক কোমল অনুভূতি ছিল অন্তর্লীন, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যা প্রকাশ পেয়েছে। বিহারী

চরিত্রের সদর্থক ভূমিকা উপন্যাসে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্রর দাম্পত্য জটিলতাকেও বিহারী সরল করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমে সে বিনোদিনীর প্রতি বিরূপ ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে সে নিজেই বিনোদিনীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। এই আকর্ষণের প্রকৃতি মহেন্দ্রর কামনা থেকে অন্যতর। বিনোদিনী শেষপর্যন্ত বিহারীর মধ্যেই খুঁজে পায় প্রকৃত প্রেমকে। আসলে মহেন্দ্র ছিল তার আতপ্ত প্রেমের বহিরঙ্গ কামনা। কিন্তু বিহারী তার অন্তরঙ্গ প্রেমানুভবের প্রেরণা। কামনার অগ্নিতে দগ্ধ বিনোদিনী বিহারীর প্রেমে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। বিহারী আপন অন্তরের সত্য উপলব্ধি করেও বিনোদিনীকে প্রত্যাখ্যান করে। তার প্রত্যাখানে বিনোদিনীর প্রেম আরো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী চরিত্র পরিক্রমায় কামনা থেকে প্রেমে উত্তরণ দেখিয়েছেন। মহেন্দ্রকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করার পিছনে ছিল তার প্রতিহিংসার মনোভাব। মহেন্দ্র যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে আশাকে বিয়ে করেছিল, সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই তার এই ধ্বংসলীলা। আশার প্রতি তীব্র ঈর্ষায় সে তার সংসারকে দগ্ধ করতে চেয়েছে এবং মহেন্দ্রকে অতি সহজেই তার কামনা-রক্তিম প্রবৃত্তির দাস করতে পেরেছে। মহেন্দ্র আশার নষ্টনীড়ের ছবি দেখে আশ্বস্ত, তৃপ্ত বিনোদিনী এবার তাকিয়ে দেখলো নিজের অন্তরে—সেখানে বিহারী অধিষ্ঠিত পূজামূর্তিতে। রবীন্দ্রনাথ কামনা তাড়িত বিনোদিনকে উত্তীর্ণ করলেন প্রেমের তপস্যায়। তাই বিহারীর বিবাহ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে পূর্ণ অন্তরে সে ছেড়ে গেল বিহারীকে। বিহারীকে চাওয়া তার কাছে যতখানি সত্য ছিল, তাকে ছেড়ে যাওয়াও ততখানি সত্য হয়ে তার অন্তরকে উদ্ভাসিত করলো।

বিনোদিনীর ভাষায় 'ননীর পুতুল' আশা লেখকের মমতা দিয়ে সৃষ্টি। উপন্যাসের শুরুতে যে সরল অনভিজ্ঞ কিশোরী বধূকে দেখি, কাহিনীর পরিণতিতে সে দুঃখ দহনের তাপে ও সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণা এক নারী রূপে বিকশিত। তার সারল্যের সুযোগে বিনোদিনী সুকৌশলে তার স্বামীকে মোহমুগ্ধ করেছে, সংসারে তীব্র অশান্তি ঘনিয়ে তুলেছে। তার শাশুড়ীও তার দাম্পত্যসুখে মনস্তাত্ত্বিক ঈর্ষা ভোগ করে তারই ওপর নিষ্ঠুর হয়েছেন এবং একদা পত্নী প্রেমে উন্মত্ত তার স্বামী মহেন্দ্র শেষপর্যন্ত তাকে ত্যাগ করে বিনোদিনীকে নিয়ে উন্মত্ত হয়েছে। তার মাসি অন্নপূর্ণা ও বিহারীর কাছে সে সান্ত্বনা ও সমবেদনা লাভ করেছে। স্বামীর অনাদর ও প্রেমের লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে এই বালিকা বধূ কখন যে ধীরে ধীরে পরিণতমনস্কতায় পৌঁছে গেছে তার বিশ্লেষণ লেখক করেননি। কিন্তু উপন্যাসের শেষে অবিচলিত ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের মিশ্রণে সে যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। বিহারী এবং মহেন্দ্রও তার এই পরিণত মানসিকতা লক্ষ্য করে বিস্ময়াভিভূত হয়েছে।

উপন্যাসের শেষে বিনোদিনীর কাশী গমন এবং মহেন্দ্র আশার পুনর্মিলন সূচিত হয়েছে। আপাত মিলনান্ত এই কাহিনীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ট্র্যাজিক সুর পাঠকের মনে থেকে যায়।

'নষ্টনীড়' গল্পকে রবীন্দ্রনাথ নির্মম সাহিত্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 'চোখের বালি'ও সেই পর্যায়েই পড়ে। লেখক বর্ণিত 'মানববিধাতার নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়া'র প্রতিফলন এখানে পাই। চোখের বালি ৫৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত দীর্ঘ উপন্যাস। এর গঠন কৌশল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসের উপযুক্ত। দীর্ঘ পরিসরে অনেক নাটকীয় মুহূর্ত এসেছে, কিন্তু লেখক সুকৌশলে নাটকীয়তা পরিহার করে সহজ সরল বর্ণনায় সেই মুহূর্তের চমককে অপ্রকাশ রেখেছেন। বিধবা বিনোদিনীর প্রেমবঞ্চিত হৃদয়ের সুপ্ত বাসনার বিস্ফোরণকেও রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে উপন্যাসের অবয়বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তার অবরুদ্ধ কামনার তৃষাগ্নিতে মহেন্দ্র গন্ধ হয়েছে, নষ্ট হয়েছে তাদের দাম্পত্যনীড়, কিন্তু সেই কামনার আগুন থেকে প্রেমের দহনে পরিশুদ্ধ বিনোদিনী শেষপর্যন্ত আলোর সন্ধান পেয়েছে। বিহারীর প্রেমে নিজেকে আবিষ্কার করে সে দহন থেকে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেছে। তার চরিত্রের অভিব্যক্তি সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিবিম্বব। তাকে আমাদের পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু তাকে অস্বীকার করা চলে না। তার মধ্য দিয়েই নারীব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন দেখা গেল। সমগ্র উপন্যাসের বয়ন ও নির্মাণে এই আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। একারণেই ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন—

> "কোনও একখানি উপন্যাস যদি কোনও সাহিত্যে উপন্যাসের প্রচলিত দর্ম ও প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়া দিয়া নূতন যুগের সূচনা করিয়া থাকে, নূতন বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'।"

৩.৫ নৌকাডুবি

চোখের বালির পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি' ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরবর্তী রচনা 'গোরা'। দুটি প্রধান উপন্যাস রচনার মধ্যবর্তী সময়টুকু যেন রবীন্দ্রনাথ মানসিক বিশ্রাম নিয়েছেন মনে হয়। চোখের বালির মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাজটিল আধুনিক রূপায়ণের পরবর্তী প্রয়াস হিসাবে 'নৌকাডুবি'-কে অত্যন্ত লঘু ও সরলীকৃত বলে মনে হয়। চোখের বালিতে যে অন্তর্মুখী দৃষ্টি, দুঃসাহসিক বিশ্লেষণ দেখেছি, 'নৌকাডুবি'তে তার চিহ্নমাত্র নেই। এর উদ্ভব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এসব কথা দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে, সে হল প্রকাশকের তাগিদে।......প্রকাশকের ফরমাসকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তাছাড়া বলব কী?"

এই কৈফিয়ৎ থেকে বোঝা যায় নৌকাডুবি রচনার জন্য লেখকের অন্তরের কোনো তাগিদ ছিল না। ফলে 'চোখের বালির' আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পর এ কাহিনীতে ফিরে এলো রোম্যান্স প্রবণ কল্পনা দৃষ্টি। যেজন্য মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী-আশা চতুরঙ্গের জটিল ছক এখানে রমেশ-কমলা-নলিনাক্ষ-হেমনলিনী চতুর্ভুজের সাদামাটা সমন্বয়ে পর্যবসিত। শুধু তাই নয় বঙ্কিমী পর্বের যে ঘটনা বাহুল্যকে রবীন্দ্রনাথ পিছনে ফেলে এসেছিলেন নৌকাডুবিতে তাকেই ফিরিয়ে আনলেন, যেজন্য উপন্যাসের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ালো চরিত্র নয়—নৌকাডুবির ঘটনা। এই মূল ঘটনা-বিপর্যয়ের সূত্র ধরেই উপন্যাসে বারবার চমকপ্রদ নাট্যমুহূর্ত এসেছে। রমেশ যখন জানল কমলা তা স্ত্রী নয়, তখন এক চমক, হেনলিনী যখন জানল রমেশ-কমলা বিবাহিত দম্পতি নয় তখন আর এক চমক, কমল যখন জানল রমেশ তার স্বামী নয় তখন আরও এক চমক এবং নলিনাক্ষ যখন জানতে পারলো কমলাই তার হারানো স্ত্রী তখন শেষ চমক। এতগুলি নাটকীয় মুহূর্ত কিন্তু কোনো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেনি, সবটাই আপন আপন পথে সরলীকৃত সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছে। নলিনাক্ষকে স্বামী জানার পর কমলার চিত্তে রমেশকে নিয়ে কোনো অন্তর্দ্বন্ধ বা আলোড়ন জাগলো না—এটা কি আধুনিক মননে বিশ্বাস্য বলে মনে হয়?

রমেশ হেমনলিনীকে ভালোবাসে। বাবার আদেশে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েও সে হেমকে ভোলেনি। পরে কমলা আসলে পরস্ত্রী জেনে সে হেমের কাছে মনের দিক থেকে খাঁটি থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় কমলার কাছাকাছি এসে গেছে এবং তাকে ঘিরে রমেশের মনে এক অন্তর্লীন অনুরাগের জন্ম হয়েছে। ঠিক তখনি ঘটনাচক্রে কমলা জানতে পারে রমেশ তার স্বামী নয়। এই ঘটনা তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এক দুর্যোগের ঘনঘটায় নৌকাডুবির ফলে দুটি চরিত্র অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছিল—অন্যতর ঘটনায় তারা আবার কক্ষচ্যুত উল্কার মত পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। কমলা শেষপর্যন্ত তার স্বামী নলিনাক্ষর কাছে আশ্রয় ও প্রেম খুঁজে পেল। রমেশ হেমনলিনীর সঙ্গে মিলিত হবে এমন সম্ভাবনার পথও হয়তো খোলা রইল। তার আগে রমেশ ও কমলার শেষ সাক্ষাৎকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিল হতে পারতো—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে গেলেন না। রমেশের জন্য একুট বেদনা করুণ ছোঁয়া পাঠক মনে লাগতে পারে হয়তো, তবু বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনী কিংবা 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথ-লবঙ্গলতার শেষ সাক্ষাৎকারে মত অনবদ্য রূপায়ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

কমলা ও হেমনলিনী-প্রধন দুই নারী চরিত্র লেখকের সযত্ন সৃষ্টি। একটি সরলা গ্রাম্য বালিকা ও একটি আধুনিক শিক্ষিতা তরুণীর পরিচয় ও প্রকৃতি স্পষ্ট রেখায় প্রকাশ পেয়েছে। হেমনলিনী পরিশীলিত অভিজাত রবীন্দ্র নায়িকা যার মধ্যে কলকাতার নব্যরুচির অলোকপ্রাপ্তা নারীর দেখা পাই, পরবর্তী সুচরিতা, লাবণ্যের মধ্যে যার পূর্ণতার বিকাশ।

সমকালীন কলকাতার সম্পন্ন ব্রাহ্মপরিবারের নিদর্শন হিসাবে অন্নদাবাবুর পরিবারকে উপন্যাসে আনা হয়েছে। পরবর্তী 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবুর পরিবারে যে চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে—যেন তারই আভাস নৌকাডুবিতে দেখা গেল।

৩.৬ গোরা (১৯১০)

মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসাবে 'গোরা'র খ্যাতি-পরিচিতি। স্বজাত্যবোধের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে গোরা উত্তীর্ণ হয় বিশ্বাত্মবোধে। এত ব্যাপক প্রসার ও ভাবকল্পনার ব্যাপ্তি, জীবনদর্শনের গভীর সামগ্রিক দৃষ্টি আর কোনো বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়নি। এই উপন্যাসে যে সমগ্রতার ধর্ম ও বৃহত্তর ঐক্যের কথা প্রকাশিত তারই মহিমময় ব্যাপ্তিতে এ কাহিনীর মর্যাদা ও তাৎপর্য।

'মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "মানুষ আপন-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে,
> তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা"

—'গোরা' উপন্যাসে বৃহতের বোধেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতার এই উপলব্ধিকে রূপায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার আদর্শই এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। লেখক গোরা চরিত্রে ভারত বোধ থেকে বিশ্ববোধ, জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতার উত্তরণ দেখিয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনাবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সেই সময় ও পটভূমিতে এই কাহিনী রচিত হয়েছিল। ঐ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া গোরা রচনার উৎসে কাজ করেছে, যদিও গোরার রচনাকাল থেকে বেশ কিছু বছর আগে কাহিনীটি স্থাপিত। লেখক গোরার জন্ম সিপাহী বিদ্রোহকালে অর্থাৎ ১৮৫৭-তে বলেছেন এবং কাহিনীতে গোরার বয়স ২২/২৩। সে হিসাবে ১৮৮০ সাল নাগাদ সময় কাহিনীর কাল। সেসময়ের শিক্ষিত যুবক গোরার মধ্যে স্বাদেশিকতা ও ইংরেজবিরোধিতা যেমন সতেজ ছিল, তেমনি প্রবল ছিল হিন্দুত্ব ও ভারতচেতনা।

নায়ক গোরা ও তার বন্ধু বিনয় হিন্দু আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং ভারত হিতৈষণা তাদের জীবনের ব্রত। বিনয় ঘটনাচক্রে ব্রাহ্ম পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুচরিতার পরিশীলিত স্বভাব ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ। গোঁড়া উগ্র হিন্দু গোরা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত মানুষদের সঙ্গে বিনয়ের মেলামেশা পছন্দ করে না। কিন্তু ঘটনাচক্রে গোরাও ঐ ব্রাহ্মপরিবারে যাতায়াত করে এবং সুচরিতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। সে পরিচয় হৃদয় সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুটি চরিত্রকেই বিকশিত করে।

দেশকাল ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গভীরতর জীবনসত্যের অন্বেষণই গোরা উপন্যাসের বিষয়। হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম কেন্দ্রিক বিরোধ দুটি পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। প্রধানত গোরা চরিত্রে যে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুয়ানীর প্রকাশ দেখি তার আবরণ ছিন্ন হয় গোরার জন্মপরিচয় উদঘাটনে। মা আনন্দময়ীর মুখে তার বিদেশী উত্তরাধিকারের বৃত্তান্ত শোনার মুহূর্তে গোরা অনুভব করেছে তার দেশানুরাগ সমাজ প্রচলিত আচার ব্যবহারের আজন্ম বিশ্বাস্য ভিত্তি ভূমি মিথ্যা অলীক। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের মতই তীব্র এবং স্বাভাবিক—"মা তুমি আমার মা নও?"

—কিন্তু পরক্ষণেই সংযত, অন্তর্মুখী তার আচরণ। সে সুচরিতার উদ্দেশ্যে পরেশবাবুর কাছে গেছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন বিশেষ সমাজ ও শ্রেণীর মধ্যে গোরাকে আবদ্ধ রাখলে তার মধ্যে তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লবীমানসের ধর্মাদর্শ সঞ্চারিত করা সম্ভভব নয়। হিন্দু সমাজের মধ্য থেকে তাকে সরিয়ে এনেই সেই গোঁড়ামির বিলুপ্তি সম্ভভব। গোরাকে জন্মসূত্রে বিদেশি করে তার মোহমুক্তি ঘটিয়ে উদারবিশ্বে তাকে মুক্তি দেওয়া সহজ হয়েছিল। তাই জননী আনন্দময়ীর মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্বমানবতার মূর্তি, বলেছে "মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

এই ঘটনাবহুল উপন্যাসে মুখ্যত উনিশশতকের শেষার্ধের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ঘটনার উপস্থাপনা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করে মানবতাবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে গোরা-সুচরিতা, বিনয়-ললিতা যুগ্ম প্রেমকাহিনীর মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানবহৃদয়ের প্রেমের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুচরিতার সঙ্গে গোরার মিলন শুধু বিবাহমাত্র নয়, তা বৃহত্তর জীবনাদর্শের মধ্যে মুক্তি। গোরা উপন্যাসের প্রতিটি প্রধান চরিত্রের মধ্যেই এই বৃহত্তর জীবন বিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। গোরা, সুচরিতা, বিনয়, ললিতা ছাড়া যে দুটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য পেয়েছে। তারা হলেন আনন্দময়ী ও পরেশবাবু—গোরার মা ও সুচরিতার পিতা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে কোনো সম্বন্ধই রক্তের বন্ধন নয়। গোরার জন্মদাত্রী জননী আইরিশ মহিলা, গোরার জন্মকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। আনন্দময়ী গোরাকে প্রকৃত মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন। অনুরূপভাবে পরেশবাবুও সুচরিতার পিতা নন, কিন্তু স্নেহে পিতারও অধিক। দুটি চরিত্রের মধ্যেই লেখকের বিশিষ্ট আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরেশবাবুকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন ধর্মোপলব্ধির মুখপাত্র হিসেবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

আনন্দময়ীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি ও চিত্তমুক্তির আলো বিচ্ছুরিত করেছেন। ইউরোপীয় দম্পতির সদ্যোজাত সন্তান গোরাকে নিজের বলে গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর উদার হৃদয় প্রকাশিত। সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে যে বিশ্বমানবতার অসীম মুক্তি তারই প্রতীকিত বাণীমূর্তি যেন আনন্দময়ী। তাই গোরার চরম উপলব্ধি ঘটেছে তাঁরই মাতৃমূর্তির আশ্রয়ে—যখন মা-র মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মাতৃভূমিকে, যখন আনন্দময়ী তার কাছে ভারতবর্ষের প্রতিমা রূপে অনুভূত হয়েছেন। গোরার চিত্তমুক্তিতে আনন্দময়ীর জীবনভাবনা ও সত্যদৃষ্টির অবদানত আছে।

৩.৭ চতুরঙ্গ (১৯১৬)

'সবুজপত্র' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় এটি 'চতুরঙ্গ' নামে বিজ্ঞাপিত হয়নি। পরপর সাতটি অনবদ্য ছোট গল্প সবুজপত্রে প্রকাশিত হবার পর 'জ্যাঠামশায়' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংখ্যায় 'শচীশ' প্রকাশের পর বোঝা যায় এটির পূর্বাপর অংশ আছে এবং ক্রমান্বয়ে 'দামিনী' ও শ্রীবিলাস' পর্ব প্রকাশে চারটি পর্যায় সম্পূর্ণ হয় এবং গ্রন্থাকারে চারটি অংশ সমন্বিত হয়ে 'চতুরঙ্গ' নামে উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে। এটির উল্লেখযোগ্য বিষয় এর ভাষা ও বাকরীতি। 'চতুরঙ্গ'-ই সাধুভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস। একই বছরে রচিত 'ঘরে-বাইরে' রবীন্দ্রনাথের লেখা চলিত ভাষার প্রথম উপন্যাস। 'চতুরঙ্গ'-র ভাষা সাধুভাষা হলেও এর রীতিও ভঙ্গিতে চলিতভাষার মুক্তি অনুভব করা যায়।

'চতুরঙ্গ' নায়ক শচীশের আত্মানুসন্ধানের কাহিনী। সে তার নাস্তিক জ্যাঠামশায় জগমোহনের শিষ্য। ম্যালথাস ও বেন্থামের ভাবশিষ্য জ্যাঠামশায় 'পজিটিভিস্ট'। 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন'ই তাঁর জীবনের আদর্শ।

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুতে শচীশের কর্মবাদের ধারা শুকিয়ে গেল। সে আশ্রয় নিল লীলানন্দস্বামীর রসসমুদ্রে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেখান থেকেও তার বিদায় গ্রহণ। অতিরিক্ত কর্ম মানুষকে শুষ্ক করে তোলে আর অতিমাত্রায় রসে মানুষের মন রস স্রোতে ডুবে যায়। কোনোটাই সত্য আশ্রয় নয়। লীলানন্দর আশ্রয়েই শচীশ দেখা পায় 'দামিনী'র। 'দামিনী' রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সৃষ্টি। 'চোখের বালির' বিনোদিনীরই অন্যতর, পরিণততর প্রকাশ দামিনী—

বিনোদিনীর দ্বিধামুক্তি যেন তার মধ্যে দেখি। শচীশের প্রতি দামিনীর আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ উপন্যাসে গতি সঞ্চার করেছে। শচীশ তার সাধনার বিঘ্ন হবে বলে দামিনীর আকর্ষণে সাড়া দেয়নি। কিন্তু দামিনীকে অস্বীকার করতেও পারেনি। জ্যাঠামশায়ের নির্দেশে বিধবা ননীবালাকে কলঙ্ক মুক্ত করতে সে তাকে বিবাহে রাজী হলেও ননীবালা আত্মহত্যা করে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। দামিনী কিন্তু অন্য ধাতুর। শচীশের উপলব্ধি " সে মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক।"

শচীশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি তত্ত্বকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। মানুষের আসল আশ্রয় কর্মবাদ বা রসবাদে নয়, তার আপন ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ই তার শক্তি। শচীশের সাধনায় দামিনী যেন বাধা ও তীব্র প্রতিবাদ। তাই শচীশ শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে মুখ ফিরিয়েছে।

গুহার দৃশ্যে নিদ্রিত শচীশ নিবেদিতা দামিনীকে আঘাত করেছে। তার সেই আঘাতই দামিনীর কাছ গোপন ঐশ্বর্য—পরশমণি। প্রত্যাখ্যাতা দামিনী শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেছে কিন্তু শচীশের দেওয়া আঘাতের বেদনাকে নিঃশব্দে বহন করে গেছে। আমরণ।

অনেকেই মনে করেন 'শচীশ' রবীন্দ্রতত্ত্বের বাহন। শচীশের নিজেরই উক্তিতে এর স্বপক্ষে সমর্থন মেলে। শচীশ বলেছে—"তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচিনা, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।"

শচীশের এই উপলব্ধি আধ্যাত্মিকজাতীয় এজন্য অনেকে 'চতুরঙ্গ'-কে রূপক বলতে চেয়েচেন। শচীশের মানস পরিক্রমা এ উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু শেষাংশে দামিনীও প্রধান হয়ে উঠেছে। ড. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত চতুরঙ্গকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—"নানা শচীশের একখানি মালা" এবং এ মালা দামিনীর প্রাপ্য বলেও মত প্রকাশ করেছেন।

শ্রীবিলাস এ কাহিনীর কথক। তারই কতকতার সূত্রে শচীশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার আইডিয়ার তত্ত্ব থেকে দামিনী প্রকাশিত হয়েছে পূর্ণ মানবী মূর্তিতে। জ্যাঠামশায়কেও পাঠক চিনেছে শ্রীবিলাসের উপলব্ধিতেই।

চতুরঙ্গের রচনাশৈলী অভিনব। এটি আত্মকাহিনী নয়, নয় ডায়েরি বা দিনলিপি। আবার পাত্রপাত্রীরা নিজের নিজের বক্তব্য নিজেরা বলেনি, যেমনটি দেখবো পরবর্তী উপন্যাস ঘরে-বাইরে অথবা পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনীতে'। এখানে শ্রীবিলাস একাই কথক। শচীশ, দামিনী, জ্যাঠামশায় এবং নিজের কথা সে একাই বলেছে। মাঝে মাঝে অন্য চরিত্রের অন্তর্লোক উদঘাটন করতে গিয়ে তাকে ডায়েরির আশ্রয় নিতে হয়েছে।

"চতুরঙ্গ' নামকরণটিও নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। চারটি চরিত্র নামাঙ্কিত বলে এর এহেন নামকরণ। আবার শচীশের চারটি মানসিক অবস্থা—(কর্মবাদ, রসবাদ, নারীপ্রেম ও সর্বউত্তীর্ণ অবস্থা) ভেবেও এ নামকরণ হতে পারে 'চতুরঙ্গ' বা 'সতরঞ্চ' জাতীয় খেলার ছকের প্রতীক হিসেবেও এই জীবনধর্মী কাহিনীকে ধরে নেওয়া যায়। এ কাহিনীতে চারটি 'মৃত্যু'-র উল্লেখ আছে, যাদের অভিঘাত নায়ক শচীশের আত্মসমীক্ষা ও আত্মউপলব্ধির সহায়ক। জ্যাঠামশায়, ননীবালা, নবীনের স্ত্রী এবং সবশেষে দামিনীর মৃত্যু সবই শচীশের জীবনপথে এক একটি স্তর চিহ্নিত করেছে।

বিষয়বস্তু, গল্পাঙ্গিক, ভাষারীতি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সবের সমন্বিত রূপ হিসাবে 'চতুরঙ্গ' অন্যন্য উপন্যাস। অনেকে এর ক্রমভঙ্গ রীতির জন্য একে আংশিকের লক্ষণাক্রান্ত বলতে চান কিন্তু এর রূপ-অরূপ তত্ত্বের মানবিক প্রয়োগের অসাধারণত্ব স্বীকার করতেই হয়। অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমরাও সহমত হতে পারি যে—

"রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভালো লেখাগুলির একটি চতুরঙ্গ। আকাশের মুক্তি এবং শোকসুখমিশ্র মাটির অমৃতকে তিনি একটি মানবিক কাহিনীতে অভিনব শিল্পাঙ্গিকে ধরে রেখেছেন।"

৩.৮ ঘরে বাইরে (১৯১৬)

'চতুরঙ্গ' সমকালে লিখিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আগাগোড়া চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। রচনারীতির দিক থেকেও নতুনতর আঙ্গিক প্রয়োগ করেছেন। চতুরঙ্গে শ্রীবিলাস নিয়েছিল কথকের দায়িত্ব। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলি নিজেরাই বলেছে নিজেদের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রজনী' উপন্যাসে এই পদ্ধতি আগেই প্রয়োগ করেছিলেন।

'ঘরে-বাইরে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির আভাস। এর আগে 'গোরা' উপন্যাসের বিশাল মহাকাব্যিক ক্যানভাসে রাজনীতি এসেছিল। পরবর্তী 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সেই প্রয়োগ সচেতন ও সোচ্চার। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'ঘরে-বাইরে' কে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আলোচনা বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল। এর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ বিশেষত সন্দীপ চরিত্রায়ণ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গঘাতে এ উপন্যাসের পটভূমি উত্তাল। দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য ও ভাবাকুলতাকে এ কাহিনীতে রূপ দিয়েছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সন্ত্রাসবাদের উত্তেজনা তাঁর কাছে হুজুগ বলে মনে হয়েছিল। ঘরে আলো জ্বালাবার জন্য অগ্নি সংযোগের প্রবণতাকে তিনি অকারণ ধ্বংসের নেশা বলে মনে করেছিলেন।

নিখিলেশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুভকামী, প্রশান্ত, স্থির আদর্শ এক মানুষকে এঁকেছেন—যার দাম্পত্য প্রেম ও দেশপ্রেম মঙ্গল ও শুভবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশধর্ম ও মানবিক ধর্মের বিরোধে রবীন্দ্রনাথ মানবতার জয়কেই স্বীকার করেছেন। এখানেই সন্দীপের দেশপ্রেমের থেকে তার বোধ স্বতন্ত্র।

এই দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির পুরুষের বিপরীতমুখী আকর্ষণ বিকর্ষণের দোলায়িত ভাবনায় বিমলার চিত্তসংকট ঘনিয়ে এসেছে। স্বামীর প্রতি বিমলার মনে প্রথমাবধি ছিল ভক্তি মিশ্রিত প্রেমানুরাগ। সে বলেছে—

"আমার স্বামী বলে এসেছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ" নিখিলেশ তার স্ত্রীকে ঘরের চার দেওয়াল থেকে মুক্ত করে বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছে। তার বিশ্বাস বাইরে এসেই স্বামী স্ত্রীর যথার্থ আত্মআবিষ্কার সম্ভব। বাইরে এসে বিমলা সন্দীপকে প্রথম দেখায় পছন্দ করেনি। কিন্তু তার অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় তার ভেতরে ভেতরে ভাঙচুর শুরু হয়েছে। বীরপূজার গৌরব ও উত্তেজনায় তার আবেগ হয়েছে বাঁধনহারা।

> "সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ ও অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল"

সন্দীপের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাসের তুলনায় বিমলার মনে হয়েছে নিখিলেশ নিরুত্তাপ ও দুর্বল। সন্দীপের স্তুতিবাদে সে মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট হয়েছে। নিজেকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে এবং আপন অজ্ঞাতেই সন্দীপের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ছুটে গেছে। নিখিলেশের কাছ থেকে কখন যে সে অনেক দূরে সরে গেছে—সে নিজেও বোঝেনি। অথচ একসময় সন্দীপের বিকৃত রূপের পরিচয় বুঝেও সে আত্মসংবরণ করতে পারেনি। পতঙ্গের মত সন্দীপের বহ্নিময় উত্তাপে দগ্ধ হয়েছে। তার এই আত্মসংকট ও তার আবর্তে ঘুরে ফেরাই উপন্যাসের উপজীব্য। এই সংকটের বীজ তার চরিত্রেই ছিল। তাই নিখিলেশ বলেছে—

> "ধৈর্যের পরে বিমলার ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।"

কিন্তু সন্দীপকে ঘিরে বিমলার মোহভঙ্গ তার চরিত্রেরই অন্য দিক। আকস্মিক ঝড়ের মত সন্দীপ তার চিত্তাকাশ আলোড়িত করলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ সে নিজের মধ্যেই খুঁজতে চেয়েছে তখনই অমূল্যের আবির্ভাবে সে কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে। একই সঙ্গে সন্দীপের অর্থলোলুপতা ও অসংযমী চিত্তের নিরাবরণ প্রকাশে তার মোহাবেশ ছিন্ন হয়েছে। অমূল্যকে কেন্দ্র করে তার স্নেহ ও শুভবোধতাকে পুরাতন পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। স্বামীর সিন্দুক থেকে সন্দীপের জন্য টাকা চুরি করতে গিয়ে তার মন যে ন্যায়নীতির বোধ ও অনুশোচনার দংশন হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত ছিল তার মোহভঙ্গের বীজ।

গৌণ চরিত্রে মধ্যে মেজরানী, চন্দ্রনাথবাবু ও অনূল্য লেখকের সৃষ্টিকুশলতার নিদর্শন।

বিমলার সন্দীপকেন্দ্রিক মোহভঙ্গে কোনো না কোনোভাবে এদের প্রভাব কাজ করেছে। অমূল্য চরিত্র এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, অবশ্যই বিমলার আত্মবীক্ষণ তাকে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে। অপরাধবোধে পীড়িত হৃদয় নিয়ে সে ফিরতে চেয়েছেন' বছর আগেকার দিনে—যেদিন চন্দন চেলি পরে এক নবভধূ এসে দাঁড়িয়েছিল নিখিলেশের পাশে। সে যখন আপনমনে বলে—

> "আজ আমি এই যে টাকা চুরি আনলুম, এও তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের
> চিরকালরে আলো চুরিরই মতো—এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি বিশ্বাস
> চুরি, ধর্ম চুরি।"

—তখনই মনে মনে তার আত্মদহন শুরু, শুরু মানসিকভাবে ফিরে আসার সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত বিমলার অনুতাপ ও বেদনার আঁখিজলে নিখিলেশের উদার প্রশান্ত প্রেমের শুভবোধে ওদের মিলন ঘটেছে।

৩.৯ যোগাযোগ (১৯২৯)

'চোখের বালি' রচনার আগে ছিল দীর্ঘ ১৬ বছরের নীরবতা। রাজর্ষির (দ্বিতীয় উপন্যাসের) পর তৃতীয়টি রচিত হয়েছিল এই দীর্ঘ ব্যবধানে। চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরের পর আবার দীর্ঘ বিরতি। তেরো বছর পর 'যোগাযোগ' প্রকাশিত হয়।

রবীনদ্র উপন্যাসও তাঁর কাব্য কবিতার মত তত্ত্বাশ্রয়ী এমন ইঙ্গিত অনেকেই করে থাকেন। বিশেষত তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাস দুই বোন, মালঞ্চ, শেষের কবিতায় এই তত্ত্বভাবনা স্পষ্ট প্রকাশিত। এই মন্তব্যের যোগ্য উত্তর—যোগাযোগ।

১৯২৯-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসে তত্ত্ববিনির্মুক্ত সমাজচিত্রণ লক্ষ্য করা যায়। এর চরিত্রগুলি বিশিষ্ট সমাজজীবনের আদর্শে গড়ে উঠেছে। সমাজজীবনের সন্ধিলগ্নের এই উপন্যাসে এই নৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের ছবিটি স্পষ্ট।

গল্পটির অন্তরঙ্গ জীবনভাবনায় আছে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সংকট। কুমুদিনী ও মধুসূদনের অন্তর্বিরোধ এ উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু কুমু ও মধুসূদনের বিরোধ অকেটাই বিপ্রদাস ও মধুসূদনের বিরোধ—আরো বিশদভাবে বলতে গেলে দুটি শ্রেণীর বিরোধ। সেই শ্রেণী বিরোধের উৎস দুই পরিবারের বংশগত বিরোধ।

তাই দাম্পত্য সমকট যা একটি পরিবারের ঘটনা তার প্রেক্ষিত পরিবার ছাড়িয়ে সমাজকে ছুঁয়েছে, ব্যক্তিদ্বন্দ্ব ব্যাপ্তি পেয়েছে শ্রেণীদ্বন্দ্বে। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতাকে আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পৌঁছে দিয়েছেন।

নূরনগরের চাটুয্যে পরিবার অর্থ প্রতিপত্তির চূড়ান্ত শীর্ষে ছিল—আজ তাদের পতনোন্মুখ অবস্থা। অন্যদিকে বাণিজ্য লক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদে সদ্য ফেঁপে ওঠা নব্য ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মধুসূদন। নূরনগরের অভিজাত বিপ্রদাসের সঙ্গে তার সংঘর্ষ।

মধুসূদন ঘোষাল কিছুটা জেদের বশে নূরনগরের চাটুয্যে পরিবারে বিবাহ করেছে—অর্থের কৌলীন্যে আভিজাতকে ক্রয় করতে চেয়েছে। কিন্তু মন তো বাজর দরের হিসেবে চলে না। তাই কুমু তার ঘরে এলেও মনেতে প্রবেশ করেনি। দুজনের অন্তর্বিরোধের প্রকৃতি এমনই যে তাদের মেলা সম্ভব ছিল না, বণিকবুদ্ধি বস্তুলোভী মধুসূদনের কাছে কুমুদিনী তার নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্রের মত। নব্য ঐশ্বর্যমদমত্ত মধুসূদন কুমুকে স্ত্রী হিসাবে চেয়েছ শুধু তার বংশ গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে হৃদয়বৃত্তির কোনা আলোড়ন বা উচ্ছ্বাস ছিলনা, শুধু ছিল উদ্ধ্যত প্রভুত্ব স্পৃহা। স্বামী সম্বন্ধে কুমুদিনী বাল্যকাল থেকে যে ধরাণা পোষণ করে এসেছে তার সঙ্গে মধুসূদনের আচার-আচরণের কোনও মিলই ছিল না। কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিরোধের প্রকৃত ইতিহাস এই। বংশগৌরব প্রতিষ্ঠার সংকল্প প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার নির্মম ক্রুরতা ও ধনগর্ব এবং প্রভুত্ব বিস্তারের লোলুপতা মধুসূদন চরিত্রকে ঘিরে আছে। নারী সম্পর্কে তার ধারণায় কোনো মোহ বা মাধুর্য ছিল না। তাঁর চরিত্রের মধ্যেই বিবাহোত্তর জীবনের বিপর্যয়ের বীজ নিহিত। কুমুদিনীর সূক্ষ্ম হৃদয়বোধ মধুসূদনের স্থূল বোধের কাছে বারবার আঘাত পেয়েছে। তাদের দুজনের মানস বিচ্ছিন্নতা দাম্পত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভিশাপ ও অনতিক্রম্য ব্যবধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এই জটিলতা অবশ্য শেষাংশে কুমুর সন্তানসম্ভভাবনায় অনেকটাই সরলীকৃত সমাধান খুঁজে পেয়েছে।

এ উপন্যাসের নামকরণ লক্ষণীয়—এ কারণে যে পত্রিকায় ধারাবাহিকতা প্রকাশকালে এর নাম প্রথমে ছিল 'তিনপুরুষ', পরে 'যোগাযোগ' নামে ঘটলো পরিণতি। আসলে 'তিনপুরুষ' থেকে 'যোগাযোগ' নাম পরিবর্তনের মধ্যে গল্পের বস্তুর চেয়ে রূপের আকর্ষণই প্রবল হয়েছিল। এই নাম বদলের মধ্যেই উপন্যাসটির আন্তরধর্মের এক বড় পরিচয় বয়ে গেছে। 'তিনপুরুষ'-এ যে কাহিনীর বিস্তার 'যোগাযোগ' তা সংহত। আবার 'তিনপুরষ' নামকরণে যে ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস—যোগাযোগ নামকরণে সেই বহিরঙ্গ ক্রমের পরিবর্তে অন্তরঙ্গ সেতুর আভাস। এ প্রসঙ্গে 'নামান্তর' নামে একটি কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—

> "গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট।....... তিনপুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে, এই আমার একটা খেয়াল মাত্র ছিল। এ চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্য নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যই।"

এ কাহিনীর প্রধান তিনটি চরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণরীতি প্রয়োগ করেছেন। মূলত দাম্পত্য সংকটের কাহিনী হলেও বিপ্রদাস এর অন্যতম প্রধান চরিত্র। রুচিবোধ ও আভিজাত্যে মহিমময় বিপ্রদাস চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের প্রতিরূপ দেখি। বনেদী জমিদারকুলের আভিজাত্য গর্বের পরাজিত বেদনার পাশে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের আর্থিক কৌলীন্যের শক্তিমত্ততা দেকালেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত যে ছিল ঐতিহ্যবাহী পরাজিত ভূস্বামীদের প্রতি তা বোঝা যায়। তাই উপন্যাসে নব্য ধনী ব্যবসায়ী মধুসূদন ঘোষালের পাশে অস্তমিত অভিজাত গরিমার প্রতিনিধি বিপ্রদাসের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মমতা প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি অনভিজাত নব্য ধনী মদুসূদন ঘোষালকে তিনি যেন সচেতনভাবে স্থূল, অহংকারী, মদমত্তরূপে চিত্রিত করেছেন।

কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমুদিনী মধুর ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের প্রতীক। তার সঙ্গে পূর্ববর্তী হেমনলিনী, সুচরিতা ও পরবর্তী লাবণ্য চরিত্রের আত্মিক সম্পর্ক আছে। তবু কুমুদিনী আপন স্বরূপে অনন্যা।

গৌণ চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নবীন, মোতির মা এবং অবশ্যই হাবুল। ঘোষাল বাড়ির বদ্ধ পরিবেশে নবীন ও তার স্ত্রী ছিল কুমুর মনের খোলা জানলা আর হাবুল ছিল সে মুক্ত বাতায়ন দিয়ে দেখা একটুকরো নীলাকাশ। কুমুর মানসমুক্তির ক্ষেত্রে এদের অবদান স্মরণীয়। এর বিপরীতে স্থাপিত শ্যামা উল্লেখ্য এক নেগেটিভ চরিত্র।

'যোগাযোগ' একটি বৃহৎ সাগা জাতীয় রচনা হয়ে ওঠার সম্ভভাবনা ছিল। 'তিনপুরুষ' নামকরণ ও সূচনায় তৃতীয় পুরুষ অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনের বর্ণনার মধ্যে সেই দীর্ঘায়িত বিশাল ক্যানভাসের সম্ভাব্য আভাস মেলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসম্পূর্ণতার লক্ষণ নিয়ে যেন উপন্যাসটিকে সমাপ্ত করা হয়েছে। শোনা যায় এর পরবর্তী একটি খণ্ড লেখার অভিপ্রায় ছিল রবীন্দ্রনাথের, যদিও সেটি সম্ভব হয়নি, সুতরাং এক বৃহৎ অলিখিত উপন্যাসের প্রথমার্ধ বলে একে মনে হয়, যদিও রসগ্রহণে অসুবিধা হয় না, তবে এর আকস্মিক সমাপ্তি নিয়ে মনে একটা অতৃপ্তজনিত বেদনাবোধ হয়।

৩.১০ শেষের কবিতা (১৯২৯)

যোগাযোগের সমকালে রচিত 'শেষের কবিতা' সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রচনা। বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে এটি 'যোগাযোগ' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখক সমকালীন আভিজাত্যের একটি স্তরকে এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সমালোচকের মতে 'শেষের কবিতার' বৈশিষ্ট্য "এর অপূর্ব মধুর কাব্যরস, বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত বাকভঙ্গি, ভাষার উজ্জ্বল ও তির্যক গতি, অপূর্ব বর্ণবিলাসময় ভাব পরিবেশ।"

অমিত-লাবণ্যর অসামান্য প্রেমকাহিনী শিলং-এর পাহাড়ী পাথর প্রেক্ষাপটে স্থাপিত। এই কাব্যধর্মী উপন্যাস তার অবয়বে ও আত্মার ধরে রেখেছে চরম রোম্যান্টিকতা।

নায়ক অমিত অতি আধুনিক ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজের একজন। এরা কলকাতার অভিজাত বংশীয়, বিলেতে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়, ধনাঢ্য বংশের সন্তান, মাতৃভাষার চেয়ে ইংরেজি ভাষায় সহজ। এদের দিকেই রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য আধুনিকতার নির্মোক সরিয়ে হৃদয়বত্তার পরিচয়ও রাখলেন—কেটির চরিত্রে তারই প্রমাণ মেলে।

শেষের কবিতার কাহিনী গড়ে উঠেছে অমিত-লাবণ্যর প্রেমকে কেন্দ্র করে। শৈলশহর শিলং-এর পথ তাদের বেঁধেছিল বন্ধনীর গ্রন্থিতে। তাদের প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য রোম্যান্টিক মাধুর্য প্রকাশ করেছেন। তাই ঘটনার ঘনঘটা নয় কবিতার ছন্দোময়তায় কাহিনী এগিয়ে চলেছে। অমিত লাবণ্যর প্রেম যখন পরপূর্ণতার দিকে অগ্রসরমান তখন তার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে কেটি মিত্রের অশ্রুজল, শোভনলালের বেদনা। অমিতের অতীত প্রেম কেটি আর লাবণ্যর অতীত স্মৃতি শোভনলাল—দুজনেই শেষ বর্তমানে উদ্ভাসিত হয়। তবে সেই অদূর অতীত নয়-শিলঙের পথে অমিত লাবণ্যর বর্তমানের প্রেমই কাহিনীর মূল বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই প্রেমে রেখে গেলেন এক মুক্তির বার্তা। প্রেমের বন্ধনেও বাঁধা নয় যে হৃদয়, সেই স্বাধীন মুক্ত হৃদয়ের কথাই শোনা গেল এ উপন্যাসে। তাই সমালোচক যথার্তই মন্তব্য করেন—

> "একই পুরুষ বা নারীর একজনকে ভালোবাসা, অন্যকে বিয়ে করা, অতবা একই পুরুষ বা নারীর একজনের সঙ্গে গভীর প্রেমে আত্মহারা অবস্থায় আপনার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অন্যের প্রতি প্রেম অন্তরে পোষণ করার যে- ছবি লেখক শেষের কবিতায় এঁকেছেন, তার চেয়ে মুক্ত হৃদয়ের বার্তা আর কি হতে পারে?"

এর থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার মুক্তি-বন্ধন তত্ত্ব এসেছে। অমিতের কাছে কেটি বন্ধন আর লাবণ্যমুক্ত প্রেমের বন্যাধারা। একেই স্পষ্ট করতে লেখক 'ঘড়ার জল আর দীঘির জলের' তত্ত্ব বার করেছেন। অমিত লাবণ্যর বিচ্ছেদের পর অমিত তাই বলেছে—

> "একদিন আমি সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি, কিন্তু আমার আকাশও রইলো।"

অমিত ও লাবণ্যই এ কাহিনীর প্রাণ। সঙ্গে আছে 'কেটি' ও শোভনলাল। গৌণ চরিত্রে মধ্যে যোগমায়া বিশেষ উল্লেখ্য। লাবণ্যর বাবা অবনীশের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া আছে সিসি, লিসি, বিমি বোস, নরেন কুমার-মুখো প্রভৃতি দল যাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বিশশতকের বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের বিশিষ্ট পরিশীলিত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়। এরা পুরোপুরি ইঙ্গবঙ্গ অনুকরণজাত আধুনিক ধনী সম্প্রদায়। এদের প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন 'ফ্যাশনটা হল মুখোস'। শিলং এর শৈলাবাসেই বাঙালি পাঠক সম্ভভবত প্রথম দেখলেন বাংলাসাহিত্যের প্রথম গভর্নেসকে, দেখলেন অভিজাত বর্ষিয়সী যোগমায়ার আন্তরিক অথচ স্মার্ট উপস্থিতি, দেখলেন বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কেটি মিত্তিরকে যে স্বচ্ছন্দে প্রথম আলাপেই ধূমপান করার জন্য এক বালিকার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে বসে।

নাগরিক চেতনাঋদ্ধ আধুনিকতার অনন্য নিদর্শন শেষের কবিতা-তেই মেলে যেখানে নরনারীর প্রণয় ও পরিণয় সম্পর্কিত মুক্ত চিন্তার অভিনব প্রকাশদীপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অন্য সব উপন্যাস থেকে এ গ্রন্থ শিল্পরূপে স্বতন্ত্র। এই ছোট উপন্যাসে কুড়িটিরও বেশি কবিতা স্থান পেয়েছে। ফলে একে 'কাব্যোপন্যাস' বলা সঙ্গত। তবে কাব্যিক আবেদন সত্ত্বেও এটি মূলত উপন্যাস এবং পাত্রপাত্রীর মনোবিশ্লেষণও এতে যথাযথ চিত্রিত হয়েছে। সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যায়—

> "প্রেমের স্বরূপধর্ম, তার বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ, মানবমনের সূক্ষ্ম ভাববৃত্তির ওপর তার বিচিত্রবর্ণের কলাপ বিস্তার, কবিত্বময় বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে।"

৩.১১ দুইবোন (১৯৩৩)

রবীন্দ্র-উপন্যাসের শেষ পর্বের যুগলগ্রন্থর অন্যতম 'দুইবোন'। সমকালে রচিত 'মালঞ্চ'র সঙ্গে এর সম্পর্ক নিগূঢ়। বঙ্গাব্দ ১৩৩৯-এর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত দুইবোন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ পত্রিকাতেই বঙ্গাব্দ ১৩৪০-এর আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল 'মালঞ্চ'। কাহিনীগত দিক থেকেও এদের মধ্যে মিল আছে। উভয়ক্ষেত্রেই বিবাহিত পুরুষের জীবনে স্ত্রীর অসুস্থতার কালে সামাজিক সম্পর্কে আত্মীয়া রমণীর সঙ্গে প্রণয় সঞ্চারিত হয়েছে এবং ফলে ঘনিয়ে উঠেছে দাম্পত্য সংকট। দু'টি উপন্যাসের পরিণতি অবশ্য ভিন্নমুখী।

রবীন্দ্র উপন্যাসে তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। আমাদের মনে হয়েছে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বভাবনা থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছিলেন। কিন্তু 'দুইবোনে' আবার সচেতনভাবেই তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয় 'দুইবোন' উপন্যাসের শুরুই হয়েছে তত্ত্ব দিয়ে।

> "মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি, একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া।"

—এই দুই নারীতত্ত্বের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে উপন্যাসের কাহিনী। এর দুই বোন শর্মিলা আর ঊর্মিমালা যথাক্রমে মা ও প্রিয়ার জাতের মেয়ে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাদের কাব্যিক উপমায় বেঁধেছেন—মা হল বর্ষা ঋতু আর প্রিয়া হল বসন্ত ঋতু।

পুরুষের জীবনে কোনো না কোনো সময়ে দুই নারীরই হয়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষিতা, অভীপ্সিতা। এই চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে জীবন হয়ে ওঠে জটিল, সংঘাত হয় জটিলতর।

'দুইবোন' উপন্যাসে শশাঙ্ক-শর্মিলার দাম্পত্য জীবনে ঊর্মির আবির্ভাবে যে তরঙ্গ হিল্লোল দেখা দিল, তাতে ঘনিয়ে এলো সংকটের কাল। এই সংকট উভয়পক্ষেই তীব্র হয়ে উঠলো, কারণ শশাঙ্কের জীবনের দুই নারী—আসলে দুই বোন। নামকরণের এই সচেতন ব্যঞ্জনই গড়ে তুলেছে নাট্য অভিঘাত। অসুস্থ শর্মিলার সঙ্গী হবার কারণে ঊর্মিমালার আবির্ভাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিদির জীবনে মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে উঠলে সে-ই। আসলে শর্মিলার অতিরিক্ত সেবা যত্ন ও মমতায় শশাঙ্কর পৌরুষ মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে চাইত। তার রোম্যান্টিক মানসে কোথায় যেন একটু অতৃপ্ত কামনা ক্রিয়াশীল ছিল, সেবাপরায়ণা শর্মিলা যা পূর্ণ করতে পারেনি। একনিষ্ঠ দাম্পত্যর বাইরে যাবার মত জোর শশাঙ্কর ছিল না, কিন্তু শ্যালী-ভগ্নীপতির আপাতনিরীহ মধুর সরস সম্পর্কের সূত্রে হয়তো অজান্তেই তার হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ করলো। তখন তার আবেগ ও উচ্ছলতা এমনই বাঁধনহীন হল যে স্ত্রীর কথা ভাবার সময় রইলো না এমনকি তার ব্যবসাও ফেল পড়লো।

অনদিকে শর্মলা নিজের বোনের সঙ্গে স্বামীর হৃদয়গত সম্পর্ক অনুমান করতে পেরে বেদনার্ত হলেও নিজেকে সংযত করেছে। নিজের রোগের কারণে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিনী হয়ে না ওঠার অজুহাতে নিজে থেকে বোনের সঙ্গে স্বামীর বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছে। পাঠকের মনে বিষবৃক্ষের 'সূর্যমুখী'র কথা চকিতে ভেসে ওঠে। সেখানে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহে সম্মতি দেয়। এখানেও শশাঙ্ক ঊর্মিকে বিবাহে মত দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে এই বিবাহ হয়ে ওঠেনি। শশাঙ্কর ব্যবসা ডুবে যাওয়ায় ঊর্মি যেন নিজের অপরাধবোধে পীড়িত হয়েছে, যে বোধ তার মনে প্রথমাবধি সুপ্ত ছিল—এই আঘাতে তা স্পষ্ট জাগ্রত হয়ে উঠে ঊর্মিকে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রায় প্রণোদিত করেছে। অন্যদিকে শর্মলা প্রায় অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে শশাঙ্ক নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে ফিরে আসে শর্মিলার কাছে—

> "আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে...যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই, একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিল, তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।"

শর্মিলাও তার বুদ্ধি ও বোধ এবং হৃদয় দিয়ে স্বামীর অনুতাপকে বুঝতে পেরেছে—তাই তাদের যথার্থ মিলনে উপন্যাস পেয়েছে সুখ পরিণতি। ঊর্মির চরিত্রের ট্র্যাজিক আভাস অনেকটাই প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে।

এই তিনটি প্রধান চরিত্রের সঙ্গে চতুর্থ চরিত্র—নীরদ, প্রথমাবধি যাকে ঊর্মির ভাবী স্বামী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই চারটি চরিত্রকে নিয়ে ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করে উপন্যাসের চারটি অংশ চারজনের নামে চিহ্নত করা হয়েছে। তবে চতুরঙ্গের মত একটি প্রধান চরিত্র এখানে একা কথকের দায়িত্ব পালন করেনি।

আয়তনের দিক থেকে 'দুইবোন-কে ছোট উপন্যাস বলা যায়। অবশ্য এজাতীয় পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ শেষদিকে বারবার করেছেন। দুইবোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায়-এর আয়তন ছোটগল্প 'নষ্টনীড়ে'র মত। 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' আয়তনে নষ্টনীড়ের চেয়ে কম। তবু রবীন্দ্রনাথ 'নষ্টনীড়'কে ছোটগল্প এবং দুইবোন-মালঞ্চকে উপন্যাস বলেই চিহ্নিত করেছেন। এর রচনারীতিতে আছে সংহত সংযম ও নাটকীয় চমৎকারিত্ব। ফলে একাধারে ছোটগল্পের সংযম, নাটকের শীর্ষসংঘাত এবং উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিলে এই উপন্যাসিকা হয়ে উঠেছে শিল্পিত এক সাহিত্য মাধ্যম।

৩.১২ মালঞ্চ (১৯৩৩)

দুইবোনের সমকালে লিখিত 'মালঞ্চ' উপন্যাসের বিষয়ও সমধর্মী। মনে হয় 'দুইবোনে' যা বলতে চেয়েছিলেন, তারই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত রূপ—মালঞ্চ। 'মালঞ্চ'-তে দুইবোনের মতই এক পুরুষের দুই নারীতে আসক্তি ও আকর্ষণ, সেইসঙ্গে দ্বিতীয় এক পুরুষ চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কোনো দুটি উপন্যাসে এমন মিল আর দেখা যায় না। তবে আন্তর ধর্মে কিছু প্রভেদও আছে, সেটা স্পষ্ট হয়ে ধরদা পড়েছে নামকরণে। 'দুইবোন' যেখানে চরিত্রের ভাবদ্যোতক, মালঞ্চ সেখানে অনেকটাই প্রতীকধর্মী। 'মালঞ্চ' কেবল সাজানো বাগানই নয়—তা যেন আদিত্যর মানস-উদ্যানও। আদিত্য ফুল ফোটানোর কারিগর। তার প্রিয় বাগান তার ফুলের ব্যবসার উৎস। দোকানের দিক তার ব্যবসায়ী দিক, আর বাগান তার মনের রোম্যান্টিক দিক। ফুলের বাগান আদিত্য গড়ে তুলেছে স্ত্রী নীরজার সঙ্গে, তাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবন ভরে উঠেছে মালঞ্চের পুষ্প লাবণ্যে। সন্তান সম্ভাবনার অঙ্কুর বিনিষ্ট হবার পর থেকেই কঠিন রোগে শয্যাগতা হল নীরজা। তার সেবা ও বাগানের পরিচর্যার কারণে সংসারে আগমন ঘটলো সরলার—আদিত্যর সঙ্গে তার আছে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার ক্ষীণসূত্র। দুইবোনে শর্মিলার অসুস্থতার কারণে ঊর্মিমালার আগমনের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসবে। তবে নীরজা যেমন শর্মিলা নয়—সরলাও ঊর্মির সমগোত্রীয় নয়। চরিত্রগুলি আন্তরধর্মে সদৃশ নয়, যদিও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পরিস্থিতি অনেকটাই এক হয়ে উঠেছে।

সরলার জ্যাঠামশাই আদিত্যর সম্পর্কিত মেসোর কাছেই তার ফুলের শিক্ষা লাভ। নীরজার সঙ্গে বিয়ের আগে আদিত্যর সরলার সঙ্গে যে সখ্যতা ছিল, তার গভীরে অন্তর্লীন থাকা প্রেম আবার জেগে ওঠার সুযোগ পেল। অসুস্থ স্ত্রীর বাগানে অনুপস্থিতির সুযোগে আদিত্যর জীবনে জেগে উঠলো সুপ্ত প্রণয় মধুরিমা। 'মালঞ্চ' নতুন পুষ্পে হল মঞ্জরিত। সরলা 'দুইবোনে'র ঊর্মিমালা নয়—সেই উচ্ছলতার পরিবর্তে তার চরিত্রে আছে অন্তর্মুখী গভীরতা। সে নিজেকে আড়াল করে রাখতেই ভালোবাসে।

এ কাহিনীতেও দ্বিতীয় পুরুষ চরিত্র আছে—রমেন। দুইবোনের নীরদের সঙ্গে তার স্বভাবের কোনো মিল নেই। সরলা সম্পর্কে তার মনে আছে স্নিগ্ধ অনুরাগ। এই পারিবারিক উপন্যাসে রমেনের চরিত্রই রাজনীতির সূত্রে সামাজিক পরিমণ্ডলের স্পর্শ নিয়ে এসেছে। ১৯৩০ থেকে সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে আইন-অমান্য আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল এ কাহিনীতে সেই প্রসঙ্গ এসেছে তাতে রমেনের সক্রিয় যোগদানের সূত্রে। রমেন কারাবরণও করেছে, এমনকি সরলাও বে-আইনী সভাসমাবেশে যোগ দিয়ে জেলে গেছে। অবশ্য সরলার ক্ষেত্রে এটি এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি—আদিত্য-নীরজার সংসার মালঞ্চ থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা।

এ উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে চারটি চরিত্রের অন্তর্লোক বিশ্লেষিত হয়েছে। আদিত্য-নীরজার দাম্পত্য সুখ নীরজার অসুস্থতায় সরলার উপস্থিতিতে অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে। নীরজার ঈর্ষায় আদিত্য-সরলার সুপ্ত নুরাগ খুঁজে পেয়েছে প্রকাশের পথ। আবার রমেন তার প্রেম নিবেদন করেছে সরলাকে—যদিও আদিত্যকে ঘিরে সরলার হৃদয় দৌর্বল্য তার অজানা ছিল না। সরলার হৃদয় আদিত্যর কাছে বাঁধা পড়েছিল—কৈশোরকালের অঙ্কুর তরুণ যৌবনে মঞ্জরিত হবার পথ খুঁজে পেয়েছিল যদিও রমেনের প্রতিও ছিল তার এক ধরনের অনুরাগ। নীরজা চেয়েছে রমেনের সঙ্গে সরলার বিয়ে দিয়ে জটিল রহস্যের সহজ সমাধান। আদিত্য কর্তব্যপরায়ণ স্বামী কিন্তু সরলার মধ্যে তার প্রথম প্রণয়ের পূর্ণ বিকাশে তার প্রেমিক সত্তা নীরজার কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে। চারটি চরিত্রের এই মানস আন্দোলনের ছবি উপন্যাসে দেখেছি—কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনেক সময়ই আড়ালে থেকে গেছে। অনেকটা ক্রমভঙ্গ রীতিতে লিখিত এই উপন্যাসে নাটকীয়তা অনেক বেশি। সম্ভবত এজন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজে এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।

দুইবোনের সমস্যা একই ধরনের হলেও সমাপ্তি কিন্তু ভিন্নতর। দুইবোনে ঊর্মি দিদির সংসার বাঁচাতে নিজে চলে যায় এবং শশাঙ্ক-শর্মিলার মিলন ঘটে। মালঞ্চ-তে কিন্তু শেষপর্যন্ত নীরজার মৃত্যু ঘটে। শেষ অধ্যায়ে নীরজা মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে যে চিরবিদায়ের আগে সে প্রসন্নমনে সরলাকে দিয়ে যাবে আদিত্য ও মালঞ্চর সব দায়িত্ব। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সরলা যখন তার কাছে এল তখন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে নীরজা বুঝতে পারলো তা সে পারবেনা। তাই তার অন্তিম উক্তি—

> "দিতে পারবো না, পারবো না....। জায়গা হবে না তোর.... আমি থাকবো, থাকবো, থাকবো।"

এ কাহিনী তাই শেষপর্যন্ত বিষাদকরুণ হারাকারেই সমাপ্ত হয়েছে।

৩.১৩ চার অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস—চার অধ্যায়। এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাস প্রকাশকালে তর্কবির্তকের সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাও বিশেষ সমালোচিত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালি নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলা দেসের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র, এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মদ্যে যে তীব্রতা যে বদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়।"

লেখকের এই উক্তি 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের প্রেমকাহিনীকেই আলোকিত করতে চেয়েছ। সমকালীন রাজনীতির ক্লেদাক্তরূপ ও বিপ্লবের ব্যর্থতাকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের সূচনার 'আভাস' অংশটির কথা মনে আসে। এইঅংশে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গেগ কবির শেষ সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। আলাপ আলোচনার শেষে ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে বলেন—'রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে।'

এই ঘটনাটি 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের সূচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল, যদিও পরে সেটিকে বাদ দিয়ে দেন। মনে হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এই সকরুণ স্বীকারোক্তি উপন্যাসের উৎস রূপে কাজ করেছে। সন্ত্রাসবাদী এই বিপ্লববাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অস্ত্যর্থক ছিল না। দেশপ্রেমের নামে সন্ত্রাস, সুলভ ভাবাবেগ, আদর্শের নামে গুপ্তহত্যাকে তিনি কোনোদিন সমর্থন করেননি।

সেই বিরোধী বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে নায়ক অতীনের মুখে। বিপ্লবপন্থায় আস্থা না থাকলেও সে আছে ইন্দ্রনাথের বিপ্লবী দলে, যেখানে আছে নায়িকা এলা-ও। এলা ও অতীনের প্রেম এই ঝোড়ো আবহাওয়াতেও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। কিন্তু দলের আদর্শ ওদের মিলতে দিল না। এইদলের মধ্যে আছে পুলিসের গোপন চর বটু—যে মনে মনে এলাকে কামনা করে, অতীনকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে চায়। এই পরিস্থিতিতে দলের সকলে এলার মৃত্যু কামনা করে এবং ইন্দ্রনাথ অতীনকেই দিয়েছিল এলাকে হত্যা করার দায়িত্ব। এলাকে বটুর হাত থেকে এবং পুলিশী নির্যাতন থেকে বাঁচাতে অতীন নিজেই নেয় তাকে হননের দুরূহ ভার। প্রেমের তীব্র গভীরতাতেই সে এলাকে চিরতরে ঘুম পাড়াবার দায়িত্ব নেয় এবং দুজনের আবেগতপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়।

রাজনীতি দিয়েই উপন্যাসটি সূচিত হয়, শেষও হয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে, কিন্তু তার মধ্যে নরনারীর প্রবল মিলনাকাঙ্ক্ষা বাঁধা পড়ে যায়। শেষ দৃশ্যের নাটকীয় মুহূর্তে অতীন এলার সংলাপ ও আচরণে যে আবেগ সংরাগের

রক্তিম উচ্চারণ ভালোবাসার অনন্ত তৃষ্মার প্রকাশ—এমটি রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনায় দেখা যায়নি। অগ্নিযুগের প্রলয়ঙ্কর পটভূমিতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ কাহিনীর অতীন ও এলা প্রেমের জয় ঘোষণাই করে গেছে।

তাই দলপতি ইন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক কানাই গুপ্ত, গুপ্তচর বটু মিলে যে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকাকে ঘনিয়ে তুলে থাকুক না কন, আসলে রবীন্দ্রনাথ প্রণয়পিপাসাতুর দুই নরনারীর প্রেমবাসনার ছবিকেই এখানে অনন্তের ফ্রেমে বন্দী করতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের প্রলয়রূপকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'পতনে'র স্বীকারোক্তি তাঁকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে বীতস্পৃহ করেছিল মনে হয়।

'চার অধ্যায়' নামকরণ সম্ভবত এর গঠনরীতি অনুসারে করা হয়েছে। এর প্রধান চরিত্র তিনটি কিন্তু চারটি বিচ্ছিন্ন অংশের সমন্বয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এর কাহিনী রচিত হয়েছে নাটকীয় পদ্ধতিতে। গল্প বলার দিকে নজর না দিয়ে লেখক সংলাপমুখ্য নাট্যরীতিতে কাহিনীকে গতিশীল করেছেন।

৩.১৪ অনুশীলনী

১। বাংলাসাহিত্যের প্রথম সার্থক আধুনিক উপন্যাস হিসাবে 'চোখের বালির' মূল্যায়ন করুন।
২। মহাকাব্যির উপন্যাস হিসাবে 'গোরা'র পরিচয় দিন।
৩। 'ঘরে-বাইরে' নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
৪। চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কী? প্রধানত শচীশ চরিত্র অবলম্বনে উত্তর দিন।
৫। যোগাযোগ উপন্যাসের দাম্পত্য সংকটের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের সংঘাত কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করুন।
৬। কাব্যধর্মী উপন্যাস হিসাবে শেষের কবিতার মূল্যায়ন করুন।
৭। যুগল উপন্যাস দুইবোন ও মালঞ্চর তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৮। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে 'চার অধ্যায়'-এর সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিন।
৯। রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী চরিত্রের স্বরূপ ও বিবর্তনের পরিচয় দিন।
১০। রবীন্দ্র উপন্যাসের গৌণ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ—সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত।
২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু।
৪. রবীন্দ্রমনন—রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৮৭।
৫. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—ক্ষেত্রগুপ্ত, ১৯৯৪।
৬. রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে—ভূদেব চৌধুরী।
৭. রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (দে'জ)
৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)—সুকুমার সেন।
৯. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-নবমূল্যায়ণ (১৯৮৩) অমরেশ দাশ।
১০. রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা—সহদেব দে (১৯৭১)।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৪ □ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও প্রবন্ধ

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা ঃ গল্প

৪.২ গল্প পাঠ ও আলোচনা

৪.৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তালিকাসূচি

৪.৪ প্রস্তাবনা ঃ প্রবন্ধ

৪.৫ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ প্রস্তাবনা

"গল্পগুচ্ছ আশ্চর্য বই। ইতিহাসের দিক থেকে আশ্চর্য, আন্তরিক মূল্যেও তাই।"—বুদ্ধদেব বসুর (রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য) এই মন্তব্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভুবন আলোকিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের হাতেই রচিত হয়েছিল যথার্থ বাংলা ছোটগল্প। তাঁর আগে ও জাতীয় রচনা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হলেও এবিষয়ে সকলেই একমত যে তিনিই বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্পের স্রষ্টা। প্রধানত সাময়িক পত্র-পত্রিকার তাগিদে তাঁর গল্প লেখা শুরু হয়, যদিও সেই উপলক্ষ্যকে ছাড়িয়ে তিনি অসামান্য ছোটগল্পের সায়কে লক্ষ্যভেদ করেন সাহিত্যক্ষেত্রে। তাঁর রচিত জীবনরস নিটোল ছোটগল্পগুলি সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ।

যৌবনে পদ্মার বুকে সঞ্চরমান তরুণ কবিকে যখন মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে জাগিয়ে রাখছিলো তখনই শুরু হয়েছিল তাঁর ছোটগল্পের ধারা। একই সময়ে লিখিত ছিন্নপত্রের চিঠিতে দেখি তাঁর আত্মকথন—

> "এক এক সময় মনে হয়, আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।"
>
> (ছিন্নপত্র—৩০শে আষাঢ় ১৮৯৩)

এই পর্বে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে যেন সঞ্চিত আছে কবিহৃদয়ের সেই সুখানুভূতি যা বাস্তব প্রেক্ষিতে স্থাপিত হয়ে অনন্য রসমাধুরী লাভ করেছে।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ রবীন্দ্র ছোটগল্পসমূহকে সাতটি বিভিন্ন পর্বে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল—সূচনাপর্ব, হিতবাদীপর্ব, সাধনা-ভারতীপর্ব, সন্ধিপর্ব, সবুজপত্রপর্ব, লিপিকাপর্ব ও অন্ত্যপর্ব।

প্রথম পর্বের গল্পের সঙ্গে অন্ত্যপর্বের গল্পের রচনারীতিতে অনেক পার্থক্য দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে মানব মনস্তত্ত্বের অনবদ্য রূপায়ণ রূপে তাঁর গল্পগুলি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবাহী। সমালোচকের মন্তব্যের সঙ্গে আমরাও সহমত যে—

> "তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) ছোটগল্পের মতো একাধারে, একই কাঠামোর মধ্যে, কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্রসৃষ্টি, নাটকীয়তা ও কবিত্ব, সমাজস্বদেশ ও বৃহৎ মানবসমাজের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্য বেদনার এমন অপূর্ব

উদ্‌ঘাটন এবং মানবমনস্তত্ত্বের এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপায়ণ বাংলাসাহিত্যে অন্যত্র দূরের কথা, রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিরল।”

(অজিত দত্ত—‘রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প’)

৪.২ গল্পপাঠ ও আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প ‘ভিখারিণি’ ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি গল্পরচনার প্রথম প্রয়াস মাত্র, রবীন্দ্রনাথ একে ছোটগল্পের যথোচিত মূল্য দিতে অস্বীকার করেন, তাই গল্পগুচ্ছে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প—‘ঘাটের কথা’। ১২৯১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা ভারতীতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকরা অনেকেই এটিকে ছোটগল্পের পূর্ণ মর্যাদা না দিয়ে গল্পচিত্র বা গল্পাভাস বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে প্রাচীন এক ভাঙা ঘাটের রূপকে জীবনের সুখদুঃখময় কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। কবির অনুভব ও গল্পকারের জীবনমুখী দৃষ্টি সমন্বিত হয়ে নিটোল একটি ছোটগল্পরূপে ‘ঘাটের কথা’ বাণীমূর্তি লাভ করেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাট যেন প্রাচীন কোনো কথক—যে শুনিয়ে চলেছে সুখ-দুঃখ স্মৃতি-বিস্মৃতি জড়িত অনেক পুরোনো কথা। সেই স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই কুসুম নামের মেয়েটিকে, দেখতে পাই নবীনকান্তি সন্ন্যাসীকে। গল্পের সমাপ্তিতে জেগে থাকে একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ—গল্পটি লীরিক ব্যঞ্জনায় মধুর হয়ে ওঠে।

সূচনাপর্বের অন্য গল্প—‘রাজপথের কথা’। প্রথম দুটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ আত্মকথনরীতি ব্যবহার করেছেন। দুটিতেই আছে পথের কথা—প্রথমটিতে ঘাটের বর্ণনায় পায়ে চলার পথ এবং দ্বিতীয়টিতে রাজপথের বর্ণনায় পথিক মানুষের চলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। এ গল্পটি আদিতে বিচিত্রপ্রবন্ধে সংকলিত হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল ‘রাজপথ’। শেষে অবশ্য কবি স্বয়ং একে গল্প অভিধা দান করেছেন।

দুটি রচনা ঘাটের কথা ও রাজপথের কথার প্রায় সাত বছর পরে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে সাপ্তাহিক ‘হিতবাদী’ পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র ছোটগল্প রচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু। এই পর্বে দেনাপাওনা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, পোস্টমাস্টার, ব্যবধান ও গিন্নি গল্প রচিত হয়েছিল। এই সময় ছিল রবীন্দ্রজীবনে শিলাইদহ পর্ব—যখন বোটে করে পদ্মার বুকে ভাসমান অবস্থায় তিনি গ্রামবাংলার জীবনের মুখ দেখেছেন। পোটমাস্টার গল্পে তার সার্থক প্রকাশ দেখা যায়। এই গল্পের বীজ ছিন্নপত্রে চিঠিতে প্রচ্ছন্ন আছে। সাহজাদপুরের এক পোস্টমাস্টারের সঙ্গে সেসময় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে ভেবেই পোস্টমাস্টার গল্পটির সূচনা। অবশ্য এর বিস্তার ও পরিণতির ক্ষেত্রে লেখকের কল্পনাই ছিল প্রধান।

‘দেনাপাওনা’ গল্পটি বাংলায় বধূনির্যাতন ও পণপ্রথা সম্পর্কিত নিষ্ঠুর বেদনাকরুণ কাহিনীর নিপুণ চিত্রায়ণ।

রবীন্দ্র ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ বলে পরিচিত সাধনা-ভারতী পর্ব। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার ‘সাধনা’ পত্রিকায় ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ দিয়ে এই পর্বের শুরু। আবার এই গল্পেই প্রথম প্রমত্তা পদ্মানদীর আবির্ভাব ঘটলো রবীন্দ্রকথাসাহিত্যে। শিলাইদহে বোটে সঞ্চরমান কবির কাছ পদ্মা যে একটি বিশেষ ভূমিকায় প্রবহমান, তা তাঁর সাহিত্যে বারেবারে নানাভাবে প্রভাব রেখে গেছে। এই গল্পে পদ্মা যেন মৃত্যুরূপা—সমালোচক এই মন্তব্য করে পদ্মার জলরাশির মধ্যে খোকাবাবুর হারিয়ে যাওয়াকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই গল্পে প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের নিগূঢ় রহস্য ও অন্তর্লোকের জটিলতা মিশে গেছে। এর মধ্যে লেখকের সত্যদৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। রোম্যান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন না হয়ে তা যেন বাস্তবের অনুলিখন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে বাস্তব নির্মম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের লীরিকধর্মী গল্পের পাশাপাশি এই গল্পটিতে নিষ্ঠুরতার এক বীভৎস ছবি লক্ষ্য করা যায়। যখের ধন-এর লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এ গল্পের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। কিন্তু নির্মম প্রথার বর্ণনা ছাড়িয়ে গল্পটি অসামান্য ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করে ছোটগল্প হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

শিক্ষিত নাগরিক সাহিত্য পাঠকের কাছে পল্লীজীবনের এই চিত্র, এই গ্রামীণ সংস্কার অজানা ছিল। জমিদারির কাজে রবীন্দ্রনাথকে যখন পল্লী প্রকৃতি ও সমাজের কাছাকাছি যেতে হলো—তখনই তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ জীবনদৃষ্টি দিয়ে তিনি পল্লীজীবনের দুঃখসুখ আনন্দবেদনার ছবিকে প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রকম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে, কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ, রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটিই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে"

গল্পগুচ্ছের অন্যতম গল্প 'দালিয়া'-তে ইতিহাসের ভগ্ন এক টুকরো থেকে এমনই গল্পাভাস খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সম্রাট সাজাহানের পুত্র শাহসুজার ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী সূত্রে মোগল হারেম থেকে আরাকান রাজপরিবার পর্যন্ত পটভূমিতে বিস্তৃত এই গল্পে আছে এক মধুর প্রেমকথা, যা পাঠককে নাটকীয় চমৎকারিত্বে মুগ্ধ করে রাখে।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দুরাশা' গল্পের পটভূমি-ও ঐতিহাসিক। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গল্পে মাত্র চারদশক পূর্বের ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট বর্ণিত। বদ্রাওনের নবাবপুত্রীর জীবনকথায় দেখি রোম্যান্সের কল্পলোককে ভেঙে দিয়েছে নির্মম জীবনসত্য। আচারধর্ম, সংস্কার ও হৃদয়ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতময় এমন ট্র্যাজেডি সাহিত্যে অল্পই দেখা যায়।

এই পর্যায়ে রচিত প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্প-কঙ্কাল। ব্যক্তিগত বাল্য-স্মৃতির অনুষঙ্গে রচিত গল্পটি আসলে এক প্রেমবঞ্চিতা নারীর জটিল মনস্তত্বের কাহিনী। বক্তা-শ্রোতা রীতিতে পরিবেশিত এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বাল্যকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ঘরে ছিল এক কঙ্কাল, সেটির সাহায্যে কবি ও তাঁর সঙ্গীরা অস্থিবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন। বহুকাল পরে ঘটনাচক্রে সেই ঘরে শয়ন করতে এসে তাঁর মনে পড়ে ছোটবেলার কঙ্কালটির কথা। সেই প্রসঙ্গে বর্তমান গল্পে একটি অনস্তিত্বের অস্তিত্ব ঘটে, মনে হয় হারানো কঙ্কালের খোঁজে একটি রমণীর অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভূত হচ্ছে। ধীরে ধীরে এক অতৃপ্ত নারীর উদগ্র প্রেমবাসনা ও ব্যর্থ বসন্তের শোচনীয় মর্মান্তিক পরিণতি গল্পটিকে ঘিরে রাখে।

"জীবিত ও মৃত" গল্পটি অতিপ্রাকৃত নয় কিন্তু সাধারণ স্বাভাবিকও নয়। সম্মোহিত, স্বপ্নাচ্ছন্ন ও নিদ্রাজাগর অবস্থায় মানুষের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা দ্বিতীয় সত্তা এই গল্পের উৎস। এ সম্বন্ধে নিজেই একবার বলেছিলেন কোনো এক গভীররাত্রে একাকী সঞ্চরমান অবস্থায় তাঁর মনে হয়েছিল "যেন এ আমি আমি নই। যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হয়ে গেছে।"

এই বোধ থেকেই তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি উৎসারিত হয়েছে। 'জীবিত ও মৃত' গল্পের নায়িকা কাদম্বিনীকে সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন "বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিঃসঙ্গ মানুষ"। এই পর্বের বিচিত্র গল্পসম্ভারের মধ্যে নানা রসের বিভিন্ন গল্পাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। কঙ্কাল, নিশীথের মত অতিপ্রাকৃত রসাশ্রিত মনস্তাত্বিক গল্পের পাশাপাশি একরাত্রির মত গীতিধর্মী প্রেমের কাহিনী, প্রকৃতি লালিত সুভা তারাপদ ও ফটিকের সাক্ষাৎ যেমন মেলে—তেমনি নিখিল পিতৃহৃদয়ের অনুভবঋদ্ধ কাবুলিওয়ালা, জীবনরসনিটোল মধ্যবর্তিনী, রহস্য কুহেলি আলো আঁধারি ক্ষুধিত পাষাণ, সামাজিক ধর্ম ও হৃদয় ধর্মের দ্বন্দ্ব জটিল 'অনধিকার প্রবেশ', রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জীবনের হাসিকান্নার 'মেঘ ও রৌদ্র', নির্মম সমাজসত্য—শাস্তি, অথবা 'বিচারক', ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত দগ্ধ প্রেমের প্রতীক 'মহামায়া' কিংবা গভীর জীবনদ্বন্দ্বের অসামান্য রূপায়ণ 'নষ্টনীড়'-এরও দেখা পাই।

বিভিন্ন বিষয়ক এই গল্পগুলির সাধারণ ধর্ম কিন্তু এক ও অভিন্ন। বিষয়ের একমুখিনতা, ঘটনাবাহুল্যের অভাব, চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও পরিণামের অতৃপ্তিজনিত জিজ্ঞাসাচিহ্নিত উপসংহার ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। একটি ক্ষণমুহূর্তে অনন্তের ব্যঞ্জনা ও সমাপ্তির ক্ষণপ্রভায় জীবনসত্যের চকিত উদ্ভাসন রবীন্দ্রছোটগল্পের লক্ষণ। তাঁর গল্পে ঘটনার চেয়ে অনুভবই প্রধান। অনেকসময়ই সমগ্র কাহিনী দাঁড়িয়ে থাকে বিশেষ একটি ভাবের উপর।

এই প্রসঙ্গে 'সাধনায়' প্রকাশিত 'একরাত্রি' গল্পটির কথা মনে আসে—যেখানে একটি অনুভূতির দ্বিধা থরোথরো চূড়ে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র গল্প প্রতিমা। সুগভীর প্রেমানুভবের অনুচ্চারিত উচ্চারণে গল্পটি হয়ে উঠেছে দীর্ঘশ্বাসের মত সকরুণ, অশ্রুবিন্দুর মত নিটোল। আবার কাবুলিওয়ালা গল্পে ধরা পড়েছে নিখিল পিতৃহৃদয়ের স্নেহবাৎসল্যের করুণমাধুরী।

গল্পগুচ্ছের এই পর্বের উপাদান যদিও মূলত বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও মানব সমাজ—তবু বিষয় অনুসারে এগুলিকে শ্রেণীবন্ধ করা যায়।

ত্যাগ, মহামায়া, অনধিকার প্রবেশ, প্রায়শ্চিত্ত, দুরাশা প্রভৃতি গল্পে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের কথা আলোচিত। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, স্বর্ণমৃগ, দানপ্রতিদান, প্রতিহিংসা-তে অর্থসম্পত্তির প্রতি আসক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আবার মধ্যবর্তিনী, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, নিশীথে, মানভঞ্জন, নষ্টনীড়, ত্যাগ, মাল্যদান, একরাত্রি, দুরাশাতে দাম্পত্য সম্পর্ক ও প্রেমানুভবের চিত্রণ দেখতে পাই। মানবহৃদয়ের স্নেহবাৎসল্যের প্রকাশ ঘটেছে কাবুলিওয়ালা, ছুটি, দিদি, আপদ প্রভৃতি গল্পে। কঙ্কাল, নিশীথে, মণিহারা ও ক্ষুধিত পাষাণে অতিলৌকিক পরিবেশে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিবেশিত হয়েছে।

শাস্তি, সম্পত্তি সমর্পণ, পুত্রযজ্ঞ গল্পে দেখি নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যরূপ। সুভা ও অতিথি গল্পে দেখেছি প্রকৃতিমগ্ন চরিত্রায়ণ।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রসঙ্গে 'লীরিকধর্মী, বিশেষণটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাঁর কবি পরিচয়ের প্রভাব তাঁর বহু গল্পে পড়েছে একথা সত্য—কিন্তু রবীন্দ্র গল্পে বাস্তব দৃষ্টির যথাযথ প্রয়োগও দেখা গেছে। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি
> সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"

প্রকৃতপক্ষে কবিতা ও উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের যে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—তাঁর ছোটগল্প তার থেকে একেবারেই মুক্ত তত্ত্ববিনির্মুক্ত বাস্তব সমাজচিত্র এখানে উপস্থিত। উপন্যাসে যে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি নাগরিক বৈদগ্ধ্যময় তিনিই গল্পগুচ্ছে নেমে এসেছেন গ্রামীণ ক্ষেত্রে। সোনারতরী পর্বে মানুষ ও প্রকৃতির একেবারে অন্তরঙ্গ সখ্যতায় এসেছেন তিনি। ছিন্নপত্র ও গল্পগুচ্ছে সেই মর্ত্যধূলির স্পর্শ লেগে আছে। এমনকি তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পও বাস্তব ভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন—

> "সমগ্র গল্পগুচ্ছ পড়ে উঠলে আমাদের মনকে প্রবলভাবে এই কথাটিই আঘাত করে
> যে এর বেশির ভাগ গল্প আক্ষরিক অর্থে বাস্তব, সারা বাংলাদেশটাকে পাওয়া যায়
> এখানে।"

এই প্রসঙ্গে 'শাস্তি' গল্পটির কথা মনে আসবে। এখানে প্রমত্তা পদ্মার ভীষণ রূপটি আবার দেখা যায়। পল্লী অঞ্চলের বর্ষাকালের ছবি এ গল্পে দেখি। ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে
> তার পাশ দিয়ে তেতে গা কেমন করে"

নগরজীবনে প্রতিপালিত রবীন্দ্রনাথের শিলাহদহ পূর্বে পল্লীজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। তিনি নিজেই লিখছেন—

> "পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, তার জন্য কিছু করবো এই
> আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল।"

এরই ফলশ্রুতির সাহিত্যিক প্রকাশ এই পর্বে লিখিত গল্পগুলি যেখানে পল্লীজীবন তার তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বাস্তবমৃত্তিকা থেকে উঠে এসেছে। 'শাস্তি' গল্পে ভূমিহীন দীনদরিদ্র কুরি পরিবারের দুই ভাই দুখিরাম ও ছিদামের জীবনের একটি দিনের একটি ঘটনার ভিত্তিতে যে ছবি আঁকা হয়েছে, তার মধ্যে আর্থসামাজিক বঞ্চনা ও জীবনের বিচিত্র রহস্য উদঘাটিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিধর্মি কল্পনা প্রাবল্য গল্পভূমিকে সিক্ত করেন—এমন অভিযোগের উত্তরে 'শাস্তি' গল্পের নির্মম বাস্তব চিত্রণকে তুলে ধরা যায় যেখানে মেঘের মিনারের কল্পলোকের কুয়াশা নয়, বজ্রাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তা চন্দরার শাস্তিই কি গল্পের নামকরণে প্রকাশ পেয়েছে? প্রকৃতপক্ষে এ শাস্তি যত না চন্দরার—তার চেয়েও বেশি ছিদামের। দাদাকে হত্যাপরাধ থেকে বাঁচাবার প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসাবে স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে যে তাৎক্ষণিক ভুল ছিদাম করেছিল, তারই শাস্তি তাকে আমৃত্যু বহন করতে হবে। এখানেই 'শাস্তি' নামকরণ খুজে পেয়েছে তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা। চন্দরার শেষ উক্তি 'মরণ' শুধু চন্দরার অপমানিত লাঞ্ছিত মানবীসত্তার মৃত্যুই নয়, বেঁচে থেকেও মরণাহত ছিদামের অনন্ত শাস্তি ভোগের ব্যঞ্জনা বহন করে। ছোট প্রাণের ছোট ছোট ব্যথাবেদনার এমন নিটোল কাহিনী রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে আছে, যার মধ্যে ধরা পড়েছে পল্লীবাংলার আবহমান বাস্তব।

এই বাস্তবের সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতির সুনিবিড় যোগের পরিচয় বহন করে সুভাষ অতিথি, ছুটি, পোস্টমাস্টারের মত অনন্য গল্পগুলি। এই গল্পগুলিতে বাংলার সজল স্নিগ্ধ প্রকৃতি যেন প্রেক্ষাপট রচিত করেছে। সুভা, তারাপদ ও ফটিক যেন গল্প তিনটির প্রধান চরিত্রই কেবল নয়, মর্ত্যমৃত্তিকাজাত শ্যামলিমা দিয়ে ঘেরা তিনটি সত্তা, যারা নাগরিক বন্ধন বা শৃঙ্খল থেকে মুক্তি কামনা করেছে। মূক সুভার সুগভীর বেদনা প্রকৃতির করুণ বিষাদে যেন মিশে গেছে। তার গোপন ব্যথা, অন্তর্লীন বেদনা, হৃদয়রহস্যের তরঙ্গাভিঘাত প্রকৃতির লীলায় যেন আপনাকে খুঁজে পেয়েছে। বালক ফটিক তার সজীব প্রাণের চাঞ্চল্য নিয়ে পল্লীপ্রকৃতিতে যে মুক্তির অবাধ স্বাধীনতায় ছিল আনন্দঘন, শহর কলকাতার কঠিন প্রাচীরের বন্ধ গৃহে সে বন্দীবিহঙ্গের মতই কাতর অসহায়। প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা তার কাছে মৃত্যুরই অন্য নাম। আবার 'অতিথি' গল্পের তারাপদ যেন নিখিল মানবাত্মার বন্ধনমুক্ত স্বাধীনসত্তা। তার স্বভাবেই আছে অনাসক্তির বীজ তাই কোথাও সে স্থির থাকতে পারে না। ক্ষণকালীন উপস্থিতিতে সে মনোহরণ করেন সকলের, কিন্তু ছিন্নশিকল পায়ে নিয়ে সে চলে যায় সুখী গৃহকোণ ছেড়ে অনন্তের উদারতায়। এখানেই গল্পটির নামকরণ সার্থক হয়ে ওঠে।

'সমাপ্তি' গল্পেও কিশোরী নায়িকা মৃন্ময়ী প্রকৃতির মুক্তি থেকে ধরা পড়ে গৃহের বন্ধনে। এখানে রমণী হৃদয়ের চির রহস্য আভাসিত। এ যেন আকাশের পাখির গৃহকোণে ধরা দেওয়ার ব্যঞ্জনা। মৃন্ময়ীর বাল্যজীবনের সমাপ্তিতেই এই গল্প এক মধুর উপহারে সমাপ্ত হয়েছে। এই গল্পের বীজ সুপ্ত ছিল ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে—যেখানে নদীর ঘাটে দেখা এক বালিকার দীপ্ত লাবণ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর গল্পের নায়িকাকে। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই গল্পগুলি রচিত হয়েছিল।

এই পর্বেই রচিত হয়েছে অনন্য প্রেমের গল্প 'একরাত্রি'র যেখানে অনুচ্চারিত প্রেমানুভব স্নিগ্ধ সুরভির মত, বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের মত ছড়িয়ে আছে। একটি অনুভূতির শীর্ষে স্তম্ভিত এই গল্পটি গদ্যে রচিত অনন্য লীরিক যা কবিতার মতই মৃদু-কোমল, একটি মুহূর্তের অনন্ত প্রতিমা।

এই প্রসঙ্গে 'পোস্টমস্টার' গল্পের প্রকৃতিমগ্নতার কথা আরেকবার স্মরণ করা যেতে পারে। হিতবাদী-তে প্রকাশিত এইগল্পে পল্লীবাংলার সজল প্রেক্ষাপটে দেখা গেল স্নিগ্ধ করুণ এক বালিকা মূর্তি প্রস্ফুটিত পুষ্প কলিকার মতই বাল্য-কৈশোরের সন্ধিলগ্নের পল্লীবালা—রতন। গল্পটিকে প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্কমূলক কাহিনী অথবা মানবজীবনের অন্তর্লোকের নিগূঢ় রহস্যলীলার কাহিনী বলা যায় কিনা এ সম্ভবন্ধে বিতর্ক উঠতে পারে। তবে পোস্টমাস্টার ও রতনের বিচিত্র অনুরাগসিক্ত সম্পর্ককে অনেকেই প্রকৃতির প্রেমের সঙ্গে উপমিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি সমমরণ করা যায়—

> "পোস্টমাস্টারের জীবনে রতনের প্রেম এসেছিল প্রকৃতির প্রেমের মতই, বসন্তের ফুলকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা যেমন বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে হারিয়ে যায়—এই গল্পের পরিণামও তাই। প্রকৃতির উদ্দাম বিষণ্ণতার মধ্যেই ছোট জীবননাট্যটুকুর সমাপ্তি ঘটেছে।"

সাধনা পর্বে রচিত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পেও শশিভূষণ ও গিরিবালার সম্পর্কে এমন এক মিশ্র অনুভূতিকে কবি প্রকাশ করেছেন। পোস্টমাস্টারে বালিকা রতনের বয়ঃসন্ধির আলো-আঁধারি হৃদয়ানুভূতি ছিল গল্পের মূল থিম। মেঘ ও রৌদ্রে শশিভূষণ-গিরিবালার হৃদয়ানুভবের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মিলে এক অন্যতর মাত্রা দান করেছে।

এই পর্বের ত্যাগ ও মহামায়া গল্পে সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ও প্রেমের এক রহস্য কুহেলির ছায়াপাত দেখি। 'ত্যাগ' গল্পে সমাজ ও সংস্কারের প্রশ্নে দোলাচল নায়ক হেমন্তর জীবনে শেষ পর্যন্ত প্রেমের অনির্বাণ জ্যোতিই সত্য হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথার ওপর প্রেমকে জয়ী করেন। এই ভাবটি তাঁর বিভিন্ন নাটকেও পরিণততর রূপে প্রকাশিত হতে দেখেছি।

মহামায়া এক আশ্চর্য কাহিনী। কৌলীনপ্রথাও সতীদাহের নির্মম ঘটনা এর প্রেক্ষাপট। তারই কাঠামোর উপর রচিত কাহিনীসৌধে বিচিত্র প্রেমের এক গল্প—আশ্চর্য নারী ব্যক্তিত্ব মহামায়া যেখানে কেন্দ্র বিন্দু। "মহামায়ার প্রেম তার নারীজীবনের স্বভাবফসল, কিন্তু সে প্রেমও তার ব্যক্তিত্ব গৌরব তথা অহমিকা বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত! এ গল্পে লেখক ব্যক্তিত্বকে মুখ্য করে তুলেছেন। হৃদয় স্বাতন্ত্র্যের জন্যই যে প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করেছে, ভালোবাসাকে স্বীকার বা অমান্য করেছে—" অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের এই মন্তব্যের আলোকে মানবমনের নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় এই ব্যক্তিত্বাচিহ্নিত আত্মবিনাশী প্রেমের গল্পে পরিস্ফুট হতে দেখি।

সাধনা পর্বের আর একটি অনবদ্য ছোটগল্প—মধ্যবর্তিনী, যার সঙ্গে ঘটনা অনুষঙ্গে আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ে—নিশীথে। অবশ্য নিশীথে কিছুটা অন্য ধরনের অতিপ্রাকৃত প্রেক্ষিতে স্থাপিত অনবদ্য মনস্তাত্ত্বিক গল্প। 'মধ্যবর্তিনী'-তেও মনস্তত্ত্বের জটিল জাল আছে। নিঃসন্তান দাম্পত্যজীবনে অসুস্থ স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুরোধ জানাচ্ছে দুটি ক্ষেত্রে। দুটি গল্পের পরিণতি অবশ্য ভিন্নতর। মধ্যবর্তিনী-তে দ্বিতীয়া পত্নী শৈলর মৃত্যুর পর স্বামীস্ত্রীর মধ্যবর্তিনী হয়েই সে বেঁচে রইল—অনস্তিত্ব অস্তিত্বের অসামান্য প্রয়োগ। 'নিশীথে' গল্পের আবহাওয়ায় রহস্যের আভাস। এখানে প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুর পর নায়ক দক্ষিণাচরণ দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমকে নিয়ে দাম্পত্যপ্রেমের মাধুর্য আস্বাদনে বঞ্চিত। বহিরঙ্গে এক অশরীরী পরিমণ্ডল তৈরি হলেও অন্তরঙ্গে সঞ্চিত আছে নায়কের অপরাধবোধ। অসামান্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গল্পটি রহস্যকাহিনীর শিহরণকে মনে করায়।

সাধনায় প্রকাশিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও ভারতীতে প্রকাশিত 'মণিহারা'—রহস্যকুহেলি ও অলৌকিক কাহিনীর অনবদ্য বাণীরূপ। রবীন্দ্রনাথের কথক-শ্রোতা রীতির পরিচিত ভঙ্গী দুটি গল্পেই ব্যবহৃত—যেমন নিশীথে বা কঙ্কাল গল্পেও দেখা গেছে।

সাধনায় প্রকাশিত 'বিচারক' গল্পটি 'বিচারক' গল্পটি নানাকারণেই স্মরণীয়। পতিতা নারীকে কেন্দ্র করে রচিত এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের মনোলোকের গভীর গহনে আলো ফেলেছেন, যার ফলে কলঙ্কিনী পতিতা ক্ষীরোদা

স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বিচারক মোহিতমোহন এই ঘৃণিতা পতিতা নারীর মধ্যে আঙ্কিার করেছেন তাঁর যৌবনের প্রেমিকা হেমশশীকে। এই দর্শন যেন আত্মদর্শন-প্রেমের অনন্য উপলব্ধি। এর শেষাংশের নাটকীয় চমক উদ্যত ফণা সর্পের মত দংশন করে নায়ককে এবং পাঠককেও।

ভারতী পর্বের শেষদিকে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'নষ্টনীড়'। গল্পকার রবীন্দ্রনাথের অসামন্য বিশ্লেষণী শক্তি ও জীবনের রহস্যগভীর অতলান্তে ডুব দিয়ে চরিত্রের আঁতের কথা বার করার অসামান্য প্রয়োগ এখানে দেখা যায়। এ গল্পের প্রকরণ বিচারে সমালোচকের মধ্যে বিতর্ক আছে। ২০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই কাহিনী ভারতী পত্রিকায় দীর্ঘ আটমাস ধরে ধাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। আয়তনের বিচারে এটি উপন্যাসের সমান, মালঞ্চ বা দুই বোনের চেয়ে দীর্ঘ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের ছোট গল্প সংকলনেই একে স্থান দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ কাহিনীতে কিছু ঘটনাবাহুল্য ও অতিরিক্ত চরিত্র থাকলেও ভাবের একমুখিনতাই এর প্রধান বিষয়। আয়তনে উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকলেও সূক্ষ্ম মনস্তত্বের সংযত ও সংহত প্রকাশে এটি ছোটগল্পের সীমায় দাঁড়িয়ে আছে।

'সবুজপত্র' পর্বের গল্পগুলি রবীন্দ্রগল্পধারায় অনন্য সংযোজন। শিলাইদহ পর্বে সোনারতরীর যুগে যে গল্প তিনি লিখেছেন—স্পষ্টতই তার সঙ্গে এই পর্বের গল্পগুলির পার্থক্য আছে। কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে এক নতুন ধরনের মননশীল দীপ্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস এই গল্পগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীরপত্র, ভাঁই ফোঁটা, অপরিচিতা ও পয়লা নম্বর—এই পর্বের অসামান্য রচনা। প্রথার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্ব এবং নারীর ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে এই গল্পগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ সবুজপত্রের পৃষ্ঠায়—যেখানে নারী ব্যক্তিত্বের অসামান্য চমকপ্রদ উদ্ভাসন নায়িকা দামিনী চরিত্রে দেখা গেছে। হৈমন্তী, স্ত্রীরপত্র, অপরিচিতা, পয়লা নম্বর—গল্পগুলিতে নারীর আত্মউন্মোচন ও স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই পর্বের বোষ্টমী গল্পের নামচরিত্রও আপন ব্যক্তিত্বে সমজ্জ্বল। আত্মদর্শনের আলোতে তার চরিত্রের দীপ্তি পেয়েছে ট্রাজিক মহিমা। এই গল্পগুলি সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

> "আসলে জীবনের রূপরচনা নয়, জীবনের ভাষ্য-রচনাই সুবজপত্র পর্বের ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষণ"
>
> (রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ ঃ তপোব্রত ঘোষ)

স্ত্রীরপত্র' গল্পে পত্রাঙ্গিকে কাহিনী বিন্যস্ত। মৃণাল তার পনেরো বছরের আপাত সুখী বিবাহিত জীবন থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি পেতে চেয়েছে। স্বামীর শ্রীচরণকমল থেকে নিজেকে সে মুক্ত করেছে। গল্পের শুরু শ্রীচরণকমলেষু' পাঠ দিয়ে এবং শেষ হয়েছে "চরণাতলাশ্রয় ছিন্ন" মৃণাল পাঠে। এই পদাশ্রয় ছিন্ন মৃণাল কিন্তু ভুলুণ্ঠিতা হয়নি, অসীম সমুদ্রের তীরে অনন্ত নীলাকাশের উদারতায় সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

দাম্পত্যজীবনের সত্য আবিষ্কার এভাবেই 'পয়লা নম্বর' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এযুগের গল্পে দেখেছি নারীমুক্তির সমাজতত্ত্ব। তা কখনো সোচ্চার প্রতিবাদে, কখনো বা আভ্যন্তর প্রতিরোধে আত্মপ্রকাশ করেছে। পয়লা নম্ভবরের নায়িকা অনিলার অন্তরের অতৃপ্তি বিদ্রোহে রূপে নিয়েছে। এ বিদ্রোহ পূর্ণ নৈঃশব্দ্যে অন্তরমহলে ঘটে গেছে। তার আত্ম উদ্বোধনই বিদ্রোহ—গৃহত্যাগ তার বাইরের ঘটনাগত রূপমাত্র। স্ত্রীরপত্রের মৃণাল তার নারীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঘর ছেড়েছিল, বোষ্টমী আনন্দী ঘর ছেড়েছে সত্য অন্বেষণের আশায়। এভাবেই এই পর্বের নায়িকারা জীবনের সত্য দৃষ্টি খুঁজে পেয়েছে—খুঁজে পেয়েছে আপন ব্যক্তিত্বের আশ্রয়।

রবীন্দ্র জীবনের অন্ত্যপর্বের উজ্জ্বল ফসল 'তিনসঙ্গী'—রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবোরেটরী নামের তিনটি অনন্য ছোটগল্প। এই পর্বে রবীন্দ্রছোটগল্প আশ্চর্য আধুনিক হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ ঝলসিত বিদ্যুতের মতই দীপ্ত ভাষা—যাকে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন স্ট্রীমলাইন ভাষা"। অন্তরধর্মেও একান্ত আধুনিক তিনসঙ্গীর গল্পত্রয়ী। নারীপুরুষ সম্পর্কে নবরূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের রচনায় সুস্পষ্ট। পুরুষে সৃষ্টিকার্যে

নারীস্বভাবের অনির্বচনীয় মাধুর্যকে তিনি বিশেষ মূল্যদান করেছেন। কিন্তু আধুনিকতার অন্তরালে রবীন্দ্র মনোধর্মের সনাতনী ঐতিহ্য এতে ছায়া ফেলেছে। তিনটি গল্পেই ত্রিবিধ বিন্যাসে এই অন্তর্লীন সুরটি শোনা যায়। সেইসঙ্গে গল্পভাষাতে হীরকদ্যুতি ঝলসিত।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পরিক্রমায় সূচনা পর্ব থেকে অনত্যপর্বে উপনীত হয়ে আমরা বিচিত্র অভিজ্ঞতার শরিক হই। বাংলাদেশের বাস্তবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার হৃৎস্পন্দন যেন শুনতে পাই। প্রকৃতি ও মানুষ সমন্বিত হয়ে বিচিত্ররূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। নরনারীর প্রণয়, বাসনা-বেদনা, প্রাচীন লোক বিশ্বাস থেকে আধুনিক বিজ্ঞান চেতনা স্বদেশী আন্দোলন থেকে সামাজিক বিপ্লব, সনাতনী ঐতিহ্য থেকে বিশশতকের আধুনিকতা, প্রথানুগত্য থেকে সংস্কার মুক্তি, আবেগ থেকে মননশীলতাকে বাণীমূর্তি দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে।

গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত না হলেও ‘লিপিকা’র কথিকাগুলিকে অনেকেই গল্প নাম দিতে চান। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের কুড়িটি রচনার মধ্যে আছে গল্পাভাস। প্রথম চোদ্দটি রচনা অবশ্য আন্তরধর্মে ছুঁয়ে আছে কবিতাকেই—রবীন্দ্র জীবনের প্রথম পর্বে রচিত ‘পুষ্পাঞ্জলি’র ভাব ও ভাষা তাকে অনুভূতির হীরক দ্যুতিতে বর্ণিল করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আলোচনায় আমরা তাঁর কবিসত্তার প্রক্ষেপকে স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প অন্তরধর্মে লীরিককেই ছুঁয়ে যায়। লেখকের ব্যক্তিমনের স্পর্শ ও প্রতিবিম্বনে ছোটগল্প এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। একটি মুহূর্তকে চিরন্তন করে রাখার প্রয়াস ছোটগল্পে দেখি, ঠিক যেমনটি দেখি গীতিকবিতার ক্ষেত্রে।

রোম্যান্টিক মনোভঙ্গী ছোটগল্পের উৎস। বিস্ময়, কল্পনা ও জীবনবোধের গভীরতর ব্যঞ্জনা দানই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। তাই ছোটগল্পের চলনটা গদ্যের হলেও তার চালটা কবিতার। তার মেজাজের সঙ্গে লীরিকের মিল আছে। এজন্যই শ্রেষ্ঠ লীরিক কবি রবীন্দ্রনাথের হাতেই শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

তাঁর ছোটগল্পে অনুগ্র গভীরবোধ ও আত্মিক জিজ্ঞাসার প্রতিফলন দেখি। এই বৈশিষ্ট্য মনে করায় বিশ্বসাহিত্যের অনন্য ছোটগল্প শিল্পী রুশ লেখক আন্তন চেকভকে। তাঁর সূক্ষ্মকাজ রুচিশীল পাঠকের অনুভূতি প্রবণতাকে স্পর্শ করে। প্রবৃত্তির উগ্রতা একটা আপাত শান্ত গভীর রূপের মধ্যে যেন আত্মস্থ। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পৃথিবীও মৃদু শান্ত। তাঁর লেকার প্রশান্তি, লীরিক আভাস সূক্ষ্ম কারুকার্য ও মনের অতলান্ত গভীরে ডুব দেওয়ার চেষ্টা পাঠককে চেকভের কথা মনে করায়।

সাধারণ দুঃখ, তুচ্ছ ক্ষণমুহূর্তের বেদনা, প্রাত্যহিক জীবনের শূন্যতাও যে সার্থক ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে, এই সত্য দেখেছি চেকভের গল্পে—রবীন্দ্রনাথেও। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির মুক্তি দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছোটপ্রাণের দুঃখকথার জীবনরসসিঞ্চিত নিটোল ছোটগল্প লিখেছেন। নাতিদীর্ঘ আয়তন, স্বল্পসংখ্যক চরিত্র, একটি তাৎপর্যময় অংশের বা নিবিড় ভাবানুভূতির রূপায়ণ, ইঙ্গিতময় রহস্যময়তা ও সমাপ্তির ক্ষণপ্রভায় জীবসত্যের চকিত উদ্ভাসন—রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তাঁর প্রথম দিকের সাধনা-ভারতী পর্বের গল্পে দেখেছি আনন্দ-বেদনার নিবিড় অনুভূতিতে আত্মস্থ ভাবমধর্মী রূপায়ণ।

সবুজপত্র পর্ব বা অন্ত্যপর্বের গল্পগুলি শিল্পরূপের বিচারে অধিকতর পরিণত, কিন্তু অনুভবের দ্যোতনায় প্রথম পর্বের গল্পগুলি আরো গভীর, অতলান্ত রহস্যবহী,—যেখানে গল্পের উপসংহার পাঠকচিত্তে এক গভীর জীবন উপলব্ধির জগৎকে উদঘাটিত করে, পরিণতিহীন করুণতার ছবি যেন অনন্তবিষাদকে স্পর্শ করে। ‘একরাত্রি’ গল্পটি এর অনবদ্য নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাই গভীরতর ব্যঞ্জনায় হৃদয়কে প্রকাশ করে, নাটকীয় সমাপ্তির চেয়ে মৃদু রস সঞ্চার করে পাঠককে আবিষ্ট করে, মুগ্ধ করে, অনন্তকে ছুঁয়ে যায়।

এখানেই শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সার্থক পরিচয়।

৪.৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তালিকাসূচি

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল
ভিখারিণি	ভারতী	শ্রাবণ, ১২৪৭
করুণা	"	আশ্বিন, ১২৮৪
ঘাটের কথা	"	কার্তিক, ১২৮৯
রাজপথের কথা	নবজীবন	অগ্রহায়ণ, ১২৯১
মুকুট	বালক	বৈশাখ, ১২৯২
দেনাপাওনা	হিতবাদী	১২৯৮
পোস্টমাস্টার	"	"
গিন্নি	"	"
রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	"	"
ব্যবধান	"	"
তারাপ্রসন্নর কীর্তি	"	"
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	সাধনা	অগ্রহায়ণ, ১২৯৮
সম্পত্তি সমর্পণ	"	পৌষ, ১২৯৮
দালিয়া	"	মাঘ, ১২৯৮
কঙ্কাল	"	ফাল্গুন, ১২৯৮
মুক্তির উপায়	"	চৈত্র, ১২৯৮
ত্যাগ	"	বৈশাখ, ১২৯৯
একরাত্রি	"	জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯
একটা আষাঢ়ে গল্প	"	আষাঢ় ১২৯৯
জীবিত ও মৃত	"	শ্রাবণ, ১২৯৯
স্বর্ণমৃগ	"	ভাদ্র, ১২৯৯
রীতিমত নভেল	"	আশ্বিন, ১২৯৯
জয়পরাজয়	"	কার্তিক, ১২৯৯
কাবুলিওয়ালা	"	অগ্রহায়ণ, ১২৯৯
ছুটি	"	পৌষ, ১২৯৯
সুভা	"	মাঘ, ১২৯৯
মহামায়া	"	ফাল্গুন, ১২৯৯
দানপ্রতিদান	"	চৈত্র, ১২৯৯
সম্পাদক	"	বৈশাখ, ১৩০০
মধ্যবর্তিনী	"	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০
অসম্ভব কথা	"	আষাঢ়, ১৩০০
শাস্তি	"	শ্রাবণ, ১৩০০

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	”	ভাদ্র, ১৩০০
সমাপ্তি	”	আশ্বিন, ১৩০০
অনধিকার প্রবেশ	সাধনা	শ্রাবণ, ১৩০১
মেঘ ও রৌদ্র	”	আশ্বিন, ১৩০১
সমস্যাপূরণ	”	অগ্রহায়ণ, ১৩০১
প্রায়শ্চিত্ত	”	অগ্রহায়ণ, ১৩০১
বিচারক	”	পৌষ, ১৩০১
নিশিথে	”	মাঘ, ১৩০১
আপদ	”	ফাল্গুন, ১৩০১
দিদি	”	চৈত্র, ১৩০১
মানভঞ্জন	”	বৈশাখ, ১৩০২
ঠাকুরদা	”	১৩০২
প্রতিহিংসা	”	”
ক্ষুধিত পাষাণ	”	”
অতিথি	”	”
ইচ্ছাপূরণ	সখা ও সাথী	১৩০২
দুরাশা	ভারতী	১৩০৫
পুত্রযজ্ঞ	ভারতী	১৩০৫
ডিটেকটিভ	”	”
অধ্যাপক	”	”
রাজটিকা	”	”
মণিহারা	”	”
দৃষ্টিদান	”	”
সদর ও অন্দর	প্রদীপ	১৩০৭
উদ্ধার	ভারতী	১৩০৭
দুর্বুদ্ধি	”	”
ফেল	”	”
শুভদৃষ্টি	প্রদীপ	১৩০৭
নষ্টনীড়	ভারতী	১৩০৮
দর্পহরণ	বঙ্গদর্শন	”
মাল্যদান	বঙ্গদর্শন	১৩০৯
মাস্টারমশায়	প্রবাসী	১৩১৪
গুপ্তধন	ভারতী	১৩১৫
রাসমণির ছেলে	”	১৩১৮

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল
পণরক্ষা	”	১৩১৮
হালদার গোষ্ঠী	সবুজপত্র	১৩২১
হৈমন্তী	”	”
বোষ্টমী	”	”
স্ত্রীরপত্র	”	১৩২১
ভাইফোঁটা	”	”
শেষের রাত্রি	”	”
অপরিচিতা	”	”
তপস্বিনী	”	১৩২৪
পয়লানম্বর	”	”
পাত্র ও পাত্রী	”	”
নামঞ্জুর গল্প	প্রবাসী	১৩৩২
সংস্কার	”	১৩৩৫
বলাই	”	”
চিত্রকর	”	”
চোরাইধন	ছোটগল্প	১৩৪০
রবিবার	আনন্দবাজার	১৩৪৬
শেষকথা	শনিবারের চিঠি	১৩৪৬
ছোটগল্প	দেশ	১৩৪৬
ল্যাবোরেটরি	আনন্দবাজার	১৩৪৭
বদনাম	প্রবাসী	১৩৪৮
প্রগতিসংহার (পূর্বনাম কাপুরুষ)	আনন্দবাজার	১৩৪৮
শেষ পুরস্কার	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৪৯
মুসলমানীর গল্প	ঋতুপত্র	১৩৬২

৪.৪ প্রস্তাবনা : প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। কবি পরিচয়ের অলোকসামান্য বিভায় তাঁরগ অন্যান্য পরিচয় কিছুটা আচ্ছন্ন হলেও একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পারে যে তিনিই বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার। পরিমাণের বিশালতায় ও বিষয় বৈচিত্র্যের অজস্রতায় তাঁর প্রবন্ধ আমাদের বিস্মিত করে।

সাধারণ প্রবন্ধ বলতে আমরা বুঝি জ্ঞানগর্ভ গদ্য রচনা যা প্রমামের দ্বারা কোনো কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করে, কোনো নতুন বিষয় বা সিদ্ধান্তকে উপস্থাপিত করে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কিন্তু তিনি নিরাসক্ত ভূমিকা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন না। রচনাটিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবল উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ ও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের পরিপূরক। বাংলা প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ রূপকার যে রবীন্দ্রনাথ তা সমালোচকের মন্তব্যে নিশ্চিত ধরা পড়ে।

> "প্রবন্ধ যাতে স্পষ্ট কোনো বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই যাতে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে মীমাংসার দিকে পৌঁছতে হয়— অন্তত সেই রকমই ধারণা করি আমরা—তাতেও এই অবিশ্বাস্য কবি (রবীন্দ্রনাথ) পরতে পরতে প্রবিষ্ঠ হয়ে আছেন। যে কোনো বিষয়ে যে কোনো আলোচনায় বিষয়টাকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর স্বর, দ্যুতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ-এক কথায় তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ"
>
> (রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প : বুদ্ধদেব বসু)

রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা প্রবন্ধ তার পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর অএনক আগেই বাংলায় প্রবন্ধ রচনা শুরু হয়েছিল বটে। কিন্তু সার্থক শিল্পরূপ পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের প্রথম যুগের প্রবন্ধের উপকরণ ছিল সামাজিক ও নৈতিক আলোচনার বর্ণনা ও সংবাদ পরিবেশন। প্রায় সমগ্র উনিশ শতকের গদ্যে তথ্য ও তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছিল। গদ্য নিঃসন্দেহে আধুনিক চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশের যোগ্যতম মাধ্যম, বিচার-বিতর্ক-জিজ্ঞাসার ভাষাও গদ্য। রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের হাতে এভাবেই বাংলা প্রবন্ধের স্থায়ীরূপ নির্মিত হল। বাংলা প্রবন্ধ রচনার আদিযুগকে রামমোহন বিদ্যাসাগর যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সদ্যসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই স্থিত হয়েছে বক্তব্য প্রধান, স্পষ্ট, তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ ছিল তখনকার প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমীযুগের পরেই গদ্য সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগের পরিমণ্ডল বর্ধিত হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন গদ্যে মুদ্রিত করেছিলেন। সেকালের গদ্যের বিষয়প্রাধান্যকে স্বীকার না করে রবীন্দ্রনাথ আত্মভাবমূলক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন, এমনকি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধেও তাঁর আত্মগত ভঙ্গি প্রবল ছিল। তাঁর প্রায় কৈশোরে লিখিত প্রবন্ধেও সংযমী ভাবুকতা ও বিচারশক্তির তীক্ষ্ণতা ছিল বিস্ময়কর। তাঁর রচনার এই প্রৌঢ়ত্বের ছাপ লক্ষ্য করেই মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন—'বাস্তবিক এত অল্প বয়সে মানসশক্তির (Intellect) এমন জাগরণ কবি জীবনে অতিশয় বিরল"

রবীন্দ্র প্রবন্ধে এই পরিণত মনন ও বিচারশক্তি লক্ষ্য করা যায়। বহিরঙ্গ প্রসাধনা ও অন্তরঙ্গ সাধনায় তাঁর প্রবন্ধ অনন্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যেই কেবল নয় তাঁর ব্যক্তিত্বের দিব্যস্পর্শে তাঁর প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠত্বের সীমা স্পর্শ করে।

৪.৫ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন পনেরো বছর বয়সে এবং তাঁর শেষ প্রবন্ধ রচিত হয় আশি বছর বয়সে। ইং ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে 'জ্ঞানাংকুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার প্রথম প্রবন্ধ—সমালোচনামূলক গদ্য রচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', রাজকৃষ্ম রায়ের 'অবসর সরোজিনী' ও হরিশচন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী'।—এই তিন গ্রন্থ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য নিয়ে অনেকটা বঙ্কিমী রীতিতে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তারই মধ্যে এই রচনায় কিশোর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গদ্যরচনাগীতির বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'ভারতী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সম্পাদক। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'মেঘনাদবধ কাব্য' ভারতীতেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর নিজের কথায় 'অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে' তিনি এই তীব্র সমালোচনা লিখেছিলেন। জীবনস্মৃতিতে এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

“এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।”

কয়েকবছর পরে ভারতীতেই (১৮৮২) ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ নামে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি হল—ঝানসীর রানী ‘বাঙ্গালির আশা ও নৈরাশ্য’, বিজনচিন্তা ও সান্ত্বনা।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ভারতীর দ্বিতীয়বর্ষ শুরু হয়। প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর প্রবন্ধ— ‘সামুদ্রিকজীব ঃ কীটানু’ প্রকাশ পায়। পরবর্তী দুটি প্রবন্ধ তাঁর বিলাতযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত মনে হয়। এ দুটি হল ‘ইংরেজদিগের আদব কায়দা’ ও ‘স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গালোস্যাকশন সাহিত্য’।

ভারতীয় পরবর্তী তিনটি সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের তিন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে প্রেমের বিচিত্র রূপের অন্বেষণ করেছেন। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ ত্রয়ী হল— ‘বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য’, ‘প্রিত্রর্কাও লরা’ এবং ‘গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ’। এই তিনটি প্রবন্ধ একটি অখণ্ড ভাবসূত্রে গ্রথিত বলে মনে হয়।

ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—সেগুলিতে তাঁর বিচিত্রমুখী মননের পরিচয় পাই। এগুলি হল ‘নর্ম্মান জাতি ও অ্যাঙ্গলো নর্ম্মান সাহিত্য’, ‘য়ুরোপ যাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র’, ‘চ্যাটার্টন-বালক কবি’, ‘বাঙ্গালি কবি নয়’ এবং ‘বাঙ্গালি কবি নয় কেন?’ ‘অকারণকষ্ট’, নিঃস্বার্থ প্রেম’, ‘পারিবারিক দাসত্ব’।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল বেথুন সোসাইটির আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাধারণ সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেটি পরে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘সঙ্গীত ও ভাব’ নামে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ—‘জুতাব্যবস্থা’ ভারতীয় পৃষ্ঠাতেই প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। তৎকালীন ইংলিশম্যান কাগজে প্রকাশিত একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকায় যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল এই প্রবন্ধটি তারই সাহিত্য পরিণাম। এছাড়া ‘চীনে মরণের ব্যবসায়’ রচনাটিও ভারতীর আলোচ্য সংখ্যাতেই (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে স্থান পেয়েছিল ‘যথার্থ দোসর’ নামে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবনার এক প্রবন্ধ যেটি ইংরেজি রোম্যান্টিক কাব্যের বিষাদ বেদনার বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে লিখিত।

আলোচ্য সময়কাল রবীন্দ্র জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে যাপিত কয়েকটি মাসের স্মৃতি তাঁর কাছে অবিস্মরণীয়। তখনই চলেছে ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ রচনার পালা। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন—

> “গঙ্গার ধারে বসে সন্ধ্যাসঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখতাম। সেও কোনো
> বাঁধা লেখা নহে—সেও একরকম যা খুশি তাই লেখা”

—এই ‘যা খুশি’ লেখাগুলিই ‘ভারতী’ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এর রচনাকালীন সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এসময় তিনি নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে একত্রে কাটিয়েছিলেন। এই গদ্য রচনার মধ্যে উল্লখযোগ্য ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’।

ভারতী পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত ‘বালক’ পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। ‘ভারতী’ ও ‘বালক’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক সত্তার স্ফুরণ ঘটে। কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ থেকে পরবর্তী পর্যায়ের পরিণত মনস্ক বহু চিন্তামূলক প্রবন্ধের প্রকাশ ঘটেছিল সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়।

১৮৭৬ থেকে ১৮৯০ (বঙ্গাব্দ ১২৮৩ থেকে ১২৯৭) সালকে তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার প্রথম যুগ বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই পর্বের মধ্যবর্তী সময় থেকেই তাঁর প্রবন্ধের মুদ্রত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮১ থেকে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মোট ছ'টি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), বিবিধ প্রসঙ্গ (১২৯০ বঙ্গাব্দ), আলোচনা (১২৯২ বঙ্গাব্দ), সমালোচনা (১২৯৪ বঙ্গাব্দ), চিঠিপত্র (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), ও মন্ত্রি অভিষেক (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। পত্রাকারে লিখিত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (ইং ১৮৮১) রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু ইংরেজি ১৮৮৩তে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে।

ইং ১৮৯০ পরবর্তী রবীন্দ্র প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে মাত্র তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি হল—'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি (প্রথম খণ্ড ১৮৯১), য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি (দ্বিতীয়খণ্ড ১৮৯৩) এবং পঞ্চভূত (১৮৯৭)।' শেষোক্তর প্রবন্ধগুলি 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' নামে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমকে নিয়ে বিচিত্র আলাপ আলোচনা বাংলা সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে গাজীপুর থেকে ফেরার পরে মেজদাদা সতেন্দ্রনাথের বাড়িতে যে সাহিত্যিক আসর বসতো, রবীন্দ্রনাথ সেখানকার সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের নানা মন্তব্য ও বাদ প্রতিবাদ 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে আলোচনা খাতায় লিখে রাখতেন। এটিই পরে 'পঞ্চভূতের ডায়েরি'তে পরিণতি লাভ করেছে।

পঞ্চভূতের আড়ালে সজীব উপস্থিতি অনুমান করেছেন বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দ। প্রকৃতপক্ষে 'পঞ্চভূতে'র এক একটি ভূত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক। এই অভিনব প্রবন্ধ গ্রন্থে একাধারে মিলেছে চিন্তার বৈচিত্র্য, জীবনের সমস্যা— সম্ভাবনার রূপায়ণ এবং ভাষাভঙ্গির মাধুর্য। বিষয়ের অভিনবত্বে ও গদ্যরীতির অসাধারণত্বে এই গ্রন্থ শুধু রবীন্দ্রসাহিতেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"এই গ্রন্থ আমেরিকান লেখক ওয়েনডেল্ হোমসের 'পোয়েট এ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেবল্' গ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মাত্র, আসলে আকাশ পাতাল প্রভেদ।"

প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহিতা ও অসামান্য বিচারশক্তির সমন্বয়ে 'পঞ্চভূত' রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব সৃষ্টিক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে।

বিশশতকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার তৃতীয় পর্ব। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথের একটিই প্রবন্ধ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল—'ঔপনিষদিক ব্রহ্ম'। এরপর সাময়িক বিরতির পর ১৯০৫-এ 'আত্মশক্তি' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০৬-এ প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সাতখানি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়— বিহচিত্রপ্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীনসাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, ব্যঙ্গকৌতুক, আধুনিক সাহিত্য।

গদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথমভাগরূপে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের রচনাগুলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অসামান্য নিদর্শন, রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকাতে মন্তব্য করেছেন—

> "এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য
> থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনা রস সম্ভোগে।"

কবিমনের মাধুরী মেশানো এই প্রবন্ধের রচনাভঙ্গীর স্বাদুসরসতা এর বৈশিষ্ট্য। লীরিকের সঙ্গে এই রচনাগুলির এক অন্তর্লীন সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। প্রবন্ধের আকারে লিখিত এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবি মনের স্পর্শ পাই।

'চারিত্রপূজা'-র সব রচনাই স্বতন্ত্রভাবে 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'ভারতপথিক রামমেহন রায়' ও 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। জীবনী প্রবন্ধের ধারায় এই প্রবন্ধত্রয়ী উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

'প্রাচীনসাহিত্য' সমালোচনা ধারায় এক অনন্য নিদর্শন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কল্পনা' কাব্যের অতীতাশ্রয়ী রোম্যান্টিক মনোভঙ্গি এই সাহিত্যলোচনায় ধরা পড়েছে। প্রাচীন ভারতের চিররহস্যময় সৌন্দর্যপুরীতে প্রবেশের চাবিকাঠি যেন এই গ্রন্থ। 'লোকসাহিত্য' বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করে। লোকসাহিত্যের যে সাহিত্যমূল্য ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে, তা রবীন্দ্রনাথই এ গ্রন্থের আলোচনায় প্রথম তুলে ধরেন। লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন এই গ্রন্থ।

'সাহিত্য' গ্রন্থে প্রধানত সাহিত্যের তুত্বালোচনামূলক রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে। সাহিত্যবিচারে তিনি পূর্ববর্তী নীতিবাদ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন নন্দনতত্ত্বে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের রস ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

'ব্যঙ্গকৌতুক'—ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ নাটিকাসহ সমজাতীয় প্রবন্ধ সংকলন। এরর প্রবন্ধ অংশটিতে ব্যঙ্গাত্মক নয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

'আধুনিক সাহিত্য' উনিশটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন। সমকালীন লেখকদের সাহিত্যকর্মের সমালোচনা এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। তবে বিচার বিশ্লেষণ কন্টকিত সমালোচনা এ নয়—সাহিত্যের রসবিচারই এই রচনার মূল কথা।

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মোট ছয়টি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ পায়। এগুলি হল—সভাপতির অভিভাষণ, রাজাপ্রজা, সমূহ, স্বদেশ,সমাজ, শিক্ষা।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত ভাষণের লিখিতরূপ 'সভাপতির অভিভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে। 'সাধনা' পত্রিকার যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক অভিমত সত্যবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠ হতে শুরু করেছিল। এই গ্রন্থেৰ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজত্বের যে ভবিষ্যতের চিত্র নির্দেশ করেছিলেন তা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে।

সমজাতীয় অপর দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ—'সমূহ' ও 'স্বদেশ' এবং সমাজবিষয়ক রচনার সংকলন গ্রন্থ—'সমাজ'। কবি রবীন্দ্রনাথের গভীর সমাজ চিন্তার প্রতিফলন এই গ্রন্থে পাই।

শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'শিক্ষা' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাবিষয়ক সুচিন্তিত মতবাদের প্রতিফলন এই প্রবন্ধগুলিতে মিলবে। শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার স্বরূপ ও সামঞ্জস্য বিষয়ে তাঁর অসামান্য চিন্তাশীল মননদীপ্ত প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—শব্দতত্ত্ব, ধর্ম শান্তিনিকেতন উপদেশমালা।

শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা ও দার্শনিক ভাবনার চিত্র 'ধর্ম' গ্রন্থ। কোনো শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা গড়ে ওঠেনি, বিশ্বজীবন থেকে তিনি ধর্মজীবনের সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের উপাসনা সভায় বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণেরগ অনুলিখন—'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'। যে ধর্ম ও দর্শন রবীন্দ্রজীবনের ভিত্তি স্বরূপ তারই সহজ অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য এই 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'। এই ভাষণমালার পরবর্তী ভাগগুলি ১৯১০ ও ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দুটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্র। গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সম্ভবত 'জীবনস্মৃতি'তে পাওয়া যায়। গদ্যরীতির দকি থেকে জীবনস্মৃতি এক অতুলন সৃষ্টি। সাধুভাষার বহিরঙ্গ আবরণ ভেদ করে চলতি ভাষার আমেজ এর অন্তরঙ্গ সুর মিলে গেছে। এই অনন্য স্মৃতিচারণা বালা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত।

এই বছরে প্রকাশিত 'ছিন্নপত্র' আরগ এক অনুপম সৃষ্টি। কবির জীবনদর্শন, ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় এই পত্রাবলীতে প্রকাশিত। রবীন্দ্রজীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায় ছন্নপত্রের যুগে শিলাইদহে পদ্মার বুকে গড়ে উঠেছিল। নিসর্গ প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের জীবনের হাসিকান্নার কলগান কবি জীবনের সেই বৃহৎ অধ্যায়ের ভূমিকা। ছিন্নপত্রে সংকলিত ১৪৫টি পত্রের সম্পূর্ণ পাঠসহ অতিরিক্ত ১০৭ খানি পত্রের (সব কটিই ইন্দিরা দেবীকে লেখা) একত্র সংকলন 'ছিন্নপত্রাবলী' ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছে। এই বিপুল পত্রসম্ভার কবির কাব্যানুভূতির সহজ পরিচয় বহন করে, সেই সঙ্গে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সহজ সাধারণ পরিচয়কেও প্রকাশ করে। এই পত্র সাহিত্য একাধারে সাহিত্য ও জীবনদর্শন। এরপর রবীন্দ্ররচনায় প্রবন্ধের দেখা মিলেছে ১৯১৫-তে শান্তিনিকেতন 'ভাষণমালা'র পরবর্তী পর্যায়ে। ১৯১৬-তেও এর পরবর্তী ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। সেই বছরেই প্রকাশিত হয়েছে 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়'।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—'জাপানযাত্রী'। ১৯১৬ সালে জাপানী পরিব্রাজক কাওয়াগুচির আমন্ত্রণে কবি জাপান গিয়েছিলেন। সেই সফরের কাহিনীই 'জাপানযাত্রী'। পত্রকারে লিখিত এই ভ্রমণাত্মক প্রবন্ধ গ্রন্থটি কবি মনের মাধুরী মেশানো অনুপম রচনা।

দীর্ঘ দশ বছর পরে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণাত্মক গদ্যরচনা 'যাত্রী' প্রকাশিত হয়। এটি 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি' ও 'জাভাযাত্রীর পত্রে'র একত্র সংকলন। এ জাতীয় রচনা তাঁর হাতে একাধারে ভ্রমণকথা, প্রবন্ধ ও পত্র হওয়াতে একই সঙ্গে তথ্যবহুল ও রসস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর কন্যা রাণু অধিকারীকে লিখিত এই পত্রগুচ্ছ 'রাণুর প্রতি ভানুদাদার আশীর্বাদ স্বরূপ' প্রকাশিত হয়েছিল।

রাশিয়ার চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নবজাগ্রত রূপ দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাকে 'তীর্থদর্শন' বলে বর্ণনা করেছেন। নবজাগ্রত রাশিয়ার সমাজজীবন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির একটি সুস্পষ্ট দলিল 'রাশিয়ার চিঠি'। ১৯৩২ সালে একটি ভাষণ পুস্তিকা প্রকাশ পায়—যাতে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কিত ইংরেজি ও বাংলা ভাষণ স্থান পেয়েছে।

১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক'-এর পদ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সুবাদে দিলেন 'কমলা বক্তৃতামালা'; তাই 'মানুষের ধর্ম' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনবছর আগে অক্স ফোর্ডে প্রদত্ত "Religion of Man" বক্তৃতামালার বাংলা রূপান্তর এই পুস্তিকা।

১৯৩৫ সালে 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা' দুটি খণ্ডে কবি কর্তৃক মার্জিত ও নূতন সংযোজনযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই বছরেই ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে সঙ্গে পত্রালাপ 'সুর ও সঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে চারখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—ছন্দ, জাপানে-পারস্যে, সাহিত্যের পথে ও প্রাক্তনী।

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, তত্ত্ব ও স্বরূপ বিশ্লেষণের অনবদ্য প্রকাশ 'ছন্দ'। 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থটি পূর্ব প্রকাশিত 'জাপানযাত্রী' ও নূতন 'পারস্য ভ্রমণের' একত্র সংকলন।

সাহিত্যের বিচিত্রতত্ত্ব ও জিজ্ঞাসার আলোচনা 'সাহিত্যের পথে'। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের বিভিন্ন সভায় কথিত ভাষণের সংকলন পুস্তিকা—'প্রাক্তনী'।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংকলন ‘কালান্তর’ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলা যেতে পারে।

এই বছরেই রবীন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসচেতন চিন্তার অনবদ্য সাহিত্যিক প্রকাশ ‘বিশ্বপরিচয়’ প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ পায়। এ দুটি হল—‘পথে ও পথের প্রান্তে’ এবং ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’। ‘পথে ও পথের প্রান্তে’র পত্রগুচ্ছ শ্রীমতী রাণী মহলানবিশকে লিখিত।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ—‘বাংলাভাষা পরিচয়’-এ ভাষা সম্বন্ধে রহস্যবোধ এবং ভাষা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় পত্র প্রবন্ধ সংকলন ‘পথের সঞ্চয়’। এগুলি ১৯১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দে য়ুরোপ আমেরিকা থেকে লেখা পত্রাবলীর সংকলন।

১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য স্মৃতিচিত্রণ ‘ছেলেবেলা’ প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিশীল কবিচিত্ত অস্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। অনবদ্য চলিত ভাষা ও রীতিতে লেখা—‘ছেলেবেলা’। ‘জীবনস্মৃতি’ যেমন সাধুভাষায় রবীন্দ্রগদ্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ, ‘ছেলেবেলা’ তেমনই কথ্যভাষায় রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম আত্মকথন।

জীবনের শেষ বেলায় ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—‘সভ্যতার সংকট’। এটি কবির আশি বছরের জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে আয়োজিত সভায় লিখিত অভিভাষণ। পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধ রচনা পালা শুরু হয়েছিল ‘জ্ঞানাংকুর’ পত্রিকায়, মৃত্যুর তিনমাস পূর্বে আশি বছরে লিখিত এই অভিভাষণে তার পরিণত রূপের পরিচয় মেলে। মানবসভ্যতার ক্রান্তিকালকে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন এই ভাষণে। শতাব্দীর সূর্য রক্তসন্ধ্যায় অস্তগামী। সভ্যতার সেই সংকটকেই এই ভাষণে তুলে ধরেছেন কবি। কিন্তু মানবতার কবি সেই নৈরাশ্যেই শেষ ন’ন। বিশ্বাস ও প্রত্যয়েই তাঁর প্রবন্ধ সমাপ্ত হয়েছে। সংকট উত্তীর্ণ এক শুভবোধ ও মঙ্গলচেতনায় তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন কবি।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের সর্বশেষে প্রকাশিত গ্রন্থ ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’। বিশ্বভারতী পুস্তিকামালার অন্তর্গত এই প্রবন্ধ গ্রন্থ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বিশ্বভারতী থেকে কবির বহু অপ্রকাশিত বা অগ্রন্থিত রচনা উদ্ধার করে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাতের বিপুল পরিমাণ পত্ররাশি যা অদ্যাবধি প্রকাশমান।

১৯৪১-এর ৭ই আগষ্টের পর প্রকাশিত হয়েছে ‘আত্মপচরিচয়’, ‘সাহিত্যের স্বরূপ’, ‘মহাত্মাগান্ধী’, ‘বিশ্বভারতী’, ‘শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম’, সমবায়নীতি, ইতিহাস বুদ্ধদেব, খৃষ্ট, ছিন্নপত্রাবলী, পল্লীপ্রকৃতি, স্বদেশীসমাজ। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব প্রকাশিত কয়েকেটি প্রবন্ধ ও রচনার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এগুলি হল—স্বদেশীসমাজ (১৯৬৩), পারস্যযাত্রী (১৯৬৩), সঙ্গীত চিন্তা (১৯৬৬), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৯৬৮), অরবিন্দ ঘোষ (১৯৭২) বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৭৭)।

আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি নিছক সংবাদ আদানপ্রদানের মাধ্যমই নয়, কবির আত্মবিকাশের দলিল হয়ে উঠেছে, মননশীল আলোচনার প্রশস্ততায় রূপ নিয়েছে প্রবন্ধের।

তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়টি মনে হয় কিছুটা অনালোচিত অথচ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনিই বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। মননশীল বিষয়চারী গদ্যরচনায় তিনি সারা জীবনই অক্লান্তভাবে ছিলেন সকর্মক। বিদগ্ধ সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন—

> “রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে—সর্বত্র পড়েছে মহাকহিবর মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগ্‌বৈভব।.....এরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয় পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ, এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।”

রবীন্দ্রপ্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। এত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনায়াস বিচরণ আমাদের বিস্মিত করে। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সঙ্গীত, শব্দতত্ত্ব, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের অসংখ্য প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিমনের প্রতিফলনে দীপ্ত অসামান্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন, যা বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই সঙ্গে আরো আছে আত্মকথা, চিঠিপত্র, ভ্রমণকথা এবং কবিমনের মাধুরী মেশানো কিছু অসাধারণ গদ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যকে স্থূল বিষয়গত নির্দেশে শ্রেণীবিভক্ত করা দুরূহ। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রণীত গ্রন্থ তালিকায় রবীন্দ্রপ্রবন্ধকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল—জীবনকথা, জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভ্রমণকথা, ধর্ম, শিক্ষা, পত্রাবলী, বিবিধ। বর্ণানুক্রমে সেগুলি এরূপ—

১। **জীবনকথা** ঃ অরবিন্দ ঘোষ, আত্মপরিচয়, খৃষ্ট, চারিত্রপূজা, ছেলেবেলা, জীবনস্মৃতি, বিদ্যাসাগর চরিত, বুদ্ধদেব, ভারতপথিক রামমেহান রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী।

২। **জাতীয় আদর্শ** ঃ কালান্তর, স্বদেশ, সভ্যতার সমকট।

৩। **ভাষা ও সাহিত্য** ঃ আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, বাংলাভাষা পরিচয়, লোকসাহিত্যে, শব্দতত্ত্ব, সাহিত্যে, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ।

৪। **শিক্ষা** ঃ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, প্রাক্তনী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শিক্ষা।

৫। **ভ্রমণ কথা** ঃ জাপানযাত্রী, জাভাযাত্রীর পথে, পথের সঞ্চয়, পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি, পারস্যযাত্রী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি রাশিয়ার চিঠি।

৬। **ধর্ম** ঃ ধর্ম, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, সঞ্চয়।

৭। **বিজ্ঞান** ঃ বিশ্বপরিচয়।

৮। **পত্রাবলী** ঃ চিঠিপত্র (একাধিক খণ্ড), ছিন্নপত্র, ছিন্নপত্রাবলী পথে ও পথের প্রান্তে, ভানুসিংহের পত্রাবলী।

৯। **বিবিধ** ঃ আলোচনা, ইতিহাস, কবির ভণিতা ছন্দ পঞ্চভূত, বিচিত্রপ্রবন্ধ, বিবিধ প্রসঙ্গ, সঙ্গীত চিন্তা, স্বদেশীসমাজ, সমবায় নীতি।

—আলোচনা থেকে বোঝা যায় গ্রন্থ নাম অনুযায়ী রবীন্দ্রপ্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টির মত এবং তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা আটশোর-ও বেশি। এই বিপুল সংখ্যা আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে যায়।

৪.৬ অনুশীলনী

১। সাধনা ও হিতবাদী পর্বের রবীন্দ্র ছোটগল্পের পরিচয় দিন।

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পে বাস্তবতা বনাম গীতিধর্মিতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। সবুজপত্রে যুগে রবীন্দ্র ছোটগল্পের রীতি প্রকৃতি বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করুন।

৪। রবীন্দ্র ছোটগল্পে অতিপ্রাকৃতের প্রয়োগ কিভাবে শিল্পিত সুষমায় পরিবেশিত—তার পরিচয় দিন।

৫। রবীন্দ্রগল্পে প্রকৃতির ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করুন।
৬। রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারীমনস্তত্ত্ব কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।
৭। লিপিকার কথিকাগুলিতে ছোটগল্পের অঙ্কুর কিভাবে বিকশিত হয়েছে, তার পরিচয় দিন।
৮। তিনসঙ্গীর গল্প তিনটিতে রীতি ও প্রকৃতিতে আধুনিকতা পূর্ণ প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে—বিচার করুন।
৯। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ নির্দেশ করুন।
১০। "পঞ্চভূত' প্রবন্ধসাহিত্য ধারায় অনন্য সংযোজন"—এ বিষয়ে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করুন।
১১। স্মৃতিকথামূলক গদ্যরচনার অনবদ্য প্রকাশ হিসাবে জীবনস্মৃতির মূল্যায়ন করুন।
১২। "কবি দার্শনিক, প্রকৃতিপ্রেমিক ও অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর অসামান্য পত্রগুচ্ছ ছিন্নপত্রাবলীতে প্রকাশিত"—মন্তব্যটির যাথার্থ্য নিরূপণ করুন।
১৩। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করুন।
১৪। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।
১৫। শিক্ষণ চিন্তার আলোকে রবীন্দ্রপ্রবন্ধের পরিচয় দিন।
১৬। রবীন্দ্রসাহিত্যতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. **অজিতকুমার চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাথ (১৯১২), কাব্যপরিক্রমা (১৯১৪)**
২. **চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : রবিরশ্মি (১ম : ১৪০৫, ২য় : ১৪০৫)**
৩. **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৫)**
৪. **নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪৩)**
৫. **শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৯৮৪)**
৬. **প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ (১৩৩৯), রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ (১৩৬২), রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (১৩৬২) রবীন্দ্র বিচিত্রা (১৩৬২), রবীন্দ্র সরণী (১৯৬৫)**
৭. **সুকুমার সেন : বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড : (১৯৯৮)**
৮. **প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড : ১৯৩৩, ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৬)**
৯. **প্রশান্তকুমার পাল : রবি-জীবনী (৭ম খণ্ড : ১৩৮৯, ১৩৯১, ১৩১৪, ১৩৯৫, ১৩৯৭, ১৩৯৯, ১৪০৪)**
১০. **ক্ষুদিরাম দাস : রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় (১৯৯৬), চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী (১৪০১), সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ (১৯৯০), রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার (১৯৮৪), চোদ্দশ' সাল ও চলমান রবি (১৯৯৪)**
১১. **ভূদেব চৌধুরী : রবীন্দ্র-উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে (১৯৮৪)**
১২. **শঙ্খ ঘোষ ' কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র-নাটক (১৯৯৫)**
১৩. **তপোব্রত ঘোষ : রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ (২০০১)**
১৪. **অমরেশ দাশ : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নব মূল্যায়ন (১৯৮৩)**
১৫. **সহদেব দে : রবন্দ্র-উপন্যাস-সমীক্ষা (১৯৭১)**
১৬. **মীনাক্ষী সিংহ (পুস্তকবিপণি)—রবীন্দ্র প্রবন্ধের রূপরেখা (২০০৩)**
১৭. **জ্যোতির্ময় ঘোষ—কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : তাঁর গল্প**
১৮. **রথীন্দ্রনাথ রায়—ছোটগল্পের কথা**
১৯. **ক্ষেত্র গুপ্ত (২০০২)—রবীন্দ্র গল্প : নারী বিদ্রোহিনী**
২০. **নন্দদুলাল বণিক—আত্মচরিতের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ**

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণের লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of
the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ বাংলা **স্নাতকোত্তর পাঠক্রম**

পাঠক্রম ঃ PGBG ঃ 1(C)

রচনা

অধ্যাপক পবিত্র মুখার্জী

অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী

অধ্যাপিকা মালঞ্চ লাহিড়ি

অধ্যাপক দিলীপ মিত্র

অধ্যাপক মানস মজুমদার

সম্পাদনা

অধ্যাপক মানস মজুমদার

পাঠক্রম ঃ PGBG ঃ 1(D)

রচনা

অধ্যাপিকা শ্রাবণী পাল

অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী

অধ্যাপক হীরেন চ্যাটার্জী

অধ্যাপিকা মালঞ্চ লাহিড়ী

অধ্যাপক দিলীপ মিত্র

অধ্যাপক মানস মজুমদার

সম্পাদনা

অধ্যাপক মানস মজুমদার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

P.G.B.G. — 1(C) & (D)

[উনিশ শতক (প্রথমার্ধ)]

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

1(C)

পর্যায়
4

একক 1 ❑ **গদ্য ঃ** **9 - 28**

ক - ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, (উইলিয়াম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, তারিনীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনসী, হরপ্রসাদ রায়)

খ - রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত।

একক 2 ❑ **কবিতা ঃ** **29 - 41**

ক - ● কবিগান ● পাঁচালি গান ● টপ্পা গান

খ - ● ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

একক 3 ❑ **সাময়িক পত্র** **42 - 52**

● দিগ্‌দর্শন
● সমাচার-দর্পন
● বাঙ্গালা গেজেট
● সম্বাদ কৌমুদী
● সমাচার চন্দ্রিকা

● সংবাদ প্রভাকর
● জ্ঞানান্বেষণ
● তত্ত্ববোধিনী

একক 4 ❑ [উনিশ শতক (দ্বিতীয়ার্ধ)] **53 - 97**

● রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
● মাইকেল মধুসূদন দত্ত
● হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
● নবীনচন্দ্র সেন
● বিহারীলাল চক্রবর্তী
● কায়কোবাদ
● ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
● গোবিন্দচন্দ্র দাস
● দেবেন্দ্রনাথ সেন
● অ(য়কুমার বড়াল
● কামিনী রায়
● মানকুমারী বসু
● গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
● দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

একক 5 ❑ প্রবন্ধ **98 - 138**

● প্যারীচাঁদ মিত্র
● রাজনারায়ণ বসু
● ভূদেব মুখোপাধ্যায়
● বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
● অ(য়চন্দ্র সরকার
● রমেশচন্দ্র দত্ত
● স্বামী বিবেকানন্দ
● সখারাম গনেশ দেউস্কার
● হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
● শিবনাথ শাস্ত্রী

একক 6 ❑ কথাসাহিত্য 139 - 184

- প্যারীচাঁদ মিত্র
- কালীপ্রসন্ন সিংহ
- ভূদেব মুখোপাধ্যায়
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- রমেশচন্দ্র দত্ত
- ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
- তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
- মীর মোশারফ হোসেন
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- স্বর্ণকুমারী দেবী
- যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

একক 7 ❑ নাট্যসাহিত্য 185 - 207

- জি. সি. গুপ্ত
- তারাচরণ সিকদার
- রামনারায়ণ তর্করত্ন
- কালীপ্রসন্ন সিংহ
- উমেশচন্দ্র মিত্র
- মধুসূদন দত্ত
- দীনবন্ধু মিত্র
- মনোমোহন বসু
- উপেন্দ্রনাথ দাস
- রাজকৃষ্ণ রায়
- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
- গিরিশচন্দ্র ঘোষ
- অমৃতলাল বসু
- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
- ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

একক 8 ❑ সাময়িক পত্র 208 - 224

- বিবিধার্থ সংগ্রহ
- মাসিক পত্রিকা
- এডুকেশন গেজেট
- সোমপ্রকাশ
- রহস্য সন্দর্ভ
- অবোধবন্ধু
- বঙ্গ দর্শন
- প্রচার
- নবজীবন
- ভারতী
- বালক
- সাধনা
- বঙ্গবাসী
- হিতবাদী
- জন্মভূমি
- বামাবোধিনী

পর্যায় 5

1(D)

একক 1	❑	কাব্য-কবিতা	225 - 299
একক 2	❑	বাংলা উপন্যাস ঃ প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্ব	300 - 324
একক 3	❑	বাংলা উপন্যাস ঃ স্বাধীনতা উত্তর পর্ব	325 - 385
একক 4	❑	ছোট গল্প—ভাগ 1	386 - 402
একক 5	❑	ছোট গল্প—ভাগ 2	403 - 515
একক 6	❑	প্রবন্ধ—ভাগ 1	516 - 551
একক 7	❑	প্রবন্ধ—ভাগ 2	552 - 575
একক 8	❑	বাংলা সাময়িক পত্র	576 - 607

একক ১ গদ্য

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

১.২.১ কেরি

১.২.২ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

১.২.৩ রামরাম বসু

১.২.৪ গোলকনাথ শর্মা

১.২.৫ তারিণীচরণ মিত্র

১.২.৬ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

১.২.৭ চণ্ডীচরণ মুনসি

১.২.৮ হরপ্রসাদ রায়

১.২.৯ উপসংহার

১.৩ রামমোহন রায়

১.৪ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১.৫ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১.৬ অক্ষয়কুমার দত্ত

১.৭ প্রশ্নমালা

১.৮ সহায়ক গ্রন্থ

১.০ উদ্দেশ্য

বাংলা গদ্যের আদিপর্বের ইতিহাস আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

১.১ প্রস্তাবনা

যে ভাষায় আমরা বাড়িতে, পথে, হাটে বাজারে, অফিসে স্কুল কলেজে কথা বলি, পরস্পরের মধ্যে মনের ভাব আদান প্রদান করি, তা হলো গদ্য, গদ্য-ভাষা। আমরা কি ভাবতে পারি যে আজ থেকে হাজার বছর আগে বাংলা ভাষায় যখন হাঁটি হাঁটি পা পা, যখন প্রাকৃত, অপভ্রংশের খোল্‌স ছেড়ে নিজের চেহারাটা হাতড়ে ফিরছিলো জীবনে কথা বলতো কবিতার ভাষায়, ছন্দে, লাইন মিলিয়ে, এতো হতে পারে না, কারণ কবিতা তো মানুষের হৃদয়ের ভাব প্রকাশের একটি শিল্পরূপ, আর প্রতিদিনের জীবনে প্রতিমুহূর্তে পরস্পরের মধ্যে কথা চালাচালির জন্যে সহজ স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে তা গদ্যই হবে, কারণ গদ্যের কোনো নির্দিষ্ট চাল নেই, তার থামটা নির্ভর করে বক্তার ইচ্ছের ওপরে; তার ভাবকে প্রকাশের জন্যে তুলনা, উপমার দরকার হয় না। এই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই গদ্যের স্বভাব।

অতএব হাজার বছর আগেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সব সময় গদ্য ছিলো পরস্পরে মধ্যে কথাবার্তা বা সংলাপের মাধ্যমে। কিন্তু, শুধু কথা বলে কোনোরকমভাবে কাজ চালানোর ভাষা ব্যবহারেই মানুষের তৃপ্তি হতে পারে না; মানুষ, এই সুন্দর প্রকৃতি, মানুষে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, সমাজ, দৈনন্দিন জীবনের নিজস্বর সুখ দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে খুঁজেছে এমন এক ভাষা, যা খুব প্রকাশ্য নয়; একটু আড়াল থাকে, আভাস ... থাকে, অনুভব ও ভাবকে ভরে রাখার মতন মাত্রা থাকে, ছন্দের বাঁধন থাকে। সে ভাবকে রূপ দেবার জন্যে কবিতার আঙ্গিক বেছে নিতে হয়েছে সেকালের মানুষকে।

অন্যদিকে, ছন্দ বা বাক্যের 'শাসন' দিয়ে বক্তব্যকে বেঁধে দিতে হয়েছে, কারণ তখন পুঁথি লেখা হতো হাতে, ছাপাখানা আসেনি। কবিতা যেহেতু ছন্দে বাধা, তাই মনে রাখা সহজ। গদ্য যেহেতু স্বাধীনভাবে চলে, তাই তা মনে রাখা কঠিন। তাই আদি বা মধ্যযুগের সাহিত্য গদ্যে নয়, কবিতায় লেখা হয়েছে। দর্শনেরই হোক, ব্যাকরণেরই হোক, ছন্দের আশ্রয় নিতে হয়েছে মুখস্ত করার সুবিধের জন্যে।

কিন্তু গদ্য কি ছিলো না? তার লিখিত রূপ তেমন খুঁজে পাওয়া কঠিন সংরক্ষণের অভাবে। নিশ্চয়ই জমিদার রাজা, মহাজন গদ্যেই দলিল দস্তাবেদ, চুক্তিপত্র ইত্যাদি লিখতেন। বহুদিনের বহু মনীষীর চর্চার ফলে যে আধুনিক গদ্যের সঙ্গে আজ আমাদের অনিবার্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেদিনের ওই কালেভদ্রে লেখা দলিল বা চিঠিচাপাতিতে সেই সরল সহজ গদ্যের কোনো স্বাক্ষর ছিলো না।

বাংলা গদ্যের প্রথম নমুনা বলা হয় ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের অহোমরাজ স্বর্গতঃ নারায়ণকে লেখা চিঠিটি।

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তর বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ

সম্পাদক পত্রাপত্রি অতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রয়ে। তোমার আমার কর্তব্যে বার্ধ্বকতাই পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আহি।'' ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যের গবেষক পন্ডিতেরা এরকম আরও কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেমন রূপ গোস্বামীর 'কারিকা', বা নরোত্তম দাসের 'দেহকড়চা' (১৬৮১-৮২) তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন্ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপ হইল। ইত্যাদি।

বোঝা যায়, একটু বদলে নিলে আজকের গদ্যের সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে।

কিন্তু, গদ্য যেহেতু প্রয়োজনের ভাষা, তার ব্যবহার যদি বাধামুক্ত না হয়, তবে তার সমৃদ্ধি ও প্রসার ঘটবে কিভাবে?

তার জন্যে আমাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। এবং এই সমৃদ্ধি ও প্রসারের জন্যে ক্ষেত্রটি তৈরী করে দিতেছিলো বিদেশীরা। ''বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা'' নামক গ্রন্থে গোপাল হালদার বলেছেন; সচেতন গদ্য-চর্চার ও গদ্য ব্যবহারের কৃতিত্ব পর্তুগীজ পাদ্রি ও তাঁদের শিষ্যদের তা মানতেই হবে। বিশেষ করে, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তাঁরাই অন্ধকার যুগের অন্তকাল ঘোষণা করেছিলেন। রোমান হরফে বাঙলা গ্রন্থ মুদ্রিত করে গদ্যকে তাঁরা স্থিরত্ব দিতে ও বহুল প্রচারিত করতে চেষ্টা করেন।

মজার ব্যাপার হলো, পর্তুগীজদের বাংলা বই রোমান হরফে ছাপা হয়েছে। তাই তাদের এসব গ্রন্থের অবদান বাংলা সাহিত্যে তেমন নেই, আর মুদ্রিত পুঁথিত দুষ্প্রাপ্য।

ষোড়শ শতকের শেষ থেকে পর্তুগীজ পাদরিরা নিজেদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কড়চা বই লিখতে শুরু করেন। প্রশ্ন আর উত্তর-এর মধ্য দিয়ে ধর্মালোচনা। ডঃ সুকুমার সেন ১৫৯৯-এ লেখা একটি চিঠির উধৃতি দিয়েছেন, তার সামানয অংশ উদ্ধার করছি।

'ছেলেরা শোভাযাত্রা করিয়া গান গাইতে গাহিতে আমাদের স্বাগত করিতে আসিল। তাহারা সনির্বন্ধে বলিল, আমাদের শিক্ষা দাও, ধর্ম উপদেশ দাও।'

ডঃ সেন এই চিঠির লেখক 'ফের্নন্দেজের কোচিন থেকে শ্রীরামপুরের আসার কাল ধরেছে ১৫৯৮ বলে গ্রন্থটির রচনা ও অনুবাদ কাল বলেছেন ১৫৯৮-এর শেষার্ধ। পর্তুগীজরা ধর্মান্তরিত করতেন প্রলোভন দেখিয়ে বল প্রয়োগ করে। তাদের লেখা বই মূলত পাদরিদের জন্যই লেখা, তা সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছোবার জন্যে নয়।

এক্ষেত্রে ব্রিটিশ পাদরিদের ভূমিকা, অর্থাৎ তাদের ধর্মপ্রচারের উপায়টা অন্যরকম ছিলো। কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ধর্ম প্রচারে পাদরিদের সহায়ক ছিলো না। কোম্পানি মনে করতো, জোর করে খ্রীষ্টধর্ম চাপালে কোম্পানির ক্ষতি হবে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য শাসন ও কর আদায়ের কাজে শাসক ইংরেজদের প্রয়োজন হলো দেশি ভাষা শেখবার। তাছাড়া কোম্পানির আইন কানুন দেশিভাষায় লেখার দরকার হলো। প্রয়োজন তীব্র না হলে উপায় ও উদ্দেশ্য স্থির হতে পারে না। ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধ, ইংরেজের জয়, রাজ্যভার নিজ হাতে কোম্পানির গ্রহণ না করা এবং ৬৫-র পর কোম্পানীর নিজের হাতে রাজ্য ভার গ্রহণ, বাংলা গদ্যের উদ্ভব মুহূর্তের একটা স্মরণীয় সময় বলতে হবে।

এতোকাল আরবি-ফারসি অধ্যুষিত দলিল দস্তাবেজই চলে আসছিলো। বাংলা ছিলো সাহিত্যের ভাষা, গ্রামকেন্দ্রিক সাহিত্যের ভাষা। আর তাও ছিলো ধর্মাশ্রিত, পদ্যে লিখিত। এবার শাসন ব্যবস্থার দরকারে গদ্যের ব্যাখ্যার জরুরী হয়ে উঠলো। 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দখল দৃঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে (১৭৬৫) রাজ্যশাসন ও রাজস্ব আদায়ের কাজে দেশি ভাষা শিখিবার ও সে ভাষায় আইন কানুন লিখিবার প্রয়োজন অপরিহার্য হইল।''

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (অন্ত) ডঃ সুকুমার সেন। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে একথাও বলোছেন যে 'পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইংরাজ বণিক দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। বাস্তব বোধ এক্ষেত্রে যে কতোখানি কাজ করেছে, বোঝা যায়। 'ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও জনসাধারণের সহিত ভাষাগত সমপ্রীতি স্থাপনের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গদ্যরচনার জন্য যে উৎসাহ ও তৎপরতা।' ইংরেজ বণিক ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ দেখিয়েছেন, তার পেছনে 'সূক্ষ্ম অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পেরণা ছিলো, বলেছেন ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশ শাসনের জন্যেই দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন, দেশীয় এবং স্বদেশ থেকে আগত সিভিলিয়ানদের ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হতেই কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী হ্যালহেড, যিনি আগে থেকেই বাঙলা ভাষাটা জানতেন, তিনি লিখলেন The grammar of the Bengali language (১৭৭৮); যদিও বইটি লেখা ইংরেজীতে। এই বইটি ছাপাবার জন্যে বাংলা মুদ্রণ ব্যবস্থারও প্রয়োজন হয় এবং সুত্রাপাতও হলো। এই মুদ্রণযন্ত্রই আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ করে, গদ্য চর্চা ও প্রসারে নিলো বিরাট ভূমিকা।

বইটি ইংরেজীতে লেখা হলেও উদাহরণ দিতে গিয়ে অনেক বাংলা শব্দ ব্যবহারের দরকার হলো। আর ঐ বাংলা শব্দের জন্যে অক্ষর তৈরীর জন্যে স্যার চার্লস উইলকিন্‌স ছেনি কেটে ছাপার যোগ্য অক্ষর বানালেন। বইটি ছাপা হলো হুগলীতে।

একটা অতি প্রয়োজনীয় কাজ করে দিলেন চালর্স উইলকিনস্। তিনি ছিলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন চাকুরে। তিনি আরো একটি কাজ করলেন। দেশে ফিরে যাবার আগে পঞ্চানন কর্মকার নামক একজন লোককে কি ভাবে অক্ষর বানাতে হয়, শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। এই পঞ্চানন কর্মকার ও তার ছেলে ছাপার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন।

ইংরেজ মিশনারীদের অবদান এই গদ্যসৃষ্টির প্রথম যুগে কম ছিলো না। আগেই বলেছি, ইংরেজ শাসকদল প্রথমে আগ্রহী ছিলেন না, কারণ এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে জন অসন্তোষ হতে পারে। উইলিয়াম কেরি নামক এক ধর্মযাজক কলকাতায় এলেন, (১৭৯৩ এর ১১ নভেম্বর) তাঁর স্বপ্ন ছিলো এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন জশুয়া মার্শম্যান এর উইলিয়াম আয়ার্ড। ওলন্দাজদের শহর শ্রীরামপুরে এসে তারা রামরাম বসু নামক একজন দেশীয় মুন্সীর সাহায্য নিয়ে বাংলা ভাষা শিখলেন। তাঁরাই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের নিউটেস্টামেন্ট অনুবাদ করলেন এই শ্রীরামপুর থেকে, করলেন শ্রীরামপুর প্রতিষ্ঠা।

কেরি ও তার বন্ধুদের চেষ্টায় বাংলা গদ্য একটি চলনযোগ্য রূপ পেলো। আর এখান থেকে বাংলা গদ্যের যাত্রা হলো শুরু।

১.২ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

দেশের শাসন ঠিকভাবে চালাতে গেলে দেশীয় ভাষা শেখা দরকার। শাসন করার ভার নিয়ে বিলেত থেকে যারা আসছিলেন তাদের এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা থাকতো না। মূলত, তাদের এদেশীয় ভাষা, ধর্ম, সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে লর্ড ওয়েলেসলী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতায়। এই কলেজের বাংলা ভাষা শেখাবার দায়িত্ব নিলেন কেরি সাহেব। আর পণ্ডিতের পদে যোগ দিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এবং রামনাথ বাচস্পতি। সহকারী ছিলেন আরো কয়েকজন পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। সব চাইতে বড়ো কথা, এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা গদ্যের সূচনা পর্ব শুরু হলো। তার আগে, মিশনারীদের চর্চা ছিলো ধর্মগ্রন্থ অনুবাদে নিয়োজিত। সাধারণের মধ্যে তা তেমন প্রসার লাভ করেনি। আর ভাষার প্রাণধর্ম নির্ভর করে তার সাধারণ-চর্চার উপর, শুধু পণ্ডিতী চর্চায় গতি পায় না ভাষা। এই কলেজেই মূলত কেরি সাহেবের নেতৃত্বে কয়েকজন পণ্ডিত লেখকদের সাহায্যে বা তাদের দিয়ে মৌলিক বা অনুবাদ গ্রন্থ লেখা শুরু হয়েছিলো।

কেরি সাহেব ছাত্রদের জন্যে সহজবোধ্য পাঠ্যবই লেখাবার তাগিদ অনুভব করলেন। কলেজের পণ্ডিত অধ্যাপকবৃন্দ শুরু করলেন গদ্য-গ্রন্থ লিখতে।

১.২.১ কেরি

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করেই কেরির প্রধান কর্মদ্যোগ শুরু হলো। তিনি কলেজে যোগ দিলেন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক রূপে, প্রায় ছ'বছর পরে, ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিভাগের প্রধান রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

কেরি প্রথমেই পাঠ্যতালিকা এবং পাঠ্য পুস্তক নিয়ে কাজ শুরু করলেন। একদল লেখক গোষ্ঠীর পরিচালক হলেন তিনি। বাংলা গদ্যের একটি লেখ্যরূপ গড়ে তোলার কাজে নিজেকে ও অন্য সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করলেন। লিখলেন *'কথোপকথন* (১৮০১ খ্রী) *ইতিহাসমালা* (১৮১২) *'কথোপকথন'* কথাটি ইংরেজি ডায়ালগ শব্দের প্রতিশব্দ। ''.....বাংলা ভাষায় কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙালাভাষা ও বাঙালী সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ৩১টি অধ্যায় দেওয়া হয়েছে।' 'কথোপকথন' দ্বিভাষিক, এক পৃষ্ঠায় বাংলা অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি। এই সংকলনে কেরি ইংএরজি অনুবাদক মাত্র। গোপাল হালদার আরো লিখেছেন; পাত্রপাত্রীর বিষয় ভেদে এই কথোপকথনের ভাষা যে গম্ভীর বা লঘু হবে, মার্জিত বা স্খলিত হবে, এমন কি বাংলা দেশে তা ফারসী ঘেঁষা বা সংস্কৃত মিশানো হয়ে থাকে, কেরি নিজেই তা উল্লেখ করেছেন। কেরির আর একটি বই 'ইতিহাস মালা'। ১৮১২ সালে প্রকাশিত। এখানে প্রায় দেড়শ (১৫০) গল্প সঙ্কলিত আছে। নানা উৎস থেকে গল্প সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছেন এবং সংকলন করেছেন। এটাও তাঁরা মৌলিক রচনা নয়।

১.২.২ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

কেরি সাহেবের সহকারী দুজন অগ্রনী লেখকের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অন্যতম। অন্যজন রামরাম বসু। বাংলা গদ্যগ্রন্থের প্রথম লেখক ছিলেন তাঁরা। ১৮০১ থেকে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় এই কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। সংস্কৃত এবং বাংলা, দুটো ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো। তাঁর চারখানা বই ১। *বত্রিশ সিংহাসন* (১৮০২) *রাজাবলি* (১৮০৮); *হিতোপদেশ* (১৮০৮); *বেদান্ত চন্দ্রিকা* (১৮১৭) এবং *প্রবোধ চন্দ্রিকা* মৃত্যুর পরে ১৮৩৩ সালে ছাপা হয়। শেষের বইটিই মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বলা হয়। বইটি দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিলো।

অন্য তিনটে বইই অনুবাদ, সংসকৃত থেকে। মৌলিক গদ্য গ্রন্থ তখন বাংলায় ছিলো না, এই উদ্ভবযুগের লেখকদের তাই অনুবাদ করে একটা গদ্যের স্টাইল গড়ে তুলতে হয়েছিলো। স্টাইল-এর দিক থেকে প্রবোধচন্দ্রিকা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলেও রাজাবলির ভাষা অনেক সহজবোধ্য, সচ্ছন্দ। সেকালের পক্ষে এও একটা মস্ত গুণ।

প্রবোধচন্দ্রিকা বইটি লোক জীবন আশ্রিত গল্পের সংকলন, তাই ভাষাও কৃত্রিমতাবর্জিত। ‘হিতোপদেশ’ বই-এর ভাষা অনেকটাই সংস্কৃত-অনুসারী।

আমরা ভাষা নিয়ে বারবার কথা বলছি, কারণ গদ্যভাষার একেবারে প্রথম যুগে সাহিত্যিক উৎকর্ষ কতখানি, তা দেখার চাইতে আজকের এই সমৃদ্ধ বাংলা গদ্যের উদ্ভবকালে কে কিরকম প্রয়াস করেছেন সেটাই বেশি মূল্যবান বলে।

১.২.৩ রামরাম বসু

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের লেখকদের মধ্যে রামরাম বসু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি নাম। মাত্র দুটো বই লিখেছিলেন তিনি। দুটিই মৌলিক রচনা।

১। *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১)।

২। *লিপিমালা* (১৮০২)

বাংলার কায়স্থ সন্তান এই লেখকের মৌলিক বই ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ গল্পগ্রন্থ, বাংলায় ছাপা প্রথম গল্পের বই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্যে লেখা, পাঠ্য বই। কেমন ছিলো এ বইয়ের গদ্যভাষা—

সম্প্রতি স্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদায়িক নাই.........

পড়লেই বোঝা যাবে, একালের গদ্যের সঙ্গে ক্রিয়াপদঘটিত কোনো পার্থক্য নেই। তবে দাড়ি কমা নেই বলে পড়তে অসুবিধে হচ্ছে। ছেদচিহ্ন ব্যবহারের জন্যে আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কবে কোথায় জন্মেছিলেন তা এখনো জানা যায়নি। তবে পাদ্রি টমাস সাহেবের মুনসি (১৭৮৭) নিযুক্ত হন। তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের অনুরাগী, এমন একটা ভাব টমাসের মনে দৃঢ়বধ্ব করেছিলেন, অবশ্যই আর্থিক নিরাপত্তা অর্জনের জন্যে। টমাস দেশে ফিরে গেলে কেরির মুনসি হলেন। খ্রীষ্ট ধর্মীয় নানা বিষয় নিয়ে লিখলেও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেননি।

লিপিমালা (১৮০২)

প্রায় ৪০টি লিপি বা চিঠির সংকলন। কাকে কে লিখছেন এসব চিঠি? রাজা লিখছেন অন্য রাজাকে, রাজা লিখছেন চাকরকে, পিতা লিখছেন পুত্রকে, মালিক লিখছেন চাকরকে, তবে মজার ব্যাপার হলো, চিঠিগুলো সাধারণ চিঠির আকারে লেখা হয়নি; চিঠির আকারে পৌরাণিক চরিত্র বা কাহিনী উপস্থিত করা হয়েছে। রচনা রীতিতে নতুনত্ব রয়েছে, নিজস্বতা রয়েছে। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষার মতন সংস্কৃত আরবী ফারসী বহুল গদ্য নয়, এর ভাষা অনেক সহজ সংযত। একারণে বইটির গুরুত্ব রয়েছে বাংলা গদ্যের আদিযুগের ইতিহাসে।

১.২.৪ গোলকনাথ শর্মা

গোলোকনাথ শর্মা সংস্কৃত পন্ডিত ছিলেন এবং কেরী সাহেবের সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন বলা হয়। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত ‘হিতোপদেশের গল্প থেকে কিছু কিছু গল্পের অনুবাদ করেছিলেন। ‘হিতোপদেশ’ নামে বইটি সম্ভত ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নানা দোষত্রুটি সত্বেও এই বইয়ের গদ্য সরল এবং বাক্য গঠনও সহজ বোধ্য।

সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, যে গোলোকনাথের পুরোনাম ছিল গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর বাড়ি ছিল মালদহের মহীপাল দীঘির কাছে কোন এক স্থানে। ১৮০৩ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

১.২.৫ তারিনীচরণ মিত্র

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দি বিভাগে মুন্সীরূপে যোগ দেন। ১৭৭২ খ্রীঃ বা কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্ম হয়।

বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় তাঁর দখল ছিল। জন গিল ক্রাইষ্ট-এর অধীনে রোমান হরফে একটি বই ছাপা হয়েছিল। নাম *ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট* (১৮০৩)। তার বাংলা, ফরাসী ও হিন্দুস্থানী অনুবাদ করেছিলেন এই তারিণীচরণ। তার বিশেষ অবদান হল, যতি চিহ্নের ব্যবহার তাঁর গ্রন্থে প্রথম দেখা যায়।

১.২.৬ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একজন পণ্ডিত। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলা হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং,' বইটি লেখেন তিনি। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত অনুসরণে বইটি লিখেছিলেন রাজীব লোচন, বলা হয়ে থাকে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভাষার দিক থেকে ঐ যুগের অন্যান্য বই এর তুলনায় স্বচ্ছতা রয়েছে।

১.২.৭ চণ্ডীচরণ মুনসি

ভাষা যতক্ষণ একটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে পারছে, ততোক্ষণ অনুবাদের মধ্য দিয়ে পথ খোজার পালা চলবেই। তারিণীচরণ মুনসি, চণ্ডীচরণ মুনসিরা এই অনুবাদকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। বাংলা বই লেখা, ছাপানো, তা পড়ার মতন মানুষ নেই; যেটুকু পড়াশুনো তা টোলে, মাদ্রাসায়, অর্থাৎ সংস্কৃতে আর সদ্য রাজা দল গেলেও তার রাজসভার ভাষা ফারসিতে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা তাই বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত হতে পারে এমন বই হাতে পাননি, তাঁদের পক্ষে কঠিন ছিলো গদ্যচর্চার প্রাথমিক ভিতটা গড়ে তোলা। সেকাজ তাঁরা সমবেত ভাবে সাধ্যমতো করে গেছেন।

যেমন চণ্ডীচরণ মুনসি। ফারসি তোতা কাহিনীর হিন্দুস্থানী অনুবাদ 'তোতা কহানী' অবলম্বনে তোতা ইতিহাস' অনুবাদ করলেন তিনি। ১৮০৫-এ তা ছাপা হলো। এতে ৩৫টি কাহিনী রয়েছে। গল্পগুলো বারবার ছাপা হয়েছে, কারণ গল্প পড়ার ইচ্ছে সামান্য বাংলাভাষা জানা মানুষের মধ্যে সেদিনও ছিলো। ছাত্রপাঠ্য বই হলেও এই বইটির গল্পরসের চাহিদা সেদিন কম ছিলো না।

ভাষার দিক থেকে সে সময়ের রাজভাষা ভারসি এবং অভিজাত ভাষা সংস্কৃতের দ্বারা প্রথমে প্রভাবিত থাকলেও ক্রমশ সহজ হয়ে ওঠে, তাই সকলের পাঠ যোগ্যতা পায়।

''বালক নামে এক শহরে চারিজন বন্ধু ধনবান ছিল তাহাদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল।''

বোঝা যাচ্ছে, ভাষা তেমন কঠিন, দুর্বোধ্য নয়। চণ্ডীচরণ এছাড়া 'ভগবদ্গীতার'ও অনুবাদ করেন।

১.২.৮ হরপ্রসাদ রায়

'পুরুষপরীক্ষা' বই-এর লেখক। তাও অনুবাদ। কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় 'পুরুষপরীক্ষা' লেখেন, হরপ্রসাদ রায় তার অনুবাদ করেন। ১৮১৫ তে ছেপে বের হয়। এ বই-এর চারটি পরিচ্ছেদ, গল্প ৫২টি। 'পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ নির্দেশক গল্প ৪৪টি।'

এ ছাড়া হরপ্রসাদের বিশেষ কৃতিত্বের খবর পাওয়া যায় না।

১.২.৯ উপসংহার

বাংলা গদ্যের উন্মেষকাল দেখে মনে হওয়া কঠিন, একশো বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা পৃথিবীর সবচাইতে উন্নত ভাষাগুলোর সমান হয়ে উঠবে। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের চিন্তা ও তথ্যমূলক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বা কাজের উপযুক্ত মাধ্যম হয়ে উঠেছে দ্রুত। আর সাহিত্যের, অর্থাৎ সৃষ্টিধর্মী রচনার মাধ্যম হিসেবে বাংলা অত্যন্ত উন্নত ভাষার অন্যতম সৃষ্টিকর্মও হয়েছে জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মের সমানমূল্যের তা আজ স্বীকৃত। অথচ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্দেশ্য ছিলো সিভিলিয়ানদের প্রাথমিক শিক্ষা দান। সে উদ্দেশ্যেই সাধন করেছিলেন উপরে উল্লিখিত লেখকেরা।

একথা ঠিক, 'ফোট উইলিয়াম কলেজ'-এর উদ্দেশ্য সার্থক সর্বাংশে হয়নি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। তবু এদেশের মানুষের গদ্য চর্চার প্রাথমিক ভিত রচনার কারণে কলেজটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

১.৩ রামমোহন রায়

একথা আমাদের জানা প্রয়োজন, বাংলা গদ্যের ইতিহাসের প্রথম পর্বের প্রধান পুরুষ। যে ভিত গড়ে উঠেছিলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মুনসিদের হাতে, হোক তা অনুবাদ, হোক পাঠ্যস্তরে উপযোগী প্রাথমিক খোজখবর, একটা ভাষা কাঠামো তাঁদের হাতেই চেহারা পায়। আর এই ভিত্তির উপরে রাজা রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের তাবৎ কীর্তিস্তম্ভ গড়ে তোলা।

রাজা রামমোহন (১৮১৫-১৮৩০), এই পনেরো বছর ধরে আধুনিকতার পথ খনন করে গেছেন। বাঙালীর পরম সৌভাগ্য রামমোহন মতন এমন বিশাল, যুক্তিবাদী, বিদ্রোহী চরিত্রের ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিলো আমাদের মধ্যে। ডঃ সুকুমার সেন রামমোহন সম্পর্কে চমৎকার একটি উক্তি করেছেন— 'গীর্জা ও পাঠশালার বাহিহরে আনিয়া, বিচার বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগাইয়া, বাঙ্গালা গদ্যকে জাতে তুলিলেন। আধুনিক কালের পুরোভূমিকায় সবচেয়ে শক্তিশালী ও মনস্বী ব্যক্তি রামমোহন রায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় খণ্ড)

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরকে জানা বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার অহংকারকে অনুভব করা। রাজা রামমোহন

গল্প, উপন্যাস, সরস নিবন্ধের লেখক ছিলেন না, তিনি মূলত চিন্তাবিদ্, কর্মী ও সংস্কারবাদী। শুধু বাঙলা নয়, ভারতের ইতিহাসের আধুনিক যুগেরও প্রবর্ত্তক হলেন রামমোহন। ইংরেজী শাসন প্রবর্তন, ইংরেজী শিক্ষা প্রসার ও তার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষার, এবং যুক্তিবাদী ভাবনার আগমন কাল থেকেই আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির উৎসব। ধর্মীয় সংস্কার চালিত, সাহিত্য, শিল্প মূলত গ্রাম্য জীবনাশ্রিত অনড় অবস্থার মধ্য থেকে তার আগে জন্ম নিতো। গতানুগতিকতা যেমন ছিলো মধ্য যুগের সাহিত্যে, তেমনি ছিলো ধর্মীয় ভাব ও সংস্কারে প্রাধান্য। আমাদের দেশের সেই জড়তাকে ধাক্কা মারলো পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য, আমরা নগর কেন্দ্রিক যুক্তি নির্ভর, কর্মব্যস্ত এক জীবনে প্রবেশ করে নতুন করে সব কিছুর মূল্যায়ন করতে শুরু করলাম। শুরু হলো নতুন এক যুগের। আর এই যুগের ভাব ভাবনা ভাষা পেলো গদ্যকে আশ্রয় করে যা আগে ছিলো না। রামমোহনের হাত ধরে এই বাংলা গদ্যের জয়যাত্রার সূচনা হলো।

১৭৭৪ (খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার রাধা নগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম। জাতিতে ব্রাহ্মণ রামমোহনের পিতা ছিলেন জমিদার। মা ছিলেন নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। বাবা রামাকান্ত রায় ঘোর বিষয়ী ছিলেন। রামমোহনকেও তিনি বিষয় বুদ্ধিতে পারদর্শী করে তুলেছিলেন, আর সেকালের সরকারি ভাষা আরবি ফারসিতে শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু মূলত, রামমোহন ছিলেন জ্ঞান ভিক্ষু। তাছাড়া সংবেদনশীল মানুষটি হিন্দু সমাজের প্রচলিত কুসংসকার ও নানা প্রথার অমানবিকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে হয়ে পড়লেন কিছুটা হিন্দু-ঐতিহ্য বিরোধী। তাঁর নাম যুক্ত হয়ে গেছে সে কালের নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার সঙ্গে। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের এক ঈশ্বর এই চেতনার উদ্‌বুদ্ধ হলেন রামমোহন। হিন্দুধর্মের মূর্তি পুজার বিরুদ্ধে বিরাগ জন্মালো তাঁর মনে। পরবর্তীকালে তাঁর প্রবর্তিত একেশ্বরবাদী ধর্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম এই নতুন চেতনার বাস্তব প্রয়োগ বলা চলে।

তাঁর কর্মক্ষেত্রে সেকালের কলকাতা শহর, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজধানী। তিনি যখন কলকাতায় এলেন তখনো ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। নিজে কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলেন।

বাংলা ভাষা, বিশেষ করে তাঁর গদ্যচর্চার মূলে তার যুক্তিবাদী মন ও প্রতিবাদী চরিত্র। একদিকে নিজের হিন্দুধর্মের কুপ্রথার ও স্বজনদের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন কলম নিয়ে, অন্যদিকে বিদেশী-ধর্মযাজকদের অকারণ আক্রমণের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, লেখাকে মাধ্যম করে নিলেন। নিজের জাতিকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন, আবার তার অযৌক্তিক নিষ্ঠুর ক্রিয়াকাণ্ডকে আঘাত হানতে তাঁর জুড়ি ছিলো না। মূলত, এই দুটি কাজে ব্যাপৃত হয়ে বাংলা গদ্যকে যুক্তি ও মুক্তির উপায় রূপে ব্যবহার করলেন রামমোহন।

আজকের এই স্বার্থপরতার যুগে, ব্যক্তি লোভ ও নীচতার অজস্র উদাহরণের যুগে রামমোহনের কথা স্মরণ করা যেন মানবতার আদর্শকেই মনে করার সামিল। কেননা, এই প্রবল ব্যক্তিত্বের মানুষটির মধ্যে ছিল অসম্ভব মানব-প্রেম। মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান ভেবেছেন তিনি, আর মানুষের সেবাকেই ভেবেছেন ঈশ্বর সেবা। সেকালের নারী সমাজের ছিল চরম দুরবস্থা। সতীদাহ এক নিষ্ঠুর প্রথা। যা রামমোহনকে ব্যথিত ও খুব চঞ্চল করে তুলেছিল। তিনি সেই

দুঃখ নিবারণের জন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবার যুক্তি দিয়ে প্রবন্ধ লিখে সতীদাহের সমর্থকদের ছিন্ন ভিন্ন করেছিলেন। স্বভাবতই যুক্তির ভাষা গদ্যকেই তিনি অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। সে সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের যে গদ্যচর্চা তার অর্থ অনেক সময়েই বোঝা যেত না, সাধারণ মানুষ সে সম্বন্ধে তেমন জানতো না, আবার তাদের কাজ মূলত ছিল পাঠ্য পুস্তক লেখায় সীমাবন্ধ। রামমোহন সে কালের শিক্ষিত বাঙালী। পাঠকের মনে তাঁর মুক্তি ও ভাবনাকে পৌঁছে দেবার জন্যে বাংলা গদ্যের নির্মাণে মন দিলেন। ফলে, তাঁর একটি নিজস্ব স্টাইল গড়ে উঠল। প্রকৃত পক্ষে বাংলা গদ্যের নতুন পথ তিনি আবিস্কার করেন। পাঠ্য বইয়ের বাইরে তিনি গদ্যকে নিয়ে এলেন। সেকালের বিখ্যাত কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন যে, দেওয়ান জি (রামমোহন) জলের মত সহজ ভাষা লিখতেন, তাতে বিচার বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সহজে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেত আর তার ফলে পাঠকেরা তা সহজেই বুঝতে পারতেন। কিন্তু তাতে বিশেষ পারিপাট্য ও মিষ্টতা ছিল না।

গোপাল হালদার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রামমোহনের ভাষা ছিল কর্মী পুরুষের ভাষা, একজন বিচার দক্ষ তাত্ত্বিকের ভাষা। সে ভাষা ভাবুকের ভাষা নয়, শিল্প রসিকের ভাষা নয়। প্রাঞ্জল কিন্তু, সরস নয়।

তাঁর বিরুধ্বাদী হিন্দু রক্ষণশীল সম্প্রদায় এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণ ও যুক্তিকে খণ্ডন করে যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁকে যুক্তি মুখীন গদ্য গড়ে তুলতে হয়েছিল। এই সময়ে এসেছিলেন ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিওর মত অসাধারণ শিক্ষাবিদ, মনের দরদী পুরুষ। এসেছিল হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গল নামে বিদ্রোহী সম্প্রদায়। রামমোহনের সমর্থক রূপে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি নব্যশিক্ষিত প্রধান ব্যক্তিগণ। পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য গড়ে উঠেছে স্কুল বুক সোসাইটি। শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ছিলেন উইলিয়াম কেরী, রাধাকান্ত দেব এবার শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ। আবার এই সময়ে লেখকদের জন্যে সাময়িক পত্র বা সংবাদ পত্র নিল বিশেষ ভূমিকা। সে ইংরেজই হোক বা বাঙালীই হোক, খবরের কাগজে সংবাদ পরিবেশনের জন্য চাই গদ্যভাষা। একটির পর একটি সংবাদ পত্র বেরুতো তখন। আর তাতে নিয়মিত লেখক শ্রেণী গড়ে উঠল। এবং এই সময়ে ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দু-একজন লেখকের রস রচনা গদ্যে লেখার সূচনা হল। রামমোহনের কালে ধম নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার ও বিতর্ক মূলত গদ্যে আরো তীব্র হল। রামমোহন ভারতের ঐতিহ্য দেখাবার জন্যে উপনিষদ অনুবাদ করলেন, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অনুবাদ করলেন।

তাঁর প্রধান প্রধান রচনা হল *বেদান্ত* (১৮১৫) *বেদান্তসার* (১৮১৫) *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৮১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৮) *সহমরণ, বিরোধী* (১৮১৭), *পুস্তিকা হল প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* (১৮১৮)। *'পথ্যপ্রদান'* (১৮২৩)। তাছাড়া শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা যখন হিন্দু ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে বিতর্ক চালাচ্ছিলেন তখন তিনি প্রকাশ করেন 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' (১৮২১) ও সম্বাদ কৌমুদি (১৮২১) নামে দুটি পত্রিকা।

তিনি ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত নিজস্ব একটি ভাষা গড়ে নিয়েছিলেন তা, উপনিষদের অনুবাদই হোক বা বেদান্ত গ্রন্থের ভাষায় হোক। তবে সহমরণ প্রথা নিবারণের জন্যে যে পুস্তিকা রচনা করেন তার ভাষা মুক্তি ও চিন্তায় সমৃধ্ব। ১৮১৫—১৮৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। তাতে বেদান্ত উপনিষদ,

সহমরণ বিষয়ে তার নির্ভিক যুক্তি উপস্থাপনা, পাদ্রীদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক, একজন ব্রহ্মধর্মী গৃহস্থের আচরণ বিধি, ব্রহ্ম সঙ্গীত এমন কি গোত্রীয় ব্যকরণ ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী, ফরাসী ভাষায় লেখা অনেক রচনা তাঁর ছিলো। তাঁরাই হাতে প্রথম ব্যক্তিত্ববান বাংলা গদ্যের জন্ম জয়। বিচার বিশ্লেষণ, যুক্তি সিদ্ধান্ত তার গদ্যকে খুব সচল ও জীবন্ত রখেছে। এবার তারই যুগে শুরু হয়েছিল বাংলার রেনেসাঁ। তিনি তাঁর অগ্রদূত। রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে লিখেছিলেন; 'কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশ এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করেন নাই।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে এই উক্তি সব অর্থেই সত্য ভাষণ।

১.৪ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায় পর্যন্ত বাংলা গদ্যভাষা মূলত প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে, তা যুক্তিতর্কের ভাষা, কঠিন বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যঅ বিশ্লেষণের ও সিদ্ধান্ত্রে ভাষা। গদ্য গড়ে উঠছে, কিন্তু রসসাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী গদ্য তা ছিলো না।

'রসসাহিত্য' বলতে ব্যক্তি মনের অনুভব-বিস্ময়-আনন্দ, বিষাদ নিয়ে এক একটি মনের গভীরে যে আলোড়ন হয়, তাকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যা জ্ঞানের চাইতে আনন্দ দান করে বেশি। সে রচনা পড়ে আমরা আনন্দের স্বাদ পাই, তাই রস রচনা বা সাহিত্য। শেষ পর্যন্ত সাহিত্য বলতে রস অনুভব করা যায় এবং গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক বা রসরচনাকে বুঝি।

এক সময় ছিলো, যখন এই আনন্দের যোগান দিন কথা-নির্ভর কাব্য। চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুরকে নিয়ে বা বৈষ্ণব শক্তিদের অনুভূতি নিয়ে তার প্রকাশ ঘটতো। তাতে ধর্মভা প্রচার ছিলো মুখ্য। আধুনিক যুগ শুরু হতে সাহিত্য ক্রমশ ধর্মনির্ভরতা ছাড়তে লাগলো, আসতে লাগলো মানুষের জীবনের বাঁচার কথা, সমস্যার কথা অর্থাৎ বাস্তব জীবনই হলো সাহিত্যের বিষয়।

রামমোহন রায় এই আধুনিক যুগের চিন্তাশীল মানুষ; তার লেখা প্রবন্ধ যুক্তির পথ বেঁছে নিয়ে ছিলো। তিনি রসের সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। এই রসসাহিত্যের সূত্রপাত ঘটলো ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। সমাচার দর্পন পত্রিকার পাতায় ১৮২১-২২ খ্রীঃ বাবুর উপাখ্যান, শৌকিন বাবু, বৃদ্ধের বিবাহ এ জাতের বিদ্রূপ এবং হাসির চিত্র প্রকাশিত হয়েছিলো। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন যে, এসব রচনা ভবানীচরণেররই। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের যে গদ্যচর্চা তার প্রস্তুতি তারই হাতে হয়েছিল, অন্তত সেই গদ্য যা শুধু মুক্তির নয়, যাতে রসের সৃষ্টি হয়। তার রচনায় সেই সময়ের যুগ চেতনার কথা রয়েছে। আর তা ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রসসৃষ্টির পরিচায়ক। ভবানীচরণের এই ব্যঙ্গরসের লেখা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, নীরস শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কের যুগে বাংলা ভাষায় লালিত্য রস সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তিনি। ১৯ শতকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে পূর্ণ সামাজিক চিত্র রচয়িতা হিসেবে তার নামই করা যায় সবার আগে।

প্রথমে তিনি ছিলেন রামমোহনের সহযোগী, পরে তাঁর [illegible] হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর দেশ, তাঁর ধর্ম, তাঁর ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। [illegible] তার [illegible] ছিলো। আবার তিনি ছিলেন সমাজ [illegible] [illegible] [illegible] বাকি। [illegible] সমাজের বিধিনিষেধ [illegible] [illegible] করতো এবং [illegible], রক্ষণশীল, রাধাকান্ত দেব সেখানে [illegible] বাঙালির সংস্কৃতিকে আঘাত না করে বুঝতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু এবং রাধাকান্তদেব তাতে খুশি হতেন। [illegible]। রামমোহন সেখানে বাঙালির সংস্কারে আঘাত করতেন সমর্থন করতেন। [illegible] এবং তিনি রামমোহনের সংস্কারের [illegible] নিজের [illegible] [illegible] করলেন। [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] করলেন। কিন্তু নতুন যুগের [illegible] তিনি ঠেকাতে পারলেন না। [illegible] সংস্কৃতির দিকে সে [illegible]।

তাঁর বিবরণ থেকে 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন— "[illegible] বিদ্যা ও [illegible] লোক সকল এই কলিকাতায় [illegible] আচার-বিচার, রীতি ও [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতা [illegible] [illegible]"। [illegible] ধর্মীয় [illegible] কলকাতার [illegible] সে সময়ের কলকাতার [illegible] ১৮২৬ সালে [illegible] এবং ১৭ সালে [illegible] ১৮৩০ সাথে [illegible] বয়স যে [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] বাঙালির [illegible] বাস্তবিক [illegible] রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা [illegible] বলেছেন।

১.৫ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আমাদের বাংলা দেশ ও সাহিত্য, এর ক্ষেত্রে [illegible] বিশাল অবদান [illegible] রয়েছেন, তাঁর সমাজ সংস্কারের [illegible] [illegible] বাঙালির [illegible] [illegible] বাংলা [illegible]।

[illegible] ১৮২০ [illegible] তাঁর জন্ম। [illegible]

কিভাবে পিতা ঠাকুর দাসের কাঁধে চড়ে ও পায়ে হেঁটে কলকাতায় এসেছিলেন পড়াশুনোর জন্যে, তা এখন সকলেরই জানা। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী বলে মনে হয় তাঁর জীবন কতা। সত্য, নিষ্ঠা, কর্মদ্যোগ, পরিশ্রম, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, সমাজের কাছে দায়বন্ধতা, সব কিছুরই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হলো বিদ্যাসাগরের জীবন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মে সেকালের সংস্কৃত বিদ্যাই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, পেয়েছিলেন দুর্লভ 'বিদ্যাসাগর' উপাধি, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর ছিলো বহুদূরগামী, অত্যন্ত স্বচ্ছ, আধুনিক। তাই, ইংরেজী ভাষা, পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেননি, আবার আমাদের নিরক্ষর সাধারণ বাঙালীর মুখের ভাষা বাংলা, তাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, পাঠ্যপুস্তক লিখতে আরম্ভ করেন, বাংলা গদ্যকে সব ধরণের মনের ভাব প্রকাশের উপযোগী করে গড়ে তোলার দায় গ্রহণ করলেন অনুবাদের মাধ্যমে বা আত্মচরিত লেখার আটপৌরে ভাষা চর্চার দ্বারা।

বিদ্যাসাগর কথা সাহিত্যিক ছিলেন না, মূলত প্রবন্ধিক, অনুবাদক। রামমোহনের মতই তাঁর গদ্য চর্চা প্রগতিবিরোধীদের মত খণ্ডনের জন্যেও গ্রন্থ রচনায়। এমন কতকগুলি সামাজিক কাজ কর্ম শুরু করেছিলেন তিনি যাতে প্রাচীন পন্থীদের সমেগ বিরোধ প্রতিপদে বাঁধতে লাগলো। হিন্দু সমাজে সে সময় অনেকগুলো কুপ্রথা চালু ছিলো। যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ। বয়সের অনেক তফাৎ থাকা সত্ত্বেও কুলীন থাকা বা হওয়ার লোভে শিশু কন্যাকে প্রৌঢ়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার নিয়ম, অনেকগুলো বিয়ে করার প্রথা সমাজকে কুসংস্কারে গিলে খাচ্ছিলো, ছিলো লিখতে পড়তে না জানা, অর্থাৎ অশিক্ষা।

বিদ্যাসাগর গভীর ভাবে এই সব কুস্কারের কুফল অনুভব করে প্রতিকারে উদ্যোগী হলেন নিজের সামান্য সামর্থ নিয়ে, প্রায় নিঃসঙ্গভাবে। আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগর স্রষ্টা ছিলেন না, ছিলেন সংস্কারক। অথচ তাঁরই হাতে বাংলা গদ্য শিল্প সম্মত রূপ নিলো। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন

বাংলা গদ্যের জটিলতা ঘুচাইয়া বাক্যে অনেকখানি ভারসমতা ও ব্যবহার যোগ্যতা দিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) পরিমিতি ও লালিত সঞ্চার করাইয়া বাংলা গদ্যে প্রাণ সঞ্চার করিলেন। বাংলা ভাষার শ্বাসোচ্ছাসতরঙ্গিত স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ অনুধাবন করিয়া বাক্যে শব্দানুবৃত্তির খাঁটি রূপ নির্দেশ করিয়া তিনি বাংলা গদ্যের তাল বাধিয়া দিলেন।

গদ্যে পরিমিতি অর্থাৎ কতোটা বলা প্রয়োজন, কিই বা বাদ দিতে হবে, এই বোধ এবং ভাষার পেলবতা বা লালিত্যই এনে দিলেন না বিদ্যাসাগর, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের গতিকে বাক্যে ব্যবহার করে বেঁধে ছিলেন যতিচিহ্নের দ্বারা। কমা, দাড়ি ইত্যাদি প্রয়োগে বাক্য থামতে ও চলতে শিখলো তখন থেকেই।

'বাসুদেব চরিত' বইটি তাঁর প্রথম রচনা বলে প্রসিদ্ধ। বেতাল পঞ্চবিংশতি তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা, যার প্রকাশকাল ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। বইটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য পুস্তক হিসেবেই হয়েছিলে। হিন্দী বেতালপচিশী থেকে কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে।

১৮৫৪ তে বেরুলো ‘শকুন্তলা’। মহাকবি কালিদাসের সুবিখ্যাত নাটক অভিজ্ঞানম শকুন্তলম গদ্যানুবাদ করলেন বিদ্যাসাগর। এর ভাষা গল্পের মতো সচ্ছন্দ, স্বচ্ছ, নাটকের গল্পটিকে সহজ ভাষায় একটি সৃষ্টি মূলক রচনা করে তুলেছিলেন তিনি।

বেতাল পঞ্চবিংশতি বইটিতেই বিদ্যাসাগর গদ্যে ছেদচিহ্নের সূচিন্তিত প্রয়োগ করেছিলেন। আমাদের কথা বলার ধারাবাহিকতাকে ক্রিয়াপদ ঠিক জায়গায় বসিয়ে শ্বাসফেলার ও শুরুর পর্বগুলোকে ভাগ করে বাক্যকে বেঁধে ফেলা নিয়মের মধ্যে, এই বিজ্ঞান-সিদ্ধ বাক্য গঠন বিদ্যাসাগরের দান, আর তার শুরুই বেতাল পঞ্চবিংশতিতে।

‘অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনা করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি সে ফল কি করিয়াছ। তিনি কহিলেন, ভক্ষণ করিয়াছি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ভূদেব চৌধুরী বলেছেন যে কমা চিহ্নের ব্যবহার, পরের বই ‘শকুন্তলা’য় শুরু করেন তিনি। কিন্তু ‘প্রবেশিয়া’, ‘জিজ্ঞাসিলেম’ এই ক্রিয়াপদের নামধাতু রূপে ব্যবহার তিনি প্রথম করেন, যার মধুসূদনের কাব্যে বেশি ব্যবহার দেখা যায় পরবর্তী কালে। বিরতি চিহ্নের ব্যবহার বাংলা ভাষাকে কিভাবে শক্তিদান করেছিলো এতোবছর পরে আমাদের পক্ষে তা বুঝ ওঠা কঠিন। ডঃ ভূদেব চৌধুরী চমৎকার মূল্যায়ণ করেছেন ঃ ‘সে যুগে বাক্য ছিল অপূর্ণ গঠিত, তার অন্বয় ছিল সাধারণ পাঠক মাত্রের অজঅত, সে যুগে বিদ্যঅসাগরের পক্ষে একাধারে ভাষা, ভাষার সঠিক এবং অর্থবোধ্বা শ্রেয়তাকে এক সঙ্গে গড়ে তুলতে হয়েছে।’’

১৮৬০-এ লিখলেন সীতার বনবাস’। এটিও মৌলিক, রচনা নয়, কিন্তু মৌলিক বই বড়ার আনন্দ পাওয়া যায় বইটি পড়লে। কবি ভবভূতির উত্তররাম রচিত’ এবং বাল্মীকির রামায়ণের সংমিশ্রণ।

মহাকবি শেকস্পীয়রের ‘কমেডি অফ্ এররস’ অবলম্বনে ১৮৬৯-প্রকাশিত হলো ভ্রান্তিবিলাস। বিদ্যাসাগরের প্রবণতাই ছিলো ‘মূল কাহিনী’ অবলম্বনে নতুন একটি সৃষ্টি। ফলত, ভ্রান্তিবিলাস-এর পাত্রপাত্রীর নামধাম বদলে দিয়ে করেছেন ভারতীয় নামকরণ। তাই, স্বাদ এসেছে ভারতীয়তার।

এছাড়া পাঠ্য বই অনুবাদ করেছিলেন বাংলায়, যা সেকালের বাঙালীর জন্যে ছিলো অত্যন্ত জরুরী কারণ ইংরেজী ভাষা সকলের বোধগম্য ছিলো না। মার্শম্যানে হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল’ বইটির কিছু অধ্যায় নিয়ে লিখেছিলেন ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’, চেম্বাসের বায়োগ্রাফিক ও রুডি মাট্স অব নলেজ্ অবলম্বনে লিখলেন জীবন চরিত (১৮৪৯) এবং বোধোদয়’ (১৮৫১), ঈশপের ফেবলক অবলম্বনে লিখলেন কথামালা’ (১৮৫৬)।

কেন এই অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন তিনি, সেদিনই বিদ্যাসাগর তার মুখ থেকে অনেক দূর এগিয়ে থাকা মানুষ ছিলেন। বুঝেছিলেন, বাংলা ভাষা, বিশেষ করে বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধি দিতে হলে অন্য সমৃধ্ব ভাষার উচ্চতর সাহিত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদ দরকার। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে, ইংরেজী সাহিত্য এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে অনুবাদ কর্ম করা দরকার ভেবেছিলেন তিনি।

এর পাশাপাশি সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে মৌলিক প্রবন্ধপুস্তিকা রচনা করেছিলেন তিনি। অর্থাৎ এই মহত্তম পুরুষটির চিন্তা ও কর্ম একই সঙ্গে চলিষ্ণু থেকেছে।

আমাদের দেশে উচ্চবর্ণের মধ্যে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকগুলি বিয়ের রীতি গড়ে উঠেছিলো। কুলীন বা উচ্চবংশের মর্যাদা লাভের জন্যে প্রবীণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে শিশু, কিশোরী, তরুণীর বিয়ে দেবার অদ্ভুত ধর্মীয় প্রথা সকলেই মেনে চলতেন হিন্দু সমাজে। অসম বয়সের বিয়ের কারণে বিধবা অল্পবয়সী বিধবার সংখ্যা পরিমাপ করা সত্যি কঠিন ছিলো। অল্পবয়সী বিধবাদের দুর্দশার সীমা ছিলো না। বিদ্যাসাগরের কোমল মনে এই নারীর বঞ্চিত জীবন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো। তিনি, এর প্রতিবিধানের কথাও ভাবলেন সমানভাবে। নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও যেমন ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, তেমনি হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে কলম ধরেছিলো নারীর অপমান ও দুর্দশা দূর করবার জন্যে। লিখলেন 'বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১, ১৮৭৩)। যুক্তি, তথ্য ও বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি তার প্রতিবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হয়তো, যুক্তি, তথ্য সমাবেশ ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধের সূত্রপাত বাংলা ভাষায় তাঁর এই সব পুস্তিকার হয়েছিলো প্রথম, এবং অবিসংবাদিত।

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ১৮৫৩, বিদ্যাসাগরের আর একটি অনুকরণীয় কাজ, বাংলা ভাষায় প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের তিনিই প্রথম লেখক।

প্রতিভার বহুমুখী দানে বাংলা গদ্য সামালক হলো তার হাতে। তাঁর আত্মজীবনী অসম্পূর্ণ, নাম 'বিদ্যাসাগর চরিত' যেখানে চমৎকার গদ্য তার জন্ম ও শৈশবের গল্প বলেছেন তিনি। হয়তো নিজের কথা বলতে কোথাও কুণ্ঠা ছিলো তাঁর, তাই পূর্ণ বয়সের মানুষটিকে এখানে পাইনা আমরা। প্রভাবতী সম্ভাষণ তাঁর আর একটি চমৎকার গ্রন্থ। ''বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনবছরের শিশু পৌত্রী প্রভাবতীর অকাল মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে স্নেহান্দোলিত বিদ্যঅসাগর চিত্ত প্রভাবতী সম্ভাষণ রচনা করেছে'' ভূদেব চৌধুরী। বইটির বাংলা গদ্য ক্রিয়াপদগুলিকে চলতি গদ্যে বদলে দিলে আজকের রচনা বলে মনে হতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, ভাষার সমৃদ্ধির জন্যে তিনি অনুবাদ করেছেন, বাংলা গদ্যকে দাঁড় করিয়েছেন, শৈশব থেকে যৌবনের শিরদাঁড়ায়, আবার 'আত্মচরিত' এবং 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' এর মতন বই লিখেছেন নিজের স্বাধীন অনুভব ও অভিজ্ঞতাকে রূপ দিকে এখানে বিদ্যাসাগর স্রষ্টার ভূমিকায় আসীন।

অন্যদিকে মাতৃভাষাকে কিভাবে আয়ত্ত করতে হবে, কতো সহজ সরল নিয়মে তাকে বুঝে নিতে হবে, তেমন লেখাও লিখেছেন তিনি। এই ভূমিকাটা বাঙালীর চিরচেনা বিদ্যাসাগরের। গোপাল হালদার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

''স্কুল স্থাপনা থেকে জীবনে প্রয়োজনীয় বিদ্যাকে সকলের পক্ষে সুগম করবার কোনো চেষ্টাই বিদ্যাসাগর বাদ রাখেননি। এ প্রসঙ্গে সেই সত্যও মনে পড়বে। যতই আমরা তাঁর সাহিত্য ও শিক্ষা সাহিত্য রচনা প্রয়াসের দিকে দেখি, ততই অনুভব করতে বাধ্য হই, পাঠ্য পরিকল্পনায় তাঁর বাস্তব বোধ বা কমন সেন্স, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি; অন্য দিকে, পাঠ্যরচনারীতিতে তাঁর নিপুণ কুশলতা, ভাষার সরলতা, সহজশ্রী, এমনকি সচলতা। সাহিত্য বিচারের প্রসঙ্গে না

গিয়ে একবার 'বর্ণপরিচয় থেকে বোধোদয় পর্যন্ত তাঁর পাঠ্য পুস্তক কয়টির দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি কেন তিনি সত্যই শিক্ষার সাহিত্যের প্রধান গুরু। বর্ণ পরিচয়ে' বর্ণজ্ঞান থেকে শিশু বা নিরক্ষরকে পদে পদে তিনি হাত ধরে নিয়ে যান। এভাবে বর্ণ বোধের শব্দমালাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসম্বন্ধ করা বিদ্যাসাগরের কীর্তি— অবশ্য আজ তা বাঙালীর অত্যন্ত সহজ সম্পদ।'' (প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর)।

আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার পথ তিনি নিজের হাতে তৈরী করে দিয়ে গেছেন।

এছাড়া 'অখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৩) যেমন গল্পগ্রন্থ তার, তেমন বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্যে তার আন্দোলনের যারা বিরোধিতা করেছেন, তাদের কুৎসার সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন তিনি 'অতি অল্প হইল', আবার অতি অল্প হইল প্রভৃতি পুস্তিকা ছদ্মনামে রচনা করে।

বিদ্যাসাগরের বিশালতা পরিমাপের ব্যর্থ প্রয়াস না করে, তাঁর দানের অসামান্যতা অনুভব করার চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

১.৬ অক্ষয়কুমার দত্ত

কোনো কোনো লেখক আসেন, যারা তাদের সময় থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকেন, দেখতে পান অনেকটা দূর সময়কে। অক্ষয়কুমার দত্ত হলেন সেই রকম একজন গদ্য লেখক। তিনি উপন্যাস, গল্প লেখেননি, লিখেছেন 'জ্ঞানের সাহিত্য'; আমাদের বাংলা সাহিত্যে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর প্রবন্ধ, লেখা, লিখে মানুষের মনকে যুক্তিশীল, সংস্কার মুক্ত করে তোলার তিনিই প্রথম পথিকৃৎ।

ধর্মনির্ভর কাব্য বা কবিওয়ালাদের স্থূল প্রেম-নিয়ে চাপান উতোরের যুগের অবসান হয়নি তখনো, সমাজ ও অনড় সংস্কারে আবধ্ব রয়েছে; কলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষা কিছু মানুষের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রশ্ন তুলে ধরছে, সৃষ্টি হচ্ছে হিন্দুধর্মের নানা সংস্কারের বিরুধ্বে অসন্তোষ, রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মণধর্ম স্থাপন করে ধর্মীয় সংস্কারে সবে হাত দিয়েছেন; সে অর্থে বাংলার নবজাগরণের সূচনাও হয়নি তখন; এই সময়ে, উনিশ্বশতকের প্রথমার্ধে বাংলায় একই বছরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে দু'জন অসাধারণ মনীষী জন্মগ্রহণ করলেন, এবং তাদের কর্মকাণ্ডের আধুনিকতা আমাদের অনড় অচল জীবনধারার উপর প্রবল ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়লো। সেই দুজন মনীষী হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত।

আজকের এই বিজ্ঞান-নির্ভর সময়ে, ধর্মের বাঁধন যখন শিথিল হয়ে গেছে, যখন পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের পরিচয় ঘটছে, আমরা বিজ্ঞানকে জানছি, ব্যবহার করছি জীবনের প্রয়োজনে, নিত্য নতুন যুক্তির মুখোমুখি হয়ে পুরোনো ধ্যানধারণা বদলে নিচ্ছি, তখন, আমাদের এইসব আদি পুরুষদের মনে পড়বে না অনেকেরই, কারণ অনেকটা সময় আমরা পার হয়ে এসেছি। কিন্তু অক্ষয়কুমারের মহৎ দান সম্পর্কে জানা পিতৃতর্পণের সমান, মনে করা প্রয়োজন।

জীবনটাও তাঁর নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে ছিলো। নবদ্বীপের কাছে 'চুপি' নামক একটি গ্রামে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারের জন্ম। পিতা পিতাম্বর দত্ত কলকাতার খিদিরপুরে চাকরী করতেন। গ্রামের পাঠশালায় সংস্কৃত ও ফার্সির পাঠ নিয়ে তিনি পিতার কাছে কলকাতায় আসেন এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্ত্তি হন। সেখানে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটে অক্ষয়কুমারের। মাত্র তিন বছর স্কুলে পড়লেন তিনি। বাবার মৃত্যু ঘটলো। স্কুলের পড়ার ছেদ পড়লো। কিন্তু তার জ্ঞান পিপাসু মনে জাগলো জ্ঞান তৃষ্ণা, সে তৃষ্ণা জাগিয়েছিলেন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, হার্ডম্যান জেফ্রয়। 'অক্ষ চরিত' বই-এর লেখক নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছিলেন ঃ 'কিছু গ্রীক, লাটিন, হিন্দু ও জার্মান ভাষা অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। .... ইলিয়ড, বর্জিল, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ অঙ্কের গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ও ইংরাজি সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল গ্রন্থ অল্প বা বিনা সাহায্যে অধ্যায়ণ করেন। বিজ্ঞানের প্রতি ইহার স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ছিল।''

[বাংলায় সাহিত্যের ইতিকথা, ২য় খণ্ড, ভূদেব চৌধুরী]

জ্ঞানার্জনের আকাঙ্খা অক্ষয় কুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার উৎস কোথায়, আমরা জেনেনিলাম। জীবন ধারণের জন্যেই অল্প বয়সেই অর্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিলো তাঁর। ভাগ্যক্রমে সুযোগও এসে গিয়েছিলো জ্ঞান সাধনার।

প্রখ্যাত ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সম্বাদ প্রভাকর পত্রিকায় কিছু গদ্য রচনা বের হয়েছিলো অক্ষয়কুমারের। পরিচয় হলো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথ তখন 'তত্ত্ববোধিনী' সভা প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে মূলত অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনা হতো, জ্ঞানের চর্চা হতো। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুারকে তাঁর পাঠশালায় শিক্ষক করে নিলেন। এখানকার উদ্যোগে বেরুলো ভূগোল নামক বইটি। একেবারেই জ্ঞানচর্চার দৃষ্টান্ত। আরো সুযোগ করে দিলেন দেবেন্দ্রনাথ, তিনি বের করলেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে)। আর সম্পাদক নিযুক্ত হলেন অক্ষয়কুমার। আবার সেই পত্রিকার প্রধান লেখকও হলেন তিনি। দশ বছর ধরে প্রচুর শ্রমে ও যত্নে তত্ত্ববোধিনীকে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা এনে দিলেন সম্পাদক ও লেখকরূপে। তখনো বাংলা গদ্য তাঁর সচ্ছন্দ চলার চেহারা অর্জন করেনি; আবার জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার তো কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিলো না; তাই অক্ষয়কুমারের বাংলা গদ্য ছিলো অনেক সময় কঠিন, আড়ষ্ট। দেবেন্দ্রনাথ এবং বিদ্যাসাগর সেই গদ্য সংশোধন করে দিয়েছেন প্রথম প্রথম। দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ অমন রচনার শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।' পত্রিকা সম্পাদনা করতে এসে হৈ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিলো তাঁর। এর ফলে তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে ভাববাদী ভাবনার বিরোধ ঘটেছিলো। দেবেন্দ্রনাথ যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ খুঁজছেন মানুষের, অক্ষয় কুমার ঠিক উল্টোপথে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানব প্রকৃতির কি সম্পর্ক, তা খুঁজে ফিরেছেন। এখানেই সেই যুগের পক্ষে এগিয়ে থাকা মানুষ রূপে তার বিশিষ্টতা।

দশবছর তত্ত্ববোধনী সম্পাদনা করেন অক্ষয়কুমার, তার মাথায় যন্ত্রণা জাত অসুখ শুরু হলে বিদ্যাসাগরের নিলেন সম্পাদনার কাজ। কিন্তু ঐ অসুস্থতা নিয়েও তিনি জ্ঞানচর্চার কাজ চালিয়ে গেছেন বিস্ময়কর ভাবে।

তাঁর রচনা

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।' অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রকাশিত বই। নামকরণ দেখেই কি বোঝা যায় না, তিনি গতানুগতিক পথের যাত্রী নন?

দু'খণ্ডের বইটি বেরোয় (১৮৫২, ১৮৫৩)। সম্পূর্ণ নিজের ভাবনা নয় অবশ্য, জর্জ কুম্বের লেখা কমস্টিটির্ডশন অব ম্যান বইটি অবলম্বনে লোপ, তবু অনেক জায়গায় অক্ষয়কুমারের অসাধারণ কাজ **'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'** বইটি। দুভাগে সমাপ্ত বইটি ১৮৭০, ১৮৮৩-তে প্রকাশিত হয়।

তিনি মৌলিক লেখক বা সৃষ্টিমূলক লেখার লেখক ছিলেন না। প্রায় লেখারই পেছনে ইংরেজ লেখকদের অনুপ্রেণণা আদর্শ দেখা যায়। যেমন 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইটি 'উইলসন রচিত' হিন্দুধর্ম সম্প্রদায় বিষয়ক চিত্রবলী নামক বই-এর প্রবন্ধের অনুপ্রেরণায়। এই অনুপ্রেণা দোষের নয়, কারণ বাংলা গদ্য সাহিত্যে রচনার ধারা ও দৃষ্টান্ত এখনো গড়ে ওঠেনি; বাংলায় জ্ঞানচর্চারও নয়; সেই সময় ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান, ইংরেজশাসক গোষ্ঠীর হাত ধরেই এদেশে এসে পড়েছে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় এই অনুসরণ করা যেতেই পারে। দেখতে হবে, লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তা প্রকাশের যোগ্যতা ছিলো কতোখানি। এ দুটোই অক্ষয়কুমারের ছিলো। তাই অনুবাদ নয়, অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি বিষয়কে আলোচনা করেছেন, পরিধি বাড়িয়েছেন। নিজে প্রচুর তথ্য জোগাড় করেছেন, এবং পূর্ববঙ্গীদের তথ্য সংশোধন করেছেন। এই বইগুলোতে তিনি ভাষা বিজ্ঞান আলোচনাও সূত্রপাত করেন এবং ভাষা বিজ্ঞানীরূপে তিনি ভারতেও পথিকৃৎ।

স্কুল কলেজের শিক্ষা তেমন পান নি তিনি, কিন্তু জ্ঞানতৃষা তাকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে ভূগোল, ইতিহাস, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মনস্বীতার সাক্ষর রেখে গেছেন। ঊনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিলো, তার ভিত্তি স্থাপনে অক্ষয়কুমারের অবদনা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তার মধ্যে কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ, জন স্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ, অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষের বেশি পরিমাণে সুখের আদর্শ, স্পেনসারের, সেই সময়ে সব আদর্শই বা দর্শনই সন্নিবিষ্ট হয়েছিলো। তার সঙ্গে বাঙালীর নতুন উদ্ভুত স্বদেশ প্রেম মিশে গিয়েছিলো। অতএব, এই অসাধারণ ব্যক্তিকে জানা আমাদের আত্ম আবিস্কারের পথেই খুলে দিতে পারে।

১.৭ প্রশ্নমালা

উনিশ শতকের প্রথমার্থ

১। বাংলা গদ্যের উদ্ভবযুগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কি ভূমিকা পালন করেছিলো?

২। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিলো? তার প্রধান (কর্ণধার) কে ছিলেন?

৩। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্য চর্চায় প্রধান কয়েকজন লেখকের অবদান পরিচয় দাও।

৪। রাজা রামমোহন রায় গদ্যচর্চায় হাত দিয়েছিলেন কি সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে, না সাহিত্য সৃষ্টি

তাড়নায়, তাঁর বিশেষ বিশেষ রচনার কথা উল্লেখ করে রামমোহনের গদ্যচর্চার ইতিহাস বর্ণনা করো।

৫। "রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলো।" রামমোহন রায়ের গদ্যচর্চার গুরুত্ব বোঝাতে রবীন্দ্রাতের এই মন্তব্য কতটা যথার্ত্য, আলোচনা করো।

৬। বাংলা গদ্যচর্চার প্রথম যুগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তার উল্লেখ করো।

৭। বিদ্যাসগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কেন?

৮। বিদ্যাসাগর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কারের কর্মবহুল সময়ে গদ্যচর্চায় মগ্ন হয়েছিলেন! তাঁর সেই উদ্দেশ্য কতোটা সফল হয়েছিলো?

৯। শুধু অনুবাদ নয়, মৌলিক গ্রন্থ লিখেছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই সব গদ্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করে তাদের পরিচয় দাও।

১০। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের আগে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনায়, যৌক্তিক গদ্য লিখনে অক্ষয়কুমার দত্ত যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা তাঁর কয়েকটি গদ্য রচনা অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও।

১.৮ সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—গোপাল হালদার

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২—ডঃ সুকুমার সেন

৩। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। ভারত কোষ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। Bengali literature in the Nineteenth Century D. Sushil Kumar De.

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ডঃ ভূদেব চৌধুরী।

৮। দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৯। প্রথম বাংলা সাময়িক ও সংবাদপত্র—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।

একক ২ কবিতা

২.১ কবিগান

২.২ পাঁচালি গান

২.৩ টপ্পা গান

২.৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২.৫ প্রশ্নমালা

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ কবিগান

যদি প্রশ্ন করেন, কবিতা এবং গানের ভাষা ও চরিত্র তো আলাদা, কবিতা শব্দের শৃঙ্খলাবন্ধ বিন্যাসে ব্যাঞ্জনা সমৃদ্ধ ছন্দ শাসিত শিল্প; কোনো কোনো কবিতা গান হয়ে উঠতেই পারে, তবে একালের কবিতায় সুরনির্ভর নয়, অর্থাৎ গীত নয়, তার স্বাধীন সত্তা রয়েছে(আবার গান কথা বা শব্দ-আশ্রিত হলেও সুরের প্রাধান্য থাকে তাতে, কথা সেখানে বড়ো নয়। তাহলে কবিগান শব্দ কোন অর্থ বহন করে?

'কবি গান' বিশেষ অর্থেই ব্যবহার হয়েছে, যাঁরা এই কবিগান রচনা করতেন, তাঁদের বলা হতো কবি ওয়ালা। সদ্য ধনসম্পদের মালিক হয়েছেন, এমন বৃটিশ আমলের প্রথম যুগের বাঙালি বাবুদের মনোরঞ্জনের একটা মাধ্যম ছিলো কবিওয়ালাদের গানের আসর। টাকা হয়েছে প্রভুত পরিমানে, উন্নত রুচি গড়ে ওঠেনি, এমন সময় এই কবিগানের বাড়বাড়ন্ত। এ গানের পৃষ্ঠপোষক কারা ছিলেন, শ্রোতাই বা কারা, এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন;

ইংরেজের নূতন সৃষ্টি রাজধানীতে রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত বৃলায়তম ব্যক্তি(এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য-রস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়েক জনের ছিল। তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মপ্রাপ্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ ভূদেব চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের কবিসংগীত সম্বন্ধে ঐ পরিণতির মধ্যেই কবি-সংগীতের আকৃতি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণ হলো।

(১) কবি-সংগীত জন্ম-সূত্রে রাজধানীর সম্পদ—নতুন নগরে সদ্য উদ্ভূত বণিক-ব্যক্তিত্বের আমোদ-উত্তেজনার উপায় হিসেবেই এই কবিতাবলীর উদ্ভব।

(২) প্রাচীন গ্রামীন জীবন-ধারার ঐতিহ্য ও সামগ্রিক মূল্যবোধের প্রভাব এদের মধ্যে তিলমাত্র নেই; ব্যক্তির মূহূর্তের ইচ্চার অনুবর্তী ছিল এই ধরণের সাহিত্য।'

আগেই বলেছি, ইংরেজশাসনে সুরক্ষিত হঠাৎ ধনী হয়ে উঠেছেন, অথচ রুচিগত উৎকর্ষ নেই, এমন হঠাৎ নবাবদের জন্যে একদল কবিওয়ালা বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্যে গান বেঁধেছেন; তাতে উত্তেজনার সৃষ্টি করার ইচ্ছেটাই প্রবল হয়েছে, অর্থাৎ তাৎক্ষণিক আনন্দ চাই, এমন কথা ও গান, যাতে গভীরতা নয়, চটুলতা আর চমক সৃষ্টি, আদিরস-প্রাধান্য থাকা চাই।

গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে এতোকাল সে উচ্চ ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধ সঞ্চিত হয়েছে, এই গানগুলিতে তা হয়েছে বর্জিত। অর্থাৎ বাংলার মূল ঐতিহ্য-বিচ্যুত। যা ঐতিহ্য-বিচ্যুত, তা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে না। তাই আজ আর এই জাতীয় প্রমোদ শিল্প বেঁচে নেই তেমন ভাবে।

এখন প্র(ৃ থাকে, কোন সময়কালে এই কবি-গানের উদ্ভব, বিকাশ ও তিনটি ঘটেছিলো।

বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইটিনথ সেনচুরি গ্রন্থে ডঃ সুশীলকুমার দে এই কবি-সংগীতের সময়কাল নির্দিষ্ট

করে বলেছেন ঃ The Kabi-poetry, Therefore, covers roughly the long stretch of a century from 1760 to 1860, although after 1830 all the greater kabi walas one ny one had passed away and kabi-poetry had rapidly declined in the hands of their less gifted followers.

১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, একশো বছর ধরে কবিসংগীত রাজত্ব করেছে ১৮৩০ এর পর থেকে প্রধান কবি ওয়ালারা পরলোক গমন করেছেন, এবং অল্পক্ষমতাবানদের হাতে পড়ে এই ধারা ক্রমশ অবলুপ্তির পথে চলে যায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে চর্যাপদের কাল থেকে চৈতন্যযুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল ফলে গেছে। আমরা বৈষ্ণব পদাবলী, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কিছু অনুবাদ সাহিত্য, চৈতন্য জীবনী সাহিত্য প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় স্বাদ গ্রহণ করেছি। কিন্তু সপ্তদশ শতক থেকেই এই উন্নত সাহিত্যরচনার ধারা শুকিয়ে যেতে থাকে। আর ঊনবিংশ শতকের প্রথম অর্ধের পর থেকেই বাংলার সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ধারা আবার ক্ষমতাবান লেখকদের হাতে নতুন চেহারা ও চরিত্র নিয়ে সৃষ্টি হতে শুরু করে। এই মধ্যবর্তী সময়কালই কবিসংগীত, পাঁচালি গান, টপপা গানের সমৃদ্ধির যুগ।

কবিওয়ালারা যে কবিগান বাঁধেন, তার বিশেষত্ব হলো দুদলের সামনাসামনি লাড়ই। একদল যে বিষয়ের গান ‘চাপান’ দেবে, অপর দল, পরে পরেই তার উত্তর বা ‘উত্তর’ দেবে। এই চাপান, উত্তরপর্ব নানা বাদ্য যন্ত্র সহযোগে উত্তেজনাকর পরিবেশ তৈরী করতো। দর্শকদের মধ্যে কে হারে, কে জেতে, এ নিয়ে উত্তেজনা আমাদের দিনের ক্রিকেট বা ফুটবল নিয়ে উত্তেজনার মতন উপভোগ করতো। যেহেতু, এই কবিগানের রচয়িতারা সৃষ্টি কর্মের জন্যে যে সমাহিত সাধনার প্রয়োজন তা করার সুযোগ পেতনা, তাই, এদের কথাগুলো মজা সৃষ্টি করতো, গভীরে দাগ রেখে যেতে পারতো না। অবশ্য, এদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক ও শ্রোতা, তাদের সময় ও মন ছিলো না গভীর ভাব ও ভাবনাকে অনুভব করবার মতন।

কবিগানের বিষয় বস্তু ছিলো খুবই সাধারণ স্তরের। মূলত, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রচলিত কাহিনীকে তারা গ্রহণ করতো বিষয়বস্তু রূপে। আমরা যে মন ও মনন সমৃদ্ধ বৈষ্ণব গীতি কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডী দাস, জ্ঞানদাসের, বলরাম দাসের পরে এসেছি, তা কবিতা হিসেবে বিশেষ করে প্রেম কবিতা হিসেবে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবিতার মতন উঁচু মানের। কিন্তু এই হঠাৎ কবির দল, শ্রোতাদের মনের জ্ঞানের জন্যে মূলত আদিরসাত্মক গীত রচনাতেই মগ্ন হয়েছিলেন। হরু ঠাকুরের একটি সখী সংবাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়—

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে
তবে কি হবে স্বজনি।
লম্পট স্বভাব তার জানি।
ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়,
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়
বুঝি কাহারো সহবাসে পোহায় রজনী।

এ হলো মহড়া অংশ। এরপর চিতেন, অন্তরা, চিতেন মহড়া, এরকম বিভাজন করা হয়েছে। সেসব অংশে বিষয় ঐ সাধারণ অআদিরসাত্মক কথা। অনুভব নেই, উপলব্ধি নেই; বলার ভংগী অমার্জিত, ছন্দসিদ্ধিও তেমন

[illegible]

রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাঁথাকেই মূল থিম হিসেবে এরা নিয়েছিলেন। আবার আসরে চমক সৃষ্টির জন্যে পূরাণ মহাকাব্য ইত্যাদি থেকে নানা কাহিনী কবিওয়ালা কি দেবে তা তো জানা থাকতো না। নানা বিষয় নিয়ে প্রস্তুত থাকতো হতো তাঁদের।

গোঁজলা গুঁই প্রাচীন কবিওয়ালা। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রঘুনাথ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, আর তার শিষ্য রাসু এবং নৃসিংহ, দুভাই এবং হরঠাকুর খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন সেকালে। **রাসু-নৃসিংহ** ফরাসী চন্দননগরের কাছাকাছি গ্রামের লোক। সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন, পরে রাঘুনাথের কাছে শিক্ষানবিশী করে এক দল বাঁধনে। এ দুভায়ের পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন ফরাসী চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এদের গানের প্রশংসাও করেছেন।

তবে রঘুনাথের অন্য শিষ্য **রুঠাকুরের** খ্যাতি ছিলো অনেক বেশি। ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে হরুঠাকুরের আসল নাম হরেকৃষ্ম দিঘাড়ি। তার জন্মস্থান কলকাতার সিমলা পল্লীতে, ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, রাা নবকৃষ্ম ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠ পোষক।

হরঠাকুরের গানে ছিলো ধ্বনি ঝংকারের আধিক্য, ছিলো চমক সৃষ্টির ক্ষমতা। এসব ক্ষমতা দিয়ে কবিওয়ালারা আচ্ছন্ন করে, উত্তেজিত করে রাখতেন সেকালের হালকা-শ্রোতাদের মন। আরম্ভ হতো ঠাকুর দেবতার কথা দিয়ে, আর উত্তেজনার পারদ যতো বাড়তে থাককে ততোই শালীনতার সীমা পার হয়ে যেতো, শ্রোতারা তাকে দিতো সাধুবাদ। হরুঠাকুরের কিছু কবি ক্ষমতা ছিলো, কিন্তু রুচি বা ভাবে, দুদিকেই সেই উত্তেজনাকর উপাদান ব্যবহারে তারও বীতরাগ ছিলো না।

আজ বাঁধনে তোার বনমালি।
করিয়ে সখিমণ্ডলী
নাগরালি তোমার যত, কোরব হত,
দিয়ে অঙ্গেতে ধুলি।
গোবরের অবশেষ দিব মস্তকে ঢালি।।

কৃষ্মের মাথায় গোবর ঢেলে দেবার বদ রসিকতা, নিশ্চয়ই সুরুচির পরিচয় দিচ্ছে না।

তাঁর সঙ্গে লড়াই এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন **কৃষ্মচন্দ্র চর্মকার** বা সংক্ষেপে কেষ্টমুচি। পিতাই বৈরাগী সখি সংবাদ ও বিরহের গান লিখে নাম করেছিলেন। তার জন্মস্থান চন্দননগরে, কাল ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

কবি ওয়ালেদের মধ্যে **রামবসু** হলেন শ্রেষ্ঠ। তবে সকলের কাছে নিতে বৈরাগী নামে জনপ্রিয় ছিলেন নিতাই বৈরাগী। আসল নাম নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। তার গানে মাধুর্য ছিলো কিন্তু কাব্যের গঠনে তেমন ক্ষমতা দেখতে পারেননি। গাইতে পারতেন সুন্দর, ভাবকে শব্দে তেমন ভরে রাখতে পারতেন না। তবু জনপ্রিয় ছিলেন সে এই ভালো গাইতে পারার জন্যে। তাঁর একটি গানক্ত

গমন সময়েতে বেঁদে গেল মুরারি।
তাই ভাবি দিবা শর্ব্বরী।।
জনমেরো মত রাধারে কাঁদালে
বুঝি ব্রজে আসিবে না শ্রীহরি।

রামবসু < নিতাই বৈরাগী, হরুঠাকুরের চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো ছিলেন। ১৭৮৬ তে তাঁর জন্ম, হাওড়ার গঙ্গাতীরবতী শালকিয়াতে। গ্রামের পাঠশালায় তার শিক্ষা সুরু, বারো বছর বয়সে জোড়াসাঁকোতে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে আসেন; তিনি সেকালের কবিওয়ালা ভবানী বণিকের দৃষ্টিতে পড়ে যান, ভবানীই তাকে উৎসাহ ও শিক্ষা দিলেন। তিনি স্কুলের বড়া অসমাপ্ত রেখে কবিগানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এবং এই গানই তার জীবিকা হয়ে ওঠে। তিনি গান রচনা করে দিতেন ভবানী, নিলুঠাকুর দাস সিংহকে। কিছু দিনের মধ্যেই নিজেই কবিওয়ালাদের দল গঠন করলেন। তার জনপ্রিয়তার কারণ হয়তো গানের সরলতা ও ভাবের গাঢ়তা। আবার তার গানের ফুটে উঠেছে সমকালের উচ্ছৃংখল যুবকদের প্রতি ঠাট্টায় বিদ্রুপ। তবে সখী সংবাদ জাতীয় গানে তিনি যে শ্রেষ্ঠ, তাতে সন্দেহ নেই—

শর্তে ধারক মান রক্ষে উভয় পক্ষে যেন মান রয়।
করে এ পক্ষে পক্ষাপাত যে পক্ষে থাক রাধানাথ
জানি প্রেমপক্ষে আমার বিপক্ষে নয়

তবে, শব্দ ও ভাবের সামঞ্জস্যে এর চাইতে অন্য একটি গান উৎকৃষ্ট ঃ

সাধ করে করেছিলাম দুর্জয় মান,
শ্যামের তায় হল আপমান
শ্যামলে সাধলেন না ফিরে চাইলেম না
কথা কইলেম না রেখে মান।

মাত্র ৪২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। অল্প দিন জীবিত থাকলেও কবিওয়ালা রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালেও সম্মান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন ঃ যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস বাংলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারত চন্দ্র সেইরূপ কবিওয়ালদিগের কবিতায় রাম দাস।

আগমনী ও বিজয় গানে তিনি রাধাকৃষ্ম প্রেম গাঁথা থেকে সরে এসে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন।

তারা হারা হোয়ে নয়নের তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই উমা কই আমার প্রাণ উমা কই।

১৮৮০র সন থেকে দ্রুত কবিগানের মতন হতে থাকে উপযুক্ত ক্ষমতাবানের অভাবে। অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী, ঠাকুর দাস সিংহ, ভোলা ময়রা, বিদ্যাময়রা ইত্যাদি কবিওয়ালারা আসর জমাতে সচেষ্ট ছিলেন পরবর্তীকালে, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কবি ও লেখকদের আবির্ভাবের ফলে এই 'হঠাৎ কবির দল' হারিয়ে যায়।

২.২ পাঁচালি গান

ডঃ ভূদের চৌধুরী তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা গ্রন্থে বলেছেনঃ ''পাঁচালি, ঢপকীর্তন ও কৃষ্মযাত্রাকেও কবিসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। একই বিশেষ সমাজ পরিবেশো, একই। আসর জমিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, একই রকম অশিক্ষিত পটু কবিদের রচনা,—এই অর্থেই আলোচ্য বিষয়, সমষ্টি, কবিগানের অন্তর্ভুক্ত।''

'শ্রীরামপাঁচালি আমরা মধ্যযুগেই পেয়েছি। পৌরাণিক বিষয় গানের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন গায়ক বা

কথক। কিন্তু সময় বদলের সঙ্গে বা যগপরিবর্তনের ফলে পাঁচালি তার গভীরের আবেদন হারিয়ে এমন চরিত্র বদলেছে, হয়েছে হাল্কা হাস্যরসের আকার। এ কালের পাঁচালিকার এই সময়ের সামাজিক সমস্যাকেই বিষয় রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

পাঁচালিকার হিসেবে দাশারথি রায় সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার কাটোয়ার বাদমুড়ি গ্রামে। ১৮১১ সালে জন্ম, মৃত্যু ১৮৫৭-তে ডঃ ভূদেব চৌধুরীর মতে তাঁর জীবনকাল ১৮০৬-১৮৬৭। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন বলা যায়।

কবিওয়ালাদের উত্তরসাধক রূপে গান বেঁধে দিতে গিয়ে বিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন, ছেড়ে দিলেন কবির দল, গঠন করলেন পাঁচালির দল। উনবিংশ শতকের যেসময়কাল ধরে তিনি জীবিত ছিলেন, সে সময় সমাজবিপ্লবে নগরজীবন টাল-মাটাল হয়ে ওঠে। রামমোহন রায়ের সমাজ ভাবনার যুগ সবে শেষ হয়েছে, বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের যুগের উপযোগী প্রগতি ভাবনাকে তেমন বুঝে উঠতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' নিয়ে তিনি লিখলেন

বিধবা বিবাহ কথা
কলির প্রধান কলিকাতা
        নগরে উঠেছে অতিরব
কাটাকাটি হচ্ছে বান
ক্রমে দেখছি বলবান
        হবার কথা হয়ে উঠিছে সব।

এইখানে বিদ্যাসাগরের নিন্দা না প্রশংসা বলা কঠিন। তাঁর সময়ে সে নতুন চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব হচ্ছে তিনি তাকে বুজে উঠতে পারেন নি, তাঁর ভাবনা এখানে অতীত মুখী। তবে শব্দ ব্যবহারের কলা কৌশল তাঁর জানা ছিলো, তিনি শ্রোতাদের বাকসর্বস্বতা দিয়ে, ধরে রাখতে পারতেন দীর্ঘক্ষণ। দাশরথি রায় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "দশরথি রায়ের কবিত্ব ছিল না এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস-চমথতে দৌরাত্ম্যে তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়েছে, পাঁচালীওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পারেন নাই।"

সর্বশেষে বলা যায়, দাশরথি রায় ও সামান্য পাঁচালিকারগণ মানুষের মনে গভীর ভক্তির ভাব জাগাতে পারেন নি পাঁচালিগানের মধ্যে দিয়ে, বর অগভীর চিন্তা আর হাসিমস্করা তাঁর ও অন্যান্যদের পাঁচালীগানকে সাহিত্যের স্তরে পৌঁছে দিতে পারেনি।

২.৩ টপ্পাগান

লিখিত সাহিত্যে একসময় গানের মাধ্যমে লোকের কাছে পৌঁছোতো, তাতে অবশ্যই থাকতো ধর্মচেতনা বা অনুভূতি যার উদ্দেশ্যে থাকতো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার। উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে এসে কবিতা ও গান আলাদা হতে থাকে; কবিতা আর 'গেয়' নয়, পাঠ্য এবং শ্রাব্য হতে লাগলেন। এর মধ্যে জনমনোরঞ্জনের চাইতে, আসতে শুরু করলো ব্যক্তি হৃদয়ের নানা অনুভবের স্বাধীন প্রকাশের ইচ্ছা। কিন্তু তার আগে, ইংরেজদের আগমনের পরে আমরা যখন ইউরোপীয় ভাবাদর্শের প্রভাবে আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য

পেতে শুরু করলাম, ঠিক তার আগে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের পরবর্তীকাল থেকে মধুসূদন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব কাল পর্যন্ত সময় কিরকম কবিতা রচিত হয়েছে তার নিদর্শন তো কবিওয়ালা থেকে পাঁচালী থেকে সংক্ষেপে আমরা দিয়েছি।

এই মধ্যবর্তীকালে গদ্যভাষার সমৃদ্ধির নানা প্রচেষ্টা চলেছে। ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ এই সময়কালেই কবিগান, টপপা, যাত্রা, পাঁচালী, ঢপ, কীর্তন, বাউল ইত্যাদি বাংলার আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন ডঃ সুশীল কুমার দে লিখেছে ঃ There is, no doubt, a sprinking of narrative and descriptive verse of the more serious type, but barring this, every poet was a natural vocalist and never there was a time when little songs were more abandant.

এই natural vocalist রাই টপ্পা গানের স্রষ্টা। বাংলায় এই টপ্পা প্রচলন করেন রামনিধিগুপ্ত সংক্ষেপে নিধুবাবু।

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গানের উৎপত্তির ইতিহাস সুন্দরভাবে বলেছেন ঃ

'এই যুগে নাগরিক কলকাতার নানা অঞ্চলে মার্গসঙ্গীতের (অর্থাৎ ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে) অনুশীলন হত, বৈঠক-বসত। অনেকে বহু যত্ন করে উত্তর ভারতীয় ওস্তাদি গান শিখতেন, কেউ বা কলাবত (কালোয়াতী) রাগ-রাগিনীতে গাওয়া হিন্দী গান ভেঙে বাংলা গান তৈরি করে গাইতেন। এরই নাম বৈঠকী সঙ্গীত বা আখড়াই গান। বৈঠক বা আখড়া অর্থাৎ কারও বৈঠকখানায় বা আটচালায় আখড়া এই ধরনের গানের কেন্দ্র ছিল।

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু বৈঠকী গানের একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন। বাংলার বাইরে (ছাপরা) কর্মব্যপদেশে বাস করে তিনি সেখান থেকে হিন্দী টপ্পা গান শিখে আসেন।"

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার ভাবে বাংলা টপ্পা গানের আমদানী কিভাবে হয়েছে, তা বর্ণনা করেছেন। টপ্পা শব্দের অর্থ হলো, হালকা চালের ওস্তাদী গান। তিনি বলেন, বাংলায় নিধুবাবুই তার প্রবর্তক। পরে শ্রীধর কথক, কালী মির্জা, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি টপ্পা গান লিখেছিলেন। টপ্পার চরিত্র কি, সে সম্বন্ধে ডঃ সুশীলকুমার দে ঃ Tappa, however, is a technical term which denotes, like dhrupad, kheyal, a specific mode of style of musical composition, lighter, briefer, yet more variegated.

একটা বিশেষ ধরণের গান হালকা চালের, সংক্ষিপ্ত আকারের গান। ধ্রুপদ বা খেয়াল থেকে এর আকার ছোট হয়, অস্থায়ী যার অন্তরায় সীমিত, জীবন্ত গান।

বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ লিরিকের উদ্ভব মধুসূদন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তীর হাতে। তবে ধর্ম-বিবিক্ত প্রণয়-নীতির পূর্বাভাস পাই এই টপ্পাগানের মধ্যে। আবার ভক্তিমূলক টপ্পাও গাওয়া হতো। টপ্পায় ব্যবহার করা হতো নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র; ফলত হয়ে উঠতো খুব উপভোগ্য। আজও তার কদর সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি।

রামনিধি গুপ্ত ঃ 'টপ্পা'র কথা উঠলেই রমনিধি গুপ্ত, সংক্ষেপে নিধুবাবুর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কেননা, নিধুবাবুই বাংলায় এ গান আনেন, বাঁধেন এবং তাঁর বাঁধনের দ্বারাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'প্রভাকর'-এর পাতায় নিধুবাবুর জীবনী প্রকাশ করেন। ১৭৪১

খ্রীস্টাব্দে ত্রিবেনীর চাঁপতা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন নিধুবাবু। তখনো বর্গীদের হাঙ্গামা চলছে। কলকাতায় পৈতৃক বাসস্থান তাঁদের। সংস্কৃত, ফরাসী এবং সামান্য ইংরেজীতে শিক্ষা লাভ করে তিনি বিহারের ছাপরায় কালেকটরিতে চাকুরী নিয়ে যান। এখানেই জনৈক মুসলমান ওস্তাদের কাছে হিন্দুস্থানী রাগসংগীত কিছুটা আয়ত্ত করেন, পরে নিজেই ঐ আদর্শে বাঙলা ভাষায় গান লিখতে শুরু করেন। বিবাহিত জীবনে একের পর এক পত্নী বিয়োগ ঘটে। পুত্র ও স্ত্রীর মৃত্যু তাঁকে শোকাকুল করে তোলে, তিনি শোকগ্রস্থ মনে গান রচনা করেন।

মূলত প্রণয়-মূলক বিষয় ছিলো তাঁর গানে। প্রকাশের যোগ্য রোমান্টিক ভাষাও ছিলো নিধুবাবুর আয়ত্তে।

নয়নে নয়নে রাখি অনিমিখ হয় আঁখি
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুখী
কি জানি অন্তর হও তাই ভয় দেখি

সাধিলে করিব মান কত মনে করে
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি।

অনেকটাই বিহারীলালের আত্মমগ্ন গানের লিরিকের সমগোত্রীয় মনে হয় না কি?

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণ দরশনে।।
কিবা দিন বিভাবরী পাসরিতে নাহি পারি
আঁখি অনিমিখ পথ হেরিতে হেরিতে।

নিধুবাবুর টপ্পা'র ভাষা রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতার ভাষার সমগোত্রীয়। সাহিত্য হিসেবেও কিছু মূল্য আছে এই গানগুলির।

তাঁর গানের জমজমাট আসর বসতো শোভাবাজারের এক আটচালায়। তাঁর টপ্পা শুনতে সেকালের জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ হতো। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের জনপ্রিয়তা, সম্মান এসেছিলো প্রভূত তিনি ৯৭ বছরে দেহত্যাগ করেন (১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে) তার জীবিত কালেই 'গীতরত্নগ্রন্থ' গীত সংকলন প্রকাশিত হয়।

শ্রীধর কথক ঃ নিধুবাবুর পরেই টপ্পা লেখক রূপে যার নাম করা যায় তিনি শ্রীধর কথক। তিনিও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে এ টুকু জানা গিয়েছে, তিনি হুগলীর অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়ায় সম্ভবত ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে শ্রীধর কবিগান, পাঁচালি সঙ্গে ডুবে থাকলেও পরে টপ্পা রচনায় মনোনিবেশ করেন। অবশ্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রামনিধির নামে শ্রীধরের গান চলে আসছে তাঁর একটি বিখ্যাত গান।

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিলে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।।
বিধমুখে মধুর হাসি দেখতে বড় ভালোবাসি
তাই শুধু দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিলে।।

২.৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে গদ্য চর্চার যে উন্নতি ঘটেছিল, কবিতায় তা হয়নি। কবি সংগীত, টপ্পা পাঁচালীতেই সে সময়ের বাঙালী কবিতার স্বাদ নিয়েছে। ইংরেজী শাসন ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতার হাত ধরে সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আগমন, তার প্রভাবে বাঙালীর মন ও মনন ক্রমশ বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত হচ্ছিলো। এই মনন চর্চার দিকটা গদ্য চর্চায় প্রকাশ পাচ্ছিলো নানাভাবে। আমাদের এতোকালের অনড় জীবনযাত্রা ও ধর্ম নির্ভর জড়তাগ্রস্থ জীবন নড়ে উঠলো, হাসতে লাগলো নতুন ভাবনা, নতুন কাজের উদ্যম, তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে রামমোহন, বিদ্যাসাগরর অসাধারণ সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বাংলা গদ্যে। যদিও স্বজন মূলক গদ্য সাহিত্য, উপন্যাস বা ছোটোগল্প সৃষ্টির প্রয়াস থাকলেও সার্থকতা ছিলো না। বঙ্কিমচন্দ্র এলেন ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টির সম্ভার নিয়ে।

এরই মধ্যে এলেন ঈশ্চরচন্দ্র গুপ্ত, সংক্ষেপে গুপ্ত কবি; প্রথমার্ধের প্রধান সৃষ্টিশীল কবি বলা যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন “No renowned Poet appeared in Bengal in the first half of the present Century and Iswar Chandra (Gupta) was the reigning king of the literary world in his day.

প্রথাগত শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাননি ঈশ্বর গুপ্ত। দরিদ্র বৈদ্য পরিবারে তাঁর জন্ম, ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে কাঁচরাপাড়ায়। তবে ছেলে বেলাতেই তিনি তার স্মৃতিশক্তি ও মেধার পরিচয় দিয়েছেন মুখে মুখে ছড়া বানিয়ে। তাঁর মা অকালে প্রয়াত হলে পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত আবার বিয়ে করেন। বালক ঈশ্বরগুপ্ত বিমাতাকে মেনে নিতে পারেন নি; সংসারের মেকি অবস্থাটা অনুভব করে, চলে এলেন কলকাতার মামার বাড়িতে। মামার বাড়িতে দারিদ্র ছিলো আরো বেশি, তিনি দারিদ্র সহ্য করেছেন অনেক। তবে বিবাহিত জীবনে তিনি অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। এইসব ব্যক্তিগত জীবনযন্ত্রণা তাকে ক্রুধ, ব্যঙ্গ প্রবণ করে তুলেছিলো, যা তাঁর কবিতায় বারবার নানা চেহারায় ধরা পড়েছে।

কবি ঈশ্বরগুপ্ত’র আর এক বড়ো পরিচয়, ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। তিনি পত্রিকা সম্পাদক রূপে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিলেন। পাথুরেঘাটা যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সাহায্যে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদনায় বেরুলো সংবাদ প্রভাকর। এই পত্রিকাটি বাঙালির জীবনে প্রভূত প্রভাব ফেলেছিলো। পরে দৈনিক পত্রিকা রূপে বেরুতে থাকে। বাংলার প্রথম দৈনিক সংবাদ প্রভাকর।

সংবাদ প্রভাকরেই তিনি বাংলার প্রাচীন কবিদের জীবনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে থাকেন। তা ছাড়া নতুন কবিদের জন্য স্থান করে দিলেন তিনি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ প্রধান কবি ও লেখকদের উৎসাহিত করেছেন প্রভাকরে। এই ক্ষমতাবান লেখকদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দানের জন্য বাংলা শক্তি ও বাঙালি জাতি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

তিনি যে যুগে এসেছিলেন, সেই যুগ ভাঙনের যুগ, আবার নতুন স্বপ্নে উদীপ্ত হবার যুগও বটে। সামাজিক জীবনে যে সব নিষ্ঠুর নিয়ম ধর্মের নামে এতোকাল চলে আসছিলো, তার বিরুধে বিদ্রোহ ঘোষিত হলো, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ইয়ংবেঙ্গলের দ্বারা মূলত স্ত্রী শিক্ষা বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ এদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিলো সে যুগে। শেখর গুপ্ত সেই প্রগতিবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি সব সময়। তাঁর মধ্যে দ্বিধা কাজ করেছে। একদিকে প্রাচীন সংস্কার, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদির প্রতি টান, অন্যদিকে নতুন যুগের নানা ভাবনা চিন্তাকে

প্রত্যক্ষ করা, এই দুয়ের টানা পোড়েন চলেছে তার মধ্যে। নতুনকে আক্রমণ করেছেন তিনি সংস্কার বশত মনে হয়।

যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ. বি," শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।
ও ভাই! আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবে দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।.....
ঘোর পাপে ভরা হোলো ধরা
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।

একসময়ে অত্যন্ত প্রচার লাভ করেছিলো, এমন একটি তার পদ্য, তিনি যেখানে নারী শিক্ষায়, নারী স্বাধীনতাকে তীব্র শ্লেষে বিঁধেছেন। আগে মেয়েরা ভালো ছিলো, 'স্কুল কলেজে যাচ্ছে এখন, বই পড়ছে, এ.বি. শিখে বিবি হয়ে যাবে। বিলাতী কথা বা ইংরেজী বলতে শুরু করবে, এটা গুপ্ত কবি মেনে নিতে পারেন না। আর সরকারি বিধবা বিবাহকে পাপ বলে অভিহিত করেছেন।

একথা সত্যি, লেখাপড়া অর্থাভাবে করতে পারেননি তিনি, ছিলেন স্বশিক্ষিত মানুষ। প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিলো, ছিলো সংগঠন ক্ষমতা, স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তিও ছিলো যথেষ্ট। সব রকম মিথ্যার বিরুধ্বে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখকর অভিজ্ঞতা তাকে করে তুলেছিলো নেতিবাদী। সব কিছুতেই পাঁক দেখেছেন, তার ফলে ইতিবাচক জীবন ভাবনা তার আসেনি। ফলত তিনি ঝুঁকেছেন ব্যঙ্গ বিদ্রুপের দিকে; জীবন মন্থন করে অমৃত তুলে আনতে পারেননি, বলিষ্ঠ কোনো জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারেননি বলে তাঁর কবিতা প্রকৃত কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। মোটা দাগের পদ্য লিখে গেছেন নানা বিষয় নিয়ে। এমন অনেকে বিষয় নিয়ে পদ্য লিখেছেন যা আগে লেখা হয়নি।

লিখেছেন নৈতিক পারমার্থিক পদ্য

লিখিছেন সামাজিক ও ব্যঞ্জনাত্মক, ঋতুবর্ণন বিষয়ক, যুদ্ধ বিষয়ক ও আরো, বিবিধ বিষয়ক নানা কবিতাবলীর সম্ভার।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহে এই বিষয় বিভাজন দেখানো হয়েছে।

পৌষপার্বন নিয়ে তার পদ্যক্ত
সুখের শিশিরকাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ, তবু রঙ্গ ভরা।।
ধনুর তনুর শেষে, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহাসুখ ভোগ।

কবিতায় নিবিড় অনুভব থাকে, থাকে তার সার্থকতম ইংগিতময় প্রকাশ। কবিওয়ালাদের উত্তরসূরি ঈশ্বরগুপ্তের

সেই কবিচরিত্র ছিলো না। তবে বিষয় ভিত্তিক খণ্ড কবতা লিখতে তিনি শুরু করে আধুনিক মনের পরিচয় রেখেছেন।

এবার বঝরকার দিন; কপালে ভাই
জুটলো নাকো, পুলি পিঠে।
যে মাগ্‌গির বাজার, হাজার হাজার
মেতেছে লোক, কপাল পিটে।

পৌষপার্বণ-এর ছবি, মজা আছে, আছে পুঙ্খনাপুঙ্খ বর্ণনা, কিন্তু অনুভূতি গাঢ় কবিতা নেই এখনো। তার জন্যে আমাদের অক্ষেক্ষা করতে হয়েছে মধুসূদনের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত।

তাঁর দেশপ্রেম ছিলো আন্তরিক, তার সুন্দ্র প্রকাশ

জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি
যে তোমায় আদরে রেখেছে......

আবার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে এভাবে—

বৃদ্ধি কর মাতৃভাষাপুরাও তাহার আশা
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ।

নানা জাতের কবিতা লিখেছেন ঈশ্বর গুপ্ত, তার সংখ্যা নেহাত কম নয়। শকুন্তলার কাহিনী নিয়ে, সারদা মঙ্গল বা উমা মেনকার বিষয় নিয়েও কবিতা লিখেছেন।

সর্বত্রই স্বভাবকবিত্ব, উপরিতলের ভাব; আদর্শ ও ভাবনা। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কবিতাতেও সূক্ষভাব ফোটেনি, কিছু প্রশ্ন জেগেছে মাত্র, কখনো আবার ধর্মীদের প্রতি নিন্দাও ব্যক্ত হযেছে।

আদর্শহীন মানুষের আচরণ দেখে তিনি নীতিবাদী কবিতা লিখেছেন—

সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কিন্তু একি বিপরীতে
ভিতরেতে অভিমান ভরা।
বিদ্যার যে সারমর্ম নাহি দেখি তার কর্ম
কর্ম্মে নাই ধর্মের সঞ্চার।

উপদেশাত্মক কবিতা, নীতিকবিতা এইসব; সাময়িক প্রতিক্রিয়ার ভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। বিষয়ের গভীরে যাবার মন তাঁর ছিলো না। প্রাচীনের প্রতি সংসারের টানে পেছনে ফিরেছেন। প্রাচীন ভাবাদর্শকে নূতন ভাবালোকে পরিবর্তিত বা শোধিত করিয়া লইবার উদারতা ঈশ্বরচন্দ্রের ছিলনা।''

তবে অদ্ভুত দ্বন্দ্বও ছিলো তাঁর মনে। বিধবা বিবাহের বিরোধিতা যিনি করেছেন তিনিই আবার কৌলীন্য প্রথার বিরুধে মত ব্যক্ত করেছেন। এইসব কারণে তাঁর কবি সত্তাকে দ্বিমুখী বলা হয়ে থাকে। একটি মুখ পেছনের দিকে সামনের দিকে আর একটি মুখ তাঁর। তবু উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের বিশিষ্ঠ প্রধান কবি।

২.৫ প্রশ্নমালা

১। 'হঠাৎ কবির দল' বলতে কাদের বলা হয়েছে? তারা বাংলার কোন যুগে কেন আবির্ভূত হয়েছিলেন? তাদের কবিগানে সমসময় কি প্রভাব ফেলেছিলো?

২। কবিওয়ালাদের আবির্ভাব বাংলায় কোন সময়ে হয়েছিলো। প্রধান প্রধান কবিলয়ালাদের পরিচয় দাও। পাঁচালি ও টপপা গানের প্রতিনিধি স্থানীয় রচনাকারের নাম বলো। সে দিন পাঁচলি ও টপপাগান কোন প্রয়োজন সাধন করেছে?

৩। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত কোন সময়ের কবি? তাকে প্রাচীনযুগের শেষ কবি ও আধুনিকযুগের প্রথম কবি বলা হয়েছে কেন? তার বিচিত্র কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—গোপাল হালদার

২। আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার

৩। অক্ষয়কুমার বড়াল ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ মানস মজুমদার

৪। আধুনিক কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়

৫। মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত—জীবেন্দ্র সিংহ রায়

৬। মধুসূদন—সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

৭। মদুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প—ক্ষেত্র গুপ্ত

৮। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। বাংলা সাহিত্যের ইতি কথা—ডঃ ভূদেব চৌধুরী

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন

১১। বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১২। ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

একক ৩ সাময়িক পত্র

গঠন

৩.০ প্রস্তাবনা

৩.১ দিগ্‌দর্শন

৩.২ সমাচার দর্পণ

৩.৩ বাঙ্গাল গেজেটি

৩.৪ সম্বাদ কৌমুদী

৩.৫ সমাচার চন্দ্রিকা

৩.৬ সংবাদ প্রভাকর

৩.৭ জ্ঞানান্বেষণ

৩.৮ তত্ত্ববোধিনী

৩.৯ প্রশ্নমালা

৩.১০ সহায়ক গ্রন্থ

৩.০ প্রস্তাবনা

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিক্ষায়তনের বাইরে সাহিত্যচর্চায় একটি নতুন ধারার সূচনা হলো সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে। দেশের সাধারণ শিক্ষিত মানুষজন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা আশ্রয়ে যেমন অধিকতর শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেল, তেমনি সাহিত্য রস আস্বাদনেরও সুযোগ পেল। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাহেতু বাংলা গদ্য দ্রুত পরিণত ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠলো। হয়ে উঠলো বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিচিত্র জগতের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটায় মানসিক উফকর্ষ সাধিত হলো। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলির অবদান তাই অকিঞ্চিৎকর নয়।

৩.১ দিগ্‌দর্শন

কত্রিকাটি মাসিক। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। স্কুল-পাঠ বিষয়ের প্রতিই পত্রিকাটির অধিক আকর্ষণ ছিল। স্কুল বুক সোসাইটি তাই এ পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বহুল পরিমাণে কিনে নিতো। সেগুলি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। উদ্দেশ্য, ছাত্রদের জ্ঞানবৃধি। স্কুল বুক সোসাইটির অনুরোধেই পত্রিকাটির ইংরেজি ও ইংরেজি-বাংলা সংস্করণ পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১ থেকে ২৬ সংখ্যা। ইংরেজি-বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১ থেকে ১৬ সংখ্যা। ইংরেজি সংস্করণও প্রথম ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' এ পত্রিকাকে সমৃধ করেছিল। পত্রিকার বিষয়সূচি থেকে তা স্পষ্ট হবে। যেমন ঃ হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ, হিন্দুস্থানের বাণিজ্য, ইংলণ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু বিবরণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের কথা, ইত্যাদি।

এ পত্রিকার বিষয়-নির্বাচন এবং গদ্যরীতির নিদর্শন; 'পৃথিবী চারিভাবে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিনভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে যে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিনশত ছাব্বিশ বংসর হইল আটশত আটানব্বই সালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্বে আমেরিকা কোন লোক কর্তৃক জানা ছিল না সেই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি!

এ বাংলা গদ্য যে খুব স্বচ্ছন্দ তা নয়, অবশ্য বক্তব্য বোঝা যায়।

মার্শম্যান এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, অনুমান, তিনি দেশীয় কোনও কোনও পণ্ডিতের সহায়তায় পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন।

পত্রিকাটি সম্পর্কে সমকালীন "Friend of India" পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ (The Dig-durshuna, It has been suggested that certain articles in the Monthly Dig-Durshuna, might not be wholly uninteresting to our youth in general.

৩.২ সমাচার-দর্পণ

ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন ঃ ''অনুবাদ-অনুসরণের বাহিরে স্বাধীন বাঙ্গালা রচনার পথ খুলিয়া দিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮১৮ অব্দের মে মাস হইতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচার-দর্পণ প্রকাশ করিয়া। সমাচার-দর্পণ পরিচালনায় মার্শম্যানের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন পণ্ডিত জয় গোপাল তর্কালঙ্কার। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক (তখন সংখ্যায় যৎসামান্য) খবরের কাগজের রস এই প্রথম আস্বাদন করিল এবং তাহাতে বাঙ্গালা গদ্যের ঘরোয়া পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিল।

সমাচার দর্পণের সাফল্য বিবিধ বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রকাশ ত্বরান্বিত করিয়াছিল। এই সাময়িকপত্রের মধ্যে অনুশীলিত হইয়াই বাঙ্গালা গদ্যের জড়তা মুক্তি ঘটিয়াছিল।'' (আনন্দ সংস্করণ, ১৪০১) পৃ. ২৫)

পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে শনিবার। তারপর প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্ররূপে পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসিকদের কাছে বিশেষ মান্যতা পেয়েছে। সমসাময়িক বাংলার ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের পরিচয় পত্রিকাটিতে পাওয়া যায়। সেকালের সমাজচিত্রের বহু উপাদানএটিতে লভ্য। 'সমাচার-দর্পণ'-এ রয়েছ সেকালের স্ত্রীশিক্ষা ও সতীদাহ রোধ প্রয়াস সম্পর্কিত নানা তথ্য, বহুবিধ সামাজিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংবাদ, নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশের বিবরণ আর আছে বেশ কিছু রস-রচনার নিদর্শন। ড. ভূদেব চৌধুরী তাই মন্তব্য করেছেন ''জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে বাংলা সাহিত্যের অনাগত কালের নানা সার্থক রচনার অঙ্কুর-সঙ্কেত এই সমাচার দর্পণের' পৃষ্ঠাতেই লক্ষ্য করে থাকি।'' বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০, পৃ. ১০০)

১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে থেকে 'সমাচার দর্পণ' হয় দ্বিভাষিক, বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হতে থাকে। ইংরেজি ভাষার প্রতি যুবসমাজের আগ্রহের বৃদ্ধিই এর হেতু।

পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৪১-এ।

'এদদ্দেশীয় লোকেদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয়' এই উদ্দেশেই পত্রিকাটির প্রকাশ। পত্রিকাটি যেহেতু খ্রিষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়, সেহেতু এতে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের নিন্দা প্রচারের চেষ্টা দেখা যায়। অন্যদিকে খ্রিষ্টানধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়। রামমোহনের সঙ্গে তাই 'সমাচার দর্পণ'-এর বিরোধ বাধে।

'সমাচার দর্পণ' প্রথম সেই সংবাদপত্র যাতে কবিতা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য সংবাদপত্রেও এই ধারাটি অব্যাহত থাকে। বাংলা সাহিত্যে নক্সা জাতীয় রচনার সূত্রপাত হয় এই পত্রিকাতেই। ভবানীচরণের 'লববাবু-বিলাস'', ''নববিবিবিলাস'' কিংবা প্যারীচাঁদ কালীপ্রসন্নের বাবু-বৃত্তান্তের সূচনা ঘটে এই পত্রিকাতেই। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ২জুন 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হয় বাবুর উপাখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধার করা হলো।

'বাবু আপনি চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন ভোরের পূর্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ার সওয়ার

হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারিদণ্ড রাতি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেন সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এইক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সেপথে গেলে লজ্জা পাইব।'

সন্দেহ নেই, বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'সমাচার দর্পণ'-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৩ বাঙ্গাল গেজেটি

১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা ভাষার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮১৮-তে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার-দর্পণ'-এর প্রকাশ কাল নিয়ে কোনও সংশয় নেই, কিন্তু 'বাঙ্গাল গেজেটি কোন মাসের কোন্ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয় তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার-দর্পণ' ছিল মিশনারীদের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত। অন্যদিকে 'বাঙ্গলা গেজেটি বাঙ্গালির সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত। 'বাঙ্গাল গেজেটি যে বাঙ্গালি সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র তাতে সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে এ পত্রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

''সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় আর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর মতে 'সমাচার-দর্পণ-এর স্বল্প পূর্বে 'বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ''সমাচার দর্পণ'' ও বাঙ্গাল গেজেটি মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। এবং 'সমাচার-দর্পণ'ই প্রথম প্রকাশিত হয়।'' (দ্রষ্টব্যঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম পর্ব, ১৯৮৯ খৃ, ৩৬১)। ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায়, 'বাঙ্গলা গেজেটি পত্রিকার ম্যানেজার হরচন্দ্র রায় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪মে 'গবর্ণমেন্ট গেজেটে'-এ যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তাতে জানানো হয় যে 'বাঙ্গালা গেজেটি নামক একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারী ঐ গেজেটে ৯ জুলাই তারিখে হরচন্দ্র রায়ের দেওয়া আর একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশিত হয়েছে! "Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, ontaining the Translation of Civil Appointments and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee Language....... No. publication of this nature having hitherto been before the public, HURROCHUNDRA ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small spare of thin patronage." (অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৬০)

তাহলে দেখা গেল, ১, দিগ্‌দর্শণের প্রকাশ ১৮১৮-র এপ্রিল, সমাচার দর্পণের প্রকাশ ১৮১৮-র ২৩ মে। কিন্তু 'বাঙ্গালা গেজেটি প্রকাশিত হয় ১৮১৮-র জুলাইয়ে ২। পত্রিকার নাম 'বেঙ্গল গেজেট পরবর্তীকালে আলোচকেরা একে 'বঙ্গাল গেজেট বা 'গেজেটি করে তুলেছেন। ৩। এতে থাকতো সরকারী চাকুরি ও নিয়ম বিধির অনুবাদ এবং স্থানীয় প্রসঙ্গ ৪. এসব সহজ বিশুধ্ব বাংলায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হতো।

শেষ দুটি উল্লেখ থেকে বোঝা যায় মিশনারী সম্পাদিত পত্রিকাদুটির সঙ্গে ও পত্রিকাটির চরিত্র-স্বভাবে পার্থক্য ছিল। 'দিগ্‌দর্শন' আর 'সমাচার-দর্পণ'-এ সরকারী চাকুরির বিজ্ঞপ্তির বা নিয়মবিধির অনুবাদ থাকতো না। ভাষাও বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা নয়। তাতে মিশনারী গন্ধ ছিল। এদিক থেকে 'বেঙ্গল গেজেট'-এর (এটিই সঠিক নাম) স্বাতন্ত্র, অনস্বীকার্য।

পত্রিকাটির কোনও কপি যেহেতু পাওয়া যায় নি, সেহেতু পত্রিকাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। অবশ্য শ্রেণীগত বিচারে একে সংবাদপত্রই বলতে হয়।

৩.৪ সম্বাদ কৌমুদী

১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক। প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হতো। মিশনারী সম্প্রদায় পরিচালিত 'সমাচার-দর্পন' পত্রিকায় হিন্দু সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে কটূক্তি বর্ষিত হতে থাকলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে 'সম্বান কৌমুদী-র প্রকাশ। পত্রিকাটির পক্ষে অবশ্য জানানো হয়েছিল 'লোকাহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ। দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে।' তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২১৩ পৃষ্ঠায় রামমোহন রায়কে এ পত্রিকার সম্পাদক বলেছেন। আবার ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'যদিও তারাচাঁদ ও ভবানীচরণ প্রথমে পত্রিকার পরিচালক ছিলেন, কিন্তু রামমোহনই ছিলেন প্রধান পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক'। ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র দ্বিতীয় পর্যায়ে জানিয়েছেন ''রাজা রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদী'-র একজন অতি উৎসাহী পৃষ্ঠ পোষক এবং শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। ....ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।'' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০, পৃ. ১০২)

রামমোহন ও পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সম্বাদ কৌমুদী'তে প্রবন্ধ লিখতে থাকলে রক্ষণশীল ভবানীচরণ এ পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করেন। প্রথম তেরটি সংখ্যা প্রকাশের পর এ ঘটনা ঘটে। ভবানীচরণ রক্ষণশীল মতের পরিপোষক। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করলেন (৫ মার্চ ১৮২২) ''কিন্তু তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্তের নামে পত্রিকা ('কৌমিদী') চলতে লাগল। অবশ্য নামে না হলেও কার্যত রামমোহনই কৌমুদীর সম্পাদনা পরিচালিত করতেন। মাস তিনেক 'কৌমুদী' চালিয়ে এর আর্থিক ঝুঁকির জন্য রামমোহন সম্পাদনা ত্যাগ করেন এবং গোবিন্দচন্দ্র কোঙার এই পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন (১৪ মে, ১৮২২), অবশ্য এর চারমাস পর 'কৌমুদী' বন্ধ হয়ে গেল। এতে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলে রক্ষণশীল সমাজে এর প্রভাব অতি দ্রুত হ্রাস পেতে লাগল। ইতিমধ্যে ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হলে কৌমুদীর রক্ষণশীল স্বভাবের গ্রাহকগণ কৌমুদী ত্যাগ করে 'চন্দ্রিকা'র গ্রাহক হলেন। ফলে 'কৌমুদী' বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু কিছুকাল পরে (এপ্রিল ১৮২৩) আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কৌমুদী' আবার প্রকাশিত হল। এটি ১৮৩১ সন পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। একসময় হলধর বসু নামক এক ব্যক্তি এর সম্পাদক হয়েছিলেন। রামমোহন বিলেত যাত্রার পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদ কিছুদিন 'কৌমুদী' পরিচালনা করেছিলেন। এরপর ১৮৩২ সনের ৫ ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে মনে হচ্ছে,

ক্রমাগত কর্মকর্তা বদলের ফলে 'কৌমুদী'-র রশ্মিচ্ছটা ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল, ১৮৩৩ সালে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। অমিক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ২১৪-২১৫)

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'সম্বাদ কৌমুদীর সম্পাদকের মধ্যে ছিলেন : (১) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৮২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮২২ সালের ২৬ ফ্রেব্রুয়ারী। (২) গোবিন্দ চন্দ্র কোঙার - ১৮২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত। (৩) আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় ১৮২৯ পর্যন্ত। (৪) রাধাপ্রসাদ রায় - ১৮৩২ থেকে।'' (১৯৮৮, পৃ. ৩৬)

'সম্বাদ কোমুদি ছিল প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার বার্তাবহ। নানাবিধ সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ এতে স্থান পেতো। কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষা সমাজ, বিচার-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাস্থ্য, ইংরেজ কর্মচারী, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি অনেক কিছুই ছিল তার বিষয় বস্তু। পত্রিকাটি দরিদ্রদের জন্য সরকারের কাছে স্কুল খোলার যেমন অনুরোধ জানিয়েছিল, তেমনি শিক্ষার প্রথম স্তরে বিদেশী ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষা বাংলার প্রচলনের আবেদন জানিয়েছিল। নিছক কেরানি তৈরির শিক্ষার পরিবর্তে প্রকৃত শিক্ষাদানের প্রসতব জানিয়েছিল। কৌলীন্য প্রথার বিরোধিতা করেছিল। শ্রাদ্ধাদি কার্যে অকারণ অর্থের অপচয়ের নিন্দা করে সে অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। বিচার-ব্যবস্থায় জুরি প্রথা চালুর আবেদন জানিয়েছিল। বাংলার চাল যাতে বিদেশে রপ্তানি না করা হয় সেজন্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। গঙ্গায় মৃতদেহ নিক্ষেপের বিরুধে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিল। কেননা, এতে জল দূষিত হয়। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষজন চিকিৎসার উপযুক্ত সুযোগে বঞ্চিত, এর প্রতিকার চেয়েছিল। উদ্ধত ইংরেজ কর্মচারীদের যথেচ্ছ ঘোড়ার গাড়ি চালানোর নিন্দা করেছিল। বিকৃত রুচির যাত্রাভিনয় যেহেতু যুবসমাজের চরিত্রের ক্ষতি করেছে, সেহেতু এ ধরনের আমোদ প্রমোদ বন্ধের আবেদন জানিয়েছিল। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

সেকালের পক্ষে পত্রিকাটির ভাষা ছিল সহজ সরল সরল ও পরিচ্ছন্ন। সমাজের উন্নতি সাধনই যে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

৩.৫ সমাচার-চন্দ্রিকা

'সংবাদ কৌমুদী' যদি হয় প্রগতিপন্থী, 'সমাচার-চন্দ্রিকা' তবে প্রাচীন পন্থী। পত্রিকাটি প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ মার্চ। ২৬ নং কলুটোলা থেকে চন্দ্রিকা যন্ত্রে ছাপা হতো। পরবর্তীকালে দ্বি-সাপ্তাহিক এবং ১৮২৪ থেকে দৈনিক পরিণত হয়। দৈনিক 'সমাচার-চন্দিকা' প্রকাশিত হতো ৫৩ নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট থেকে।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রের তালিকা থেকে জানা যায়। 'সমাচার-চন্দ্রিকা' সে সময় ছিল অর্ধ সপ্তাহিক।

সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসী ভাষায় দক্ষ। 'সম্পাদ কৌমুদী' কে কেন্দ্র করে রামমোহনের সঙ্গে বিরোধিতার প্রতিক্রিয়াতেই 'সমাচার চন্দ্রিকা'র আবির্ভাব। ভবনীচরণ ছিলেন সতীদাহ প্রথার সমর্থক; স্বভাবতই রামমোহনের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে এবিষয়ে তিনি রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ নিয়েছিলেন। 'সমাচার-চন্দিকা' বেশ জনপ্রিয়তা হয়েছিল। 'সম্বাদ কৌমুদী'-র প্রচার সংখ্যা হ্রাস পায়!

শুধু তাই নয়, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে ভবানীচরণ যে ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই ধর্মসভারই মুখপত্র করে তুলেছিলেন 'সমাচার-চন্দিকা'কে। এ পত্রিকা হয়ে উঠেছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের বাণীবাহক। বলাবাহুল্য, সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের আনুকূল্য ও সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন। একদিকে তিনি যেমন সতীদাহ প্রথা বজায় রাখার পক্ষে প্রবল জনমত তৈরি করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার বিরুধে ছিলেন। নিম্নবর্গের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনেরও বিরোধী ছিলেন তিনি। বেশ বোঝা যায়, নবযুগের বার্তাটি তিনি গ্রহণ করতে পারে নি।

অবশ্য এ পত্রিকার প্রশংসাযোগ্য দিকও রয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় সেই দিকটির উল্লেখ করে লিখেছেন; ''উনিশ শতকের প্রগতিমুখী আন্দোলনের বিরুধে প্রতিক্রিয়ার প্রবল দ্বন্দ্ব হিসাবে চিহ্নিত হলেও চন্দ্রিকার সাংবাদিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সামাজিক আন্দোলনে গোঁড়ামির দিকটি বাদ দিলে পত্রিকার অর্থনৈতিক চিন্তা এবং ক্ষেত্রবিশেষ বিদেশী রাজশক্তির বিরুধ স্বাধিকার চিন্তা এবং দেশীয় শিক্ষা প্রসারে আগ্রহ সৃষ্টি প্রভৃতি অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চন্দ্রিকা নীলকরদের অত্যাচারের বিরুধেও সোচ্চার ছিল।'' বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬-৩৭)

''আর তাছাড়া ভবানীচরণ প্রথম বাঙালী কলামিস্ট। বাংলা সংবাদপত্রের সেই ঊষালগ্নে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সাময়িক রচনার মধ্যেও সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক সরলতা প্রবর্তন করেছিলেন।'' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৩৭)

৩.৬ সংবাদ প্রভাকর

১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ (১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি) সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের আর্থিক সহায়তায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা এসকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হতে পারে, তা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। ১২৪৩ সালের ২৭ শ্রাবণ থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' বারত্রায়িক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয় এবং ১২৪৬ সালের ১ আষাঢ় থেকে দৈনিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতবর্ষে প্রথম দেশীয় দৈনিক সংবাদপত্র হলো 'সংবাদ প্রভাকর'। দৈনিক 'প্রভাকর'-এর পাশাপাশি ১২৬০ সাল থেকে মাসিক 'বাংলা প্রভাকর' ও প্রকাশিত হতে থাকে। 'ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিছেছেন ''এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। ...একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা-কর্তা বিধাতা ছিলেন।'' প্রভাকরে একদিকে যেমন সমসাময়িক বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হতো, অন্যদিকে তেমনি পদ্য সমূহও মুদ্রিত হতো। থাকতো সম্পাদকীয় নিবন্ধ। ১২৬৫ সালের ১২ মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর অনুজের সম্পাদনায় বেশ কিছুকাল পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ভূমিকা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এ পত্রিকা দীর্ঘকাল পাঠকদের নানা ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে এসেছে। সেই সঙ্গে সাহিত্যরস পরিবেশনের দায়িত্বও পালন করেছে। দ্বিতীয়ত, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায় প্রমুখ কবির এবং গোঁজলা গুঁই, লালু-নন্দলাল, রামু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, এ্যান্টনি কবিয়াল, কেষ্টা মুচি প্রমুখ কবিওয়ালার

জীবনী ও রচনা পত্রিকাটিতে প্রথম পত্রিকাটিতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যদি এগুলি সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ না করতেন, তা হলে বহু তথ্যই লুপ্ত হয়ে যেত। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এতে প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে ইতিহাস সচেতন ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন তার প্রমাণ সংগৃহীত এ সমস্ত রচনায় পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, 'সংবাদ প্রভাকর'কে তিনি সাহিত্যিক তৈরির পাঠশালায় পরিণত করেছিলেন। পরবর্তীকালের বহু বিখ্যাত লেখকের সাহিত্য সৃষ্টিতে হাতে-খড়ি হয়েছিল এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহে এঁরা সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্বুধ হন। অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এঁদের শিক্ষানবিশী শুরু হয় 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠাতেই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ের উল্লেখ করে জানিয়েছেনঃ ''আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।'' (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ) চতুর্থত, ১২৫৭ সালের নববর্ষ থেকে প্রতিবছর পয়লা বৈশাখ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার কার্যালয়ে তিনি যে সাহিত্য সভার আয়োজন করতেন তাতে নিজেদের রচনাদি পাঠ করতেন, তেমনি এ পত্রিকার অন্য লেখকরাও তাঁদের লেখা পাঠ করতেন। আধুনিককালে এই প্রথম সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান। এ সভায় 'সংবাদ প্রভাকর'-এর লেখকগোষ্ঠীর অনেকে যেমন উপস্থিত থাকতেন, তেমনি গুনমুগ্ধদেরও দেখা যেত।

প্রভাকরের লেখক তালিকায় নবীন-প্রবীণ অনেকেই ছিলেন। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ প্রমুখ। আধুনিকপন্থীদের মদ্যে নীলরত্ন হালদার, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। বস্তুতপক্ষে, প্রভাকর ছিল এমন একটি পত্রিকা যাতে প্রবীণ ও নবীন উভয় মতাদর্শের সমন্বয় ঘটেছিল। এককথায় প্রভাকর ছিলে যুগের দর্পন সদৃশ।

'সংবাদ প্রভাকর'-এর গদ্য নিদর্শনও বাণিজ্যের নাম লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী এক্ষণে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া তরণী আরোহনে বিদেশ বাসিনী হইতেছেন। এদেশের লোক লক্ষ্মীহারা হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দাসত্বের শরণ লইয়াছে। .... দেশের ধন বিদেশে যাইতেছে, দেশে লোক ফকীর হইতেছে, এই দুর্ভাগ্য সকলে অনুভব করিতেছেন না, অনুভব করে থাকুক, স্বপ্নেও বোধহয় সেটা কেহ চিন্তাও করেন না।... (২৫ নভেম্বর, ১৯৫৯)

৩.৭ জ্ঞানান্বেষণ

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুন শনিবার ইয়ংবেঙ্গলদের মুখপত্র এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি থেকে ইংরেজি ও বাংলা দ্বিভাষিকে রূপান্তরিত হয়। প্রধান উদ্যোক্তা দক্ষিণারঞ্জন (দক্ষিণানন্দন) মুখোপাধ্যায়। পত্রিকা-পরিচালনায় দক্ষিরারঞ্জন (নন্দন) ছাড়াও ছিলেন তারকচন্দ্র বসু, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ। এঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডিরোজিওর শিষ্য এবং মতাদর্শে প্রগতিশীল। এঁদের চিন্তা-ভাবনা-রচনায় তাই সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জ্ঞানান্বেষণ' বহুল প্রচারিত পত্রিকা ছিল না, পাঠক সংখ্যা ছিল সীমিত। 'যদিও এই সাপ্তাহিকে সর্বপ্রথম শুভপ্রদ মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল, ভাবভঙ্গিমা, বক্তব্য ও বিষয় নির্বাচনে তরুণ মনের সজীবতা লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু সময়াভাব ও অর্থাভাবের ফলে প্রায় দশ বৎসর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল, এটি বাঙালির সাংবাদিকতার ইতিহাসের দুর্ঘটনাই বলতে হবে।' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষষ্ঠ

খণ্ডঃ প্রথম পর্ব, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮৫)

'জ্ঞানান্বেষণ' নামকরণেই পত্রিকার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সুতীব্র জ্ঞানস্পৃহার থেকেই এ পত্রিকার জন্ম। ইয়ং বেঙ্গলগোষ্ঠী এ পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্বজ্ঞানের রসদ সরবরাহ করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে, সংকীর্ণতা মুক্ত করতে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বা কলহে তাঁদের রুচি ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ছিলেন তাঁরা। রক্ষণশীলরা তাই এ পত্রিকাকে সুনজরে দেখেন নি।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঃ "বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে জ্ঞানান্বেষণের গুরুত্ব প্রধানতঃ দুটি কারণে। এক, ত্রিশ দশকে ইয়ংবেঙ্গল দলের সমাজচিন্তার প্রতিফলন এই কাগজে পাওয়া যাবে। ত্রিশ দশকের প্রগতিপন্থী জনমত গড়ে তোলার যে চেষ্টা রামমোহন, প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথ প্রমুখেরা করেছিনে, জ্ঞানান্বেষণে এসে তা আর একটি মোড় নেয়। দ্বিতীয়তঃ এই পত্রিকার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর অসাধারণ প্রতিভাশালী সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে।" (বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, ১৯৮৮, পৃ. ৪৬-৪৭)

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা যায় বিভিন্ন সময়ে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, রসিককৃষ্ম মল্লিক, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র ও হরমোহন চট্টোপাধ্যায় এ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন (ন্দন) ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক। পত্রিকাটির আর্থিক দায়-দায়িত্ব তিনিই বহন করতেন। শিক্ষিত হিন্দু ছাত্রদের মদ্যে পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরিত হতো।

যে তরুণ গোষ্ঠী এই পত্রিকা চালাতেন তাঁদের সকলেই একে একে ভালো চাকরি পেয়ে অন্যত্র চলে যান। ফলে ১৮৪০-এ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর ক্যালকাটা কুরিয়র পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য ঃ "(The Gyannaneshun an native Newspaper has we regret to hear, been given up for want of public support. It existed about ten years and was for some time ably conducted by a number of college students. In its palmy days it was a legitimate organ of the educated Hindoos, but since the retirement of Baboo Russicrishna Mullick, and Dackinananden Mookherjee, who orginally established the paper, merely with a view of keeping alive a spirit of liberal enquiry amongst the Hindoos and combating the prejudies of the orthodox party, it exhibited many symptoms of dotage and decay, till in the course of the present week it died a natural death."

"জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকার ভাষা কেমন ছিল, তার উদাহরণ হিসেবে একটি রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে—

'কাজলা পাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথা এখানে কন্যা কিনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষে টের পাইলেন ঘটকেরা প্রতারণাপূর্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছেন। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষে জানিলেন পোদ-জাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে। আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান বাঁড়ুয্যার ঘরে যে তাঁহারাদিগের পুত্র-পৌত্রাদির গৃহিনী সকল আছেন তাহারাদিগের মদ্যে অনেকেই ধোপা, নাপিত, বৈষ্ণব, মালি, কামার, কাপালির কন্যা। কিন্তু সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন। ' এভাষা শাণিত, পরিহাসদীপ্ত। সেকি ব্রাহ্মণত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এ ভাষা যে অব্যর্থ তাতে সন্দেহ নেই।

৩.৮ তত্ত্ববোধিনী

'তত্ত্ববোধিনী' তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। চরিত্রে সংবাদপত্র নয়, সাময়িকপত্র। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল। অর্থাৎ পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল ছিল ৮৯ বছর।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উভয়েই প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর 'আত্মজীবনী'কে লিখেছেন ঃ 'আমি ভাবিতাম তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্ম সমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যেসকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বুদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে (১৮৪৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।'

ধর্মকলহ কিংবা বিরুদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার সে সময় কোনও কোনও পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এসবে রুচি ছিল না। আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা সমন্বিত একটি উন্নত মানের পত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তত্ত্ববোধিনী সে উদ্দেশ্য নিশ্চয় পূরণ করেছিল, কিন্তু তাতেই বদ্ধ থাকে নি। 'অর্থনীতি, গ্রাম্য সমাজের দারিদ্র্য, জমিদারের অত্যাচার, শিল্প-বাণিজ্য, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক উদারনীতি, দেশপ্রেমে দীক্ষা, সাহিত্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল, স্থানীয় গ্রামজনপদের অবস্থা—সমস্ত কিছুই এই পত্রিমায় প্রতিফলিত হয়েছিল।' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষষ্ঠ খণ্ডঃ প্রথম পর্ব, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯২)

'তত্ত্ববোধিনী'র ৮৯ বছরের ইতিহাসে অনেকেই সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। ১৮৭৭ পর্যন্ত পাঁচজন এ দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন ঃ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৪৩-১৮৫৫) নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৮৫৯), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ডিসেম্বর ১৮৫৯-মার্চ ১৮৬২, এপ্রিল ১৯০৯-এপ্রিল ১৯১০, এপ্রিল ১৯১৫—জানুয়ারি ১৯২৩), অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫—এপ্রিল ১৮৬৭, এপ্রিল ১৮৬৯—১৮৭২), হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (এপ্রিল ১৮৬৭ - এপ্রিল ১৮৬৯, এপ্রিল ১৮৭৭ - সেপ্টেম্বর ১৮৭৭)। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর পরিকল্পনা নৈপুণ্যে এবং সম্পাদনার কুশলতায় তত্ত্ববোধিনী উন্নত মানের পত্রিকা হয়ে ওঠে। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে ঃ 'তত্ত্ববোধিনী' বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে, বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের এবস্থা কি ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়া ছিলেন তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।' (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১৯৯-২০০)।

'তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত রচনার গদ্যরীতির নিদর্শন ঃ 'স্বদেশানুরাগ না থাকিলে স্বদেশের হিত সাধন

করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আনন্দের বিষয় এই যে এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। স্বদেশানুরাগ যতই বৃদ্ধি হইবে ততই তাহাদের দ্বারা স্বদেশের উপকার সাধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ভারতের উদ্ধার কেবল এই স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধির প্রতি নির্ভর করিতেছে। এই স্বদেশানুরাগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে যতই ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করা যাসবে ততই ভারতের উন্নতি সাধন হইবে।' (আশ্বিন ১৭৯৮ শকাব্দ)

৩.৯ প্রশ্নমালা

১। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র বাংলাসাহিত্যের উন্নতিসাধনে কী ভূমিকা নিয়েছে আলোচনা করো।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার-দর্পন' পত্রিকার গুরুত্ব নির্দেশ করো।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকার গুরুত্ব নির্ধারন করো।

৪। 'সংবাদ কৌমুদী যদি হয় প্রগতিপন্থী, সমাচার-চন্দ্রিকা তবে প্রাচীন পন্থী।'—মন্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৫। 'একদিন প্রভাকর বাংলা সাহিত্যের হর্তা-কর্তা বিধাতা ছিলেন।'—'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ মন্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৬। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। টীকা লেখো ঃ

বাঙ্গাল গেজেটি, জ্ঞানান্বেষণ।

৩.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয়খণ্ড (আনন্দ সংস্করর), ১৪০১।

২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষষ্ঠখণ্ডঃ প্রথম পর্ব, ১৯৮৯।

৩। ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬০।

৪। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, ১৯৮৮।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১৩৪২।

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (যেমন ঃ ১৩৩৯, ২য় খণ্ড ঃ ১৩৪৯, ৩য় খণ্ড ঃ ১৩৪২)।

৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক সাহিত্য, ১৩৫১। বাংলা সাময়িক পত্র ১৩৪৬।

একক ৪ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

গঠন

৪.১ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.২ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪.৩ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.৪ নবীনচন্দ্র সেন

৪.৫ বিহারীলাল চক্রবর্তী

৪.৬ কায়কোবাদ

৪.৭ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.৮ গোবিন্দচন্দ্র দাস

৪.৯ দেবেন্দ্রনাথ সেন

৪.১০ অক্ষয়কুমার বড়াল

৪.১১ কামিনী রায়

৪.১২ মানকুমারী বসু

৪.১৩ গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী

৪.১৪ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৪.১৫ প্রশ্নমালা

৪.১ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদন দত্ত থেকেই বাংলার আধুনিক কাব্য সাহিত্যের নতুন যুগের সূচনা হয়েছে এবং নিজস্ব মাটিও খুঁজে নিতে পেরেছে। তবে, তার জন্যে আগে থেকেই মাটি তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিলো, আর তা করেছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি ক্ষমতায় রঙ্গলাল মাইকেলের সঙ্গে তুলনীয়ই নন। কলকাতার খিদিরপুরে একটি অঞ্চলে খুব কাছাকাছি থাকতেন দুজনে, পরিচিতও ছিলেন তাঁরা; দুজনেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের গুনগ্রাহী, এবং ইংরেজ বা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগে সুপরিচিত ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের লেখক রূপে আত্মপ্রকাশ রঙ্গলালের, অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন গুপ্ত কবির দ্বারাই। কিন্তু পথ দুজনের আলাদা হয়ে গিয়েছিলো; রঙ্গলাল প্রথাগত কবিতা লিখলেন না, তাই সদ্য-আত্মসচেতন শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্বাধীনতা-বোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আধুনিক যুগের ব্যক্তি ও জাতির স্বাধীন চেতনা জাগ্রত হওয়াকে বুঝে গিয়েছিলেন, এবং তার রূপকার হতে চাইলেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন রঙ্গলাল। হুগলী কলেজে পড়াশুনা করেন কিছুদিন। কিশোর কাল থেকে কবিতা লেখায় তার প্রবণতা ছিলো। নানা সময়ে পত্রপত্রিকাও পরিচালনা করেছেন, হয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ একটা বিশেষ ঘটনা থেকে প্রেরণা পেয়ে লেখা।

‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ আখ্যান কাব্য, বিষয় ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনী আর উদ্দেশ্য স্বদেশ প্রেমের উদ্বোধন। এই আখ্যান কাব্য রাজপুতদের স্বদেশ প্রেমের কাহিনী অবলম্বন রচিত।

লেখাটির পেছনে একটি ঘটনা রয়েছে। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ‘বীটন সোসাইটি’তে এক সভায় হরচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি ‘Bengali Poetry’ নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। তাতে তিনি ইংরেজী কবিতার তুলনায় বাংলা কবিতা যে নিম্নমানের তা দেখান। তিনি তাতে দেখাতে চেয়েছেন যে স্বাধীন ইংরেজ জাতির রচনা উৎকৃষ্ট হবেই, কারণ জাতি স্বাধীন হলেই মনের মুক্তি ঘটে, আর মুক্ত মনই পারে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি করতে। বাঙালির দীর্ঘকাল পরাধীন জাতি, তাই তাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।

রঙ্গলাল ঐ সভায় ছিলেন, বক্তব্য শুনে ক্ষুব্ধ হলেন এবং কিছুকালের মধ্যেই ঐ ‘বীটন সোসাইটি’তে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন, বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ। তাতে তথ্য, যুক্তি যথেষ্ট ছিলো, তিনি যে ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী তা প্রবন্ধে প্রমাণিত হলো। স্বদেশকে ভালোবাসার ডাক দিলেন অলক্ষ্যে প্রবন্ধটিতে, অচিরেই কবিতায় তার প্রকাশ ঘটালেন তিনি।

এই স্বদেশ প্রেমের উদ্বোধনের জন্যে বেছে নিলেন রাজস্থানের কাহিনী কর্ণেল জেমস্ টড সাহেবের Annals and Antiquities of Rajasthan-এ উল্লিখিত আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ, জয়, এবং আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সুন্দরী পদ্মিনীর আত্মবিসর্জন। ১৮৫৮-তে বইটি প্রকাশিত হলো।

সাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভূদেব চৌধুরী, রঙ্গলালকে বলেছেন জ্ঞানযোগী। তিনি রঙ্গলালের আখ্যান কাব্যের তথা কবিতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

(১) ঐতিহ্য সচেতনতা ও প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা, এবং 'স্বদেশীয় লোকের', মধ্যে সেই গরিমা বোধের প্রবর্তন কামনা।

দেখা যাচ্ছে, দেশের স্বাধীনতা ও প্রাচীন সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর আখ্যান কাব্যে নতুন পথ স্থাপন করেছে, যেখান থেকে পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করেছে।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' বেরুলো ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। এটি কাহিনী কাব্য জাতীয়। রোমান্টিক প্রণয়, তাঁর সতীত্বের মহৎ আদর্শ, ...' যেমন আখ্যারে মদ্যে তুলে ধরা হয়েছে তেমনি পদ্মিনীর ব্যক্তিত্ব, তাৎক্ষণিক বুত্তিমত্তা এবং অসীম সাহস বর্ণিত হয়েছে, হয়েছে পারিবারিক আদর্শরক্ষার জন্যে নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে আত্মবিসর্জনের চমৎকার দৃষ্টান্ত। বিষয়বস্তুতে আধুনিক ভাবনা পরিবেশিত হলেও রচনারীতি, ছন্দ ব্যবহার তেমন নতুনত্ব দেখাতে পারেন নি রঙ্গলাল। বীররস, করুণ রসের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে এখানে। রাণা ভীমসিংহের সেই প্রেরণাদায়ী অংশটি স্বাধীনতা যুদ্ধে মুখে মুখে ঘুরেছে একদিন।

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।

দাসত্বশৃংখল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?

কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।

দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গসুখ তায়

সবচাইতে বেশি জনপ্রিয় এই 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। এছাড়া তিনি ঐ রাজস্থানের বিশেষ একটি সতী চরিত্র নিয়ে লিখেছিলেন 'কর্মদেবী' (১৮৬২) 'সুরসুন্দরীও' রাজস্থানের বীরকন্যার কাহিনী নিয়ে। উড়িষ্যার বীরাঙ্গনার কাহিনী নিয়ে। উড়িষ্যার বীরাঙ্গনার কাহিনী নিয়ে লিখলেন কাঞ্চিকাবেরী (১৮৭৯)

আমরা সকল লেখকের কাছে সব দাবি পূরণের আশা করতে পারি না। রঙ্গলাল জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটালেন, নারীর মর্যাদা রক্ষার মহত্ব বর্ণনা করলেন, নারীর বীরাঙ্গনা রূপ ফুটিয়ে তুললেন তার দুর্বল, প্রায় অগভীর কাহিনী কাব্যে। তিনি ভিত্তি রচনা করে দিলেন মাইকেল মধুসূদনের মহৎ কাব্য সৃষ্টির জন্যে। এ তাঁর কম কাজ নয়।

৪.২ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আমাদের সাহিত্যের প্রথম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ভাবতে বিস্ময় লাগে যখন সবে মাত্র ইওরোপীয় শাসনব্যবস্থার কল্যাণে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে কিছু কিছু ধনী পরিবারের ছেলেদের পরিচয় ঘটছে; স্থাপিত হয়েছে 'হিন্দুকলেজ' এখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজ, ডিরোজিওর মতন পন্ডিত শিক্ষকের প্রেরণায় 'ইয়ংবেঙ্গলঁ নামক নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা হয়ে পড়ছে স্বদেশী সভ্যতার প্রতি বিরূপ, সংস্কারের প্রতি দেখাচ্ছে বিদ্রোহ, মাইকেল এলেন সুদূর সাগরদাড়ি গ্রাম থেকে কলকাতার খিদিরপুরে শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। অবশ্য, তিনি

যখন ছাত্র, তখন বাংলার হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনের প্রয়াস করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, করে গেছে রাজা রামমোহন। শিক্ষায়, সমাজে, একটা জাগরণ ও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মেয়েরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তারা শিক্ষিত হয়, সংস্কার মুক্ত মানুষে মতন হতে পারে তার জন্যে প্রায় যুধ্ব করেছেন বিদ্যাসাগর, করছেন বেথুন সাহেব। এই পটভূমিতে মাইকেল হিন্দু কলেজের ছাত্র হলেন, অসম্ভব মেধাবী ছাত্র রূপে গণ্য হলেন; ইংরেজীতে কবিতা লিখতে শুরু করলেন এবত রাম নারায়ণের নাটক দেখতে বসে, কিভাবে তার মনে হলো, বাজে নাটকের পেছনে রাজা মহারাজারা টাকা খরচ করছেন, তা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। প্রায় চ্যালেঞ্জ নিয়ে তিনি নাটক লিখে ফেললেন 'শর্মিষ্ঠা'।

তাঁর জীবনকাহিনী শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেরই জানা। ধনী রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র সন্তান, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন ইংল্যাণ্ড যাবার জন্যে, সেখান থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরবেন, স্বপ্ন ছিলো তাঁর। পিতা রাজনারায়ণ তাকে ত্যাগ করলেন, মধুসূদন নানা ভাষায় সুপণ্ডিত হলেন, মাদ্রাজে গেলেন সম্পাদনার কাজ নিয়ে। সেখানে বসে লিখলেন ছদ্মনামে "VISIONS OF THE PAST' – CAPTIVE LADIE' নামক কাহিনী কাব্য, ১৮৪৯ সালে তা প্রকাশিতও হলো। বাঙালির লেখা ইংরেজী কাব্য হিসেবে প্রশংসা পাবার যোগ্য হলেও, অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন ইংরেজী ভাষায় এর স্থান হবে না। সেই সময়ের গভর্নর জেনারেল বেথুন সাহেব, বন্ধু-গৌরদাসের পরামর্শ, বাংলা ভাষায় তাঁর প্রতিভার প্রয়োজন অনেক, তিনি শুনলেন।

মাদ্রাজ থেকে চলে এলেন কলকাতায়, তার সঙ্গে তখন কলকাতার শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের যোগাযোগ হতে লাগলো। সেই উপলক্ষেই নাটুকে রাম নারায়ণের নাটকের সঙ্গে পরিচয়, এরপর নিজেই নাটকে হাত দিলেন। অভিনয় হতে লাগলো। মনে হলো, পাশ্চাত্য াটকের সংলাপের কবিত্ব ও গতি আনতে গেলে নাটকের Blank Verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ দরকার। অনেকেই তাঁর এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপযোগিতা নিয়ে সন্দেহ করেছিলেন সেদিন, লাক্রনে লাইনে মিল বিন্যাস যে আর তেমন প্রয়োজন নেই, বুজে নিয়ে তিনি লিখলেন তিলোত্তম সম্ভব কাব্য, ১৮৬০-এ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা তাঁর প্রথম কাব্য।

ইংরাজীতে শুধু কথাবার্তা নয়, চিঠিপত্র লেখা নয়, পোষাক আসাক, খানা দানা, এমন কি স্বপ্নও দেখেছিলেন ইংরেজী, তাঁর জীবনীকারগণ বলেছেন। যদি তা-ই হয়, তবে, ভারতীয় পুরাণ ইতিহাসের বিশাল সঞ্চয়ে তিনি কিভাবে প্রবেশ করলেন, প্রস্তুতিই বা নিলেন কখন?

প্রতিভা-অনন্যতা এখানেই যে তাকে কার্যকারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মাত্র ছ'সাত বছর একটানা লিখেছেন মধুসূদন, তার মধ্যেই মহাকাব্য, পত্রকাব্য, লিরিক বা গীতিকবিতা, নাটক লিখেছেন, করেছেন বিষয়বস্তু আঙ্গিক ও ভাষা নিয়ে নানা পরীক্ষা। বদলে দিয়েছেন আমাদের এতোকালের সাহিত্যের প্রচলিত ভঙ্গী ও বিষয়বস্তুকে। এনেছে ধর্মের স্থলে সম্পূর্ণ মানবিক মূল্যবোধ, এনেছেন নারীর স্বমহিমা। তিলোত্তমা কাব্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তবে অক্ষরবৃত্তের বাঁধন থেকে বাংলা ছন্দকে মুক্তি দিলেন এই কাব্যেই প্রথম। তাই এর অনেক গুরুত্ব।

বিষয়বস্তু, পুরাণের সুন্দ-উপসুন্দ কাহিনী। দুজন দৈত্যভ্রাতা, খুব মিল ছিলো তাদের, তাদের বধ করবার জন্যে তিলোত্তমা নামক পরমা সুন্দরীর কাহিনী, তাকে নিজের ভাবনা অনুযায়ী সাজিয়ে নিলেন, রচনা করলেন চারটি খণ্ডে বিভক্ত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'।

মেঘনাদবধ কাব্য

আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেলেন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করে। হাত দিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনায়। ৯টি খণ্ডে বিভক্ত এই আধুনিক মহাকাব্যের বিষয় হিসাবে বেছে নিলেন রামায়নের তিনদিন দুরাত্রির কাহিনী। প্রথম খণ্ড ১৮৬১-তে বেরুলো। দ্বিতীয়টিও ঐ বছরে। বেরুনো মাত্র সেকালের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিকে তাঁর 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানালেন। কবি হিসেবে মধুসূদনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো।

তিনদিন দুরাত্রির ঘটনা রয়েছে এখানে ন'টি খণ্ডে নিজের পরিকল্পনা ও ভাবনা মতো আধুনিক মহাকাব্যটি রচনা করলেন মহাকবি। বীরবাহুর নিধন থেকে আরম্ভ, মেঘনাদের সেনাপতি পদে বরণ, লক্ষণ কর্তৃক তাকে হত্যা, প্রতিশোধের জন্য রাবণের যুদ্ধ যাত্রা, মেঘনাদ পত্নী প্রমীলার স্বামীর চিতায় আরোহন, এই কাব্যের বিষয় বস্তু।

যদিও তিনি কাব্যের আরম্ভে 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' বলে অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু রাবণের পিতৃহৃদয়ের করুণ ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি করুণ রসের কাব্যই সৃষ্টি করেছেন। এই কাব্যের চরিত্রগুলি ভারতীয় পুরাণের চরিত্র হলেও তার মধ্যে ইওরোপীয় মহাকাযের চরিত্রগুর প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আমাদের ধর্মবোধকে পাশে সরিয়ে রেখে রামচন্দ্রের, লক্ষণের চরিত্র থেকে মেঘনাদ এবং রাবণের চরিত্রকে অনেক বেশি ব্যক্তিত্ববান করে তুলেছেন। কাহিনী এমন ভাবে উপস্থিত করেছেন, যেখানে, রাবণের স্বর্ণলঙ্কা বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং শত্রু মুক্ত করবার জন্যে রাজণ সসৈন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুতক্তএমন মনে হয়। আমাদের সদ্য হারানো স্বাধীনতার জন্যে কবির গভীর অন্তঃশীলা বেদনারও যেন প্রকাশ দেখছি এখানে।

মধুসূদনের কাব্যে বীররস চমৎকার ফুটেছে, নারী চরিত্র অঙ্কনে তাঁর ক্ষমতা আজো বিস্মিত করে। একদিকে প্রমীলার মতন তেজস্বিনী বীরাঙ্গনার তেজো দৃপ্ত ভাব, অন্যদিকে চতুর্থ সর্গে সীতা সরমা সংবাদে চিরকালের পতিব্রতা ভারতীয় নারীর সুন্দর মহিমাময়ী রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন অমিত্রাক্ষরের চমৎকার প্রয়োগে।

কৌটা খুলি, রক্ষোবধু যত্নে দিলা ফোঁটা

সীমান্তে, সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে,

গোধুলি-ললাটে, আহা! তারারত্ন যথা!

দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা।

এই কাব্যের ভাষা কখনো একমাত্রিম নয়, বহুমাত্রিক। উপমার অজস্র প্রয়োগ ও নতুনত্ব আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। চোখের সামনে প্রতিটি সর্গের বর্ণিত কাহিনী ছবির মতন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে; আজকের সিনেমার মতন Visual দৃশ্যাত্মক। মহাকাব্যের গাম্ভীর্য বজায় রেখেও গীতিকবিতার ব্যঞ্জ ও মাধুর্য তিনি বজায় রাখতে পেরেছেন। বাংলা ভাষার একমাত্র সার্থক আলংকারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য রূপে 'মেঘনাদবধ কাব্য' আজও অবিস্মরণীয় এবং পাঠ্য।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

'সীতা-সরমা' সংবাদ সগটি লিখতে বসে হয়তো কবি অনুভব করেছিলেন বাংলার স্বাভাবিক প্রবণতা গীতিমাধুর্যের প্রতি। কিন্তু, তার আগেই ১৮৬০-এ একটি লিরিক কাব্য লিখেছিলেন মধুসূদন, নাম 'ব্রজাঙ্গনা' প্রথমে বইটির নাম দিয়েছিলেন 'রাধা বিরহ'। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন ১৮৬১-তে, নাম হলো 'ব্রজাঙ্গনা'। ডঃ সুকুমার সেন এই কাব্যের বিষয় সম্বন্ধে লিখেছেন,'' হৃদয়পাশে বন্দিনী হইয়া যে নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সহিয়াছে, সেই নারীই মধুসূদনের কাব্য নাটকের নায়িকা।

ভাবলে অবাক লাগে, মেঘনাদ লিখছেন যখন, অর্থাৎ মহাকাব্য লেখার সময়ই তার লিরিক কবিতা লেখা, চলছে। তাঁর মধ্যে বাঙালী মনের আবেগ, দুঃখ, আনন্দ যেনো উৎসমুখ অবরুদ্ধ ছিলো, এই কাব্যে যেনো তার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। আর তার হাতেই বাংলা গীতিকবিতা জন্ম নিলো। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

কেনে এত ফুল তুলিলি, সজনী
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুমরতনে
ব্রজের বালা?
আর কি পারিবে কভু ফুলহারে
ব্রজকাটিনী?

ত্রিপদী ছন্দে গীতিমাধুর্য আশ্রয় করলো আমাদের চিরাচড়িত প্রেম কাহিনী রাধাকৃষ্ণ প্রণয় কাহিনীকে। শোনা যায় এই কবিতা পড়ে বৈষ্ণব গণ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, একজন ভক্ত কবিকে দেখে জীবন ধন্য করবেন বলে।

বীরাঙ্গনা কাব্য

আজকের যুগে নারী স্বাধীনতা দাবি করে কবিতা লিখছেন মহিলা কবিরা। অথচ মধুসূদন ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, লিখছেন 'বীরাঙ্গনা'। ব্রজাঙ্গনা'তে এই নারীর স্বাধীনতা সরল অকপট এবং দুঃসাহসী ভাবে প্রকাশ করেছেন রাধা আজ থেকে দেড়শো বছর আগে।

যে যাহারে ভালোবাসে, সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?

অর্থাৎ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাধীন ভাবে নারী পুরুষের সঙ্গী নির্বাচনের দাবী করছেন রাধা। কিন্তু ওই একই বছরে ১৮৬৬-তে রচিত, ৬২-তে প্রকাশিত 'বীরাঙ্গনা'য় যেন সব দিক থেকেই আধুনিক নারীর ইচ্ছে, সংকল্প, অবদমিত বাসনার সাহসী প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

মধুসূদন যেনো বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষার, নারী মুক্তি আন্দোলনের সকল কাব্যরূপ দিলেন তাঁর কবিতায়। বিদ্যাসাগর জমি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন যেন তাঁরই জন্যে।

আমাদের ভাষায় প্রথম আন্তর্জাতিক কবি মধুসূদন। যদিও তার কিছু আগে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করে কিন্তু তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা ছিলো সীমাবন্ধ। তাছাড়া তার স্বদেশীয় ইতিহাস সংস্কৃতির প্রতি টানও কম ছিলো না। মধুসূদন নানা ভাষায় অভিজ্ঞ, গ্রীক, ল্যাটিনও শিখেছিলেন। ফলে উওরোপের ধ্রুপদী সাহিত্য গভীর ভাবে পড়েছিলেন তিনি, তাই তাঁর হাতে নতুন নতুন কবিতার আঙ্গিক প্রবর্তিত হতে লাগলো বাংলা কবিতায়।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদনের এক নতুন আঙ্গিকে লেখা কবিতা। চিঠির আকারে, অর্থাৎ কাউকে উদ্দেশ্য করে কেউ লিখছেন নিজের মনে আশা, আকাঙ্খা, ব্যথা বেদনার কথা। প্রতিটি চরিত্রই নারী চরিত্র। কেউ কুমারী, কেউ বিধবা, কেউ গুরুপত্নী, ছাত্রের প্রতি আকর্ষণের কথা, কেউ স্বামীর বিশ্বাসের প্রতি অনাস্থা, ইত্যাদি নারী মনের নানা স্রোত বিপরীত স্রোতের টানা পোড়েনে পত্রকাব্যগুলো জীবন্ত, তরতাজা আধুনিকতায় মানবীয় মনোজগতের দলিল হতে পেরেছে।

লেখার এই রীতিটি মধুসূদন ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে নিয়েছেন। ইটালীর বিখ্যাত কবি অভিদ্ (Ovid-খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩-১৮)-এর 'Heroides' কাব্যের রচনারীতি অনুকরণ করে লিখেছেন ১১টি পত্র। আরো কয়েকটি অসম্পূর্ণ পত্র কাব্য লিখেছেন তিনি।

বিষয়বস্তু রূপে ভারতীয় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বা প্রাচীন সাহিত্য থেকে বিভিন্ন বয়সের ও অবস্থায় নারীচরিত্র চয়ন করেছেন মধুসূদন। 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, লক্ষণের প্রতি সূর্পনখা, সোমের প্রতি তারা, কৃষ্ণের প্রতি রুকমিনী, এরকম সব চরিত্র এ কাব্যের নায়িকা। নায়করা সবাই নেপথ্যে রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে চিঠিগুলো অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছে। সকলেই বীরনারী, তা নয়, তবে অকপটে মনের সব আশা আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করেছেন, কোনো সামাজিক সংসারের ভয় করে গোপন রাখেননি মনের ভাব। এইখানেই এঁরা বীরাঙ্গনা।

একটি চিঠির বিষয় সূর্পনখার প্রেম নিবেদন, তাও লক্ষণকে। বাল্য বিধবা সূর্পনখা বিধবা নারীর দুঃসহ জীবনকে মেনে নিতে পারেনি। রামায়ণের কবি, বিধবার স্বপ্ন আকাঙ্খার কোনো মূল্য দেন নি; কিন্তু মধুসূদন, একালের কবি, তিনি বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনের যৌক্তিকতা অনুভব করেছিলেন, আর নিজের মধ্যে করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের হৃদয় স্বচ্ছজলের নদীর মতন বয়ে যাচ্ছিলো, তিনি সুর্পনখার প্রেমকে যুক্তির উপরে দাঁড় করালেন, দিলেন, হৃদয়ের বন্ধন মুক্তির স্বাদ—

এস, গুণ নিধি
দেখ আসি, এ মিনতি দাসীর ও পদে।
কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।

ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে।
নহে কহ প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে
এ বেশ ভূষণ ব্যক্তি, উদাসীন, বেশে
সাজি, পুজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব।

মেঘনাদ কাব্যে'র ভাষা ও অমিত্রাক্ষর এই কবিতাগুলিতে আরো স্বাভাবিক ও সচ্ছন্দস চিঠিগুলোর মর্মবস্তু কবি নাটকীয়তা রক্ষা করেও গীতি কবিতার সুরে ও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছেন।

তাঁর সর্বশেষ অসামান্য রচনা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী।' বাংলা সাহিত্যে চতুর্দশপদী বা সনেটের প্রচলন তিনিই করেন এবং তা সার্থক ভাবেই করেন। ১৮৬০ সালে প্রথম সনেটটি লিখে পাঠান বন্ধু রাজনারায়ণের কাছে, পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি দেশ থেকে অনেক দূরে, ফ্রান্সের ভার্সাইতে রয়েছেন, ভোগ করছেন দারিদ্র্য দুঃখ, উপলব্ধি করছেন প্রিয় দেশ ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা, তখন একটির পর একটি চতুর্দশপদী লিখেছেন তিনি, উজার করে দিয়েছেন সনেটের কঠিন বন্ধরে মধ্যে বিষণ্ণ হৃদয়ের আর্তি।

সনেট বা চতুর্দশপদী লেখার জন্যে প্রয়োজন কম কথায় বেশি অনুভূতি প্রকাশ করার দক্ষতা। চৌদ্দটি পংক্তির মধ্যে মিলবিন্যাস রেখে ভাবের উপস্থাপন, তাতে ভাবের আরোহ এবং অবরোহ থাকবে। আটটি পংক্তিতে অষ্টক বন্ধ ও শেষ ছয় ছত্রে ষটকবন্ধ সনেটের গাঢ় সংহতি এনে দেয়।

মধুসূদন ইটালীর সনেটের স্রষ্টা পেত্রার্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এতো রচনাভংগীর দিক, সনেটের প্রাণসঞ্চার করতে তিনি ব্যক্তিগত ভাবনা ও অনুভবকে ব্যবহার করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেনঃ সেই সুদূর সাগর পাড়ের দেশে যখন ঘরছাড়া কবির চিত্তে 'মন কেমনের হাওয়ার পাকে' অনেক স্মৃতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখনই সেই সনেটগুলির জন্ম।

তাঁর কথায় ''দেশের আকাশ-বাতাস-গন্ধ-স্পর্শের জন্য ব্যাকুল মধুসূদনের মনোবেদনার রেশ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মদ্যে ঝংকৃত রহিয়াছে।''

একটি দৃষ্টান্ত ঃ

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে (অবোধ আমি;) অবহেলা করি,
পর ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পর দেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায় নিরাহারে সঁপি কায় মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;
ফেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন!

এই হলো প্রথম অংশ, আট পংক্তির অষ্টক। এর পর ষটক বা ছয় পংক্তির স্তকব রয়েছে।

এছাড়া গীতি কবিতা রচনাতেও প্রথম পথিকৃৎ মধুসূদন। ধর্ম বিবর্জিত, ব্যক্তি জীবনের অনুভবকে গীতি কবিতায় চমৎকার ভাবে সুসংহত প্রকাশ দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, 'রেখো মা দাসেরে মনে' 'আত্মবিলাপ স্মরনীয়।

তাঁর হাতে বাংলা আধুনিক কবিতার উৎসার, ভিত গড়ে উঠেছিলো। তাঁর জীবন কাহিনী নানা ব্যর্থতায় পূর্ণ। তাঁর মৃত্যু অভাব অনটনের মধ্যে, দাতব্য হাসপাতালে। স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যু তাকে আরো বেদনা দিয়েছিলো। সমস্ত জীবন বিষ পান করে তিনি বাঙালী পাঠকের মুখে সামনে অমৃতের পাত্র তুলে দিয়ে গেছেন।

৪.৩ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের তিনজন কবির আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে। থাকতেনও একই পাড়ায় কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে। রঙ্গলাল, মধুসূদন আর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুসূদন থেকে চৌদ্দ বছরের ছোটো ছিলেন বয়সে। তাঁর জন্ম ১৮৩৮-এর এপ্রিলে। পিতা কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা আনন্দময়ী। হেমচন্দ্রও হিন্দু কলেজে পড়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে। এর ফলে বাংলা গীতি কবিতার মধ্যে ইংরেজী প্রভাব তিনিই এনেছেন, আর গীতি কবিতার বিষয়ের মধ্যে তৎকালীন বাঙ্গালির জাতি হিসেবে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতার চেতনা তার দান।

মধুসূদনের প্রতিভা, তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতার সঙ্গে হেমচন্দ্রের তুলনা চলে না। বিষয় বৈচিত্র্যে, ভাবের গভীরতায়, নতুন নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তনায় মধুসূদন খুলে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতার আধুনিক পর্বের জানলা দরজা। হেমচন্দ্র মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধকাব্য’ সম্পাদনার কাজে নেমে খুঁজে পেলেন নিজেকে। ১৮৩৮ থেকে ১৯০৩ এই সময়কালে তিনি প্রচণ্ড খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এমন কি মধুসূদনের চাইতেও খ্যাতি তাঁর বেশি ছিলো।

সময়টাও তার পক্ষে ছিলো। তিনি সেকালের রাজনীতি সচেতন কবি। ইংরেজ শাসনে জাতীয় সম্মান মাঝে মাঝে অসম্মানিত হতো, দেশীয়দের সঙ্গে শাসকদের পার্থক্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতো বিদেশীরা। ইংরেজ পণ্ডিতরাও এদেশের প্রতি তাচ্ছিল্ল প্রকাশ করতেন অনেকেই।

প্রথম প্রথম বাঙালি হিন্দু সমাজ ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলো, কিন্তু আস্তে আস্তে ধারণা জন্মাচ্ছিলো যে ইংরেজদের অন্তত এতোটা বিশ্বাস করা যায় না। বরং তাদের অনাচারমূলক অনেক ঘটনাই ঘটছিলো, যাতে শিক্ষিত হিন্দুর ইংরেজ ও ইংরেজশাসন সম্বন্ধে মোহ ভাঙতে শুরু করেছিলো এরই ফলে বাঙালির মনে স্বাধীনতা কামনা জাগ্রত হতে লাগলো, গড়ে উঠতে লাগলো ইংরেজ-শাসন-বিরোধী মনোভাব।

হেমচন্দ্রের কবিতায় যে সমসাময়িক নানা ঘটনা ও ইংরেজের প্রতি বিরূপতার কথা দেখা যায়, তার তাঁর সময় সচেতনার ফল। শুধু শিল্পের জন্যে শিল্পের নয়, লেখকের দায় আছে জাতি ও দেশের প্রতি, তারও প্রমাণ চার খণ্ড কবিতাগুলি। তাঁর ‘ভারতবিলাপ’ কবিতায় এই সচেতন আত্মবুদ্ধির পরিচয় চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

অহে বঙ্গবাসী জান কি তোমরা
অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা

কার রাজধানী কি জাতি ইহারা
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।

নাহি যদি জান এস এইখানে
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিধানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়।

কবি দুঃখ করেছেন স্বদেশেই নিজেরা পরবাসী ভেবে

হায়রে কপাল, ওদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস?

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস।

এই অবস্থার জন্যে, কবি বাংলার স্বাধীনতা চলে যাওয়াকেই দাবি করেছেন—

কি হবে বিলাপ করিলে এখন
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন
চোরে শিরোমনি করেছে হরণ
তখনি সে সাধ ঘুচেছে।

এমনকি তিনি প্রতিবাদের স্বর বাজিয়ে দিয়েছেনক্ত

'নহিলে শুনিতে এ বীনা ঝঙ্কার
বাজিত গরজে উষলি আবার ....।

একজন দেশীয় কবির এই দ্রোহাত্মক মনোভাব তৎকালীন বৃটিশ সরকার সহ্য করবেন কেন? ফলে রাজরোষে পড়ে ভুগতে হয়েছে হেমচন্দ্রকে। আরো কয়েকটি কবিতা এই বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রকাশ করছে পরেও।

রচনাশক্তিতে তিনি মধুসূদনের সঙ্গে কোনো ভাবেই তুলনীয় নন, তবে মধুসূদনের কবিতার উচ্চস্তরের ভাব ও রচনা দক্ষতা বুঝে নেবার মতন পাঠক তখনো তৈরী হয়নি, সরল সহজভাবে প্রকাশের জন্যে সেকালের পাঠকের প্রিয় হয়েছিলেন হেমচন্দ্র। যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমজদার শিক্ষিত পাঠক গড়ে উঠেছে, ফলে মধুসূদনের খ্যাতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর বিস্মৃতি গ্রাস করছে হেমচন্দ্রের। তিনি চিরকালের কবি হয়ে উঠতে পারেন নি মধুসূদনের মতো।

১৮৬১ তে বেরুলো চিন্তাতরঙ্গিনী, ৬৪-তে 'বীরবাহ' কাব্য-এ কবিতাবলী, ৭৫-৭৭-এ বৃত্র সংহার, ৮২-তে দশমহাবিদ্যা, ৯৮-তে চিত্তপ্রকাশ।

প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষের আত্মহত্যা কবিকে গভীরভাবে শোকার্ত করে, তারই প্রতিক্রিয়া থেকে লেখা 'চিন্তাতরঙ্গিনী'। হেমচন্দ্রের প্রতিভা ছিলো গীতি কবির। এই কাব্যে তাই চিন্তার চাইতে আবেগের ভাগই বেশি। এখানে বালিকা বধূর অসহায় জীবন চিত্র সরলভাবে প্রকাশ করেছেন, যা সময়কালীন নারীসমাজের অসহায়তার দলিল হয়েছে।

'বীরবাহু' কাব্য এর পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে উপন্যাসটি কাল্পনিক, কোনো ইতিহাসের কাহিনী আশ্রিত নয়। ''পুরাকালে হিন্দু কুল-তিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থে কি প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।''

স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও জাতীয় মর্যাদা বোধ হেমচন্দ্রের প্রথম থেকেই তীব্র ছিলো। তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবও প্রথম থেকে—

মাগো ওমা জন্মভূমি আরো কতোকাল তুমি
এ বয়েসে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবন দল বল আর কতকাল
নিদয়, নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।

অবশ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' কবিতার বা গানের সুর যেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

হেমচন্দ্রের কবিতার গুরুত্ব এখানে। এই স্বাধীনতার চেতনায় কবিতাকে ব্যবহার করা। রাজশক্তির বিরুধে তার স্বদেশ জননীকে জাগাবার আহ্বান পরবর্তীকালের দেশ প্রেমিকদের কি মনে পড়েনি?

কতই ঘুমাবে মাগো, 'জাগো গো মা জাগো জাগো
কেঁদে সারা হয় দেখ পুত্রকন্যা সকলে।

'বৃত্রসংহার'- ডঃ সুকুমার সেনের মতে ''মধুসূদনের অনুকরণে যাঁহারা 'মহাকাব্য' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার শ্রেষ্ঠ।''

একথা ঠিক, এই 'বৃত্রসংহার'ই তাঁর খ্যাতি এনে দিয়েছিলো দুখণ্ডে রচিত। ২৪টি সর্গে বিভক্ত ১৮৭৫, ১৮৭৭-এ প্রকাশিত। পুরাণ থেকে মূল কাহিনী নিয়েছেন। বৃত্রাসুর মহাদেবের বরে শক্তিমান হয়ে বলপূর্বক স্বর্গরাজ্য থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে নিজে ইন্দ্রের সিংহাসনে বসলেন। দেবতারা বিতাড়িত হয়ে লাঞ্ছিত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন, স্তবটিতে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিলেন বৃত্র সংহারের উপায়। কিন্তু বলদর্পী বৃত্র পত্নী ঐন্দ্রিলার ইচ্ছে পূরণের জন্যে পুত্র রুদ্রপীড়কে, ইন্দ্রপত্নী শচীকে হরণ করার দায়িত্ব দিলেন। এই

অপরাধেই মহাদেব বৃত্রের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তার শক্তি ফিরিয়ে নিলেন, এবং বৃত্র বধের উপায় বলে দিলেন। মুনি দধীচি ইচ্ছায় দেহত্যাগ করলেন। তার, অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মিত হলো, ইন্দ্র সেই বজ্র দিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে বিনাশ করলেন বৃত্রসুরকে। পাপীদের শাস্তি হলো, স্বর্গে ফিরে এলেন দেবতারা।

'মহাকাব্য' হিসেবে সেকালে প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছিল বৃত্রসংহার। এমনকি রবীন্দ্রনাথও প্রথমে প্রশংসা করেছিলেন। কারো কারো ধারণা হয়েছিলো, 'মেঘনাধবধ' কাব্যের চাইতে 'বৃত্রসংহার' শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সময়ই প্রমাণ করেছে বিশিষ্ট কিছু চরিত্র অংকন ও দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ছাড়া এই কাব্যের তেমন কোনো মহত্ব নেই। তাঁর মানসিকতা ছিলো একজন প্রকৃত ভারতীয়ের; সে সময়ে মধুসূদনের আধুনিক মানসিকতা বোঝার মতন পাঠক সৃষ্টি হয়নি। তাই, বৃত্রসংহারের ভারতীয়তার স্বস্তি খুঁজে পেয়েছেন সেকালের পাঠক। এবং সেই জন্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন তিনি। এর জন্যে তার ভাষার সহতজাও অনেকটা কাজ করেছে। অন্যত্র মধুসূদনের মহাকাব্যের অনুসরণ, মেঘনাদের ছাঁচে চরিত্র নির্মাণ দেখা যায়।

সজনীকান্ত দাস লিখেছেনঃ হেমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির ইতিহাসে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকিবেন; কারণ, তিনি আমাদের স্বজাত্য-বোধ ও স্বদেশ প্রেম যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন আর সে যুগে কোনে কবি করেন নাই। দেবতাদের স্বর্গ রাজ্য ফিরে পাবার জন্যে যে সংগ্রাম, তা সেকালের বাঙালীর মনে স্বদেশের স্বাধীনতা ফিরে পাবার স্বপ্নের বীজ বপন করেছে। এই সব কারণে হেমচন্দ্রর প্রভূত সম্মান ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

পাতালপুরীতে পরাজিত দেবতারা আশ্রয় নিয়েছে, দেবসেনাপতি স্কন্দ তাদের উদ্দেশ্যে বলছেনক্ত

''ধিক দেব! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়ে
এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য, সুধা, স্বর্ণ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।

এই কথা, সে সময়ের ইংরেজী শিক্ষিত, সজাতিক সম্মান সম্পর্কে সচেতন যুবকদের, কিংবা সকলকেই স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্দীপ্ত করেছে সন্দেহ নেই।

এছাড়া হেমচন্দ্র ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন কবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র স্বাদ বাঙালী পাঠককে দেবার জন্যে 'ছায়াময়ী' কাব্য।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'দশমহাবিদ্যা' প্রকাশিত হলো। ''হেমচন্দ্র এই পুস্তিকায় পুরাণের দশমহাবিদ্যার কাহিনীর ছাঁচে ব্যঞ্জনার আকারে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাই বলেছেন''। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এছাড়া (১৮৭৬) আশাকানন, প্রকাশ পেলো। ১৮৭০-৯৮-এর মধ্যে প্রকাশিত বলে গীতিকবিতা সংগ্রহ কবিতাবলী। তাঁর বিশেষত্ব দেশাত্মবোধক কবিতা রচনায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন। আমাদের জাতীয় জীবনে দেশাত্মবোধ উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কিভাবে জেগে উঠেছে, তার দৃষ্টান্ত হেমচন্দ্রের নানা গীতি কবিতায় বা খণ্ড কবিতায় দেখতে বিধৃত রয়েছে।

ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট কয়েকজন কবির কবিতায় অনুমাদ করে বাঙালিদের ইংরেজী কবিতার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলে। সে যুগের পক্ষে এও কম কথা নয়। শেকসপীয়ারের দুটি নাটকের অনুবাদ করেও বাঙলার শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করিয়েছিলেন শেকসপীয়ার সম্বন্ধে। টেম্পেস্ট অবলম্বনে 'নলিনীবসন্ত' এবং রোমিও জুলিয়েট অবলম্বনে 'জুলিয়েত'।

তাছাড়া সমকালের রাজনৈতিক ঘটনাকে ব্যঙ্গে আপত করেছেন খণ্ড কবিতায়। 'বিবিধ কবিতা নামে তা প্রকাশিত হয়েছে। এসব কবিতায় তার সহজ ভাব প্রকাশ ও গীতিকবিতার স্টাইল ব্যবহারের দক্ষতা দেখা গেছে। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

হায় কি হোল দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে।

পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত রাজ্য পরে।

সবাই 'লীডার'—কর্তা স্বয়ং আপনি বাহাদুর,

কতই দিকে তুলছে কতো কতোই-তরো সুর।

শত বছর পরেও আজও কি প্রাসঙ্গিক মনে হয় না এসব কথা'

৪.৪ নবীনচন্দ্র সেন

উনিশ শতকের প্রথম ভাগকে যদি গদ্য চর্চার যুগ বলি, দ্বিতীয় অর্ধকে কবিতার যুগ বলতেই হবে। আবার মজার কথা হ'লো, সৃষ্টিশীল গদ্য আবার এই সময়েই সমৃদ্ধ হয়েছে। এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধুসূদন, হেম-নবীনের যুগটা চলেছে অর্ধশতক জুড়ে। আজ, এই একুশ শতরে শুরুতে স্বাভাবিক কারণেই মানুষের মুখের ভাষা বদলে গেছে, আর গত একশো বছর, অর্থাৎ বিংশ শতক (১৯০১-২০০০) জুড়ে নানা প্রতিভাবান লেখক কবিদের চর্চায় বাংলা গদ্য, কবিতার নাটকের, প্রবন্ধে ভাষার অনর্গল পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। এবং আজও হয়ে চলেছে।

'পলাশীর যুদ্ধ'-এর কবি বলে একসময় নবীনচন্দ্র সেন খ্যাতির চূড়োয় উঠেছিলেন। মাত্র একশো বছর আগে ঘটে যাওয়া ইতিহাসকে নিয়ে কাব্য রচনা দুঃসাহসী কাজ সন্দেহ নেই। বইটি পাঠ্য বই-এর মর্যাদা পাওয়ার খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু, নবীনচন্দ্রের কবিতার নানা বিচিত্রতা ছিলো, তিনি লিখেছেন মহাকাব্য, খণ্ড কবিতা, বিদেশী ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়েও খণ্ড কাব্য। তিনি তার 'আকাশ বাহিনী' (১৮৭১) প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি যখন 'এডুকেশান গেজেট'-এ কবিতা লিখছেন, তখন পর্যন্ত নানাবিষয় নিয়ে খণ্ড খণ্ড কবিতা লেখা শুরু হয়নি। আরো দাবি করেছেন, যে তাঁর আগে স্বদেশ প্রেম-মূলক কবিতাও কেউ লেখেন নি।

কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র খণ্ড কবিতা লিখেছেন, স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতাও লিখেছেন। বরং তাঁদের কবিতায় স্বদেশ প্রেম, স্বাধীনতার আকাঙ্খা অনেক বেশি তীব্র হয়ে ফুটেছে।

নবীনচন্দ্র উচ্চ রাজকর্মচারী। তাঁদের আদিবাস বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তার 'আত্মজীবনী' থেকে নানা তথ্য জানা যায়, যা তার সময় এবং কবিতা বুঝতে সাহায্য করে। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; রাজকার্যে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার স্পষ্টবাদিতার জন্যে নির্যাতিত হয়েছেন। ঘুরেছেন ভারতের নানা স্থানে, তাতে দেশ ও জাতি সম্পর্কে, ইতিহাস ও পুরাণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তা, সাহিত্য সৃষ্টিতে খুবই কাজে লেগেছে।

মোট বারোটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। *অবকাশরঞ্জিনী* ১৮৭১, ১৯৭৮, দুখণ্ডে; *পলাশীর যুদ্ধ* ১৮৭৫; *রৈবতক* ১৮৮৭; *কুরুক্ষেত্র* ১৮৯৩, অমৃতাভ, অমিতাভ, খ্রীষ্ট ইত্যাদি মহাপুরুষের জীবনী কাব্য; লিখেছেন আমার জীবন' ৫ খণ্ডে; এছাড়া কিছু চিঠিপত্রও।

একথা ঠিক, গীতিকবিতা'র প্রচলন তখনো তেমনভাবে হয়নি; তবে মন্ময় Subjective কবিতা মধুসূদন, হেমচন্দ্র লিখেছেন, পরিমানে কম।

ব্যক্তিগত আবেগ গীতিকবিতাকে প্রাণবান করে তোলে। মহাকাব্য অনেক পরিমাণে বিষয় প্রধান, সেখানে কবির নিজস্ব আবেগ সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকতে হয় তাতে কাহিনী, চরিত্র ও দর্শন প্রধান হয়ে ওঠে। নবীনচন্দ্র আবেগকে মূর্ত করে তুলতে গীতি কবিতা লিখেছেন অনেক। মূলত, তাঁর কবি স্বভাবেই ছিলো আবেগের প্রাধান্য, যেমন রবীন্দ্রনাথের কবি স্বভাবের মূল চরিত্র রোমান্টিক ভাবাবেগ।

ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত রোমান্টিক কবি বায়রনের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর মিল, অর্থাৎ কবিতার চরিত্রের সঙ্গে, এজন্য সেকালে নবীনচন্দ্রকে বাংলার বাইরন বলার রেওয়াজ ছিলো। 'পলাশীর যুদ্ধ' সেই খ্যাতি এনে দিলো।

'পলাশীর যুদ্ধ' ১৮৮৬ তে প্রকাশিত। পাঁচ সর্গে ভাগ করা হয়েছে মাত্র একশো বছর আগের ঐতিহাসিক গল্প। সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎ শেঠ কৃষ্ণচন্দ্রের মন্ত্রণা, ব্রিটিশ শিবিরে চিন্তামগ্ন ক্লাইভ, দেবী ব্রিটানিয়ার দ্বারা আশ্বাস প্রদান, যুদ্ধের আগের রাতে সিরাজের আতঙ্ক, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, মোহনলালের অনুশোচনা, শেষ সর্গে বিজয়ী ইংরেজদের উৎসব, সিরাজের হত্যা দৃশ্য এবং কাব্যের শেষ।

এই কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ বাঙালীর মনে স্বাধীনতা হারাবার বেদনার প্রকাশ ঘটলো।

''সেইখানে মোগলের মুকুটরতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাশির রণে!
সেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবশেষে পাপাত্মা যবনে।

বিলালী সিরাজের বিশেষণ 'পাপাত্মা যবন' মনে হয়। তবে সিরাজের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছেক্ত

নিবিল তখন,
ভারতের শেষ আশা, হইল স্বপন।

এ কাব্যের দুর্বলতা হলো, লিরিক-উচ্ছ্বাস, অর্থাৎ আবেগের উৎসার। তবে, চরিত্রগুলো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেনি।

এর পরে 'রঙ্গমতী' ১৮৮০তে বেরুলো। তার আগে ১৮৭৭-এ বেরুলো ক্লিওপেট্রা। ইতিহাসের আশ্রয়ে নয়, রঙ্গমতী কবির কল্পনা প্রসূত একটি প্রেম কাহিনী, যাতে স্বদেশ প্রেমের আবেগ ও উত্তেজনা ধরা পড়েছে।

মিশরের রানী ক্লিওটেট্রার কাহিনী অবলম্বনে রচিত রোমান্টিক কাব্য।

'ত্রয়ী' কাব্যের কবি হিসেবে নবীনচন্দ্র প্রভূত সম্মান পেয়েছেন বাঙালী পাঠকের কাছে। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস এই তিনভাগে বিভক্ত শ্রীকৃষ্ণের জীবন, কর্মকাণ্ড নিয়ে কবি ভারতের আত্মার সম্মান করেছেন ত্রয়ী কাব্যে।

রৈবতক ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। কুরুক্ষেত্র ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাস ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। কবির কথায় ''রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদি লীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিম লীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।''

বিশাল মহাকাব্যের পরিকল্পনা, তাই গল্পাংশ বা আখ্যাটিও বিশাল পটভূমিতে স্থাপিত দেখা যায়। রচনার সময় ও প্রেরণা সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, ''কার্যাপলক্ষ্যে নবীনচন্দ্র ঐতিহাসিক স্মৃতিপূর্ণ রাজগিরে কিছুকাল যাপন করিয়াছিলেন। এখানে জরাসন্ধের স্মৃতি তাঁহাকে পুনরায় ভারতকাহিনী পাঠ করিবার কৌতুহল দিয়াছিল। মহাভারত পড়িয়া এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা দেখিয়া নবীনচন্দ্র এক অভিনব মহাকাব্য রচনার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন।''

এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস, বা তাঁর মহাভারতের মূল কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্রের নূতন ব্যাখ্যা পাই আমরা। এই তিনটি কাব্যের মূল ঘটনা হলে সুভদ্রা হরণ, অভিমুন্য বধ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজবংশ যদুবংশের ধ্বংস।

এই বিরাট কাব্যের পরিকল্পনা একালের মানুষের মধ্যে আর্য্যজাতিত্ব বোধ সমপ্রচার করা। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ খণ্ডছিন্ন ভারতবর্ষকে মহাভারতের যুদ্ধের মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন; নবীনচন্দ্রও সেই স্বপ্ন দেখেছেন দেশ প্রেমের আবেগ নিয়ে।'' বুঝিলাম তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে না।''

এই সব কারণে, পরিকল্পনার বিরাটত্ব, অনেক চরিত্রের সমাবেশ, দার্শনিক উপলব্ধ, নতুন জাগ্রত জাতির স্বপ্ন কল্পনা মিশ্রিত এই কাব্যকে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' নামে সম্মানিত করা হয়েছে।

এক ধর্ম এক জাতি, এক মাত্রা রাজনীতি
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত
জননী খণ্ড দেহ হবেনা মিলিত।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবি এইভাবে মহাভারত রচনার আদর্শ প্রকাশ করেছেন। কবি, কৃষ্ণকে ভগবান রূপে না

দেখে, তাকে নানাগুনের সমন্বয় শ্রেষ্ঠ মানবরূপে দেখেছেন কাব্যে; এবং নতুন ব্যাখ্যায় কৃষ্ণকে তুলে ধরেছেন, 'আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি' প্রভৃতির আদর্শে সমৃদ্ধ একজন মহামানব হিসেবে। এ কারণেই 'উনিশ শতকের মহাভারত' বলা হয়েছে এই ত্রয়ী কাব্যকে।

এছাড়া কয়েকটি জীবনীকাব্য লিখেছিলেন এই আদর্শ বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে। যেমন 'খৃষ্ট' কাব্য প্রকাশ ১৮৯১। ''মেথু প্রণীত খৃষ্ট মাহাত্ম্য হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম উদ্ধৃত, ও কবিতায় অনুবাদিত''।

বুদ্ধের জীবন অবলম্বনে লিখেছেন 'অমিতাভ'। প্রকাশিত হয় ১৮৯৫তে।

এবং তাঁর শেষ কাব্য হলেন 'অমৃতাভ', চৈতন্যের জীবন অবলম্বনে রচিত হয়, প্রকাশ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাছাড়া 'আমার জীবন', তাঁর আত্মজীবনী মূলক বই। তখন পর্যন্ত আত্মজীবনী লেখার রেওয়াজ ছিলো। সম সময়ের কথা, নিজের জীবনকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে নানা বই লেখার প্রেরণা কখন কিভাবে পেয়েছেন, স্বপ্ন কল্পনা, সেকালের নামা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নানা কল্প নিয়ে এই 'আমার জীবন' একটি প্রয়োজনীয় লিখেছেন তিনি, যা তাঁকে বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে।

৪.৫ বিহারীলাল চক্রবর্তী

আমরা বাঙালী, আমরা অনেকটাই আবেগ প্রধান জাতি। হয়তো এই প্রবণতার জন্যে দায়ী বাঙালার ভূপ্রকৃতি, বাংলার নদীমাতৃকতা; এখানে নদ-নদী, উপনদী, শাখানদী জাল শিরার মতন বইছে। যেদিকে তাকানো যায় সবুজ মাঠ, অরণ্য, শস্যক্ষেত। আকাশে অফুরন্ত নীলের বন্যা। তাই, কি জাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।'— লিখেছেন বাঙালী কবি।

যতই মঙ্গলকাব্য, চরিত সাহিত্য, আখ্যান কাব্য লেখা হোক, বাঙালী গীতি কবিতাতেই তার আনন্দ খুঁজে পায়, পেয়েছে। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিগণ অসাধারণ কাব্যগুণ সমৃদধ ধর্ম-সঙ্গীত লিখেছেন; যে নামেই ডাকুন না কেন, সে সব কবিতা প্রেমের কবিতা ছাড়া কিছু নয়। মনমনসিংহ গীতিকার মধ্যে বাংলার আকাশ বাতাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কাহিনী বর্জিত, বিশেষ মুহূর্তের অনুভবকে শব্দে বাজিয়ে দেওয়াই গীতি কবিতা। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় অনুভব আর তাকে ব্যঞ্জনাগর্ভ ক'রে প্রকাশই গীতি কবিতা। এই কবিতা লিখেই রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গীতি কবিদের একজন বলে গৃহীত হয়েছেন।

উনিশতকের গীতি কবিতা ধর্মীয় ভাব বর্জন ক'রে, মানুষের আবেগ অনুভূতিকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। ব্যক্তির নিজস্ব আবেগ, অনুভব ও কল্পনার গভীর প্রকাশ এই সময় থেকে শুরু হয়, অবশ্যই এরকম ব্যক্তিত্ব-নির্ভর গীতি কবিতার সূচনা বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেছিলেন শ্রী মধুসূদন।

কিন্তু, তাঁর বিশেষ প্রবণতা 'মহাকাব্য' রচনার দিকে ছিলো, ছিলো পত্রকাব্য, সনেট রচনায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেনও মহাকাব্য রচনায় বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। তবে, খণ্ড কবিতা রচনা ক'রে তাদের ভিতরের আবেগ, অনুভবকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তী; মহাকাব্য চরচনায় না গিয়ে

সম্পূর্ণভাবে গীতিকবিতা রচনার আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এবং এই পথে তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছিলো, আর তিনি যে পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই পথ ধরে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছে ছিলেন। গীতি কবিতা তাঁর হাতে চরম সিদ্ধি লাভ করেছিলো। তাই, তিনি বিহারীলালকে গুরু বলে সম্মান প্রদর্শন করেন।

'গীতি কবিতা'র কবি রূপেই তাঁর আবির্ভাব, তাঁর হাতে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন ও প্রসারের পথ খুলে যায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম, পিতা দীননাথ চক্রবর্তী। অতি অল্প বয়সে বিহারীলাল মাতৃহীন হন।

আমরা যাকে এ্যাকাডেমিক শিক্ষা বলি, তার সুযোগ তেমন পান নি তিনি, তবে কিছুদিন জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্‌টিটিউসানে তিনি যাতায়াত করেছেন, কিছুদিন সংস্কৃত কলেজেও পড়েছিলেন।

তিনি যে গীতিকবি রূপে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে, তার অঙ্কুর অবশ্য উন্মোচিত হয়েছিলো ছেলেবেলার সংগীত প্রীতির মধ্যে, গান ভালোবাসতেন ''যাত্রা পাঁচালী বা কবির গানের কথা শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীত-শ্রবণসাধ পরিতৃপ্ত করিতেন।'

(সাহিত্য সাধক চরিতমালা)

তাছাড়া কিছু ইংরেজী ভাষার চর্চা তিনি করেছিলেন, আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গভীর ভাবে পড়েছিলেন। সব কিছু তাঁর কবিচিত্তের ভিত্ তৈরী করে দিয়েছিলো।

কবির ব্যক্তিগত জীবনে, প্রথম স্ত্রীর অকাল প্রয়ান, এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। মানুষ হিসেবে উদার, বন্ধুবৎসল, আবেগ প্রবণ ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় শোকে মুহ্যমান হয়ে যে শোকোচ্ছ্বাস কবিতা লেখেন 'বহুবিয়োগ' গ্রন্থে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন বেশ কয়েকটি। প্রথমে 'পূর্ণিমা' ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৬৩ তে 'সংক্রান্তি'; ঐ বছরই 'অবোধবন্ধু' নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন বিহারীলাল। তাঁর বহুপরিচিত নিসর্গ সন্দর্শন। বঙ্গসুন্দরী, সুরবালা এই 'অবোধবিন্দুতেই' প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছে ঃ বঙ্গদর্শন'কে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্দুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

তাছাড়া, অবোধবন্ধুত্বেই রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন বিহারীলালের কবিতা, যা তাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলো। আর এই পথেই তাঁর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম যে গীতিকবিতার আঙ্গিক, তা আবিষ্কার করেছিলেন।

তাঁর প্রথম বই ১৮৫৮তে বেরুলো 'স্বপ্নদর্শন'। ১৮৬২তে 'সঙ্গীতশতক' ১৮৭০-এ বঙ্গসুন্দরী, ১৮৭০-নিসর্গ সন্দর্শন; ১৮৭০-এ বন্ধুবিয়োগ প্রকাশিত হয়েছিলো। 'প্রেম প্রবাহিনী' ঐ ১৮৭০-এ বেরুলো। ১৮৭৯-এ সারদামঙ্গল, এরকরেও বেরিয়েছে সাধের আসন, বাউল বিংশতি।

লেখার সময়কাল ১৮৫৮ থেকে ৮৬, এই ২৮ বছরকাল।

সেকালের পাঠক মুগ্ধ ছিলো মহাকাব্য এবং আখ্যানকাব্যের রসে; গীতিকবিতার পাঠক তখনো তৈরী হয়নি। তিনি একান্তে বসে, খ্যাতি-সুখ্যাতির দিকে না তাকিয়ে একটির পর একটি রহস্য, দর্শন, ব্যঞ্জনাধর্মী

গীতি কবিতা লিখেছিলেন। তিনি তাঁর কবি চরিত্রের অনুকূল নীতিধর্ম অনুযায়ী আত্মমগ্ন গীতি কবিতা লিখে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর বিশিষ্টতা ও ক্ষমতা অনুভব করতে পেরেচিলেন তবে রবীন্দ্রনাথই তাঁর যোগ্য উত্তরসুরি। এই মহান প্রতিভার স্পর্শে গীতি কবিতা সমুদ্রের বিশালতা ও গভীরতার বোধহস্তে পেরেছিলো।

'স্বপ্নদর্শন' একটি গদ্য বূপক কাব্য। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবস্থায় তিনি বইটি রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। 'সঙ্গীত শতক'-এ তাঁর কবি মনের প্রবণতা ধরা পড়েছে সেই ১৮৬২তেই।

প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতিরমণী সনে।

যাহার লাবণ্যছটা মোহিত করেছে মনে।

তাঁর আগে প্রকৃতি বাংলা কবিতায় পটভূমি গড়ে তোলার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রেমের উদ্দীপনবিভাব রূপেও কাজ করেছে। তাঁর যে স্বতন্ত্র মহিমা আছে, অবস্থান আছে, বিহারীলালই সেই ভাবনাকে কবিতায় প্রতিষ্ঠা দিলেন। লিখলেন **'নিসর্গ সন্দশান'**। এই নিসর্গ বা প্রকৃতি কবির মনে আনন্দ বিষাদের নানা আলোছায়া সৃষ্টি করেছে; জীবন্ত প্রকৃতির রূপ চোখের তৃপ্তি এনে দেয়, শান্তি ও আনন্দ এনে দেয়। তাকে কেন্দ্র করে বিহারীলাল আলোড়িত হয়েছেন। যেমন সমুদ্রকে দেখে প্রচণ্ড বিস্ময় জাগলো তাঁর মনে, জাগলো নানা অনুভূতি, কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে গভীর ভাব প্রকাশের উপযুক্ত রূপ গড়ে তুলতে অবশ্য পারেন নি। ঢেউ-এর উপরে দুলতে থাকা জাহাজগুলোকে দেখে তার বিস্ময় এভাবে প্রকাশ পেয়েছেক্ত

হাসিমুখী পরীসব আলুথালু বৈণী
নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায়।

তবে কবিতায় ছবি আঁকায় দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেনক্ত

একি এ প্রকারড কাণ্ড সম্মুখে আমার!
অসীম আকাশপ্রায় নীল জলরাশি;
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার,
মুহূর্তকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি।

'বহুবিয়োগ' তার খণ্ড কাব্য। 'পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্র নামে চারিজন বন্ধুর এবং প্রাথমাপত্নীর বিয়োগ-ব্যথা 'বন্ধু বিয়োগে' আত্মপ্রকাশ করেছে।'

সে হিসেবে বাংলার প্রথম শোককাব্য বলা যেতে পারে। এই সব বন্ধু ও প্রাথমাপত্নীর সঙ্গে নানা সম্পর্কের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত, স্মৃতি কবিতাগুলিতে রা পড়েছে।

'প্রেম প্রবাহিনী', প্রথমে তাঁর সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় ছাপা হয়, পরে গ্রন্থকারে বেরোয়।

এখানে কবির প্রথম প্রেমের অনুরাগ, আবেগ, উচ্ছাস অনুত্তেজক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই কবিতায় ধরা পড়েছে প্রেমের অলৌকিক ভাবনা, অথবা নারীর শরীর নয়, সুধ্ব প্রেমের অনুসন্ধান করেছেন।

জগতে সকলি ফাঁকি, সব অনিশ্চয়

প্রেম বল, সুখ বল, কিছু কিছু নয়।

এরকম দীর্ঘশ্বাসও রয়েছেন; আবার এই কাব্যে এই ভাবনারও পৌঁছেছেন কবি

মধুময়, সুধাময়, শান্তি সুখময়।

'বঙ্গসুন্দরী' বেরুলো ১৮৭০-এ। সংসারের চার দেয়ালে আবন্ধ থেকেও নারীর নানা আচরণ অবস্থান, যেমন কখনো মা, কখনো মেয়ে, কখনো বোন, কখনো কন্যা রূপ থাকি কাছে স্বর্গীয় সৌন্দর্য ও আনন্দরূপে দেখা দেয়। নারী সত্তার এই বিচিত্র অন্তর্গত ও ব্যবহারিক দিকগুলো তার কবিতায় সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। তিনি এই কাব্যে মায়ের যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বাঙালির অতিপরিচিত স্নেহকাতরা মাতৃরূপ। পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থ 'সারদা মঙ্গল' এবং 'সাধের আসন' কাব্যে এই ভাবনারই পরিণত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।

'সারদামঙ্গল' বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন ''মৈত্রীবিরহ, প্রীতি বিরহ ও সরস্বতী বিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ' হয়ে এই কাব্য রচনা করেনি। ''দেবী সরস্বতীর সহিত প্রেম মিলন ও বিরহের ভাবোদ্যোতক কবিতা নিয়ে কাব্যখানি অপূর্ব সুষমা মন্ডিত।'' (সাহিত্য সাধক চরিত মালা)

দেবী সরস্বতী মূল কেন্দ্রে রয়েছেন। তার সঙ্গেই কবির প্রেম, মিলন, বিরহের নানা ভাবের সংমিশ্রণে লিখছেন দীর্ঘ কাব্যটি। তবে, ভাবের পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে।

সরস্বতী বিদ্যাদায়িনী দেবী; বিহারীলালের নতুনত্ব হলো, তিনি তাকে প্রেমিকারূপে ভাবছেন। ডঃ সুকুমার সেন এই কাব্যের মূল সুর নির্ণয় করেছেন ঃ দেবী সারদার সঙ্গে কবির বিরহ-মিলনের সম্পর্কই এ কাব্যের মূল সুর। ভারতবর্ষে বৈদিক, পৌরানিক ও মধ্যযুগে, জৈন ও বৌদ্ধ তত্ত্বে সরস্বতীকে জননীরূপেই বন্দনা করা হয়েছে। কিন্তু বিহারীলালের কবি সৃষ্টি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের।''

সরস্বতীর সঙ্গে বিরহ মিলনের কথা রয়েছে এখানে এই কাব্যে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন কোনো উদ্দেশ্য প্রচারের জন্যে এ কাব্য লেখেন নি, কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করারও এ কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। অনুভব, তার স্বতোৎসারিত প্রকাশ; ব্যক্তিমনের প্রেম বিরহ আর্তি, সরস্বতীর বা সারদার তিনটি মূর্তি ধ্যানে অনুভব করে, গাইলেন এক রাতে; উদ্ভাসিত হলো সরস্বতীর তিনরূপ। আর তাতে স্পষ্ট কোনো কাহিনী রইলো না। তবে, ভাবের একটা শৃংখলা ধরা পড়লো। এই বইটিতে এমন একটা সুর বেজে উঠলো যা সম্পূর্ণ সাবজেক্টিভ, মন্ময়, আর তা বাংলা ভাষায় নতুন বলে স্বীকৃতি পেলো। রবীন্দরনাথের কথায় 'সারদা মঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না।'' পাঁচটি সর্গে বিভক্ত এই কাব্য। সূচনায় এই অংশটি রয়েছে, যেখানে গীতিকাব্যের নিশ্চিত চরিত্র ধরা পড়েছে।

নয়ন-অমৃত রাশি প্রেরণা আমার।
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার।
মধুর মুরতি তব

ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জানে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।

কবি সারদাকে কখনে বিশ্বসৌন্দর্যের আকর রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, কখনো তার বিরহে কাতর হয়ে বলছেন—

হে সারদে দাও দেখা!
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ কাতর হৃদয়।

আবার বিরহের শেষে তাঁর সঙ্গে মিলন হলে আনন্দের প্লাবন জেগেছে মনে—

আহা কি ফুটিল হাসি
বড় আমি ভালবাসি

এই সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'গো-মুখ' বিহারীলালের কবিতা, বিশেষ করে 'সারদা মঙ্গল'; কবি সেই উৎস থেকে নির্মল জল স্রোতকে সমতলে সহস্র ধারায় খুলে দিয়েছেন। একারণে 'গীতিকবিতার' ভোরের পাখি বলে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের আবির্ভাবকে চিহ্নিত করেছেন।

'সাধের আসন' রচনার ইতিহাস এরকম ''জোড়া সাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের পত্নী তাহাকে স্বহস্ত রচিত একখানি আসন উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বিহারী 'সাধের আসন' লিখেন।

বিহারীলালের বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতি কথায় একথা বলেছেন (সাহিত্য সাধন রচিত মালা)

আসলে জ্যেতিরিন্দ্র নাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ছিলেন বিহারীলালের ভক্ত পাঠিকা। 'সারদা মঙ্গল' কাব্যের গভীর তাৎপর্য তিনি অনুভব করেছিলে, ঐ কাব্যের গূঢ় কথা তিনি জানতে চেয়ে একটি আসনে তা লিখে কবিকে উপহার দেন। কাদম্বরী দেবীর অকস্মাৎ মৃত্যু হলে, পরে কবি সে কথা স্মরণ করে লেখেন সাধের আসন।

বিহারীলাল বাংলা কবিতার বিশেষ এবং জনপ্রিয় একটি দিক, গীতি কবিতা, লিরিকের প্রথম যুগের প্রবর্তক ও শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি, কাহিনীবর্জিত, আবেগ, বাহিত সৌন্দর্য সৃষ্টির কবি; হয়তো ভাষায় আছে দুর্বলতা উপমা, উৎশেষ্টা ইত্যাদি অলৎকার মধুসূদনের মতন যথোচিত ও সুন্দর হয়নি তার কাব্যে, তবু তিনি ভাবে ভোলা আত্মমগ্ন কবি, বাংলা লিরিকের প্রবর্তক রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৪.৬ কায়কোবাদ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ১৮৫৭ (১৮৫৮?) খ্রীষ্টাব্দে কবি কায়কোবাদের জন্ম। তাঁর মৃত্যু, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের বছরে তার জন্ম, আর ৯৬ বছর তাঁর আয়ুস্কাল। জীবিত কালেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর আসল নাম ছিলো কাজেম আলী কোরেশী। ঢাকা জেলায় নবাবগঞ্জের আগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কায়কোবাদ। কলিকাতা মাদ্রাসা'য় এবং ঢাকায় পড়াশুনো। অবশেষে পোষ্টমাস্টারের চাকুরি গ্রহণ। কবি হিসেবে তাঁর পদার্পণ বিরহ বিলাপ (১৮৭০) কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে।

মুসলমান লেখকদের মধ্যে, মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) একজন সার্থক লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' বর্ণনার দক্ষতায়, দরদে ও রচনা নৈপুন্যে একটি শাশ্বত কালের সাহিত্য রূপে গণ্য হয়েছে। আরও কয়েকজন মুসলিম লেখক অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কায়কোবাদ এই লেখকদের মধ্যে ক্ষমতায় জনপ্রিয়তায় প্রায় শীর্ষে উঠেছিলেন।

'বিরহ বিলাপ' গীতি কবিতা গ্রন্থ। বিশুদ্ধ গীতিকবিতার সংগ্রহ, যা তাঁকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য ধারার লেখক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেনের ধারায় মহাকাব্য লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯০৪-এ প্রকাশিত "মহাশ্মশান" তাঁর বিরাট আয়তনের মহাকাব্য। এর বিষয়বস্তু হলো পানিপথের তৃতীয়যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় এবং আহ্মদ শাহ আবদালির বিজয়।

এই মহাকাব্য লিখে তিনি সেকালের অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবীর বিষনজরে পড়েন। লিখেছেন ঃ 'পানিপথ য়েমন হিন্দু গৌরবের সমাধিক্ষেত্রে, অপরপক্ষে মুসলমান গৌরবের মহাশ্মশান।' 'কাব্যটি একই ছন্দে রচিত এওঔবং ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত হলেও প্রণয় আখ্যানও এর অন্যতম প্রধান কাহিনী।' ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু লেখকেরা সে সময়ে তাচ্ছিল্য করে বলতেন য়ে মুসলমানরা বাংলা লিখতে জানে না। তিনি লিখেছেন ঃ "মুসলমানের বাঙালা ভাষায় দখল আছে কিনা, মুসলমান বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষা লিখিতে জানে কিনা তাহা দেখাইবার জন্যই আমি বিশুদ্ধ 'বাঙ্গালা' ভাষায় কাব্য লিখিতে আরম্ভ করি।"

হিন্দু মুসলমানের বিভেদে কারকোবাদ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলতেন সে ঈশ্বর হিন্দু-মুসলমানের ভেদ সৃষ্টি করেননি, হিন্দু মুসলমান ভারতের একজাতির দু'ভাই।

এস ভাই হিন্দু এস মুসলমান
আমরা দুইভাই ভারতসন্তান
এস আজি সবে হয়ে এক প্রাণ
সেবিতে মায়ের চরণ দুটি।
(অমিয় ধারায়)।

এ যেন কবি নজরুলের সেই অপূর্ব অনুভবজনিত উচ্চারণের উৎস 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।'

এক বঙ্গভাষা আমাদের বুলি।

মাও যে মোদের একই জন (হিন্দু মুসলমান)— তাঁর কবিতার মধ্যে এই জাতিভেদ-জীবাণু-মুক্ত এক সুন্দর কবি মনের প্রকাশ দেখে সেকালের হিন্দু পাঠকেরা। তাকে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর অশ্রুমালা পরে মুসলমান কবির এই সুন্দর বলিষ্ঠ রচনা সম্পর্কে লিখেছিলেন ‘মুসলমান যে বাঙালাভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙালা কবতার উপর এরূপ অধিকার আছে।’’

বিশশতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কারকোবাদ জীবিত ছিলেন তাঁর গ্রন্থ হলো— (১) বিরহবিলাপ (১৮৭০); কুসুমকানন (১৮৭৩); অশ্রুমালা (১৮৯৬); মহাশ্মশান (১৯০৫) শিবমন্দির (১৯২২); অমিয়ধারা (১৯২৩) মহম্মদশরিফ বা আত্ম বিসর্জন কাব্য (১৯৩০); শ্মশান ভস্ম (১৯৩৮)।

মৃত্যুর পরে কয়েকটি কাব্য গ্রন্থ বেরিয়েছিলো। ১৯৫২ সালে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর জীবন কেটেছে সামান্য টাকা বেতনের গ্রামের পোষ্ট অফিসে পোষ্ট মাস্টারী করে। শেষ বয়সে বন্ধু ডঃ মুইন্মদ শহীফুল্লাহর প্রচেষ্টায় তিনি সামান্য অর্থসাহায্য পেয়ে ছিলেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ লিখেছিলেন।

তোমারি চেষ্টায় বন্ধু পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট
মঞ্জুর করেছে মাসে
পঁচাত্তর টাকা।

রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি হলেও কায়কোবাদের কবিতা রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত। তিনি হেম-নবীনের ঘরানার কবি। তাঁর কবিতার শিল্পগুণও তেমন উৎকৃষ্ট নয়, তবু হিন্দুমুসলমান ভেদ মুক্ত মানব দরদী কবি হিসেবে তাঁর গুরুত্ব অসীম।

তাঁর মহাশ্মশান কাব্যের গঠনভঙ্গী হেম নবীনের অনুসারী হলেও চেতনায়, মহাকাব্যিক উদাত্ততা রয়েছে।

সুগভীর তমস্বিনী, সুনীল গগনে

অসংখ্য তারকারাজি শোভিছে সুন্দর

হৈমবেশে, য়েন নীল পয়োটির জলে

ভাসিছে কনকপদ্ম, অথবা ত্রিদিবে

উজ্জ্বল প্রদীপ রাজি জ্বলিছে সুন্দর

ঘরে ঘরে স্ফটিকের স্বচ্ছ দীপাধারে

দ্বন্দ,-শব্দ চয়ন, গাম্ভীর্য় সৃষ্টির দক্ষতা, বর্ণনার সুন্দর স্বচ্ছতা কায়কোবাদকে এঔঔকজন প্রকৃত কবি মর্য়াদা দিয়েছে।

৪.৭ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে ইন্দ্রনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায় ''বাঙালার প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস'' (১৮৭৪) কল্পতরু প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসময়েই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের সিদ্ধিলাভ। কিন্তু আরম্ভেরও আরম্ভ থাকে। সেদিক থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেছে বলা চলে। কিন্তু, উপন্যাস হলো এঔঔকালের গদ্যে লিখিত মহাকাব্য। এই আঙ্গিকে জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপটাকেই ধরা য়ায়। উপরিতলের ঘটনা, ব্যক্তিমনের নানা টানা পোড়েন, বহুমানুষের সম্পর্ক ও কর্মকাণ্ড, কিংবা একক ব্যক্তিত্বের মনের গূঢ় রহস্য, দ্বন্দ্ব, আশা আকাঙ্খা, সংলতা ব্যর্থতা, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন এই উপন্যাসের উপস্থাপনা, বর্ণন ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব, কারণ উপন্যাস বর্ণনাত্মক শিল্প, কাহিনী আশ্রয়ী আর চরিত্র প্রভাস। এর আয়তনও দীর্ঘ, দীর্ঘতর হয়ে থাকে।

বঙ্কিম চন্দ্রের হাতে বাংলায় পূর্ণায়ত উপন্যাসের সৃষ্টি, এবং সার্থকতায় উত্তরণ ঘটলো। তার আগে নক্‌শা জাতীয় লেখায় সমকালের নানা ঘটনা ও চরিত্র উঠে এঔঔসেছে কারো কারো লেখায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র এই নক্‌শা জাতীয় রচনায় উত্তীর্ণ শিল্পী। আর এই ধারায় ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন ইন্দ্রনাথ।

তাঁর 'আত্মকথা' থেকে জানা য়াচ্ছে ১৭৭১ শকাব্দে বর্ধমান জেলায় পাণ্ডুগ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি তাঁর পিতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মস্থল বিহারের পূর্ণিয়ায় ছিলেন ছেলেবেলায়। পিতার মৃত্যুর পর চলে আসেন কৃষ্ণনগরে, সেখানে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হন, পড়া শেষ করতে পারেননি। এনট্রান্স পাশ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে তাঁর পরিচয় হয়েছিলো কলকাতার সঙ্গে। বি. এ পাশ করলেন ১৮৬৯-এ। তাঁর নিজের কথায়, ''আমার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে স্থূল কথা এই য়ে আমি অল্পই পড়িয়াছি।.......আর এক কথা এই য়ে আমার পড়াবিদ্যা অপেক্ষা কুড়ান বিদ্যা বেশি। আমি কুড়াইয়া বহুবিদ্যা লাভ করিয়াছি।

পিতার মতই ইন্দ্রনাথ ওকালতি করেছেন অর্থ উপার্জনের জন্যে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ইচ্ছে জাগলো একটি নোটবই ছাপাতে গিয়ে। প্রেসে একখানা নাটক ছাপা হচ্ছিলো তখন। ঐ নাটক দেখেই ব্যঙ্গ করবার ইচ্ছে জাগলো, লিখলেন 'উৎকৃষ্ট কাব্য'। এটিই তাঁর satire জাতীয় প্রথম রচনা, ১৮৭০-এঔঔ প্রকাশিত, ছন্দে লেখা বই।

'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হলে তিনি ইন্দ্রনাথকে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার জন্যে লেখা চান। সেই অনুরোধে তিনি লেখেন 'কল্পতরু'। প্রকাশিত হলো ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। 'লনব্য হিন্দুত্ব-এর পক্ষ থেকে বিশেষ করে ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধেই Satire এর আঘাত রচনা করেছিলেন ইন্দ্র।'' (ভূদেব চৌধুরী।)

'বঙ্গদর্শন' পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 'কল্পতরু'র প্রশংসা করেছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার য়োগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্য চরিত্রের বহুদর্শিতায় লিপিচাতুর্য্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দুক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার য়ে লিপি কৌশল, সে রচনাচাতুর্য তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাইক্তসে বাক্‌শক্তি নাই।

দীনবন্ধু মিত্রও স্বীকার করেছেন ''কল্পতরু'' বঙ্গভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

বাংলার রঙ্গরসের, হাস্য কৌতুকের কবিতার বা রচনার ধারায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারায় ইন্দ্রনাথ যথেষ্ট দক্ষ লেখক। তখন পর্য্যন্ত সিরিয়াস কবিতা ও গদ্যের ধারা প্রচলিত এবং গড়ে উঠেছে। ইন্দ্রনাথের ভাষায় ''আমি Satire টাকে ব্যঙ্গ করে উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিসলম। ফরাসী Satirest দিগের বই পড়িয়া আমার এই সাধটা হইয়াছিল।''

'ভারত উদ্ধার' তাঁর খণ্ড কাব্য, ১৮৭৮ এ প্রকাশিত। এই কাব্যটিও ইন্দ্রনাথের হাস্যরস রসিকতার দৃষ্টান্ত। সেকালের 'ভারতী পত্রিকা' লিখেছিলো : ''এই হাস্য রস উদ্দীপক মহাকাব্য খানি পাঠ করিতে করিতে আমরা গ্রন্থকর্তাকে শতশত সাধুবাদ দিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ সরস গ্রন্থ আমরা অনেকদিন পাঠ করি নাই এবং বোধ হয় এরূপ বিদ্রপাত্মক কাব্য (Satire) আর নাই।''

কাব্যের বিষয় সম্বন্ধে ঐ আলোচনায় বলা হয়েছে : ভারতের স্বাধীনতাপ্রিয় বঙ্গ-যুবক কর্তৃক কিরূপে ''পাষণ্ড ইংরাজ'' ''বাটায়িত' নিরস্ত্র ও পরাস্ত হইবে তাহাই গ্রন্থকার ভবিষ্যৎবক্তা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।''

কমল-আসনে বসি, বীণা করি করে
কেমনে ইংরাজ-অরি দুর্দান্ত বাঙ্গালী
ত্যজিয়া বিলাস ভোগ, চাকুরীর মায়া
টানা-পাখা, বাঁধা-হুঁকো, তাকিয়ায় ঠেস
উৎসৃজি সে মহারতে। সাপাটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল কোঁচা,
ভারতের নির্বাপিত গৌরব প্রদীপ,
তৈলহীন, সলতেহীন, আভাহীন এবে
উহা লাইয়া পূনর্ব্বার উজ্জ্বলিয়া মহী।

বোঝা যাচ্ছে, সেকালের বাঙালীর ভারত প্রেম, বা দেশ প্রেমকে বিদ্রূপ, কশাঘাত করছেন ইন্দ্রনাথ এবং সফল ভাবে তার প্রকাশ ঘটেছে এখানে। ডঃ সুকুমার সেন এ বই সম্পর্কে লিখেছেন; ভারত উদ্ধার কাব্যে তখনকার দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের হাস্যজনক দিকটা বেশ ফুটিয়াছে।

'পঞ্চানন্দ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো রস-প্রধান সাহিত্য। অনেক চুটকি বেরিয়েছিলো পঞ্চানন্দ সম্পাদিত এই পত্রিকায়। ইন্দ্রনাথের এওঔই সব লেখা 'পাঁচুঠাকুর' এবং পঞ্চানন্দ নামে বই আকারে বেরোয়। এই লেখাগুলো সম্পর্কে লেখক বলেছেন, ''রহস্য এওঔবং রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারিনা। তবে রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই। এই চুটকির দৃষ্টান্ত :

'অমৃতবাজারের বাজার খরচার পয়সা জোটা ভার হইল। কিন্তু মতিভায়া (মতিলাল ঘোষ) ফিকিরবাজ লোক, বেকার থাকিবেন কেন? মাথাত একরকম মুড়নোই ছিল। একটু বেশী করিয়া মুড়াইলেন।

এছাড়া ''ক্ষুদিরাম'' খাজনার আইন, 'জাতিভেদ' প্রভৃতি আরো কয়েকটি রচনা রয়েছে ইন্দ্রনাথের। বাংলা

সাহিত্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে রঙ্গব্যাঙ্গের রচনা প্রবর্তনায়। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে ইন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়াছেন।"

৪.৮ গোবিন্দচন্দ্র দাস

ভাওয়ালের, [এখনকার বাংলা দেশের অন্তর্গত] গোবিন্দ দাস 'স্বভাব কবি নামে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। সারাটা জীবন দুর্ভাগ্যবহন করে কাটাতে হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন, খুব স্বাধীনচেতা, মিথ্যের সঙ্গে আপোষ করে চলতে পারতেন না, ছিলেন দেশপ্রেমিক।

স্বভাব কবি খেতাবটি তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে গেছে। এর কারণ হয়েতো, স্বভাবেই তিনি ছিলেন কবি; শিক্ষার দ্বারা নাগরিক বুদ্ধি ও পরিমার্জনা দিয়ে স্বভাবকে বাঁধতে পারেন নি।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্ম। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর ছয়েকের বড়ো ছিলেন বয়সে। সারাজীবন দুঃখকষ্টে কেটেছে, তাতে তিনি মনের দিক থেকে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, তাছাড়া তাঁর সত্যবাদিতা, স্বাধীন চিত্ততার জন্যে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। এমন কি য়ে ভাওয়ালকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়েছিলেন ভাওয়ালের রাজার বিরাগভাজন হয়ে। পরে অবশ্য আবার দেশে ফিরে এসেছিলেন।

তাছাড়া দেশের মানুষ তাঁর কবিপ্রতিভার সমাদর করেনি তাঁর জীবিত কালে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য়ে ভরা ভাওয়ালে তাঁর জন্ম, অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ, ফলে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মুখোমুখি হলো তাঁর পরিবার ভাওয়ালের ভূস্বামী কালীনারায়ণ রায়ের আনুকূল্যে কিছু মাসিক বৃত্তির সাহায্য পেলো এই দাস পরিবার। গোবিন্দচন্দ্রের জীবন জড়িয়ে পড়লো রাজ পরিবারের সঙ্গে। সেখানে মহারানীর স্নেহে কিছু পড়াশুনো করলেন। আবার রাজ কন্যার বন্ধুত্ব পেলেন। কিন্তু রাজকর্মচারীর ষড়য়ন্ত্রে পড়লেন রাজরোষে। দেওে ছাড়তে হয়েছিলো এই রাজরোষের ফলে। সে দীর্ঘ ইতিহাস। দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্যে নানা চাকুরী নিয়েছেন, ছিলেন অস্থির মনের বেশিদিন কোথাও থাকতে পারেননি। স্কুলের পড়াশুনোও তেমন হয়নি। ইংরেজি ভাষায় অধিকার ছিলো না, যা তাঁর সমসময়ের লেখকদের আয়ত্তে এসেছিলো। ইউরোপীয় সাহিত্যর সংস্পর্শে এসে সেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধের লেখকেরা নতুন বোধে, বিশ্বাসে, নতুন আঙ্গিকে নিজেদের সমৃধ্ব করেছেন। গোবিন্দচন্দ্র তা করেননি। ফলত তার কবিতা স্বভাব কবিত্বের সীমা পার হতে পারেনি।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন : "সমসাময়িক ও ঈষৎ পূর্বগ কবিদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্ট। গোবিন্দ চন্দ্রের প্রতিভায় দীপ্তি ছিল, অনুভূতিতে প্রগাঢ়তা ছিল, অভিজ্ঞতায় দুঃখদহনের প্রগাঢ়তা ছিল, কিন্তু কাব্যকলায় সব সময় ভাবের সংয়ম এবং ভাষার বাঁধুনি ছিল না।"

কালীপ্রসন্ন নামক ভাওয়ালের রাজকর্মচারীর অত্যাচারের প্রতিবাদ করে বিপাকে পড়েন গোবিন্দদাস, ছাড়তে

হয় চাকুরী। তিনি ভাওয়ালকে প্রাণের চাইতে ভালোবাসতেন, দেশের প্রজাদের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেননি বলেই প্রতিবাদ করেন। প্রজাদের সংঘবদ্ধ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখান তিনি। এসব কারণে দুর্দশা আসতে থাকে একটার পর একটা। পারিবারিক বিপর্যয়ও তাঁকে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে মারে। স্ত্রীকে হারালেন, যাকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন, হারালেন সহোদর ভাইকে। একদা বন্ধু, ভাওয়ালের রাজপুত্র, তখন রাজা, তিনি ভালোবাসতেন কবিকে, তাঁর ধারণা হলো 'নবযুগ' পত্রিকায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও কালী প্রসন্ন ঘোষের বিরুদ্দে নিন্দাসূচক য়ে প্রবাদ ছাপা হয়েছে তা লিখেছেন গোবিন্দ দাস। রাজা তাকে ভাওয়াল থেকে নির্বাসন দিলেন অন্যায় ভাবে। তিনি অন্যায় মেনে নিলেন না। লিখলেন 'মগের মুল্লুক'।

'মগের মুল্লুক' পাঁচ দিনে লিখেছিলেন, ছাপা হয়েছিলো 'প্রকৃতি' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায়, ১৮৯২ তে থেকে ধারাবাহিক ভাবে। তাঁর এই লেখায় ''ভাওয়ালের প্রজাদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার উৎপীড়নের বহু গোপন কাহিনী ইহাতে পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিন হইল। রাজ্যের হোমরা-চোমরাদের তিনি কঠোর ব্যঙ্গ বিদ্রুপের কষাঘাতে জর্জরিত করিলেন, তাহাদের মুখোশ খসিয়া পড়িল (সাহিত্য সঠিক চরিতমালা)।

এওঔই প্রতিবাদী কাব্য সাধারণের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। সমসময়ে তিনি ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকারী রূপেও ব্যাস্তাত হন। দৃষ্টান্ত :

বঙ্গদেশে আছে একটি 'স্বর্গপুর গ্রাম,
গাছ গাছলায় ভরা তাহা নবীন ঘনশ্যাম!
রাঙা মাটি, পলাকাটী খাঁটি সোনার মত,
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে য়ায় মৈনাক শত শত।

তাঁর গ্রন্থগুলি হলো প্রসূন (১৮৭০); প্রেম ও ফুল (১৮৮৮) কুঙ্কুম (১৮৯২); মগের মুল্লুক (ব্যঙ্ককাব্য) ১৮৯৩; কস্তুরী (১৮৯৫); চন্দন (১৮৯৬); ফুলরেণু (সনেট) (১৮৯৬) বৈজয়ন্তী (১৯০৫); শোক ও সান্ত্বনা (১৯০৯) শোকোন্ধাস (১৯০৮)। এওঔছাড়া আরো অনেক অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্যঙ্গকাব্য ও শোক কাব্য, সনেট ছাড়া বেশির ভাগই হলো গীতি কবিতা।

তাঁর কবিত্বশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো। দেশকে ভালোবাসা, দেশের প্রকৃতিকে, সাধারণ মানুষকে ভালোবাসা ছিলো তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য।

য়েমন 'স্বদেশ' কবিতার অংশ বিশেষক্ত
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে' এদেশ তোমার নয়,—
এই য়মুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত য়দি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়'
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি মণি,

সাগর ছেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়।

'দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাস'— নয়, বাংলার প্রেমের কবিতায় তিনিই প্রথম দেহাশ্রিত প্রেমভাবনাকে স্থান দিয়েছেন সাহসিকতার সঙ্গে

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমিও নারীর রূপে
আমিও মাংসের স্তূপে
কামনার কামনীয় কেলি-কালীদহ
ও কর্দমে এই পঙ্কে,
অই ক্লেদে ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ!
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

বলিষ্ঠ দেহচেতনার, পৌরুষদীপ্ত প্রতিবাদের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস অন্তিম সময়ে কিছু আর্থিক সাহায্যের পৃষ্ঠপোষণা লাভ করে, কিছু স্বস্তি অনুভব করে, ১৩২৫ সালে মৃত্যু পথয়াত্রী হলেন। বাংলা কবিতার জগতে তিনি তাঁর য়োগ্য সমাদর লাভ করেননি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি বিস্মৃত হননি, সেকথাও সত্য।

৪.৯ দেবেন্দ্রনাথ সেন

বিহারীলাল চক্রবর্তীর আত্মতন্ময় গীতিকবিতার ধারায় প্রত্যক্ষভাবে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। বিহারী লালের কবিতায় আবেগের বাঁধভাঙ্গা রূপ আমরা দেখেছি। তিনি নিজেই লিখেছেন— কেবল হৃদয়ে দেখি দেখাইতে পারিনে।' শুধু নিজে মানসচোখে দেখলেই তো হবে না, রূপে রসে তাকে সৃষ্টির প্রত্যক্ষ রূপ দিতে হয় কবিকে। কবিতায় তো শুধু ভাব বা অনুভবই থাকে না, অন্তরের অনুভবকে শব্দে ধরে রাখতে হয়, আর এইখানেই কবির রূপ নির্মাণ দক্ষতার প্রশ্ন আসছে। বিহারীলাল সচেতনভাবে এই রূপ নির্মাণে তেমন দক্ষতা দেখয়ে পারেননি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে গীতি সুষমাময় কবিতার প্রেরণা নিয়ে সে কাজ করলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁকে নব্য রোমান্টিকদের অগ্রণী বলেছেন। তিনি দেখেছেন, দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় মাইকেলের স্টাইল সচেতনতা ও বিহারীলালের আত্মহার ভাব রীতির মিশ্রণ।

দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় সৌন্দর্য, প্রেমানুভব কেন্দ্রীয় ভাবনা। তাঁর স্বতস্ফূর্ত আনন্দময় আবেগকে তিনি সংয়ত শিল্প দক্ষতায় প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর কবিতার জগৎ কখনো সম্প্রসারিত হয়েছে বাৎসল্যভাবে, কখনো বৈষ্ণব ভক্তিরসে, কখনো নিপীড়িত, শোসিত মানুষের প্রতি গভীর দরদে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোধ্যায়, তাঁর সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় লিখেছেন ''আনুমানিক ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশের গাজিপুরে এক সমভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। গাজিপুরে তাঁর জন্ম, কিন্তু আদিনিবাস হুগলীজেলার বলাগড় গ্রামে।

দেখা যাচ্ছে ছাত্র জীবনে তিনি কৃতী, ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করে ওকালতিতে য়োগ দেন; তাঁর কর্মস্থান ছিলো এলাহাবাদ।

ছেলেবেলা থেকেই দেবেন্দ্রনাথের কবিতাচর্চা আরম্ভ ১৮৮০-৮১তে গাজিপুরে থাকার সময়ে তিনটি ছোট কবিতার বই প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঊর্ম্মিলা কাব্যের প্রশংসাও করেছেন। তাঁদের দুজনার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো গাজীপুরে থাকার সময়।

রবীন্দ্রনাথই দেবেন্দ্রনাথেরা কবিতা সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারীর হাতে তুলে দেন। বেশ কয়েকটি কবিতা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ১৮৯০-এ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি য়খন 'সাহিত্য পত্রিকা বের করলেন, সেখানে দেবেন্দ্রনাথ হলেন নিয়মিত লেখক। এবং এই সময় থেকেই কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন দেবেন্দ্রনাথ।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছ' বইটি বেরুলো। এই বই তাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিলো। সেকালের প্রখ্যাত পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতে লাগলেন। কমলা কান্ত শর্মা নামে রসরচনাও লিখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায়।

দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থ ঃ

ফুলবালা (১৮৮০); ঊর্ম্মিলা কাব্য (১৮৮১); নির্ঝরিণী (১৮৮১); অশোকগুচ্ছ (১৯০০); হরিমঙ্গলকাব্য (১৯০৫); শেফালীগুচ্ছ (১৯২২); পারিজাত গুচ্ছ (১৯১২) জ্ঞানদামঙ্গল কাব্য (১৯১২) অপূর্ব নৈবেদ্য (১৯১২) গোলাপগুচ্ছ (১৯১২); অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা (১৯১৩)।

এছাড়াও বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ আছে তাঁর। তবে তাঁর কবিতার বিশিষ্টতা এই সব বই এর কবিতায়েই ছড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ একই সময়ের কবি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় য়খ সকলেই মুগ্ধ, বিস্মিত, তখন প্রভাবিত না হয়ে নিজের বিশিষ্ট কণ্ঠস্বরটি দেবেন্দ্রনাথ তুলে ধরতে পেরেছিলেন এবং বজায় রাখতে পেরেছিলেন, এটা কম কথা নয়।

প্রখ্যাত সাহিত্য-ইতিহাসকার ভূদেব চৌধুরী দেবেন্দ্রনাথের কবিতার স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেছেন এই বলে ঃ ''দেবেন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে বিহারীলালের কবি স্বভাব য়েন সুপরিণত হয়ে পুর্ণজন্মলাভ করেছিল। নিজ জীবনের একান্ত আপনার ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান অনাবৃত নিবিড়তায় ধরা পড়েছে দেবেন্দ্রনাথের কবিতায়। তাঁর কবি-ভাবনা ছিল প্রধানতঃ গার্হস্থ্য প্রেম সুখ তন্ময়।''

দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছেন 'রূপের পূজারী'। তিনি রূপের সহজ সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে শান্তি

রয়েছে, রয়েছে উপলব্ধির গাঢ়তা। রূপ থেকে অরূপের দিকে তাঁর য়াত্রা লক্ষ্য করেছিলেন হয়তো তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ। আত্মলীন গীতিস্ময় কবি দেবেন্দ্রনাথ। কবি মোহিতলাল দেবেন্দ্র নাথের প্রতিভার মূল সুর সম্বন্ধে লিখেছেন ‘‘তাঁহার প্রতিভা আত্ম-মুগ্ধ; তিনি আপন হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত ভাব-নির্ঝরিণীর মধ্যে আপনাকে মুক্তিদিবার চেষ্টা করিয়াছেন : আপনার অন্তরের য়ে স্পর্শমণি পাইয়াছেন তাহার স্পর্শে জগৎ ও জীবনকে সোনার সোনা করিতে চাহিয়াছেন; তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া অনাবিল প্রীতির মন্ত্রে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন— কোন প্রকার চিন্তা বা বিচারকে তিনি সে পূজাগৃহে পদক্ষেপ করতে দেন নাই।’ (আধুনিক বাংলা সাহিত্য।)

চতুর্দশপদী বা সনেট রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। মধুসূদনের পরে, তাঁরই ধারায় শ্রেষ্ঠ সনেটকার তিনি।

তাছাড়া নানা জাতের ফুলকে অবলম্বন করে দেবেন্দ্রনাথ অনেক কবিতা লিখেছেন। তাতে বৈচিত্র্য আছে, দক্ষতাও রয়েছে, রয়েছে তাঁর অনাবিল সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচয়। ফুলের নামে কয়েকটি বই তাঁর পুষ্পপ্রীতির নিদর্শন। ‘অহোকগুচ্ছ’, শেফালিগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ। সবই ফুলের নামে। ফুল তাঁর কাছে সৌন্দর্য সম্ভোগের আকর। আবর ফুলের রূপের মধ্যে তিনি পেয়েছেন অরূপের সহাস। রবীন্দ্রনাথ তার এই রহস্য সৌন্দর্য সম্ভোগের প্রশংসা করেছেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেম কি সুন্দর সংমিশ্রিত হয়েছে তাঁর সনেটে! সনেটের কঠিন বাঁধন, ভাবের সংহতির এঔঔকটি দৃষ্টান্ত—

ফেলিয়া দিয়াছ বাসি মালতির মালাক্ত
চম্পক অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ বালা,
তোমার অলকগুচ্ছ হয়েছে উতলা!
মালা গাঁথা হলে শেষ পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ
সরসে মলিনী সম হয়েছে চঞ্চলা?

১৪ পংক্তির সনেটের আট পংক্তির অষ্টম; এর পর ষটক বন্ধ, এঔঔরই ভাবঘন উপসংহার। জীবনের প্রতি অপার মমতা, সচ্ছ প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টি দেবেন্দ্রনাথের কবিতাকে স্বতন্ত্র স্বাদ এনে দিয়েছে। তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক, নারী সৌন্দর্যমুগ্ধ, সংসারের নানা সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের প্রতি প্রীতিময় এঔঔকজন রোমান্টিক কবি। নারীর জননী ও জায়া রূপ তাকে বেশি আকর্ষণ করেছে; প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য ও শান্তি খুঁজেছেন তিনি। শব্দ চয়নে, ছন্দের সঠিক প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

দেরাদুন শহরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

৪.১০ অক্ষয়কুমার বড়াল

সহজ সুন্দর কবিত্বের প্রকাশ অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায়। অক্ষয়কুমার বড়াল তার ‘এষা’ কাব্যের জন্য আজো স্মরণীয় হয়ে আছেন। আত্মমগ্ন গীতিকবিতা তাঁকে বিশিষ্ট কবিরূপে চিহ্নিত করেছে। রবীন্দ্রসমসাময়িক

কবি হলেও রবীন্দ্র প্রভাব নয়, তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তীর অনুসারী রূপে কবিতা লিখেছেন, এই ধারায় অন্য দুজন বিশিষ্ট কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এঔঔবং দেবেন্দ্রনাথ সেন।

অক্ষয়কুমারের জন্ম ১৮৬৬ সালে কলকাতার চোরবাগানে। লেখা পড়া হেয়ার স্কুলে। এই ছাত্রাবস্থায় তিনি বিহারীলালের কবিতার প্রতি আসক্ত হন, বিহারীলালের কাব্যিক দর্শন ও নির্মাণ শৈলী দ্বারা আকৃষ্ট হন।

স্কুলের পড়া ছেড়ে য়োগ দিয়েছিলেন চাকুরীতে, কর্মজীবনে তিনি সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছিলেন।

সেকালের অজস্র পত্র পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে, কিন্তু বই মাত্র পাঁচখানি।

প্রথম বই প্রদীপ (১৮৮৪); দ্বিতীয় 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৬) তৃতীয় 'ভুল' (১৮৮৭); চতুর্থ 'শঙ্খ' (১৯১০) ; পঞ্চম 'এষা' (১৯১২)।

দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল; গোবিন্দচন্দ্র দাস রবীন্দ্রসমসাময়িক কবি, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যেও এঔঔসেছেন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, কিন্তু এঔঔতোটুকু প্রভাবিত হননি, নিজস্ব স্বাতন্ত্রে এঁরা শেষ পর্যন্ত সমুজ্জ্বল থেকেছেন।

প্রশ্ন হলো অক্ষয়কুমারের কবিতার জগতের বিশিষ্ট ভূমি কোথায়?

রোমান্টিক চরিত্র, আবেগে, চিত্রধর্মী বর্ণনায়, দার্শনিক উপলব্ধিতে ও সৌন্দর্য়ের স্বাভাবিক তৃষ্ণায় গাড় উঠেছিলো অক্ষয়কুমারের কবিতা। তিনি গার্হস্থ্য সুখ ও প্রেমকে মর্যাদা দিয়েছেন, ভালোবেসেছেন। কিন্তু তাঁর সীমাবন্ধতা ছাড়িয়ে কবিকল্পনা হয়েছে অনন্তে উধাও। সহজ সুন্দর প্রকাশে, তাঁর কল্পনায় অবাধ মুক্তি ঘটেছে। আত্মলীন কবি স্বভাবের মাধুর্য়ে ও গভীরতায় তিনি নিজস্ব চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন তাঁর কবিতায়।

কবি মোহিতলাল মজুমদার অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিচরিত্র ও কবিচরিত্রের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করে লিখেছিলেন; ''বাহিরের জীবনে অক্ষয়কুমার ছিলেন একজন অতিসাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক-গৃহী ও বিষয়ী, অতি প্রখর সামাজিক বুদ্ধি..... ব্যক্তি। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত না, য়ে, তিনি 'প্রদীপ' 'কনকাঞ্জলি'র সেই বাস্তব বিড়ম্বিত ভাবস্বপ্নাতুর অতিসূক্ষ্ম রোমান্টিক কল্পনার বিষরস-লুব্ধ-আধুনিক গীতি কবি।''.....

''সমাজ ও সংসারের পূরা দাবী মিটাইয়া তিনি নিজের জন্য একটি পৃথক ভাবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ।''

মোহিতলাল তাঁর কবিচরিত্র প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, ''তাঁহার কবি-মানসের বিকাশ ধারাও য়েমন সরল, তেমনি তাঁহার কাব্য-মাত্র প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অতিশয় সুস্পষ্ট।''

বাস্তবতার স্থূল বর্ণনা নয়, কল্পনার সূক্ষ্ম বোধের পৌঁছোতে চেয়েছেন, অর্থাৎ কল্পনার প্রাধান্য তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে। তার প্রেম চেতনা এঔঔই পৃথিবীর সাধারণ প্রেভাবনার নয় য়েন, তাঁর প্রেম অধরা, অতিমর্ত্য ভাবনায় পূর্ণ। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের প্রেম-চেতনার সঙ্গে মিল রয়েছে, গোবিন্দ দাসের সেই 'আমি তাকে ভালবাসি অস্থিমজ্জা

সহ'-এর ঠিক বিপরীত! প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখ আশ্রিত ভালোবাসায় তাঁর তৃপ্তি ছিলো না, তাঁর মানসী স্বপ্ন লোকের অভিসারিনী!

আমার পরাণ ভাসিয়া য়ায়, পড়ে না উছলি
য়েন এক মহাকাব্য হয়ে ওতোপ্রোত।...
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে এস সখি, তবে,
রূপ-বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে

[আলিঙ্গন/ভুল]

'প্রকৃতি'র কবিতা রচনাতেও তাঁর উদাস মন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে কোন দ্যুলোকে ধাওয়া করেছে।

চেয়ে আছি শূন্যপানে কোন কাজ হাতে নাই
কোন কাজে নাহি বসে মন।
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই, দেহ আছে, মন নাই,
ওরা য়েন অস্ফুট স্বপন।
এই উঠি, এই বসি; কেন উঠি, কেন বসি!
এই শূন্য, এঔঔই গান গাই।
কি গান, কাহার গান, কি সুর, কি ভাব তার,
ছিল কভু, আজ মনে নাই।

বর্ষার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিমনকে উদাস করে দার্শনিক উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে য়েন।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা' বেরিয়েছিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে; তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে কবি শোকগ্রস্ত মনে এই দীর্ঘ কাব্য লিখেছিলেন।

বাস্তব জগতের এই ভয়ানক আঘাত কবিকে নামিয়ে এনেছিলো কল্পনার জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবে, তিনি মৃত্যু সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন হলেন। রোমান্টিক স্বপ্ন স্বর্গে বিচরণকারী কবির স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থা দূর করে দিলো মৃত্যুর ভয়ানক বাস্তব উপস্থিতি। 'এষা'কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন : কাব্যটি পূর্ণ পরিণত জীবনের রচনা। ......এষার মর্মবাণী হইল ব্যক্তিগত কামনা ''মানবীর তরে কাঁদি, য়াচিনা দেবতা।''

'মৃত্যু', 'অশৌচ', 'শোক'-এর সান্ত্বনা-এই চারটি পর্বে এষা বিভক্ত। পরলোকগত পত্নীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

হা প্রিয়া-শ্মশানদগ্ধা, হও পড়কামা,
ত্যজিয়াছ মর্ত্যভূমি তবু আছ-আছ তুমি,
তুমি নাই-কোথা নাই, হয়না বিশ্বাস।
এতরূপ গুণ ভক্তি এত প্রীতি অনুরক্তি
সৃজনে য়ে পূর্বতার নাহিক বিনাশ।

বাংলা সাহিত্যে যে কটি প্রধান শোক কবিতা লেখা হয়েছে ‘এষা’ তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। তিনি কল্পরাজ্যের স্বপ্ন সুন্দর জগৎ ছেড়ে হলেন মৃত্যুসচেতন, জীবনের সীমা সচেতন, হলেন স্বপ্ন ও বাস্তবের য়ৌথ-অভিজ্ঞতার অংশীদার, পরিণত মনের কবি।

তাঁর ‘প্রদীপ’ ‘গ্রন্থের এঔঔকটি কবিতা ‘মানব-বন্দনা’য় ভাব ও ভাষার চমৎকার মেলবন্ধন ঘটেছে—সৃষ্টিকালের অসহায় মানুষের ক্রমশ পরিণত মানুষ হয়ে ওঠার সুন্দর দীর্ঘ বর্ণনায় কবিতাটি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কল্পনার সমন্বয় সমৃধ্ধ ঃ

সেই আদিয়ুগে য়বে শিশু অসহায়,
নেত্রমেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে কারে ডেকে ছিল,
দেবে, না মানবে?
কাতর-আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি
লুটি গ্রহে গ্রহে
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর
ধারায় আগ্রহে?
সেই ক্ষুব্ধ অহংকারে, মরুত-অর্জনে
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত-ক্ষুধার্ত
খুঁজিছে স্বজন।

ডঃ সুকুমার সেন কবির প্রথম দিকের অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। দুজনেই বিহারীলালের ভাবশিষ্য, খুব কাছের মানুষ; এবং সমকালীন, তাই রবীন্দ্র-প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার হয়তো করতে পারেন নি। কারণ প্রতিভার প্রখর দীপ্তি তাঁর গায়েও পড়েছিলো। তবে, তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এই কবির উপরে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন ডঃ মানস মজুমদার। সেখানে কবির প্রকৃত রচনা করেছেন ডঃ মানস মজুমদার। সেখানে কবির প্রকৃত অবস্থান ও কৃতিত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে য়া অক্ষয়কুমারকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে সাহায্য করে।

৪.১১ কামিনী রায়

বাংলা ভাষা সাহিত্যে য়ে ক'জন মহিলা কবি আজো নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বরণীয় আছেন, কামিনী তাঁদের মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় কবি। তাঁর কয়েকটি কবিতার লাইন আজো পাঠকের ভালো লাগে, য়েমন—নাই কি রে সুখ নাই কিরে রে সুখ / এথার কি শুধু বিষাদময়'

অথবা
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবনমন সকলি দাও,

তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও

পরের কারণে মরণেরও সুখ,
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদনা আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয়ভার।

পরিচ্ছন্ন ভাবনার কবিতা, যদিও এর মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনচর্চা-জাত অভিজ্ঞতার নির্য্যাস তেমন নেই, আছে আদর্শবাদী উচ্চারণ, যাকে তত্ত্বধর্মী কবিতা বলা য়ায়। কিন্তু রচনায় আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই।

আজ পর্য্যন্ত স্কুলের পাঠ্যবই এ কামিনী রায় একজন প্রাসঙ্গিক কবি রূপে গ্রাহ্য হয়ে আছেন। আ য়খন মহিলা কবিদের আত্ম-মর্য়াদাকে তুলে ধরে আক্রমণাত্মক কবিতা লিখতে দেখা য়াচ্ছে ঘোষণা করে, সেই কালে, আজ থেকে এক শতাব্দী আগে ঘোষণা ছাড়াই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত কামিনী রায় স্বাধীন উচ্চারণে জীবনের নানা মূল্যবোধ সুন্দর গীতিময় প্রকাশ দিতে পেরেছেন কবিতায়।

জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্য পরিবারে। তাঁর পিতা চণ্ডীচরণ সেন ছিলেন ঐতিহাসিক পণ্ডিত মানুষ। তিনি মেয়েকে শিক্ষা দিতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। পিতা চণ্ডীচরণ ছিলেন মুনসেফ। তাঁর পড়াশুনায় আগ্রহ ছিলো অপরিসীম। তাঁর গ্রন্থ সংগ্রহ ছিলো প্রচুর, কিশোরী কামিনী সেন সেই গ্রন্থাগারে নানা বিষয়ে পাঠ নিয়েছেন।

বেথুন স্কুল থেকে বি. এঔঔ পাশ করে, সেখানে শিক্ষিকা নিয়ুক্ত হলেন। ইংরেজী ও বাংলা, দুটি ভাষাতেই তাঁর অধিকার ছিলো। বিয়ে হয়েছিলো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সঙ্গে। শিক্ষা ও আভিজাত্যের সমন্বয় ঘটেছিলো কামিনী রায়ের চরিত্রে।

'সাহিত্য সাধক চরিত্র মালা' গ্রন্থে কামিনী রায়ের কবিতার প্রতি ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে লেখ জানিয়েছেন : বাল্যকাল হইতেই কামিনী ভাবুকতাপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ ছিলেন। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কামিনী প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।'

তাঁর প্রথম কবিতার বই 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বেরুলো। ভূমিকা লিখলেন সেকালের প্রসিদ্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতাগুলির শেষে দুটি দীর্ঘ কাহিনী কবিতা য়ুক্ত ছিলো, নাম-'মহাশ্বেতা' এঔঔবং 'পুণ্ডরীক্'।

নির্মাল্য বা 'মাল্য নির্মাল্য' বইটি (১৯১৮) 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭), অশোক সঙ্গীত (সনেট সংগ্রহ) (১৯১৪) দীপ ও ধূপ (১৯২৯) জীবন পথে (১৯৩০) তাঁর প্রধান রচনা। এঔঔছাড়া শিশু কবিতা, গল্প ও জীবনী লিখেছেন কামিনী রায়।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ে লিখেছেন, কবি কামিনী রায় সর্বপ্রথম মেয়েলি ধরণের ঘরোয়া পরিবেশ ছেড়ে উদারতর কাব্যাঙ্গণে পদার্পণ করেছিলেন এবং নানা বিচিত্র বিষয়ে কবিতা লিখে প্রতিভার ব্যাপকতা প্রমাণ করেছিলেন। প্রেম, প্রকৃতি স্বদেশ প্রেম এই তিন শাখায় তাঁর মুকুলিত কবিত্ব কবিতা পুষ্প রূপে ফুটে

উঠেছিল।''

তাঁর সময়ে তিনি শিক্ষা দীক্ষায় এক অগ্রণী নারী ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তি জীবনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নতুন কবির প্রথম বই ''আলো ও ছায়া''র ভূমিকা লিখেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছিলেন—

এই কবিতাগুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়েছে; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীরভাবে পরিপূর্ণ য়ে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া য়ায়। ফলত বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।

'ভূমিকাতেই তিনি বলেছেন য়ে কবিতাগুলি পড়তে পড়তে তিনি মনে মনে কবিকে সাধুবাদ দিয়েছেন এবং কোনো কোনো অংশ পড়ে ইর্ষা উপস্থিত হয়েছে তাঁর মনে। এরকম সমালোচনা নতুন কবির কাছে বিরাট প্রাপ্তি। কামিনী রায় য়শস্বিনী হলেন। ছড়িয়ে পড়লো তাঁর খ্যাতি, অনেক কবিতা মুখ মুখে ফিরতে লাগলো শিক্ষিত লোকের।

একথা ঠিক, কামিনী রায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু তিনি নিজের মতন বিশিষ্ঠতাও দেখিয়েছেন। সে সময়ের কবিদের ওপর বিদেশী রোমান্টিকদের প্রভাবও পড়া স্বাভাবিক। গীতি কবিতার আত্মগত চরিত্র কামিনী রায়েরও চরিত্র, তবে পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন।

ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, ''কামিনী রায়ের কাব্যে নারী হৃদয়ের প্রকাশ যতটা অকৃপণ ততটা ইতিপূর্বে কোন মহিলার রচনায় দেখা য়ায় নাই।''—

হৃদয়ের অন্তঃপুরে, নব-বধুটির মত
ভালবাসা মৃদুপদে করে বিচরণ,
পশিলে আপন কানে আপনার মৃদু গীত,
সরমে আকুল হয়ে মরে সে তখন,
আপনার ছায়া দেখি দূরে দূরে সরি যায়,
অয়ুতে অয়ুতে ফুল ফুটে তার পায় পায়

প্রেমানুভূতির নম্র নিবিড় উচ্চারণ, এওঔকজন নারীর প্রেমের প্রাথমিক উন্মেষ য়থায়থ এখানে।

স্বদেশ প্রেম মূলক কবিতা রচনাতেও আন্তরিক উচ্চারণ-বক্তব্যের স্বচ্ছতা ও আদর্শবোধের তীব্রতা ফুটেছে এজাতের কবিতায়। তাঁর বহুপঠিত কবিতার কয়েকটি পংক্তি—

য়েইদিন ও চরণে ডালি দিনু এওঔ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জন্মভূমি, মা আমার, মা আমার।

[মা আমার]

দেশ মাতার উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করেছেন যেদিন থেকে সেদিন থেকেই হাসি অশ্রু, য়া ব্যক্তিগত, তাকে বিসর্জন দিয়েছেন; এখন হাসা বা কাঁদার সময় নেই, কারণ মা, দেশমাতা বলেই দুঃখিনী কারণ পরাধীন।

কবিতাতে এই সহজ সচ্ছন্দ অনুভূতির প্রকাশ আজো আমাদের আকর্ষণ করে। 'মাল্যও নির্মাল্য' বই-এর একটি কবিতা 'হাত'—

দুখানি সুগোল বাহু দুখানি কোমল কর,
স্নেহ য়েন দেহ ধরি সেথায় বেঁধেছে ঘর,
রূপ নাকি কাছে টানে, গুণে বেঁধে রাখে হিয়া,
আমারে সে ডাকিতেছে ছোট হাতখানি দিয়া।
এ দুখানি শুভ্র বাহু মালা করি পরি গলে,
এ হাত উঠাবে স্বর্গে, ডুবাবে বা রসাতলে।

" স্নেহ য়েন দেহ ধরি সেথায় বেঁধেছে ঘর" চমৎকার কাব্যিক প্রকাশ, প্রকৃতই কবিতা। ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষায়' হৃদয়ের অনুভূতিতে প্রকাশ করেছেন কামিনী রায়। তিনি পৌরাণিক কাহিনী নিয়েও দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। লিখেছেন নারী হৃদয়ের মান, অভিমান, গভীরে অঙ্কুরিত প্রেমের উন্মেষ পর্বের কথা, একজন প্রকৃত অর্থের কবির দুঃসাহস ও নমতা নিয়ে। 'নারীর অভিমান কবিতায় তা ধরা পড়েছে এভাবে—

বুঝিলে কি অবশেষে, অবোধ হৃদয়
সম্পূর্ণ কাহারো নয়, কেহ তব নয়'
কাছে থাক দূরে য়াও, প্রাণ দাও প্রেম দাও
সে তোমারে এতোটুকু করে না প্রত্যয়।

অভিজ্ঞতা-লব্ধ দার্শনিক উপলব্ধিও ধরা পড়েছে এ জাতের কবিতায়। তাঁর সনেট জাতীয় কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে, কবিতা হিসেবে তাদের সাফল্য কম নয়।

নানা সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন কামিনী রায়। পেয়েছেন 'জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক। ১৯৩০ সালে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৩৩ সালে কামিনী রায় পরলোকে গমন করেন।

৪.১২ মানকুমারী বসু

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর এঔঔকজন মহিলা কবি মানকুমারী বসু। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী তাঁর জন্ম। রবীন্দ্রনাথ থেকে দুবছরের ছোটো, আর মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু'বছর পরে ১৯৪৩-এঔঔর দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন মানকুমারী, পেয়েছেন সেকালের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সম্মান। কিন্তু তাঁর জীবন সুখের ছিলো না। তিনি জন্মেছিলেন সাগরদাঁড়ির দত্ত পরিবারে, অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিবারে। বাইকেল সম্পর্কে তাঁর পিতৃব্য বা কাকা। সুতরাং পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর কবিতাচর্চার পেছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

হিন্দু পরিবারে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি ছেলেবেলায় কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ

করেছেন। তাছাড়া তাঁদের পরিবারে তাঁর দাদা, ভ্রাতৃবধূ, 'বামাবোধিনী' পত্রিকার পাঠক ছিলেন, তাঁরা গদ্য পদ্য চর্চা করতেন। ঐ সব দেখে মানকুমারীর সাহিত্য চর্চার ইচ্ছা জাগতো। সেকালের সাধারণ রীতি অনুসারে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। মাত্র দশ বছর পার হতে না হতেই একটি মেয়ে নিয়ে তিনি বিধবা হলেন। অত্যন্ত অল্প বয়সেই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছিলেন বাল্যবিধবা মানকুমারী।

তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়লেও অচিরেই, তিনি আত্মবিশ্বাস অর্জন ক'রে সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন, স্থির করলেন। এই সময়ে 'কথা' নামক পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হলো।

'প্রিয় প্রসঙ্গ' (১৮৮৪) লেখিকার নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়। বই এর প্রকাশক লিখেছিলেন 'নবীনা বঙ্গবালার তরুণ শোকোচ্ছাস বঙ্গবাসীর সমক্ষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।''

এই বই-এর কবিতাবলী সম্পর্কে মানকুমারী লিখেছেন ঃ ''আমি যখন সেই তরুণ বয়সে নিদারুণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, যখন সেই তরুণ বয়সে নিদারুণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, তখন যেন আমার হৃদয় পিষিয়া কবিত্বশক্তি সকল বাহির হইতে লাগিল। এই শোকোন্মাদ অবস্থায় আমার গদ্য কাব্য প্রিয় প্রসঙ্গ রচিত হইয়াছিল।'' কয়েকটি লেখার শিরোনাম উল্লেখ করলেই কবির সেই বিষাদ পর্ব অনুভব করা যায়।

'তুমি কোথায়'? মুকুরে মুখ, পিঞ্জরে বিহগী অরণ্যে রোদন ইত্যাদি।

১৮৯৩-তে বেরুলো কাব্য কুসুমাঞ্জলি—

একা আমি চিরদিন একা,
সে কেন দু'দিন দিল দেখা?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেন বা জ্বলিল আলো?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা!
ভুলে ভুলে ভাববাসা
ভুলে ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের রেখা।

বোঝা যায়, বাল্যবিধবার একাকীত্বের নৈরাশ্য, পূর্বসুখ স্মরণ করে যন্ত্রণা, সরল সাবলীল ভাবে প্রকাশ করেছেন কবি।

৫৮টি কবিতা এখানে সংকলিত। তাছাড়া একটি 'শোকোচ্ছাস' নামের গদ্য রয়েছে, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে শোকাহত কবির রচনা।

সহজ সরল ভাষায় নারী-হৃদয়ের গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারতেন মানকুমারী। কনকাঞ্জলি (১৮৯৬) বীরকুমার বধ (১৯০৪) বিভুতি (১৯০৪); সোনার সাথী (১৯২৭) পুরাতন ছবি (১৯৩৬) প্রভৃতি এওঁওঁই কাব্য গ্রন্থগুলি ছাড়াও 'বাঙ্গালা রমনী দিগের গৃহধর্ম', 'দুইটি প্রবন্ধ' প্রভৃতি গদ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখেছিলেন।

পেয়েছিলেন কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কার। গল্প লেখাতেও তিনি প্রতিভা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর লেখা 'রাজলক্ষ্মী'

গল্প বিখ্যাত 'কুন্তলীন' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। 'অদৃষ্ট চক্র' 'শোভা' গল্পও পুরষ্কৃত হয়েছিলো। তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন ভারত সরকার, আমৃত্যু মাসিক বৃত্তি দান করে।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মানকুমারী পরলোক গমন করেন। দীর্ঘ ষাট বছর ধরে সাহিত্য চর্চা করেছেন তিনি। তিনি তাঁর স্বামীর স্মৃতি কখনো ভুলে যাননি। তাঁর কবিতার মধ্যে বিষাদময় অনুভব স্বচ্ছভাবে ছন্দায়িত হয়েছে; যার অনেক স্তবক ও পংক্তি আজো স্মরণীয়।

আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে,
    বসন্তের নবহাসি
    উল্লাসে উঠেছে ভাসি,
মল্লিকা মালতী-জাতি থোকা থোকা দোলে,
    অঙ্গের সৌরভ তার
    তুলনা মিলেনা আর,
নন্দনে মন্দার অরি! প্রাণমন ভোলে!
আমি দেখিয়াছি তার ফুল মালা গলে

[মৃত্যু কাব্যকুসুমাঞ্জলি সুহৃদ]

৪.১৩ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আজকের এই বিশশতক জুড়ে, একুশ শতকের শুরুতে পৌঁছে, চারদিকে নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা প্রতিটি সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, স্বীকৃতি, নারীর অংশ গ্রহণ, দেখে একশো বছর আগের মেয়েদের ভূমি ও ভূমিকা নিয়ে ভাবনা করা কঠিন। আর আজও কি আমরা মেয়েদের সাহিত্য প্রতিভাকে প্রেরণা দিই, ক্ষমতাকে স্বীকার করি সহজে?

এ তো আরো আগে, দেড়শো বছর আগের কথা। উনিশ শতকের মধ্যভাগ, যখন নানা সংস্কারে গৃহবন্দী ছিলো হিন্দু নারী। মুসলমান নারী সমাজে তেমন জাগরণ ঘটেনি। রামমোহনের সামাজিক আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের সামাজিক ও শিক্ষা আন্দোলন যে ভূমি গড়ে তুলেছিলো, সেই কর্ষিত মাটিতে কামিনী রায় মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী নারী কবিদের আবির্ভাব।

তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে পুরুষদেরই প্রাধান্য, তাঁদের পাশে মহিলা কবিবৃন্দ যে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন, তা তাঁদের কবিতায় নারীর নিজস্ব মন, মনের গোপন-গভীর নানা অনুভূতির আন্তরিক প্রকাশের জন্যে, যার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের তেমন কোনো পরিচয় ছিলো না এঔঔতাবৎ। কামিনী রায়, গিরীন্দ্র মোহিনীদের কবিতাচর্চায় নারীর হৃদয়ের বিচিত্র অনুভব গীতি কবিতায়, কখনো দীর্ঘ কবিতায় প্রকাশ পেলো। এঔঔও এঔঔক নতুন প্রাপ্তি বাঙালি পাঠকদের কাছে।

তাও গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায় বা স্বর্ণকুমারী দেবীদের মতন স্কুল কলেজের শিক্ষা তেমন পাননি। সম্পূর্ণ স্বভাবের দ্বারা, আবেগের তাড়নায় কবিতা লিখেছেন তিনি। এই শেখার পেছনে তেমন কোনো শিক্ষাগত ঐতিহ্য ছিলো না।

কলকাতার ভবানীপুরে গিরীন্দ্রমোহনী ১৮ আগস্ট, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে মজিলপুর গ্রামে। সেখানেই শিক্ষা লাভ, নানা বই পড়া, ছেলে বেলা থেকেই পরের দুঃখে কাতর হতেন, অর্থাৎ তাঁর মন সংবেদনশীল ছিলো তখন থেকেই। তাই, ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখার অভ্যেস গড়ে ওঠে। আপন আগ্রহে বাবার কাছে বিজ্ঞানের, ইংরেজী ভাষার কিছু জ্ঞান আহরণ করেন।

দশ বছর বয়সে বিয়ে হলো গিরীন্দ্রমোহিনীর। তিনি ছিলেন স্বামীর ছায়া সঙ্গিনীর মতন, স্বামীগত প্রাণ। স্বামীর অকাল মৃত্যু তাঁকে গভীর ভাবে আহত করে, তিনি বিষাদ গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর কবিতার মূলকেন্দ্রীয় ভাব স্বামীর মৃত্যু জনিত বিরহ ও পূর্বস্মৃতিজরিত আনন্দ।

গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী (১৮৭২)। পাঁচটি চিঠি গ্রন্থভুক্ত, তার মধ্যে চারটি স্বামীর উদ্দেশে লেখা। তাছাড়া কাব্য গ্রন্থ কবিতাহার (১৮৭৩); ভারতকুসুম (১৮৮২) অশ্রুকণা (১৮৮৭); আভাষ (১৮৯০); শিখা (১৮৯৬) অর্ঘ্য (১৯০২), স্বদেশিনী (১৯০৬) সিন্ধুগাঁথা (১৯০৭) প্রভৃতি।

স্বামী ও 'সখা'র স্মৃতি কোমলপ্রাণা নারী মনে কি গভীর বিরহকাতর, অনুভব সৃষ্টি করেছে, তার সহজ অথচ ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রকাশ 'অশ্রুকণা' বই এর উপহার কবিতাটি।

> য়া ছিল আমার, দেখি; মোর য়া, তোমারি সব!
> সবি পুরাতন, সখা, আছে অশ্রুকণা নব।
>
> এঔঔ নয় সে অশ্রুরেখা, মানান্তে নয়ন-কোণে,
> ঝরিতে য়া চাহিনা দেখা হলে ফুলবনে।
> সে অশ্রু এ নয়, সখা, দীর্ঘ বিরহের পরে,
> ফুটিয়া উঠিত য়াহা হাসির কমল-থরে।
> এ শোকাশ্রু! নিরাশার য়াতনা-গরল-ঢাকা।
> এ শোকাশ্রু! বাসনার অনন্ত-পিপাসা-মাখা।
> এ শোকাশ্রু! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
> এ শোকাশ্রু! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন!
>
> কোথা আছ নাহি জানি, জানিনা হৃদয় তব।

যা ছিল সকলি দেহি, লও এ শোকাশ্রু নব।

একজন স্ব-শিক্ষিত মহিলার কবিতায় ভাবের সংহতি, আন্তরিকতা ও গীতিকবিতার ব্যঞ্জনা ও মাধুর্য কি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'বাসনার অন্ত পিপাসা-মাখা' চমৎকার প্রেম-ঘন উপস্থাপন।

সাহিত্য সাধক চরিত মালায় তাঁর কবিতা সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করা হয়েছে—

'......গিরীন্দ্রমোহিনী নারীমনের সম্পূর্ণ
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে কবিতা রচনা করিয়াছেন,
তাঁহার আবেগের কেন্দ্র প্রধানতঃ তাঁহার
স্বামী। তাঁহার পরিবেশ মূলতঃ গৃহ-সংসার
পরিবেশ। সেই কারণেই তিনি য়খন নিরাশ
কিশোর বয়সে সাহিত্যের আসর অবতীর্ণ
হন-তখনি সাহিত্য-রসিক-মহলে
বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়।''

কবি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা সমসময়েই হয়েছিলো। তাছাড়া 'জাহ্নবী' নামক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন তিনি। বাংলার মহিলা কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গিরীন্দ্রমোহিনীর মৃত্যু হয় ১৬ আগস্ট, ১৯২৪।

৪.১৪ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নাট্যকার ও হাসির গানের জন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল সমকালেই প্রভূত পরিমাণে যশের অধিকারী হয়েছেন। রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি ও নাট্যকার, বিখ্যাত পরিবারের সন্তান, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে প্রেরণা দেবার য়োগ্য নাটক ও গানের স্রষ্টা রূপে বহু নন্দিত হয়েছেন, আজও তিনি একজন প্রাসঙ্গিক লেখক রূপে গণ্য।

তাঁর জন্ম নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে, য়ে কৃষ্ণনগর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নানা কিংবদন্তী নিয়ে গৌরবজনক অধ্যায়ের পরিচয় বহন করেছে। ১৮৬৩ সনে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম। রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে দু'বছরের ছোটো। পিতা ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়।

সচ্ছল, নামী পরিবারের সন্তান দ্বিজেন্দ্রলাল ছেলেবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজীতে এম. এ পাশ করেন, স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে য়ান দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সেখানে বসে ইংরেজীতে কবিতা লিখলেন, এবং Lyrics of Ind নামে তা সেখানে বই আকারে বেরোয়, দু'একটি বিলাতি কাগজে তা প্রশংসিতও হয়।

কিন্তু গান রচনা শুরু করেন ছেলেবেলায়। ম্যালেরিয়ায় বেশি ভুগতেন বলে তাঁকে তাঁর পিতা দেওঘরে বায়ু

পরিবর্তনের জন্যে পাঠান। সেখানে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তখনি দ্বিজেন্দ্রলাল দেশের প্রতি ভালোবাসার গান লিখে গাইছেন। জানি না জননী, কেন এত ভালবাসি তোরে,' ইত্যাদি। দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দ্বিজেন্দ্রলালকে মুগ্ধ করে, তিনি লেখেন 'দেওঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া', 'শ্মশান সঙ্গীত' এবং ১৮৮৩ তে তা প্রকাশিত হয় 'নব্যভারত' পত্রিকায়।

এরপরই তাঁর বিলাতযাত্রা; উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে ফিরলেন দেশে। কিন্তু সেকালে 'কালাপানি' অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দিতে হলে হিন্দুদের জাতিচ্যুতও হতে হতো। দেশে ফিরলেন তাঁকেও হিন্দুসমাজ এক ঘরে করে দিলো। এই অবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হলো ড. প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীর সঙ্গে।

'দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিবাদ করলেন হিন্দুসমাজের এই কুসংস্কারের বিরুধ্বে। রাগে, অভিমানে সেই সময় তিনি লিখলেন 'একঘরে' (১৮৮৯) নামক একটি নকশা জাতিয় রচনা, এবং প্রকাশ করলেন তা। রবীন্দ্রনাথের বোন তখনকার প্রখ্যাত কবি স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক', পত্রিকায় সে বই-এর প্রশংসা করলেন। তাতে তিনি স্বীকার করেছিলেন 'তবে বই খানিতে বেশ একটু খাঁটি হাস্যরস আছে এবং কলমের জোরও বেশ একটু দেখিতে পাওয়া যায়— ইহার প্রধান কারণ তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন।'

দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে অকপটতা ও সত্য প্রকাশের জোর দেশের প্রতি ভালোবাসা, এবং তা থেকেই ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ করার প্রবণতা প্রথম থেকেই সকলে লক্ষ্য করেছেন। এই চরিত্রের জন্যে বিলাত থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এলেও উপযুক্ত চাকরী পেলেন না, ডেপুটিগিরি পেলেন মাত্র। নানা স্থানে বদলী হতে লাগলেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন, চিনলেন সারা দেশকে, অনুভব করলেন দেশের সামাজিক, আর্থিক দুরস্থার কারণগুলি। য়োগ দিলেন স্বদেশী আন্দোলনে।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দেহান্তরিত হলেন প্রিয়তম পত্নী সুরবালা দেবী। তাঁর সংবেদনশীল মন হাহাকার করে উঠলো, লিখলেন 'হতভাগ্য' কবিতা; সেই কবিতায় গৃহলক্ষ্মীকে হারিয়ে, মাতৃহারা শিশুপুত্রকে নিয়ে তাঁর করুণ অবস্থাই ব্যক্ত হয়েছে—

একখানি তার তরী ছিল বিজনশূন্য ঘাটে বাঁধা,
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে;
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে, পুড়ে গেল
একদিন আগুন লেগে খড়ে।
একটি ছেলে একটি মেয়ে, একটি ডাইনে একটি বাঁয়ে
হাতে ধরে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়;
সারাবছর ঘুরে বেড়ায়, জানেনা সে হতভাগা
তাদের নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কবিতাটি পড়লে আশ্চর্য হতে হয়, ভাষা আজকের মতই চলতি ও আধুনিক। কোথাও অস্পষ্টতা নেই, অথচ বেদনার স্পর্শ লেগে আছে।

প্রখ্যাত সমালোচক রবীন্দ্রনাথ রায় দ্বিজেন্দ্রনাথের গীতি কবিতার উৎস ও প্রেরণার নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেনক্ত

''নবপরিনীতা পত্নীকে ঘিরে তাঁর হৃদয়োদ্বাস গীতি কবিতার স্পটিকপাত্রে স্বর্ণমদিরার মতো বিহুল ও উজ্জ্বল হয়ে আত্মপকরকাশ করেছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মানসজীবনে এই দুটি ধারা লক্ষ্য করা য়ায়— একদিকে আত্মমুগ্ধা প্রেমবিহুল স্বপ্নাতুর কবি-চিত্ত আর একদিকে সামাজিক অসঙ্গতিতে ক্ষুব্ধ সামাজিক মানুষ। কখনও কখনও এই দুটি বিরুদ্ধ ধারা একত্রিত হয়ে কবিতার ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্র মুখী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই দুটি ধারাই কবির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। পত্নী সুরবালার প্রেম ও দাম্পত্যরস ও অপরটিতে সামাজিক নির্য়াতন এই দুটি ব্যাপারে একত্রিত হয়ে কবি বানসের এই স্বরূপ ও ধর্মকে তীব্রতর ও ত্বরাণিত করেছে।''

তিনটি শ্রেণীতে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টিকে বিভক্ত করা য়ায়।

১। গদ্য, ২। কবিতা, ৩। নাটক।

তিনটি বিষয়ের মধ্যে তিনি নাটক রচনায় দেখিয়েছেন অসাধারণ দক্ষতা, এর ফলে তাঁর জনপ্রিয়তাও হয়েছিল বিপুল। ফলত, তাঁর কবি প্রতিভার তেমন বিকাশ, পরিণতি ঘটেনি, আর, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উজ্জ্বলতা ঐ সময়ের সকল কবিকেই আবৃত করেছেন, করেছে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতাকে। কিন্তু অনুকরণ, অনুসরণ করেনি তিনি কখনো। নিজে কবিতার বিষয় ও ভাষা, রীতি প্রকরণ একেবারে দ্বিজেন্দ্রিয়।

তাঁর কবিতা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ফসল হলো 'আষাঢ়ে' 'মন্ত্র' 'আলেখ্য', এবং 'হাসির গান'।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'আর্য়গাথা' ১ম ভাগ। বইটিতে রয়েছে কবিতা ও গান। এরপর প্রকাশিত হয় আর্য়গাথা দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে।

এঔঔখানে 'গাথা' শব্দটি মধ্যয়ুগের কাহিনী ধর্মী গান অর্থে তেমন ব্যবহার করেছেন তিনি, মনে হয় না। কবিতা ও গানের বা কবিতাকে সুর দিয়ে গাওয়া, এমন একটি রীতির তিনি প্রবর্তক মনে হয় আর্য়গাথার ভূমিকায় এঔঔ বিষয়ে তিনি বলেছেন য়ে প্রেমের গানই গান, এরকম ভাবনা আর্য়গাথায় প্রত্যাশা করা য়াবে না। প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য় ও লাবণ্যে মুগ্ধ হলে, এই সৃষ্টির সৌন্দর্য় ও মহিমা দেখে কেউ স্তব্ধ হন, দুঃখয়ন্ত্রণা দেখে কেউ চোখের জল ধরে রাখতে পারে না, কারো য়দি দুঃখিনী দেশ মাতার জন্যে চোখে জল আসে, তবে তারাই আর্য়গাথাকে সমাদরে নিতে পারবেন।

এখানে গান অর্থে কবিতাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য় মুগ্ধতা, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্দনা; মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে বিষাদ বোধ এবং দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা এই হলো, আর্য়গাথার গান বা কবিতার অন্তর্গত আনন্দ, বিষাদ, দেশ প্রেমের সুর ও ভাব বৈচিত্র্য।

ডঃ সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান প্রসঙ্গে লিখেচে, ''নাট্যকার হিসাবে প্রথানত খ্যাতি অর্জন করলেও বিশ শতকের সূচনায় তাঁর কিছু কিছু দেশাত্মবোধক কবিতা ও হাসির গান অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল কখনোই নিছক হাস্যরস সৃষ্টি করেননি। তাঁর হাস্যরস সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক এবং তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতার মধ্যেই এ রসের ভান্ডার। দেশের অবস্থাও স্বজাতির আচার আচরণকে কেন্দ্র করেই তাঁর এই চিন্তাশীলতা গড়ে উঠেছে। তাই তাঁর হাসির রচনাগুলি পড়ার

সময় হাসতে গিয়ে ভাবতে হয়, আর স্বজাতিকে হাসিয়ে ভাবিয়ে তোলাই তাঁর এই জাতীয় লেখার উদ্দেশ্য ছিল।”

আষাঢ়ে (১৮৯৯ খ্রীঃ) মন্দ্র (১৯০২) আলেখ্য (১৯০৭) হাসির গান (১৯০০) দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিক কবিতা গ্রন্থ।

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে;
চৌদ্দশত পুরুষ আছি পরের জুতা খেয়ে।
তথাপি চাই মানের লাগি, ধরনী মাঝে ভিক্ষা মাগি!
নিজমহিমা দেশ-বিদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে।
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধুলি চেয়ে।

[জাতীয় সংগীত মন্দ্র]

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল সময়। এই সময় বেরুলো তাঁর ‘আলেখ্য’ কাব্যগ্রন্থ। সেকালের সামাজিক অবস্থার ছবি আলেখ্যর নামক কবিতার বিষয় হয়েছে, মনে হয়, স্বদেশবাসীর দুর্বলতার দিকটাও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিলো জাতিকে জাগিয়ে তুলবার জন্যে

চতুর্দশ চিত্র

(নেতা)

কথায় কথায় য়াচ্ছে শুধু কথা বেড়ে
গানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা,
কিছু বোঝা য়াচ্ছে না’ক নেড়ে চেড়ে
কিরকম য়ে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায় সভায় মাঠে হাটে, গোলেমালে
বক্তৃতাতে আকাশ পাতাল ফাটছে;
য়াদের সময় কাটত না’ক কোনকালে
তাদের এখন খাসা সময় কাটছে।
নেতায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভরে গেল,
সবাই নেতা সবাই উপদেষ্টা
চেঁচিয়ে তো সবার গলা ধরে গেল,
অন্য কিছুর দেখাও য়ায় না শেষটা।

'আলেখ্য'র আগেই 'আষাঢ়ে' বইটি বেরিয়ে ছিলো। 'ব্যঙ্গকাব্য' গ্রন্থ আষাঢ়ে ১৮৯৯ এঔঔবং 'হাসির গান' বেরিয়েছিলো ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই বই দুটির কবিতা ও গানে দ্বিজেন্দ্রলালের কবি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য য়ে সমাজ সচেতনতা, ব্যঙ্গ প্রবণতা তার অনেক পরিচয় রয়েছে।

আর্য্যগাথা, হাসির গান, দুটি বই-এর অনেক কবিতা দেশাত্ববোধক ব্যঙ্গ সঙ্গীত। কবিতাগুলির মধ্যে দেশসেবা, দেশনেতার চরিত্র, সামাজিক অবস্থার অসঙ্গতির দিকটি এমন চমৎকার ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল তুলে ধরতে পেরেছিলেন, য়ে সেগুলি সেয়ুগেই শুধু অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি, আজও আমাদের মনকে সমানভাবে নাড়া দিয়ে থাকে। য়েমন কয়েকটি কবিতা, 'নন্দলাল' 'বিলাতফের্তা', 'জিজিয়া কর', ইত্যাদি।

আমি য়দি পিঠে তোর ঐ
  লাইত একটি মারিই রাখে;
তোর তো আস্পর্দ্ধা বড়
  পিঠে য়ে তোর ব্যথা লাগে'
আমার পায়ে লাগল সেটা
  কিছুই বুঝি নয় কো বেটা'
নিজের জ্বালায় নিজে মরিস
  নিজের কথাই ভাবিস আগে।

এক সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিলো। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক প্রহসন লিখেছিলেন 'আনন্দবিদায়' নামে; কিন্তু, তার জন্যে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুধে রবীন্দ্র অনুরাগিগণ ক্ষিপ্ত হয়েছিলো। অথচ রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন—

'তিনি য়ে সকল বাভালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে য়ে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়েছেন।'

দ্বিজেন্দ্র-গবেষক রথীন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'আলেখ্য' 'ত্রিবেনী'কে পরিণতি পর্বের কাব্য বলেছেন।'

ডঃ সুকুমার সেন সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন ''দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় বৈশিষ্ট্য দুইটি, কৌতুকের স্পর্শ, এবং ছন্দে ও ভাষায় প্রচলিত রীতি উল্লঙ্ঘনের দুঃসাহসা। কবি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল খুব সার্থকতা দেখাইতে পারেন নাই, তবে পদ্যের লাস্য রীতিতে গদ্যের তাণ্ডব আনিয়া বাঙ্গালা কাব্যের স্টাইলে অভিনব শক্তি সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।''

''পরিশেষে বলা য়ায় কবিতায় ও গানে ছন্দের, ভঙ্গির ও সুরের বিবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদক করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের অনেক বিভাবে তিনি প্রথম পদপ্রদর্শকের গৌরবও দাবী করিতে পারেন।'' ..... দ্বিজেন্দ্রলালের এঔঔকান্ত বৈশিষ্ট্য তাঁহার পৌরুষ। ''কাপুরুষতার প্রতি য়থোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরব বিশিষ্ট।''

(সাহিত্য সাধক চরিতমালা/ষষ্ঠ খণ্ড)

এখানে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান তাঁর নাটক সেখানে একদা তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আজও সমানভাবে শ্রদ্ধেয়।

৪.১৫ প্রশ্নমালা

১। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব কাল নির্দেশ করো। তাঁর কাব্যের বিশেষত্ব কি? কোন কাব্যে তা প্রকাশ পেয়েছে?

২। বলা হয়ে থাকে যে মধুসূদনের কাব্য থেকে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে। আধুনিক পূর্ব যুগের কাব্যের সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যের পার্থক্য কোথায়? তিনি কবিতায় কি ভাবে আধুনিকতার প্রবর্তন করেন?

৩। ঊনিশ শতকের, বাংলা কবিতার প্রথম পর্বে মধুসূদনের কবিতার ক্ষেত্রে অবদান কি? তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যগুলির পরিচয় দিয়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করো।

৪। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান প্রধান কাব্যকৃতির পরিচয় দাও। মহাকাব্য রচনায় তার কৃতিত্ব কতোখানি?

৫। নবীনাস্ত্রের 'ত্রয়ী' কাব্য বলতে কি বোঝায়? পুরাণকাহিনী ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ, তাদের বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করো।

৬। কবি কায়কোবাদের কাব্যকৃতি এঔঔবং বাংলা কবিতায় তাঁর স্থান নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৭। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রঙ্গব্যাঙ্গের কবিতা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৮। বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতার বিশিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনা করে দেখাও য়ে তিনি বা তাঁর গীতিকবিতা বাংলাকাব্যকে কিভাবে পথ নির্দেশ দিয়েছে?

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারীলাল চক্রবর্তীকে 'ভোরের পাখি' বলেছিলেন কেন?

১০। বিহারীলালের হাতে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত। ঐ পথ অনুসরণে গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু য়ে ক্ষমতার পরিবর্তে দিয়েছিলেন, উদ্ধৃত য়োগে তা আলোচনা করো।

১১। গোবিন্দচন্দ্র দাসকে কেন স্বভাবকবি বলা হয়? তাঁর কবিতার বিশেষত্ব কি? কোন সুর তিনি বাংলা কবিতায় জুড়ে দিয়েছেন, ব্যাখ্যা করো।

১২। ঊনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙ্গলা মহিলা কবিদের মধ্যে কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী প্রভৃতি কবিগণ কবিতা রচনায় যে বিশিষ্টতা প্রদর্শন করেছেন, তা দেখাও।

১৩। অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবি বিশেষে বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করো।

১৪। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের খ্যাতির আড়ালে তাঁর কবি প্রতিভা অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে, বলা হয়; অথচ কৌতুক সৃষ্টিতে, দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানে তিনি অধিক সার্থক-এ বিষয়ে তোমার ধারণা বিশ্লেষণ করো।

একক ৫ প্রবন্ধ

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ প্যারীচাঁদ মিত্র

৫.৩ রাজনারায়ণ বসু

৫.৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

৫.৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫.৬ অক্ষয় চন্দ্র সরকার

৫.৭ রমেশচন্দ্র দত্ত

৫.৮ স্বামী বিবেকানন্দ

৫.৯ সখারাম গণেশ দেউস্কর

৫.১০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৫.১১ শিবনাথ শাস্ত্রী

৫.১ প্রস্তাবনা

প্রবন্ধ ঃ উনিশ শতক

মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে ভাষা সৃষ্টির আদিপর্ব থেকেই। সেই সাহিত্য হৃদয়ের সাহিত্য, উপলব্ধির সাহিত্য। কিন্তু মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেই আর এক জাতীয় ভাষা-শিল্পের প্রয়োজন এবং চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাকে বলা যেতে পারে জ্ঞানের সাহিত্য, বিশিষ্ট মনন চর্চার ভাষাবন্ধ রূপ। তাকেই বলব প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রকৃষ্ট বন্ধন বোঝায়। একেই অন্যভাবে বলতে পারি সুশৃঙ্খল নির্মাণ। কিসের শৃঙ্খলা? কিসেরই বা নির্মাণ? শৃঙ্খলা বলতে এখানে চিন্তন-পরম্পরার যৌক্তিক বিন্যাস বোঝায়। আর, নির্মাণ বলতে বোঝায় ভাষার দ্বারা নির্মিত অবয়ব। কোনো একটি বিষয়কে সামনে রেখে যদি কেউ কিছু বলতে চান তা হলে তাঁর বক্তব্য তিনি উপস্থাপিত করতে চান, তা হলে সেখানেও তাঁকে তুলে আনতে হবে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য এবং যুক্তি-তর্ক। প্রবন্ধের রচনাশৈলীতে তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণের মূল্যই বেশি; ব্যক্তিগত ভালো লাগা বা বন্দ লাগার কোনো দিক নিশ্চয়ই থাকে কিন্তু তাকে তুলে ধরতে হবে নিরপেক্ষভাবে, যুক্তি ও প্রমাণে ভিত্তিতে। এই সুবিন্যস্ত ভাষা নির্মাণকেই প্রবন্ধ বলা হয়। একটি প্রবন্ধে প্রত্যাশিত পর্যায় বিন্যাস হল—প্রথমে আলোচ্য বিষয়টির উপস্থাপনা এবং বিষয়টির সঙ্গে শ্রোতা বা পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত বিষয়টির ভালো এওঔবং মন্দ দিকগুলি নিরপেক্ষভাবে, তথ্য প্রমাণের সাহায্যে উপস্থিত করা। তৃতীয়ত, যদি প্রবন্ধ লেখকের নিজস্ব কোনো বক্তব্য থাকে তা হলে সেই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি বিন্যস্ত করা। সর্ব শেষে নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা। প্রকৃষ্ট বন্ধন প্রবন্ধ বলে এই জাতীয় সংরূপকেই। এই সংরূপে প্রাধান্য পায় বক্তব্য বিষয়টি; কোনো আবেগ উচ্ছ্বাস নয়, আবার অলংকৃত রচনাশৈলীও নয়।

প্রবন্ধ সাহিত্যের সূত্রপাত বহু প্রাচীন কালে। মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেই প্রবন্ধের বিকাশ ও বৈচিত্র লক্ষণীয়। মানুষের সভ্যতা হৃদয়াবেগ দিয়ে নির্মিত হয় না। বহু চিন্তন-প্রসূত সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং ব্যবহারিক, বহু নীতি ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষের সভ্যতা। এই সব ভাবনা-চিন্তার শব্দে অভিব্যক্তিকেই প্রবন্ধ নাম দেওয়া য়ায়।

কিন্তু সাহিত্যসষ্টির অপেক্ষাকৃত নবীনতর পর্য়ায়ে রচিত হয়েছে আর এক ধরনের লিখন য়েখানে আখ্যান নেই; আছে একটি ভাবনার বিস্তার, অথচ তথ্য ও যুক্তির মহন্বয়ে ও সুশৃঙ্খল বিন্যাসে একটি পরিণামী সিদ্ধান্ত উপস্থিত করবার শৈলী সেখানে অনুপস্থিত। সেখানে বক্তব্য বা উপলব্ধি, বা ভাবনা অভিব্যক্ত হয় যেন লেখকের ইচ্ছাক্রমে। য়েন য়েভাবে ইচ্ছে সেভাবেই লেখক পাঠকের সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার রীতিতে নিজের ভাবনা ও উপলব্ধিকে স্তরে স্তরে বিকশিত করে তোলেন। কোনো সার্বিক পরিকল্পনা করে এ জাতীয় রচনা লিখিতে হয় না। সেখানে লেখকের কিছু প্রমাণ করবার দায় নেই। তাঁর উদ্দেশ্য কেবল তাঁর উপলব্ধির বলয়কে পাঠকের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া। এজাতীয় রচনা সরস হতে পারে, মননদীপ্ত হতে পারে, ব্যঙ্গ-পরিহাসমূলকও হতে পারে।

সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুটি জাতীয় প্রবন্ধেরই সমৃদ্ধ ধারা আছে। এই দুই ধারার নাম যথাক্রমে দেওয়া হয়েছে তন্ময় বা তন্নিষ্ঠ প্রবন্ধ ও মন্ময় প্রবন্ধ। এছাড়া বিষয় প্রধান এবং অনুভূতি প্রধানও বলা যেতে পারে দুটি ধারাকে। মন্ময় প্রবন্ধকে ব্যক্তিগত রচনাও বলা হয়ে থাকে। ফরাসি, সাহিত্যে এই জাতীয় রচনাকে বলা হয় bel letters. এই দুই ধারাতেই বিশ্ব সাহিত্যে বহু কালোত্তীর্ণ লিখন আমরা পেয়েছি। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুই জাতীয় লিখনেরই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমনই মনে করা হয়। অবশ্যই এ মতের পক্ষে যুক্তি এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রবন্ধের স্বাভাবিক বাহন গদ্য ভাষা। তথ্যের উপস্থাপনা এবং যুক্তির বাহন গদ্যেই সুষমভাবে বিন্যস্ত ও পরিস্ফুটিত হতে পারে। তা ছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসবার ফলে উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি-মনেই বিশ্বজ্ঞানকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল। তবে একথাও স্বীকার্য যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালেও আমরা চিন্তামূলক বহু বিষয়কে লিপিবদ্ধ হতে দেখেছি। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক কিছু কিছু গ্রন্থ লিখিত হয়েছে— যেগুলি পয়ার ছন্দে রচিত হলেও সেগুলির বিন্যাস-কৌশলকে প্রবন্ধেরই কাছাকাছি বলা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচারিতামৃত' গ্রন্থের অনেক অংশই প্রবন্ধ-লিখনশৈলীর কাছাকাছি বলে মনে হতে পারে। তবু একথা স্বীকার্য যে—আকারে ও প্রকারে, বিষয় বৈচিত্র্য, ভাবনার প্রেক্ষিত এবং রচনার পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রকৃত প্রবন্ধ জাতীয় লেখা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যেই আমরা পেয়েছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করেছে বাংলা সাময়িক পত্র। আখ্যান বিহীন, চিন্তামূলক গদ্য লিখনের চর্চা নিয়মিত হয়ে ওঠবার অবকাশ পেয়েছে তখন থেকেই। সেই সঙ্গে বাংলার মানুষ সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন সেই সময় থেকেই। বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবন্ধ জাতীয় রচনা লিখিত হয়েছে প্রত্যক্ষ সমাজ-সংস্কার মূলক উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে। একাহাতে সমাজসংস্কার, ধর্ম-সংস্কার এবং ভাষা সংস্কারের কাছে নেমেছিলেন রামমোহন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের স্রষ্টা তাই তাঁকেই বলা যায়। তাঁর ধর্মসংস্কারের সূচনা বেদান্তের অনুবাদ দিয়ে। তাঁর এঔঔ সম্পর্কিত গ্রন্থ যথাক্রমে 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ভূমিকা, 'বেদান্তসার' (১৮১৫?) তাঁর পূর্ব প্রকাশিত 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এঔঔর সারসংক্ষেপ-এঔঔর প্রকাশ কাল নিয়ে মতভেদ আছে। 'তলবকার উপনিষৎ' অর্থাৎ ফেনোপনিষৎ, জুন (১৮১৬) শাঙ্করভাষ্য অনুয়ায়ী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। 'ঈশোপনিষৎ' বোজসনেয় সাংহিতোপনিষৎ (১৮১৬) অনুবাদ, 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' (১৮১৭) , মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) প্রত্যুত্তর, 'কঠোপনিষৎ' (অনুবাদ আগষ্ট ১৮১৭) 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ' (মার্চ, ১৮১৯) 'আত্মানাত বিবেক' (১৮১৯ শঙ্করাচার্য়ের এপাশের গ্রন্থের অনুবাদ) 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সম্বাদ' (ডিসেম্বর ১৮১৮) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (নভেম্বর, ১৮১৯) কাশীনাথ তর্কবাগীস রচিত 'বিধয়েক নিষেধক সম্বাদ রামমোহনের প্রথম সম্বাদের প্রতিবাদ' (১৮১১-এঔঔর উত্তরে রচিত)। 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০), 'চারিপ্রশ্নের উত্তর' (১৮২২), 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩), পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' (১৮২২-২৩)। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের

মধ্যে 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পাষণ্ড পীড়ন (১৮২৩-এর উত্তর, ধর্মগ্রন্থ 'ব্রহ্মনিষ্ঠ পৃহস্বর লক্ষণ' (১৮২৬), 'হহ্রসূচী' (১৮২৭) বৌদ্ধ মহায়ান পুস্তিকার মূল ও অনুবাদ, 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধিনিং' (১৮২৭) , 'ব্রহ্মোসংগীত' (১৮২৮) 'অধ্যাত্ম বিষয়ক সংগীত, অনুষ্ঠান' (১৮২৯) 'ক্ষুদ্র পতী' (আনুমানিক ১৮৩০), গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)।

এতগুলি গ্রন্থ রচনা সত্ত্বেও রামমোহনের ভাষা স্বাচ্ছন্দ বাংলা গদ্য হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ তাঁর সামনে বাংলা গদ্যের কোনো আদর্শই ছিল না, একদিকে সংস্কৃত গদ্যের বিধিবন্ধতা, অন্য দিকে কথ্য বাংলা গদ্যের মৌখিক ভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের য়ে চেষ্টা তিনি করেছিলেন তার কিছু সাফল্য অবশ্যই অর্জিত হয়েছিল। কারণ তঁর রচনাগুলি আলোড়িত করেছিল বাঙালি সমাজকে। শিক্ষিত বাঙালি স্পষ্ট বুঝে নিয়েছিলেন তাঁর গদ্যের বক্ত ব্য। এবং এতটাই তাঁরা উত্তেজিত হয়েছিলেন য়ে দেখা দিয়েছিল রামমোহনের পক্ষে এবং বিপক্ষে আরও অনেক গদ্য লেখা। সেগুলি সম্পূর্ণ সুনির্মিত প্রবন্ধ নয়, কিন্তু বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম সোপান অবশ্যই।

রামমোহনের আগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের বাংলা গদ্য চর্চার মধ্যে ছিল জীবনী। জীবনী অবশ্যই কথাসাহিত্য নয়, কিন্তু পুরোপুরি প্রবন্ধও তাদের বলা সংগত নয়, মনে করা য়ায় রামরামবসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এঔঔবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্মচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫)-এঔঔর কথা। অবশ্য জীবনীতে প্রবন্ধের প্রদান বৈশিষ্ট্য যুক্তি সমর্থিত চিন্তনের উপস্থাপন আমরা পাই না।

তথ্যের সমাবেশ, বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা এবং জীবনালেখ্য নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এক ধরনের ভাবনামূলক গদ্য রচিত হয় জীবনীতে। এই ধারাতেই ১৮৫৩-৫৪ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন কবি জীবনী।

রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত প্রবন্ধ রচনার ধারা সমৃদ্ধ হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লিখন সমূহের মধ্যে আমরা প্রকৃত প্রবন্ধের ও নিদর্শন পাই। ভাষাশিল্পী হিসেব বিদ্যাসাগর রামমোহনের তুলনায় অনেকটাই পরিণত ছিলেন। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত রচনাগুলির বাইরেও তিনি য়েসব লেখা লিখেছিলেন তাদের মধ্যে প্রকৃত প্রবন্ধের সন্ধান আমরা পাই। য়েমন জল ক্লাক মার্সম্যান-এর outlines of the History of Bengal of the use of youth in India'-র শেষ নয় অধ্যায়ের অনুবাদ 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ২য় ভাগ (১৮৪৮), তার সঙ্গে কিছু তনুত তথ্য সংয়োয়িত হয়েছে। রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বার্স-এর 'Fxemplary Biography-র বালক পাঠ্য অনুবাদ 'জীবন রচিত' (১৮৪৯), 'বোবোদয়' (১৮৫১), 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এঔঔতবিদষয়ক বিচার' (১৮৭১), 'বহুবিবাহরহিত হওয়া কিনা এঔঔতদ্বিষয়ক বিচার' দ্বিতীয় পুস্তক' (১৮৭৩), 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' (১৮৮৮), 'বিদ্যাসাগর রচিত' (আত্মজীবনী, মৃত্যুর পর মুদ্রিত, ১৮৯১) 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) 'বিধবা বিবাহ ও য়শোহর হিন্দুরক্ষিণী সভা' (১৮৮৪), 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬) 'প্রভাবতী

সম্ভাষণ' (আনুমানিক ১৮৬৪)। এই সব গ্রন্থের মধ্যে প্রথম তিনটি পাঠ্যপুস্তক জাতীয় রচনা। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ-কে স্নেহভাজন বন্দুকন্যার মৃত্যুতে লেখা মন্ময় প্রবন্ধ বলা য়ায়।

বাংলা প্রবন্ধে প্রথম যুগের আর একটি সমৃধ্ব সম্ভার গড়ে উঠেছিল 'তত্ত্বাবোধিনী সভা' এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্ম চিন্তাবিদগণের চেষ্টায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর অনেকখানি অংশকে বলা য়ায় ধর্মভাবনা মূলক প্রবন্ধ। সঙ্গে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভূগোল' (১৮৪১), 'চারপাঠ' (১ম ১৮৫৩, ২-য়, ১৮৫৪। ৩-য়, ১৮৫৯), 'পদার্থ বিদ্যা' (১৮৫৬)—এই পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে তিনখণ্ড চারপাঠে এওঁওঁ নানা বিষয়ের প্রবন্ধ আছে। তবে তাঁর য়থার্থ প্রবন্ধ গ্রন্থ— 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম-১৮৫১, ২-য় ১৮৫৩), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬), এওঁওঁবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ১৮৭০ ২য় ১৮৮৩)। য়দিও তিন গ্রন্থের উৎসহ বিদেশি প্রভাব বর্তমান। (বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'— স্কটিশ মনোবিদ জর্জকুম্ব (১৮০৮-১৮৫৮) রিচত 'Essays on phren d logy (১৮১৯) অবলম্বনে রচিত। কুম্ব-এর 'The constitution of Man' (১৮২৮)-এর ভিত্তিতে লেখা 'ধর্মনীতি'। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দুটি খণ্ডের উৎহোরেস হেমান উইলসন-এর 'Religious sects of Hindus' অক্ষয়কুমার তার সঙ্গে অনেক নতুন তথ্য য়োগ করেছিলেন। স্বাধীন চিন্তনশক্তি আর তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসের শক্তিকে অক্ষয়কুমার হয়ে উঠেছেন বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের পথিকৃৎ।

এইভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা প্রবন্ধের সবল একটি পাদপীঠ এবং উর্বর ভূমি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এওঁওঁই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা পেয়েছি বার্ংা প্রবন্ধের সমুজ্জ্বল স্বর্ণফসল। সেই সময় আবির্ভূত শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন জ্ঞান, মনীষা আর প্রতিভা সম্পন্ন লেখক। বাংলা প্রবন্ধের য়ে ঐশ্বর্য্যময় সম্ভার তাঁদের কলমে গড়ে উঠেছিল তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সুকর্ষিত বাঙালি মনণকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমরা তেমন কয়েকজন প্রাবন্ধিকের পরিচয় এখানে সন্নিবিষ্ট করব।

সময়ানুক্রমিক বিন্যাসে এইসব প্রাবন্ধিকের প্রথমেই আসেন প্যারীচাঁদ মিত্র ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩)।

৫.২ প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

সময়ানুক্রমিক বিন্যাসে এই সব প্রাবন্ধিকের প্রথমে আসেন প্যারীচাঁদ মিত্র (ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর) (১৮১৪-১৮৮৩)

সংক্ষিপ্তজীবনী ঃ হুগলী জেলার হরিপালার থানার অন্তর্গত পানিসেওলা গ্রামের মানুষ গঙ্গাধর রাজধানী কলকাতায় উজ্জ্বল জীবনের আকর্ষণে চলে এসেছিলেন কলকাতা; নিজেকে করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত; বাস ছিল নিমতলা অঞ্চলে। তাঁর পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পাঁচ সন্তানের অন্যতম প্যারীচাঁদের জন্ম ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুলাই।

শিক্ষা ঃ প্যারীচাঁদ পড়েছিলেন হিন্দু কলেজ; ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো (১৮০৯-১৮৩১)-র কৃতীছাত্র। কিন্তু তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। পরে স্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৮৬০-এ প্রেততত্ত্ব তাঁকে টেনেছিল। মাদাম হেলেনা প্রেট্রভনা ব্লাভাট্স্কি আর কর্নেল ওলকট থিয়সফি আন্দোলনও তাঁকে আকর্ষণ করেছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্যারীচরণকে নারীদের প্রতি করেছিল শ্রদ্ধাপরায়ণ। তিনি য়ে স্বদেশ ও স্বজাতির হিতাকাঙ্খী ছিলেন তারও মূলে আছে হিন্দু কলেজ আর তৎকালীন কলকাতার বিদ্যাচর্চার আবহ। অবশ্য শিক্ষা সম্বধে কিছুটা আগ্রহ তাঁর পরিবার-পরিবেশেও ছিল।

জীবিকা ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়ুক্ত হন প্যারীচরণ। পরে তিনি হয়েছিলেন লাইব্রেরিয়ান এবং সেক্রেটারি (১৮৪৮)। এছাড়া প্রথমে যুগ্মভাবে ওপরে স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা তিনি য়থেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

সমকালের নানা সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে ছিল তাঁর য়েগ। য়েমন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্ট (১৮৮০)-র সহকারী সভাপতি, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড-এর অবৈতনিক ব্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলকাতা হাইকোর্ট-এঔওর গ্রান্ড জুরি, কলকাতা থিয়সফিক্যাল সোসাটির সভাপতি (১৮৮২ থেকে আ-মৃত্যু।)

১৮৪৭-এ তিনি এঔওগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া-র সদস্য হন পরে তিনি এর সভাপতি এবং অনারারি মেম্বারও হয়েছিলেন, প্যারীচাঁদ এ সমিতির প্রথম বাঙালি সদস্য। তিনি সমিতির মুখপত্র The Agricultural Miscellanous-এর সম্পাদক ছিলেন।

রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে য়ৌথভাবে 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৮-১৮৫৮) সম্পাদনা প্যারীচাঁদের আর এক কীর্তি।

১৮৮৩ সালের ২৩ নভেম্বর প্যারীচাঁদের মৃত্যু হয়।

সামগ্রিক সাহিত্য পরিচয় ঃ

বাংলা সাহিত্য প্যারীচাঁদকে মনে রেখেছে প্রথম বাংলা উপন্যাস, আলালের ঘরের দুলাল'-এর জন্য। সরল ভাষায় বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য প্যারীচাঁদ প্রকাশ করেছিলেন 'মাসিক পত্রিকা', এ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হয় ওই উপন্যাস। তাই বলা য়ায় স্ত্রীশিক্ষাদানই ছিল এ উপন্যাস লেখার কারণ।

তাঁর অন্য উপন্যাস—'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮৩)। তার অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে কথোপকথন আঙ্গিকে রচিত 'রামারঞ্জিকা' (১৮৩০), 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯। 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১; ব্রাম্ন সংগীত সংকলন) এবং নীতিমূলক কাহিনী 'বামাতোষিনী (১৮৮১)

প্রাবন্ধিক প্যারীচাঁদ

সমকালীন দেশ, রাজনীতি সাধারণ মানুষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্যারীচাঁদ। তবে তাঁর বেশিরভাগ প্রবন্ধই ইংরেজিতে লেখা। তাঁর অনেক প্রবন্ধ সাময়িক পত্রের প্রয়োজনে লেখা। য়ে সব পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় সেগুলি হল 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১-১৮৪০), দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১৮৪২ —

১৮৪৩) ও রেভারেণ্ড কৃষ্মমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'। এই পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে প্যারীচাঁদের তিনটি জীবনী প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরও তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ 'নব্য ভারত ও থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কলকাতা শাখার মুখপত্র 'পন্থা'-য় প্রকাশিত হয়।

পত্নীর মৃত্যুর পর প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধও রচনা করেন। এরূপ বহু প্রবন্ধ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার নানা পত্র-পত্রিকায় বের হয়। সেই সব প্রবন্দের কিছু কিছু তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ সংকলন 'The spirited stray Leaves' (১৮৭৯) ও 'Thoughts of spiritualism' '১৮৮০' সংকলিত হয়েছে।

প্যারীচাঁদ চলিত ভাষায় লিখেছিলেন 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন সাধু ভাষা। অবশ্য সে ভাষা স্বচ্ছ এবং বলিষ্ঠ।

বাংলায় লেখা তাঁর য়থার্থ প্রবন্ধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সংকলনের সংখ্যা মাত্র তিনটি 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১) ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮) এবং 'এতদেশীয় স্ত্রীলোকদিকের পূর্ব্বাবস্থা' (১৮৭৯)।

কোনো কোনো সমালোচক তাঁর 'রামারঞ্জিকা ও 'য়ৎকিঞ্চিৎ-কে প্রবন্ধ হিসেব বিচার করেছেন। 'রামারঞ্জিকা' স্বামী ও স্ত্রীর আলাপের আঙ্গিকে লিখিত। এই আলাপ সূত্রে মেয়েদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়েছে। ফলে প্রবন্ধের প্রার্থিত সংহতি সৃষ্টি হয়নি। তাই রামারঞ্জিকা প্রবন্ধ নয় এঔঔকটি নীতিভিত্তিক রচনামাত্র।

'যৎকিঞ্চিত' আসলে একটি আধ্যাত্মিক ভাবপ্রধান রচনা। রচনাটিতে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ নামে দুই ব্যক্তি র বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে।

এই আলাপ সূত্রে এসেছে বহু বিষয় এবং বহু তত্ত্ব আলোচনা। একটি আখ্যানের আবরণ থাকলেও 'য়ৎকিঞ্চিৎ'-কে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ঈশ্বরতত্ত্বমূলক দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলনই বলা য়ায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অ-নশ্বরত্ন, পরলোক এবং উপাসনা সংক্রান্ত আলোচনা আছে বিভিন্ন অধ্যায়ে। লিখনশৈলীতে মন্ময় রচনার বৈশিষ্ট অনুভূত হয়। দৃষ্টান্ত ঃ— 'হে পরমাত্মা তুমি সামান্য রূপে সকল বস্তু ও জীবে আছ। তুমি জ্যোতি স্বরূপ, গতিস্বরূপ, আকর্ষণস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ, সুগন্ধস্বরূপ সুরম্য ধ্বনিস্বরূপ! তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বসুখদাতা। বাহ্যরাজ্যে য়েমন দিবাকর প্রজ্বলিত; তেমনি অন্তররাজ্যের তুমি সূর্য্য। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্য ও তিমির তিরোহিত হয়— য়ে আত্মা নত, পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে ও প্রেমেতে পূর্ণ; সেই আত্মাতেই তুমিবিশেষরূপে বিরাজ কর, তখন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়। তোমার অস্তিত্ব প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্জ্বল্যমান'।

'কৃষিপাঠ' (১৮৬১)-এঔঔ বাংলার কৃষিজাত পণ্য বিষয়ে আলোচনা আছে। এটি প্রকাশিত হয় এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি-র উদ্যোগে। এই সভার মুখপত্রে প্রকাশিত প্যারীচাঁদের কিছু প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ (অনুবাদ করেছেন লেখক নিজেই) ভিন্ন কয়েকটি স্বতন্ত্র বাংলা প্রবন্ধও গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। বাংলা দেশের চাষ-আবাদ বিষয়ে তাঁর চিন্তনজাত মন্তব্যগুলির গভীরতা এবং বাস্তবদৃষ্টির তীক্ষ্ণতার প্রমাণ এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া য়ায়।

বাংলার কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ছিল সুস্পষ্ট ধারণা। বাংলার কৃষকদের গৃহীত কৃষিপদ্ধতির সঙ্গে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সম্পর্ক গ্রন্থটিতে নির্ণয় করেছেন প্যারীচাঁদ। এই সূত্রে উদ্ভিদ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যও তিন পরিবেশন করেছেন। তাঁর মতে বাংলার চাষিদের পদ্ধতি বহু ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান সম্মত এবং প্রাচীন পদ্ধতিগুলিরও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা আছে। এই সব কারণে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে সফল প্রবন্ধ। কৃষি-সংক্রান্ত বাস্তব স্পর্শী এই গ্রন্থটি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ব্যতিক্রম একটি নিদর্শন।

'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮)-কে জীবনীমূলক বাংলা প্রবন্ধের বিশিষ্ট নিদর্শন বলা যায়। ডেভিড হেয়ার ছিলেন ঘড়ির ব্যবসায়ী কিন্তু এদেশে এসে তিনি হয়ে উঠেছিলেন শিক্ষাব্রতী। এদেশের বালকদের শিক্ষিত করে তোলাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। প্রতি ছাত্রের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা। একারণে সেই সময়ের প্রায় সব শিক্ষিতক বাঙালিই ডেভিড হেয়ারকে শ্রদ্ধা করতেন। প্যারীচাঁদও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সেই বোধ থেকেই তিনি লিখেছিলেন 'A Biographical sketch of David Hare' (১৮৭৭) বাংলা গ্রন্থটি ওই গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্তরূপ।

'এতদেশীয় স্ত্রীলোক দিগের পূর্ব্বাবস্থা' (১৮৭৯) প্যারীচাঁদের নারীদের প্রতি সহানুভূতি ও স্বদেশ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ। গ্রন্থটিতে সংকলিত ছোটো প্রবন্ধগুলিতে দেওয়া হয়েছে পুরাণ ও ইতিহাসখ্যাত ভারতীয় মহিলাদের সাংসারিক আর আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয়। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে অতীত ভারতে মেয়েদের দেওয়া হত পূর্ণ শিক্ষা। কারণ তাঁরা অর্জন করতেন ইহলোকিক ও আধ্যাত্মিক— উভয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান। তার মতে মেয়েদের শিক্ষা তখনই পূর্ণতা পাবে যখন তারা পরিবার ও সংসারের দায় বহনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তাও করবে। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন প্রাচীন ভারতে মেয়েরা সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জীবন যাপনেরও সুযোগ পেতেন। তাই মেয়েদে মধ্যে ছিল দুটি ভাগ 'সদ্যোবধূ' আর 'ব্রহ্মবাদিনী'। 'সদ্যোবধূরা বিবাহ করে সংসারী হতেন আর 'ব্রহ্মবাদিনী'গণ অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচিন্তা করতেন।

এই গ্রন্থটি থেকে প্যারীচাঁদের ভাবনা কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হল— ''দয়মন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছিলেন, —অরণ্যে পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত— অর্দ্ধবস্ত্র পরিধানা, নিমেষ মাত্র পতিকে বিস্মরণ না করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে পর্য্যটনপূর্ব্বক পুনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।

'প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলার প্রথম যুগের প্রাবন্ধিক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর চিন্তা ছিল স্পষ্ট ভাষা ছিল প্রবন্ধের উপযোগী; বক্তব্যের প্রতিষ্ঠাও ঘটেছে যথার্থভাবে। কিন্তু সামাজিক প্রসঙ্গে তাঁর সন্তান ভারতীয় রক্ষণশীল আদর্শের সমর্থক সমাজ ও নারীসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বিন্যস্ত যুক্তি সমূহ প্রায়শই বিজ্ঞানসম্মত নয়; আধুনিক যুগের ব্যক্তি ত্ব বাদকেও তা তুলে ধরে না। তবে সেই যুগের পক্ষে তাঁর ভাবনা ছিল স্বাভাবিক। বাংলার কৃষি এবং বাংলার নারী এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সময়োপযোগীভাবে তিনি প্রবন্ধের মধ্যে তুলে ধরেছিলেন।

৫.৩ রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)

জীবনী ও শিক্ষা ঃ চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ সালের ৭ অক্টোবর নন্দকিশোর বসুর পুত্র রাজনারায়ণের জন্ম। তাঁর পরিবারে ছিল আধুনিক শিক্ষার আবহ।

শিক্ষা ঃ রাজনারায়ণ বসুর শিক্ষা শুরু হয় হেয়ার স্কুলে। ১৮৪০ সালে তিনি ভরতি হন হিন্দু কলেজে। কিন্তু তিন বছর পরে শারীরিক কারণে তাঁকে কলেজ ছেড়ে দিতে হয়।

হিন্দু কলেজে তিনি ছিলেন মধুসূদনের সহাধ্যায়ী এবং ইংয় বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই গোষ্ঠী পুরোনো অর্থহীন সংস্কার ভেঙে ফেলে বাংলার সমাজ পরিবেশে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন আধুনিক চিন্তা-চেতনা। তাই বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ভারত সচিবের কাছে য়ে আবেদন করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন রাজনারায়ণ। শুধু তাই নয় তিনি নিজেও বিধবা বিবাহ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ তাতপুত্র ুর্গানারায়ণ আর নিজের ভাই মদনমোহনের বিবাহ দিয়েছিলেন বাল্যবিধবাদের সঙ্গে।

জীবিকা ঃ রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রধান প্রতিষ্ঠান তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে তাঁকে ষাট টাা বেতনে উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ করার কাজ দেওয়া হয়। ১৮৪৬ থেকে ১৮৪৯ এই তিন বছর তিনি একাজ করেন।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শিক্ষক পদে য়োগ দিয়েছিলেন। দু বছর পরে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়ুক্ত হন। এই স্কুল থেকেই ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

রাজনারায়ণ বসুর কাম্য ছিল ছাত্রদের মানসিক উন্নতি। তাই তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা কালে নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির বাইরেও বহু কাজ করেছিলেন। ছাত্রদের তিনি পাঠ্য গ্রন্থ ভিন্ন বাইরের বই পড়তে শিখিয়েছিলেন আর বই জোগানোর জন্য গড়ে তোলেন একটি গ্রন্থাগার। এছাড়া ছাত্রদের তিনি পাঠ্য গ্রন্থভিন্ন বাইরের বই পড়তে শিখিয়েছিলেন আর বই জোগানোর জন্য গড়ে তোলেন একটি গ্রন্থাগার। এছাড়া ছাত্র ও শিক্ষিকদের মধ্যে সাহিত্যালোচনার জন্য তিনি স্থাপন করেন বিতর্ক সভা।

শিক্ষার সার্বিক বিস্তার ছিল তাঁর কাম্য। আপন সাধ্যমতো সে কাজ করেছিলেন তিনি। কৃষক-শ্রমিকদের জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন রাতের স্কুল আর মেয়েদের জন্য স্থাপন করেছিলেন বালিকা বিদ্যালয়। তিনি বৃধ্ব ও অসহায়দের সাহায়্য করার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে একটি দরিদ্র ভাণ্ডার গঠন করেছিলেন। এছাড়া ব্রাহ্মধর্মের প্রচারেও তিনি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব ছিল গভীর দেশপ্রীতি। তাঁর প্রভাবে নবগোপাল মিত্র ১৮৭৫-এ শুরু করেন হিন্দু মেলা। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তার প্রথম উদবোধক। ন্যাশনাল সোসাইটি আর ন্যাশনাল স্কুল গঠনের মূলেও ছিল রাজনারায়ণের প্রভাব। ন্যাশনাল সোসাইটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। লর্ড লিটন-এর ভার্নাকুলর প্রেস আইনের বিরুধে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর

সুচনা সময়ের সদস্য রাজনারায়ণ-বসু ছিলেন সঞ্জীবনী সভা' নামের গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠনের সভাপতি। অনেকে মনে করেন এই সভার আদর্শে পরে গড়ে উঠেছিল বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের গোপন সংগঠন সমূহ।

এঔঔকদা রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন রাজনারায়ণ।

তাঁর শেষ জীবন কেটেছিল দেওঘরে। সে সময়ে রাজনারায়ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। সখারামের দেশনুরাগ এবং প্রবন্ধ রচনার প্রবণতা অনেকটাই রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে উন্মেষিত হয়েছিল।

প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণ ঃ

রাজনারায়ণ ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক। বাংলার তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। এক দুই দিকই তাঁর প্রবন্ধ সমূহের উৎসভূমি।

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ছাত্র শিবনাথ প্রথম জীবনে ছিলেন উশৃঙ্খল আর অমিতাচারী। পরে কিন্তু তিনি হয়ে ওঠেন সংযত এঔঔবং স্বধর্মে আস্থাশীল।

শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম—সব দিক দিয়ে সমাজের উন্নতির সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন রাজনারায়ণ। এই কারণে তিনি বিবিধ বিষয়ে নানা স্থানে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিষয়ের একমুখীনতা এবং সংহতির জন্য সেই বক্তৃতাগুলিও অর্জন করেছে প্রবন্ধের মর্যাদা। তাঁর বেশির ভাগ প্রবন্ধই এই সব বক্তৃতার লিখিত রূপ।

রাজনারায়ণ বসু বিষয়প্রধান তন্ময় প্রবন্ধ আর স্মৃতিচারণ মূলক মন্ময়প্রবন্ধ দুই-ই লিখেছিলেন। বিষয়ের দিক থেকে তাঁর প্রবন্ধগুলিকে ধর্ম এবং সাহিত্য এই দুইভাগে বিন্যস্ত করা যায়। তিনি প্রবন্ধ ভিন্ন অন্য কিছু লেখেন নি।

রাজনারায়ণের প্রবন্ধের মধ্যে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশি। কারণ তিনি ছিলেন প্রথম যুগের সুপণ্ডিত ব্রাহ্ম। তাই প্রচার আর ব্রাহ্ম সমাজে পাঠের কারণে তিনি প্রচুর ধর্মভিত্তিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সব বক্ৃতায় ব্রাহ্ম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই নানা ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে হয়েছিল তাঁকে। এই বিস্তৃত জ্ঞানের সঙ্গে মিশেছিল সহজাত সাহিত্য বোধ আর সরস স্বচ্ছ ভাষা। তাই তাঁর প্রবন্ধগুলি নীরস তত্ত্ব কথা হয়নি। তাঁর এ শ্রেণীর প্রবন্ধ-সংকলন হল—'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' (১ম ভাগ ১৮৫৫, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭০ 'ব্রহ্মসাধন' (১৮৬৫), 'ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা' (১ম ভাগ ১৮৬৬, ২য় ভাগ ১৮৬৭), 'হিন্দু ধর্মের (শ্রেষ্ঠতা (১৮৭৩), 'প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে' (১৮৭৩) 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৮৮৩)। 'আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব' (১৮৭৫), 'সারধর্ম্ম' (১৮৮৬) তাম্বুলোপহার (১৮৮৬) এঔঔবং 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭)।

তাঁর কলকাতা ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম সমাজে দেওয়া বক্তৃতার সংকলন 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' (১ম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ)। যুক্তি দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থাপন, দৃঢ়বদ্ধ পরিচ্ছন্ন প্রকাশভঙ্গি এই বক্তৃতাগুলিকে করে তুলেছে প্রবন্ধ।

নানা ধর্ম শাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা, বিভিন্ন তথ্যের যুক্তিভিত্তিক সন্নিবেশ আর সরল প্রকাশ রীতির গুণে 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' (১ম ও ২য়) হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধর্মালোচনা গ্রন্থ। ধর্মতত্ত্ব তাঁর প্রত্যয়ী মনের স্পর্শে এবং সাহিত্যগুণ ও নিবিড় বিশ্লেষণ গুণে হয়ে উঠেছে মনোজ্ঞ।

প্রবন্ধের বিষয় আর রচনা রীতির দিক থেকে তাঁর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনা স্বতঃই মনে আসে।

ধর্ম বিষয়ের প্রবন্ধগুলিতে ব্রাহ্ম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিবাদন করার সময় রাজনারায়ণ কখনও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করেননি। তাঁর রচনারকিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। ''য়খন মানুষের ধর্ম্মমত এত বিচিত্র ও পরিবর্ত্তনশীল, তখন মত লইয়া এঔঔত মারামারি কেন? য়দি ধর্ম্ম বিষয়ে একান্তই তর্ক করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার ও চাতুরী প্রয়োগ না করিয়া উষ্মতাহীন যুক্তি দ্বারা বিধিমতে সৌজন্য প্রদর্শণপূর্ব্বক তর্ক চালান কর্ত্তব্য। তর্ককালে নাস্তিকের প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করা উচিত।'' ('সারধর্ম্ম' ১৮০৭ শকাব্দ পৃ. ১৩)। রাজনারায়ণের ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলি থেকে বোঝা য়ায় য়ে—সংস্কারবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও রাজনারায়ণ বসু ঈশ্বরবিশ্বাসী, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মনে করতেন ধর্মবিশ্বাস মানুষের আত্মোন্নতি এবং সমাজের মঙ্গলের সহায়ক।

ধর্ম-ভিন্ন রাজনারায়ণ বসু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে য়ে সব ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলির সংকলন 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৫) এখানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক এক পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের তুলনায় ভাষার আলোচনাই বক্তৃতাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে তিনি সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি বক্তৃতাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে— ''আমাদিগের কথাপকথনের ভাষার বিশুদ্ধ সম্পাদিত না হইলে বাঙ্গালা বক্তৃতায় বিশেষ নৈপুন্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। খাঁটী ইংরাজীতে কথোপকথন করিলে আমরা ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি, কিম্বা খাঁটী বাঙ্গালাতে কথোপকথন করিলে আমরা বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি। কিন্তু খিচুড়ি করিলে কোন ভাষাই উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি না। য়ে ভাব ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে কোনমতে প্রকাশিত হয় না, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ইংরাজী শব্দ অবশ্য ব্যবহার করা উচিত কিন্তু এমন ভাব অল্পই আছে।

সেই সময়ে প্রাপ্ত সকল তথ্য ব্যবহার দ্বারা তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন সাহিত্য অংশটিতে। আর প্রকৃত গবেষকের মতো তথ্যসূত্র হিসেবে তাঁর অবলম্বন য়ে রামগতি ন্যায়রত্নের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও অন্যান্য কিছু গ্রন্থ সেকথাও বলেছেন। তিনি সংক্ষেপে উপন্যাস গল্প, কবিতা নাটক— প্রতিটিরই আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত এসেছে ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা। তবে নিজস্ব সাহিত্য বোধ দ্বারা রাজনারায়ণ অধিকাংশ স্থলে চালিত হয়েছে। তাই মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁর মত— ''মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাজ্জলতার অভাব। করিব রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। ......কিন্তু এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ সত্ত্বেও কে না স্বীকার করিবে য়ে মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি? 'মেঘনাধ বধ' ব্যতীত 'বীরঙ্গনা' 'চতুর্দশপদী কবিতা' প্রভৃতি তাঁহার অন্য সকল কবিতাও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ করিতেছে।''

'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭৬) 'বিবিধ প্রবন্ধ (১ম খণ্ড, ১৮৮২)— এই তিন প্রবন্ধ সংকলন তাঁর সমকাল-সচেতনতা ও ইতিহাস জ্ঞানের পরিচায়ক গ্রন্থ। এঔঔই সব প্রবন্ধের বিশেষত্ব বিষয় অনুয়ায়ী ভাষার ব্যবহার।

‘আত্মচরিত’— স্বলিখিত এই স্মৃতিকথায় রাজনারায়ণ নিজের কথা একটু বেশি করে বলেছেন। তথাপি পরিবর্তমান সময় আর সমাজের ছবি তাঁর সরস ভাষায় হয়ে উঠেছে বাস্তব। ব্যক্তি-মনের গভীর অনুভূতির ভাষারূপ মন্ময় প্রবন্ধের লক্ষণ-তা ‘আত্মচরিত’-এ বর্তমান। তাই গ্রন্থটিকে বাংলা মন্ময় প্রবন্ধের আদিরূপ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

প্যারীচাঁদ প্রবন্ধে এনে ছিলেন ভাষার স্বচ্ছতা এবং প্রকাশ-শৃঙ্খলা। রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধে দেখা গেল সাহিত্যগুণ এবং বিশ্লেষণ শক্তির সফল সমন্বয়। এইভাবেই ধীরে ধীরে বাংলা প্রবন্ধ বিকাশ লাভ করেছে।

৫.৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭ - ১৮৯৪)

বিশ্বনাথ কর্তভূষণের পুত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়, ১৮২৭ সালের ফেব্রুয়ারি। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ভূদেবের শিক্ষা শুরু হয়েছিল সংস্কৃত কলেজে। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষার জন্য ১৮৩৯ সালে তাঁকে ভর্তি করা হয় হিন্দু কলেজের সপ্ত শ্রেণীতে। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় ১৮৪২ সাল থেকে তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের নব্য বাঙালিদের সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও ভূদেবের মনে হিন্দু ধর্ম এবং ঐতিহ্যমুসৃত আদর্শে ছিল দৃঢ়বিশ্বাস।

জীবিকা ঃ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূদেবের জীবিকা ছিল শিক্ষাকেন্দ্রিক। তিনি শিক্ষকতা করেছিলেন হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে এবং চন্দননগর সেমিনারি স্কুলে। দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন ভূদেব নিজেই। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অ্যাডিশনাল ইন্‌সপেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি হয়েছিলেন বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের প্রথম শ্রেণির কর্মী। অবসর গ্রহণের সময় তিনি ছিলেন শিক্ষাসংক্রান্ত হান্টার কমিশন-এর (২৩।৭। ১৮৮৬) সদস্য। ১৮৭৭-এ তাঁকে দেওয়া হয়ে সি. আই. ই. উপাধি। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়েছিলেন।

পত্রিকা সম্পাদনা ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার’ এবং সরকারি পত্রিকা ‘এডুকেসন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ’—এই দুটি পত্রিকার সম্পাদক দ্বিতীয় পত্রিকাটি সরকারি হলেও তার পুরো দায়িত্ব ছিল ভূদেবের উপর।

ভূদেব হিন্দি ভাষায় উন্নয়নের জন্য বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড স্থাপন করেছিলেন।

ভিন্ন প্রদেশের ভাষার উন্নয়নের জন্য এই প্রয়াস তাঁর মানসিক ঔদার্য্যের প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষা শেখানোর জন্য তিনি পিতার নামে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী এবং মায়ের নামে আয়ুর্বেদ চর্চার কেন্দ্র ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সামগ্রিক সাহিত্য চর্চা ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্য মনে রেখেছে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ (১৮৫৭) -এর রচয়িতা হিসেবে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫) ‘পুষ্পাঞ্জলি’ ১ম ভাগ, ১৮৭৬। এছাড়া তিনি বেশ কিছু বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন।

তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে আছে ‘শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৬), ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ (১৮৮২), ‘সামাজিক

প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৫), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ ১৮৯৫, দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৫)। তাঁর প্রবন্ধ সমূহের অধিকাংশই তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা দুটিতে মুদ্রিত হয়েছিল। ভূদেব ইংরেজি সাহিত্যের মনোয়োগী পাঠক ছিলেন। পাশ্চাত্যের অন্যান্য সাহিত্য সম্বন্ধে ও তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। কিন্তু তিনি কখনই বিদেশীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করেননি। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি নিবিড় প্রীতিই ছিল তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য। দেশজ ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই তিনি দেশের উন্নতির বিষয় ভেবেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধসমূহে পাওয়া য়ায় তারই পরিচয়। শিক্ষা সম্পর্কে অনুরাগ এবং শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রকাশ দেখা য়ায় তার প্রবন্ধে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলিকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করা য়ায়—(১) শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ,

(২) বাঙালির গৃহজীবন ভিত্তিক প্রবন্ধ এবং

(৩) হিন্দু সমাজ ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কিত প্রবন্ধ। এছাড়া সাহিত্য এবং কর্ম সম্পর্কেও তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

(১) শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ ঃ

শিক্ষকতা এবং শিক্ষা বিভাগের কাজ ভূদেবকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করেছিল। দেশমনস্কতার জন্য এ ব্যবস্থার দোষ স্থালনের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন কিছু প্রবন্ধ। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ— 'শিক্ষা বিষয়ক 'প্রস্তাব' এঔঔর প্রমাণ। গ্রন্থটিরবিষয় এদেশের শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর শিক্ষা দেওয়ার উপায় সম্পর্কে চিন্তাসমৃদ্ধ কিছু কথা লিখেছেন। দেশের মানুষ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করুক এই কামনা নিয়েই তিনি এদেশের এবং বিদেশের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপয়োগিতা সম্পর্কে ভেবেছিলেন। নিপুন বিশ্লেষণ দ্বারা দুই পদ্ধতির দোষ-গুণ বিচার করে তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন নতুন একটা শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী।

এই প্রবন্ধের শেষাংশে ভূদেব স্কুলের নিয়ম সম্মত শিক্ষারীতি আর গৃহে ছোটোদের শিক্ষিত করে তোলার বিধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপযুক্ত উদাহরণ দেওয়ার আলোচনাটি উপদেশ মূলক হলেও হয়েছে হৃদয়গ্রাহী।

শিক্ষাতাদা এঔঔবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি এবং শ্রদ্ধার মনোভাবই য়ে সর্ববিধ শিক্ষার য়থার্থ ভিত্তি তা ভূদেবের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ দিলে তা বোঝা য়াবে।

''বালকদিগের সহিত শিক্ষকের প্রণয় করা কর্ত্তব্য। এই কথা সকলেরই অনুমত বটে। কিন্তু ইহা প্রতিপালনের উপয়ুক্ত কর্ম্ম করায় প্রথমতঃ অনেকের প্রবৃত্তি হয় না।'' এদেশের শিক্ষক এবং পিতামাতা— কেউ-ই দান ও সন্তানের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সঙ্গী হন না। কারণ সম্ভ্রমহানির অমূলক ভয়। ভূদেবের মতে— ''এইরূপ বিবেচনা করেন বলিয়াই বালকদিগের ক্রীড়া তাহাদিগের পাঠের প্রতিবন্ধক হয়, এবং শৈশবাবস্থাতেই এত কুসংস্কার জন্মে। য়দি শিক্ষকেরা বালকদিগের ক্রীড়ার সংসর্গী হন, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ কিছুই হইতে পারে না। ক্রীড়াও নানা সুশিক্ষার সহকারিণী হয়, ...'' (পৃ. ৩০। 'শিক্ষাবিদায়ক প্রস্তাব' ১২৮৮ বঙ্গাব্দ)।

ভূদেবের বিশ্বাস ছিল বেদসমকালীন গৃহস্থ ব্রাহ্মনের জীবনের আদর্শে বাঙালি হিন্দু নিজের গৃহ তথা সমাজকে গড়ে তুলতে পারলেই তার জীবন হবে সুখময়। তার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন য়ৌথ পরিবারের আদর্শ। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২)-এ সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধের মূল সুর এই আদর্শের সম্যক অনুসরণ তৎকালীন

হিন্দু বাঙালির একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের বাস্তব চিত্র আছে এ গ্রন্থের প্রবন্ধ সমূহে। নিবিড় পরিচয়ের জন্য এই পরিবার-ব্যবস্থার ত্রুটি দুর্বলতা জানা ছিল ভূদেবের। তাই তিনি এই বিন্যাসের উন্নতির জন্য পরিবারের নারী-পুরুষের পালনীয় কর্তব্য ও সদাচারের তালিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তার মতে বহু পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সমাজ। আর উন্নত শক্তিমান পরিবারই সমাজকে করে তোলে বলবান। সেই পরিবারের সমুন্নতির জন্য ভূদেব লিখেছিলেন 'বাল্যবিবাহ' 'দাম্পত্য প্রণয়' 'গৃহিনী-পণা, 'কুটম্বতা', 'অতিথি সেবা' প্রভৃতি উপদেশ মূলক অথচ সরস প্রবন্ধ। বাস্তব অভিজ্ঞতা আর আন্তরিক সদেশপ্রেমের গভীরতার ভাষারূপ এই প্রবন্ধগুলি বিষয়ের দিক থেকেও অভিনয়। তাঁর আগে বাঙালির গৃহজীবনের অনুপুঙ্খ নিয়ে প্রবন্ধ রচনার কথা কেউ ভাবেননি। পরেও এরূপ চিন্তা প্রবন্ধিকদের মধ্যে দুর্লভ।

'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঙালির সমাজ-ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। তার সঙ্গে ভারতবর্ষ এওঔবং পাশ্চাত্যের সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত অনেক মতের আলোচনা করে দেখিয়েছেন কোন পথে সমাজের সম্যক বিকাশ সম্ভব। ছয় অধ্যায়ের এই গ্রন্থটি লেখকের পাঠ বিস্তৃতি ও বিচার দক্ষতার পরিচায়ক। নানা দেশ ও জাতির সমাজের গঠন এবং স্বাভাবিক প্রবণতার আলোচনাও তিনি করেছেন। হিন্দু সমাজের প্রকৃতি এবং বিশেষত্ব তিনি যুক্তি এবং উদাহরণ দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে।

ভূদেব জাতীয়তাবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রদেশভিত্তিক সংকীর্ণতা ছিল না। তাই ভারতের একতার জন্য ভাষাগত ঐকের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এবং ভারতের নানা ভাষার মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দির উপয়োগিতা বুঝেছিলেন। ভবিষ্যবিচার ভারতবর্ষের কথা (ভাষা-বিষয়ক)' প্রবন্ধে য়ে কথাই তিনি বলেছেন। স্বাধীন ভারতে হিন্দির রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি ভূদেবের দূরদৃষ্টি ও বিচারবোধের ভ্রান্তিহীনতার পরিচায়ক।

ভূদেব হিন্দু কলেজের ছাত্র এওঔবং পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হলেও হিন্দু ব্রাহ্মণের পালনীয় আচার সমূ নিষ্টাভরে মেনে চলতেন। ব্রাহ্মণ হিন্দুর অবশ্য পালনীয় আচার, বিবিধ অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয়তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'আচার-প্রবন্ধ' (১৮৯৫) পুস্তকে। এ গ্রন্থে ভূদেব য়ছেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে য়া লিখেছেন সেইমত (আমরা গ্রহণ না-ও করতে পারি। তবে নিজের মতামতকে তিনি য়েভাবে সাহিত্যে গুণান্বিত প্রবন্ধরূপ দিয়েছেন—তা এই সাহিত্য-সংরূপ নির্মানে তাঁর নিপুণতার প্রবাণ।

কর্মময় জীবনে সাহিত্যচর্চার অবকাশ তিনি কমই পেয়েছেন। য়েটুকু পেয়েছেন তা দেশ, সমাজ, পরিবারে কল্যাণমূলক (অবশ্যই আপন দৃষ্টি-ভঙ্গি অনুসারে) প্রবন্ধ রচনাতেই ব্যয়িত হয়েছে। তথাপি তিনি কয়েকটি সাহিত্যে বিচার কেন্দ্রিক প্রবন্ধ লিখে গেছেন। সেগুলি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (১৮৯৫), সংকলিত হয়েছে। এই সব প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে 'উত্তরচরিত' 'রত্নাবলী', মৃচ্ছকটিক' । এওঔই সব প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব অনুসারে রচনাগুলির সাহিত্যগুণ বিচার করেছেন।

তাঁর ব্যাখ্যা পদ্ধতি জটিল নয়। তবে আবেগের আধিক্য তাঁর সমালোচনার একটি ত্রুটি। তবে মাঝে মাঝে তিনি মৌলিক বিশ্লষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, 'উত্তরচরিত না রামসীতার পূনর্মিলন ভিত্তিক তৃতীয় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী'-র তুলনামূলক আলোচনা মৃচ্ছকটিক'—নাটকের রচয়িতা শূদ্রক সম্পর্কিত আলোচনা—তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা রীতির নিজস্বতার পরিচায়ক।

'বিবিধ প্রবন্ধ' ২-য় ভাগ (১৯০৫)-এওঁও আছে, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব এবং তন্ত্র সংক্রান্ত কিছু প্রবন্ধ। এ গ্রন্থের তন্ত্রবিষয়ের প্রবন্ধগুলি ভূদেবের শানিত যুক্তি বিন্যাস আর সরল প্রকাশভঙ্গির পরিচয় পাওয়া য়ায়।

প্রবন্ধের নির্দিষ্ট আঙ্গিকে রচিত না হলেও ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি' ১ম ভাগ (১৮৭৬) ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫) গ্রন্থদুটিকে প্রবন্ধ লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ বলা য়ায়। 'পুষ্পাঞ্জলি' কথোপকথনের আঙ্গিকে রচিত। বেদব্যাস এবং মার্কণ্ডেয় মুনির আলাপের মাধ্যমে এদেশের তীর্থগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। তিনি প্রসঙ্গত এদেশের মূর্তি ও মন্দিরশিল্প এবং সভ্যতা সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। এ গ্রন্থে তিনি ভারতের দেবীরূপ বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এই বর্ণনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে দেশের দেবীমূর্তি কল্পনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। লেখকের ধর্মবিশ্বাস, ইতিহাসজ্ঞানের সঙ্গে দেশপ্রীতির মিশ্রণে রচনাটি কিছুটা মন্ময় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

ভূদেব ইতিহাসবিদ ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর দুটি আখ্যানেরই উৎস ইতিহাস। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' তাঁর ইতিহাস প্রীতি আর দেশপ্রেমের মিশ্রণে হয়ে উঠেছে একটি উৎকৃষ্ট মন্ময় প্রবন্ধ। প্রবন্ধের বিষয় পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের জয়লাভ এবং হিন্দু শাসনাদীন স্বাধীন ভারতের গৌরবময় উত্তান। সংস্কৃতি প্রভাবিত হলেও রচনাটির ভাষা সজীব এবং সুন্দর। ব্যক্তি মনের ঐকান্তিক বাসনা রচনাটিতে য়থায়োগ্য যুক্তিসহ উপস্থাপিত। তাই এটিকে আমরা মন্ময় প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

প্রবন্ধের ভাষা ব্যবহার ও অন্যান্য বিশেষত্ব ঃ

পরিবারের সংস্কৃত-ভাষা চর্চা ও শাস্ত্রজ্ঞানের আবহ ভূদেবের ভাষাকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি সংস্কৃতানুসারী হলেও তাঁর ভাষা সরল এবং সহজবোধ্য, সংস্কৃত শব্দ বাহুল্যে পীড়িত নয়। ভাষার সরলতা তাঁর চিন্তার স্পষ্টতা প্রকাশের সহায়ক হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। বিষয়ের প্রয়োজনে তিনি তদ্ভব ও দেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে সপ্রাণ এবং বক্তব্য প্রকাশের সহায়ক। বিষয় অনুয়ায়ী ভাষা ব্যবহারের নিপুণ ভূদেব পরিভাষা নির্মাণে-ও কৃতী। প্রগাঢ় দেশপ্রেম হেতুই তিনি বাংলা প্রবন্ধে বিদেশি শব্দ বা পদ ব্যবহার য়তদূর সম্ভব এড়িয়ে গেছেন সমাজনীতি আর রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে য়ে সব পরিভাষা গঠন করেন তার অনেকগুলি এখন্য বর্তমান। য়েমন Stone Age প্রস্তর যুগ, Foreign Trade বহির্বাণিজ্য, Ethics নীতিশাস্ত্র। ভূদেবের ভাষাজ্ঞানের গভীরতাই এর দ্বারা প্রমাণিত হয়।

উপদেশ প্রবণতা আর নির্দেশ বহুলতা ভূদেবের প্রবন্ধের প্রদান ত্রুটি। কিন্তু প্রকাশরীতির সরলতা এবং অনুভব-গাঢ়তার সমন্বয়ে ভূদেবের প্রবন্ধ লাভ করেছে সাহিত্যগুণ। বক্তব্যের সরল বলিষ্ঠ প্রকাশ ও ভূদেবের প্রবন্ধের অন্যতম বিশেষত্ব।

বিষয় বৈচিত্র্য ভূদেবের প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষণ। এক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী অন্য প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যে নেই বলেই হয়। এই সব কারণে বাংলা প্রবন্ধের বিকাশ ধারায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় অন্যতম দ্যুতিময় এক সাহিত্যব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত।

একক ৭ নাট্যসাহিত্য

৭.০ - প্রস্তাবনা

৭.১ - বাংলার প্রথম ট্র্যাজেডি (জি. সি গুপ্ত)

৭.২ - বাংলার প্রথম যথার্থ নাটক (তারাচরণ শিকদার)

৭.৩ - সৃজন পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার (রামনারায়ণ তর্করত্ন)

৭.৪ - নাট্যরচনার আন্তরিক প্রয়াস (কালীপ্রসন্ন সিংহ)

৭.৫ - প্রগতি চেতনার প্রকাশ (উমেশচন্দ্র মিত্র)

৭.৬ - আধুনিক নাটকের প্রবর্তক (মধুসূদন দত্ত)

৭.৭ - বিদ্রোহী নাট্যকার (দীনবন্ধু মিত্র)

৭.৮ - পৌরানিক নাটকের সফল রচয়িতা (মনোমোহন বসু)

৭.৯ - নাটক প্রতিবাদ (উপেন্দ্রনাথ দাস)

৭.১০ - বিচিত্র প্রতিভার সমন্বয় (রাজকৃষ্ম রায়)

৭.১১ - বাংলা নাটক ফরাসিয়ানা (জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর)

৭.১২ - বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের শ্রেষ্ঠ পুরুষ (গিরীশচন্দ্র ঘোষ)

৭.১৩ - রসনির্মাতা তীব্র ব্যঙ্গ ও আক্রমণ (অমৃতলাল বসু)

৭.১৪ - ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

৭.১৫ - ঐতিহাসিক পৌরানিক গীতিনাট্যের জনপ্রিয় লেখক (ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদ)

৭.০ প্রস্তাবনা

আধুনিক বাংলা নাটক পাশ্চাত্যে প্রভাবে গড়ে উঠেলেও তার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। বাংলা তথা ভারতীয় নাটকের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃত সাহিত্যে। ঋগ্বেদের সংবাদ মূক্তর মধ্যে নাটকের অস্ফুট কিন্তু অনিবার্য প্রকাশ ঘটেছিল তা পরবর্তী কালে ঋদ্ধ সংস্কৃত নাটকের আবির্ভাব সম্ভব করেছিল। এই মহৎ ঐতিহ্য থেকে ঋক্য গ্রহণ করে বাংলা নাটক নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলা নাটকের সৃষ্টির মূলে লোক ঐতিহ্যকেও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা লোকনাটকেরও এক উজ্জ্বল অতীত আছে। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে যাত্রা পাঁচালী ইত্যাদি লোকায়ত প্রয়োগশিল্পর কথা মনে পড়বে। যদিও সে ধারা ঈষৎ ম্লান হয়ে পড়েছিল।

ইংরেজ আগমনের পর বঙ্গারঙ্গশালার আবার উজ্জীবন ঘটে। নাট্যশালার প্রদীপ জ্বলে ওঠে, কুশীলবদের পদসঞ্চারে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মঞ্চ, রচিত হয় বিভিন্ন নাটক। অবশ্য প্রথম পর্যায়ে এই সব নাটক ছিল ইংরেজি ও সংস্কৃতর অনুবাদ, কারণ তখনও বাঙালী নাট্যকাররা সৃজনের স্বভূমি নির্ণয় করতে পারেনি. কিন্তু ক্রমে নবনবো মেষ শালিনী প্রতিভায় বাংলার নাট্যকার মৌলিক নাটক রচনায় ব্রতী হন। বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক হল যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তর 'কীর্তিবিলাস' - বাংলার প্রথম ট্রাজেডি, এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'- বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ নাটক।

৭.১ বাংলার প্রথম ট্রাজেডি

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী নাট্যরসিকদের বিভ্রান্ত বিচলিত নাট্যাদর্শ এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শম্বুক গতিতে পরিবর্তনের পথ ধরেছিল। নাট্যস্রষ্টারা এসময় বুঝতে পারছিলেন যে, আধুনিক আদর্শে মঞ্চোপযোগী নাটক লেখা সম্ভব। ঘটনা চক্রে এই উপলব্ধি থেকে লেখা নাটকগুলি মঞ্চের দাক্ষিণ্য পায় নি। অভিনয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েও শেষ পর্যন্ত এগুলি অনভিনীতই থেকে যায়। কিন্তু এই সব নাট্য প্রয়াসে সে সময়ের নাট্যরসিক বাঙালীর আন্তরিক চাহিদার স্বরূপটি আভাসিত হয়ে আছে।

এই নাটক গুলির মধ্যে প্রথম প্রকাশ গৌরব জি. সি. গুপ্ত রচিত 'কীর্তিবিলাস'-এর। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে জি. সি. গুপ্তের নামে এটি প্রকাশিত হয়। জি.সি. গুপ্তের প্রকৃত নাম নিয়ে একসময় যথেষ্ট বির্তক হয়েছিল। তবে এখন সাধারণ ভাবে এটা স্বীকৃত যে ইনি যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত। বেথুন সোসাইটির সদস্য তালিকায় তাঁর নাম পাওয়া যায়। রেভারেন্ড লহ তাঁর প্রকৃত মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকায় 'কীর্তিবিলাসের' রচয়িতা হিসেবে জি.সি. গুপ্তের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। ড. সুকুমার সেন-ই সর্বপ্রথম কীর্তিবিলাসের প্রসঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, 'রচনা অমার্জিত এবং বিশৃঙ্খল হইলেও বিষাদন্ত নাটক রচনার প্রথম প্রয়োগ বলিয়া কীর্তিবিলাসের ঐতিহাসিক মূল্য আছে'। অবশ্য আর একটি দিক থেকেও কীর্তিবিলাস উল্লেখযোগ্য; কীর্তিবিলাসই আধুনিক যুগে রূপকথাকে নবতর অর্থে প্রথম ব্যবহার করেছে। নাটকের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় -এর দীর্ঘ ভূমিকা।

কৃতবিদ যোগেন্দ্র চন্দ্র এই ভূমিকায় এ্যারিস্টটলের ট্রাজেডিতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। এমন কি সেখানে সেনেকা প্রসঙ্গ ও আছে। পাশ্চাত্য নাট্যবিদদের নাট্যদল সম্বন্ধে তাঁর সুপরিচয়ের প্রমাণ এই ভূমিকায় মেলে। সে সময়কার বাঙলা নাট্য জগতের আবহাওয়া বোঝার ক্ষেত্রে এই ভূমিকাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যে সচেতন ভাবেই ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্ন রসে নাটক লিখছেন- একথাও ভূমিকাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এখানে যোগেন্দ্র চন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও যুক্তিবাদী মনটিও নানা মন্তব্যে আভাস প্রকাশ লাভ করেছে। এদেশে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত নাট্যদর্শকের যে বলিষ্ঠতায় সমালোচনা করেছেন তা নি:সন্দেহে প্রশংসনীয়। তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পন্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দু:খাভিনয় করিবার সময়ে তাঁহাকে দু:খার্নবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরি ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদগ্রস্ত হইবে না, এমত নয়ে? ''কীর্তিবিলাস'' পঞ্চাঙ্ক নাটক। এর 'অভিনয়' বা দৃশ্য সংখ্যা ১৭। নতুন আঙ্গিকের কথা বললেও নাট্যকার সংস্কৃতি রীতি অনুসারী 'নান্দী' ও সূত্রধরের অবতারণা করেছেন। নাটকের শেষে একটি ভরতবাক্য ও উচ্চারিত হয়েছে।

এ নাটকের কাহিনী শেকস্‌পীয়ারের হ্যামলেট ও দেশীয় রূপকথার সমন্বয়ে গঠিত। কাহিনীটি হল,—

হেমপুরের রাজা চন্দ্রকান্ত; তাঁর দুই ছেলে কীর্তিবিলাস ও মুরারি। বৃদ্ধ বয়সে রাজা বিপত্নীক হয়ে তরুণী নলিনীর দার পরিগ্রহ করলেন। নতুন শ্যালক হল তাঁর পরামর্শদাতা। একই সঙ্গে প্রায় প্রাণনাথ নাথে এক দুশ্চরিত্র পারিষদ ও জুটল তাঁর। প্রাণনাথের দুষ্কর্মে বাধা দিতে গিয়ে কীর্তিবিলাস এক গভীর চক্রান্তের শিকার হলেন। তরুণী নলিনী কীর্তিবিলাসের প্রণয়াকাঙ্কানী হয়ে প্রত্যাখ্যাতা হলে এই চক্রান্ত আরো ঘনীভূত হয়ে উঠল। নলিনী রাজাকে কৌশলে কীর্তিবিলাসের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলল। বৃধস্য তরুণী ভার্যা হলে যা হয়, তা-ই হল; রাজা কীর্তিবিলাসকে প্রাণদণ্ড দিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনিই সেই আদেশ রহিত করলেন এরপর অসুস্থ হয়ে রাজা মারা গেলেন। এদিকে প্রাণদন্ডাদেশের খবর পেয়ে এবং কীর্তিবিলাসের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী আত্মহত্যা করলেন। সৌদামিনীর আত্মহত্যা কীর্তিবিলাসকেও আত্মঘাতী করল।

কাহিনী বিশ্লেষণে দেখা যাবে রূপকথার আধারে হ্যামলেটের ছায়ায় এ নাকি অনেকটাই আচ্ছন্ন। তবে হ্যামলেটের সঙ্গে এ কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্যও আছে। দেশীয় ঐতিহ্যের প্রচল রীতি মনে রেখে নাট্যকার রানীর নয়, রাজার পুনর্বিবাহ দিয়েছেন। এছাড়া কীর্তিবিলাস হ্যামলেটের মত আত্মমুখিন, জটিল, 'আত্মজিজ্ঞাসা বিব্রত' চরিত্র নয়। তবে পরিণতিগত দিক থেকে হ্যামলেটের সঙ্গে কীর্তিবিলাসের মিল আছে।

যোগেন্দ্র গুপ্ত এ নাটকের ভূমিকায় ট্রাজেডিতত্ত্ব আলোচনা করলেও নাটকের তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে সার্থক হয়ে উঠতে পারেন নি। মৃত্যু, আত্মহনন ইত্যাদি থাকলেও ট্রাডেডির গভীরতা ও ব্যাপ্তি এখানে অনুপস্থিত থেকে গেছে। ট্রাজেডির গাম্ভীর্য রক্ষার প্রয়াস থাকলেও তা কখনোই ট্রাজেডির উত্তুঙ্গ মহিমা স্পর্শ করে নি।

কীর্তিবিলাসের কাহিনীকে নাট্যকার যথেষ্ট গতিশীল রেখেছেন। কিন্তু এর জন্য কোনো কোনো দৃশ্য অতিমাত্রায় সংক্ষেপিত হয়েছে। সংলাপ তথা ভাষার ক্ষেত্রে সমকালীন কাব্য জগতের অল্পবিস্তর প্রভাব দেখা যায়। সংলাপে নাটকীয়তা ও সংগীতের যথোচিত ব্যবহারের প্রয়াসও লক্ষণীয়? তির্যক গদ্য সংলাপ রচনায় যোগেন্দ্র চন্দ্র অনেক ক্ষেত্রেই বেশ উজ্জ্বল। যদিও দুর্ভাগ্যবশত নাটকটি সে যুগে অভিনীত হয় নি; নাট্যসাহিত্য রূপেও উল্লেখ্য জনপ্রিয় যায় নি, তবু বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এর ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। কীর্তিবিলাসের নায্য সাফল্য যতখানি, নাট্যকার হিসেবে যোগেন্দ্র চন্দ্রের সার্থকতার সীমাও ঠিক ততটুকুই।

৭.২ বাংলার প্রথম যথার্থ নাটক

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সূচনাপর্ব থেকেই বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় একটা নূতন বেগের সঞ্চার হয়। এই কালপর্বকে বাংলা নাটকের যথার্থ জন্মের প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। প্রচলিত সংস্কৃত নাট্যরীতি থেকে সরে এসে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি সংমিশ্রণের প্রয়াস এই পর্বের নাটকগুলিকে ঐতিহাসিক মূল্য দান করেছে। যদিও এই নাটকগুলির হয়ত সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

'ভদ্রার্জুন' নাটকটি এই ধারারই গোত্রভুক্ত। এর রচয়িতা জেনারেল অ্যাসেম ব্লিজ ইনস্টিটিউশনের গণিত শিক্ষক **তারাচরণ শিকদার।** 'ভদ্রার্জুন' ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।. নাটকটি 'অভিনীত হবে' শোনা গেলেও অভিনীত হওয়ার কোনো সংবাদ মেলে না। নাটকটির ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার যে 'ইউরোপীয় নাটক প্রায় নাটক রচনায় প্রয়াস করেছেন তা স্পষ্ঠতই জানানো হয়েছে এই ভূমিকায়। সমকালীন অনূদিত সংস্কৃত নাটকের চরিত্রের যথার্থ বিশ্লেষণ ও এখানে আছে। প্রসঙ্গে এসে এখানে নাট্যকার জানিয়েছেন,...'....এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলব গণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনাই ভক্ত গণ আসিয়া ভন্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয় কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই উহার মূল কারণ।

'ভদ্রার্জুন' এই অভাব দূরণের লক্ষ্যেই রচিত। এর কাহিনী মহাভারতীয়। মহাভারতের আদিপর্ব থেকে সুভদ্রাহরণ 'প্রস্তাব ভদ্রার্জুণ'-এর মূল বিষয়। প্রথম অঙ্কে দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাসে নারদ কর্তৃক পঞ্চ পান্ডবদের নিজেদের মধ্যে নিয়ম সংস্থাপন ও সেই নিয়ম লক্ষণের ফলে বারো বছরের জন্য অর্জুনের তীর্থবাস যাত্রা।

দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বারকায় বসুদেবের প্রাসাদ বর্ণনা ও সুভদ্রাকে পাত্রস্থ করার জন্য উৎকণ্ঠার বিবরণ রয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কে অর্জুনের প্রতি সুভদ্রার প্রেম সঞ্চার ও পূর্বরাগের বর্ণনা। এছাড়া এখানে বলভদ্র সুভদ্রাকে দূর্যোধনের হাতে সমর্পন করবেন বলে ঠিক করে নাটকের দ্বন্দ্ব সম্ভাবনার বীজবপন করেছেন। বলা বাহুল্য, এই সম্ভাবনা অবশ্য অঙ্কুরেই বিলীন হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কে দুর্যোধনের বিবাহযাত্রা; পান্ডবেরা বরযাত্রী যদিও পান্ডবেরা জেনে গেছেন যে সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের ইতিমধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। আসলে অর্জুনহীন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে রাজি নন,—

'অর্জুন নিকটে নাই তাহে ভীত মন
যদি উপস্থিত হয় কে করিবে রণ।।
তাই, সম্ভাবে গমন কর না কর কলহ
বরযাত্রী ভাবে যাও কৌরবের সহ'।।

পঞ্চম অঙ্ক নাটকের **climax** পর্ব। কিন্তু নাট্যকার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। প্রেম ও বীর্য যে উতুঙ্গ মহিমা লাভের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল তা পরিণতি পেল নিতান্তই সাধারণভাবে। এই অঙ্কে দুর্যোধনের ব্যর্থতা ও অপমান, কৌরবদের প্রত্যাবর্তন ও বলভদ্রের ব্যর্থতা জনিত অভিমান-ই-হল বর্ণিত বিষয়। দুঃখিত বলভদ্রের লোকালয় ত্যাগের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে।

তারাচরণ তাঁর নাটকে মহাভারতের ঘটনার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এই অনুসরণে কোনো মৌলিক ভাব-ভাবনা নেই। কালের কারণেই হোক বা প্রতিভার তারতম্যের কারণেই হোক, নাট্যকার মহাভারতীয় বৃত্তেই আবদ্ধ থেকে গেছেন। ফলত, কোথাও কোনো ঘটনা কোনো তীব্র সঙ্কটের মুখোমুখি হয় নি। বলরাম, দুর্যোধন ও দুঃশাসন চরিত্রে অল্পবিস্তর অভিনবত্ব থাকলেও অন্যান্য চরিত্রগুলি যেন মঙ্গলকাব্যের বাহুবেষ্টনী থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে নি। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক তারাচরণ তাঁর নাটকে নতুন কোনো জীবন বোধ সঞ্চারিত করতে পারেন নি। তার জন্য বাংলা নাটককে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

নাট্যসমালোচকের মতে, 'এ নাটকের প্রাণধর্ম বিদ্যাসুন্দরীয় সাহিত্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত'। মহাভারতের আখ্যানের **classic** মাত্রা বর্জন করে নাট্যকার এই কাহিনীকে বাঙালীর পারিবারিক বৃত্তে প্রায় টেনে এনেছেন। নানা আচার অনুষ্ঠানের সময়, রঙ্গরসিকতার সময় 'ভদ্রার্জুণ' বাঙালীর একান্ত (ঘরোয়া) পরিবেশে নিমজ্জিত হয়েছে। গঠনগত দিক থেকে অভিনবত্ব সৃষ্টির আন্তরিক প্রয়াস থাকলেও মর্মগত দিকে এ নাটক সেকেলে, একান্তই মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের ঘরানারই সন্তান।

নাটকের সংলাপ গদ্যপদ্য মিশ্রিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পয়ারের প্রয়োগই দেখা যায়। তবে পয়ার ব্যবহারে তারাচরণের অভিনবত্ব প্রশংসনীয়। ত্রিপদীও ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্য সংলাপ চরিত্র নির্বিশেষেই সাধুধর্মী । বাতুল, মদ্যপায়ীও পৌরাণিক চরিত্রগুলির মত সাধুভাষা ব্যবহার করেছে। অবশ্য বিক্ষিপ্ত ভাবে কথ্য ভাষার প্রয়োগও মেলে।

এ নাটকের তিনটি গান আছে। নব্যপন্থী তারাচরণ নাটকে সংগীত যোজনাকে **'dramatic relief'** সৃষ্টির উপাদান হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি এ ব্যাপারে দর্শকদের রুচির প্রতিও বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। তার প্রমাণ, —

ঐ আসতেছে অর্জুন
আমি মদের জন্য হব খুন
যখন অর্জুন আসবে কাছে
তার কাচে ভিক্ষা চাব,
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে
তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।

মোটকথা, বাংলা নাটকের প্রস্তুতি পর্বে তারাচরণে নতুন প্রণালীতে নাটক রচনার প্রচেষ্টাই তারাচরণের ভদ্রার্জুনের উল্লেখযোগ্যতার প্রধান কারণ। নতুন আলোকে পুরাকাহিনীকে আলোকিত করার মধুসূদনীয় প্রতিবা তাঁর ছিল না, সে চেষ্টাও তিনি করেন নি। কিন্তু 'মামুলি কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাংলা সাহিত্যে' তাঁর। সজীবাঙ্কন ক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অন্তরঙ্গে মঙ্গলকাব্যীয় হলেও বহিরঙ্গে 'ভদ্রার্জুন' আধুনিক — এরও কম উল্লেখযোগ্যতা নেই।

৭.৩ সৃজন পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার

বাংলা নাট্যসৃজন পর্বের সর্বাধিক শক্তিশালী নাট্যকার **রাম নারায়ণ তর্করত্ন** (১৮২২-১৮৮৬) প্রকৃতপক্ষে

বাংলা নাটককে আধুনিকতার প্রান্তসীমায় উপনীত করলেন। প্রখর সমাজসচেতনতা মানবিকবোধ ও শিল্পনির্মাণ ক্ষমতা তাঁকে বাংলা নাটকের অগ্রণী শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে। উনিশ শতক রেনেসাঁসের আলোকধারায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত কলকাতার অন্ধকার এক দিক ছিল যেখানে সামাজিক অন্যায় অবিচার বেদনার যে প্রবাহ ছিল তাকে প্রকাশ করেছেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। একজন সংস্কৃত জানা বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পন্ডিত ব্রাহ্মণ সমাজের লোভ লালসা নীচতা বিকৃতির যে ছবি এঁকেছেন তা বিস্ময়কর। মূলত কৌতুকের মাধ্যমে নাট্যকার সমাজের বিকার ব্যভিচারকে আঘাত করেছেন, প্রবল বেদনা তীব্র ব্যঙ্গে মর্মপ্রদাহীরূপ নির্মাণ করেছে। সামাজিক প্রহসন, পৌরাণিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নাটক লিখেছেন রামনারায়ণ তর্করত্ন।

'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪) রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রথম নাটক যা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে উপনীত করে। একে বাংলার প্রথম সামাজিক নাটক বলা যায় কৌলীন্যপ্রথার বর্বরতা বীভৎসতা দোষ অসঙ্গতি বেদনায় ও হাস্যরসাত্মক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক কুলীন কুলমর্যাদারক্ষার্থে তার চার মেয়েরই বিয়ে দেয় এক অতিবৃদ্ধ কুদর্শন ব্যক্তির সঙ্গে। ছোট মেয়ে যে নিতান্তই বালিকা যে জানেনা বিয়ে কি সেও এই যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হল। তদানীনন্ত সমাজের এই কদর্যতম রূপ পরিস্ফুটনের জন্য রামনারায়ণ অবশ্যই প্রশংসার ভাগী হবেন। এই নাটকের প্রেরণা ছিল রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর একটি ঘোষণা যে 'কুলীন কুল সর্বস্ব নামে নাটক লিখে যিনি 'রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি ৫০ টাকা পুরস্কার পাবেন। বলাই বাহুল্য পুরস্কার পান রামনারায়ণ। এই প্রাথমিক প্রেরণাই রাজা নারায়ণকে মহৎ রচনায় প্রণোদিত করে। কৌলিন্য প্রথার দোষ ছাড়াও তদানীন্তন সমাজের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের লোভ লালসা নীচতার কদর্য পরিচয়ও নাটকে আছে। সংস্কৃতজ্ঞ রামনারায়ণ নাটকে অনেক ক্ষেত্রে ধ্রুপদী নাট্যরীতি ব্যবহার করেছেন। সংলাপেও সংস্কৃতের প্রভাব আছে। অবশ্য নাটকের আঙ্গিক শিথিল, ঘটনায় নাটকীয়তা অপেক্ষা বর্ণনার প্রাধান্য, সংলাপও দুর্বল। তবু বক্তব্যের দৃঢ়তায়, ভাবনার তীব্রতায় ও মানবিক আবেগে কুলীনকুল সর্বস্ব' এক অনন্য সমাজসচেতন নাট্যকৃতিরূপে বিবেচিত হবে।

'নবনাটক' (১৮৬৬) নাটক ও একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে এতে বহুবিবাহ প্রথাকে আক্রমণ আছে। এখানেও নাট্যকারের শিল্পপ্রভাব অনুযায়ী কৌতুক ব্যঙ্গই প্রধান হয়ে উঠেছে—অবশ্য আক্রমণের ঝাঁজ তাতে কমেনি। রামানারায়ণের প্রায় নাটকই স্বেচধর্মী, কিন্তু এতে একটা সামগ্রিকতা আছে। নাটকটি জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত হয়। রামনারায়ণের প্রহতেণ জাতীয় নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট হন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' যেটি পরনারীর প্রতি আজও মুন্সেফ ও তার সেরেস্তাদারেরকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। 'চক্ষুদান' (১৮৬৯) লাম্পটব্যধিকে তীব্র আৰমণ। 'উভয় সংকট' (১৮৬৯) সপত্নী সমস্যার ওপর আধারিত প্রহসন।

রামনারায়ণ তর্করত্নের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট 'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১) পুরাণশ্রয়ী হলেও নতুনত্বের স্পর্শ তার সর্বাঙ্গে। নাট্যকার পরিচিত প্রাচীন কথার অনুবাদ অনুবর্তন মাত্র করেন নি, ঘটনায় বা চরিত্রচিত্রণে নতুনত্ব এনেছেন। অলৌকিক অবাস্তব কাহিনীও যেন প্রত্যক্ষ পরিচিত হয়ে উঠেছে, দৈবী চরিত্র হয়েছে পরিচিত বাস্তব। ভাষাতে এসেছে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। 'কংসবধ' (১৮৭৫) নাটক অবশ্য প্রায় সম্পূর্ণ পুরাণগন্ধী, নাট্যকারের আধুনিক জীবনাবোধ ও আঙ্গিকের স্বচ্ছেদ্য এতে, অনুপ্রাণিত। তিনি বেশ কটি নাটকের সুদর অনুবাদ করেছেন 'বেণীসংহার' (১৮৫৩), 'রত্নবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' (১৮৬০), 'মানতীসাধব' (১৮৬৭)।

বাংলা নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্নের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তিনি বাংলার নাট্য আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ।

৫.৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪)

চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামের সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন যাদবচন্দ্র ও দুর্গাদেবীর তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুর জেলার ডেপুটি কালেক্টর।

শিক্ষা ও জীবিকা ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষার শুরু বাড়িতে। ১৮৪৪-এপিতা তাঁকে মেদিনীপুরে নিয়ে যান এবং মেদিনীপুর ইংরেজি স্কুলে ভরতি করে দেন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর ফিরে আসেন এবং ২৩ অক্টোবর হুগলি কলেজের জুনিয়ার বিভাগের প্রথম শ্রেণিতে ভরতি হন।

তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। ১৮৫৪ এবং ১৮৫৬ দুবছরই বৃত্তিলাভ করেছিলেন। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে তিনি আইন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র আইন পড়া ছেড়ে নব প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বি. এ. পাস করেন। এবছরের ৬ আগস্ট তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর পদে নিযুক্ত হন। পরে অবশ্য ১৮৬৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি আইন পাস করেছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যচর্চা ঃ হুগলি কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' আর 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামের আর একটি পত্রিকায় পদ্য ও গদ্য লিখতেন। তাঁর এসময়ের লেখায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বের হয় তাঁর 'ললিতা পুরাকালিক গল্প তথা মানস' নামের কাব্যটি। পরে তিনি লিখতে শুরু করেন ইংরেজিতে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ইংরেজিতে লেখা 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ'। এটি কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। 'অ্যাডভেঞ্চার অব আ ইয়ং হিন্দু' বঙ্কিমের দ্বিতীয় ইংরেজি উপন্যাস এবছরেই লেখা হলেও মুদ্রিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উপন্যাস ও প্রবন্ধ—উভয় সাহিত্যরূপের দক্ষ শল্পী। বঙ্কিমচন্দ্র তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম শিল্পসার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' মুদ্রিত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। ছোটো বড়ো মিলিয়ে তাঁর উপন্যাসের মোট সংখ্যা চোদ্দো।

পত্রিকা সম্পাদনা ঃ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় মুদ্রিত হয় মাসিক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। বাঙালির এবং বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নয়নই ছিল এপত্রিকার লক্ষ্য। প্রথমে কলকাতা থেকে বের হলেও পরে পত্রিকাটি কাঁঠালপাড়ার নিজস্ব প্রেস থেকে বের হত। বঙ্কিমের সম্পাদনায় চার বছর চলেছিল এই পত্রিকা এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন এনেছিল পত্রিকাটি। মূলত এই পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিম ঃ উপান্যাসের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যেরও সূচনার ভাষা ছিল ইংরেজি। চাকরি সূত্রে বহরমপুরে থাকার সময় তিনি কলকাতার 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'-এপড়ার জন্য তিনি

লিখেছিলেন দুটি ইংরেজি প্রবন্ধ 'অন দি ওরিজিন অব হিন্দু ফেস্টিভ্যাল' আর 'আ পপুলার লিটারেচার ফর বেঙ্গল'। এছাড়া তিনি আরও কয়েকটি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ লেখায় মনোনিবে করেন। অচিরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার প্রধান প্রাবন্ধিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থের একটি তালিকা—(১) 'লোকরহস্য' ১৮৭৪, (২) 'বিজ্ঞান রহস্য' ১৮৭৫, (৩) 'কমলাকান্তের দপ্তর' ১৮৭৫, (৪) 'বিবিধ সমালোচনা' ১৮৭৬, (৫) 'সাম্য' ১৮৭৯, (৬) 'প্রবন্ধপুস্তক ১৮৭৯, (৭) 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম ভাগ ১৮৮৬, (৮) 'বিবিধপ্রবন্ধ' ১৮৮৭ (বিবিধ সমালোচনা ও 'প্রবন্ধপুস্তক' গ্রন্থ দুটির সম্মিলিত রূপ। 'বিবিধ সমালোচনা'-র 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটি বাদ দেওয়া হয় এবং পরে সেটি 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত পরে সেটি 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর 'প্রবন্ধপুস্তক'-এর হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল প্রবন্ধটির সংশোধিত ও বর্ধিত রূপ 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি বলে' প্রবন্ধটি 'বিবিধপ্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগে স্থান পায়। 'প্রবন্ধপুস্তক'-এর 'বুড়া বয়সের কথ' এর আগেই কমলাকান্তের দপ্তর'-এস্থান পেয়েছিল।)

(৯) 'ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ অনুশীলন' (১৮৮৮)

(১০) 'বিবিধপ্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২)

(১১) 'শ্রীমদ্ভগব গীতা' (১৯০২, মৃত্যুর পর মুদ্রিত)

(১২) 'দৈবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' (১৯৩৮, মৃত্যু পরে প্রকাশিত)

(১৩) 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' (১৮৮৫)।

এছাড়া তিনি বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর জন্য লিখেছিলেন 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' (১৮৭৭) , টেকচাঁদ ঠাকুর অর্থাৎ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'লুপ্ত রত্নোদ্ধার' নামক গ্রন্থাবলীর জন্য লেখা ভূমিকা 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' (১৮৯২), 'সঞ্জীবনী সুধা' নামের সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলীর জন্য লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত 'জীবনী', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থের ভূমিকা 'জীবন চরিত ও কবিত্ব উপক্রমণিকা', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১)

বঙ্কিমচন্দ্র 'সহজরচনা শিক্ষা' (১৮৯৪ ২য় সংস্করণ), 'সহজ ইংরাজী শিক্ষা' (১৮৯৪ ২য় সংস্করণ) নামে দুটি পাঠ্যপুস্তক এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা করেছিলেন। 'রুক্মপার্শ্ব নকুল' নামে সংস্কৃত থেকে তাঁর অনুদিত একটি কাহিনি এই পাঠ্যবইতে স্থান পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসমূহকে তন্ময় প্রবন্ধ এবং মন্ময় প্রবন্ধ এই দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। তাঁর প্রায় সব প্রবন্ধই 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার' এবং 'ভ্রমর'—এই পত্রিকা তিনটিতে মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর শ্রেস্ঠ প্রবন্ধগুলি রচিত হয় ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাঁর তন্ময় প্রবন্ধের মধ্যে আছে 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ সমালোচনা', 'সাম্য', 'প্রবন্ধপুস্তক', 'কৃষ্ণচরিত', 'বিবিধপ্রবন্ধ' ও দ্বিতীয় ভাগ, 'ধর্ম্মতত্ত্ব'। 'লোকরহস্য' আর 'কমলাকান্ত্রে দপ্তর' সমস্ত প্রবন্ধের পর্যায়ে পড়ে।

বিজ্ঞান, ধর্মত্তত্ব দর্শন, সাহিত্য তত্ত্ব, সাহিত্যালোচনা মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব—জ্ঞানের প্রতি শাখা অবলম্বনেই রচিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি।

বিজ্ঞান—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিষয়মুখী প্রবন্ধ সংকলন 'বিজ্ঞান রহস্য'। এগ্রন্থে আছে 'আশ্চর্য সৌরোৎপাত রহস্য', 'আকাশে কত তারা আছে', 'ধূলা', 'গগন পর্যটন', 'চঞ্চল জগৎ', 'কতকাল মনুষ্য', 'পরিমাণ রহস্য', 'চন্দ্রলোক'—এই আটটি প্রবন্ধ। হক্‌সলি, টিন্ডল, পোক্টর, লাকিয়ের, লায়ন—প্রমুখ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানতত্ত্ব এই প্রবন্ধগুলির বিষয়। জটিল বিজ্ঞানের তত্ত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি পাঠকপাঠিকা এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরল সুবোধ্য ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় বঙ্কিমের জীবৎকালেই ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম সংস্করণের স্যার উইলিয়ম টমসন কৃত জীব সৃষ্টির ব্যাখ্যার পরিবর্তে স্থান পায় 'ভ্রমর' পত্রিকায় (১৮৮৩) মুদ্রিত 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধটি।

প্রাণী বিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে রচিত এই সব প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানতথ্যকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ফলে প্রবন্ধগুলি হয়ে উঠেছে প্রায় মৌলিক নিবন্ধ। আকাশে কত তারা আছে' প্রবন্ধের কিছু অংশ দৃষ্টান্তরূপে দেওয়া হল। আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেতরেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। ঐ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র সমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতাবশতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু তাহার আলোক সমবায়ে ছায়াপথ শ্বেতবর্ণ দেখায়।

('বিজ্ঞানরহস্য' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পৃ. ৯)

তাঁর ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কৃষ্ণচরিত্র'। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' এবং 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' আর 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র অনুবাদ এই পর্যায়ের রচনা।

উনিশ শতকের বাংলায় নব হিন্দুত্বের যেজোয়ার এসেছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই যোগ তাঁকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল তবে তাঁর চিন্তনক্ষমতা কখনই আবেগ-প্রবলতায় আপ্লুত হয়নি। তিনি সর্ববিধ ভাবাবেগ দূরে সরিয়ে দিয়ে মুক্তবুদ্ধির আলোয় ব্যাখ্যা করেছিলেন হিন্দুধর্ম আর তার অন্যতম প্রধান পুরুষ কৃষ্ণের চরিত্র। কৃষ্ণকে তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন কৃষ্ণরাধা কাহিনি ভিত্তিক বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালিকে করে তুলেছিল কর্মবিমুখ, অলস আর ভোগী। সেই আবিল প্রেম স্রোত থেকে মুক্ত করে তিনি বাঙালিকে দেহে মনে শক্তিমান করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' ধর্মতত্ত্ব আর 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র অনুবাদ তারই সেই মানসিকতার প্রমাণ। যদিও দুটি গ্রন্থেই কান্ট, হার্বার্ট, স্পেনসার—এই সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতের প্রভাব আছে। তথাপি তাঁর বুদ্ধিনির্ভর যুক্তিপ্রধান নিরাসক্ত সমালোচনা সেই সময়ের উপযোগী ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ১৯৯২ বঙ্গাব্দের চৈত্র এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলির সঙ্গে কয়েকটি নতুন প্রবন্ধ যোগ করে মুদ্রিত হয় 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রথম ভাগ অনুশীলন' বইটিতে তিনি প্রকৃত মানব ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আপন মত লিপিবদ্ধ করেছেন।

সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধ ঃ

এরূপ প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি লেখা হয়েছিল বিশেষ বিশেষ লেখকের রচনাবলীর ভূমিকা রূপে। অন্যগুলি লিখিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা প্রবন্ধ রূপে।

প্রিয়বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর পর তিনি দীনবন্ধুর একটি গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সেই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা হিসেবে লেখা 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্দু মিত্রের রচনার গুণ ও দোষ সাহিত্যবোধ জারিত ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন।

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র রচনা বিশেষত্ব স্বচ্ছ, সাবলীল ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র' আর 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী' প্রবন্ধ দুটিতেও বঙ্কিমচন্দ্র নিপুণভাবে ও সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ ভাষায় দুই লেখকের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম পথিকদের সম্পর্কে বহুতথ্য সংরক্ষিত হতে পেরেছে।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ সমালোচনা' গ্রন্থটি। ১৯৮২ থেকে ১৮৭৬—এই চার বছরে নিজের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এতিনি সমকালের কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনা করেন।

সেইসব সমালোচনার নির্বাচিত গ্রন্থ ভূমিকায় সংকলন এই গ্রন্থ। গ্রন্থ ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"যেকয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুলি প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যেযেস্থানে সাহিত্য বিষয়ক মূল কথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'-এর মিলিত রূপ 'বিবিধ প্রবন্ধ' মুদ্রিত হয়। তবে 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'বুড়া বয়সের কথা' প্রবন্ধ দুটি এসংকলনে ছিল না। দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত', 'বিদ্যাপতি' ও 'জয়দেব'—'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমনা' সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ।

এগুলির মধ্যে 'গীতিকাব্য' রচিত হয় 'অবকাশরঞ্জিনী' কবিতা সংকলনের সমালোচনা রূপে।

সমালোচনা সূত্রের রচিত হলেও এগুলিতে সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্দে মননদীপ্ত বিশ্লেষণ রয়েছে। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবিতার লক্ষণ ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বাল্মীকি, ভবভূতি ও শেক্সপিয়র'-এর রচনা থেকে উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকবিতার গঠন ও ভাবগত ভিন্নতা। প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রখর মনীষা ও গভীর সাহিত্যবোধের পরিচায়ক। এই প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যতত্ত্বের উৎস। দৃষ্টান্ত হিসেবে এই প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হল—"

"গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দেবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; আগের গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যেউদ্দেশ্য, যেকাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।''

অন্যান্য শ্রেণির প্রবন্ধ ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ছিল দেশ ও দেশবাসীর প্রতি গভীর প্রীতি। স্বদেশ ও স্বজাতির সর্ববিধ ত্রুটি দূর করার নিহিত বাসনা তাঁকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশে প্রাণিত করে। এই দেশপ্রেমের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও তার দূরদৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাসি বিপ্লব উৎসারিত সাম্য ও স্বাধীনতার বার্তা বঙ্কিমচন্দ্রকেও আলোড়িত করেছিল। তার সঙ্গে ছিল মফস্‌সল আদালতের বিচারক রূপে জমিদার কর্তৃক প্রজাপীড়নের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

শুধু কৃষক নয় সামাজিকভাবে আর মানসিক দিকে নিপীড়িত নারী ও অন্ত্যজ শ্রেণির সম্বন্ধে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সম্যকজ্ঞান। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদের প্রথম প্রচারক। সর্ব মানবের কল্যাণকারী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার যেরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য ছিল সাম্য তারই ভাষারূপ। 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি জমিদারের প্রজাপীড়ন সম্বন্দে যেকথা বলেছিলেন—তারই বিস্তারিত রূপ 'বঙ্গদেশের কৃষক' । বঙ্কিমচন্দ্রের দরদি হৃদয়ের প্রকাশ থাকলেও প্রবন্ধটিতে যুক্তিসম্মতভাবে কৃষকদের দুর্দশা এবং তার প্রতিকারের কথা বলেছেন তিনি। চার পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ এই প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট। 'সাম্য' ও পারে এই প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়।

তিনি এ প্রবন্ধে উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সমাজের বৃহৎ অংশ সাধারণ মানুষ তাদের অবস্থার উন্নতি ভিন্ন দেশের সার্বিক উন্নতি অসম্ভব।

গাঢ় ও আন্তরিক স্বজাতি ও স্বদেশ প্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রাণিত করেছিল বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির যথাযথ ইতিহাস সন্ধানে। তিনি প্রচলিত ইতিবৃত্তকে নির্বিচারে মেনে নিতে চাননি। তিনি ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং তাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নতুন করে লিখতে চেয়েছিলেন বাংলার ইতিহাস। বাঙালিকে ইতিহাস সেচতন ও স্বদেশ প্রেমিক করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম, তাই তিনি লিখেছিলেন—''বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।'' এপ্রবন্ধের নাম 'বাঙ্গালার ইতিহাস ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'। আত্মবিস্মৃত আর অনুকরণ প্রিয় বাঙালিকে তিনি নতুন শক্তিতে, আত্মগৌরবে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন। এবং এজন্যই স্বয়ং লিখেছিলেন 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' আর 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি'-র মতো ইতিহাস এবং নৃতত্ত্বভিত্তিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ দুটি বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আর শ্রমশীল মানসিকতার প্রমাণ।

উনিশ শতকের পাশচাত্য দার্শনিকের মতবাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। আবার প্রাচ্য দর্শনতত্ত্বকে তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি প্রতীচ্য দর্শনের ভিত্তিতে প্রাচ্যের দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রাচ্য দর্শনের বিশেষত্ব তিনি বজায় রেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনসংক্রান্ত চিন্তন উচ্ছ্বাস ও বাগ্‌বিস্তার শূন্য এবং একান্তভাবে যুক্তিনির্ভর। 'জ্ঞান', 'সাংখ্যদর্শন', 'মনুষ্যত্ব কি'—এইসব প্রবন্ধে তিনি সহজ ভাষায় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে পাশ্চাত্য ফিলসফির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন। কিন্তু প্রাচ্য দর্শন জ্ঞানের সঙ্গে চায়—''.... নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামান্তর-বিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা।'' (জ্ঞান)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের আলোচনায় বারবার এসে যায় তাঁর যুক্তি প্রবণতার কথা। আসলে প্রকৃত প্রবন্ধের ভিত্তি যুক্তি-নির্ভর মানসিকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই যুক্তিশীলতার সঙ্গে ছিল সাহিত্যরস সৃষ্টির শক্তি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র হতে পেরেছেন সফল প্রাবন্ধিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ময় প্রবন্ধ ঃ

বিষয়নির্ভর প্রবন্ধের সঙ্গে এই শ্রেণির প্রবন্ধের প্রধান পার্থক্য উপস্থাপন পদ্ধতিগত। ব্যক্তিনিরপেক্ষ যুক্তি নির্ভরতার পরিবর্তে এরূপ প্রবন্ধে রচয়িতার মনোভঙ্গি ও আবেগ প্রাধান্য পায়। অনেক সময় এরূপ প্রবন্ধে কাহিনীর ঈষৎ আভাস থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' ১৮৭৫—এই ধরণের প্রবন্ধ সংকলন।

'লোকরহস্য' সংকলনের রচনাগুলিতে মার্জিত ব্যঙ্গ আর হালকা হাসির আবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচেতনা ও দেশভাবনা রূপ লাভ করেছে, এই সংকলনের পনেরোটি লেখা আছে—'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল', 'ইংরাজ স্তোত্র', 'বাবু', 'গর্দ্দভ', 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন', 'বসন্ত এবং বিরহ' 'সুবর্ণ গোলক', 'রামায়ণের সমালোচনা', 'বর্ষ সমালোচনা', 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র', 'Bransonism', 'হনুমদ্বাবু সংবাদ', 'গ্রাম্য কথা', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর' এবং 'New years Day'—এই গল্পাভাস যুক্ত নিবন্ধগুলিতে আমরা মন্ময় প্রবন্ধের বিশেষ এক ধারা বলতে পারি। ঐতিহ্য অঙ্গীকারের মানসিকতা, অনুকরণেচ্ছা হীনম্মন্যতা— বাঙালি চরিত্রের এই সব ত্রুটিকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ বিধ করেছেন এই নিবন্ধগুলিতে।

বাঙালি চরিত্রের ত্রুটি দূর করার বাসনাই অপরূপ হয়ে উঠেছে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর রচনাগুলিতে। কিছু রচনায় উপাখ্যানধর্ম রয়েছে কিন্তু কোনো কোনো রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণধীশক্তি এবং সংহত আবেগের প্রকাশে হয়ে উঠেছে আশ্চর্য আবেগের প্রকাশে হয়ে উঠেছে আশ্চর্য মন্ময় প্রবন্ধ। 'আমার দুর্গোৎসব' এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। বাঙালির কাঙিক্ষততম এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অহিফেনসেবী কমলাকান্তে স্বপ্ন দর্শন ভিত্তিক এই নিবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল দেশপ্রেমের মূর্ত প্রকাশ হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত দিলে তা বোঝা যাবে—

''সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূর প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে।

... চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। ... এমূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না কিন্তু একদিন দেখিব—''

তাঁর প্রবন্ধের ভাষা স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ, সহজ যুক্তিসমৃদ্ধ এবত বলিষ্ঠ। ক্রমশ তাঁর ভাষা ব্যঞ্জনার অ-পূর্বতা, সাহিত্যগুণান্বিত হয়ে হয়ে উঠেছে, বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। বিষয় অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধের ভাষা। উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ এবং সুমিত বাক্যবিন্যাস তাঁর প্রবন্ধ ভাষার বিশেষত্ব।

বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব নিয়ে তিনি নিজেই ভেবেছিলেন। রচনার ভাষারীতি সম্বন্ধেও তাঁর গভীর চিন্তনের প্রমাণ—তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের নীচের পঙ্‌ক্তিসমূহ—''বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহারপর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে।

('বিবিধ প্রবন্ধ' ২য় ভাগ)

গভীর মনন আর পাণ্ডিত্যের মিলিতরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ। তথ্য এবং প্রমাণের যুক্তিসম্মত উপস্থাপন দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে। তার সঙ্গে মিশেছে সাহিত্যগুণ। বাংলা প্রবন্ধের উন্নত, এবং শিল্পগুণ সমৃদ্ধ রূপ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্যে লক্ষিত হয়। বস্তুত বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের যেসমুন্নত আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র স্থাপন করেছিলেন তা এসাহিত্যশাখার ভবিষ্যৎ উন্নতি কারণ। এখানেই প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব।

৫.৬ অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬ - ১৯১৭)

জীবনী ঃ চুঁচড়া জেলার কদমতলার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে ১৮৪৬-এর ১১ ডিসেম্বর অক্ষয়চন্দ্রের জন্ম। পিতা গঙ্গাচরণ ছিলেন হুগলি কলেজের কৃতী ছাত্র। আইন বিভাগের উচ্চপদের সরকারি কর্মী গঙ্গাচরণ কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর অনেক রচনা পুত্রের সম্পাদিত 'সাধারণী ও নবজীবন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

গঙ্গাচরণের তিনটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে—

(১) কবিতা সংকলন 'ঋতুবর্ণন' (১৮৭৪), (২) 'হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা' (১৮৭৯) এবং 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' (১৮৮০)। এথেকে বোঝা যায় অক্ষয়চন্দ্রের পরিবারে ছিল সাহিত্য চর্চার পরিবেশ।

শিক্ষা ঃ অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় বাড়িতেই। ১৮৫৭-সালের ২ জুন তিনি হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভরতি হন। এই স্কুল থেকেই ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। হুগলি গলেজ থেকে অক্ষয়চন্দ্র এফ. এও বি. এ. পরীক্ষা পাস করেন যথাক্রমে ১৮৬৫ ও ১৮৬৭ সালে। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগে ভর্তি হন।

এই কলেজের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁর সহপাঠী। ১৮৬৮ সালে অক্ষয়চন্দ্র বি. এল. পাস করেন এবং বহরমপুরে ওকালতি শুরু করেন। তখন তাঁর পিতা গঙ্গাচরণ ওই শহরের সাব-মুন্সেফ ছিলেন। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। পাঁচ বছর পরে মাতার অসুস্থতা হেতু তিনি চুঁচুড়ায় চলে আসেন। এখানেও তাঁর বৃত্তি ছিল ওকালতি। সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল সাহিত্যচর্চা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্র নিয়মিত লিখতেন; করতেন পুস্তক সমালোচনা।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে সরল ভাষায় রাজনীতি ও সাহিত্য চর্চার জন্য তিনি বের করেন সাপ্তাহিক 'সাধারণী' পত্রিকা। সতেরো বছর চলেছিল এপত্রিকা। পরে অবশ্য পত্রিকাটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। পত্রিকাটির নিজস্ব একটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল 'সাধারণী যন্ত্র' নামে। বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ সকল প্রতিষ্ঠিত

লেখকই 'সাধারণী'তে লিখতেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই মুদ্রিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ 'জাতিবৈর'।

হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল অক্ষয়চন্দ্রের। তাই উনিশ শতকে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের সময় তিনি হিন্দু ধর্ম প্রচারের জন্য প্রকাশ করেন 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকা।

অক্ষয়চন্দ্র রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। তাই 'ভারতসভা' বা 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান'-এযোগ দিয়েছিলেন তিনি। এই সংস্থার দুই সহকারী সম্পাদকের একজন ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র; অন্য জন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এছাড়া রেন্ট বিল আর এজ অব কনসেন্ট বিল-এর বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও সোৎসাহে যোগ দিতেন। হিন্দুত্ব প্রচারে উৎসাহী অক্ষয়চন্দ্র শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মানুশীলনের জন্য চুঁচুড়ায় নিজের বাড়িতে একটি চতুস্পাঠী স্থাপন করেন। এটি পঁচিশ বছর চলেছিল।

আবার আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করতেন। তাই চুঁচুড়ার 'হিন্দু স্কুল'—উঠে যাওয়ার পর তিনি গড়ে তোলেন 'সাধারণী স্কুল'। দশ বছর স্থায়ী এবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ভিন্ন শিক্ষাদানেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৯৭, ১৮৯৮ ও ১৯১৩—এই তিন বছর অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১১-এপরিষদের উদ্যোগে চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। ১৯১৪-এচট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন তিনি। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর একাত্তর বছর বয়সে তাঁর প্রয়ান ঘটে।

সামগ্রিক সাহিত্য পরিচয়—অক্ষয়চন্দ্র কবিতা, শিশুপাঠ্য কবিতা, প্রবন্ধ, রম্য রচনা—সবই লিখেছেন। এছাড়া প্রাচীন বাংলা কাব্যের একটি সংকলনের সম্পাদনায়ও ছিল তাঁর সহায়তা। তাঁর কবিতা সংকলনের মধ্যে আছে 'শিক্ষানবীশের পদ' এবং শিশুপাঠ্য পল্লীচিত্র যুক্তাক্ষর বর্জিত পয়ার ছন্দে লেখা 'গোচারনের মাঠ' (১৮৮০)। সারদাচরণ মিত্র এবং বরদাচরণ মিত্রের সহায়তায় তিনি সম্পাদনা করেন 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি খণ্ডাকারে বের হয়। পরে ১৮৮৪-তে দুখণ্ডে মুদ্রিত হয়। এর মধ্যে ছিল বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস—এঁদের পদাবলী; রামেশ্বরের 'শিবায়ন' এবং মুকুন্দরাম কবিকঙ্কনের 'চণ্ডীমঙ্গল'। তিনি রামায়নের একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ করেন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন প্রহসন 'হাতে হাতে ফল' (১৮৮২) রচয়িতার 'শ্রীবঙ্গবিলাস সমজদার' বলা বাহুল্য এটি ছদ্মনাম।

'সাহিত্য-পাঠ' (১৯০৩) পাঠ্যপুস্তকটিও তাঁরই রচনা। এছাড়া 'সাহিত্য-সাধনের' নামে একটি কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থও তিনি সম্পাদনা করেন—এটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ সংকলনের সংখ্যা—সাত (১) 'সমাজ সমালোচনা' (১৮৭৪; বঙ্গদর্শন—এপ্রকাশিত 'উদ্দীপনা' ও 'গ্রাবু' প্রবন্ধ দুটির সংকলন), (২) 'আলোচনা' (১৮৫২)—বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ সংকলন; 'সানতনী' (১৯১১) প্রাচীন হিন্দু ধর্ম, দর্শন ও সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংকলন; (৪) 'কবি হেমচন্দ্র' (১৯১২, অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর প্র প্রকাশিত) হেমচন্দ্রের ক্ষুদ্র জীবনী এবং কাব্যের আলোচনা, (৫) 'জ্যোতিকুমারী' (১৯১৭)

নানা পত্রিকায় মুদ্রিত সরস লঘু নিবন্ধের সংগ্রহ) (৬) 'মহাপূজা' (১৯২১ 'সাধারণী' ও 'নবজীবন'-এমুদ্রিত দুর্গাপূজার বিষয়ে চারটি প্রবন্ধের সংকলন, 'রূপক ও রহস্য', (১৯২৩ মৃত্যুর পর মুদ্রিত), সংকলনে প্রবন্ধ ভিন্ন কবিতা নাটক ও রঙ্গরচনা স্থান পেয়েছে।

প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্য ঃ অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন স্বদেশ, স্বধর্ম, স্ব-সমাজের গভীর অনুরাগী। সময়ে সময়ে যেঅনুরাগ হয়ে উঠত যুক্তিহীন। কারণ ভারতবর্ষের অতীতের ত্রুটির সমালোচনা তিনি কখনই করেননি। প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা। হিন্দু ধর্মের শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াস তাঁর অনেক প্রবন্ধের উৎস।

তাঁর প্রবন্ধের যুক্তির তুলনায় হৃদয়াবেগই প্রধান। তার সঙ্গে ছিল বিষয়ের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ। তাই তত্ত্ব বা মহৎ ভাবের রূপায়ণভিত্তিক রচনার তুলনায় ভারহীন মন্ময় হাস্যরসের উপস্থাপনেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। বস্তুত এইরূপ মন্ময় প্রবন্ধ রচনাতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফূরণ লক্ষিত হয়েছে। এরূপ প্রবন্ধ রচনায় অক্ষয়চন্দ্রের নিপুণতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এতাঁর 'চন্দ্রালোক' প্রবন্ধটির অন্তর্ভুক্তি। 'জ্যোতিকুমারী' (১৯১৭) তাঁর এশ্রেণির রচনার একটি সংকলন। দৃষ্টান্ত হিসেবে এরূপ একটি প্রবন্ধ 'ভাই হাততালি' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হল—"ভাই হাততালি তোমার দুটি হাতে ধরি, তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও,— তোমার চট্ চট্ গর্জনে একবার বিরাম দাও। ... তুমিই ত স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্ত্যের মাটি করিয়াছিলে। সেই প্রশস্ত হৃদয়, সেই অগর্বে অধ্যাবসায়, সেই অচলা ভক্তি, সেই প্রবলানিষ্ঠা, সেই আনন্দের ব্রহ্মাণ্ড তোমার চাটুপটু চট্চটিতে সেহেন কেশবচন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল পদ স্খলিত হইয়াছিল, তাঁহার শরীর অবশ করিয়াছিল। ভাই! এমনই করিয়া কি বাঙ্গলার মুখ হাসাইতে হয়!"

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত রীতির অনুসারী। তবে কোনো কোনো প্রবন্ধে তাঁর উপলব্ধির নিজস্বতা ও রসবোধের মার্জিত প্রকাশ লক্ষিত হয়। তাঁর এরূপ প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'কবি হেমচন্দ্র' গ্রন্থটি।মনে রাখতে হবে তিনিই প্রথম হেমচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রচনাটিতে অপেক্ষাকৃত দুরূহ কাব্যতত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা এবং সেই তত্ত্বের দ্বারা হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতার দোষ-গুণ বিশ্লেষণ অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ রচনার শক্তির প্রমাণ দেয়।

তাঁর পুস্তক সমালোচনাগুলি ছিল খুবই জনপ্রিয়। গম্ভীর তত্ত্বের সঙ্গে নির্মল কৌতুক রসের সুষম মিশ্রণের জন্য উপভোগ্য হয়েছে রচনাগুলি। ফলে সমালোচনার যা মূল উদ্দেশ্য-সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ তা হয়েছে সফল।

ভাষা বৈশিষ্ট্য ঃ তাঁর ভাষা বুদ্ধির দীপ্তিতে তেমন দ্যুতিময় নয়। সরল, সহজ, মাধুর্যে মণ্ডিত ভাষা তাঁর প্রবন্ধকে করেছে আকর্ষক। বিষয় অনুযায়ী নানা রসের ব্যঞ্জনাবহ শব্দ-ব্যবহার অক্ষয়চন্দ্রের ভাষার বিশেষত্ব।

তাই বলা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধারণার অনড়তা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তৃতির অভাব থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত বাংলা প্রবন্ধের ধারাকে যাঁরা স্বীয় শক্তিতে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁদের মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্য বিশেষ আসন অধিকার করে আছেন উনিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ আলোচনা করতে গেলে তাই অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে দূরে রাখা অসম্ভব।

৫.৭ রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮ — ১৯০৯)

কলকাতার রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ১৮৪৮-এর ১৩ আগস্ট রমেশচন্দ্রের জন্ম। পিতার নাম ঈশানচন্দ্র।

শিক্ষা ঃ ১৮৬৪-তে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন রমেশচন্দ্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যথাক্রমে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ নিয়ে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এফ. এ. পাস করেন তিনি। এই কলেজের চতুর্থ শ্রেণিতে পাঠকালে তিনি ইংল্যান্ড যান। ১৮৬৯-এরমেশচন্দ্র আই. সি. এস. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন, পরে ব্যারিস্টারিও পাস করেন। তিনি বহু উচ্চপদে কাজ করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার।

১৮৯৫-এতিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন। ১৮৯২-এতিনি সি. আই. ই. উপাধি পান। ভারতীয় বলেই কোনো উচ্চপদে তাঁকে স্থায়ী করা হয়নি। তাই তিনি ১৮৯৭-এপদত্যাগ করেন। এরপর তিনি আবার ইংল্যান্ড যান এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনার সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৯০৪-এতিনি ভারতে এসে দেশীয় রাজ্য বরোদার অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে এরাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন রমেশচন্দ্র। স্বদেশের রাজনীতি এবং শিল্প সম্পর্কে উৎসাহী রমেশচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতিও ছিল। পদত্যাগের পরের বছর ১৮৯৭-তে তিনি দাদাভাই নৌরজি ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯৯-এতিনি হন কংগ্রেস সভাপতি। ১৯০৭-এসুরাট অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প সম্মেলনের সভাপতি রমেশচন্দ্র এবছরই ডি সেন্ট্রালাইজেশন কমিশনের সদস্য হন।

রমেশচন্দ্র ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর প্রথম সভাপতি। তাঁর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি আচ খণ্ডে ঋগ্বেদের প্রথম বঙ্গানুবাদ (১৮৮৫)।

সেকালের অনেক লেখকের মতো রমেশচন্দ্রের বেশির ভাগ সাহিত্যকর্মের ভাষা ইংরেজি। ১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাবনার প্রজা বিদ্রোহকালে জমিতে প্রজার সত্ব বিষয়ে 'আর সিডি' (Arcy Dye) ছদ্মনামে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় ইংরেজিতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন রমেশচন্দ্র তাঁর গবেষণামূলক ইংরেজি ইতিহাস গ্রন্থ (১) England and India-a Record of Progress during Hundred Years 1758-1885 (২) The Peasanty of Bengal (৩) Fanines & Land Assessments in India (৪) Economic History & British India (৫) Civilisation in Ancient India। ১৯০২-এমুদ্রিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

বিদ্যালয়ে পাঠের উপযোগী করে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা তাঁর অন্যতম কীর্তি।

সাহিত্য পরিচয় ঃ রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চার মাধ্যমে প্রথমে ছিল ইংরেজি। সরকারি চাকরি করার সময় রেভারেন্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত 'Bengali Magazine' আর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'Mookerjee's Magazine'-এ'Arcy Dye' ছদ্মনামে ইংরেজিতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে

মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় প্রণোদিত করেন। রমেশচন্দ্র স্বয়ং ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'নব্যভারত' এএবিষয়ে লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র যে'ছাপাখানা' থেকে প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' বের করেন, তরে নিকটেই ছিল রমেশচন্দ্রের বাড়ি —''

''...... তথায় বঙ্কিম বাবু সর্ব্বদা যাইতেন। .... বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। এক দিন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল। আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?'' আমি বিস্মিত হইলাম, বলিলাম,—''আমি যেবাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না। ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা লিখি নাই, রচনা পদ্ধতি জানি না।'' গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবুর উত্তর করিলেন, ''রচনা পদ্ধতি আবার কি,— তোমরা শিক্ষিত যুবক যাহা লিখিবে তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।' এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল।''

এই অনুপ্রেরণার ফল রমেশচন্দ্রের চারটি ইতিহাসশ্রিত এবং দুটি সমাজ-জীবন ভিত্তিক উপান্যাস— 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), মাধবী ()' (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র 'জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮), রাজপুত 'জীবনসন্ধ্যা', (১৮৭৯) 'সংসার' (১ম ও ২য় খণ্ড ১৮৮৬) এবং 'সমাজ' (১৮৯৪)।

রমেশচন্দ্রের প্রধান কীর্তি 'ঋগ্বেদ সংহিতার' প্রথম থেকে অষ্টম অষ্টক বাংলায় অনুবাদ (১৮৮৫-১৮৮৭)। নয় খণ্ডে বিভিন্ন পণ্ডিত বেদ ষড়দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদ করেন 'হিন্দুশাস্ত্র নামে ১৮৯৩-২৮৯৭)। এগুলির মধ্যে প্রথম ভাগ 'বেদ সংহিতার'র অনুবাদ করেন সত্যব্রত সাশ্রমী ও রমেশচন্দ্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে ছিল যথাক্রমে 'ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ' এবং 'শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র'। এই দুই ভাগের অনুবাদ করেছিলেন রমেশচন্দ্র।

রমেশচন্দ্রের কোনো বাংলা প্রবন্ধ সংকলন নেই। অবশ্য ইংরেজিতে তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ বর্তমান।

নানা বিষয়ে লেখা তাঁর বাংলা প্রবন্ধগুলি ছড়িয়ে আচে সমকালের প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ বাংলা সাময়িক পত্রিকায়। সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল। অবশ্য এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়।

১। 'ঋগ্বেদের দেবগণ'— 'নবজীবন' (১২৯২ বঙ্গাব্দ)

২। 'হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস'— নব্যভারত (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)

৩। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—'নবভারত' (ভাদ্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ)

৪। 'কবি কালিদাস'—'ভারতী ও বালক' (পৌষ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ)

৫। 'কবি ভবভুতি'—'সাধনা' (মাঘ ১২৯৯, বঙ্গাব্দ)

৬। 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'—'নব্যভারত' (বৈশাখ ১৩০১ বঙ্গাব্দ)

৭। বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য—'পরিষৎ পত্রিকা' (১৩০১ বঙ্গাব্দ)

৮। 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' 'বঙ্গীয় সাহিত্য—'পরিষৎ পত্রিকা' (৩য় সংখ্যা, ১৩০১ বঙ্গাব্দ)

৯। 'দুদিনের স্বদেশ যাপন'—'ভারতী' (বৈশাখ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)

১০। 'ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ'—'প্রভাত' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)

১১। 'হিন্দু দর্শন' 'ভারতী' (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

১২। 'ভারতীয় দুর্ভিক্ষ (তাহার কারণ ও প্রতিকার)'—'ভারতী' (আষাঢ় ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

১৩। 'ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি'—'ভারতী' (শ্রাবন ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

১৪। 'বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত'—'ভারতী' (পৌষ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

১৫। 'ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা'—'ভারতী', (ফাল্গুন ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

১৬। 'ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল', 'ভারতী' (বৈশাখ, আষাঢ় ১৩০৯ বঙ্গাব্দ)

১৭। 'বারানসী শিল্প-সমিতি'—'ভাণ্ডার', (ফাল্গুন ১৩১২ বঙ্গাব্দ)

বালকদের জন্য তাঁর দুটি সচিত্র নিবন্ধ 'অমৃতসর' ও 'উড়িষ্যা' মুদ্রিত হয় 'মুকুল' পত্রিকার ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায়।

ভারতের ইতিহাস নিয়ে তিনি লিখেচিলেন একটি পাঠ্যপুস্তক 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ১ম শিক্ষা।

রমেশচন্দ্র তৎকালীন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মতোই স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের প্রধান বিষয় তাই স্বদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ ধর্মনীতি ও অর্থনীতি। তবে কয়েকটি জীবনীমূলক প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন।

তাঁর বিশেষত্ব সাহিত্যিক ইতিহাসের উপাদান রূপে গ্রহণ। সাহিত্য দেশের জনসমাজের চিন্তা, রীতিনীতি মনোভাবের পরিচয় বহন করে। রমেশচন্দ্র যেকথা বুঝেছিলেন বলেই সাহিত্যিক তিনি ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র সে যুগের বহু লেখকের মতোই জাতীয়তাবাদ নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সাময়িক পত্রে মুদ্রিত তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে দুটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনা—'বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য এবং 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র'। প্রবন্ধ দুটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকার ১৩০১ বঙ্গাব্দের দুটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধ দুটিতে দুই সময়ের লেখকের রচনার তুলনাত্মক আলোচনায় নিজের পরিণত সাহিত্য বোদের পরিচয় দিয়েছেন রমেশচন্দ্র।

বিষয়ের রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধের বিশেষ গুণ সংযত এবং সুষ্ঠু প্রকাশ। তাঁর প্রবন্ধে কখনই অপ্রাসঙ্গিকতা বা বাগবাহুল্য দেখা যায় না।

প্রবন্ধের ভাষার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন রমেশচন্দ্রের আদর্শ। তথাপি তাঁর ভাষায় লক্ষিত হয় স্বতন্ত্রতা। রমেশচন্দ্রের ভাষা অলংকার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত নয়। তাঁর উপন্যাসের ভাষার মতোই তাঁর প্রবন্ধের ভাষায় মাধুর্য আছে। অর্থাৎ বিষয় এবং তার প্রকাশ—উভয়ত রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধ তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে।

৫.৮ স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

আইন ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি, কলকাতায়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের সক্রিয় কর্মী ছিলেন বিবেকানন্দের পিতা।

শিক্ষা—বিবেকানন্দের প্রাথমিক শিক্ষা গৃহেই হয়। পরে পাঠ গ্রহণ করেন যথাক্রমে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিন্তু তিনি কলা বিভাগে স্নাতক হন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে এবং আইন পড়তে শুরু করেন। পিতার মৃত্যুজনিত আর্থিক সংকটের কারণে তাঁকে সেই পড়া ছাড়তে হয়। তিনি সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, এইসব বিষয়েও তিনি নিয়মিত পড়াশোনা করতেন। রামমোহন রায়ের রচিত বেদান্ত দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ পাঠের ফলে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কলেজে পড়ার সময়েই তিনি রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

জীবিকা ঃ— কিছুকাল তিনি বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন স্কুল-এশিক্ষকতা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর পাঠদানে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাঁকে ওই কাজ ছাড়তে হয়। এরপরে তিনি তেমন কিছু কাজ করেননি।

ধর্মীয় কাজ— রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্যের সাহায্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বরাহনগর রামকৃষ্ণ মঠ। এসময়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। এরপর তিন বছর পরিব্রাজক রূপে ভারত ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ কালে তিনি জয়পুর রাজের সভাপন্ডিতদের নিকট পাণিনি, খেতরির রাজার সভাপণ্ডিত, নারায়ণ দাসের নিকট পতঞ্জলি এবং পাণ্ডু রায়ের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগোর ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়ে হিন্দু ধর্ম বিষয়ে অসাধারণ বক্তৃতা দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯৯-এতিনি বেলুড় মঠ স্থাপন করেন এবং বেদান্ত শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যান, প্রত্যাবর্তন সময়ে যোগ দেন প্যারিসে অনুষ্ঠিত ধর্ম ইতিহাস সম্মেলনে। ১৯০০ সালে ভারতের নানা স্থানে রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করেন।

১৯০২ সালের ৪ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

সাহিত্য-পরিচয়— লিখিত বাংলায় কথ্যরীতি ব্যবহারের অন্যতম প্রবক্তা বিবেকানন্দের বেশির ভাগ গ্রন্থই ইংরেজিতে লেখা। বাংলায় রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে ‘পরিব্রাজক’ (১৯০৩) নামের ভ্রমণ কথা। তাঁর প্রবন্ধসংকলনের সংখ্যা তিন ‘ভাববার কথা’ (১৯০৫) ‘বর্তমান ভারত’ (১৯০৫), ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ‘উদ্বোধন’ (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রবন্ধ রচনার যোগ নিবিড়।

তাঁর ‘ভাববার কথা’ নামের লঘু প্রবন্ধ-সংকলনের সব প্রবন্ধই ‘উদ্বোধন’-এপ্রকাশিত হয়েছিল। শুধু ১২৯৬-বঙ্গাব্দের ‘সাহিত্য কল্পদ্রুম’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘Imitation of Christ’ এর অনুবাদ ‘ঈশা অনুসরণ’ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পঁয়ষট্টিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে লেখা ‘হিন্দুধর্ম’— এদুটি প্রবন্ধই পূর্বে লেখা হয়।

‘ভাববার কথা’য় আছে ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ ‘বাংলা ভাষা’। এটি আসলে ‘উদ্বোধন’ সম্পাদককে লেখা চিঠি।

রচনাটিতে চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রতি বিবেকানন্দের সমর্থনের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মতে 'ভাষা— ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান, ভাষা পরে।''

হিন্দু ধর্মের ক্রটিগুলি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ কয়েকটি লঘু ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

অভিপ্রেত বিষয়ের স্বচ্ছ প্রকাশ রচনাগুলির বিশেষত্ব। সমকালে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতাকে আঘাত করেছেন। তিনি একটি কথিকায় 'গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য— মহাপণ্ডিত।......

বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ ও চৌম্বক শক্তির গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ।''

'ভাববার কথা'—তে বেশ কিছু গভীর ভাবাত্মক প্রবন্ধও বর্তমান। এরূপ চারটি প্রবন্ধ 'হিন্দু ধর্ম' ও শ্রীরামকৃষ্ণ',। বর্তমান সমস্যা' 'জ্ঞানার্জন', 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' সাধু ভাষায় লেখা 'বর্তমান সমস্যা' উদ্বোধন পত্রিকার প্রস্তাবনা রূপে রচিত। এপ্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয়ে বিষয়ে তাঁর চিন্তা রূপ লাভ করেছে। তাঁর মতে পারমার্থিক মুক্তি নয়, শক্তি অর্জন করে জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভই এদেশীয়দের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে বিবেকানন্দের চিন্তাশক্তির গভীরতা, উজ্জ্বলতা আর স্বতন্ত্রতার প্রকাশ দেখা যায়! বিষয় অনুসারে ভাষা ব্যবহারেও তিনি এখানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

এই ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধ পুস্তিকাটিতে ভাররে ইতিহাস ও সমাজ বিন্যাস সম্পর্কে বিবেকানন্দের জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথনির্দেশ পাঠককে বিস্মিত করে। তিনি ইতিহাসের গতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ভবিষ্যতে শূদ্র অর্থাৎ শ্রমজীবীরাই হবে বিশ্ব ইতিহাসের নিয়ামক। তাঁর বক্তব্য এই শ্রমজীবীদের সংস্কৃতির ও সভ্যতার সৎ আদর্শগুলি গ্রহণ করা উচিত। নতুবা জগতের তথা ভারতের সার্বিক উন্নতি অসম্ভব।

'বর্তমান ভারত' বিবেবানন্দের নিবিড় দেশপ্রেমের প্রকাশরূপ। তিন গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতার যেমূল ত্রুটি সেই জাতিভেদ দূর করার চেষ্টা করেছেন।

এগ্রন্থের 'হে ভারত ভুলিও না' শীর্ষক শেষাংশে বিবেকানন্দের মনের প্রকাশ লক্ষিত হয়। বলিস্ট ও তেজোময় সেই প্রকাশ বিপ্লবীদের স্বদেশ সাধনার মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। 'পরিব্রাজক' বিবেকানন্দের দ্বিতীয় বার আমেরিকা ও ইউরোপে ভ্রমণের বৃত্তান্ত। গ্রন্থটির প্রথম নাম ছিল 'বিলাতযাত্রীর পত্র'। কারণ গ্রন্থটি পত্রকারে রচিত। এখানে বিবেকানন্দ সরস চলিত ভাষায় ভারতীয় আদেশের মাপকাঠিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিচার করেছেন।

বিবেকানন্দের পাঠ পরিধি ছিল বিস্তীর্ণ। 'পরিব্রাজক'-এর স্থানে স্থানে তার প্রকাশ আছে।

তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের প্রকাশ রূপে উল্লেখ করা যায় হাঙর শিকারের বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণের সঙ্গে শুকর মাংসের তুলনা'' আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙবেরঙের গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে।''

অংশটিতে বাস্তবের ভাষা চিত্র অঙ্কনের বিবেকানন্দর সজীব সরসতা সহজেই পাঠক মনকে আকর্ষণ করে। এখানেও স্থানে স্থানে লঘু, মার্জিত কৌতুকের প্রকাশ বিবেকানন্দের। বিষয়-বিন্যাস শক্তির পরিচায়ক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিবেকানন্দের গম্ভীর ভাবাত্মক প্রবন্ধ সংকলন। এই প্রবন্ধগুলি দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন'- এআষাড়, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ থেকে তৃতীয় বর্ষ বৈশাখ ১৩০৮ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সভ্যতার তুলনা—এই প্রবন্ধ সংকলনের বিষয়। এই তুলনায় বিবেকানন্দের মনন শক্তির গভীরতা। যুক্তিদ্বারা বক্তব্য প্রমাণের নিপুণতা, ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ দক্ষতার পরিচয় ও বর্তমান।

বিবেকানন্দের প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ সংকলন (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) এই বইটি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের মূল্যবান এক সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাজ পূর্ব ও পশ্চিম' (রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ঃ পৃঃ ৫৫ প্রবন্ধে এই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। আরও মনে রাখতে হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সমন্বয়ের বিষয়টি পরে বহু মনীষী বহুভাবে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের লেখনীতেই তার সূচনা এক্ষেত্রে তিনি পথ প্রদর্শক রূপে স্মরণীয়।

প্রবন্ধে তথা সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন বিবেকানন্দ। কারণ তিনি মনে করতেন তার ফলে সাহিত্যের বাতবতা পরিস্ফুটিত হয়। বিবেকানন্দের মতে "স্বাভাবিক যেভাষায় মনের ভাব অমরা প্রকাশ করি, যেভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না। ও ভাষার যেমন জোর তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না।

তবে ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে তিনি সাধু ভাষাতেও লিখেছেন। 'বর্তমানে ভারত' সাধু ভাষায় রচিত। সে ভাষারও বলিষ্ঠ সজীবতা অনন্য।

তথ্য ও যুক্তির বিন্যাসে, বাগ্‌ভঙ্গির সরসতায়, সর্বোপরি বিষয়ের সঙ্গে অনুভবের সুষম মিশ্রণে বিবেকানন্দের প্রবন্ধ সংখ্যায় স্বল্প হলেও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। উনিষ শতকের বাংলা প্রবন্ধের ধারায় বিবেকানন্দ স্ব-স্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিমান। পরের যুগে এই ধারায় কিছুটা অনুসরণে বুদ্ধিদীপ্ত সরস প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রথম চৌধুরী এবং সৈয়দ মুজতবা আলী। কিন্তু এঁদের রচনায় নেই বিবেকানন্দের মতো অনুভবের গাঢ়তা এবং দেশ প্রেমের নিবিড়তা।

তাই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে আজও বিবেকানন্দ স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৫.৯ সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২)

মহারাষ্ট্রের বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান সখারাম দেউস্কর বালক বয়সেই মাকে হারান। পিতার নাম গণেশ। জন্ম তৎকালীন বিহারের দেওঘরে। বাল্যেই বাংলা শিখেছিলেন তিনি।

শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা— দেওঘর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন সখারাম। তিনি যখন ওই স্কুলে পড়তেন তখন মাইকেল জীবনী রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু ছিলেন প্রধান শিক্ষক। তাঁরই প্রভাবে সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন সখারাম। ক্রমে ইতিহাস হয়ে ওঠে তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ শিখতে আরম্ভ করেন।

তাঁর রচিত বহু ইতিহাস-কেন্দ্রিক প্রবন্ধ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত 'হিতবাদী'-তে মুদ্রিত হয়েছিল।

জীবিকা— সখারাম ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে দেওঘর বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিন্তু 'হিতবাদী' পত্রিকায় দেওঘরের ম্যাজিস্ট্রেট মি. হার্ড-এর অন্যায্য কর্মের সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখার জন্য তাঁর চাকরি যায় এবং তাঁকে দেওঘর ত্যাগ করতে হয়।

সখারাম চলে আসেন কলকাতায় এবং 'হিতবাদী'র প্রুফ রিডার নিযুক্ত হন। পরে তিনি এ পত্রিকার সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন। 'হিতবাদী' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই সখারাম হন সম্পাদক, কিন্তু সেই পদ তিনি ত্যাগ করেন। কারণ সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে তিলক-এর ভূমিকার সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ। তাতে সম্মত হননি সখারাম এবং একারণে তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর কলকাতায় নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাস অধ্যাপকের পদে কাজ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর লেখা 'দেশের কথা' আর 'তিলকের মোকদ্দমা' বই দুটি ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে। জাতীয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভীত হন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং পরে নানা স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ ছিল সখারামের (১৯০৫-১৯১১) । বিপ্লবী দলের পত্রিকা যুগান্তর-এমাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন সখারাম। ১৯০২ সালে বাংলায় শিবাজী উৎসব প্রচলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সখারাম। ১৯১২ সালের ২৩ নভেম্বর দেওঘরে সখারামের মৃত্যু হয়। প্রবন্ধ ভিন্ন অন্যান্য সাহিত্য-শাখা সম্পর্কে আগ্রহ ছিল না তাঁর। সখারামের সাহিত্য সাধনা তথা প্রবন্ধ রচনার উৎস ছিল স্বদেশপ্রীতি। তাঁর ভাষা ছিল সরল। বিশুদ্ধ বাংলার ব্যবহার ছিল তাঁর রচনার বিশেষত্ব। তাঁর বারোটি প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দেশের কথা' ১৯০৪-এগ্রন্থটির একটি পরিশিষ্ট মুদ্রিত হয়। তাঁর ভূমিকায় সখারাম জানিয়েছিলেন মি. উইলিয়াম ডিগরি-র 'দি প্রসপারাম ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' ('The Prosperous British India') দাদাভাই নৌরোজির পভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' (Poverty and un-British rule in India') এবং রমেশচন্দ্র দত্তের 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' ('The Economic History of British India')— মূলত এই বইগুলি অবলম্বনে 'দেশের কথা' লেখা হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় রচিত বইগুলির মর্ম সর্বজনবোধ্য করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা ভাষায় 'দেশের কথা' রচনা করেন। গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয় ইংরেজ শাসনে শিল্প বাণিজ্যের ক্রমবিনাশই ভারতবর্ষের অধোগতির কারণ।

'দেশের কথা' ভিন্ন তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু তথ্য দেওয়া হল।

সখারামের প্রথম গ্রন্থ 'এটা কোন যুগ?' শুদ্ধিপত্র সমেত পঁচিশ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। যুগ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিচারমূলক এই পুস্তিকাটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের 'কার্তিক সংখ্যা 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' পত্রিকায়।

'মহামতি রাণাডে (১৯০১) নামের জীবনীটি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটির অনেকটা অংশ 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়।

তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'ঝাঁসীর রাজকুমার' (১৯০১) ষাট পৃষ্ঠার একটি জীবনী। সখারাম জানিয়েছেন যেতাঁর ঐতিহাসিক বন্ধু দত্তাত্রেয় বালবন্ত পারাসনিম-এর মারাঠিতে লেখা 'মহারাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের জীবন চরিত'-এর সহায়তায় তিনি এগ্রন্থটি রচনা করেছেন।

সখারামের চতুর্থ গ্রন্থ 'বাজীরাও' (১৯০২)। মূল মারাঠি দলিল-পত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই জীবনীটি তিনি লিখেছিলেন।

তাঁর পঞ্চম গ্রন্থ 'আনন্দী বাঈ' (১৯০৩) ও জীবনী পুস্তিকা। মারাঠি মহিলা কাশী বাঈ-এর লেখা আনন্দী বাঈ-এর বৃহৎ জীবনী অবলম্বনে সখারাম এই একানব্বই পৃষ্ঠার জীবনীটি রচনা করেছিলেন। বইটির অনেকাংশ 'সখী' পত্রিকার ১৩০৭ বঙ্গাব্দের মাঘ-চৈত্র এবং ১৩০৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সখারামের ষষ্ঠ রচনা 'শিবাজীর মহত্ত্ব' (১৯০৩)। কুড়ি পৃষ্ঠার ছোটো এই বইটি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শিবাজি উৎসব উপলক্ষে রচিত। উৎসব কর্তৃপক্ষ এটি বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সখারাম গণেশ দেওঘর-এর সপ্তম গ্রন্থ 'দেশের কথা' সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। তাঁর অষ্টম গ্রন্থ 'কৃষকের সর্বনাশ' (১৯০৪) কোনো নতুন বই নয়, 'দেশের কথা' গ্রন্থের একটি অংশের পূনর্মুদ্রণ।

তাঁর নবম গ্রন্থ 'শিবাজীর দীক্ষা' ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি এই বইটিতে মুদ্রিত হয়েছিল।

সখারামের দশম গ্রন্থ 'শিবাজী' (১৯০৬) কলকাতার শিবাজি উৎসব উপলক্ষে বিতরণের জন্য রচিত। তাঁর একাদশ গ্রন্থ 'তিলকের মোকদ্দমাও জীবন চরিত' (১৯০৮)।

সখারামের দ্বাদশ ও শেষ গ্রন্থ 'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ১৩১৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

দেখা যাচ্ছে সখারামের বেশির ভাগ গ্রন্থই মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী। গ্রন্থগুলি তাঁর স্বদেশ স্বজাতি প্রীতির পরিচায়ক। এগুলি কিন্তু বিষয়-চিন্তন মূলক প্রবন্ধ নয়— জীবনালেখ্য।

প্রকৃত অর্থে সখারামের প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা চার— (১) 'এটা কোন যুগ?' 'দেশের কথা' 'কৃষকের সর্বনাশ' এবং 'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?'

প্রথম গ্রন্থের বিষয় যুগ বিভাগ সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রানুসারী আলোচনা। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দেশের কথা'-র বিসয় ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ার কারণ ও পরিস্থিতি এবং দেশের অবনতির কারণ সমূহের যুক্তি সম্মত বিশ্লেষণ।

তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'কৃষকের সর্বনাশ' আসলে দ্বিতীয় গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের মুদ্রিত রূপ। এই গ্রন্থে ভারতীয় কৃষকদের দুর্গতির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন সখারাম।

চতুর্থ প্রবন্ধ সংকলনে সখারাম বাঙালি হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার দ্বারা সখারাম প্রমাণ করতে চেয়েছেন এরূপ জাতির সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়।

এই চারটি গ্রন্থের প্রবন্ধ ভিন্ন নানা বিষয়ে লেখা সখারামের প্রচুর প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

প্রবন্ধ বিশেষত্ব— যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, সরসতা ও সহজ বোধ্যতা সখারামের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তবে তাঁর প্রবন্ধের ত্রুটি আবেগের অতিরেক আর বিষয়ের বৈচিত্রহীনতা। আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এমনও বলা যায় যেতাঁর দেশভাবনা ছিল পুরোপুরি হিন্দুত্ববাদী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় হিন্দুদের শিক্ষিত অংশ ও এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন। কিন্তু সখারাম ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি। এই সাহস ও সততার কারণে তিনি সেই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ত্ব হয়ে উঠেছিলেন।

এই বাংলাভাষীয় মহারাষ্ট্রীয় মানুষটি বাংলা ভাষায় রাজনৈতিক কথা স্বদেশ প্রেমমূলক প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপয়িতা হিসেবে স্মরণীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর 'দেশের কথা' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হল।

"ভারতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বৃটিশ শাসনের রাজের প্রদত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধানতম সুফল। এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং ইহা যেদেশের সামগ্রী সেই দেশের রীতির অনুকরণে ইহাকে পরিচালিত করিতে না পারিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা। সুদূর পরাহত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রজার রাজনীতিক আন্দোলনে যেআশু সুফল লাভ হয়, তাহার কারণ এই যে, তত্রত্য প্রাসমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এ সিকল আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে। আমাদের দেশের অজ্ঞতার জন্য অনেকেই এই সকল আন্দোলনের সংবাদ পর্য্যন্ত রাখেন না, সমাজের সকলে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কাজেই ক্ষমতাপ্রিয় যথোচ্ছাচার রাজ পুরুষেরা আন্দোলনকারীদিগের মুষ্টিমেয়তা বা সংখ্যার অল্পতা অনুভব করিয়া প্রতীকারে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতীয় মহাসমিতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয় না আমাদিগের অকর্ম্মণ্যতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।"

৫.১০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)

নৈহাটির শাস্ত্রচর্চার ঐতিহ্য সমন্বিত ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৫৩-র ৬ ডিসেম্বর হরপ্রসাদের জন্ম। এই পরিবারের আদি বাস ছিল খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে। তাঁর পিতামহ কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন।

পিতা রামকমল ন্যায়রত্নের (মৃত্যু ১৮৬১) ছয় ছেলের মধ্যে হরপ্রসাদ ছিলেন পঞ্চম সন্তান। প্রাথমিক শিক্ষা কান্দীর স্কুলে। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন। তাঁর পারিবারিক পরিবেশে ছিল সংস্কৃত এবং পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার আবহ। ছাত্রজীবনেও এই পরিমণ্ডলেই তিনি বড়ো হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের সংস্পর্শে হরপ্রসাদের মনে যুক্তিপরায়ণতা ও দেশপ্রীতি সঞ্চারিত হয়।

জীবিকা—এম. এ. পাস করার পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারী রূপে এশিয়াটিক সোসাইটির

পুঁথি সংক্রান্ত বিভাগে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। যদিও এশিয়াটিক সোসাইটির কাজের সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হয়নি। ক্রমে তিনি সোসাইটির অন্যান্য কাজের সঙ্গে 'বিবলিওথেকী ইন্ডিকা' গ্রন্থমালার সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন।

১৮৯১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর তিনি সোসাইটির ডিরেক্টর অফ দি অপারেশনস ইন সার্চ অফ সানসক্রিট ম্যানাসক্রিপ্ট-এর পদে নিযুক্ত হন। তিনি সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং সভাপতি হয়েছিলেন (১৯১৯-১৯২১)। পরে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর যুক্ত হন এবং বাংলা পুঁথি সংক্রান্ত বহু মূল্যবান কাজ করেন। ১৮৯৮ সালে সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করে।

১৯৩১-এর ১৭ নভেম্বর হরপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

বিশিষ্ট কাজ— হরপ্রসাদ ইংরেজি ভালো জানতেন। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠও জানতেন। তাছাড়া তাঁর জানা ছিল মৈথিলি, হিন্দি, রাজস্থানি ও গুজরাটি ভাষা।

হরপ্রসাদের বিশেষ কৃতিত্ব নেপাল রাজ দরবার গ্রন্থগার থেকে বাংলা ভাষার প্রথম লিখিত নিদর্শন চর্যাগীতির পুঁথি আবিষ্কৃত এবং 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে অন্য দুটি পুঁথির সঙ্গে বইটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করা। তিনি বৌদ্ধ ও যোগীতান্ত্রিকদের বহু পুরানো পুঁথি আবিষ্কার করে ভারততত্ত্ব চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য অশ্ব ঘোষ রচিত 'সৌন্দরনন্দ', সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত দ্ব্যর্থক সংস্কৃত গ্রন্থ 'রামচরিত', বিদ্যাপতির অবহট্‌ঠ ভাষায় লেখা মিথিলার রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থ 'কীর্তিলতা' এবং মৈথিলি ভাষায় গদ্যে লেখা জ্যোতিরীশ্বর-এর গ্রন্থ 'বর্ণনরত্নাকর'। সবগুলির পুঁথিই তিনি পেয়েছিলেন নেপাল রাজ দরবারের গ্রন্থাগারে।

এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি বিভাগে কাজ করার সূত্রে হরপ্রসাদ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন এবং ভারতে এই ধর্মের বিস্তৃত দীর্ঘ প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এবং বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকে পূর্ণতা দিয়েছে।

সামগ্রিক সাহিত্যচর্চা ঃ

ছাত্রাবস্থায়ই হরপ্রসাদের সাহিত্যচর্চার শুরু। এসময়েই তাঁর লেখা 'ভারতমহিলা' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এপ্রকাশিত হয় (মাঘ-চৈত্র ১২৮২ বঙ্গাব্দ)। এসময়ে তাঁর কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয় 'আর্য দর্শন' (১৮৭৪) পত্রিকায়।

প্রবন্ধ ব্যতীত তিনি রূপক কাহিনী, উপন্যাস, আখ্যান, ভ্রমণ নিবন্ধ রম্যরচনা এবং দু-একটি কবিতাও লিখেছিলেন। তাঁর রূপ কাহিনীর নাম 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১)।

উপন্যাস—কাঞ্চনমালা (১ম প্রকাশ বঙ্গদর্শন ১২৮৯ ধারাবাহিক প্রকাশ, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩২২) এবং 'বেনের মেয়ে' (১ম প্রকাশ নারায়ণ, গ্রন্থাকারে ১ম প্রকাশ ১৯১৯)।

প্রবন্ধক হরপ্রসাদ ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রচুর সংস্কৃত এবং বাংলা গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন এবং সে প্রসঙ্গে বহু

প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সে সবের কিছু গ্রন্থ নিবন্ধ হলেও অনেক প্রবন্ধই ছড়িয়ে আছে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। বাংলা আর ইংরেজি—দু ভাষাতেই তিনি রচনা করেছেন প্রবন্ধ—এগুলি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও বিস্তৃতি পাঠের পরিচয় বহন করে।

যুক্তি দ্বারা বিষয়ের উপস্থাপনা এবং বিশ্লেষণমুখীনতা হরপ্রসাদের প্রবন্ধে লক্ষিত হয়। তার সঙ্গে তাঁর ছিল সরল, সরস অথচ আন্তরিক রচনাভঙ্গি। তার সঙ্গে তাঁর ছিল সরল, সরস অথচ আন্তরিক রচনাভঙ্গি। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা স্বচ্ছ এবং তদ্ভব ও দেশি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে উজ্জ্বল। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা বাংলা গদ্যকে দিয়েছে ঋজুতা এবং বলিষ্ঠতা।

হরপ্রসাদের প্রথম যুগের প্রবন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু দ্রুত হরপ্রসাদ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন।

হরপ্রসাদের প্রবন্ধ-পুস্তকের সংখ্যা তিন—'ভারত-মহিলা' (১৮৮১), 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' (১৯৪৬) এবং 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯৪৮)। শেষ দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় হরপ্রসাদের মৃত্যুর পর।

মধ্যপ্রদেশের স্থানীয় ভূপতি মহারাজ হোলকার ভারতীয় মনস্বিনী নারীদের বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। এই উপলক্ষে হরপ্রসাদ লিখেছিলেন 'ভারত-মহিলা'। গ্রন্থটি ঘোষিত পুরস্কার লাভ করে। অতীত ভারতের কবি ও পাণ্ডিতগণের লেখা নান ধরনের রচনা থেকে সেই সময়ের মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ও তাদের চরিত্র মহিমার কতা এই প্রবন্ধ গ্রন্থের বিষয়। এই বিষয়ে অনেক লেখকই পূর্বে লিখেছেন। আমরা মনে করতে পারি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' (১৮৭৯)—গ্রন্থের কথা। হরপ্রসাদের মৌলিকত্ব রয়েছে চিন্তন এবং প্রকাশরীতিতে। এগ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে—বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র—এইসব তন্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাচীন ভারতের মেয়েদের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। বাকি তিন অধ্যায়ে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা থেকে গৃহীত কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলার চরিত্রমহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। ছাত্রজীবনে লেখা এই প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে হরপ্রসাদ আকর্ষক ভাষায় বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হরপ্রসাদ যাঁদের চরিত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন তাঁদের মদ্যে আছেন গীতা, সাবিত্রী ও লোপামুদ্রা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, পার্বতী ও গান্ধারী। গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে হরপ্রসাদ কালিদাস অর ভবভূতির সাহিত্যে চিত্রিত বিশিষ্ট নারীদের পরিচয় দিয়েছেন। এঅংশে তাঁর সংস্কৃতভাষার জ্ঞান এবং রসগ্রামী মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং তুলনা দ্বারা দেখিয়েছেন রামায়ণ ও মহাভারতের নারীচরিত্র কালিদাস ভবভূতির রচনায় সর্বাংশে এক না হলেও তাঁদের চরিত্র মহিমা খর্বিত হয়নি।

প্রসঙ্গত আমরা হরপ্রসাদের কয়েকটি সংস্কৃত সাহিত্য-আলোচনামূলক প্রবন্ধের কথা বলে নিতে চাই। এইসব রচনার মধ্যে কালিদাসের কাব্য নাটকই প্রধান যথা 'মেঘদূত', 'রঘুবংশ', 'রঘুবংশের গাঁথুনি', 'কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা', 'পার্ব্বতীর প্রণয়', 'দুর্ব্বাসার শাপ'—এই সব প্রবন্ধে হরপ্রসাদের সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকার ও সমালোচনা শক্তির পরিচয় বর্তমান।

নাটক—কাব্যের বিশেষত্ব এবং মূল ভাব তাঁর সাহিত্যরসিক মন এবং সরল, মধুর, স্পষ্ট রচনাভঙ্গির জন্য সুবোধ্য হয়ে উঠেছে। 'মেঘদূত' প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত হল। 'তাঁহার প্রথম সহানুভূতি স্বভাব সৌন্দর্য্যে রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্বত পর্যন্ত এই সুদূর বিস্তীর্ণ পথে যেখানে যেবস্তু সুন্দর, কালিদাস যক্ষমুখে সেই সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন। ... ক্রমে ভৌতিক সৌন্দর্য্য পরিহার করিয়া তিনি মনুষ্য-সৌন্দর্য্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জগতের সৌন্দর্য্য বর্ণা করিয়া রমণী সৌন্দর্য্য দ্বারা তাহার উপসংহার করিলেন। দেখাইলেন রমণী-সৌন্দর্য্য স্বভাব-সৌন্দর্য্য হইতে উচ্চতর; উহাই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা।''

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'—কালিদাসের এই নাটকের আলোচনা করা হয়েছে 'দুর্বাসার শাপ' নামে। কারণ দুর্বাসার অভিশাপই নাটকটিতে নাট্য-কৌতুহল সৃষ্টি করেছে এবত দুষ্মন্ত চরিত্রকে দিয়েছে নায়কোচিত বিশিষ্টতা। তিনি পূর্ব সমালোচকদের মতো সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বা প্রতীচ্য কাব্যতত্ত্বের দ্বারা কালিদাসের রচনা বিশ্লেষণ করেননি। পুরোপুরি নিজস্ব রসগ্রাহী মন নিয়ে তিনি কালিদাস-সাহিত্যের যেআলোচনা করেছেন তা সচরাচর সৃষ্ট হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে নাম করা যায়—'কালিদাস ও সেক্সপীয়র', 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধ দুটির প্রথম প্রবন্ধে তিনি তথ্য আর তুলনা দ্বারা ভিন্ন দেশ ও পৃথক সাহিত্য-ঐতিহ্যের দুই বিশিষ্ট কবি-নাট্যকারের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। নিরপেক্ষভাবে তিনি এই দুই সাহিত্যিকের দুর্বলতা এবং সফলতার দিকগুলি স্পষ্ট করে দিতে পেরেছেন।

'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধের তিন কবি কালিদাস, বায়রন ও বঙ্কিমচন্দ্র। এপ্রবন্ধে বাঙালি তরুণদের মনে পাশ্চাত্যে সাহিত্য, দেশজ ঐতিহ্য আর সমকালীন সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে হরপ্রসাদ আলোচনা করেছেন।

বাংলাভাষা আর সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও বঙ্গবিদ্যা প্রীতির নিদর্শন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে 'বাঙ্গালা ভাষা', 'নতুন কথাগড়া' বাঙ্গালা ভাষার পরিণতি' 'বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রভৃতি।

বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত। কিন্তু এভাষার স্বরূপ যেস্বতন্ত্র তা হরপ্রসাদ নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তথ্য-প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বাংলাভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায় বিজ্ঞানী মন এবং বাংলা ভাষা অনুরাগের প্রকাশ।

প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস সম্পর্কে হরপ্রসাদের ছিল নিবিড় অনুসন্ধিৎসা। বিশেষত বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতুহল তাঁর মধ্যে এসেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার হিসেবে। তাঁর এই শ্রেণির প্রবন্ধগুলি নতুন সন্ধানলব্ধ তথ্যে সমৃদ্ধ। অবশ্য তাঁর এই ধরনের প্রবন্ধগুলির বেশির ভাগই ইংরেজিতে লেখা। বাংলাতেও এরূপ কিছু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। তবে তাঁর এই প্রবন্ধগুলির বেশিরভাগই ছড়িয়ে আছে নানা সাময়িক পত্রে। পাশ্চাত্য লেখকদের ভারতবর্ষ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি যেপ্রকৃত তথ্যের অভাবে বিশ্বাস্য হতে পারেনি—তা হরপ্রসাদ প্রমাণ সহযোগে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজ করার সূত্রে প্রচুর শিলালিপি ও তাম্রপত্রের পাঠ নির্ণয় করেছেন। অনেক পুরোনো পুঁথি সংগ্রহ করেছেন এবং তাদের তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করেছেন। এই দুই কারণে ভারতবর্ষ তথা বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যসমৃদ্ধি লক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধসমূহ তার লেখনীগুণে হয়ে উঠেছে সাহিত্যরসসমৃদ্ধ—যথা

'আমাদের গৌরবের দুই সময়', 'পালবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'পুরাণ বাঙ্গালার একটি খণ্ড'—'ভাস্করের কাজ' প্রভৃতি।

বাংলা আর বাঙালির ইতিবৃত্ত, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে হরপ্রসাদের গাঢ় অনুরাগ নৈষ্টিক গবেষণার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' গ্রন্থটি তার প্রমাণ। এই গ্রন্থের কুড়িটি প্রবন্ধ ১৯১৪ সালে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর অষ্টম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল। 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান', 'ভাস্করের কাজ', 'বাংলায় সংস্কৃত' 'বাঙালী ব্রাহ্মণ', 'চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর'—গ্রন্থের এইসব তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ তাঁর প্রগাঢ় স্বজাতিপ্রীতির দীপ্তিতে দ্যুতিমান হয়ে উঠেছে।

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ের প্রবন্ধে হরপ্রসাদের মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। এবিষয়ে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমধর্ম। রবীন্দ্রনাথ উভয়ের তুলনা করে লিখেগেছেন—উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা—যেকোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল তার জটিল গ্রন্থগুলি অনায়াসে মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনপ্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা' ২য় ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৩৯) পৃ. ১১৯০)

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বাংলায় অল্প প্রবন্ধই লিখেছেন হরপ্রসাদ। এক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমের বিচারপ্রণালীর অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন ইতিহাসের প্রতিটি অংশ তিনি বিজ্ঞানী সদৃশ মনোভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছেন।

তাঁর এবিষয়ের বাংলা প্রবন্ধের নিদর্শন 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে সংকলিত সতেরোটি প্রবন্ধ। এইসব প্রবন্ধ (বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?', 'নির্বাণ কয় রকম?' 'হীনযান ও মহাযান', 'সহজযান' প্রভৃতি) ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে 'নারায়ণ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে হরপ্রসাদ প্রত্নতত্ত্বের সহায়তায় বৌদ্ধ ধর্মের নানা দিক ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আর সমাজবিন্যাস সম্পর্কেও হরপ্রসাদ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলি তাঁর পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

হরপ্রসাদ বহুদিন শিক্ষকতা করার জন্য এদেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন শিক্ষা মানুষের মনকে সমৃদ্ধ ও মার্জিত করে, তাকে দেয় উদার সহিষ্ণুতা এবং মানব কল্যাণসাধনের ইচ্ছা তাঁর মতে এ-দেশের শিক্ষা-প্রণালী ব্যক্তির মনকে সেই পুষ্টি দেয় না, কারণ উহাতে শারীরিক শিক্ষার নামও নাই, যাহাতে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তাহাও উহাতে নাই আছে শুধু কয়েকটি বৃদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা, তাহাও উচ্চতর

বৃত্তিসমূহের নহে। প্রধানতঃ কেবল স্মরণ-শক্তির উন্নতির দিকেই অধিক দৃষ্টি। ('কালেজী শিক্ষা') তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে আছে 'মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য', 'শিক্ষা', 'কালেজী শিক্ষা' প্রভৃতি।

হরপ্রসাদের সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধের মধ্যে আছে 'প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ', 'সমাজের পরিবর্ত কর রূপ'— প্রভৃতি। প্রবন্ধগুলিতে তাঁর মনের আধুনিকতার পরিচয় বর্তমান। তাঁর মতে সময়ের সঙ্গে সমাজ ও সমাজবিধির পরিবর্তন আবশ্যিক। নতুবা সমাজ হীনবল হয়। 'সমাজের পরিবর্ত কয় রূপ' প্রবন্ধে তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা আমাদের বিস্মিত করে। তিনি লিখেছেন—'সমাজ মনুষ্যের জন্য, মানুষ সমাজের জন্য নহে।''

তিনি কিছু লঘু প্রবন্ধ ('তৈলদান', 'স্ত্রীবিপ্লব') ভ্রমণ-নিবন্ধ ('ধ্যনোগী টিব্বা', 'ঝিল্গী', 'উড়িষ্যার জঙ্গলে') কিছু জীবনীমূলক প্রবন্ধ ('রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী', 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া'য় 'বঙ্কিমচন্দ্র-১', 'বঙ্কিমচন্দ্র-২', 'অর্দ্ধেন্দু কথা' 'অর্দ্ধেন্দুশেখর-১' 'অর্দ্ধেন্দুশেখর-২' 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার' প্রভৃতি) এবং 'মন্ময় প্রবন্ধ' ('যৌবনে সন্ন্যাসী', 'হৃদয় উদাস' প্রভৃতি) লিখেছিলেন।

প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদের আর এক বিশেষত্ব সরস প্রকাশভঙ্গি, ফলে দুরহ বিষয়ও হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ এবং রম্য।

গভীর জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্লেষণদক্ষতা, বক্তব্য-বিষয়ের বিন্যঅসকৌশল এবং প্রকাশভঙ্গির সরসতার জন্য বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হরপ্রসাদের স্থান অতিউচ্চে। গবেষকের নিরাসক্ত মানসিকতা অনেকই। বজায় থাকায় হরপ্রসাদের প্রবন্ধমালা হয়ে উঠেছে অনন্য। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে তিনি ঐশ্বর্য ও দ্যুতি দিতে সমর্থ হয়েছেন।

৫.১১ শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)

শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম মাতুলালয় চব্বিশ পরগনা জেলার চাংড়িপোতা গ্রামে। তাঁর পৈতৃক আবাস এই জেলারই মজিলপুরে।

তাঁর পিতা, মজিলুর গ্রামের সরকারি স্কুলের পন্ডিত হরানন্দ স্ত্রী গোলকমণিকে লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন। শিবনাথের শিক্ষা শুরু হয়েছিলেন মায়ের কাছে। তাঁর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন সমকালের বিখ্যাত 'সেমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক।

শিক্ষা ঃ মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পর শিবনাথ ভর্ত্তি হন মজিলপুরের পাঠশালায়। পরে তিনি পড়েন স্থানীয় হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুল-এ।

কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে, বি. এ. ১৮৭১-এআর ১৮৭২-এসংস্কৃত নিয়ে এম. এ. পাস করে তিনি শাস্ত্রী উপাধি পান।

সমাজসেবা, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ও প্রচার কলকাতায় ছাত্রজীবনেই সমাজ সংস্কার মুলক কাজ করা শুরু করেন শিবনাথ।

বিধবাবিবাহের পক্ষে দায়িত্ব নিয়ে কয়েকটি বিধবা বিবাহ ঘটিয়েছিলেন।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং উপবীত ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করেন। পরে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন সভার সঙ্গে যুক্ত হন এবং মদ্যপান নিবারণ বিভাগের সদস্য রূপে কাজ করেন।

১৮৭২-৭৩ সালের মধ্যে মজিলপুরে অবস্থান কালে তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠন করেন, মিউনিসিপ্যালিটির সংস্কার করেন; স্থাপন করেন দাতব্য চিকিৎসালয়।

মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য আগ্রহী ছিলেন শিবনাথ। মেয়েদের বিবাহ বয়স নির্ধারক (চোদ্দো বছর বয়সের কমবয়সী মেয়েদের বিবাহ দেওয়া চলবে না) আইন বিধিবদ্ধ করার আন্দোলনে তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্রের সহযোগী।

'হিন্দু মহিলাবিদ্যালয়' বা 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' এবং 'নীতি বিদ্যঅলয়' নামে বালিকা বিদ্যালয় (১৮৮৪) স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শিবনাথ।

১৮৭৭ তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কয়েক জন যুবককে নিয়ে গঠন করেন 'ইনার সার্কল' নামের বৈপ্লবিক সমিতি। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও জনসেবার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উন্নতির কাজেও এই সমিতি উদ্যোগী ছিল।

এর আগেই ১৮৭৫-এসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় 'ভারতসভা' বা 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'।

১৮৭৮-একেশবচন্দ্র নিজের চোদ্দো বছরের কম বয়সী কন্যার সঙ্গে কোচবিহার-রাজ্যের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের বিবাহ দেন। এনিয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ'-এওঠে তুমুল আলোড়ন। পরিণামে বিভক্ত হয় ব্রাহ্ম সমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্যদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'। এ-সমাজের উন্নতির জন্য শিবনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করতেন ১৮৮৮-তে তাঁর বিলেত যাওয়ার কারণ সম্ভবত এ-সমাজের উন্নতির উপায় সন্ধান, এসভার প্রচারক হিসেবে শিবনাথ প্রায় সারা ভারত ভ্রমণ করেছিলেন।

তাঁর অন্যান্য কীর্তির মধ্যে আছে 'সিটিস্কুল' (১৮৯৭) স্থাপন ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য 'ছাত্র সমিতি' গঠন এবং ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতির জন্য 'সাধানাশ্রম' (১৮৯২) প্রতিষ্ঠা।

জীবিকা ঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবিকা ছিল শিক্ষকতা। ১৮৭২-এতিনি মজিলপুরে মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। তবে ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হওয়ার ১৮৭৮-এর শেষদিকে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৭৬-এতিনি হেয়ার স্কুল-এর হেড পণ্ডিত ও ট্রানস্লেশন-শিক্ষক নিযুক্ত হন।

পত্রিকা সম্পাদনা ঃ ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ-এর সঙ্গে যুক্ত থাকা কালে শিবনাথ সম্পাদনী করতেন 'মদ না গরল' নামের পত্রিকা। বিনামূল্যে বিতরিত পত্রিকাটির সুরা পান বিরোধি গদ্য ও গত্য রচনাগুলির অধিকাংশ ছিল তাঁর লেখা।

'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'-এর পাক্ষিক বাংলা মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদী' এবং ইংরেজি মুখপত্র 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার'— শিবনাথের সম্পাদনায় মুদ্রিত হত। মাতুল দ্বারকানাথ তত্ত্বভূষণের পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' তিনি ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৪ এই একবছরে সম্পাদনা করেন।

শিবনাথের প্রিয় ছাত্র প্রমদাচরণ সেন কিশোরদের জন্য প্রকাশ করেছিলেন সচিত্র মাসিকপত্র 'সখা' (১৮৮৩) তাঁর মৃত্যুর পর তৃতীয় বর্ষ সপ্তম সংখ্যা জুলাই, ১৮৮৫) থেকে চতুর্থ বর্ষ (১৮৮৬) পর্যন্ত শিবনাথ পত্রিকাটি

সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'মুকুল' নামে আর একটি সচিত্র মাসিক কিশোর পত্রিকা ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

সামগ্রিক সাহিত্য পরিচয় ঃ শিবনাথ ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ও শিশু সাহিত্যিক। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় তিনি 'সোমপ্রকাশ' ও 'এডুকেশন গেজেট'-একবিতা লিখতেন তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮) নামের খণ্ড কাব্য।

তাঁর কবিতা-সংকলন ও কাব্য যথাক্রমে 'পুষ্পমালা' (১৮৭৬ কবিতা সংকলন), 'হিমাদ্রিকুসুম' ১৮৮৭ কাব্য 'পুষ্পাঞ্জলি' ১৮১৮ কাব্য) 'ছায়াময়ী পরিণয় (১৮৮৯ রূপক কাব্য) উপন্যাস 'মেজ বৌ' (১৮৮০) 'যুগান্তর' (১৮৯৫), 'নয়ম তারা' (১৮৯৯), 'বিধবার ছেলে' (১৯১৬)। এছাড়া 'সখা', 'সখা ও সাথী' এবং 'মুকুল'-এতিনি কিশোরদের জন্য বেশ কিছু গদ্যও পদ্য রচনা লিখেছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী মূলত ছিলেন প্রাবন্ধিক। চার প্রবন্ধ গ্রন্থের একটি তালিকা দেখা হল। (১) 'এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ' (১৮৭৮), (২) 'গৃহধর্ম' (১৮৮১), (৩) 'জাতিভেদ' (১৮৮৪), (৪) রামমোহন রায়' (১৮৮৬), (৫) 'বক্ত ৃতা স্তবক' (১৮৮৮), (৬) 'মাঘোৎসবের উপদেশ' (১৯০৪), (৯) ' প্রবন্ধাবলি' ১ম খণ্ড (১৯০৪), (১০) 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র' (১৯১০), (১১) 'ধর্মজীবন' (১ম ১৯১৪, ২য় ১৯১৫, (১২) 'আত্মচরিত' (১৯১৮)।

ইংরেজিতে তিনি দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ লিখেছিলেন দু-খণ্ডে বিভক্ত 'হিস্ট্রি অব দি ব্রাহ্ম সমাজ' (১৯১১-১৯১২) এবং 'মেন আই হ্যাভ সিন' (১৯১৯)।

এছাড়া তাঁর অনেক প্রবন্ধধর্মী বক্তৃতা পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

তাঁর প্রবন্ধের প্রবীন বিষয় ব্রাহ্ম ধর্ম এবং প্রায়শ সেগুলি ব্রাহ্ম সমাজে বা মাঘোৎসব উপলক্ষে পদত্ত বক্ত ৃতার সংকলন। উদাহরণ রূপে আমরা 'বক্তৃতা স্তবক' (১৮৮৮) গ্রন্থটির কথা বলতে পারি। গ্রন্থটি কলকাতার ছাত্র-সমাজ ও অন্যান্য স্থানে দেওয়া। কিছু বক্তৃতার মধ্যে 'মানবচরিত্র ও প্রতিষ্ঠার বল', 'সমাজ-রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি', 'ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ' এগুলি পৃথক পুস্তিকা হিসেবেও মুদ্রিত হয়েছে। এইসব প্রবন্ধ শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম-বিরোধীদের মত যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন এবং সরল সহজ স্পষ্ট ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ। তারইসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যায় যুক্ত হয়েছে সাহিত্য-লাবণ্য। ফলে ধর্মতত্ত্ব হয়ে উঠেছে উপভোগ্য সরস প্রবন্ধ। তাঁর এরূপ প্রবন্ধেরমধ্যে 'বক্তৃতাস্তবক' ভিন্ন আছে 'এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ' (১৮৭৮) কোচবিহার-রাজার পুত্র ও কেশবচন্দ্র সেনের অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহের প্রতিবাদ ভিত্তিক নিবন্ধ; 'মাঘোৎসবের উপদেশ' ১৮৭৯ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাঘোৎসব উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতার সংকলন 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা ১৮০৫, ১৮০৬ আর ১৮১৫ থেকে ১৮২৩ শকাব্দ পর্যন্ত মাঘোৎসবে দেওয়া (৯) বক্তৃতার সমষ্টি, 'ধর্ম্মজীবন' (তিনখণ্ড) —সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত উপদেশের সংকলন।

'গৃহধর্ম্ম' ও 'জাতিভেদ' (১৮৮৪) গ্রন্থ দুটিতে সংসার ও সমাজ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীয় ভাবনার প্রকাশ লক্ষিত হয়। তাঁর সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'বক্তৃতা স্তবক' আর 'প্রবন্ধাবিল'-র বিভিন্ন লিখনে। 'প্রদীপ', 'ভারতী' এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় শিবনাথের যেসব প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় তারই সংকলন 'প্রবন্ধবলি' বইটি। ধর্ম-বিষয়ক কিছু প্রবন্ধও গ্রন্থটিতে আছে। এইসব প্রবন্ধে তিনি 'সমাজ

রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি', 'অবরোধ প্রথা', 'বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘাত'—ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ধর্ম ভিন্ন শিবনাথ শাস্ত্রী জীবনী, আত্মজীবনী এবঙ সাহিত্যবিষয়েও লিখেছিলেন। তাঁর জীবনী বিষয় রচনার মধ্যে আছে ''রামমোহন রায়'' (১৮৮৬) নামক জীবনী পুস্তিকা, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪) নামের অসামান্য সুলিখিত জীবনী ভিত্তিক সমাজ-স্মৃতিচিত্রণ এবং 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র'। এটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মাঘোৎসব উপলক্ষে দেওয়া দুটি বক্তৃতার সারসংক্ষেপ।

এই তিনটি গ্রন্থটিতে সবচেয়ে মূল্যবান 'রামাতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। গ্রন্থটিতে আদর্শ ব্রাহ্ম রামতনু লাহিড়ীর জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সমকালের বাংলার সমাজ পরিবর্তনের জীবন্ত চিত্র সাহিত্য গুণান্বিত ভাষায় অঙ্কিত হয়েছে। ফলে তথ্যের আকার গ্রন্থ আর সাহিত্যরসসমৃদ্ধ রচনা—উভয় দিক দিয়েই এটি হয়ে উঠেছে মূল্যবান। আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ 'আত্মচরিত'—নসম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত এই গ্রন্থে ১৯০৮-এর ৫ জুন পর্যন্ত তার নিজের জীবনের ঘটনাসমূহ বিবৃত হয়েছে। এগ্রন্থের কিছু অংশ উদ্ধৃত হল ঃ— ''কেশববাবু ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াই .... নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। ..... আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি সুরাপান বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। সে-সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম।''

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় তাঁর 'আত্মচরিত' রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি, আত্মপরিচয়' বা ' ছেলেবেলা'র মতো আপন সত্তার ক্রমোন্মেষের বিশ্লেষণ মূলক রচনা নয়। তিনি নিজের কর্মময় জীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে নবজাগ্রত বাংলার স্বরূপ ও প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তারই সঙ্গে এই সমাজের অন্তর্বৈশিষ্ট্যও বিশ্লেষিত হয়েছে।

আবেগবহুলতা নেই তাঁর বর্ণনায়। ভাষা সরল, সংযত এবং শুর থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত স্নিগ্ধ কৌতুকের আভায় মধুর। ফলে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে আকর্ষক।

সাহিত্য-বিষয় নির্ভর প্রবন্ধ ঃ এরূপ প্রবন্ধ কমই লিখেছেন শিবনাথ। যেকটি লিখেছেন সেগুলিতে শিবনাথ স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছেন। সাহিত্যের লক্ষণ আর কবির বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি পূর্বাগত কোনো ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হননি। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতোই অপন প্রজ্ঞার আলোয় তিনি সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেই বোধির মধ্যে রয়েছে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা এবং পরিণত রস-বোধের পরিচয়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে 'ঋষিত্ব ও কবিত্ব', 'কাব্য ও কবিত্ব'—শিবনাধের মতে বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াই কবিত্বের মূল উৎস। এই তন্ময়তা সূত্রে কবিচিত্ত—''সৃষ্টির উপরে পড়িয়া তাহার অস্থি মজ্জাস্থিত সৌন্দর্য্যে গিয়া উপস্থিত হয়। (প্রবন্ধাবলি ১ম খণ্ড, ১৩, ১১, বঙ্গাব্দ পৃ. ১২৬) তাই বলা যায় বিষয়নিষ্ট এবং আত্মমগ্ন—প্রবন্ধের এই দুই ধারায় বিশিষ্ট লেখক হিসেবেই শিবনাথ শাস্ত্রী যেমন উল্লেখযোগ্য—তেমনই প্রয়োজনে দুই ধারার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনে সুদক্ষ শিবনাথ শাস্ত্রী উনিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ ধারায় স্মরণ যোগ্য একটি নাম।

একক ৬ কথাসাহিত্য

গঠন

৬.১ প্যারীচাঁদ মিত্র

৬.২ কালীপ্রসন্ন সিংহ

৬.৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

৬.৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬.৫ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬.৬ রমেশচন্দ্র দত্ত

৬.৭ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

৬.৮ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৬.৯ মীর মোশারফ হোসেন

৬.১০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৬.১১ স্বর্ণকুমারী দেবী

৬.১২ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

৬.১৩ প্রশ্নমালা

৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ প্যারীচাঁদ মিত্র

আমরা, সেই রামায়ণ মহাভারতের পর অতিকায় মহাকাব্য আর কোনো কবিকে লিখতে দেখিনি। কতো বড়ো কাহিনী, মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী, অসংখ্য চরিত্র, যুদ্ধ, দার্শনিক উপলব্ধি, ধর্মবোধ, মানবনীতি, এই সব ঐ দীর্ঘ আকারের মহাকাব্য দুটিতে রয়েছে।

পরবর্তীকালে, শতশত বছর ধরে ক্ষুদ্রাকার মহাকাব্য লেখ হয়ে চলেছে। বেশিরভাগেরই মূল কাহিনী ঐ দুই মহাগ্রন্থ থেকে নেওয়া। সংস্কৃতেও তাই, বার্গাতেও তাই। উনিশ শতকে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখলেন। লিখলেন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, আরো অনেকেই চেষ্টা করেছেন।

গদ্যভাষা এসে, সব কিছুই বদলে দিলো। ঊনিশ শতক থেকে বাংলা গদ্যের জয়যাত্রা শুরু হলো। এই গদ্যের প্রসার হতে লাগলো নানা লেখকের হাতে। প্রবন্ধ এলো, সংবাদপত্রে প্রতিবেদন এলো, নকশা জাতীয় লেখা এলো সেই সময়ের বাবুদের কীর্তি নিয়ে মজার নকশা। উপন্যাস এলো, যেখানে মহাকাব্যের মতন আকার, অনেক চরিত্র, ঘটনা, মনে বিশ্লেষণ, ইত্যাদি, একটু পরে, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার পূর্ণ চেহারাটা পেলাম আমরা। কিন্তু তার আগে যিনি উপন্যাস লেখার প্রতিশ্রুতি এনেছিলেন, তিনি নতুন বাংলা গদ্যের জনক, প্যারীচাঁদ মিত্র।

প্যারীচাঁদ মিত্রের একটি ছদ্মনাম রয়েছে— টেকচোঁদ ঠাকুর। যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম'। 'উপন্যাস' নামক রচনা রীতিটা এসেছে এদেশে ইংরেজদের রাজস্ব প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজীসাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর সংযোগের ফলে। একটা নতুন আঙ্গিক, য়া সবকটি ভাষা শিল্পের, কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, সব চাইতে বেশি জনপ্রিয়।

গদ্যে লিখিত কাহিনী ও চরিত্র থাকলেই, আকারে দীর্ঘ হলেই তা উপন্যাস হয় না। উপন্যাস হতে গের্ে দেখতে হবে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী, চরিত্র বা চিরত্রগণ, সমস্যাবলী, মনস্তত্বব্যাখ্যা, লেখকের জীবনদর্শন, এই সবের সংমিশ্রণে উপভোগ্য, সরস একটি রচনা হয়ে উঠতে হবে। আমাদের সাহিত্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যা কলিকাতা কমলালয়', নববাবু বিলাস ইত্যাদি স্কেচ জাতীয় উপভোগ্য গদ্য লিখেছেন, তিনি পূর্ণায়ত, আগে ও পরের সংযোগ আছে, এমন পূর্ণাংঙ্গ কাহিনী লেখেন নি। সে কাজ প্রথমে শুরু করেচিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, এবং বইটির নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'।

যদি কেউ প্রশ্ন করে বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস কোন্ টি? উত্তর সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় আলালের ঘরের দুলাল। অন্তত উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষ্মণ তাতে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সে মর্মে ঐপন্যাসিক, প্যারীচাঁদ, তা নন, তবে ভিতটা তিনিই গড়ে তুলেছিলেন। আগেই বলেছি একটি আরম্ভ থেকে পরিণতিমুই ককাহিনীটা, নানা চরিত্রের সমাবেশ, তাদের সম্পর্কের জটিলতা, মনস্তত্বের বৈচিত্র্য, সংঘাত, চরিত্রের বিকাশ, পরিণতি, লেখকের জীবনদর্শন- এই সবের সমন্বয়ে আধুনিক উপন্যাসের সৃষ্টি। প্যারীচাঁদের আলাল-এ তা এমন নেই। ডঃ ভূদেব চৌধুরী তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে চমৎকার প্রশ্ন তুলেছেনঃ উপন্যাসের পরিণতি মর্মে আধুনিক জীবন বোধের অ-খণ্ডতা অপরিহার্য বোধ করি। ... সেই অখণ্ড পরিনাম আলালের গল্পে আছে কী? মতিলাল ও রামলালের

দুটি বিপরীত স্বভাবাপন্ন চরিত্র কথাকে একেবারে শেষে একত্রবন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু, সেত অভিনয় শেষে চরিত্র কথাকে একেবারে শেষে এনে একত্রবন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সে ত অভিনয় শেষে রঙ্গমঞ্চে কুশীলবদের একসংগে দাঁড়িয়ে নমস্কার করার মত। আগাগোড়া বাবুরাম-মতিলাল-কাহিনী ও বরদাবাবু-রামলাল কথা পৃথক বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এদের প্রত্যেকের জীবন ঘটনার বর্ণনাতে অন্তর্বন্ধ সংযোগ নেই কোথাও, যেমন একই জীবনের কতকগুলি পৃথক পৃথক ঘটনার ছবি, নকসা।''

আধুনিক শিল্প, কথাশিল্পের মহৎরূপ উপন্যাস-এর বীজ রোপন করেছিলেন প্যারীচাঁদ, আলাল-এ। আঠেরো শতকের শেষভাগের এই কলকাতা শহরের এক শ্রেণীর মানুষের নানারকমের উচ্ছৃঙ্খল আচরন, জীবনধারনের বিভিন্ন অনাচার ইত্যাদি প্যারীচাঁদ কৌতুক বা মজার মাধ্যমে উপস্থিত করেছিলেন আলাল-এ। এর বেশি কিছু নয়, যদি এর বেশি কিছু থাকে, তবে তা এর ভাষায়। আলাল-এর ভাষা বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত গদ্যের দরজা খুলে দিয়েছিলো; এ বড়ো কম কথা নয়।

প্যারীচাঁদের জীবন বিচিত্র কর্মমুখর ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় তাঁর জন্ম। ব্যবসায়ী, ধনবান রামনারায়ণ মিত্র তাঁর পিতা। হিন্দুকলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ) কিছুকাল পড়াশুনো করেন। ডিরোজওর কাছে পড়াশুনোর সুযোগ হয়েছিলো হয়তো। ছাত্র হিসেবে প্যারীচাঁদ ছিলেন মেধাবী। ইংরেজী ভাষা সাহিত্য পড়াবার মতন স্কুল গড়েছিলেন নিজের বাড়িতে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী সাব-লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন প্যারীচাঁদ। ব্যবসা বাণিজ্যেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রেও কম অবদান রাখেন নি। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে মহিলাদের উপযোগী একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, নাম 'মাসিক পত্রিকা'। প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিলো ১৬ আগস্ট, ১৮৫৪ তে। চলেছিলো চার বছর। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর এখানেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

'মহিলাদের উপযোগী' করে গদ্য লেখার প্রয়াস, সরল, সাধুভাষা বর্জিত গদ্যের চর্চা শুরু করলেন তিনি বা তারা এই পত্রিকায়। আজকে, যে চলতি ভাষা আমরা বহুল ভাবে ব্যবহার করি, তার পথ প্রদর্শক প্যারী চাঁদ।

''সুখের রাত্রি দেখিতে'' যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে তখন রাত্রি অতিকায় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি বোহাইল কিন্তু কোহাইতে, পোহাইতেও পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা নানা ভাব নানা কৌশল নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রভাত না হইতে হইতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

এ ভাষা আজকের বাংলা গদ্যের মতই সহজ সরল। শুধু ক্রিয়াপদগুলি সাধু। সেই সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার তো আজও কেউ কেউ করে থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন অতি চমৎকারভাবে— ''বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হলে তা ক্ষণিকের। মহাকবিদের সমুন্নতভাব প্রকাশের জন্যে কখনো কখনো দুরূহ ভাষায় দরকার হয়। গদ্যে তার দরকার পড়ে না।

এক সময় বাংলা ভাষা দুটো স্বতন্ত্র ভাষা ছিলো। সাধু বা শিক্ষিত লোকের এক ভাষা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে ভট্টাচার্য অধ্যাপকেরা যে ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন তারা সংস্কৃত পণ্ডিতরা ছাড়া কেউ বুঝতেন না তাঁরা 'খয়ের' বলতেন না বলেতন 'খদির'। 'চিনিকে শর্করা', চুল'কে কেশ; কলা কে রম্ভা।

এই শব্দ ও ভাষা সাধারণে বুঝতো না। বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত এই ভাষাকে কিছুটা সংস্কার করলেন। বিদ্যাসাগর সুন্দর ভাষা গড়লেন। কিন্তু সকলে তা বুঝতো না। তবে লেখকেরা বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করতেন।

আর মৌলিক গল্প উপন্যাস তখন লেখা হতো না। হতো সংস্কৃত এবং ইংরেজী থেকে অনুবাদ। বিদ্যাসাগরও অনুবাদই করেছেন দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া।

'এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। 'যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথমে তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের সমস্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করলেন। এক ''আলালের ঘরের দুলাল'' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

আলাল-এর গল্প বা কাহিনী অংশটুকু বাস্তবতায় ভরা। কিন্তু লেখক নিরস নয়, সরলভাবে গল্প বর্ণনা করেছেন। একটি ধনীর দুলাল, নাম মতিলাল কিভাবে কুশিক্ষার জন্যে, সংগদোষে এবং অভিভাবকদের বিনা শাসনে বখে গিয়েছিল, কিভাবে তার কাছে সঙ্গীদলের সংস্পর্শে এসে নানাবিধ কুকর্ম করে এবং পরিশেষে অনেক দুঃকষ্ট পেয়ে আবার ফিরে আসে সহজ জীবনে গল্প অংশ এই টুকুই। কিন্তু লেখকের সরস বর্ণনায় মূল কাহিনী ও উপকাহিনী, মূল চরিত্র ও উপচরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ধড়িবাজ, গেঁজেল, মাতাল, চরিত্রগুলি যতটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সৎ চরিত্রগুলি তেমন হয়নি। কিন্তু বোঝা যায় লেখকের অভিজ্ঞতার পরিধি কত বাস্তবোচিত ও বিশাল ছিল। ভাষাও সহজ স্বাভাবিক বলে সমস্ত রচনাটি কৌতুকে উজ্জ্বল্য পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে আলালের ঘরের দুলাল ঔপন্যাসের বীজ বপন করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র সঠিক বলেছিলেন যে প্যারিচাঁদের আগে এমন সুমধুর বাংলা গদ্য কেউ লিখতে পারেননি। তখন বাংলা গদ্য ছিল সাধু বা তৎসম শব্দে ভারাক্রান্ত তিনি অর্থাৎ প্যারিচাঁদ কৃত্রিম সাধু ভাষার বিরুধ্বে প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

আলালের পরে প্রকাশিত জল ''মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'' (১৮৫৯)। মদ খাবার শেষ কিংবা রক্ষণশীল সমাজে জাত মারা উপায় এখানে দেখানো হয়েছে। প্যারিচাঁদের স্বভাব মত কৌতুক করার ক্ষমতা এই গল্পেও রয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর ঘটনার সংযোগ নেই।

এর পর লিখলেন ''রামারঞ্জিকা'' (১৮৬০)। ''স্ত্রী পদ্মাবতীকে সুগৃহীনী, সুশিক্ষিতা ও সুমাতা করার জন্য

স্বামী হরিহর পৃথিবী বিখ্যাত নারী চরিত্রের আখ্যান বর্ণনা করেছেন'' কাহিনীর মধ্যে অনেক আদর্শের কথা আছে, কিন্তু জীবন সঞ্চারিত হয়নি।

এছাড়া ''অভেদী'' নামক একটি আধ্যাত্মিক উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি উপন্যাসের নায়ক এবং নায়িকা নিজ নিজ আত্ম বিষয়ের জ্ঞান অন্বেষণ করেছে এবং নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে তারা জীবনে ইষ্ট লাভ করেছে।

আর একটি উপন্যাস ''যৎকিঞ্চিৎ'' (১৮৬৫) এখানে দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে নানা ধরণের লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। যারা এসেছিলেন তারাই এই, দুজনের আধ্যাত্মিক ভাবের সংস্পর্শে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হলেন।

৬.২ কালীপ্রসন্ন সিংহ

আজ এই একুশ শতকের শুরুতে পৌঁছে যে সমৃদ্ধ বাংলা গদ্য আমরা হামেশাই ব্যবহার করছি, এসময়ে বসে ভাবাও কঠিন, কিরকম বাংলা সাধুগদ্য ছিলো আমাদের। যে ভাষায় পথে ঘাটে, বাড়িতে, মাঠে ময়দানে আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কথা বলি, সেই ভাষা, সেই চলতি গদ্য তখন সবে মাত্র প্যারীচাঁদ মিত্রের হাতে একটা রূপ নিচ্ছিলো।

''কয়েকদিন হইল মদ কেমন ভবানীবাবু চক্ষে দেখেন নাই—মাতাল বাবুদেরও আশা যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আপনি বিছানায় পড়ে-উঠিবার তাকৎ নাই—পরিবারের কেহ না কেহ ধরিয়া উঠাচ্ছে—বসাচ্ছে—খাওয়াচ্ছে—শোয়াচ্ছে। তিনি যাহাতে সোয়াস্তি পান, যাহাতে ভাল থাকেন, প্রাণপণে তাহাই করছে।' [প্যারিচাঁদ মিত্র /মদ খাওয়া বড় দায় জাত—থাকার কি উপায়।]

প্যারীচাঁদ চলতি ভাষার স্বাচ্ছন্দ এনেছেন, তবুও ক্রিয়াপদগুলো সাধু' 'হইয়াছে' 'উঠিবার' ইত্যাদি সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেন নি।

এলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় ছেলেবেলার চমৎকার বর্ণনা দিলেন এভাবে

> 'ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গালা ভাষার উপর
> বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা
> ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে আমাদের বুড়ো
> ঠাকুমার ঘুমবার পূর্ব্বে নানা প্রকার উপকথা কইতেন।
> কবিকঙ্কন, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের পরার মুখস্থ।
> আওড়াতেন।'

আজ আমরা যে বাংলায় কথা বলি, সংবাদপত্রের খবর লিখি, এতো সেই আজকের বাংলা। অছত, মুখের ভাষার এমন প্রাণশক্তিকে হুতোমের সময়ে এবং পরেও তেমন ব্যবহার করা হয়নি। একধরণের শুদ্ধ বাংলা, পুঁথির গদ্য নিয়ে আজ আমরা মেতে আছি। বাংলা গদ্যের এই চলতিরূপ নিয়ে ডঃ ভূদেব চৌধুরী সঠিক মন্তব্য করেছেন—

বস্তুতঃ প্যারীচাঁদের চিন্তা ও চেষ্টা নূতনত্বের ভাবরূপে পূর্ণতা লাভ করেছে কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে। যে

হুতোম ছিলেন ব্যঙ্গ আর রঙ্গে সবসময় পটু। প্যারীচাঁদ বা টেকচাঁদ গুরুগম্ভীর ভাবে আদর্শবাদের কথা লেখেন, সেখানে তিনি ধীর চালের আবার ব্যঙ্গাচপল যেখানে, সেখানে লঘু চালের। তাতে মাঝে মাঝে ছন্দ পতন ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু হুতোমের চাল আগাগোড়াই লঘু, কিন্তু উদ্দেশ্য কোথাও তরল-চপল নয়' হুতোমের বলার ভঙ্গীটাই আলাদা। যেনো সেকালের জমিদারেরা কাছাড়িতে আড্ডায় বলেছেন ঢিলেঢালা ফরাস পেতে, চলছে হালকা চালে গপ্পপপ্প। গতি থামছে না চলেছে ধীর লয়ে অথচ বিষয়বস্তু একেবারেই হালকা নয়।

কালীপ্রসন্নের শ্রেষ্ঠ রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা।'—বাংলা গদ্যের আসাধারণ গতিশীল রচনাও নিদর্শন। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় সেই ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এমন গদ্য তিনি লিখলেন কি করে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কালীপ্রসন্ন মাত্র ৩০ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে, আজ থেকে দেড়শো বছরেরও আগে তিনি কলকাতায় এক ধনী পরিবারে জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের দু'বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন, আর পরলোক গমন করেন সেই সময় যখন বঙ্কিম পদ্যরচনার চেষ্টা ছেড়ে সবে মাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' লেখা শেষ করেছেন।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ধনী পরিবারে তঁর জন্ম। পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ) শিক্ষা লাভ করেন, ইংরেজী শেখেন একজন সাহেবের কাছে। তাছাড়া শিখেছিলেন সংস্কৃত ও বাংলা উপযুক্ত পন্ডিতের কাছে।

ভিত গড়ে নিয়েছিলেন ছাত্রবস্থাতেই। অল্প বয়সেই করলেন সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ। তেরো বছর বয়সেই প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা। এথ সভাকে কেন্দ্র করে তার নানা কীর্তি গড়ে উঠেছিল। এখান থেকেই সেকালের খ্যাত নামা লেখকদের সম্বর্ধনা দেবার প্রজলন হয়। এবং বাংলার আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ১২ ফ্রেবুয়ারী ১৮৬১ তারিখে সম্বর্ধনা দান করা হয়। মাইকেল মধুসূদন সম্বর্ধনার মানপত্রের উত্তরে বাংলায় একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার অনুলিপির সূচনা এরকম

''বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্যন্ত বাধিত হইলাম, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।''

মধুসূদনের পর বৎসর কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে পাদ্রী লঙ সাহেবকেও সম্বর্ধিত করেছিলেন। দীনবন্দু মিত্রের নীলদর্পন নাটকটি ইংরেজী ভাষায় প্রচারের অভিযোগে নীলকর সাহেবেরা পাদ্রী লঙের বিরুধে মামলা করলে বিচারপতি লঙের একমাস কারা বাস ও ১ হাজার টাকা অর্থ দন্ডের আদেশ দিলেন মহাত্মা কালীপ্রসন্নই এগিয়ে এসে আদালতে সেই অর্থ দন্ডের হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন। তাছাড়া নানা সমাজ সংস্কারের কাজের সঙ্গে এই সভার যোগ ছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলন সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি ঐ সভার পক্ষ্য থেকে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান। এছাড়া তৈরি করেন বিদ্যোৎ সাহিনী রঙ্গমঞ্চ। প্রকাশ করেন বিদ্যোৎ সাহিনী পত্রিকা, যা ছিল ঐ সভার মুখপত্র একটি মাসিক পত্রিকা। তাছাড়া সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা, বিবিধ ধর্ম্মে সংগ্রহ নামক মাসিক পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। মাত্র ৩০ বছর বয়সের সময় সীমায় তার অসাধারণ কাজের সমান দৃষ্টান্ত বাংলায় তার তেমন নেই।

তাঁর রচনাবলী

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক (১৮৫৭)—মূল সংস্কৃত থেকে মহাকবি কালীদাস রচিত এই নাটকটি কালীপ্রসন্ন অনুবাদ করেন।

সাবিত্রী সত্যবান নাটক—এটি তার অনুবাদ নয়, নিজের লেখা। এর মূল কাহিনী নিয়েছিলেন মহাভারত থেকে।

মালতি মাধব নাটক—মহাকবি ভবভূতির মূল নাটক সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তার আসল রচনা—

হুতুম প্যাঁচার নকসা। ১৮৬১ খ্রীঃ প্রথম খণ্ড ছাপা হয়। এর ভূমিকায় একটি বিজ্ঞাপন ছিল এরকম—

''হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নক্‌শা প্রস্তুত করিবেন, এতে কী উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছুদিন পরে বুজতে পারবেন, হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয়তো সে সময়ে হতভাগ্য হুতোমকে দিনের ব্যালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফরমাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোট ও বাঁশ দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে মেরে ফেলবে। সুতরাং কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পারে না।

১৮৬২ খ্রী. শেষে নক্‌শার প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষার চলতি রীতিকে প্রতিদিনের জীবনে আনতে চেয়েছিলেন প্যাঁরিচাদ। কিন্তু তিনি তাতে সক্ষম হননি। হুতোম চলতি রূপের বিশুদ্ধ রীতি ধরতে চেষ্টা করেছেন। শুধু ব্যকরণের দিক থেকেই নয়, বলার ভঙ্গির দিক থেকেও এমনকি চলতি শব্দের উচ্চারণের ভঙ্গিটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন উপরের আলোচনার 'বেলা' কথাটিকে তিনি লিখেছেন 'ব্যালা' যেমন আমরা উচ্চারণ করে থাকি, কিংবা 'বুঝত' না লিখে লিখেছেন 'বুজ্‌বে'। আজও পর্যন্ত আমরা হুতোমের মতন উচ্চারণ অনুযায়ী বানান ব্যবহারে সাহসী হতে পারিনি। এবং ধারাটিকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। যদি পারা যেত তবে বাংলা গদ্যে প্রাণ শক্তি ও সর্ব সাধারণের কাছে পৌঁছে যাওয়া অনেক সহজ হত।

হুতোমের গদ্য সেকালেই তেমন সমর্থন পায়নি। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দা করেছিলেন—লিখলের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান ও সঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনো সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র; ইহার তত শব্দ ধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাধন নাই, হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতা শূন্য। হুতোম ভাষায় কখনো গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উঠিত নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিচার মেনে নেওয়া যায় না কারণ হুতোমি ভাষায় উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি সৃষ্টিধর্মী কাজ হতে পারে কিনা, তার প্রমাণই হয়নি এখনো। শ্লীল, অশ্লীল পবিত্রতাশূণ্য ইত্যাদি মন্তব্যের সারবত্তা নেই। কালী প্রসঙ্গে জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ, হুতোমের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ইহা কেবল নকসা বলিয়াই তৎকালে আদৃত হয় নাই, অনেক ভণ্ড সমাজদ্রোহীর পৃষ্ঠে ঢহা যে তীব্র কশাঘাত পূর্বক' তাঁহাদিগকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিয়া সমাজ সংস্কার সাধন করিয়াছিল। তজ্জন্যও ইহা কম প্রশংসা লাভ করে নাই।''

তখন অনেক সমাজদ্রোহী ব্যক্তিগত জীবনে ভণ্ডপ্রকৃতির ছিলেন, তারা আবার সমাজের মাথায় চড়ে বসেছিলেন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' নিবন্ধটিতে এই শ্রেণীর মানুষের নানা পরিচয় পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র জন্মেজয়, বৈশম্পায়নের মুখ দিয়ে এদের চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। সরাসরি করেন নি। হুতোম কিন্তু সরাসরি করেছেন। হুতোমের নকশায় সেই ভণ্ড সমাজদ্রোহী ও সমাজপত্তিরা নিজেদের মুখ দেখতে পেরেছিলেন। তারা প্রভাবশালী ছিলেন। তাদের চটিয়ে ছিলেন হুতোম।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন হুতোমের লেখায় ঈর্ষা বিদ্বেষ রয়েছে। হুতোম বঙ্কিমের অভিযোগ তীব্র ভাষায় অস্বীকার করেছেন। হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম ততদূর নীচ নন যে দাদ্‌ তোলা কি

গাল দেবার জন্য কলম ধরেন, জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে, হুতোমের নক্সা প্রসব করেছে, সেই কলমে ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষ বিধায়ক মুমুর্ষু, সংসারি, বিরাগী ও রাজার অনন্য অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক

তাঁর এই দাবী সম্পূর্ণ সঠিক। পণ্ডিতদের সহায়তায় কালীপ্রসন্ন ব্যাসদেবের মহাভারত অনুবাদ করলেন, যা ছিলেন কঠিনতম কাজ। গদ্য, স্বচ্ছন্দ, সরল। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিলো জাতির পক্ষে কল্যাণকর। ডঃ ভূদেব চৌধুরী হুতোমের ভাষার প্রকৃত গুণ ও শক্তির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন ''হুতোমী ভাষায় যেমন কুটচালের চলিত ভাষা রচিত হয়েছে, তেমনি গুরু গম্ভীর ছন্দে প্রবাহিত হয়েছে মহাভারতের গদ্যভাষা, তাঁর আদর্শ ছিল, মনে হয়, বিদ্যাসাগরীয় প্রাজ্জলতা।

লঘু চালের চলিত ভাষা ব্যবহার করলেন কেন? কারণ, ''সমাজের অন্ধকার কক্ষে আলোকপাত করাই ছিল কালীপ্রসন্নের উদ্দেশ্য। ধনী পরিবারের কদাচারও তাঁর লেখনীর আক্রমন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। গাজন, রথযাত্রা, দুর্গাপূজা, পাঁচ ইয়ারের হৈচৈ, পূজাপাঠকের নিয়মরুচিকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন।' [অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।]

নানা বিষয় হুতোমের রঙবব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। সমসময়ের বাংলার সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর চরিত্র, জীবনাচরণ তাঁর ব্যঙ্গের বিষয়। ''জোড়াসাঁকো সিংহীবাগান, বাহির সিমলা, পাথুরিয়াঘাটা, হোগলা, কুড়িয়া ডিহি, শ্রীরামপুর, দর্জিপাড়া, কাঁসারিপাড়া, কম্মুলিটোলা, চাষা, ধোপাপাড়া, চোরামাগান, ঝামাপুকুর, বেনিয়াপুকুরের অলিগলি হুতোমের দণ্ডরুচিকৌমুদীর ছটায় ঝিকমিক করত;'' (ঐ)

এই সব বিষয়, রঙ্গে ব্যঙ্গে বর্ণনার ভাষা যাঁর, তরতাজা, ঝকমকে কলকাতার ভাষা, যা পরবর্তী কালে বাংলা চলতি গদ্যের আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে, তাঁরই হাতে মহাভারত অনুবাদের গম্বীর অথচ জীবন্ত গদ্য চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। তিনি শ্রীমদ্ভবদগীতাও অনুবাদ করছিলেন, কিন্তু াকালে তাঁর, মৃত্যু হয়। বইএর আকারে তখন প্রকাশ হয় নি।

অসামান্য কর্মশক্তির অধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ দুটি কারণে আজও আমাদের পর শ্রদ্ধার স্থানে অমস্থান করছেন। একটি হলো, তাঁর হুতোম প্যাচার নকসা, অন্যটি মহাভারতের অনুবাদ। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন তিনি, পত্র পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন; সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে, তাঁর দেশপ্রীতিও ছিলো অসামান্য। বিচারকের পদও অলংকৃত করেছেন। এতো অল্প সময়ের মধ্য এমন অসংখ্য কাজ ও অবদানের তুলনা পাওয়া যায় না।

৬.৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে। আর সকলেই জানি যে, ওই উদ্ভবের যুগেই পরিণত রচনা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আবার এও জানা যে, প্রকৃত উপন্যাস নয়, তবে নক্সা জাতীয় এক ধরণের রঙ্গব্যঙ্গের লেখা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে প্যারিচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালকে প্রথম উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলা হয়েছে। আবার ড. ভূদেব চৌধুরী তার

বাংলা সাহিত্য ইতিকথা গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতেই প্রথম উপন্যাসের কাজ রপ্ত হয়েছিল এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উপন্যাস বলতে কি বোঝায় স্বল্প কথায় তার আলোচনা প্রয়োজন।

ইংরেজী Novel কথাটির মূলে রয়েছে Latin শব্দ Novella নভেলা অর্থাৎ একটি নতুন জিনিস। সেযুগের ইতালীর লেখক বোকার্চিও, ডেকামেরণ নতুন গল্প Novella স্টোরি নামে অভিহিত হত। বাংলায় উপন্যাস বলতে এই Novel-এর চরিত্রই মনে করায়।

মানুষের গল্প শোনার আকাঙ্খা চিরদিন ছিল ও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মানুষ গল্প পোষ্য জীব। বিখ্যাত সমালোচক ই. এম. ফস্টার তাঁর Aspects of Novel বইতে উপন্যাসের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হল The, Fundamental aspect of the Novel is its story telling aspect.

একটি সুনির্দিষ্ঠ শুরু, বিস্তার এবং সমাপ্তি আছে এমন কাহিনী থাকবে উপন্যাসে। থাকবে চরিত্র, সংলাপ, লেখকের বাস্তব জ্ঞান, থাকবে মনোস্তাত্বিক বিশ্লেষণ, উপকাহিনী এবং লেখকের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন। আয়তন সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ঠ কিছু বলা হয়নি। প্রথম থেকেই উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র রয়েছে যেমন—ঐতিহাসিক সামাজিক, আঞ্চলিক, রাজনৈতিক, মনোস্তাত্বিক, আত্মজীবনী মূলক ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম ১৯ শতকে।

আমরা হিন্দু কলেজে একই শ্রেণীতে পাঠরত মহাকবি মধুসূদন এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা জানি এবং বিশেষ করে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে আমরা মূলত জানি প্রাবন্ধিক হিসেবে। ১৮২৯ খ্রীঃ এক নিষ্ঠাবান। ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ যেমন ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত তেমনি অনেক প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা ও টীকা রচনা করেছিলেন। ওই মানুষটির মধ্যে ছিল উদার ভাবনার এক জগৎ। ভূদেবের মধ্যেও তাঁর পিতার ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং উদারতার যোগ ঘটেছিল তিনি ছিলেন আদর্শবাদী একজন মানুষ এবং ভারতবর্ষের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাবান। ব্যক্তিও বটে।

আমরা জানি যে, হিন্দু কলেজকে ঘিরে ১৯ শতকের প্রথম ভাগে শিক্ষাগত উৎসাহ এবং গোড়ামির বিরুধে যুধের একটি পরিবেশ তৈরী করেছিলেন ডিরোজিও। কলেজের তরুণ অধ্যাপক, ভূদেব প্রথমে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করে ভর্ত্তি হয়েছিলেন সেই হিন্দু কলেজে। আর তার সহপাঠী ছিলেন মধুসূদন।

খুব মেধাবী ছাত্র এবং উন্নত রুচির এক আদর্শবাদী মানুষ ভারতের প্রাচীন হিন্দু আদর্শকে অবলম্বন করে লিখেচিলেন পারিবারিক প্রবন্ধ। সমাজ সংসারের নানা প্রচলিত নিয়মকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন, লিখেছিলেন সামাজিক প্রবন্ধ এবং আচার প্রবন্ধ। তিনি লিখেছিলেন ভারতবর্ষের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাসের কথা তার ছিল খুব দৃঢ়, গভীর দৃষ্টি কোণ এবং কল্পনা সমৃধ মন।

সেই মনই উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিলো ভূদেব কে। লিখলেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস। ডঃ ভূদেব চৌধুরী স্পষ্টতই এই রচনাদ্বয়কে উপন্যাস শিল্প' বলেছেন এবং বলেছেন প্যারীচাঁদ নয়, ''ভূদেবই প্রথম 'যথার্থ-নামা ঔপন্যাসিক।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস। তিনি ইতিহাস ও গালগল্প মেলানো ' রোমান্স অব হিস্ট্রি—'ইন্ডিয়া', বইটির কিছু কিছু গল্প কাহিনী অবলম্বনে ঐতিহাসিক উপন্যাসটি লিখেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রী. 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। তাঁর ছিল ইতিহাসের প্রতি বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি গভীর ভালবাসা। হিন্দুর ঐতিহ্যের দিকে তার বেশী আকর্ষণ

থাকলেও ইসলাম ধর্মের প্রতিও তার শ্রদ্ধা ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ভারতবর্ষ বিদেশী অধিকৃত হয়। যদিও তার আগে থেকেই দীর্ঘকাল মুসলমান শাসন এদেশে ছিল। আর গড়ে উঠেছিল ১ হাজার বছর ধরে হিন্দু মুসলমানের ভারত। ৩টি পানিপথের যুদ্ধ সেই সময়ে ঘটেছিল। প্রথম যুদ্ধে পাঠানরা মুঘলদের হাতে পরাজিত হয়, সূচনা জয় মুঘল যুগের। ২য় পানিপথের যুদ্ধে আকবর জয়ী হন। আর ১৭৬১ খ্রী. মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও এবং আফ্‌গান আহম্মদ শা আবদালী পরাজিত হন, এবং মুঘল সম্রাট দিল্লীশ্বর শাহ আলমের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে আর এই সুযোগ ইংরেজরা ভারতের শাসন দণ্ডটি কেড়ে নেয় যদি মারাঠারা না হেরে যেত, তাহলে ভবিষ্যৎ ভারত কেমন হত, সমাজের কি বদল হত, ইতিহাসকি রূপ নিতো, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তঁর কল্পনা শক্তির দ্বারা তার একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। এই সুন্দর ছবি 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থটি। এখানে মনীষী ভূদেব নয়, ইতিহাসের বিষয় ছাড়িয়ে একটি কল্পনাত্মক 'উপন্যাসের জন্ম দিলেন তিনি, সেখানে তিনি কল্পনা করলেন যে, মারাঠারা বিজয়ী হয়েছে। বিদেশীরা পরাজিত হয়ে ভারত ছেড়েছে, আর হিন্দু মুসলমান মুঘল ও মারাঠারা মিলে গড়ে তুলেছে এক স্বপ্নের ভারত।

"আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকার অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজ সেই বিবাদনল নির্ব্বপিত হইবে। আজ ভারতভূমির মাতৃ-ভক্তি-নারায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।'

উপরের উদ্ধৃতিটিতে লেখকের উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

কেউ কেউ বলেছেন যে, বঙ্কিবচন্দ্রের আগেই ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সূত্রপাত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ঠপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত। কিন্তু উপন্যাস হিসেবে 'দুর্গেশনন্দিনী' যেমন সার্থক, ভূদেবের উপন্যাস তেমন সার্থক হতে পারেনি। কেননা, ইতিহাসের মূল ভিত্তি ছাড়িয়ে ভূদেব তার আদর্শ বোধ থেকে উদ্দাম কল্পনা নিয়ে চরিত্র কাহিনী রচনা করেছেন, ইতিহাসের তথ্য রক্ষা করতে পারেননি। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাস্তব ও কল্পনা, ইতিহাস ও লোককাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য যে 'ইতিহাস রসের সৃষ্টি তার উপরে জোর দিয়েছেন।

ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইটিতে তাঁর উপন্যাস রচনার ক্ষমতা, কল্পনা শক্তি এবং সহজ সরল ভাষার পরিচয় রেখেছেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারেন নি।

ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থের ২টি কাহিনী আছে।

(১) সফল স্বপ্ন

(২) অঙ্গুরীয় বিনিময়।

লেখক নিজেই বলেছেন যে, তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য হল গল্প বলার ছলে কিছু কিছু সত্য ঘটনার বিবরণ এবং হিতোপদেশ দান। বইটি বেরোয় ১৮৫৭ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ২টি আলাদা গল্প গ্রন্থটিতে রয়েছে। কিন্তু কারোর সঙ্গে কারোর সম্বন্ধ তেমন নেই। কন্টারের Romance of History India থেকে ২টি গল্প নেওয়া যয়েছে। সফল স্বপ্ন একটি ছোট আকারের রূপকথা জাতীয় কাহিনী। একজন দরিদ্র পথিক কাজের খোঁজে বেরিয়ে পথে কিভাবে দুঃখ কন্ট ভোগ করে এবং একটি শিশু হরিণকে খেতে উদ্যত হয়। কিন্তু হরিণ শিশুটির

মায়ের করুণ চোখের দিকে চেয়ে সে না খেয়ে ছেড়ে দেয়। আর সেই দৃশ্য দেখে ভাগ্য দেবতা সদয় হয়ে পথিকের স্বপ্নে দেখা দেন এবং বলেন যে, এই অসহায় জীবকে দয়া করার জন্য সে গজনী নগরে একদিন রাজা হবে। এই স্বপ্ন এই দুঃস্থ পথিকের জীবনের পথ কিভাবে ঘুরিয়ে দেয় এবং তার স্বপ্ন সফল হয় তারই কথা অল্প কথায় এখানে বলা হয়েছে।

২য় কাহিনীটি হল অঙ্গুরীয় বিনিময়। এই লেখাটি একটু দীর্ঘ। কন্টারের বই থেকেই মূল গল্প নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভূদেব গল্পটিকে নিজের কল্পনার দ্বারা একটি বিশেষ পরিণতি দান করেছেন।

গল্পটি হল, ''ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশেনারা ছত্রপতি শিবাজীর হাতে বন্দী হন এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু নানা কারণে তাদের মিলন হতে পারেনি। এই টুকুই 'এর কাহিনী'। কিছুটা কন্টারের বই থেকে এবং অনেকটা নিজের কল্পনা দিয়ে ভূদেব এই নভেল লিখেছেন। গল্পের অনেকটাই কল্পনায় মিশ্রিত হলেও ইতিহাসের উপাদানও এতে রয়েছে যেমন মারাঠা শক্তি তাদের শাসন ব্যবস্থা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রজাপালন পদ্ধতি ইত্যাদি ইতিহাস ভিত্তিক। শিবাজীকেও ভূদেব এক স্বাধীন দেশনেতা রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস তা সমর্থন করে। শিবাজী ছিলেন যোদ্ধা এবং এর চরিত্রে মহত্বের অভাব ছিল না। তিনি ছিলেন কূট কৌশলী। কিন্তু নারীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অসীম। এইসব গুনাবতীর টানে রোশেনারা তার দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নানা ঘটনার সন্নিবেশ করে শিবাজী রোশেনারা খণ্ড নাটকটিকে লেখক ট্রাজেডিতে পরিণত করেন।

ভূদেবে মধ্যে পূর্বেই বলেছি কোনো ধর্মীয় কুসংস্কার ছিল না। হিন্দু শিবাজী এবং মুঘল রাজকুমারীর প্রেম কাহিনী বর্ণনায় তিনি কোনো সংস্কারের বশ হননি। ধর্মীয় সংস্কারের উর্ধ্বে মানবতার দাবী অনেক বড়ো, জানতেন তিনি তাঁর সময়ের অনেক লেখকের চাইতে বেশি। রোশেনারা এবং শিবাজীর অঙ্গুরীয় বিনিময়-এ ধর্মীয় সংস্কারের দ্বারা ছোটো করে দেখান নি ভূদেব। বাস্তবে দুজনের প্রেমের সাফল্য না এলেও পরবর্তী জন্মে তারা স্বামী স্ত্রী হিসেবে মিলিত হবেন, এমন এক সুন্দর কল্পনা তিনি সাহসের সঙ্গে মেলে ধরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাঙলা রোমমান্সধর্মী উপন্যাসের জন্ম, হবে ভূদেবে তাঁর ইংগিত রয়েছে, যদিও কাহিনী তার নিজস্ব নয় তা আগেই বলা হয়েছে। আসলে ঔপন্যাসিকের সার্বিক প্রতিভা ভূদেবের ছিলো না, তাঁর হাতে বীজ উপ্ত হয়েছে মাত্র।

'তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এ গদ্যের দৃষ্টান্ত ঃ-

''একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণ বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে পথিক অধ্বভ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষনার্থে রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্তী নির্ঝর তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়াছে।''

৬.৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্পনাশক্তি ঐতিহাসিক চেতনা, সমকাল সচেতনা, নির্মাণ দক্ষতা, আদর্শবোধ, তীক্ষ্ণ তীব্র দেখার ক্ষমতা, এই সব কিছুর সমন্বয় ঘটেছিলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টির মধ্যে; বলা যায় মহাশক্তিধর এই লেখকের মধ্যে।

'উপন্যাস' নামক কথা সাহিত্যের বিশেষ আঙ্গিকটির সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় তখনো ঘটে ওঠেনি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীর বিনিময় বা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' কিছু কিছু প্রতিশ্রুতির আভাস দিয়েছে মাত্র, পূর্ণাঙ্গ রূপ নিলো বঙ্কিমের হাতে এবং তারপর থেকে সেই ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে আজ, এই একশ শতকের সূচনায় পৌঁছে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্যাদায় অসীন রয়েছেন। একটু যদিও শক্তিধর ঔপন্যাসিকের অভাব হয়নি উনিশ ও বিশ শতকের বাংলায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি প্রতিভার দুটো দিক, রয়েছে। একদিকে তিনি আদর্শবাদী, ইতিহাসবিদ, যুক্তিমার্গিক প্রবন্ধের নিবন্ধের স্রষ্টা; অর্থাৎ জ্ঞানচর্চায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ, অন্যদিকে সৃজনমূলক রস সাহিত্যের স্রষ্টা সেখানেও তিনি পথপ্রদর্শক। দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় নতুন করে বলার নয়।

ঔপন্যাসিক; প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি কর্মের শুরু ইংরেজী রচনা দিয়ে Rajmohan's wife কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, ইংরেজী নয়, বাংলা ভাষাই তাঁর প্রকৃত সৃষ্টির মাধ্যম।

১৮৫৭-তে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীর বিনিময়' বেরুল ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে কাহিনী গড়ে তোলার একটা পথ খুলে গেলো। বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারা যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, 'দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে স্কটের 'আইভ্যানহো'র সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা থাক বা না থাক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময়ের স্পষ্ট প্রভাব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের শাহজাদী রোশেনার দুর্গেশনন্দিনীর নবাবজাদী আয়েষার পূর্বরূপ, শিবাজী জগৎ সিংহের, রামদাস স্বামী অভিরামস্বামীর। দুর্গেশ নন্দিনীর ঘটনা বাঙ্গালা দেশে ঘটিয়াছে, সজন্য তিলোত্তমাকে পাইয়াছি।

ইংরেজী ভাষার ও সাহিত্যের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরজী উপন্যাসের শৈল্পিক দিকটা অথবা কিভাবে উপন্যাস শিল্পটি গড়ে নিতে হয়, তা জানতেন। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সময়ে উদ্ভূত এই রচনা শৈলী জন্ম মাত্রই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আমাদের সাহিত্যেও ইংরেজী সাহিত্যের হাত ধরে উপন্যাস শিল্পটি প্রবেশ করল আর তার প্রথম সার্থক শিল্পী হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আবির্ভাবের আগে থেকেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির হাতে বাংলা গদ্য গড়ে উঠছিল। এমনকি প্রতিদিনের জীবনের ঘটনা বলার মত একটি ভাষাও প্যারিচাঁদ এবং হুতোমের হাত ধরে। কিন্তু একালের গদ্য মহাকাব্য রূপ উপন্যাস শিল্পের ভাষা কেমন হবে তার কোনো নিদর্শন ছিল না। অভিজ্ঞতা নির্মাণ করে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর জীবনকে যেমন মননশীল প্রবন্ধ রচনার দ্বারা একটি সুস্থ দৃঢ় মাটিতে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, তেমনি কথা সাহিত্য সৃষ্টি করে চেয়েছেন আদর্শ বোধ ও রসবোধের উচ্চতম নিদর্শন বাঙালীর কাছে তুলে ধরা। মন ও মননের অনুভব ও চিন্তার যুক্তি ও কল্পনার সংমিশ্রণ ছাড়া কোন সার্থক সৃষ্টি হল না।

১৮৭২ সালে তিনি প্রকাশ করলেন 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা। শুধু নিজে নানা মুখীন সৃষ্টির দ্বারা নয়, তরুণ লেখকদের তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন আদর্শতাকে দীক্ষিত করতে, নানা সৃষ্টি কর্মে উৎসাহিত করতে আর

নিজে ১৮৬৫-১৮৮৭ খ্রী. মধ্যে লিখেছিলেন ১৪ খানি উপন্যাস, তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী এবং শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' এ তার জীবনের শেষ ২২টি বছরের রচনা। তারপর যতদিন বেঁচে ছিলেন আর উপন্যাস লেখার উৎসাহ অনুভব করেননি।

তাঁর উপন্যাস গুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া যায়

(i) ইতিহাস আশ্রিত রোমান্স
(ii) ঐতিহাসিক
(iii) তত্ত্বমূলক
(iv) সামাজিক
(v) মনোস্তাত্বিক।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল—

দুর্গেশনন্দিনী, কপাল কুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর ও সীতারাম, 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। তত্ত্বমূলক হল—

দুর্গেশনন্দিনী, কপাল কুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর ও সীতারাম, 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। তত্ত্বমূলক হল— 'আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরানী, আর 'সামাজিক ও পারিবারিক হল—' বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল, মনস্তাত্বিক হল 'রজনী'

(i) দুর্গেশ নন্দিনী (১৮৬৫)
(ii) কপাল কুণ্ডলা (১৮৬৬)
(iii) মৃণালিনী (১৮৬৯)
(iv) বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)
(v) ইন্দিরা (১৮৭৩)
(vi) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)
(vii) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)
(viii) রজনী (১৮৭৭)
(ix) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)
(x) রাজসিংহ (১৮৮২)
(xi) আনন্দমঠ (১৮৮৪)
(xii) দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪)
(xiii) রাধারানী (১৮৮৬)
(xiv) সীতারাম (১৮৮৭)

ড. সুকুমার সেন বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসকেই রোমান্স শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী থেকেই নেওয়া হোক কিংবা ভদ্র বাঙালীর সংসার থেকেই নেওয়া হোক নারী পুরুষের প্রণয়, তাকে ঘিরে নানা দ্বন্দ্ব, উপনাসের মূল বিষয়। তা ইতিহাসের হোক বা পারিবারিক হোক। এই প্রসঙ্গেই উপন্যাসের চরিত্র, লক্ষণ রোমান্সের সঙ্গে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে দু একটি কথা বলা দরকার।

উপন্যাস হল গদ্যে বর্ণনা মূলক কাহিনী। তাতে বিশেষ স্থান, কাল ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটে। ঘটতে থাকে

নানা ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাত এবং কাহিনী প্রয়োজন মত বিস্তৃত লাভ করে। এই বিস্তৃত কাহিনীকেই বলা হয় প্লট। পাঠকের মন আকৃষ্ট হয় এই কাহিনীর বিস্তৃত ঘটনার উপস্থাপনায়, চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও বিকাশের মাধ্যমে, গল্প রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কোথাও চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে, কোথাও বা কোনো স্থান কালের বিশেষ সমস্যা প্রাধান্য পায়।

বঙ্কিমের উপন্যাসে রোমান্সের ধর্ম একটি প্রধান ধর্ম 'ল্যাটিন' শব্দ 'রোমান্স' কথাটির মূল অর্থ ভাষায় লেখা কোনো কাজ। কিন্তু আমরা 'রোমান্স' বলতে আরো একটু অন্যরকম বুঝি। যা বাস্তব জীবনের কথা ছাড়িয়ে আবেগের ভাষায় কোনো রহস্য বা ক্রমানুভূতিকে ব্যক্ত করা। যেখানে বাস্তবতা তেমন প্রধান নয়। এখানে অলৌকিক ও অদ্ভুতের সমন্বয় থাকে। সাধারণতঃ আমাদের উপন্যাসে রোমান্স গড়ে উঠেছে ইতিহাসের কোন কাহিনী অবলম্বনে। যেখানে সুদূর ইতিহাসের ধূসর রহস্যময় পরিবেশ রয়েছে। আবার রূপকথার মতন গড়ে ওঠে এক অতি লৌকিক পৃথিবীর মায়া জগৎ। এর জন্য রোমান্টিক উপন্যাসের ভাষাও হয় কাব্যধর্মী।

ইতিহাসশ্রিত রোমান্স : দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুরডলা, মৃণালিনী যুগাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, ইতিহাসকে আশ্রয় বা পটভূমি হিসেবে নিয়ে প্রণয় কাহিনী, যেখানে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, মনে হচ্ছে, সব চরিত্রই ইতিহাস থেকে নেওয়া, আসলে, অনেক চরিত্রই লেখকের কল্পনার নির্মান, কিন্তু রচনার দক্ষতায় কাল্পনিক চরিত্র ইতিহাসের চরিত্রের মতন সত্য হয়ে উঠেছে।

সময়টা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়; বাঙালী সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তদের মধ্যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আসক্তি সেই সময় প্রবল আকার নিয়েছে, শ্রদ্ধা, ভক্তি থেকে জন্ম নিয়েছে ভালোবাসারও। সেই সময় ইংরেজী সাহিত্যে স্যার ওয়ালটার স্কটের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। তিনি ইতিহাস ও রোমান্সের সমন্বয়ে ঐতিহাসিক রোমান্স লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আমাদের ইংরেজী জানা পাঠক তার দ্বারা আপ্লুত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী জানা মানুষ, তিনি স্কটের এজাতের লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক; অবশ্য স্কটের আইভানহো'র দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে দুর্গেশনন্দিনী' লিখেচিলেন, একথা নিজে স্বীকার রেননি। বলেছেন আইভ্যানহো তাঁর পড়া ছিলোনা বইটি লেখার আগে।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী তিনটি বই ইতিহাসের প্রেক্ষিতে প্রণয়কাহিনী, মূলত ঘটনাগুলো কাল্পনিক, তবে ইতিহাসের আবহ জীবন্ত রূপ নিয়েছে। ঘটনার মধ্যে নাটকীয় মুহূর্তে, সাসপেন্স সৃষ্টি, মানুষের চিরকালীন স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্খা, জীবন জিজ্ঞাসা উপন্যাসগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

১৮৬৫ দুর্গেশনন্দিনী বেরুলো, এর গল্পরস, রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতা লেখককে জনপ্রিয়তা এনে দিলো। বাঙালী পাঠকের গল্পরস উপভোগের ক্ষেত্রে হয়তো তৈরী ছিলো, কিন্তু সেরকম বই-এর অভাব ছিলো খুবই। বঙ্কিমের ঘনবিন্যস্ত কাহিনী নির্মাণের দক্ষতা, রোমান্টিক পরিবেশ নির্মাণ, সর্বত্র তার কল্পনার চমৎকার প্রকাশ পাঠকদের আকর্ষণ করলো।

উড়িষ্যা ও বাংলার অধিপতি কাতলু খাঁ মুঘল সেনাপতি মানসিংহের সংঘাত, গড় মান্দারণ দুর্গের অধিপতি বীরেন্দ্র সিংহ, কাতলু খাকে নিজের পক্ষে আনবার জন্যে চিঠি দিলেন বীরেন্দ্র সিংহ, বীরেন্দ্র সিংহ সে চিঠি ফিরিয়ে দিলেন। তার ফল হলো বীরেন্দ্র সিং বন্দী হলেন, নিহত হলেন।

মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহর প্রতি আসক্ত হলো কতলু খাঁর কন্যা আয়েসা, বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমা। এর মধ্যে এক নারী অন্যের জন্যে পথ মুক্ত করে দিলো। নিজের ভালোবাসাকে সংযত করে আয়েসা, তিলোত্তমাকে

স্থান করে দিলো। চমৎকার প্রেম-গভীরতা, জটিলতা, নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি উপন্যাসের কাহিনীকে আকর্ষনীয় করে তোলে।

দুর্গেশনন্দিনীর একবছর পরে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বেরুলো কপালকুণ্ডলা। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে একটি প্রশ্ন জেগেছিলো কোনো নারী যদি স্বাভাবিকভাবে সংসারে না থেকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো অরণ্যে বড়ো হয়ে ওঠে, তবে পরবর্তী জীবনে সংসারের গৃহকর্মে সে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা, না কি বন্য প্রকৃতি তাকে প্রভাবিত করবে, সে মানিয়ে নিতে পারবে না। বঙ্কিম এই প্রশ্নটি সামনে রেখে কপালকুণ্ডলা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কপালকুণ্ডলা সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বড়ো হয়েছে সমুদ্রতীরে অরণ্যের ভিতর, তার মধ্যে কাপালিকের প্রভাব রয়েছে সক্রিয়। ঘটনাচক্রে নবকুমার নামক যুবককে সে বিয়ে করেছে, সংসারে বধুরূপে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তার আরণ্য-শিক্ষা ও সংস্কার তাকে আবার পূর্ব জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, পরিণতি হয়েচে করুণ।

চমৎকার ভাষা, কাহিনী নির্মাণের দক্ষতা, কবিত্ব, কল্পনার সৌন্দর্য কপালকুরডলা'কে করেছে অনন্য সাধারণ। এর পরিবেশে অরণ্য দুহিতা কপালকুণ্ডলার সরলতা, দৈহিক সৌন্দর্য, লেখক কবি প্রাণ উজাড় করে এঁকেছেন। মাঝখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নারীর প্রসঙ্গ এনে মোঘলযুগের এক বিশেষ অধ্যায়কে যুক্ত করে ঐতিহাসিক প্রেষিত গড়ে তুলেছেন, যা কাহিনীকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসের জন্ম কাল ও লেখকের অবস্থান সম্বন্ধে বলেছেন যে ১৮৬০ সালের জানুয়ারী মাসে বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়া' মহকুমায় বদলি হন যার বর্তমান নাম কাঁথি। বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটো ভাই পূর্ণচন্দ্র জানিয়েছেন যে, ঐ সময়ে একজন সন্ন্যাসী গভীর রাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁরই ছায়ায় কপালকুণ্ডলা'র কাপালিক চরিত্রটি রচিত। এর প্রেক্ষাপক্ষে সে সমুদ্র, অরণ্য, বালিয়ারি ঝোপজঙ্গল রয়েছে, তা নেগুয়ার কিছু দূরের সমুদ্র বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি, আর রসুলপুরের নদীর বর্ণনা।

ডঃ সুকুমার সেন কপালকুণ্ডলা'র অসাধারণত্ব সম্পর্কে বলেছেন—'' এতেও রোমান্সের লক্ষণ প্রবল, কিন্তু তার অতিরিক্ত আছে চরিত্রের সমস্যা, মানব প্রকৃতির গূঢ় রহস্য এবং নিয়তিতাড়িত মানব ভাগ্যের নিদারুণ পরিণাম, আর সে পরিণাম বর্ণিত হয়েছে কখনও কাব্যবয় গীতির সোচ্ছাসের দ্বারা, কখনও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের দ্বারা, কখনও বা নাটকীয় চমৎকারিত্বের সাহায্যে। প্রকৃতি-দুহিতা কপালকুণ্ডলা সামাজিক জীবন ও বিবাহবন্ধনে বাধা পড়ে এবং দুর্জেয় নিয়তি নির্দেশে কীভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যু পরিণামের দিকে এগিয়ে গেল, কীভাবে তার স্বামী নবকুমার ঘটনাচক্রকে অজ্ঞাতসারে বেগবান করে তুলল, এই সমস্ত বিচিত্র কাহিনী ও চরিত্র এই উপন্যাসে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।''

মৃণালিনী ইতিহাসমিশ্রিত আর একটি রোমান্সধর্মী উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশিত হওয়া মাত্র লেখকের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়লো। উপন্যাসের বিষয় তুর্কী মুসলমান কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়, যদিও ঘটনা ইতিহাস সমর্থিত নয় পুরোপুরি। ইতিহাসের মনোযোগী পাঠক বঙ্কিমচন্দ্র আঠেরোজন মুসলমান অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে বখতিয়ারউদ্দিন খিলজী রাজা লক্ষণ সেনকে নবদ্বীপ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন এবং সমগ্র বাংলা মুসলমানদের অধিকারে যায়, এটা সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বাঙালীর এই কাপুরুষতা মেনে না নিতে পেরে ইতিহাসের মধ্যে কারণ ও ঘটনা খুঁজেছেন, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য তথ্য না পেয়ে কল্পনা দিয়ে ইতিহাসের ভগ্নাংশের সঙ্গে চরিত্র ও কাল্পনিক ঘটনার সংমিশ্রণে মৃণালিণী রচনা করেছেন।

এই উপন্যাসের পটভূমি ইতিহাসের বিশেষ অধ্যায় হলেও চরিত্রগুলো তার নিজস্ব দৃষ্টি। ঐতিহাসিক উপন্যাস

একে তাই বলা যায় না। রোমান্সই এর চরিত্র। ড অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ তাঁর ঐতিহাসিক উৎস হল মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তকবৎ-ই-নাসিরি'। তাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে এবং উপন্যাসকে পরিণামের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে কল্প-ইতিহাস ও হেমচন্দ্রের প্রণয়কাহিনীকে একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে এবং একাধিক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রেম কাহিনী রোমান্স-রসে পূর্ণ, এর মধ্যে নবদ্বীপ রাজের প্রধান অমাত্য পশুপতি, যিনি রাজার বিরুধ্বে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তার প্রণয়িনী মনোরমা-উপাখ্যান যুক্ত করে এই কাহিনীতে জটিল দ্বিমুখী প্রণয় পরিবেশ রচনা করেছেন লেখক। সতেরোজন অশ্বারোহী যে বর্দবিদয় করেছিলো, তাদের সহায়ক ছিলেন বিশ্বাসঘাত পশুপতি, একজন প্রধান রাজ অমাত্য। তাঁর দুর্বলতা বা প্রেম-মনোরমার প্রতি এতোই সে নবদ্বীপের রাজা হবার স্বপ্নও দেখেছেন তিনি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করেও রাজ্য পেলেন না, 'আগুনের লেলিহান শিখায় তার মৃত্যু হলো।

এই উপন্যাসের নায়ক যদিও হেমচন্দ্র, কিন্তু জীবন্ত চরিত্র, প্রায় নায়ক হয়ে উঠেছেন পশুপতি।

উপন্যাসটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশের স্বাধীনতা অস্ত যাবার বেদনাই যেনো মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'মৃণালিণী' প্রকাশের মাসকানেকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হয়ে আসেন। তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছে ছিলো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' বেরুলো। ভূদেব, দীনবন্ধু মিত্র গড়ে তুললেন 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক সমাজ প্রভৃতি বহরমপুরের সুধীসমাজকে নিয়ে নিজে সব্যসাচীর মতন সৃষ্টিধর্মী রচনা একহাতে, অন্যহাতে কঠোর সমালোচনার জন্যে কলম ধরলেন। তিনি গোষ্ঠীপতি হলেন আর নানা লেখকদের দিয়ে চিন্তামূলক প্রবন্ধ লেখাতে লাগলেন।

এই 'বঙ্গদর্শন' এই বেরুতে লাগলো 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয়, প্রভৃতি উপন্যাস, আর সমাজ, রাষ্ট্র, লোক চরিত্রের নানা রহস্য নিয়ে লিখলেন 'লোকরহস্য' 'বিজ্ঞানরহস্য' কমলাকান্তের দপ্তর, প্রভৃতি চিন্তামূলক ও সৃজনশীল রচনা।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে বেরুলো 'যুগাঙ্গুরীয়'। একটি এ্যাডভেঞ্চার জাতীয় রচনা। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর এর পটভূমি। তাম্রলিপ্ত, অধুনা তমলুক ছিলো বাণিজ্য নগরী। বাঙালি বণিকেরা সেসময় এখান থেকে বাণিজ্য করতে যেতো সিংহলে ও নানা দেশে। এই বড়ো গল্পটি সেই কালের পটভূমিতে রচিত। সমস্ত ঘটনাটাই কল্পনা প্রসূত, পেছনে ইতিহাসের সমর্থন নেই। কিন্তু বঙ্কিম চন্দ্রের অসাধারণ কল্পনা প্রতিভা যুগাঙ্গুরীয়কে উপভোগ্য রচনায় উত্তীর্ণ করেছে।

এরপর রচিত হলো তাঁর চন্দ্রশেখর উপন্যাস। প্রকাশিত ১৮৭৫-এ। বঙ্কিম প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানেও ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্স, তবে যুক্ত হয়েছে সেকালে সামাজিক জিজ্ঞাসা। এর প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে নবাব মীরকাশিমের রাজত্বকাল। সিরাজদ্দৌলার পরবর্তী কালের বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিম। মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশিমকে ইংরেজরাই নবাবী দিলেন, কিন্তু মীরকাশিম স্বাধীনচেতা মানুষ, তার সঙ্গে ইংরেজের বিরোধ বাধলো, পরিণতিতে যুদ্ধ। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এই ঘটনা বিশেষ স্থান নিয়েছে; অর্থাৎ বাংলার ইতিহাস ও সেকালের সমাজ জীবন যুগপৎ স্থান নিয়েছে উপন্যাসে। রোমান্সের সুন্দর প্রয়োগ রয়েছে প্রতাপ-শৈবলিণীর কাহিনীতে। তার সঙ্গে মীরকাশিম আর দলনীর কাহিনী যুক্ত হয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের মেলবন্ধন ঘটেছে। অবশ্যই এই দুটি কাহিনীর মূল সূত্র গেঁথেছেন চন্দ্রশেখর, যিনি উপন্যাসটির নায়কও।

"এ উপন্যাসের ঘটনা দুটি ভাবে বিভক্ত। একটি চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিণীর কাহিনী। আর একটি মীরকাশিম ও দলনী বেগমের কাহিনী। কোথায় সুবা বাংলার নবাব মীরকাশিম আলি খাঁ আর কোথায় মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম। লেখক সুকৌশলে দুটির মধ্যে সেতু রচনা করলেন; প্রতাপ-শৈবলিণী-চন্দ্রশেখর রাজনীতি, ইতিহাস ও যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলেন। তবে যাকে স্বদেশপ্রেম বলে, এ উপন্যাসে তা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শাসক ও বণিক ইংরেজের দম্ভ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুবৃত্ত কর্মচারীদের পশুপ্রবৃত্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। এ উপন্যাসে মানব ভাগ্যই প্রধান স্থান লাভ করেছে, এবং সে ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যেমন বাস্তব ঘটনার দ্বারা, তেমনি দুর্জ্ঞেয় নিয়তির অঙ্গুলি সঙ্কেত।"

[বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঐতিহাসিক উপন্যাস : ইতিহাসকে অনেকটা অবিকৃত রেখে, মূল চরিত্র ইতিহাস সমর্থিত, আর উপন্যাসের প্রয়োজনে কল্পনা দিয়ে ইতিহাসের অজানা লুপ্ত জগৎ নির্মাণ করে বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেন, তা হলো 'রাজসিংহ'। তিনি নিজেই বলেছেন যে রাজসিংহই তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস, কারণ প্রধান চরিত্র এবং ইতিহাস এখানে গভীরভাবে মিশে আছে। প্রকাশকাল ১৮৯৩।

ঔরঙ্গজেব এবং রাজপুতদের যুদ্ধ যেমন এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাল্পনিক কাহিনী। ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' উপন্যাসে লিখেছেন "তিনি এই উপন্যাসে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং মোগল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াচেন, কারণ উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।

এই উপন্যাসের মূল কাহিনীর কেন্দ্র হলো রাজপুত রাজা রাজসিংহ এবং মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ। উপন্যাসের রস সৃষ্টি হয়ে রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর রাজ সিংহের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা, ঔরঙ্গজেবের ছবিকে সে অপমান করেছে, সেই কাহিনী চলে গেছে ঔরঙ্গজেবের কাছে। যুদ্ধ তা নিয়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া নির্মলকুমারী, মানিকলাল, ঐতিহাসিক চরিত্র না হয়েও তার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কাহিনীটিকে করে তুলেছে জীবন্ত। জেবউন্নিসা মোবারকের কাহিনী উপন্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাহিনীকে যেমন গতিশীল করেছে তেমনি চমৎকার নাট্যমুহূর্ত গড়ে তুলেছে। উপন্যাসের পরিবেশ গড়ে তুলতে লেখক চমৎকার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের কয়েকটি সত্যিকারের চরিত্রের সাধারণ মানবস্বভাবও সত্য করে তুলেছেন কল্পনাবলে।

তত্ত্বমূলক

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনে কয়েকটি বাঁক রয়েছে। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জাতিগঠনের উদ্দেশ্য লইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) এই নবতন পদ্ধতির প্রথম উপন্যাস। পরবর্তী দুইটি উপন্যাস 'দেবী চৌধুরী' (১৮৮৪) ও সীতারাম (১৮৮৭) এই ধারাই পরিণতি লাভ করিয়াছে। 'ত্রয়ী' নামে খ্যাত তাঁহার এই শেষ উপন্যাস তিনটি উদ্দেশ্য ও প্রচার দোষ-দুষ্ট বলিয়া বহু সাহিত্যিকের নিন্দাভাজন হইয়াছে, আবার অনেকে এই তিনটিকে তাঁহার পরিণত বয়সের মহোত্তম কীর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলের রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং শেষোক্ত দলে শ্রী অরবিন্দ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি।

বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কালে যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়, তা ইতিহাস সমর্থিক। লেখক 'আনন্দমঠ' এ বেছে নিয়েছেন সেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র সবার উপরে দেশকে স্থান দিয়েছেন। 'ধর্মতত্ত্ব'-তে বলেছেন 'সকলধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।' দেশকে ভালোবাসতেন, দেশমাতার বন্দনা করতেন, কিন্তু তাঁর কাছে স্বাধীনতা ছিলো সবার উপরে, তার উপরে ছিলো স্বদেশের সাধারণ মানুষের জীবনের সাচ্ছন্দ, সুখ। যদি স্বাধীনতা অর্থে অরাজকতা বোঝায় তার পক্ষপাতী চিলেন না তিনি। আনন্দমঠ উপন্যাসে এই দুয়ের সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করেছেন। তত্ত্ব তবু প্রধান হয়ে উঠেছে দেশ প্রেম এবং গীতার নিষ্কামতত্ব 'আনন্দমঠ'-এ প্রধান হয়েছে। তাই অধিকাংশ চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি, তবে এই উপন্যাস আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই উপন্যাসে বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা আজও আমাদের বেদনাবিদ্ধ করে। আর 'বন্দেমাতরম' গানটি তো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মন্ত্ররূপে কাজ করেছে।

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসটিও তত্ত্বমূলক। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে গীতার নিষ্কামধর্ম তত্ত্ব প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাহিনী বর্ণনায় অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা উপস্থাপনে বঙ্কিম অসাধারণ সার্থকতা দেখিয়েছেন এখানে। 'আনন্দমঠ' আরদেবী চৌধুরানী তত্ত্বাশ্রিত নাটক হলে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। ডঃ সুকুমার এই পার্থক্য নির্ণয় করেছেন এভাবে আনন্দমঠের সঙ্গে দেবী চৌধুরাণীর পার্থক্য প্রধানত এইখানে যে প্রথম উপন্যাসে দেশোদ্ধারে লাগিয়াছিলো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় উপন্যাসে ব্যক্তিগত উদ্দীপনা। দরিদ্র ঘরের প্রফুল্ল স্বামী সঙ্গ বর্জিত অবস্থায় ডাকাতশ্রেষ্ঠ ভবানী পাঠকের কাছে কি ভাবে পৌঁছোয়, ভবানীপাঠক তাকে কিভাবে বদলে দেয়, এবং প্রফুল্ল হয়ে ওঠে দেবী চৌধুরানী, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী এই উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে। পরিশেষে প্রভাব প্রতিপত্তি ছেড়ে স্বামীর ঘরে সাধারণ নারীর মতন গার্হস্থ্যজীবন পালনকেই মনে করে শ্রেষ্ঠ কাজ, এই নিষ্কামতত্ত্ব 'দেবীচৌধুরানীতে তুলে ধরেছেন লেখক ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে বেরুলো 'সীতারাম'। তার আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম এই তত্ত্ব মূলক উপন্যাসে ত্রয়ীবৃত্ত সম্পূর্ণ করলো। সীতারাম এও ধর্মতত্ত্ব, এর প্রেক্ষিতে রয়েছে হিন্দুরাজা সীতা রামের সঙ্গে মোগল রাজশক্তির বিরোধ বিদ্রোহ।

''সীতারাম উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার বিস্তৃতি ও ঘটনা বহুলতা। গ্রন্থমধ্যে তিনটি গল্পের সন্নিবেশ হইয়াছে। প্রধান কাহিনী সীতারাম ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দুজনের পরস্পরকে ভালোবাসা কোনো পরিণতি পায়নি, জয়ন্তীর সন্ন্যাসধর্ম সীতারামকে চালিত করেছে বৈরাগ্যের পথে। ঘটনাক্রমের মধ্যে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা জড়িত হয়েছে। দুটি উপকাহিনীও মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সীতারামএ।

সামাজিক উপন্যাস

বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারানী, প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বঙ্কিমের অসাধারণ কীর্তি। এসব উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্বের উপর লেখক ঝোঁক দেননি, তবে বঙ্কিমের মানসিকতা লেখকের কিছু সামাজিক দায় আছে, শুধু লিখে আনন্দ দেওয়াই তাঁর কাজ নয়, এমন মনোভাব তাঁর সামাজিক উপন্যাস থেকেও পাওয়া যায়।

সামাজিক বিষয় উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি বেছে নিলেন। ১৮৭২-এর বৈশাখ থেকে বারোটা সংখ্যায় ধারাবাহিক বেরোলো বিষবৃক্ষ। ১৮৭৩-এ গ্রন্থকারে বেরোয়।

অনেকেই মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র নারী প্রগতির বিরোধী ছিলেন; তা সত্য না হলেও বিদ্যাসাগরের বিধবাদের বিয়ে দেবার জন্যে যে আন্দোলন হয়েছিলো এই উপন্যাস লেখার কিছু আগে, ঊনিশ শতকের মাঝবরাবর, যে আন্দোলনের বিপক্ষে হিন্দুরক্ষণশীল সমাজ জোট বেঁধেছিলো, তুমুল আন্দোলন হয়েছিলো যা নিয়ে, এবং সরকার বাধ্য হয়ে আইন পাশ করলো, উৎসাহিত হয়ে কেউ কেউ বিধবাদের বিয়ে করতে লাগলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা তেমন স্বাভাবিক মনে মেনে নিতে পারেননি। প্রবন্ধে নয়, উপন্যাসের মাধ্যমে প্রতিবাদই করলেন যেনো বিধবা বিবাহের। তবে সেই উদ্দেশ্যটাই মুখ্য হয়ে ওঠেনি এখানে।

বিষবৃক্ষ'র মতন এমন জনপ্রিয় উপন্যাস বাংলায় খুব কমই দেখা গেছে। লেখকের জীবিতকালেই আটটি সংস্করণ বেরিয়েছে। সেকালে আজকের তুলনায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নগন্য ছিলো। তারই মধ্যে পাঠক তৈরী করে নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখার অসাধারণ আকর্ষণীয় শক্তির সাহায্যে। এই উপন্যাসের কাহিনী পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের নির্মাণ রীতির উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে।

বঙ্কিমচন্দর নারীর প্রতি পুরুষের সাধারণ দুর্বলতা, বিশেষ করে দুর্বল পুরুষের নারীর সৌন্দর্যের আকর্ষণে পদচ্যুত হওয়ার এবং অনেক ঘটনার পর, আবার স্বস্থানে ফিরে আসার কথা বর্ণনা করেছেন 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। জমিদারির কাজে গিয়ে নগেন্দ্রনাথের পরিচয় হলো অনাথা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে। নগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের মানুষ, তার চরিত্রের আদর্শও উন্নত মানের। তিনি তার সুন্দরী সাধবী স্ত্রী সূর্যমুখীর ভালোবাসা ও কর্তব্য নিষ্ঠায় বেশ সুন্দর জীবনই যাপন করছিলেন। কিন্তু সব তছনছ করে দিলো কুন্দ, কুন্দনন্দিনী, যাকে অসহায় দেখে নিয়ে এসেছিলেন নিজের আশ্রয়ে নগেন্দ্রনাথ। কখন কিভাবে বাল্যবিধবা কুন্দের প্রতি আকৃষ্ট হলেন নগেন্দ্রনাথ, তার প্রণয়ে উন্মাদ হলেন, বিয়ে করতে প্রতিজ্ঞা করলেন; প্রবৃত্তি তার নীতিবোধকে স্ত্রী সূর্যমুখীর প্রতি বীতরাগ করে তুললো; কারো উপদেশই কানে তুললেন না তিনি; ছেড়ে দিলেন বিষয় কর্মের কাজ, জীবনের প্রতি আসক্তি চলে গেলো, কুন্দকে চাই, না হলে জীবন ব্যর্থ, এই বোধে প্রায় পাগল হলেন। তা দেখে কুন্দনন্দিনী পলায়ন করলো। তারফলে নগেন্দ্রনাথ হলেন আরো বেশি উন্মাদনাগ্রস্ত। ফিরে এলো কুন্দ, সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখে তার সঙ্গে কুন্দের বিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে সতীসাধ্বী, অভিমানিনী সূর্যমুখী কোথায় চলে গেলেন। নগেন্দ্রনাথ অনেক খুঁজলেন কিন্তু কোথাও পেলেন না তাঁকে। এবার তার অনুতাপ হলো, অসহ্য হয়ে উঠলো কুন্দ নগেন্দ্রর কাছে, দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে খুঁজে আনতে। অনেক ঘটনার পর সূর্যমুখীকে খুঁজে পেলেন নগেন্দ্র, মিলন হলো তাদের। পরিত্যাক্ত বিসর্জিত প্রতিমা কুন্দ বিষপানে করলো আত্মহত্যা।

এছাড়া এই উপন্যাসে রয়েছে হীরা ও দেবেন্দ্রনাথের কাহিনী। তা কাহিনীর উত্থান পতনের নানা জটিলতার প্রয়োজনেই এসেছে।

লেখক উপন্যাস শেষ করলেন এই কথা বলে ''আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে ঘরে ঘরে অমৃত ফলিবে।''

কৃষ্ণকান্তের উইল

'বঙ্গদর্শন' পত্রে ধারাবাহিক বেরোয় কৃষ্ণকান্তে উইল, গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে। এই উপন্যাসের সামাজিক সমস্যা ও ব্যক্তিগত সমস্যার মেলবন্ধনে লেখক মনস্তত্বসম্মত সুন্দর কাহিনী নির্মাণ করেছে। রচনা শৈলী ও পরিণত চিন্তা চেতনার সংমিশ্রণে এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয়।

হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়। তার দুই ছেলে। বড়ো ছেলে হরলাল যেমন হৃদয়হীন তেমনি দুর্বিনীত। কৃষ্ণকান্ত রায়ের ছোটো ভাই-এর ছেলে গোবিন্দলাল যেমন সৎ চরিত্র সম্পন্ন তেমনি দয়ালু প্রকৃতির। জমিদার কৃষ্ণকান্ত স্বাবাবিকভাবেই গোবিন্দালালকে সম্পত্তির বেশির ভাগটাই উইল করে দেন। অবশ্য তার মৃত্যুর পরে এই সম্পত্তির বিভাজন ঘটবে। হরলাল স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রুধ হয়ে কলকাতা থেকে বাবাকে লিখলো, তার পক্ষে উপযুক্ত উইল যদি না করা হয় তবে সে বিধবা বিয়ে করবে। শুনে কৃষ্ণকান্ত ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। হরলাল তা মেনে নিলো না, সে প্রতিবেশী বাল্যবিধবা রোহিনীর শরণাপন্ন হলো। হরলাল রোহিনীকে আসল উইল বদলে তার তৈরী জাল উইল রাখতে বললো সিন্দুকে। রোহিনী প্রথমে রাজী হয়নি, হরলাল বিধবাকে বিয়ে করার লোভ দেখালো। লোভে পড়ে রোহিনী ঘুমন্ত কৃষ্ণকান্তের দেরাজ থেকে চুরি করলো আসল উইল এবং রেখে এলো জাল উইল, সে তা হরলালকে দিলো না, জানালো হরলাল যদি সত্যি বিধবা বিয়ে করে তবে তাকেই আসল উইল দেবে।

বারুণী পুকুর ঘাটে গোবিন্দলালের সঙ্গে দেখা হলো। তার লোভ ঈর্ষা প্রেম জাগলো গোবিন্দলালকে ঘিরে। গোবিন্দলালও স্ত্রীকে ত্যাগ করলো, যে স্ত্রী ভ্রমরকে নিয়ে সে এতোদিন সুখেই ছিলো, এখন রোহিনীকে নিয়ে তাঁর উন্মাদনা শুরু হলো। কিন্তু চরিত্রভ্রষ্টা রোহিনী গোবিন্দলালের প্রেমের মূল্য দিলো না, গোবিন্দলাল আহত অপমানিত হয়ে রোহিনীকে হত্যা করলো। করে ফেরার হলো সে। পরে অবশ্য মামলা থেকে মুক্তি পেলো গোবিন্দলাল, কিন্তু প্রকাশ্যে মুখ দেখালো না, উপস্থিত হলো স্ত্রী ভ্রমরের মৃত্যু শয্যার পাশে। ভ্রমণ সতীসাধ্বী নারী, সে গোবিন্দলালের পায়ের ধুলো নিয়ে দেহত্যাগ করলো, কিন্তু হিন্দু নারীর জন্মজন্মান্তরের স্বামী রূপে গোবিন্দলালকে আবার পাবে, এরকম কোনো প্রার্থনা জানালো না। এই ঘটনা গোবিন্দলালকে চেতনা এনে দিলো, সে ঈশ্বরের সাধনায় নিজেকে সমর্পণ করে শান্তি খুঁজলো। রোহিণী চরিত্রটি অসাধারণ মানবীয় স্বাভাবিক আবরণে সমৃধ্ব। সে মরতে চায়নি। সে জীবনকে ভালো বেসেছিলো, বাঁচতে চেয়েছিলো। গোবিন্দলাল তাকে মারতে উদ্যত হলে সে বলেছিলো ''মারিও না, মারিও না। আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না।'

বিধবা রোহিনীর কি বাঁচবার, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, স্বামী প্রেম নিয়ে বাঁচবার অধিকার ছিলো না? তাই রোহিনীর এই অকাল অসহায় মৃত্যু সেকালের পাঠক মেনে নিতে পারেননি। লেখককে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন কেন তিনি রোহিনীকে মারলেন?

বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র কোনো দিনই প্রবৃত্তিকে জিতে যেতে দেননি, তাঁর কাছে, সামাজিক সুরক্ষার জন্যে সংযম ছিলো অনেক বেশি মূল্যবান। ফলত, শিল্পকলার ক্ষেত্রে নরনারীর স্বাধীন বিকাশ, তিনি মেনে নিতে পারেননি সেদিন। এদিক থেকে তিনি বেশ কিছুটা প্রাচীনপন্থী বলা যেতে পারে।

রজনী

সামাজিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হলেও, মনস্তত্ব-প্রধান উপন্যাস বলা যায়। উপন্যাসটি খুব বড়ো আকারে নয়, বেরিয়েছিলো বঙ্গদর্শন-এ ধারাবাহিক হিসেবে। বই আকারে বেরোয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের নিষ্ঠ পাঠক, বাংলার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে উপাদান সংগ্রহে কখনো কখনো বিদেশী সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হয়েছিলো। নিজেই লিখেছেন যে দুটি ইংরেজী উপন্যাস দ্বারা সামান্যভাবে প্রভাবিত হয়ে 'রজনী' রচনা করেন। লর্ড লিটনের 'লাষ্ট ভেজ অব্ পমনি' এবং উইল কি কলিনসের দি ঔউমেন ইন হোয়াইট তাকে রজনী লিখতে অনুপ্রাণিত করে। রচনা রীতিটি অন্যরকম। গল্পের চরিত্রগুলি তাদের কথা নিজেরাই বলছে, সাধারণত লেখকই নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির কথা বলেন, এখানে চরিত্র নিজে বলছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়'' এই প্রথার গুণ এইয়ে যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই এ উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।''

উপন্যাসটির নায়িকা রজনী, সে অন্ধ। সে যা কিছু বোঝে তা স্পর্শ করে, অনুভব করে। বইটিতে দেখানো হয়েছে অজস্র ঘটনা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জন্মান্ধ রজনী ও শচীশের মিলন। সঙ্গে রয়েছে উপকাহিনী, শচীশের বিমাতা লবঙ্গলতার কাহিনী, যা উপন্যাসের মূলকাহিনীর সমান্তরাল কাহিনী গড়ে তুলেছে। কাহিনী নির্মাণ, অন্ধ নারীর মনস্তত্বের চমৎকার প্রকাশ উপন্যাসটিকে এমন উচ্চস্তরে নিয়ে গেছে, যে বাংলার মনস্তত্ব মূলক উপন্যাসের সূতিকাজার 'রজনী' বলা যেতে পারে। চোখে দেখতে না পারলেও স্পর্শে রূপানুভূতি প্রেমের জন্ম দিতে পারে, রজনী পাঠ করলে সেই সত্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। লবঙ্গলতা, অমরনাথ, শচীশ, সকলের প্রেমানুভূতির তীব্রতা, অকপটতা, পৌরুষ ও ত্যাগ কবি বঙ্কিম অপূর্ব স্রষ্টার কৃতিত্বে উপস্থিত করেছেন 'রজনীতে'।

'রাধারানী' একটি বড়ো গল্প। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। অনেকটাই অভাবিত ঘটনার সমন্বয় রয়েছে এখানে, লেখাটা রূপকথা জাতীয়, বলেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাধারানী নামের এগারো বছরের মেয়ে মাহেশের রথ যাত্রার মেলায় একগাছা ফুলের মালা বিক্রয় করতে গিয়েছিলো অসুস্থ মায়ের পথ্য কেনার জন্যে। প্রচন্ড বৃষ্টি হওয়ায় মালা বেচতে পারলো না রাধারানী, জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে বাড়ী ফিরছিলো, ঐ পথ দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিলো, রাধারানী অন্ধকারে তার ঘাড়ে পড়লো, ভদ্রলোক সব শুনে মালাটি কিনে নিলো দুপয়সা দিয়ে, কিন্তু বাড়ি ফিরে আলোয় দেখতে পেলো। দুপয়সা নয়, দুটো টাকা, হয়তো মায়ের অসুখের কথা শুনে ভদ্রলোক দিয়েছেন। আবার বাজারের দোকানদারের হাত দিয়ে শাড়িও তিনি পাঠিয়েছেন। রাধারানীরা ও একদা বড়োলোক ছিলো। জ্ঞাতিরা তাদের ঠকিয়েছে তাই আজ তারা দীন ভিক্ষারিণী। ভদ্রলোকের দেওয়া নোটে স্বাক্ষর ছিলো রুক্মিনীকুমার নামক এক ব্যক্তির। তার খোঁজ করা হলো, পাওয়া গেলো না।

এরমধ্যে বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলের রায় বেরুলো, তারফলে রাধারানীরা তাদের পরহস্তগত সম্পত্তি ফিরে পেলো। মা মারা গেলো রাধারানীর, সে এসে পিতৃবন্ধু কামাখ্যাবাবুর কাছে রইলো। কামাখ্যাবাবু তাকে উপযুক্ত লেখাপড়া

শেখালেন। রাধারানীর ভুলে যায়নি দুঃসময়ের সাহায্যকারী রুক্মিণীকুমারকে, সে তাকে বিয়ে করবে, কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে? কামাখ্যাবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, রুক্মিনী কুমারও বিপত্নিক, তার উপরে ধনী। তাদের মিলন হলো। যদিও এর মধ্যে নানা অসম্ভব সম্ভব ঘটনা প্রবাহ লেখক উপস্থিত করেছেন।

ইন্দিরা

'ইন্দিরা' ও একটি ছোটো গল্প চরিত্রের, অন্তত প্রথম দিকের, পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উপন্যাসের কিছুটা চরিত্র পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীবর্ণনার সহজ দক্ষতা এবং চরিত্রের স্বচ্ছতা এখানেও দেখা যাচ্ছে। ইন্দিরা কিভাবে পতিগৃহে যাত্রা করে ডাকাতের হাতে, তার অলংকার ইত্যাদি লুঠ করে নিয়ে যায়, ইন্দিরা সাহসে ভর করে রক্ষা পায়; কলকাতায় এসে মিলিত হয় স্বামীর সঙ্গে, তারই চমৎকার বর্ণনা ক্ষুদে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। অবশ্য নায়িকা ইন্দিরার মুখ দিয়েই গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। এক সুন্দর নারী মনের মধুর কোমল দিকটি লেখক চমৎকার নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন।

বাংলার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, আজও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যে সময়ে তিনি উপন্যাস লিখতে আসেন, তখন পর্যন্ত নক্‌শা জাতীয় কিছু লেখা, প্যারীচাঁদ মিত্রের সামান্য প্রচেষ্টার বাইরে আদর্শ বলে কিছু ছিলো না। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত লেখক অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, লেখার আঙ্গিক বা ফর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই সাহায্য পেয়েছিলেন সেখান থেকে, কিন্তু প্রতিটি উপন্যাসের ঘটনা বা কাহিনী বৃত্ত, চরিত্র নির্মাণ, পরিবেশ সৃষ্টি, সমস্তত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাকেই আয়ত্ত করতে হয়েছিলো আপন প্রতিভাবলে। সরকারী কাজে নামা ব্যস্ততার মধ্যে মাত্র তেরোটি সৃষ্টি ধর্মী লেখা সমাপ্ত করেছেন যা আমাদের কাছে ঁআজো বিস্ময়। তার সঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা, তরুণ লেখকদের সৃষ্টিধর্মী ও চিন্তামূলক লেখা লিখতে অনুপ্রাণিত করা, গবেষণাধর্মী ও হাস্যরসাত্মক গদ্য সৃষ্টি সব্যসাচী বঙ্কিমের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। আজো তিনি আমাদের কাছে বিস্ময়।

৬.৫ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ বা মেজোভাই সঞ্জীবচন্দ্রকে সাধারণভাবে আমরা 'পালামৌ'র লেখক বলেই জানি। কেউ কেউ 'জাল প্রতাপচাঁদ এর লেখকও জানি বটে, এর বেশি কিছু আমাদের অনেকেরই জানা নেই। অথচ তিনি কয়েকখানি উপন্যাস, লিখেছিলেন, সম্পাদনা করেছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকাও, প্রবন্ধ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি রীতিমতো প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন, যদিও কোনো সৃষ্টিকর্মতেই সমস্ত মন ঢেলে দিতে পারেননি, বলে তেমন লেখক হিসেবে খ্যাতি পাননি।

প্রবন্ধ লেখক হিসেবে তাঁর পরিচয় আমরা তুলে ধরছি না। সৃষ্টিধর্মী লেখক রূপে তাকে ভাবতে গেলে প্রথমেই আসবে ভ্রমণকাহিনী, পালামৌ-এর কথা, আসবে জাল প্রতাপচাঁদ-এর কথা। এছাড়া কণ্ঠমালা, মাধবীলতা, দামিনী, উপন্যাসের কথাও আসবে, যদিও উপন্যাস শিল্পাঙ্গিকটিকে পূর্ণ ব্যবহারের দক্ষতা দেখাতে পারেন নি।

কোনো কোনো মানুষ আসে, যারা প্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু চারিত্রিক অব্যবস্থাচিত্ততার জন্যে

প্রতিভার সদ্ব্যবহার করতে পারেন না। শুধু প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখে যান। সে স্বাক্ষরও অবহেলার যোগ্য নয়। ঠিক এরকমই একজন হলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটীর কাছাকাছি কাঁঠালপাড়ায় সঞ্জীবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেকটর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সঞ্জীবনী সুধা' গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে নানা তথ্য দিয়েছেন। গ্রামের গুরু মহাশয় থেকে মেদিনীপুরের ইংরেজ স্কুলে, হুগলী কলেজে সঞ্জীবচন্দ্র পড়াশুনো করেছেন, কিন্তু সত্যিকারের মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি।

এমনকি তাঁর পিতার চেষ্টায় এবং নিজের প্রয়াসেও চাকুরী পেয়েছেন, সেখানে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেননি তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ঃ তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রতিভাবলে অল্পদিনে ইংরেজী সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কলেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

পিতা যাদবচন্দ্র নানা সময়ে তাকে চাকুরীতে নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু তাঁর ভালো লগাতো কঁঠালপাড়ায় উদ্যান রচনা করতে। তিনি ছিলেন উদারচেতা, বন্ধুবৎসল মানুষ তিনি সৌন্দর্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় মানুষ। কৃষ্ণনগরে চাকরী করবার সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। সে বন্ধুত্ব ছিলো অকপট ভালোবাসার।

ইংরেজ সরকার তাকে গুরুতর কাজের ভার দিয়ে পালামৌ পাঠালেন। বাঘ ভাল্লুকের আশ্রয় ভূমি পালামৌতে তিনি বেশিদিন থাকতে পারলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় ঃ কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। 'পালামৌ' শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে, তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। প্রমথনাথ বসু ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব, এগুলি যে তাঁহার রচনা, তদ্‌বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।'' (সাহিত্য সাধক চরিতমালা, তৃতীয় খণ্ড)

পালামৌ (১২৮৭-৮৯) সময়ে বঙ্গদর্শনে প্র. না. বি ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের একটি অনবদ্য ভ্রমণ কথা। লেখকের সৌন্দর্যপ্রিয়তা, প্রাকৃতিক চিত্র আকার চমৎকার ক্ষমতা, দার্শনিকতা ও কবিত্বের সুন্দর পরিচয় এ বই এর নিবন্ধে রয়েছে।

''আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি এমন সময়ে কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আমার গাড়ি ঘেরিল। ''সাহেব একটি পয়সা'' ''সাহেব একটি পয়সা''। এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতিচাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালি বসিয়া আছি, আমাকে কেন সাহেব বলিতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, ''আমি সাহেব নহি।'' একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীয়বৎ অলংকারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, ''হাঁ তুমি সাহেব।''

সামান্য এই উদ্ধৃতিটিতে কৌতুক প্রবণতা যেমন স্পষ্ট তেমনি পরিচ্ছন্ন ভাষা ও বর্ণনার চমৎকার ভংগি আমাদের মুগ্ধ করে। 'পালামৌ'-এর একটি বাক্য তো প্রবচনের তাৎপর্য লাভ করেছে। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা

মাতৃক্রোড়ে''। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে পালামৌ সম্পর্কে যথার্থ লিখেছেন, শুধু ভ্রমণকাহিনী উপলক্ষ্যে যে আখ্যানবর্জিত মনোরম সাহিত্য রচনা সম্ভব তাহা পালামৌ প্রমাণিত করিয়াছে। ছোটনাগপুরের আদিম গিরি-দরী-অরণ্যানী এবং আরণ্যক পশু মানব লেখকের সমবেদনার রসধারার অভিষেকে পালামৌ প্রবন্ধগুলিতে নতুনতর মাধুর্য মণ্ডিত হইয়া জীবন্ত হইয়াছে। অসংলগ্ন ও অপ্রচুর চিত্রসমষ্টি হইলেও পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। অন্যান্য উপন্যাস হলো 'জালপ্রতাপচাঁদ (১৮৮৩) রামেশ্বরের অদৃষ্ট; কণ্ঠমালা; মাধবীলতা (১৮৮৫) দামিনী।

এর মধ্যে জালপ্রতাপচাঁদ' একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো অন্য কারণে। বর্ধমানের রাজপুত্র জাল প্রতাপচাঁদকে ঘিরে সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা সাড়া ফেলেছিলো। সঞ্জীবচন্দ্র বরাবরই কৌতূহলী মানুষ ছিলেন। তিনি ঐ মামলার নথিপত্র ঘেঁটে কাহিনী তৈরী করে লিখলেন জাল প্রতাপচাঁদ। ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ ইতিহাস কাহিনী হইলেও লিখিবার গুণে উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক। সঞ্জীবচন্দ্রের সহানুভূতি উৎপীড়িত 'জাল' প্রতাপচাঁদ ভূমিকাটিকে পাঠকের দল মহিমামন্ডিত করেছে।''

''জাল রাজার মূর্তি বড় প্রশান্ত ছিল। যে দেখিয়াছে সেই তাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। সে মূর্তি ক্ষুদ্রচেতা জুয়া চোরের নহে। গল্প আছে, তিনি তিনি একবার কোন পল্লিগ্রামে শিষ্যাদের দেখিতে গিয়া একটি গৃহস্থের বাটিতে গোপনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে বাড়িতে পুরুষ থাকিত না, শিষ্যারা সকলেই তথায় গোপনে গুরুদর্শনে আসিত।

'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', কণ্ঠমালা, মাধবীলতা এবং দামিনী সাধারণ গল্প কাহিনীর ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তবে ভাষাগত সারল্য এবং গল্প বলবার গুণে একদা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। 'দামিনী' অবশ্য কয়েকটি গল্পের সংকলন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে, যথেষ্ট প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সঞ্জীবচন্দ্র কেন সার্থক স্রষ্টা হতে পারেননি, সে প্রসঙ্গে বলেছেন— ''কোনো কোনো ক্ষমতাশালী লেখকের প্রতিভার কী একটি গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতার অভিশাপ থাকিয়া যায়; তাহারা অনেক লিখিলেও মনে হয় তাহাদের সব লেখা শেষ হয় নাই। তাহাদের প্রতিভাবে আমরা সুসংলগ্ন আকারবদ্ধ ভাবে পাই না; বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে বৃহত্ত্বের অনেক উপাদান ছিল, কেবল সেই সংযোজনা ছিল না যাহার প্রভাবে সে আপনাকে সর্বসাধারণের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে পারে। সঞ্জীবচন্দ্রে প্রতিভা পূর্বোক্ত শ্রেণীর। তাঁহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার হাতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজ দেখাইয়াছেন তাহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণে ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণে উদ্যম ছিল না।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার সম্পূর্ণ প্রকাশ যে তার সৃষ্ট সাহিত্যে ঘটেনি, সে ঘিরে সন্দেহ নেই।

৬.৬ রমেশচন্দ্র দত্ত

এক একজন মানুষ জন্মগত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, আবার কেউ কেউ শ্রমের দ্বারা কৃতিত্ব অর্জন করেন। অবশ্যই শ্রম সব ক্ষেত্রেই জয়ী হবার শর্ত। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র দত্ত। ছাত্র হিসেবে দুজনেই

সমান কৃতী; রমেশচন্দ্র একটু বেশি এগিয়ে, তিনি সেকালে বিলেত থেকে আই. সি হয়ে আসেন, প্রবন্ধ লিখলেও সৃষ্টিমূলক লেখা কিন্তু আরম্ভ করেন বঙ্কিমের অনুপ্রেরণায়। দেখা যায় শিক্ষা, সংকল্প ও শ্রম তাঁকেও জয় এনে দিয়েছিল, তবে অবশ্য জন্মার্জিত প্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্রের মতন নয়।

স্যার ওয়ালটার স্কট অনুপ্রাণিত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে ইতিহাসকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনা করতে; ঐ একই পথে রমেশচন্দ্রও গিয়েছিলেন। এবং সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস না হলেও শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

রমেশচন্দ্রের জন্ম ১৮৪৮ সনের ১৩ই আগস্ট, কলকাতায় বর্তমান বেথুন কলেজ সংলগ্ন গলিতে, মামার বাড়িতে। পিতা ছিলেন সেকালের ডেপুটি কালেক্টর, বদলির চাকরী, তাই তার পরিবারের সকলে কলকাতায় থাকতেন। রমেশচন্দ্র কলকাতার স্কুলে পড়েন, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সিনিয়র স্কলারশিপ নিয়ে এফ এ পাশ করেন। ছাত্রবস্থাতেই তার পিতা মাতার অকাল মৃত্যু ঘটে, এনট্রান্স পড়ার সময় তাঁর বিবাহ হয়, অগ্রজের সহায়তায় তিনি বিলাতযাত্রা করেন; বিলেতে সিভিল সার্ভিসের তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ সনে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন, তারপর সরকারী চাকুরী, এমন উচ্চপদের চাকুরী তিনি পেয়েছিলেন যে ইংরেজী পত্রিকা তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষোভ প্রকাশও করে।

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিলেতে বসেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর কর্মময় জীবন নানা সার্থকতার সমন্বয়। বরোদার রাজার দেওয়ান হন তিনি। ১৯৩৯ সনে তার মৃত্যু হয়। তাঁর দায়িত্বপূর্ণ কর্মজীবনের মধ্যেই সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগ করেন তিনি মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায়। তাঁর মধ্যে দ্বিধা ছিলো সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা তা নিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রই তাকে বলেছিলেন যে তাঁর মতন শিক্ষিত যুবকদেরই একাজে এগিয়ে আসা উচিত। তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

তাঁর সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রয়েছে মোট ছ'টি উপন্যাসে। ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা ছিলো রমেশচন্দ্রের। ইতিহাসের পটভূমিতে লিখেছিলেন 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪); মাধবী কঙ্কন (১৮৭৭)। লিখেছিলেন ইতিহাস-অবলম্বনে পূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

আসলে; উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে, সামাজিক বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখার আদর্শ বাংলা ভাষার গড়ে ওঠেনি, বঙ্কিমচন্দ্রও দ্বিধান্বিতভাব কাটিয়ে প্রথমে ইতিহাস, পরে তত্ত্বমূলক এবং সংসার জীবনাভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। ইতিহাস ও ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসের বিষয় মোগল-ইতিহাসের একশোবছরের ঘটনা তাই এই গুলিকে 'শতবর্ষ' নাম নিয়ে সংকলিত করা হয়েছে। একত্রে প্রকাশিত 'শতবর্ষের প্রকাশকাল ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯।

বঙ্গবিজেতাতে আকবরের রাজস্বসচিব টোডরমল্লের কাহিনী; ইতিহাসের ফাঁকগুলো তিনি যতোটা সম্ভব কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করেছেন। প্রেম, সংসারের বিচিত্রবর্ণনা, ত্যাগের মহিমা, হিংস্রতা, উপন্যাসের বিস্তার ও জটিলতার প্রয়োজন চিত্রিত করেছেন রমেশচন্দ্র। টোডরমল্ল আকবরের সময়ে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। তার বিরুধে জমিদার অমরসিংহ বিদ্রোহ করেছিলেন। এই ঘটনাই উপন্যাসের আকারে কল্পনার সংমিশ্রণে, নানা কাল্পনিক চরিত্র গড়ে তুলেছেন লেখক, তবে চরিত্রগুলি ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

'মাধবী কঙ্কন' (১৮৭৭) বঙ্গবিজেতার তিনবছর পরে প্রকাশ পায়। বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে শাহজাহানের সময়কাল। ইতিহাসের পরিবেশ রচনায় চমৎকার দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন রমেশচন্দ্র, তাই রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ইতিহাসের পরিবেশ রচনায় চমৎকার দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন রমেশচন্দ্র, তাই রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ইতিহাস রস বলেছেন, তার স্বাদ অনুভব করা যায় এখানেও। ঘটনায় ইতিহাসের চরিত্র না নিয়ে সাধারণ চরিত্রই নিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ নামক একজন জমিদার তার এক কর্মচারীর চক্রান্তে হারালেন তার জমিদারী, হেমলতার সঙ্গে তার ভালোবাসা সফল না হয়ে, শাহজাহানের পুত্র সূজার দরবারে এসে উপস্থিত হলেন, তারপর বৃধ শাহজাহাদের পুত্রদের মধ্যে গণ্ডগোলে কি ভাবে জড়িত হলেন, সেই ঘটনা এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

'বঙ্গবিজেতা'র সময়কাল ১৫৮০ সন, আকবরের আমল চলছে তখন; মাধবীকঙ্কন-এর ঘটনা শাহজাহানের সময় কালের, ১৬৫৪; 'জীবনসন্ধ্যার' সময় কাল ১৫৭৬ সন, জীবন প্রভাত ১৬৬৩ সন; চারটি উপন্যাসের সময়কাল বিস্তৃত ১০০ বছরের। আকবর থেকে শিবাজী। ''এই শতবর্ষের বিশেষ ঘটনা—আকবরের প্রভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, রাজপুত শক্তির জীবনসন্ধ্যা এবং আওরঙ্গজেবের সময়ে শিবাজীর প্রবাবে মহারাষ্ট্র-শক্তির জীবনপ্রভাত। এই চারিখানি উপন্যাসের লেখক ভারতবর্ষের সন্ধ্যা প্রভাত সন্ধি বিগ্রহের শতবর্ষকে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর সেই উপলক্ষে, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে তাঁহাকে পর্যটন করিতে হইয়াছে।

(প্রমথনাথ বিশী/রমেশ রচনা সম্ভার/মিত্র ও ঘোষ)

'সংসার' ১৮৮৬ সনে; 'সমাজ' ১৮৯৪ সনে প্রকাশিত হয়। দুটিই তাঁর সামাজিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সামাজিক উপন্যাস লেখাতেও অনুপ্রাণিত করেছিলো, আবার বাল্যবিধবা ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে উপন্যাস রচনা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তাঁরই কথায়—

On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the devided and enfeebled nation, and we should established this principle (as well as widow-marriage etc) safely and securely in our little society, so that the greater Hindu society, of which we are only a portion and the advance guard, may take heart and follow.

বিধবাবিবাহের সমর্থনে, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে উপন্যাস লেখা বেশ দুঃসাহসিক কাজ ছিল সেকালের পক্ষে, কেননা বঙ্কিমচন্দ্র ও তা করে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতই দেশের ঐতিহ্যের প্রতি রমেশচন্দ্রের শ্রধা ছিলো, ছিলো আকর্ষণ। সংসার ও সমাজ থেকে। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন; তিনি প্রগতিমূলক সমাজ সংসারের পক্ষপাতি ছিলেন, বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন কাম্য মনে করিতেন। ইংরেজী শিক্ষা ও প্রাচীন শিক্ষা, নূতন নাগরিক সভ্যতা ও প্রাচীন গ্রাম্য সমভ্যতা এই দুই ধারার মধ্যেই ভালোমন্দ আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল, কোনোটাকেই সর্বথা ত্যাজ্যা বা গ্রাহ্য মনে করিতেন না, বা কোনো এক ধারাকে অবলম্বন করিয়া আমরা চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিব মনে করতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমাজের কল্যাণ শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ ধারার উপরে নির্ভর করে না, করে ব্যক্তির মনুষ্যত্বের উপর।

রমেশচন্দ্রের চরিত্রে এই ব্যক্তিত্ব ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা ছিলো। তিনি সংসার ও সমাজ উপন্যাসে সেই ব্যক্তিত্বের ও মানুষের স্বাধীন জীবনচর্চার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতির পরিচয় দিয়েছিলেন।

রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, বই দুটি ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে রচিত, কোথাও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, তবে তা উপন্যাসের রসসৃষ্টির দরকারে। তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ ছিলো দেশপ্রেমে। তাছাড়া তিনি ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি ছিলো অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন কৃতী, দেশের ইতিহাসও তিনি গভীর ভাবে পড়েছিলেন। এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতে কাজ করেছিলো।

'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' যথার্থ অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস। মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায়ে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রের জাতীয় জীবনে ঘটেছিলো জাগরণ, জাতীয় জাগরণ শিবাজীর নেতৃত্বে; ইতিহাসের এই জীবন্ত অধ্যায়কে অবলম্বন করে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি।

রাজপুত জীবন সন্ধ্যার বিষয়বস্তু হলো মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় রাজপুতজাতির গৌরবময় দিনগুলো কি ভাবে অস্তমিত হয়, তাঁরই বেদনা বিষাদ।

এই দুটি উপন্যাস সম্পর্কে 'বাংলা উপন্যাসের ধারা'র লেখক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন।

মহারাষ্ট্রের উত্থান ও রাজপুতের পতন ভারত ইতিহাসের দুইটি কীর্তিভাস্বর পৃষ্ঠা; এই দুটি পৃষ্ঠাতে যত অনুপম বীরত্ব, যত উচ্চ ও পবিত্র হৃদয়াবেগ, যত গৌরবময় অনুভূতি লইয়া ইতিহাসের তুষার শীতল পাষাণদলকে নিশ্চল হইয়াছিল, রমেশচন্দ্র সেগুলিকে কল্পনার শিখায় দ্রবীভূত করিয়া মানব মনের সজীবভাব প্রবাহের সহিত তাহাদের পুনর্মিলন সাধন করিয়াছেন। শিবাজীর কর্মরত ও মহত্বদীপ্ত চরিত্র, তাঁহার রাজনৈতিক কুশলতা, লোমহর্ষক সংগ্রাম, নবজাগ্রত মহারাষ্ট্রীয় জাতির বিপুল উদ্দীপনা এ সমস্তই মহারাষ্ট্রীয় জীবন প্রভাতে এক একটি বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দুটি রাজনীতি নির্ভর বা ইতিহাস নির্ভর উপন্যাসই পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্ভব যুগে জাতির জীবনে প্রেরণা সঞ্চারের করেছে, বিশেষ করে যে সব ঐতিহাসিক নাটক বাংলার স্বাধীনতা বোধকে উদ্দীপ্ত করেছে, তাদের পশ্চাতে ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল দিকটি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র। এই দিক থেকে তাঁর অবদান স্বীকার করতেই হবে। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য অবদানের প্রশ্নে ডঃ সুকুমার সেন তার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ২ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ

রমেশচন্দ্রের লেখায় খুব ধার ছিল না, সেইজন্য গল্পরস জমিতে পারে নাই। তবে রমেশচন্দ্র বাঙ্গালা রোমান্সে নূতনত্বের আবির্ভাব করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে গল্পকাহিনীর সংযোগ দৃঢ়তর করিয়া দিয়া তিনি বাঙ্গালা রেমান্সে বৈচিত্র্য ঘটাইলেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহাসের মর্যাদা যথাসম্ভব রক্ষিত।''

সুতরাং বলা যায়, প্রথমে দ্বিধা নিয়ে বাংলা সাহিত্য প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলেও রমেশচন্দ্র কিন্তু প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতে ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্স রচনায়। তাঁর লেখায় গল্পরস বঙ্কিমচন্দ্রের মতন ছিলো না বটে, তবে তিনি ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনায় যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, সন্দেহ নেই।

৬.৭ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের সাহিত্যে নির্দোষ হাস্যরসের পথিকৃৎ বলা চলে। একটা কথা বলা হয়, বাঙ্গালীর হাসতে জানে না, সব ব্যপারেই তারা সিরিয়াস বা ভাবগম্ভীর। অন্তত, সাহিত্যে একথা খানিকটা সত্যি। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যগুলিতে হাস্যরস যথেষ্ট রয়েছে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় কিছু নিদর্শন রয়েছে। নিছক হাস্যকৌতুক আমরা দেখি বঙ্কিমযুগের লেখক ত্রৈলোক্যনাথের রচনায়।

কতো ধরনের হাসির কারণ যে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে থাকে, কারণে অকারণে হাস্যরসের সৃষ্টি করি আমরা, সচেতন ভাবে কতোটুকুই বা মনে রাখি? সাধারণ হাসি, মজা, তামাশা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক ভাড়ামি, কখনো কথার মধ্য দিয়ে, কখনো আচরণের দ্বারা আমরা তৈরী করি উপভোগ করি। সমস্ত হাস্যরসের উদ্ভব ঘটে আচরণ বা কথার অসঙ্গতি থেকে; নিজের কথা বা আচরণের অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়ে না, পড়ে অপরের, আর তা থেকেই সৃষ্টি হয় হাস্যরসের।

উদ্ভট ঘটনা বা চিন্তা থেকেও হাস্যরসের চমৎকার নিদর্শন দেখি। আমাদের সাহিত্যে, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। তার ফোকলা দিগম্বর, ডমরুচরিত', লুল্লু, কঙ্কাবতী, মুক্তামালা ইত্যাদি অসাধারণ হাসির উৎস ও বিস্তার। আমাদের সাহিত্যের সাধারণ চরিত্র, ভাবগাম্ভীর্য, প্রায় প্রধান লেখকগণ এঔই ভাবগম্ভীর লেখাই লিখেছেন; ত্রৈলোক্যনাথ তা লেখেননি বলে, আমরা তাকে অভিজাত লেখকের মর্যাদা দিইনি দীর্ঘকাল। আজ কাল, বেশ কিছু পাঠকের কাছে আবার তিনি সমাদর লাভ করছেন। নতুন করে।

অসম্ভব দুঃখকষ্ট ত্রৈলোক্যনাথের জীবন শুরু। ২৪ পরগণার শ্যামনগরের কাছে রাহুতা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১২৫৪ সালে (১৮৪৭) তাঁর জন্ম। 'বঙ্গবাসী কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, শৈশবে খুবই দুরন্ত ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। ছেলেবেলাতেই....' ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেই মনগড়া একরূপ ভাষার সৃষ্টি করিয়া সম্পূর্ণ নতুনতর এক বর্ণমালা আবিষ্কার করেন।' নিজের মনে গান, হেয়ালি, শ্লোক লিখে কাঠের ফলকে ও মাটির চাকতিতে তা ছেপে রাখতেন। অর্থাৎ সৃষ্টির তাড়না ছেলেবেলা থেকেই ছিলো।

পড়াশুনো গ্রামের পাঠশালা থেকে নানা স্কুলে। শৈশবেই বাবা মা, মারা যান। অত্যন্ত দারিদ্রে নিষ্পেশিত হতে থাকেন। এঔকটু বাচবার মতন আশ্রয়ের জন্যে অনেক স্থানে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়, সঞ্চয় করেন বিশাল অভিজ্ঞতা। পরিণত বয়সে ভারত গভর্ণমেন্টের উচ্চপদে চাকরী পান ত্রৈলোক্যনাথ। ভারতের নানা উৎপন্ন পণ্য, অর্থনীতির নানা বিষয়ে তাঁর ছিলো গভীর অভিজ্ঞতা, পড়াশুনো। তিনি ইল্যান্ড, ইওরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করেন। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে তিনি পুরীতে বাস করতে থাকেন, সেখানেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ত্রৈলোক্যনাথের রচনা

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ নয়, উদ্ভট-রসের লেখক ত্রৈলোক্যনাথ, যার দক্ষতা এমনই যে এই লেখককে অন্য কেউই অনুকরণ করতে পারবে না, পারেওনি।

বেশিরভাগ লেখাই 'বঙ্গবাসী' এওবং 'জন্মভূমি' পত্রিকায়। গল্প-কাহিনী ছাড়া গবেষণাধর্মী লেখা তিনি লিখেছেন। আমাদের আলোচ্য ত্রৈলোক্যনাথের রসরচনা। কঙ্কাবতী ১৯৯২ (উপন্যাস); ভূত ও মানুষ (গল্প) ১৮৯৬।

ফোক্‌লা দিগম্বর (সামাজিক উপন্যাস) ১৯০১; মুক্তামালা (উপন্যাস) ১৯০১; ময়না কোথায় (উপন্যাস) ১৯০৪; মজার গল্প (১৯০৬); পাপের পরিণাম (উপন্যাস) ১৯০৮; ডমরুচরিত (গল্প) ১৯২৩;

সাহিত্য সাধক চরিতমালায় ত্রৈলোক্যনাথের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে বলা হয়েছেক্ত

ত্রৈলোক্যনাথকে আদর্শ করিয়া পরবর্তীকালে বাংলা দেশে ব্যঙ্গ ও আজগুবি রসের ক্ষেত্রে কয়েকজন সাহিত্যিক খ্যাতনামা হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ত্রৈলোক্যনাথ স্বয়ং তাহার য়থায়োগ্য আসন পান নাই। ....য়দি কেহ তাঁহার 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'ডমরু চরিত' প্রভৃতি পুস্তিকাগুলি পাঠ করেন, তাঁহারা নিঃসংশয়ে বাংলা সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন রসের সন্ধান পাইবেন। বাংলা ভাষায় এমন আজগুবি ও ভুতুড়ে গল্প আর কেহ রচনা করিতে পারেন না। ত্রৈলোক্যনাথের ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। ইংরেজী শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত এমন একজন পন্ডিত ব্যক্তি য়ে কেমন করিয়া এমন সহজ সরল সরস বাংলা লিখিতে পারিলেন, তাহা, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। য়াঁহার কর্মোদ্যম ও পান্ডিত্য একদিন বিশ্বকোষ' রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল তিনিই বাংলা দেশের বালক বালিকা এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের অবসর বিনোদনের জন্য এমন বিচিত্র কাহিনী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, য়াহার জুড়ি আজ পর্য়ন্ত মিলিল না। ত্রৈলোক্যনাথের রচনার বিশেষত্ব এই য়ে এইগুলি সরল হইয়াও নির্দোষ। তাঁহার পূর্বে এরূপ নির্দোষ রসিকতা আমরা কল্পনা করিতে পারিতাম না।''

কবি অজিত দত্ত ত্রৈলোক্যনাথের স্থান সাহিত্যে কোথায়, বিশেষ করে হাসির রস পরিবেশনে, বলেছেন.... ''ব্যাঙ্গাত্মক ও হাস্যরসাত্মক রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র য়ত উচ্চাদর্শই রক্ষা করে থাকুন, বঙ্কিম য়ুগের ব্যঙ্গ অধিকাংশই অসূয়া প্রণোদিত, সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন এবং অপরিচ্ছন্ন। তাই সেই সাহিত্যিকে পরিবেশে ত্রৈলোক্যনাথের মত মানবসহানুভূতিপূর্ণ, পরদুঃখ কাতর, উদার ও সংস্কারবর্জিত একটি মন এবং সেই সঙ্গে প্রভূত এবং অতুলনীয় হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতার অপূর্ব সমন্বয় প্রকৃতই বিস্ময়কর মনে হয়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' চিন্তাশীল সুরসিক এওক ব্যক্তির সামাজিক ও ব্যক্তিক নানা অসঙ্গতির আলোচনা রঙ্গ ব্যাঙ্গ কৌতুকের চমৎকার সমন্বয়। ত্রৈলোক্যনাথ নিছক হাস্য রস সৃষ্টি, য়েখানে বিদ্রূপ নেই, সমালোচনা নেই, শ্লেষ নেই। ফ্যান্টাসি, বাংলায় য়াকে উদ্ভট বলা য়েতেপারে, সেখানে রূপকথার অদ্ভুত পরিবেশ রয়েছে, রয়েছে সামান্য ব্যঙ্গ ও কৌতুক, য়া কাউকে আঘাত করে না, বরং সমবেদনায় সিক্ত করে, সেরকম কল্পনাজড়িত বাস্তবতার নির্মল শুভ্র হাস্যরস সৃষ্টি করেন। ত্রৈলোক্যনাথ।

'কঙ্কাবতী' রচনাটি সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন 'তাঁহার কঙ্কাবতী (১২৯৯ সাল) বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন একটা দিক খুলিয়া দিল য়ে দিকে আমাদের সাহিত্য রথীদের গতিবিধি কখনো ছিলনা।''

খুব সংক্ষেপে গল্পটি এরকম, য়ে ''কঙ্কাবতীর ভাই একটি আম এনে দিব্যি দিয়ে বলেছিল, আমটি য়েন কেউ না খায়, য়ে খাবে কঙ্কাবতী তাকে বিয়ে করবেন। একটি অঘটন ঘটে গেলো। শিশু কঙ্কাবতী সেটা খেয়ে ফেললো

না জেনেই। কঙ্কাবতীর তো মহাবিপদ। উপায় না দেখে গ্রামের শেষে প্রবাহিত নদীতে একটি নৌকায় চড়ে বসলো সে। ভাইকে সে কি ভাবে বিয়ে করবে? এ জন্যেই।

গল্পটি আমাদের দেশের ছেলে ভুলোনো ছড়ায় উল্লেখিত আছে। লেখক তাকে লুইস ক্যারলের অ্যালিস ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড উপন্যাসের আদর্শে একটি অদ্ভুত উপন্যাস লিখলেন। উদ্ভট কল্পনা অবলম্বনে অদ্ভুত রস সৃষ্টি করলেন তিনি যেখানে 'লেখকের সকৌতুক স্নিগ্ধ কটাক্ষে সঞ্জীবিত মানুষ-পশু-ভূত-প্রেতিনী সকলে সম্ভব অসম্ভবের রাজ্যে অবিরোধে পরস্পরের পরম আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে। (ডঃ সুকুমার সেনম্ববাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ২)

ডমরুচরিত-এ হাস্যরসের স্রোত বয়ে গেছে। ডমরু চরিত্রটি অসাধারণ মৌলিক। তিনি এই রচনায় ব্যাঙ্গ কৌতুকের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, সংগে করুণমাধুর্য। একটির পর একটি গল্প ত্রৈলোক্যনাথের বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার বিস্তার, মাধুর্য ও তিক্ততার শিল্পিত পরিচয় বহন করছে। মানুষের চরিত্রের নানাদিক, যেমন স্বার্থপরতা, অপরের সঙ্গে শঠতা করার প্রবণতা, সামাজিক নানা মিথ্যাচারকে ব্যাঙ্গে বিদ্ধ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ, তেমনি এই সবই জীবন্ত মানুষেরই চরিত্র, এমন একটি জীবনবাদী দৃষ্টি তুলে ধরেছেন, যা জীবনেরই স্বাদ বৈচিত্র্য এনে দেয়।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডমরু ধরের চরিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ তাঁহার উদ্ভটগল্পর ভিতর দিয়ে তাহার চরিত্রের যেরূপ অপূর্ব বিকাশ হইয়াছে তাহাই আমাদিগকে বেশী আকৃষ্ট করে। গল্পরসের সহিত চারিত্রিক পরিচয় মিশ্রিত হইয়া পরস্পরের উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে।''

কাহিনী গুলির কল্পনার অসামান্য দাম, ডমরু চরিত্রেকে অবলম্বন করে জীবনের নানা দিক, কূটবুদ্ধি, বীভৎসতা, আত্মপ্রসাদ সুসঙ্গত রূপ নিয়েছে। এ যেনো জীবন মন্থনকরে অমৃত তুলে এনেছেন লেখক। ডমরু চরিত্রের সমতুল চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আর নেই। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। ডমরুধর পৃথিবীর ব্যাঙ্গসাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি।

'ফোকলা দিগম্বর' আর একটি উপভোগ্য কাহিনী। ত্রৈলোক্যনাথের বর্ণনা অত্যন্ত সরস, ভাষা মনে হয় আজকের ভাষা। কোথাও জড়তা নেই, সাধুভাষার গুরু গাম্ভীর্য নেই।

বিয়ে পাগলা দিগম্বরের স্ত্রী দিগম্বরী ক্রিয়া কলাপ ও চেহারার বর্ণনা পড়েই হাসি সম্বরণ করা যায় না।

'চওড়া সস্তাপেড়ে শাড়ি তিনি পড়িয়াছিলেন, 'মুখখানি তাহার বড় একটি হাড়ির মতছিল। সেই হাড়ির মধ্যস্থল—উচ্চ নাসিকাদ্বারা, দুই পার্শ্ব দুই ঢলের অস্থি দ্বারা, নিম্নদেশ মুখগহ্বরের দ্বারা, আর তাহার উপর কতকগুলি বড় বড় গোফের কেশ দ্বারা সুশোভিত ছিল।' ভূত ও মানুষ (১৮৯৭)-এর গল্পগুলি 'জন্মভূমি' পত্রে বেরিয়েছিলো। এই বই-এর 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পটি ভিকটর উগোর টয়লাস অব দি সী উপন্যাসের ছায়ায় লেখা।

মুক্তামালা' (১৯০১)র গল্পগুলিও লেখকের রঙ্গব্যঙ্গ কৌতুকের সম্ভার। ভাষা ও উপস্থাপানা এমন সুন্দর যে পড়তে বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না। ভূতের গল্পও কতো রোমহর্ষক অথচ আনন্দদায়ক হতে পারে 'পূজার ভূত' গল্পটি তার প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' উৎকৃষ্ট হাসির রচনা, বলা যায় গদ্যে এরকম উন্নত মানের হাস্যরসাত্মক রচনা এর আগে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়নি।

ত্রৈলোক্যনাথের রচনাও এমন স্তরের, তাকে অনুকরণই করা যায় না। তাঁর তুলনা তিনিই। পরবর্তী কালে উন্নতমানের হাস্য রসাত্মক গল্প লিখেছেন পরশুরাম বা রাজশেখর বসু, লিখেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, সাম্প্রতিক কালের সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। এই সব ক্ষমতাবান লেখনের পথপ্রদর্শক য়ে ত্রৈলোক্যনাথ, তাতে সন্দেহ নেই। এমন কি সুকুমার রায়ের উদ্ভট রসের কবিতা ও পদ্যের উৎস খুঁজলে ত্রৈলোক্যনাথে য়েতে হবে। একটি বিশেষ ধারায় এঔকজন অননুকরণীয় লেখক হয়ে থাকা কি সামান্য কথা' ত্রৈলোক্যনাথ সেই দিক থেকে অসামান্য।

৬.৮ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এক সময়, একটি মাত্র উপন্যাস লিখে প্রচণ্ড সাড়া ফেলে দিয়ে ছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন তিনি। 'স্বর্ণলতা' নামক উপন্যাসের লেখক রাতারাতি বিখ্যাত, কারণ সাধারণ সংসারের এমন বাস্তবধর্মী লেখা তখনো হয়নি বলে। এমন কথাও সেসময় 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু' নামক পত্রিকা 'স্বর্ণলতা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিল য়ে স্বর্ণলতাই বাংলার একমাত্র খাঁটি উপন্যাস; বঙ্কিমের বইগুলো উপন্যাস নয় কাব্য।

This is the only true novel we have reading Bengali, Babu Bankim Chandra's works being poem, not novels ; and we therefore glad that it has passed through its third edition.

কপালকুণ্ডলা, রজনী, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল য়ে লেখক লিখেছেন, তিনি কি শুধুই কল্পনা-নির্ভর কবি; ঔপন্যাসিকের বাস্তবজ্ঞান তাঁর নেই? আর উপন্যাসটি শুধু ঘরোয়া দৈনন্দিনের বর্ণনা মাত্র? তাঁর শিল্প প্রকরণ নেই? সেই শিল্প প্রকরণ, কল্পনা প্রতিভা আর বাস্তবজ্ঞানের সঙ্গে দার্শনিক উপলব্ধি বঙ্কিমের রচনাকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, শুধু সংসারের ঘরোয়া সাদামাটা গল্প কথা স্বর্ণলতা'কে নিয়ে সেকালে এঔমন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিলো কি করে।

এঔকথা সত্যি, 'স্বর্ণলতা' তারকনাথকে প্রভূত জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিলো। এবং এই একটি মাত্র উপন্যাসের জন্যে তিনি আজও বাংলা সাহিত্যের উল্লেখয়োগ্য ঔপন্যাসিকদের তালিকায় রয়েছেন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বাগ আঁচড়া গ্রামে এঔক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ অক্টোবর তারকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনো গ্রামের পাঠশালা, কলকাতার লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুলে, তারপর মেডিকেল কলেজে। জীবনের শেষ দিনপর্য্যন্ত তিনি খ্যাতির সঙ্গে ডাক্তারী করেছেন। তিনি য়খন ডাক্তারী পড়ছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়। এঔই রোমান্সধর্মী রচনাটি তারকনাথকে তৃপ্ত করেনি তিনি সেই সময়ই বাস্তবঘটনা ভিত্তিক উপন্যাস, য়া বাঙালী সমাজের ছবিতে পূর্ণ, লিখতে মনস্থ করেন। ডাক্তারী কাজে নানা জায়গায় ঘুরেছেন, বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, অর্জন করেছেন মানুষের বিচিত্র চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

সেই সব অভিজ্ঞতার সাহায্যে লিখলেন 'স্বর্ণলতা' প্রায় সমস্ত চরিত্রই বাস্তব থেকে নেওয়া লিখতে শুরু করার ও শেষ করার মধ্যে অনেক দিনের পার্থক্য ছিলো না। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই স্বর্ণলতা রচনা শেষ হয়, জানা যাচ্ছে। ডাইরিতে লিখেছেন Finished my tale in the evening at about 8 PM. It was melancholy pleasure to see it Completed as I was to part Company with my friends for ever, Monday 7th for 1873.

রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থেকে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা বের করতেন শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয়। 'স্বর্ণলতা' প্রথম থেকেই পাঠকদের মধ্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়া লেখকের অন্যান্য গল্প প্রবন্ধ জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হয়। 'স্বর্ণলতাই বেশি খ্যাতি লাভ করে, তুলনায় তাঁর অন্যান্য উপন্যাস অতিসাধারণ স্তরের।

স্বর্ণলতার গল্পাংশ দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ সরলার মৃত্যু পর্যন্ত প্রসারিত, এবং দ্বিতীয় অংশে তার পরবর্তী ঘটনাবলী। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, ''এই উপন্যাসে ত্রিবিধ আকর্ষণসূত্র অনেকটা শিথিল গ্রন্থনে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে।''

তাঁর ব্যাখ্যা এরকম প্রথমে দেখানো হয়েছে পারিবারিক ক্ষেত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের বিপরীতমুখী প্রকাশ। দ্বিতীয় অংশে পথিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তৃতীয় অংশে দৈবের সাহায্যে পাপের শাস্তি, ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তাঁর সিদ্ধান্ত ঃ উপন্যাসখানি একদিকে বস্তুধর্মী, অপরদিকে নীতিতে আস্থাশীল ও রোমান্স-কৌতূহলী।'

য়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা শক্তি ও রোমান্সধর্মিতাকে তারকনাথ পছন্দ করতেন না, য়িনি বলেছেন, তার অনেকগুলি চরিত্রই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, বাস্তব জগৎ থেকে নেওয়া হয়েছে (some character of my novel are from the real life'). তিনিও রোমান্সের হাত থেকে পরিত্রাণ পাননি। আসলে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলেই লেখক হওয়া যায় না, তাই চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা, তার জন্যে চাই কল্পনা প্রতিভা, চাই নির্মাণ করার মতন শক্তিসামর্থ। বঙ্কিমের তা ছিলো প্রভূত পরিমাণে, তার সঙ্গে তাঁর কোন বাঙালী ঔপন্যাসিকের তুলনা চলে?

বাঙালীর পারিবারিক জীবনে তেমন রোমান্স নেই, নাটকীয়তা নেই, বড়ো কোনো ঘটনার অভিঘাত নেই। শান্ত নিরুপদ্রব জীবন একটানা বয়ে চলেছে। সেই সরল সাধারণ দৈনন্দিনের, অতিচেনা পারিবারিক মানুষগুলোর জীবনের পরিচিতি বাস্তব ছবি তারকনাথ 'স্বর্ণলতায়' তুলে ধরেছেন। ক্যালকাটা রিভিয়ুতে বলা হয়েছিলো। বাঙালীর গাহস্থ্য সাধারণ জীবনের ছবি এওঁকেছেন লেখক, বাস্তবের চেনামানুষের চরিত্র, অতিসাধারণ সংসারের ছবি, এওসব স্বর্ণলতা'র লেখক, বাবু তারকনাথ লিখেছেন বলে, তারকনাথ 'is without a rival among Bengali writers of fiction.' তিনি মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষক ছিলেন, তার একান্ত নিজস্ব একটি রচনা বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি অতিসাধারণ বিষয়কেও খুব উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পারতেন। চরিত্র হিসেবে প্রমাদ, সরলা, গদাধর, নীলকমল, শ্যামা, শশাঙ্কশেখর, এই বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর পারিবারিক জীবন, ভ্রাতৃবন্ধুদের কলহের ফলে পরিবারের ভাঙন— প্রধানত এই পটভূমিকায় শশিভূষণ ও বিধূভূষণের একান্নবর্তী পরিবারের ঘরোয়া সমস্যাই ইহার প্রধান বর্ণনায় বিষয়। ইহার সজীব বাস্তবচিত্র, একান্নবর্তী পরিবারের ঘরোয়া সমস্যাই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহার সজীব বাস্তবচিত্র, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনধরা জীর্ণ নয়, একদিকে প্রমদার স্বার্থপরতা, নির্মমতা, ক্রুরতা, আর একদিকে সরলার আদর্শ নারী চরিত্র, একদিকে দারিদ্র দুঃখের বর্ণনা, আর একদিকে গদাধর চন্দ্র ও নীলকমলের হাস্য পরিহাস সে যুগের পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। প্রাত্যহিক বাঙালী জীবনের প্রাণরসোজ্জ্বল পরিচয় এবং মনোরম স্নিগ্ধ রচনা লেককেকে প্রায় অমরত্বের কোঠায় লইয়া গিয়াছে।

সেকালের পাঠকদের কাছে আজকের শরৎচন্দ্রের মতন জনপ্রিয় হয়েছিলেন তারকনাথ। কারণ, ঐ ঘরোয়াকথার, সাধারণ জীবনকথার লেখক তিনি। প্রশংসা পেয়েছেন পাঠকের কাছে, সমালোচকদের কাছে। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় তিনি শ্রেষ্ঠ তাও বলা হয়েছে।

কিন্তু প্রতিদিনের সাধারণ সংসারের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনের সাফল্যই স্বার্থক উপন্যাসিক হবার এওকমাত্র শর্ত নয়। চাই চরিত্রের সর্বজনগ্রাহ্য রূপ, টাইপ চরিত্র হলে চলে না। চরিত্রের আলো আঁধারী রহস্য উন্মোচন, তাঁর জন্যে মনের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা চাই, অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে হয়, য়েমন বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রধান চরিত্রগুলিতে রয়েছে, তারকনাথের স্বর্ণলতায় তা সার্থক হয়নি। কোনো চরিত্র পুরোপুরি ভালো, কোনোটি পুরোপুরি খারাপ, এমন ভাবে এওকেঁছেন তারকনাথ, তাছাড়া উপন্যাসিক বিশিষ্ট জীবন দর্শন সৃষ্টিকে মহনীয়তা দান করে, তারকনাথের বিশেষ কোনো জীবন দর্শনও ফোটেনি 'স্বর্ণলতা'য়। তবুও পারিবারিক জীবনের আলেখ্যরূপে তার বিশেষ মূল্য রয়েছে।

অন্যান্য উপন্যাস 'হরিষে বিষাদ', 'তিনটি গল্প' অদৃষ্ট', 'বিধিলিপি' লিখেছিলেন তারকনাথ। এওই রচনাগুলিতে বিশেষ কোনো বিশিষ্টতার পরিচয় নেই।

৬.৯ মীর মোসারফ হোসেন

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতই একটি রচনার জন্যে মোশারফ হোসেন বাংলা ভাষায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এটিও উপন্যাস, তবে পারিবারিক বা ইতিহাস আশ্রিত বা শুধুই রোমান্সধর্মী লেখা নয়; এ হলো ইসলাম ধর্মের এক করুণ কাহিনী, হাসান হোসেন আর এওজিদের কাহিনী; কিন্তু রচনার প্রসাদগুণে সকলের উপভোগ্য; পড়তে শুরু করলে ছেড়ে দেওয়া কঠিন।

তাঁর কৃতিত্ব সমকালেই স্বীকৃতি পেয়েছিলো, সম্মান পেয়েছিলো, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছিলেন—

মীর সাহেবের পূর্বে মুসলমান লিখিত বঙ্গসাহিত্যে কবিতা ছিল, পড়িবার মত গদ্য ছিল না। এখন অনেকে সুখপাঠ গদ্য গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, মুসলমান গদ্য লেখক বর্গের মধ্যে এওখন পর্য়ন্তও মীর সাহেবসর্ব প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক বলিয়া পরিচিত। ইনি অদ্যাপি সাহিত্য সেবায় ব্যাপৃত আছেন।

'বিষাদ সিন্ধুর' লেখক মোশারফ হোসেনের জন্ম নদীয়া জেলার লাছিনাপড়া গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর।

গ্রামের পাঠশালা, কুষ্টিয়ার ইংরেজী বাংলা স্কুল হয়ে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে, পরে কলকাতার চেতলায় পিতৃবন্ধুর পড়াশুনো করেন।

কর্মজীবনে মোশারফ জীবনের বেশিরভাগ সময় ফরিদপুরের নবাবের এবং দেলদুয়ার এস্টেটে উচ্চপদে কাজ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার আগ্রহ ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ছোটো ভাই শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর'-এর তিনি ছিলেন কুষ্ঠিয়ার সংবাদদাতা। কুমারখালি থেকে হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) য়ে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ করতেন, মোশারফ হোসেন সেখানেও প্রতিসপ্তাহে লিখতেন।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৬৫ সালের মে মাসে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম।''

(আত্মকথা)

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকার' কাঙাল হরিনাথ ছিলেন মোশারফের সাহিত্য গুরু। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর সাহিত্য জীবনের শিক্ষা পর্ব নিয়ে লিখেছেন য়ে হরিনাথের পত্রিকা ও সংবাদ প্রভাকরে লিখে লিখে তিনি লিখতে পাকা হয়ে নিজেই বের করেন 'আজিজন নেহার' নামক এঔকটি সংবাদ পত্র। আর এই পত্রিকাটিই মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত প্রথম বাংলা পত্রিকা বলে পরিচয় লাভ করে। তার পর থেকে অনেক বই লিখেছেন হুশেন সাহেব। কুষ্টিয়া ছিলো সেকালে নীল বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র তার সঠিক কাহিনী লিখে প্রকাশ করেন মীরসাহেব 'উদাসীন পথিকের মনের কথা নামক বিচিত্র উপন্যাস লিখে ফেললেন। এটা তার মনের কথা। একজন পল্লী গ্রামের মুসলমান লেখক ঘটনাচক্রে পড়ে সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তার বর্ণনা চমৎকার। মৈত্রেয় লিখেছেন য়ে তার ঐ লেখা লেখার সময় দেশের কাগজ, মুদ্রায়ন্ত্র ছিল না, ছিলো দু' চারটে বাংলা স্কুল, দু চারটি কলেজ, দু' দশটি ভালো বই। ''এঔকজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহুবাধা বিঘ্ন বর্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মোশারফ হোসেন য়ে সাহিত্য শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্পসমাদর বিষয় নহে। (প্রদীপ, পৌষ, ১৩০৮) (সাহিত্য সাধক চরিতমালা' দ্বিতীয় খণ্ড)।

গদ্য আর কবিতার বই এঔর সংখ্যা প্রায় পঁচিশটি। তাঁর পদ্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এঔ লিখেছিলেন—

গ্রন্থখানি পদ্য। গদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরনীয়। বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক— পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় য়ে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য জন্মে।'

'....জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। অতএব মীর মোশারফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।

'বিষাদসিন্ধু' বইটি পড়া এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। সাহিত্যপাঠের আনন্দ অনুভূতি লাভ করাই এই অভিজ্ঞতা। বইটি তিনপর্বে বিভক্ত। মহরম পর্ব। উদ্ধার পর্ব। এজিদ পর্ব। ১৯৮৫ থেকে ৯১এঔ প্রকাশিত।

মুখবন্ধ চলতি ভাষায় এরকম ঃ

চান্দ্রমাসের বছরের প্রথম মাসের নাম মহরম। হিজরী ৬১ সালের ৮ই মহরম তারিখে মদিনার অধিপতি

হোসেন ঘটনা চক্রে কারবালায় সপরিবারে আসেন। এজিদের পাঠানো সেনাদের হাতে সেখানে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই শোচনীয় ঘটনা মহরম নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে.....। পারস্য এবং আরব্য গ্রন্থ থেকে মূল ঘটনার সারাংশ নিয়েই বিষাদ সিন্ধু রচনা করা হয়েছে।..... মহরমের মূল ঘটনাটা বঙ্গভাষা প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাতের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

সেকালে এই বইটি কিরকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো, তার কিছু প্রতিক্রিয়া।

'গ্রন্থকর্তা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেক গুলো গ্রন্থ লিখিয়া এবং গতজীবন 'আজিজন নেহার' সম্বন্ধে পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যনির্বাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তন্ত বিষাদ সিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ হইয়া বিষাদ সিন্ধু নামের সার্থকতা প্রদান করিয়াছে। ইহার এক একটি স্থান এঔরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। মুসলমান দিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। (গ্রামবার্থা প্রকাশিকা)

ভারতী (ফাল্গুন ১২৯৩) তে লেখা হলো।

''ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গালা য়েমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি য়েমন পরিস্ফুট নায়ক নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সপরিরূপে চিত্রিত। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা দেখিয় বলিয়া মনে হয় না। এঔছাড়া বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯) রচনা করেন। বেহুলা লখিন্দরের অতিপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে নিয়ে রচিত। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) মোশারফ হোসেনের একটি উপন্যাস। মুখবন্ধ তিনি লিখেছিলেন ''গুপ্তকথা, গুপ্ত লিপি, গুপ্ত কাণ্ড, গুপ্ত রহস্য, গুপ্ত প্রেম ক্রমে সকলকেই ব্যক্ত হইয়াছে। 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী' সম্বন্ধে বলা হয়েছে য়ে এরচনা এঔকটি বিচিত্র সমাজচিত্র, সুশোভিত, সুলিখিত উপন্যাস এখানে সকল রসের সমাবেশ ঘটেছে।

'প্রদীপ' (পৌষ ১৩০৮) পত্রে এ বই এর আলোচনা বেরিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিলো 'মফঃস্বলের কথা। মফঃস্বলের ভাষায় লিখিতে গিয়া গাজী মিঁয়া প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক প্রকারের পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে মফঃস্বলবাসী ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকেরই ছবি দেখিতে পাওয়ার য়ায়।

''য়ে লেখনী হইতে 'বিষাদ-সিন্ধু প্রসূত হইয়াছে 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী' ও য়ে সেই লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এঔমন ভাষা, এঔমন ভাব, এমন কাহিনীকৌশল বিন্যাস কৌশল মুসলমান সাহিত্য সেবকদিগের মতে এ পর্য্যন্ত ও কেবল 'বিষাদ-সিন্ধুর রচয়িতাতেই লক্ষিত হইয়াছে।

১৯০১ (১৩১৮) সালে মীর মোশারফের জীবনাবসান হয়। তিনি সমকালের যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছেন। মৃত্যুর বছরই অক্ষয় কুমার সরকার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভাষণে বলেছিলেন....মীর মোসারেফ হোসেনকে আমি কখনও দেখিনাই; তাঁহার বিষাদ সিন্ধু আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম, এঔই সম্মিলনে তাঁহাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করায়া হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিব। শেষ সময়ে শুনিলাম। তিনি এঔখন বিহেস্ত বিহারী। য়াঁহারা কখন মুর্শিদাবাদের মহরমের সময় মর্শিয়াগীতি শুনিয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন, মহরমের আখ্যানকাব্য বিষাদ সিন্ধু কিরূপ প্লাবনী করুণারসে টলটল করিতেছে। আর সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালি হিন্দু লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।

(বসুধা' ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৮)

'বিষাদ সিন্ধুর' সামান্য দৃষ্টান্ত ঃ

রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজবিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্য মধ্যে বিরোধ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে যথাসময়ে অবশ্যই নির্ব্বাস হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দ্দমনীয় তেজও একবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈব-দুর্বিপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম শেষ হইলেও নিরাশ সাগরে ভাসিতে হয় না—আশা থাকে। রাজার মজ্জা দোষে, কি উপযুক্ত মন্ত্রণা অভাবে রাজ্য সামনে অকৃতকার্য় হইলেও আশা থাকে।

একশত বছর আগের এঐমন সরল সুন্দর গদ্য কজনই বা লিখতে পেরেছেন। 'সাহিত্য সাধক চরিত মালা' গ্রন্থে মীর মোশারফের বাংলা সাহিত্যে অবদানের পরিমাণ স্বল্প কথায় পরিবেশন করা হয়েছে য়া সঠিক।

''বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের দান সম্পর্কে য়দি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা চলে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের য়ে স্থান, অন্যদিকে 'বিষাদ সিন্ধু' প্রণেতা মীর মশারফ হোসেনের স্থান ঠিক অনুরূপ। এদেশের মুসলমান সমাজে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্য শিল্পী এঐবং এঐখন পর্য়ন্ত তিনিই প্রধান সাহিত্য শিল্পী হইয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস', বাংলাদেশের ঘরে ঘরে য়েমন এককালে পঠিত হইয়াছিল। 'বিষাদ সিন্ধু' তেমনই আজও পর্য়ন্ত জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়; বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ সম্পদ হিসাবে সমাজেই এই গদ্যকাব্যখানির সমান আদর।''

৬.১০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে আমরা য়েমন জানি, লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে তেমন করে জানিনা। তাছাড়া গল্প উপন্যাসের পাঠক কেউ কেউ তাঁকে 'বোনের মেয়ে' উপন্যাসের জন্যে লেখক হিসেবে জানে। বইটিও আজ দুর্লভ। তাঁর বেশিরভাগ রচনাই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। য়ে দুটি উপন্যাস তিনি লিখেছেন, তার বিষয়বস্তু আধুনিক কালের নয়। হিন্দু বৌধ্ব যুগের ফলত তার আকর্ষণ একালে তেমন থাকার কথাও নয়। তবু বাংলা সাহিত্যে তার কিছু ভূমিকা রয়েছে 'বোনের মেয়ে' লেখকরূপে। আর বহুবিষয়ে প্রবন্ধ তাকে পথিকৃতের সম্মান দিয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৫৩ সনের ৬ই ডিসেম্বর নৈহাটির প্রসিধ্ব ভট্টাচার্য় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তার নামছিল শরৎনাথ। মুর্শিদাবাদের কান্দী স্কুলে, বিদ্যাসাগরের আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনো করেন। তখন থেকে তিনি 'হরপ্রসাদ' নামে পরিচিত হন। অনেক দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে তিনি পড়াশুনো করেছিলেন। তবে সত্যিকারের মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি।

চাকুরী জীবনে নানা বিশিষ্ট পদ অলংকৃত করেছেন য়োগ্যতার সঙ্গে। বাংলা লেখার শুরু সংস্কৃত কলেজের ছাত্র থাকার সময়। বি. এ. ক্লাসের ছাত্র যখন তখন 'ভারত মহিলা' প্রবন্ধ লিখে পুরস্কৃত হন, সেই প্রবন্ধটি ছাপা হলো বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার (১২৮২, মাঘ-চৈত্র, ১৮৭৬ ইং) সংখ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় ছিলেন তখন, আর শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িও কাছাকাছি ছিল। তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেখানে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন দুজনে।

তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা-ভাষা, সাহিত্য, কালিদাসের কবিতার আলোচনা

এবং বৌদ্ধধর্ম, প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হলেন তিনি, তাঁর সঙ্গে বাংলা পুঁথি সংগ্রহ এবং তার তালিকা প্রণয়ন করলেন।

আমরা এখানে তাঁর সৃষ্টিধর্মী কাজের সামান্য কথা বলবার চেষ্টা করছি।

তাঁর উপন্যাস কাঞ্চনমালা (২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬, বঙ্গদর্শন-এ—প্রকাশিত হয়। বেনের মেয়ে (উপন্যাস) ১৩২৬ সাল (২ ফ্রেবুয়ারি ১৯২০); প্রকাশিত হয় 'নারায়ণ' পত্রিকায়। এছাড়া 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'সচিত্র রামায়ণ', 'বাল্মীকির জয়' প্রভৃতি বই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে হরপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ রচনা বলেছেন 'বেনের মেয়ে' বইটিকে। ''এই উপন্যাস চিত্রটিতে দশম-এঔকাদশ শতাব্দের সপ্তগ্রাম অঞ্চলের কাল্পনিক আলেক্য জীবন্ত ইতিহাস হইয়া উঠিয়াছে।''—বলেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে হরপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ রচনা বলেছেন 'বেনের মেয়ে' বইটিকে। ''এই উপন্যাস চিত্রটিকে দশম-একাদশ শতাব্দের সপ্তগ্রাম অঞ্চলের কাল্পনিক আলেখ্য জীবন্ত ইতিহাস হইয়া উঠিয়াছে।''—বলেছেন ডঃ সুকুমার সেন। a

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যেপাধ্যায় বলেছেন, ''বেনের মেয়ে'' বইটিকে। ''এঔই উপন্যাসটি হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ও সমাজ বিন্যাসের বিচিত্র নিদর্শনের অপূর্ব সংগ্রহশালা।'

এক বিষয়বস্তু দশম-একাদশ শতক থেকে সংগৃহীত। উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশ। তখন বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি ঘটেছে; আর অন্যদিকে ঘটছে হিন্দুধর্মের জাগরণ। দশম একাদশ শতকের বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের অন্তরালবর্তী পরিবর্তনের ইতিহাস য়া তথ্যসমৃদ্ধ, তার পরিচয় রয়েছে উপন্যাসে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রভূত জ্ঞান ছিলো ভারতের ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে। তাঁর সঙ্গে প্রাচীন বাংলার গৌরব সম্বন্ধে তার জ্ঞানের সীমা ছিলো না গর্ব বোধ, ছিলো। তিনি এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা 'বেনের মেয়ে' গ্রন্থে ধরা পড়েছে।

কাহিনী অংশটিতে দেখা য়াচ্ছে সপ্তগ্রাম বন্দরের শ্রেষ্ঠ বনিক সাগর দত্ত, তার একমাত্র সন্তান মায়া; আবার আর একটি বিরাট বণিক পরিবারে তার বিয়ে হয়েছে। দুই বংশের প্রচুর সম্পদ, সেই সম্পদের সেই সময়টা বৌদ্ধ ও হিন্দুদের বিরাধের সময়; মায়া-অপহরণকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে, শেষ পর্য়ন্ত বৌদ্ধেরা হেরে য়ায়। আবার হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নৃত্যগীত ব্যবসায়ী মস্করী বঙ্গাধীপের কাছে পুরস্কার দাবী করে, বঙ্গাধীপ রাজি হয়ে তাকে দিলেন ভারতবর্ষব্যাপী নিমন্ত্রণের ভার।

উপন্যাসের নায়িকা বেনের মেয়ে মায়া, তাকে নিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে প্রতিয়োগিতা সে স্বামীর স্মৃতি তন্ময়, হিন্দুধর্মসাধনায় আকৃষ্ট, বৌদ্ধ সংঘের অর্থলোলুপতা ও সহজ সাধনার মধ্যে য়ৌন বিকারের প্রভাব তাকে বুধ্দদেবের প্রতি আনুগত্যকে বিচলিত করেছে। প্রায় বেশির ভাগ রাঙ্গালী হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের — নানা মিশ্ররূপের মধ্যে বেছে নিয়েছে হিন্দু আচার ও ধর্মের শাসন।

'ভারতে দেড় হাজার বছর ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, হিন্দুধর্ম পিছু হটেছে, থেকেছে অবদমিত দশম শতক থেকেই ধীরে ধীরে সেই বৌদ্ধ গৌরবময় য়ুগ পিছু হটতে শুরু করেছিলো, আর সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাব বিস্তার শুরু করেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এঔ প্রসঙ্গে বলেছেন য়ে বৌদ্ধধর্ম বিলোপ হতে থাকলে সাধারণ মানুযের মনের কতকগুলি ভালো গুণ অপসারিত হতে তাকে। ''আর আমরা বাগদী রাজা

ও পদাতিক বাহিনী এবং ডোম অশ্বারোহী সেনা পাইব না। বৌদ্ধধর্মের গণতান্ত্রিক সমতাবোধের মধ্যে হীনবর্ণের য়ে দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ, য়ে উন্নত রাজ্য পরিচালনা কৌশল স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা পরবর্তী যুগে সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হইলে আধুনিক কালে তপশিলী জাতির বিশেষ অধিকারের প্রশ্নই উঠিত না।''

বৌদ্ধদের পতনের কারণ মঠ, বিহার, চৈত্যে দুর্নীতি, ব্যাভিচারের প্রসার। অথচ একসময় ঐ সব প্রতিষ্ঠানই ছিলো শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিক উন্নতমানের কেন্দ্র। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে নিজেদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন য়ে বৌদ্ধ কবিই প্রথম বাংলা কবিতা লিখেছে (প্রসঙ্গত চর্যাপদ বৌদ্ধদের রচনা স্মরণীয়), বৌদ্ধ গায়কই সমবেত গানের প্রবর্তক, পরে য়া কীর্তন গানে পর্যবসিত।

'বেনের মেয়ে'তে গুণীজন পুরস্কার সভার য়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পাণ্ডিত্য, কবিতা লেখার প্রতিভা, তাদের নানা ভাষা জ্ঞান এমনভাবে উপস্থিত করেছেন য়ার ফলে বাংলা দীনহীন দেশ মাত্র থাকে নি, অর্থ সম্পদ ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত একসুন্দর রূপ পেয়েছে।

উপন্যাস য়ে শুধু সমকালের ঘটনা নিয়ে বাস্তবতাকে উপজীব্য করে ঘরের কথা লিখতে হবে, এমন কোনো শর্ত কেউই দেননি। লেখক পুরোনো দিনের হারানো পৃথিবীকে কল্পনা বলে সত্য ও জীবিত করে তুলতেও পারেন। আসলে চাই রচনা শক্তি, কল্পনা ও শিক্ষাসৃষ্টির দক্ষতা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বেনের মেয়ে'তে একটা বিশেষ যুগসন্ধি ক্ষণের প্রকৃত রূপ ধরা পড়েছে। তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন বইটিতে। অথচ জ্ঞানগর্ভ মাথাভারি হয়ে ওঠেনি রচনাটি। সুখপাঠ্যতা সর্বত্র বজায় রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের পতন, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের দায় গ্রহণ করেছিলেন এই গ্রন্থে উল্লিখিত হিন্দুরাজ্য হরিধর্মদেবের প্রধানমন্ত্রী ভবদেব ভট্ট। হিন্দু সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্যে বৃত্তি অনুয়ায়ী ভাগ করা হলো হিন্দু সমাজকে। নানা ধরণের বিধি নিষেধ আরোপ করা হলো, নতুন নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা হলো। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এওই গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে য়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান।

''বাংলা সমাজ বলিতে আমরা য়াহা বুঝি তাহার প্রথম ভিত্তি-স্থাপন এই যুগেই হইল, এবং 'বেনের মেয়ে'' উপন্যাসে এই বৌদ্ধ বরোভাবের যুগে,অথচ বৌদ্ধ কীর্তির প্রতিসম্পূর্ণ সুবিচার করিয়াই লেখক এই হিন্দুসমাজ গঠনের প্রথম প্রয়াসটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসটি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানেও লেখক জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কল্পনাবলে বাস্তবায়িত করেছেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে সম্রাট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেবার পরে হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংঘাত পটভূমি রচনা করেছে। তার মধ্যে অশোকের মহিষীর যুবরাজ কুনালের প্রতি আসক্তি, তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কুনালের চোখ উপ্‌ড়ে নেওয়া, তাকে বন্দী করে রাখা এবং তার উপর নানা অত্যাচার 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে ''উপন্যাসে কুনাল ও কাঞ্চনমালায় নিবিড় একাত্ম প্রেম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উৎসর্গিত জীবনকথা ও তিষ্যরক্ষিতার (অশোক মহিষী) দৃঢ় প্রতিহিংসা সংকল্প ও চক্রান্ত নিপুণতা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।'' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।)

এওই দুটি উপন্যাস হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সৃজন প্রতিভার সাক্ষর বহন করছে। এওছাড়া তিনি নানা প্রবন্ধে গভীর মনস্বীতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

৬.১১ স্বর্ণকুমারী দেবী

সে যুগে মেয়েদের লেখাপড়ার কোনো সুয়োগই তৈরী হয়নি, বিদ্যাসাগরের আন্দোলনও নিন্দিত হচ্ছে, স্ত্রী শিক্ষার প্রতি ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ চলছে, স্ত্রী স্বাধীনতার দাবীর প্রতি কৌতুক আর বিরোধিতাই য়খন সাধারণ নিয়ম ছিলো, তখন একজন মহিলা লেখিকা বিচিত্র বিষয়ে সাহিত্যের নানা বিভাগে য়ে বিচরণ করেছেন, দিয়েছেন প্রতিভার পরিচয়, সেই বিদূষী মহিলাকে আজ নারী জাগরণের সর্বতোমুখী প্রয়াসের দিনে প্রণাম জানাই।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন ''মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থকন্যা স্বর্ণকুমারী (১৮৫৫-১৯৩২) বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ভালো লেখিকা। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইনি দুইদফায় 'ভারতী' সম্পাদনা করিয়াছিলেন। স্বর্ণকুমারীর কবিতা ও নাট্যরচনা অকিঞ্চিৎকর নয়, তবে উপন্যাস-গল্পেই ইহার, কৃতিত্ব সর্বাধিক পরিস্ফুট।''

কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে স্বর্ণকুমারী জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষির চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী এমন একটি পরিবারের বাতাবরণে বড়ো হয়েছিলেন য়েখানে স্ত্রী শিক্ষা স্বীকৃত ছিলো, অথচ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন তেমন ভাবে হয়নি। স্বর্ণকুমারী য়ে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার জন্য তিনি তাঁর পারিবারিক পরিবেশকে বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন ''কলিকাতার সাধারণ সম্ভ্রান্ত অন্তঃপুরের কথা জানিনা, কিন্তু সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে কাল অর্থে এ স্থলে আমি শুধু আমার শৈশবকাল গণ্য করিতেছি না—আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার শৈশব পর্য়ন্ত এ সমস্ত কালখণ্ডটাই গণনায় আনিতেছি।

.....আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি এঐকটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতা ঠাকুরানী ত কাজ কর্মের অবসরে সারাদিনই এঐকখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। ....মনে আছে, বাড়িতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়ে মহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার য়ত কিছু নতুন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে-গল্প ইহার সংখ্যাই য়দিও অধিক-অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া য়াইত। ঘরে ঘরে সকলের আলমারী ভরা পুতুল, খেলনা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্দুকবন্দী পুস্তক রাশিও থাকিত।''

স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কার, সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্যও ভেবেছেন। বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে সমাজের নিন্দা গ্রাহ্য না করে তিনি তাঁর শিশুকন্যাদের স্কুলে ভর্তি করেছেন।

এই পরিবেশে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশেই বড়ো হয়ে উঠেছেন। পরিবেশ প্রতিভার গড়ে ওঠার পক্ষে এঐক জরুরী উপাদান।

স্বর্ণকুমারী ১৩ বছর বয়সে জানকীনাথ ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয়। স্বামীর সমর্থন ও সহায়তা সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি লাভ করেছেন।

সেকালে মেয়েদের উপরে হাজারো বাধা নিষেধ ছিলো পদে পদে, পথে বের হওয়া, স্কুলে পড়া, সব কিছুতেই বাধা সেই সময়ে স্বর্ণকুমারী পারিবারিক উন্নত পরিবেশে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, ''আমার একটি কনিষ্ঠ ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমাকে সেগুলি শুনাইতেন। আমি তাহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা।''

অর্থাৎ, সাহিত্যচর্চার শুরু তাঁর অল্প বয়স থেকেই। ইঃ ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদক হন জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই পত্রিকায় জ্যেতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ তিনজনই সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীর হাতে পত্রিকার সম্পাদনার ভার ছেড়ে দেন।

ভারতীয় পাতায় স্বর্ণকুমারীর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান এখানে ছাপা হয় এবং বই আকারে পরে প্রকাশিত হয়। "বঙ্গ মহিলাগণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম উপন্যাস, গাথা ও চৈতোনিক প্রবাদ রচনা করেন।"

আমরা এখানে তাঁর কথা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবো।

স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসগুলি হলো 'দীপ-নির্ব্বান' ১২৮৩ সালে (১৮৭৬)।

'ছিন্নমুকুল' ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে, 'মালতী' উপন্যাস ১২৮৬ সাল, ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে; 'মিবারবাজ', ঐতিহাসিক উপন্যাস (১২৯৪ সাল, ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে); স্নেহলতা উপন্যাস, দুখণ্ডে বিভক্ত (১৮৯০, ১৮৯৩)।

বিদ্রোহ, ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৯০)।

নবকাহিনী (ছোটোগল্প, ১৮৯২)

ফুলের মালা (উপন্যাস, ১৮৯২)।

কাহাকে (উপন্যাস) ১৮৯৮।

বিচিত্রা (উপন্যাস), স্বপ্নবানী (উপন্যাস)

মিলনরাত্রি (উপন্যাস)

নাটক, প্রহসন, কবিতা ইত্যাদি রচনার পরিমাণও কম নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বর্ণকুমারীর কথা সাহিত্য। সেখানেও উপরের তালিকা দেখে বোঝা যাচ্ছে। তিনি কি রকম সৃষ্টিশীল ছিলেন। আমাদের দেশে স্বর্ণকুমারী যথাযোগ্য সম্মান পাননি, এর কারণ রবীন্দ্র প্রতিভার সামগ্রিক আচ্ছন্নতা; তাছাড়া মেয়েরা যে অসাধারণ কিছু করতে পারে, পুরুষশাসিত সমাজে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো সেদিন।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'তে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'... রচনায় উৎকর্ষ ও পরিমাণের দিক দিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।'

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন (১) দীপ নির্বান, (২) ফুলের মালা, (৩) মিবাররাজ, (৪) বিদ্রোহ।

'দীপ নির্বান' উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলো "চিতোর রাজের পারিবারিক ইতিহাস ও মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণ—এই দুই ঐতিহাসিক ধারা উপন্যাসের মধ্যে মিলিত হইয়াছে।"

'ফুলের মালা'য় 'দীপ নির্ব্বান' থেকে ইতিহাসের প্রতি বেশি আনুগত্য দেখিয়েছেন লেখিকা। এই উপন্যাসের সময় বিস্তৃতি হলো পাঠানগণ যখন বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব করছেন, সেকেন্দারশা সুলতান বাঙলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে দিল্লীর অধীনতা প্রায় অস্বীকার করছেন।'

"একদিকে দিনাজপুরের রাজবংশের সহিত বর্দ্দেশ্বরের, অন্যদিকে বঙ্গরাজ পরিবারের মধ্যে পিতাপুত্রের বিরোধ উপন্যাসটির প্রধান বিষয়বস্তু।"

'মিবাররাজ' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে রাজস্থানের ভীলদের রাজভক্তি, চারিত্রিক সারল্য, অন্যদিকে ঐতিহ্যগত প্রথার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি।

'বিদ্রোহ' উপন্যাসটিতেও রাজপুতজাতির ইতিহাস, ভীল, রাজপুতদের শত্রুতার বিবরণ রয়েছে। এই উপন্যাসে ভীল ও রাজপুতদের সম্পর্ক কত জটিল, সূক্ষ্ম তারই উপস্থাপনা রয়েছে। কিভাবে ভীলদের জন্মভূমির রাজপুতদের অধিকারে চলে গেলো, ভীলরা রাজপুতদের বশ্যতা মেনে নিয়ে কৃষিকাজ থেকে মেষপালন প্রভৃতি সামান্য কাজ করতে বাধ্য হলো, তার ফলে কখনো যুদ্ধ কখনো বিদ্রোহ করলো তারা, ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটিকেই স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মন্তব্য করেছে।

এছাড়া তাঁর সামাজিক, পারিবারিক, উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্ট হলো 'ছিন্ন মুকুল', 'স্নেহলতা', 'কাহাকে' ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের ধর্ম ও সংসারের নানা উত্তেজক ঘটনা এসব উপন্যাসের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। নানা তর্ক বিতর্কে উপন্যাসের পারিবারিক বাস্তবতা প্রায়সই বিধ্বস্ত হয়েছে; গঠন শৈলীতেও দুর্বলতা দেখা গেছে। পাতার পর পাতায় শুধু ধর্মতত্ত্ব, আলোচনা, তর্ক বিতর্ক যা গল্পরসকে নষ্ট করেছে। এই প্রবণতা দেখা গেছে তাঁর হুগলীর ইমামবাড়ী উপন্যাসটিতে। সাহিত্য রসের সামগ্রী। লেখকের উদ্দেশ্য যদি প্রধান হয়ে ওঠে, তবে রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যই চাপা পড়ে যায়। দেখা যাচ্ছে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'স্নেহলতা' উপন্যাসটিও সমাজ-ধর্মসংস্কারের প্রবল চাপে ঔপন্যাসের চরিত্র হারিয়ে বসেছে! 'জগৎবাবুর পারিবারিক জীবনের যে চমৎকার চিত্র গ্রন্থারম্ভে আমাদের আশার উদ্রেক করে, দুই এক অধ্যায় পরেই তার্কিকতার একটা ঢেউ আসিয়া তাহার উজ্জ্বলতাকে মুছিয়া দিয়া গিয়াছে।' চরিত্র এসেছে অনেকে, কিন্তু সকলেই তার্কিক, চারিত্রিক বিশিষ্টতা নেই প্রায় কারোই। ফলত উপন্যাসটি দুখণ্ডে বিভক্ত, বিরাট, বিচিত্র তর্ক বিতর্কে পূর্ণ। 'কাহাকে' বেরিয়েছিলো ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। এক আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা, ইহাতে তাহার প্রণয়ের-ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী বিব্রত করিয়াছে। এর রচনাভঙ্গী অনেক সুগঠিত, চরিত্র নির্মাণেও লেখিকা পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই উপন্যাসটিই স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ রচনা।

ঐতিহাসির উপন্যাস রচনায় স্বর্ণকুমারী দেবী যতটা সফল, তার চেয়ে পারিবারিক উপন্যাস, বিশেষ করে 'কাহাকে' উপন্যাসটিতে তার চাইতে অনেক বেশি সাফল্য দেখিয়েছেন। সেই যুগে নারী লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ধারণ করেছেন। তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন অর্জন করেছিলেন, তেমনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী নারী, 'কাহাকে' উপন্যাসটিতে স্বর্ণকুমারী ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করলেও নারীর কোমল সংবেদনশীল হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন তা উপন্যাসটি পড়লে অনুভব ধরা পড়ে। পুরুষ কর্তৃক নারীর হৃদয় উন্মোচন হয়নি এখানে, বরং নারী লেখিকা নারীর হৃদয়ের মাধুর্য্যও কোমল বৃত্তির চমৎকার উপস্থাপনা করেছেন। এটাইতো স্বাভাবিক।

স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলার প্রথম প্রতিভাবান লেখিকা। সারা জীবন সাহিত্য সাধনা করেছেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন।

সাহিত্য সাধক চরিত মালা'য় স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিভা ও অবদান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংযোগের পর বাংলা দেশের সাহিত্যে যে নবজাগরণ হয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর কণ্ঠেই দেশের নারী সমাজের পক্ষে তাহার প্রথম ফলনীতি ধ্বনিত হইয়া উঠে। প্রথম হইলেও তাহা অস্ফুট

ফলগানমাত্র নয়। গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কৌতুক নাট্য, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ (সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক) — সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁহার দানের পরিমাণ বিপুল। উৎকর্ষের দিক দিয়াও তাহা যে গণনার অযোগ্য নয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহাদের কাছেই তাহা স্পষ্ট হইবে। এই গুলি অপঠিত আছে বলিয়াই স্বর্ণকুমারী সাহিত্যক্ষেত্রে তাদৃশ বিখ্যাত হন নাই— যদিও সাহিত্য সম্রাজ্ঞী নামে অভিহিত করিয়া দেশের লোক এবং জগত্তারিনী পদক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার সম্মান করিয়াছেন।''

পরিশেষে একটি কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় যে স্বদেশ প্রেম ছিলো তাঁর তাবৎ সাহিত্য সাধনার উৎস। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ'-এর উপহার পত্রে লিখেছিলেন—

আর্য্য-অবনতি কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা
বহিবে নয়নে তব শোখ অশ্রুধার
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়াছে চলি,
ঢেকেছে ভারতভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙেছে কপাল।

৬.১২ য়োগেন্দ্রচন্দ্র বসু

বাংলা গদ্য সাহিত্যের সেকালের একটি বিশিষ্ট নাম য়োগেন্দ্রচন্দ্র বসু। আজ, তার তিরোভাবের (১৯০৫) প্রায় এঐকশোবছর পর বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত। কারণ, যুগের দাবি মিটিয়ে যুগ অতিক্রম করতে পারে এঐমন স্রষ্টা তিনি ছিলেন না। তবে, তাঁর যুগে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তিনি সম্পাদক ও ব্যাঙ্গরচনাকার রূপে যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। বিশেষ করে, আমাদের সাহিত্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র বিশেষ এক নক্শা জাতীয় রচনার জন্যে পথিকৃৎ হিসেবেও উল্লিখিত হন। য়োগেন্দ্রচন্দ্রকেও সেই ধারায় লেখকরূপে চিহ্নিত করা যায়।

তাঁর এঐকটি বই তো বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে, তাঁর 'মডেলভগিনী'। সম্পাদিত পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' খুব তাড়াতাড়ি হিন্দুসমাজের মুখপত্ররূপে পরিগণিত হয়েছিলো। ইহা এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল য়ে, মফঃস্বলে সংবাদপত্র বলিতে 'বঙ্গবাসীকেই বুঝাইত'।

হিন্দু সমাজের মুখপাত্র রূপে য়েমন 'বঙ্গবাসী' প্রচারিত হয়েছিলো, তেমনি 'জন্মভূমি' নামক মাসিক পত্রও ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন য়োগেন্দ্রচন্দ্র। উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দুর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, এই কামনা অন্তরে রাখিয়া, আমরা মাসিকপত্র প্রকাশই কল্পনা করি।'

হিন্দুধর্মের মুখপত্ররূপে য়োগেন্দ্রচন্দ্র নিজেকে ও তার ধ্যান ধারণাকে তার লেখার মধ্য প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। য়োগেন্দ্রচন্দ্র সম্পর্কে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ

তিনি স্বরচিত কতকগুলি পুস্তকের সাহায্যে, সদ্বর্থ সংস্থাপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকগুলি বিদ্রূপাত্মক। অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির বিশ্বাস য়ে, বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের প্রয়োজন কেবল নরনারীকে দন্তবিকাশে পটুলতালাভ করাইবার জন্য; কিন্তু ইহা নিতান্ত অসার বিশ্বাস।''

[সাহিত্য সাধক চরিত্র মালা, তৃতীয় খন্ড]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালের বাংলার জাতীয় জীবন ও চরিত্রের নানা বিষয় নিয়ে রঙ্গকৌতুকের নকশা এঁকেছেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁরই শিষ্য।

বর্ধমান জেলার মেমারির নিকটে ইলসবা গ্রামে ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে যোগেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁদের আসল বাড়ি বেড়ুগ্রামে। পিতা মাধবচন্দ্র বসু।

পড়াশুনো বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। হুগলী কলেজে এফ্ এ পড়া শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে দিলেন প্রথমে শিক্ষকতা, তারপর সম্পাদনা; মাত্র ২৬ বছর বয়সেই বন্ধুর সহযোগিতায় 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তাছাড়া হিন্দী ও ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশ করেন তিনি।

মাত্র ৫০ বছর বয়সে যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১৮ই আগস্ট ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মধুপুরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁর প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে 'শাস্ত্রপ্রকাশ', তার একটি কীর্তিরূপে গণ্য। হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদি অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

'মডেল ভগিনী' ৪ ভাগে বিভক্ত উপন্যাস। প্রথম ভাগ ১১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে বেরোয়।

ইন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য রূপে যোগেন্দ্রচন্দ্রের আবির্ভাব হলেও ইন্দ্রনাথের রঙ্গকৌতুক সর্বস্বতা তাঁর রচনায় দেখা যায় না। অর্থাৎ তাঁর লেখা নকশা মাত্র নয়। একটি কাহিনী রয়েছে এবং তার মধ্যেই রসরসিকতা পরিবেশন করেছেন তিনি।

বাঙ্গালীচরিত, চিনিবাসচরিতামৃত, কালাচাঁদ, নেড়া হরিদাস, শ্রী শ্রী রাজলক্ষ্মী যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপন্যাসজাতীয় রচনা। এদের মধ্যে 'মডেল ভগিনী' এবং শ্রী শ্রী রাজলক্ষ্মী, বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাসগুলোর কিছুটা স্থান রয়েছে। উপন্যাস বলতে যে কাহিনী আশ্রিত চরিত্র বিশ্লেষণাত্মক দীর্ঘ আখ্যানকে বুঝি, যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখা ঠিক তা নয়। লেখক যেহেতু হিন্দুধর্মের একজন ধারক ও যোদ্ধা, তাই নানা শ্লেশ, কৌতুক, ব্যঙ্গ রয়েছে ব্রাহ্ম বা খ্রীস্টানদের নিয়ে, রয়েছে হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা, নীতি প্রচার নানা অলৌকিক কাহিনীর সহাবস্থান। এদের আধিক্যে উপন্যাসের বাস্তবতা ও চরিত্র বিশ্লেষণ গৌণ হয়ে পড়েছে।

ডঃ সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২-এতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ " যোগেন্দ্র চন্দ্র এই ব্যঙ্গ কাহিনী গুলি লিখিয়াছেন...টানা কাহিনী নয়, নকশার সমষ্টি। বইগুলির প্রধান প্রধান ভূমিকায় কোন না কোন সমসাময়িক প্রসিধ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; তবে রঙ, এত চড়া যে কাহিনী সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রান্ত 'কালাচাঁদে' বাস্তসৃষ্টির যে পরিচয় আছে তাহা হয়ত উপযুক্ত লেখকের হাতে ভালো ফল দিত।"

কোনো সৃষ্টিকর্মই সার্থক হ'তে পারে না, যদি তার পেছনে লেখকের কোনো বিশেষ বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্যটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যটাই যদি প্রচার মূলক হয় তবে চরিত্রগুলো টাইপ হিসেবে কাজ করে; তাদের কাজের মধ্য দিয়ে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনা।

"যোগেন্দ্র স্মরণী" পাঠে দেখা যায় যোগেন্দ্র চন্দ্র শুধু বিপুল পরিমান খাঁটি ভোজ্যেরই ভক্ত ছিলেন না, একটা খাঁটি পারিবারিক আদর্শের মধ্যেই তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। এই পারিবারিক আদর্শ বাঙালী সমাজের চিরাগত যৌথ পরিবারের আদর্শ—এই পারিবারিক প্রথায় সবচেয়ে বড় গুণ সমষ্টির কাছে ব্যক্তির আত্মবিসর্জন, বৃহতের কল্যানে ক্ষুদ্রের স্বার্থত্যাগ। এই পারিবারিক আদর্শ অজ্ঞাতসারে তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে। উত্তর জীবনে তিনি যখন সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে সুলভে সংবাদপত্র ও ধর্মগ্রন্থ প্রচারে

আত্মনিয়োগ করেছেন তখন এই স্বার্তত্যাগী পারিবারিক শিক্ষা দূরাগতভাবে তাকে অনুপ্রাণিত করেছে।... ব্রাহ্মবিরাগ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে মেকির শত্রুতাই তাঁর ব্যক্তিত্ব তথা মানবিকতার প্রদান লক্ষণ।"

উধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যোগেন্দ্র চন্দ্র এক বিশেষ পারিবারিক আদর্শে বিশ্বাসী, এবং মেকির শত্রু। সামাজিক কোনো বিষয় অপছন্দ হলেই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র রচনাবলী'র সম্পাদক এই প্রতিবাদের চেহারাটা কি ছিলো সে সম্পর্কে বলেছেন, এই প্রতিবাদ শুধু ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধেই ছিলেন, হিন্দু সমাজের স্পষ্ট ধর্মবাদীর বিরুধে সমান ছিলো।

দেখা যাচ্ছে, নিছক উপন্যাস শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা তার রচনার প্রেরণা ছিলোনা। ফলত্র কর্তব্যটা বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়।

'মডেল ভগিনী' (১৮৮৫) উপন্যাসটি একদা তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলো। সেকালের অনেক পাঠকই মনে করেছিলেন, বইটি 'মডেল ভগিনী' আসলে ব্রাহ্মদের বিরুধে আক্রমণাত্মক লেখা।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে লিখেছেন যে খাঁটি সাহিত্যিক আদর্শের দিক দিয়ে বিচার করলে উপন্যাসটির কিছু উৎকর্ষ রয়েছে। লেখক বিশ্বাসের দিক দিয়ে যা-ই হোন, হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে কিছুটা অতিরঞ্জন করেছেন চরিত্র সৃষ্টিতে ও তাদের কার্য কলাপে। আর কে না জানে, স্বাভাবিক আজরণ হাস্যারসের সৃষ্টি করে না, একটু অসঙ্গতি সৃষ্টি এবং বাড়িয়ে বলার দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করতে হয়। এই হাস্যরস সৃষ্টিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; যদি কোথাও কোথাও শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে ঠিকই।

এক ব্রাহ্ম মহিলাকে লেখক এভাবে চিত্রিত করেছেন, "সেই প্রকাণ্ড হরিতাল রঙের হলে কি দেখিলাম? দেখিলাম, এক শ্রীনোন্নত পয়োধরা, আলুলায়িত কেশ, বিবিধবর্ণের বেশ-ভূষিতা বরবর্ণিনী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজ-বিশিষ্ট চেয়ারে অধিষ্ঠিতা। ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই;— পায়ে এষ্টাকিন! মাগী কে গো? এমন গুমট গ্রীষ্মে দিন দুপুরে যে মেয়েমানুষ এষ্টাকিন এঁটে বসে থাকতে পারে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে?

যোগেন্দ্র চন্দ্রের লক্ষ্য সম্বন্ধে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "উগ্র ইংরেজীয়ানার নকল-নবিশগণ এবং হিন্দুধর্মের দূষক ব্রাহ্মসমাজের নেতারা হলো তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। বিশেষ করে আচার-আচরণে কিছু কৃত্রিম ব্রাহ্ম স্ত্রী পুরুষকে তিনি কঠোর ভাবে ব্যঙ্গ করেছেন।

'শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী' (১৯০২) বইটিতে এই ব্যঙ্গ বিদ্রুপের প্রবণতা কমেছে,—উগ্র বক্তব্যের ভারও কিছুটা কম। এর কাহিনী বেশ বিস্তৃত, এবং নিরস বক্তৃতা নয় নানা ধরনের ঘটনাগত বিচিত্রতার সন্নিবেশ ঘটিয়ে উপন্যাসের স্বাদ এনেছেন। অবশ্য এখানেও দেখানো হয়েছে, ইওরোপীয় সভ্যতার চাপে হিন্দুধর্ম ও আদর্শ কিভাবে পিছু হটে যাচ্ছে। অর্থাৎ লেখক উপন্যাসকে চিন্তা, ভাবাবেগ, আদর্শবোধের ছায়া নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এতে খাঁটি উপন্যাসের চরিত্রের হানি ঘটেছে।

নেড়া হরিদাস (১৯০১) গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন "অপধর্ম পাপানিগ্নতে যে সকল পতঙ্গ পড়িয়া দগ্ধ হইতেছে, সেই পতঙ্গকুলকে দিন থাকিতে সতর্ক করাই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

মায়াবি-নিশাচরের-মায়াজাল, হরিণ-শিশুকে চিনাইয়া দিবার জন্যই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের মর্ত্যে আবির্ভাব। পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থের কলঙ্ক কালিমা মোচনার্থ এ নেড়া হরিদাস গ্রন্থ বিরচিত।

পরিশেষে বলা যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন, তার প্রয়োজনে ব্যঙ্গকৌতুক ব্যবহার করেছে। তাঁর ভাষা যেমন সরল, পরিবেশনাতেও রয়েছে স্বচ্ছতা।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৌতুক নক্‌শা অঙ্কনে অদ্বিতীয় ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র তারই শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন, নক্‌শা নয়, উপন্যাস লিখে তিনি তার ভাবনা চিন্তাকে প্রাশ করেছেন। ভবানীচরনের মতই তিনিও ছিলেন হিন্দুধর্মে আচ্ছাদন সনাতনপন্থী, ব্রহ্মাবিরোধী। ''ভবাণীচরণ রামমোহনের বিরুদ্ধে এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র কেশবচন্দ্রের বিরুধে ব্যঙ্গ উদ্‌গীরণ করেছেন। উভয়ের আক্রমণের হাতিয়ার ছিল সাময়িক পত্রিকা,—ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'যোগেন্দ্রচন্দ্রের বঙ্গবাসী'। উভয়েই হিন্দু-শাস্ত্র গ্রন্থ প্রচারে মনোযোগী ছিলেন।'

[যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী ১ : ভূমিকা—নির্মল দাশ]

অন্যদিকে দুজনেরই রঙ্গব্যঙ্গ সৃষ্টিতে দক্ষতা ছিলো। শুধু তত্ত্বপ্রচার বা মতবাদ প্রচার করা উদ্দেশ্য হলে তার জন্যে প্রবন্ধই যথেষ্ট ছিলো; সৃষ্টিধর্মী রচনার প্রয়োজন হতো না। উপভোগ্যতা শিল্পকর্মের এক বিশেষ চরিত্র। যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় সেই উপভোগ্যতা আমরা দেখি ও উপভোগ করি।

৬.১৩ প্রশ্নমালা

১। বাংলা কথা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান কি? তাঁর 'আলালের ঘরে দুলাল' বইটিকে কি উপন্যাস বলা যায়?

২। উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রে প্যারীচাঁদ মিত্রের ''আলালের ঘরে দুলাল'কে বাংলা প্রথম উপন্যাস বলা যায় কি না আলোচনা কর।

৩। কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনাম কি? ছদ্মনামে সে সব রচনা একসময় খ্যাতি অর্জন করেছিলো, তার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করো।

৪। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে প্যারীচাঁদের অবদানের পরিচয় দাও।

৫। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করে তাদের বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করো।

৬। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস সৃষ্টিতে রমেশচন্দ্র দত্তের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৭। বাংলা উপন্যাসে তাঁর বিশেষ দর্শন ব্যক্ত হয়েছে, সেই দর্শন কি উপন্যাসের রস সৃষ্টিতে ক্ষতি করেছে? আলোচনা করো।

৮। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁর বিশেষ বিশেষ দর্শন ব্যক্ত হয়েছে, সেই দর্শন কি উপন্যাসের রসসৃষ্টিতে ক্ষতি করেছে? আলোচনা করো।

৯। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করো।
অথবা
বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করো।

১০। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন ভ্রমণকাহিনীটি আজও ভ্রমণ সাহিত্যের অসাধারণ নিদর্শন? বইটির নাম ও বিশিষ্টতা নিয়ে নিবন্ধ লেখো।

১১। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' কি কারণে সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলো, বিশিষ্টতাগুলো উল্লেখ করে দেখাও।

১২। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সমালোচকগণ প্রথম হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের অগ্রদূত বলেন। ত্রৈলোক্যনাথের কয়েকটি বই-এর বিষয় বস্তু ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে সমালোচকদের মত সঠিক কিনা আলোচনা করো।

১৩। মীর মোসারেফ হোসেন কোন কোন গুণাবলীর জন্যে বাংলার মুসলমান লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন দেখাও। তাঁর 'বিষাদসিন্ধু'র আকর্ষণ আজও সমান রয়েছে কেন আলোচনা করে দেখাও।

১৪। যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর সামগ্রিক সাহিত্য প্রয়াস নিয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো। তাঁর মডেল ভগিনী' কি কারণে জনপ্রিয় হয়েছিলো?

১৫। সুপন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ঔপন্যাসিক হিসেবে কৃতিত্বের পরিমাণ করো।

১৬। বাংলার মহিলা লেখিকাদের মধ্যে প্রতিভাময়ী স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য-অবদান সম্বন্ধে কি জানো? তার উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করো।

৬.১৪ সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বঙ্কিমচন্দ্র— ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৩। রমেশ রচনাসম্ভার—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত।

৪। য়োগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী—ডঃ নির্মল দাশ সম্পাদিত।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খন্ড)—ডঃ ভুদেব চৌধুরী।

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন

৮। ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। ভারত কোষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

তার সমাজবোধে তদানীন্তন জীবনের যন্ত্রনা দাহ প্রবল রূপ পেয়েছে যা মানবিক বোধে গভীর। তখনকার অনেক নাট্যকার তাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে অনেক নাটক লিখেছেন। সামাজিক নাট্যপ্রীতি ও নাট্যবোধের জন্য তিনি যথার্থই নাটুকে রামনারায়ণ আক্ষায় অভিহিত ও অনন্য স্রষ্টারূপে জনমানসে সমাদৃত হয়েছিলেন।

৭.৪ নাট্যরচনার আন্তরিক প্রয়াস

রেনেসাঁসের আলোক ধারায় স্নাত ঊনবিংস শতাব্দীতে জ্ঞান বিদ্যা পান্ডিত্য মানবিকতায় উজ্জ্বল কিছু মানুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন যারা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। **কালীপ্রসন্ন সিংহ** (১৮৪০-১৮৭০) ছিলেন এমনই একজন মানুষ যে কৃতবিদ্য প্রতিভা সম্পন্ন মানুষটি স্বল্পায়ু জীবনেও সামাজিক ও শৈল্পিক কর্মের সর্বস্তরে আপনার বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় রেখে গেছেন। 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি যা ছিল উনিশ শতকের সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতির যথাযথ দর্পণ। তাঁর মহাভারতের অনুবাদ এক মহৎ শিল্পকর্ম। নাটকের ক্ষেত্রেও কালীপ্রসন্ন-র দক্ষতা প্রমাণিত। তিনি মৌলিক নাটক লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেছেন এবং অভিনয়কর্মেও ব্রতী হয়েছেন। বাংলা নাটকের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

'বাবু' (১৮৫৪) কালীপ্রসন্নর লেখা প্রথম নাটক যা এই প্রতিভাবান মানুষটি মাত্র ১৪ বছর বয়সে রচনা করেন। সমাজ-জীবনের রূপচ্ছবিতে এটি চিত্রময়। কালিদামের 'বিৰমোর্বশী' (১৮৫৭) তিনি সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে এটি অভিনীত হয় এবং কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবারে ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাট্যকার মূল গ্রন্থকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন, অনুবাদও মূলানুগ; তাই নাটকের আবেদন গভীর হৃদয়স্পর্শী হতে পারে না এবং ভাষাও হয়েছে নিয়ন্ত্রণে, অকারণ উচ্ছ্বসিত। 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) মহাভারতের মূল সাবিত্রী উপাখ্যাণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। নাটকটি বিশেষ সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। সমালোচক বলেছেন 'কথাবস্তু চিত্তাকর্ষভাবে গ্রথিত হলেও নাটকখানি খুব উচুদরের নহে। দৃশ্যগুলি স্বল্পায়তন, ক্ষিপ্রগতি ও অবান্তর বিষয়ের বাহুল্য বর্জিত, কিন্তু চরিত্রাঙ্কন বেশ স্পষ্ট বা পরিস্ফুট হয় নাই। গ্রন্থকার পুস্তকগত নায়ক নায়িকার আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন, জীবন্ত চিত্র আকিতে পারেন নাই' (ড. সুশীলকুমার দে)। ভবভূতির বিখ্যাত নাটক সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'মালতী মাধব' (১৮৭৯) শীর্ষক এই নাটক কালীপ্রসন্ন মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। নাটকটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতের অনুবাদ নয়, লেখকের নিজস্ব ভাবনা ও কল্পনা একে অন্যতর রূপ দিয়েছে। নাটকটি চার কান্ডে ও বার অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকের ভাষারীতিতে ও সংলাপে লেখক আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত ভার ও প্রভাবমু— 'মালতী মাধব' নাটকের ভাষা সাজ স্বচ্ছন্দ ও ঝরঝরে। 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'র লেখকের এই ভাষারীতিই তো প্রত্যাশিত। বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও রঙ্গমঞ্চের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

অকালপ্রয়াত এই মহৎ প্রতিভার দান বাংলা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

৭.৫ প্রগতি চেতনার প্রকাশ

নবজাগরণের আলোকধারায় উদ্ভাসিত ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় নারীজীবনের সমস্যার সমাধানের

বার্তাও ধ্বনিত হচ্ছিল। তদানীন্তন সামাজিক অভিশাপ কৌলীন্যপ্রথার পরিনামে অনেক নারী অকালেই বৈধব্যজীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছিল। এই বিধবা নারীদের সৃষ্টি পুরুষ শাসিত সমাজের দুনীর্তি ও ব্যভিচারের পরিনাম, এবং এই বিধবা নারীদের বিবাহের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মহান মানুষ। এবং স্থবির দুনীর্তিগ্রস্ত মানুষদের বাধাদান সত্বেও বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে এবং সংবেদনশীল নাট্যকাররা বিধবাবিবাহ বিষয় অবলম্বন করে নাট্যরচনায় ব্রতী হন।

প্রগতিশীল মানসিকতার অধিকারী **উমেশচন্দ্র মিত্র** ও এই সামাজিক সমস্যা বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করে নাটক লেখেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি মানবিকতার তাগিদে লেখেন 'বিধবা বিবাহ নাটক'। নাট্যকার দুটি বিধবা মেয়ের জীবনের কাহিনী অবলম্বন করে নাটকটি রচনা করেছেন। কীর্তিরাম ঘোষের বাল-বিধবা মেয়ে সুলোচনা অন্যাসক্তা হয়ে মা হতে চলে এবং শেষ পর্যন্ত কলঙ্ক ও অপমান থেকে বাচবার জন্য মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু অদ্বৈত দত্তের বিধবা মেয়ে প্রসন্ন-র আবার বিয়ে হয় ও তার জীবন সুখদায়ক হয়। লেখক দুটি ঘটনাকে পাশাপাশি স্থাপন করে বিধবাবিবাহের সপক্ষে তার স্পষ্ট ও অকুণ্ঠ মতামত ব্য— করেছেন। উমেশচন্দ্র বিধবাবিবাহ বিষয়ক সমস্যাটি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন, বিধবাদের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর মমতা এবং শিল্পসম্মত ভাবেই তাকে তিনি তুলে ধরেছিন নাটকে। নাটকটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল সিঁদুরিয়া পটিতে মেট্রোপলিটন থিয়েটারে সর্বসমক্ষে প্রথম অভিনীত হয়। ব্রহ্মানদ কেশবচন্দ্র সেন ছাত্রাবস্থায় এ অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন। বিধবা বিবাহ নিয়ে সে সময়ে সে সব নাটক লেখা হয় তার পথিকৃৎ ছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র।

বিধবাদের নিয়ে তদানীন্তন সময়ে লেখা অন্যান্য নাটকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ' (১৮৫৬), যাদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় 'চপলচিত্ত-চাপল্য' (১৮৬১), শিমুয়েল পিরবক্স রচিত 'বিধবা বিরহ নাটক' (১৮৬০) ইত্যাদি। খুব বড় সৃষ্টি এরা হয়ত নয়, কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব পালনে এদের ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না।

৪.৭.৬ আধুনিক নাটকের প্রবর্তক

অসাধারণ প্রতিভাবান নাট্যস্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৮-১৮৭৩) 'আধুনিক নাট্যসাহিত্যের জনক ও প্রবর্তক' রূপে উল্লেখ করেছেন সমালোচক। মধুসূদনের পূর্বে বাংলা নাট্য ছন্দের গতি প্রবাহ থাকলেও গতিপথ নির্দিষ্ট ছিল না। মৌলিক সৃষ্টি তখন প্রায় নেই বললেই চলে। সংস্কৃত ও ইংরেজি নাট্যকের অনুবাদ তখন চলছে; এমন কি—নাট্যকারগন সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয়বিধ নাট্যাদর্শতেই মেনে চলছেন এবং সেই আঙ্গিকে বাংলা নাটক লিখছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজি থেকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রতি নাট্যকারদের ঝোঁক মাত্রাগত ভাবে একটু বেশি। কিন্তু সে সময় সখের রঙ্গালয় গুলিতে অভিনয়, মঞ্চসজ্জা সবই চলছে ইউরোপীয় ধাঁচে। বাংলা নাটকের এমন এক সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব নাট্যকার মধুদসূদনের। তিনি বাংলা নাটকের আধুনিকতার পথ প্রশস্ত করে ছিলেন।

তৎকালীন সখের নাট্যশালাগুলির সঙ্গে মধুসূদনের যোগ ছিল খুবই নিবিড়। সেই সূত্রে তিনি বেলগাছিয়া নাট্য শালার অনুরোধে রামনারায়নের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদের কাজে হাত দেন। এবং এই কাজে তিনি বুঝতে পারেন বাংলা নাটকের দুর্বলতা। এই দুর্বলতা মোচনে তিনি বাংলা নাট্য রচনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

মধুসূদন মোট চারটি নাটক ও তিনটি প্রহসন রচনা করেন- এগুলি হল- 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), 'মায়াকানন' (১৮৭১)। প্রহসন - 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬১) 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) 'বিষ না ধনুর্গুণ' (১৮৭১)। এই রচনা গুলির মধ্যে 'মায়াকানন' ও বিষ না ধনুর্গুণ - এ দুটি তিনি পরিপাটি করে লেখার অবকাশ পাননি।

শর্মিষ্ঠা নাটকটির কাহিনী মহাভারতের আদি পর্ব থেকে গৃহীত। শর্মিষ্ঠা -দেবযানী- যযাতির গল্পই মূলত এ নাটকের বিষয় বস্তু। পৌরানিক কাহিনীকে রোমান্টিক রসে জারিত করে এ নাটকে পরিবেশন করা হয়েছে। কাহিনী ও রচনার কোন কোন অংশে কালিদাসের 'শকুন্তলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কাহিনী নির্বাচন ও কিছু ক্ষেত্রে সংস্কৃত অনুসরণ থাকলেও রচনাক্রম এবং গ্রন্থনপদ্ধতি পাশ্চাত্যপন্থী। বাঙালী জীবন ধর্মের বৈশিষ্ট্যে নারীত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নাট্যকার আবেগ কল্পনার উচ্ছ্বসিত প্রাণময়তা প্রদর্শন করেছেন এ নাটকে। এ কারণেও সেদিনকার নাট্যপ্রেমি সমাজে নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

'পদ্মাবতী' হল তাঁর দ্বিতীয় নাটক। গ্রিক পুরানের Apple of discord' উপকাহিনী অবলম্বনে রচিত। গ্রিক পুরানের দেব জুনো, ভেনাস ও প্যালস এই তিন সুন্দরীর সুবর্ণ আপেল নিয়ে কলহের উপকাহিনীকে তিনি ভারতীয় পুরাণের ছাঁচে ফেলে শচী, রতি ও সুরজার চিরত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পদ্মাবতীর জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তিন দেবীর সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বময় পটভূমিকা। এই নাটকে বিদেশী কাহিনীকে ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে মেলানোর সুকৌশলের মধ্যে নাট্যকারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু এ নাটকেও মধুসূদন সংস্কৃত নাট্যরীতিকে অতিৰম করে যেতে পারেন নি। তবে এ নাটকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর ভাষা রীতি। এখানে তার অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা মূলক ব্যবহার করেন।

তাঁর তৃতীয় নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। বলা যেতে পারে এ নাটকে প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থটি থেকে এর কাহিনী নাট্যকার গ্রহণ করেছেন। তবে নাট্যকার নিজের প্রয়োজন মত কাহিনীকে বিকৃত না করে সাজিয়ে নিয়েছেন। উদয় পুরের রাজা ভীম সিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণি গ্রহণের জন্য জয়সিংহ ও মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে নাট্য কাহিনী গ্রথিত। মূল নাট্য কাহিনীর অন্তরালে রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ও ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির প্রতিফলন সার্থক শিল্প রূপে অভিমণ্ডিত হয়েছে। এ নাটকে মদনিকা-বিলাসবতী-ধনদাস-জগৎসিংহের উপকাহিনী সমগ্র নাট্য কাহিনীর গ্রন্থিজালকে দৃঢ় পিনদ্ধ করে এর শিল্প রূপকে সফল করে তুলেছে. যদি এই উপকাহিনী ইতিহাস সমর্থিত নয় তবুত লেখক জন শ্রুতি অবলম্বনে এটি গ্রহণ করেছেন। ইতিহাসকে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটকের ব্যক্তি চরিত্রে অন্তস্থলে প্রবেশ করে তাকে শিল্প সুষমায় রস-সমৃদ্ধ ও জীবনমুখী করে তুলেছেন। বাংলা নাট্যশৈলীর এ এক দিক।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে আর একটি দিক থেকে কৃষ্ণকুমারী গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হল বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম পূর্ণ ট্রাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী।'

'মায়াকানন' তার চতুর্থ নাটক। নাট্যকার এনাটকে এক অতীতাশ্রয়ী কল্পনার ঘটনা জাল বিস্তার করে নায়ক অজয়কে অমোখ নিয়তির রথ চৰের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার হতাশা ও বেদনাহত কণ্ঠস্বরের মধ্যেই নাট্য কাহিনীর পরিনতি।

মধুসূদনের যুগান্তকারী সৃষ্টি হল তাঁর দুটি প্রহসন- 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়োশালিকের রোঁ'।

নাট্যকারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এমন নিখুঁত প্রহসন বোধ করি বাংলা সাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা' - তে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ বিমূঢ় ও বিপথ গামী তরুণ 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছিন নাট্যকার। ইংরেজদের বর্ণবিদ্বেষ, বারবণিতার আধিপত্য, বৈ/বের অসাধুতা, পুলিশ প্রশাসনের উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা ঘটনা নক্সা আকারে এ প্রহসনে পরিবেশিত হয়েছে। তবে ঘটনা গুলি নক্সাকে অতিৰম করে নাট্যধর্মীতা লাভ করেছে।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'- তে গরীব চাষী হানিফের স্ত্রী ফতিমার প্রতি গাঁয়ের কপট ধার্মিক নামাবলী আবৃত লম্পট জমিদার ভক্ত চরনের লোলুপ দৃষ্টি এবং শেষ পর্যন্ত শিকার ধরতে গিয়ে শিকারীর হাতে বাঁধা পড়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সজীবতা অর্জিত হয়েছে। আসলে প্রহসনটিতে কপট ধার্মিক গোঁড়া নামাবলীর কৃত্রিম আচ্ছাদনে আবৃত চরিত্র-শৈথিল্যের ও লাম্পট্য প্রবৃত্তির কুকীর্তির চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে।

মধুসূদন বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। বাংলা নাটকের আধুনিক পথে অগ্রসর তার প্রদর্শিত পথেই। এমন কি বাংলা প্রহসনের জগতে তিনি যুগান্তর সাধন করে বাংলা নাটককে নতুন খাতে প্রবাহিত করার শক্তি এনে দিলেন। মধুসূদন শুধু প্রতিভাধর কবিই নন যুগান্তর নাট্যকার।

৭.৭ বিদ্রোহী নাট্যকার

বাঙলার অসামান্য ক্ষমতা সম্পন্ন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) বাংলা নাটককে সৃষ্টির সমুন্নত মহিমায় স্থিত করেছেন। তিনি ছিলেন মধুসূদনের উত্তর সাধক। তাঁর প্রহসন ইত্যাদির মধ্যে মধুসূদনের প্রভাব আছে কিন্তু তার উন্মেষশালিনী প্রতিভায় দীনবন্ধু সেই ভাবে নবনব শিল্পরূপে উদ্ভাসিত করেছেন। দীনবন্ধুর ছিল প্রখর সমাজচেতনা ও প্রবল বস্তু নিষ্ঠা। তাঁর তীক্ষ্ম অনিসন্ধিৎসু মন সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতিকে দেখে তার কারণ নির্ণয় করেছে এবং প্রতিকারের পন্থাও নির্দেশ করেছে। আমরা জানি যে সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প যার দর্পনে জীবন প্রতিফলিত। দীনবন্ধুর নাটক তদানীন্তন জীবন যথাযথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত 'নীলদর্পন' নাটকের কথা মনে পড়ে যেখানে নীলচাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের বর্বর রূপ যথাযথ চিত্রিত হয়েছে যা ইংরেজদের পাশবিক পরিচয় তুলে ধরে এবং সেই বাস্তব নির্মম বার্তা যেন মানুষকে অগ্নি চেতনায় জাগ্রত করে ও বিদেশী সভ্যতার মর্মমূল যেন কাঁপিয়ে দেয়। 'নীলদর্পন' এভাবেই হয়ে ওঠে ইতিহাসের দলিল।

নির্মম ট্রাজেডির রূপ অঙ্কন করলেও দীনবন্ধু মিত্র কিন্তু হাস্যরস সৃষ্টিতেই পারঙ্গম। তার নাটক কৌতুক রসের অবিশ্রন্ত নির্ঝরণী প্রবাহিত হয়ে যায় : ব্যঙ্গে বিদ্রুপে রসরসিকতায় হাস্যরস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর হাস্যরসের মূলে আছে সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতি - মদ্যপান ব্যভিচার লাম্পট্য পরবিদ্বেষ ইত্যাদিকে তিনি নির্মম পরিহাসের আঘাতে জর্জরিত করেছেন। মানব চরিত্রের অসঙ্গতিও তার আঘাতের লক্ষ্যস্থল হয়েছে সেখানে অনুগ্রহপ্রার্থী ঘর জামাই থেকে উচ্চপদস্থ অথচ মূর্খ ডেপুটি কেউই পরিত্রাণ পায়নি। চরিত্রগুলির স্থূল অমার্জিত কথাবার্তা ভাবভঙ্গী চিত্রিত করতে গিয়ে তারা বাস্তব হয়েও অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে রুচিহীন অশ্লীল যে বিকারগ্রস্থ ভাব ভদ্রসমাজের কাছে সবসময় গ্রহনীয় হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন- রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙা নিমচাদ আমরা পাইতাম'।

দীনবন্ধু সেখানে গম্ভীর সেখানে সিরিয়াস সেখানে তিনি ব্যর্থ। তাই ভদ্র চরিত্রের অঙ্কনে তিনি সার্থক হতে

পারেন নি। শিষ্টজনের সংলাপ রচনায় তিনি কি আশ্চর্য ভাবে অসফল! অথচ ভদ্রেতর চরিত্রের চিত্রনে ও তাদের সংলাপ রচনা তিনি জীবন্ত প্রাণবান। তাই নীলদর্পণ-এর নবীন মাধব, নবীন তপস্বিনী'র বিজয় ও কামিনী, 'লীলাবতী'র ললিত ও লীলাবতী আড়ষ্ট ও নিষ্প্রাণ এবং তাদের সংলাপও স্থূল জবড়জঙ্গ। তুলনায় 'নীলদর্পণ'-এর আদুরী বা তোরাপ, 'নবীন তণস্বিনী'র জলধর- জগদম্বা-মালতী, 'সধবার একাদশীর নিমচাদ অটল প্রভৃতি তাদের কথাবার্তায় ও সামাজিক পরিচয়ে কত দীপ্ত কত প্রাণবন্ত। দীনবন্ধু উচ্চ সমাজের পুরুষ বিশেষত নারী সমাজ সম্পর্কে ততটা অভিজ্ঞ ছিলেন না বলেই এমন বৈষম্য ঘটেছে।

'নীলদর্পণ' (১৮৬০) দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক যাতে লেখকের প্রবল স্বদেশানুরাগ ও প্রজাপীড়ক বিদেশী শাসকের বিরূধে তীব্র ক্রোধ প্রকাশিত হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচারের ভয়াবহতম রূপ নাটক ধরা পড়েছে. চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করা তাদের কয়েদ ও উৎপীড়ন, তাদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার এবং যে কোন প্রতিবাদকেই নিষ্ঠুরভাবে স্তব্ধ করা, এমনকি নির্মম অজস্র হত্যা - এসব 'নীলদর্পণ' এ আছে। নাটক সারাদেশে এলে আলোড়নের সৃষ্টি করে। সমস্ত বাঙালীর মন আগুনের মত অসহ্য দাহে জ্বলে ওঠে, পরিণামে নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হয়। শিল্পহিসেবে 'নীলদর্পণ' এ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও বক্তব্যের বিচারে ও আবেদন সৃষ্টিতে তা আজও বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী শিল্প।

'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) দীনবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন, বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন এটি। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত নব যুবক সম্প্রদায়ের ত্রুটি বিচ্যুতি এতে আঁকা হয়েছে বিশেষত মদ্যাস— জনিত প্রতিভাবান যুবকদের বেদনাদায়ক পরিণতি মর্মস্পর্শী রূপ পেয়েছে যার প্রকাশ ঘটেছে নিমচাদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রহসনে প্রাচীন স্থবির সংস্কারগ্রস্ত সমাজকে নিয়ে মজা। 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রহসনে শ্বশুর-নির্ভর কুলীন জামাইদের দুরবস্থা চিত্রিত হয়েছে।

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) তাঁর দ্বিতীয় নাট্যকর্ম যাতে দুটি গুরুগম্ভীর কাহিনী ও হাসরসাত্মক কাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে। দ্বিতীয় কাহিনী অর্থাৎ জলধর-জগদম্বা-মালতীর কাহিনীর ওপর শেক্সপীয়রের Merry Evies of windsor প্রভাব আছে। 'লীলাবতী' (১৮৬৭) নাটকে এক অযোগ্য কুলীন পুত্রের সঙ্গে এক শিক্ষিত মেয়ের বিবাহ জনিত জটিলতা দ্বন্দ্ব সংঘাতময় রূপ পেয়েছে। দীনবন্ধুর সর্বশেষ নাটক 'কমলে কামিনী' কাছাড় ইতিহাসের ঘটনার ওপর আধারিত।

দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটককে সার্থকতার সমুন্নত ক্ষেত্রে নিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী নাট্যকার - তার নীলদর্পনের আগুন ঝলসে দিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। সমালোচকের মতে দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান বাস্তববাদী লেখক। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে 'ন্যাশানাল থিয়েটার' এর অভ্যুদয় ঘটল - দীনবন্ধু মিত্র এভাবেই হয়ে উঠেছিল বাংলা মঞ্চের ইতিহাসের নবযুগের স্রষ্টা।

৭.৮ পৌরানিক নাটকের সফল রচয়িতা

মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর প্রায় সমসাময়িক মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) মূলত পৌরানিক নাটক লেখার জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রাচ্য আদর্শ অবলম্বন করেই তিনি নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মনোমোহন বসু যুগোপযোগী কয়েকটি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু ভক্তি মূলক এবং সঙ্গীত মূলক নাটকেই তার প্রতিভা

বিশেষ বিকাশলাভ করেছিল। ভারতীয় সমৃদ্ধময় অতীত জীবন ও পুরাণ কথাই তার ভাবনাকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল ও উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সেই ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তাকে বাংলা পৌরাণিক নাটকের প্রকৃত প্রবর্তক রূপে অভিহিত করা যায়।

মনোমোহন ছেলেবেলা থেকেই গানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কবি গান, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি রচনায় তিনি ছিলেন প্রবৃত্ত. তিনি গানও লিখতেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকে তো বটেই, সামাজিক নাটকও গানের বিশেষ প্রয়োগ আছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই করুণরসে মর্মবিদারনকারী গভীরতার পরিবর্তে কৃত্রিম উচ্ছাসই বেশী দেখা যায়। মনোমোহনের পৌরানিক চরিত্র গুলির মধ্যে মানবিক ধর্মের আরোপ ঘটেছে যদিও তাদের মধ্যে অনুরূপ মহিমা প্রত্যক্ষ হয় না- প্রেয় ও শ্রেয়োর সমন্বয় কম ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

'রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস' (১৮৬৭) মনোমোহনের প্রথম নাটক। এটি পৌরাণিক নাটক। রামের অভিষেকের সূচনা কেমন করে বনবাসে পর্যবসিত হল সেই আনন্দ ও বিষাদের মর্মস্পর্শী। পরিচয় নাটকে সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নাটক করুন রস ট্র্যাজেডির গভীরতায় তুলে ধরা হয়েছে। 'সতী নাটক' (১৮৭৩) দক্ষযজ্ঞের প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করেই লেখা। নাটকে প্রধান ভূমিকা সতীর এবং সতীর দেহত্যাগে নাটক পরিসমাপ্ত হয়েছে। মনোমোহন তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পুরানকথাকে মানবিক কথায় রূপান্তরিত করেছেন, পৌরাণিক চরিত্ররা দৈবী মহিমা পরিহার করে মনুষ্যরূপে 'ধারণ করেছে।' বিষাদে নাটকের অবসান ঘটবে না বলে শেষে মিলনাত্মক অঙ্ক যুক্ত হয়েছে। 'হরিশচন্দ্র নাটক' পৌরাণিক চরিত্র হরিশচন্দ্র ও শৈব্যার আশ্চর্য আবেদনময় কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা, যদিও মূল কাহিনীর সঙ্গে একটি উপকাহিনীও যোগ করে দিয়েছিন। মনোমোহন সংস্কৃত নাটক 'বন্ডকৌশিক' দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর মৌলকতা স্পষ্ট। তাঁর অন্যান্য পৌরানিক নাটক দল 'পার্থপরাজয় নাটক' (১৮৮১), 'রাসলীলা নাটক' (১৮৭৯) ইত্যাদি।

মনোমোহন বসুর প্রথম সামাজিক নাটক 'প্রণয়-পরীক্ষা' (১৮৬৯) সামাজিক কুপ্রথাকে যথাযথ অঙ্কন করেছে। বহুবিবাহ ও সপত্নী বিদ্বেষের ভয়াবহ রূপ নাটক দেখানো হয়েছে। পারিবারিক সংকট এবং সামাজিক সমস্যার ছবি পাওয়া যায় 'আনন্দময় নাটক'-এ (১৮৯০)। আনন্দময় চৌধুরীর পরিবার কেমন করে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং সব বাধা অতিৰম করে মিলনে পূর্ণতা লাভ করে নাটকের বিষয়। বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গ নাটকে এসেছে গুরুতর ভাবেই এবং লেখক এই বিবাহের সপক্ষেই মত দিয়েছেন।

মনোমোহন বসুর নাটকের কিছু বিশেষ প্রবণতা উল্লেখের দাবী রাখে। তার ছিল স্বদেশ অনুরাগ এবং হিন্দুমেলার তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। এই বোধই তাকে প্রাচীন ভারতের গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে পৌরানিক নাকি রচনায়। অতীত থেকে ঋকথ গ্রহণ করে তিনি যেন বর্তমানকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশ স্বভূমির প্রতি অনুরাগও তাকে সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণে প্রণোদিত করেছিল। তার স্বদেশপ্রেম ও জাতি প্রীতি পৌরানিক নাটকেও দেখা গেছে- 'হরিশচন্দ্র নাটক'- এর একটি গান একদা বাঙালী বিপ্লবীদের প্রেরণ ছিল:

দিনের পর দিন সবে দীন পরাধীন।
অন্নভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ
অপমানে তনুক্ষীণ।

৭.৯ নাটক প্রতিবাদ

বাংলা নাটক চিরদিনই দায়বদ্ধ সমাজচেতনতা, মানবিক প্রত্যয়ে দীপ্ত। বাংলা নাট্যকারের চেতনায় বিদ্রোহ, মননে প্রতিবাদ, কণ্ঠে বিপ্লবের সুর। প্রথম পর্যায়ের বিশিষ্ট নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮৪৮-১৮৯৫) এভাবেই হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী নাট্যকার। তিনি হয়ত প্রচলিত নাট্যবিধি অতিক্রম করতে পারেন নি, রোমাঞ্চকর ও অতিনাটকীয় ঘটনায় তাঁর রচনা ভারাক্রান্ত ছিল যা এনে দিয়েছিল সুলভ জনপ্রিয়তা। তবু হিন্দুমেলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, প্রগতিশীল ভাবনায় উদ্বুদ্ধ উপেন্দ্রনাথ নাটক দেশত্ববোধের স্ফুরণ ঘটান ও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধে বিদীর্ণ হন। পরিনামে তাঁকে কারাদন্ড ভোগ করতে হয়।

শরৎ সরোজিনী (১৮৭১) সাধারণ প্রেমের কাহিনী। শরৎ-সরোজিনী এবং বিনয়—সুকুমারীর প্রেম, বিবিধ সংকট যার মূল হল খলচরিত্র মতিলালের চক্রান্ত, এবং শেষ পর্যন্ত জটিলতার অবমানে সকলের মিলন- এটাই হল নাটকের কথা। একদা এই নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বাংলা ভাষায় এক অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টির রূপে পরিগণিত হয়েছিল। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকটিতেও প্রনয় কাহিনীর জটিলতা আছে তবে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল ক্রোধ ও বিদ্বেষ। নাট্যকার নায়কও নায়িকা সুরেন্দ্র ও বিনোদিনী পরস্পরের প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত ও বিবাহের প্রতীক্ষায় তারা আছে। কিন্তু কৌতুকপ্রিয় ও চক্রান্তকারী হরিপ্রিয়র ষড়যন্ত্র তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ব্যবধান প্রবল হয়; যদিও শেষ পর্যন্ত সব অশান্তির অবসান ঘটে। নাটকে উদ্ধত অত্যাচারী ইংরেজ রাজপুরুষ মাক্রেন্ডল সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং সুরেন্দ্র তাকে প্রবল আঘাত ও অপমান করে। লেখকের ইংরেজ বিদ্বেষ ও স্বদেশানুরাগ এতে প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজ সরকার নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেয় এবং উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুর একমাস করে সশ্রম কারাদন্ড হয়। পরে অবশ্য হাইকোর্টের বিচারে দুজনেই মুক্তি পান।

'দাদা ও আমি' (১৮৮৮) নাটকের উৎস ইংরেজী নাটক 'ব্রাদার জিল এণ্ড আই' যার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন ইংলন্ডে ব্যরিস্টারি পডতে গিয়ে। এটি প্রণয়ভিত্তিক হাস্যরসাত্মক নাটক। অন্তরঙ্গ বন্ধুবৎ দুই ভাই প্রথম নারী সমাজ সর্ম্পকে ভীত ও বিবাহ অনিচ্ছুক থাকলেও তাদের অশৎচার অবসান ঘটে ও তারা সহজ প্রেমময় জীবনে ফিরে আসে। বাংলার সংগ্রামী নাট্যভাবনার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ দাসের সম্বন্ধ নিকট ও নিবিড়। তার উদ্দাম বেহিসেবী জীবন যাত্রার ছায়া নাটকে পড়েছিল। কিন্তু তিনি একারনেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন যে উপেন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা বাস্তব জীবনাশ্রয়ী হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সঙ্গে তিনি অস্ত্র নিয়ে সোজাসুজি লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তার নাটক 'শরৎ-সরোজিনী' তে উদ্ধত অহংকারী ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ ধ্বনিত হয়েছে; 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' তে হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেটের অনাচার, অত্যাচার, নারীদের ওপর পীড়ন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই রঙ্গমঞ্চকে যেন রণ ক্ষেত্রে পরিণত করেছে. উপেন্দ্রনাথ দাসের এই সংগ্রামী নাট্যধারা ইংরেজকে ভীতত্রস্ত করে ও তারা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে বঙ্গরঙ্গ মঞ্চ ও বাংলা নাটককে শৃঙ্খলিত করতে প্রয়াসী হয়। এই সংগ্রামী মানবিকতার জন্য উপেন্দ্রনাথ দাস চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

৭.১০ বিচিত্র প্রতিভার সমন্বয়

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ, বিচিত্র ছিল তাঁর শিল্পসাধনা। তিনি

ছিলেন নট, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও সংগঠক, কবি, সুরশিল্পী, সাময়িক পত্র সম্পাদক। প্রেস বা মুদ্রন যন্ত্রও তিনি স্থাপন করেছিলেন। এই স্বল্প- পরিসর জীবনে তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণে দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল, অকাল প্রয়াণ এই উজ্জ্বল বর্ণময় অস্তিত্বর অবসান ঘটিয়ে বাংলার নাট্যলোকের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। রাজকৃষ্ণ রায় নাট্যকাররূপে বিশিষ্ট- ছোটবউ বিভিন্ন ভাব ও আঙ্গিকের নাটক নিয়েছেন তিনি যা সংখ্যায় ত্রিশেরও বেশী রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা উল্লেখ করতে পরি। তিনি মনোমোহন বসুর অপেরা বা গীতাভিনয়রূপ নাট্যধারার যথার্থ উত্তর সাধক : ঐ ভাবময় নাটককে আরো পুষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নাট্যরূপবৈচিত্রে তার সৃষ্টি ছিল অনন্য - নাটক গীতিনাট্য পৌরানিক নাটক ঐতিহাসিক নাটক সামাজিক নাটক প্রহসন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নাটক তিনি লিখেছেন. নাটক সঙ্গীতের প্রয়োগে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন- সে তার বাদনে ও সঙ্গীতে দক্ষতা তাকে সাফল্য এনে দিয়েছিল। বাংলা নাট্য-সংলাপে ছন্দপ্রয়োগের নবীনতা রাজকৃষ্ণ রায়কে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে তিনি করেছেন 'অনলে বিজলী' ইত্যাদি নাটক। কিন্তু ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগেও তিনি করেন এবং অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে তা করেন, যেমন 'হরধনুভঙ্গ নাটক'-এ. নাট্যপ্রয়োগে তা অত্যন্ত সার্থক হয়। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রবর্তিত এই ছন্দ প্রকৃতপ৭ে গৈরিশ ছন্দের পূর্বাবাস।

রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রথম নাটক 'পতিব্রতা' (১৮৭৫), সাবিত্রীর কথা অবলম্বনে রচিত এই 'নাট্যগীতি' পৌরানিক নাটক। 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮) সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কাহিনী। অমিত্রাক্ষর ছন্দে এটি রচিত। বিষয়বস্তু প্রাচীন হলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক। রামায়নের কাহিনী অবলম্বনে রাজকৃষ্ণ রায় যে সব নাটক লিখেছিলেন ('রামের বনবাস' -১৯৯২; 'তরণীসেন বধ' - ১৮৮৪ ইত্যাদি) তাদের মধ্যে 'অনলে বিজলী' শ্রেষ্ঠ।

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৪) প্রহ্লাদের কাহিনী অবলম্বনে অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। প্রহ্লাদের বার বার হত্যা করার চেষ্টার কাহিনী পরিচিত হলেও তার মধ্যে আকর্ষণ' নাটকীয়তা আছে। ভক্তিরসের প্রাবল্য নাটককে আচ্ছন্ন করেছে। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়ে নাটকটি আলোড়ন ফেলেছিল। 'নরমেধ যজ্ঞ' (১২৯৮) পৌরানিক নাটক, কিন্তু এতে আধুনিক যুগের ছায়াসম্পাত হয়েছে। 'পিতৃভ—র সঙ্গে নব মানবিকতা বোধের দ্বন্দ্ব এখানে আছে। পিতা নহুষের প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য যযাতি নরমেদ যজ্ঞ করতে আদেশ প্রাপ্ত কিন্তু অষ্টম বর্ষায় বালককে বলি দিতে নহুষ একেবারেই চান না, - অন্তদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানবিকতার উদ্ভাস ঘটেছে। সমাজের কুলীন জীবীদের ভয়াবহ রূপ ফুটেছে রত্নদত্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে। 'বামন ভিক্ষা' নাটক বিষ্ণুর বামন লীলার ছবি আঁকা হয়েছে। বামনের বাল্যলীলা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে, বলির কাছে গিয়ে তাকে অবনত করা ও পাতালে প্রেরণ কাহিনীও বেশ চাতুর্যপূর্ণ।

সাধক ও ভক্তদের জীবনী নিয়ে রাজকৃষ্ণ রায় নিয়েছেন 'মীরাবাঈ' 'হরিদাস ঠাকুর' ইতাদি। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য 'রাজা বিত্রমাদিত্য' (১৮৮৪)। তাঁর প্রহসনগুলি কৌতুক ব্যঙ্গে উচ্ছল এবং সামাজিক চেতনার প্রখর। এই জাতীয় নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট হল 'কলির প্রহ্লাদ' (১৮৮৮), 'টাটকা টোটকা' (১৮৯০), 'জগা পাগলা' (১৮৯০); লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (১৮৯০) আজও বাংলা রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়।

পৌরাণিক নাটক 'হরধনু ভঙ্গ' (১২৮৫) ঐতিহাসিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ কারণ 'ভাঙা অতিত্রাক্ষর' ছন্দের প্রয়োগ এখানে আছে যাতে গৈরিক ছন্দের সূচনা ঘটেছে। বাংলা একাঙ্ক নাটকের ইতিহাসে উল্লেখ করতেই হবে 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮) নাটককে।

দুঃখ দারিদ্র বেদনায় জর্জরিত অকালে প্রয়াত রাজকৃষ্ণ রায় রঙ্গবঙ্গ মঞ্চের আলোকিত পুরুষ রূপে চিরজীবী হয়ে থাকবেন।

৭.১১ বাংলা নাটকে ফরাসিয়ানা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) সৃষ্টি ও কৃষ্টির অন্যতম দিকপাল। সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি-সামাজিক বোধ এবং দেশাত্ববোধের এক তীব্র দ্যোতনা ফুটে ওঠে তার মনন ও সত্তার ভিতর দিয়ে। এদেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তিনি ছিলেন বহুভাষিক। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ফরাসী এবং মারাঠী ভাষার সঙ্গে তাঁর তীব্র যোগাযোগ হেতু তিনি সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনে অগ্রগন্য ভূমিকা গ্রহন করেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে এ সকল ভাষার যোগাযোগের রাস্তাটি তাঁর অন্যতম প্রধান সৃষ্টি। সাহিত্য সৃষ্টিতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। কাব্য-অনুবাদ ইত্যাদি রচনার ভিতরে নাট্যকার জোতিরিন্দ্রনাথই আমাদের কাছে অধিকমাত্রায় গ্রহণ যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, তাঁর সাহিত্যকর্মের নিত্যসঙ্গী 'জ্যোতিদাদা' নাটকের জলবায়ুর মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র একাদিক যেমন নাট্যকার, অন্যদিকে তেমনই নট শিল্পীও বটে। অভিনয়ে, অভিনয় শিক্ষায় এবং নাটক রচনায় তিনি ঠাকুর বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে নাগরিক ও সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'তাঁর কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রিত ও কল্পনামিশ্রিত রোমাণ্টিক নাটক এবং মার্জিত রুচির লঘু নক্‌শা ও প্রহশন গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে নাট্যামোদী সৌখীন সম্প্রদায়ের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল সর্বোপরি অনেক সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে তিনি সাধারণের অগম্য ভাষা, কালিদাস শূদ্রক, ভবভূতিকে বাঙালী পাঠকের সমাজে উপস্থিত করেন.' তিনি ফরাসী কবিতা গল্প এবং প্রবন্ধ অনুবাদ করেন। তাঁর করা মলিয়রের নাটকের অনুবাদ কিংবা বলা ভাল ভাবানুবাদ বাংলা নাটকের অমূল্য সম্পদ।

ড. সুকুমার সেনের ভাষায়, নাট্যরচনায় নাট্যভিনয়ে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় এবং সচেষ্ট দেশহিতৈষিতায় তিনি সেই অসামান্য দিনেও অসামান্যতা' দেখিয়েছিলেন। বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের দান অগ্রগণ্য। আর এর মধ্যে জোতিরিন্দ্রনাথের অংশটুকু গণ্য না করে উপায় নেই। বাঙালির নাটক চর্চায় ইতিহাসে বিশেষ করে নাটক রচনা ও নাটক অভিনয়ে ঠাকুর বাড়ির গোসুরিয়াঘাটা এবং জোড়াসাঁকো দুইয়েতেই পোষকতা যথেষ্ঠ সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। আর সেই পোষকতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যথেষ্ঠ হাত ছিল। ড. সেন জানিয়েছেন, 'জোড়াসাঁকো থিয়েটারে নবনাটকের নটীর ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম সম্পর্ক। কিছুকাল পরে তিনি নিজেই নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক গুলির সাহিত্য মূল্য নিয়ে কোনও কোনও সমালোচকের দ্বিধা আছে। কিন্তু সে সব নাটকের অভিনয় মূল্য নিয়ে তাঁদের কোনও সংশয় নেই। ইতিহাস, কল্পনা, ও স্বদেশিকতা মিশিয়ে তিনি বেশকিছু ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। পুরু ও আলেকজাণ্ডারের কাহিনী অবলম্বনে 'পুরুবিরম' (১৮৭৫), আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমন কাহিনী নিয়ে 'সরোজিনী' (১৮৭৯), প্রতাপসিংহের সঙ্গে মানসিংহের বিরোধের ঘটনাকে ভিত্তি করে 'অশ্রুমতী' (১৮৮২) এবং বাংলাদেশের শোভাসিংহের বিদ্রোহের পটভূমিকার প্রেম ও স্বদেশ প্রেমের কাল্পনিক কাহিনীতে উপস্থিত করেছিল 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা জরুরী যে, প্রাচীন

সত্তাপক্ষপাতী আদি ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে কেশবচন্দ্র সেন 'নব্যতাপন্থী' ভারতবর্ষী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেছিলেন। স্ত্রী স্বাধীনতা, বর্ণভেদ প্রথার বিরোধিতা ইত্যাদি বিষেয়ে তাঁরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। খ্রীষ্টান উপসনা রীতিরও অনুকরণ করেন কতিপয় ক্ষেত্রে। এ সব উৎকেন্দ্রিকতার দিকে কটাক্ষ করেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যরস একাত্ম, প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' (১৮৭২)। যদিও পরবর্তীতে স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে তার মতের পার্থক্য রচিত হয়ে এ গ্রন্থ আর পুন:প্রকাশ করেন নি। নাটকটি জোড়াসাঁকোর থিয়েটারে বহুবার মঞ্চস্থ হয়।

এ সমস্ত নাটক ব্যাতীত তিনি হালকা চলের কতকগুলি প্রহসন রচনা করেছিলেন. সেগুলি হল 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৩০৯), 'হিতে বিপরীত ' (১৮৯৬) ইত্যাদি। এ সকল প্রহসন গুলোর জ্যোতিরিন্দ্র আরেকটু সংযত, ও সর্তক হত। তবে একথা মনে রাখতে হবে উত্তর -গৈরিক পর্বে এবং সকলের পৌরানিক ভক্তিরসের বেনো জলের স্রোত থেকে বেরিয়ে ইতিহাসবোধ ও জাতীয়তাবোধের তুমুল আবেদন তাঁর নাটককে গৌরব দান করেছে। কিন্তু সংযমের অভাব এগুলোকে পটু করে তোলে নি। সমকালে ও পরবর্তীতে জ্যোরিন্দ্র নাথের নাটকগুলো নিয়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। 'পুরুবিৰম' নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যর্থাই বলেছিলেন, 'গ্রন্থখানি বীররস প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীরত্বের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়।' ঠিকই। কেন না, পুরুবিৰমের বীররস অবাস্তব, যুদ্ধ গুলির বর্ণনা থিয়েটারি ধরনের।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন মৌলিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তেমনই অনুবাদে ছিলেন দক্ষ। লিখেছিলেন 'পুর্নবসন্ত' ৯১৮৯৯), বসন্তলীলা (১৯০০), 'ধ্যানভঙ্গ' (১৯০০) নাসের তিনটি গীতিনাট্য। অনুবাদগুলি মধ্যে উল্লেখ্য : ফরাসী- মলিয়েরের প্রহসন 'মারিয়াজ ফোর্সে'-র অনুবাদ দায়ে পড়ে দারগ্রস্থ'। সংস্কৃতে - অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৩০৬), মালবিকালিগ্নমিত্র (১৩০৮), মৃচ্ছকটিক (১৩০৮) ইত্যাদি উল্লেকযোগ্য। ইংরেজী - 'জুলিয়াস সিজার' (১৩১৪) ইত্যাদি।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাট্যক্ষেত্রে বিপুল মহিমায় অধিষ্ঠিত। অন্ততঃ একটি বিশেষ কারণে তাকে স্মরণ করতেই হবে। তিনি বাংলা সাহিত্যে ফরাসি হাওয়া বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের এক মুখী প্রভাবে বাংলা নব্যসাহিত্যের যে বিকাশ তাকে অভিনবত্ব দেবার ইচ্ছা। তাঁর মনে জেগেছিল' (ক্ষেত্রগুপ্ত-ভূমিকা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক)। বলিষ্ঠ বক্তব্য, নিপুণ আঙ্গিক, প্লটের সার্থক গাঁথুনি সংলাপের চাতুর্য এবং চরিত্রচিত্রনের সার্থকতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটককে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভারতীয় নাট্যভাবনার সমৃদ্ধির সঙ্গে পাশচাত্যে শিল্পের সমম্বয়ে তার নাটক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের জ্যোতি দাদা বাংলা নাটকের যে একটি উজ্জ্বল প্রকাশ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই কিছুমাত্র।

৭.১২ বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের শ্রেষ্ঠ পুরুষ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) বাংলার অসামান্য নাট্যব্যি—ত্ব। নাটক রচনার, অভিনয়ে, শিক্ষাদানে, পরিচালনায়, এবং সামগ্রিক ভাবে বাংলা রঙ্গলোকের উন্নয়ণে ব্যাপৃত এমন দক্ষ ও যোগ্য পুরুষ বাংলায় আর আবির্ভূত হননি। তিনি যথার্থই 'বাংলার শেক্সপীয়র' রূপে অভিহিত হয়েছেন। তিনি অভিনয়ের উপযোগী নাটক বিশেষ পাননি। প্রকৃত পক্ষে অভিনয় বা রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। ড. সুকুমার সেন এর পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য দিচ্ছেন :'এ বিষয়ে ইঁহার প্রথম প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রে কপালকুন্ডলা-মৃনালিণীর' নাট্যরূপ দান

এগুলি বিশেষ করিয়া রঙ্গমঞ্চে ব্যবহারের জন্যই লেখা হইয়াছিল বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।' এর অব্যবহিত পরে 'খুকুটাচরণ মিত্র' ছদ্মনাম দিয়ে 'আগমনী২ (১৮৭৭) এবং 'অকালবোধন' (১৮৭৭) দুটি ক্ষুদ্র গীতি নাট্য রচনা করেন।

১৮৪৫ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কলকাতার বাগবাজার পল্লীতে ভূমিষ্ট হন। নীলকমল ঘোষ তাঁর পিতা। খুব অল্প বয়সেই গিরিশচন্দ্রের পিতা-মাতা দেহত্যাগ করেন। সে কারণে লেখাপড়াও তাঁর বিশেষ হয়ে ওঠেনি তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থপাঠে তাঁর আগ্রহ ছিল। কর্মজীবনে কিছুদিন সওদাগরি অফিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরে অভিনয়, নাটক রচনাকেই সমগ্র জীবনকে সমর্পণ করেন তিনি। ১৮৬৭ খ্রী: কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একত্রে গিরিশচন্দ্র এক যাত্রাদল গঠন করেন এবং 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয় করেন। পরে এদের সঙ্গে নিয়ে বাগবাজারে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে 'সধবার একাদশী' অভিনয় করেন। ১৮৭১ সালে গিরিশচন্দ্রই প্রথম 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার' নাম দিয়ে একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে দর্শনী নিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভিনয় প্রদর্শন করেন। কিছুদিন বাদে এদের সঙ্গে মত বিরোধ দেখা দিলে তিনি তাদের থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

পরে দু বছর বাদে যখন গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার' নামে রঙ্গালয়টি পুণর্গঠন হয়, তখন গিরিশচন্দ্র তাতে পুনরায় যোগ দেন। এসময়ে মধুসূদন, দীনবন্ধু এমনকি বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে নাটক প্রদর্শন করে তিনি। নাটকের অভাব দেখা দেয়। উদ্যোগ নেন তিনি. কিন্তু পরিশেষে নিজে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়। ১৮৮০ সালে গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদ জসরী পরিচালিত 'ন্যাশনাল থিয়েটার-এ বেতনভু— কার্য্যাধ্যক্ষ রূপে যোগ দান করে। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী এ সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত থেকেছেন। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে কার্যাধ্যক্ষ রূপে কাজ করে পুনরায় মিনার্ভায় ফিরে আসেন এবং ১৯১২ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শেক্‌সপীয়রের ট্রাজেডি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে A.H. Thorndike বলেছিলেন, 'Their themes are revenge, madness, tyranny, conspiracy, lust, adultery and jealousy. They abound in villainy, intrigue, and slaughter." আমরা একই গদ্যবাচ্য অনুভব করি গিরিশঘোষের নাটকে। গিরিশচন্দ্রের সমগ্র নাট্য সংগ্রহকে পাঁচটি শ্রেনীতে ভাগ করতে পারি। যথা- (ক) ভক্তি রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক, (খ) পারিবারিক সামাজিক নাটক, (গ) রাজনৈতিক-চেতনা সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক (ঘ) পঞ্চরঙ্ বা প্রহসন এবং (ঙ) গীতিনাট্য।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে ভক্তিরসাশ্রিত পৌরানিক নাটকে। একথা বলা বাহুল্য যে গিরিশ আবির্ভবের পূর্বেই বালায় পৌরাণিক নাটকের ভিত্তি রচিত হয়ে গিয়েছিল। পৌরাণিক ঘটনাই যে জনমনের মেজাজকে আহ্লাদিত করবে সে অনুভব গিরিশ পেয়েছিলেন প্রথম আবিভাবেই. দর্শক শ্রোতাদের মনের গহনে পৌরাণিকতার প্রভাব সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র সচেতন ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। ধর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।' অতএব ধর্মকে আশ্রয় করে গিরিশচন্দ্রের আবিভার্বের কোনও বিস্ময় নেই। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি একটি ধর্মমগ্ন পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। তাঁর প্রভাবও এতে আছে। তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটকগুলি প্রথম দিকে রামায়ণ-মহাভারত থেকে আগত এবং সেখানে কাহিনীই প্রধান। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি ব্যক্তি মাহাত্মের আধার হয়ে ওঠে। মহাজীবনের কথা ও ভক্তিরসের প্রবাহ বইয়ে দেবার দিকেই নাট্যকারের প্রবল আকুতি প্রত্যয় করি। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির সংখ্যা অন্তত: ৩০-৩২ টি. রামকৃষ্ণের সাহচের্যের পূর্বে কাহিনীপ্রধান পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল: 'রাবণবধ', 'রামের বনবাস', 'সীতাহরণ', ৯১৮৮২), 'কমলেকামিনী', 'বৃষকেতু', (১৮৮৫) ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলিতে ভক্তিরসের মায়াজাল অধিক। 'জনা' গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। জৈমিনি মহাভারতের যে জনাকাহিনীর পরিচয় মেলে তার পরিণাম কাশিরাম দাস এর 'জনা'য়। গিরিশচন্দ্র ভক্তিরসের প্লাবনে জনাকে মুগ্ধ করান।

পারিবারিক-সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য প্রফুল্ল (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শাস্তি' (১৯০৮) ইত্যাদি। এই নাটকগুলির মধ্যে সাধারণত: পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবা বিবাহ-পণ প্রথা ইত্যাদির ভয়াবহ পরিণাম এ নাটকগুলোতে প্রত্যক্ষ হয়েছে। যৌথ পরিবারগুলির ভাঙ্গন, বিভিন্ন সমস্যার কথা সেই নাটক গুলোতে প্রমাণ রাখে। এবং এর পরিণাম ট্রাজেডির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ-এর মন্তব্য স্মরণযোগ্য: 'প্রত্যেকখানি নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হইতেছেন পরিবারের কর্তা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার আঘাতে তিনি বিকৃত মস্তিস্ক ও অসংলগ্ন প্রলাপী হইয়া উঠিয়াছেন। যোগেশ, হরিশ, করুণাময়, প্রসন্নকুমার, কালীকিঙ্কর এবং উপেন্দ্রনাথ- ইহারা সকলে মূলত একই চরিত্র। এই ধরনের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র খুব মনোহর অভিনয় করিতেন, সম্ভবত তিনি নিজের, অভিনয়োপযোগী ভূমিকার কথা চিন্তা করিয়াই প্রত্যেক নাটকে একই রকম চরিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাইহোক একথা বলতেই হবে তার নাট্যধর্ম ও নাটকের চরিত্র একটি মাত্র পথে সঞ্চারিত হয়েছে।

রাজনৈতিক চেতনা সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ্য: সিরাজউদ্দৌলা (১৯০৬), মীরকাশিম (১৯০৬) , 'ছত্রপতি শিবাজি' (১৯০৭) 'অশোক' ইত্যাদি। কিছু নাটক ইংরেজ সরকার ১৯১১ সালে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র তেমন সার্থক না হইলেও বলা বাহুল্য যে বাঙালির চেতনার পক্ষে নাট্যগুণেও সমৃধ্যে ছিল সেদিনের সে নাটক গুলি। গিরিশচন্দ্রের প্রহসন গুলির মধ্যে উল্লেখ করতে হয় 'ভোট মঙ্গল', ' বেল্লিকবাজার', 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'সত্যতার পাণ্ডা' ইত্যাদি। তবে এ প্রহসন গুলি গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচায়ক নয়।

গীতিনাট্য দিয়েই গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার হিসেবে প্রথম আবির্ভাব। গীতিনাট্যের সংখ্যা প্রায় ৭৫টি। কারও মতে শতাধিক। তিনি প্রথমদিকে যাত্রাদলের জন্য কতগুলি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল 'আগমণী' (১৮৭৭), 'অকালবোধন' (১৮৭৭), ' দোললীলা', 'মোহিনী প্রতিমা', 'আলাদিন' ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যসমীক্ষা করতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন কথাটাই লিখেছেন, 'গিরিশের নাটকে ইহার অতিরিক্তও কিছু আছে। সে হইল আন্তরিকতা। গিরিশ ইচ্ছা করিয়া অথবা অক্ষমতাবশত রচনায় ফাঁকি চালান নাই, নিজের আদর্শকে মানিয়াই তিনি সাহিত্যের ও রঙ্গালয়ের সেবা করিয়াছেন। গিরিশের লেখার প্রধান গুন সারল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য। রচনারীতি সর্বত্র প্রসন্ন নয় বটে কিন্তু অক্ষমতার খোঁচাও নাই।

৭.১৩. রসনির্মাতা ঃ তীব্র ব্যঙ্গ ও আক্রমণ

রসরাজ **অমৃতলাল বসু** বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান, রঙ্গরসের স্রষ্টা বিখ্যাত নট ও নাট্যকার। তাঁর প্রতিভা ছিল আপাদমস্তক প্রহসনকারের প্রতিভা। তাঁর নাটকের নাট্যলক্ষণ ও সাহিত্যমূল্য অনেকটা ক্ষীণ হলেও তাঁর প্রতিভাবে আমাদের স্বীকৃতি দিতেই হবে। ১৮৫৩ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতার নাম কৈলাস চন্দ্র বসু। অমৃতলাল জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিট্যুট থেকে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকাল মেডিকেল

কলেজে পাঠাভ্যাস করেন। কর্মজীবনে কিছুদিন শিক্ষকতা করলেও তিনি আসলে নাট্য জগতে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ছিলেন তাঁর নাট্যগুরু। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁর আদর্শ নটপুরুষ। অমৃতলালও গিরিশচন্দ্রের মত নট, নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষ হিসেবে নিজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার গঠনে অমৃতলালের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বিভিন্ন নাটক রচনার পাশাপাশি অমৃতলাল অন্যবিধ সাহিত্যরচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর সহ সভাপতি; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগতারিনী পদকের প্রাপক হিসেবে বাঙালির বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃতিলাভ করেন। 'স্টার' থিয়েটারে প্রাণপুরুষ ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের মত গম্ভীর নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হলেও সফল হন নি। বরং প্রহসনগুলি যথোচিত সাফল্য লাভ করে। ১৯২৯ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অমৃতলালের নাটকে প্রহসনে মিলিয়ে সংখ্যাটি নেহাত মন্দ নয়। তার রচিত নাটকগুলি আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। যথা— (ক) পৌরানিক, (খ) ঐতিহাসিক, (গ) পারিবারিক। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ' (১৮৭৫)। অমৃতলালের নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ্য ঃ তরুবালা (১৮৯১), 'দ্বিমাতা' বা 'বিজয়বসন্ত' (১৮৯৩), হরিশচন্দ্র (১৮৯৯), 'আদর্শ বন্ধু' (১৯০০), 'খাসদখল' (১৯২২), 'নবযৌবন' (১৯১৪) যাজ্ঞসেনী (১৮১৮) ইত্যাদি।

অমৃতলালের প্রহসনগুলি আমাদের বড় মূলধন। এদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় 'তিলতর্পণ' (১৮৮১), 'চোরের উপর বাটপাড়ি (১৮৭৬), ডিস্‌মিস্ (১৮৮৩), 'বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪), 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে' (১৮৮৩), 'ব্যাপিকা বিদায়' প্রভৃতি নাটকের কথা। ড. অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতলালের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'অমৃতলাল শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান ছিলেন, নাটক প্রহসনে অতি অদ্ভুত রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কৌতুকপরিহাস আমদানি করতে পারতেন। বুদ্ধির দীপ্তি, বাক্-রীতির মারপ্যাঁচ, কাহিনীর চাতুরী সব কিছুর অধিকারী হয়েও তিনি আগামী যুগের পদধ্বনি শুনতে পাননি যা কিছু সাম্প্রতিক, প্রগতিশীল, শুধু তার মন্দের দিকটাকেই নিন্দা-বিদ্রূপ করেছেন।' বস্তুত একথা অনিবার্যভাবেই মানতে হবে নেহাত ভাঁড় হিসেবে কিংবা স্থুল হাস্য পরিবেশনের জন্য অমৃতলালের প্রহসনগুলি ছিল না; তাতে সমকালীন সামাজিক দায় প্রত্যক্ষ করা গেছে। ড. অমিত কুমার ঘোষের মতে, গিরিশচন্দ্রের শিষ্য হইলেও নাটক রচনা বিষয়ে অমৃতলাল স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।' গিরিশচন্দ্র ভাবনিষ্ঠ, তত্ত্ব সন্ধানে মগ্ন, জীবনের গূঢ় লয় কে বেঁধে তোলেন সার্থক ভাবে। কিন্তু তরল ও হাল্কা জীবনের বিপর্যয় এবং বিকৃতির দিকেই অমৃতলাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। গুরুগম্ভীর বিষয়ের দিকে তার প্রবলতা ছিল কম। তাঁর প্রতিভার উৎস হাস্যরসে। 'এই উৎস হইতে অজস্র ধারা নির্গত হইয়া তাহার রচনাবলীকে স্নিগ্ধ ও সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।'

'হীরকচূর্ণ' দিয়ে অমৃতলালের যাত্রাশুরু। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত এ নাটক। গায়কোয়াড়ের মহারাজা ইংরেজ রেসিডেন্টকে মদের সঙ্গে হীরকচূর্ণ মিশিয়ে তাকে হত্যা করার অপরাধে গদিচ্যুত হন — কাহিনীর অবলম্বন এই ঘটনাটি। 'তরুবালা' অমৃতলালের একমাত্র সমাজসমস্যামূলক পারিবারিক নাটকরূপে গৃহীত। এখানে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ এনে তার বিরোধিতা করেছেন। এবং সেখানে নব্যতন্ত্রের বিরুদ্ধেই রক্ষণশীলতাকে গ্রহণ করেছেন। নাটকের মূল প্রাপ্তি তার হাস্যরস। 'হরিশচন্দ্র' অমৃতলালের পৌরাণিক নাটক। 'আদর্শ বন্ধু নাটকটি 'Damon and pythus' গ্রীক সাহিত্য অবলম্বনে রচিত।

অমৃতলালের প্রহসন 'খাসদখল' ও 'নবযৌবন' শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হিসেবে চিহ্নিত। এগুলোকে Comedy of Ro-

mance বলা যেতে পারে। 'খাসদখল'-এ সামাজিক সমস্যার কিছু আলোকপাত আছে। 'নবযৌবন' নাটকে 'মধুর প্রণয়লীলার কোমল বারি প্রবাহের উপর বিদগ্ধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের আলোকসম্পাত হওয়াতে বিশেষ চমৎকারিত্ব সম্পাদিত হইয়াছে।'

অমৃতলালের প্রহসনগুলোর দুটি চরিত্র। একটি বিশুদ্ধ প্রহসন (Farce) অন্যটি বিদ্রুপাত্মক (Satire)। প্রথমটিতে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ থাকলেও কোমল পীড়ন নেই। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনও না কোনও ভাবে ব্যি—, সম্প্রদায় বা সামাজিক বিধির বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রচিত হয়েছে। আর আশ্চর্যের এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আঘাত হেনেছেন প্রগতিবাদীদের বিরুদ্ধে। অমৃতলালের নাট্যবীক্ষায় ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন ঃ 'গিরিশচন্দ্রের নাটকে জীবনের গভীরতার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিবার চেষ্টা আছে। অমৃতলালের নাটক প্রহসনে তাহা নাই। থাকিবার কথাও নয়, কেননা অমৃতলালের উদ্দেশ্য কৌতুকরসের দৃষ্টি এরা হাসির ছলে জাতীয় ও সামাজিক অসঙ্গতির দিকে শিক্ষিত সাধারণের চোখ ফেরানো।'

৭.১৪. ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং ঐতিহাসিক নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। ইংরেজি ১৮৬৩ সালে ১৭ জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে দিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের দেওয়ান। মাতা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর বংশধর কালাচাঁদ গোস্বামীর ভগিনী। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যি—জীবন ও কবিজীবনের উপর তাঁর পিতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। কার্তিকেয় চন্দ্রের 'আত্মজীবনচরিত' ও 'ক্ষিতিশ বংশাবলী' বঙ্গ সাহিত্য ও তৎকালীন ইতিহাসের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। কার্তিকেয় মার্গসংগীতের প্রথিতযশা মানুষ। ফলে এসকল গুণের অধিকারী এক পিতা প্রভাব তাঁর সাহিত্যিক মণ্ডলের উপর পড়বে তাতে আশ্চর্য কী! শিশুকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭২ সালে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮০ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পাশ করেন। ১৮৮৩তে বি. এ. তে প্রথম শ্রেণী ও ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম. এ. তে প্রথমশ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৪ সালে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। এ ঘটনাটি যথেষ্ট গুরুত্ব। পশ্চিমের সংগীত শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এ পর্বেই রচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। অতঃপর ১৮৮৭ তে দেশে ফিরে আসেন। ১৮৯০ এ তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়। যুক্তিবাদী সমাজ সচেতন দ্বিজেন্দ্রলাল নির্ভীক সৈনিকের মত অন্যায়কে আপস করে নেননি। ১৯১৩ সালের ১৭ মে সুরধামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত নাটকগুলিকে আমরা আপাতভাবে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা— (ক) ঐতিহাসিক নাটক, (খ) পৌরাণিক নাটক, (গ) সামাজিক নাটক, (ঘ) প্রহসন ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলাল সহজেই মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল কিংবা ক্ষীরোদপ্রসাদের মত পৌরাণিক ধর্মমূলক নাটকের পরিবর্তে, ভক্তিভাবের পরিবর্তে আধুনিক মানবচেতনামূলক নাট্যরচনার মধ্যদিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নবীন স্বাদ ও রস পরিবেশন করলেন। তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙালি জীবনের নাট্যচর্চার ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হল। তাঁর নাটক পর্যালোচনা করতে গিয়ে 'ভারতী' পত্রিকায় সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, মানব হৃদয়ের বিবিধ ভাব, সেন্টিমেন্ট, প্রবৃত্তি যেন আকার পাইয়া তাহার নাটকে মূর্তিমান হইয়াছে। বাঙলা নাটকে সেন্টিমেন্টের

এমন লীলা দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে কোন নাট্যকারই দ্বিতীয় নাটকে দেখাতে পারেন নাই।' দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সবচেয়ে বড় গুর হল ব্যক্তি হৃদয়ের দ্বন্দ্বের অপূর্ব প্রকাশ। সেক্সপীয়র সম্পর্কে সমালোচক Stoll বলেছিলেন, 'The illusion he offers is the widest and highest, the emotion he arouses is the most irsesistible and overwhelming.' অভিমতটি দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রেও অংশ মিলে যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা প্রধানতঃ তাঁর গদ্য সংলাপবাহী ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে প্রতিষ্ঠিত। অনেকের মতে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা করেন। মধুসূদন, দীনবন্ধুদের পর ভক্তি রসের প্লাবন দেখা দেয় এদেশে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে পুনরায় আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়ের ফলে তাঁর নাটকগুলিতে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাঁর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে সমকালিন প্রেক্ষাপট ধরা দিয়েছে সহসাই। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'রাণাপ্রতাপ সিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' ১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯) 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), ইত্যাদি। ঐতিহাসিক নাটকগুলির ভাষা গদ্য ও ঋজু। এ সম্পর্কে নিজেই জানিয়েছেন ঃ লোকে কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করলে উক্তিগুলি স্বাভাবিক ঠেকিবেই।' তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিকৃত নয়। এ প্রসঙ্গে জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী জানিয়েছেন ঃ 'তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোন স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিৰম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র যেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুনতার সহিত বর্ণপার্ত করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাঈ'। এতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে অপরিনতির স্বাক্ষর আছে। টডের 'রাজৰান' এর অনুসরণে এ নাটক লেখা। 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। 'দুর্গাদাস' নাটকে ডি. এল. রায়-এর স্বদেশিকতার পরিচয় মেলে। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজপুত রাঠোরদের সংগ্রমে কাহিনীই এই নাটকের প্রতিপাদ্য। 'নূরজাহান' তাঁর অনবদ্য কীর্ত্তি। ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডীর এক অনন্য দলিল। 'মেবার পতন' স্বদেশ প্রেমের ভাবনাকে মূর্ত করেছে। 'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে ঔরঙ্গজেব। ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এক অবিচ্ছিন্ন নাটক রসের উদ্ভাবন এ নাটকের মূলধন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি মুঘল ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে একটি ভিন্ন কাহিনীকে অবস্থান করেছে। এ নাটকে বিদেশী প্রভাবের পরিচয় দেখা যায়। ঐতিহাসিক নাটকেই তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম সিদ্ধি।

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকগুলিতে ভক্তি রসের প্রাবল্য নেই। তিনি আধুনিক বাস্তবতার পটভূমিতে পুরাণ কাহিনীকে প্রতিষ্টা করেছেন। অহল্যার কাহিনী অবলম্বনে 'পাষাণী' নাটকের উদ্ভাবন হলেও তাঁকে কখনও পাষাণ মূর্তিতে দেখেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্তিভাবের অভাব এ ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চারে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। 'সীতা', 'ভীষ্ম' ইত্যাদি পৌরাণিক নাটকে লেখকের পরিনত মননের খোঁজ পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটক মাত্র দুটি— 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী'। প্রথমটির রচনাকালে মনে করা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের আধ্যাত্মিক ভাব ব্যক্ত হয়েছিল দ্বিতীয়টি গৈরিশ আদর্শে রচিত। এগুলি অভিনয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও নাট্যগুণ ও সাহিত্যগুণে পরিত্যক্ত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার বিশেষ পর্বটি হল প্রহসন। প্রহসনগুলোর উৎস ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসাত্মক কবিতার সাফল্য। ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছিলেন, তাহার প্রহসনে ব্যঙ্গ চিত্ররূপের কাঁটাগুলি একটু তীক্ষ্ণভাবেই আছে।' 'কল্কি অবতার' নাটকে বিলেতফেরতা পাঁচ শ্রেণীকে আঘাত করা হয়েছে, এরা হল ঈঙ্গ-বঙ্গ, ব্রহ্ম,

নব্যহিন্দু, গোঁড়া হিন্দু এবং পণ্ডিত। 'বিরহ' প্রহসনটি তুলনামূলক উঁচু মানে। 'অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যরস এতে আছে। 'এ্যহস্পর্শ'-তে তাঁর প্রতিভার ছাপ নেই। 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহশনে নব্যপন্থীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বানে বিদ্ধ করা হয়েছে। 'আঙ্গ বিদায়' তাঁর শেষ প্রহসন। রবীন্দ্রনাথ-এর প্রধান লক্ষ্য। দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার কলঙ্কময় অধ্যায় এই 'আঙ্গ বিদায়'। ড. সুকুমার সেন তাঁর প্রহসন সম্পর্কে বলেছেন, 'দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিতে প্রায়ই কপটাচারের প্রতি উপহাস আছে। সংলাপে কৌতুকের চেষ্টা আছে কিন্তু সে চেষ্টা সর্বত্র সফল হয় নাই। তবে হাসির গানগুলি থাকায় অভিনয়ে কৌতুকাবহ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকগুলিতে নাট্যরস জমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মানসিক দ্বন্দ্বের দ্বারা।'

৭.১৫. ঐতিহাসিক পৌরাণিক ও গীতিনাট্যের জনপ্রিয় লেখক ঃ

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সুবর্ণ যুগে আবির্ভূত হলেন **ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ** (১৮৬৩ – ১৯২৭)। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের তুলনা করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ 'দ্বিজেন্দ্রলাল যেন নাট্যসাহিত্যের উন্নতি করবেন এবং দর্শকদের রুচির মোড় ফেরাবেন— এই ইচ্ছায় কলম ধরেছিলেন; ক্ষীরেন্দ্রপ্রসাদের সে রকম কোন অভিপ্রায় ছিল না। সত্য কথা বলতে কি, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে পেশাদার নাটক লিখিয়ে হিসেবেই তিনি (ক্ষীরোপ্রসাদ) নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তবু একথা বলতেই হবে যে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যচেতনা ছিল প্রখর এবং তাঁর বেশ কিছু নাটক কালজয়ী হয়েছে। 'নরনারায়ন', 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' প্রভৃতি নাটক চিরকালের সম্পদ। প্রতিভাবান ক্ষীরোদপ্রসাদ উত্তর ২৪ পরগণার খড়দহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গুরুচরণ ভট্টাচার্য। রসায়নে এম. এ. পাশ করে তিনি অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যে তার মোহ ছিল। মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' নাম্নী আখ্যায়িকা দুটি খন্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে নাট্যচর্চার প্রতি প্রবল ইচ্ছায় অধ্যাপনার পদ ত্যাগ করে নাট্যরচনায় মগ্ন হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চল্লিশ। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় আটান্ন। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪) একটি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে চিহ্নিত। ১৯২৭ সালে ক্ষীরোপ্রসাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর নাটকগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা— (ক) পৌরাণিক নাটক, (খ) ঐতিহাসিক নাটক, (গ) ঐতিহাসিক পর্বভূমিকায় কাল্পনিক নাটক, (ঘ) গীতিনাট্য ইত্যাদি। পৌরাণিক নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ 'বভ্রূ বাহন' (১৮৯৯) সাবিত্রী (১৯০২), রুদ্রাবতী (১৯০৪), মন্দাকিনী (১৯২১), নরনারায়ণ (১৯২৬) ইত্যাদি। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ প্রতাপাদিত্য (১৯০৩), পদ্মিনী (১৯০৬), 'চাঁদ বিবি' (১৯০৭), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), 'আলমগীর' (১৯২১), ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কাল্পনিক নাটক গুলের মধ্যে উলেখযোগ্য হল ঃ 'রঘুবীর' (১৯০৩), 'সাজাহান' (১৯২১), 'বঙ্গে রাঠোর' (১৯১৭) ইত্যাদি। ক্ষীরেদ্দপ্রসাদের অনেকগুলি গীতিনাট্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'জুলিয়া' (১৯০০), 'সপ্তম প্রতিমা' (১৯০২), পলিন (১৯০৪) ইত্যাদি। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলিতে অতিনাটকীয়তার বাড়াবাড়ি থাকলেও শূন্যগর্ত আদর্শবাদের বাহ্যিক আড়ম্বর নেই।

গিরিশচন্দ্রের ধারা বেয়েই ক্ষীরোদপ্রসাদের আবির্ভাব। ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলিতে সেই গৈরিশ ধারা অব্যাহত। প্রথমদিকে ভক্তিরসে মজে থাকলেও গিরিশচন্দ্রের নাট্যবোধের সঙ্গে তাল মেশানো ক্ষীরোদপ্রসাদের সম্ভব ছিল না। কেননা তার দৃষ্টি মূলত মনোরঞ্জনের দিকেই। তার পৌরানিক নাটক রুদ্রাবতীর উৎস ধর্মঙ্গলকাব্য।

'নরনারায়ণ' তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পৌরানিক নাটক। মহাভারতের বহুপ্রোক্ত কাহিনীকে অবলম্বন করে একটি বিশেষ আদর্শের প্রচার উদ্দেশ্য নিয়েই নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকে দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত দৈব-ই জয়ী হয়। কিন্তু দর্শক হৃদয় পুরস্কারে জন্যই সমর্পিত ছিল। নরনারায়ণে কর্ণের দ্বন্দ্বেটির পেছনে রবীন্দ্রকৃত 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এর ছায়া দেখা যায়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এদেশের সাহিত্য যে স্বদেশীকতার জোয়ার এসেছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক 'প্রতাপাদিত্য' তাঁর উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকের স্বার্থে ঐতিহাসিকতাকে বিবৃত করেন নি। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রবল আবেগ সে ক্ষেত্রে পীড়ন দিয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে সর্বদা ইতিহাসবোধ রক্ষিত হয়নি। 'পদ্মিনী' নাটকের ট্র্যাজেডী বাইরে থেকে আমদানিকৃত। মূল চরিত্রের ভিতরে সে বীজ ছিল না। 'অশোক' নাটকে অশোক অপেক্ষা অন্যান্য চরিত্রগুলোর মাহাত্মই অধিকমাত্রায় বর্ণিত। ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাটক 'আলমগীর'। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা জরুরী যে শিশির কুমারের অসাধারণ অভিনয়েই এর জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাল্পনিক কাহিনীযুক্ত নাটকগুলিতে সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রতি নাট্যকারে দৃষ্টি না থাকায় অসঙ্গত দেখা দিয়েছে। 'আহেরিয়া' নাটকটি যথেষ্ট সাফল্যমন্ডিত হলেও নাট্যরসে যথার্থ হতে পারেনি। বাঙালির বলবীর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রচিত হয়েছে 'বঙ্গে রাঠোর'।

গীতিনাট্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিভার উন্মোচন অধিক। 'আলিবাবা' গীতিনাট্যের ভিতর দিয়েই তার যাত্রা শুরু হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ পারস্য ও আরব উপন্যাসকে বর্ণিত কাহিনী বা সেই জাতীয় কাহিনী অবলম্বন করে এই গীতিনাট্যগুলি রচনা করেন। এখানে গল্প ও নৃত্যগীতি অধিকভাবে সক্রিয়; সেখানে নাটকীয়তা বা চরিত্র নির্মাণে ক্ষীরোদপ্রসাদের নজর ছিল না। পৌরানিক কাহিনী অবলম্বন করে একটি গীতিনাট্য 'কিন্নরী' খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'করুনা' এরা 'ভূতের বেগার' গীতিনাট্যে অমৃতলাল বসুর ছায়া রয়েছে।

সমালোচক ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যরচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহারিত্ব অর্থাৎ প্লটের গল্পরস। গিরিশচন্দ্র যে ভক্তিরসোচ্ছাসের বন্যা আনিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা প্রতিরোধ করিলেন নাট্যকাহিনীকে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জক করিয়া। আলোচ্য কালের নাট্যরচয়িতাদের মধ্যে, অমৃতলাল ছাড়া, শুধু ক্ষীরোদপ্রসাদই রবীন্দ্রনাথের অনুসার করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে পড়িয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকটি নাটকে সংলাপের ঔচিত্য রাখিতে পারেন নাই।'

একক ৮ সাময়িক পত্র

৮.০ – প্রস্তাবনা
৮.১ – বিবিদার্থ সংগ্রহ
৮.২ – মাসিক পত্রিকা
৮.৩ – এডুকেশন গেজেট
৮.৪ – সোম প্রকাশ
৮.৫ – রহস্য সন্দর্ভ
৮.৬ – অবোধবন্ধু
৮.৭ – বঙ্গদর্শন
৮.৮ – প্রচার
৮.৯ – নবজীবন
৮.১০ – ভারতী
৮.১১ – বালক
৮.১২ – সাধনা
৮.১৩ – বঙ্গবাসী
৮.১৪ – হিতবাদী
৮.১৫ – জন্মভূমি
৮.১৬ – বামাবোধিনী
৮.১৭ – অনুশীলনী
৮.১৮ – সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৮.০. প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাময়িক পত্রগুলির অবদান যথেষ্ট। এগুলি পাঠক তৈরিতে সাহায্য করেছে। নানা বিষয়ক রচনায় পরিপূর্ণ হওয়ায় পাঠক সমাজ অল্প আয়াসে শিক্ষিত হয়েছে। নতুন যুগের চিন্তা-ভাবনা সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। মনের দরজা-জানালা উন্মুক্ত হয়েছে। চিত্তের প্রসার ঘটেছে। সাহিত্যবোধের বিস্তার ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনায় পত্রিকাগুলি তাই উপেক্ষনীয় নয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সমস্ত সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, রহস্যসন্দর্ভ, অবোধবন্ধু, বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, ভারতী, বালক, সাধিকা, বঙ্গবানী, হিতবাদী, জন্মভূমি ও বাসাবোধিনী।

৮.১. বিবিধার্থ সংগ্রহ

পত্রিকার নামের বানানটি ছিল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটির অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কার্তিক ১২৫৮ প্রথম প্রকাশিত। ইংরেজি Penny Magazine ছিল পত্রিকাটির আদর্শ। বাংলা সাহিত্যে এটি প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা যোল। বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। অর্থাৎ প্রতি সংখ্যার দাম দু'আনা। সম্পাদক রাজেন্দ্র লাল মিত্র। পত্রিকা প্রকাশের জন্য রাজেন্দ্রলাল ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটির কাছ থেকে মাসিক ৮০ টাকা সাহায্য পেতেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে 'পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র রুপে। অর্থাৎ পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, প্রাণিবিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি ছিল পত্রিকাটির আলোচ্য বিষয়। আলোচনার ভঙ্গি ছিল সহজ সরল চিত্তাকার্ষক। পত্রিকাটির লক্ষ্যসাধন পাঠক সমাজের উপযোগী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানানো হয়েছে— ''যাহাতে ব্রহ্মপদেশস্থ জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং একৎ সৎ ও আনন্দজনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মূল্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় 'পেনি মেগাজিন' নামক পত্রের অনুবর্ভিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধার্থে অবিরত সম্যক্ চেষ্টা করা যাইবেক, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের পাঠ্যযোগ্য করণার্থে উক্তপত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক।'' পুরাবৃত্ত, ইতিহাস প্রভৃতির পাশাপাশি মহান ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত, পুরাতন তীর্থসমূহের বিবরণ, নীতিমূলক উপন্যাস, রহস্যমূলক কাহিনী, গ্রন্থ সমালোচনা ইত্যাদি পরিবেশিত হতো।

এ পত্রিকায় মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য'-এর প্রথম দুটি সর্গ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র সমালোচনা এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের দীর্ঘ সমালোচনাও এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পাঠকের বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন ঃ 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধনে একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকো বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরে তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নইল তিমি মৎসের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।'

পত্রিকাটির প্রথম ৬টি পর্ব (১৭৮১ শতাব্দ পর্যন্ত) রাজেন্দ্রলাল সম্পাদনা করেছিলেন। ১৭৮৩ সকাব্দ থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত তিনি সম্পাদনা করেন।

৮.২. মাসিক পত্রিকা

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগষ্ট প্রথম প্রকাশিত। সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। রাধানাথ শিকদার পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পত্রিকাটির আদর্শ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল ঃ 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। কিন্তু পন্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা নির্মিত হয় নাই।' ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন, এই পত্রিকাটির ''উদ্দেশ্য অল্পশিক্ষিত জনসাধারণকে, বিশেষ করিয়া অন্তঃ পুরবাসিনীদের শিক্ষাচ্ছলে সাহিত্যরসের যোগান দেওয়া। তাই প্রবন্ধগুলির বিষয় সহজ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ, আর ভাষা যথাসাধ্য কথ্যরীতির অনুযায়ী। লেখ্য ও কথ্য ভাষার একপ্রকার মিশ্রণ-রীতিই ছিল 'মাসিক পত্রিকা'র প্রধান বিশেষত্ব।'' বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে তয়নন্ত, ১৩৮৬, পৃ. ১৬৪।

পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল চার বছর। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর প্রায় সমগ্র অংশ প্রথম এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যা থেকে)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাহিত্য রচিতমানা'য় লিখেছেন ঃ '' 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশে প্যারীচাঁদ এবং তাঁহার সহযোগী রাধানাথ সিকদারর দুঃসাহসিকতা আজও আমাদের বিস্ময়ের বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ইঁহারা এই সাহস প্রদর্শন না করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আমরা বাংলা সাহিত্যের এমন উন্নতি ও প্রসার আশা করিতে পারিতাম না।'' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৭ - ১৯৮)।

সে সাহস হলো, যথাসম্ভব কথ্যভাষার প্রয়োগ। সংস্কৃতানুসারী গদ্যরীতি বর্জন। 'মাসিক পত্রিকা'র গদ্যরীতির নিদর্শন ঃ ''ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীনে মেয়ে দিলে যেমন বাপমার মুখ উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ স্পার্টবাসিদের মধ্যে ছেলে লড়াইয়ে মরিলে বাপমার মুখ উজ্জ্বল হইত। এই নিমিত্তে ছেলে যখন লড়াইয়ে যাইত, মা আপনি তাহার হাতে ঢাল তলবার দিতেন। দিয়া বলিতেন — বাপু তুমি লড়াইয়ে যাও।'' (জুন ১৮৫৭)

স্মরণযোগ্য 'মাসিক পত্রিকা'তেই সর্বপ্রথম কথা, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরাম চিহ্ন যথাযথ ব্যবহৃত হয়।

৮.৩. এডুকেশন গেজেট

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'এডুকেশন গেজেট'-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম প্রকাশ ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই। প্রথম প্রকাশকালে পত্রিকাটির নামছিল 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ'। পত্রিকাটি প্রকাশের একটি ইতিহাস আছে। শিক্ষা বিভাগের দক্ষিণ অঞ্চলের ইনস্পেকটর হজসন প্রাটের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সরকারী নীতি জনসাধারণকে সরাসরি জানানোর জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দিলে এটি এবিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারই ফলস্বরূপ এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

প্রথম সম্পাদক ডবলিউ ও ব্রায়েন স্মিথ। স্মিথ নামে সম্পাদক, পত্রিকাটির তদারক করতেন সহ-সম্পাদক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটিকে সরকার প্রতি মাসে দুশো টাকা অনুদান দিতেন।

১৮৬৬-র জানুয়ারিতে স্মিথ সাহেব স্বদেশে ফিরে গেলে পত্রিকাটি স্বল্প কাল সম্পাদনা করেন কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক। ১৮৬৬-র মার্চে প্যারীচরণ সরকার পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাসিক বেতন হয় তিনশো টাকা। কিন্তু ১৮৬৮-র ৩১ জুলাই তিনি পদত্যাগ করেন। পত্রিকা সম্পাদনার নীতি নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়।

কারণটি হলো, শ্যামনগর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় বহু যাত্রী হতাহত হয়। রেল কর্তৃপক্ষ হতাহতের সংখ্যা অনেক কম করে দেখায়। কিন্তু প্যারীচরণ স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধান করিয়ে সত্য ঘটনা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি। এমন কী, আহতদের দেহ নিহতদের সঙ্গে মিশিয়ে পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও অপহরণ করা হয়। এই তদন্ত রিপোর্ট এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হলে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্যারীচরণের কৈফিয়ৎ চাইলে, প্যারীচরণ জানান তিনি তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাসমতো যা সত্য তাই প্রকাশ করেছেন। সরকারের সঙ্গে তাঁর এমন কোনও চুক্তি হয় নি যে তিনি সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে পারবেন না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদের পরিণতিতে তিনি সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

এডুকেশন গেজেটের পরবর্তী সম্পাদক ভূদেব বুখোপাধ্যায়। তাঁর শর্ত ছিল যে, ঐ পত্রিকার সম্পূর্ণ স্বত্ব তাঁকে দিতে হবে এবং বেতনের পরিবর্তে মাসিক তিনশো টাকা গ্রাম-ইন-এড হিসেবে দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ সম্মত হন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর থেকে ভূদেবের সম্পাদনায় এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হয়। অবশ্য ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি তিনশো টাকার পরিবর্তে দুশো টাকা সাহায্য পেতে থাকেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫মে ভূদেবের মৃত্যু হয়। আমৃত্যু তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন।

ভূদেব সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'-এর প্রথম সংখ্যায় (৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮) ভূদেব পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানান ঃ

"কোন মত, কোন দল, কোন পক্ষ, অবলম্বন করার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সকল মতেই, সকল দলেই, সকল পক্ষেই, কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা থাকে— কিছুতেই সত্য অথবা মিথ্যা সম্পূর্ণ অমিশ্র-ভাবে থাকে না। আমরা সত্যের দিকেই থাকিতে চেষ্টা করিব— অসত্য ভিন্ন আর কিছুরই ভয় করিব না — কারণ আশৈশব আমাদিগের এই মহাকাব্যে বিশ্বাস আছে 'সত্যমেব জয়তে'।"

ভূদেবের সম্পাদনাকালে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় দেশীয় বর্ষ গণনা রীতি চালু হয়। অর্থাৎ, তিনি বৈশাখ মাস থেকে বছর গণনা শুরু করেন। পত্রিকাটি কী ধরনের হবে সে সম্পর্কে তিনি জানান ঃ 'এডুকেশন গেজেট সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রচারেই নিযুক্ত থাকিবে এবং একাধারে সম্পাদ পত্র এবং মাসিক পত্র এবং ত্রৈমাসিক পত্রেরও কাজ, কতকটা করিবে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু কবিতা এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর 'ভারত বিলাপ' এবং 'ভারত সঙ্গীত' প্রথম এডুকেশন গেজেটেই প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখের লেখা এ পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। অন্যান্য লেখকেরা হলেন ঃ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় পুলিন বিহারী ভাদুড়ি দ্বারকানাথ চৰবর্তী, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। স্বয়ং ভূদেবের বহু রচনা এ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ আচার প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগের শেষাংশ এবং বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে।

এডুকেশন গেজেটের নিয়মিত বিভাগগুলি ছিল (১) সম্পাদকীয়, (২) সম্পাদকের লেখা প্রবন্ধ, (৩) সাপ্তাহিক সংবাদ, (৪) রাজকার্যে নিয়োগ, (৫) পত্র প্রেরকের প্রতি সম্পাদকের মন্তব্য, (৬) পাঠকদের পত্র, (৭) কবিতা, (৮) বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, (৯) শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা, (১০) বিবিধ।

এডুকেশন গেজেটের সাহিত্য সমালোচনা বিভাগটি সমৃদ্ধ ছিল। টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) 'অভেদী', দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বৃত্তসংহার', চন্দ্রকোলর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কবিকাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটি সেকালে জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সে কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক, কী অর্থনৈতিক প্রায় প্রতিটি ক্ষেতে। আবার সাহিত্য ব্যাপারেও পত্রিকাটির আগ্রহ ছিল। সত্যি কথা বলতে কী, এডুকেশন গেজেট নিছক একটি পত্রিকা ছিল না, একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

৮.৪. সোমপ্রকাশ

'সোমপ্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর। ১২৬৫ সালের ১ অগ্রহায়ণ, সোমবার। সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তিনি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক।

'সোমপ্রকাশ' প্রকাশে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পত্রিকার ব্যাপারে দ্বারকানাথকে নানা পরামর্শ দিতেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় দ্বারকানাথ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ ''তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাংলা ভাষাকে ও বাংলা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাংলা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিকস্, আলোচিত হইতে লাগিল। বাংলা ভাষার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্বে লোকে ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।''

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট-এ দ্বারকানাথের মৃত্যুতে লেখেন ঃ ''বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রথম শিক্ষাগুরু। তাঁহা হইতেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতি হয়। পূর্বে ভাস্কর প্রভাকর সমাচারচন্দ্রিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকল ছিল বটে, কিন্তু সংবাদপত্রের উপযুক্ত বিষয়সহ সেই সকল পত্রনির্গত হইত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সুপদ্ধতিতে বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলন কিরূপ করিতে হয়, তিনি প্রথম তাহা বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দেখাইয়া দেন। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রই যে এ উন্নতির মূল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।' (১৯ ভাদ্র ১২৯৩)

'সোমপ্রকাশ'-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় 'ভারতবর্ষের আত্মশাসন' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (১৫ পৌষ ১২৬৯) ঃ 'এদেশে একটি জাতি সাধারণ সভা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বারম্বার ইহার প্রস্তাব করিয়াছি। আমাদিগের সুখের বিষয় এই যখন আমাদিগের ভারতবর্ষীয় সভা নিদ্রিত আছেন, এ বিষয়ে ইংলন্ডে আন্দোলিত হইতেছে। যতদিন ইহা না হইতেছে ততদিন আমাদিগের যথার্থ স্বাধীনতা ও যথার্থ উন্নতি হইতেছে না। '' 'সোমপ্রকাশ' উপলব্ধি করেছিল, ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। যে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতা লাভের উপযোগী করে তুলবে।

স্মরণযোগ্য, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে প্রতিষ্ঠানটি নেতৃত্ব দেয়, তার স্বপ্ন কিন্তু 'সোমপ্রকাশ'-এ তেইশ বছর আগেই দেখা হয়েছে।

ধর্ম সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ'-এর মত ছিল উদার। সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুরা ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে যতই বিরূপ ভাব পোষণ করুক না কেন, দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সহমর্মিতা সৃষ্টিই ছিল 'সোমপ্রকাশ'-এর লক্ষ্য। ১২৯৩ সালের ৮ আষাঢ় 'সোমপ্রকাশ' তাই লিখেছিল ঃ

''হিন্দু সমাজ বহুদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের ভাবগতিক উন্নতি ও অবনতির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের উপর লোকের যে বিদ্বেষ ভাব ছিল ৰমে তাহা অন্তর্হিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে হিন্দু সমাজ যে কোন উপকার লাভ করেন নাই একথা বলিলে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। ক্রমে ব্রাহ্ম হিন্দুকে আদর করিতে শিখিয়াছেন, জনকয়েক অজাতশত্রু ধার্ম্মিক বেশধারী চালক ভিন্ন বয়স্ক ব্রাহ্মণ হিন্দুর মাহাত্ম্য প্রচার করিতে .... মনে করিতেছেন, অনেক কার্য্যে হিন্দু ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন।'' 'সোম প্রকাশ' ছিল সমন্বয়পন্থী।

দ্বারকানাথ যে অবিচ্ছিন্নভাবে 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পাদনা করেছিলেন তা নয়। কর্মবাহুল্যের দরুন ১৮৬৫-এর ২ জানুযারী থেকে কিছুকাল তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন। মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পান।

১৮৭৮-এ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু হয়। 'সোমপ্রকাশ' রাজরোষে পড়ে। সরকার বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে অভিযু— হয়। ফলে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এক বছরের জন্যে এ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১৮৮০ (৮ বৈশাখ ১২৮৭) থেকে নবকলেবর ধারণ করে পুনরায় প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরেই অবশ্য পত্রিকাটি হস্তান্তরিত হয়।

৮.৫. রহস্য-সন্দর্ভ

প্রথম প্রকাশ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। পত্রিকাটি মাসিক, সচিত্র। সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এর আগে রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের কার্তিক থেকে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের চৈত্র পর্যন্ত, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-এর অভাব পূরণের জন্যে 'রহস্য-সন্দর্ভ'-এর প্রকাশ ঘটে পত্রিকাটি ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি ও কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির আনুকূল্য লাভ করে। পত্রিকাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়।

''...... অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নাম দ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশ্যে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কল্পিত হইয়াছে......''

রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনাগুণে পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাজেন্দ্রলাল ষষ্ঠ পর্ব পর্যন্ত মোট ৬৬টি খণ্ড সম্পাদনা করেছিলেন। তারপর দু বৎসর পত্রিকাটি পরিচালন করেছিলেন প্রাণনাথ দত্ত।

রঙ্গলাল এ পত্রিকায় লিখতেন। কয়েকটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদও করেছিলেন। যেমন, 'প্রভাত-সঙ্গীত' (ওয়াট থেকে), 'নদী ও কালের সমতা' (কুপার থেকে), 'আদিম নরদমপতীর প্রাতরুপাসনা' (মিলটন থেকে)।

'রহস্য-সন্দর্ভ-এর দ্বিতীয় পর্বের ২১ খণ্ডে টেকচাঁদ ঠাকুরের'আলালের ঘরের দুলাল' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের

'দুর্গেশনন্দিনী'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থটি সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের মন্তব্যের অংশবিশেষ উদারযোগ্য। তিনি লেখেন ঃ ''রহস্যসন্দর্ভের পাঠকমণ্ডলী মধ্যে অল্প ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুরের নাম দ্রুত হয়েন নাই। তাঁহার 'আললের ঘরের দুলাল' অনেকের ঘরে আলালের ঘরের দুলাল হইয়া বিরাজ করিতেছে, এবং তিনি একজন সুচতুর রহস্যব্যঞ্জক লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

আমাদের ঠাকুরজী ব্যঙ্গ লিখিতে সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম, অতএব ব্যঙ্গ বিষয়ক যে কথা লিপিবদ্ধ করেন তাহা অবশ্যই সর্ব্বত্রই আদনীয় হয়, কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি তাদৃশ সফলতা লাভ করিতে পারেন না।''

'দুর্গেশনন্দিনী'র সমালোচনায় তিনি লেখেন ঃ ''গ্রন্থকারের বর্ণনাশক্তি বিলক্ষণ বলবতী এবং যে কোন বিষয়ের আদর্শ শব্দে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাই মনোজ্ঞ বোধ হয়।''....

''তাঁহার গ্রন্থখানি যে রসব্যঞ্জক ভাবদ্রোতক ও নূতন প্রণালীর আদর্শস্বরূপ হইয়াছে এই নির্ম্মিত্ত আমরা তাঁহাকে সম্যক সাধুবাদ করিলাম।''

৮.৬. অবোধবন্ধু

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল 'অবোধবন্ধু' প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রথম সংখ্যার সাইজ ছিল পকেটবুকের সাইজ। পরবর্তী সংখ্যা থেকে পত্রিকার আয়তন পরিবর্তিত হয়। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু আনা। বার্ষিক মূল্য কলকাতায় একটাকা। কলকাতার বাইরে একটাকা বারো আনা।

পত্রিকাটির সঙ্গে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি যে শুধু এ পত্রিকায় লিখতেন তা নয়, পত্রিকাটি প্রকাশে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় তার উল্লেখও দেখা যায়।''.......আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম এস্থলে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর জন্য এরূপ শারীরিক ও মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে অবোধবন্ধু চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিল।''

কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ হয়। পুনঃ প্রকাশিত হয় ১৮৬৭-র ফেব্রুয়ারি থেকে প্রথম ভাগ ১২৭৩-র ফালগুনে শুরু হয়, শেষ হয় ১২৭৪-র মাঘ মাসে। নতুন আকারে দ্বিতীয় ভাগ ১২৭৫-র বৈশাখে শুরু হয়। দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা অর্থাৎ ১২৭৫-র পৌষ থেকে বিহারীলাল পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী পৌষ থেকে বিহারীলাল পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী হন। তাঁর 'নিসর্গসন্দর্শন', বঙ্গসুন্দরী', সুরবালা কাব্য প্রভৃতি পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। বিহারীলালের সম্পাদনাকালেই হেমচন্দ্রের 'ইন্দ্রের সুধাপান' (শ্রাবণ ১২৭৬) আর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের পৌলভর্জ্জীনী', 'নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত' এবং অন্যান্য রচনা এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির স্বাদ-স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ করেছেন: ''বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচনা করিবেন তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

‘জীবনাস্মৃতি’তে বাল্যকালে প্রথম ‘অবোধবন্ধু’ পাঠের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জানিয়েছে তাঁর মুগ্ধতার কথা:

“এই কাগজেই বিহারিলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। এখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।”

৮.৭ বঙ্গদর্শন

১২৭৯ সালের বৈশাখে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৮২ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত তিনি এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

‘বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা। একটি উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা। বঙ্কিম বুঝেছিলেন, ‘যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালী বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।’ তাই তিনি বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা করেন। ‘বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা’য় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: “এই পত্র আমরা কৃতাবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকোলন, এবং চিতোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।”

‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত শ্রেণীর মাধ্যমে অশিক্ষিত শ্রেণীকে আলোকিত করা, ‘বঙ্গদর্শন’কে তার মাধ্যম করা। মুখার্জি’র ম্যাগাজিনের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ লেখা একটি পত্রে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছিলেন: “I have myself projected a Bengali Magazine (বঙ্গদর্শন) with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes.”

‘বঙ্গদর্শন’ এই পত্রিকা-নামের পেছনে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘Bengal Spectator’ পত্রিকার প্রভাব থাকা সম্ভব।

‘বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা’য় বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন: “আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।” সেজন্যে বঙ্গদর্শনে উন্নত মানের উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, রসরচনা, সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হতো। প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সংগীত, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’, ‘ইন্দিরা’ ছোট, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘যুগলাঙ্গুরীয়’, ‘লোকরহস্য’, ‘বিজ্ঞানরহস্য’, ‘কমলাকান্তের দপ্তর’, ‘সাম্য’ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

পাঠক মনোরঞ্জোনের জন্যে এবং বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্যে তিনি আপাতলঘু রঙ্গব্যঙ্গাত্মক রীতিতে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। ‘লোকরহস্য’ এ ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর রচনাগুলি তার নিদর্শন। এ সমস্ত লেখায় হাল্কা সুরে তিনি গভীর কথা শুনিয়েছেন। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই স্বভাব দার্শনিক, কবি, স্বদেশ প্রেমিক কমলাকান্তের আবির্ভাব।

‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত না হলে আদৌ কমলাকান্তের আবির্ভাব ঘটতো কিনা সন্দেহ আছে। ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদনা না করলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ধারা বোধকরি ভিন্ন হতো। এই পত্রিকার তাগিদেই বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি উপন্যাস ও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই তাঁর কলমে সাহিত্য সমালোচনার আধুনিক রীতির সূত্রপাত ঘটে। সাহিত্য সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন সাহিত্যধারাকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তেমনি পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্য সমালোচনাকেও প্রভাবিত করেছেন। সমালোচক বঙ্কিমের প্রশংসায় লেখকেরা যেমন উৎসাহিত হয়েছেন, তেমনি নিন্দায় সচেতনও সতর্ক হয়েছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পক্ষপাত শূন্য।

‘বঙ্গদর্শন’কে কেন্দ্র করে শক্তিশালী একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। প্রয়োজনে বঙ্কিম তাঁদের লেখা সংশোধন করেছেন। এভাবে তিনি বহু লেখক তৈরি করেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীলচন্দ্র মজুমদার, জগদীশ নাথ রায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম।

‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের খোলনলচে পাল্টে দেন।

‘বঙ্গদর্শন’ বঙ্কিমের সাহিত্য সৃষ্টিতে জোয়ার আনে। ‘বঙ্গদর্শন’ বন্ধ হলে তাঁর রচনার গতিও স্তিমিত হয়।

বাংলা সামরিক পত্রিকার ইতিহাসে বঙ্গদর্শনের একটি স্থায়ী মূল্য আছে। এমন উন্নত মানের পত্রিকা এর পূর্বে আর প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন: “বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।” (জীবনস্মৃতি)

কর্মব্যস্ততা ও সময়াভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের প্রকাশ রহিত করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে ১২৮৫ সালের চৈত্র, ১২৮৭ সালের বৈশাখ থেকে ১২৮৮ সালের আশ্বিন, ১২৮৯ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হয়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১২৯০এর কার্তিক থেকে মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৩০৮-এর বৈশাখ থেকে ১১৩১২-র চৈত্র পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি সত্যজিৎ চৌধুরীর সম্পাদনায় নৈহাটি থেকে ‘বঙ্গদর্শন’ পুনঃ প্রকাশিত হচ্ছে। অবশ্য মাসিক নয়।

৮.৮ প্রচার

১৮৮৪ খ্রিস্ট্রাব্দের জুলাই মাসে, ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচালনায় নব্য হিন্দুধর্মের মুখপত্ররূপে ‘প্রচার’ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সীতারাম’ উপন্যাসটি এতে প্রকাশিত হতে থাকে। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালের মাঘ পর্যন্ত। অবশ্য মাঝখানে কয়েক মাস বন্ধ ছিল। এ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ধর্মজিজ্ঞাসু। তাঁর সেই ধর্মজিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায় ‘প্রচার’ ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘নবজীবন’ পত্রিকায়। ‘প্রচার’ পত্রিকার ১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ‘হিন্দুধর্ম’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘ভারতী’তে ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। ‘প্রচার’ পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ম চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তাঁর গভীর মনস্বিতার প্রমাণ মেলে। তিনি কৃষকে

ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে দেখেন এবং কৃষ্ণ সম্পর্কে শাস্ত্রাদিতে প্রচলিত অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্জন করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংস্কারমুক্ত, যুক্তিনিষ্ঠ। এভাবে কৃষ্ণচরিত্রকে তাঁর আগে দেখা হয় নি।

আলোচ্য পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের দেবতত্ত্ব বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'শ্রীমদ্ ভগবদগীতা'র ব্যাখ্যাতেও তিনি প্রবৃত্ত হন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত তিনি ব্যাখ্যা করেন। উভয় রচনাই অস্পূর্ণ থাকে।

'প্রচার' পত্রিকায় আরও অনেকেই লিখতেন। হেমচন্দ্র অনুজ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রমুখের নাম উল্লেখ করা চলে। অক্ষয়কুমারের 'অলস জোহনাময়ী নিথর যামিনী' (১২৯৩ ভাদ্র), 'ভালবাসা' (১২৯৩ ফাল্গুন), 'সে' (১২৯৫ জৈষ্ঠ্য) কবিতাসমূহ প্রচারে প্রকাশিত হয়। নবকৃষ্ণের 'শেষ' কবিতাটি ১২৯৫ সালের প্রচারে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি ছন্দোনৈপুণ্য প্রশংসালযোগ্য: গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন। (আর) গাহেনা পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ। দুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব কলিকা সনে, মধুরতর নাহি সে আর সমীর-ধীর-সঞ্চরণ।।

৮.৯ নবজীবন

১২৯১ সালের শ্রাবণে অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত। পত্রিকাটি ছিল মাসিক। আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৯৬ সালের ভাদ্র মাসে। পত্রিকাটি ছিল উচ্চ মানের। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ অনেকেই এ পত্রিকায় লিখতেন। স্বয়ং অক্ষয়চন্দ্রের 'বদরসিক', 'কুঞ্জ সরকার', 'সুন্দর বনে ব্যাখ্যাধিকার', 'হলধর ঘটক', 'পূজার গল্প' এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এগুলি লঘুরসের রচনা। এছাড়াও তাঁর আরও অনেক রচনা পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রে ধর্মতত্ত্বের অংশ বিশেষ প্রথমে নবজীবনে প্রকাশিত। ১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাক্ষরবিহীন ব্যঙ্গ রচনা এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে রহস্যছলে জানানো হয় যে ভানুসিংহ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেও হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজপথের কথা' গল্পটি 'নবজীবন'-এর ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দু বিবাহ' গ্রন্থাগারে প্রকাশের পূর্বে 'নবজীবন'-এ মুদ্রিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ 'নবজীবন'-এ প্রকাশিত। যেমন—'মহাশক্তি' (পৌষ ১২৯১) , 'বিবর্ত্তন' (বৈশাখ ১২৯২), 'মহাতরঙ্গ' (অগ্রহায়ণ ১২৯২), 'জড়জগতের বিকাশ' (আষাঢ় ১২৯৩), 'সৃষ্টিতত্ত্ব' (শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৯৩), 'বৈদেশিক সভ্যতা' (শ্রাবণ ১২৯৪)। 'নবজীবন'-এর একটি রচনার অংশ বিশেষ এখানে উধ্বারযোগ্য: ভাই হাততালি! তোমার দুটী হাতে ধরি, তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও, — তোমার চট্‌চট্ গর্জনে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিড়ম্বনায় অগাধ জলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়া ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি! আর আমাদিগকে ডুবাইয়া দিবার জন্য তোমার এত আড়ম্বর কেন?'' (অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভাই হাততালি, মাঘ ১২৯১)।

৮.১০ ভারতী

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন বন্ধ হলে উন্নত মানের একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'ভারতী'র জন্ম। প্রধানত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহেই এ পত্রিকার আবির্ভাব। প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম প্রকাশ ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে। পত্রিকাটি ছিল মাসিক। পত্রিকার নামকরণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। প্রথম সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকা-নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লেখেন: 'ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর অর্থ বানী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বানী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য...।'

রয়্যাল আট পেজি পাঁচ ফর্মার পত্রিকা। মূল্য বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা। প্রথমে প্রতি মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হতো। তারপর মাসের ১ তারিখে। প্রথম সংখ্যা ছাপা হয় পাঁচশো কপি। পরবর্তীকালে কোনও কোনও সংখ্যা এক হাজার কপি করে ছাপানো হয়।

প্রথম সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভূমিকা' ছাড়া 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামানিক' ও 'গঞ্জিকা' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'গঞ্জিকা' কৌতুক রসাত্মক। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জ্ঞান নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা' নামে ধারাবাহিক একটি প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম কবিতা ছিল তিনটি। 'ভারতী', মেঘনাদ বধ' ও 'ভিখারিনী'। 'মেঘনাদ বধ কাব্য' মেঘনাধ বধ কাব্যের সমালোচনা। ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। 'ভিখারিনী' গল্প। এছাড়া ছিল অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর ধারাবাহিক রচনা, বঙ্গসাহিত্য ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সম্পাদকের বৈঠক' । দেশী-বিদেশী বিষয় নিয়ে রস্য রচনার আকারে লেখা। 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় 'ভারতী' সম্পর্কে লেখা হয়: The style of the Bharati is extremely good and graceful. It is completely free from faults of imitation and mannerism.

সাহিত্য ছাড়া রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা, অভিনয়, ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ ও পত্রিকায় স্থান পেতো। গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে সাহিত্যের দিকটি সমৃদ্ধছিল। গ্রন্থ সমালোচনাও প্রকাশিত হতো। ছিল বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ।

১২৮৪-র শ্রাবণ থেকে ১৩৩৩-এর কার্তিক পর্যন্ত আয়ুষ্কালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণময়ী দেবী ও সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতবর্ষের বাইরেও এ পত্রিকার প্রচার ছিল। 'ভারতী' ঠিক সময়ে প্রকাশিত হতো।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য কাব্য-কবিতা: কবি কাহিনী, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, জুতা আবিষ্কার, তোমরা এবং আমরা, দুঃসময়, দীনদান, দেবতার গ্রাস, নববর্ষা, পসারিনী, বর্ষশেষ, বর্ষামঙ্গল, ভানুসিংহের কবিতা, মদনভস্মের পর, মদন ভস্মের পূর্বে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বপ্ন ইত্যাদি। অতিথি, ডিটেকটিভ, দেনাপাওনা, অধ্যাপক, দুরাশা, দুর্বুদ্ধি, দৃষ্টিদান, নতুন পুতুল, নষ্ট নীড়, নামের খেলা, পণরক্ষা, পরীর পরিচয়, বিদূষক, মীনু প্রভৃতি গল্প ভারতী পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। 'করুণা' উপন্যাস কিংবা চিরকুমার সভা'র মতো নাটক ও এ পত্রিকায় লেখেন। অন্তর বাহির, ঐতিহাসিক উপন্যাস, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কাব্যের উপেক্ষিতা, গ্রাম্য সাহিত্য, ছোট ও বড়, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি প্রবন্ধ এ পত্রিকাতেই প্রথম মুদ্রিত। অবনীন্দ্রনাথের 'আলোর ফুলকি' উপন্যাস, 'ছেলে ভোলানো ছড়া' কিংবা 'বাংলার ব্রত' প্রবন্ধ, 'নানক'-এর মতো গল্প 'ভারতী' তেই প্রকাশিত হয়। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লিখেছিলেন 'কর্মফল', 'নারায়নী', 'শিরী-ফরিদ' নাটক। এ পত্রিকার উল্লেখযোগ্য লেখকেরা হলেন:

অক্ষয়কুমার বড়াল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অনুরূপা দেবী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অমৃতলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, আশুতোষ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, জলধর সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেন্দ্রকুমার রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, নরেন্দ্র দেব, নিরুপমা দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। 'ভারতী' জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত। এ পরিবারের অনেকেই এ পত্রিকায় লিখতেন। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের বাইরেও এ পত্রিকার বৃহত্তর একটি লেখকগোষ্ঠী ছিল। 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে সৃষ্টির একটা জোয়ার এসেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

রবীন্দ্র জীবনে এ পত্রিকার গুরুত্ব কম নয়। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি গদ্য-পদ্যের জুড়ি হাঁকিয়েছেন। দেখা দিয়েছে সৃষ্টি-প্রাচুর্য।

বিভিন্ন পর্বে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করে স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী নিঃসন্দেহে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কৃতিত্ব এ পত্রিকার, বহু লেখিকার সমাবেশে। অনঙ্গমোহিনী দেবী, অনুজা ঘোষ, অনুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, অমলা দেবী, অমিয়বালা দেবী, আমোদিনী ঘোষজায়া, ইন্দিরা দেবী (সুরূপা দেবী), ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, উমাশশী দেবী, ঊর্মিলা দেবী, ঊষাপ্রভা দেবী, কমলা দেবী, কল্যানী দে, কৃষ্ণভাবিনী দাস, গিরিবালা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, নিরুপমা দেবী, নিস্তারিনী দেবী, নীহার বালা দেবী, প্রতিভা দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী, প্রভাময়ী মিত্র, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, বিনয়কুমারী বসু প্রমুখ লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে এ পত্রিকায়।

প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ: ভারত ষড়ঙ্গ, শিল্প ও শিল্পী, শিল্পের ত্রিধারা। প্রাচীন ভারত হয়েছে অবিনাশচন্দ্র দাসের প্রবন্ধের বিষয়: ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব, কিষ্কিন্ধ্যার অবস্থান, প্রাচীন ভারতে রাজ্য শাসন প্রণালী। জাতিতত্বের আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন অমূল্যভূষণ বিদ্যাচরণ, কিরাত জাতি, কুকী, তিপ্রা বা তিপারা জাতি। আবার বাংলা ব্যাকরণ অভিধান বিষয়েও তাঁর কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায় 'বাঙ্‌লার প্রথম ঃ প্রথম বাঙ্‌লা ব্যাকরণ' কিংবা 'প্রথম বাঙলা অভিধান' প্রবন্ধে। 'গার্হস্থ্য চিকিৎসাবিদ্যা', 'ভারত ভৈষজ্য তত্ত্ব' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন অম্বিকাচরণ রক্ষিত। অমিতকুমার হালদারের আগ্রহ 'অজন্তা', 'অজন্তার খোদিত শিল্প', 'ভারতশিল্প', 'ভাস্কর্য' ইত্যাদি বিষয়ে। উচ্চশিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদি হলো আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয়। চীনের ধর্ম ও শিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন আশুতোষ রায়। জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার, নৌচালন বিদ্যা, ফরাসী দেশের চিত্রশালা নিয়ে লিখেছেন ইন্দুমাধব মল্লিক। তুকারাম, বৌদ্ধ কা উপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধের বিষয়। অব্দ, আদিশূর ইবনবতোতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত, উড়িষ্যার ইতিহাস, এম. বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, উড়িষ্যার ইতিহাস, এম. বার্নিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, গুপ্ত রাজগণ, চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব, জাজনগর রাজ্য, লিচ্ছবি রাজগণ, হিয়োন সাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ ইত্যাদি কৈলাসচন্দ্র সিংহের উপজীব্য। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'ভাষা-রহস্য', 'ভাষার গঠন ও উন্নতি', 'লিখন সৃষ্টির ইতিহাস' জাতীয় প্রবন্ধ। 'অযোধ্যা', 'কর্নপ্রয়াগ', ' দেব-প্রয়াগ', 'নন্দ-প্রয়াগ', 'বদরিকাশ্রমে', 'যোশীমঠ', 'রুদ্র প্রয়াগ', 'শ্রীনগর' ইত্যাদি ভ্রমণবৃত্তান্ত পরিবেশন করেছেন জলধর সেন। 'আধুনিক জাপান', 'আধুনিক ভারত ও য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব', আধুনিক য়ুরোপীয় সঙ্গীত' 'কালিদাসের নাটক' 'জুলিয়ার সীজার' প্রভৃতি বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহ দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শঙ্করাচার্যের দার্শনিক সিধান্ত', 'কাপ্টে র দর্শন ও বেদান্ত দর্শন', ' দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ' জাতীয় প্রবন্ধে দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ। ....নাথ ঠাকুরের 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী',

‘বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস’, ‘ভারতচন্দ্ররায়’, ‘মুকুন্দরাম চক্রবর্তী’ ‘ মেঘদূত’ প্রভৃতি প্রবন্ধে সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় লভ্য। এককথায় স্বাদবৈচিত্র্যে ‘ভারতী’ পত্রিকা ছিল অসাধারণ।

৮.১১. বালক

‘বালক’ মাসিক পত্রিকা। ১২৯২-এর বৈশাখ মাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। উদ্দেশ্য, ঠাকুরবাড়ির অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের লেখায় ও লেখা প্রকাশে উৎসাহ দেওয়া। সেজন্য তাদের লেখা যেমন এ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও অন্য লেখকদের বালক পাঠোপযোগী গদ্য-পদ্য রচনাদিও মুদ্রিত হতে থাকে। পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্বে অবশ্য ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ‘বালক’ পত্রিকার তাগিদেই তিনি ছোটদের জন্য গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক রচনা সুরু করেন। বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়। প্রথম সংখ্যাতেই ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ কবিতা। আষাঢ় সংখ্যায় ‘সাত ভাই চম্পা’। প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হলো তাঁর ‘মুকুট’ গল্পটি। ১২৯২-এর আষাঢ় সংখ্যা থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস। হাস্যকৌতুক জাতীয় বেশ কয়েকটি নাটিকাও তিনি এ সময়ে রচনা করেন। ‘বালক’ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশিত হয়। যেমন রোগের চিকিৎসা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২), পেটে ও পিঠে (আষাঢ় ১২৯২), ছাত্রের পরীক্ষা (শ্রাবণ ১২৯২), অভ্যর্থনা (ভাদ্র ১২৯২), চিন্তাশীল (আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২) , ভাব ও অভাব (অগ্রহায়ণ ১২৯২), রোগীর বন্ধু (পৌষ ১২৯২), খ্যাতির বিড়ম্বনা (মাঘ ১২৯২), আর্থ ও অনার্থ (ফাল্গুন ১২৯২), ডেডে পিঁপড়ের বক্তব্য (চৈত্র্য ১২৯২)। ১২৯২ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় একটি প্রবন্ধ, ‘রুদ্ধগৃহ’ ‘মৃত্যুকে আমরা যেমন ভয় করি বিস্মৃতিকেও আমরা তেমনি ভয় করি। .....বিস্মৃতি মাঝে মাঝে আসিয়া স্মৃতির শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া যায়।..... একটি জীবনের মধ্যেও শতসহস্র বিস্মৃতি চাই, তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে।’’

১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত ... চিরঞ্জীবেষু’ ও ‘শ্রীচরণেষু’ শিরোনামে কল্পিত ঠাকুর্দা ও নাতির মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়, সেগুলিও রবীন্দ্রনাথের রচনা। দুই কুলের দৃষ্টিভঙ্গি পত্রগুলিতে প্রকাশিত। পরিকল্পনার অভিনবত্ব অনস্বীকার্য।

‘বালক’ পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ও পোষ ১২৯২) রাস্কিনের অনুবাদ, বলেন্দনাথের ‘একরাহি’ প্রবন্ধ (জৈষ্ট ১২৯২) ও ‘সন্ধ্যা’ কবিতা (ফাল্গুন ১২৯২), সুবীন্দ্রনাথের ‘স্বাধীনতা’ (বৈশাখ ১২৯২) প্রকাশিত হয়।

১২৯৩ সালের বৈশাখ থেকে ‘বালক’ ‘ভারতী’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়।

৮.১২. সাধনা

পত্রিকাটি মাসিক। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র। সুধীন্দ্রনাথ নামেই সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ কান্ডারী ও ভান্ডারী। প্রথম সংখ্যা থেকেই তাঁর ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়রি’ প্রকাশিত হতে থাকে। রোজনামচার আকারে লেখা আড়াই মাসের বিদেশ ভ্রমণের কাহিনী। দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর ‘আহারতত্ত্ব’ প্রবন্ধের প্রতিবাদে লেখেন ‘আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর মত প্রবন্ধটি। বিতর্ক জমে ওঠে। মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘কর্মের উমেদার’ প্রবন্ধটি। একই সংখ্যায় ‘স্ত্রী মজুর’ নামে তাঁর আর একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এদেশে স্ত্রী মজুরদের সমস্যা নিয়ে এটাই বোধহয় প্রথম আলোচনা। ‘দালিয়া’ গল্পটি এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়।

‘সাধনা’র প্রথম সংখ্যা থেকেই সাময়িক বাংলা পত্রিকা সমালোচনার একটি বিভাগ চালু হয়। বিলাতি পত্রিকা থেকেও নানাবিধ রচনার সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গল্প ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’, পৌষে ‘সম্পত্তি-সমর্পণ’, মাঘে ‘দালিয়া’, ফাল্গুনে ‘কঙ্কাল’, চৈত্রে ‘মুক্তির উপায়’। ১২৯৯-এর বৈশাখে ‘ত্যাগ’, জ্যৈষ্ঠে ‘এক রাহি’, আষাঢ় ‘একটি আষাঢ়ে গল্প’, শ্রাবণ-ভাদ্রে ‘জীবিত ও মৃত’, আশ্বিনে ‘রীতিমতো নভেল’ এবং ‘স্বর্ণমৃগ’ কার্তিকে ‘জয়-পরাজয়’, অগ্রাহাণে ‘কাবুলিওয়ালা’ পৌষে ‘ছুটি’, মাঘে ‘সুভা’, ফাল্গুনে ‘মহামায়া’, চৈত্রে ‘দান প্রতিদান’, ১৩০০-র বৈশাখে ‘সম্পাদক’, জৈষ্ঠে ‘মধ্যবর্তিনী’, আষাঢ়ে অসম্ভব কথা’, শ্রাবণে ‘শাস্তি’ ভাদ্রে ‘একটি পুরাতন গল্প’, আশ্বিন-কার্তিকে ‘সমাপ্তি’ ইত্যাদি।

‘সাধনা’য় শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আটটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১২৯৮-এর চৈত্রে ‘নিছনি’ (১), ১২৯৯-এর বৈশাখে ‘নিছনি’ (২), জ্যৈষ্ঠে ‘পঁহু’ আষাঢ়ে ‘স্বরবর্ণ অ’, শ্রবণে ‘পঁহু প্রত্যুত্তর (১), কার্তিকে ‘স্বরবর্ণ এ’, অগ্রহায়ণে ‘টা টে টো’, চৈত্রে পঁহু প্রত্যুত্তর (২)’। ১২৯৯-এর শ্রাবণে প্রকাশিত হয় ‘বাংলা শব্দ ও ছন্দ’। ‘সাধনা’তেই প্রকাশিত হয় ‘পঞ্চভূতের ডায়রি।

১২৯৯-এর ভাদ্রে প্রকাশিত হয় ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাট্যকাব্য ও ‘ গোড়ায় গলদ’ প্রহসন।

‘সমৃদ্ধের প্রতি’ কবিতাটি ১৩০০ সালের বৈশাখ সংখ্যা ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ‘এবার ফিরাও মোরে’ চৈত্রে।

এ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা হলো ‘পয়সার লাঞ্ছনা’ (জ্যৈষ্ঠ ১৩০০), প্রাচীন দেবতার নতুন বিপদ’ (আষাঢ় ১৩০০); আরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি’ (ভাদ্র ১৩০০)

সুপরিচিত ‘শিক্ষার হের ফের’ প্রবন্ধটি ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত। ‘রাজসিংহ’ ১৩০০-র চৈত্রে। ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধটি ১৩০১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

‘সাধনা’র চতুর্থ বর্ষে (১৩০১-১৩০২) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ‘সাধনা’ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ এ পর্বে ‘সাধনায় প্রকাশিত হয়। বস্তুতপক্ষে ‘সাধনা’ পত্রিকা আশ্রয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রাচুর্য দেখা যায়।

‘সাধনা’ পত্রিকার একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেন্দনাথ ঠাকুর, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই এ পত্রিকায় লিখতেন। ১৩০০ সালের অগ্রাহায়ণে জগদানন্দের সাময়িক সারসংগ্রহ গর্জন ও বর্ষণ ১৩০১ সালের আষাঢ়ে প্রতীচ্য গণিত মুদ্রিত হয়।

বলেন্দনাথের কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, জয়দেব, পশুপ্রীতি, কাব্যে প্রকৃতি, রবিবর্মা, হিন্দু দেবদেবীর চিত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত।

‘সাধনা’ পত্রিকার আয়ুষ্কাল স্বল্প। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার একটি স্থায়ী মূল্য আছে।

৮.১৩ বঙ্গবাসী

‘বঙ্গবাসী’ সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮, ১৮৮১-র ১০ ডিসেম্বর। পত্রিকাটি ছিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র। উনিশ শতকের বাংলায় যে ধর্ম সংখ্যা দেখা যায়, তাতে কয়েকটি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মুলপত্র ‘তত্ত্ববোধিনী’, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুলপত্র ‘তত্ত্বকৌমুদী’, নব্য হিন্দু সমাজের মুলপত্র ‘নবজীবন’ ও ‘বঙ্গবাসী’-কে আশ্রয় করে এই ধর্মসংখ্যাও তীব্র হয়ে ওঠে।

সম্পাদক ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। পত্রিকাটি অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে সময় মফস্বলে পত্রিকা বলতে 'বঙ্গবাসী'কেই বোঝাতো। 'বঙ্গবাসী'র বৈশিষ্ট্য তা ছিল খাঁটি বাঙালিয়ানার পৃষ্ঠপোষক। এ পত্রিকার অধিকাংশ রচনাই রঙ্গব্যঙ্গাত্মক। এগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে ছিল সহজবোধ্য। যোগেন্দ্র চন্দ্র এ পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। তাঁর রঙ্গব্যঙ্গাত্মক রচনার দ্বারা পরবর্তীকালের ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় অনুপ্রণিত হন।

চন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গবাসী'র আর এক উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিরূপ। রবীন্দ্রনাথ এঁদের ব্যঙ্গ করে 'শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৮.১৪. হিতবাদী

'হিতবাদী' সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭ জৈষ্ঠ ১২৯৮, এর মে ১৮৯১। সে সময় দুটি সপ্তাহিক পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। 'বঙ্গবাসী' গোঁড়া হিন্দুধর্মের প্রচারক, 'সঞ্জীবনী' সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূখ পত্র, যা কিছু পুরানো তারই বিরুধে। সত্যিকার সাহিত্যপত্রের সে সময় অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণের জন্যই 'হিতবাদী'র আবির্ভাব। পত্রিকার নামকরণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই এ পত্রিকার motto ঠিক করে দেন 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ'। প্রধান সম্পাদক হন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক হন রবীন্দ্রনাথ এবং মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় হন রাজনৈতিক সম্পাদক। পত্রিকাটির মূলধন ছিল পঁচিশ হাজার টাকা। এই টাকা আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়। এভাবে যৌথ মালিকানায় পত্রিকা প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ও সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে এর আগে দেখা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটিতে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ছোটগল্প লিখতেন। তার দেনাপাওনা, পোষ্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুধিতা, ব্যবধান, তারা প্রসন্নের কীর্তি গল্পগুলি 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত হয়। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন ''হিতবাদীর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ মাস দেড়েকের বেশি ছিল না; কর্মকর্তাগণের ফরমাশ হইয়াছিল যে গল্পগুলি আরোও লঘুভাবে লিখিলে ভালো হয়। তাঁহারা সাপ্তাহিকের জন্য বোধ হয় হাল্কা গল্প চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আর্টিস্টের পক্ষে ফরমাইশি গল্প লেখা অসম্ভব; অল্পদিনের মধ্যে হিতবাদীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইল।'' (প্রথম খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ. ৩১০)

রবীন্দ্রনাথ এ পত্রিকায় প্রবন্ধও লিখেছেন। একটি প্রবন্ধের নাম 'অকালবিবাহ'।

পরবর্তীকালে পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর বদল ঘটে। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২১মে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদনায় 'হিতবাদী' পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তারপর সখারাম গণেশ দেউসকর, জলধর সেন প্রমুখের চেষ্টায় আরও কিছুদিন এ পত্রিকা চালু থাকে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'হিতবাদী' বিশেষভাবে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির জন্যই।

৮.১৫ জন্মভূমি

মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১২৯৭ সালের পৌষ। 'বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত' এ পত্রিকা। এঁদের

মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুও ছিলেন। পত্রিকাটি উচ্চমানের ছিল। পত্রিকাটির উদ্দেশ সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়ঃ

সূচনা। ...... আমরা অনেকদিন হইতে একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র প্রকাশের কল্পনা করিয়া আসিতেছিলাম – কারণ আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস ভাল মাসিকপত্র ব্যতীত লোকশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সংবাদপত্রে লোকের অর্দ্ধ শিক্ষা হয়, মাসিকপত্রে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তুলে। হিন্দুর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, এই কামনা অন্তরে রাখিয়া, আমরা মাসিকপত্র প্রকাশার্থ প্রথম কল্পনা করি,.........''

পত্রিকাটির নবম ভাগের প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা (পৌষ - চৈত্র ১৩০৫) পর্যন্ত প্রকাশিত হয় বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে। তারপর পত্রিকার হাত বদল ঘটে। নবপর্যায়ের 'জন্মভূমি' নবম ভাগ - নবম বর্ষ (শ্রাবণ ১৩০৭ - আষাঢ় ১৩০৮) প্রকাশ করেন নরেন্দ্র দত্ত।

নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ'-র অংশবিশেষ 'বুধদেব' নামে 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ চৌধুরীর 'ছত্রভঙ্গ' ও 'পাণ্ডবনির্বাসন' নাটকদ্বয় এ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার বড়াল লিখেছেন 'সংসারে', 'আহ্বান', 'প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতা।

৮.১৬. বামাবোধিনী

'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে। পত্রিকাটি ছিল বামাবোধিনী সভার মুখপত্র। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ছিল পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই এদেশের স্ত্রী পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো 'কন্যায়েবং পালনীয়' শ্লোকটি। তাই এদেশের স্ত্রী সমাজের নানাবিধ সমস্যা পত্রিকাটিতে প্রকাশ পেতো। ১২৭৪ সালের ফাল্গুনে পত্রিকায় লেখা হয় ঃ ''বাল্যবিবাহ রীতি এদেশ হইতে নির্বাণ না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। বঙ্গদেশে এত বিদ্যার গৌরব, প্রতি বর্ষে এত বি. এ. এম. এ. হইতেছে কিন্তু স্ত্রী জাতির দুরবস্থা প্রায় পূর্ববৎই রহিয়াছে। আমাদিগের এই বিষয় কিছুতেই নিরাকৃত হইল না। মূর্খ, কলহপ্রিয় ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র এ সুবর্ণখণ্ডিত স্ত্রীর সহবাসে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কিরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করেন?

শুধু পত্রিকা প্রকাশ নয়, স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য পত্রিকাটি মহিলাদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজনও করতো। এদেশের সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়ে পত্রিকাটি বিনামূল্যে প্রেরিত হতো।

অন্তঃপুরবাসিনীদের শিক্ষার জন্য পত্রিকাটি একটি সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম চালু করতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য স্বামীরা এই পাঠক্রম অনুসরণে স্ত্রীদের শিক্ষা দেবে। 'বামাবোধিনী'র বক্তব্য ছিল ঃ ''স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই লইয়াই জনসমাজ হইয়াছে। অতএব স্ত্রীদের পরিত্যাগ করে কেবল পুরুষদের উন্নতি করিলে— তাহাতে জনসমাজের উন্নতি হইবে না...... স্ত্রীগণ সকলেই বিদ্যাবতী না হইলে সে দেশের কখনই প্রকৃত মঙ্গল হইবে না ইহা কয়জন ব্যক্তির মনে বিশ্বাস হইয়াছে?'' (পৌষ ১২৭২)

স্ত্রী সমাজের বহুবিধ দুরবস্থার প্রতি পত্রিকাটির দৃষ্টি ছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর পত্রিকাটির একটি প্রতিবেদন ছিল নিম্নরূপ।

মুসলমান কুলবালাগণের অবস্থার একটি চিত্র আমরা মনে করি হিন্দু রমনীরাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগা। কিন্তু মুসলমান নারীগণের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অশ্রুপাত না করিয়া স্থির থাকা যায় না। হিন্দু রমনীগণ অনেকস্থলে ঐহিক সুখে বঞ্চিত হইয়াও পারলোকিক সদ্গতি লাভের উপায় করিতে পারেন, কিন্তু মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের ঐহিক পারত্রিক উভয় পথই কণ্টকাকীর্ণ।

বধূ নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছিল 'বামাবোধিনী'। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বধূ শাসন

কলিকাতার কোন ভদ্র গৃহের ১২ বৎসরের একটি পুত্রবধূ একটি সন্দেশ চুরি করিয়া খাইয়াছিল বলিয়া জটিলা শাশুড়ী খুন্তি পোড়াইয়া তাঁহার গাত্রের নানা স্থানে দাগাইয়া দেন। সিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনের বিচারে এই শাশুড়ীর ৪ মাস কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। শাশুড়ীগণ সতর্ক হউন। সেকালের বউ জ্বালান ধর্ম্ম পালন করিবার এ সময় নয়।

৮.১৭ অনুশীলনী

১। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন।

২। বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'মাসিক পত্রিকা'র স্থান নির্দেশ করুন।

৩। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার পরিচয় দিন।

৪। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা নানা দিক থেকেই অভিনব — যথার্থ্য বিচার করুন।

৫। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকাদ্বয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৬। 'বালক', 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'হিতবাদী' পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নির্দেশ করুন।

৭। স্ত্রী সমাজের উন্নতি সাধনে 'বামাবোধিনী' পত্রিকার গুরুত্ব প্রতিপাদন করুন।

৮। টীকা লিখুন ঃ
সোমপ্রকাশ, রহস্যসন্দর্ভ, অবোধবন্ধু, বঙ্গবাসী, জন্মভূমি।

৮.১৮. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। সেন সুকুমার ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ড, ১৪০১, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৮।

২। বন্দোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ঃ সাহিত্য সাধক চরিত্রখানা ২য় খণ্ড ঃ ১৩৬২, ৩য় খণ্ড ১৩৬৮, ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ ১৩৬৫, ৮ম খণ্ড ঃ ১৩৬৯।

৩। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার ঃ রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, ১৩৭৭।

৪। চট্টোপাধ্যায় পার্থ ঃ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, ১৯৮৮

৫। দাস সুনীল ঃ ভারতী — ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী ১৯৮৪।

৬। ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন ঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, ১৯৭১।

৭। ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন ঃ রবীন্দ্রনাথসাধনা ও সাহিত্য, ১৯৮১।

একক ১ ❑ কাব্য কবিতা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ প্রমথ চৌধুরী

১.৩ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১.৪ যতীন্দ্রমোহন বাগচী

১.৫ কালিদাস রায়

১.৬ মোহিতলাল মজুমদার

১.৭ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১.৮ কাজি নজরুল ইসলাম

১.৯ জীবনানন্দ দাস

১.১০ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১.১১ অমিয় চক্রবর্তী

১.১২ বুদ্ধদেব বসু

১.১৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র

১.১৪ বিষ্ণু দে

১.১৫ সমর সেন

১.১৬ অরুণ মিত্র

১.১৭ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১.১৮ দিনেশ দাস

১.১৯ বিমলচন্দ্র ঘোষ

১.২০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১.২১ সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

১.২২ গোলাম কুদ্দুস

১.২৩ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১.২৪ শঙ্খ ঘোষ

১.২৫ তরুণ সান্যাল

১.২৬ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

১.২৭ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১.২৮ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১.২৯ বিনয় মজুমদার

১.৩০ অমিতাভ দাশগুপ্ত

১.৩১ অনুশীলনী

১.৩২ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য কবিতার ইতিহাস ও পালাবদলের ধারাটি জানতে পারবেন ও প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে পারবেন। এই এককটির মনোযোগী পাঠ আপনাকে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনে সাহায্য করবে—

- রবীন্দ্র-সমকালীন কবি এবং রবীন্দ্র-অনুসারী কবিগোষ্ঠীর কাব্যধারা
- পালাবদলের ইঙ্গিত—মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতা
- কল্লোল যুগ—বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দেশকাল এবং কাব্যধারা
- জীবনানন্দ দাশ—রবীন্দ্র পরবর্তী কালের এই বিশিষ্ট কবির কাব্যজগৎ
- সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেব বসু-প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বিষ্ণু দে-র স্বতন্ত্র কাব্যধারা
- চল্লিশের দশকের পটভূমি এবং সমকালীন কবিগোষ্ঠীর কবিতার বৈশিষ্ট্য

১.১ প্রস্তাবনা

আপনি এই এককটি পাঠ করলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্যের দেহান্তর এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা কাব্যকবিতায় যে পালাবদল ঘটেছিল তার একটি রূপরেখা অনুধাবন করতে পারবেন। এই এককটিতে আপনারা লক্ষ করবেন রবীন্দ্রনাথের সমকালবর্তী এবং কবির নিকট-আত্মীয় হলেও তাঁর প্রভাব-মুক্ত মননশীল এক কবি, প্রমথ চৌধুরীর কবিতারচনার স্বাতন্ত্র্য। ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন বলা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায় এঁরা ভাবে-ভাবনায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় শিরোধার্য করেছিলেন। কিন্তু সমকালবর্তী হলেও লক্ষ করবেন, মোহিতলাল প্রমুখর কবিতায় একটা নতুন সুর এসে লাগল। ব্যাপক অর্থে এরা রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মধ্যে আলোচিত হলেও এঁদের কবিতাতেই রবীন্দ্র-বৃত্তের বাইরে আসার একটা ভাবনা কাজ করেছিল।

এই সূত্র ধরেই আপনারা দেখবেন বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে শুরু হল কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'আধুনিক' কবিতার আন্দোলন। 'কল্লোল' পত্রিকায় কয়েকজন নব্যযুবক নতুন ভাব ও রূপের জোয়ার আনতে চাইলেন সাহিত্যে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নানা প্রতিক্রিয়া, বিধ্বস্ত য়ুরোপ ও বিপর্যস্ত বিচলিত বাংলা দেশ তার সবটুকু

দারিদ্র্য দীনতা আর বিকৃতি নিয়ে বা 'বাস্তব' নিয়ে ধরা দিল সমকালীন রচনায়। এই সময়টি বাংলা কাব্যধারার গতিপথ অনুধাবনে খুব জরুরি। লক্ষ্য করবেন বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে এইসময়ের কবিতার ভাষা এবং প্রকরণ কৌশলও।

জীবনানন্দ দাশ এইসময়েই সৃষ্টি করেছেন তাঁর কবিতার এক অ-পূর্ব জগৎ-সুর-রিয়ালিজম্ বা অতিবাস্তবতা যেমন তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ, তেমনই ইমপ্রেশনিস্ট কিংবা ফবিস্ট কিংবা ফিউচারিস্টদের মতোই তাঁর কবিতায় আলোছায়ার ইশারা, কঠিনতা এবং যুগযন্ত্রণায় গভীর ক্লান্তি ও মৃত্যুচেতনা। ইতিহাস-চেতনা তাঁর কবিতায় একটা আলাদা মাত্রা নিয়ে এল, শব্দনির্বাচনে জীবনানন্দ যে প্রচলিত সংস্কার বর্জন করে কবিতার সীমানাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা অনুসৃত হয়েছিল তাঁর পরবর্তী কবিগোষ্ঠীর দ্বারাও। সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখর কবিতাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল বিদেশি সাহিত্যের জগতে তাঁদের অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দ পরিক্রমণ। এইখানে লক্ষ্য করবেন বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সংকেত।

চল্লিশের দশক পাশ্চাত্যে যেমন, এদেশেও তেমনই প্রচণ্ড সংকটের কাল। অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিবেশ, বিপন্ন অর্থনীতি আর সমাজ-পরিবেশ মননশীল কোনো কবিকেই আর অবিচলিত থাকতে দিল না। এই পর্বে রাজনীতিনির্ভর সমাজ-সচেতন কবিতা রচনার পাশাপাশি মূলত এরই প্রতিক্রিয়ায় রোমান্টিক কবিতার চর্চাও লক্ষ্য করা যাবে। সমর সেন, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস প্রমুখর কবিতা এইসময়ের দর্পণ। আপনারা লক্ষ্য করবেন, এই পর্বের কবিতায় উচ্চকিত হয়েছে রাজনৈতিক মতাদর্শ তথা সাম্যবাদী চেতনা।

এই এককটির নিবিড় পাঠ প্রমথ চৌধুরী থেকে দিনেশ দাস পর্যন্ত বাংলা কবিতায় যে কালান্তরের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দেশকালের পরিবর্তিত পটভূমি কীভাবে বিচলিত করেছে বাংলা কবিতার প্রবহমান ধারাটিকে, প্রতীচ্যের অভিঘাতে দেশীয় দুর্গতিতে এবং এরই মধ্যে ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার আকাঙ্ক্ষায় বাংলা কবিতার যে পরিবর্তনশীল গতিপ্রকৃতি, সে সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত করবে।

১.২ প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

কালগত বিচারে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রযুগের কবি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের সমকালবর্তী এবং নিকট-আত্মীয় হলেও তাঁর সম্ভাব্য প্রভাব থেকে প্রমথ চৌধুরী নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। তিনি মননধর্মী সাহিত্যিক, হৃদয়াবেগের থেকে তাঁর লেখায় মননের দীপ্তিই প্রখর। পারিবারিক আবহাওয়া, বিদেশি সাহিত্য-অধ্যয়ন, সর্বসংস্কার-বর্জিত প্রগতিশীল যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাব এবং মুখের ভাষাকে সাহিত্যে অবাধে ব্যবহারের সংকল্প প্রমথ চৌধুরীর স্বতন্ত্রতার দ্যোতক। অনবদ্য গদ্য লিখেছেন, লিখেছেন কিছু সনেটও। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাবালু অক্ষম অনুকরণে ক্ষুব্ধ প্রমথ চৌধুরী সনেটের উজ্জ্বল কঠিন গঠনের মধ্যেই দেখতে পেয়েছিলেন আপন শিল্পী-মনের মুক্তির পথ—ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন/শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন। 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) ও 'পদচারণা' (১৯১৯) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। প্রথমোক্ত কাব্যের সূচনায় তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্কাকে গুরু-প্রণাম জানিয়েছেন, যদিও বলেছেন 'আমি ফরাসী সনেটের ছাঁচই অবলম্বন করেছি,' এই দুটি গ্রন্থে ফরাসি সনেটের প্রভাবই স্পষ্ট। ক খ খ ক ক খ খ ক, গ গ চ ছ ছ চ ছ—এই ধরনের মিল ফরাসি সনেটেই দেখা যায়। তবে তাঁর সনেটে নবম ও দশম চরণদুটির মিত্রাক্ষর পয়ার রূপে ফরাসি প্রভাব থাকলেও দশম চরণান্তে ভাবের সমাপ্তি ঘটানো একান্তভাবেই প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তা। ফলে মিল ও ভাব, সবদিক থেকেই তাঁর সনেট ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সনেটে প্রমথ বীণাপাণিকে খড়্গপাণি মূর্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন। 'আবেগাত্মক নয়, চিন্তাপ্রধান কাব্যই তাঁর বৈদগ্ধ্য ও শীলিত রুচির স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক'। 'পদ চারণা'য় তিমি Terza Rima প্রয়োগ

করতে চেয়েছেন নিজের মতো করে। সনেট নিয়ে তাঁর এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। আর কৃষ্ণনাগরিক কবি যখন বাণভট্টের চরিত্রকে আহ্বান করে লেখেন—'গিরি পুরী লঙ্ঘি, সিন্ধু কান্তার বিজন,/মনোরথে নীলাম্বরে ভ্রমি যবে একা/মম অঙ্কে এসে বস, কবির সৃজন,/তাম্বুল করঙ্ক করে তুমি পত্রলেখা।'—তখন মনে হয়, তাঁর সব সনেটেই বীণাপাণি 'খড়গপাণি মূর্তিতে' আবির্ভূত নন।

১.৩ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

১৮৯০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যকে প্রায় চালনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তিনটি পর্যায়ে এই কাললগ্ন কবিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছেন। প্রথম পর্যায়ে ছিলেন উনিশ শতকের শেষপাদের কবিরা— দেবেন্দ্রনাথ সেন-অক্ষয়কুমার বড়াল-বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। দ্বিতীয় স্তরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনুসারী কবিসমাজ—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ ছিলেন এই দলে। তৃতীয় পর্যায়ে কল্লোল ও উত্তরকালের কবিকুল—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অবশ্যই জীবননান্দ দাশ, এঁরা রবীন্দ্রপ্রভাবকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। সিদ্ধির বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য—"রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমুখ সাহিত্যিক বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জন্মাননি এবং পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, অনুভূতির রাজ্যে সুদ্ধ তারা এমন কোনো পথের সন্ধান পায়নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই। বস্তুত তাঁর দিগ্বিজয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থান্তর ঘটেছে, তা এই : তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের অনেক জমি জোতদারদের দখলে এসেছে এবং তাদের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, তারা নিজের নিজের এলাকায় শস্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে মাত্র, ফসলের জাত বদলাতে পারেনি।"

মূলত ভারতী-প্রবাসী-বিচিত্রা-মানসী ও মর্মবাণী-ভারতবর্ষ-যমুনা ইত্যাদি পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ কাব্যসাধনায় রত ছিলেন। বাংলা দেশের গ্রামজীবন, নিসর্গপ্রকৃতি, লোক-সংস্কৃতি, পুরাণ-বৈষ্ণবকাব্য-মঙ্গলকাব্যাদির ঐতিহ্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে এঁরা রক্ষা করেছেন, তাঁদের রচনায় নতুন মর্যাদা দিয়েছেন অতীতকথাকে। রোমান্টিক প্রকৃতি ধ্যান, আস্তিক্য চেতনা, গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি আকর্ষণ, কখনো ব্যক্তিগত প্রেম-ক্ষণিক মিলনতৃপ্তি বা ব্যর্থতা এবং কখনো স্বদেশপ্রেম আর সব মিলিয়ে একটা শান্ত-শুভ-আদর্শময় পৃথিবীর ছবি এঁদের লেখায় ফুটে উঠেছে। সমকালীন সমাজচেতনার প্রতিফলন তুলনায় কিছু কম এখানে।

পিতামহ অক্ষয়কুমারের তথ্যদৃষ্টি ও জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রিয়তা এবং রবীন্দ্রনাথের সহজ ভাষা ও প্রসন্ন চপল ছন্দ—এই দুইয়ের উত্তরাধিকার বহন করেছেন **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**। ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা', তারপর 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), বেনু ও বীণা (১৯০৬), হোমশিখা (১৯০৭), তীর্থসলিল (১৯০৮), তীর্থরেণু (১৯১০), কুহু ও কেকা (১৯১২), রঙ্গমল্লী (১৯১৩), তুলির লিখন (১৯১৪), মণিমঞ্জুষা (১৯১৫), অভ্র আবীর (১৯১৬) ও হসন্তিকা (১৯১৭)। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'বেলাশেষের গান' (১৯২৩)। বিদায় আরতি (১৯২৪) ও ধূপের ধোঁয়ায় (১৯২৯)। চিত্র ও ধ্বনির একান্ত অনুরাগী কবির পরিচয় পদ্মার প্রতি, গ্রীষ্মের সুর, চম্পা, চিত্রশরৎ প্রভৃতি কবিতায়, লঘু কল্পনা-বিলাস তথা ফ্যান্সির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত 'নীলপরী', 'সবুজপরী', 'জর্দাপরী', 'লালপরী' কবিতা—রূপসাধক কবির প্রকাশ এখানে। সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘটনাবর্ত প্রতিফলিত 'জাতির পাঁতি', 'শূদ্র', 'মেথর', 'সাম্য-সাম' ইত্যাদি কবিতা, স্নেহে প্রেমে বীর্যে গরিমায় জ্ঞানে কীর্তিতে তপস্যা সাধনায় রঙ্গমাতৃকার একটি লাবণ্যপ্রতিমা এঁকেছেন দেশানুরাগী কবি তাঁর 'আমরা' কবিতায়—'বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,/ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,/কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,/চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,/সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গভঙ্গে,—/আমরা বাঙালী

বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।' ইতিহাস-রসকে কীভাবে চিত্রে ও ভাস্কর্যে, শব্দে ও কারুকলায় কাব্যরসে পরিণত করা যায়, সে কৌশল কবির অধিগত ছিল। যদিও বস্তু ও তথ্যের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ কবিতার পক্ষে প্রায়শ ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবেই 'প্রকৃতির চিত্রশালা এবং পণ্ডিতের পুথিশালা' থেকে উপকরণ নিলেও সর্বত্র তা দিব্যকল্পনায় জারিত হয়ে অনন্য কাব্যসম্পদ হয়ে ওঠেনি। বহুভাষাবিদ্ কবি বিদেশি বহু কবিতার ভালো অনুবাদ করেছেন (তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, মণিমঞ্জুষা—অনুবাদ কবিতার সংকলন), কিছু অনুবাদ 'তিনি মৌলিক রচয়িতার সমতুল কীর্তিমান।

তবে সত্যেন্দ্রনাথের স্মরণীয় কৃতিত্ব ছন্দ-ব্যবহারে—বিদেশি সংগীত লোকনৃত্যের ছন্দ, সংস্কৃত মালিনী স্রগ্ধরা রুচিরা মন্দাক্রান্তা ছন্দ, ফারসি রুবাই-এর ছন্দ সবকিছুই তিনি ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী ছন্দও তাঁর হাতে নতুন রূপ পেয়েছিল, সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছিলেন ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। পাল্‌কির দ্রুত-গমনের রূপটি যেমন তিনি ফুটিয়েছেন পালকি বাহকদের দ্রুত পদবিক্ষেপে—'পাল্কী চলে/পাল্কী চলে/দুল্‌কি চালে/নৃত্য তালে/ছয় বেহারা/জোয়ান তারা/গ্রাম ছাড়িয়ে/আগ্ বাড়িয়ে/নাম্‌ল মাটে/তামার টাটে।.....' ইত্যাদি।

১.৪ যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৭-১৯৪৮)

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ভাষায় ও ছন্দে প্রথম থেকেই রবীন্দ্র-অনুসারী। যেমন—''অয়ি মম হৃদয় কুঞ্জ অভিসারিকা/আজি রজনী-তিমির অবগুণ্ঠিতা/ত্রাসে নিখিল পৌরবধূকুণ্ঠিতা/এস ত্রস্ত বিশদবাস লুণ্ঠিতা/মম তৃষিত হৃদয়মনোহারিকা।' এইভাবে একদিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের অনুসারী, যেখানে তিনি রোমান্টিক কবি; অন্যদিকে তিনি লোকায়ত কাব্য ধারায় দীক্ষিত, যেখানে তিনি পল্লিবঙ্গের কাছের মানুষ। রূপমুগ্ধ রোমান্টিকের মতোই নিসর্গসৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি আনন্দবোধ করেন—'জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী'র রূপ তাঁর কাছে ধরা পড়ে এইভাবে, 'তুমি লুকিয়ে বেড়াও যে মুখখানি,—দেখেছি কাল রাতে—/আমার পদ্মাচরের ভাঙা ঘরের শূন্য আঙিনাতে/সে যে কত রাতের বিফল জাগা সফল করে দিয়ে/শেষে কালকে আমার চোখের ফাঁদে পড়ল ধরা প্রিয়ে।' আবার তার কবিতায় জেলের ছেলে, জেলের মেয়ে, চাষার মেয়ের ভিড়—ঘোষপাড়া, বেলঝাড়, ময়নাগাঙের তীর, চন্দনদীঘির উল্লেখে কবির অতিপরিচিত পল্লিজগৎ। বর্ণনায় চরিত্রাঙ্কনে বাগ্‌ভঙ্গিতেও তিনি পল্লিজীবনের বিশিষ্টতা রক্ষায় সমর্থ (স্মরণীয়, কাজলা-দিদি বা অন্ধবধূ কবিতা)। পুরাণ কথাকে জীবন্ত করে তোলা এবং তার মধ্যে আধুনিক জীবনবোধকে সঞ্চারিত করার মতো দুরূহ-কর্মে যতীন্দ্রমোহন সাফল্য পেয়েছেন 'মহাভারতী' কাব্যগ্রন্থে। দু-একটি ক্ষেত্রে সিদ্ধরসের হানি ঘটলেও কাব্যকায়া নির্মাণে নাটকীয় একোক্তির (Dramatic Monologue) রীতি তিনি মান্য করেছেন। যে আধুনিকতার প্রকাশ সংশয়ে-যন্ত্রণায়-আঘাতে যতীন্দ্রমোহন সেই আধুনিকতার কবি, শুধু ঘরোয়া সুখ-দুঃখের বর্ণনায় তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, 'নিরুপায়' মানুষের ক্রন্দনও তাঁকে ব্যথিত করেছে—'শ্রমিকের ফাটছে পিলে ধনিকের বুটের ঘায়ে/বণিকের বংশ বাড়ে তেতলা প্রাসাদ-ছায়ে;/কে খাটে, কেই বা খাটায়? কে বা কাল খেলায় কাটায়/যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে।' প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : লেখা (১৯০৬) , রেখা (১৯১০), অপরাজিতা (১৯১৩), নাগকেশর (১৯১৭), বন্ধুর দান (১৯১৮), জাগরণী (১৯২২), নীহারিকা (১৯২৭) ও 'মহাভারতী' (১৯৩৬)।

১.৫ কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫)

কালিদাস রায়ের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতোই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা... এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।'' কুন্দ (১৯০৮), কিশলয় (১৯১১), পর্ণপুট

(১৯১৪), ব্রজবেনু (১৯১৫), বল্লরী (১৯১৫), ঋতুমঙ্গল (১৯১৬), ক্ষুদকুঁড়া (১৯২২), রসকদম্ব (১৯২৩), লাজাঞ্জলি (১৯২৪), হৈমন্তী (১৯৩৪), বৈকালী (১৯৪০) ইত্যাদি কালিদাস রায়ের কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ যদি কালিদাস রায়ের 'গুরু হন, তবে কুমুদরঞ্জন তাঁর 'উপগুরু'। পল্লীপ্রীতি—গ্রামবাংলার মানুষ ও নিসর্গসৌন্দর্য, পারিবারিক জীবনরস ও বৈষ্ণবভাবুকতা কালিদাস রায়ের কবিতার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতায় একই সঙ্গে মিশেছে বৈষ্ণবীয় ভাব আর ছন্দের কুশলতা—'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,/চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।/জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ/ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার। বৃন্দাবন অন্ধকার।' একধরনের সরল সহৃদয়তা তাঁর কবিতায় স্বতোৎসারিত। শিক্ষক-কবির ছাত্রপ্রীতির উদাহরণ জনপ্রিয় 'ছাত্রধারা' কবিতা। গীতগোবিন্দ, শকুন্তলা, মেঘদূত ইত্যাদি কাব্যের অনুবাদও তিনি করেছিলেন। বিবিধ বিষয়ে লেখা অজস্র কবিতার ভাবগভীরতায়, ভাষার প্রসন্নতায়, অতীত ও সাম্প্রত জীবনের রোমান্টিক রসকল্পনায় কালিদাস রায় এইসময়ের বিশিষ্ট কবি।

● পালাবদলের ইঙ্গিত

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ব্যস্ত এইসব কবিরা বুঝতে পারেননি যে, বাংলার গ্রাম-পটভূমি 'আধুনিক' নাগরিকতার অভিঘাতে বিচলিত হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় চাকরিজীবী বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন নানা অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হয়েছে, প্রচলিত মূল্যবোধ অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে টান পড়েছে। এই সময়ের সংকটকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) এবং কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এই তিনজন প্রায়শ রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ-ভক্ত হিসাবেই আলোচিত, কিন্তু এঁদের কবিতাতেই রবীন্দ্র-বৃত্তের বাইরে আসার একটা ভাবনা কাজ করেছিল। মোহিতলালের জীবন-সম্ভোগবাদ, নজরুলের বাঁধভাঙা তারুণ্যের দুর্দম আবেগ, যতীন্দ্রনাথের আত্মদ্রোহী দুঃখবাদ পরবর্তীকালের কবিদের প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা যেমন নিঃশেষ আত্মসমর্পণ করেননি, তেমনই ভাবগত স্বতন্ত্রতার মধ্যে দিয়ে এঁরাই বাংলা কবিতার উত্তরকালকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য বলেছেন, এই তিন কবির 'বিদ্রোহ রবীন্দ্র-প্রণতির নামান্তর মাত্র।' কেননা ঐতিহ্যপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রীতির দিক থেকে, রবীন্দ্রকাব্যের জীবনপ্রেম ও অক্ষয় শান্তিতে বিশ্বাসের দিক থেকে মূল্যবোধে শ্রদ্ধা ও আস্তিক্যবোধের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শকে এঁরা কোথাও না কোথাও অনুসরণ করেছেন, কিন্তু অতিমাত্রায় সমকালচেতনা এবং আত্মস্বাতন্ত্র্য তাঁদেরকে করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন কালিদাস রায়ের কাব্যবৃত্ত রায়ের কাব্যবৃত্ত থেকে অনেক দূরে এনে ফেলেছে। আলোচ্য কবিদের স্বতন্ত্র আলোচনায় এই বিষয়টি হয়তো স্পষ্ট হবে।

১.৬ মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)

'ভারতী' পত্রিকায় কাব্যচর্চা শুরু করলেও মোহিতলাল পরে, এই পত্রিকা-গোষ্ঠীর কাব্যাদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁর 'পান্থ' বেরিয়েছিল 'কল্লোলে' ১৩৩২-এর ভাদ্র সংখ্যায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—"মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম।.... মনে হয়, যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কারসাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়।" মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন পসারী' (১৯২২) 'ভারতী'র রোমান্টিক যৌবনমোহ-মুগ্ধ কাব্যধর্মের অনুসারী, বেশ কিছু কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণ। অথচ এই গ্রন্থেরই 'অঘোরপন্থী' এবং 'পাপ'-এই দুটি কবিতায় পরিবর্তনের সংকেত—কবির উদাত্ত কণ্ঠে শোনা গেল জীবনের বন্দনা, জীবন-উপভোগের সুতীব্র পিপাসা—

ভুল করিবারে পাবে অধিকার, পাপ সে জানিত যারে—
একটি মধুর চুম্বনে দিবে সারা প্রাণ একেবারে!
শতবার করি' পুড়িয়া মরিবে বাসনা বহ্নিমুখ—
মরি' মরি' শেষে অমর হইবে প্রেমের স্বর্গ। (পাপ)

ভোগবাদী এই জীবনচেতনাই কবিকে একসময় সরিয়ে নিয়েছে রবীন্দ্র-সরণি থেকে, আকর্ষণ করেছে কল্লোলপন্থীদের দিকে, আবার সরিয়ে নিয়ে গেছে বিরলপথিক নিঃসঙ্গ কাব্যপথে; 'বিস্মরনী' (১৯২৭) ও 'স্মর-গরল' (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থে এই ভাবনারই বিস্তার। 'দেহের মাঝারে দেহাতীত আত্মার ক্রন্দন' ও জীবনসম্ভোগের বিপুল বাসনা-মথিত কবিচিত্তে যুগপৎ যে অমৃত ও বিষ উঠেছে, নীলকণ্ঠের মতো সেই গরল পান করে মোহিতলাল 'দেহবাদী' কবি বলে চিহ্নিত হয়েছেন—

ত্যাগ নহে, ভোগ ভোগ তারি লাগি, যেইজন বলীয়ান,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে এত বড় যার প্রাণ!
যেজন নিঃস্ব পঞ্জর তরে নাই যার প্রাণ-ধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ!

মোহিতলালের কাব্যে তাই 'শাক্ত' সাধনার সুর—পঞ্চেন্দ্রিয়ের দেহ ও আত্মার জন্য নৈবেদ্য আহরণই 'শাক্ত' ধর্মের প্রেরণা এবং কবির ভোগবাদ একটি অতিদৃঢ় বিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি দেহ-বন্দনা ও নারী-বন্দনায় সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যে কামনা-ইন্দ্রিয় বাসনা বারবার নন্দিত হয়েছে—'জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে/ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি কামানল!' বলেছেন 'জীবনের দুঃখ-সুখ বারবার ভুঞ্জিতে বাসনা/অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো।' দুঃখময় মানবজীবনের বেদিমূলে আত্মার শিখা জ্বেলে তিনি 'স্মর-গরল' কাব্য থেকে বিদায় নিয়েছেন। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্ত-গোধূলি'তে (১৯৪১) কবিও যেন তাঁর কাব্যজীবনের হেমন্ত-গোধূলিতে উপনীত। পূর্বাহ্নের যৌবনদীপ্তি, যুযুধান মনোভঙ্গি, জীবনসম্ভোগ তীব্রতা আজ অপসৃত। শৃঙ্গার ও রৌদ্ররসকে বিদায় জানিয়ে কবি এখন শান্তরসের সন্ধানী

ঘচিল সংশয়মোহ-সত্য আর সুন্দরের ছল;
বুঝিলাম দুই-ই মিথ্যা! সৎ শুধু প্রকাশ-মহিমা
প্রাণস্পর্শী বিরাটের; তারি ধ্যানে সঁপিনু সকল। (প্রকাশ, হেমন্ত-গোধূলি)

'ছন্দ-চতুর্দশী' (১৯৫১) কবির সনেটসমূহের সংকলন। তানপ্রধান ছন্দে, দৃঢ়বদ্ধ কঠিন কাব্যদেহ নির্মাণে, ধ্রুপদী রীতির প্রতি আনুগত্যে কবি মোহিতলালের মানসিকতা বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত।

১.৭ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)

পেশায় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন বলেই হয়তো যতীন্দ্রনাথের কবি-ধাতু কিছুটা আলাদা। তিনি যখন কবিতা লেখা শুরু করেন তখন বাংলার কাব্যাকাশে রবীন্দ্রনাথেরই খর-দীপ্তি, আর সেই বিপুল রশ্মিছটায় বিবশ-মুগ্ধ তৎকালীন কবিকুল। যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ মুগ্ধ আত্মতৃপ্ত সৌন্দর্যারতির বিরুদ্ধে এবং অত্যন্ত ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ সে আঘাত আর গণজীবনের মর্মমূলে কাব্যপ্রেরণা সন্ধান আধুনিক বাংলা কাব্যে তাঁর কবিতাতেই প্রথম লক্ষ করা গেল। বাস্তব-পরিবেশে জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না পেয়ে কবি হাহাকার করেছেন, বেদনার্ত কণ্ঠে এই দুঃখের কারণ ও নিয়ামক ঈশ্বরের উদ্দেশে অভিমান-অভিযোগ উচ্চারণ করেছেন। সুখবাদীরা দৃশ্যমান পৃথিবীর সবকিছুকেই সুন্দর দেখেন—

ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি।
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
কিন্তু দুঃখবাদী কবি জানেন,—তেলে সিন্দূরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়,
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।
অতল দুঃখ-সিন্ধু
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।

জীবন তার কাছে সুদীর্ঘ একটি বাসররাত্রি নয়, রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মতো মাধুর্যে লালিত্যে মনোহরণ করতে চাননি যতীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখর লেখনীতে বাংলা কবিতায় যে রুচি প্রচলিত হয়েছিল যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তার বিরোধী, তাই লিখেছিলেন—

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারো মাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস!

তাঁর কবিতার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তাই বাস্তব আর আপতিকের বিরোধ—তাই সেখানে কোকিল বেহায়া, হাওয়া লম্পট, ফুলের দোকানের পাশেই মাংস 'থোড়ে' কসাই, আর সূর্যাস্তকালের মেগ যেন 'রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা'। 'ঘুমের ঘোরে'-র সাতটি কোঁকে তিনি জীবন-জগতের দুঃখের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'কচি ডাব' কবিতায় যেখানে দেবাদিদেব মহাদেব আর ডাব-বিক্রেতা এক হয়ে গেছেন, সেখানে পীড়িত লাঞ্ছিত দীনদরিদ্রের সপক্ষে কবির একাত্মতা তাঁকে গণবাদী বলে চিহ্নিত করে। মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০) জীবনের নৈরাশ্যসূচক রূপের সহাস্য উপস্থাপনায় এখনও উপভোগ্য। সায়ম্‌ (১৯৪০) ও ত্রিযামা (১৯৪৮) কাব্যে নব্য-রোমান্টিক মনোবৃত্তি লক্ষণীয়। একদা দুঃখবাদ মরুচারিতার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন চিরবৈশাখ (সায়ম্‌) কবিতায়, আন্তরিকতার সঙ্গে এই দৃষ্টি-পরিবর্তন স্বীকার করেছেন—

যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা, 'প্রেম বলে কিছু নাই,'
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।'
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্‌ চেতনার ঝাঁজ?....
আজ মনে হয় এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে বলেছিনু-নাই,
চেতনার কূলে বসি চিতামূলে গায় মাখি তার ছাই। (সমাধান, ত্রিযামা)

প্রচলিত কবিভাষার পরিবর্তে চলিত-সাধু-সংস্কৃত-ম্লেচ্ছ-চাষাড়ে বা ভদ্র সব শব্দকে বিনা দ্বিধায় কবিতায় ব্যবহার করে একটা নতুন দিকের সূচনা তিনি করে গেছেন।

১.৮ কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

কাজি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব যেন তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'ধূমকেতু'র নামের মতোই আকস্মিক। দরিদ্র মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম, দারিদ্র্যের চেহারা দেখেছেন খুব কাছে থেকে, সমকালীন বাঙালি কবিদের তুলনায় অতিরিক্ত ছিল দু-বছর সেনাবাহিনীতে হাবিলদার জীবনের অভিজ্ঞতা। উদ্দাম অবাধ ভাবাবেগ, প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে প্রায় প্রস্তুতিহীনভাবে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের মতো বাংলার কাব্য-আঙিনায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাব্যে দৃঢ়তা আছে বলিষ্ঠতা আছে, কিন্তু সংযম বা শৃঙ্খলা নেই।

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।
আমি মানি না ক' কোনো আইন
আমি ভরা তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন।....
আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যেই নিয়ম-ভাঙা আপন-প্রভু নজরুলের পরিচয় আছে। তিনি 'তিরিশে'র যুগে রবীন্দ্রশাসিত কাব্যজগতের একটি উপগ্রহ মাত্র নন, তিনি ধূমকেতু। তিনি স্বাধীনতাকামী দেশের স্বদেশি আন্দোলনের উন্মাদনার চড়া সুরে তাঁর কাব্যবীণা বেঁধে নিয়েছেন, রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন। কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, আর তীব্র ব্যঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধ শক্তিকে আহ্বান করেছেন রামপ্রসাদের ধরনে—

''আর কত কাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল,
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীরযুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা—আসবি কখন সর্বনাশী?'

কোনো সাম্প্রদায়িক ভাবনা এই কবিকে স্পর্শ করেনি, 'জাতের নামে বজ্জাতি'কেও তিনি বিদ্ধ করেছেন, বলেছেন 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' সমকালের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন, এদিক থেকে হয়তো তিনি topical poet, এখানেই তাঁর স্বভাব, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রকৃতির বিচিত্র রূপের সন্ধানীও ছিলেন নজরুল। প্রেমের কবিতা ও গানে নজরুল তীব্র ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী প্রেমের উপাসক। তবে শুধু দেহাশ্রিত প্রেম নয়, নজরুল রোমান্টিক প্রেমের বন্দনাগান রচয়িতা—

কস্তুরী হরিণ সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে; গন্ধ-অন্ধ মন মৃগ মম।
আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!

নজরুলের প্রথম কবিতা ও গানের বই 'ব্যথার দান' (১৯২১), তারপর 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'ছায়ানট' (১৯২৩), 'দোলনচাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪); 'ফণিমনসা' (১৯২৪), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'বুলবুল' (১৯২৮), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), 'সুরাসাকী' (১৯৩২), 'নূতন চাঁদ' (১৯৪৫) ইত্যাদি একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের শেষ কয়েক বছর কবি শুধু শারীরিকভাবে বেঁচে ছিলেন, কণ্ঠ নীরব এবং লেখনী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ, আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার, বর্ণবহুল চিত্রাঙ্কণে নজরুল সত্যেন্দ্র অনুসারী। ছন্দের ক্ষেত্রে পয়ারের প্রবহমানতা ও মাত্রাবৃত্তের পল্লবিত ব্যবহারে, অতি-পর্ব ও শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের প্রয়োগনৈপুণ্যে নজরুল উল্লেখযোগ্য। পুরাণ-কোরান থেকে কাহিনি উপমার যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন, কাব্যকলা তাঁর যত্নকৃত ছিল না। কিন্তু আবেগের প্রাবল্য, ভাবাতিরেক-অতিকথন এবং স্বতঃস্ফূর্ততায় নির্মিত কাব্যশরীরও কখনো পৃথক মনোযোগ দাবি করে। অগ্নিবীণার বিদ্রোহ-গর্জনের পরেই দোলনচাঁপার স্নিগ্ধ রসময়তায়, চৈতী-হাওয়ার উদাস দুপুরে, ফণিমনসা-

য় সমকালের রাজনৈতিক অস্থিরতায় এবং নতুন চাঁদ-এ রোমান্টিক প্রেমের অনন্ত বেদনার জগতে প্রত্যাবর্তন— এইভাবেই নজরুলের পথ-চলা। তাঁর কবিতায় যে প্রচণ্ড জীবনীশক্তির উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি তা নিঃসন্দেহে বাংলা কবিতার ধারায় নবতর সংযোজন।

● কল্লোল যুগ

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে শুরু হয় রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতার আন্দোলন মূলত কল্লোল-উত্তরা-কালিকলম-ধূপছায়া-প্রগতি-ও অল্প পরে প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্র-সমকালীন ও রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের রবি-রশ্মিতে আচ্ছন্ন মুগ্ধতা দেখে এইসময় তরুণ কবিগোষ্ঠীর অনেকেই মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী এই প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে আধুনিক বাংলা কবিতা শুধু রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিধ্বনি হয়ে দাঁড়াবে, স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার জগৎসৃষ্টি করতে পারবে না। মোহিতলাল-নজরুল-যতীন্দ্রনাথ তাঁদের দেহভোগবাদ-বিদ্রোহ-দুঃখবাদ দিয়ে এই পটভূমিকে একটা বিপুল নাড়া দিয়েছিলেন। মোহিতলালকে শিরোধার্য করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। সমাজচিন্তার সাফল্য মানব ও মানবসম্পদ সম্বন্ধে নতুন চেতনা নিয়ে এল। এই সময়েই যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় লেখকদের রচনা-পাঠে বাঙালি তরুণ লেখক নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হল। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়, স্বদেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, স্বাধীনতা-আন্দোলন অনুভূতিপ্রবণ শিক্ষিত যুবকদের বিশ্ববীক্ষাকে বিচলিত করেছিল। ধ্বস্ত সময়ের চোরাবালিতে দাঁড়িয়েও তাঁরা খুঁজে নিতে চেয়েছেন কবিতার নতুন বক্তব্য, নতুন শৈলী। বিক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি আর রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্যে কিছুটা বিমুখ হয়েই বোধহয় অচিন্ত্যকুমার লেখেন 'সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,/আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো/যুগসূর্য ম্লান তার কাছে।' বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল 'বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ'', সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী এবং তিনি নিজে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীলও ছিলেন। জীবনানন্দ রবীন্দ্র প্রভাব অতিক্রম করতে পেরেছিলেন মাত্র। ১৯২৭-এ রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতা বিষয়ে লিখলেন 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ, ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ কালপর্বে প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর মর্মবাণী ও বন্দীর বন্দনা, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাবলী, জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' সুধীন্দ্রনাথের 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থ ও 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধ, অজিত দত্তের কুসুমের মাস ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ। যদিও পশ্চিমে বোদলেয়ার থেকে আধুনিক কবিতার সূত্রপাত মনে করেন অনেকে, তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ইউরোপের পোড়ো জমিতে আধুনিক কবিতার জন্ম। আর মূলত তারই প্রভাবে গড়ে ওঠে বাংলা আধুনিক কবিতার ধারা। এইধারার প্রধান কবিরা প্রায় সকলেই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন বলে এঁদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক মনোভাবের অভিযোগ একসময় উঠেছিল। যাই হোক, এইসময় বাংলা কবিতার সীমা প্রসারিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রেও। 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছোটো ছোটো গ্রামগুলির জীবন অপেক্ষা এই পর্বের কবিতায় স্থান পেয়েছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পীঠস্থান নগর কলকাতা, হাওড়া ব্রিজ, লিবিয়ার জঙ্গলের মতো শ্বাপদসংকুল নিষ্প্রদীপ নাগরিক রাত্রি, 'রূপসী বাংলার পাণ্ডুর রুগ্ন হৈমন্তিক রূপ, হাইড্রান্ট খুলে কুষ্ঠরোগীর জল চেটে নেওয়ার ছবি। এই কবিতায় থাকে পরাবাস্তব কল্পনা, ব্যাকরণের অনুশাসনের স্বেচ্ছাকৃত বিপর্যয়, মিত ও তির্যক কথন। পাঠকের কাছে এই কবিতা স্বভাবতই দাবি করে সচেতন মনোযোগ, মনীষা এইসব কবিতার মৌলিক লক্ষণ। বাস্তবতা মানে কখনো 'দারিদ্র্যের আস্ফালন আর লালসার অসংযম'। 'রিয়ালিটির' এই 'কারি-পাউডার' রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পায়নি, যদিও সাহিত্যের এই গতি পরিবর্তন এই বাঁকটাকেই তিনি ''মডার্ন, বাংলায় বলা যাক আধুনিক'' বলে স্বীকার করেছিলেন। বিষয়ের সঙ্গে বদলে গিয়েছিল এইপর্বের কবিতার ভাষা-উপমা-চিত্রকল্প-কৃৎকৌশল।

অর্থাৎ কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে

মুক্তিলাভের প্রয়াসী এবং সৃষ্টির দিক থেকে নবতম সুরের সাধক। বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।' 'কল্লোল' ও সমকালীন পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে কাব্যে আধুনিকতার এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাই সাধারণভাবে এই সময়টিকে **কল্লোল যুগ** বলে চিহ্নিত করা হয়।

১.৯ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

"অন্তরের গহন গোপন মহারহস্য আবিষ্কার করতে হলে মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় সমুদ্রের তীরে কিংবা খোলা আকাশের নিচে। আমাদের জীবনে জীবনানন্দ সেই সমুদ্রতীর, সেই অনবরুদ্ধ দীপ্ত আকাশ।" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই কথাগুলি বলেছিলেন রবীন্দ্র পরবর্তী কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে। রবীন্দ্রানুসরণে বাংলা কাব্যের মুক্তি নেই জেনে প্রথম থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন "মানস পরিধি থেকে পূর্বজেরা তখন সরে গিয়েছেন খানিক দূরে—অনেক দূরে; রবীন্দ্র বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন ঐতিহ্যও ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড় বড় বৈদেশিকদের উজ্জ্বল আলোয়।" যদিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' (১৩৩৪)-এর কয়েকটি কবিতায় (যেমন, নীলিমা, পিরামিড, সেদিন এ ধরণীতে) রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-ধ্যানের প্রভাব রয়েছে। তবু বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন ইতিহাস-চেতনা ও দেশজ শব্দের যথাযথ প্রয়োগ, নজরুলের বাঁধভাঙা আবেগ, ভোগবাসনা ও তারুণ্যের জয়ঘোষণা, মোহিতলালের দেহচেতনা ও আরব ফারস শব্দপ্রয়োগে ইন্দ্রিয়ঘন জগতের সৃষ্টি, কল্লোলের বিদ্রোহ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রীতি, আবার এই কাব্যগ্রন্থ থেকেই জীবনানন্দ নিজস্ব ঐতিহ্য নির্মাণে প্রয়াসী-ঝরাপাতা, জলডাহুকী, শিরশিরে হাওয়া, বুনো হাঁস, দারুচিনি দ্বীপ, ব্যাবিলন মিশরের সভ্যতা এসবই তাঁর বৈশিষ্ট্য দ্যোতক, শ্মশান, মরুবালু, আলেয়া প্রভৃতি কবিতায় বন্ধ্যাযুগের যোগ্য চিত্রকল্প, মৃত্যুচেতনা সমকালীন যুগযন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৭), তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দ স্পষ্টই ঘোষণা করলেন তাঁর স্বাতন্ত্র্য—

একদিন শুনেছ যে সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা'—কোন এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ! ...
আমার পায়ের শব্দ শোনো,—
নতুন এ,—আর সবহারানো-পুরানো। (কয়েকটি লাইন)

'উৎসবের কথা আমি কহি নাক'/পড়ি নাক দুর্দশার গান' একথা বলে 'মেঠো চাঁদ' কবিতায় অতিব্যবহৃত রোমান্টিকতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'বুড়ো হ'য়ে গেছ তুমি এই বুড়ী পৃথিবীর মতো!' 'নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে' প্রতিফলিত করলেন পরিবর্তিত মূল্যবোধে পার্থিব জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা ও কুশ্রীতা। টি. এস. এলিয়ট 'The Waste Land'-এর চিত্রকল্পে বর্তমান বন্ধ্যা যুগকে দেখেছিলেন, জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের নিঃস্ব, রিক্ত, অনুর্বর রূপে এই ক্ষয়িষ্ণু সৃষ্টিসম্ভাবনাহীন যুগেরই প্রতিবিম্ব। এক গভীর শূন্যতাবোধ জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলিকে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। 'হায় চিল' কবিতায় ভিজে মেঘের দুপুর, ধানসিড়ি নদীর ধারে চিলের উদাস ডাক যেন সেই অপরিসীম শূন্যতাকেই ব্যঞ্জিত করেছে, অথচ সে প্রকাশ সংযত, অনুচ্ছ্বসিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইয়েট্স্-এর He Reproves the Curlew কবিতাটির সঙ্গে জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতার সাদৃশ্য আছে। প্রিয়ার দেহী রূপকে প্রত্যক্ষ করে তোলবার জন্য কবি তাকে পদবিসমেত দেশকাল প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন (যেমন,

নাটোরের বনলতা সেন)। ইন্দ্রিয়ঘনত্ব তথা চিত্রধর্ম তাঁর কাব্যকে আরো বেশি অবয়বত্ব দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'; বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে, ...'' 'তখন হলুদ নদী/নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে।' কিংবা 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা আসে,' কিংবা 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট/সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে' বা 'সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে শ্রবণ দর্শন স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মিশ্রণ লক্ষণীয়। এইভাবে জীবনানন্দের কবিতায় কখনো দেখা গেছে ইমপ্রেসনিস্টদের মতো ছবি—আলোছায়ার ইশারা, কখনো ফবিস্টদের মতো কাঠিন্য ও তীব্র বর্ণময়তা (হলুদ কঠিন ঠ্যাং, জাফরান রঙের সূর্য, রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ ইত্যাদি), ফিউচারিস্টদের মতোই কখনা যুগজ্বরকে প্রকাশ করতে গিয়ে কালের অনিবার্য পদপাতে জীবনানন্দের কবিতায় গভীর ক্লান্তি আর মৃত্যুচেতনা। তবে 'অন্ধকার' কবিতায় যে Morbidity, 'জীবন' কবিতায় 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ' উচ্চারণ জীবনানন্দের সর্বস্ব নয়; তাই মর্গ, লাশকাটা ঘর, আত্মহত্যাকারীর কথায় যে 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার শুরু, সেখানেও মৃত্যুর মধ্যেও ফুটে ওঠে প্রবল জীবনীশক্তি—''তবুও তো পেঁচা জাগে/গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে/আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।'' জীবনানন্দকে বাংলা কাব্যে সুর রিয়ালিস্ট কবিতার প্রবর্তক বলা যেতে পারে। রিয়ালিজমের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে থেকে থেকে আর-এক তীক্ষ্ণ বোধের উপলব্ধি হচ্ছে, তা হল সুর-রিয়ালিজম্ বা অতিবাস্তব চেতনা। যেখানে 'real and unreal, meditation and action' মিশে গেছে, তার দৃষ্টান্ত হল 'বনলতা সেন' 'হরিণেরা' কিংবা 'অবশেষ'। Fantasy রচনাও Surrealism এর অন্যতম দান, 'সেই সব শেয়ালেরা' কবিতার মধ্যে যেমন একটি অবোধ্য হেঁয়ালি সব কিছু আবৃত করে আছে, 'শ্রাবণরাত' কবিতায় যেমন তিনি বলেছেন—

> 'চোখ তুলে আমি
> দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মত প্রবেশ করলাম
> সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।

'ঝরা পালক'-এর ইতিহাসচেতনা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র যুগের মৃত্যুচেতনার মধ্যে লুপ্ত হয়েছিল, 'বনলতা সেন'-এ মনে হয় এই মৃত্যুবোধকে অতিক্রম করবার জন্যই তিনি আবার ফিরে গেছেন ইতিহাসের জগতে। 'কবিতার কথা'য় তিনি বলেছিলেন ''মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতি সাধক অপরিহার্য সত্যের মতো, কবিতা লিখবার পথে কিছুদূরে অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি'। এবং ''কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।'' প্রাথমিক ইতিহাসচেতনাই ক্রমশ কবিকে সমাজচেতনার পথে নিয়ে গেছে, ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শকুন ক্যাম্পে প্রভৃতি কবিতায় তার প্রকাশ ছিল। 'মহাপৃথিবী'তে কবি অতীত ও বর্তমানকে ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে কখনো মনে হয়েছে 'কালরাত্রি' (বিভিন্ন কোরাস), কখনো 'অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন' (সবিতা), কখনো 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ'। 'সাতটি তারার তিমির'-এ সমাজসচেতনতা অনেক বেশি তীব্র যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মৃত্যু কবিকে আরো এক কঠিন জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি করেছে। 'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—' মানুষের লালসার শেষ নেই,' 'অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই, তবু কবি বলেন 'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে', 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'—চক্রবৎ মানুষের যাত্রাপথে স্মরণীয় সৌভাগ্যের পর এখন এসেছে ধ্বংসের অন্ধক্ষণ। ক্রমশ তার চেতনার পরিধি বিস্তৃত হবে এবং এই চৈতন্যের জাগরণে প্রেমই হবে অন্যতম প্রধান শক্তি—'প্রেম ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।' ইতিহাসের রাশি রাশি দুঃখের খনি ভেদ করে শত শত জলঝর্নার শব্দ শুনেছেন তিনি, তিমিরবিনাশী হতে চেয়েছেন, সূর্যে সূর্যে চেয়েছেন চলতে।

শব্দনির্বাচনে প্রচলিত সংস্কার বর্জন করে জীবনানন্দ কাব্যসীমানাকে অনেকখানি বিস্তৃত করে দিতে পেরেছিলেন। ছিঁড়ে ফেঁড়ে, নটকান, শেমিজ, থুতনি, নাকের ডাঁশা, নষ্ট শসা প্রভৃতি শব্দকে তিনি অনায়াসে তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যেমন দেশজ শব্দের প্রাচুর্য, ব্যক্তিগত বিষাদের দ্যোতনায় হয়তো সেইসব চলিত গ্রাম্য শব্দই ছিল অনুকূল আবার বিশ্বগত ব্যথা প্রকাশের জন্য 'সাতটি তারার তিমির'-এ ইংরেজি শব্দের ব্যবহার—ডাইনামো, অ্যামিবা, ভিটামিন, ম্যাগ্‌নেটিক মাইন, কনভয় ইত্যাদি শব্দ সেখানে অনায়াসে এসেছে। তবে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য উপমা-রচনায়, কবির মতে 'উপমাই কবিত্ব'। জীবনানন্দের উপমাগুলি কেবলই ছবি নয়, তাঁর মনন, তাই 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'-এ উপমা তুলনাত্মক ততটা নয়, যতটা হৃদয়বেদ্য। চিত্র-চিন্তা আর আতি-বাস্তবতার ত্রিবেণিসঙ্গমে 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার চিত্রকল্প উল্লেখযোগ্য—

> এই কথা বলেছিল তারে
> চাঁদ ডুবে চলে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
> যেন তার জানালার ধারে
> উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা এসে।

তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি তানপ্রধান ছন্দেই লেখা, হয় পয়ারে নয় বলাকার ছন্দে। বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিলন তাঁর ছন্দের বৈশিষ্ট্য। এইভাবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জগৎ থেকে 'সাতটি তারার তিমির'-এর দিকে, যেন এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে কবির যাত্রা, আলোর ভুবন থেকে অন্ধকারের পথে, আবার অন্ধকার থেকে আলোকতীর্থে তাঁর উত্তরণের অভিলাষ। কবিতাকে জীবনের কাছে নিয়ে আসার জন্য নিয়োজিত তাঁর সব প্রয়াস, তাঁর কবিতার জগৎ এমনই 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায়' যেখানে, যেখানে 'হতেছে স্নিগ্ধ কান।'

১.১০ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

'বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী' এই কবি 'জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে/বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে/নিরুত্তর।' বন্ধ্যাত্ব, অক্ষমতা, নিষ্ফলতাবোধ এই বিদগ্ধ কবির কবিতার প্রধান কথা। এলিয়ট বলেছেন পোড়ো জমি আর ক্যাকটাসের কথা তার নেতিবাদী শূন্যবাদী বৌদ্ধ ক্ষণবাদী সুধীন্দ্রনাথ বলেন মরুভূমি আর ফণিমনসার কথা। কাব্যরচনার প্রথম পর্বে ঐতিহ্যবাদী হলেও সুধীন্দ্রনাথের কবিতা যেন ক্রমশই ব্যাপক আত্মানুসন্ধানের সাক্ষ্য। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী'র (১৯৩০) ভূমিকায় কবি জানিয়েছিলেন 'কবিতাগুলোর ওপরে স্বদেশি বিদেশি অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন—সব সময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্র জ্ঞানকৃত।' এর পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫) সুধীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্যসৃষ্টির প্রথম ফসল। ভূমিকায় কবির বক্তব্য ''বাংলা কবিতার পদলালিত্য এ-গ্রন্থে প্রত্যাখ্যাত এবং এতে রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধের ব্যবহার বিরূপ বিশ্বের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে'', এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে শব্দযোজনার মাধ্যমে মূর্ত হৈমন্তিক দৃশ্যপটে তারই স্বাক্ষর—

> ''বৈদেহী বিচিত্রা আজি সংকুচিত শিশির সন্ধ্যায়
> প্রচারিল আচম্বিতে অধরার অহেতু আকুতি :
> অস্তগামী সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
> অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেল রজনীগন্ধায়।
> ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্তলোহিত,
> তরুণতরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,
> শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ণ বলাকা
> ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত। ('হেমন্ত' : 'অর্কেস্ট্রা')

‘ক্রন্দসী’ (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থের সূচনা থেকেই আত্মসন্তুষ্টির অভাব, পুরোনো পৃথিবী ও তার নিঃশেষিত মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা, তারপর দুঃখবাদ ও তদ্‌গত হতাশার ক্ষরণ। তবে সুধীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বোদলেয়র, মালার্মে ও ভালেরির কাব্যদর্শনের সঙ্গে পরিচয়ে মোহিতলাল কিংবা যতীন্দ্রনাথের দুঃখচেতনা থেকে স্বতন্ত্র। ‘নরক’ কবিতায় তাঁর শূন্যবাদী দর্শনের চিত্ররূপময় বর্ণনা প্রায় নিখুঁত সাফল্য অর্জন করেছে ‘‘জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,/নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া/শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।’’ ‘উটপাখি’ কবিতার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু পলায়নপর মধ্যবিত্ত কিংবা বিরাট অজ্ঞেয়তার আবর্তে পরিত্যক্ত অস্তিত্ববাদীর অসহায়তার ব্যঞ্জনায় অভিনবত্ব আছে, তবে ‘উত্তরফাল্গুনী’তে (১৯৪০) কবি আবার ফিরে গিয়েছেন তাঁর প্রেমের জগতে, যেখানে ‘উধাও মলয়ে দ্যুলোকে-ভূলোকে/মোদের প্রেমের কাহিনী কবে।/মোর অসাধ্য সাধনে, মানবী,/নিশ্চয় তুমি সিদ্ধ হবে’’।

‘সংবর্ত’-র (১৯৫৩) কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৩। আন্তর্জাতিক জগতে এই কালপর্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর প্রতিক্রিয়ার সূচনা; আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ‘জনসংঘ বিভীষিকা’ হয়ে ওঠে কবির কাছে, তখন তিনি ‘অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে/যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে’ সাম্যবাদ কিংবা ফ্যাসিবাদ, যে-কোনো প্রকার একনায়কত্বেই কবি তখন বীতশ্রদ্ধ। তবে এই কাব্যগ্রন্থেই ঘোষিত হল তাঁর কাব্যাদর্শ—‘‘মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট : আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য....’’। ‘দশমী’ (১৯৫৬) কাব্য তাঁর পরিণত মেধা ও মনীষার অভিজ্ঞান, চক্রবৎ পরিবর্তমান ও বৈনাশিক কালচেতনা এখানে প্রকাশিত—

কিন্তু চক্রচর কাল : সুরাসুর
বিশ্বে সমবল, সম্পূর্ণ পৃথিবী ঊষর, উর্বর
একাধারে, ধর্মে কর্মে শুভাশুভ নিত্য নিরন্তর— (‘তীর্থপরিক্রমা’ : ‘দশমী‘)

শেষপর্যন্ত তিনি নিরাবলম্ব, নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে নিরাশ্রয়, বলেন ‘বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী’। আবেগ ও যুক্তির সমীকরণে তাঁর কাব্য-প্রকরণ উৎসুক মনোযোগ দাবি করে। গদ্যের মতো পদবিন্যাসের তিনি পক্ষপাতী, অব্যয়ের অবাধ কবিতার ব্যবহারে স্বতন্ত্র, সমিল অমিত্রাক্ষর, প্রবহমান পয়ার ইত্যাদি তানপ্রধান ছন্দব্যবহারে তাঁর নিপুণ সিদ্ধি। বস্তুত, বাংলা কবিতার ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর মনন ও আবেগের সমীকরণে। আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাষায়—“The balance between passion and logic that he has achieved is unequalled in Bengali Poetry, and is his greatest contribution to it.”

১.১১ অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসাধনার সূত্রপাত ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় ১৯২৭ সালে, কিন্তু ১৯৩০ পর্যন্ত তাঁর কবিতা মুখ্যত রবীন্দ্রানুসরণ, ১৯৩৮-এ ‘খসড়া’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবিসংবাদিতভাবে আধুনিক কবিগোষ্ঠীর অন্যতম হয়ে উঠলেন। প্রাথমিক রবীন্দ্রানুসরণকে বাদ দিলে তাঁর কবিতার তিনটি পর্যায়। ‘খসড়া’ ও ‘একমুঠো’ (১৯৩৯)-এ দুটি কাব্যে কবির দর্শন হল ‘দৃষ্টির দর্শন’, রোমান্টিকতা পরিহার করে চোখের দেখায় যা মেলে কবি তাকেই স্থান দিয়েছেন সাহিত্যে। একে বৈজ্ঞানিক মরমিয়াবাদও বলা যেতে পারে, ইন্দ্রিয়বেদ্য বাহ্যজগৎ তাঁর কবিতার কেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়, পারিবারিক ঐতিহ্যাগত এবং স্বীয় বোধিলব্ধ মিস্টিক চেতনার থেকে অমিয় চক্রবর্তীর ধারণা আলাদা। তিনি যন্ত্রের ঘর্ঘরেই শুনেছেন কল্যাণের ওঙ্কার। দ্বিতীয় পর্যায়ে কবি দেখলেন শুধু বিজ্ঞান ও বস্তুচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের সমস্ত রহস্যের উপলব্ধি হয় না, ধ্যানেরও মূল্য আছে। ‘মাটির দেয়াল’ (১৩৪৮), ‘অভিজ্ঞান বসন্ত’ (১৩৫০), ‘দূরযানী’ (১৩৫১) কাব্যগ্রন্থে এই ভাবনার চিহ্ন আছে; দৃষ্টির দর্শনের বাইরে কাব্যসৃষ্টির একটা বড়ো অংশ যে সামাজিক স্রোতের সঙ্গে জড়িত—কবি তা স্বীকার করেছেন।

'ত্রিকাল' পত্রিকায় তাঁর 'কাব্যাদর্শ' সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তী বললেন—''আজ আমরা বল্‌ব সাহিত্যের আরেকটি রূপ আছে যা নিঃসংলগ্ন, যা বর্ণাঢ্য কিন্তু শ্রেয়োধর্মী—অথচ সেই শ্রেয়তা সমাজের উপস্থিত ভালো-মন্দের সঙ্গেও স্পষ্টভাবে যুক্ত নয় তো।'' তৃতীয় পর্যায়ে কবি বিশ্বপরিক্রমায় নিষ্ক্রান্ত হয়ে দেখলেন প্রাচ্যে-প্রতীচ্যের বিধ্বস্ত ছিন্নমূল বেদনার্ত জীবনকে। বুঝলেন শুধু ধ্যানে মুক্তি নেই, মুক্তি নেই শুধু বিজ্ঞানেও, সমাজের জন্য চাই বিজ্ঞানে কল্যাণে সন্ধি, কবির প্রয়োজন দৃষ্টি ও ধ্যানের সংগতি। চারটি মহাদেশের পটভূমিকায় বিস্তৃত তাঁর এই পর্বের কাব্য 'পারাপার' (১৩৬০), 'পালাবদল' (১৩৬২)। শেষ পর্যায়ের কাব্যভাবনা ব্যক্ত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর কাছে লেখা একটি চিঠিতে—''পৃথিবীতে এসে যা দেখা গেল তার বিমিশ্র সহজ একটি আক্ষরিক পরিচয়, সাক্ষীর বিমুগ্ধ আত্মভাষায় স্বীকৃতি। কিছু আপত্তি, কিন্তু সব বিরুদ্ধতা ভুলিয়ে দেওয়া আশ্চর্য সংসারের স্রোতোধ্বনি, আশ্চর্য রঙিন কাহিনী যা দেখাশোনা যায় না।''

অমিয় চক্রবর্তীর এই প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত মিস্টিক চেতনার সঙ্গে কেউ জেরার্ড ম্যান্‌লি হপকিন্স-এর আত্মসমাহিত দিব্য বিভার সাধর্ম লক্ষ করেছেন। হপকিন্স-এর 'Sprung rhythem', ব্যাকরণবিধি ভেঙে ফেলা লক্ষ করা যায় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়। রোদ্দুরি, সবুজি, মরন্ত, জীবনতা আনন্তিক, ধান-খুশি ইত্যাদি 'নতুন' শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি 'স্প্রাং রিদ্‌ম' কে বাংলায় রূপ দিলেন তিনি—

চোঙ। কালো ছলছলে তল; উপরে চাকরি শূন্যরঙা,
ইঁটের ফাটল লাল জবাফুল সাঁওতাল পিতলের
ঘটি বাটি রাঙা
গামোছা। গাঁয়ের বউ ছায়ে
কাঠ কাঁদে কাক ঠোঁট ঘ্যান ঘ্যান দড়ি, যায় ব'য়ে
গ্রীষ্মের কান্না : উনোনের রান্নাঘরের জল, ওঁ,
চুন সুরকির ভাঙা চোঙ। ('কুয়োতলা' : 'খসড়া')

ওয়ালেশ স্টীভেন্স-এর মতো কবি প্রকৃতিকে দেখেছেন যন্ত্রের চিত্রকল্পে—সমুদ্র তাঁর কাছে কারখানা, আকাশ ঘড়ি, নক্ষত্র চন্দ্র কামারশালার আগুনের ফুলকি, দেহ ইঞ্জিন, মন এক ক্যাপ্টেন। তবে কবিধর্মে অমিয় চক্রবর্তী জার্মান কবি রিলকে-এর সমগোত্রী, রিল্‌কে যাকে Transformation বা Transmutation বলেছেন তা আপতিক বিরোধকে সংগতি দান করে, তারই মতো নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বেদনার দুর্গম পথ পেরিয়ে অমিয় চক্রবর্তী উত্তীর্ণ হয়েছিলেন একটা গভীর আশা ও বিশ্বাসের জগতে—'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর/পোড়ো বাড়িটার/ঐ ভাঙা দরজাটা।/মেলাবেন।'

অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কয়েকবছর, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, দূর প্রাচ্য, আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন কর্মসূত্রে। তাঁর কবিতায় তাই আন্তর্জাতিক চেহারা স্পষ্ট। তাঁর আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ 'ঘরে ফেরার দিন' (১৩৬৮), 'হারানো অর্কিড' (১৩৭৩), 'পুষ্পিত ইমেজ' (১৩৭৪) ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বর্বরতায় উৎপীড়িত মানবিকতায় কবির উদ্বিগ্ন যুগপৎ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গেছে 'ঘরে ফেরার দিন'-এর কিছু কবিতায়। বাস্তবিক, আঙ্গিকে ও উচ্চারণে আগাগোড়া অমিয় চক্রবর্তী বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত। জীবনানন্দের মতো গভীর জটিল যন্ত্রণার চিহ্ন তাঁর কবিতায় নেই, নেই বুদ্ধদেবের মতো সৌন্দর্যমুগ্ধ আবেগতাড়িত কাব্যোচ্ছ্বাস, সুধীন্দ্রনাথের মতো হতাশা বা তার্কিক রীতি। পৃথিবী-ঈশ্বর-মানুষের গভীর চেতনা-স্বরূপ, মৃত্যু ও বিজ্ঞান—এই পাঁচটি মূল ধারায় তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির স্রোত কবিতা-ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

উল্লম্ফন, শব্দার্থতত্ত্বের বিপর্যয়, ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহার, কথোপকথনের দেশজ রীতি, চলচ্চিত্রধর্মিতা

কখনও ভাঙা পয়ার কখনও মুক্তক ছন্দের তানপ্রবাহে সমর্পিত হয়ে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে যে আবহ নির্মাণ করেছে তা' 'সমস্তই নিবিড় মননশক্তির ফল।'

১.১২ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী' (আশ্বিন, ১৩৩১) ভাবে-রূপে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ, সত্যেন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলও তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নন। কিন্তু এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই কবি বুঝলেন—'গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মকরূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।' রবীন্দ্র-প্রভাবের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ প্রথম সার্থক রূপ নিল 'বন্দীর বন্দনা'-য় (১৯৩০)। এ কাব্য প্রধানত প্রেমের কাব্য হলেও তা রোমান্টিক প্রেম নয়। প্রেমের লোকোত্তর দেহাতীত রূপ নয়, কবি এখানে যেন প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দি, দেহজ কামনার শাপে নিয়ত দগ্ধ—'বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন' এবং বলেন 'যৌবন আমার অভিশাপ'। প্রবৃত্তির জন্য স্রষ্টাকেই দায়ী করেছেন বুদ্ধদেব, ঘোষণা করেছেন 'তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,/এই গর্ব মোর'। দেহকে আশ্রয় করেও দেহাতীতের এক বোধ 'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থে আরো পরিণত হয়েছে। 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থে কবিকিশোরের উচ্ছ্বাসের তীব্রতা হ্রাস পেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত প্রণয়াবেগের সংহত রূপ লক্ষণীয়। 'দময়ন্তী' (১৯৪৩), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮) 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫), 'মরচেপড়া পেরেকের গান' (১৯)—উত্তরকালের এইসব কাব্যগ্রন্থে বহির্সংসারের নানা বিষয় থাকলেও অন্তর্নিহিত প্রেমের অনুরণন কখনই একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তাঁর কবিতার প্রথম পর্ব শেলি, কিটস, সুইনবার্ন-এ আচ্ছন্ন, পরে লরেন্স, বোদলেয়র, পাস্তেরনাক প্রমুখের দ্বারা আক্রান্ত বুদ্ধদেবের কবি-ব্যক্তিত্ব। ফলে তাঁর কবিতায় সৃষ্টি তাঁর কাছে 'অসম্ভব দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ি।' কালচেতনা কিংবা সমাজচেতনা খুব গভীর প্রভাব হয়তো ফেলেনি বুদ্ধদেবের কাব্যে, তবে তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায় তিরিশের যুগের শুরুতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য গ্রামবাংলার নিসর্গপরিবেশ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পরিবেশের দিকে। যেন আবিষ্কারকের সন্ধিৎসা ও ধৈর্য নিয়ে বুদ্ধদেব খুঁজেছেন শহরের সৌন্দর্যকে—

'বৃষ্টি পড়ে ঘাসে
ট্রামের রাস্তার পাশে, বালিগঞ্জে।
এই তো শ্রাবণ।' ('ঘাস', 'শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর')

গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য ও বিদেশি শব্দের ব্যবহারে গদ্য ও পদ্যের ব্যবধান বিলোপে বুদ্ধদেব আগাগোড়া সচেষ্ট। কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ দেখা যায় অলংকার প্রয়োগে, ছন্দের পরীক্ষায় ও শব্দচয়নে। ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষিত হয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পুরাণের কাহিনি, প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের উক্তি অথবা ইতিহাসের ঘটনাবলি স্মরণে—'অমিতার প্রেম-এ' যেমন অরফিউসের কাহিনির ইঙ্গিত,

'মোর প্রাণে নেই সেই প্রেম—যার বলে
গুপ্ত মৃত্যুপুরী হতে এনেছিল ফিরায়ে প্রিয়ারে
বিরহী প্রেমিক।'

১.১৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮)

আধুনিক কাব্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাই সবচেয়ে বেশি আলোড়ন এনেছিল। কল্লোলী বিদ্রোহের যুগে যতীন্দ্রনাথ-নজরুল এবং মোহিতলালের পরিমণ্ডল পার হতে হতে প্রেমেন্দ্র উচ্চারণ করেছিলেন নিজস্ব একটি উক্তি—'জীবনবিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার।' মোহিতলাল প্রমুখের সঙ্গে উত্তরকালের 'কল্লোল'-এর 'আধুনিক'দের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র যেন একটি যোজক। তাঁর কবিতায় দুঃখবাদ, দেহবাদ নেই, উৎকণ্ঠা নেই, সমাজ বা যুক্তিবাদের বিরোধিতা নেই, নেই বৈয়াকরণিক বিপর্যয় বা বাগ্‌ভঙ্গির তির্যকতা। এক সরল আশাবাদে আলোকিত তাঁর কবিতা বরাবরই একশ্রেণির পাঠককে আকৃষ্ট করেছে।

'প্রথমা' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বকীয়তা ও কাব্যকুশলতার পরিচয় আছে। ধারাবাহিকভাবে কোনো উত্তরণ-পর্ব নেই। অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থাশীল এই কবি মনে করতেন প্রকৃতি আর চৈতন্যের দ্বন্দ্বই আধুনিকতার মূল কথা। 'মাটির ঢেলা', 'বেনামী বন্দর', 'আমি কবি যত কামারের' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর স্বতন্ত্রতা আছে। এখানেই তিনি বলেছেন 'আমি কবি যতো কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের;/মুটে মজুরের/আমি কবি যতো ইতরের।' এঁদের সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তা, 'মানুষের মানে চাই' কবিতায় তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার মূল সূত্র বিধৃত—'আমায় ঘিরে জীবনের স্রোত বয় এবং আমি সেই স্রোতের স্পর্শ হৃদয়ে সানন্দে অনুভব করি।' দুর্দিন ঘনিয়ে এলেও কবি মনে করেন শপথ রক্ষা হবে কারণ 'প্রিয়ার দৃষ্টি আছে সম্বল, আছে বন্ধুর প্রেম, কত জননীর অযাচিত স্নেহ।' সব কিছুকে নস্যাৎ না করে তাই গাঢ় বিশ্বাসে তিনি প্রতীক্ষা করেছেন নব সূর্যোদয়ের জন্য। তাঁর কবিতা একভাবে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা আর গভীর অনুভবের উচ্চারণ। তাই নীল দিনে কত বৃষ্টি-ঝড়-অন্ধকার মেঘের ঘনঘটার পর কবিহৃদয় সবকিছু ভুলে গিয়ে সুনীল উৎসবে মাতে, মনে হয় প্রেমিকার 'নয়ন হতে' 'নীল দিন' 'জীবনের দিগন্তে' ছড়িয়ে পড়ে। নিসর্গচিত্র তাঁর কবিতায় সুস্থ জীবনাদর্শের পরিপূরক। 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'অথবা কিন্নর' (১৯৬৭), 'কখনো মেঘ' (১৯৬১), 'নদীর নিকটে', 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৩০) তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ এবং চলিষ্ণুতায় এই গ্রন্থগুলি স্পন্দিত। 'প্রথমা' থেকে 'সম্রাট'-এ যখন কবি এলেন তখন তিনি বাইরে থেকে ভিতরে যেতে চাইছেন। 'সাগর থেকে ফেরা'য় সভ্যতা সম্বন্ধে কবির উদ্বেগ প্রাধান্য পেয়েছে। 'অথবা কিন্নর'-এ তাঁর অভিমুখীতা মনের গভীরে, 'কখনো মেঘ'-এ তিনি জীবনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে মর্যাদা দিলেন। 'নদীর নিকটে' কাব্যে অন্ধকারের প্রতীকে ব্যঞ্জিত হয়েছে জীবনের গূঢ় ব্যাসকূট। সাম্প্রতিক অস্তিত্বের সংঘাত 'বেদনা দ্যোতিত-হরিণ চিতা চিল'-এ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিমানস একদিকে দুর্গম পথসন্ধানী সমুদ্রসন্ধানী, অন্যদিকে সভ্যতার সুস্থ বিবর্তনে বিশ্বাসী, তাঁর প্রতিবাদ মৃদু হলেও অব্যর্থ। জীবনানন্দের নৈঃসঙ্গ কিংবা সুধীন্দ্রনাথের নাস্তিবাদ তাঁর কবিতায় কখনও ছায়া ফেলেছে বলে মনে হয় না, অমিয় চক্রবর্তীর কল্যাণময় হার্দ্য সুরের রনন থেকেও প্রেমেন্দ্রর পৌরুষযুক্ত উচ্চারণ আলাদা। কাব্যিক ভাষা পরিহার করে সংহত মুখের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতার আবেদনকে যে অব্যর্থ করে তোলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় তারও নিদর্শন আছে।

১.১৪ বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)

মধ্য-তিরিশ থেকে ষাট দশক পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের সামাজিক পটভূমিকায় বাংলা কবিতার ক্রমপরিবর্তমান শিল্পরূপ বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রত্যক্ষ, কাব্যপাঠকের রুচি ও প্রগতি তাঁর কাব্যের সংস্রবে পরিশীলিত এবং তাঁর কবিতা একটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা। বুদ্ধদেবের 'প্রগতি' পত্রিকায়, শ্যামল রায় ছদ্মনামে 'কল্লোল' ও 'মহাকাল' পত্রিকায় তিনি একসময় প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন, তারপর যোগ দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়'-গোষ্ঠীতে। এই সময়ে এলিয়ট-এর ১৯২৫ সালের কবিতাবলি, সমালোচনা গ্রন্থ 'The Sacred Wood' ও 'Criterion'

পত্রিকার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি এলিয়ট-এর দ্বারা প্রাণিত হন।

'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২) বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও বিদেশি শব্দ-রূপক-উপমার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারে তা শুধু তাঁর রচনা-পরিণতিরই ইঙ্গিতবহ নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কাব্যজগতের সূচকও বটে। 'চোরাবালি' (১৯৩৮)-র প্রথম কবিতা 'ঘোড়সওয়ার' নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে পুরুষকারের উত্তরণ-পর্বের আকাঙ্ক্ষার অবিস্মরণীয় প্রতীক, চতুর্দিকের চোরাবালির ভয়াবহ প্রেক্ষিতে হৃদয়ের মহত্তর জাগরণের দ্যোতনায় ভাস্বর ''জনসমুদ্রে উন্মথি কোলাহল/ললাটে তিলক টানো।/সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল,/হৃদয়ে আধির চড়া।/চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে/ কোথায় পুরুষকার?/হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!/আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,/অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?'' ভাবানুষঙ্গের জটিলতা সত্ত্বেও 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' কবিতা দুটি বিষ্ণু দে-র কাব্যের কলাকৌশল ও ধ্রুপদী অনুসন্ধিৎসার নিদর্শন। এলিয়টী রীতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত 'ক্রেসিডা' কবিতায়—

ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়!
আশ্লেষে তব অনন্ত স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ।
তোমাতেই করি মত্ত মরমে জয়।

'পূর্বলেখ' (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থ থেকেই বিষ্ণু দে-র কবিতা মার্কসীয় সমাজচেতনা ও ইতিহাসবোধে বিস্তৃত হল। মার্কসের পথেই তিনি মুক্তির ইশারা পেলেন, ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে শোষিত গ্রামগুলির চেহারা দেখলেন তিনি—

'গ্রাম তো হাপর
হাঁপ ধরে সেই মরা ঝরে পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপেঝাড়ে
ঘুঁটের ধোঁয়ায় শ্যাওলায় আগাছায় নোংরায় ভাঙা পথে
জীর্ণ মঠ বিদীর্ণ মন্দিরে
ঝিরঝিরে মরা নদী মজা খাল, কচুরি পুকুরে ....
দূর থেকে নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি। ('বৈকালী', 'পূর্বলেখ')

এমনকী প্রেম সম্বন্ধে তাঁর পরিবর্তিত মূল্যবোধের উৎসেও রয়েছে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর প্রিয়া স্বকীয়া, রোমান্টিক কবিদের পরকীয়া কল্পনা বিষ্ণু দে গ্রহণ করেননি, তাই তাঁর প্রিয়া একাধারে গৃহিণী ও কমরেড—'আমার বৈশাখে তুমি শ্রাবণের সেই নদী/প্রেমের লাবণ্যে স্নেহে কর্মিষ্ঠতায় আশ্বিনের স্বচ্ছ স্রোত/পাড়ে পাড়ে ঝিকিমিকি এক ও অনেক।' ('নদীর উৎস যদি জানা থাকে', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার') দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ, দাঙ্গা, শান্তির জন্য সংগ্রাম-সংকটের নানাবিধ ঘূর্ণিতেও বিষ্ণু দে তাঁর বিশ্বাস থেকে ভ্রষ্ট হননি, 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৯)-এর প্রায় সব কবিতাই এই বিশ্বাসজাত দৃঢ়তার প্রতীক। সমকালীন জীবন থেকে যেমন, তেমনই দেশের পুরাণ-মঙ্গলকাব্য-রূপকথা থেকেও কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি। 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭) কিংবা 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০)—এইসব কাব্যগ্রন্থে বিশ্ববীক্ষায় উৎসুক সচেতন এই কবিকে একভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে, এলিয়ট ও পরে পল এলুয়ার, লোরকা, লুই আরাঙ্গ, পাবলো নেরুদার অনুরণন-মুখরিত বিষ্ণু দে-র কবিতার ভাষাবিন্যাস ও প্রয়োগনৈপুণ্য সর্বদা হয়তো প্রাঞ্জল নয়, কিন্তু এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসেও দেশজ পুরাণে তিনি সমর্পিত, প্রার্থনা তাঁর 'জল দাও আমার শিকড়ে', 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৪)-য় বিষ্ণু দের সমাজচেতনা ও জীবনজিজ্ঞাসা স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' (১৯৬৩) গ্রন্থে কবি অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে বর্তমানের ফাঁকিকে এযুগের কাছে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৫৮)-এ কবি রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করে বর্তমানের হতাশা আর মৃত্যুভয় থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। সংগীতধর্মিতা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইউরোপীয় সংগীতের টেকনিকেই তাঁর 'জন্মাষ্টমী' রচিত,

পদবিন্যাসে বিশৃঙ্খলা-উল্লম্ফন কৌশলের প্রয়োগ, ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে বিষ্ণু দে তাৎপর্যপূর্ণ।

- **চল্লিশের দশক : পটভূমি**

১৯৩৬ সালে শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ১৯৩৭-এ জাপান আক্রমণ করে চিন, ১৯৩৯-এ শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১-এ অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করেন হিটলার। ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন প্রতিরোধের একটা তাগিদ অনুভব করেছিলেন সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ—রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে সংস্কৃতি-কর্মীরাও। ভারতবর্ষের পরিস্থিতিও তখন অগ্নিগর্ভ—গান্ধিজির ডাকে আগস্ট বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে জনমানস উত্তাল, এইসময়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবর্গের মুক্তির জন্য আন্দোলন, নৌ সেনার বিদ্রোহ, ডাক ও তার কর্মীদের হরতাল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি জোরদার হয়েছে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। পাশাপাশি পঞ্চাশের মহামন্বন্তর আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যথাক্রমে ব্রিটিশ শাসনের হৃদয়হীন ঔদাসীন্য আর গোপন মদতকেই লক্ষ করল মানুষ। এই দশকের শেষার্ধেই ১৯৪৭-এ দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এল, সীমান্ত পেরিয়ে এসে পড়ল উদ্বাস্তুরা, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ হল বিপন্ন। সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রের নবজাতক সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের হয়তো বা হঠকারী সিদ্ধান্তই নেয় কমিউনিস্ট পার্টি। উত্তরবঙ্গের ও দক্ষিণবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়। ফ্যাসি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন। ‘সার্থক সাহিত্য প্রগতিশীল হইতে বাধ্য’, গণজীবন হবে এই কবিতার বিষয়, বাস্তববাদী হবে তার পদ্ধতি—এই-ই প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মূল কথা। কবিতা হবে গণমুখী, সহজ, আবেদন-প্রত্যক্ষ এবং আশাবাদী। এই কাব্য-আন্দোলনকে নানাভাবে প্রাণিত করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক এবং সাংগঠনিক শক্তি। আবার শিল্পকলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পার্টির নজরদারি মানতে রাজি ছিলেন না কেউ কেউ। যাই হোক, উত্তাল এই কালপর্বে কবিতার দুটি ধারা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে—১. সমাজ-সচেতন রাজনীতিনির্ভর কবিতা এবং ২. তারই প্রতিক্রিয়ায় মূলত রোমান্টিক কবিতার চর্চা।

১.১৫ সমর সেন (১৯১৬-৮৭)

সমর সেন ছিলেন প্রগতিপন্থী এই কবিগোষ্ঠীর অগ্রণী। প্রকরণে ও পদ্ধতিতে এক নতুন কাব্যধারার প্রবর্তকও বলা যায় তাঁকে। কাটা-কাটা শব্দে এবং খণ্ড খণ্ড প্রতীকী চিত্র ও ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে গদ্যছন্দেই কবিতাকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন। সমর সেনের পর্বের রচনায় এক ধরনের চাপা যন্ত্রণা-বিধুরতা, বিষাদ ও নৈরাশ্য শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে গাঢ় হয়ে উঠেছে—

‘স্তব্ধ রাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও?
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
বিশাল অন্ধকারে শুধু একটি তারা কাঁপে,
হাওয়ায় কাঁপে শুধু একটি তারা।
কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধরাত্রে
আমাকে একলা ফেলে?’ (‘নিঃশব্দতার ছন্দ’)

এই বিমূর্ত যন্ত্রণা কিংবা romantic agony মাঝে মাঝে তীব্র আশায় কেঁপে ওঠে

‘যদি ঝড় নেমে আসে,
শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ করে
অন্ধকারে ঝড় নেমে আসে
ঝড় নেমে আসে বিশাল, গভীর অন্ধকারে,

তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।' ('ঝড়')

মেঘ-মদির 'মহুয়ার দেশ'-ও তাঁকে হাতছানি দেয়, কয়লাখনির 'গভীর বিশাল শব্দ' শুনতে পান, কিন্তু 'শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে অবসন্ন মানুষের শরীরে ধুলোর কলঙ্ক' তিনি দেখেন এবং তাদের 'ঘুমহীন চোখে ক্লান্ত দুঃস্বপ্নের হানা' টের পান।

তবে এই শূন্যচারিতার পর কবি নিজের শিকড়-সন্ধানের প্রয়াস করেছেন নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন ও পরিপার্শ্বের মধ্যে—শহুরে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের গ্লানি, তার বিবর্ণ প্রাত্যহিক, তার সংকীর্ণতা, আত্মমগ্নতা এবং অসহায়তা তাঁর জীবনে সমর সেন সহজেই চিনে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর বিদগ্ধ মননে এই মধ্যবিত্ত প্রাণধারণের অংশীদার হিসাবে একধরনের আত্মকরুণার ভাব জন্ম নিয়েছিল, পরিচিত জীবন সম্বন্ধে মোহমুক্তি কবিতায় নিয়ে এনে বিপুল নৈরাশ্যের অসামান্য ক্ষমতায় তিনি তাঁর কতকগুলি পঙ্‌ক্তিকে 'গণ-কণ্ঠবাহিনী' করে তুলতে পেরেছিলেন। একটা আবেগ তাঁর মধ্যেও ক্রিয়াশীল, কিন্তু সে ব্যক্তিগত আবেগের বিষয়-উপাদান বাইরের সংঘর্ষ-সংকুল শ্রেণিবিভক্ত বিশ্ব-মানব-সমাজ থেকে নেওয়া, তাঁর ব্যঙ্গও শ্রেণিবোধ সচেতন রাজনৈতিক ব্যঙ্গ। এই সময়ের কবিতায় চিত্রকল্প বিরল হয়ে আসে, রাজনৈতিক শ্লোগান হয়ে ওঠে অনেককবিতার চরণ। তবু কবি বিদ্রূপে বিদ্ধ করেন সাম্যবাদ ও প্রগতির সমর্থক মধ্যবিত্ত 'কবি'দের—এবং নিজেকেও 'মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি/মনে রোমান্টিক বুলবুলের অবিরত গান,/তুমি ছিলে তারি একজন।/এ অধমও তারি একজন।' ('কয়েকটি মৃত্যু') ''জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি/দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি' একথা বললেও কবি যেন ক্রমশ নিজের ভেতর শুনতে পাচ্ছিলেন অন্য এক কণ্ঠস্বর। শ্রমিক-কৃষক নিয়ে ভাবালু ধরনের কবিতা লিখলে তা প্রগতিশীল কবিতা হবে, এমন কোনো ধারণায় আর বিশ্বাস রাখতে পারছিলেন না। বরং তাঁর মনে হয়েছিল ব্যক্তিগত সততা বজায় রাখার মধ্যে দিয়েই কবি হতে পারেন প্রগতিশীল—এসব সংশয়ের সমাধান অসম্ভব জেনেই হয়তো শ্রদ্ধেয় সততায় তিনি কবি হিসেবে স্তব্ধ হয়ে গেলেন—

শুনি না আর সমুদ্রের গান

'থেমেছে রক্তে ট্রাম বাসের বেতাল স্পন্দন।
ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগণার লালমাটি....
রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।' ('জন্মদিন')

এই বোধহয় তাঁর শেষ কবিতা, এরপর কবিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমর সেন সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সাংবাদিকতায়। এখানে তিনি আপোসহীন। তাঁর স্বাধীনচেতা ও বৈপ্লবিক মানসিকতার জন্য জীবনে পরে অনেক ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছে, তবু নিজের মতামত প্রকাশে নিঃসংশয় ছিলেন তিনি। প্রথম দিকে তাঁর রচনা-পদ্ধতি একই রকম—কাটা-কাটা কথা, শ্লেষ, টুকরো টুকরো ছবি এবং ব্যঞ্জনা সেখানে থাকলেও পরে গদ্যভঙ্গিতে বিবৃতিধর্মী বাচনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর 'কবিতা'-র আধার।

সমর সেনের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪—এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এইসব কাব্যগ্রন্থ—'কয়েকটি কবিতা', 'গ্রহণ', 'নানাকথা', 'খোলা চিঠি', 'তিন পুরুষ', 'সমর সেনের কবিতা'।

১.১৬ অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০)

চল্লিশের দশকে যাঁরা গদ্যরীতিতে কাব্যচর্চা করেন, অরুণ মিত্র তাঁদের মধ্যে একজন। এবং আলাদা একজন। 'কিন্তু কোনো সৌরভে আমি ভিড়লাম না/কোনো কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করল না,/কারণ আমার বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল পাথরে/এক অনমনীয় পাথরে' ('নির্ভর', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')—এই কবিতা অরুণ মিত্রের স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান।

আলো আর অন্ধকারের মধ্যেই তাঁর বার বার আনাগোনা, পাথর আর ধুলোর মাঝখানে তাঁর আসা-যাওয়া—জল আর বরফের মধ্যে। একজন আধুনিক মানুষ কতখানি ধ্যাননিমগ্ন হতে পারে তাঁর কবিতায় তারই বিরল উদাহরণ। তিনিও নির্জন কবি, তবে জীবনানন্দের থেকে সে নির্জনতার মাত্রা আলাদা। জনতার মাঝখানে থেকেও জনতাকে উপেক্ষা না করেও অরুণ মিত্র জানেন কী করে নিভৃত হতে হয়। 'নির্জনতা আমি জেনেছি।/নিজেকে বিলোবার নিজেকে সমৃদ্ধ করবার ঘনিষ্ঠ মাটিতে।/আমি এই যেখানে এসেছি/ এ কি কোনো নির্জনতা,/শব্দের শব্দহীনতায় থিতোনো/আলো অন্ধকারের চাকে নতুন গড়া?' তাঁর কবিতায় বার বার চিত্রকল্প—''সমুদ্র শেষ হল,/গভীর বনে আর হরিণ নেই,/সবুজ পাখি গিয়েছে মরে,/আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে/দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে/উড়ন্ত পাখির মতো।'' ('স্বর্গ হতে বিদায়') এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ খোঁজেন কবি সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের স্বপ্নের মধ্যে—''কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী/যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে।'' 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি'-র সমস্ত দাহ বুকে নিয়েও বলতে পারেন হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন'। এক শহরের ছবি, যা আমাদের চেনা আবার অচেনাও বটে। দুপুরবেলার শহর, রাত্রির শহর, তালাবন্ধ শহর এবং পাথর আর জল, রাত্রি ও রৌদ্র, জনতা এবং নির্জনতা—সবকিছুকে মিলিয়েই গড়ে উঠেছে অরুণ মিত্রের প্রতীকের জগৎ।

''আমি যে জিনিসেই হাত দিতে যাই, আমার আঙ্গুল বেয়ে টপটপ রক্ত। আমি হন্যে হয়ে খুঁজেছি কোথায় এই সাদার নীচে বাসি পাতায় একটু রস রয়েছে যদি পাহারাদারের অজান্তে নিংড়ে নেওয়া যায় হায় বিশল্যকরণী, যদি আমার নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের কাছে ঐসব নিশ্বাস বইয়ের রাখা যায় হায় বিশল্যকরণী। আমি খুঁজছি আমি খুঁজছি''।

এইভাবেই পাথরের প্রতীকে কবি খুঁজতে চান প্রস্রবণ, উদ্ভিদ আর নদীর উৎস, প্রথমাবধি তিনি জানেন, প্রত্যেক রাত্রি অনন্ত রৌদ্রের জন্ম দেয়, বিদীর্ণ পাষাণেই হৃদয় মূল মেলবার জায়গা খুঁজে পাবে। 'প্রান্তরেখা' (১৯৪৩) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, তারপর 'উৎসের দিকে' (১৯৫৪) তাঁর অভিযাত্রা, 'এই অমৃত এই গরল' খুঁজতে খুঁজতে অরুণ মিত্র এত দূর পর্যন্ত চলে এসেছেন, বাগর্থের সীমা পেরিয়ে অনির্বচনীয়ের দিকে তিনি এগিয়ে গেছেন। ব্যবহৃত শব্দগুলিকে নিজস্ব ধ্বনি ও অর্থের অনুষঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করাই তাঁর লক্ষ্য ''কেমন করে হাত মুঠো না করেও সংকল্প ব্যক্ত করা যায়, হাত চেপে না ধরেও বন্ধুত্ব, অরুণ মিত্রের কবিতায় তারই আভা।'' ('বাংলা কবিতার কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

১.১৭ সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)

১৯৪০ সালে বুদ্ধদেব বসু কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন দেখে যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ''বোধহয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না।''

এমনকী, প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না, কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষণীয় ছিল''। বস্তুত প্রেম ও প্রকৃতির সংজ্ঞা সুভাষের হাতে কিছুটা শিথিল সম্প্রসারিত হয়েছে, কেন না কবিতার 'প্রচলিত' উপকরণ কিছুটা প্রত্যাখ্যান করেই একদা তিনি লিখেছিলেন—''পালাবার পথে ধূলা ওড়ানোর দঙ্গলে, ভাই/আমিও ছিলাম একজন আজ প্রাণপণে তাই/ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওড়াই।'' বলেছিলেন—'কমরেড নবযুগ আনবে না?' ১৯৩৮ সালে তাঁর কবিতা লেখার শুরু (প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক', ১৯৪০-এ প্রকাশিত), একটা নতুন সুরের প্রবর্তনায় তাঁর বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ দিগ্‌বিজয়ীর মতো—

'সূর্যকে মাথায় রেখে
অহংকারের সাড়ে-তিন হাত ছায়াটাকে
পায়ে মাড়িয়ে
খাড়া রোদ দাঁড়িয়ে ঘামে।

নোনা হাওয়ার নোনা আগুনে
পাথর-খোদাই পেশীগুলো
স্ফীত হয়ে ওঠে...'

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথে উদ্বুদ্ধ আর পরে এলিয়ট-হুইটম্যান-আরাঙ্গ-মায়াকভস্কি-পাস্তেরনাক-নেরুদার সঙ্গে মানস-নৈকট্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করেন সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানো কবির অন্যতম দায়। এই দায়বোধ থেকেই সম্ভবত উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তির চতুর নাগরিক বিন্যাস থেকে তিনি পৌঁছে গেছেন 'মানুষের কাছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দারুণ আঘাতে দুর্ভিক্ষের কালো শকুনের ছায়ায় অরন্তুদ মানুষগুলির মাঝখানে তাঁর কবিতা খুঁজে পেয়েছে নিজের অধিষ্ঠান ভূমি—আমরা পেলাম 'এই আশ্বিনে' কিংবা 'স্বাগত'-র মতো কবিতা। 'পদাতিক'-এ তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উপর ভর করে দাঁড়াতে চেয়েছিল তাঁর জীবনবোধ, 'চিরকুট'-এও সেই ভাবনারই বিস্তার। কিন্তু ক্রমশ জীবনের ব্যাপক জটিল অসংজ্ঞেয় বিষয়ের কাছে পৌঁছে যেতে যেতে কবি লেখেন—'ফুলকে দিয়ে/মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই/ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।/তার চেয়ে আমার পছন্দ/আগুনের ফুলিক—/যা দিয়ে কোনোদিন কারো মুখোশ হয় না'—('পাথরের ফুল', 'যত দূরেই যাই')। 'ফুল ফুটুক' থেকেই কবির লক্ষ্য আরো স্পষ্ট, 'ছেলে গেছে বনে' গ্রন্থে এই বোধ আরো তীব্রতা পেয়েছে। একটু পা চালিয়ে, ভাই' বলে হেঁকে তিনি যেন পৌঁছোতে চেয়েছেন সেই জীবনে'রই কাছাকাছি।

কথাগুলোকে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে চেয়ে, প্রত্যেকটি ছায়ার চোখ ফোটাতে চেয়ে, স্থির ছবিকে হাঁটাতে চেয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা মুখের ভাষার অনায়াস ব্যবহারে, মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দের অনিবার্য অথচ স্বাভাবিক মিশ্রণে, শব্দ নিক্ষেপের নির্ভুল লক্ষ্যে, স্যাটায়ারে, প্রতীকধর্মিতায় অ-পূর্ব। এবং ছড়া-প্রবাদ-প্রবচনের সঙ্গেও তাঁর কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। এক সময় তিনি 'অমরুশতক', 'হাফেজ', 'গাথাসপ্তশতী', এমনকী নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ পর্যন্ত করেছেন, উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল : 'পদাতিক' (১৯৪০), 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮) , 'চিরকুট' (১৯৫০), 'যত দূরেই যাই', 'কাল মধুমাস', 'ছেলে গেছে বনে', 'একটু পা চালিয়ে ভাই' ইত্যাদি।

১.১৮ দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫)

সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিশোর বয়সে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে আকৃষ্ট হলেও ১৯৩০-এ লবণ-আইন ভঙ্গের আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন এবং গান্ধি সম্পর্কে এইসময় থেকেই মনের মধ্যে একটা সশ্রদ্ধ ধারণা দৃঢ় হয়ে যায়। চা-বাগানের ম্যানেজারের বাড়িতে শিক্ষকতার কাজ করেছেন, কলকাতার চেতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের শিক্ষকতা করেছেন। চা-বাগানের নিপীড়িত কুলিদের দুর্দশা গান্ধিবাদের প্রতি তাঁর মনকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত করেছে, আকর্ষণ করেছে মার্কসবাদের প্রতি—''আমার কাব্যের হাওয়া বদল হল। রোমান্টিসিজমের ডুবজল থেকে ধীরে ধীরে সাম্যবাদের বাস্তব ডাঙায় উঠে এলাম।'' এইসময়েই 'কাস্তে', 'লালমেঘ', 'ব্ল্যাকআউট : ১৯৩৭', 'বামপন্থী', 'হাতুড়ি' ইত্যাদি কবিতা রচিত। সমকালের মননকে আন্দোলিত করে প্রকাশিত হল 'কাস্তে' কবিতাটি 'বেয়নেট হোক যত ধারালো/কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু/শেল্ আর বোম হোক ভারালো/কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!/বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি/তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?/চাঁদের শতক আজ নহে তো,/এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে!'' 'কবিতা : ১৩৪৩-৪৮' সংকলনে সরাসরি রাজনীতি আশ্রয়ী কবিতা ('জাপান, ১৯৪০') যেমন মেলে, তেমনই বহু পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা যায় যেখানে বামপন্থার প্রতি আনুগত্য স্পষ্ট (যেমন, 'ঘড়ি' কিংবা 'নভেম্বর', ১৯৪১ কবিতা); কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বামপন্থী দলের ইংরেজ শাসকের পক্ষ সমর্থন আরো অনেকের মতো দিনেশ দাসকেও আহত, বিভ্রান্ত করল। আশৈশব-লালিত গান্ধিবাদেই আস্থা জ্ঞাপন করলেন তিনি 'বন্ধ্যাভূমিতে ঢেলে দিলে তুমি প্রাণের গঙ্গাজল/অজস্র অবিরল', কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই আর মেলাতে চেষ্টা করলেন না নিজের অভিমত—যদিও প্রতিবাদীই রইলেন সারাজীবন, সে প্রতিবাদ

একক ও নির্দল ব্যক্তির প্রতিবাদ। সাম্প্রতের পৃথিবীতে ব্যক্তি-সমাজতন্ত্র-ধনতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, নানা রাষ্ট্রের স্বার্থজড়িত আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক অসহায়তা ইত্যাদি জটিলতার প্রতিফলন আর দেখা গেল না তাঁর শেষ পর্বের কবিতায়, বরং ক্ষুধাতুর ও পীড়িতের প্রতি সহানুভূতির আন্তরিক স্পর্শে পেলাম আত্মগত অনুভবে মেদুর বহু লিরিক। ১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'ভুখ মিছিল'-এর সমাজচেতনা তখন ব্যক্তিগত বেদনায় পর্যবসিত—'অথচ স্বাধীনতার পর/আমি কখনও আইন ভাঙিনি—/আইনই আমাকে প্রত্যহ ভাঙছে।' ('আইন : ১৯৭৫', 'রাম গেছে বনবাসে')। বাংলা ছন্দের তিনটি ধারায় এবং গদ্যরীতিতে প্রাথমিক কিছু বিচ্যুতি থাকলেও অনায়াস তিনি, শব্দচয়নে তাঁর প্রতিভা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। উপমায় প্রথম থেকেই তিনি স্বাতন্ত্র্য এনেছেন, তাঁর কাস্তের সঙ্গে চাঁদের তুলনা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী হয়েছে। সরল ভাষণকে ব্যঙ্গনাবহ বাণীতে উত্তীর্ণ করবার বিরল ক্ষমতার তিনি অধিকারী।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'কবিতা' (১৯৪২), 'ভুখ মিছিল' (১৯৪৪), 'দিনেশ দাসের কবিতা' [সংকলন] (১৯৫১) 'অহল্যা' (১৯৫৪), 'কাচের মানুষ' (১৯৬৪), 'অসংগতি' (১৯৭২), 'রাম গেছে বনবাসে' (১৯৮১), 'দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা' [প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯; পরিমার্জিত পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ ১৯৯৩]

১.১৯ বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-১৯৮১)

শুরু থেকেই বিমলচন্দ্র ঘোষ সমাজসচেতন কবি। তিনি মনে করতেন, কবিকে হতে হবে কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামী জীবনের শরিক। তাদের আনন্দ-যন্ত্রণার অংশীদার। মানুষ প্রথমে সমাজবদ্ধ জীব, তারপর সে শিল্পী, কবি। তার শিল্পচেতনাকে, তার কবিত্বকে শুধু প্রকৃতি নয়, সমাজও রসদ ও প্রেরণা জোগায়। কবির পক্ষে অহংবুদ্ধিতে আচ্ছন্নতা, লোকবিমুখতাকে অপরাধ বলে মনে করেন বলেই রক্ষণশীলতা-কুসংস্কার-অবিচার-শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতায় গর্জে উঠেছে বজ্রকঠিন প্রতিরোধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় দেশজোড়া কালোবাজারি মুনাফালোভীর বীভৎস চেহারা দেখে বিমলচন্দ্র ঘোষ তীব্র ক্ষোভে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ, শেলি এবং কিট্স্ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেও উত্তরকালে স্বাভাবিকভাবে এলিয়ট কিংবা মায়কোভস্কিকে নিকটজন বলে মনে হয়েছিল। 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা'-র উড়ানের ছবিতে পাঠক মুগ্ধ হয় তার 'নোনা ঘাম : খাড়া রোদ্দুর'-এ পাঠক সচকিত, সতর্ক—

> 'রক্তের নুনে
> ঘামের নুনে
> চোখের জলের নুনে
> মহাপৃথিবী লাবণ্যময়ী
> যে নুন
> শ্রম ও সৃষ্টির
> আদি উপাদান,
> যে নুনের খরতীব্রতায়
> সাতসমুদ্র উদ্‌বেলিত।'

বিমলচন্দ্র ঘোষের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'জীবন ও রাত্রি' (১৩৪০), 'দক্ষিণায়ন' (১৯৪১), 'উলুখড়' (১৯৪৩), 'দ্বিপ্রহর ও অন্যান্য কবিতা' (১৩৫২), 'নানকিং' (১৯৪৮), 'সাবিত্রী' (১৯৫১), 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' (১৯৫১), 'ভুখা ভারত' (১৯৫১), 'বিশ্বশান্তি' (১৯৫১)। কবিতা সংকলন : 'ছায়াপথ' (১৯৫৫), 'উদাত্ত ভারত' (১৯৫১), 'রক্তগোলাপ' (১৯৫৮) 'উত্তরাকাশের তারা শান্তি' (১৯৫১), 'উত্তরাকাশের তারা' (১৯৬৭)।

১.২০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যৌবনে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চারের দশকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাথমিক সদস্য বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতাকে এই পৃথিবীর অন্যায় অবিচার, সুবিধাবাদ এবং মেকি মানুষগুলির ওপর চাবুকের মতো ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং চেতনাকে রক্তে না নিলে কবির কবিতা নিষ্ফল এমন মনে না করলেও তিনি বলেন যে সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করতে হলে কবিকে রাজনৈতিক বা সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতেই হবে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ্কে-স্কুলে-কাগজের অফিসে চাকরি করেছেন, ১৯৬২-এর সীমান্ত সংঘর্ষে চীনবিরোধী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভোট দেওয়ার প্রতিবাদে আইন অমান্য করে জেলে গেছেন, বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে কলকাতার বিক্ষোভ মিছিলে পা মিলিয়েছেন। এই প্রতিবাদী চেতনার স্বাক্ষর তাঁর কবিতাতেও—ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার থেকেও তাঁর কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে স্বদেশের আলোহীন পরিবেশ। তিনি দেখেছেন শাসকশ্রেণির বর্বর অত্যাচার, জন্মভূমির মৃত্তিকায় লেগেছে শিশুর রক্ত। তিনি নতুন স্তোত্র রচনা করেন—'অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা;/অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা/সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তারে কাড়ে/ধ্বংস করো ধ্বংস করো তারে।'' তাঁর কবিতা সরল উচ্চারণের তীব্রতায় সরাসরি বিদ্ধ করে। নিজেকেই যেন তিনি বলেন ''তুমি গাইতে জানো না/এমন গান/যাতে আগুন রক্তজবা ফুলের মতো.....' তাঁর গলায় প্রেমের গান—মানুষের প্রতি ভালোবাসার গান, হাতের লেখনীতে আগুনের ফুলকি—প্রতিবাদী স্বচ্ছ বলিষ্ঠ চেতনার জন্যই ষাট-সত্তর দশকের উত্তাল সময়ে কারারুদ্ধ তরুণদের দিকে তিনিই বাড়িয়ে দিতে পারেন আশ্বাসের হাত—তার জন্য তাঁকে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। বর্তমান কালের অস্তিত্বের যন্ত্রণা-সংকট মহাভারত মন্থন করে উঠে এসেছে তাঁর লেখায়—'ঘুরেছি মহাভারতে—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে, কুরুক্ষেত্রের/ধর্মযুদ্ধে; গিয়েছি দ্বারকায়/দেখেছি যুদ্ধে আগুন আছে....।'

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'গ্রহচ্যুত' (১৩৪৯), 'রাণুর জন্য' (১৩৫৮), 'উলুখড়ের কবিতা' (১৩৬১), 'মৃত্যুত্তীর্ণ' (১৩৬২), 'লখিন্দর' (১৩৬৩), 'জাতক' (১৩৬৫), 'সভা ভেঙে গেলে' (১৩৭১), 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন' (১৩৭১), 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' (১৩৭১), 'ভিসা অফিসের সামনে' (১৩৭৪), 'মহাদেবের দুয়ার' (১৩৭৪), 'মানুষের মুখ' (১৩৭৬), 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে' (১৩৭৮), 'আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা' (১৩৭৯), 'রাস্তায় যে হেঁটে যায়' (১৩৭৯), 'জ্বলুক সহস্র চিতা অহোরাত্র এ পাড়ায় ও পাড়ায়' (১৩৮০), 'মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়' (১৩৮০), 'এই জন্ম, জন্মভূমি' (১৩৮০), 'ভিয়েতনাম, ভারতবর্ষ' (১৩৮১), 'বাহবা সময়, তোর সার্কাসের খেলা' [সংকলন] : (১৩৮১), 'পৃথিবী ঘুরছে' (১৩৮২), 'আর এক আরম্ভের জন্য' (১৩৮৮), 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা,' [সংকলন] : (১ম খণ্ড ১৩৮৪, ২য় খণ্ড ১৩৮৮, ৩য় খণ্ড ১৩৮৯) ইত্যাদি।

১.২১ সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭)

অকালপ্রয়াত এই কবি বাংলা সাহিত্যের একটি 'কিংবদন্তী'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলিতে মহামন্বন্তরের শবাকীর্ণ দিনগুলিতে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার রক্তাক্ত দিনগুলিতে সুকান্তের কবি-জীবনের যাত্রা শুরু। আত্মপরিচয় দিয়েই যেন লিখেছিলেন—'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি/প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।' খাদ্যের সারিতে তাঁর বসন্ত কেটে যায়, বিনিদ্র রাত্রিতে আর্তনাদ করে ওঠে সাইরেন, বিক্ষুব্ধ বিমর্ষ কবি লেখেন 'এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম। অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম।' রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত সুকান্তর কবিতা একদিক থেকে সরল প্রত্যক্ষ আবেদনময় এবং ভাষণধর্মী। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছ প্রতিদিন জেনেও অন্ধকার অন্ত্রে আর ফুসফুসে রোদের ঝলক প্রবেশের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশাবাদী কবি বলেন—''একদিন হয়তো এই

পৃথিবীতে থাকব না,.... তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে। আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে। গাছে ফুল ফুটবে; শুধু তখন থাকব না আমি,..... তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম...এই আমার আজকের সান্ত্বনা...'

'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক।
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।'

এইভাবেই তাঁর কণ্ঠস্বর মন্দ্রস্বরে বেজে ওঠে, মন্বন্তরের শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে স্বার্থলোভী কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে সুকান্ত উদ্‌গীরণ করে দেন তাঁর সমস্ত ক্রোধ আর ঘৃণা—

'প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনো ভুলিতে পারি?'

ছয় মাত্রার কলাবৃত্তে তাঁর দুর্বলতা থাকলেও নিয়মিত যতিবিন্যাসের কৃত্রিমতা কেমন করে পরিহার করা যায় সে কথাও তিনি ভেবেছেন। বলাকার ছন্দে তাঁর উচ্ছ্বসিত আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর জীবনের শেষ রচনাটি সাধনা ও সিদ্ধির অসামান্য নিদর্শন—তাঁর নন্দনতত্ত্ব সংহত হয়েছে এ-কবিতার শেষ দুটি দ্যুতিময় ছত্রে—

'হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্য আনো
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

● পঞ্চাশের দশক

বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিশেষ কয়েকজন কবির গুরুত্ব প্রতিপাদনই এ আলোচনার উদ্দেশ্য। বাংলা কবিতার ইতিহাসটিকে এঁরা নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সাহিত্য স্বয়ম্ভু নয়। দেশের সমাজব্যবস্থা আর রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে তার সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। তাই কোনো দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা কালে সেই দেশের সামাজিক আর রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। এছাড়া মনে রাখতে হবে মানবসভ্যতার নিজস্ব বিবর্তনের সঙ্গে সব দেশেরই সামগ্রিক পরিস্থিতি—তার সাহিত্য-সংস্কৃতিও নিয়ত বিবর্তিত হয় ক্রমশ স্পষ্ট হয়, পরিবর্তনের লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে বাংলা আধুনিক কবিতা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিল। যদিও ইউরোপীয় কবিতার নব্য রূপরীতি তাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল বিষয় আর প্রকাশভঙ্গি—উভয়তই। এর কিছুকালের মধ্যেই বিশ্বরাষ্ট্রিক পরিস্থিতি হয়ে উঠল বিক্ষুব্ধ। একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রতিরোধ, সাম্যবাদের উত্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্বভাবত আলোড়িত করেছিল মননশীল চিত্তের অধিকারী মানুষদের। কবিতায়ও দেখা গিয়েছিল তার প্রকাশ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—এঁদের কবিতা তার প্রমাণ।

ক্রমে এল আরও পরিবর্তন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয় হল মিত্রপক্ষের। কিন্তু যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির ভারগ্রস্ত ইংল্যান্ড মুক্তি খুঁজল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও তখন অপ্রতিরোধ্য। ফলে ১৯৪৭-এ স্বাধীন হল ভারত। কিন্তু বিনিময়ে বিভক্ত হল দেশ। একদিকে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদার নতুন বোধ অন্য দিকে পুব পশ্চিমে রাষ্ট্রীয় বিভাজনের ফলস্বরূপ এল ব্যাপক বিপন্নতা। বহু মানুষ স্বভূমি, আত্মীয়-পরিজন, বিষয়, সম্পদ ফেলে ছিন্নমূল হয়ে বাধ্য হল দেশত্যাগে। পুব বাংলার মানুষের ভিড়ে ভরে গেল কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলা। দেখা দিল ক্ষোভ আর প্রতিবাদ। এদিকে প্রার্থনাসভায় আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন গান্ধিজি। ১৯৪৮-এ নিষিদ্ধ হল কমিউনিস্ট দল। ১৯৪৬ থেকে দরিদ্র কৃষকরা ফসলের ন্যায্য ভাগের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছিল, তা চলেছিল ১৯৪৯ পর্যন্ত। স্বাধীন দেশের পুলিশের গুলি চলেছিল তাদের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৈনাশিকতা—বিশেষত হিটলারের ইহুদি-নির্যাতন এবং আমেরিকার পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ—মানবিকতার সব শর্তই লঙ্ঘন করেছিল। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মোহে অন্ধ মানুষের ভয়ংকর রূপ দেখেছিল ১৯৪৬ আর ১৯৪৮-এর কলকাতা, নোয়াখালি আর বিহারের মানুষ।

এসব তিক্ততা সত্ত্বেও স্বাধীনতা দেশের মানুষকে দিয়েছিল স্বতন্ত্র একটি বোধ। আত্মমর্যাদায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা।

বাংলা সাহিত্যে দেখা গিয়েছিল এই সব প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রতিফলন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে তাই শোনা যায় বহু মিশ্রিত স্বরের সমাহার।

স্বাধীন দেশের নাগরিকের দায়িত্ববোধ আর সংকল্পের চেতনা, তারই সঙ্গে ক্ষোভ, যন্ত্রণা প্রতিবাদ, আত্মস্বাতন্ত্র্য আর আত্মমর্যাদায় বিভিন্ন স্তর দেখা গিয়েছিল এই সময়ের সাহিত্যে।

এই সময়ের সাহিত্যের—বিশেষত কবিতার প্রধান লক্ষণ আত্মমগ্নতা। কোনো সুস্থ স্বাভাবিক রাজনীতির আদর্শ কবিদের সামনে ছিল না। রাজনীতি তখন অনেকটাই হয়ে উঠেছে ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির উপায়। ফলে রাজনীতি তাঁদের আকর্ষণ করেনি। দেশভাগের বিবিধ যন্ত্রণা সত্ত্বেও একটা সুফল কিন্তু হয়েছিল। পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় সকলেই চলে এসেছিলেন কলকাতায়। দুঃখ-দারিদ্র্য অস্থিরতা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন তাঁরা। পারস্পরিক ভাববিনিময়ের ফলে গড়ে উঠল অন্য ধরনের এক কাব্যজগৎ। এই জগতের কবিরা কবিতাকে, কবির নিজস্ব অনুভবকেই স্থান দিলেন সবার উপরে। সমাজ বিমুখ যে তাঁরা ছিলেন না তা তাঁদের কবিতা পাঠ করলেই বোঝা যায়। অনুত্তেজিত আত্মবিশ্বাসে স্থির এই কবিরা বাংলা কবিতায় উচ্চারণ আর শ্রুতির স্বাভাবিকতাকে দিলেন প্রধান স্থান। ফলে স্বাভাবিকতার সহজ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হল তাঁদের কবিতা। এঁরা গদ্য ছন্দে এবং বাংলার তিন প্রধান নিরূপিত ছন্দ—কলাবৃত্ত, মিশ্রকলাবৃত্ত আর দলবৃত্তেও ছিলেন দক্ষ। চিত্রকল্প নির্মাণেও এঁরা প্রায়শ ব্যক্তি-অনুভবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শব্দব্যবহারে তাঁরা ছিলেন নিপুণ। গভীর অনুভবের গাঢ় অথচ সরল আর আন্তরিক অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল তাঁদের কবিতা।

এই কবিরা কবিতাকে দিয়েছিলেন বিস্তৃতি। বিশিষ্ট মনন আর অধ্যয়ন ভিন্ন কবিতা উপভোগ করা যায় না—কবিতা হবে সমাজচেতনার অভিব্যক্তি—এসব ধারণা ভেঙে দিয়েছিলেন তাঁরা; কবিতাকে শর্তবদ্ধ করতে চাননি এঁরা। সব কবিতাপ্রেমিকের জন্যই কবিতা, একমাত্র শিল্পবোধই কবিতার কষ্ঠিপাথর—কবিতার এই সর্বত্রগামিতা তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কবিতার এই সর্বতোমুখীনতার স্বীকৃতি বাংলা কবিতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল এই সময়ে।

আমরা এই পর্বের কয়েকজন কবির জীবন ও কাব্যচর্চার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই সময়ের অর্থাৎ

স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন দশকের বাংলা কবিতার সমগ্র চালচিত্রটি বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

১.২২ গোলাম কুদ্দুস

জন্ম ২০ জানুয়ারি, ১৯২০। জন্মেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে। বিদ্যালয় শিক্ষার স্থান নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার হরিনারায়ণপুর হাইস্কুল।

কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিলেন কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে। ১৯৪১-এ রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গোলাম কুদ্দুস সাম্মানিক স্নাতক হন ১৯৪৪-এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে, বিষয় ইতিহাস। ইতিহাসেই স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬-এ।

স্নাতক হওয়ার বছরেই, ১৯৪৪-এ গোলাম কুদ্দুস অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি ছিলেন দলের সর্বক্ষণের কর্মী। খাদ্য আন্দোলনে (১৯৭৮) যোগ দিয়ে জেলেও গিয়েছিলেন।

মূলত সাংবাদিকতা ছিল তাঁর বৃত্তি। ১৯৪৬-এ 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। কিছুকাল 'পরিচয়' সম্পাদনা করেছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শগত মতান্তরের কারণে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর তিনি 'কালান্তর' পত্রিকায় যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬৯ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর এখানে কর্মকাল।

তাঁর কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটি ঃ—

(১) 'বিদীর্ণ' (১৯৫০)
(২) 'ইলা মিত্র' (১৯৫১)
(৩) 'নাচে মনময়ুর' (১৯৮৩)
(৪) 'স্বেচ্ছাবন্দী' (প্রকাশকাল জানা যায় নি)
(৫) 'নব রামায়ণ' (১৯৮৭)

গোলাম কুদ্দুস কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনাদি তাঁর কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু প্রত্যয়দীপ্ত। যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদে মুখর। 'নব রামায়ণ' ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমজীবীর জীবন কাব্য। ক্ষুদ্র এই গদ্য কাব্যটিতে শোষক আর শোষিতের সম্পর্ক এবং শ্রমিক ঐক্যের মাধ্যমে, সংগ্রামের পথে মুক্তির কথা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। চোদ্দোটি সর্গে বিভক্ত কাব্যটির চতুর্থসর্গের প্রথমাংশে 'মেঘনাদবধকাব্য'-এর 'সম্মুখ সমরে পড়ি' অংশটির প্যারডি করা হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর এই কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরি। দেশের মাটি-জল ও মানুষের সঙ্গে তাঁর কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগ। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির নীরব দ্রষ্টা মাত্র নন তিনি, নিপুণ ভাষ্যকারও। সহজ সরল আবেগদীপ্ত তাঁর কবিতা।

১.২৩ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পঞ্চাশের দশকের এক উল্লেখ্য কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। যদিও চল্লিশের দশকেই তাঁর কবিতা লেখার শুরু, কিন্তু পঞ্চাশের দশকে তাঁর সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

১৯২৪-এর ১৯ অক্টোবর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের চান্দ্রায় (বর্তমান বাংলাদেশ) তাঁর জন্ম। জিতেন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লনলিনীর সন্তান নীরেন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন কেটেছে নগর কলকাতায়। ১৯৪০-এ তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বঙ্গবাসী কলেজ স্কুল থেকে। বঙ্গবাসী কলেজ থেকেই ১৯৪২-এ আই.এ. দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৪-এ

নীরেন্দ্রনাথ ইতিহাস নিয়ে স্নাতক হন সেন্ট পলস কলেজ থেকে।

তার আগেই অবশ্য শুরু হয়েছিল তাঁর কর্মজীবন। সাংবাদিকতাই তাঁর জীবিকা। ১৯৪২-এ তিনি যুক্ত ছিলেন কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে—যেমন 'প্রত্যহ' (সহ-সম্পাদক), 'মাতৃভূমি', 'প্রত্যহ' (দ্বিতীয় পর্যায়), 'স্বরাজ পত্রিকা', 'ভারত', 'সত্যযুগ'। ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া নামের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৩-১৯৪৬ এই সময়বৃত্তে তাঁর যোগ ছিল 'শ্রীহর্ষ' (বাংলা ও ইংরেজি) এবং 'কিশোর পত্রিকা'র সঙ্গে। ১৯৫১ থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। 'রবিবাসরীয়' বিভাগের সম্পাদনা, সম্পাদকীয় লেখা, 'আনন্দমেলা' বিভাগের সম্পাদনা এসব কাজের পর বর্তমানে তিনি পত্রিকাটির সম্পাদকীয় উপদেষ্টা। এযাবৎ তাঁর মোট কবিতা-সংকলনের সংখ্যা একুশ : (১) 'নীল নির্জন' : ১৯৫৪, (২) 'অন্ধকার বারান্দা' : ১৯৬১, (৩) 'প্রথম নায়ক' : ১৯৬১, (৪) 'নীরক্ত করবী' : ১৯৬৫, (৫) 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' : ১৯৬৯, (৬) 'কলকাতার যীশু' : ১৯৬৯, (৭) 'উলঙ্গ রাজা' : ১৯৭১, (৮) 'খোলা মুঠি' : ১৯৭৪, (৯) 'কবিতার বদলে কবিতা' : ১৯৭৬, (১০) 'আজ সকালে' : ১৯৭৮, (১১) 'পাগলা ঘন্টি' : ১৯৮১, (১২) 'ঘর-দুয়ার' : ১৯৮৩, (১৩) 'সময় বড় কম' : ১৯৮৪, (১৪) 'রূপকাহিনী' : ১৯৮৭, (১৫) 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' : ১৯৮৯, (১৬) 'আয় রঙ্গ' : ১৯৯১, (১৭) 'চল্লিশের দিনগুলি' : ১৯৯৪, (১৮) 'সত্য সেলুকাস' : ১৯৯৫, (১৯) 'সন্ধ্যারাতের কবিতা' ১৯৯৭, (২০) 'অন্য গোপাল' : ১৯৯৯, (২১) 'জলের জেলখানা থেকে' : ২০০০ (হঠাৎ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া কলকাতায় বসে রচিত); বাহুল্য নেই কোথাও। কথ্যরীতির সঙ্গে তিনি কবিতাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। 'বিশ্বভুবন'-এর মতো তৎসম শব্দের পাশে 'ফাঁসিয়ে'-এর মতো কথ্য শব্দ মোটামুটি নিপুণ ভাবে ব্যবহৃত। মিল এসেছে স্বাভাবিক উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে। স্তবক শেষের পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরবর্তী স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তি যুক্ত হয়েছে। নীরেন্দ্রনাথ সুনিপুণ ছন্দ-শিল্পী। ছন্দ ও গদ্যরীতিতেও তিনি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে কবিতা লিখে থাকেন।

অনেক সময় প্রচলিত গল্পের ব্যবহারে তাঁর কবিতা পায় অন্য এক মাত্রা। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'উলঙ্গ রাজা'। এখানে লোককাহিনির ব্যবহারে খামখেয়ালি, আত্মপ্রাধান্যের বোধে তৃপ্ত থাকা, স্তাবকতাপ্রিয় নির্বোধ শাসক আর ভীরু ব্যক্তিত্বহীন স্বার্থপর জনতার ছবি আঁকা হয়েছে। কবি হয়ে উঠেছেন সময় ও সমাজের সমালোচক।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা সরল অথচ সংহতি গাঢ়। সোজাসুজি বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তা তাঁর কবিতায় স্বপ্রকাশ। তৎসম শব্দের সঙ্গে প্রচলিত কথ্য শব্দের সুষম বিন্যাসে গড়ে ওঠে তাঁর কবিতার আবহ এবং ছন্দস্পন্দ; একটি উদাহরণ—

> "রাস্তা যে কেমন, সেটা এইবারে বর্ষায়
> মোটামুটি
> বোঝা যাবে। এখনও বাবুটি
> সেজে, নাগরা পায়ে দিব্যি চলে যায়
> যারা, তারা জানে না যে, আর
> দু-চার দিনের মধ্যে প্রবল বর্ষার
> খেলা হবে শুরু।
> একটু একটু করে মেঘ জমছে, গুরুগুরু,
> শব্দ যাচ্ছে শোনা।
> তাই বলে ভেবো না
> বর্ষা এসে গেছে বিশ্বভুবন ভাসিয়ে।
> সে আসে নি, কিন্তু আসবে, গাঁ-গঞ্জ ফাঁসিয়ে

শহরে সড়কে দেবে হানা।
রাস্তা যে কেমন সেটা বর্ষার ভিতরে যাবে জানা।"
('রাস্তার খবর' : 'আজ সকালে')

লক্ষণীয় কবিতাটির আশ্চর্য মিল বিন্যাস এবং ভাবের প্রবহমানতা। অথচ প্রাত্যহিক বাস্তবতার সহজ প্রকাশ দেখা যায় নীরেন্দ্রনাথের কবিতায়। আবেগবিহ্বলতার ভাব নেই তাঁর লেখায়। সময়, সমাজ, সংস্কার—সবই তাঁর কবিতায় এসেছে প্রবলভাবে। মানবিকতার বোধই তাঁর কবিতার ভিত্তি। হয়তো দীর্ঘকালীন সাংবাদিক জীবনই এভাবে নির্মাণ করেছে তাঁর কবিসত্তা। তাই নীতিহীন এই সভ্যতার স্বরূপ খুব সহজেই তিনি ধরতে পেরেছেন। কবিতাকে তিনি বিনোদন বলে মনে করেন না। 'কলঘরে চিলের কান্না' কবিতায় আহত মহত্ত্বের প্রতি সহানুভূতি বিদ্রুপতীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশলাভ করে। বন্ধনমুক্ত বিস্তৃত আকাশচারী পাখি চিল বন্দি হয়েছে স্নানঘরের সীমিত পরিসরে। তার ব্যর্থ মুক্তি-প্রয়াসের আর্তনাদ মাটির পৃথিবীর কিছু মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে কৌতুকের উৎস। নিজস্ব ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ মানুষেরা এমনই করে মহৎ আর বৃহতের প্রতি নিজেদের আক্রোশ পরিতৃপ্ত করে। এমনটি বাস্তবে প্রায়ই দেখা যায়।

"যারা ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, আর
পারে না বলেই যারা
পৃথিবীর
ভাগাড়ে ও আঁস্তাকুঁড়ে কাপুরুষ মস্তানের মতো
দঙ্গল পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের
হাতে কি কখনও আমি ঊর্ধ্বচারী মানুষের
লাঞ্ছনা দেখিনি"

এই শব্দচিত্রে একদা শক্তিমানের উপায়হীনতার বিষণ্ণতা ব্যঞ্জিত হয়েছে।

সমকালের অব্যবস্থার নীতিহীনতা বার বার বিদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতায়। 'হ্যালো দমদম' কবিতাটিতে সমাজব্যবস্থার অব্যবস্থায় বন্দি মানুষের অসহায় আর্তনাদ ধ্বনিত, বৃষ্টি-জলে প্লাবিত নগরের পথ। মানুষটির প্রিয় সন্তান অসুস্থ। কিন্তু বিপদতারণ দমদম সাড়া দিচ্ছে না তাঁর ডাকে আসছে না উদ্ধারকারী নৌকা।

'না রাম না গঙ্গা' কবিতায় সমকালের স্বার্থসর্বস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তির্যক ব্যঙ্গ হয়ে উঠেছে প্রখর। আত্মস্বার্থপরায়ণ বর্তমান নেতার কাছে মাটি মানেই নির্বাচন-কেন্দ্র আর মানুষ মানে ভোটার। বন্যায় নির্বাচন কেন্দ্রের কয়েকটি বাচ্চা ভেসে গেছে বলে তিনি চিন্তিত। কিন্তু যখন তাঁর মনে পড়ে বাচ্চাদের ভোট নেই। আর দূরের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার সামর্থ্যও বুড়োবুড়িদের নেই তখনই তিনি স্বস্তি ফিরে পান।

এ জন্যই নীরেন্দ্রনাথের কবিতা সহজেই পৌঁছে যায় সর্বশ্রেণির পাঠকের কাছে। নীরেন্দ্রনাথের মতে কবির কাজ শ্বাস নেওয়ার মতো সুস্থ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা।

জীবনযুদ্ধে অসফল সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আছে গাঢ় সহানুভূতি। 'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল'—কবিতাটি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। অমলকান্তি নামের ছেলেটি চেয়েছিল সহজ সুন্দর নির্মল জীবন। প্রতিষ্ঠা তার কাম্য ছিল না। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য তাকে কাজ করতে হয় ছাপাখানার অন্ধকারে। সে রোদ্দুর হতে পারেনি। কিন্তু তার স্বভাবের নির্মলতার জন্যই সে স্মরণযোগ্য। স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি এখানে। সংকেতময় ভাষায়, প্রতীকের নিপুণ ব্যবহারে শব্দচয়ন আর বিন্যাসের সংযমে কবিতাটি হয়ে উঠেছে অনুভূতি-গভীর।

প্রবল আবেগ বা বাসনা-গাঢ় প্রেমের কবিতা নেই তাঁর। নারী তাঁর কবিতায় শান্ত গার্হস্থ্য ভালোবাসার প্রতীক—
'তবুও তোমায় বলি জনান্তিকে

জনতার মিছিল কিংবা বৃক্ষ পাখি—
যে দিকে যখন আমার চক্ষু রাখি,
তবুও লক্ষ্য থাকে তোমার দিকে।

জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা কবির। শুধু নিজে নয় চারপাশের বঞ্চিত মানুষগুলিকে তিনি দিতে চান শান্তির আশ্রয়। ''স্বপ্নে দেখা ঘর দুয়ার''-এ সমৃদ্ধ গ্রাম্য গৃহজীবনের একটি প্রাণময় ছবি আছে। সে ছবির মধ্যে আছে পুঁটলি ঘাড়ে করে একলা চলে যাওয়া আশ্রয়হীন একটি মানুষের কথা। এই গৃহজীবনে তাকেও ডেকে নিতে চান কবি—

'ও বড়ো বউ, ডাকো ওকে ডাকো
ওই যে লোকটা পার হয়ে যায়
কাঁসাই নদীর সাঁকো।'

এই মানবিকতার প্রকাশই কবির কাম্য। তাই তিনি লিখতে পারেন 'আবার একদিন এই সব হবে তাই'-র মতো বিশ্বাস-আপ্লুত কবিতা—

একদিন সমস্ত যোদ্ধা বিষণ্ণ হবার মন্ত্র শিখে যাবে
একদিন সমস্ত বৃদ্ধ দুঃখহীন বলতে পারবে যাই।
একদিন সমস্ত ধর্ম অর্থ পাবে ভিন্ন রকমের।
....
একদিন সমস্ত ধর্মযাজকের উর্দি কেড়ে নিয়ে
নিষ্পাপ বালক বলবে, হা হা
একদিন এইসব হবে বলেই এখনও
সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে এবং কবিতা লেখা হয়।'
('কবিতার বদলে কবিতা')

আজকের বাস্তবের সমাজে যা হয়নি তা একদিন সত্য হয়ে উঠবে—এ বিশ্বাস কবি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কামনা একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে যুদ্ধ। প্রতি মানুষের জীবনের বাসনা হবে সফল। অপ্রাপ্তির বিষণ্ণতা বিপন্ন করবে না কোনো মানুষকে। প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম মুছে যাবে, প্রতিষ্ঠা লাভ করবে মানুষের ধর্ম—মানবতা। এই স্বপ্ন আছে প্রতি মানুষের মনে। নতুবা এই সন্ত্রাস-বিপন্ন সম্পদবিকারে মগ্ন পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসম্ভব হত। সর্ব অর্থে পরাস্ত হত জীবন।

নীরেন্দ্রনাথ এই বিশ্বাসের কবি—

'সব রক্ত আর জল মিলে মিশে প্রণামের
রক্তিম ভোরের দিকে যাবে।
আজ নয়, কালও নয়,
তবু জেনো একদিন হবে।'
('একদিন হবে' : 'পরিচয়' শারদ সংখ্যা ১৩৯৬)

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় দেখা যায় এক বিশ্বাসের শব্দরূপ। কিন্তু সে বিশ্বাসে নেই কোনো রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের রঙ। তা সম্পূর্ণত ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং মানবিকতায় দৃঢ় বিশ্বাসের অভিব্যক্তি।

এই সময়ের আর এক কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের আস্থার মূল একই সঙ্গে মানবতা ও বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন। এখানেই মানবিকতার জয় ঘোষণাকারী দুই কবির ভিন্নতা।

১.২৪ শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ (প্রকৃত নাম চিত্তপ্রিয়) ঘোষের জন্ম বিভাগ-পূর্ব বাংলার ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে, ১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বরিশালে।

পাবনা জেলার পাকশির চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে ১৯৪৭-এ তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তারপর তাঁদের পরিবার দেশভাগ-জনিত পরিস্থিতির কারণে এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়। তিনি ভরতি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ওই কলেজ থেকেই তিনি ১৯৪৯-এ আই.এ. এবং ১৯৫১-তে বি.এ. পাস করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাস করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে শঙ্খ ঘোষ কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তারপর অধ্যাপনা করেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর কলেজ—১৯৫৫-৫৬ ও বহরমপুর গার্লস কলেজে—১৯৫৬-৫৭। কলকাতার সিটি কলেজে তিনি থাকেন ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। এর মধ্যে ১৯৭৪-এ তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে পড়িয়েছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৮ সালে ছিলেন আমন্ত্রিত অধ্যাপক। ১৯৮৭-১৯৮৮—এই সময়ে তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর 'পোয়েট ইন রেসিডেন্স' অর্থাৎ বসবাসকারী কবি। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি ১৯৮৯-৯০—এই একবছর কাজ করেন। ১৯৯৩-এ তিনি হন ইউ.জি.সি-র বিশিষ্ট মান্য অধ্যাপক—এমেরিটাস ফেলো।

তাঁর কবিতা-সংকলনের সংখ্যা এযাবৎ কুড়ি। তার মধ্যে একটি অনুবাদ-সংকলন।

(১) 'দিনগুলি রাতগুলি' ১৯৫৬
(২) 'এখন সময় নয়' ১৯৬৭
(৩) 'নিহিত পাতাল ছায়া' ১৯৭৬
(৪) 'আদিম লতাগুল্মময়' ১৯৭২
(৫) 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' ১৯৭৪
(৬) 'বাবরের প্রার্থনা' ১৯৭৬
(৭) 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' ১৯৭৮
(৮) 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' ১৯৮০
(৯) 'প্রহরজোড়া ত্রিতাল' ১৯৮২
(১০) 'রাগ করো না রাগুনি' ১৯৮৩
(১১) 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' ১৯৮৪
(১২) 'বন্ধুরা মাতি তর্জায়'
(১৩) 'বহুল দেবতা বহু স্বর' ১৯৮৬
(১৪) 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' ১৯৮৭
(১৫) 'সব কিছুতেই খেলনা হয়' ১৯৮৭
(১৬) 'আমন ধানের ছড়া' ১৯৯১
(১৭) 'লাইনেই ছিলাম বাবা' ১৯৯৩
(১৮) 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' ১৯৯৪
(১৯) 'আমন খাবে লাট্টু পাহাড়' ১৯৯৬
(২০) 'নিকোলাস গিয়েনের চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা' (কিউবার কবিতা) ১৯৭৯

মানুষের প্রতি প্রীতিতে উজ্জ্বল শঙ্খ ঘোষের কবিতা। তিনি চান কবিতা হবে ইঙ্গিতময়, ব্যঞ্জনাঋদ্ধ। সব সময়েই আপন অনুভব রূপ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। শব্দ ব্যবহারে আছে তাঁর সহজাত দক্ষতা। বাস্তববোধ আর আত্মগত অনুভবের সমন্বয়ে দীপ্ত তাঁর কবিতা। সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন সহ্য করতে হয় নানা অপমান। টিকে থাকার জন্য তার নিত্য সংগ্রাম। প্রতিকূলতা তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চায়। এই আহত মানুষের প্রতি তাঁর রয়েছে গভীর সহানুভতি—

"নিচু হয়ে এসেছিল যে মানুষ অপমানে, ঘাতে
ঝরে গিয়েছিল যার দিনগুলি প্রহরে উজানে
তারই কাছে এসে ওই পাঁজরে পালক রেখেছিলে
তোমার আঙুলে আমি ঈশ্বর দেখেছি কালরাতে।"

('পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'/'৫০')

মানুষের সত্তার নিজস্বতা এভাবেই মূল্য পেয়েছে তাঁর রচনায়।

শঙ্খ ঘোষ জোর দিয়েছেন শব্দের নিহিত শক্তির প্রতি। প্রাত্যহিক ব্যবহৃত শব্দের অন্তর্গত মহিমা তাঁর কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে—

"যাওয়াই বেশি ফিরে আসার পথ
চেনাজানা, খুবই সহজ, কম
না যেতে চান যদি মহম্মদ
সব সময় পাহাড় কাছে আসে?
নিথর পাহাড় গৈরিকে সন্ন্যাসে
বলে একি নিছক ভ্রমণ? দাঁড়াও কিংবা ফেরো
যেদিকে যাও আমিই ভবিষ্যৎ' ('ভ্রমণ')

তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় প্রকৃতির মাধুর্য আর ঐশ্বর্যরূপটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মানুষ তথা কবিকে ঘিরে থাকে এই প্রকৃতি। তাকে আশ্রয় দিতে পারে সে। সেই সঙ্গেই স্বদেশ, সমকাল আর মানুষের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পেরেছেন তিনি। খাদ্যের দাবি নিয়ে যে মিছিল হয়েছিল কুচবিহারের ১৯৫১ সালে, তার সামনে ছিল এক কিশোরী। সে কিশোরীর মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। সেই বেদনার স্মরণে তিনি লেখেন—

নেকড়ে ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দুতিনটে গঙ্গা

এই ('যমুনাবতী') কবিতার অবলম্বন 'যমুনাবতী সরস্বতী'-এই লৌকিক ছড়াটি। মানুষের প্রতি কবির দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ। সেখানে কোনো দলীয় পক্ষপাত ছিল না কোনোদিন। ১৯৭৮ সালে দণ্ডকারণ্য থেকে আসা উদ্‌বাস্তুদের সংকটে কবির অনুভব রূপে পেয়েছে 'তুমি আর নেই সে তুমি' কবিতায়। নামটির পরোক্ষে আছে বিস্মৃত প্রেমের প্রতি ক্ষীণ অভিযোগমূলক শচীনদেব বর্মনের একদা জনপ্রিয় একটি গান—

'তুমি আর নেই সে তুমি।
জানি না জানি না কেন এমন হয়'

এ গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি হয়েছে কবিতার নাম। তারপর শঙ্খ ঘোষ বলেছেন শাসনতন্ত্রের মানববৈরিতার কথা—

‘চোখের সামনে ধুঁকলে মানুষ
উড়িয়ে দেবে টিয়া
তুমি বললে বিপ্লব, আর
আমি প্রতিক্রিয়া।’

সর্বত্রই প্রশাসন আর সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে এই বিরোধ। বিভক্ত দেশ আর বাস্তুচ্যুত মানুষের কথা তিনি কখনই বিস্মৃত হতে পারেন না। কারণ তিনি স্বয়ং বাধ্য হয়েছিলেন জন্মভূমি ত্যাগ করতে। নিষ্পাপ কৈশোর দ্রুত মুছে গিয়েছিল তাঁর জীবন থেকে। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে হয়েছে তাঁকে। তিনি বিস্মৃত হননি সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা—

‘আমি যাই; যেতে হয়েছিল, স্বেচ্ছায় নয় বাধ্যত।
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল ধ্বস
তীর বল্লম
ভিটে মাটি
সমস্ত একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিম মুখে
স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দল দঙ্গল
ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আম গাছের ছায়ায়
এক পা ছেয়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন’। (‘পুনর্বাসন’)

বাস্তুহীন জীবনের গ্লানি তাই তাঁকে ব্যথিত করেছে—

‘এই সেই অনেক দিনের ঘর তার দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে........
....
আমি জানি মায়ের এই দম্ভ ঘুচবে না কোনো দিন
অকুলান সংসারকে কুলিয়ে দেবার দম্ভ
প্রজাপুঞ্জ বাহিরে বেরোয় ঘর ছেড়ে কোনোখানে একটু নিশ্বাস মিলবে
শূন্য নীলে কিংবা শহরে
যেখানে ঘর নেই, ঘরের নৈরাশ্য নেই, ঠাকুমার চোখ নেই’
(‘ঘরে বাইরে’)

মানুষকে রাজনৈতিক পরিচয়ে চিহ্নিত করে বিচার করার প্রবণতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ রূপ পেয়েছে ‘তুমি কোন দলে’ কবিতাটিতে। তিনি মানুষকে তার নিজস্ব হৃদয়ের পরিচয়ে গ্রহণ করতে চান। স্বার্থসর্বস্ব শাসন-সংকীর্ণতার বিরোধিতা তিনি করেছেন বার বার—

‘বাসের হাতল কেউ দ্রুত পায়ে ছুঁতে এলে আগে তাকে প্রশ্ন করো
তুমি কোন দলে
ভুখা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে প্রশ্ন করো
তুমি কোন দলে
পুলিশের গুলিতে যে পাথরে লুটোয় তাকে টেনে তুলবার
আগে জেনে নাও দল।’ (‘লাইনেই ছিলাম বাবা’)

সমাজভুক্ত মানুষের সুখদুঃখ নাড়া দিয়েছে এই কবিকে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার (১৯৫৩) প্রথম সংখ্যায় প্রথম লেখা ছিল শঙ্খ ঘোষের দীর্ঘ কবিতা 'দিনগুলি রাতগুলি'। কবিতাটির মুখ্য অবলম্বন প্রেম। একাধিক ক্ষুদ্র গীতিকবিতার সমন্বয়ে রচিত কবিতাটি কোনো বিশেষ নারীর উদ্দেশে নিবেদিত। তাই শিরোমানের পর বন্ধনীতে আছে 'ইভাকে' শব্দটি। প্রকৃতিমুগ্ধতা, প্রেম আর জীবনপ্রীতির মিশ্রণ রয়েছে এই কবিতায়। ব্যক্তিমনের অনুভবকে তিনি করে তুলেছেন বিশ্বমনের অনুভূতি—

'জলের ডালায় যদি হৃদয় প্রসার করি, তোমারই বিকাশ
মেঘের গুহায় ঢালি হৃদয় যখন, দেখি তোমারই বিকাশ
কুয়াশা উথাল ছটা দিক দিক ভরে যদি তোমারই বিকাশ
স্মরণ যেখানে, প্রাণ যেখানেই সেখানেই তোমার বিকাশ।'

প্রেম আর প্রকৃতি এক হয়ে গেছে এ কবিতায়—শেষ তিনটি পঙ্ক্তিতে উদ্ভাসিত সেই উপলব্ধি—

'প্রেমের বিকীর্ণ শাখা ফুলে ফলে জলে
জেগে ওঠে ধীরে ধীরে একখানি
তপ্তহত পরিপূর্ণ মুখ
রাত্রির কলস ভেঙে সকাল গড়ায় দিকে দিকে।'

মানুষ তাঁর কবিতার মূল বিষয়। দেশকালের পরিবর্তনে মানুষের পরিবর্তন হয়। সমকালীন পৃথিবীর সঙ্গে রয়েছে তার যোগ। আবার প্রবহমান সময়ের সঙ্গেও মানুষ যুক্ত। এভাবেই তার সত্তা পূর্ণতা পায়। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আছে মানবজীবনের এই সমগ্ররূপ—

'আনন্দে চিরায়ু তুমি লগ্ন তুমি প্রত্যহের স্রোতে ....
উপরে আকাশ ঢালে প্রকাণ্ড ডালায় বসুধারা
নিচে খুলে খুলে যায় সব তুচ্ছ সবুজের মুঠি ....'

('ধানে গানে বসুধায়')

প্রাত্যহিকতাকে তিনি করে তোলেন চিরন্তন। বর্তমানকে মিলিয়ে দেন চিরকালের সঙ্গে। আবার সমকাল তথা খণ্ডকালের সংকটেও তিনি বিপন্ন মানুষের সম্পর্কে সমভাবেই বিচলিত। তাই বন্যাপীড়িত মানুষ সম্পর্কে তিনি লেখেন—

'সব যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়
সমস্ত মিলায়
এমন মুহূর্ত আসে যেন তুমি একা
দাঁড়িয়েছ মুহূর্তের টিলার উপরে; আর জল
সব ধারে ধাবমান জল
প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিত হীন
আর; তুমি একা
এত ছোটো দুটি হাত স্তব্ধ করে ধরেছ করোটি
মহাসময়ের শূন্যতলে ....'

('অঞ্জলি')

কিন্তু সময়ের চিরন্তনত্বও শঙ্খ ঘোষের কবিতায় একটি বড়ো দিক। বর্তমানের সামান্যতা কীভাবে তার সীমা

অতিক্রম করে যায় তার রহস্যও কবিই জানেন—তাই বাসের সহযাত্রী যখন নিতান্ত স্বার্থপরের মতো ছোটো হয়ে যেতে বলে তখন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে—

'আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে!
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে আড়ালে'?

'পিছনে এগিয়ে যান দাদা'—বাস-কনডাকটরের এই নিয়ত উচ্চারিত সামান্য কথা তাঁকে জানিয়ে দেয় আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থা। সময় একুশ শতক হলেও আমাদের দেশ আর সমাজে পিছনে যাবার সে দৃষ্টান্ত তো অফুরান। এখানেও অন্যভাবে সময় তার সীমা পার হয়ে যায়।

কবি মানুষের মনকে সচেতন ও চলিষ্ণু দেখতে চান। ভোগ সুখের নিশ্চিন্ত দিন যাপন মানুষকে বোধহীন করে দেয়। তারই ছবি কোনো কোনো কবিতায়—

'এ বাড়িতে
যা যা থাকা উচিত সবই আছে
আছে সবই
এমন কী ওরা দুজনেও
বেশ আছে
এত বেশি আছে যে জানে না বুকের মধ্যখানে
আসলে লাফায় বুড়ো ব্যাঙ।' ('ব্যাঙ')

এ ব্যাঙ যেন স্থবির অস্তিত্বের প্রতীক। মনে পড়ে 'রক্তকরবী'র রাজার দেখা বুড়ো ব্যাঙকে—যে শুধু টিকে থাকার সাধনাতেই মগ্ন ছিল। এ জীবন কাম্য নয় কোনো মানুষের।

ক্ষমতাবান মানুষের অন্যায়-অবিচার আর লোভ দেশের দরিদ্র জনতাকে করে দিয়েছে নিঃস্ব। তাদের প্রতি রয়েছে কবির অসীম মমতা—

'সি আই টি রোডের ফাঁকে পাথরকুচির উপরে
হাত ছড়িয়ে দিয়ে
ঘুমিয়ে আছে আমার মেয়ে
বুকের কাছে এনামেলের বাটি' ('ভয়')

অন্য অর্থে বলা যায় মেয়েটি যেন ভারতবর্ষ—সমস্ত বিশ্বের করুণার প্রত্যাশী।

মানুষ টিকে থাকতে চায় সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে। নিজের কোনো আচরণকেই সে তাই মনে করে না অন্যায়।

ধনী আর নির্ধনের মধ্যে বিপুল ব্যবধান। এমনকী একজনের বাঁচবার প্রয়াস আর একজনের কাছে বিরক্তির কারণ হয়। একটি কবিতায় হতদরিদ্র মেয়েটি বলেছে—

'আমি তা বুঝেও এমন
বেহায়া শরমখাকী
খুঁটে খাই যখন যা পাই
সুবোদের পায়ের তলায়

খেতে তোহবেই বাবা
না খেয়ে মরব নাকি? ('লজ্জা')

আর এক বাউলের বেশ-ধরা বালক-ভিক্ষুকের দৃপ্ত ঘোষণা—

'বেশ করেছি ভেক ধরেছি
বাঁচিয়ে রাখি জান
দূরের থেকে দেখি সবার
দরদভরা টান।'

এই মলিনতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে একটা সময়ে ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের শুরুতে প্রাণ দিয়েছিল উজ্জ্বল কিছু যুবক—

'চিতা যখন জ্বলছে, আমার হৃৎকমলে
ধুম লেগেছে, ঘুম লেগেছে, চরাচরে, পাপড়ি জ্বলে
এই তো আমার
এই তো আমার জন্মভূমির আলোর কথা'
('হৃৎকমল')

কবিতাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে উনিশ শতকের কবি রামপ্রসাদ সেনের গানের এই পঙ্‌ক্তির অনুষঙ্গ—

'বড়ো ধুম লেগেছে হৃৎকমলে
মজা দেখিছে আমার মন পাগলে।'

স্বদেশের এই অসুস্থতা দূর করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চান তিনি; 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬) তারই লিখিত রূপ। কবিতাটির প্রত্যক্ষ পটভূমি কবির বড়ো মেয়ের দুরারোগ্য অসুস্থতা। কবিতাটিতে আছে অসুস্থ সন্তানের নিরাময়ের জন্য সম্রাট বাবর কর্তৃক এক ফকিরের উপদেশে নিজ প্রাণ উৎসর্গের প্রার্থনার কিংবদন্তির পরোক্ষ ব্যবহার। কিন্তু এই কবিতা হয়ে উঠেছে সমস্ত মানবজাতির সুস্থতার প্রগাঢ় কামনা—

'জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।'
('বাবরের প্রার্থনা')

ধ্রুবপদের মতো প্রতি স্তবকের শেষে এসেছে পঙ্‌ক্তি দুটি যা সমস্ত মানুষের জন্য কবির শুভ কামনার প্রমাণ।

অনুরূপভাবে পুরাণ-প্রতীকের ব্যবহারে তিনি সমকালীন অবস্থাকে মূর্ত করেছেন। বর্তমানের ঘনায়মান অন্ধকারে তিনি দেখেছেন ক্রূর সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে। এ অন্ধকার দূর করতে চায় চাঁদ সদাগরের মতো কিছু বিদ্রোহী মানুষ। তারা মানবতার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে জেগে থাকে—

'আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি
যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর নিশ্বাস লাগে
যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথ নগরে

হেঁতালের লাঠি যেন এ কাল প্রহরে মনে রাখে
চম্পকনগরে আছ কানীর চক্রান্ত চারদিকে।
('হেঁতালের লাঠি)

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দিনগুলিকেও তিনি রূপ দিয়েছেন মহাভারতের মৌষল পর্বে প্রভাসতীর্থে যাদবকুলের প্রাণঘাতী হত্যার উৎসবের মাধ্যমে। নিদারুণ জিঘাংসায় সুরামত্ত যাদবদের হাতে তৃণমুষ্টি হয়ে উঠেছিল মুষল-মুদ্‌গর। শঙ্খ ঘোষ দেখেছেন—আধিপত্য বিস্তার আর শক্তিমত্ততার 'মদ' (অহংকার) গ্রাস করেছে বিচার-বুদ্ধিকে। দলে-উপদলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত এদেশের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ছিল চিরদিন। আজ তার প্রাণঘাতী রূপ হয়ে উঠেছে ব্যাপক। হত্যার উৎসবে আজ ভারততীর্থ মেতে উঠেছে—

'মাথায় গিয়েছে 'মদ' তাই
যে কোনো সবুজ ঘাস
হাতে নিলে হয়ে ওঠে মুষল মুদ্‌গর ধ্বংসবীজ
সবাই সবার চোখে ঘাতক।
....
আমাদের এই তীর্থে আজ ভেঙে পড়ার উৎসব ....
আমাদের এই তীর্থে ঘোর উৎসব
আমাদের এই তীর্থে শেষ উৎসব।
('আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব')

বিহারের আরওয়ালের গণহত্যা আর রাষ্ট্রযন্ত্রের উদাসীনতা কবিকে মনে করিয়েছে—মহাভারত-যুদ্ধের পরোক্ষ নায়ক ধৃতরাষ্ট্রের কথা। 'অন্ধবিলাপ' তার প্রমাণ—

'অন্ধ আমি, দেখতে পাইনাক, আমিই তবু রাজ্য শিরে
এবং লোকে বলে এদেশ যে তিমিরে সে তিমিরে
কারা এসব রটিয়ে বেড়ায় বলো আমায় হে সঞ্জয়
অন্ধ আমি, কিন্তু তবু এসব আমায় জানতে হবে ....
সামান্য এক ছটাক জমি ছাড়বে কেন আমার ছেলে
আমার সঙ্গে ভূমিসেনা আমার সঙ্গে ভূস্বামীরা।
.... একাই একশো আমার ছেলে
তারাই জানে শমন দমন, ধ্বংস দিনে ধ্বংস রাতে
ছড়িয়ে যাবে ঘটল যা সব আরওয়ালে কানসারাতে
মারব না কি নির্ভূমিকে? নিরন্নকে? নিরস্ত্রকে?
অবশ্য কেউ মেরেছিল সেটাই বা কি প্রমাণ করে।'
('অন্ধবিলাপ')

এভাবেই অতীত আর বর্তমান যুক্ত হয়। ভবিষ্যৎ থাকে না অস্পষ্ট। অত্যাচারিত মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে বিনষ্ট করে অত্যাচারীকে। পুরাণ-কাহিনির ব্যবহারে এভাবেই সমকালের সংকট মূর্ত হয়—

'আমার পাপেই উশকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক
সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে যাক ....' (অন্ধবিলাপ')

সমকালের মধ্যে থেকেও তাকে উত্তীর্ণ হওয়া, বর্তমানের ভিতর দিয়ে চিরন্তনতায় যাওয়া শঙ্খ ঘোষের কবিতার মূল ভিত্তি। শব্দ, চিত্রকল্প আর ছন্দ—স্পষ্ট করে দেয় এই অভিপ্রায়।

শব্দ-ব্যবহার সম্বন্ধে অতি সচেতন এই কবি বার বার শব্দহীন তা আর গীতরীতির কথা বলেছেন। তিনি জোর দিয়েছেন শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তির উপর। ভাষার মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছে যান ভাষাহীনতার বিস্তৃতিতে। শব্দের মাধ্যমে শব্দাতীত অনুভবকে রূপ দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। এজন্য চাই প্রখর সমাজ বিশ্বের উপলব্ধি আর প্রবল অন্তর্মুখীনতার সমন্বয়। অন্তর্মুখীনতাই বাহির বিশ্বকে করে তোলে নিজস্ব। শব্দের মধ্য দিয়ে সত্যকে স্পর্শ করতে চান তিনি—

'এতো বেশি কথা বলো কেন ? চুপ করো
শব্দহীন হও
শব্দমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর ......'
('আয়ু')

ছোটো কবিতাগুলিতে এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট। সংসারে বীতস্পৃহ মানুষকে বেছে নিতে হয় সঙ্গীহীন একলা চলার পথ। তাঁর কবিতায় সে সত্য রূপ পেয়েছে এইভাবে—

'শব্দ দিয়ে আগুন দিয়ে ঘিরে
বানিয়েছিলে অসীম সংসারী-
যখন লোকে একলা চলে, তখন
সরিয়ে নাও সমস্ত ঘরবাড়ি।'
('যখন লোকে')

এখানে শব্দের অর্থ নয়, ব্যঞ্জনা থেকে উঠে এসেছে অনুভব। ভাষা যখন দৈনন্দিনতার ক্ষুদ্রতাকে ছাপিয়ে যায় আর তাতে যুক্ত হয় সুর তখন তা পার হয়ে যায় সাধারণ জীবনের অভ্যস্ত বিবর্ণতাকে। সীমিত প্রাত্যহিকতার মধ্যে অবস্থিত হলেও কবিতা যখন নিত্যকালের সীমাহীনতাকে স্পর্শ করে তখন কবিতায় যুক্ত হয় একটি সুর। এ সুর গানের সুরের মতো নয়, একে শোনা যায় না, এ সুর অনুভবের বিষয়। এই সুরই কবিতাকে নিয়ে যায় চিরন্তনতার দিকে—

'আমার দুঃখের দিন তথাগত
আমার সুখের দিন ভাসমান।
এমন বৃষ্টির দিনে পথে পথে
আমার মৃত্যুর দিন মনে পড়ে।'
('বৃষ্টি')

বৃষ্টি তাঁকে প্রাত্যহিক জীবনের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। তাই তিনি লিখতে পারেন, 'আবার এ রকম একটি পঙ্‌ক্তি।

'তার মাঝখানে আজ স্রোতের ভিতরে দাবদাহ
ধ্বংস ওঠে পায়ে পায়ে, মাথার উপরে ধারাপাত
সমস্ত দেয়াল ভেঙে ভেসে যায় গ্রহণের জলে ....'
('জ্বর')

কবির নিজস্ব অনুভব ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে। শব্দের শব্দাতীত শক্তি বা ব্যঞ্জনার দ্বারাই এই শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে।

'কবিতাও তার পাঠক' প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন ''কবি কখনই ভুলে যান না যে এক হাতে এই দেশ নিহিত

কাল আর অন্য হাতে দেশোত্তর কাল ধারণ করার মুহূর্তেও তিনি পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন অস্থির সমসময়ের সংকটের উপর।''

সাধারণ মানুষের ব্যবহারের কথ্য ভাষাই তাঁর রচনার অবলম্বন। সে ভাষার মধ্য দিয়েই তিনি স্পর্শ করেন, প্রকাশ করেন চিরকালকে। প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলিই তার প্রমাণ। সেই সঙ্গে দেখা যায়, তৎসম শব্দের প্রয়োগেও তাঁর আশ্চর্য কুশলতা।

ছন্দ ব্যবহারে শঙ্খ ঘোষ অতীব স্বচ্ছন্দ। ছন্দ-বিষয়ে বহু ভাবনা এবং প্রবন্ধ-গ্রন্থও আছে তাঁর। ছন্দের ধ্বনির আকর্ষণ তাঁর অনেক কবিতাকে করেছে আভাময়। ছড়ার ছন্দে বা সাবলীল দলবৃত্তে তিনি ফুটিয়ে তোলেন বাণিজ্যপ্রবণ সমাজে বিপন্ন মানব-অস্তিত্বের স্বর—

'ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।
একটা দুটো সহজ কথা
বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রং বাহারে।
নিয়ন আলোয় পণ্য হলো
যা কিছু আজ ব্যক্তিগত।'
('মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে')

আবার কলাবৃত্ত ছন্দেও তিনি নিপুণ। চিত্রকল্প নির্মাণের দ্বারাও শঙ্খ ঘোষ সাময়িকতাকে করে তুলেছেন চিরন্তন। সমকালীন জীবনের সঙ্গে সংঘাতের সম্পর্ক এবং তা পার হওয়া—এই দুটি দিকই চিত্রকল্প গড়ে তোলার সময় শঙ্খ ঘোষ মনে রাখেন। তাঁর চিত্রকল্পে আরও আছে পৃথিবীর প্রতি তাঁর প্রীতির প্রকাশ।

তাই 'পতঙ্গ' কবিতায় দেখি চিত্রময় শব্দ-বিন্যাস। সে বিন্যাসের মধ্যে উড়ে চলা কয়েকটি পতঙ্গের চিত্র স্পষ্ট—

'কিছু পতঙ্গ উড়ে এসেছিল আমার মাথার
ভিতরে সে ছিল
ঝোড়ো পতঙ্গ উড়ো পতঙ্গ
বীজাণুর চেয়ে গুঁড়ো পতঙ্গ
খুঁড়ে খুঁড়ে এই খুলি খুলেছিল ঘুন ঘুন ঘুন কুরে।
আমার ভিতরে যা-কিছু—বা—ছিল সহসা সাহসে
ভর করে এসে
সব খুঁড়েছিল দলে দলে যত হীন পতঙ্গ গুঁড়ো পতঙ্গ।'

পতঙ্গ এখানে হীন ও অশিব শক্তির—তথা ভাবের প্রতীক। এই ধ্বংসাত্মক ভাব মানবচিত্তের শুভ বাসনাকে ধ্বংস করে দেয়, যেমন শস্য বিনষ্ট করে পতঙ্গ। এই অনুভূত অর্থের জোরে চিত্রটি হয়ে উঠেছে চিত্রকল্প।

আরও দুটি দৃষ্টান্ত— 'যেখানে সে পা দুখানি রেখেছে, সেখানে
কাল বিকেলের শেষ ঝড়ে
ঝরে আছে কুরে খাওয়া মহানিম গাছ।
মেঘ ঘোরাফেরা করে চেতনার অন্ধিসন্ধি ঘিরে

(২) 'মাথা থেকে পা অবধি ধীর হয়ে আছে ঘন জল
হাঁসের ডানার ভারে চোখের পাতায় কোমলতা ....।'
('মুহূর্ত')

উল্লিখিত দুটি চিত্রকল্পের মধ্যে প্রথমটিতে ধ্বংসের উর্ধ্বে জীবনের উল্লাস আর দ্বিতীয়টিতে প্রগাঢ় সজল কোমল অনুভব মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শঙ্খ ঘোষের মতে কবিতার এবং কবির কাজ সত্যের প্রকাশ—

'কে চায় সুন্দর কথা আর
দু একটি সত্যি শুধু বলো।'

সময়ের মধ্যে, তাৎক্ষণিকতার মধ্যে সত্যকে অনেক সময়ই চিনে ওঠা যায় না। সময়কে অতিক্রম করে যে চিরকালীন সত্য তাকে চিনে ওঠা, তার রূপ দেওয়া সহজ নয়। কবিতার মধ্যে দিয়ে এই দুরূহ কাজটি আশ্চর্যভাবে সফল করে তুলেছেন শঙ্খ ঘোষ। সে কাজকে কখনই মনে হয় না দার্শনিক তত্ত্বের গুরুভারে অন্বিত। কবির অনুভূতি আর উপলব্ধিতেই তা ব্যাপ্তি পেয়েছে।

১.২৫ তরুণ সান্যাল

১৯৩২-এ পাবনার (বাংলাদেশ) পোরজনায় জন্ম তরুণ সান্যালের। পৈতৃক বাস বর্ধমান জেলার নূতন পল্লীতে। ছদ্মনাম শুভব্রত রায় ও ইকবাল হক। স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা ছিল তাঁর বৃত্তি।

একটি অনুবাদ-কবিতার সংকলন ভিন্ন ('কৃষ্ণ আফ্রিকার কবিতা') তাঁর এযাবৎ মুদ্রিত কবিতা-গ্রন্থের সংখ্যা যতদূর সম্ভব দেওয়া হল।

১. 'মাটির বেহালা', ১৯৫৬
২. 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার', ১৯৫৬
৩. 'অন্ধকার উদ্যানে যে নদী', ১৯৬২
৪. 'এরই নাম অন্য বাংলাদেশ', ১৯৭২
৫. 'চতুর্থ পেরেক', ১৯৮১
৬. 'যেমন উদ্ভিদ', ১৯৭৯
৭. 'পুরাণ কথন', ১৯৮৩
৮. 'অপেক্ষা কোরো ও অন্যান্য কবিতা'
৯. 'কায়া নৌকায়', ১৯৮৯
১০. 'নিতান্ত পুঁতির টায়রা', ১৯৮৯
১১. 'কবি এক জাগে', ১৯৯৫
১২. 'রূপের ভুবনডাঙায়', ২০০১

রাজনীতি-সচেতন পরিবারের সন্তান তরুণ ছাত্রজীবনে যুক্ত হন কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে। কর্মজীবনেও সে যোগ ছিল। কৈশোর থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯৪৬-এ তাঁর যথার্থ কবিতাচর্চার সূচনা। প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বিদ্রোহী' ('অগ্রণী', অক্টোবর ১৯৪৯-এ মুদ্রিত হয়)। প্রথম কবিতা-সংকলন 'মাটির বেহালা' (১৯৫৬)-তে স্বাধীনতার আগের সংগ্রামী মানসিকতা, স্বাধীনতা-উত্তর আশাহীনতা, শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, বাস্তুচ্যুত মানুষগুলির প্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রাম—সমকালের এই সব সমস্যা নিয়ে কবির নিজস্ব

অনুভূতির প্রকাশ লক্ষিত হয়। প্রতিবাদ বা সংগ্রামী মনোভাবের পরিবর্তে আত্মগত অনুভবের রূপায়ণই ছিল তাঁর প্রথম দিকের কবিতাগুলির বিশেষত্ব।

পরের দিকের কবিতা-সংকলনগুলিতে স্বকীয় অনুভবের সঙ্গে সমকালীন সমাজ-সমস্যা জনিত বহুমুখী উপলব্ধির মিশ্রণ লক্ষিত হয়।

১৯৭০-৭১-এর হত্যা-প্লাবিত দুই বাংলা সম্পর্কে কবির মনোভাব তাই এভাবেই রূপলাভ করতে দেখি—

এখন কি অন্য ঝড় বাঁকায় উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে ধনুক দু ঠোঁটে
এবং রক্তের নদী শিউরে তোলা প্রত্যাশা ঘনালো
এবং থর থর কেঁপে ফুটে উঠছে কদম প্লাবন
উথাল পাতাল এসো
যৌবন শয্যায় নারী শুয়ে আছে প্রত্যাশায়
বিধ্বস্ত শ্যামলে বাংলাদেশ!'

মানব-অস্তিত্বের অবিনশ্বরত্ব স্বীকৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তবুও তাঁর কবিতা মূলত বর্তমানকে ঘিরেই আবর্তিত।

একাকীত্বের বেদনা আর মহিমার রূপায়ণ তরুণ সান্যালের রচনার আর একটি বিশেষত্ব। উদ্ধৃত হল কিছু পঙ্‌ক্তি—

'নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে একাই পায়চারি করি
একা ঘরে একাই পায়চারি
পায়ে পায়ে'
('বুকের ভিতরে তুমি')

নিজেকে চেনার জন্য, সত্তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য একা হওয়াও যে দরকার—এ সত্যের উপলব্ধি আছে তরুণের কিছু কবিতায়—

'আমরা সবাই যাই মানুষের আপন গ্রন্থাগারে
আপন স্বরাটে,
ছাত্র হয়ে।'

এবং এ যাওয়ার জন্য প্রয়োজন আত্মমগ্নতা। ক্রমে এই আত্মমগ্নতা আরও গভীর এবং বিস্তৃত হয়েছে,—নিজেকে তিনি চিনে নিতে চেয়েছেন—

'আমার ললাটে কার পুঞ্জ অমানিশা ছিল
সে আমাকে আনে না আলোয়—
আমি অবিরল স্রোতে, অপরাহ্ণ থেকে ঢের আগে
কচুরিপানার মূলে মাটি না ছোঁয়ার ধর্ম শিখেছি, কখনও
যন্ত্রণার মুখ দেখে আমিও দর্পণে একা, স্তব্ধ সাজঘরে
হাজার ওয়াট বালবে কপালের রেখা পড়তে চাই।'
('রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা')

সাম্যবাদে কবির দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কবিতায় খুব প্রত্যক্ষ ভাষণে তার প্রকাশ কম। তিনি প্রধানত খুঁজে নিতে চেয়েছেন সত্তার স্বরূপ, মানুষের স্বরূপ। তাই পুরাণ-প্রতীকের বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয় তাঁর কবিতায়। পুরাণ-প্রতীকের ব্যবহার দ্বারা তিনি চিনতে পেরেছেন বর্তমানকে।

একটি উদাহরণ—

'ওরে ও নিষাদ ওরে ও ক্রৌঞ্চ
শেষে বানালি রে কী এ
বাবরি রাম জন্মভূমির
ঘটালি বিকট বিয়ে
তারপর হল কী কী
তুষের গোপনে বিদ্বেষ পুষে
রেখে দিলি ধিকি ধিকি'
('রামকাহিনী', 'কায়ানৌকা')

বিদেশি সাহিত্যের উল্লেখ আর রবীন্দ্র-কবিতার পঙ্‌ক্তির অভিপ্রায়-অনুরূপ প্রয়োগ দেখা যায় তরুণ সান্যালের কবিতায়—

'বলো ভার্জিল কোন রহস্য যাচে
শ্বেতবসনা কে মোহিনী বিয়াত্রিচে।
*   *   *   *   *   *
এখনো সুচির রাত্রির সংগ্রাম
তিমিরে নিবিড়, কাঁদে আসন্ধ্যা ভোর
এ শুধু ছলনা .... স্খলনের পরিণাম ....
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।'
('অচেনার দর্পণে', 'অন্ধকার উদ্যানে যে নদী')

প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তিতে মহাকবি ভার্জিল-এর সঙ্গে রয়েছে দান্তে-রচিত 'ডিভাইন কমেডি'-র চরিত্রের উল্লেখ। উদ্ধৃতির শেষে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার ভাব এবং ভাষাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন কবি। ফলে বিপন্ন মানবতার ক্রন্দন লাভ করেছে অবয়ব। কিন্তু এ-কবিতার রসগ্রহণ সুশিক্ষিত পাঠকের পক্ষেই সম্ভব।

মানুষের চিরদিনের সংগ্রামী সত্তাকেও খুঁজেছেন তিনি ইতিহাসের গতির মধ্যে—

'পুনর্বার ফিরে আসে তিতুমীর, বিরশা সিধু
দিব্যক মঙ্গল পাঁড়ে, রোডেসিয়া লুমুম্বা লেনিন
একেকটি তরঙ্গ।'
('সময়ের হাতে')

তরুণ সান্যালের ইতিহাস-সচেতনতা ও মানস-বিস্তৃতির চিহ্ন রয়েছে এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে।

বিদ্রোহী মানুষের প্রতি কবির সহানুভূতি আশ্চর্য মননঋদ্ধ কিছু পঙ্‌ক্তির জন্ম দিয়েছে—

'ধ্বজা পূজা
রাজা
তবে যেতে হয় তৈরি হয়ে নিন
ওদিকে রঞ্জন শুয়ে আপ্লুত শোণিতে
গুয়েভারা'।
('ধ্বজাপূজা', 'তোমার জন্যেই বাংলাদেশ')

'রক্তকরবী' নাটকের বিদ্রোহ আর বিংশ শতকের বাস্তব এক বিপ্লবীকে যেভাবে তরুণ সান্যাল মিলিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে আছে হৃদয়াবেগ এবং শাণিত মননের অপূর্ব সম্মিলন।

জীবনকে শ্রদ্ধা করেছেন তরুণ সান্যাল। জীবনকে ভালোবেসেছেন গভীরভাবে। চিরাগত ঔপনিষদিক দেব ধারণার সঙ্গে জীবনস্তুতি মিশে গেছে তাঁর উচ্চারণে—

'হাওয়ায় সমুদ্রে সূর্যে বালুতে ঢেউয়ের কোটি দাঁতে
যে দেবতা তাকে নমস্কার
হরিণীর অতি কাছে বাঘের কোমল পদপাতে
যে দেবতা তাকে নমস্কার'
('ঈশ্বরস্তোত্র', 'যেমন উদ্ভিদ' ১৯৭৯)

লোকায়ত সংস্কৃতি আর লৌকিক কাব্যভাষার মিশ্রণ দেখা যায় তাঁর 'কায়া নৌকায়' সংকলনের কবিতাগুলিতে। এখানেও কিন্তু বাস্তব মানুষের চিত্রণই তাঁর লক্ষ্য—

'না পদ্ম নয়, শাপলা চাকা চাকা
ফুলের বরণ কড়ি ভরেছে কড়াই
নটে শাকের মধ্যে বিউলি বড়ি
ঘড়া বক-বক দিঘিতে জল ভরায়'
('জলের মধ্যে')

একটি লৌকিক ছড়ার স্পন্দন রয়েছে পঙ্‌ক্তিগুলিতে। সেই সঙ্গে সচ্ছল মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনই যেন চিত্রিত—যা প্রায়ই দেখা যায় ছড়ায়।

তরুণ সান্যালের বিশ্বাস মানবতায়। শক্তিমানের পীড়ন আর অন্ধ সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা তাঁর কাম্য। প্রতিবাদী, সংগ্রামী মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা—

'খোকা তোর আরো ঢের মন দিয়ে
বর্ণপরিচয় শেখা চাই
মহাদেশ মহাসাগরের নক্সা
মহাবিশ্ব সৌরলোক
ফসলে ও যন্ত্রে পাখি নদীর কাকালি নিয়ে
গোটা মানুষের ছবি ফুটে ওঠা চাই'
('বর্ণপরিচয়', 'যেমন উদ্ভদ')

তরুণ সান্যালের কবিতায় প্রেম আছে, আছে নারীপুরুষের সম্পর্কের চিরন্তন রূপের প্রকাশ। বস্তুত প্রেমের কবিতায় পুরুষ-প্রকৃতি দর্শন ও আদি সত্তার চিরন্তন কামনার রূপটি ফুটিয়ে তোলাই তাঁর অভিপ্রায়—

'আর ধীরে উন্মোচন দেহ থেকে এমন সুষমা
যার স্বাদ হাওয়া জানে, মেঘ জানে, বৃষ্টিপাত জানে,
এবং পুরুষও সেই আর্দ্র কাঁসা রাঙা মুখ
যেন সে শিশির ধোয়া, যেন ঢের প্রতীক্ষার পর
আলুলিত কাশফুল কারুকার্য ধবল উষ্ণীষ।

সমস্তই স্বাদ তবু জিহ্বা নয়, সমস্ত শরীর
ঘ্রাণকোষ বীজকোষ গন্ধকোষ দৃষ্টি স্পর্শ ত্বক
বিপুল পাতাল থেকে অন্ধকার স্বাদমূল থেকে
দীর্ঘবাহু তুলে উঠে আসে :'

('সমস্তই স্বাদ গন্ধ', 'চতুর্থ পেরেক')

আবার বৃক্ষলতা-স্পন্দিত নিসর্গের দিকেও সম্পাতিত তাঁর মুগ্ধ চোখ। তাঁর প্রকৃতি-প্রীতিই যেন উদ্ভিদ বন্দনায় রূপলাভ করেছে—

'হে উদ্ভিদ, বীজপুঞ্জ   ওষধি ও বনস্পতি
হে বড়ো সবুজ,   থাকো নির্মম নিয়তি হয়ে
          গোপনে উৎসের জলপাত
আমি তোমাদের কাছে বসেছি আবার।'

('হে উদ্ভিদ')

প্রাকৃতিক জীবনের শুদ্ধতায় ফিরে যেতে চেয়েছেন কবি। যদিও এ তাঁর মানবতা-বিশ্বাসের কিছুটা বিপরীত দিক বলা যায়। যা শুদ্ধ পবিত্র, স্বার্থের বন্ধনে মিথ্যার জালে জটিল নয় যে
এভাবেই রূপলাভ করেছে।

তাঁর ছন্দে আছে নিপুণতা। চিত্রকল্প নির্মাণেও তিনি অনন্য। শব্দ নির্বাচন ও শব্দবিন্যাসকে তরুণ সান্যাল বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিষয়অনুযায়ী সমান ওজনের শব্দ ব্যবহার তাঁর বিশেষত্ব—

'কত না সুনসান গ্রাম, ফেউ-হাঁকারে পথ,
মরা জ্যোৎস্না, ছায়ায় পাতায় চুলে বিনুনি বাঁধার তারা ফুল,
এবং কে যেন ঢিল ছুঁড়লেই আঁধার
বিস্মৃত জ্যোৎস্নার, কিংবা ছায়ার অকূল
ব্যাঙ নাচানো ছপছপাতে সকালে পেলাম.....'

('তীর্থযাত্রা')

আমরা আগে দেখেছি—এই কথ্য ভাষার সঙ্গেই সু-পরিশীলিত সাহিত্যের ভাষায়, পুরাণসম্ভব শব্দাবলি কত অনায়াসে ব্যবহার করেছেন তিনি।

তরুণ সান্যালের কবিতার ভুবন সুবিস্তৃত। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সমাজসচেতন সাম্যবাদী প্রত্যয়, মানবতা-বোধের বহুমাত্রিক বিশ্বাস, নিসর্গ-প্রীতি, প্রেম, ইতিহাস—সব কিছুকেই কবিতায় নিয়ে আসতে আগ্রহী তিনি। কখনও কখনও তিনি সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু দুরূহ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেই দুরূহতাকে রূপ দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন না। মননশীল পাঠকই তাঁর লক্ষ্য।

১.২৬ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

১৯৩৩-এর ৫ অক্টোবর কলকাতায় জন্ম। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে শিক্ষা শুরু হয় অলোকরঞ্জনের। আর বিদ্যাভবন (শান্তিনিকেতন) থেকে ১৯০৯-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন তিনি। আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক বাংলায় স্নাতক হন ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো হিসেবে পি-এইচ.ডি. হন ১৯৫৭-তে। তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় ছিল 'ভারতীয় লিরিক রূপকল্পের উৎস ও ক্রমবিবর্তন', ১৯৬৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি. ফিল. করেন।

কর্মজীবন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে লেকচারার হিসেবে তিনি যোগ দেন ১৯৫৭ সালে। ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন। ১৯৭৩-৭৭-এ তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার ছিলেন। অলোকরঞ্জন এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম জার্মানির আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্ট ফাউন্ডেসন-এর সিনিয়র ফেলো হিসেবে কাজ করেন। আর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৭৭ সালে ওই পদে আবার নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

অলোকরঞ্জনের প্রকাশিত কবিতা-সংকলন—

১. 'যৌবন বাউল' (১৯৫৯)
২. 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' (১৯৬৮)
৩. 'রক্তাক্ত ঝরোখা' (১৯৬৯)
৪. 'ছৌ কাবুকির মুখোশ' (১৯৭৭)
৫. 'গিলোটিনে আলপনা' (১৯৭৭)
৬. 'লঘু সংগীতে ভোরের হাওয়ার মুখে' (১৯৭৮)
৭. 'জবাবদিহির টিলা' (১৯৮২)
৮. 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' (১৯৮৩)
৯. 'এবার চলো বিপ্রতীপে' (১৯৮৪)
১০. 'ঝরছে কথা আতসকাঁচে' (১৯৮৫)
১১. 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার' (১৯৮৮)
১২. 'নিজস্ব এই মাতৃভাষায়' (১৯৯০)
১৩. 'মরমী রাত' (১৯৯০)
১৪. 'আয়না যখন নিশ্বাস নেয়' (১৯৯১)
১৫. 'রক্তমেঘের স্কন্দ পুরাণ' (১৯৯৩)
১৬. 'নদী ও রাত্রি বণ্টন হয়ে গেলে' (১৯৯৪)
১৭. 'জ্বরের ঘোরে তরাজু কেঁপে যায়' (১৯৯৪)
১৮. 'এক একটি উপভাষার বৃষ্টি পড়ে' (১৯৯৫)
১৯. 'তুষার জুড়ে ত্রিশূল চিহ্ন' (১৯৯৬)
২০. 'মুণ্ডেশ্বরী ফেরিঘাট পার হতে গিয়ে' (১৯৯৮)
২১. 'ধুলো মাখা ঈথারের জামা' (১৯৯৯)
২২. 'এখনও নামেনি বন্ধু নিউক্লিয়ার শীতের গোধূলি' (১৯৯৯)
২৩. 'সেরা ছড়া'

অনুবাদ সংকলন :

১. ‘সুরদাস সঞ্চয়িতা’ ১৯৮০

২. ‘ব্রেষটের কবিতা ও গান’ ১৯৮০

৩. ‘প্রেমে পরবাসে’ (হাইনে-র কবিতার অনুবাদ)

কবি-বিশেষত্ব : কবিতা সম্বন্ধে অলোকরঞ্জনের অভিমত—অভিজ্ঞতাই কবিতার উৎস। প্রাত্যহিক অভ্যাসের জড়তা থেকে মুক্তি দেয় কবিতা। অনুভবকে জাগ্রত করে। পরিবর্তমান সময় রূপায়িত হয় কবিতায়। অনুশীলনের আনন্দশ্রমকেই তিনি কবিতা তথা সৃষ্টির শেষ কথা মনে করেন।

‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন তিনি। তবু প্রথম থেকে তিনি আপন বিশেষত্বে স্বতন্ত্র। বিশ্বাস করেন শিল্পীর স্বাধীনতায়। অলোকরঞ্জন পঞ্চাশ দশকের কবি। এসময়ের কবিতায় ঈশ্বর-বিশ্বাসের কোনো স্থান ছিল না। অলোকরঞ্জনের কবিতায় কিন্তু আছে ঈশ্বরানুভূতি। ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা টলাতে পারে না তাঁর বিশ্বাস—

যে দিকে ফিরাও উট এই দ্যাখো করপুটে এক গণ্ডুষ
বিশ্বাসের জল, তুমি পান করো আমি জল না
খেয়ে মরবো।’

আধ্যাত্মিক-ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছেন অলোকরঞ্জন। তাই তাঁর কবিতায় আছে চর্যাগীতি ও বাউলের সহজিয়া তত্ত্ব, তান্ত্রিক মতের দেহভিত্তিক সাধনা সম্পর্কিত তত্ত্বের সূক্ষ্ম প্রয়োগ। বৈষ্ণবের ঈশ্বরপ্রেম, শাক্তগীতির ভক্ত-ভগবান সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের পান্থ-ভাবনা ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়—

‘চেয়ে দেখি চন্দ্র এসে পাপীর
হাতের ছাপ, সুষুম্নার মাপ তুলে নিয়ে আমাকে
দেখায়, আমি কি দুখেরে ডরাই? আমি
তো প্রস্তুত হয়ে আছি’
‘আমি কি দুখেরে ডরাই’

—শাক্তগীতির এই পঙ্‌ক্তিটি তিনি ব্যবহার করেছেন স্বীয় প্রয়োজনে।

জীবনকে তিনি গ্রহণ করেছেন সমগ্ররূপে। ভালোমন্দ, সুন্দর-কুৎসিত সবই আছে তাঁর রচনায়। তিনি বিশ্বাস করেন জীবনের চলমানতায়—

‘তবে আমার এখন থেকে জেগে থাকার
আমৃত্যু-ভূমিকা—’

সমাজবদ্ধতার দায় তিনি স্বীকার করেন। মানবতা-বিরোধীদের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রবলভাবে এসেছে কবিতায়—

‘তোমাকে মেধাবী তেজে তীব্র অভিশাপ দিতে হবে।’

সমকালে হনন-বিধ্বস্ত বাস্তবতা এবং ব্যক্তিমানুষের অবস্থান জীবন্ত হয়ে উঠেছে ‘পুরুষ’ (‘রক্তাক্ত ঝরোখা’) কবিতায়। কয়েকটি পর্বে বিভক্ত কবিতাটির চতুর্থ পর্ব—

‘পেট্রোল পুড়িয়ে চলল ফিস্‌ফাস চক্রান্ত মফঃস্বলে,

সাত খুন মাপ জেনে তারা শালবনের অন্দরে
সাড়ে ছটি খুন করে দেহগুলি চিন্ময় বল্কলে
ঢেকে উপহার দিল পাড়ায় মোড়লকে লগ্ন ধরে
আমি সবই জানতাম। আমাকে পুরুষ বলা চলে?'

ক্রমে এই দায়বদ্ধতা হয়েছে বিশ্বব্যাপী। আসলে 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ' থেকে তাঁর কবিতা হয়েছে বিশ্বমুখী। ছৌ বাংলার মুখোশ-নৃত্য, কাবুলি জাপানের মুখোশ-নাটক।

নামকবিতাতেই রয়েছে সমস্ত বাধা, সংকীর্ণ সীমা চূর্ণ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা। কবিতাটির পটভূমি জার্মানিকে বিভক্ত করে দেওয়া বার্লিন প্রাচীর। অবশ্য এ প্রচীর আর নেই। যুক্ত হয়েছে জার্মানি—

'তুমি এসো বার্লিনের দুই দিক থেকে
অবিভক্ত সাদা-কালো খঞ্জন আমার
ছৌ-কাবুকি ছদ্মবেশে
চূর্ণ করে দাও যত অলীক সীমান্ত
আমি যদি কৃত্রিম প্রাচীর গড়ি
মৃদু পক্ষপাতে ভেঙে দিয়ো
ডানা অটুট রাখো ভাঙে যদি আমাদের প্রেম।'

'মুণ্ডেশ্বরী ফেরিঘাট পার হতে গিয়ে' (১৯৯৮) সংকলনের 'ক্লোন' কবিতাটিতে আধুনিক বিজ্ঞান কী সংকট আনতে চলেছে সে সম্বন্ধে যেন মানবজাতিকে কবি সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মুণ্ডেশ্বরী দামোদরের একটি শাখানদী। এবং হুগলি জেলায় এই নদীটি একদা ডেকে আনত সর্বনাশ। আরও একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। জীবের বা উদ্ভিদের কোষের ধর্ম বেড়ে চলা। এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে কোনো জীবের বা উদ্ভিদের দেহকোষ থেকে অনুরূপ জীব তৈরির প্রক্রিয়ার নাম ক্লোন। প্রথমে উদ্ভিদের প্রতিরূপ এ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। পরে 'ডলি' নামে একটি মেষকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়। পদ্ধতিটির বৈনাশিকতার দিকটি স্পষ্ট হয়েছে অলোকরঞ্জনের কবিতাটিতে—

'মা-বাবা ছাড়া বানিয়ে দিল হাজার ভাই বোন
শয়তানটা হেসে বলল, এরা সবাই ক্লোন

বলল দেখুন মোদ্দা কথা এটা মন্বন্তর
ভাঁড়ার শূন্য হলেই ওরা জোগাবে রাজকর
গতর খেটে, কিন্তু ওদের যতই হৃদয় দিন।

বরাতজোরে ওরা শুধুই থাকবে হৃদয়হীন।'

নারী সম্বন্ধে অলোকরঞ্জনের অনুভব যন্ত্রণা, হতাশায় জর্জরিত। নারীর মধ্যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন যুগের বিশ্বাসহীনতা—

'বিনা অছিলায় আমার সঙ্গে
যে মেয়ে মিশতো তার ঠোঁট উচ্ছিষ্ট।'

তবু এই নারীর নিকটে তিনি নিজেকে অর্পণ করেন—

'তবু আবার অন্তিম দুঃসাহসে তোমার বেদীতে
আমি রক্তচন্দন অর্পিলাম।'

নারীকে, তার প্রকৃতিকে তিনি ঘৃণা করেননি। নারী সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব—

'কিন্তু তুমি লাস্যের চকিতে বশ করেছ
মৃত্যুকে, হে মৈত্রেয়ী।'

তাঁর প্রকৃতিচিত্র—দৃশ্যাতীত ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ—

'এই সকালের আলোর আড়ালে কি কোনো তামসী রাতের
অন্ধকারের প্রস্তুতি নেই?
নির্জন থেকে জন্ম যে-সব সোনালি মায়ার কুহেলিকাদের
এ সকাল মাতে তাদের সঙ্গে প্রদক্ষিণেই
শ্বেত করবীর বুক জুড়ে ওই একটি শালিক
বসে আছে যেন ঐন্দ্রজালিক।'

আবার 'গোধূলির শান্তিনিকেতন' ('যৌবন বাউল')-এর মতো নিসর্গ-সৌন্দর্য-নির্ভর কবিতাও তিনি লিখেছেন।

সহজ, মধুর, রোমান্টিক কবিতা তিনি লিখেছেন দক্ষতার সঙ্গেই—

'অন্য কাননে যাস নে যে চোর,
নিজেকেই আজ করব চুরি,
যাকে চেয়েছিস গোপনে সে তোর
বুকের আকাশে থির বিজুরি'

আবার 'তমসো মা'-র মতো দার্শনিক চেতনায় দীপ্ত কবিতা তিনি লিখেছেন অনায়াসে—

'তোমরা দুজন এসো, হে যুগ্ম জ্যোতি অতৃতীয়
এসো অবতীর্ণ হও, শ্বেতাভ ঝর্নার পাখা মেলে,
অনন্ত জলের শিল্পে জরা হোক শান্তির অমিয়,
ধরার কলঙ্ক হোক তোমাদের অলঙ্করণীয়—
তারপর ফিরে যেয়ো তৃতীয় নয়ন জ্বেলে জ্বেলে'

পঞ্চাশ দশকের কবিরা দুরূহতা আনতে চাইতেন না রচনায়। কিন্তু মনন ও বৈদগ্ধ্যের শীলিত স্পর্শে অলোকরঞ্জনের কবিতা ঈষৎ দুরূহ। প্রথম দিকের রচনায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এই দুরূহতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। অবশ্য অতিসংহতি ও বিচ্ছিন্ন উপমা, সুনির্বাচিত বিশেষণ, ছন্দস্পন্দ-জাত নতুন অর্থের ব্যঞ্জনা অনেক সময় তাঁর কবিতাকে করেছে দুরধিগম্য।

শব্দ-ব্যবহারে অতি সতর্ক অলোকরঞ্জন। শব্দের কৌশলগূঢ় প্রয়োগে, ধ্বনির নিপুণ ব্যবহারে গোপন সুরের ধারায় সিক্ত হয় তাঁর কবিতা। অপ্রত্যাশিত মিল নির্মাণে তিনি দক্ষ। 'মাউথ অর্গান আর 'অর্ঘ দান'—এর মিল মত সাবলীলভাবে এসে যায় তাঁর রচনায়।

পঙ্‌ক্তির মধ্যে শব্দ বিন্যাসের দ্বারা তিনি আনেন ধ্বনির স্পন্দন—

'তবু অবাক, আঁখিপদ্মে ছিল না ভর্ৎসনা,
অনুক্ত আকৃতি ছিল রক্ত কোকনদে।'

পঙ্‌ক্তিদুটিতে 'অ, আ', আর 'ত', 'ক', 'ন' ধ্বনির ক্রমব্যবহারে শব্দ হয়ে উঠেছে সুরময়। তথাকথিত কাব্যিক শব্দ—'জ্বলি' 'তব' 'অর্পিলাম' প্রভৃতি তিনি বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। অবশ্য অনেক সময় তাঁর শব্দ প্রয়োগ হয়ে উঠেছে বুদ্ধিগ্রাহ্য—

'অন্য অন্য রমণীরা অঞ্জনার মতো অসহায়'

'অ' ধ্বনির অনুপ্রাস আর 'ন' ধ্বনির মাধুর্যে পঙ্‌ক্তি হয়েছে সুন্দর। কিন্তু পবনদেব বলপূর্বক গ্রহণ করে অঞ্জনাকে। তারই ফল হনুমান। এ কাহিনি জানা না থাকলে পঙ্‌ক্তিটির পূর্ণ রস উপভোগে একটু বাধা এসে যায় না কি? ঈষৎ রহস্যময় ব্যক্তিগত চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি সফল—

'এখুনি লণ্ঠন জ্বলবে, নিভবে রোদ্দুর
দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি আকাশ
বুকে নিয়ে আমি আর নীলকণ্ঠপুর।'

কখনও বা তাঁর তীব্র অনুভব চিত্রকল্পে এনেছে সজীবতা—

'অভুক্ত দেবতার অর্ঘ্যের
আপেল চিরে রক্ত আমি সইতে পারছি না।

ব্যক্তিগত এ বেদনায় মিলে গেছে মানবজাতির যন্ত্রণা—

'গোধূলির বিন্ধ্যাচলে আমাদের
অকৃতার্থতা কি অর্ঘ্য ও দেবতা মিলে
আমাদের শতাব্দীর পাখি।'

বাংলা কবিতার তিনটি ছন্দ দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত আর মিশ্র কলাবৃত্ত—অলোকরঞ্জন ব্যবহার করেছেন নিবিড় নিপুণতার। একটি উদাহরণ—

'বোবা দেয়ালটা সাদা দেয়ালটা
হঠাৎ লালচে
রঙ্গনটিনী ভ্রমরার কাছে
আদর কাড়ছে।' ('দেয়ালটা'/দলবৃত্ত)

১.২৭ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৩-এর ২৭ নভেম্বর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর। শৈশবে পিতৃহারা শক্তি মাতামহের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহড়ু গ্রামে বড়ো হয়ে ওঠেন।

১৯৪৩-এ ওই গ্রামের বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভরতি হন শক্তি। সম্ভবত ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় শুরু হয় তাঁর কবিতা রচনা।

১৯৪৮-এ কলকাতায় বাগবাজারে মামার বাড়ি আসেন, শক্তি ভরতি হন অষ্টম শ্রেণিতে। এ সময়ই এক শিক্ষকের প্রভাবে সাম্যবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মায়।

১৯৪৯-এ মামার ছাপাখানা থেকে তিনি প্রকাশ করেন ‘বহ্নিশিখা’ পত্রিকা। সে পত্রিকায় প্রথমে স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার পরে স্ব নামে কবিতা লিখতে শুরু করেন শক্তি।

১৯৫১-এ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আই.কম. পড়া শুরু করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন তিনি।

১৯৫৩ সালে তিনি প্রথম বিভাগে আই.কম পাশ করে বাংলায় অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’-তে মুদ্রিত ‘যম’ কবিতাটি থেকে শক্তি কবিখ্যাতি লাভ করেন। ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অমনোযোগী শক্তি প্রেসিডেন্সি ত্যাগ করেন।

১৯৫৭-এ মা এবং ছোটো ভাইকে নিয়ে তিনি উলটোডাঙার বস্তিতে বাস করতে শুরু করেন আর বুদ্ধদেব বসুর প্রেরণায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে স্নাতক স্তরে ভরতি হন। অবশ্য কয়েক মাস পরে তিনি নিয়মিত পড়াশোনা ছেড়ে দেন এবং মদ্যপান সহ অনিয়মিত জীবন শুরু করেন। ১৯৫৮-তে কমিউনিস্ট দল ত্যাগ করেন শক্তি। পরের বছরের চাইবাসা ও হেসাডি ভ্রমণ তাঁর জীবনে আনে বড়ো রকমের পরিবর্তন।

১৯৬১ সালে মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন ‘হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ’। ততদিনে তিনি লাভ করেছেন খ্যাতি এবং যুক্ত হয়েছেন ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার সঙ্গে।

১৯৬২-তে তিনি ‘হাংরি’ আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ওঠেন। জীবনযাত্রায় আসে উচ্ছৃঙ্খলতা। তিন বছর পরেই অবশ্য তিনি সরে আসেন এই আন্দোলন থেকে।

১৯৬৬-তে তিনি প্রকাশ করেন শুধুমাত্র কবিতার পত্রিকা ‘কবিতা সাপ্তাহিকী’। ১৯৬৭-এ বিবাহের পর তিনি বেহালায় বাসা করেন। ১৯৭০-এ কন্যার জন্ম তাঁকে ঈষৎ সাংসারিক করে তোলে। তিনি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় রবিবারের সাহিত্য পৃষ্ঠা সম্পাদনা কাজে যোগদান করেন।

১৯৮৫-এ মধ্যপ্রদেশ সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভূপালের ভারতভবন উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ফলে ভারতের নানা প্রদেশের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। ১৯৮৬ সালে ভূপালের ভারতভবনে কবিতা অনুবাদ-কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন কবি।

১৯৮৭ সালে শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে যুক্তভাবে মুদ্রিত হয় তাঁর কবিতার হিন্দি অনুবাদ। ১৯৮৯-এ বেলেঘাটায় নিজের বাড়িতে উঠে আসেন তিনি। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুইডেনে দশম ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রি আর্ট ফেস্টিভ্যালে সস্ত্রীক যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৯৪-এ তিনি ‘আনন্দবাজার’-এর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশ করে তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। ১৯৯৫ সালে বিশ্বভারতীতে তিনমাসের জন্য অতিথি-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ বছরের মার্চ মাসে হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয় তাঁর।

মুদ্রিত কবিতা-সংকলনের তালিকা :

১. ‘হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য’, ১৯৬১
২. ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’, ১৯৬৫
৩. ‘অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে’, ১৯৬৬
৪. ‘পুরানো সিঁড়ি, আনুমানিক’, ১৯৬৭
৫. ‘সোনার মাছি খুন করেছি’, ১৯৬৭
৬. ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’, ১৯৬৯
৭. ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ ১৯৭০
৮. ‘পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি’, ১৯৭১
৯. ‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’, ১৯৭২
১০. ‘সুখে আছি’, ১৯৭৪
১১. ‘ঈশ্বর থাকেন জলে’, ১৯৭৫
১২. ‘জ্বলন্ত রুমাল’, ১ম দে’জ সংস্করণ ১৯৭৫
১৩. ‘অস্ত্রের গৌরবহীন একা’, ১৯৭৫
১৪. ‘ছিন্নবিচ্ছিন্ন’, ১৯৭৫
১৫. ‘সুন্দর এখানে একা নয়’, ১৯৭৬
১৬. ‘আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল’, ১৯৭৬
১৭. ‘কবিতার তুলো ওড়ে’, ১৯৭৭
১৮. ‘এই আমি যে পাথরে’, ১৯৭৭
১৯. ‘হেমন্ত যেখানে থাকে’, ১৯৭৭
২০. ‘পাতাল থেকে ডাকছি’, ১৯৭৭
২১. ‘উড়ন্ত সিংহাসন’, ১৯৭৮
২২. ‘পরশুরামের কুঠার’, ১৯৭৮
২৩. ‘মানুষ বড়ো কাঁদছে’, ১৯৭৮
২৪. ‘ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি’, ১৯৭৮
২৫. ‘ভাত নেই, পাথর রয়েছে’, ১৯৭৯
২৬. ‘আমাকে দাও কলা’, ১৯৮০
২৭. ‘আমি চলে যেতে পারি’, ১৯৮০
(‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’—এ গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হয়)
২৮. ‘মন্ত্রের মতন আছি স্থির’, ১৯৮০
২৯. ‘অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল’, ১৯৮০
৩০. ‘আমি একা বড়ো একা’, ১৯৮১
৩১. ‘প্রচ্ছন্ন স্বদেশ’, ১৯৮২
৩২. ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’, ১৯৮২
৩৩. ‘কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে’, ১৯৮৩
৩৪. ‘কক্সবাজারে সন্ধ্যা’, ১৯৮৪

৩৫. 'সে তার প্রতিচ্ছবি', ১৯৮৪
৩৬. 'ও চিরপ্রণম্য অগ্নি', ১৯৮৫
৩৭. 'সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার', ১৯৮৬
৩৮. 'আমাকে জাগাও', ১৯৮৬
৩৯. 'এই তো মর্মর মূর্তি', ১৯৮৭
৪০. 'বিষের মধ্যে সমস্ত লোক', ১৯৮৭
৪১. 'ছবি আঁকে ছিঁড়ে ফ্যালে', ১৯৯১
৪২. 'পাতালে টেনেছে আজ', ১৯৯১
৪৩. 'জঙ্গল বিষাদে আছে', ১৯৯৫
৪৪. 'বড়ো ছড়া', ১৯৯৪

কিশোরদের ছড়া—

১. 'পুণ্যিপুকুর পুষ্করিণী', ১৯৮২
২. 'মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয়', ১৯৮৫

অনুবাদ—

১. 'ওমর খৈয়ামের রুবাই', ১৯৬৯
২. 'কালিদাসের মেঘদূত', ১৯৭২
৩. 'গালিবের কবিতা', ১৯৭৫ (আয়ান রশিদের সঙ্গে)
৪. 'পাবলো নেরুদার প্রেমের কবিতা', ১৯৭৬
৫. 'কুমারসম্ভব কাব্য', ১৯৭৬
৬. 'হাইনের প্রেমের কবিতা', ১৯৭৯
৭. 'লোরকার কবিতা', ১৯৭৯
৮. 'দশ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা', (মুকুল গুহের সঙ্গে), ১৯৮০
৯. 'কহলীল জিব্রালের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (মুকুল গুহের সঙ্গে), ১৯৮১
১০. 'প্রীতিশ নন্দীর কবিতা', ১৯৮১
১১. 'মায়াকোভস্কির শ্রেষ্ঠ কবিতা'
(সিদ্ধেশ্বর সেন ও মুকুল গুহের সঙ্গে), ১৯৮১
১২. 'ডুইলো এলেজি, রাইনার মারিয়া রিলকে' (১৯৭৫-১৯৭৬)
(মুকুল গুহের সঙ্গে), ১৯৮২
১৩. 'পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা', ১৯৮৮
১৪. 'আমেরিকান ইন্ডিয়ান শ্রেষ্ঠ কবিতা', ১৯৯২

যৌগ কবিতা সংকলন—

১. তিন তরঙ্গ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৯৬৪
২. চার কবির কবিতা সংকলন—
'প্রথম রাখাল বাণীপ্রিয়র জন্য শাশ্বত স্বীকারোক্তি'
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অংশটির নাম 'এখন', অন্য তিন কবি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল পুরকায়স্থ ও অভিজিৎ ঘোষ, ১৯৭১

৩. ‘যুগলবন্দী’—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭২

৪. ‘সুন্দর রহস্যময়’—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮০

রচনা বিশেষত্ব—বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য আর মৌলিকতায় পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র শক্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রেম, নারী, প্রকৃতি, সুখ, দুঃখ, আশা, হতাশা নিয়ে অতল জীবন-রহস্য আর মৃত্যুর বিষণ্ণতা—এ সবই তাঁর কবিতায় নানা মাত্রা নিয়ে এসেছে। স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে প্রবল হৃদয়াবেগ, ক্রোধ, ভালোবাসা মিশে গেছে তাঁর কবিতায়। ঈষৎ উদ্‌ভট কল্পনা আর পরাবাস্তবের স্পর্শ সত্ত্বেও তাঁর কবিতা স্বয়ংক্রিয় রচনা নয়। কল্পনাই তাঁর কবিতার চালিকা শক্তি। প্রসঙ্গত তাঁর ‘সে বড়ো সুখের সময় নয়’ (‘সোনার মাছি খুন করেছি’) কবিতাটির কথা মনে করতে পারি আমরা—

‘মনে করো, গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়ুচ্ছে নিবন্ত ডুমের পাশে
তারার আলো
মানের করো জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির—আকাশ-পাতাল
এতোল-বেতোল।’

এই কবিতাটির প্রাণ—ছবি এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপনভঙ্গি। শব্দসমাহারে পাঠকমনে সামগ্রিক একটি অনুভব-উদ্রেকই তাঁর লক্ষ্য।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিস্বভাবের আছে দুটি দিক—বাস্তব জগতের প্রতি আকর্ষণ এবং চেতনাজগতে অবাধ বিচরণের প্রবল বাসনা। গতি তাঁর প্রিয়, স্থিরতা নয়। জীবনের গতিময়তা তাঁকে আকর্ষণ করে। এজন্যই স্টেশন, প্লাটফর্ম, নদী, নৌকা, জাহাজ—বার বার এসে যায় তাঁর কবিতায়।

ধ্যানীর নির্লিপ্ততা নয় প্রবল বাসনা দিয়ে বিশ্বকে গ্রহণ করেন তিনি। তাই তাঁর কবিতায় নেই কোনো স্থির গম্ভীর চিত্র। আবার আবেগের প্রাবল্যের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত এক উদাসীনতা। ‘ত্যাগে আমার ভাগ বসেছে—এই বসন্তে বৃষ্টি হবে’—এরকম পঙ্‌ক্তি তাই তিনি লিখতে পারেন।

গতি প্রিয় হলেও বার বার পিছনে ফিরে তাকাতে হয় তাঁকে। ফলে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বময় এক নাটকীয়তা—

‘যাত্রী তুমি, পথে বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে।
এইতো চাই, বিচার বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূটকচল, টানাপোড়েন সর্বজনীন
মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি পথে বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই।’

প্রেম, নারী আর প্রকৃতি বার বার এসেছে তাঁর রচনায়। কখনও তাঁর প্রেম শরীরী বাসনায় উষ্ণ—

‘সে কখন দুর্লভ সুখে গলে গলে শূন্যে পৌঁছালো। অঙ্গার অন্ধকারের পিঠ তীক্ষ্ণ নখরে বিদ্ধ করতে করতে খোঁজায় রত হলাম তার। সে আমার পার্শ্বে ছিল ভ্রমরের স্বরের মত মধুর।’

(‘সুবর্ণরেখার জন্ম’)

তারই সঙ্গে প্রেমের ইঙ্গিতময় প্রকাশরূপ নির্মাণে শক্তির দক্ষতা প্রশ্নাতীত—

‘আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে
....
ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি।

দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি।
এই তো রোমাঞ্চকর যামিনী—সোনায় কোনো গ্লানি লাগেনা
খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম।
('সোনার মাছি খুন করেছি')

চতুর্দশপদীর সংহতির মধ্যে উচ্চারিত হয় তাঁর স্পর্ধিত ঘোষণা—

'ভালোবাসা পেলে সব লন্ডভন্ড করে
চলে যাবো।

বঞ্চিত যৌবনের অসহায় যন্ত্রণা অপরূপ হয়ে উঠেছে তাঁর রচনাগুণে—

'অই কপালে কী পরেছে
কখন যেন পরে?
সবার বয়স হয় আমার বালক বয়স
বাড়ে না কেন?'
('পরস্ত্রী')

প্রকৃতি কখনও একা তাঁকে সঙ্গ দেয়—

'অন্তরে সবুজ পাতা জংলা হরিণ
সংঘে সমষ্টিতে একলা একা
('পাতার শোকে')

কখনও নিসর্গ আর প্রেম যেন মিশে গেছে—

'আলো আছে যার আলাদা প্রকৃতি
মহিষের চোখে আর নদীর পাথরে,
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো—
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর
ঝরে পড়ছে।'
('একবার তুমি')

উপলব্ধি আর মানবিকতা শক্তির কবিতার মূল ভিত্তি। সমস্ত অনুভূতিপ্রবণ কবির মতো শক্তিও উপেক্ষা করতে পারেননি তাঁর সমকাল আর পারিপার্শ্বিককে। রক্তস্নাত সত্তর দশকে রাজপথে মৃতদেহ দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে—

'কোন্ অপরাধে এক প্রাণবন্ত জীবন আঁধারে
ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, ও শুধু বিপ্লব চেয়ে দোষী?'
('রক্তের দাগ')

যে অনড় স্থবির সমাজ কাঠামোকে ভাঙতে গিয়েছিল ওই তরুণ তার স্বরূপ জানা আছে কবির—

'অথচ পাথরে যদি মারো,
ঘা দাও, অমনি বগা ফোঁস করে, ঐতিহ্যমণ্ডিত
দেশের পাথর যদি ছেদ্রে যায়, বিদেশে কী করে।

ছাত নেই, ভাত নেই—কোন কাম পাথরে মচ্ছবে—
তোমাদের?'

('ভাত নেই পাথর রয়েছে')

দেশবাসী সচেতন নয় এই নিদারুণ অবস্থা সম্বন্ধে। তারা—

'অধিকাংশ আলস্যে কাতর
তাই শুয়ে-বসে থাকে মনোভঙ্গি নবাবের মতো
প্রগতিবিমুখ
ফুৎকার এড়িয়ে শুধু বেঁচে থাকে, ভোট
দিতে থাকে।'

('শুধু বেঁচে থাকে')

এই সচেতনতা সত্ত্বেও শক্তি হয়ে ওঠেন না বিপ্লবী। কারণ তিনি অস্তিত্বের গভীর রহস্যের উন্মোচন চান। বিশুদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতে চান তিনি। কিন্তু সমাজ-সংসার, মনন—অস্তিত্বকে নিয়মে বেঁধে গড়তে চান না তত্ত্বসত্যের কঠিন অবয়ব। সেই আরোপিত অবয়ব ছিন্ন করে, সুষমা আর সম্ভ্রমকে চূর্ণ করে সত্তার অবাধ স্বাধীনতায় নিজেকে স্থাপন করাই তাঁর অভীষ্ট—

'সত্যকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গঙ্গার
বাতাসে
... তারপর কষে দুগালে মারি থাপ্পড়।'

('কবিতার সত্য')

এই নির্মাণ আর বিনাশের এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে চান কবি—

'আমি জানি না পথ আমাকে কোন দিকে
নিয়ে যাবে।
ডানদিকে বাঁদিকে—দুদিকেই যেতে পারা যায়।
শুধু যাওয়া চাই—ঐটেই আসল কথা..........।'

মৃত্যু বারবার এসেছে শক্তির কবিতায়। এত বেশি বার এবং এরকম বিভিন্নরূপে মৃত্যুকে দেখেছেন খুব কম বাঙালি কবি। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর চেতনায় মৃত্যু মহান বা সুন্দর নয়। আদি মানুষের মতোই তাঁর কাছে মৃত্যু রহস্যময় এবং ভয়ের উৎস। এই মৃত্যুর প্রেক্ষিতে জীবনকে আরও নিবিড় করে ভালোবাসতে চাইছেন শক্তি—

'এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতা কাঠ ডাকে : আয় আয়
যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু কেন যাবো?
সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমু খাবো।'

('যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো')

এই মৃতুকে সহজভাবে গ্রহণ করার মতো বলিষ্ঠতা আছে তাঁর মধ্যে। মৃত্যুর প্রতি নিবিড় মধুর একটি টান তিনি অনুভব করেছেন মাঝে মাঝে। চিতাগ্নি তাই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে 'চির প্রণম্য'।

মৃত্যু ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি তাঁর জীবনপ্রীতিকে। তাঁর কাছে জীবন অনিঃশেষ, মৃত্যু নিতান্ত একটি জাগতিক ঘটনা, জীবনের সমাপ্তি নয়। মৃত্যু-কামনা আর জীবন-কামনার সম্মিলনের পূর্ণরূপ দেখা যায় তাঁর 'মৃত্যু' নামের দলবৃত্ত ছন্দে রচিত সাত পঙ্‌ক্তির কবিতাটিতে—

'পুড়েছিল ঐ শ্মশান ভরে কাঠের রাশি
পুড়তে আমি ভালোবাসি, ভালোই বাসি।
পুড়তে আমি চাচ্ছি কোনো নদীর ধারে।

কারণ, একটা সময় আসে, আসতে পারে
মৃত্যু তখন হয় না সফল, হয় না সফল।'

মৃত্যুকে প্রথমে কবি খুব সহজভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। নদীতীরে দগ্ধ হওয়ার বাসনা তাঁর। জল, বিশেষত বহতা বারি সর্বদা জীবনের প্রতীক। হয়তো সে কারণে এদেশের শ্মশান হয় নদীতীরে, পুকুরের পাড়ে। মৃত্যু-অতিক্রমী জীবনের প্রতি প্রখর আকর্ষণ এভাবেই যেন রূপ পায়। মৃত্যু-নির্ভর কবিতাগুলি আসলে শক্তির নিবিড় জীবনাসক্তি, অস্তিত্ব-প্রীতিরই প্রতীক।

হাংরি আন্দোলন ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১৯৬১ সালে মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হন শক্তি। এই বছরেই 'সম্প্রতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয় শক্তির 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব'। শুরু হয় বাংলা কবিতার হাংরি আন্দোলন। ১৯৬৫-তে শক্তি সরে আসেন এই আন্দোলন থেকে। কিন্তু এই অল্প সময়েই তিনি আন্দোলনটিকে তত্ত্বগত ও সাহিত্যগত—উভয়বিধ প্রতিষ্ঠাই দিতে পেরেছিলেন।

'সম্প্রতি'র তৃতীয় সংকলনে মুদ্রিত শক্তির দুটি সনেট 'ক্ষুৎকাতর যৌন কাতর নয়' হয়ে দাঁড়িয়েছিল হাংরি আন্দোলনের প্রকাশ্য লিখিত ঘোষণা (ম্যানিফেস্টো)।

১৯৬২-র মধ্যভাগে মার্কিন 'বিটনিক' আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা কবি অ্যালেন গিনসবার্গ কলকাতায় আসেন এবং 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর প্রভাবে রাসায়নিক মাদক গ্রহণ, স্বতোৎসার রচনারীতি এবং উচ্ছৃখল জীবনযাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তরুণ বাঙালি কবিজন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি জীবনের প্রচলিত ছকটিকে ধাক্কা দিতে চেয়েছিল এ আন্দোলন

আন্দোলনের মধ্যমণি হয়ে উঠলেও শক্তি 'হাংরি'দের অসাহিত্যিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যকে আক্রমণ, সমর্থন করেননি। আবার কখনও নিরূপিত ছন্দের বাইরে যায়নি তাঁর কবিতা। পূর্বে যে ম্যানিফেস্টো সদৃশ সনেটদ্বয়ের কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মাইকেল প্রবর্তিত সনেটের আদর্শে রচিত অর্থাৎ উত্তরাধিকার অস্বীকার করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। ব্যক্তিজীবনে সংযম না থাকলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি দ্রুত সরে এসেছিলেন এ আন্দোলন থেকে। যদিচ এর প্রভাবে তাঁর কিছু কবিতায় অশ্লীল ও যৌনতাগন্ধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল।

গঠনশিল্প : ছন্দ

বাংলা কবিতার প্রচলিত ছন্দ-কলাবৃত্ত, মিশ্রকলাবৃত্ত আর দলবৃত্ত—তিনটিতে সমান দখল ছিল শক্তির। তবে দলবৃত্ত ছন্দে তাঁর প্রতিভা যেন আরও দ্যুতিমান হয়ে উঠতো। পাঁচ মাত্রার কলাবৃত্ত ছন্দেও আশ্চর্য নিপুণতা ছিল তাঁর—

'তোমায় কিছু দিয়েছিলাম প্রীতির ছায়াতলে
নীলাঞ্জন কহিয়া গেল রম্য চিতাপটে ....
চমৎকার বারুণী গীতি আছো তো সখা ভালো?
বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার
শূন্য নদীতটে।'
('ভ্রান্তি')

দলবৃত্ত ছন্দে রচিত 'ঝর্না কবিতায় পদগত আয়তনের অভিন্নতা মেনে চলেননি শক্তি। কথ্য রীতির স্বাভাবিকতা আনার প্রয়োজনে যতির বিধিবদ্ধ নিয়মও লঙঘন করেছেন। দ্রুত লয়ের ছন্দে ঝর্নার নৃত্যপরতা হয়ে উঠেছে সপ্রাণ—

'সারঙ্গ, যদি ঝর্না ফোটাই তুমি আসবে কি তুমি আসবে কি
সন্তর্পণে পল্লব দোলে এত অজস্র বন্ধু হাওয়া
গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর অমন নূপুর জলে ভাসবে কি।
পাহাড়খণ্ড পাহাড়খণ্ড ওর নৃত্যের দোষ নিয়ো না হে।'

একশোটি চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট রচনা করেছেন শক্তি। সেগুলির বেশ কয়েকটিতে সনেটের প্রথাবদ্ধ গঠনরীতি মানা হয়নি। আবার অনেকগুলি রীতিবদ্ধ সনেটও তিনি লিখেছেন। অবশ্য অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে সর্বদা তিনি নিয়মের বিরুদ্ধেই ছিলেন।

গদ্যরীতির কবিতা রচনায়ও অনায়াস সাবলীলতার পরিচয় দিয়েছেন শক্তি। কখনও কখনও এজাতীয় কবিতার মধ্যে মধ্যে এসেছে অন্ত্যমিল সমৃদ্ধ ভাঙা পয়ার; কখনও কখনও এসেছে নিরূপিত ছন্দে নির্মিত দু-একটি পঙ্‌ক্তি। দেওয়া হল দুটি উদাহরণ—

'এবার বসন্তকালে বৃষ্টি হলো স্বপ্নের ভিতর
স্বপ্নের ভিতর হলো বজ্রপাত তাও বহু বার'
('অলৌকিক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ')

'আমাকে তুই আনলি কেন ফিরিয়ে নে'
('জরাসন্ধ')

তাঁর গদ্যকবিতার অন্য এক বৈশিষ্ট্য গল্প-চরিত্রের মতো নাটকীয় দ্বন্দ্ব। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায় তাঁর কল্পনা। কিন্তু ভাবের মূল সূত্রটি বজায় থাকে প্রথম পঙ্‌ক্তির পুনরাবৃত্তিতে। আর কবিতার শেষে প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাসের প্রয়োগ বুঝতে দেয় না ছন্দমিলের অভাব। তার সঙ্গে থাকে গতিময় কিছু ছবি—

'সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম
আস্তে, যেমন জামরুল, ঐ নীল ভিজোনো গাছের ছালে
ছড়িয়ে দিলুম যেমন চাষা ছড়িয়েছিলো পুরুষ্টু বীজ
ক্ষেত ভরে যায় শস্য ওঠে, তোমার শস্য শরীর ভরে
কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম—
কারণ ছিলো? কারণ আছে? তালসুপুরি গাছের কাছে
কারণ ছিলো—কারণ আছে।'
('বিষ-পিঁপড়ে)

গোপন অনুপ্রাস রয়েছে এ অংশটিতে— 'জুড়ে/পিঁপড়ে, কুড়িয়ে/ছড়িয়ে'

আর শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে আছে অন্ত্যমিল।

রবীন্দ্র-কবিতার অংশ ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে কখনও কখনও ব্যবহার করেছেন কবি—

'আমার ভিতর ঘর করেছে লক্ষ জনায়
এবং আমায় পর করেছে লক্ষ জনে
এখন আমার একটি ইচ্ছে, তার বেশি নয়
স্বস্তিতে আজ থাকতে দে না আপন মনে।'

'শব্দ-ব্যবহারে কৃতী ছিলেন শক্তি। খাঁটি তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশজ শব্দ, আঞ্চলিক গ্রাম্য শব্দ তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে দ্যুতিমান হয়ে উঠেছে কবিতা-শরীর—

'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারো মাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্‌মুখ সবুজ নালি ঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—'

('অবনী বাড়ি আছো')

'গাভীর'-এই তৎসম শব্দের সঙ্গে 'চরে'-র মতো নিতান্ত আঞ্চলিক শব্দব্যবহারে তিনি এমন প্রভা ছড়িয়ে দিয়েছেন পঙ্‌ক্তিটিতে যে তার হয়ে উঠেছে অপরূপ।

চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব অনুভব ব্যবহার করতেন। একটি উদাহরণ—

'রাত্রি কেটে গেলে ভোর যদি
ইস্টিশান মাস্টারের মেয়ের মতন মনে হয়।'

('তির্যক', 'কৃত্তিবাস', অষ্টম সংকলন ১৯৫৭)

স্বগতোক্তি, প্রশ্নাত্মক ভঙ্গি আর নিষেধাত্মক শব্দ সমাবেশ শক্তির কবিতার বিশেষত্ব। দেওয়া হল দুটি উদাহরণ—

১. 'আমার ভাবনা হলো বিশাল বাগান
কেমন করে মনে রাখবে
প্রতিটি গাছে পাখিরা আসছে, প্রতিটি দুঃখ
আলোর মান্য উষ্ণতায় মেওয়া ফলের মতন স্বাদু

('বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে')

২. 'আমার ফুল ফুটবে তুমি সৌরভ পাবে না
পুকুর ভাসবে সবুজ পানায় নিরুৎসুক দৃষ্টিতে
মুখ আমার ভাসবে আলোর গৌরব পাবে না।'

('অতিজীবিতঃ')

অনুবাদ কবিতা :

দেশবিদেশের প্রচুর কবিতা অনুবাদ করেছেন শক্তি। কিন্তু তাঁর কবিতা সর্বদা মূলের একান্ত অধীন নয়। অনুবাদ যে পুনরায় নির্মাণ—এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর অনুবাদে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

১.　　'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষুবসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।।'

শক্তি লিখেছেন—

'কুবের অভিশাপে মহিমা গেল খোয়া বিরহভার হলো দুরূহ
যক্ষ একাকী সে না-কাজ ফল দোষে পেলেন গুরু এই শাস্তি
বসতি রামগিরি, যেখানে ছায়া দেয় নিবিড় নীল ওই তরুগণ
যেখানে ধারাজল পুণ্য হয়ে আছে জনকতনয়ার স্পর্শে।'

ছোটোদের জন্য ছড়াও লিখেছেন শক্তি। এমনই একটি গ্রন্থ 'মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয়' থেকে উদ্ধৃত হল একটি নমুনা—

'বিল্টু ছিলেন ওকলাহোমায়, বিল্টু আছেন দুলিয়াজান
হেলিয়া দুলিয়া হাঁটেন বিল্টু—মুখে ভরিয়া তাম্বুল পান..'

শক্তি শক্তিমান কবি ছিলেন, এবং কবিতাই ছিল তাঁর প্রাণ—এ আলোচনা সে-সত্যই প্রমাণ করে।

১.২৮ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৩৪-এর ৭ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে (বাংলাদেশ) সুনীলের জন্ম। দেশভাগের পর তাঁর পরিবার চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। তাই শিক্ষারম্ভ গ্রামের বিদ্যালয়ে হলেও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৯৫০-এ কলকাতার টাউন স্কুল থেকে। ১৯৫২-তে দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে আই. এস. সি পাশ করেন। সাম্মানিক অর্থনীতি সহ স্নাতক হয়েছিলেন তিনি আমহার্স্ট স্ট্রিট সিটি কলেজ থেকে ১৯৫৪-তে। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সুনীল। এর আগেই অবশ্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য নিগমের অধীন সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরস-এ কেরানির চাকরি পেয়েছিলেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি এ কাজ করেন। ১৯৭০-এ তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সাংবাদিকতা শুরু করেন। এ কাজেই তিনি এখন পর্যন্ত যুক্ত আছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই বাংলা সাহিত্যের সেই লেখক যিনি গদ্য সাহিত্য ও কবিতায় সমান পারদর্শী।

তাঁর কবিতা-সংকলনের সংখ্যা প্রায় চব্বিশ।

কবিতা-সংকলন :

১)　'একা এবং কয়েকজন', ১৯৫৭
২)　'আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি', ১৯৬৫
৩)　'বন্দী জেগে আছো', ১৯৭৪
৪)　'আমার স্বপ্ন', ১৯৮০
৫)　'সত্যবদ্ধ অভিমান', ১৯৮২
৬)　'জাগরণ হেমবর্ণ', ১৯৮৩
৭)　'সোনার মুকুট থেকে', ১৯৮২
৮)　'স্মৃতির শহর', ১৯৮৩
৯)　'স্বর্গনগরীর চাবি',

১০) ‘স্মৃতির চাবি’,
১১) ‘সাদা পৃষ্ঠা তোমার সঙ্গে’, ১৯৮৬
১২) ‘বাতাসে কিসের ডাক শোনো’, ১৯৮৭
১৩) ‘চল যাই’, ১৯৮৮
১৪) ‘হঠাৎ নীরার জন্য’ ১৯৮৮ ৭ম সং
১৫) ‘নীরা হারিয়ে যেওনা’, ১৯৮৯
১৬) ‘দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়’, ১৯৮৯
১৭) ‘অন্য আমি’, ১৯৯২
১৮) ‘এ জন্মের দেখাশোনা’, ১৯৯৪
১৯) ‘রাত্রির রঁদেভু’, ১৯৯৫
২০) ‘মন ভালো নেই’, ১৯৯৬
২১) ‘সেই মুহূর্তে নীরা’, ১৯৯৭
২২) ‘সবচেয়ে সেই মধুর শব্দ’, ১৯৯৭
২৩) ‘সুন্দরের মন খারাপ মাধুর্যের জ্বর’, ১৯৯১
২৪) ‘এসেছি দৈর্ব পিকনিকে’, ১৯৯৮
২৫) ‘ভালোবাসা খণ্ড কাব্য’, ২০০১

অনুবাদ : অন্য দেশের কবিতা

ছড়া—‘আ—আ—চৈ—চৈ’, ১৯৯২

সতেরো বছর বয়সে ‘দেশ’ পত্রিকার ১৯৫১-র ৩১ মার্চ সংখ্যায় মুদ্রিত ‘একটি চিঠি’ কবিতা দিয়ে তাঁর কবিজীবনের সূচনা। নির্ভুল ছন্দে রচিত রোমান্টিক কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত হল—

‘হিংস্র নখর এখনো লুকোয় বাঁকে-বাঁকে
সরল কুমারী বোবা চোখে শুধু
চেয়ে থাকে।
সমুদ্র-ঝড় আসেনি এখনও মনে-মনে
বলাকা-হৃদয় এখনও কি শুধু দিন গোনে।’

খুব অল্প দিনের মধ্যে তাঁর পরের পাঁচটি কবিতা মুদ্রিত হয় ‘অগ্রণী’, ‘শতভিষা’, ‘কবিতা’ এবং ‘দেশ’-এ। চতুর্থ কবিতাটি আবু-সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত ‘পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা’য় সংকলিত হওয়ায় সুনীল সহজেই বিখ্যাত হয়ে যান।

সুনীলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, বন্ধু দীপক মজুমদারের সঙ্গে ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা (১৩৬০-এর শ্রাবণ) প্রকাশ। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তরুণ কবি আনন্দ বাগচী। এঁদের প্রেরণা দিয়েছিলেন সিগনেট প্রেস-র দিলীপকুমার গুপ্ত। শুরু থেকে এ পত্রিকার লক্ষ্য ছিল বাংলা কবিতায় বলিষ্ঠতা আর নতুন উত্তাপ সঞ্চার। পঞ্চাশের কবিরা সুনীলের পরিচালিত ‘কৃত্তিবাস’-এ কবিকর্মের যাবতীয় পরীক্ষার একটি সুন্দর স্থান পেয়েছিলেন। কবিতার ভাষা, অবয়ব নির্মাণ, ছন্দ—সব কিছুতেই এঁরা অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। ১৯৬২ সালে মার্কিন বিটনিক গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কবি অ্যালেন গিনসবার্গ আসেন ভারতে। তাঁর সঙ্গে ‘কৃত্তিবাস’ গোষ্ঠীর কবিদের সম্পর্ক হয় নিবিড়। ফলে তাঁদের জীবনে এবং কবিতায় দেখা দেয় উন্মত্ত উন্মার্গগামিতা। যা কিছু শোভন, ভদ্র বলে এতকাল পরিচিত

ছিল—সে সব কিছুকেই তাঁরা আঘাত করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে পরে কিন্তু বাংলা কবিতা অনেক ঋজু, বলিষ্ঠ এবং সাহসী হয়ে ওঠে। ১৯৬৩-৬৪ এই সময়টিতে সুনীল আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কবি-কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন। ফলে বিশ্ব-কবিতার আধুনিক রূপ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হয় বিস্তৃত। এ সবের দূরপ্রসারী ফল হিসেবে বাংলা কবিতা সুনীলের লেখনীতে হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাচারী, বেপরোয়া।

সুনীল নিজে বলেন তাঁর কবিতা 'স্বীকারোক্তিমূলক'। বস্তুত ব্যক্তি-অনুভূতিকেই তিনি কবিতায় ব্যবহার করেন। ফলে প্রায়শ তাঁর কবিতায় এসে যায় 'আমি' এই সর্বনাম। রোমান্টিক এবং সৌন্দর্য-পিপাসু তাঁর মন। তার সঙ্গে রয়েছে আবেগের প্রবলতা আর জীবনপ্রীতি।

তাঁর অনেক কবিতার কেন্দ্র নারী। 'দ্বারভাঙা জেলার রমণী' এমন একটি কবিতা—এখানে নারীকে তিনি বিশ্বের চালিকা শক্তি হিসেবে দেখেছেন—তখন সর্বনাশের কাছে সৃষ্টি হাঁটু গেড়ে বসে আছে তখন বিষণ্ণতার কাছে অবিশ্বাস তার আত্মার মুক্তির মূল্য পেয়ে গেছে। সব ধ্বংসের পর শুধু দ্বারভাঙা জেলার সেই রমণী সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো কেন না ঐ মুহূর্তে সে মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল।''

আবার নারীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে কবির প্রবল প্রেম। নারী—শব্দটির বিন্যাস পালটে নিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন 'নীরা' নামের চরিত্রটিকে, এই মেয়েকে তিনি পেতে চেয়েছেন বার বার নানাভাবে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার প্রেমের কবিতায় সুনীল চাইতেন রক্তমাংসের উত্তাপ। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিতে প্রায়শ প্রেমের আর সুন্দরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে।

'ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ
সত্যবদ্ধ অভিধান—চোখ জ্বালা করে ওঠে
                    সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে ভালোবাসি
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?'

এরই পাশে নারীকে কেন্দ্র করে জীবনের কৃষ্ণ, অন্ধকার, ভীষণ দিকটিও তাঁর কবিতায় উদ্ভাসিত—

'লুব্ধ প্রতিহারী তোমার উন্মুখ স্তনে মুখ দিয়ে গেলে
গুপ্ত বিষ, বিষ বিষ অন্ধকার বিষে ভরে যাক বাণী
ওরে বিষকন্যা তোর নগ্ন শরীরের দুলে ওঠা
মোহিনী মায়ায় অ্যারিস্টটলকে তুই ঘোড়া কর
প্রগাঢ় তামসে তোর নাচের উৎসব শুরু হোক।'

বিক্ষুব্ধ সৌন্দর্যের উপাসক সুনীল। প্রকৃতি-সৌন্দর্যকে তিনি দেখেছেন তুচ্ছ দৈনন্দিনতার মধ্যে—

'সুন্দরের এককণা দোল খায় এঁদো জলে কচুরিপানায়
তাজমহলের চেয়ে সেখানেও তাকে কিছু কম কি মানায়?
শুধু তো গোলাপ নয়, ঝরে পড়া শেফালির আশ্বিনের কাশে
গরিব ঘরের চালে হঠাৎ সে কুমড়োর ফুল হয়ে হাসে।'
                    ('সুন্দর আমার')

কখনও কখনও তাঁর কবিতা হয়েছে ভঙ্গিসর্বস্ব—

'অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় জীবন বদলে নিলাম আমি ও নিখিলেশ'
হাতঘড়ি ও কলম, পকেটবই, রুমাল—

রেডিওতে পাঁচটা বাজল, আচ্ছা কাল
দেখা হবে—বিদায় নিলাম।.......'

('জুয়া')

কখনও পাঠককে চমকে দিতে চেয়েছেন তিনি—

'শিয়রে পায়ের কাছে বই-বই-বই
তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।'

একাকীত্ব নাগরিক কবি সুনীলের কবিতার আর একটি বিশেষত্ব। এই সঙ্গীহীনতার বিষণ্ণতার সঙ্গে আছে তৃপ্তিহীনতার অন্তহীন যন্ত্রণা।

কী বিশাল ভাঙনের কিনারায় তুমি একা, মাথা ঘোরে,
চোখ ঘোরে
তুমি একা তুমি একা, চোখে জল, এত জল, চোখে জল,
হুহু জল'

('মায়া-সংসার')

হারানো অতীতের জন্য হাহাকার আছে তাঁর অনেক কবিতায়—

'যে সব নদী শুকিয়ে গেছে, মরে ভূত হয়ে হারিয়ে গেছে
যে সব আগাছা ভরা দুঃখী মাঠ উধাও হয়ে গেছে জনারণ্যে
ছেলেবেলায় শিউলি ফুল, কার্তিকে আটকানো ছেঁড়া ঘুড়ির ফর ফর শব্দ
কিছুই হারাতে দিতে ইচ্ছে করে না যেন সবাই ফিরে আসবে
অন্ধকার সুড়ঙ্গের আলো যেমন ফিরে আসে স্মৃতির মধ্যে।'

('মনে পড়ে যায়')

কবি সেই অতীতে ফিরতে পারবেন না, তাঁকে থাকতে হবে। এই 'বিশাল মহান গম্ভীর সুদূর শহর'-এ। সে জড়িয়ে যাবে তাঁর চেতনায়। এই মহান গাম্ভীর্যের নিকট তিনি 'নিবেদন' করেছেন তাঁর 'সোনার কৈশোর' আর 'স্বেচ্ছা-কণ্টকময় যৌবন'।

'এর পথে পথে রয়েছে আমার অজস্র ব্যাকুল চুম্বন
আর কোনো প্রতিদান চাই না
শুধু বাঁচতে দাও। বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো...'।

স্নিগ্ধ রোমান্টিক গীতিকবিতায় আবার ফুটে ওঠে কবি-মনের সৌন্দর্যতৃষ্ণা—

'এখনো কোনো দিন জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় আকাশ
আমার জন্য প্রতীক্ষা করে
নদী কিনারার মাটি প্রতীক্ষা করে আছে
আমার পদস্পর্শের।
ঘাসফুলটি হাওয়ায় দুলছে প্রতীক্ষায়
আমি তাকে ছিঁড়ে নেবো'।

(স্থির সত্য')

সমকালের স্বদেশ আর স্বসমাজের মানুষগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেনি সুনীলের সংবেদনশীল কবিমন। 'দুপুর' (নবম সংকলন 'কৃত্তিবাস' ১৯৫৭) তারই দৃষ্টান্ত। নারীর দীপ্ত মোহিনীরূপ মুগ্ধ করছে অসংখ্য যুবককে—

'রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা
এ যেন আলোরই শস্য দুপুরের অস্থির কুহক
অলিন্দে দাঁড়ানো মূর্তি ঢেকে দিল দু চক্ষুর সীমা
পথ চলতে থমকে গেল অপ্রতিভ অসংখ্য যুবক।'

শুধু রুক্ষ চুলের ক্লান্ত এক যুবককে নাড়া দিতে পারে না সেই রূপ। সে তখন তার অবশিষ্ট অর্থের হিসেব করতে ব্যস্ত। 'এ মাসেই চাকরি' হবে এই নিশ্চয়তার সুখই তাকে মগ্ন করে দিয়েছে। অর্থ যে আমাদের সমাজের ভিত্তি এ সত্য এখানে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ক্রমে তাঁর অনুভবের গণ্ডি হয় বিস্তৃত। বিপন্ন মানুষের বেদনা অনুভব করেন তিনি। নিরুপায় নিরন্ন মানুষকে দেখে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা ক্রোধে ফেটে পড়ে—

'আমি রাজনীতি-ফিতি বুঝি না। আমি সইতে পারছি না ঐ
তিনজন মানুষের নিঃশব্দে বসে থাকা

আপন সমাজের বাইরে আহত মানবতার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চান তিনি। শক্তিলোভীর হননোৎসবের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে পারেন—

'সাবধান!
মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না।
সাবধান! মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না।'

('তিনজন মানুষ' : 'আমার স্বপ্ন')

তাঁর কবিতার ভাষা প্রাঞ্জল, ঋজু গদ্যধর্মী। সহজ কথোপকথনের দৈনন্দিন গদ্যকেই তিনি করে তুলেছেন কবিতার ভাষা। নাটকীয়তা আছে তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে। ক্বচিৎ কাহিনির ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর কবিতায়।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে তিনি লিখেছেন অনেক কবিতা—

'বহু রকমের চাবি, বন্দি হয়ে আছে এই ঘর
দেরাজ, আলমারি, বাক্স, বস্তুর সমস্ত স্পর্ধা।
দমন করেছে এই
কটিমাত্র পিতলের চাবি
মাঝে মাঝে ভাবি আমি, চাবিরও কি প্রাণ আছে নাকি'?

('চাবি')

স্বরবৃত্ত ছন্দেও তিনি লিখেছেন কিছু কবিতা—

'শিরীষ গাছে রোদ লেগেছে
শিরীষ কোথায় মরুভূমি!
বিকেল নয়, তবু আমার
বিকেল বেলার ক্ষুৎপিপাসা.....'

('তোমার কাছেই')

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে সুনীল আপন স্বতন্ত্রতায় দীপ্ত এক শিল্পী-ব্যক্তিত্ব।

১.২৯ বিনয় মজুমদার

ব্রহ্মদেশে ১৯৩৪-এর ১৭ সেপ্টেম্বর বিনয় মজুমদারের জন্ম। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ঠাকুর নগর, শিমুলপুরে।

তাঁর স্কুলজীবন শুরু হয় বৌলতলি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ১৯৪৬-এ। থাকতেন স্কুল বোর্ডিং-এ। ১৯৪৭এ বিদ্যালয় পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতা থেকেই তাঁর কবিজীবনের শুরু।

১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে তিনি কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন-এর বউবাজার ব্রাঞ্চে ভরতি হন। এখানেও থাকতেন মেস বা বোর্ডিং-এ। এখান থেকে ১৯৫০-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে তিনি ভরতি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। থাকতেন ইডেন হিন্দু হস্টেলে। এ সময় তাঁর পরিচয় হয় আধুনিক কবিতার সঙ্গে, আলাপ হয় কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ ও সিগনেট প্রেস-খ্যাত দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে। কবিতা লেখা চলছিল তাঁর। কিন্তু মুদ্রণ ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না তিনি।

১৯৫১-তে গণিত নিয়ে আই.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে শিবপুর বি.ই. কলেজে ভরতি হন বিনয়। এসময় তাঁর কিছু কবিতা ব্যবসায়িক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তিনি মাদাম গুয়েভার নিকট রুশ ভাষা শেখেন। চার বছর পর বি. ই. পাশ করেন (সম্ভবত ১৯৫৬ সালে) বিনয়।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৫৮ সালে কলকাতার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক হিসেবে। এ সময় অনেক তরুণ কবির সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয় তাঁর একটি ক্ষুদ্র কবিতা-সংকলন 'নক্ষত্রের আলোয়'। ১৯৫৯-এ তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করে কেবলমাত্র পাঠ ও কবিতা রচনায় মন দিয়েছিলেন পরে অবশ্য তিনি আবার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি অধ্যাপনা করেছেন ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ, সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ। তিনি 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ও 'যুগান্তর'-এর সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন কিছুকালের জন্য। দুর্গাপুর আয়রন অ্যান্ড স্টিল ফ্যাকটরির সুপারভাইজার হিসেবেও কয়েক বছর কাজ করেছিলেন তিনি। মোট এগারোটি কবিতা-সংকলন আছে তাঁর। যথা—

১) 'নক্ষত্রের আলোয়', ১৯৫৬
২) 'গায়ত্রীকে', ১৯৬১
৩) 'ফিরে এসো চাকা', ১৯৬২
৪) 'আমার ঈশ্বরীকে', ১৯৬৪
৫) 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী', ১৯৬৫
৬) 'অধিকন্তু'
৭) 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা', ১৯৭৪
৮) 'বাল্মীকির কবিতা', ১৯৭৬
৯) 'আমাদের বাগানে', ১৯৮৫
১০) 'এক পঙ্‌ক্তির কবিতা', ১৯৮৫
১১) 'আমাকেও মনে রেখো', ১৯৯৫
১২) 'এখন দ্বিতীয় শৈশব', ১৯৯৯

এছাড়া তিনি কয়েকটি ছোটো গল্প, কয়েকটি প্রবন্ধ-সংকলন এবং অনুবাদ গ্রন্থ (রুশ ভাষা ও ইংরেজি থেকে)-ও রচনা করেছেন।

কাব্য-বিশেষত্ব : স্ববৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিনয় মজুমদারের কাব্যজগৎ। কবিতায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁর নিভৃতসত্তা। অনেক সময় তাঁর কবিতায় জীবনানন্দের মতো প্রবল বিষণ্ণতার প্রকাশ লক্ষিত হয়। তাঁর প্রথম দিকের কবিতাগুলি দুঃখময় এক জগৎ নির্মাণ করেছে। এর মূলে ছিল হয়তো ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতার বেদনা—

'কাগজ কলম নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা প্রয়োজন আজ,
প্রতিটি ব্যর্থতা, ক্লান্তি কী অস্পষ্ট আত্মচিন্তা সঙ্গে নিয়ে আসে।
সতত বিশ্বাস হয়, প্রায় সব আয়োজনই হয়ে গেছে, তবু
কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না এখনও।'

('ফিরে এসো চাকা')

চিন্তাশীলতা জড়িয়ে গেছে তাঁর কবিতার অবয়বে—

'সকল ফুলের কাছে এক মোহময় মনে যাবার পরেও
মানুষেরা কিন্তু মাংস রন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'

('ফিরে এসো চাকা')

প্রথম যুগে তাঁর কবিতার মূল বিষয় ছিল প্রেম। প্রেমের বেদনায় আপ্লুত ছিল তাঁর পৃথিবী। দেহবাসনা ও দেহউত্তীর্ণ প্রেমের চেতনা আছে তাঁর প্রথম যুগের কবিতায়—

'আমার কোলের চেয়ে বেশি উচ্চ সম্মানিত কোনো
আসন এ বিশ্বে নেই, আর সে আসন ঈশ্বরীর।'

কখনও তিনি অনুভব করেন 'নিখিল কোমলতার মতো তুমি শুয়ে থাকো বুকের ওপরে।'

ক্রমে এই শরীর-কামনা চলে গেছে কামুকতার পর্যায়ে। হয়তো কবির অবচেতনায় নিহিত ছিল এ বাসনা। তিনি স্বীকার করেন—

'কোনো রচনা বা বিষয়ের
বিভিন্ন নিগূঢ় অর্থ করার প্রচেষ্টা করে গেলে
বিভিন্ন অর্থের রূপে অবচেতনার কথাগুলি
মাঝে মাঝে দেখা দেয়, ফলে দেখি বিশ্বময় যোনি',

এ বর্ণনাকে অশ্লীল বলা যায় কি? কারণ কবির নিগূঢ় বেদনার আভায় উজ্জ্বল এই পঙ্‌ক্তিগুলি।

চলে গেছে প্রেমিকা, বিরহী তাঁর সত্তার আকুলতা ধ্বনিত হয়েছে এই আহ্বানে—

'আমি মুগ্ধ, উড়ে গেছো ফিরে এসো, ফিরে এসো চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো অবয়বহীন
সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল অকাশে।'

এ-আহ্বানের পরে ইন্দ্রিয়লিপ্সা প্রবল হয়েছে—

'খেতে দেবে অন্ধকারে—সকলের এই অভিলাষ।
কে জানে কী ফল কিংবা মিষ্ট দ্রব্য কোনো—
বয়স্কা, অনূঢ়া, স্ফীত, কিন্তু হয়ে আমার রমণী
বয়স্কা ভালোবাসে, পূর্বাহ্নেই রূপে ঘ্রাণে, রসাপ্লুত হতে।'

আবার এর সঙ্গে আছে সরল প্রেমের শুদ্ধতা, প্রেমের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন নিখিল ভুবনকে—

'সর্বত্র বিরাজমান; বিশ্বের সকল কিছুতেই
রূপ ও প্রকৃতি হয়ে আছি দুজনেই।'

দেবতাদের সঙ্গে সম অবস্থান এই প্রেমের—

'একাই সকল কিছু অধিকন্তু রয়েছেন দেবদেবীগণ।'

এভাবেই ব্যক্তিপ্রেম থেকে তিনি পৌঁছে গেছেন বিশ্বপ্রেমে এবং ঐশ্বরিক পবিত্রতার অনুভূতিতে—

'দেহহীন সব সত্তা পক্ষপাত প্রীত তারকারা
সময় আকাশে আলো ঐশ্বরিক প্রতিভায় জ্বলে
বিশ্বের প্রতিটি বস্তু তাঁদের পবিত্র প্রতিষ্ঠায়
পৃথিবীতে আজ এক বিস্ময় সঞ্চার করে চলে।'
('আমাদের দ্বৈতচিন্তা')

বিশাল বিশ্বের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমের অনুভূতি। তিনি মনে করেন একদা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে ছিল মানুষ। আজ সে বিচ্ছিন্ন, তাই সে রিক্ত আর ব্যথাদীর্ণ তার মন—

'তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু,
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।'

তিনি বিশ্বাস করেন প্রেম ও প্রকৃতির সহাবস্থানে 'শাশ্বত, সহজতম এই দান'—শুধু অঙ্কুরের উদ্‌গমে বাধা না দেওয়া, নিষ্পেষিত আলোকে রেখে ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণ না করে শ্যামল হতে দেওয়া।

ক্রমে তাঁর মন হয়েছে পরিবর্তিত; প্রেমের আবেগ থেকে তিনি পৌঁছে গেছেন দার্শনিকতার নৈর্ব্যক্তিকতায়। জীবনের গাণিতিক সূত্র খুঁজতে চেয়েছেন তিনি। চেয়েছেন তত্ত্ব ও জীবনের সমীকরণ।

'সকল কিছুরই কিছু নাম আছে, মানে থাকে
মানে নেই—দুরকম কিছু
স্বাভাবিক প্রকৃতিতে কখনো সম্ভব নয়, সৃষ্টি হলে
মানে হয়ে যায়
আপনিই এসে যায় সৃষ্টির গভীরে,
এক আরো গভীরতা হয়ে আসে—
এমনিই কিছু আসে, সে যাই আসুক তাই সে সৃষ্টির
আপনার মানে।'

অঘ্রাণের অনুভূতিমালা' কবিতা-সংকলনে আছে বিশুদ্ধ আবেগের সরলতা। এই সরলতা এসেছে পূর্বের ব্যর্থ প্রেম এবং প্রবল দেহবাসনার ফল হিসেবে। কবি হয়ে উঠেছেন শিশুর মতো সরল প্রকৃতির মতো শুদ্ধ। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতাকে তিনি করে তুলেছেন বিমূর্ত। পাঠক সহজেই যুক্ত হতে পারেন কবির আবেগের সঙ্গে। শিল্প যে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং সাধারণ, সে সত্য উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতায়—

'সত্য ও সুন্দর সব মনে নিয়ে আমাদের মনের আলোকে
সচেতন চিন্তা থেকে উভয়ের সচেতন কামনা থেকেও
যেন ভবিষ্যতে বস্তু জন্ম পায় এবং বিলয়প্রাপ্ত হয়

যেন মহিমার মতো ঈশ্বরী ও ঈশ্বরদের ঐশ্বর্যের
মতো হয়ে যায়।'

এমন করেই কবির অনুভূতি আর পাঠকের পাঠ—উভয়ের মিলনে গড়ে ওঠে কবিতা। বিনয়ের মতে কবিতার বিষয় আসে বাস্তব থেকে। কবি সেই বাস্তবকে নিজস্ব দর্শনে জারিত করে নির্মাণ করেন কবিতা। কবিতাকে তিনি মনে করেন বিশ্বজনীন এবং আনন্দের উৎস।

'সেতু চুপে শুয়ে আছে, সেতু শুয়ে আছে তার ছায়ার উপরে
ছায়া কেঁপে কেঁপে ওঠে থেকে থেকে জয়ী হওয়া সেতুর বাতাসে
সকল সেতুর মতো এখানেও এই প্রান্তে কুসুম ফুটেছে
সুন্দর সুঘ্রাণ ফুল, ও প্রান্তের কুসুমের ঘ্রাণ ভেসে যায়।'
('অঘ্রাণের অনুভূতিমালা')

বহির্দৃশ্য এখানে লাভ করেছে অন্য ব্যঞ্জনা।

ক্রমে বিনয় প্রকৃতি-ভাবনার মাধ্যমে পৌঁছে যান এক দার্শনিক উপলব্ধিতে—

'পাখিদের থেকে সব পাখি জন্মে, আলোকের থেকে জন্মে সকল আলোক
এর বিপরীতভাবে পাখি যদি মরে যায় তবু সেই মৃতদেহ-পাখি,
গাছ যদি মরে তবে যা থাকে তা—তাও গাছ মৃত বলে অন্য কিছু নয়।'

জীবন আর সত্তার অবিনশ্বরতা এভাবেই রূপ লাভ করে বিনয়ের কবিতায়। শরীর হয়ে ওঠে বিশ্বব্যাপ্ত চেতনার আধার। তাঁর মনে হয় তিনি বিচ্ছিন্ন নন—বিশ্বের সঙ্গে যোগ রয়েছে তাঁর—'আমি নিজে একা এই আলো ব্যোম ও সময়।' এই সময়ে বিনয়ের কবিতা পাঠককে পৌঁছে দেয় এক প্রত্যয়ে। মানুষ সঙ্গীহীন হতে পারে, কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে রয়েছে তার যোগ ও সম্পর্ক। এই বোধে পৌঁছে বিনয় হয়ে ওঠেন এক তত্ত্ববিশ্বের নির্মাতা।

নির্মাণ শিল্প—

উপমা ব্যবহারের ঝোঁক ছিল বিনয়ের—

'ফুল নয়, চাঁদ নয়, মহিলার দেহস্থিত মন
অতি অল্পকালে যদি বিকশিত হয় তবে হয়
না হলে কাঁটার মতো বিঁধে ফের কিছু ভেঙে থাকে।'

চিত্রকল্প নির্মাণেও ছিল তাঁর কুশলতা—ব্যক্তিহৃদয়ের শূন্যতা নীচের চিত্রকল্পে হয়ে উঠেছে অনুভবগম্য—

'আমি বৃক্ষ রোগশয্যা পরিত্যক্ত
টিপয়ের মতো জীর্ণ ধূলিম্লান।'

প্রথমে বিনয়ের পক্ষপাত ছিল মিশ্রবৃত্ত ছন্দের প্রতি—

'নেই কোনো দৃশ্য নেই, আকাশের সুদূরতা ছাড়া
সূর্যপরিক্রমারত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে শুধু

ধূমকেতু প্রকৃতই অগ্নিময়ী, তোমার প্রতিভা
স্বাভাবিকতায় নীল, নর্তকীর অঙ্গ সঞ্চালন
ক্লান্তিকর নয় বলে নৃত্য হয় যেমন তেমনি’
('ফিরে এসো চাকা')

শব্দব্যবহারে অতীব সতর্ক ছিলেন তিনি। প্রাচীন শব্দ যে পাঠককে চমৎকৃত করে এটা জানা ছিল তাঁর। ফলে অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ রয়েছে তাঁর কবিতায়—

‘অঘমর্ষী মানুষের মতো
সেও আজ তপস্যায় রত।’

‘অঘমর্ষী’ শব্দের অর্থ যে দোষ ক্ষমা করে। তাঁর জানা ছিল অবস্থানের সামান্য পরিবর্তনেই চেনা শব্দ হয়ে ওঠে আশ্চর্য সুন্দর—তাই প্রবল বাতাসের পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেন ‘প্রখর বাতাস’। ‘শুভ্র সাগর-হংসীর গান’ না লিখে তিনি লেখেন ‘সাগর হংসীর শুভ্র গান’।

এই শব্দব্যবহার-সচেতনতা, নির্মাণ নৈপুণ্য তাঁর অনুভূতিঋদ্ধ রচনায় অন্বিত হয়েছে অনায়াসে। ফলে বিনয় মজুমদার হয়ে উঠেছেন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং স্বতন্ত্র।

১.৩০ অমিতাভ দাশগুপ্ত

১৯৩৫-এর ২৫ নভেম্বর। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরে (বর্তমান বাংলাদেশ) জন্ম হয় অমিতাভ দাশগুপ্তের ওখানেই ঈশান ইনস্‌টিটিউশন বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর শিক্ষা। পরে কলকাতার টাউন স্কুলে ভরতি হন। কারণ দেশভাগের ফলে তাঁদের পরিবার তখন কলকাতার অধিবাসী। ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। আই.এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। সাম্মানিক বাংলা নিয়ে তিনি ওই কলেজ থেকেই স্নাতক হন ১৯৫৫ সালে। তার সঙ্গে বরাহনগর স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে সি.এ.বি. লিগের প্রথম ডিভিশনে বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে খেলেছিলেন। এই সময়ে তিনি অসুস্থ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জীবৎকালে মুদ্রিত শেষ উপন্যাস) ‘হলুদ নদী সবুজ বন’ শ্রুতিলিখন শুরু করেন।

কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক কর্মাদি :

১৯৫৬ সাল বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন অমিতাভ। ১৯৫৭-এ তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ওই বছরেই তাঁর প্রথম কারাবরণ। মুক্তির পর জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন।

১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন অমিতাভ। ওই বছরেই অনুরাধা সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৬১ থেকে ১৯৬১—এই এক বছর তিনি ধানবাদের পি. কে. কলেজে অধ্যাপনা করেন। জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে তাঁর অধ্যাপনা কাল ১৯৬১-১৯৬৯। এই সময়ে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে আনন্দচন্দ্র কলেজের ছাত্রগণ সহ তিনি জেলে গিয়েছিলেন। ১৯৬৯-এ সেন্ট পল্‌স কলেজের বাংলার অধ্যাপক পদে যোগ দিয়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। এই সময়ে তিনি 'কালান্তর', 'পরিচয়'—পত্রিকাদুটির সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৭১-এ নকশাল আন্দোলনের ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিকালে তাঁকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৮৬-এ তিনি হন 'পরিচয়'-এর সম্পাদক। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগের প্রধান রূপে সেন্ট পল্‌স কলেজ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

এযাবৎ তাঁর ষোলোটি কবিতা-সংকলন এবং পাঁচটি অনুবাদ কবিতা-সংকলন মুদ্রিত হয়েছে।

গ্রন্থ তালিকা :

১) 'সমুদ্র থেকে আকাশ', ১৯৫৭

২) 'মৃত শিশুদের জন্য টফি', ১৯৬৪

৩) 'মধ্যরাত ছুঁতে আর সাতমাইল', ১৯৬৭

৪) 'মৃত্যুর অধিক খেলা', ১৯৭২

৫) 'বারুদ বালিকা', ১৯৭৮

৬) 'আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও', ১৯৮৪

৭) 'এসো, স্পর্শ করো', ১৯৮৬

৮) 'ক্ষমা, কাকে ক্ষমা', ১৯৯২

৯) 'আগুনের ডালপালা'

১০) 'কয়েকটি কবিতা', ১৯৯৩

১১) 'ছিন্নপত্র নয়, ছেঁড়া পাতা', ১৯৯৫

১২) 'আমার নীরবতা, আমার ভাষা', ১৯৯৮

১৩) 'এসো রাত্রি, এসো হোম', ১৯৯৯

১৪) 'নীল সরস্বতী', ২০০০

১৫) 'এত যে পাতাল খুঁড়ছি', ২০০১

১৬) 'দ্রাবিড় শর্বরী', ২০০১

১৭) 'অগ্নিবিষয়ক সতর্কতা', ২০০১

অনুবাদ :

১) 'লোরকার কবিতা' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে)

২) 'ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কবিতা', ১৯৮৫

৩) 'লোরকার শ্রেষ্ঠ কবিতা' (কবিতা সিংহের সঙ্গে), ১৯৯০

৪) 'শেক্‌সপিয়রের 'ভিনাস ও অ্যাডোনিস', ১৯৯১

৫) 'মাও-জে-দঙ-এর কবিতা'

কাব্যজীবন ও কবিতা-বিশেষত্ব :

ভাল কবিতা লিখতেন মা। জননীর নিকটেই তিনি পেয়েছিলেন কাব্য প্রেরণা। ছাত্রজীবনেই কমিউনিজম তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুত বামপন্থী রাজনীতি এবং কবিতা রচনা প্রায় সমভাবে প্রাণিত করেছে তাঁর কবিসত্তাকে। কলেজে পড়ার সময় ফরাসি কবি বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭)-এর ফ্ল্যর দ্যু ম্যল (ক্লেদজ কুসুম) থেকে তিনি অনুবাদ করেন কয়েকটি কবিতা। সেগুলির একটি 'লা সাপ্লন' ('ক্লান্তি') ১৯৫৪-তে 'দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এরপরে তিনি সাহিত্যসাধনায় বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পাঠ গ্রহণের জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে চলে আসেন সিটি কলেজে। এখানে পরিচয় হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, ফণিভূষণ আচার্য প্রমুখ তরুণ কবিদের সঙ্গে। সহপাঠী রূপে পরিচিত হন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু এই কবিদের সান্নিধ্য তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। দলীয় রাজনীতিও ছায়া ফেলেনি তাঁর রচনায়। আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল তিনি। তাঁর মতে কবিতার বিষয় আর রচনাভঙ্গিমা সম্পূর্ণত কবির ইচ্ছাধীন। যে-কোনো উপলব্ধি থেকে হতে পারে কবিতার জন্ম—এই তাঁর বিশ্বাস।

তাঁর কবিতায় রয়েছে বিষয়বৈচিত্র্য এবং ভাষাবৈচিত্র্য। প্রবল শারীরিক বাসনাময় প্রেমের কবিতা তিনি লিখেছেন; আবার সমকাল, সমসমাজ আর স্বদেশবাসী সম্পর্কে তাঁর অনুভব রূপলাভ করেছে কবিতায়। কল্পনাশক্তির বিচিত্রতা তাঁর কবিতার অবয়বে এনেছে অভিনবত্ব। পুরাণ বর্ণিত বিষয় নতুনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

> 'রাজ যায়, পাট যায়, কৃষ্ণ তবু এই শতরঞ্চ খেলা
> এর বুঝি শেষ নেই, মেঘে মেঘে যায় কত বেলা
>
> * * * *
>
> জীবনের অগস্ত্য পিপাসা শুধতে গিয়ে পাণ্ডবের দেনা
> পাঞ্চালীরই শাড়ি যায়। যুধিষ্ঠির নিয়মিত
> হেরে চলে সৌভাগ্যের পাশা।'
>
> ('শতরঞ্চ' : 'সমুদ্র থেকে আকাশ' ১৯৫৭)

অর্থনৈতিক অসহায়তা কীভাবে মনুষ্যত্বকে হত্যা করে তার বিষাদ করুণ চিত্র 'নারীমেধ' কবিতায় পাই। কবির সমকাল-সচেতনতার পরিচয় বা এই কবিতাটি রয়েছে 'মৃত্যুর অধিক খেলা' গ্রন্থে। নিচের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে তা—

> ''ছিটের বেড়ার ঘরের পাশে
> সাপের শিসের শব্দ।
> বোনের ঘরে গিয়েছিলাম
> বোনের ঘর ফাঁকা
> দিদির ঘরে ফাঁকা।
> বাপের ঘরে ঢুকতেই দেখি,
> প্যারালিটিক দুহাতে তাঁর—
> আঁজলা-ভরা টাকা।''

সম-সমাজের নিরুপায় মানুষগুলির বেদনা আলোড়িত করে তাঁকে। কিন্তু তার ফলে কবিতা হারায় না তার ব্যঞ্জনাশক্তি—

'সমুদ্র পারে না ধুতে এত কালো জমেছে সংসারে।
বৈকুণ্ঠবাসিনী জায়া
এক ছেলে ফেরার, বাপ অন্ধ। চটকলের দরজায়
তালা ও পুলিশ। ছোটো বোন
মুদ্রানাগরের বাড়ি।
জননী পাথর।'

কিছু ব্যবসায়ীর নিষ্ঠুর অমানবিক লোভ কেমন করে ধ্বংস করে দেয় সংসারের পর সংসার—এই নগ্ন সত্য কবি সহ্য করতে পারেননি। তাঁর প্রতিবাদ এভাবেই রূপায়িত। বিশেষত শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তির অসামান্য ব্যঞ্জনা, কবির রচনানিপুণতার পরিচায়ক।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের অমানবিক ক্ষণগুলি এড়িয়ে যেতে পারেননি তিনি। তাঁর নিরুপায় ক্রোধ কবিতায় আত্মপ্রকাশ করে—

'বেলচির হরিজন নাগমতী
আজ প্যারামাউন্ট সার্কাসের—
প্যারাগন গোলাপসুন্দরী—
আহ্ গুলি মারুন হরিজনে
হরিজন পুড়লে কি কখনো গোলাপের গন্ধ বেরোয়?
('আগুনের ভেলা' : 'মৃত্যুর অধিক খেলা')

নির্মম বাস্তবের এমন জীবন্ত শব্দরূপ দিতে পারেন খুব কম কবি।

মনুষ্যত্বের অপচয় আর অবমাননা ক্ষুব্ধ করে, ক্রুদ্ধ করে তাঁকে। কখনও বা সেই ক্রোধ জারিত হয় রাজনীতি চেতনায়। কিন্তু ব্যক্তি-অনুভূতি আর বিশ্বাসকে মূল্য দিতে পারেন বলেই তাঁর কবিতা কখনও হয়ে ওঠেনা ইশতেহার।

বিস্তৃত, বিপুল জীবন তাঁর কবিতার উৎস। সে জীবনের বঞ্চনা-দুঃখ সুখ কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তাই তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের অতীত-প্রীতি আর মানবিকতার দিকটি উপেক্ষা করতে পারেন নি। সে জীবনে তেমন সচ্ছলতা হয়তো ছিল না কিন্তু ছিল হৃদয়ের প্রসারতা—

'এক কেজি ব্যসন কিনে
এন্তার কুমড়ো ফুল ভাজা হত,
মৌরলা মাছের টক রাঁধত বৌ
এক বেঘতা এই ঘরে
খেয়ে শুয়ে গায়ে গত্তি লাগিয়ে
চলে যেতে তোমরা।'
('ছিল' : 'মৃত্যুর অধিক খেলা')

সমকালের রাজনৈতিক আর সামাজিক নানা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তিনি। কবিতায়ও স্থান পেয়েছে সেগুলি। কিন্তু কবি যে স্রষ্টা, অনুভবমন্থিত হৃদয় থেকে উঠে আসে কবিতা—একথা কখনও বিস্মৃত হননি

তিনি। কবির যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা কবিতার শরীরে জড়িয়ে থাকে। সত্যভাষণই কবিতার ধর্ম। বিপুল জীবনের শব্দময় রূপই কবিতা। প্রসঙ্গত আলোচনা করে নেওয়া যায় এরকম কিছু কবিতা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি লিখেছিলেন 'শাঁখা-ভাঙা হাত' ('নির্বাচিত কবিতা')।

'মা
তোমার শাঁখা-ভাঙা হাত দুটি কি দিয়ে সাজাবো?
রক্তের বেগার্ত ঢলে
ভাসে মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, পদ্মায় বেহুলা,
মর্টার গোলার পাশে
উঠে আসে মৃত্যুজিৎ কিশোরের খর করবাল'

একাত্তরের পশ্চিম বাংলায় যে হননোৎসব চলেছিল তার রূপ দিতে গিয়ে তাঁর ভাষায় একই সঙ্গে মিশে যায় বিদ্রুপ আর নিহতের প্রতি সহৃদয়তা।

'তোমার আত্মজ
কোন পুণ্যে অষ্টাবক্র
হিসেব মেলাতে নও রাজি,
যদি কাজি, মহামাত্য, নগর কোটাল
তোমার অজ্ঞতা নিয়ে খরসান অস্ত্র গড়ে
ভ্রুক্ষেপ বিহীন ছোড়ে ছুঁচলো গরম শিসা
এফোঁড় ওফোঁড়
মার্কসীয় নির্বাণে তাকে কতদূর, যেতে দেবে তুমি?
....
তোমার ছেলের হাতে বিষের নাড়ুর মত বোমা—
ক্ষমা? কাকে ক্ষমা?'

('ক্ষমা কাকে ক্ষমা?' : 'নির্বাচিত কবিতা')

কোনো উদাসীন আত্মমগ্নতা নেই তাঁর কবিতায়; মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতা।

তাই দেশ তাঁর কাছে—

'তিন খানা ইঁটে পাতা উনুনের আঁচে ফুটপাথে
গাঁওছুট বুড়ি
স্বপ্নে দেখছে দেশের ভিটায় লোক ঝমঝম
ভরা সংসার।
শহুরে রক্ত কারবাইডের জ্বালায় ক্ষিপ্ত
হা রে যৌবন,
এই সব কিছু মিলিয়ে আমার স্বদেশ
আমার রক্তমাংস,'

('স্বদেশ' : 'মৃত্যুর অধিক খেলা')

মতবাদকে তিনি মানুষের উপরে স্থান দিতে চাননি। তাই এ দেশের প্রাতিষ্ঠানিকতায় রূপান্তরিত কমিউনিজমকে তিনি বিদ্ধ করেন তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে :—

"এখানে মোপেড পাবে
মার্সিডিজ
বিলিতি সিগ্রেট।
লবণ হ্রদের জমি
দামি ফ্ল্যাট, সোনালি টিকেট
স্নেহধন্য পারমিট।
টেন্ডার ছাড়াই কন্ট্রাক্ট
কিন্তু পাওয়া যাবে না দিশি কুসুমের মত
লাল নিশানের স্বপ্ন
পাবে না লেনিন।'

('পাবে না লেনিন')

পূর্ব ইউরোপে যখন ভেঙে পড়ল সাম্যবাদী সরকারগুলি, সাম্যবাদ প্রায় মুছে গেল বিশ্বমানচিত্র থেকে তখনও নিরাশা গ্রাস করতে পারেনি অমিতাভকে। বরং তিনি খুঁজে বার করতে চেয়েছেন এই বিনাশের উৎসটিকে—

'সবটাই
এখন নতুন করে ভাবতে হবে।
এতদিন
মেপে মেপে
যে সব ছক আমরা তৈরি করেছিলাম
এখানে ওখানে
লক্ষণের গণ্ডী টানা হয়েছিল
যে দরজা জানালাগুলি
আমরা ভুলেও খুলিনি—
সেই ছক গণ্ডী দরজা জানালা
বাতিল করার সময় এসেছে কিনা।
সবটাই
এখন নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের।"

জীবনকে তিনি অভিজ্ঞতা আর অনুভব দিয়ে যাচাই করে নিতে চান। আত্মসমালোচনায় কুণ্ঠা নেই তাঁর। দৃঢ়বদ্ধ ঋজু গদ্যে তিনি বলতে পারেন—

'যাদের খুব কাছে
পৌঁছনোর কথা ছিল
তারা যে দূরে সে-দূরেই

যাদের শরীরের ভ্যাপসা পচা গন্ধে
ভরে যাচ্ছে চারপাশ,
তাদেরই কপালে রাজটিকা এঁকে
আমরা হাঁটছি তো হাঁটছি।'

প্রতিটি পদক্ষেপে যাদের লড়তে হয়েছে ন্যায়হীনতার সঙ্গে, স্বার্থপরতার সঙ্গে, সেই সংগ্রামীদের সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করেন কবি—

'আমাদের মুখের দিকে তাকাও
সেখানে
অজস্র শিকড়-বাকড়ের আঁকিবুকি।
নুন আর ঘামের রেখার ভেতরে পথ কেটে
নেমে গেছে
... ...
আমাদের কপাল
অজস্র সরু মোটা ভাঁজে ভাঁজে
লুকিয়ে রেখেছে
একটা দুনিয়া জোড়া যুদ্ধ।'

অন্য অর্থে বলা যায় অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ বার্ধক্যের সৌন্দর্য-মহিমাকে এইভাবে দেখেছেন কবি। এঁরা যেন ইতিহাস-পুরুষ। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির, প্রেমের সঙ্গে সংগ্রামের সংযোগ নির্মাণ করতে পারেন এঁরাই—

'পূর্ব আর উত্তরপুরুষের মাঝখানে
আমরাই তো সেতুবন্ধ'

ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে সর্বপ্রকারের শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী অমিতাভ—

'শব্দকে ফোটাতে চাই
কাঁড়া বা আকাঁড়া হোক
যেভাবে ভিক্ষার চালে টগবগ ফুটে ওঠে ভাত
এই জন্মভিখারীকে চিনে রাখো পথের মানুষ।'

সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে চান কবি। চেনাজানা জীবনের রূপ অনায়াসে ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায়। সাম্যবাদী দর্শনে দৃঢ় তাঁর বিশ্বাস। তাই আশাহীনতা তাঁকে গ্রাস করতে পারে না। তিনি জানেন—

'আজ নয়। কালও নয়
একদিন হবে।
সেদিন তুমি বা আমি কেউ থাকবো না
তবু হবে।'

১.৩১ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ-ভুক্ত কবি কারা? তাঁদের কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। মোহিতলাল মজুমদার-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-কাজী নজরুল ইসলাম—রবীন্দ্র-সমকালে কাব্যরচনা করলেও এঁরা ভাবনায় স্বতন্ত্র ছিলেন—উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে বিষয়টি আলোচনা করুন।

৩। 'কল্লোল' যুগ বলতে আমরা কী বুঝি? এই পর্বের কবিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন।

৪। জীবনানন্দ দাশের কাব্যধারার বিস্তৃত পরিচয় দিন।

৫। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বুদ্ধদেব বসু-অমিয় চক্রবর্তী-বিষ্ণু দে-র কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে পূর্বজ কবিদের তুলনায় এঁদের স্বাতন্ত্র্য দেখান।

৬। চল্লিশের দশকে কালপ্রেক্ষিতে বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি আলোচনা করুন।

৭। পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতায় ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রকাশই প্রধান হয়ে উঠল কেন বলে আপনার মনে হয়? এই পর্বের প্রধান দু-জন কবির জীবন ও কাব্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮। কবিতায় সমাজমনস্কতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পঞ্চাশের দশকের কোনো কোনো কবির লেখায়। উদাহরণ সহ এই দিকটি ব্যাখ্যা করুন।

৯। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা স্বদেশীয় হয়েও আন্তর্জাতিক। কয়েকজন কবির রচনার সাক্ষ্যে এই মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করুন।

১০। ভাষার নির্মাণ ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে একালের কবিরা পরম্পরা ও অভিনবত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আলোচনা করুন।

১১। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সমাজমনস্কতা ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির মিলন উল্লেখযোগ্য কাব্যরূপ পেয়েছে।—আলোচনা করুন।

১২। অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতায় জীবনচেতনার যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন।

১৩। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যুচেতনা এত বিস্তৃত রূপ পেয়েছে কেন বলে আপনার মনে হয়? আলোচনা করুন।

১.৩২ গ্রন্থপঞ্জি

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

২। অলোক রায়—সন্ধিক্ষণের কবিতা

৩। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—আধুনিক কবিতার ইতিহাস

৪। অশ্রুকুমার সিকদার—হাজার বছরের বাংলা কবিতা, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়

৫। দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়

৬। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা কবিতার কালান্তর

৭। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড

৮। সুমিতা চক্রবর্তী—জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল

একক ২ ❑ বাংলা উপন্যাস : প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্ব

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২.২.১ কালানুক্রমিক বিন্যাস

২.২.২ বিষয়ভিত্তিক বিভাগ

২.২.৩ শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট্য

২.৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২.৩.১ প্রভাতকুমারের উপন্যাস

২.৪ জগদীশ গুপ্ত

২.৪.১ জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস

২.৪.২ জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের বিষয়-বিভাগ

২.৪.৩ জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস : ভাষাবিচার

২.৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৫.১ সাধারণ পরিচয়

২.৫.২ তারাশঙ্করের উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

২.৫.৩ তারাশঙ্করের উপন্যাসের পরিচয়

২.৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৬.১ বিভূতিভূষণের উপন্যাস

২.৭ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৭.১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

২.৮ অন্নদাশঙ্কর রায়

২.৮.১ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস : পঞ্জি

২.৮.২ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস : আলোচনা

২.৯ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২.১০ গোপাল হালদার

২.১১ বনফুল

২.১২ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
২.১৩ প্রমথনাথ বিশী
২.১৪ সুবোধ ঘোষ
২.১৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
২.১৬ সতীনাথ ভাদুড়ী
২.১৭ আশাপূর্ণা দেবী
২.১৮ অনুশীলনী
২.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

বঙ্কিম-রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাস অন্বেষণই এ অংশে আমাদের লক্ষ্য। এ ইতিহাস বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের ইতিহাস।

২.১ প্রস্তাবনা

বাংলা উপন্যাসের ধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) আবির্ভাব কিছুটা আকস্মিক বলে মনে হতে পারে। বাংলা সাহিত্য ও বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা অনেকেই একথা বলেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে স্বাগত জানিয়েছেন ছোট বড় প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা পত্রিকায় লিখেছেন, ‘‘শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।’’

বাংলা কথাসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টির জন্য কল্লোলযুগের সাহিত্যিকদের আমরা ঐতিহাসিক কৃতিত্বের অধিকারী মনে করি। তাঁরাও শরৎচন্দ্রকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং এই যুগের সম্ভবত সবচেয়ে স্বতন্ত্র ও মৌলিক রচনার স্রষ্টা জগদীশ গুপ্ত বলেছেন, ‘‘এমন করিয়া আগে ত’ অপ্রকাশকে কেহ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় নাই—কথা ছিল, শিল্প ছিল, ছিল না দরদ।’’

শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাবে তিনি যে সাহিত্যসমাজ, পাঠককুল এবং প্রতিভাধর লেখকদের চমকিত করেছিলেন, তার কিছু কারণ আছে। বাংলায় উপন্যাসের পথিকৃতের সম্মান আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই দিয়ে থাকি। এই অভিনব সাহিত্য-প্রকরণের প্রথম সার্থক রূপকার হিসাবে তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সংসারের মানুষগুলি অধিকাংশই রাজা, জমিদার, ‘মহা ধনবান’ বা অত্যন্ত অভিজাত ব্যক্তি। উপন্যাসের সমস্যাগুলিও আমাদের ঘরোয়া জীবন থেকে অনেক দূরে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মানুষগুলি তুলনামূলকভাবে কিছুটা পরিচিত এবং সাধারণ হিসাবে মনে হতে পারে, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, মহেন্দ্র, বিহারী, বিনোদিনী, গোরা, সুচরিতা, শচীশ, দামিনী, নিখিলেশ, অমিত, লাবণ্য প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রগুলি সমাজের সাধারণ স্তর থেকে উঠে এলেও এরা কেউই কিন্তু চরিত্রবৈশিষ্ট্যে খুব ‘সাধারণ’ মানুষ নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সমস্যাও খুব ঘরোয়া বৃত্তের সমস্যা নয়। শরৎচন্দ্রের অভিনবত্ব এখানেই যে, তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি একেবারেই আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। সাধারণ, ভবঘুরে, নেশাখোর, সংসারে প্রতিষ্ঠাহীন এইসব মানুষগুলিও যেমন

আমাদের পরিচিত, বাংলার সেবাময়ী নারীরাও আমাদের মোটেই অপরিচিত নয়। আবার বিষয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক কাহিনিগুলি সবই প্রায় আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার গল্প—ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদ, নারী মনস্তত্ত্ব, দাম্পত্যকলহ, গৃহিণীদের ঘরোয়া কূটনীতি এবং কখনো বা পল্লীসমাজের সংকীর্ণতা শরৎচন্দ্রের প্রধান বিষয়। এই কারণেই শরৎচন্দ্রের রচনায় আমরা প্রথম আমাদের একান্ত পরিচিত নরনারী এবং কাহিনীতে ঘরোয়া জীবনের পরিচিত আস্বাদ পেয়েই চমৎকৃত হয়েছিলাম।

শরৎচন্দ্রের রচনার আর দুটি-একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের চেয়ে সমাজকেই বড় করে দেখেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ সমাজের চেয়ে অনেক বড়। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা ব'লে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নরনারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে।" শরৎচন্দ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য, নিপীড়িত ও বঞ্চিত শ্রেণির প্রতি তাঁর সহানুভূতি। শুধুমাত্র এই গভীর সহানুভূতি এবং মমত্ববোধ থেকেই যে তিনি সাহিত্যসাধনা করতে এসেছিলেন, এ কথা তিনি বলেছেন কলকাতার টাউন হলে তাঁর সাতান্নতম জন্মদিনে তাঁকে দেওয়া সংবর্ধনার উত্তরে। তিনি বলেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলেনা কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, ... এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।"

২.২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২.২.১ কালানুক্রমিক বিন্যাস

শরৎচন্দ্রের ছোট-বড় উপন্যাসের প্রায় ত্রিশ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'বড়দিদি'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাস', এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে।

মধ্যবর্তী সময়ে অনেকগুলি উপন্যাস শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, কালানুক্রমিক ভাবে সেগুলির নাম উল্লেখ করা হল :

বিরাজ-বৌ (২ মে, ১৯১৪), পরিণীতা (১০ আগস্ট, ১৯১৪), পণ্ডিতমশাই (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৫ জানুয়ারি, ১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১২ মার্চ, ১৯১৬), বৈকুণ্ঠের উইল (৫ জন, ১৯১৬), অরক্ষণীয়া (২০ নভেম্বর, ১৯১৬); শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭), দেবদাস (জুন, ১৯১৭), চরিত্রহীন (নভেম্বর, ১৯১৭), স্বামী (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮), শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব (সেপ্টেম্বর, ১৯১৮), দত্তা (সেপ্টেম্বর, ১৯১৮), ছবি (জানুয়ারি, ১৯২০), গৃহদাহ (মার্চ, ১৯২০), বামুনের মেয়ে (সেপ্টেম্বর, ১৯২০), দেনাপাওনা (আগস্ট, ১৯২৩), নববিধান (অক্টোবর, ১৯২৪), পথের দাবী (আগস্ট, ১৯২৬), শ্রীকান্ত, তৃতীয় পর্ব (এপ্রিল, ১৯২৭), শেষ প্রশ্ন (মে, ১৯৩১), শ্রীকান্ত, চতুর্থপর্ব (মার্চ, ১৯৩৩) এবং বিপ্রদাস (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫)। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় শুভদা (জুন, ১৯৩৮) এবং তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' (জুন, ১৯৩৯) যা সমাপ্ত করেন রাধারানি দেবী।

২.২.২ বিষয়ভিত্তিক বিভাগ

বিষয় হিসাবে শরৎচন্দ্রের যে বিভাগ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, তাকেই আমরা মোটামুটিভাবে যুক্তিযুক্ত মনে করি। তাঁর বিভাগ এইরকম—

ক) প্রেমবর্জিত পারিবারিক বিরোধ-চিত্র,

খ) সমাজবিধির প্রাধান্যচিহ্নিত দাম্পত্য প্রেম ও বিরোধকাহিনি,

গ) সমাজ-সমালোচনামূলক উপন্যাস,

ঘ) পূর্বরাগপুষ্ট মধুরান্তিক প্রেম,

ঙ) নিষিদ্ধ সমাজ-বিরোধী প্রেম এবং

চ) মতবাদপ্রধান ও পূর্বানুবৃত্তিমূলক উপন্যাস

ক) পরিচিত পরিবারের অতি-পরিচিত কলহ, মন-কষাকষি, পারিবারিক রাজনীতি ইত্যাদি বাংলা উপন্যাসে তেমনভাবে কখনো উঠে আসেনি শরৎচন্দ্রের আগে। তাঁর অলিখিত 'মরমী সাহিত্যিক' আখ্যা পাওয়ার মূল কারণও এখানেই নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অবশ্য এর সূত্রপাত হয়েছে, একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা চলতে পারে। আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, পারিবারিক বিরোধের চিত্র শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পেই বেশি ফুটেছে, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে কম। তবু যে-সব ক্ষুদ্র উপন্যাসে এই বিষয় অবলম্বন করা হয়েছে তার মধ্যে 'পণ্ডিতমশাই' ও বৈকুণ্ঠের উইল'-এর নাম করা যেতে পারে। 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে বৃন্দাবন ও কুসুমের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করেছে পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার। কুসুমের পক্ষে প্রধান বাধা তার বৈধব্যজনিত সংস্কার, বৃন্দাবনের পক্ষে প্রধান বাধা তার মায়ের অপমান। 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসে ভ্রাতৃস্নেহের চূড়ান্ত বিকাশ আমরা দেখতে পাই। আপাতদৃষ্টিতে অসভ্য, অশিক্ষিত এবং নেশাখোর বড়ভাই গোকুল তার শিক্ষিত ও আপাতসভ্য ভাই বিনোদের প্রতি যে কোমল এবং অন্ধ স্নেহ পোষণ করতো সেটাই এই কাহিনির উপজীব্য।

খ) সমাজ-বিগর্হিত প্রেম এবং সমাজব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সামাজিক বৃত্তের মধ্যে থেকেও কিছু উপন্যাস শরৎচন্দ্র লিখেছেন যেখানে বিদ্রোহের বিশেষ কোনো উত্তাপ পাওয়া যায় না। 'বড়দিদি'-তে অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ চরিত্রই কাহিনির প্রধান আকর্ষণ। এইরকম উদাসীন, অগোছালো এবং আপনভোলা মানুষের সঙ্গে বিধবা মাধবীর যে সম্পর্ক তার আন্তরিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা এতই বেশি যে একে প্রেম আখ্যা দিলে যেন সম্পর্কটিরই অবমাননা করা হয়। নিজেদের সম্পর্ক নয়, নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে অন্যান্য মানুষ কী চিন্তা করতে পারে, এই আশঙ্কাই উপন্যাসের উপজীব্য।

'চন্দ্রনাথ' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ উপন্যাস। এখানে চন্দ্রনাথ ও সরযুর প্রেমে সামাজিক কলঙ্কের একটা প্রেক্ষিত আছে, কিন্তু বিদ্রোহে কোনো সুর নেই। বিদ্রোহ বা সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র এ উপন্যাসে যদি কেউ থাকেন, তিনি কৈলাস খুড়ো। সামাজিক কলঙ্কের জন্য সরযুকে ত্যাগ করে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাকা মণিশঙ্করের অনুরোধে চন্দ্রনাথ যে তাকে আবার গ্রহণ করে, এটাই কাহিনির সারাংশ। কিন্তু চন্দ্রনাথের গভীর প্রেমই যে সমগ্র উপন্যাসকে সজীব ও আকর্ষণীয় করে রেখেছে, সে কথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে।

মিষ্টিমধুর প্রেমের উপন্যাস হিসাবে 'পরিণীতা'-র উল্লেখ করতে হবে। প্রায় খেলার ছলে একদিন ললিতা শেখরকে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিল। এই সামাজিক সম্পর্কটি বজায় রাখার জন্য তাদের অবিরাম প্রয়াস—ললিতাকেই অবশ্য এ বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, কাহিনিকে আমাদের কাছে উপভোগ্য করে তুলেছে। 'স্বামী' উপন্যাসকে কিছুটা এর পরিপূরক বলা যেতে পারে। শৈশবে অবৈধ প্রণয় অপক্ষো দাম্পত্য প্রেমের মর্যাদা যে বেশি, সেই কথাই এখানে বলা হয়েছে। অবশ্য কোনো নীতি উপদেশের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, স্বামী তার ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও প্রেম দিয়েই স্ত্রীকে জয় করে নিয়েছে। 'নববিধান' উপন্যাসের বিষয়ও দাম্পত্য প্রেম, তবে তা ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে যতটা জড়িত, সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে ততটা নয়। এখানে অবশ্য সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং নাটকীয়তা অনেক বেশি। সাহেবি জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এবং হিন্দুয়ানিকে সংস্কার হিসাবে গণ্য করা নায়ক, অধ্যাপক শৈলেশের প্রথম বিবাহ প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে ঊষার সঙ্গে। এই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতে সময়

লাগে নি, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঊষা স্বামীর কাছে আবার ফিরে আসে ও ব্যক্তিত্বের জোরে এবং কোমলতায় সংসারে হিন্দু আচার-ব্যবস্থা প্রচলিত করে। শৈলেশের ভগ্নী বিভা আবার সংসারে বিশৃঙ্খলা আনে, ফলে শৈলেশকে ঘর ছাড়তে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিণতি মিলনমধুর। এইজাতীয় উপন্যাসের মধ্যে অনেকে 'বিরাজ-বৌ'কে শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

গ) পল্লীসমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটি এবং তার অমানুষিক শোষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন শরৎচন্দ্র। যে কয়েকটি উপন্যাসে পল্লীসমাজের এই স্বরূপ তিনি উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন সেগুলি হল 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', এবং 'পল্লীসমাজ'। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস যে 'পল্লীসমাজ' সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই—শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবেও এটি স্বীকৃত। 'অরক্ষণীয়া'তে সামাজিক দুঃশাসনের চিত্র অনেক তীব্র ও নির্মম, তুলনায় 'বামুনের মেয়ে' অনেক সহনীয়, কৌলীন্য প্রথার কুফলটুকুই এখানে দেখান হয়েছে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে একটি নিটোল ও অনুক্ত প্রেমকাহিনির নিখুঁত প্রেক্ষিত গড়তে পেরেছে পল্লীসমাজের নিষ্ঠুরতা। গ্রামের ছেলে রমেশ দীর্ঘ প্রবাসের পর যখন পিতৃহীন হয়ে ফিরে এসেছে, বাল্যপ্রেমের নায়িকা রমা তখন বিধবা। গ্রামের ভালো করবার যাবতীয় প্রচেষ্টা তার বিফলে যায় সমাজপতিদের কূটকচালি ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। এরমধ্যে রমেশ ও রমার অস্ফুট প্রণয় সম্পর্ক উপন্যাসে আরো জটিলতা সৃষ্টি করে। এই উপন্যাসে কেবল পল্লীসমাজের কুশ্রী দিকের প্রতিফলন নেই, সেই সঙ্গে সে সমস্যার প্রতিকারের একটা ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে জ্যাঠাইমা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। এটাও উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ।

ঘ) পূর্বরাগপুষ্ট মধুর প্রেমের যেসব উপন্যাস শরৎচন্দ্র লিখেছেন তার মধ্যে দুটিই উল্লেখযোগ্য—'দত্তা' এবং 'দেনা-পাওনা'। 'দত্তা' উপন্যাসটি আদ্যন্ত মধুর এবং সুখপাঠ্য। নরেন এবং বিজয়ার পূর্বপ্রণয় সত্বেও, বিজয়ার পিতা বনমালী তাঁর প্রিয় বন্ধু রাসবিহারীর পুত্র বিলাসকেই মনে মনে জামাতা ঠিক করে রেখেছেন, এই বিশ্বাসে বিজয়া পিতৃ-ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য বদরাগী ও অভদ্র বিলাসকে মনে মনে স্বামী হিসাবে মেনে নিয়েছিল। বিলাসও এর পূর্ণ সুযোগ নিত। কিন্তু পরে জানা যায়, বনমালী জগদীশের পুত্র নরেনকেই জামাই হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন এবং ডাক্তারি পড়াবার জন্য নিজের খরচেই বিলাত পাঠান। শেষপর্যন্ত অবশ্য মধুরেন সমাপয়েৎ হয়েছে, চূড়ান্ত নাটকীয় পরিণতির মধ্য দিয়ে বিজয়া-নরেনের বিবাহ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দেনা-পাওনা শরৎচন্দ্রের জটিল উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি। তাঁর প্রথাগত চরিত্রনির্মাণও এখানে ঠিক যেন লক্ষ করা যায় না। এর নায়ক জীবানন্দ শরৎচন্দ্রের একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। লম্পট, দুর্বত্ত, পাপাচারী, অর্থপিশাচ—যত মন্দ কথা একটি চরিত্র সম্বন্ধে বলা সম্ভব, সব কিছুই চরিত্রটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে। তার নিজের বিবাহিত অথচ পরিত্যক্ত স্ত্রীই এখন তার অধিকারভুক্ত চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। এই অকুতোভয় লম্পট মানুষটির হৃদয়ে কী ক'রে প্রেমের সঞ্চার হল এবং সংসার জীবনে প্রবেশ করার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠল, সেটাই এ উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। নির্মল-হৈমর উপকাহিনিটিও উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এবং ফকির চরিত্রটি প্রায় অবিস্মরণীয়।

ঙ) সমাজবিরোধী প্রেম এবং মানুষের ওপরে প্রেমের দুর্নিবার প্রভাব শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই দেখতে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক খ্যাতির মূলে প্রধানত এই উপন্যাসগুলিই আছে। এ সব উপন্যাসে সমাজের স্খলিতা নারীদের তিনি সহানুভূতির সঙ্গে স্থান দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে, তাদের সমাজবিগর্হিত প্রেমকে যথোচিত মর্যাদাও দিয়েছেন, যদিও দাম্পত্যবন্ধনে তাদের সার্থক করে তোলার ব্যাপারে কিছু সংকোচ তাঁর ছিল বলেই মনে হয়। তাঁর এ জাতীয় তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' এবং 'শ্রীকান্ত'। চরিত্রহীন উপন্যাসে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি এবং তার মাধ্যমে মানুষকে বিচার করার সনাতন পদ্ধতির ওপর তীব্র ব্যঙ্গ আছে। মানুষের চরিত্রবিচারে Ethics নয়, মানবিক গুণাবলিরই বিচার হওয়া উচিত এবং মনস্তত্ত্ব এমনই জটিল যে তা সামাজিক অনুশাসনে বদ্ধ হবার নয়, এই ধরনের বক্তব্যই এখানে আছে। দুটি কাহিনি এখানে পরস্পরযুক্ত—

সতীশ-সাবিত্রীর কাহিনি এবং উপেন্দ্র-কিরণময়ী-দিবাকরের কাহিনি। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে দুটি ক্ষেত্রেই অসামাজিক সম্পর্ককে একই সঙ্গে অনৈতিক বলেও আমরা ঘোষণা করতে পারি, কিন্তু মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আর অস্বাভাবিক বলতে পারিনা।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা শেষপর্যন্ত মহিমকে বিবাহ করেছে বটে, কিন্তু প্রাণোচ্ছল সুরেশ সম্বন্ধে মোহমুগ্ধতার ভাব তার কখনোই কাটেনি। ফলে তার দাম্পত্য জীবনে তা বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের বৃহত্তম এবং জনপ্রিয়তম উপন্যাস। অসামাজিক সম্পর্ক এখানে প্রধানভাবে আছে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের সম্পর্কে, তবে অভয়ার সঙ্গে রোহিনীর সম্পর্ক, কমললতার সঙ্গে গহরের সম্পর্ক সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে গর্হিত তো বলতেই হবে।

চ) মূলত দুটি উপন্যাসকেই আমরা মতবাদ প্রধান উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি, তার মধ্যে 'পথের দাবী' রাজনৈতিক উপন্যাস, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক উপন্যাস 'শেষ প্রশ্ন'। এজাতীয় উপন্যাসের জন্য শরৎচন্দ্রের পরিচিতি নয় এবং এরকম উপন্যাস লিখতে যে তিনি বিষয় সাচ্ছন্দ্যও বোধ করেন না, 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে তার সাক্ষ্য আছে। নারীর মূল্য বিষয়ে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে তিনি অনেক সহজ। অবশ্য বিতর্কিত ও ব্যতিক্রমী উপন্যাস হিসাবে 'শেষ প্রশ্ন'-ও তাৎপর্যপূর্ণ। নায়িকা কমল চরিত্রটিই সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

২.২.৩ শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট্য

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমকালের তরুণ সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাদের বাস্তব সমস্যা এবং বাস্তব চরিত্রচিত্রণের জন্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে বলতে হবে, বাস্তব সমস্যা অপেক্ষা পারিবারিক মনস্তত্ত্ব এবং হৃদয়াবেগ ঘটিত সমস্যাগুলিই তিনি প্রধান উপজীব্য করে নিয়েছিলেন। চরিত্রচিত্রণে তিনি সাধারণ মানুষকে আত্মীয় করে আমাদের সচেতন করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টিতে এক ধরনের ছক বা প্যাটার্নই প্রমাণ করে, তিনি বাস্তব চরিত্রসৃজনে যতটা আগ্রহী ছিলেন, হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে ভালো লাগার মতো চরিত্রনির্মাণে উৎসাহ বোধ করেছেন আরো বেশি। এই ছকটি অনেক সমালোচকেরই চোখে পড়েছে। তাঁর নায়করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, সাংসারিক জ্ঞানশূন্য উদাসীন চরিত্র—'অর্থ উপার্জন করে জীবনে স্থিতিশীল হওয়া এবং সম্পন্ন সংসারের প্রতিষ্ঠা করা যাদের চিন্তাতেই আসে না। আবার নায়িকাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই দেখা যায় যে, এই ধরনের চালচুলোহীন চরিত্রের প্রতিই তাদের আকর্ষণ বেশি। নায়িকারা ব্যক্তিত্বময়ী, অথচ অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সময় একবার স্খলিত। তারা প্রত্যেকেই সেবাময়ী, নায়কের দুরবস্থায় একবার অন্তত সেবা করার ও নিপুণভাবে যত্নসহকারে খাওয়াবার সুযোগও একবার পেয়ে যায়। এর ফলে চরিত্রগুলির মূল্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা যে কমে যায়, এমন নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব চরিত্রের এরকম কোনো ছক থাকে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ জন্মায়। তবে বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র যে এক যুগন্ধর স্রষ্টা সে বিষয়ে সমালোচকগণ সকলেই একমত।

২.৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ছোটগল্পকার হিসাবেই বেশি পরিচিত এবং তাঁর সামর্থ্যও ছোটগল্পেই অধিক, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। 'দেবী' উপন্যাসের সূত্রেই তিনি উপন্যাসিক হিসাবে বেশ কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছেন, যদিও আরো কয়েকটি ভালো উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন।

ইংরিজি সাহিত্যে উপন্যাসের মূল দুটি ভাগ, নভেল এবং স্টোরি-টেলার। প্রভাতকুমারকে আমরা দ্বিতীয়ভাগের

ঔপন্যাসিক বলতে পারি, অর্থাৎ গল্পকথনই ছিল যাঁর মূল উদ্দেশ্য। এটাও অবশ্য খুব কম কৃতিত্বের কথা নয়, কাহিনির আকর্ষণ পাঠকের মনে সৃষ্টি করা এবং সর্বক্ষণ তা জাগরূক রাখা এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। প্রভাতকুমার সেই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে এটাই আমরা বলতে পারি যে, যে-গভীর জীবনসমস্যা মহৎ ঔপন্যাসিকদের কাছ থেকে আমরা পাই, জীবনের যে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা তিনি ঘটনাংশের মধ্য দিয়ে করেন, প্রভাতকুমার তার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গল্পপ্রিয় বাঙালি পাঠককে কাহিনিসূত্র দিয়েই সম্মোহিত করে রাখা।

প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও এই সূত্রেই উল্লেখ করা যেতে পারে। উপন্যাসে অনেকে চরিত্রের ওপর বেশি নির্ভর করেন, যেমন শরৎচন্দ্র, কিন্তু অনেকে চরিত্র অপেক্ষা কাহিনিভাগের ওপর জোর দেন বেশি। প্রভাতকুমারের কাছে কাহিনিই ছিল প্রায় সর্বস্ব, সুতরাং চরিত্রসৃষ্টির গুরুত্ব ছিল তাঁর কাছে কম। সেই কারণেই তাঁর চরিত্রগুলি দোষেগুণে রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে কিছুটা একমুখী। অবশ্য মন্দ চরিত্র বা খল চরিত্র সৃষ্টি করতে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না বলেই চরিত্রগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়েছে আদর্শ এবং ভালো লাগার মতো।

প্রভাতকুমারের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর উপন্যাসের কাহিনিগুলি অনেকক্ষেত্রেই মনে হয় যেন ছোটগল্পেরই সম্প্রসারিত রূপ। ছোটগল্প হিসাবে যা গুণসংবদ্ধ হতে পারত, উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে যেন অনাবশ্যকভাবে তা শিথিল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তা কখনো কখনো সামান্য আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছে।

২.৩.১ প্রভাতকুমারের উপন্যাস

সংখ্যায় প্রভাতকুমারের উপন্যাস খুব বেশি না হলেও নিতান্ত অল্প নয়। 'আরতি', 'গরীব স্বামী' প্রভৃতি অপরিচিত উপন্যাস যেমন আছে, 'রত্নদীপ' বা 'সিন্দুর কৌটা'-র মতো জনপ্রিয় উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। উপন্যাসগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে।

প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস 'রামসুন্দরী' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩০৯ থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এবং গ্রন্থাকারে এটির প্রকাশ ঘটে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। রমাসুন্দরীই উপন্যাসের নায়িকা এবং প্রধান চরিত্র। কাহিনির প্রথম ভাগে চরিত্রটি যেভাবে বিকশিত হয়েছে, পরিণয়োত্তর জীবনে সেই স্বাচ্ছন্দ্য নেই। কাহিনিতে জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে কুটিল চরিত্র সীতানাথ ও তার মা, কঠোর চরিত্র কান্তিচন্দ্র এবং স্বাধীনচেতা নবগোপাল। কিন্তু শেষাংশে কাশ্মীরভ্রমণ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসটি তেমন আকর্ষণীয় হতে পারে নি।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'নবীন সন্ন্যাসী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। জমিদারের সঙ্গে জমিদারের রেষারেষি, কূটচক্রান্ত, মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত করবার চেষ্টা ইত্যাদি মামুলি ঘটনার সমাবেশই উপন্যাসে দেখা যায়। নায়ক মোহিত এবং নায়িকা চিনিও ঠিক মনে রাখবার মত চরিত্র নয়। তবে উপন্যাসের যদি কোনো সত্যকার আকর্ষণ থাকে, তবে তিনি নায়েব গদাই পাল। এই চরিত্রসৃষ্টি প্রভাতকুমারের প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলতে হবে। এই জাতীয় চরিত্র নির্মাণে যে আদর্শ তিনি রচনা করেছেন, পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের কাছে তা অনুসরণযোগ্য হয়ে রয়েছে। জমিদার গোপীকান্তর প্রতি তাঁর বিশ্বস্তবা, যাবতীয় মিথ্যাচারের মধ্যে নিমগ্ন থেকেও ধর্মীয় ভণ্ডামি, বিভিনন্ন স্তরের মানুষকে বশীভূত করার কৌশল, কূটমন্ত্রণা এবং নিপুণ রণকৌশলে রমণ ঘোষকে পর্যুদস্ত করা, হরিদাসীর সঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেমাভিনয়—সব কিছুতেই চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'রত্নদীপ' সম্ভবত প্রভাতকুমারের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। চরিত্রসৃষ্টি এ উপন্যাসে অনুল্লেখ্য, এমন কথা বলা যাবে না, কিন্তু প্রধানত ঘটনাজাল বিস্তার ও নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যই এটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কনক এবং সুরবালার কাহিনি আমাদের ভালো লাগে, প্রায় ভিলেন হিসাবে আঁকা চরিত্র খগেনও আকর্ষণীয়, কিন্তু

উপন্যাসের মূল আকর্ষণ বৌরানি চরিত্র। শুচিশুদ্ধ পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে বৌরানির চরিত্রটি এমনভাবে লেখক এঁকেছেন যে, নাটকীয় বিপর্যয়ের পর নিজের ভুল ভেঙে গেলে যে আচরণ বৌরানি করেছেন, মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও তাকে একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতে আমরা পারিনা। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসে, রমেশ তার স্বামী নয় এ কথা জানবার পর কমলার আচরণ যদি আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিই, তবে বৌরানির আচরণকেও অস্বাভাবিক মনে করবার উপায় নেই। রাখাল অবশ্য বৌরানির কিছু ক্ষতি নিশ্চয়ই করতে পারতেন, কিন্তু বৌরানির স্নিগ্ধোজ্জ্বল চরিত্রই তাকে এ ব্যাপারে প্রতিহত করেছে বলে আমাদের মনে হয়। 'সিন্দুরকৌটা' উপন্যাসটিও প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও মনে করেছেন 'উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণকাহিনি', কিন্তু একে উপন্যাস হিসাবে অভিহিত না করার কোনো কারণও আমরা দেখতে পাইনা। পরকীয়া প্রেমই এই উপন্যাসের বিষয়। দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে মূল্যবোধ, বিশ্বাসভঙ্গের জন্য অপরাধবোধ, সামাজিক সম্পর্ক ও ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপন্যাসটিকে সজীব করে রেখেছে। স্বামী-পরিত্যক্তা সুশীকে বলা যায় এই উপন্যাসের নায়িকা এবং বকুরানির স্বামী বিজয়কে বলতে পারি উপন্যাসের নায়ক। করুণা শেষপর্যন্ত প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বাংলা ও ইংরেজি উপন্যাসে আমরা আগেও দেখতে পেয়েছি। এখানেও তাই হয়েছে—বিজয় সুশীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে বিবাহের সংকল্প করেছে। এই সংকল্পে প্রতিবন্ধকতা ছিল খুবই অল্প, কারণ পতির সুখে আত্মবিসর্জনের পরম সতীত্বই বকুরাণির চরিত্রের ভিত্তি। এই চরিত্রকে বৈপরীত্যের দ্বারা স্পষ্টতর করেছে পল সাহেবের চরিত্র, স্ত্রী যাঁর কাছে পণ্যসামগ্রী মাত্র।

'জীবনের মূল্য' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। চূড়ান্ত নাটকীয় ঘটনার দ্বারা জগদীশ বাবুর পরিবারের ব্যাপক বিপর্যয় দেখানো লেখকের অভিপ্রায় ছিল। পর পর যে দুর্ঘটনাগুলি এই পরিবারে ঘটে যায়, তা নিছকই দৈব দুর্ঘটনা, অথচ উপন্যাসে আমরা একটা কার্যকারণ সূত্র অবশ্যই প্রত্যাশা করি, দৈব দুর্বিপাক উপন্যাসের পক্ষে খুব ভালো যুক্তি হতে পারে না। মনে হতে পারে বিয়ে-পাগলা বুড়ো গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের অভিশাপেই বুঝি এই এই ধরনের বিপর্যয় ঘটে চলেছে, কিন্তু তাকেও খুব বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

প্রভাতকুমার আরো কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন, যথা 'মনের মানুষ', 'আরতি', 'সত্যবালা', 'গরীব স্বামী', কিন্তু এগুলি কোনোটিই খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কাহিনিবয়নের দক্ষতায় এগুলির পঠনযোগ্যতা যতোটা আছে, উপন্যাস হিসাবে পরিগণিত হবার মতো যোগ্যতা ততটা নেই।

২.৪ জগদীশ গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) খুব পরিচিত নাম নয়, কারণ তিনি জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না, কিন্তু শক্তিশালী লেখক যে ছিলেন সে স্বীকৃতি সুকুমার সেনের মতো সমালোচকও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'শক্তিশালী এবং অসাধারণ লেখক বলিয়াই জগদীশচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে শাখাপতিও হইতে পারেন নাই' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থখণ্ড। পৃ. ৩৪০)

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত নামেই তিনি লেখা শুরু করেন, পরে নামের মধ্যাংশ বর্জনের যে হুজুগ তখন আধুনিকতার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, সেই প্রথাতেই এই সংক্ষেপীকরণ ঘটে। ছোটগল্প রচনার মাধ্যমেই তিনি সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন, অতঃপর উপন্যাস রচনা শুরু করেন একই সঙ্গে। যেহেতু তিনি প্রথা বর্জন করেছেন এবং স্বতন্ত্রচিহ্নিত বিষয় ও ভঙ্গিমায় সাহিত্যরচনা করেছেন, তাঁর মানসিকতার বৈশিষ্ট্য একটু না জেনে রাখলে তাঁর উপন্যাস উপভোগ করা সম্ভব হবে না।

সাধারণভাবে যাকে বলে 'কল্লোল যুগ', জগদীশ গুপ্ত সেই সময়েরই লেখক, তবে তাঁকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক

বলাটা ঠিক হবে না। সাহিত্যিক আড্ডায় তিনি বিশেষ আসেন নি। বোলপুরে থাকতেন কর্ম-উপলক্ষে, সেখান থেকেই লেখা পাঠাতেন। তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনির সঙ্গে যিনি পরিচিত আছেন, তিনিই মানুষটির স্বাধীনচেতা মানসিকতাকে চিনে নিতে পারবেন। আইন ব্যবসায়ের জন্য সুপরিচিত পরিবারের মানুষ এই ব্যবসায়ে মিথ্যা কথা বলতে হয় বলে আইন পড়েন নি এবং দাসত্ব করতে হয় বলে কোনো চাকরিও বিশেষ করেন নি। ফলে আর্থিক স্বাচ্ছল্য জীবনে কখনোই তেমন লাভ করতে পারেন নি তিনি। নিঃসন্তান এই মানুষটি সুকুমারী বলে একটি পালিতা কন্যার জনক, যে সুকুকে নিয়ে তাঁর বেশ কিছু কবিতা ও গল্প আছে।

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস প্রথাবিরোধী এবং তিনি কল্লোলযুগীয়, এ দুটি কথা বলার অর্থ, উপন্যাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐহিত্য গ্রহণ করেন নি এবং কল্লোল যুগের লেখকদের মতো বাস্তবতাবাদী উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছেন। জীবনের আদর্শ ও নৈতিক রূপ, জীবনের সুন্দর রূপ এবং জীবন যেমন হলে আমাদের ভালো লাগতো, উপন্যাসে সেই জীবনের চিত্র না এঁকে জীবন প্রকৃতই যেরকম, সেই জীবনই তিনি এঁকেছেন। ফলে মানুষের প্রকৃত চেহারা ও জীবনের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে।

উপন্যাসে নিটোল কাহিনি জগদীশ গুপ্তের একেবারেই অপছন্দ ছিল। জীবনের যেহেতু কোনো সুন্দর ছক নেই, উপন্যাসেও কোনো সুষ্ঠু ছক তিনি পছন্দ করেন নি। সাধারণত ছোট মাপের উপন্যাসই তিনি লিখতেন, এ ব্যাপারে কোনো রকম আপোস তিনি পছন্দ করতেন না। 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসের ভূমিকা থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসের কিঞ্চিত কলেবরবৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রকাশক, লেখকের উত্তর ছিল—'যে উপন্যাস যেখানে যখন সমাপ্ত হওয়ার প্রয়োজন এবং যে ঘটনা বিস্তারের যতটুকু ক্ষেত্র আছে, তার বেশি কোনো ফরমাশি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

২.৪.১ জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস

জগদীশ গুপ্ত ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাস কিছু অল্পই লিখেছেন। তাঁর মোট উপন্যাসের সংখ্যা আঠারো, কলেবরে কোনোটিই খুব বড় নয়। বিভিন্ন তথ্য থেকে মনে হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'লঘুগুরু'-ই তাঁর প্রথম উপন্যাস। অথচ তাঁর দীর্ঘতম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থে'-র প্রকাশ কাল হিসাবে উল্লেখ আছে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে তাঁর আরো কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, এগুলি হল—'তাতল সৈকত', 'দুলালের দোলা' এবং 'রোমন্থন'। 'সতিনী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। অন্যান্য উপন্যাসের নাম, প্রকাশকালসহ—'রতি ও বিরতি' (১৯৩৪), 'গতিহারা জাহ্নবী' (১৯৩৫), 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' (সম্ভবত ১৯৩৯), 'নিষেধের পটভূমিকায়' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), জগদীশ গুপ্তের কয়েকটি উপন্যাসের প্রকাশকাল সঠিকভাবে উদ্ধার করা যায় নি, এগুলি হল, 'কঙ্ক', 'নন্দ আর কৃষ্ণা', 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ', 'মহিষী', 'যথাক্রমে' এবং 'সত্রভোগ'। তাঁর 'চৌধুরাণী' উপন্যাসটি সম্ভবত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, এটি 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ থেকে আষাঢ় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তেরোটি সংখ্যায়।

২.৪.২ জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের বিষয়-বিভাগ

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে কাহিনির পরিপাট্য অপেক্ষা বক্তব্যবিষয় এবং চরিত্রনির্মাণের গুরুত্ব অনেক বেশি, তা সত্ত্বেও উপন্যাসগুলির বক্তব্যবিষয়ভিত্তিক কয়েকটি বিভাগ আমরা করতে পারি :

ক) নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে উপন্যাস,

খ) পল্লীসমাজের প্রকৃত সমস্যা-বিষয়ক উপন্যাস এবং

গ) অলঙ্ঘ্য ভবিতব্য বিষয়ক উপন্যাস।

ক) নারী ও পুরুষের প্রকৃত সম্পর্ক, তাদের সম্পর্ক বিষয়ে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ, দাম্পত্য সম্বন্ধের ক্লেদ, আদর্শ দাম্পত্য সম্বন্ধ ইত্যাদি নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস জগদীশ গুপ্ত লিখেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই সম্পর্কের বাস্তব চিত্রটি তিনি পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, ফলে তার যাবতীয় ক্লেদ, মলিনতা, অপবিত্র সামঞ্জস্য ইত্যাদিই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। সেই কারণেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ধারণায় পুষ্ট পাঠকসমাজ বিপর্যস্ত এই সব উপন্যাসের মুখোমুখি এসে। কয়েকটি উপন্যাস আলোচনা করলেই সে কথা আমরা বুঝতে পারবো।

'লঘুগুরু' জগদীশ গুপ্তের সবচেয়ে বিতর্কিত উপন্যাস, কারণ 'জগদীশের রচনা-নৈপুণ্য' আছে, এ কথা স্বীকার করেও বিভিন্ন অসংগতি দেখিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন। কাহিনির নায়িকা একটি গণিকা উত্তম, মানুষকে পিশাচে পরিণত করার খেলা খেলতে খেলতে সহসাই যে বিপরীত পথে শয়তানকে শাসন করে মানুষে পরিণত করার একটি খেলা খেলে বিশ্বম্ভরকে নিয়ে। নিজের মেয়ে টুকিকে সে সৎশিক্ষা দিয়ে সৎপাত্রস্থ করতে চায়, কিন্তু তার সমস্ত আশা ব্যর্থ হয়, কারণ একদা যে গণিকাবৃত্তি করেছে ভবিষ্যতে তার শুদ্ধজীবনাগ্রহ কেউ মেনে নিতে পারে না, তার কন্যাকেও কেউ সৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। তাই সংসার জীবনে প্রবেশ করার পরও টুকিকে শেষ পর্যন্ত 'ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে' গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসে আমরা কৃষ্ণা নামে এক স্বভাবগণিকাকে দেখতে পাই, যেরকম চরিত্র বাংলা উপন্যাসে বিরল। তার নিজের মা উপন্যাসের শেষে বলেছে, ঈশ্বর ওকে ভালবাসার ক্ষমতাই দেন নি, 'রূপ আছে' রূপের জোরে মানুষকে খেপিয়ে তুলে মজা দেখাই ওর জন্মগত অভ্যাস।' বিবাহিত এই মেয়েটি উপন্যাসের আখ্যান-অংশে মজা দেখেছে গৃহশিক্ষক নন্দকে ক্ষেপিয়ে তুলে। নগ্ননায়িকাকে প্রথম দর্শনে এবং তার এই চেহারা মানুষ দেখুক, সেটাই তার পছন্দ, এমন কথা শুনে শিক্ষকতা ফেলে পালিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু নারীসৌন্দর্যের মোহে আবার যেতে হয়েছিল, যদিও বিপর্যয় শেষপর্যন্ত হয় নি।

'সুতিনী' উপন্যাসের নায়িকা রাজবালা এক অর্থে বিদ্রোহিনী নারী, কিন্তু পাঠক-মনোরঞ্জনের উত্তেজক রসদ সে নয়, আধুনিকতা প্রদর্শনের হাতিয়ারও নয় সে। হাইস্কুলের মাস্টার দুর্গাপদর সঙ্গে রাজবালার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্কে অশান্তি প্রবেশ করেছিল সন্তানের কারণে, সন্তান হয়ে, আঁতুড়েই মারা যায়। প্রথম প্রথম সে শুনতো, এটা অদৃষ্টের দোষ, তারপর শুনতো নিজের দোষ। বিদ্রোহ করেনি, কিন্তু তার মনে হয়েছিল, 'অদৃষ্ট আর আমরা! দায়ী করা যেতে পারে মাঝখানে এমন কি কেউ নেই?' এমন কেউ আছে কিনা জানবার পরীক্ষাতেই, অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই নিজের বোন মধুবালার সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দিয়েছে রাজবালা, সতীত্বের পরাকাষ্ঠায় নয়—এ কথাটাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

নারীব্যক্তিত্ব যে দাম্পত্যবন্ধনের চেয়েও মূল্যবান, এ কথা 'যোগাযোগে'র নায়িকা কুমুদিনী আংশিকভাবে হলেও দেখিয়েছিল, জগদীশ গুপ্ত তা দেখিয়েছেন 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসে। কুমুদিনীর মতই পরিণতিতে এই উপন্যাসের নায়িকা কিশোরীকে মেনে নিতে হয় স্বামীকে, কারণ সে বাংলা দেশের মেয়ে। বিদ্রোহ কিছুটা হলেও জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসের নায়িকার মধ্য দিয়ে।

আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের কোন দৃঢ়তা তাকে রক্ষা করে এবং আদর্শ বিবাহ-অনুষ্ঠান কেমন হলে সংগত হয়, এসব জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসে; 'চৌধুরাণী' উপন্যাসেও বক্তব্য কিছুটা এই ধরনেরই। যে বিবাহ-ব্যবস্থার কথা এখানে বলা হয়েছে—বিবাহবন্ধনে মিলনেচ্ছু পাত্রপাত্রী নিজেরাই যাবে কোনো দেব মন্দিরে এবং পুরোহিত তাদের মিলনের স্বীকৃতি দেবেন—এমন ব্যবস্থা বাস্তবে হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু এই আদর্শ বিবাহপদ্ধতি যে তাঁর বিশেষ চিন্তারই ফসল সে কথা আমরা বুঝতে পারি।

খ) পল্লীসমাজের কথা শরৎচন্দ্রই তাঁর উপন্যাসে পরিস্ফুট করেছেন প্রথম, এমন সম্মান শরৎচন্দ্রকে দেওয়া হয় এবং তা যে অযৌক্তিক, এমন কথাও বলা যাবে না। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত যে সামান্য কয়েকটি উপন্যাসে পল্লীসমাজকে উপস্থাপিত করেছেন, তার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে, জগদীশ গুপ্তের গ্রাম্য সমাজ, সমাজের আচার-অনুষ্ঠান এবং গ্রামীণ মানুষদের মনোভাব সম্বন্ধে ধারণা কত প্রখর ও গভীর ছিল। এ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বেশি না থাকলে এসব কথা বলা যায় না।

উপন্যাসে নিটোল কাহিনিগ্রন্থন জগদীশ গুপ্তের খুব পছন্দ নয়, তা সত্ত্বেও তাঁর 'যথাক্রমে' উপন্যাসে কাহিনি আছে—একটি নয়, দুটি। প্রথম কাহিনিতে দীনবন্ধুর আদরের বোন, শান্ত ও অতি নম্রস্বভাবের মেয়ে সাবিত্রী তার কোমল স্বভাবের জন্যই শাশুড়ির কাছে অকথ্য নির্যাতন লাভ করে। একদা জ্বরের প্রবল ঘোরে এর সমাধান সাবিত্রীর মাথাতেই এসে যায় এবং তা প্রয়োগ করে। সুফল যে ফলেছে, অনতিকাল পরেই তা জানা যায়—'এখন শাশুড়ি যদি বলে এক কথা সাবিত্রী শোনায় তাকে দশ কথা—শাশুড়ি যদি তোলে কঞ্চি, সাবিত্রী তোলে বাঁশ।'

দ্বিতীয় কাহিনিতে শহরের পাশকরা ডাক্তার নিত্যপদ সেবাধর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং গ্রাম সম্বন্ধে প্রচুর কল্পিত ভাবাবেগ নিয়ে ক্রমে এসেছে চিকিৎসা করতে, ও সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ফণীভূষণ কেবল রঙিন জল খাইয়ে এবং ডাক্তারির বিশেষ কিছু না জেনেও যে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে কী করে হাত করে রাখতে পেরেছিল, সে কথা নিত্যপদ বুঝতে পেরেছে অনেক পরে। প্রথম কথা, দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে ডাক্তারের ফি ছাড়া উচিত নয়, 'প্রাপ্য ছাড়লে প্রণয় বাড়ে এ কথা ভুল।' দ্বিতীয় কথা নাগরিক ভদ্রতার জ্ঞান এখানে অচল, সকলের সব কথায় থাকতে হবে এবং প্রচুর হৈ চৈ করে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে—প্রচুর শব্দোৎপাদনপূর্বক দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করতে না পারিলে এখানে অস্তিত্বই স্বীকৃত হইবে না।' আর সবচেয়ে বড় কথাটি বুঝতে পেরেছে নিত্যপদ আরো পরে। লোকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে পয়সা খরচে কোনো ত্রুটি করে না, চিকিৎসার ব্যাপারে, কারণ ঔষধের দাম কম হইলে তাহার ফল যাহা দাঁড়ায়, একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহা ভুলিতে পারা যায়—কিন্তু মামলার তদ্বির বে-তাগ্ হইলে তাহার ফল প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে এবং পুরুষানুক্রমে বহন করিতে হইবে।' এই উপলব্ধি প্রাণের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে মনে আসা সম্ভব নয়।

পল্লীসমাজ নিয়ে আরো উপন্যাস জগদীশ গুপ্ত লিখেছেন, যেমন 'রোমন্থন' বা 'দুলালের দেলা', যদিও কাহিনিসূত্র দুটি উপন্যাসেই ক্ষীণ। কিন্তু পল্লীসমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার যে প্রমাণ সেখানে রেখেছে, শুধু সেই কারণেই এগুলি মূল্যবান। 'রোমন্থন' উপন্যাসে শহরের তিন বাবু গ্রাম সম্বন্ধে বহু সংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে গিয়েছেন গ্রামে বাস করতে। সেখানে দারিদ্র্যের যে নিদারুণ ও বাস্তব চিত্র তাঁরা পেয়েছেন, বাংলা উপন্যাসে সেই নির্মম চিত্র সম্ভবত আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। সবচেয়ে বড় উপদ্রব দেখা দিয়েছে সেখানে যেখানে সব ব্যাপারে চড়াও হয়ে মোড়লি করার দরকার হয়। বাবুরা তা করতে পারেন নি, সেই কারণে সেখানে বাসের মেয়াদ তাঁদের ফুরিয়েছে। 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে একটি কিশোর এফ্. এ. পরীক্ষা দিয়ে গ্রাম দর্শন করতে গিয়েছে। গ্রাম সম্বন্ধে মোহ তারও ছিল, কিন্তু গ্রামের আচার আচরণে যে কুশ্রীতার পরিচয় সে পেয়েছে, তাতে তারও গ্রামবাস দীর্ঘায়ত হয় নি।

গ) এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি মানুষের জীবনে অনড় হয়ে বসে আছে, তার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও প্রয়াসকে এক ফুৎকারে, সে উড়িয়ে দেয়—এই ধরনের এক অদৃষ্ট-চেতনা জগদীশ গুপ্তের বেশ কিছু উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। 'লঘুগুরু' উপন্যাসে আমরা দেখেছি, গণিকা উত্তম তার আপ্রাণ প্রযত্ন সত্ত্বেও টুকিকে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। 'রোমন্থন' উপন্যাসে অভয়ের বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এই ক্রূর নিয়তি, এরকম দৃষ্টান্ত তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও প্রচুর আছে, আমরা মূলত দুটি উপন্যাসের উল্লেখ করবো—'রতি ও বিরতি' ও 'অসাধু সিদ্ধার্থ'।

'রতি ও বিরতি' উপন্যাসের নায়ক রাম একজন ভিক্ষুক। মানুষ কী করে ভিক্ষুকে পরিণত হয় এবং এই পরিণতি ঘটলে মানুষের কী ধরনের মানসিক পরিবর্তন ঘটে, তার যে অসহ বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই উপন্যাসে নিয়তির ভূমিকায় দেখা দিয়েছে একটি কালসর্প। এই সর্পের কামড়েই রামের পুত্র মারা যায়, আবার এই কালসর্পের দংশনেই রামের জীবনাবসান হয়েছে। রামের ভাগ্যকে নিয়ে যেন পুতুলখেলা করেছে এই বিষধর সর্প। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত নটবেরর নামে একটি মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর জৈব প্রয়াস দেখিয়েছেন। বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই আছে—নটবরের মতো অতি ঘৃণ্য মানুষ—জীবনে বহু কদর্য কাজ যাকে করতে হয়েছে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য, নিজের পরিচয় বদলে সে সিদ্ধার্থ করে নিয়েছিল, ওই বাঁচারই তাগিদে। জীবনে যতদিন শুধু জৈব অস্তিত্বরক্ষার স্পৃহা ছিল, জীবনধারণে কোনো অসুবিধা তার হয় নি; কিন্তু জীবনে যখন সত্যিই মানুষের মত বাঁচার প্রেরণা এল, শুদ্ধতার চেতনা এল, তখনই তার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচিত করা গেল। নিয়তি এইভাবেই তার শুদ্ধতাভিসার ভেঙে চুরমার করে দিল।

২.৪.৩ ভাষাবিচার

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের নামকরণ ও ভাষাশৈলি সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য বোধহয় করা দরকার। যে সব উপন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকেই অনুমান করা যাবে, নামকরণের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী। 'দুলালের দোলা' 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' কিংবা 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' যে কোনো গুরুগম্ভীর উপন্যাসের নাম হতে পারে এ কথা বিশ্বাস করাই আমাদের পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে। ছোটগল্পের নামকরণে এইরকম স্বেচ্ছাচার আমরা আরো অনেক বেশি দেখতে পাই।

উপন্যাসের বিষয়ে শুধু নয়, ভাষারীতিতেও এমন এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জগদীশ গুপ্ত, যে সে বিষয়েও কিছু মন্তব্য করা দরকার। জীবনকে যেমন বস্তুগতভাবে দেখেছেন, ভাষাভঙ্গিতেও সেই নির্বোদ মানসিকতা বজায় রেখেছেন লেখক। কেমন যেন সংবাদ পরিবেষণার ভাষা—কোনো উচ্ছ্বাস নেই, বাহুল্য নেই। যেন উপন্যাস লিখছেন না, লিখছেন কোনো প্রবন্ধ। সম্ভবত সেই কারণেই 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক মন্তব্য করেছন—'উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের, বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।'

২.৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৫.১ সাধারণ পরিচয়

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্য শাসন করেছেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম। ছোটগল্প ও উপন্যাস দু-ধরনের প্রকরণেই তাঁর সমান স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও তুলনামূলকভাবে উপন্যাসগুলিই তাঁর বেশি সমর্থ এবং জনপ্রিয়। দীর্ঘকাল ধরে উপন্যাস লিখেছেন, বলা যেতে পারে আমৃত্যু এবং সেইসব উপন্যাস পর্ব পর্বান্তরে স্বাদ বদল করেছে বলে উপন্যাসগুলির আলোচনা পর্বভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে সেইভাবে পর্বগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার আগে ঔপনাসিক হিসাবে তাঁর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে রাখা প্রয়োজন।

ক. উপন্যাস রচনায় তারাশঙ্করের একটা ধ্রুপদী বা ক্লাসিক আদর্শ ছিল মনে করাই ভালো। অর্থাৎ আধুনিক সময়ের উপযোগী হবার জন্য সমসাময়িক বিপর্যয়ের চিত্রগুলি উপন্যাসে উপস্থাপনের প্রয়োজন তিনি বোধ

করেননি। জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন। উপন্যাসের কলেবর অনেক সময়ই দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে ভাবিত হবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেছেন বলে মনে হয়না। নিজে গান্ধীবাদী রাজনীতি করতেন, উপন্যাসে তার প্রভাবও খুব গভীরভাবে পড়েছে বলে মনে হয়না।

খ. তারাশঙ্করকে অনেকেই আঞ্চলিক উপন্যাসের পথিকৃৎ মনে করে, কারণ রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চলকে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন, এর মধ্যে পরিপূরক-ত্রয়ী বা ট্রিলজি উপন্যাসও এমনভাবে এঁকেছেন যে, সমগ্র রাঢ় অঞ্চলই তাঁর কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গ. আঞ্চলিক মানুষের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করার জন্য তাদের মুখের আঞ্চলিক ভাষাও তারাশঙ্কর গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে, অর্থাৎ এই ভাষা বৃহত্তর পাঠক-সাধারণের বোধগম্য হবে কি না, এ সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধা ও অস্বস্তি তারাশঙ্করের ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সমর্থন পেয়ে এ বিষয়ে সংশয় তাঁর দূর হয় এবং অসংকোচে এই ভাষা তিনি ব্যবহার করতে থাকেন। অবশ্য উত্তরপর্বে তাঁর উপন্যাস যখন বেশিরভাগই নগরকেন্দ্রিক হয়ে আসে, তখন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন তাঁর আর ঘটে নি।

২.৫.২ তারাশঙ্করের উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

তারাশঙ্করের রচিত উপন্যাস উৎকর্ষে বড় তো বটেই, কিন্তু পরিমাণেও নিতান্ত কম নয়। বিষয়বৈচিত্র্যও উল্লেখ করার মতো। সুতরাং পর্ব-অনুযায়ী তাদের খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে পর্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আমরা মোটামুটি তিনটি পর্বে তাঁর উপন্যাসগুলি বিন্যস্ত করতে পারি :

ক. উন্মেষ পর্ব

খ. ধ্রুপদী পর্ব

গ. আধুনিক পর্ব

উন্মেষ পর্বে আমরা চৈতালি ঘূর্ণি, রাইকমল প্রভৃতি সেইসব উপন্যাসকে স্থান দিতে পারি যেগুলি আয়তনে বিশেষ বড় নয়, কোনো-কোনোটিকে বড় গল্প আখ্যা দেওয়াও অসম্ভব নয়। দীর্ঘ উপন্যাসের বীজ এদের মধ্যে নিহিত থাকলেও সম্ভবত প্রাথমিক প্রয়াস বলেই এদের আয়তন দীর্ঘ করা হয়নি। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের জন্যই তারাশঙ্করের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বেশি, এগুলি তাঁর স্বাতন্ত্র্যেও বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত বলা যায়। ধ্রুপদী রীতিতে রচিত বলেই এদের আয়তন নিয়ে তারাশঙ্করকে বিশেষ চিন্তা করতে হয় নি। আজ পর্যন্ত তারাশঙ্করের পরিচয়বাহী উপন্যাস বলতে এগুলিরই নাম করতে হয়। এদের মধ্যে আছে ধাত্রীদেবতা, কবি, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা প্রভৃতি উপন্যাস। তৃতীয়পর্বের উপন্যাসে তারাশঙ্কর শহরমুখী হয়েছেন। সামন্ততন্ত্র, গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয়, পল্লীসংস্কৃতির হ্রাসপ্রাপ্তি ইত্যাদির বদলে শহর ও নাগরিক সমস্যাকে তিনি বেছে নিয়েছেন। এই পর্বের উপন্যাসের মধ্যে পড়তে পারে বিচারক, সপ্তপদী, মঞ্জুরী অপেরা প্রভৃতি।

২.৫.৩ তারাশঙ্করের উপন্যাসের পরিচয়

ক তারাশঙ্করের উন্মেষ পর্বের উপন্যাসে একদিকে আমরা দেখি শরৎচন্দ্রীয় উত্তরাধিকার নিম্নবিত্ত সংসারের পারিবারিক সমস্যা, অন্যদিকে অবক্ষয়িত বৈষ্ণব সমাজের চিত্র। 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৩) উপন্যাসে নাটকীয় ঘটনা খুব বেশি। সচ্ছল কৃষক পরিবারের কর্তা শ্রীমন্ত একটি অযোগ্যপাত্রের হাতে নিজের ভাগিনেয়ীকে সমর্পণের চেষ্টা প্রতিহত করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত কারাবরণ করেছে। শ্রীমন্তর কারাবাসে স্বাধীনচেতা গিরির অবস্থা হয়েছে করুণ। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের অভিঘাতে ক্লান্ত গিরি স্বামীর বন্ধু বিপিনের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন অনাথ সন্তান নীলকণ্ঠ আশ্রয় পেয়েছে শ্রীমন্তর কাছে।

'রাইকমল' (১৯৩৪) উপন্যাসে তারাশঙ্করের বিশিষ্ট সৃষ্টিপ্রযত্নের একটি আভাস পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সমাজের রোমান্টিক আবহাওয়ায় এই উপন্যাস লালিত। বৈষ্ণব জীবনচর্যা, রাধাকৃষ্ণের সেবা, আশ্রমের পরিচর্যা, মাঝে মাঝে বৈষ্ণব পদাবলীর কলি এই উপন্যাসে এমন এক ধরনের মাদকতার সৃষ্টি করে যে কাহিনিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা—রসিকদাসের সঙ্গে রাইকমলের বিবাহ আদৌ বিশ্বাস্য কিনা, এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগেনা।

বরং তুলনামূলক ভাবে প্রথম পর্বে রচিত 'পাষাণপুরী' উপন্যাসটি অনেক উন্নতমানের। পরবর্তীকালে জরাসন্ধ কারাগারকে অবলম্বন করে যেসব জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করেন, এটিকে তার সূচনা বলা হয়। কারাগারে অসুস্থ পরিবেশেও মানবমহিমার জয়গাথা এর মূল অবলম্বন। নরুর জীবনাদর্শ পাতালপুরীকে স্বর্গলোকে পরিণত করেছে, কিন্তু বলা বাহুল্য এই পরিবেশ ক্ষণস্থায়ীই হয়, চিরস্থায়ী হতে পারে না।

প্রথম পর্বের উপন্যাসের মধ্যে 'আগুন'-এর নামও করতে হবে, কারণ অরণ্যপ্রকৃতির ওপর যন্ত্রশক্তির প্রাধান্য, ভেতরে ভেতরে প্রাচীন প্রথার সুনিশ্চিত অবলুপ্তি জেনেও তার প্রতি মমত্ববোধ ইত্যাদি লেখকের বিশিষ্ট মানসিকতা এখানে প্রকাশিত।

খ. তারাশঙ্করের উন্মেষপর্বের কালসীমা যদি ধরি 'আগুন' উপন্যাসের অর্থাৎ ১৯৩৭ সাল, বা তার একবছর পরে, তবে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস থেকেই তারাশঙ্করের মূল রচনাপর্বের কালসীমা শুরু হবে। মোটামুটিভাবে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। এর মধ্যেই তারাশঙ্কর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি রচনা করেন। এগুলি হল—'ধাত্রী দেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪) 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'কবি' প্রভৃতি। 'আগুন' উপন্যাসে যার সূচনা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রশক্তির সাহায্যপুষ্ট নবোদ্ভুত ধনতান্ত্রিক সমাজের সংঘর্ষ, বিলীয়মান পল্লীসংস্কৃতি, রাঢ়ের সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রা—এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাই এই পর্বের উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। অবশ্য তাই বলে ব্যক্তিগত সমস্যাও যে একেবারেই নেই, সে কথা বলা যাবে না।

ধাত্রীদেবতা-গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাস তিনটিকে একটি ট্রিলজি বলাই ভালো। রাঢ়ের জীবনযাপন প্রণালী, মানুষের মূল্যবোধ, পর্বান্তরের সূচনা—সবকিছুই যেন সামগ্রিক ভাব ধরা হয়েছে এখানে। প্রথম দুটি উপন্যাসে পাই জমিদার গোষ্ঠীর সংস্কারলালিত জীবনে আধুনিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ এবং তৃতীয় উপন্যাসে পাই রাঢ়ের সাধারণ মানুষের জীবনে জটিল সমস্যা উদ্ভব। 'ধাত্রীদেবতা'য় জমিদার সন্তান শিবনাথের যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত কালসীমা বর্ণিত হয়েছে। স্নেহময়ী ও কোমলস্বভাবের মা এবং 'জমি বাপের নয়, দাপের', এ কথা যিনি বলেন, সেই জমিদারি মেজাজের পিসিমা—এই দুই নারী ব্যক্তিত্বের টানাপোড়েনে চরিত্রটি গঠিত। সেইসঙ্গে সমসাময়িক রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ ও অসহযোগ আন্দোলনও তাকে প্রভাবিত করে। 'গণদেবতা'-য় পাই আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনি। আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে গ্রাম্য অর্থনীতির বিপর্যয় এবং গ্রামীণ আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির অবলুপ্তি এই উপন্যাসের বিষয়। জমিদার দ্বারিক চৌধুরী নেমে এসেছেন সাধারণ কৃষকের পর্যায়ে। বিত্তের প্রভাবে বর্ণ কৌলীন্য লাভ করতে চাওয়ার দৃষ্টান্ত ছিরু পাল—সে শ্রীহরি পাল হিসাবে জাহির করে নিজেকে। দেবু পণ্ডিত গ্রামে নতুন এক আদর্শের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে, কিন্তু গ্রামের বিলম্বিত লয়ের জীবনচর্যায় তা ছন্দপতন বলেই মনে হবে। আর এক স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরের ন্যায়রত্ন, যদিও উপন্যাসে তাঁর কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। কাহিনীর পূর্বানুবৃত্তি বরং আছে 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে। ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে এটিকেই সব চেয়ে সার্থক বলা উচিত। এই উপন্যাসে কাহিনি যদিও মাঝে মাঝে অতিনাটকীয় হয়ে পড়েছে, চরিত্রগুলির পরিণতি একেবারে সঠিক, বিশেষত দেবু পণ্ডিত অর্থাৎ দেবু ঘোষ।

'কালিন্দী' উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে খুব অভিনবত্ব নেই, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারশ্রেণির সঙ্গে ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিভূ বিমল মুখার্জির সংঘাত এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পূর্বাভাস। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-য় প্রাচীন লোকসংস্কারাশ্রিত জীবনের প্রতিভূ

বনোয়ারি এবং আধুনিক কালের মানুষ করালীচরণ। এই দু'জন বা দুটি জীবন্তদৃষ্টি সংঘাতই উপন্যাসের অবলম্বন। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'-র অবলম্বনও অনেকটা তাই। বরং 'কবি' উপন্যাসে সংঘাতের চেয়ে গ্রাম্য কবিগান এবং ঝুমুর গোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালীই অনেক প্রাধান্য পেয়েছে। কিছুটা ব্যক্তিগত সমস্যাও এখানে উঠে এসেছে। 'জীবন এত ছোট কেনে' এবং 'ভালোবেসে মিটিলনা সাধ'—এই দু'টি গানই হল এই উপন্যাসের নির্যাস।

তারাশঙ্করের তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসের সূচনা হিসাবে আমরা ধরেছি 'আরোগ্য নিকেতন' (১৩৫৯)। এটি অবশ্য নাগরিক উপন্যাস নয়, কিন্তু প্রাচীনপন্থী কবিরাজ জীবন মশায়ের সঙ্গে আধুনিক ডাক্তারের সঙ্গত এখানে নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাই। সেই হিসাবে একে আধুনিক সমস্যাই বলব আমরা। অন্তত গোষ্ঠী ছেড়ে ব্যক্তিক সমস্যার বৃত্তে যে নেমে এসেছেন তারাশঙ্কর, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি উপন্যাসই অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাই পৃথকভাবে আলোচনা করে লাভ নেই, শুধু বলা যায়, আধুনিক জাটিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর করে লিখেছেন বিচারক (১৯৫৬), ধর্মীয় সংস্কার ও প্রেম-মনস্তত্ত্বের নিপুণ মিশ্রণে লিখেছেন 'সপ্তপদী' (১৯৫৭), একটি বিশেষ সময়ের বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনকে অবলম্বন করে লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাধা' (১৯৫৮), ওই একই সালে লেখা যুদ্ধের পটভূমিকায় বিচিত্র প্রেমোপাখ্যান 'উত্তরায়ণ'। এ ছাড়াও 'মহাশ্বেতা' (১৯৬০), যোগভ্রষ্ট (১৯৬০) প্রভৃতি তাঁর শেষ পর্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

তারাশঙ্করের উত্তরপর্বের উপন্যাসে রাজনীতি প্রায়ই একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং কোনো কোনা ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দৃষ্টি শিল্পকীর্তিকে আচ্ছন্ন করেছে।

২.৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

এমন একটি সময়ের বিভূতিভূষণের আবির্ভাব, বাংলা সাহিত্যকে যখন বলা চলে একটা প্রশ্ন চিহ্নের যুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই স্থির ও ধ্রুববিশ্বাসে ফাটল ধরতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত সৃষ্টি সমকালীন কল্লোলীয়দের খুশি করতে পারছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতো শিল্পীও নিটোল উপন্যাসসৃষ্টি থেকে শুরু করে বিরত ছিলেন। আসলে যে আস্তিক্য মনোভাব উপন্যাসশিল্পের জন্ম দিতে পারে, সেই মনোভাবই আজ সংশয়াচ্ছন্ন। সেই সময়ে বিভূতিভূষণের হাতে 'পথের পাঁচালি'-র মতো উপন্যাসের জন্ম একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

বিভূতিভূষণের মানসিকতার বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে দু-ধরনের ঔপন্যাসিক আছেন—(ক) জ্ঞানমার্গীয়, যাদের কাকপন্থী বলা যায় অর্থাৎ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা যাঁরা জীবনের রূপ ফুটিয়ে তুলতে চান, (খ) আস্বাদনপন্থী বা কোকিলবৃত্তের লেখক, জীবনকে যাঁরা উপভোগ করতে চান। বিভূতিভূষণ এই দ্বিতীয় ধরনের লেখক।

ব্যক্তিগত জীবনে যিনি ছিলেন নিতান্ত সরল ও সাদাসিধা মানুষ, রচনাভঙ্গিও তাঁর আটপৌরে। ভঙ্গি দিয়ে চোখ না ভুলিয়ে অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতাতেই পাঠককে তিনি মুগ্ধ করেছেন। বিষয়ের বৈচিত্র্যও তাঁর উপন্যাসের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য, প্রেম ও রোমান্স সৃষ্টিতে তাঁর খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায় না, কিন্তু জীবনের সহজ সরল কাহিনিতে তিনি স্বাচ্ছন্দ এবং স্বভাবত সেই কারণেই তিনি বাংলা উপন্যাসের এক অতি জনপ্রিয় শিল্পী।

২.৬.১ বিভূতিভূষণের উপন্যাস

'পথের পাঁচালি' (১৯২৯) ও 'অপরাজিত' (১৯৩২) উপন্যাস নিয়ে বিভূতিভূষণের আত্মপ্রকাশ। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যখন অগ্নিগর্ভ, তখন নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের প্রশান্ত সরল জীবনের চিত্র আঁকা লেখকের পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক কিনা, এ প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছেন। এখানে আমাদের বক্তব্য

অতি স্পষ্ট। গ্রামের বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও সুবিশাল দারিদ্র্যের ছবি বিভূতিভূষণ আঁকেননি বললে সত্যভাষণ করা হবে না। চরম বিপর্যয়ের ছবি তিনি এঁকেছেন, কিন্তু সমস্ত কাহিনিবৃত্তই একটি মুগ্ধ বালকের চোখে দেখা বলে তার মধ্যে এক বিস্ময়াবিষ্ট সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। লেখকের জীবনদৃষ্টিই এক জন্য দায়ী।

উপন্যাসদুটিকে আত্মজৈবনিকও কেউ কেউ মনে করেন। উপন্যাসের নায়ক অপু বা অপূর্ব বিভূতিভূষণেরই আত্মপ্রক্ষেপ বলে কারো কারো মনে হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছেন—'বল্লালী-বালাই', 'আম আঁটির ভেঁপু' এবং 'অক্রূর সংবাদ' (প্রথম নাম ছিল 'উড়ো পায়রা')। গ্রামীণ পরিবেশে বর্ধিত এক বিশেষ পরিবারের বিস্তৃত কালযাপনের বর্ণনা সূত্রে যেন লেখক জীবনপথের একটি ধারাবাহিক চিত্রই অঙ্কন করতে চেয়েছেন। পথের এই পাঁচালির প্রথমভাগে কৌলিন্যপ্রথার কুফল স্বরূপ ইন্দির ঠাকুরণের দুঃসহ জীবন, সেই জীবনের অবসানে যেন একটা যুগের সমাপ্তি। অতঃপর অপু-দুর্গার নির্মম দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বপ্নদেখার ও স্বপ্নালু দৃষ্টিতে জীবনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পাঠ দেখানো হয়েছে, তাই এর নাম আম আঁটির ভেঁপু। দুর্গার অকালপ্রয়াণে এই পর্বের সমাপ্তি এবং নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ছেড়ে প্রবাস যাত্রায় অক্রূর সংবাদের সূচনা।

'পথের পাঁচালী'-র পথ যে সত্যই দীর্ঘ, নিশ্চিন্দিপুরের মতো ছোট একটি গ্রামের পথেই যে তা আবদ্ধ নয়, এ কথা উপন্যাস আরো অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝতে পারি। প্রথমে কাশীর একেবারে অপরিচিত জীবন, জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে পরিচয়েরও সেই সূচনা। এরপর মনসাপোতার জীবন। মায়ের ইচ্ছা পৌরোহিত্যের জীবন, কিন্তু অপু তা গ্রহণ করেনি, পড়াশুনোর জীবনই সে গ্রহণ করেছে। এরপর তার কলকাতায় কলেজ জীবন নিশ্চিদ্র দারিদ্র্যের জীবন। মায়ের মৃত্যু এবং আকস্মিক বিবাহ তার জীবনে এরপর দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুর দীর্ঘ প্রবাসজীবন যেন এই উপন্যাসের নামকরণের পরোক্ষ সমর্থন। পথের পরিক্রমা শেষ হয়েছে পুত্র কাজলকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসায়।

পথের পাঁচালী-অপরাজিত-য় অপু গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছিল, 'আরণ্যকে' (১৯৩৯) সত্যচরণ শহর থেকে গ্রামে এল। দু'জনেই আসলে বিভূতিভূষণের ছদ্ম-আমি ছাড়া বিশেষ কেউ নয়। আরণ্যকে যে জগৎ আমরা দেখতে পাই সে জগতের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ছিল না, সে দারিদ্রের সঙ্গেও নয়। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন এখানেও উঠবে। সত্যচরণ যে কাজে লবটুলিয়ার জঙ্গলে এসেছিল, তাকে নির্মম কাজ হিসাবেই অভিহিত করা যায়। নদীর গর্ভে বিলীন জমি আবার জেগে ওঠার পর সেখানে প্রজাপত্তন করা—অবশ্যই পুরনো প্রজার বদলে নতুন প্রজার সম্মান কারণ তাতে অর্থসংগ্রহ অনেক বেশি হবে। এই নিষ্ঠুর জমিদারি চালের পরিবর্তে এক মুগ্ধ প্রকৃতিবোধ যে উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যে প্রায় অনন্য করে রেখেছে, তার কারণ সত্যচরণের আদ্যন্ত নাগরিক চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে ব্যাপ্ত, বিশাল ও ভয়ংকর-সুন্দর আরণ্য প্রকৃতিকে।

'আরণ্যক' বিভূতিভূষণের চতুর্থ উপন্যাস। তৃতীয় উপন্যাস 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫) এবং পরে 'দেবযানে' প্রথম দুটি উপন্যাসের উন্নত মান লেখক বজায় রাখতে পারেন নি, এমন কথা অনেকে মনে করেন। এ দুটি উপন্যাসেই বিভূতিভূষণ এঁকেছেন মরণোত্তর জীবনের ছবি। এই অতিলৌকিক জগৎ বাস্তব জগতের মতো আলোকিত হতে পারে নি এবং তাঁর বস্তুনিষ্ঠার মাহাত্ম্য যেন কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে, এমন কথা কেউ কেউ মনে করেন।

বহু বিচিত্র ধরনের উপন্যাস বিভূতিভূষণ লিখেছেন। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪৩) উপন্যস একেবারে আটপৌরে উপন্যাস। রানাঘাট স্টেশনে হাজারি ঠাকুরের এই হোটেল কী ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এই উপলক্ষে জীবনের সুখদুঃখের সাধারণ গল্প, অথচ অসাধারণ শক্তিশালী কলমে পরিস্ফুট। এইরকম সাধারণ পরিবারের গল্পই পাই 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১) উপন্যাসে। সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভূতিভূষণ লিখেছেন 'অনুবর্তন' (১৯৪২) উপন্যাস। আদর্শ শিক্ষাবিদের জীবন নিয়ে আশ্চর্য এই মানবিক সৃষ্টিকর্মটি ঈষৎ অপরিচিত হলেও এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে। আরো অনেক উন্নতমানের উপন্যাস বিভূতিভূষণ লিখেছেন, সেগুলি বেশ কিছুটা

জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। তবে 'ইছামতী' (১৯৪৯) উপন্যাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিভূতিভূষণ কিশোরদের উপযোগী উপন্যাসেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিশেষত তাঁর 'চাঁদের পাহাড়' আজ পর্যন্ত একটি ধ্রুপদী কিশোর সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

২.৭ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

বাংলা কথাসাহিত্যের একজন নিষ্ঠ ও সচেতন শিল্পী হিসাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিতি। উপন্যাস তিনি সংখ্যায় খুব বেশি লেখেন নি, কিন্তু অত্যন্ত অল্প বয়সেই তিনটি অসাধারণ উপন্যাস লিখে তিনি পাঠকদের চমৎকৃত করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের রোমান্টিক বাতাবরণ ছিন্ন করে তিনি যে বস্তুবাদী নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, বাংলা কথাসাহিত্যে তা অভিনব, সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে অবশ্য মার্কসবাদে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর সৃষ্টিকর্মে এক লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্ববর্তী পর্বে তাঁর রচনাকর্মের সঙ্গে যথাস্থিতবাদী বা ন্যাচারালিস্ট সাহিত্যিকদের রচনায় সাদৃশ্য দেখা যেত, কিন্তু উত্তরপর্বে তিনি উদ্দেশ্যভিত্তিক সাহিত্যকর্মের প্রতি বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য মহৎ সাহিত্যিক ছিলেন বলেই এতে তাঁর রচনাসৌকর্যের খুব বেশি তারতম্য ঘটেছে বলে আমরা মনে করি না, কিন্তু দুটি পর্বের রচনায় আস্বাদের পরিবর্তন যে ঘটেছে এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

২.৭.১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

প্রথম আবির্ভাবেই সচকিত করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চারটি উপন্যাসের মাধ্যমে। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'জননী' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য', ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি'। এর মধ্যে প্রথম দুটি উপন্যাসের মধ্যে 'জননী' আপাতদৃষ্টিতে সরল, কিন্তু 'দিবারাত্রির কাব্য' আদ্যন্ত সাঙ্কেতিক। জননী উপন্যাসে শ্যামা চরিত্র অবলম্বন করে দেখানো হয়েছে নারীর জীবনে জননী-স্তরটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি অবশ্য কোনো আদর্শায়িত ধারণা থেকে নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বর্ণিত। কিন্তু দিবারাত্রির কাব্য' বাংলা সাহিত্যে কেন, কোনো ভাষার সাহিত্যেই সুপ্রচুর রচিত হয় না। ভূমিকায় চরিত্রগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখক বলেই দিয়েছেন—'চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection, মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।' কাহিনিবিভাগ এরকম উপন্যাসে কমই থাকে, তবু বলা যায় এর প্রধান চরিত্র চারটি—হেরম্ব-সুপ্রিয়া, অশোক ও আনন্দ। তিনভাগে বিভক্ত উপন্যাসের প্রথমভাগ দিনের 'কবিতা'-য় হেরম্ব-সুপ্রিয়ার প্রাক্-বিবাহ প্রেম সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত পুলিশের দারোগা অশোকের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিবাহ, পাঁচ বছর পরে সুপ্রিয়ার বিবাহ, হেরম্বর কাছে ফিরে আসার চেষ্টা কিন্তু উদাসীন। দ্বিতীয়ভাগ 'রাতের কবিতায়' স্বর্গীয় সুষমার মূর্তরূপ আনন্দর প্রতি হেরম্বর আকর্ষণ, নর্তকী আনন্দ ও হেরম্বর সম্পর্ক। তৃতীয়ভাগ 'দিবারাত্রির কাব্য' সুপ্রিয়ার ভালোবাসার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, হেরম্ব সুপ্রিয় ও আনন্দর মধ্যে কাকে ভালোবাসে এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত—অবসিতপ্রায় যৌবনে আনন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় না, সুপ্রিয়ার বিদ্রোহেরও শরিক হওয়া অসম্ভব।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্ভবত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। গাওদিয়া গ্রামের শশী শহর থেকে ডাক্তারি পাশ করে আসার পরে না পারে গ্রাম্য মানসিকতা মেনে নিতে, না পারে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে। এই সঙ্গে মতি ও কুমুদের বৃত্তান্ত জুড়ে তৈরি হয়েছে এক আদর্শ উপন্যাস যেখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছের প্রায় কিছুই মূল্য নেই, আদর্শ নিয়তির হাতে মানুষ পুতুলের মতো নাচছে। 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবেরও প্রায় সেইরকমই হোসেন মিয়ার হাতের পুতুল—যেন তার অলঙঘ্য নির্দেশেই স্ত্রীকে ছেড়ে শ্যালিকা কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপ চলে যেতে হয় তাকে।

প্রথম পর্বে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল 'অহিংসা', 'অমৃতস্য পুত্রা', 'সহরতলী',

'চতুষ্কোণ' ও 'প্রতিবিম্ব'। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'সহরতলী' ও 'চতুষ্কোণ'। দু-খণ্ডে রচিত 'সহরতলী' উপন্যাসে সমাজের একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষদের গল্প শুনিয়েছেন লেখক। মতি, সুধীর, ধনঞ্জয়, জগৎ, চাঁপা প্রভৃতি এই সমাজের মানুষ। যশোদা এবং সত্যপ্রিয় এই সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছে। চরিত্রদুটি অসাধারণ দক্ষতায় অঙ্কিত ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী অথচ পরিপূরক চরিত্র। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটি ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়। এর নায়ক রাজকুমার যৌন বিকারকে খুব স্বাভাবিক 'অ্যাকসিডেন্ট' হিসাবে গ্রহণ করে।

পরবর্তী সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব উপন্যাস রচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জয়ন্তী' (১৯৪৮) এবং দু-খণ্ড সমাপ্ত 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১-৫২)।

২.৮ অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২)

সাহিত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এবং কৃচ্ছ্রসাধনকারী অন্নদাশঙ্কর রায় পাঠকমহলে প্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা পান নি। কৃতবিদ্য ও I.C.S পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী এই মানুষটি শ্লাঘনীয় চাকরিতে পদত্যাগ করেছিলেন লেখার জন্যই, আমেরিকান পত্নীকে কায়িক ক্লেশ ও দারিদ্র্যের মধ্যে রেখেছেন এই কারণেই, বার্ধক্যের বিশ্রাম বর্জন করে নিয়ম করে টেবিলে বসে লিখে গিয়েছেন, তবু যদি পাঠকের মন জয় করতে না পারেন সে এই জন্য যে তাঁর লেখা ব্যতিক্রমী ও বুদ্ধিবৃত্ত—জনপ্রিয়তার মোহে তা থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি।

অন্নদাশঙ্কর রায় বরং যে জাতীয় রচনায় প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন, সে হল ছড়া। 'তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর ওপর রাগ করো'—আজও অনেক মানুষের মুখে। তিনি প্রবন্ধপুস্তক, সাম্প্রতিক সমস্যা বিষয়ক নিবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি এবং অবশ্যই ছোটগল্প লিখেছেন বিস্তর। এক জীবনে এত কিছু করতে পারা দুঃসাধ্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

জনপ্রিয়তা অন্নদাশঙ্করের অদৃষ্টে খুব বেশি না জুটলেও স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি অনেক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার প্রশংসা করেছেন, 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ কাহিনি সমসাময়িক প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভ্রমণকাহিনি 'জাপানে'-র জন্য ১৯৬৩ সালে তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য-আকাদেমি পুরস্কার, ঔপন্যাসিক হিসাবে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার ১৯৮৩ সালে এবং দ্বিতীয়বার আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৯৪ সালে, প্রবন্ধ সমগ্রের জন্য।

২.৮.১ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস : পঞ্জি

অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাসের সামগ্রিক আলোচনার আগে উপন্যাসগুলির উল্লেখ করা দরকার, কারণ আলোচনায় আমরা শুধু উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির কথাই বলবো।

অন্নদাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'অসমাপিকা' (১৯৩০)। অতঃপর যে উপন্যাসগুলি তিনি রচনা করেন সেগুলি হল :

আগুন নিয়ে খেলা (১৯৯০)
পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩০)
সত্যাসত্য (১৯৩২-১৯৪২। ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ)
রত্ন ও শ্রীমতী (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)
বিশল্যকরণী
তৃষ্ণার জল
ক্রান্তদর্শী (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)

২.৮.২ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস : আলোচনা

বাজার চলতি উপন্যাস লেখেন না বলে একদা অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর উপন্যাস মননপ্রধান। লেখকের নিজের জীবনদৃষ্টি এবং বক্তব্য উপন্যাসে অবশ্যই প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু তার ফলে আখ্যান ও চরিত্রগুলি নীরস ও নীরক্ত হয়ে পড়লে উপন্যাস আকর্ষণীয় হতে পারে না। অন্নদাশঙ্করের চিন্তার বিষয় ভালো ছিল, কিন্তু তা উপস্থাপিত করতে গিয়ে প্রতিভার 'গৃহিণীপনা' তিনি বিশেষ দেখাতে পারেন নি। সংযমও লেখার একটি গুণ। প্রত্যেকটি উপন্যাস সুদীর্ঘ হয়ে পড়লে পাঠককে ধরে রাখা শক্ত, এবং যে উপন্যাসের পাঠক নেই তা লেখার অন্তত আংশিক উপযোগিতা কমে যেতে বাধ্য।

'আগুন নিয়ে খেলা' এবং 'পুতুল নিয়ে খেলা' একই উপন্যাসের পরিপূরক অংশ বলা যেতে পারে। সোম দুটি উপন্যাসেরই নায়ক। এক ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ প্রেম প্রথম উপন্যাসের বিষয় এবং সেই কারণে সোমের বিবাহে প্রতিবন্ধকতা দ্বিতীয় উপন্যাসের বিষয়।

'সত্যাসত্য' উপন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যপ্রতীচ্যের মিলন, সে কথা লেখক বলেছেন। আসলে ছ-টি উপন্যাস নিয়ে এটি একটি বিশাল উপন্যাস। এই ছ-টি উপন্যাস হল—'যার যেথা দেশ', 'অজ্ঞাতবাস', 'কলঙ্কবতী' 'দুঃখমোচন', 'মর্ত্যের স্বর্গ' এবং 'অপসারণ'। প্রাচ্য এবং প্রাতীচ্যের জীবনাদর্শের উপস্থাপনা এবং আদর্শ জীবনচর্যা কী হতে পারে এই নিয়ে প্রচুর কথোপকথনে উপন্যাস শেষ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র—নায়ক বাদল সেন, নায়িকা উজ্জয়িনী, বাদল, সুধী, মিঃ ওয়েলি দাবারু, বিলি, ফ্রাউ, মারিয়ান ভাইসম্যান প্রমুখ।

'রত্ন ও শ্রীমতী', 'বিশল্যকরণী' এবং 'তৃষ্ণার জল' উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর ধরতে চেয়েছেন Eternal Feminine কে। 'ক্রান্তদর্শী' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে লেখা, শেষ হয়েছে ভারতবিভাগে।

২.৯ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরচনা অপেক্ষা সাহিত্যিক আলোচনার জন্যই অধিকতর লব্ধপ্রতিষ্ঠ'। চূড়ান্ত বুদ্ধিবাদী এই সাহিত্যিক বুদ্ধির যে পরিচয় তাঁর উপন্যাসে দিয়েছেন, সাহিত্যিক প্রতিভার প্রমাণ সে অনুপাতে দিতে পারেন নি।

ইংরেজিতে যাকে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস, বাংলায় সেই জাতীয় উপন্যাস লেখার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। উল্লেখ করার মতো উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন তিনটি— 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহনা', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তিনটিকে একসঙ্গে একটি ট্রিলজি উপন্যাস বলাই ভালো, কারণ চরিত্রগুলি তিনটি উপন্যাসে অভিন্নই আছে। উপন্যাসের মূল বিষয় দুটি নরনারীর গভীর গোপন ও জটিল হৃদয়সম্পর্ক—যারা চরিত্রগত ভাবে অন্তত পরিশীলিত, মার্জিত ও পরিণত। উপন্যাসে এ দুটি চরিত্র খগেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীর বান্ধবী রমলা।

২.১০ গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩)

প্রধানত প্রাবন্ধিক হিসাবেই খ্যাত গোপাল হালদার ঔপন্যাসিক হিসাবেও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। যে বিশেষ উপন্যাসের জন্য তাঁর এই পরিচিতি, সেটির নাম 'একদা', যদিও এই উপন্যাসের আর-একটি পরিপূরক উপন্যাস আছে যার নাম 'আর একদিন'। উপন্যাস হিসাবে সেটিও বেশ উল্লেখযোগ্য বলেই মনে হয়।

রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নির্দেশ করে দিয়েছেন, সেই ভাবেই 'একদা' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত মনীশ, সুনীল, অমৃত কারাগারে বসে আত্মসমীক্ষার এবং

সন্ত্রাসবাদের উপযোগিতা বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছে। অতীতবীক্ষার মাধ্যমে তাদের পূর্বজীবন ও পারিবারিক জীবন এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং তার ফলেই উপন্যাসটি জীবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সেই জীবনবৃত্তে একদিকে যেমন আছে মুনসেফ শৈলেন বা এ্যাটর্নি সাতকড়ির জীবনাচরণের ঘৃণিত দিক, অন্যদিকে আছে ইন্দ্রাণী, সুধীর, সবিতা বা সুনীলের বৌদির মতো চরিত্ররা।

উপন্যাসটির দ্বিতীয় আকর্ষণ এর উপস্থাপনরীতি। চেতনপ্রবাহমূলক রীতির সার্থক প্রয়োগ করতে পেরেছেন গোপাল হালদার। উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত না করে, এই রীতিতে তাকে সজীব করে তোলার পন্থা লেখকের জানা ছিল বলেই মনে হয়। বন্দিরা মুক্তি পাবার পর তাদের যে মানসিকতা, সেই মানসিকতা নিয়েই লেখা হয়েছে 'আর এক দিন'। যে প্রবল সক্রিয়তা নিয়ে সন্ত্রাসবাদের আন্দোলনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কারাবাসের মন্থর কর্মহীন দিন তাদের সেই গতিশীলতা রুদ্ধ করে দিয়েছে। স্থিতির জাড্য অনুসারে শুধু যে তাদের দেহ স্থাবর হয়ে পড়েছে তাই নয়, মনেও যেন কেমন অবসাদ ও শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। এই মানবিক অনুভূতি, যে জগৎ থেকে তারা দেশের উন্নতির জন্য ছুটে গিয়েছিল, সেই পরিচিতি জগৎ ও পরিবেশের সঙ্গে যে তারা আর একাত্ম হতে পারছেনা, একটা অপরিচয়ের দূরত্ব অনুভব করছে, এই মানবিক অনুভূতির কারণেই উপন্যাসটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

২.১১ বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)

বনফুল ছদ্মনামের আড়ালে ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই সময়ের একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। তাঁর খ্যাতি মূলত ছোটগল্পের জন্য হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী লেখক। এমন অনেক বিষয় নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেছেন যাদের বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। এত বিচিত্র বিষয়ে উপন্যাস রচনার সামর্থ্য বা উদ্যোগ সমকালে কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সংখ্যাতেও তিনি নিতান্ত কম উপন্যাস লেখেন নি।

বনফুল উপন্যাস রচনা শুরু করেন তাঁর ডাক্তারি অভিজ্ঞতার সংগ্রহ দিয়ে। প্রথম পর্বের এইসব উপন্যাসের মধ্যে আছে 'তৃণখণ্ড' (১৩৪২), 'বৈতরনী তীরে' (১৩৪৩), 'কিছুক্ষণ' (১৩৪৪) প্রভৃতি। তবে বৈচিত্র্যে ও সৃষ্টিক্ষমতায় এই পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'সে ও আমি' (১৩৫০)। একটি অসাধারণ আঙ্গিক নিয়ে শেষোক্ত উপন্যাসটি রচিত। অতীত সংঘটিত ঘটনা, বর্তমানে ঘটমান বৃত্তান্ত এবং যা ঘটতে পারত অথচ ঘটে নি, যা কেবল নায়কের চিন্তার মধ্যেই আছে—এই সমস্ত নিয়ে এমন এক বিচিত্র উপস্থাপন রীতির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, ভবিষ্যতের উপন্যাস রচনায় যা দিক্‌নির্দেশক হিসাবে গণ্য হতে পারে।

দ্বিতীয় পর্বে বনফুলের উপন্যাস রচনার ক্ষমতায় একটা পরিণতির চিহ্ন পাওয়া যায়। বিচিত্র কাহিনির অনুসন্ধান ও তাঁর শুরু হয়ে গিয়েছে। 'দ্বৈরথ (১৩৪৪) উপন্যাসটিতে দুই আত্মীয় জমিদারের পারস্পরিক রেষারেষি যে অনবদ্য কাহিনির জাল তিনি বিস্তার করেছেন তা একই সঙ্গে উপভোগ্য এবং ঔপন্যাসিক ক্ষমতার পরিচায়ক। বিষয় নির্বাচনের অভিনবত্ব পাওয়া যাবে 'মৃগয়া'(১৩৪৭), 'প্রান্তরে', 'ডানা' (১৯৪৮) ও 'নবদিগন্ত' (১৩৫৬) উপন্যাসে । 'মৃগয়া' উপন্যাসে গদ্য, পদ্য, নাটক সবই আছে, 'প্রান্তরে' উপন্যাসে আছে বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের এক অপূর্ব সমন্বয়। 'ডানা' উপন্যাস সম্পূর্ণ অভিনব। এখানে কাহিনি একেবারে নেই বললে ভুল হবে, নায়িকা ডানা তার ওড়বার আকাশ খুঁজছে—এরকম একটা কাহিনির কথা আমরা ভাবতে পারি, কিংবা প্রত্যেকেই যেন খুঁজছে তাঁর নিজস্ব আকাশ। কিন্তু কবির লেখা প্রায় প্রত্যেক রকমের পাখির ওপর একটি করে ছড়া এ উপন্যাসের বিচিত্র আকর্ষণ। 'নবদিগন্ত' পরিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

বৈচিত্র্যের কথা বিচার করলে বনফুলের 'স্থাবর' (১৩৫৮) এবং 'জঙ্গম' (১৩৫০) দুটি অসাধারণ শিল্পপ্রয়াস।

মানুষের ইতিহাস যখন শুরু হয়নি, সেই নিয়েনডার্থান স্তরের আদিম মানুষ থেকে শুরু করে হোমো স্যাপিয়েন্স স্তরে আসার মধ্যবর্তী স্তরগুলি তিনি গ্রহণ করেছেন এবং তার মধ্যেও এক দীর্ঘ সময়পর্ব জুড়ে অসাধারণ কিছু 'মানবিক' কাহিনি শুনিয়েছেন। তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ জঙ্গম উপন্যাসে মানবসভ্যতার এক বিস্তীর্ণ পটভূমি আছে। উপন্যাস হিসাবেও এটি অসাধারণ। বনফুলের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে ডা: অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অনন্য চরিত্র নিয়ে লেখা 'অগ্নীশ্বর' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২.১২ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে ব্যোমকেশ চরিত্রের স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে বাঙালি পাঠক বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্তু গোয়েন্দাকাহিনি ছাড়াও যে ক্ষেত্রে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তা হল ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসনির্ভর গল্পও তিনি অনেক লিখেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি তিনি লিখেছেন বিভিন্ন কালপর্ব অবলম্বন করে। তবে লেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিটি কালপর্ব এবং পরিবেশ অনুযায়ী ভাষাকে তিনি পরিবর্তিত করে নিতে পেরেছেন। ফলে, কেবল সুচিন্তিত এবং সুপ্রযুক্ত ভাষাভঙ্গিই সেই বিশেষ সময় ও তার আচার ব্যবহারের প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে তোলে, সেই বিশেষ সময় জীবন্ত হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক উপন্যাস স্বাধীনতা-উত্তর কালে নতুন করে ফিরে আসার পর এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দিগ্ধ স্বীকৃতি পেতে পারেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্ভবত 'কালের মন্দিরা' (১৩৫৮)। হুনদের ভারত আক্রমণ অবলম্বন করে লেখা এই কাহিনী দীর্ঘ বারো বছর ধরে লেখা হয়েছে। রাজকুমারী রট্টা যশোধরা, প্রিয়সখী সুগোপা, চিত্রক প্রভৃতি চরিত্র কালের ব্যবধান অতিক্রম করে বাস্তব চরিত্রের মতো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'গৌড়মল্লার' (১৩৬১) উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর ঠিক পরে, এবং শেষ হয়েছে কুড়ি বছর পরে। প্রথমে উপন্যাসটির নাম ছিল 'মৌরী নদীর তীরে'। বঙ্গের ইতিহাসের এক অত্যন্ত সংকটময় সময়ের প্রেক্ষিতে মানবদেব-রঙ্গনা এবং তাঁদের পুত্রকন্যা বজ্রদেব ও গুঞ্জাকে নিয়ে একটি মনোজ্ঞ মানবিক কাহিনি রচনা করেছেন লেখক।

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' (১৩৬৫) সেই সময়ের প্রেক্ষিতে লেখা, যাকে ইতিহাসে বলা হয় হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ। উপন্যাসে দীপঙ্কর, রত্নাকর, শান্তি, আচার্য বিনয় ধর প্রভৃতি চরিত্র হিসাবে উপস্থিত আছেন বটে কিন্তু এর মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বেদীরাজ কর্ণদেব আর বাংলার পাল রাজাদের নিয়ে। কর্ণদেব নিজের কন্যা যৌবনশ্রীকে পালরাজ বিগ্রহ পালের হাতে দিয়ে সন্ধি করেছিলেন—এই মিলনে কি বাধা এসেছিল, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তাতে কী বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল, এগুলিই উপন্যাসের বিষয়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' (১৩৭২), তবে এর আগে তিনি কবি কালিদাসের জীবন নিয়ে মনোরম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কুমারসম্ভবের কবি' (১৩৭০) লেখেন। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' একই সঙ্গে নাটকীয়, ঐতিহাসিক এবং মানবিক উপন্যাস। কাহিনি-অংশ সাধারণ উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর। কলিঙ্গদেশের রাজকন্যা ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা বিজয়নগর যাচ্ছে জলপথে, সেখানকার তরুণ রাজা দ্বিতীয় দেবরায় বিবাহের জন্য, সঙ্গে আছে তার বৈমাত্রেয় বোন মণিকঙ্কনা—এই নিয়ে উপন্যাসের সূচনা। সূচনাতেই দেখি অজ্ঞাতকুলশীল অর্জুন বর্মাকে জল থেকে উদ্ধার করে বিদ্যুন্মালা বাঁচায়। বহু ঘটনার আবর্তে কাহিনি যখন শেষ হয় তখন দেখি বিদ্যুন্মালা বিবাহ করে অর্জুনকে, মণিকঙ্কনা দ্বিতীয় দেবরায়কে। কিন্তু রাজার কথা তো মিথ্যা হবার নয়, তাই শেষ মুহূর্তে বোনেদের নাম পরিবর্তন করতে হয়—বিদ্যুন্মালা হয় মণিকঙ্কনা এবং মণিকঙ্কনা বিদ্যুন্মালা। এই উপন্যাসের জন্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

২.১৩ প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-২০০১)

প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপক হিসাবে বেশি পরিচিত প্রমথনাথ বিশী উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা এবং নাট্যরচনাতেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দুটি উপন্যাস তাঁর চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে, ছোটগল্পগুলি ব্যতিক্রমী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে, কবিতা সম্পর্কে অনেক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, কয়েকটি নাটক রীতিমতো মঞ্চ সাফল্য লাভ করেছে যার মধ্যে 'সানিভিলা'-র নাম অবশ্যই করতে হবে।

প্রমথনাথ বিশীর মোট পনেরোটি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকগণ মনে করেন তাঁর মধ্যে উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি তেমন সার্থকতা লাভ করে নি। প্রথম উপন্যাস 'দেশের শত্রু'-তে দুর্বলতার অনেক চিহ্ন আছে, দ্বিতীয় উপন্যাসে 'পদ্মা' (১৯৫৩) সে তুলনায় খানিকটা পরিণত। কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা দিয়ে পদ্মাকে তিনি ঘিরে রেখেছেন, নায়ক বিনয়ের মনে সে গভীর বোধের কোনো উপলব্ধিই সম্ভব নয়। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভঙ্গিতে রচিত হলেও এটি একটি জমিদার পরিবারের উত্থান ও পতনের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত এই পরিবার নিয়ে প্রমথনাথ ট্রিলজি বা তিনটি উপন্যাস লিখেছেন—'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'অশ্বত্থের অভিশাপ' এবং 'চলনবিল'। তিনটি উপন্যাস একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'জোড়াদিঘীর উদয়াস্ত' নামে।

প্রমথনাথ বিশী পরবর্তী কালের উপন্যাসগুলির নাম 'কোপবতী', 'মহামতী রাম ফাঁসুড়ে', 'নীলমণির স্বর্গ', 'সিন্ধুনদের প্রহরী', 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', 'বিপুল সুদূর তুমি যে', 'পূর্ণাবতার', 'পনেরোই আগস্ট' এবং 'ধুলোউড়ির কুঠি'। এদের মধ্যে কেরী সাহেবের মুন্সী এবং 'লালকেল্লা' উপন্যাস হিসাবে স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছে বলে মনে করা যায়। যে অতীত সম্প্রতিই অতীত হয়েছে তাকে নিয়ে উপন্যাস লেখা সহজসাধ্য নয়। কেরী সাহেবের মুন্সী রাম রাম বসুকে নিয়ে তা সত্ত্বেও একটি মানবিক কাহিনি লিখতে পেরেছেন লেখক এবং মতিরায়ের বাগান বাড়িতে বন্দিনি রেশমির করুণ আত্মহত্যায় উপন্যাস শেষ করেছেন। 'লালকেল্লা' উপন্যাসটি আরো বিস্তৃত পরিসরে লেখা, অথচ ঘটনার ঐক্যসূত্র সেখানে আরো স্পষ্ট। প্রত্যেকটি পর্বের নামকরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি দিয়ে, এই কাব্যিকতার সঙ্গে মিশেছে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত। নিঃসংশয়ে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

২.১৪ সুবোধ ঘোষ (১৯০০-১৯৮০)

সৃষ্টির পরিমাণ বিচার করলে সুবোধ ঘোষকে ছোটগল্পকার আখ্যা দেওয়াই সংগত হবে বোধহয়, কিন্তু তাঁর লেখা উপন্যাসও নিতান্ত নগণ্য নয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪)। দুর্ভিক্ষের পর যে অবস্থা ঘটেছিল তার বিচার-বিশ্লেষণ এবং সে-সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকাই পটভূমি এবং তার মধ্যে লালিত হয়েছে শিশির ও সিতার মানসিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের গল্প। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর তীব্র অনীহার পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক মনোভাবের এই পরিচয়ই নিবিড়তর ভাবে ফুটে উঠেছে সুবোধ ঘোষের পরবর্তী উপন্যাস 'গঙ্গোত্রী' (১৩৫৪) তে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনাচরণে কেমন প্রভাব ফেলেছে ও এই জীবনধারা কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, এটাই উপন্যাসের ব্যাপ্ত পটভূমি। তবে তার মধ্যে প্রেম কাহিনির অগ্রগতিও আছে। কিন্তু মাধুরী ও কেশবের হৃদয়ঘটিত সমস্যাকে যতই প্রাধান্য দেওয়া হোক, অথবা নারী রহস্যময়ী ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যতই কৈফিয়ৎ দেওয়া হোক, মাধুরীর অকারণ দাক্ষিণ্য ও অকারণ নিষ্ঠুরতার ব্যাখ্যা সর্বত্র পাওয়া যায় না।

'ত্রিযামা' সুবোধ ঘোষের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। প্রকৃত ঔপন্যাসিক সমস্যাই এখানে লেখক গ্রহণ করেছেন। মাতৃশাসিত নবলা যে বিশাল বৈভবে এবং ভালোমন্দের বোধদয় এক বিলাসী জীবনযাত্রায় গা ঢেলে দিয়েছিল এবং তাতে মায়ের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল তাতে কুশলের গভীর প্রেমকে উপলব্ধির ক্ষমতাই তার ছিল না। দেবী রায়ের সঙ্গে অগভীর প্রেমের খেলা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কুশল এবং তার মধ্যে এনে দিয়েছে সেই আত্মমর্যাদাবোধ, যা না থাকলে কোনো মানুষই নিজেকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না।

সুবোধ ঘোষের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শতকিয়া', 'শ্রেয়সী', 'জিয়াভরলি' প্রভৃতি। তবে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস বোধহয় 'সুজাতা'।

২.১৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

ছোটগল্পের বিশ্রুত লেখক এবং টেনিদার স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক হিসাবেও যথেষ্ট সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন, পরিমাণেও তাঁর উপন্যাস কম নয়। প্রথম দিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। বস্তুত তিনখণ্ডে লেখা প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' (১৯৪৪)-ই তাঁকে বাংলা উপন্যাসের জগতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। প্রথম পর্বে যে সব চরিত্র আমরা পাই—ডি. সুজা, জোহান, লিসি, মাফুন, গঞ্জালেশ প্রভৃতি প্রাচীন পোর্তুগিজ ও জলদস্যুদের উত্তরসাধক কিন্তু স্থায়ীপথে বাংলাদেশের বাসিন্দা, তাদের অভিঘাতে মধ্যবিত্ত জীবন কেঁপে ওঠে। আদিম প্রবৃত্তিশাসিত জীবনযাত্রার এক নিখুঁত চিত্র আমরা এখানে পাই।

এই ঐতিহাসিক চেতনা এবং রাজনৈতিক উত্থানপতনের নিপুণ জ্ঞান নিয়েই বরেন্দ্রভূমির বিচিত্র অতীত কথাকে উপন্যাসের বিষয় করে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৩৫১), 'মহানন্দা' (১৩৫৩), এবং 'লালমাটি' (১৩৫৮)। আগস্ট আন্দোলন এবং বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যুবশক্তির উত্থান নিয়ে লিখেছেন 'মন্দমুখর' (১৩৫২) এবং 'স্বর্ণসীতা' (১৩৫৩)।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের দিক্ পরিবর্তন মাঝে মাঝেই দেখা গিয়েছে। 'ট্রফি' উপন্যাসে একটি প্রেমকাহিনিই আছে, কিন্তু তা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ—নাটকীয়ও বলা চলে। অবাঙালি বিক্রম বাঙালি মেয়ের প্রেমে মগ্নচৈতন্য হয়ে বাঙালিত্বের সাধনায় জীবন ওষ্ঠাগত করেছে। ব্যর্থ হয়ে বিবাহ করেছে রাজপুতানার মেয়ে প্রেমকুমারীকে। কিন্তু দেখা গিয়েছে প্রেমকুমারী আত্মসমর্পণ করেছে এক বাঙালি যুবকের কাছে। শেষে অবশেষে বিক্রমের জীবনে প্রথম যৌবনের প্রিয়া মণিকা সেন এসেছে, কিন্তু তাতে ভালো হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৫১) উপন্যাসটিকে উদ্ভট উপন্যাস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একটি সার্কাসের ক্লাউনকে নিয়ে অসাধারণ উপন্যাস 'বিদূষক'। ভারতচন্দ্রের জীবন নিয়ে আকর্ষণীয় উপন্যাস 'অমাবস্যার গান'। সাধারণ সামাজিক ও মনস্তত্ত্বের জটিলতায় রচিত উপন্যাস 'অসিধারা'-ও অনবদ্য।

২.১৬ সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)

প্রবাসী সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রায় সারাটা জীবনই কেটেছে প্রবাসে, সেই কারণেই বোধহয় তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের পটভূমিই বিহার। সক্রিয় রাজনীতি করা মানুষ, রাজনীতি নিয়েও লিখেছেন, অন্য বিষয়েও লিখেছেন। কিন্তু তাঁর লেখার বিষয় একটু ভিন্নধর্মী, ভাষাও ভিন্নধরনের—যেহেতু অবাঙালি বা প্রবাসী বাঙালি চরিত্র তাঁর উপন্যাসে বেশি। সেই কারণে তাঁর লেখার জনপ্রিয়তাও খুব বেশি নয়।

দু'খণ্ডে সমাপ্ত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সতীনাথ ভাদুড়ীর সর্ববৃহৎ উপন্যাস। বিহারের জিরানিয়া গ্রামের অতি নিম্নবিত্ত কিছু মানুষই এই উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী ঢোঁড়াই পিতৃহারা মাতা-পরিত্যক্ত একটি অনাথ বালক,

মানুষ হয়েছে একটি বোবা সন্ন্যাসীর কাছে গাছতলায়। নিজের বুদ্ধির জোরে সে ছেলে কীভাবে নিজের সম্প্রদায়ের পাঁচজনের কাছে মান্য হয়ে ওঠে, কীভাবে সে কিছুটা প্রতিষ্ঠা করে বিবাহাদি করে, কেমন করে নিজের বউ অন্য লোকের সঙ্গে পালায়, কীভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে এবং গান্ধিজির নেতৃত্বে সংগ্রাম করে—ইত্যাকার বিবরণ অত্যন্ত মানবিক উপায়ে পরিবেশন করেন লেখক। রামচন্দ্রের বড় হওয়ার যে বর্ণনা তুলসীদাসে পেয়েছেন, প্রায় সেই ছকেই ঢোঁড়াইয়ের জীবনচরিত বর্ণনা করা হয় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে ঢোঁড়াই চরিত মানস।

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত 'জাগরী' সম্ভবত সতীনাথ ভাদুড়ীর সবচেয়ে পরিচিত উপন্যাস। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য বিলুর ফাঁসির নির্দেশ হয়, ধরিয়ে দেয় তারই ভাই নীলু। ফাঁসির আগের রাতের ঘটনা, অন্য সেলে রয়েছে বিলুর বাবা ও মা। ফাঁসিসেল, আপার ডিভিশন ওয়ার্ড, আওরৎ ফিতা এবং জেল গেট—এই চারটি অধ্যায়ে চারজনের জবানিতে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসটি স্মৃতিচারণ মূলক পদ্ধতিতে গোটাটাই ফ্ল্যাশ ব্যাকের মাধ্যমে লেখা হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর আর একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'। কাহিনির পরিবেশনে অভিনবত্ব আছে, কারণ প্রধান পাত্রী মিনাকুমারীর আত্মহত্যা দিয়েই গল্পের শুরু। তারপর সমগ্র উপন্যাসের কাহিনি কখন যেন উল্টোরথের যাত্রা।

লেখকের শেষ পর্যায়ের তিনটি উপন্যাস 'অচিনর‍্যাগিনী', 'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত'-এর পরিচয় এক কথায় দিতে হলে বলতে হবে এরা প্রত্যেকেই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই উপন্যাস তিনটির প্রাণ, তবে তার মধ্যে জটিলতম মানসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে বোধহয় 'অচিন রাগিনী'-তে। অন্যান্য উপন্যাসের মতো বিহারই এর প্রেক্ষাপট, পাত্র-পাত্রীরাও বিহার প্রবাসী মানুষ, কেবল নতুন দিদিমা বাংলা দেশের মেয়ে। কাহিনি শুরু হয় এইভাবে—'পিলে, নতুন দিদিমা আর তুলসী, তিনজনকে নিয়ে এই টান ভালোবাসার গল্প।' সংকট ও দিগ্‌ভ্রান্ত উপন্যাসের প্রকৃতি মনস্তাত্ত্বিক হলেও অচিন রাগিনীর সঙ্গে তাদের পার্থক্য অনেক।

২.১৭ আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)

অত্যন্ত সাদামাটা আটপৌরে জীবনের গল্পও যে অসাধারণ বাস্তবতা ও শিল্পগুণে মণ্ডিত করে লেখা সম্ভব, আশাপূর্ণা দেবী সে কথা প্রমাণ করেছেন। ছোটদের জন্য ও বড়দের জন্য প্রচুর গল্প-উপন্যাস তিনি লিখেছেন এবং দু-ধরনের লেখাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লেখার স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন অজস্র। রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার তো আছেই, দেশের সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও লাভ করেছেন। এ ছাড়া পেয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট ডিগ্রি। আমেরিকা প্রবাসী লেখিকা পুলিৎজার পুরস্কারবিজয়িনী ঝুম্পা লাহিড়ি তাঁর ওপর গবেষণা করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের আলোচনায় প্রধান প্রতিবন্ধক তাঁর উপন্যাসের পরিমাণ। এগুলির মোট সংখ্যা একশো ছিয়াত্তর। সবচেয়ে জনপ্রিয় রচনা ট্রিলজি—'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে আছে 'মিত্তির বাড়ি', 'বলয়গ্রাস', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'কল্যাণী', 'শশীবাবুর সংসার', 'ছাড়পত্র', 'নবজন্ম' প্রভৃতি।

'মিত্তির বাড়ি' উপন্যাসের অবলম্বন এমন একটি যৌথ পরিবার, যেরকম একটি পরিবারকে জানলেই বহু পরিবারকে জানার কাজ হয়—সমস্যা ও কলহের প্রকৃতি ঘরে ঘরে প্রায় একই রকম। তারই নিপুণ উন্মোচন ঘটেছে উপন্যাসে। 'বলয়গ্রাস' ও 'অগ্নিপরীক্ষা' একদা জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। 'শশীবাবুর সংসার' আকাশবাণীর প্রথম ধারাবাহিক নাট্যাভিনয়ের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রই এই উপন্যাসের

অবলম্বন, তবে এখানে যৌথ পরিবার নেই, আছে একক পরিবারের সমস্যা। ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে রচিত উপন্যাসের মধ্যে 'অতিক্রান্ত', 'উন্মোচন' ও 'নেপথ্যনায়িকা'-র নাম করা যায়।

বিচিত্র ধরনের উপন্যাসের মধ্যে—তা বিষয়বৈচিত্র্যই হোক বা আঙ্গিক বৈচিত্র্য, নাম করা যেতে পারে প্রথমেই 'সমুদ্র নীল আকাশ নীল' উপন্যাসের। যে পারিবারিক চেনা জগৎ লেখিকার বেশিরভাগ উপন্যাসের মূল অবলম্বন, এখানে তার পরিবর্তে আছে ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের বিচিত্র সমস্যা। বৈধব্যবরণের পর শ্রাবণীর পিতা তার চেয়ে অল্পবয়সী ছেলে চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে শ্রাবণীর বিয়ে দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রাবণীর ব্যক্তিত্বের কাছে তার বজ্রকঠিন পিতা লোকমোহন পরাস্ত হয়েছে।

'সমুদ্রনীল আকাশনীল' উপন্যাসে যেমন আশাপূর্ণা কম বয়সি পাত্রের সমস্যা উপস্থিত করেছেন, 'ছাড়পত্র' উপন্যাসে দেখিয়েছেন প্রথম আইনসিদ্ধ বিবাহ-বিচ্ছেদ'। অবাক লাগে ভাবতে, নারী পকেটমারকে নিয়েও একটি উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন, যার নাম 'উত্তরণ'।

আঙ্গিকের বিচারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মুখর রাত্রি' যেখানে প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্র—শচীপতি, মন্টু, দেবরায়, বিরজা, নীরজা, সরোজা—প্রত্যেকে নিজ নিজ জবানিতে নিজেদের কথা বলেছে। এমন কি শেষে দেওয়ালও সজীব হয়ে একটি চরিত্রে পরিণত হয়েছে এবং তার অভিজ্ঞতা বলতে শুরু করেছে। কাজেই শুধু গল্পের আকর্ষণে নয়—যদিও গল্প আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের মুখ্য আকর্ষণ, লেখিকা উপস্থাপনা এবং বয়সের গুণেও বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসাবে পরিগণিত হতে পারেন।

২.১৮ অনুশীলনী

১) বাংলা উপন্যাসের ধারায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ অবদান কী, বিচার করুন।
২) সমাজ বিগর্হিত প্রেম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনোভাব কী ছিল, কয়েকটি উপন্যাস অবলম্বন করে বুঝিয়ে দিন।
৩) ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিয়ে বলুন।
৪) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির একটি সামগ্রিক আলোচনা করুন।
৫) জগদীশ গুপ্তের বৈশিষ্ট্য বিচার করে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির নাম করুন।
৬) জগদীশ গুপ্তের পল্লীসমাজ বিষয়ক উপন্যাসে পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দিন।
৭) ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য বিচার করুন।
৮) তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলির সাধারণ পরিচয় দিন।
৯) বিভূতিভূষণের উপন্যাস সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।
১০) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান দুটি উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা করুন।
১১) অন্নদাশঙ্কর রায়ের সত্যাসত্য উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
১২) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
১৩) আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের মূল সুর কী? কয়েকটি উপন্যাস অবলম্বন করে বুঝিয়ে দিন।

২.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৪৫।
২) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ১৯৬২।
৩) দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের কথা, ১৯৬১।
৪) বিষয় : বাংলা উপন্যাস, বীরেন চন্দ সম্পাদিত।
৫) শতবর্ষের আলোয় আশাপূর্ণা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

একক ৩ ❑ বাংলা উপন্যাস : স্বাধীনতা উত্তরপর্ব

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

৩.৩ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

৩.৪ সাবিত্রী রায়

৩.৫ অমিয়ভূষণ মজুমদার

৩.৬ সন্তোষকুমার ঘোষ

৩.৭ ননী ভৌমিক

৩.৮ বিমল কর

৩.৯ গৌরকিশোর ঘোষ

৩.১০ রমাপদ চৌধুরী

৩.১১ সমরেশ বসু

৩.১২ গুণময় মান্না

৩.১৩ মহাশ্বেতা দেবী

৩.১৪ অসীম রায়

৩.১৫ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

৩.১৬ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

৩.১৭ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

৩.১৮ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৩.১৯ প্রফুল্ল রায়

৩.২০ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

৩.২১ দেবেশ রায়

৩.২২ অনুশীলনী

৩.২৩ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ প্রস্তাবনা

বিশ্বের সর্বত্রই বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে বহু ধরনের আখ্যান। অষ্টাদশ শতক থেকে আধুনিক কালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং মানুষের সমাজসচেতন হয়ে ওঠবার প্রেক্ষিতে সেই আখ্যান থেকে জন্মলাভ করেছে একালের উপন্যাস। নির্বাচিত ঘটনার কারণ-কার্য পরম্পরা সহযোগে শিল্পিত ভাষা বিন্যাসকেই উপন্যাস বলা যেতে পারে। লেখক তাঁর প্রতিপাদ্য বক্তব্যকে তাঁর উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস এবং চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেন। প্রত্যেক দেশেরই সমৃদ্ধ ভাষাগুলিতে উপন্যাস লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষায় উপন্যাসের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি কেমন ছিল তার রূপরেখা তুলে ধরাই এই পাঠ্যবস্তুর উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক গদ্য ছিল না। লোকায়ত প্রেমকাহিনিকাব্য এবং দেবমহিমাজ্ঞাপক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শ এসে কীভাবে গদ্যের উদ্ভব হল তা পূর্ববর্তী পাঠগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ থেকে বাংলা উপন্যাস কেমন করে বিবর্তিত হয়েছে তা আমরা পূর্বপাঠে জেনেছি। বর্তমানে এই পাঠ্যবস্তুর লক্ষ্য স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া। একাজের জন্য প্রয়োজন বিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্থের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গড়ে তোলা। কারণ উপন্যাস বাস্তব জীবনের আখ্যান এবং তা সমকালীনতার প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত।

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার জনজীবনে দেখা দিল সুগভীর বিপর্যয়। ভারতের পশ্চিম প্রান্তের পাঞ্জাব এবং পূর্বপ্রান্তের বাংলা দ্বিখণ্ডিত করে দুটি ভাগের নাম দেওয়া হল পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা বিভাগের পরে ভারতভুক্ত অংশের নাম হল পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ব পাকিস্তানে বহুকাল ধরে যেসব হিন্দু বাঙালি বাস করতেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা চলে আসতে শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গে। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল। সেই জনসংখ্যার মধ্যে যেহেতু অধিকাংশই ছিন্নমূল, বাসগৃহহীন, সামাজিক, আর্থিক এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপর্যস্ত— সেই কারণে পশ্চিম বাংলার জনজীবনে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থানে দেখা দিল বিপন্নতার আলোড়ন। বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেল। একদা সম্পন্ন গৃহস্থের দল শরণার্থী, অর্থ-ভিক্ষুকে পরিণত হলেন। জীবনের দীর্ঘলালিত মূল্যবোধগুলি সামাজিক সংকটের আঘাতে ভেঙে গেল অথবা পরিবর্তিত হল।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার অনেক লেখকই উদ্‌বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছিলেন। ফলে তাঁদের লেখায় এই জীবনযাপনের সংকট, মূল্যবোধের বিপর্যয়, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, হতাশ, অসহায়, বিপর্যস্ত মানসিকতার প্রকাশ দেখা গেল। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের বাংলা উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে এই নৈরাশ্যপীড়িত অসুখী নিরাবলম্বনতার ছবি সুপরিস্ফুট।

সমাজে নারীর অবস্থানে অতি দ্রুত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল বাংলার পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় প্রান্তেই। যদিও স্ত্রীশিক্ষা যথেষ্টই বিস্তার লাভ করেছিল চল্লিশের দশকেই, তবুও মেয়েদের গৃহজীবনের বাইরে পদচারণের প্রধান ক্ষেত্রটি ছিল রাজনীতির ক্ষেত্র এবং সমাজসংস্কার। নিছক অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, চাকরি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে মেয়েরা বাড়ির বাইরে এলেন চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে। ফলে বাঙালির পারিবারিক জীবনে এক বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেল। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রটি হয়ে উঠতে লাগল অনেকখানি অর্থনৈতিক। স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলা উপন্যাসে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের দ্বন্দ্বময় পথরেখাটি উৎকীর্ণ।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেই তা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক শৃঙ্খল মোচনের শক্তি জোগায়। ফলত স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলা উপন্যাসে হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে বিধবাবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, প্রেমের অধিকার, নারীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা—ইত্যাদি বিষয় বহুল পরিমাণে স্থান করে নিতে লাগল। আরও একটু এগিয়ে প্রশ্ন তোলা হতে লাগল নারীর চারিত্রিক শুচিতা এবং নৈতিকতা বিষয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসন নিয়েও। সব জড়িয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিক অবস্থান খুব বড়ো একটি বিষয়।

বাংলা সাহিত্যে সমাজমনস্ক উপন্যাস চিরকালই লেখা হয়েছে, যদিও বিভিন্ন যুগে তার ধরন একরকম নয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালের উপন্যাসে সমাজমনস্কতার চেহারাটি বিশেষভাবে সমকালের বাস্তবতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠল। শরণার্থী সমস্যা, মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি ব্যাপক রূপ পেল উপন্যাসে। সেই সঙ্গে বিংশ শতাব্দের শেষ তিন দশকে, খানিকটা নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রশাসনকে দেখাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। বিশেষ করে ১৯৭৭-এর পর পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক প্রশাসনের পরিবর্তন সূচিত হলে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ভূমিব্যবস্থা, বর্গা, পঞ্চায়েতি প্রশাসন, দিনমজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র সমাজে যে পরিবর্তন ঘটল তা বাংলা উপন্যাসেও অনেকখানি বিস্তৃত হল। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রশাসনের ত্রুটি স্পষ্ট করে দিয়ে লেখা উপন্যাসও আমরা কিছু পেয়েছি।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে। একটি হল সেইসব উপন্যাস যাদের মাধ্যমে লেখক নিজের জীবন-বীক্ষণ, মানব-সমাজ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির সত্যতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে চান। তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছোতে চান সে কথা সত্য, কিন্তু সে জন্য বিনোদন-পিপাসু সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য গল্প বানাতে চান না। অপর শ্রেণির উপন্যাস হল আগাগোড়াই সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য পরিকল্পিত রচনা। স্বাধীন ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থায় সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য থাকলেও প্রশাসনিক নীতি পুঁজিবাদের প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করেছে। তার ফলে বাণিজ্যিকতার প্রসার এবং বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রাধান্য এদেশের একটি বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থাও এই সময় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল যারা সাহিত্যকে ব্যবসায়িক উপাদান রূপে গ্রহণ ও ব্যবহার করার দিকে মনোযোগী। সাক্ষরতার প্রসারের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটল। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তারও সেই পাঠকশ্রেণি তৈরি করল যারা সাহিত্য থেকে মনোরঞ্জনের উপাদান প্রত্যাশা করে। ফলে পঞ্চাশের দশক থেকেই সেইসব প্রকাশন-সংস্থা এবং সাময়িকপত্র যথেষ্ট বেড়ে উঠল যেখান থেকে প্রকাশিত হতে লাগল বহু সংখ্যক উপন্যাস যেখানে লেখকের উদ্দেশ্য প্রধানত মনোরম একটি গল্প নির্মাণ করা।

এই প্রবণতাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সৎ লেখকদেরও তা বহু সময়ে প্রভাবিত করেছে। আবার মনোরঞ্জক উপন্যাসের লেখকেরাও বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনের সামাজিক সংকটকে উপন্যাসে রূপ দেবার কাজে এগিয়ে আসেন।

এ জাতীয় উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ হল সাধারণত মধ্যবিত্ত সমাজকে অবলম্বন করেই এগুলি লেখা হয় এবং মধ্যবিত্ত বাঙালির সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাই উপন্যাসে প্লট নির্মাণে প্রধান হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত প্রেম, প্রজন্ম-দ্বন্দ্ব, অল্পবয়স্ক তরুণ-তরুণীদের চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরার দিকটা বড়ো হয়ে দেখা দেয় এই সব উপন্যাসে। ভাষা হয় সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিশীল। মোটের উপর বাঙালি মধ্যবিত্তের রুচিকে লালিত ও প্রতিফলিত করে এই জাতের উপন্যাস।

শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বাংলা উপন্যাসের গঠন, চরিত্রচিত্রণ এবং প্রবণতার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ঘটনাবিরল, অন্তর্মুখী, আত্মভাবনামূলক এক ধরনের উপন্যাস কেউ কেউ লিখেছেন যেগুলি পাঠকমনোরঞ্জন না হলেও প্রকাশনা সংস্থার কিছু আনুকূল্য পেয়েছে। অন্যদিকে যৌন সম্পর্ক এবং সামাজিক ভায়োলেন্সকে উপন্যাসে বিস্তৃত করে দেখাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকখানি। বেশ কয়েকজন নারী লেখক নিজেদের দৃষ্টিকোণকে

সাহসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই পর্বে।

কিন্তু আমরা যে ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে আলোচনা করব সেখানে এই শেষ দুই দশকের উপন্যাসের কথা প্রধান হয়ে ওঠেনি। একান্ত সাম্প্রতিকের বিশ্লেষণ করবার জন্য কিছুটা সময়-দূরত্ব এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন হয় যা একান্ত সাম্প্রতিক কালের লেখা সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকের মনে ততটা গড়ে ওঠে না। আমাদের আলোচনায় প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের লেখকদের রচনা। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ লেখা শুরু করেছেন স্বাধীনতার দু-এক বছর আগেই। কিন্তু তাঁদের ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল এবং বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির রচনাকাল ছিল এই সময়ের মধ্যেই। একটি দেশ প্রায় দুশো বছর ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন থাকবার পর স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ফলে বিভিন্ন দিকে থেকে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তার সমাজ, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষের মন। এই পরিবর্তনের কালচিহ্ন স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম তিন দশকের উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বাক্ষরিত ছিল। বিশেষত পাঠ্য রূপে যে ঔপন্যাসিকদের নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাঁদের লেখা থেকে সেই সাক্ষ্যই পাওয়া যাবে। এখন আমরা পাঠক্রম-নির্দিষ্ট ঔপন্যাসিকদের সাধারণ প্রবণতা এবং বিশেষ বিশেষ উপন্যাসগুলির আলোচনা তুলে ধরব।

৩.২ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩)

স্বাধীনতা-পূর্বকালের অখণ্ড বাংলার কুমিল্লায় ১৯১২ সালে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম। ছাত্র থাকাকালীন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে কিছুদিন কারাবাস করেছিলেন এবং অন্তরীন ছিলেন। বি. এ. পাশ করে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় আসেন ১৯৩৭-৩৮-এ। নানান ধরনের কাজ করেছেন। তার মধ্যে অনেক সময়েই যুক্ত থেকেছেন কোনো না কোনো সংবাদপত্রের সঙ্গে। অবসর নিয়ে পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'মীরার দুপুর' (১৯৫৩), 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৯৫৫), 'চন্দ্রমল্লিকা' (১৯৬২), 'প্রেমের চেয়ে বড়ো' (১৯৬৬), 'এই তার পুরস্কার' (১৯৭২)। সর্বসমেত তাঁর বাহান্নটি উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। নিয়মিত উপন্যাস লিখেছেন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। মনোরঞ্জক উপন্যাসও তার মধ্যে পাওয়া যাবে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম সাড়া জাগানো উপন্যাস ছিল 'মীরার দুপুর'। তেরো পরিচ্ছেদের এ উপন্যাসের উপস্থাপন-রীতিতে রয়েছে বিশ্লেষণ-মুখীনতা। ঘটনাবিরল উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে চরিত্রের স্বগত-কথন রীতিতে। উপন্যাসের কাহিনি সংক্ষেপে এ রকম—তেইশ বছরের সুন্দরী তরুণী মীরার অধ্যাপক স্বামী হীরেন অসুস্থতার জন্য চাকরি হারিয়ে ঘরে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। মীরার উপর সংসার চালানোর ভার। কর্তব্যে ত্রুটি নেই তার। রুগ্ন স্বামীর পরিচর্যার পর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য মুখ্যত চাকরির সন্ধান, গৌণত অর্থ-সন্ধান। সেই অর্থ প্রাপ্তির জন্য সে পুরোনো প্রীতির বন্ধনগুলিকে ব্যবহার করে। ঋণের জন্য যায় বাপের বাড়ি, কলেজের বন্ধু অমরেশ আর পুষ্পের কাছে। কখনও বা একলা পথে ঘুরে বেড়ায়। আসলে সে খুঁজছে স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক এবং অস্তিত্বের পূর্ণ স্বাধীনতা। কারণ দীর্ঘ কর্মহীনতা তার স্বামী অসুস্থ হীরেনকে করে তুলেছে সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। মীরার জীবন থেকে মুছে গেছে স্বামীর প্রেম। সে আকৃষ্ট হয়েছে প্রাক্তন সহপাঠী অমরেশের প্রতি। পাশের ফ্ল্যাটের শিল্পী বাসিন্দা মৃগাঙ্কের প্রেমের আহ্বান সে উপেক্ষা করতে পারেনি। আবার স্বাধীনভাবে এই প্রেমকে গ্রহণ করার মতো মানসিক শক্তি নেই মীরার। কারণ সে ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি মধ্যবিত্ত নীতি-আদর্শের চিরাগত বন্ধন। এবং তার নেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তাই মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়েই কাটে তার দুপুরগুলি।

অথচ তার কাজের মেয়ে মালতী যুবতী এবং সুন্দরী। শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত এই মেয়ের আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

এবং নেই তথাকথিত নৈতিক বন্ধন। মীরার স্বামী হীরেনের মতো তার স্বামীরও ছিল সন্দেহপ্রবণতা। তাই মালতী ত্যাগ করেছে সে স্বামীকে এবং বাস করছে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে। উচ্চকিত বিদ্রোহ নয়, আচরণ দিয়ে সে প্রমাণ করেছে দীর্ঘদিনের সামাজিক আদর্শের বর্তমান শূন্যতা—'হিঁদুর মেয়ের তো দু-বার বিয়ে নেই, তাই এক সঙ্গে থাকা আর কি।' আর্থিক বিষয়ে স্বনির্ভরতা আছে বলেই মনিব মীরাকে 'পাঁচ টাকা' ধার দিতে পারে সে। আবার বিপন্ন এই মেয়েটিকে অকারণ সন্দেহের তির থেকে রক্ষার চেষ্টার মধ্যে তার নারীমনের বিচিত্র প্রকাশ দেখি। মীরা ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে স্বামী পরিচয় দিয়ে রক্ষা করেছিল মৃগাঙ্ককে। এই সংবাদ মুদ্রিত খবরের কাগজ সে মীরার নির্দেশে দগ্ধ করে। কিন্তু যে দ্রুততার সঙ্গে সে কাজটি করে তার মধ্যে সর্বতোভাবে পরাধীন মীরার স্বাধীন সত্তার ক্ষণ-উদ্ভাসের প্রতি তার সহানুভূতি মালতীকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। সে হয়ে উঠেছে আধুনিক আত্মবিশ্বাসী নারীর প্রতিনিধি।

মীরার মধ্যে আছে স্বাধীন হয়ে ওঠার কামনা। স্বামী অন্যায্য আচরণ সে মেনে নেয়নি। আপন তৃষ্ণার্ত মনের দাবি সে পূরণ করেছে। সাড়া দিয়েছে অমরেশ আর মৃগাঙ্কের ভালোবাসায়। এ বিষয়ে তার মনে নেই কোনো কুণ্ঠা। স্বামী থাকা সত্ত্বেও একাধিক পুরুষকে ভালোবাসার জন্য বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই তার মনে। এ চরিত্র স্বাধীনতা-পরবর্তী বাঙালি নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতীক। আবার একই সঙ্গে মীরা হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিরূপ। চিরন্তন মূল্যবোধ চূর্ণিত হয়ে যাচ্ছে এই মধ্যবিত্ত সমাজে। এ বিপর্যয়ের উৎস অর্থনৈতিক সংকট। হীরেন যদি সুস্থ থাকত, তবে মীরা পতিব্রতা পত্নীর চরিত্রের মাপে নিজেকে গড়ে তুলত, যেমন এতদিন করে এসেছে সে। অর্থনৈতিক সংকট তাকে টেনে এনেছে পথে। এবং পথই তাকে স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠার মুক্তির সন্ধান দিয়েছে।

উপন্যাসের সবচেয়ে অসহায় চরিত্র হীরেন। সে মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষ। স্ত্রীর কর্তব্য গৃহকর্ম, স্বামীসেবা এবং স্বামীপ্রেম—এই তার বিশ্বাস। এই মানুষটিই অবস্থা-বিপর্যয় হেতু পত্নী মীরাকে পথে বের হওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। নইলে বিপন্ন হবে উভয়ের অস্তিত্ব। এই উপায়হীনতা তার মনকে করেছে ব্যাধিগ্রস্ত। স্ত্রীকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে সে। ফলে তার জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে শান্তি। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি বলেই শেষ পর্যন্ত সে বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ। এ মৃত্যুর বিষণ্ণতা যে মীরাকে বেঁধে রাখবে না স্মৃতির বৃত্তে, সে যে সত্তার স্বাধীন প্রকাশে আনন্দিত হয়ে উঠবে—এ ইঙ্গিত উপন্যাসটিতে স্পষ্ট।

এমনভাবে নারীর স্বাধীন সত্তার প্রকাশ, তথাকথিত নীতিবোধের বিনাশ আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার শক্তিতে সুস্থিত নারীর বলিষ্ঠ জীবনপ্রীতি উপন্যাসটিকে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাস, ধারার বিশেষ একটি উপন্যাস করে তুলেছে।

১৯৫৫ সালে মুদ্রিত 'বারো ঘর এক উঠোন' সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সর্বাধিক পঠিত এবং বহু আলোচিত উপন্যাস। এ উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামগ্রিক সংকটের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের একটি বস্তি সদৃশ এজমালি বাড়িতে। পশ্চিম বাংলায় যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট আরও জটিল করে দিয়েছিল দেশবিভাগের শর্তে লব্ধ স্বাধীনতা। কারণ তার ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অগণিত শরণার্থীর ভারে আরও বিপর্যস্ত হয়েছিল এই রাজ্যটির অর্থনীতি। অর্থনৈতিক সংকট চূর্ণ করে দিয়েছিল এ রাজ্যের সুস্থিত সমাজবৃত্তকে। ধনী হয়ে যাচ্ছিল বিত্তহীন; মার্জিতরুচি, সংস্কৃতিগর্বিত মধ্যবিত্ত জীবন থেকে নিতান্ত আর্থিক কারণে মুছে যাচ্ছিল সকল নীতি আর সৌন্দর্য। আবার নিরাপত্তা-আশায় আগত উদ্‌বাস্তু মানুষগুলিও চূড়ান্ত অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

'বারো ঘর এক উঠোন' মনুষ্যত্বের ক্রমাবনতির; ধ্বংসের মুখোমুখি সহায়হীন মানুষের জীবন্ত চলচ্ছবি। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে চাকরি-হারানো শিবনাথের ফ্ল্যাট বাড়ি ছেড়ে বেলেঘাটার আট নং বস্তির বারো ঘর এক উঠোনের একটি ঘরে আশ্রয় নেওয়া নিয়ে। তার স্ত্রী রুচি চাকরি নিয়েছে মেয়েদের স্কুলে। স্ত্রীর উপার্জনে সংসার চলে তার। উপন্যাসটি যে সময়ের প্রেক্ষিতে রচিত তখন সমাজে মেয়েদের অবস্থান ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। কেবল

অর্থের জন্য ঘরের মেয়ে-বউকে চাকরি করতে দিতে বাধ্য হচ্ছিল বহু রক্ষণশীল পরিবার। সমাজ এবং পরিজনবর্গ ব্যাপারটিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তাদের মনে রয়েছে দ্বিধা। এই দ্বিধা আর মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়াই মধ্যবিত্তের স্বভাবধর্ম। উপন্যাসে সেই স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলা হয়েছে। মেয়েদের পক্ষে সম্মানের কাজ শিক্ষকতা—শিবনাথের স্ত্রী রুচি এই কাজ করেই শিশুকন্যা আর বেকার স্বামীকে নিয়ে গড়া সংসার চালায়। কমলা করে নার্সের কাজ। তার জীবন একক বলে যেমন ঈষৎ সচ্ছল, তেমনই তার দিকে সন্দেহের আঙুল তুলেই রেখেছে অন্য মানুষগুলি। ভুবনবাবুর মেয়ে প্রীতি কাজ করে টেলিফোন অফিসে। তাঁর অন্য মেয়ে বীথিকে নিন্দিত কমলা জুটিয়ে দিয়েছে মাতৃহীন এক শিশুর দেখাশোনা করার কাজ। আর শিক্ষক হয়েও বিধুবাবু পেটের দায়ে দুই কন্যাকে ম্যাসাজ ক্লিনিক-এ (আসলে দেহ-ব্যাবসার কেন্দ্র) কাজ করতে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

মেয়েদের কাজ করাকে সন্দেহের চোখে দেখা হত বহুদিন ধরেই। সেই নির্মম সময়েও এই সন্দেহ টিকেছিল। বারো ঘরের অন্যতম বাসিন্দা অমল চাকরি করত কারখানায়। স্ট্রাইকের জন্য বন্ধ হয়েছে সেই কারখানা। সংসার অচল। তবু স্ত্রী কিরণকে সে বাড়িওয়ালার গেঞ্জির কারখানায় কাজ করতে যেতে দেয় না। তাকে সমর্থন করে প্রতিবেশী বেকার কে. গুপ্ত। সুনীতির চাকরির চেষ্টায় ক্রুদ্ধ তার মায়ের কর্কশ ভাষণে মেয়েদের বহির্জগতে অর্থোপার্জন চেষ্টার প্রতি সমাজের তৎকালীন ধারণা ধরা পড়েছে—'ক্যান আমার ভাতের হাঁড়িতে কি ঠাডা পড়ছে যে পেটের মাইয়্যাকে বেশ্যা বানামু।'' মেয়েরা যে পুরুষের ভোগের জন্যই এসেছে—এটাই যে তাদের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ—এই সমাজবোধই উপন্যাসটিতে রূপ পেয়েছে। চাকরি করা মেয়েদের কর্মস্থল আর সংসারের সংকটে জর্জরিত অসহায়তার চিত্র আঁকতে চাননি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তিনি চেয়েছিলেন সেই সার্বিক ক্ষয়ের চিত্রায়ণ। তাই দেখি রুচির মতো মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মেয়েটিও শেষপর্যন্ত সিনেমায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক হয়ে চারু রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তার অজানা ছিল না যে চারু রায় মেয়েদের যৌন তৃপ্তির উপায় হিসেবেই গ্রহণ করে। তবে কি এটাই তার প্রতিবাদ? স্বামীর বিরুদ্ধে মেয়েদের যারা নিজেদের সর্ববিধ সুখ প্রাপ্তির যন্ত্র মনে করে সেই শিবনাথদের মতো স্বার্থপর পুরুষদের বিরুদ্ধে?

তবুও লেখক হয়তো বিশ্বাস করেন এই সমূহ সর্বনাশই সত্য নয়। কোথাও টিকে আছে সত্য আর সুন্দরের প্রতি মানুষের আর্ত পিপাসা। বিধু মাস্টারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণির মধ্যে সেই অ-মৃত সত্য যেন রূপলাভ করেছে। স্বামীর দেহসর্বস্বতার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ নেই। ত্রয়োদশবার গর্ভবতী হলেও স্বামীর প্রতি তার ভক্তি অটল। অব্যবস্থাকে সে মেনে নেয়। হাসপাতালে বেড না পেয়ে মেঝেয় শুতে হলেও তার অভিযোগ নেই। হাসপাতাল যে তাকে গ্রহণ করেছে এতেই সে যেন ধন্য। এই পর্যন্ত ভাবলে মনে হয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাকেই ধর্ম বলে জেনেছে মেয়েটি। কিন্তু যখন দেখি এই অসহনীয় অবস্থায়ও সে সন্তানদের দেয় সাধ্যমতো সাহিত্যাস্বাদনের শিক্ষা; তখন সম্ভ্রমে নত হয়ে আসে অন্তর।

মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও হয়তো বিশ্বাস করেন এই কুটিল বীভৎস আত্মসর্বস্বতা, মানুষের সর্বাত্মক এই বিনাশই শেষ কথা নয়। কোথাও যেন রয়ে গেছে আশার একটি বিন্দু, বিশ্বাসের ঈষৎ আশ্রয়। শুধু লক্ষ্মীমণির সাহিত্যমনস্কতাতেই সে বিশ্বাস সীমিত নয়। লেখক মাঝে মাঝে বারো ঘরের বাড়িটিকে তুলনা করেছেন চলমান জাহাজের সঙ্গে। যে জাহাজ থেমে যায়নি, যে গতিময়, তার সামনে কিন্তু কোনো বন্দরে পৌঁছোনোর আশা থেকেই যায়। হয়তো সার্বিক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েও মানুষ যে মরে না, হার মানতে চায় না সেই চিরন্তন আশার অ-বিনাশী সত্যের দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি এ উপন্যাসে। তথাপি উপন্যাসটিতে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকটিই প্রধান হয়েছে। নিষ্ঠুর এক সময়ের ছবিই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটিতে প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই রুচির আর চারু রায়ের ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে উপন্যাস।

'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র এক সাহিত্যিক। তিনি বয়সে প্রৌঢ় এবং প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বলে

সাধারণ পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হতে পারেননি। কোনো পুরস্কারও অর্জিত হয়নি তাঁর। যেখানে তাঁর সমকালীন কেউ কেউ মনোরঞ্জক উপন্যাস লেখার সুবাদে বাড়ি-গাড়ি করে নিয়েছেন। এই পরিস্থিতির কারণে সাহিত্যিক রামানন্দ সেন মানসিক অস্থিরতায় আক্রান্ত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তিনি ক্রমে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। মৃত্যুচিন্তা তাঁকে গ্রাস করে। শেষ পর্যন্ত জীবনযাপনের ভিন্নতর অভিজ্ঞতায় সত্য ও সুন্দরের বিচিত্র উপলব্ধি অর্জন এবং এক ধরনের মানসিক উত্তরণে উপনীত হওয়া উপন্যাসের মূল বিষয়। সেই সঙ্গে উপন্যাসে বাস্তবের সত্য ও সাহিত্যের সত্য, শিল্পের স্বরূপ, শিল্পীর সংকট, সমকালীন সাহিত্যিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রসঙ্গও এসেছে। ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে খানিকটা দার্শনিক ও খানিকটা বিতর্কমূলক। অনেকেই উপন্যাসটিকে কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মসমালোচনার স্বাক্ষর বলে মনে করেন।

উপন্যাসটিতে রামানন্দকে ঘিরে জটিল ঘটনাবর্ত গড়ে উঠেছে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর বহু দিনের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আত্মহত্যা করতে গেছেন। কিন্তু আত্মহত্যাও করা হয়নি তাঁর। তিনি অনেকটা অজ্ঞাতবাসে কাল কাটাতে শুরু করেছেন। সেখানে বিচিত্র ধরনের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। জীবনের বহু ভালো দিক, মন্দ দিক, নরনারী সম্পর্কের বিচিত্র বিন্যাস—ইত্যাদি অভিজ্ঞতার অর্জনে শেষপর্যন্ত রামানন্দ সেন জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে ফিরে পেয়েছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সর্বার্থে নাগরিক লেখক। যদিও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য অভিনিবেশ এবং আকর্ষণ লক্ষ করা যায়, তবু নাগরিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে যথার্থভাবে বোঝা যাবে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা, বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং জীবনের সৌন্দর্য ও সত্যের অন্বেষণ তাঁর সাহিত্যের লক্ষণ। তাঁর লেখা বিশ্লেষণধর্মী। বাস্তবের সব নির্মমতাকে স্বীকার করেও তিনি ব্যক্তির শুদ্ধতার উত্তরণে বিশ্বাস করেন।

৩.৩ নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬/১৭-১৯৭৫)

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম পূর্ব বাংলার ফরিদপুরে। কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজ থেকে কলাবিভাগে স্নাতক হবার পর প্রধানত সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-য় যোগ দেন ১৯৫৩ সালে, অবশিষ্ট কর্মজীবন সেখানেই কাটে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে প্রথম তিন দশকের বেশি অর্থাৎ সত্তরের দশকের সূত্রপাত কাল পর্যন্ত কথাসাহিত্যিক রূপে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা ছিল। প্রধানত নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকেই রূপায়িত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা তিরিশের বেশি। বিশিষ্ট উপন্যাস হিসেবে ‘দ্বীপপুঞ্জ’, ‘দূরভাষিণী’, ‘চেনামহল’, ‘সুখদুঃখের ঢেউ’, ‘সূর্যসাক্ষী’—এগুলির নাম করা যায়।

প্রথম উপন্যাস ‘দ্বীপপুঞ্জ’ ‘দেশ’-এ প্রকাশিত হয়েছিল ‘হরিবংশ’ নামে ১৯৪২-এ। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৪৬-এ এই প্রথম উপন্যাসটিতে তিনি তাঁর গ্রামদেশের জীবনকে তুলে ধরেছেন। বাস্তব পরিবেশ চিত্রণ, গ্রামের উৎসব-অনুষ্ঠান, কীর্তনগান, মেয়েদের ব্রত, বিভিন্ন জীবিকার বিবরণ উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য। দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ এবং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া ও গড়ে ওঠার কাহিনি ‘দ্বীপপুঞ্জ’।

গ্রামজীবনের পটে এমন উপন্যাস কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখা হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে নাগরিক জীবনের কাহিনি রচনায়। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় কেমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের আদর্শ এবং জীবনযাপনের চলচ্চিত্র—তা তাঁর লেখায় বিশ্লেষিত। এই জীবনবৃত্তে তথা সমাজে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক সংকট আঘাত করেছে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে। অনেকেরই কিছুটা ভূ-সম্পত্তি থাকায় যে সাশ্রয় হত তা ছেড়ে আসতে হয়েছে পূর্ব বাংলায়। গ্রামদেশের জমিজমা আর রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু দ্রব্যমূল্য

উর্ধ্বমুখী। অপর দিকে মেয়েদের কলেজের শিক্ষা পর্যন্ত তখন সমাজে স্বীকৃত। কাজেই মেয়েদের চাকরির প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটি তীব্র হয়ে দেখা দিল মধ্যবিত্ত সমাজে। 'দূরভাষিণী' সেই সংকটেরই আখ্যান। টেলিফোন-অপারেটর মেয়েরা হল দূরভাষিণী। টেলিফোন অফিস এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে যা গৃহকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে এক ব্যতিক্রম। কয়েকজন মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের ঘিরে তাদের পরিবারের সংকট দেখিয়েছেন লেখক। কোথাও রক্ষণশীলতার বাধা, কোথাও বেকার স্বামী স্ত্রীর উপার্জন নিতে হচ্ছে বলে হীনম্মন্যতায় ভোগে, কোথাও বাধে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। আবার কোথাও ঘরে ও বাইরে পরিশ্রমের চাপে নারী হয়ে পড়ে অবসন্ন এবং অসুস্থ। সব সংকট কাটিয়ে উঠে মেয়েরা এভাবেই নিজেদের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করবে—এই বিশ্বাস উপন্যাসটিতে সমুজ্জ্বল।

'অক্ষরে অক্ষরে' উপন্যাসটিতে নারীর আর এক ধরনের সংগ্রাম বর্ণিত। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার, উপার্জনের উৎস একটি প্রেস। বাড়ির মেয়েটি সুরূপা নয়, মা, দাদা ও বোনের সংসার। মেয়েটির বিয়ে হতে চায় না সহজে। কারণ আর্থিক সামর্থ্য অতি সীমিত। মেয়েটি কিন্তু দুর্ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করে চলে আসে প্রেসের কাজে। প্রেসে কাজ করা মেয়ে খুবই ব্যতিক্রম। সেখানে প্রেসেরই আর এক কর্মীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। মালিক ও কর্মীর সম্পর্কের দূরত্ব কাটিয়ে কাজের জগতের নতুন পরিচিতির মর্যাদায় তারা পরস্পরকে চিনতে পারে এবং পরিবারের মানসিক বাধা অপসৃত করে তারা মিলিত হয়।

'চেনা মহল'-কে অনেকেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মনে করেন। তাঁর লেখার সুপরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন কলকাতার মধ্যবিত্ত অঞ্চল, মধ্যবিত্তের জীবনযাপনে মান বজায় রাখার দায় এবং আর্থিক সংকটের মধ্যে অনিবার্য দ্বন্দ্ব, এবং চরিত্রগুলির মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিভিন্ন দিকের প্রকাশ এই উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। পিতৃপুরুষের রেখে যাওয়া মোটামুটি বড়ো একটি বাড়িতে ভাই এবং বোনের পরিবার খানিকটা আর্থিক সাশ্রয়ের জন্যই একত্র বসবাস করে। দুই পরিবারের মধ্যে প্রীতি এবং কোথাও কোথাও অপ্রীতিকর মানসিক সংঘাত উপন্যাসের প্রধান বিষয়। বাড়ির তরুণতর প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব জীবন-জীবিকা আর প্রেমের বিভিন্ন সংকটও উপস্থাপিত হয়েছে। বার বার উঠে এসেছে প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব জীবন-জীবিকা আর প্রেমের বিভিন্ন সংকটও উপস্থাপিত হয়েছে। বার বার উঠে এসেছে প্রজন্মের সংঘাত, ব্যক্তিমনের নতুন মূল্যবোধ এবং নরনারী সম্পর্কের গোপন ও প্রকাশ্য আকর্ষণ-বিকর্ষণের চিত্র। সর্বোপরি কলকাতা শহরে ঘরবাড়ি, রাস্তা, ফুটপাথ, গলি, চায়ের দোকান, বস্তি, রেস্টুরেন্ট, অফিস—এই সবকিছু নিয়ে 'চেনামহল'—চেনা কলকাতার ভিতর ও বাইরের ছবি একই সঙ্গে।

'সুখ-দুঃখের ঢেউ' উপন্যাসটি গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা—এই উপন্যাসটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিজের জীবনের উপাদান নিয়ে নির্মিত আংশিক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। যে পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল সেটি কিছুটা ভূসম্পত্তিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। কোনো অর্থেই ধনী নয়। কিন্তু খাওয়া-পরা এবং সাধারণ শিক্ষার অভাব ছিল না। পিতৃতন্ত্র-শাসিত পরিবারের গৃহকর্তার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন নিঃসন্তান। কনিষ্ঠ পুত্রের একটি ছেলেকে গৃহস্বামী জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূকে দান করেন। এই ঘটনা ঘটেছিল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনেই। তিনি এভাবেই তাঁর জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ হয়ে ছিলেন এবং জ্যাঠাইমাকেই মা বলে ডাকতেন। এই নিয়ে তাঁর দুই মায়ের মধ্যে ঈষৎ মানসিক সংঘাত, তাঁর নিজের মায়ের মনোকষ্ট—ইত্যাদি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সেই সঙ্গে আছে গ্রামীণ কিশোর এবং গ্রামীণ পরিবেশে সম্পর্কের বিভিন্ন দিক। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে বহু বাংলা উপন্যাসেই আমরা যার ব্যবহার দেখেতে পাই। 'সুখ দুঃখের ঢেউ' উপন্যাসটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্ররূপেই উল্লেখযোগ্য। 'সূর্যসাক্ষী' শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব-মিলনের ভিত্তিতে রচিত। মূলত দাম্পত্য সম্পর্কই উপন্যাসের উৎস। বহুনারীবিলাসী অধ্যাপক শশাঙ্ক। তার সৌন্দর্য আর মানসিক উৎকর্ষ মেয়েদের কাছে টানে। কিন্তু দুর্বলমনা শশাঙ্ক কাউকেই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারে না। স্ত্রী সুজাতা তার এই স্বভাবকে সহ্য করতে পারে না। সে চলে যায় স্বামীকে ত্যাগ করে এক আশ্রমে। এর মধ্যে শশাঙ্কের জীবনে আসে ছাত্রী মন্দিরা। মন্দিরা এবং শশাঙ্কের মধ্যে

যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা কিন্তু সহজে মুছে যায় না। শশাঙ্ক তাকে স্বভাবমতো সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু অনেকটা দৃঢ়মনা মন্দিরা তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। অভিভাবকেরা মন্দিরার অসম্মতি সত্ত্বেও মিহির নামের যুবকটির সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। মন্দিরা প্রথম মিলন রাত্রিতে আপন প্রেমের কথা জানিয়ে দেয় স্বামীকে। সে ভেবেছিল কলঙ্কিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করবে স্বামী এবং শশাঙ্ক ও তার মিলন হবে বিঘ্নহীন। কিন্তু মিহির জানায় এ কাহিনি তার জানা এবং অতীত নয়, বর্তমানকেই সে গ্রহণ করতে চায়। ক্রমে মিহির মন্দিরাকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসে ফেলে। মন্দিরার অবচেতনেও স্বামীর প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়। যদিও সে সম্বন্ধে ছিল না তার সচেতনতা।

এরপরে দেখা যায় স্বামীকে ছেড়ে মন্দিরা চলে এসেছে শশাঙ্কের গৃহে। কিন্তু ভীরু শশাঙ্ক তাকে গ্রহণ তো দূরের কথা আশ্রয় দিতেও অসমর্থ। প্রেমিকের এ আচরণ হতাশ করে মন্দিরাকে। তবু সে স্বামীগৃহে ফিরে যায় না। এ দিকে মিহির শশাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মোকদ্দমা করে। মিহিরের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও মনের উদারতা মন্দিরাকে ভেতরে ভেতরে টানে। উপন্যাসের শেষে দেখি শশাঙ্কের অবহেলিতা স্ত্রী সুজাতা স্বামীর প্রতি গোপন টান ছিঁড়তে পারেনি। তারই অনুরোধে মামলা তুলে নেয় মিহির। আর মন্দিরাকে গ্রহণ করে।

দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে চিরাচরিত সংস্কার আর আধুনিক নরনারীর মানসিক দ্বন্দ্ব—এই দুটি ভিন্ন বিষয়কে আশ্চর্য দক্ষতায় মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক উপন্যাসে। প্রতিটি চরিত্রই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মানবমনের আলো-অন্ধকারের বিশ্লেষণ-নিপুণতার জন্য 'সূর্যসাক্ষী' স্মরণীয় উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান কথাশিল্পী। অবশ্য প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনই তাঁর চিন্তন-মননের অবলম্বন ছিল। আমরা লক্ষ করি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকে কীভাবে পরিবর্তিত করে দিচ্ছে তার বিশ্বস্ত, প্রামাণ্য এবং শিল্পগুণসম্পন্ন রূপায়ণ তাঁর উপন্যাসে সুপরিস্ফুট। এক্ষেত্রে তাঁর তুলনা কমই পাওয়া যায়।

৩.৪ সাবিত্রী রায় (১৯১৮-১৯৮৫)

বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার উয়াড়িতে সাবিত্রী রায়ের জন্ম। পিতা নলিনীরঞ্জন সেন ও মাতা সরযূবালার সংসারে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং দেশপ্রেমের আবহ ছিল। উপসি গ্রামের সাধারণ বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা হয়। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে স্নাতক উপাধি অর্জন করেন। তাঁর বড়ো দাদা দেবপ্রসাদ সেন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে হিজলি জেলে বন্দি ছিলেন। সেখানেই তিনি সাম্যবাদী মতাদর্শে আকৃষ্ট হন। মুক্তি পেয়ে কলকাতায় এলে তাঁরই সূত্রে সাম্যবাদী শান্তিময় রায়ের সঙ্গে সাবিত্রীর পরিচয় ও বিবাহ হয়। সাবিত্রী রায় নিজেও শিক্ষকতার কাজ করেছেন। কিন্তু শান্তিময় রায় কলকাতায় অধ্যাপনা জীবন শুরু করলে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের সাহিত্য রচনা এবং কন্যার শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

অল্প বয়স থেকেই দাদা এবং স্বামীর সূত্রে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ, সংগঠন এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। যখন স্বাধীনতার পরে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় তখন পার্টির বহু গোপন সভা ডাকা হত সাবিত্রী-শান্তিময়ের কলকাতার বাসগৃহে। সাম্যবাদী মতাদর্শে সাবিত্রী রায় পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর রচনাকর্মে তার সাক্ষ্য আছে। সেই সঙ্গেই তাঁর স্বাধীন চিন্তা এবং সংগঠনের দুর্বলতাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবার মতো সাহস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও ছিল। তাঁর উপন্যাসগুলি সমাজমনস্ক শিক্ষিত পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের মনোরঞ্জনের কোনো উপাদান ছিল না বলে জনপ্রিয় উপন্যাসের ধারায় কখনই তাঁর লেখাগুলি স্থান করে নিতে পারেনি। তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'সৃজন' (১৯৪৭), 'ত্রিস্রোতা' (১৯৫০), 'স্বরলিপি'

(১৯৫২), 'মালশ্রী' (১৯৫৪) এবং তিনপর্বে লেখা 'পাকা ধানের গান' (১ম-১৯৫৬, ২য় ১৯৫৭, ৩য় ১৯৫৮), 'মেঘনা-পদ্মা' (১ম-১৯৬৪, ২য় পর্ব-১৯৬৫, ৩য় পর্ব-১৯৬৮)।

প্রথম উপন্যাস 'সৃজন'-এর পটভূমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকাল। এই উপন্যাসের নায়ক বিশ্বজিৎ দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও এক ধনী বিধবা জমিদার গৃহিণীর পোষ্যপুত্র রূপে গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে সাবিত্রী রায়ের স্বামী শান্তিময় রায়ের জীবনেই তেমন ঘটনা ঘটে। প্রথম উপন্যাসটিতে সাবিত্রী তাঁর স্বামীকে নায়ক চরিত্রের আদল রূপে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু উপন্যাসটির মূল আলোকসম্পাত ঘটেছে বিশ্বজিতের দেশপ্রেম, রাজনীতি-সচেতনতা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের বিবর্তনের উপর। সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে বিশ্বজিতের সমাজতন্ত্রের পথ গঠনই এই উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসটি প্রথম থেকেই গভীরতা সন্ধানী। আলোচিত হয়েছে ফ্যাসিবাদের বিশ্বজোড়া প্রেক্ষাপট; সেই সঙ্গে বাংলার প্রগতি আন্দোলনের চরিত্র। আন্দোলনের ইতিবাচক দিক এবং অন্তঃকলহ-জনিত দুর্বলতা—দুটিই প্রকাশ করেছেন তিনি। উপন্যাসটিতে বিশ্বজিতের জীবনের প্রেম এবং তার উন্মূলিত জীবনের একাকীত্ববোধকে অবলম্বন করে নায়কের মানবিক রূপকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই—লেখিকার প্রথম রচনাতেই রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রকৃত লক্ষণ ফুটে উঠেছে। প্রকৃত রাজনৈতিক উপন্যাসে মতাদর্শগত বিশ্লেষণ থাকা আবশ্যিক।

সাবিত্রী রায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ত্রিস্রোতা'। এখানেও বাংলার রাজনৈতিক চালচিত্রে কংগ্রেসের আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদের যুগ এবং সাম্যবাদী ভাবধারার যে অবস্থানগত বিন্যাস ও সংঘাত ছিল তাকে তুলে ধরেছেন লেখিকা। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঘটনায় এসে উপন্যাস শেষ হয়েছে। তবে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র পদ্মা নামের এক নারী। সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসে ক্রমশই নারীচরিত্র বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এখানেই তার সূত্রপাত। উপন্যাসটিতে মধ্যবিত্তের শ্রেণিচ্যুতির প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রমিক শ্রেণির জীবনাদর্শকে গ্রহণ করবার আদর্শে আস্থা প্রকাশিত হয়েছে।

সাবিত্রী রায়ের পরবর্তী উপন্যাস 'স্বরলিপি' প্রকাশিত হলে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিরুদ্ধতা দেখা দেয়। কারণ উপন্যাসটিতে লেখক পার্টির নানবিধ কর্মকাণ্ড তুলে ধরবার পাশাপাশি সংগঠনের দুর্বলতার দিকটিও তুলে ধরেছিলেন। উপন্যাসটিতে তেভাগা আন্দোলন এবং উদ্‌বাস্তু সমস্যা-সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের কথা বিস্তৃতভাবে এসেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবাবেগ এবং উন্মাদনাবশত কোথাও কোথাও ভুল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, নিজেদের মধ্যে ছিল বহুবিধ দ্বিধা—একথাও বলা হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, যে কোনো সমালোচনাকেই পার্টিতে শত্রুতা বলে গণ্য করার ব্যাপারটি যে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যকেই প্রতিপদে ব্যাহত করছে—এ সত্যই তুলে ধরেছেন সাবিত্রী রায়। তবে একথা অবশ্যই বলা যায় যে স্বাধীনতার সমকালের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পূর্ণ চিত্রটি গভীর গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন সাবিত্রী রায়। পৃথ্বী, শীতা, ফল্গু, সাগরী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে হৃদয়-সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখিয়েছেন সাবিত্রী রায়।

'মালশ্রী' একটি প্রেমের উপন্যাস। প্রেমের বিচিত্র রূপ ও বিবর্তনকে তুলে ধরাই এখানে লেখিকার উদ্দেশ্য। নায়িকা রাখী। তার প্রেমকে জাগিয়েছে সৌমিত্র। কিন্তু পরে আদর্শ এবং নিষ্ঠার মুগ্ধ হয়ে সে হৃদয় দিয়েছে সাম্যকে। রাজনৈতিক বিশ্বাস, পারিবারিক সংকট ইত্যাদির ফলে রাখী যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়। সেই অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করে গুজরাতি সাম্যবাদী সাহিত্যিক দিগন্ত। উপন্যাসটি লক্ষণীয় দিক হল নারীর প্রেমের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং সাম্যবাদী মতাদর্শে অবিচল আস্থা।

সাবিত্রী রায়ের ত্রিপর্ব উপন্যাস 'পাকা ধানের গান'-কেই (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬৫) তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা হয়। বিদেশি ভাষায় উপন্যাসটি অনূদিত হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার হাজং অঞ্চলের অভিজ্ঞতা এবং তেভাগা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত উপন্যাসটিকে অনেকে শলোখ্‌ভ-এর প্রখ্যাত উপন্যাস 'ধীরে বহে ডন'-এর সুঙ্গে তুলনা করেছেন। উপন্যাসটিতে গ্রামের চাষিদের বিদ্রোহ, দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে

কৃষক শ্রেণির সম্পর্ক বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। একটি প্রাচীন পরিবার উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকলেও চিত্রণপটে প্রবেশ করেছে অসংখ্য মানুষ। সংগ্রামে নেমে পড়েছে প্রগতিমনস্ক মধ্যবিত্ত যুবক। গ্রামের মেয়েদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে এই আন্দোলনের শিক্ষা। সামন্ততান্ত্রিক শাসন অস্বীকার করে মেয়েরা পা বাড়াচ্ছে বহির্জীবনে। সেই সঙ্গে গ্রামের মানুষের জীবনচর্যা ও লোকাচারকেও চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা। কোনো একটি চরিত্র এখানে প্রধান নয়। সর্ব শ্রেণীর সর্ব মানবের সমন্বয়ী স্বর এই 'পাকাধানের গান'। গারো পাহাড়ের পাদপীঠে বিস্তীর্ণ অরণ্য। কৃষিভূমি আর নদীর নিসর্গ-সৌন্দর্যও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে ভিন্নতর রূপে উদ্‌ভাসিত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসটিকে 'এপিক' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

আরও একটি ত্রিপর্ব উপন্যাস 'মেঘনা পদ্মা' (১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৮) লিখেছিলেন সাবিত্রী রায়। এখানেও পটভূমির বিপুল বিস্তার এবং অজস্র রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাবলিকে এক সূত্রে বাঁধবার বিস্ময়কর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তিনি। উপন্যাসের সময়পর্ব ব্রিটিশ আমলের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে গণনাট্যের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস বহুদিন পর্যন্ত সমালোচকদের কাছেও উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালীন বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে সাবিত্রী রায় এক বিরল প্রতিভাসম্পন্ন ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখায় দেশকালের চিত্রও যেমন উজ্জ্বল, তেমনই বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণী মনের জিজ্ঞাসাও সমুজ্জ্বল। এই অনির্বাণ জিজ্ঞাসাই শিল্পকে কালোত্তীর্ণতা দান করে যেমন দিয়েছে সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস সমূহকে।

৩.৫ অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১)

বাংলা উপন্যাসের ধারায় মাঝে মাঝে এমন কোনো কোনো লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা যেন পরম্পরা-বহির্ভূতা। সাধারণভাবে বাংলা উপন্যাসের লিপিকৌশল হল বিবৃতিধর্মী। ঘটনা বর্ণনার পথ ধরেই কাহিনি অগ্রসর হয়। যুক্তি-পারম্পর্যের সংগতি বজায় রেখে বিন্যস্ত হয় কথাবৃত্ত। কাহিনি উঠে আসে বাস্তবজীবন থেকে, চরিত্র হয় জীবন্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। এর ব্যতিক্রম বলতে আছে ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম-সমকালীন ও শরৎচন্দ্র-সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা মোটের উপর এই ধারাই অনুসরণ করেছেন। তার পরবর্তীকালে বদলেছে সমাজদৃষ্টির কৌণিকতা, পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক মূল্যবোধের মানদণ্ড। কিন্তু এই বাস্তবজীবনের স্বাভাবিক প্রতিরূপ নির্মাণের অভিপ্রায় বাংলার ঔপন্যাসিকেরা বজায় রেখেছেন প্রায় সব সময়।

এর মধ্যে সহসা ব্যতিক্রমের মতো মাঝে মধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম অমিয়ভূষণ মজুমদার এবং কমলকুমার মজুমদার। বাস্তবতার বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা উপন্যাস লিখেছেন এমন নয়। কিন্তু অসামান্য লিপিকৌশলে তাঁরা কখনও চিত্রধর্মে, কখনও চলচ্চিত্রধর্মে, অথবা ইতিহাস ও মিথ-এর সংমিশ্রণে, দৃষ্টিকোণের বিভিন্ন তল থেকে বাস্তবের অবলোকনে নতুন ধরনের এক নির্মাণকৌশল আবিষ্কার করেছেন। এই দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব এবং বর্ণন-রীতির অসাধারণত্বই তাঁদের উপন্যাসকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মাত্রা।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের জন্ম ১৯১৮ সালে কোচবিহার শহরে। পূর্বপুরুষের ছিল জমিদারি। সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের একটা রেশ ছিল তাঁর মানস-চরিত্রে। বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ ছিল। কিশোর বয়সেই বাংলা ও ইংরেজি ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। বি. এ. পাশ করবার পর ডাক ও তার বিভাগে চাকরি করেন এবং শুরু করেন সাহিত্যচর্চা। উত্তরবঙ্গেই জীবন যাপন করেছেন, প্রয়াত হয়েছেন ২০০১-এ।

জীবনযাপনের এই আপাত নিস্তরঙ্গ স্রোত দিয়ে কিন্তু সাহিত্যিক অমিয়ভূষণকে চেনা যাবে না। বিশ্বের সাহিত্য তাঁর নখদর্পণে ছিল। সেই সঙ্গে সুপণ্ডিত ছিলেন ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে। অধিকার ছিল

সংগীতে চিত্রকলার জগতে। চিত্তলোকে ছিল প্রগাঢ় সমাজমনস্কতা এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সমন্বয়। উপন্যাস, ছোটোগল্প এবং দুটি নাটক লিখেছেন। প্রধানত ঔপন্যাসিক রূপেই তাঁর পরিচয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা মিলিয়ে বাইশটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। প্রত্যেকটিই বিষয়বস্তুতে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বতন্ত্র স্বাদের। বিত্তবান জমিদার শ্রেণির কথা আছে। আবার বাস্তুহারা শরণার্থীকেও উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সংকট তুলে ধরবার আগ্রহ ছিল তাঁর। উত্তর বাংলার আদিবাসী থেকে শুরু করে ষোড়শ শতকের বাঙালি বণিক আর জ্যামাইকা দ্বীপের আদিম অধিবাসী অথবা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য থেকে উঠে আসা বণিক সম্প্রদায়ের মানুষজনকে তিনি সম গুরুত্ব সহকারে উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন।

তাঁর বাইশটি উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল 'নয়নতারা' (১৯৫৫ : 'নীল ভুঁইয়া নামে প্রথম প্রকাশিত), 'গড়শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭), 'নির্বাস (১৯৫৯), 'দুখিয়ার কুঠী' (১৯৫৯), 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৭৮), 'রাজনগর' (১৯৮৩, রচনাকাল ১৯৭২-৭৪), 'মধু সাধুখাঁ' (১৯৮৮), 'চাঁদ বেনে' (১৯৯৩), 'বিনদিনী', 'মাকচক হরিণ' (১৯৯১)। এই উপন্যাসগুলির নিরিখে আমরা ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নয়নতারা'-য় উত্তর বাংলার 'রাজা' উপাধিধারী এক প্রাচীন ভূস্বামী-পরিবারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসটির সময়সীমা ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮। এই উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে অভিহিত করা যায়। কারণ লেখক ভূমিকায় বলেছেন—''তৎকালীন নীলাক্ত সমাজকে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।'' 'নীলাক্ত সমাজ' অর্থে নীলকর সাহেবদের অধীনে বাংলার নীলচাষিদের অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিহাসকে এই উপন্যাসে তিনটি দিক থেকে স্পর্শ করা যায়। প্রথমত, প্রাচীন ধনী অভিজাত পরিবারটির সামগ্রিক চিত্রে—তাদের প্রাসাদ, উৎসব, রীতি, চালচলন, পোশাক, বিলাস-ব্যসন, শিক্ষা ইত্যাদির বর্ণনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে এক বিলুপ্তপ্রায় শ্রেণি। দ্বিতীয়, নীল ব্যবসায়ী শ্বেতাঙ্গসাহেব, তাদের ভারতীয় কর্মচারীবৃন্দ এবং অত্যাচারিত কৃষক সমাজ। উল্লেখ্য যে দরিদ্র কৃষকদের পরিস্থিতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়নি, উল্লেখিত হয়েছে মাত্র। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকেও কিছুটা দেখানো হয়েছে। সিপাহি বিদ্রোহের প্রসঙ্গও প্রাধান্য পায়নি তবে তারও প্রয়োজনীয় উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ইতিহাসের বর্ণনা যতটা আছে উপন্যাসে, তার বিবর্তন ততটা স্পষ্ট নয়।

নরনারীর সম্পর্ক উপন্যাসটিতে যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে। রাজপুত্র রাজচন্দ্র এবং গ্রামের এক শিক্ষিত পরিবারের ব্যক্তিত্বময়ী নারী নয়নতারার বিচিত্র সুন্দর আকর্ষণের আলেখ্য এই উপন্যাস। সেই সঙ্গে রানি এবং তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ফরাসি এক ব্যক্তির সম্পর্কও উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। লেখক অতি যত্নের সঙ্গে রানি, রাজচন্দ্র, নয়নতারা, পিয়েত্রো ইত্যাদি চরিত্রের রূপরেখা নির্মাণ করেছেন। চরিত্র চিত্রণে রোমান্টিকতার লক্ষণ নিয়ে আসবার দিকে অমিয়ভূষণের প্রবণতা ছিল। উপন্যাসটির ভাষায় অপরূপ চিত্রময়তা পাঠককে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। আখ্যানেরও একটি গতি আছে। কিন্তু তা অত্যন্ত ধীর। বর্ণনার সৌন্দর্যই উপন্যাসটির প্রধান আকর্ষণ।

'নয়নতারা' উপন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাকেন্দ্রিক পরিণতি নেই। উত্তরবঙ্গের ওই বিশেষ অঞ্চলটিতে ওই রাজপরিবার, নীলকর সাহেবদের সমাজ এবং শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের জীবন কীভাবে ধীর বিবর্তনে অতিবাহিত হয়ে চলেছে তাই দেখানো হয়েছে।

'রাজনগর' উপন্যাসটি 'নয়নতারা'-র দ্বিতীয় পর্ব। এখানে কাহিনি শুরু হয়েছে ১৮৫৯ সালে। উপন্যাসের এই খণ্ডে ঘটনার বিন্যাস কিছুটা বেশি। প্রথম দিকে ওই জীবনধারার ধীর চিত্র, তারপর রাজবাড়িতে রানির জন্মদিনের উৎসবের প্রস্তুতি চলে। তার মধ্যেই এক ঝড়ের রাত্রে রাজচন্দ্র-নয়নতারার মিলন এবং তারপরেই নয়নতারার অন্তর্ধান। রাজচন্দ্রের সঙ্গিনী হিসেবে রাজবাড়ি থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে অভিজাত পরিবারের আর এক নারীকে। এইভাবে কিছু দিন জীবনযাপন চলে। কিন্তু রাজচন্দ্রের বিবাহ যখন স্থির হয় তখনই সেই বিবাহে ঘটে গোলযোগ

এবং উপন্যাসের প্রথম অংশ শেষ হয় সেখানেই। এই ঘটনার পরে উপন্যাসের পরিকল্পনায় একটি কালগত ছেদ আছে। এরপর উপন্যাসের আখ্যানের যবনিকা ওঠে ১৮৮৩ সালে রাজচন্দ্র এবং তার সঙ্গিনীর ট্রেন যাত্রার বিবরণে। সেখানে দেখা দিয়েছে এক অতি সুন্দর তরুণ; স্পষ্টতই যে রাজচন্দ্র ও নয়নতারার সন্তান। এই দুটি উপন্যাসই একটি উপন্যাসের সম্প্রসারণ। আগেই আমরা বলেছি যে ইতিহাসের সৌন্দর্য এবং ইতিহাসের চিত্রপট এই উপন্যাসে অসাধারণ নৈপুণ্যে চিত্রিত হয়েছে।

'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটির জন্য অমিয়ভূষণ মজুমদার বহু পরিচিত। অমিয়ভূষণ কেবলই অভিজাত সমাজের চিত্রাঙ্কনে উন্মুখ ছিলেন একথা সত্য নয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিই ছিল তাঁর সজাগ অভিনিবেশ। 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে তার প্রমাণ পাই। উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্ব; ভারতের আসন্ন স্বাধীনতা এবং দেশ বিভাগের সম্ভাবনার চাপ, মন্বন্তরের রেশ এবং দাঙ্গার আঘাত নিয়ে এই উপন্যাসের সময়পর্ব গঠিত। জনজীবনের প্রতিটি স্তরকে তিনি তুলে ধরেছেন। জমিদারদের সান্যালবাড়ি, নায়েব, দারোগা প্রভৃতি চাকরিজীবী শ্রেণি, দেশকর্মী, ছোটো ব্যবসায়ী, রেলের খালাসি, হিন্দু ও মুসলমান কৃষক এবং সান্দার নামে অভিহিত জনজাতি গোষ্ঠী। ভারত ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময়টি জনজীবনের প্রতিটি স্তরকে কীভাবে আলোড়িত করেছে তা এই উপন্যাস-আখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

নরনারী সম্পর্কের বিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণকে রূপায়িত করবার দিকে বিশেষ একটি প্রবণতা ছিল লেখকের। এখানেও তিনি সান্যালবাড়ির শিক্ষিত পুত্রের সঙ্গে মধ্যবিত্ত পরিবারের দেশব্রতী তরুণীর প্রেম দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে কৃষক রামচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী পুত্রোপ্রেম যুবকের টানে শেষপর্যন্ত আত্মহননে নিজেকে শেষ করে দেয়। আবার সান্দারদের মেয়ে সুরতুন প্রথমে রেল খালাসি মাধাই, তারপর মাধাই হারিয়ে গেলে অন্য এক যুবকের সঙ্গে বাঁধা পড়ে জীবনের আকর্ষণে।

কালের সংকট ও মানবচিত্তের সংকটকেই দেখাতে চান অমিয়ভূষণ। এই উপন্যাসে তার বিপুল প্রতীক হয়ে উঠেছে পদ্মা নদী। পদ্মার উপর ব্রিজ হয়েছে। কিন্তু পদ্মা যখন ফুলে ওঠে, দেখা দেয় বন্যা, ফাটল ধরে ব্রিজ-এ, তখন পদ্মাই সেই মহাজীবনের প্রতিরূপ যা ভাঙে এবং গড়ে। এই ধ্বংসচিত্র যেভাবে অমিয়ভূষণ এঁকেছেন তা থেকে তাঁর আখ্যান বিস্তারের রীতি এবং দৃষ্টিকোণ কিছুটা বোঝা যাবে—''বন্যা থেমে গেলে হয়তো বোঝা যাবে, পদ্মা এবার পাশ ফিরলো কি না—এটা তার প্রসাদ কিম্বা রোষ। থেকে থেকে পদ্মার মুখ কালো হয়ে উঠেছে তখনো, ফুলে ফুলে উঠছে তার বুক। উপরে ড ড ড করে মেঘ ডাকছে। পুরাণটা যদি জানা থাকে হয়তো কারো মনে পড়তে পারে, কেউ যেন অন্য কাউকে বলছে : দয়া করো, দয়া করো। ..... এখন সব কিছুই পদ্মা। আকাশে দ্যাখো, সেখানে পদ্মা প্রতিফলিত। ... জীবন কী? এটাও যেন পদ্মার মতো একটা কিছু।...''

সাধারণ জনপদ জীবন, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ, আদিবাসী ও বহিরাগতদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ও অতীব গভীর অনুধাবনে প্রতিফলিত হয় অমিয়ভূষণের উপন্যাসে। এইসব বিষয় নিয়ে নভেলেট জাতীয় উপন্যাস লিখেছেন তিনি। 'দুখিয়ার কুঠী'-তে অরণ্য-প্রান্তিক একটি অনগ্রসর অঞ্চলে রাস্তা তৈরি করাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী গ্রামজীবনে নাগরিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ও গ্রামীণ অস্তিত্বের বিপর্যয়ের চিত্র আঁকা হয়েছে। 'নির্বাস' উপন্যাসটিতে দেশবিভাগের ফলে বাস্তুহারা মানুষের নতুন করে বসতি গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে। এজাতীয় উপন্যাসের মধ্যে খুবই বিশিষ্ট 'মহিষকুড়ার উপকথা'। এখানে শোষিত আদিবাসীরা মহাজনদের হাতে কীভাবে ব্যবহৃত হয় তার চিত্র দেখি। সেই সঙ্গে দেখি গ্রামীণ জীবনের সমস্ত উপাদানগুলি কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার অনুপ্রবেশে। আদিবাসীদের পরিত্রাতা-শক্তির প্রতীক ছিল বিশাল দেহ বন্য মহিষ। তার নামেই মহিষকুড়া। কিন্তু কালের নিয়মে একদিন সেই মহিষ আর কল্পনাতেও দেখা দেয় না। তার জায়গায় সগর্জন গতিতে বনভূমি কাঁপিয়ে এসে দাঁড়ায় অতিকায় লরি। সে শোষক-শক্তির প্রতিভূ। আদিবাসীদের অবস্থা কোনো

সময়েই পরিবর্তিত হয় না। তবে এই তিনটি উপন্যাসেই আখ্যানের বয়নে নরনারী সম্পর্কের বিচিত্রবর্ণ সৌন্দর্য রম্যতাগুণ সৃষ্টি করেছে।

অমিয়ভূষণের সৃষ্টি-কল্পলোকে বণিকসমাজের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর ইতিহাসবোধের অন্যতম অবলম্বনই হল বণিক ও বাণিজ্য। একটি দেশের ইতিহাস প্রধানত তার অর্থনীতির ইতিহাস। বণিকেরা দেশকে কেবল সমৃদ্ধিই দেয় না, স্থানিক আবদ্ধতা কাটাতে পারে বলে তাদের রক্ষণশীলতাও শিথিল হয়ে যায়। 'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসে এই বিষয়টি শিল্পরূপ লাভ করেছে। ষোড়শ শতকের বাংলার বণিক মধু সাধুখাঁ চলেছে বাণিজ্যে। তার পরিচয় হয়েছে ইংরেজ পর্যটকের সঙ্গে। নিজের দেশের পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাপারেও মধু সাধুখাঁ আগ্রহী। ধর্মে তার মন নেই। নদীতীরের সতীদাহের দৃশ্য দেখে সে সমাজ-পরিস্থিতির কথা ভাবে। ইংরেজ পর্যটকের সঙ্গে আলোচনা করে পৃথিবীর রাজনৈতিক ভূগোল নিয়ে। সাহসী বণিক মধু জলদস্যুর আক্রমণেও ভয় পায়নি। তার চিরন্তন জীবনাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি রূপেই সৃষ্টি এই মিতকায় উপন্যাসের।

বণিক-নায়ককে নিয়ে লেখা আর এক বিশিষ্ট উপন্যাস 'চাঁদ বেনে'। এই উপন্যাসের স্বাদ আবার কিছুটা আলাদা। মনসামঙ্গল কাহিনির চাঁদবেনে নয় এই উপন্যাসের নায়ক। উপন্যাসে দেবী মনসা কিংবা বেহুলা-লখিন্দর চরিত্র নেই। এখানে বণিক চাঁদবেনে সেই মানব শক্তির প্রতীক, সেই অতিকথার নায়ক যে জলের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তি জল। আবার জলই জীবন। প্রকৃতি ও মানুষের এই নিত্য দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই এই উপন্যাসের মূল কথা। সেই সঙ্গে বাংলার বণিক জীবন খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে পূর্ব ভারতে কেমন ছিল তার অসাধারণ চিত্র এই উপন্যাস।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের বহু উপন্যাসে আদিবাসীদের জীবন-সংকটকে অনাবৃত করে দেওয়া হয়েছে। উত্তর বাংলার রাভা নামক জনজাতি গোষ্ঠীকে অবলম্বন করে দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন অমিয়ভূষণ, কোনোটিই গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি। উপন্যাস দুটির নাম 'বিনদনি' ('সপ্তাহ' শারদ সংখ্যা ১৯৮৫) এবং 'মাকচক হরিণ' ('দৈনিক বসুমতী' শারদ সংখ্যা : ১৯৯১)। বহু দিন আগে উত্তরের শীতল পার্বত্য দেশ থেকে কোচ সম্প্রদায়ভুক্ত রাভা উপজাতি এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন অসম অঞ্চলে। তাদের ধর্ম ছিল নিজস্ব। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এবং জনসংখ্যার শক্তিতে দুর্বল রাভারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সহজে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তারা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে সন্নিহিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ছত্রছায়া পাবার জন্য। হারিয়ে যেতে চলেছে তাদের ভাষা। এককালে গভীর অরণ্যের মধ্যে তারা যে আবাদযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করেছিল, কোনো লেখাপড়া করার পদ্ধতি না থাকায় পরবর্তীকালে সে সব চলে যাচ্ছে অন্য গোষ্ঠীর হাতে। এই সংকটকেই রূপায়িত করেছেন অমিয়ভূষণ। বিনদনি এক রাভা রমণী। মাতৃতান্ত্রিক রাভা সমাজে মেয়েরাই জমির উত্তরাধিকারী। এই বিনদনির জমি কীভাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায় তারই কাহিনি এ উপন্যাস।

উপন্যাসের আখ্যাত পরিকল্পিত হয়েছে আধুনিক কালের দৃষ্টিভঙ্গিতে। দুই গবেষক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা রাভা সমাজ নিয়ে কাজ করতে এসেছেন ভারতে। তাঁদের গবেষণার সূত্রে উঠে এসেছে রাভাদের ইতিহাস। আমরা দেখি জনজাতিগোষ্ঠীকে সমাজের অন্য গোষ্ঠীর মানুষেরা কিছুতেই আপন মনে করতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানদের অত্যাচারেই তারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অত্যাচারের সঙ্গে আছে অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অপমান। রাভা শব্দ 'মাকচক'—যার অর্থ হরিণ। উপন্যাসটিতে আছে এক প্রতীকী হরিণ, বিচ্ছিন্ন এবং একা, মানুষের হাতে বন্দি। যেন বা অবলুপ্ত প্রায় বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ জনজাতি গোষ্ঠী রাভাদেরই প্রতীক সে।

অমিয়ভুষণ মজুমদার নিঃসংশয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিরল প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক। তাঁর জীবনদৃষ্টির দার্শনিক ব্যাপ্তি ও গভীরতার সঙ্গে মিশেছে বাস্তব দৃষ্টির সত্যতা এবং কল্পনাসমৃদ্ধ শিল্পসৌন্দর্যের মুগ্ধতাবোধ। আধুনিক বাংলা উপন্যাসে এই ধরনের ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধি আমরা আর কোনো লেখকের রচনায় পাই না।

৩.৬ সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫)

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি নামক মহকুমা শহরে সন্তোষকুমারের জন্ম। মধ্যবিত্ত পরিবারটিতে শিক্ষার আগ্রহ ছিল। স্কুলের পড়াশোনার সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যাবার অভ্যাস সেই সময়েই লেখকের গড়ে উঠেছিল। শহরটিতে রেলের কাজের সূত্রে বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গও ছিল।

পিতা সুরেশচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসকর্মী ও সাংবাদিক। আবার পালাগান লেখার অভ্যাসও তাঁর ছিল। বাড়িতে ছিল যথেষ্ট পুস্তকসম্ভার। এই পরিবেশে সাহিত্যচর্চায় অল্প বয়স থেকেই সন্তোষকুমারের আগ্রহ জাগে। উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতায় এসে তিনি কলকাতার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে মিশে যান। স্নাতক উপাধি অর্জনের পর অর্থনীতিতে এম.এ. পড়তে শুরু করেন সন্তোষকুমার। কিন্তু পাঠক্রম শেষ করেননি।

সন্তোষকুমারের জীবিকা ছিল সাংবাদিকতা। কিছু ছোটো পত্রিকা ছাড়া 'যুগান্তর', 'স্টেটসম্যান' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত দুটি পত্রিকাতেই ছিলেন সহ-সম্পাদক। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় বার্তা সম্পাদন হিসেবে যোগ দান করেন ১৯৫৮ সালে। তারপর থেকেই তিনি সাহিত্যিক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নানা রঙের দিন'-এর কিছু অংশ 'কালান্তর' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। কিন্তু পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লেখাটি শেষ হয়নি।

সন্তোষকুমার ঘোষ সতেরোটি উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে তিনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। আমরা তাঁর পাঁচটি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসের পরিচয় দেব। উপন্যাসগুলি হল—'কিনু গোয়ালার গলি' (১৯৫০), 'মোমের পুতুল' (১৯৫৪, পরের সংস্করণের নাম 'সুধার শহর'), 'মুখের রেখা' (১৯৫৯), 'জল দাও' (১৯৬৭), 'শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে' (১৯৭১)।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি' (১৯৫০)-তে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কলকাতার নগরজীবনের প্রেক্ষাপট। সন্তোষকুমারের লেখায় বার বার এই কালচিত্র ঘুরে ঘুরে এসেছে। তিনি বিশেষভাবেই পশ্চিম বাংলার নগর-জীবনের রূপকার। সেই নগর হল শহর-কলকাতা। উপন্যাসের প্রধান স্থানিক আবহে আছে একটি গলি। সেই গলিতে তিনটি স্বতন্ত্র কথাবৃত্তের বিবরণে উঠে এসেছে ছন্নছাড়া নাগরিক মধ্যবিত্তের ছবি। একটি কথাবৃত্তে আছে নীলা এবং তার বাবা-মা, দাদা-বউদি। আর্থিক নিরাপত্তাবিহীন পরিবারে নীলাকে নিজের ব্যাবসার ক্ষেত্রে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চায় দাদা দেবব্রত। নীলা অবশ্য প্রতিবাদী। উপন্যাসটিতে নীলার মধ্য দিয়েই সুরুচি ও সৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। আর একটি কথাবৃত্তে সাহিত্যিক-নাট্যকার মনীন্দ্রের স্ত্রী শান্তি। স্বামীর অনিশ্চিত উপার্জন এবং উদাসীনতার কারণে সে ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে; সম্পর্ক গড়ে তোলে ইন্দ্রজিৎ নামে এক দুর্বলচিত্ত কবির সঙ্গে। তৃতীয় কথাবৃত্তে ব্যক্তিত্বময়ী শকুন্তলা স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্থাপন করতে চায় এক সেবাসত্র; যেখানে আরও অনেক মেয়ে পাবে স্বাধীন জীবিকার সুযোগ। এক সময়ে নীলা এবং ইন্দ্রজিতের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ শান্তির সঙ্গে সম্পর্ক কাটাতে পারে না বলে নীলা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও নীলা তখন সন্তানসম্ভবা। নীলা কিন্তু হার মানে না। সে শকুন্তলার কাছে যায়। দু জনে মিলে আবার নারীর স্বাধীনতার ক্ষেত্র গড়ে তোলবার পথে পা রাখে। সমস্ত কাহিনিটি বর্ণিত হয়েছে গলির মোড়ে বাস করা স্বর্ণব্যবসায়ী প্রথম পোদ্দারের দৃষ্টিতে ও ভাবনায়। তার কাছে সমস্ত কলকাতা শহরকে মনে হয় অন্ধকার গলির জীবন।

'মোমের পুতুল' (১৯৫৪) নামের উপন্যাসটি পরবর্তী কালে 'সুধার শহর' নামে নতুন সংস্করণে (১৯৭৩) পরিচিত হয়েছিল। এখানেও প্রেক্ষাপট সেই কলকাতা শহর। কিন্তু অবলম্বন হয়েছে প্রধানত একটি পরিবার। নিম্নবিত্ত এই পরিবারে আছে মা, পুত্র শশাঙ্ক, কন্যা অতসী এবং গ্রাম থেকে আসা সুধা—যে অতসীর দিদির মেয়ে। অতসী স্কুলের শিক্ষিকা, তারই উপার্জনে সংসার চলে। সে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন। তার অর্থে সংসার চললেও তার মা তার প্রতি প্রসন্ন নন। সুধা এসেছে গ্রাম থেকে। বুঝতে চেষ্টা করছে শহরকে। উপন্যাসটিতে অতসী এবং সুধা—দুজনেরই চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, অনুসৃত হয়েছে দুজনেরই দৃষ্টিকোণ। সুধার সূত্রে এসেছে একটি কথাবৃত্ত যেখানে তার বান্ধবী নূপুর প্রতিবন্ধী এবং তীব্র শরীর বাসনাগ্রস্ত। চিকিৎসক তার চিকিৎসা না করে তার মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বেশি আগ্রহী। নূপুরের মাও নূপুরকে ফেলে ডাক্তারের সঙ্গে চলে যাবার কথা ভাবে। উপন্যাসটিতে মা ও মেয়ের সম্পর্ক দেখানোর ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ পরম্পরাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। আছে আরও অনেক চরিত্র। অসৎ রাজনীতিবিদ, নারীলোলুপ প্রতারক। সুধার বাবা নীরদ যাত্রা-পালা লেখে এবং তা ছাপাও হয়। অতসী তার রোগগ্রস্ত প্রেমিক নীলাদ্রিকে আশ্রয় দেয় এবং তার ভার নেয়। অতসী একটি সংগ্রামী চরিত্র। এই উপন্যাসে কলকাতা শহর কেবলই অবক্ষয়-চিহ্নিত নয়। সে যেমন কেড়ে নেয় তেমনই আবার আশ্রয়ও দেয়। অতসী এবং কিশোরী সুধা—দুজনেই কলকাতা শহরে নিজেদের জীবনকে নিজেদের মতো করে পেয়েছে।

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদানের ব্যবহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু আত্মজৈবনিকতার উপাদান ব্যবহৃত হতে পারে দু-ভাবে। জীবনের বহিরঙ্গ ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে উপন্যাসের কথাবৃত্ত নির্মিত হতে পারে, অথবা লেখকের অন্তর্জীবন উপন্যাসের চরিত্রের মানসলোকে প্রতিবিম্বিত হতে পারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লিখনে। 'মুখের রেখা' (১৯৫৯) উপন্যাসটিকে অনেকেই এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে আত্মজৈবনিক বলেছেন। নায়ক সৌরেশের মনে জাগ্রত হয় এক দার্শনিক জীবন-বিজ্ঞাসা। সে ভাবে মানুষ—যেমন সে নিজেও প্রতিমুহূর্তে জন্মগ্রহণ করছে নতুনভাবে। একজন মানুষ কিশোর বয়সে যা থাকে, যৌবনে সে হয়ে যায় আর একজন, বার্ধক্যে সে-ই এক তৃতীয় ব্যক্তি। সন্তানসম্ভবা পত্নীর প্রসব-যন্ত্রণা দেখে তার মনে এই জিজ্ঞাসা উদিত হয়। সৌরেশ ভাবে জীবন যখন প্রতি মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন মৃত্যুই ভালো। এইভাবে তার মনে জাগে মৃত্যু-ইচ্ছা। কিন্তু তার পর সে ভাবে যে, মানুষের অন্তর্জীবনে প্রতি মুহূর্তেই যখন ঘটে যাচ্ছে মৃত্যু, তখন আর আলাদা করে মরবার চেষ্টা করা নিরর্থক। এ ভাবেই সৌরেশ বেঁচে থাকে। এই উপন্যাসটিকে আত্মজৈবনিক না বলে লেখকের অন্তর্মনের জিজ্ঞাসা এবং উত্তর সন্ধানের পরিক্রমা বলা যায়। সেই অর্থে লেখাটি কিছুটা আত্মজৈবনিক। তবে মনস্তাত্ত্বিক বিশেষণটি সম্ভবত অধিকতর যথার্থ। নায়কের সমস্ত ভাবনাকেই সংহত করা হয়েছে একটি দিনের সময়-পরিসরে। এই উপন্যাসটি সন্তোষকুমার ঘোষের একটি পরীক্ষামূলক উপন্যাস—তাতে সন্দেহ নেই।

'জল দাও' (১৯৬৭) সন্তোষকুমার ঘোষের আর একটি সুপরিচিত উপন্যাস। এখানেও আছে নির্মাণের এক বিশেষ কুশলতা এবং অভিনবত্ব। তিমিরবরণ চাকলদার নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার শবদেহ শনাক্ত করা যায়নি বলে ছবি ছাপা হয়েছিল কাগজে। সেই ছবি দেখে বিভিন্ন সময়ে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এমন নানা মানুষের প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি এই উপন্যাস। এই ব্যক্তিদের মধ্যে আছে তার ব্যবহৃত নারীরা; পাদ্রি পবিত্র বিশ্বাস, যার কাছে সে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল এবং আছেন পত্রিকা-সম্পাদক মৃগাঙ্কমোহন যাঁর কাছে রক্ষিত আছে তিমিরবরণের একটি পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপি থেকে তিমিরবরণের জীবন জানা যায়। সেই গল্পই 'জল দাও'। তিমিরবরণ একজন মানুষ যে অনেক অন্যায় করেছে। তার কৈশোর যৌবন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উপন্যাসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আছে আলোর প্রার্থনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ষাটের দশকে বাংলা উপন্যাসে কথাসাহিত্যের এই ছকটি—অর্থাৎ অন্ধকারকে আশ্রয় করেছে এমন মানুষের আলোকপিপাসা ছিল বহু ব্যবহৃত একটি মডেল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ—সকলেই এই ধারায় কিছু কিছু উপন্যাস লিখেছেন।

‘শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে’ (১৯৭১) সন্তোষকুমার ঘোষের সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস। নায়ক এখানে পত্রলেখক, চিঠি লিখছে তার নিরুদ্দিষ্ট মাকে। নায়ক এখানে নামহীন। তার নিজের জীবনের স্মৃতির পটে ভেসে উঠছে অনেক মানুষের চরিত্র। তার বাবা কলকাতায় গিয়ে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য এবং পারিবারিক জীবন উপেক্ষা করে, কিছুটা নষ্টও হয়ে যায়। তার মা—আধা মফস্‌সল শহরে কিশোর পুত্রকে নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। সেই প্রয়াসে চরিত্রটি উজ্জ্বল। আছে সুধীর মামা—যে নায়কের মায়ের সঙ্গে কিছুটা হৃদয়ের সম্পর্কে জড়িত। এ ছাড়া আছে নায়কের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কে জড়ি বিভিন্ন নারী। উপন্যাসের আর একটি দিক পিতা এবং পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক। পিতার প্রতি পুত্রের বিরাগ, পিতাকে অ-স্বীকারের চেষ্টা, কিন্তু পিতা যেমন কলকাতায় গিয়ে কিছুটা নষ্টচরিত্র হয়ে গিয়েছিল, পুত্রও তাই হয়ে যায়। নিজের অনিচ্ছায় এবং অজান্তে পিতার মতোই হয়ে যায় সে। কলকাতা শহর যেন নষ্ট করে দু-জনকে।

সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পশ্চিমবাংলার বিসমভাবে বিকশিত নাগরিকতার চিত্রাঙ্কন। এই নাগরিকতা বহু সংকটে আকীর্ণ এবং তা মানুষকে আশ্রয়ও দেয়, আবার তার শুদ্ধতাকে বিনষ্টও করে দেয়। সেই সঙ্গে আত্মজীবনীমূলক উপাদানের ব্যবহার, নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিলতা, জননী ও সন্তানের মধ্যে অবদমিত মানসিক কূটগ্রন্থিগুলির সংকেত, অন্তর্মগ্নতা—ইত্যাদি নিয়ে তিনি এই সময়ের বিশিষ্ট একজন ঔপন্যাসিক।

৩.৭ ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯১৭)

বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর শহরে ননী ভৌমিকের বাল্যজীবন কেটেছিল। পাবনা কলেজ থেকে তিনি স্নাতক উপাধি অর্জন করেন এবং দেশবিভাগের পর বীরভূম জেলায় বসবাস করতে শুরু করেন। সাংবাদিকতা ছিল তাঁর জীবিকা। যথাক্রমে ‘জনযুদ্ধ’, ‘স্বাধীনতা’ এবং ‘পরিচয়’ পত্রিকায় কাজ করেন। সাম্যবাদী রাজনীতি ও সংগঠনের সঙ্গে অল্প বয়স থেকেই যুক্ত। রুশ সাহিত্যের বাংলা অনুবাদের কাজ নিয়ে ১৯৫৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন-এ যান এবং বাকি জীবন সেখানেই বাস করেন। তিনি একটিমাত্র উপন্যাস এবং কিছু ছোটো গল্প লিখেছিলেন। উপন্যাসটি তাঁর সমাজচিন্তা এবং জীবনবীক্ষার পরিচয় দেয়।

‘ধুলোমাটি’ নামের উপন্যাসটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের তিন প্রজন্মকে তিনি তুলে ধরেছেন। তিনজন পুরুষকে অবলম্বন করে রচিত উপন্যাসটির তিনটি স্তর। প্রথম স্তরের সময়কাল উনিশ শতক। রামচন্দ্র চৌধুরী উত্তরবঙ্গের পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি ছেড়ে রাঢ় অঞ্চলের একটি মফস্‌সল শহরে আদালতের চাকরি নিয়ে চলে আসেন। যদিও শহরটির নাম নেই তবু বীরভূমের সিউড়ি বলে জায়গাটিকে চেনা যায়। খানিকটা ননী ভৌমিকের নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। রামচন্দ্র চৌধুরীর কাছে মেধাই সম্পদ রূপে পরিগণিত ছিল। তিনি ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন।

উপন্যাসটির দ্বিতীয় স্তরে আছেন রামচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী। সরকারি আদালতের মাঝারি স্তরের কেরানি। সব দিক থেকেই তিনি একজন মধ্যবিত্ত মানুষ। নিরাপত্তাই তাঁর কাছে বিবেচ্য। কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। চরিত্রটির প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা অর্পিত হয়নি। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের পত্নী মোহিনী ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। বিপ্লবপন্থী পুত্র তাঁর সমর্থন পেয়েছিল। স্বামীকে পরিত্যাগ করে আসা মেয়েকেও সমর্থন করেছিলেন। সম্ভবত ননী ভৌমিকের মায়ের চরিত্র এখানে কিছুটা ছায়া ফেলেছে। তৃতীয় পুরুষ শিবেন্দ্র চৌধুরী বিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ের মানুষ। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। শিবেন্দ্রর প্রতি লেখকের সম্ভ্রম অনুভব করা যায়। কিন্তু ননী ভৌমিকের নিজের ব্যক্তিত্বের ধারক হয়ে উঠেছে শিবেন্দ্রর ছোটো ভাই বীরু। সে বাস্তববাদী এবং বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ও যন্ত্রশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সে ব্যাবসা করে নিজের কারখানার উৎপাদন বাজারজাত করে স্বনির্ভর

হতে চায়। কিন্তু যেহেতু বিপণন সম্পর্কে তার বুদ্ধি যথেষ্ট চতুর ও সক্রিয় নয়—তাই সে ব্যর্থ হয়। জনা বাউড়ি নামে এক শ্রমিকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব উপন্যাসের লক্ষণীয় দিক।

উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। সেগুলির নাম যথাক্রমে 'ধুলো', 'ঝড়ের দিন', 'দিনরাতের ঝড়' এবং 'মাটি'। প্রথম খণ্ডে উনিশ শতকীর রাজনৈতিক অস্থিরতা; দ্বিতীয় খণ্ডে পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সংকট; তৃতীয় খণ্ডে কোন রাজনৈতিক পথ গ্রহণযোগ্য তার বিচার-বিশ্লেষণ এবং চতুর্থ খণ্ডে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। সাম্যবাদে নায়কের বিশ্বাসের উত্তরণই উপন্যাসটিকে দেখানো হয়েছে। অবশ্য বিপ্লবী শিবেন্দ্রকেও সর্বত্র শ্রদ্ধা করা হয়েছে এবং সে নিজের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়নি। উপন্যাসটি সুলিখিত। তত্ত্ব এবং ঘটনাবিন্যাস সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়েছে। সাম্যবাদে বিশ্বাসের কথা থাকলেও অন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উপন্যাসটিতে ছোটো করা হয়নি।

৩.৮ বিমল কর (১৯২১-২০০৩)

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারায় বরেণ্য এক নাম বিমল কর। জীবনদৃষ্টির গভীরতায়, মানবচরিত্র জ্ঞানের বৈচিত্র্যে এবং জীবনকে অনুভব করবার এক বিশেষ ভঙ্গিতে বিমল কর নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার গ্রামে আদি নিবাস হলেও পরিবারের প্রায় সকলেই ভারতীয় রেল বিভাগে এবং কোলিয়ারিতে কাজ করতেন বলে তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছে ধানবাদ-হাজারিবাগ অঞ্চলে (বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্য)। শিক্ষিত, ভদ্র, একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জীবন কেটেছে। বি. এ. পাশ করার পর তিনিও রেল বিভাগে চাকরি নিয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ ছেড়ে প্রথমে সাময়িকপত্রের সম্পাদক পদে এবং পরে 'দেশ' পত্রিকায় কাজ করেন। অবসর গ্রহণের পর অন্য দুটি পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

কিশোর বয়স থেকেই বহু ধরনের বই পড়েছেন—বাংলা এবং ইংরেজি, ছোটোদের গল্প থেকে ধ্রুপদী সাহিত্য। লেখালেখির অভ্যাস ছিল অল্পবয়স থেকেই। 'দেশ' পত্রিকায় কাজ করবার ফলে সম্পূর্ণভাবে লেখার জগতে নিজেকে নিয়োজিত করতে অসুবিধা হয়নি। বহু ধরনের উপন্যাস লিখেছেন। ছোটোদের জন্য গোয়েন্দা উপন্যাস আছে। গল্প, বড়ো গল্প এবং আত্মস্মৃতি-মূলক রচনা ইত্যাদি লিখেছেন। তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখ্য 'দেওয়াল' (তিনখণ্ড, ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৬২), 'খড়কুটো' (১৯৬৩), 'পূর্ণ অপূর্ণ' (১৯৬৭), 'যদুবংশ' (১৯৭১), 'অসময়' (১৯৭২)।

'দেওয়াল' বিমল করের তৃতীয় উপন্যাস। এর আগের প্রথম উপন্যাস 'হ্রদ' এবং দ্বিতীয় উপন্যাস 'বনভূমি' তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে বিমল কর প্রতিষ্ঠিত হলেন এই 'দেওয়াল' উপন্যাসেই। তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুসারে অল্প বয়সে একটি ইংরেজি উপন্যাসে প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বার্লিন শহরের একটি দরিদ্র পরিবার কীভাবে সব দিক থেকে অধঃপতিত হয়ে যাচ্ছে—তা পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'দেওয়াল' লেখার সময় কাজ করেছিল সেই স্মৃতি। সমকালীন কলকাতা শহরে মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণুতা এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একটি পরিবারের ভাঙনের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের ভাঙনকেই দেখিয়েছেন বিমল কর। উপন্যাসটির সময়কাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের কলকাতা। ব্ল্যাক আউট, বোমা, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার—চারদিক থেকে তখন মানুষকে চেপে ধরেছে। অন্য দিকে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। বউবাজার স্ট্রিট সংলগ্ন গলি ফটিক দে লেন। এইভাবে কলকাতা শহরের গলির নাম চিহ্নিত করে পরিবেশকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূর্ত করার রীতি তাঁর উপন্যাসে প্রায়শ পাই। জীর্ণ ভাড়াবাড়িতে চন্দ্রকান্ত বিদ্যারত্নের বিধবা পত্নী রত্নময়ী, কন্যা সুধা, পালিতা কন্যা আরতি এবং পুত্র বাসুকে নিয়ে বাস করেন। অর্থনৈতিক বিপর্যয় পরিবারটিকে গ্রাস করে ফেলছে। চন্দ্রকান্তের বিদ্যাচর্চার উত্তরাধিকার কেউ-ই বহন করছে না। টুকরো টুকরো উল্লেখে সেই সময়ের রাজনৈতিক সংঘাত, যুদ্ধ

এবং গান্ধিজি, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-চেতনা—এই সবই এই তিন খণ্ড উপন্যাসে পাই। চরিত্রগুলির মনের মাপ অতি সাধারণ। সাধারণ মানুষকেই কেন্দ্র-ভূমিকা দেবার প্রবণতা ঔপন্যাসিক বিমল করের এক বিশিষ্ট পরিচয়। তিনি দেখিয়েছেন মানুষগুলির মন কীভাবে ধীরে ধীরে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেননি। সময়ের সমস্ত খুঁটিনাটিকে তুলে ধরবার পরেও তিনি শেষ পর্যন্ত আলো ফেলেছেন মানুষের মনের অভ্যন্তরে। দেখিয়েছেন মানুষের পতনের জন্য কেবল পরিবেশ নয়, তার অবচেতন মনের ভূমিকাও যথেষ্ট। এখান থেকেই বোঝা যায় বিমল কর ঔপন্যাসিক হিসেবে নিজেকে সময়ের দলিল রচনার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠবেন মানুষের মনের জটিলতার রূপকার।

'খড়কুটো' (১৯৬৩) উপন্যাসটি সুপরিচিত কিন্তু জটিল নয়। দুটি তরুণ তরুণীর স্নিগ্ধ সরল প্রেম, এর অবলম্বন। পরিণামে আছে বিষাদঘন বেদনা। উপন্যাসের নায়ক অমল বেড়াতে এসেছে পিতৃবন্ধু আনন্দমোহনের বাড়িতে। আনন্দমোহনের গৃহে আছেন দ্বিতীয়া পত্নী হিমানী, কন্যা কৃষ্ণা এবং প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ভ্রমর—কৃষ্ণার দিদি। পরিবারটি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। খ্রিস্টীয় সমাজকে নিয়ে সাহিত্য রচনায় অগ্রণীদের অন্যতম বিমল কর। অমল সেখানে এসে দেখে আনন্দমোহন তাঁর অধ্যাপনা নিয়ে, হিমানী নিজের কাজ ও গির্জায় যাওয়া-আসা নিয়ে, কিশোরী কৃষ্ণা নিজের বন্ধুবান্ধব, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। ভ্রমরের শরীর রুগ্ন, সে পরিবারে অত্যাচারিত নয়, কিন্তু বিচ্ছিন্ন এবং একা। অমল এবং ভ্রমরের অনুচ্চারিত, সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ, সহমর্মী ভালোবাসার এক কাব্যময় আলেখ্য 'খড়কুটো' উপন্যাসটি। শেষপর্যন্ত রক্তের ক্যানসারে ভ্রমরের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর সম্ভাবনা আর পরিবারের সকলের বেদনা এবং অমলের মনের গভীর কষ্ট ও শূন্যতাবোধ—এই অনুভবের মধ্যেই উপন্যাস শেষ হয়। উপন্যাসটিতে জটিলতা নেই কিন্তু গভীরতা আছে। বিমল করের পরবর্তী অনেক লেখাতেই মানুষের অসুস্থতা, যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুবোধ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় উপলব্ধি হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে তার সূত্রপাত। আবার মানবসম্পর্ককে তিনি কখনই চড়া দাগে আঁকেন না। অতি সূক্ষ্ম রেখায় অত্যন্ত স্বাভাবিক রেখে তিনি সম্পর্কের ক্রমবিবর্তন দেখাতে পারেন। এই উপন্যাসে তারও শুরু দেখতে পাই আমরা।

পরবর্তী উপন্যাস 'পূর্ণ-অপূর্ণ' (১৯৬৭)-তে বিমল করের শিল্পীসত্তার দার্শনিক দিকটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হল। উপন্যাসের এক জায়গায় লেখক লিখেছেন—'মানুষের জীবনে কেউ কেউ তার মনোমতন একটি পূর্ণতার সন্ধান করে বেড়াতে পারে, আবার কেউ কেউ মনে করতেও পারে, এ ধরনের অন্বেষণ অর্থহীন, কেননা যথার্থ পূর্ণতা বলে যদি কিছু থাকেও সংসারে—তা অলভ্য। অথচ, এটা আমরা দেখি, পূর্ণতা সম্পর্কে আমরা অবিশ্বাসী হলেও, যারা তার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়—তাদের প্রতি আমাদের কোথায় যেন একটা চাপা সহানুভূতি থেকে যায়।' ('পূর্ণ অপূর্ণ' : ১৯৬৭, পৃ. ১৪০)।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তিন জন—সুরেশ্বর, হৈমন্তী এবং অবনী। আর একটি চরিত্র নির্মলা ঘটনার দিক থেকে গৌণ কিন্তু উপন্যাসের প্রতিপাদ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সুরেশ্বর অসুস্থ ও বিপন্ন মানুষের সেবা করে এবং তারই মধ্য দিয়ে পূর্ণতার সন্ধান করে। হৈমন্তী প্রথম যৌবনে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সুরেশ্বরের পরিচর্যায় সে সুস্থ হয়েছে এবং ভালোবেসেছে তাকে। সুরেশ্বরের আগ্রহেই যে চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সুরেশ্বরের আছে একটি সেবাশ্রম। এক ঝড়ের রাতে প্রায় অন্ধ এক নারী নির্মলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নির্মলার অন্তরে এই শান্ত আস্তিক্যবোধ এবং পূর্ণতায় বিশ্বাস আছে। সে জীবনের সব দুঃখ স্বীকার করে নিয়েও মানুষের প্রতি আস্থাশীল। নির্মলার সঙ্গে পরিচিত হবার পর পূর্ণতার আভাস পায় সুরেশ্বর। হৈমন্তী আর তেমনভাবে তাকে আকর্ষণ করে না।

সুরেশ্বরের আশ্রমে অবনী নামে এক জনের সঙ্গে হৈমন্তীর পরিচয়। তার বাবা-মার জীবন ছিল অসংযত। অভিজাত বংশের সন্তান হয়েও অবনীর জীবন বিশৃঙ্খল। স্ত্রী ললিতার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ওই আশ্রমেই হৈমন্তী ও অবনী—দুজন জীবনের আঘাতের আহত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মোটের উপর

উপন্যাসটি এখানেই শেষ হয়। পূর্ণতার সন্ধানী সুরেশ্বর নির্মলার হৃদয়ের স্পর্শে সেই পূর্ণতার সন্ধান পায়। অবনী এবং হৈমন্তী নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের কথাই ভেবেছিল প্রধানভাবে। তাই তারা সেই পূর্ণতাবোধে পৌঁছোতে পারেনি। কিন্তু পূর্ণতার সাধনা তারা উপলব্ধি করেছে এবং তার সার্থকতাও কামনা করেছে। এই ধরনের দার্শনিক প্রত্যয়শুদ্ধ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল।

পরবর্তী উপন্যাস 'যদুবংশ' (১৯৬৮) আবার একেবারে অন্যরকম। ষাটের দশকের পশ্চিম বাংলা বহু ধরনের বিক্ষোভে আলোড়িত। স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক প্রশাসন পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই খানিকটা ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরেছে। ষাটের দশকের প্রথমেই খাদ্য আন্দোলনের তীব্রতা এবং মধ্যভাগে বিভিন্ন ধরনের ছাত্র আন্দোলন মানুষকে করে তুলেছে নৈরাশ্যপীড়িত এবং কিছুটা বিভ্রান্ত। ১৯৬৭ সালে একই সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং প্রথম যুক্তফ্রন্টের স্বল্পকালীন প্রশাসন। এসবের ফলে বাংলার তরুণ সমাজ সত্যিই খানিকটা গন্তব্যহীন, ভবিষ্যৎহীন, হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এরাই সেই 'যদুবংশ' যারা নিজেরাই ধ্বংস করেছে নিজেদের। পাঁচ জন যুবক প্রায় সমমূল্য পেয়েছে উপন্যাসে। তার মধ্যেই গণনাথ একটু বয়সে বড়ো; মনের দিক থেকে খানিকটা স্থির, শান্ত, পরোপকারী এবং কিছুটা আদর্শবাদী। বাকি চারজন সূর্য, অভয়, বুল্লি আর কৃপাময়। আছে কিছু নারীচরিত্র। তার মধ্যে সূর্যের দিদি বিজয়া এবং বান্ধবী মালা প্রধান। চরিত্রগুলিকে ঘিরে বিচ্ছিন্ন কথাবৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রতিটি চরিত্রই সামাজিক বিপন্নতাবোধে আক্রান্ত। কেউ-ই মহৎ চরিত্র নয়। বিশেষভাবে নারীচরিত্রগুলির মধ্যে সমকামিতার সম্পর্কও দেখিয়েছেন বিমল কর। যুবক সমাজের ছিন্নমূল অবস্থান, পঞ্চাশ-ষাটের দশকের অসুস্থ যৌবনের ছবি এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। সুলিখিত উপন্যাস, কিন্তু হয়তো বা একটু বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত।

সব শেষে আমরা বিমল করের আর একটি বিশিষ্ট উপন্যাস 'অসময়' (১৯৭২)-এর আলোচনায় আসব। এখানে তাঁর উদ্দিষ্ট হল সময়ের সংঘাত। তিনি দেখিয়েছেন একটি প্রাচীন পরিবার পূর্বপুরুষের শিক্ষা, সংস্কার ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু সেই পরিবারের মানসিকতার ওপর আছড়ে পড়ল নতুন যুগের সংকট। একালের মানুষের ব্যক্তিত্বের চাপে ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল পুরোনো আভিজাত্যের পর্দা। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মোহিনী। মফস্সল শহরের বাসিন্দা এই পরিবারের মোহিনীর বিবাহ স্থির হল কলকাতার অভিজাত পরিবারে। শহরেরই ছেলে শচীপতির সঙ্গে মোহিনীর ঘনিষ্ঠতা থাকলেও মোহিনীর বাবা তা গ্রাহ্য করলেন না। কিন্তু বিবাহের পর চরিত্রহীন স্বামীকে ত্যাগ করে পিতৃগৃহে ফিরে এসেছে মোহিনী। সে-ই কিন্তু ধরে রাখতে চায় পরিবারের প্রাচীনত্ব, আভিজাত্য আর সংস্কার। তার একদিকে পূর্ব প্রজন্ম জ্যাঠামশায়; অন্য দিকে নবীন প্রজন্ম ভাই সুহাস ও বোন আয়না। সুহাস এবং আয়না সেই শহরেরই মেয়ে বুলা এবং যুবক তাপসকে ভালোবাসলেও তা স্বীকার করতে পারে না তারা। এই সময় অবিম নামে এক ঝড়ের মতো মানুষ এসে পড়ে তাদের সংসারে। প্রচলিত প্রথায় তার বিশ্বাস নেই। মোহিনীর আভিজাত্য-সংস্কারকে সে সবদিক থেকে আঘাত করে; বাড়িটাকে বলে 'কয়েদখানা'। অবিনের চেষ্টাতেই আয়নার বিবাহ স্থির হয়েছে তার প্রেমিকের সঙ্গে। পুরোনো ধারণাগুলি ভেঙে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত মোহিনীও ধরা দিয়েছে অবিনের আকর্ষণে। শচীপতি চরিত্রটি একটু উপেক্ষিত মনে হয় কিন্তু লেখকের প্রতিপাদ্য ছিল জীবনের নবীনায়ন। শচীপতি জোরের সঙ্গে তা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অবিন পেরেছে বলেই জয়ী হয়েছে সে।

বিমল কর বহু উপন্যাসের লেখক। কিন্তু তাঁর প্রধান প্রবণতাগুলি আলোচিত উপন্যাসগুলির মধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। তিনি সমকাল ও সমাজকে ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু সেই বৃত্তের মধ্যে আসলে মানুষকে তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি মানুষের রোগ, শোক, ত্রুটি, দ্বিধা, দুর্বলতা, ঈর্ষা, নীচতা—কোনো কিছুকেই বাদ দেন না। কোথাও কোথাও মানুষের কিছু মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও মানুষের সাধারণত্বকে জীবনের প্রকৃত স্বরূপ বলে দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। আবার এর মধ্যেই মানবচিত্তের দার্শনিকতার বোধ, সত্যের জন্য, পূর্ণের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা ও সন্ধান তাঁর উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয়।

৩.৯ গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০)

যশোর জেলায় গৌরকিশোর ঘোষের জন্ম। আদি নিবাসও সেখানেই। কিন্তু শৈশব শ্রীহট্ট জেলার চা বাগানে এবং বাল্যবয়স নবদ্বীপে কেটেছে। দেশ ভাগের পর পুরোপুরি পশ্চিম বাংলায় বাস করেন এবং বহু ধরনের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হন। যেমন গৃহশিক্ষকতা করেছেন, তেমনই রেস্তোরাঁর পরিচারক হিসেবেও কাজ করেছেন। এ. আর. পি. রেসকিউ সার্ভিস, এরোপ্লেন কারখানার কর্মী, কাঠের কন্ট্রাক্টার, বিমা কোম্পানির এজেন্ট, ওষুধ কোম্পানির এজেন্ট, সরকারি কর্মী আবার নাচের দলের ম্যানেজার—ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত সাংবাদিকতায় আসেন। সে জীবনেও বহু বৈচিত্র্য ছিল। 'নব বাণী', 'দৈনিক সত্যযুগ', সাপ্তাহিক 'অরণি', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'আজকাল' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে যুক্ত থেকেছেন। সাংবাদিকতা থেকে সম্পাদনা—সব কাজই করেছেন। সাংবাদিক হিসেবে পর্বত অভিযানেও গেছেন। সাংবাদিক রূপে ছিলেন নির্ভীক। জরুরি অবস্থার সময় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে প্রায় এক বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। 'রূপদর্শী' ছদ্মনামেও লিখেছেন।

সাংবাদিকের কাজেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। তাঁর গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা কম এবং সেগুলি অধিকাংশই পাঠকের কাছে বেশি পরিচিত নয়। কিন্তু একটি তিন পর্ব বিশিষ্ট উপন্যাসের জন্য গৌরকিশোর ঘোষের নাম বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসের ধারায় স্থায়ী হয়ে আছে। 'দেশ মাটি মানুষ' অভিধায় একটি বড়ো মাপের লেখার পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন যার তিনটি খণ্ডের নাম যথাক্রমে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' (১ম খণ্ড), 'প্রেম নেই' (২য় খণ্ড), 'প্রতিবেশী' (৩য় খণ্ড)।

এই উপন্যাসটি ভারতীয় মুসলমান সমাজের এক বিস্তৃত ইতিহাস। ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক সংকট, হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং ধর্মীয় পরিচয় ও সংস্কার ছিন্ন করে দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরই মানুষ হিসেবে নিজেকে উপলব্ধি করবার এবং চিনে নেবার এক আশ্চর্য দর্পণ-এই খণ্ড উপন্যাস।

'জল পড়ে পাতা নড়ে'-র সময়সীমা ১৯২২ থেকে ১৯২৬। স্বাধীনতাপূর্ব অখণ্ড বাংলার পূর্ববঙ্গের প্রেক্ষিতে নির্মিত উপন্যাসটিতে দেখা যায় গ্রামীণ বর্ণহিন্দুদের মুসলিম-বিদ্বেষের তীব্রতা তখনই ছিল প্রবল। তখনও বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা তেমন প্রসারলাভ করেনি। দরিদ্র মুসলমান কৃষক-শ্রমজীবীদের গড়ে ওঠেনি কোনো রাজনৈতিক সংগঠন। তথাপি একেবারে শ্রমজীবী দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তেমন প্রভেদ ছিল না। কিন্তু মধ্যবিত্তদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ ছিল প্রবল। কাজেই এই ভেদচিন্তাকে কেবল ব্রিটিশ শাসকের নির্মাণ বলে মনে করা যায় না। 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-তে এক গ্রামীণ মজলিশে কোনো উচ্চবর্ণের হিন্দুর একটি মন্তব্য প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায়—'.....ওরা যদি কিছু বোঝবেই তাহলি আর চিরকাল নাঙ্গলা চাষা হয়ে থাকে? ('জল পড়ে পাতা নড়ে' পৃ. ৫)।

বিত্তহীন শ্রমজীবীরা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে শোষণ এবং উৎপীড়নের শিকার ছিল। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে একমাত্র ধর্মীয় কারণেই ছোলেমান নিকিরির মতো শ্রমজীবীরা নিগৃহীত হত—এতথ্য অস্বীকার করা যায় না।

'জল পড়ে পাতা নড়ে'-তে দেখা মেলে পরবর্তী খণ্ড 'প্রেম নেই'-এর নায়ক ফটিক মিঞা বা শফিকুলের, সে শিক্ষিত মুসলমানের প্রতিনিধি। এবং স্ব-শ্রেণির অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। তার মতে মুসলমানগণ যেহেতু শিক্ষায় হিন্দুদের অপেক্ষা পিছিয়ে আছে তাই তাদের জন্য '...... আলাদা ব্যবস্থা করার সত্যিই দরকার হয়ে পড়িছে।' (ওই পৃ. ৩৯) এখানেই হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রকৃত যথার্থ দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য হিন্দুদের মধ্যেও মেজকর্তার মতো যথার্থ শিক্ষিত যুক্তিবাদী, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে মোহহীন সত্যদ্রষ্টাও ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের প্রয়াস সফল হয়নি। ফটিক এই মেজকর্তার জন্যই হয়ে উঠেছিল মুক্তমনের মানুষ।

'প্রেম নেই'-এর কাল ১৯৩৫। তখন রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রবল হয়েছে। আর তার ফলে সামাজিক ব্যবধান হয়েছে তীব্র। যোগ্যতার পরিবর্তে ধর্ম হয়ে উঠেছে চাকরি পাওয়ার মানদণ্ড। তাই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ফটিককে গ্রামের স্কুলের প্রধানশিক্ষক হতে দেওয়া হয় না। সে পদ পায় অযোগ্য এক বর্ণহিন্দু। ফটিক চাকরি করবে না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কলকাতা যায় ওকালতি পড়তে। মহানগর তার দৃষ্টিভঙ্গিকে করে তোলে আরও উদার দ্বিজাতিতত্ত্বের শাসক-প্রশ্রয়পুষ্ট উগ্রতার মধ্যেও যে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সুস্থ, উদার। সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত চিন্তাধারা সম্পন্ন একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠছিল—'প্রেম নেই'-তে সে সত্য প্রতিষ্ঠিত। আবার সাধারণ দরিদ্র কৃষক মুসলমানগণ জমিদার-মহাজন জমিদার-কর্মচারী—এই শোষণ-কাঠামোর শিকার; যে কাঠামোর অধিকাংশ হিন্দু—সে বাস্তব সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন লেখক। সেই সময়ের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এই ভিত্তিস্তরের সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন ছিল বলেই গড়ে উঠেছিল পৃথক মুসলিম রাজনৈতিক দল—'কৃষক প্রজা পার্টি'। 'কৃষক প্রজা পার্টি'-ও অবসান ঘটাতে পারেনি এই অবিচারের। ফটিকের মতো উদারমনা মুসলিম মানুষগুলি—হিন্দু আর মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েই খুঁজে পায়নি প্রীতির সম্পর্ক। এই বিভেদ-রেখা দিয়েই জন্ম হয়েছিল মুসলিম লিগ-এর। অবশ্য শাসক-প্রশ্রয়ের কথাও অস্বীকার করা যায় না।

'দেশ মাটি মানুষ'-এর শেষ পর্ব 'প্রতিবেশী'। এ অংশের ঘটনাকাল স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষ। ক্যানসারগ্রস্ত প্রৌঢ়া অমিতার স্মৃতিচারণরূপে উপন্যাসটিতে বিভাগ-পূর্ব ভারতবর্ষের উত্তপ্ত রাজনৈতিক বাতাবরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দেশবিভাগের মতো নিষ্ঠুর বাস্তব রূপায়িত হয়েছে। ফটিক মিয়াঁ আর মেজকর্তার মতো সৎ উদার মনের মানুষগুলির পরাজয় আর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে এই ত্রিপর্ব উপন্যাস।

উপন্যাস তিনটিতে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, প্রীতি-বিদ্বেষের প্রাণময় চিত্র আছে। তারই সঙ্গে আছে রাজনৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসর্বস্বতা, উদারতা, অসহায়তার প্রকৃত চিত্র।

সে কারণেই উপন্যাস তিনটি হয়ে উঠেছে দেশ, কাল মানুষের প্রামাণ্য এবং বাস্তব কথাচিত্র।

রাজনীতি এবং মানুষ—এই জটিল সম্পর্ক সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্ভবত সাংবাদিকতার কারণেই অর্জন করেছিলেন গৌরকিশোর। এটাও তাঁর অজানা ছিল না যে রাজনীতির কুটিল বন্ধন প্রায়শ মানুষের পারস্পরিক প্রীতির দিকটি মুছে দিতে চায়। তাঁর বহু উপন্যাসে রয়েছে তার চিহ্ন। গৌরকিশোর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো' উপন্যাসটিও পাঠকের কাছে বিভিন্ন কারণে পরিচিত। প্রধান কারণ এই—সরল ও সুবোধ্য ভাষায় তিনি তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ত্রুটি, নেতাদের স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতালোভের দিকটি উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন। সাগিনা মাহাতো নামের এক শ্রমিক নেতা তার সরল সততা নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু সংগঠনের তথাকথিত শহরবাসী বড়ো নেতারা কীভাবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার শাস্তিবিধান করল—এই আখ্যানকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে উপন্যাস। লেখকের প্রতিবাদ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নয়, অসৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

গৌরকিশোর ঘোষের প্রতিভা বড়ো মাপের ঔপন্যাসিক হবার উপযুক্ত ছিল। সাংবাদিকের দায়িত্ব পালনে অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় তিনি যথেষ্ট পরিমাণ লিখে যেতে পারেন নি। কিন্তু যা তিনি লিখেছেন তার জন্যই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর স্থান অবিচলিত থাকবে।

১.২ রমাপদ চৌধুরী (১৯২৩-   )

পশ্চিবঙ্গের খড়গপুরের রেল কলোনিতে সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯২৩ সালে রমাপদ চৌধুরীর জন্ম। পরিবারের অনেকেই কাজ করতেন রেল দপ্তরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করবার পর কিছুদিন দু-একটি অন্য কাজ করে ১৯৫৩ সালে তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক পদে যোগ দেন।

পরে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যে আগ্রহ ছিল। গল্প লিখতেন। কুড়ি বছর বয়সেই প্রথম গল্প ছাপা হয়ে যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য়।

পঞ্চাশের অধিক ছোটো ও বড়ো উপন্যাসের লেখক রমাপদ চৌধুরী বাঙালি পাঠকের কাছে একজন সমাদৃত সাহিত্যিক। কারণ তাঁর লেখায় কখনই অতিরিক্ত পাঠক-মনোরঞ্জনের প্রবণতা-জনিত লঘুতা থাকে না। তিনি সর্বদাই গুরুত্ববোধের সঙ্গে সমাজ-পরিস্থিতি, মানব-মনস্তত্ত্ব এবং এই দুইয়ের সম্পর্কের টেনশনকে তাঁর লেখায় স্থান দিয়েছেন। বিশেষভাবে একান্ত সমকালীন সমস্যাকে তুলে ধরবার প্রয়াসে তাঁর আন্তরিকতা লক্ষণীয়। তিনি নগরজীবন এবং গ্রামজীবন—উভয়েরই বিবর্তনকে উদ্‌ঘাটিত করবার চেষ্টা করেন। তাঁর বহু উপন্যাসের মধ্যে যে বিশিষ্ট কয়েকটি উপন্যাস আলোচনা করলে লেখক হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাকে বোঝা যাবে সেগুলি হল—'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' (১৯৫৭), 'বনপলাশির পদাবলী (১৯৬২), 'লাল বাই (১৯৬৩), 'এখনই' (১৯৬৯), 'পিকনিক' (১৯৭০), 'খারিজ' (১৯৭৪), 'লজ্জা' (১৯৭৬), 'অভিমন্যু' (১৯৮২), 'বাড়ি বদলে যায়' (১৯৮৪)।

যদিও ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত 'প্রথম প্রহর' এবং ১৯৫৭-য় প্রকাশিত 'অরণ্য আদিম' রমাপদ চৌধুরীর প্রথম দুটি উপন্যাস তবু 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' লিখেই তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে জল-জঙ্গলের মাঝখানে টিয়ারঙ দ্বীপ। সেখানে আছে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা। সাহেব কোম্পানি তাদের বাণিজ্যের হাত বাড়িয়ে দিল সেই দ্বীপে। একদিকে বনের গাছ নির্বিচারে কাটা হয়ে বণিকের মুনাফা বৃদ্ধি করতে লাগল; অন্যদিকে অরণ্যবাসী মানুষেরা পরিণত হল শোষিত শ্রমিকে। উজাড় হয়ে যেতে লাগল অরণ্য। আদিবাসী, মধ্যশ্রেণির বাঙালি আর সাহেবদের সম্পর্কের জটিলতার সূত্রে বিদ্রোহী হয়ে উঠল মানুষগুলি। কর্মচ্যুত হয়ে অনেকেই পাড়ি দিল দ্বীপ থেকে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায় দ্বীপের মানুষ আবার ফিরে আসছে জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলবার সংকল্প নিয়ে। উপন্যাসটি সুপাঠ্য হলেও নির্মাণকর্মে রোম্যান্টিকতার আতিশয্য এবং পরিকল্পনার কিছু দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র মডেল লেখকের মধ্যে ছিল বলে মনে হয়।

'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসে রমাপদ চৌধুরীর প্রকৃত সাহিত্যিক প্রতিভা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় দেখা বাংলার গ্রাম এবং গ্রামসমাজের বিবর্তন নিয়ে রচিত প্রকৃতই বড়ো মাপের উপন্যাস। বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথের ধারে বনপলাশি গ্রাম। সময় ১৯৫৬-৫৭। বিদ্যুৎ আসেনি, কিন্তু তার পোল তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার দশ বছর পরেও গ্রামগুলিতে পরিবর্তন সামান্যই। প্রধান শিক্ষক গিরিজাপ্রসাদ অবসর নিয়ে সপরিবার ফিরে এলেন গ্রামে। ছোটো ভাই গিরীন, তার স্ত্রী যাকে সবাই বলে 'মোহনপুরের বউ' এবং মেয়ে টিয়া। পরিবারের গ্রামীণ অংশ আর নাগরিক অংশে মিল হয় না। দুই পরিবার আলাদা হয়ে যায়। গিরিজাপ্রসাদ গ্রামের পরিবর্তন লক্ষ করেন, করে দুঃখ পান। শিক্ষিত জনের সম্মান নেই, বড়োলোকেরই দাপট গ্রামে। গ্রামকে আপন করতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ। গ্রাম ছেড়ে যাবার কথা ভাবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত গ্রামের মেয়ে, গ্রামের বউ গিরীনের স্ত্রী নিজের মেয়ের জন্য স্থিরীকৃত পাত্র তরুণ বি.ডি.ও. প্রভাকরের সঙ্গে বিয়ে দেয় ভাসুরের মেয়ের। কারণ সে তাদের হৃদয়ের খবর জেনেছিল। গ্রামের মানুষের মহত্ত্ব অনুভব করলেন গিরিজাপ্রসাদ।

উপন্যাসে আছে এক স্বামী-পরিত্যক্তা বৃদ্ধার চরিত্র। তাঁকে সবাই বলে অট্টা মা। তাঁর স্বামী খ্রিস্টান হয়েছিলেন বলে স্বামীর ঘর না করে বনপলাশির শ্বশুরবাড়িতেই থেকে গিয়েছিলেন তিনি। প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন কলকাতায় গিয়ে স্বামীর কবরের পাশে সমাহিত হতে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর গ্রাম ছেড়ে যেতে পারেন না। গ্রামের সমাজ তাঁকে কিছুই দেয়নি। তবু তিনি বনপলাশির শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য হয়, তাই চান। অট্টামাকে বাংলার গ্রামের শান্ত জীবনযাত্রার প্রতীক-প্রতিমারূপে এঁকেছেন লেখক। শান্ত হলেও তাঁর মন কিন্তু স্তব্ধ নয়, সজীব ও সচল। রাঢ়-বাংলার গ্রামের এক অসাধারণ পটচিত্র এবং অট্টা মা-র কণ্ঠে উচ্চারিত অজস্র প্রবাদ-ছড়া, সেই সঙ্গে ডি. ভি. সি.-র ক্যানেল কাটার উদ্যোগ—এই সব নিয়ে উপন্যাসটি বড়ো সত্য এবং জীবন্ত। যদিও তারাশঙ্করের ছায়া এখানেও

দুর্লক্ষ্য নয়। অট্টা মা-র চরিত্রে সুচাঁদ বুড়ি খুবই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

'লাল বাই' উপন্যাসে রমাপদ চৌধুরী বাংলার অন্যতম সমৃদ্ধ রাজপরিবার বিষ্ণুপুর-রাজপরিবার এবং বিষ্ণুপুরকে জীবন্ত করে তুলেছেন। বিষ্ণুপুর রাজপরিবার ছিল বৈষ্ণব এবং সংগীত, ভাস্কর্য তথা শিল্পের পোষক। এই বংশের রাজা রঘুনাথ সংগীত-সূত্রে আকৃষ্ট হন নর্তকী লালবাইয়ের প্রতি। ক্রমে সে আকর্ষণ পরিণত হয় প্রেমে। যবনী লাল বাইকে বেগমের আসনে বসান তিনি। পাটরানি চন্দ্রপ্রভা এতে শঙ্কিত হন, কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল বিষ্ণুপুরের পবিত্র সিংহাসন অধিকার করবে ওই যবনীর সন্তান। বঞ্চিত হবে তাঁর পুত্র, থেমে যাবে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ, কীর্তনের মধুর গুঞ্জন। মুসলমান ধর্ম আর সুরা-নারী বিলাসের উৎস হয়ে উঠবে বিষ্ণুপুর। কারণ এর মধ্যে রঘুনাথ প্রেয়সী লাল বাইয়ের নামে নির্মাণ করেছেন লাল বাঁধ আর তার সন্তানের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করেছেন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদেব। ধর্মনাশের ভয়ে রাজ্যের সকল বিশিষ্ট প্রজা আর রাজকর্মচারী শরণ নেয় রানি চন্দ্রপ্রভার। রানি বিচলিত হন। অস্ত্র চালনায় পটু চন্দ্রপ্রভা অবশেষে মুহূর্তের উত্তেজনায় হত্যা করেন স্বামীকে এবং সহমৃতা হন। আর উত্তেজিত প্রজা আর কর্মচারীগণ লাল বাইকে শৃঙ্খলিত করে ডুবিয়ে মারে তারই নামে খনিত লাল বাঁধে। এই কাহিনিবৃত্তকে কেন্দ্র করে বাংলার ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসটিতে। শোভাসিংহের বিদ্রোহ, বর্ধমান-রাজকন্যা সত্যবতীর হস্তে তার প্রাণনাশ, বৈষ্ণব ধর্মের আবেশে স্নিগ্ধ অথচ সংস্কারান্ধ বিষ্ণুপুর, সংগীত আর শিল্পের নব রূপদানে উৎসাহী বিষ্ণুপুর—যে অস্তায়মান বাঙালি প্রতিভার দীপ্তোজ্জ্বল শেষ শিখা—তার বাস্তবতুল্য চিত্রায়ণে 'লাল বাই' হয়ে উঠেছে শিল্পসফল এক ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক এবং কল্পিত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মানবিকীকরণের সফলতায় 'লাল বাই' সুদূর সুগন্ধে হয়ে উঠেছে অনুপম।

রমাপদ চৌধুরীর অনেক উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বার্থসর্বস্বতা, উদারতার ভান করা, আত্মপ্রতারণা, পারস্পরিক ঈর্ষার ও সহায়তার দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে। 'খারিজ' তাদের একটি। জয়দীপ-অদিতির কিশোর ভৃত্য পালান কঠিন শীতের এক রাতে শতরঞ্জিত মতো পাতলা তোষক আর ছেঁড়া চাদর গায়ে বারান্দায় ঘুমোতে পারেনি। একটু উষ্ণতার সন্ধানে সে ঢুকেছিল ভেন্টিলেটরহীন রান্নাঘরে। উনোনে কাঠকয়লা দিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টার ফলে বন্ধ ঘরে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের বিষে মারা যায় ছেলেটি। জয়দীপ আর অদিতির মনে জেগে ওঠে ভয়। তারা তো জানে তাদের অবহেলাই এই মৃত্যুর কারণ। তাই জয়দীপ ডাক্তার ডাকে, থানায় খবর দেয়। এস. আই. মুখার্জির পালানের বিছানা সম্বন্ধে 'কি ডার্টি রে বাবা' মন্তব্যে আহত হয় সে। কিন্তু স্ত্রীর উপর দোষ চাপিয়ে আপন বিবেককে শান্ত করে জয়দীপ। তারপর দেখা যায় জয়দীপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার বিরূপ বাড়িওয়ালা, সহৃদয় প্রতিবেশী, অফিসের সহকর্মী রাধানাথ। কারণ তারা '....শিক্ষিত ভদ্রলোক, পরস্পরকে চিনি, যেমন করে পারি খুঁজে বের করি। ডাক্তার, উকিল ইনফ্লুয়েন্স সব তো আমাদের দিকে।' শেষ পর্যন্ত দেখা যায় করোনার মৃত্যুটিকে নিছক দুর্ঘটনা বলে রায় দিয়েছেন। খারিজ হয়েছে মামলা। স্বস্তিতে হেসে ওঠে অদিতি। কিন্তু জয়দীপের মুমূর্ষু বিবেক জেগে ওঠে। সে 'বুকের মধ্যে কি এক দমবন্ধ হওয়া কষ্ট' অনুভব করে। পালানের জন্য শোকার্ত হয় সে পূর্ণ বিপদমুক্তির পর। আর পাঠকদের মনে হতে থাকে এই খারিজ হওয়া মামলাটি মধ্যবিত্ত বাঙালির অবক্ষয়ী, সংকীর্ণ মানসিকতাকে অনাবৃত করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা মনে করতে পারি লেখকের 'বাহিরি' উপন্যাসটির কথা। সেখানেও একটি মধ্যবিত্ত পরিবার উদারতা দেখাতে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল এক বালককে, শিখিয়েছিল লেখাপড়া। কিন্তু যখন দেখা গেল আশ্রিত সেই বালক মেধায় ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাদের সন্তানদের, তখন মুছে গিয়েছিল সব প্রীতি; সকল ঔদার্যের ভান। ছেলেটির নির্মল ভালোবাসা গ্রহণ করতে পারেনি এই হীনচেতা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষগুলি।

'লজ্জা' বাঙালি মধ্যবিত্তের পাছে লোকে কিছু বলে এই মনোবৃত্তির বাস্তব চিত্র। দরিদ্র অনিমেষ পড়াশুনোর জন্য আশ্রয় পেয়েছিল তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাণী পিসিমার বাড়ি। পিসতুতো বোন রেণু আর তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সূক্ষ্ম একটি মানসিক যোগ। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে অনিমেষ-রেণু চেপে রেখেছিল সেই প্রেম। অনিমেষের

ভয় ছিল পাছে তাকে অভিযুক্ত হতে হয়। রেণুর ছিল লজ্জা। যথাসময়ে রেণুর বিয়ে হয়, কিন্তু অবদমিত ভালোবাসা ক্রমে নষ্ট করে দেয় তার মানসিক স্থিতি। তখন তার বাবা, মা, সকলেই চেষ্টা করে জনসমক্ষে যেন রেণু না আসে। কারণ এতে চূর্ণ হবে তাদের সামাজিক অবস্থান, অন্য মেয়ের ভালো বিয়ে হওয়া শক্ত হবে। প্রাথমিক অবহেলায় গুরুতর হয়ে ওঠে রেণুর রোগ। পরিবারের কারও কাছে সে পায় না বিন্দুমাত্র সহানুভূতি। হয়তো প্রীতির স্পর্শে সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সম্মানসচেতন মধ্যবিত্ত মন রুগ্ন রেণুকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে স্বস্তি পায়। নিজেদের ত্রুটি ঢেকে রাখে এই আত্মসান্ত্বনায় যে ডাক্তার বলেছেন এটাই রেণুর রোগমুক্তির উপায় রেণুর আর্ত চিৎকার 'আমি পাগল নই,' ছিঁড়ে দিতে চায় এই আত্মপ্রতারণার আবরণ। বৃথাই। এই অর্থহীন সম্মানবোধ, আর লোকলজ্জা-সচেতনতা আসলে তাদের আত্মকেন্দ্রিকতার প্রকাশ—এই রূঢ় সত্যের বলিষ্ঠ রূপায়ণে 'লজ্জা' হয়ে উঠেছে স্মরণীয় একটি উপন্যাস।

'অভিমন্যু'-তে রমাপদ কর্মজগতে মধ্যবিত্ত বাঙালির হীন ঈর্ষাতুর মানসিকতার নগ্ন প্রকাশ লক্ষিত হয়। উপন্যাসটির উৎস বাস্তব একটি ঘটনা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় নামে এক ডাক্তার হিমায়িত ভ্রূণ দিয়ে বিশেষ কারণে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু নীচমনা কিছু ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে তিনি স্বীকৃতি পাননি। অবিরত সমালোচনার চাপে তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। তারপরই স্বীকৃত হয় তাঁর পদ্ধতি এবং সেটি হয় বিদেশে। এই করুণ ট্র্যাজেডির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে 'অভিমন্যু'। উপন্যাসের নায়ক ডক্টরেট ডাক্তার দীপঙ্কর রায়ের ছিল যথার্থ বৈজ্ঞানিক মন। নিছক অর্থোপার্জনের জন্য সে আপন বৃত্তিকে ব্যবহার করেনি। সে দীর্ঘ শ্রমসাধ্য গবেষণায় আবিষ্কার করে লেপ্রসির প্রতিষেধক ভ্যাকসিন। ক্রোমোজোমের পরিবর্তে ওই ভ্যাকসিন বন্ধ্যা নারীর বন্ধ্যাত্ব দূর করতে পারবে এবং মেয়েদের উপর এই ভ্যাকসিন প্রয়োগের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হবে কুষ্ঠমুক্ত। সংবাদপত্রে এ আবিষ্কারের কথা পড়ে কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকদের মধ্যে দেখা দিল প্রবল ঈর্ষা। তারা হীন উপায়ে সেমিনারে দীপঙ্করকে অপমান করে। তার আবিষ্কারকে মিথ্যা প্রমাণ করে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় প্রশাসন। মহাভারতের বীর বালক অভিমন্যুর মতোই দীপঙ্কর গবেষণার সফলতা দ্বারা ভেদ করে ছিল চিকিৎসকদের প্রতিপত্তি আর প্রশাসনের চক্রব্যূহ। কিন্তু নির্গমনের উপায় তার জানা ছিল না। চিকিৎসাকে যারা ব্যাবসা করে তুলেছে সেই রামানন্দের মতো ডাক্তার, হেলথ ডিরেক্টর আর সমধর্মীদের দিয়ে গড়ে তুলল এক নীচ ষড়যন্ত্র। দীপঙ্কর সেই ষড়যন্ত্রের বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসতে পারল না। তার আবিষ্কারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আনন্দিত হল এই আত্মপর হিংসায় আবিলমনা চিকিৎসকগণ আর প্রশাসন। কিন্তু বিজ্ঞানের বৃহৎক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হল দুরারোগ্য কুষ্ঠের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কৃতিত্ব থেকে। দীপঙ্করের পদ্ধতিতে গবেষণা করে দীর্ঘদিনের ঘৃণ্য রোগ কুষ্ঠ প্রতিরোধের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলেন মার্কিন দেশের দুই বিজ্ঞানী। যে জার্নালে এ সংবাদ বের হল সেই জার্নালই জানাল ভারত থেকেও লেপ্রসি-ভ্যাকসিন আবিষ্কারের দাবি হয়েছিল। কিন্তু সে দেশের বিজ্ঞানী আর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তা মিথ্যা এক দাবি। এভাবেই সপ্তরথীর মতো শক্তিমান কিছু মানুষ নিছক ঈর্ষার বশে হত্যা করল এক আবিষ্কার তথা আবিষ্কারককে। সমধর্মীকে উচ্চ সম্মান থেকে টেনে নামানোর বৃত্তিগত হিংসার এই হীন নির্মম চক্রান্ত এদেশে অতি স্বাভাবিক। স্বক্ষেত্রে কৃতী প্রতি মানুষকেই সম্মুখীন হতে হয় এদের। বহু প্রতিভার অকালমৃত্যু ঘটায় এই কুষ্ঠগ্রস্ত মানসিকতায় ক্ষয়গ্রস্ত সপ্তরথীর দল। এই নির্মম বাস্তবের কঠোর রূপ যেভাবে উপন্যাসে এসেছে তা আমাদের সচেতন করে, সতর্ক করে। রমাপদ চৌধুরীর লেখক-সত্তার অনন্যসাধারণ দক্ষতার প্রমাণলেখ এই উপন্যাস তা অবশ্যস্বীকার্য।

রমাপদ চৌধুরীর কয়েকটি উপন্যাসে উঠে এসেছে বিশ শতকের ষাট-সত্তর-আশির দশকের তরুণ-সমাজের সংকট। সময়টি সত্যিই তরুণদের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য হত সেখানে বেকার সমস্যা ছিল ক্রমবর্ধমান। উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না অনেকের পক্ষেই। সময়ের স্রোতে তরুণ-তরুণীদের মেলামেশা হয়েছিল অনেকটাই স্বচ্ছন্দ। কিন্তু সেই

প্রেমকে সহজ মিলনে পৌঁছে দেবার পথ সহজ ছিল না। পারিবারিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হবার ফলে অভিভাবকদের সব কথাই নির্বিচারে মেনে চলবার দিন হয়েছিল অবসিত। অন্যদিকে রাজনীতির টানাপোড়েনে তরুণরা কোনো মানসিক আশ্রয় পাচ্ছিল না এবং তাদের মনে দেখা দিয়েছিল বিভ্রান্তি। এই তরুণ-তরুণীদের কথা লিখেছেন রমাপদ চৌধুরী। 'এখনই' এবং 'পিকনিক'—এই দুটি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে এই ছেলেমেয়েদের কথা। 'এখনই' উপন্যাসে অনেকের মধ্যে থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক কলেজছাত্র কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার বাবা অবসর নিয়েছেন, মা কঠিন রোগে আক্রান্ত, ছোটো বোন ছাত্রী। ছেলেটি সামনে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। আর একটি চরিত্র তারই সহপাঠী এবং ধনীকন্যা এক তরুণী। এই ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে, বেড়াতে যায়, উৎসব-অনুষ্ঠান করে, পরীক্ষা দেয়, এবং জড়িয়ে যায় যে যার জীবনযুদ্ধে। এর মধ্যে নায়িকা ঊর্মিকে প্রতারণা করে পলাতক হয় তার বড়োলোকের ছেলে প্রেমিক। বিপদগ্রস্ত ঊর্মি অনভিপ্রেত গর্ভ মোচন করবার জন্য সাহায্য চায় অরুণের কাছে। অরুণ ঊর্মির প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও তাকে কোনো আশার বাণী শোনাতে পারেনি। এই উপন্যাসে অভিব্যক্ত হতাশা, সমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে।

'পিকনিক' উপন্যাসে ছ-জন ছেলেমেয়ের সমান ভূমিকা। একসঙ্গে তারা পিকনিকে গেছে একজনের গাড়িতে। ছ-জনের মধ্যে আছে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা, সাধারণ পরিচয়ের সম্পর্ক আছে এবং নতুন পরিচয় হচ্ছে এমন ছেলেমেয়েও আছে। উপন্যাসের শুরুতে তারা হালকা খুশিতে ভরপুর। কিন্তু সারাদিনের পিকনিক শেষে ফেরার সময় গাড়ির ইঞ্জিন চালু হয় না। ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা। মেয়েরা বিপন্ন বোধ করে। বাড়িতে খবর দেবার উপায় নেই। কোথায় রাত কাটাবে তারা। সম্পর্কের প্রসন্নতা তিক্ততায় পরিণত হয়। মেয়েরা ছেলেদের ভয় পেতে এবং সন্দেহ করতে শুরু করে। তারপর এক সময় গাড়ি চালু হয়। তারা ফিরতে থাকে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। কিন্তু তাদের নিজেদের মনের সংকীর্ণতা এবং ক্ষুদ্রতা তখন অনাবৃত হয়ে গেছে নিজেদের কাছে। উপন্যাসটি শেষের দিকে বিষাদময় হয়ে ওঠে। দেশের যুবশক্তি যেন কীটদষ্ট এবং চারিত্রিক শক্তিতে নিতান্তই দুর্বল। এই সত্যটাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন রমাপদ চৌধুরী। এবং তিনি তা পেরেছেন।

একটু অন্য ধরনের উপন্যাস 'বাড়ি বদলে যায়'। ঘটনা অংশ খুবই সামান্য। একজন ব্যক্তি বাস করে ভাড়া বাড়িতে। বাড়িওয়ালা থাকে উপরে। বাড়ি নিয়ে প্রতিপদেই বাধে খিটিমিটি; জল নিয়ে, আলো নিয়ে। দেওয়ালে পেরেক ঠোকা নিয়ে ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার সম্পর্ক হতে থাকে তিক্ত। ভাড়াটে ভদ্রলোক ভাবেন পৃথিবীতে আছে এই দুই শ্রেণির মানুষ—ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালা। এক জনের সম্পত্তি আছে, অন্যজনের নেই। যার নেই তাকে কিছু পয়সার বিনিময়ে নিজের সম্পত্তির ভাগ দিতে হচ্ছে সম্পদবানকে। ভাড়াটে ভাবে যে সম্পত্তি তার নয়, হবে না কোনোদিন, সেখানে বাস করার জন্যে যে টাকা দিতে হয় সে টাকা সম্পূর্ণই যায়, ফেরে না কিছুই। সম্পর্ক জটিল। ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার মুখের ভাষার সঙ্গে মনের ভাবনার কোনোদিনও মিল হয় না.।

সময় চলে যায়। এক সময় যে ভাড়াটে ছিল, সে শহরতলিতে সুন্দর বাড়ি করে উঠে যায় শান্তিতে থাকবে বলে। কিন্তু খরচে টান পড়ে কিছুটা নিঃসঙ্গতাও জাগে। সে বাড়ি ভাড়া দেয়। আবার ভাড়াটে এসে যখন জিনিসপত্তর টানাটানি করে, তখন তার মনের মধ্যে জাগে শঙ্কা। কত যত্নে বানানো ঘরের দেওয়ালগুলি, সুন্দর মেঝে—কষ্টের সম্পদ বুঝি নষ্ট হল ভাড়াটের অ-যত্নে এবং উদাসীনতায়। উপন্যাসটির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম এক দার্শনিকতা আছে। বাড়ি বদ্‌লে যায়; মানুষের অবস্থা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু মানুষে মানুষে সম্পর্কের সত্যিই কোনো পরিবর্তন হয় না, জটগুলি কখনই খোলে না। সকলেই কেবল নিজের দাঁড়াবার জায়গাটি দেখতে পায়, নিজের দৃষ্টিকোণই ধরে রাখে।

রমাপদ চৌধুরী ঔপন্যাসিকজীবনের প্রথম পর্বে 'দ্বীপের নাম টিয়া রঙ' আর 'লাল বাই' ছাড়া বাকি সব উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনকেই নানাভাবে খুলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাবনা গভীর, তাঁর ভাষা সংযত, তাঁর বাস্তবতাবোধ সত্যস্পর্শী। তিনি কল্পনার দূরাভিসারে অভ্যস্ত নন। উপলব্ধিকে রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের দৃষ্টিতে প্রায় কখনই দেখেন না। জীবন যাপনের চেনা সুখ-দুঃখগুলির বাইরে তিনি কোনো বিস্ময়, কোনোরূপ রঙ্গ,

কোনো দর্শন আবিষ্কার করতে আগ্রহী নন। অতি পরিচিত, অতি সাধারণকেই তিনি মানুষের জীবনবৃত্তের কেন্দ্রীয় খুঁটি বলে চেনেন। সেভাবেই তিনি উপন্যাস লেখেন এবং এই দৃষ্টিকোণ এবং শিল্পরীতির সমন্বয়েই হয়ে ওঠেন স্মরণযোগ্য ঔপন্যাসিক।

৩.১১ সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)

বর্তমান বাংলা দেশের ঢাকা জেলার রাজানগর গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয়। লেখক-নাম সমরেশ তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। দেশ বিভাগের বেশ কিছু আগেই তাঁরা নৈহাটিতে চলে আসেন এবং সমরেশ নৈহাটির স্কুলে ভর্তি হন। দাদা ছিলেন রেলওয়ে কর্মচারী। ফলে রেলের গ্রন্থাগার থেকে বই এনে পড়বার অভ্যাস হয়েছিল। অল্প বয়স থেকেই বহু ধরনের মানুষের সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় মন ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয় ১৯৪২ সালে। জীবিকার জন্য বহু ধরনের কাজ করেছেন। কিন্তু সাহিত্য রচনার অভ্যাস ছিল আকৈশোর। ১৯৪৪ সালের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী গল্প 'আদাব' তাঁকে বিখ্যাত করে। ওই সালেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। রাজনীতি করবার কারণে কারাবাসও করতে হয়। পরবর্তীকালে সাহিত্যকেই একমাত্র জীবিকা করেছিলেন। পশ্চিম-বাংলার প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। 'কালকূট' ছদ্মনামেও তিনি বিখ্যাত। আর একটি ছদ্মনাম ছিল 'ভ্রমর'।

সমরেশ বসু বহু ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লেখক ছিলেন। জীবনে যে সত্যকে অনুভব করেছেন তাকেই প্রকাশ করেছেন সাহিত্যে। সাম্যবাদে আস্থাশীল হলেও সাহিত্য সৃষ্টির উপর দলীয় অনুশাসন মেনে নেননি। ফলে একসময় পার্টির সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। জীবনকে নানা দিক থেকে দেখবার আগ্রহ ছিল তাঁর। জীবনের বিচিত্র রূপকেই প্রকাশ করেছেন। বৈচিত্র্য তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার একটি লক্ষণ। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রখরভাবে সচেতন ছিলেন। তবে শিল্পকর্মে ব্যক্তিমনের বৈচিত্র্যকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বহু বিচিত্র মানুষকে উপন্যাসে জীবন্ত করে তুললেও মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষকে নিয়ে লেখবারই আগ্রহ ছিল তাঁর। আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীকে বিশেষ রূপায়িত করেননি।

শতাধিক উপন্যাসের লেখক সমরেশ বসু। যদি কিশোর উপন্যাস ও গোয়েন্দা উপন্যাস ধরা হয়—তবে উপন্যাস সংখ্যা দুশোর বেশি। আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করব। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' ১৯৫১ সালে প্রকাশিত। তাঁর উপন্যাসের বৈচিত্র্য এতটাই যে বিষয়বস্তু অনুসারে কোনো পর্ব ভাগ করা যায় না।

তিনি কিছুকাল কাজ করেছিলেন ইছাপুরের বন্দুক কারখানায়। বাস করেছেন শ্রমিক-বস্তিতে। নিতান্ত নিম্নবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণির মানুষদের জীবন নিয়ে একাধিক উপন্যাস লিখেছেন সমরেশ বসু। সেগুলির মধ্যে 'বি. টি. রোডের ধারে' (১৯৫২), 'শ্রীমতী কাফে' (১৯৫৩), 'জগদ্দল' (১৯৬৬)—ইত্যাদির নাম করা যায়।

'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসটি একদিকে বস্তিজীবনের নৈর্ব্যক্তিক আলেখ্য, অন্য দিকে বিভিন্ন চরিত্রের জটিল মানসিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ। গঙ্গার তীরে রেল লাইনের ধারে কারখানার শ্রমিকদের বস্তি। বস্তির বিবর্ণ অস্বাস্থ্যকর কুৎসিত পরিবেশ অকম্পিত হাতে আঁকেন লেখক। বি. টি. রোডের ধারে সেই বস্তিতে এসে পৌঁছোয় গোবিন্দ নামের এক ব্যক্তি। ধীরে ধীরে নেতৃত্ব দিতে থাকে। বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্ট অনুযায়ী উচ্ছেদের রায় বহাল থাকে। বিরোধী পক্ষের হাতে খুন হয়ে যায় গোবিন্দ। লেখক রূপকথার মতন ধর্মের জয় দেখাতে চেষ্টা করেননি। যা জীবনের কঠোর সত্য তাকেই রূপায়িত করেছেন। এ ধরনের বস্তিজীবন সমরেশ বসুর উপন্যাসে বার বার ঘুরেফিরে এসেছে।

সম সময়ে প্রকাশিত 'শ্রীমতী কাফে' উপন্যাসের সময়কাল ১৯২২ থেকে ১৯৩৯। এই পর্বে ভারতীয় রাজনীতিতে স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল প্রবল। সেই সময়েই একটি মফস্‌সল শহরে ছিল শ্রীমতী কাফে নামক খাবারের দোকান। সেই দোকানে আসে নানা ধরনের মানুষ, চলে আলাপ-আলোচনা, শোনা যায় বিপ্লবের কথা, সাম্যবাদের কথা। এককালে শ্রীমতী কাফেকে বলা হত স্বদেশি রেস্টুরেন্ট, পরে লোকে বলেছে এটা রেস্টুরেন্ট নয়, কমিউনিস্ট পার্টির অফিস। ভজন বা ভজু লাট 'শ্রীমতী কাফে'-র মালিক। তার দাদা নারায়ণই প্রথম বিপ্লবের বাণী বহন করে এনেছিল এই অঞ্চলে। উপন্যাসটি এই পরিবেশ-পরিস্থিতির চিত্রপট যেন। মুক্ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা ভজু লাট সেই সময়ের সাক্ষী। যদিও উপন্যাসটিতে প্রত্যক্ষ আশাবাদের ঘোষণা নেই তবু নৈরাশ্যবাদী উপন্যাসও বলা চলে না 'শ্রীমতী কাফে'কে। তবে মধ্যবিত্ত মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে না পড়ে একটু পাশে সরে থাকার প্রবণতা ভজনের চরিত্রে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত মনের এই রূপটি অধিকাংশ সমাজমনস্ক লেখকের লেখাতেই ফুটে ওঠে।

'গঙ্গা' একটি ভিন্ন ধরনের উপন্যাস। মাছ ধরার মরশুমে একদল জেলে গঙ্গার স্রোত বেয়ে ইলিশ মাছ ধরার জন্য সমবেত হয় গঙ্গাবক্ষের একটি বিশেষ জায়গায়। পাড় থেকে ফড়েরা আসে। মাছ কেনাবেচা হয়। লাভের কড়ি গুনে নিয়ে ফিরে আসে জেলেরা। মাছমারাদের জীবন এই উপন্যাসের মূল বিষয়। বিলাস নামক জেলে-যুবক উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। কেমন করে বহু বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে সফলতাকে স্পর্শ করে এই জেলেরা তাই দেখিয়েছেন লেখক। এর মধ্যেই তাদের জীবনে শত্রুতা আর বন্ধুতার স্রোত-প্রতিস্রোত দেখা দেয়, আসে প্রেম এবং বিরহ। নায়ক বিলাসের মনের মধ্যে আছে সমুদ্রে যাবার স্বপ্ন। এই স্বপ্নদর্শী যুবককে প্রতিষ্ঠিত করেই উপন্যাস শেষ হয়েছে। জেলেদের জীবন-বিবরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্যতায় এই উপন্যাসটি পাঠকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষক হয়ে ওঠে।

এখন আমরা সমরেশ বসুর লেখকজীবনের বিশেষ একটি বাঁকে রচিত একগুচ্ছ উপন্যাসের কথা বলব। এই ধারার সূত্রপাত হয়েছিল আত্মকথামূলক একটি ছোটো গল্প থেকে। কিন্তু ১৯৬৫ সালে 'বিবর' প্রকাশিত হওয়া মাত্র বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। 'বিবর' নিঃসন্দেহেই মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠকের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই উপন্যাসে নায়ক নামহীন। সে নিজেই নিজের স্বীকারোক্তি বিবৃত করেছে উপন্যাসে। সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সংসারে কোনো অভাব নেই। নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নেবার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিতে দ্বিধা নেই তার বাবার। এই যুবক তার পরিবারের কাউকেই শ্রদ্ধা করে না। নিজেকেও করে না। কারণ তার নিজের মনের ভেতরের চেহারাটাও কোনো নৈতিক আদর্শকে মান্য করেনি। সে অশ্লীল ভোগবিলাসে ডুবে থাকে সারাক্ষণ। ঘুষ নেয়, স্বেচ্ছাবিহারিণী নারীর সংসর্গে সময় কাটায়। কিন্তু ক্রমশ সমাজ ও সংসারবদ্ধ মানুষের স্বাধীনতার অভাব তাকে পীড়িত করতে থাকে। অস্তিত্ববাদী দর্শনে মানুষের শৃঙ্খলিত অধীনতার যে সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে এবং তার ফলে নৈরাশ্যবাদকেই একান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে সেই দাসত্বই তাকে পীড়িত করতে থাকে। সহসা সে কেমন প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ায়। নীতা নামের যে মেয়েটির সঙ্গে সে শরীর-মনের নেশায় বাঁধা ছিল তাকে সে খুন করে। এটাই তার স্বাধীনতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। তারপর সে চাকরির ক্ষেত্রে একটি সত্য রিপোর্ট বড়ো সাহেবের আদেশ সত্ত্বেও ফিরিয়ে নিল না। যদিও আগে সে অনেক অন্যায়-ই করেছে। এরপর সে গ্রেফতার হয়ে যায় কারণ সে খুনি। কিন্তু এই কারাবাসই হয়ত তার শাস্তিগ্রহণ, তার শুদ্ধতার দিকে যাত্রা। উপন্যাসের শেষ অংশে গাছের পাতার বুকে লালচে রোদের চিক্কণ আভা দেখে সে মুগ্ধ হয়। নদীর ওপর পাল তোলা নৌকার দিকে তাকায় সে।

উপন্যাসটিতে নায়কের আত্মকথনের মধ্যে বুনে দেওয়া হয়েছে বহু উক্তি ও অভিব্যক্তি যা মধ্যবিত্ত রুচিতে প্রকৃতই অশ্লীল। মানুষ নিজের সতিকারের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিকে অবদমিত রাখে অনেক সময়। সেখান থেকেই অশ্লীলতার জন্ম। এই সত্যই তুলে ধরেছে এই উপন্যাস। 'বিবর' প্রকাশিত হলে বহু পাঠকের বহু নিন্দাই সত্য করতে হয়েছিল লেখককে। কিন্তু এই উপন্যাসের শক্তিকে অস্বীকার করা যায়নি।

'বিবর' উপন্যাসের তথাকথিত অশ্লীলতা নিয়ে বহু আলোড়ন উঠেছিল এবং নতুন করে দেখা দিয়েছিল সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কিত বিতর্ক। সম্ভবত তার উত্তর দেবার জন্যই পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে সমরেশ বসু লিখলেন 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭), 'পাতক' (১৯৬৯)। এগুলিতে চরিত্রের গড়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই চরিত্রের ভাবনার এবং সংলাপের ভাষাকে বেশ খানিকটা অশ্লীলও করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ভাষায়। উপন্যাসগুলি পরিণতিতে আখ্যানের নিটোলতাকে তুলে ধরে এবং মধ্যবিত্তের প্রত্যাশাকে ব্যাহতও করে না। অন্য দিক থেকে বলা যায় 'বিবর' উপন্যাসের' দার্শনিক মাত্রাটি এই উপন্যাসগুলিতে নেই। 'বিবর' এক তীব্র ব্যতিক্রম, অন্য উপন্যাসগুলি গতানুগতিক।

'গঙ্গা' উপন্যাসে বিশেষ বৃত্তিতে নিযুক্ত এক জনগোষ্ঠীকে রূপায়িত করা হয়েছে। এই ধারায় বেশ কিছুকাল পরে আবার একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছিলেন সমরেশ বসু। বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির বয়নশিল্পীদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে লেখা এই উপন্যাস ওই বিশেষ শিল্পীগোষ্ঠীর সমগ্র জগৎটিকে তুলে এনেছে। 'গঙ্গা'-তেও আমরা দেখেছিলাম ওই বিশেষ বৃত্তির সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য, বিভিন্ন উপকরণের পারিভাষিক শব্দাবলি এবং জেলেদের নিজস্ব ভাষাকে সাবলীলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন সমরেশ বসু। 'টানাপোড়েন' (১৯৮০) উপন্যাসেও দেখা গেল সেই একই করণকৌশলের নিপুণতা। বালুচরীর নকশা আঁকে যে শিল্পীগোষ্ঠী তাদের জীবনকেও বর্ণনা করা হয়েছে ওই টানাপোড়েনের ভাষায়। উপন্যাসটিতে শেষের দিকে প্রধান হয়ে উঠেছে এক নারীর শরীরী প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু উপন্যাসটির প্রধান আকর্ষণ এবং শিল্পগুণ ওই বয়নশিল্পীদের জীবনকে মূর্ত করে তোলায়।

এ জাতীয় আরও দু-চারটি উপন্যাস লিখেছিলেন সমরেশ বসু।

সমরেশ বসু সারাজীবন ধরেই রাজনীতি ভাবনার সঙ্গে নিজের মনকে অবিচ্ছিন্ন বলে জেনেছিলেন। তরুণ বয়সে যখন সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন বিশ্বাস থেকেই সে কাজ করেছিলেন। পরে সাংগঠনিকতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেননি বলে সরে এসেছেন, কিন্তু জীবন ও রাজনীতির একান্ত সংযোগ সম্পর্কে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসটিতে অনেকটাই মিশে আছে তাঁর আত্মজীবনের উপাদান। সেখানে নায়ক চরিত্রটির জীবন চল্লিশের দশকের সাম্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ওই সময়ের এক বিস্তৃত চলচ্চিত্র উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়।

তারপরেই সমরেশ বসু পর পর দুটি উপন্যাস লেখেন 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' (১৯৮৪) এবং 'তিনপুরুষ' (১৯৮৬)। এই দুটি উপন্যাসকেই বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক উপন্যাস। অবশ্য সমরেশ বসুর অনেক উপন্যাসেই রাজনীতির প্রসঙ্গ ওতপ্রোত হয়ে আছে। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সুপরিচিত এক প্রধান ব্যক্তিত্বকে রুহিতন কুরমি নামে তিনি উপন্যাসে উপস্থিত করেছিলেন। উপন্যাসটিতে নকশাল আন্দোলন বিষয়ে লেখকের মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসটিতে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতি সমরেশ বসুর অসমর্থনই দেখা যায়। তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তেমনই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু প্রকৃত রাজনৈতিক উপন্যাসে থাকা দরকার লেখকের এক ধরনের নিরপেক্ষতা। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সব দিককে তুলে ধরতে হবে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে। সেখানে থাকতে হবে রাজনৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ। তাই রাজনৈতিক উপন্যাস প্রায়ই তর্কবিতর্কমূলক এবং আলোচনা (ডিসকোর্স)-প্রধান হয়ে থাকে। এই জিনিসটি আমরা প্রকৃতপক্ষে খুঁজে পাই 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' এবং 'তিনপুরুষ' উপন্যাসে। বিশেষ করে দ্বিতীয়টিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনীতি এবং স্বাধীন ভারতের রাজনীতি নিয়ে বহু আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাগুলিই উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র। চরিত্রগুলি এসেছে রাজনৈতিক মতাদর্শের মুখপাত্র হিসেবে। 'তিনপুরুষ' উপন্যাসের শেষে দেখানো হয়েছে রাজনীতি কেমনভাবে বন্ধুকে শত্রু করে তুলতে পারে। ভেঙে দিতে পারে ভালোবাসাকে। মানুষের হৃদয়ের এই যন্ত্রণার রেখাচিত্র আছে

বলে রচনাটি হয়ে উঠেছে প্রকৃত অর্থে উপন্যাস। অনেকে লেখাটিকে সমরেশ বসুর রাজনীতি-বিমুখতার প্রমাণ হিসেবে দেখতে চান। কিন্তু উপন্যাস পাঠে ঠিক তেমন অনুভূতি জাগে না। রাজনৈতিক মতাদর্শ যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা শৃঙ্খলরূপে দেখা দেয় তা হলেই তা ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে লেখকের এই উপলব্ধিই রূপায়িত।

'কালকূট' ছদ্মনামে সমরেশ বসু বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নামে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়। যেখানে লেখক নিজেকে এক পথচলার আনন্দে মুগ্ধ পথিকরূপে কল্পনা করেছেন এবং পথিকের চোখ দিয়ে অনুভব করেছেন বিশ্বজগতের বিচিত্র সুন্দরকে; সেখানেই ব্যবহার করেছেন এই নাম। 'কালকূট' নামে রচিত প্রথম উপন্যাস 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' (১৯৫৪)। কুম্ভমেলার বিপুল জনসমাবেশে অভিযাত্রী লেখক যেন ভারত-আত্মার সন্ধান পেয়েছেন—ধর্মে নয়, মানবতায়।

'কোথায় পাব তারে' (১৯৬৮) উপন্যাসে লেখক সঙ্গী হয়েছেন এক বাউল ও তার সঙ্গিনীর। তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আহরণ করেছেন বাউল-বৈরাগীর জীবনের আনন্দ-কণিকা।

'কালকূট' নামে লেখা এই ধরনের আরও উপন্যাস আছে। যেমন 'আরবসাগরের জল লোনা' (১৯৭২), 'তুষার সিংহের পদতলে' (১৯৭৬), 'মুক্তবেণীর উজানে' (১৯৮১), 'চলো মন রূপনগরে' (১৯৮২), 'পুণ্যভূমে পুণ্যস্নান' (১৯৮৭) ইত্যাদি। অনেকে এগুলিকে ভ্রমণোপন্যাস বলে থাকেন।

'কালকূট' ছদ্মনামে কিন্তু দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন সমরেশ বসু, যে দুটি তাঁর সৃষ্টিধারায় কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। সে দুটি উপন্যাস হল 'শাম্ব' (১৯৭৮) এবং 'পৃথা' (১৯৮৬)। পুরাণকে নব ব্যাখ্যায় নতুন করে অনুভব করা, পৌরাণিক চরিত্রকে নতুন রূপে আধুনিক তাৎপর্যে অনুভব করা বহু দেশের বহু উপন্যাসেই দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যেও এ ধরনের উপন্যাস ষাটের দশক থেকে লিখিত হয়ে এসেছে। এই দুটি উপন্যাস সেই ধারার সৃষ্টি। কিন্তু আর কোথাও সমরেশ বসুকে ভারতীয় পুরাণের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আগ্রহী হতে দেখা যায়নি। 'শাম্ব' উপন্যাসটি অত্যন্ত সুলিখিত। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব ছিল ভোগবিলাসী এক যুবক। বিশেষত সুপুরুষ শাম্ব নারী সংসর্গ উপভোগ করত পরিপূর্ণ চিত্তে। তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন কৃষ্ণের পত্নীরা। যৌন কামনার এক নিগূঢ় সংকট এখানে প্রকাশিত যে পিতা ঈর্ষান্বিত হয় পুত্রের যৌবনের প্রতি। কৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হল শাম্ব। তারপর সূর্য-উপাসনার কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করে আরোগ্য লাভ করল সে। এটুকু হল পুরাণ-কাহিনি। এই আখ্যানে আধুনিক কালের মানবতার স্পর্শ এখানেই—প্রথমত রোগকে দূর করবার জন্য, সুস্থ ও শুদ্ধ শরীর হয়ে ওঠার জন্য শাম্বর কঠোর সাধনা। অন্য কুষ্ঠরোগীরা এই সাধনায় ভঙ্গ দেয়। তাদের রোগমুক্তি ঘটে না। এখানে এই শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা প্রতীকত্ব পায়। দ্বিতীয়ত কৃষ্ণপুত্র এবং নারীবিলাসী শাম্ব তার সমস্ত ভোগসুখ ও রাজকীয়তার বন্ধন অতিক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণাকাতর সর্ব মানবের সমাবেশে নিজেকে মিলিয়ে দেয়। এ-ও যেন এক অমৃতকুম্ভের সন্ধানে যাত্রা।

'পৃথা' উপনাসেও রাজদুহিতা কুন্তী সূর্যকে আহ্বান করেছিল নিজের শরীরে। তা একই সঙ্গে পাপ এবং হয়ত বা পাপ নয়। সমাজ তাকে পাপের ছাপ দিলেও কুন্তীর অন্তরের সূর্যসাধনা জীবনের প্রতি সংরক্ত। কিন্তু কুন্তী বা পৃথার জীবন তারপরে বিচিত্রতর পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেবতার সংস্পর্শে যেতে বাধ্য হয়েছে। তবু কুন্তী শেষপর্যন্ত সূর্য-উপাসিকা। বহু দুঃখের দহনে পুড়ে, কর্ণকে পুত্র বলে স্বীকার করে নিয়ে পার্থজননী পৃথার শেষ আত্মবিসর্জন।

জীবনের শেষ পর্বে আবারও এক বৃহৎ ব্যতিক্রমী শিল্প-প্রয়াসে মগ্ন হয়েছিলেন সমরেশ বসু। শিল্পী রামকিঙ্করকে নিয়ে দীর্ঘ এক জীবনী-উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। বাংলায় এ ধরনের মৌলিক জীবনোপন্যাস রচনার সম্ভবত প্রথম এই প্রয়াসটি সমাপ্তি-সুন্দর হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ উপন্যাস রচনার মধ্য পথে প্রয়াত হয়েছিলেন সমরেশ।

সমাজের প্রত্যন্ত স্তরের এক কিশোরের সৌন্দর্যতৃষ্ণা, রূপ নির্মাণের, সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা কেমন করে নানা ঘাত-

প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সার্থকতার বিঘ্নসংকুল পথে অগ্রসর হয় উপন্যাসটি তারই আখ্যান। কাহিনিসূত্রে উপন্যাসে এসেছেন বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের শিল্পীর স্বাধীনতার সমর্থনের যে চিত্র উপন্যাসে আছে তা বাস্তব ও শিল্প—উভয় দিক থেকেই সফল। উপন্যাসটিকে রামকিঙ্করের জীবনের সঙ্গে অনেকটাই মিলিয়ে নেওয়া যায়, তবে কোনো কোনো জায়গায় বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালের সংকট, প্রেম ও কামনার উন্মেষ—ইত্যাদি দিকগুলিতে স্বভাবতই লেখকের কল্পনার স্থান বিস্তৃত হয়েছে। এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। কারণ লেখাটি উপন্যাস। এটুকুই বলা যায় যে এই কল্পনা উপন্যাসটির কোনো ক্ষতি করেনি।

সমরেশ বসু বাংলা উপন্যাসের এক বড়ো মাপের স্রষ্টা। বহুদিন ধরে বহু ধরনের উপন্যাস লিখে পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন তিনি। লেখাই জীবিকা ছিল বলে এবং লেখা সংক্রান্ত বাণিজ্যিক প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অনেক লঘু ধরনের নিতান্ত মনোরঞ্জন উপন্যাসও লিখতে হয়েছিল তাঁকে। যেমন 'অপরিচিত' (১৯৬৮), 'ছুটির ফাঁদে' (১৯৭০) ইত্যাদি। কিন্তু এককভাবে যত বিচিত্র ধরনের উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি, বাঙালি সমাজের যত বিচিত্রমুখী রূপ অঙ্কন করেছেন, বিভিন্ন শ্রেণিকে তুলে এনেছেন উপন্যাসের বৃত্তে যে তাঁকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর কালের বাংলা উপন্যাসের কোনো আলোচনাই হতে পারে না।

৩.১২ গুণময় মান্না (১৯২৫-)

পূর্বতন মেদিনীপুর জেলার মহকুমা শহর ঘাটালের পার্শ্ববর্তী গ্রাম আড়গোড়ায় ১৯২৫-এর ২৩ মার্চ দীননাথ ও প্রাণবালার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান গুণময়ের জন্ম। পরিবার এবং পরিবেশে তেমন বিদ্যাচর্চা না থাকলেও মা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের উৎসাহে শৈশবে পিতৃহীন মেধাবী গুণময় বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হন। স্কটিশ চার্চ কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক পর্যায়ের পাঠগ্রহণকালে গুণময় বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এ জন্য পুলিশের খাতায় তাঁর নাম ওঠে এবং তাঁর গ্রামের বাড়িতে পুলিশি তল্লাসি হয়। পরে অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় যোগ ছিল না তাঁর; তবে সাম্যবাদের সঙ্গে ছিল মানসিক সংযোগ। বাংলায় এম. এ. (১৯৫১) পাশ করার পর 'রবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তরেখা' বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৬৪ সালে পি-এইচ. ডি. হন গুণময়। তাঁর বৃত্তি ছিল অধ্যাপনা।

বালক বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চা করেছেন গুণময়। তখন লিখতেন কবিতা। সেগুলি এখন লুপ্ত। পরে গদ্য চর্চায় মন দিয়েছিলেন। গল্প-উপন্যাস ভিন্ন বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি। প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০)। আমরা আলোচনার জন্য তাঁর উপন্যাস-সম্ভারের মধ্য থেকে পাঁচটি নির্বাচন করেছি। যথা—'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০), 'কটা ভানারি' (১৯৬০), 'জুনাপুর স্টীল' (পূর্বখণ্ড ১৯৬০; উত্তর খণ্ড ১৯৬২) 'শালবনি' (১৯৭৮) এবং 'মুটে'।

তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে শ্রমজীবী মানুষ। এর মধ্যে আবার দুটি ভাগ আছে, কৃষিশ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমজীবী। দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে রয়েছে কারখানাকর্মী এবং ভারবাহী শ্রেণি। 'লখীন্দর দিগার', 'কটা ভানারি', 'শালবনি' প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত আর 'জনাপুর স্টীল' (দু খণ্ড) আর 'মুটে' দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়বে।

গুণময় বাংলার লোকজীবনকে চেনেন ঘনিষ্ঠভাবে, গ্রাম আর গ্রামের মানুষের জীবন, তাদের সংকট, সংগ্রাম, দুঃখ-আনন্দ নিয়েই নির্মিত 'লখীন্দর দিগার'। উপন্যাসটির সময়কাল স্বাধীনতার পরের গ্রাম। কিছু আগে শেষ হয়ে গেছে তেভাগার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম; ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য চাষিদের লড়াই। এবার এসেছে জমির মালিকানা রক্ষার যুদ্ধ। মেদিনীপুরের একটি গ্রামে কেমন করে কৃষকেরা গ্রাম্য জমিদার, জোতদার আর রাষ্ট্রশক্তি—এই অশুভ যুক্ত শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল তারই চিত্র 'লখীন্দর দিগার'। ব্যক্তিনামে নামাঙ্কিত হলেও উপন্যাসটি লখীন্দর দিগার নামের কৃষকের জীবনগাথা নয়। এটি যূথবদ্ধ চাষিদের, রূপান্তরিত সংগ্রামী মানুষের কাহিনি।

শীরসার জমিদার অনুতোষ সিংহ, ধানগাছিয়ার জমিদার অজয় রায় আর তার মামা হরি চৌধুরী শোষক শ্রেণির প্রতিভূ। কৃষকনেতা গোবিন্দের সঙ্গে লখীন্দরের যোগাযোগ হয়। ক্রমে বদলে যায় লখীন্দর আর অন্য কৃষকেরা। ভেঙে যায় তাদের পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দের চিরন্তন ধারণা। লখীন্দরের ছেলে সুধীরও ক্রমে হয়ে ওঠে সচেতন সংগ্রামী। তাদের প্রতিজ্ঞা রূপ পেয়েছে গোবিন্দের মুখে 'যে চাষী, সে চাষ করবে জমি হবে তারই। আর কাউকে আমরা মানিনে।'

লখীন্দরও অনুপ্রাণিত হয় এ প্রতিজ্ঞায়। আর মনের মধ্যে অনুভব করে অদ্ভুত এক আনন্দ। যদিও তার মনের চিরন্তন মূল্যবোধ চূর্ণিত হয় না। সে ভোরে উঠে কৃষ্ণনাম করে—নবোদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হয় তার মন। সূর্যের রক্তবর্ণের মধ্যে সে যেন দেখতে পায় সাম্যবাদী সংগ্রামের নবীন রূপ। লখীন্দর অবশ্য ধরা পড়ে। কিন্তু থেমে যায় না সংগ্রাম। সূর্যের উদয় যেমন কেউ বন্ধ করতে পারে না; তেমনই শ্রমজীবী মানুষের স্বাধিকার লাভের এ সংগ্রামও কেউ থামিয়ে দিতে পারবে না এ বিশ্বাসেই সমাপ্ত হয়েছে উপন্যাসটি।

'কটা ভানারি'-র কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু কৃষিপণ্য নিয়ে যাদের কারবার সেই ভানারিরা। এরা ধান থেকে চাল তৈরি ও বিক্রি করে; এটাই তাদের জীবিকা। এই জীবিকার মেদিনীপুরে প্রচলিত নাম 'কটা ভানারি'। ঘাটাল কটা ভানার কেন্দ্র। কটাতি হল যারা এই তৈরি চাল গ্রাম-মফস্সল থেকে এনে বিক্রি করে বেঁচে থাকে। যে সময়পর্ব উপন্যাসে চিত্রিত তখন পশ্চিমবঙ্গে চালু ছিল ধানচালের কর্ডনিং। এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, গ্রাম থেকে শহরে ধানচালের ক্রয়বিক্রয় ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু ভূমিহীন যে শ্রমজীবীরা এই চাল বিক্রিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল তাদের কথা ভাবেনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। সেই শ্রমিকদের জীবন, আর জীবিকার লড়াই উপন্যাসের অন্বিষ্ট। কয়েকটি ব্যক্তিচরিত্রের মাধ্যমে গুণময় উপন্যাসটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন বহমান জীবনস্রোতের কয়েকটি বাঁক। কৃষকদের মতো ভানারিদের জীবনও বন্যা, অজন্মা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এমনই এক দুর্যোগের পটভূমিতে। শিলাই বা শিলাবতীর বন্যার পর সরকার থেকে ত্রাণদ্রব্য বিতরিত হচ্ছে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র শরৎ দলুই। তার স্ত্রী কমলা রিলিফ আনতে যাচ্ছে—এ নিয়ে উপন্যাসের সূচনা। ক্রমে এসেছে কর্ডনিং এবং প্রশাসনের দুর্নীতির কথা। অন্যতম চরিত্র বিজয় করে পেট্রলম্যানের চাকরি অর্থাৎ ধান-চাল বেআইনি-ভাবে বেচাকেনা হচ্ছে কিনা তার তদারক করাই তার কাজ। গাঁয়ের দরিদ্র মানুষগুলি এর বিরুদ্ধে। কারণ এ আইন তাদের জীবিকাকে বিঘ্নিত করছে। ধানচাল পাচার বন্ধ হয়নি। কিন্তু তাদের এ জন্য প্রশাসনকে ঘুষ দিতে হচ্ছে। ক্রমে কটাতিরা সংঘবদ্ধ হয়। তারা শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। শরতের স্ত্রী কমলা হয়ে যায় কটাতি আর তারই মতো মেয়েদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে এস.ডি.ও.-র কাছে যায়। তাদের সহায়তা করতে আসে শম্ভু-শরতের মতো পুরুষের দল। তাদের শাস্তি হয়। এবং শেষপর্যন্ত দেখা যায় উপন্যাসের মানুষগুলি ব্যক্তিস্বার্থের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। এবং নিজেদের যথার্থ প্রাপ্য পাওয়ার জন্য সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ একভাবে বলা যায় শ্রমজীবীদের চেতনার উন্মেষেই শেষ হয়েছে উপন্যাস।

'শালবনি'-র প্রকাশকাল ১৯৭৮, রচনা ১৯৭৩-৭৬ এই সময়পর্বে। মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার মধ্যবর্তী কয়েকটি গ্রাম, বিস্তৃত মাঠ আর তাদের ঘিরে আছে এক অরণ্য, যে অরণ্যের প্রধান বৃক্ষ শাল। তাই অঞ্চলটির নাম 'শালবনি'। উপন্যাসের আখ্যানটি এরকম—গণপতি সিং এই স্থানটির প্রায় সব জমির মালিক। ধানকল, পুকুর, গো-সম্পদের মালিক গণপতির কাজ করেই বেঁচে থাকে অঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলি। তাই গণপতি আর তার কর্মচারীদের অন্যায় নিপীড়নও তাদের মেনে নিতে হয়। গ্রামের দুলে-মাহাতো-সাঁওতালদের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ে মোহন নামের এক তরুণ। নিঃসন্তান মৃত গজেন দুলের কুটুমের ছেলে বলেই গ্রামের মানুষ তাকে জানে। সে-ই এখন গজেনের জমির মালিক। তার সঙ্গে মৃত সনাতন মাহাতোর মেয়ে শামলীর একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার চোখে ধরা পড়ে মোহন যেন কৃষিকর্মে ঠিক অভ্যস্ত নয়। এই সময়েই এক সন্ধ্যায় অজানা চার আততায়ী হত্যা করে গণপতিকে। তার আগে—তার অপরাধ সম্বন্ধে তারা যা বলে তা নকশালবাড়ি আন্দোলনেরই কথা। এদের মধ্যে ছিল মোহন। সে মেধাবী ছাত্র,

ব্রাহ্মণের সন্তান। আন্দোলনে যোগ দিয়ে চলে এসেছে শালবনিতে। তারা ধীরে ধীরে সংগঠিত করতে চায় গ্রামের সাধারণ মানুষগুলিকে। মালিক না থাকলেও কৃষকেরা আপ্রাণ চেষ্টায় কৃষি-উপকরণ জোগাড় করে চাষ শুরু করে দেয়। চলে সাঁওতালদের উৎসব। মথুর কৌড়ি এ উপন্যাসে আদর্শ চরিত্র। সে কোনো চিরাগত নিয়মের বন্ধনে বন্দি নয়। তার দৃষ্টি উদার, সহৃদয় তার মন। সাঁওতালদের উৎসবে সে যেমন সহায়তা করে তেমনই গজেন দুলের আত্মীয় মোহনের সঙ্গে মাহাতো মেয়ে শামলীর বিয়ে দেয় সে। উভয়ের মিলন-মধুরতার মধ্যে আগমন ঘটে পুলিশ আর মিলিটারির। তারা বলে দেয় মোহনের যথার্থ পরিচয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই যুবক যোগ দিয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনে। তাই তার গ্রামে আসা, গণপতিকে হত্যা করা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণে মারা পড়ে সে। ধর্ষিত শামলীকে পুত্রবধূর মর্যাদায় ঘরে তুলে নেয় মথুর। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নারান দুলে সে খবর পৌঁছে দেয় পুলিশের কাছে। তাদের হাতে মারা যায় মথুর। কিন্তু শামলী বেঁচে থাকে তার আর মোহনের সন্তানের জন্য। বিপ্লবীর এই সন্তান যথাসময়ে জন্ম নেয়। এই শিশু যেন সমস্ত গ্রামের আশার প্রতীক। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

উপন্যাসটির গঠনে কোনো জটিলতা নেই। নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা উপন্যাসটিতে স্পষ্ট। তিনি এ আন্দোলনের ভ্রম হনননীতির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। শিক্ষিত নাগরিক মোহনের সঙ্গে নিতান্ত গ্রাম্য তরুণী শামলীর প্রেমের মধ্যেও নেই কোনো দ্বিধা বা সংশয়ের বিন্দুচিহ্ন। সরল একমাত্রিক এই উপন্যাসটির সঙ্গে লেখক-সত্তার অন্তরের যোগ স্থাপিত হয়নি। সে কারণেই 'লখীন্দর দিগার' বা 'কটা ভানারি'-র তুলনায় 'শালবনি' ততটা শিল্পসার্থক হয়ে উঠতে পারেনি, একথা আমাদের বলতেই হবে।

আবার একদিক দিয়ে দেখলে 'লখীন্দর দিগার', 'কটা ভানারি' আর 'শালবনি'—রচনাকালের পার্থক্য সত্ত্বেও এই তিনটি উপন্যাস স্বাধীনতা-উত্তর গ্রাম বাংলার কৃষিশ্রমিকদের জীবনের ক্রমপরিবর্তনের একটি ধারাচিত্র হয়ে উঠেছে। 'লখীন্দর দিগার'-এ কৃষকদের জমির মালিকানা লাভের লড়াই, 'কটা ভানারি'-তে শস্য যাদের জীবিকা সেই ভানারিদের জীবন আর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের চিত্র আর 'শালবনি'-তে এই রাষ্ট্রশাসন পরিবর্তনের স্বপ্ন, সংগ্রাম আর সুন্দর ভবিষ্যতের অনির্বাণ আশার দিকটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কথাশিল্প হিসেবে কিছুটা সরল হলেও 'শালবনি'কে তাই দূরে রাখা যায় না কোনোভাবেই।

আবার এই তিন উপন্যাসে বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের গ্রাম আর গ্রামীণ মানুষ—তাদের আহার-বিহার পূজা-উৎসব, ব্রত, প্রবাদ-প্রবচন, সংস্কার—সব নিয়ে বাস্তব হয়ে উঠেছে। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবশ্যই এই বাস্তবায়নের অন্যতম কারণ, কিন্তু মূল কারণ লেখকের প্রীতি আর সৃষ্টিশক্তির অনন্যতা—একথা মেনে নিতে হয় সব সচেতন পাঠককে।

প্রৌঢ় সুধীর সাঁতরা গ্রামের মানুষ। ঘাটাল বাজারে মালবহন তার পেশা। তাকে নিয়েই নির্মিত হয়েছে 'মুটে'-র কাহিনিবৃত্ত। প্রসঙ্গত মুটে-জীবনের অনুপুঙ্খ আর গ্রামজীবনের পূর্ণ চিত্র এঁকেছেন লেখক। বলিষ্ঠ শরীর-মনের অধিকারী সুধীর সর্দার মুটে আর মুটেদের যুগ্ম সম্পাদক। ভার বহন তাদের বংশানুক্রমিক পেশা। কিন্তু ছেলে প্রবীরকে সে একাজে আনেনি। মাধ্যমিক পাশ করার পর ছেলেকে সে পিয়নের কাজে ঢুকিয়েছিল। ছেলে নকশালবাড়ি রাজনীতিতে যোগ দিয়ে পুলিশের ভয়ে পলাতক। সুধীর কিন্তু রাজনীতি বোঝে না, সে বোঝে কাজ। শ্রম দিয়েই জীবনকে সুন্দর করতে চায় সে। স্ত্রী কুসুম আর কিশোরী কন্যা সরলাকে নিয়ে তার সংসার। কেবল পুত্রের জন্য নিরন্তর দুঃখ বিদ্ধ করে তার মন। এর মধ্যে গ্রামে আসে কানাই মণ্ডল নামের এক তরুণ। ক্রমে সে গাঁয়ের তরুণদের নায়ক হয়ে ওঠে। সুধীর যেন তাকে ঠিক সহ্য করতে পারে না। আবার তার সঙ্গে সংঘর্ষেও যেতে চায় না। পরিবর্তে কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে চায় সে। গ্রামের শিব বাবা শীতলানন্দের গাজনের পাট ভক্তে বা প্রধান সন্ন্যাসী হয়। এই সূত্রে গাজন নামের গ্রামীণ লোকায়ত উৎসবটির নিখুঁত এবং সজীব বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। শব্দ দিয়ে বাস্তবের পূর্ণ রূপায়ণে সক্ষম হয়েছেন লেখক। সুধীর যে ঠিক আর পাঁচটা মানুষের

মতো নয়, মনকে সে গ্লানিমুক্ত করতে চায়; তার জন্য দুঃখ বহনেও তার কুণ্ঠা নেই—গাজনের ভক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে চরিত্রটির এই দিকটিই ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসের শেষে দেখি প্রবীর মারা গেছে বিপক্ষের অস্ত্রে। সুধীরের মেয়ে সরলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কানাইয়ের। বেশ চেনা এই কাহিনিবিন্যাস। উপন্যাসটি একটু পৃথক ব্যঞ্জনা পেয়েছে সমাপ্তিতে। বোঝা ফেলে দেওয়া নবীন মুটেকে সে শিখিয়েছে ঘাড় সোজা রাখতে না পারলে মুটে হওয়া যায় না। সেই বোঝা শুধু মালের বোঝা নয়—অস্তিত্বের বিরোধী দুঃখ-বেদনা-লাঞ্ছনার বোঝা। দেহে-মনে বলিষ্ঠ মানুষই মেরুদণ্ড সোজা রেখে প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। এই সব মানুষের শ্রমকিণাঙ্কিত হাতই গড়ে দেয় সভ্যতার ভিত্তি, গতি এনে দেয় সভ্যতার চাকায়—এই নিত্য সত্যের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে উপন্যাস। মানুষের উপর লেখকের বিশ্বাস উপন্যাসটিকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র।

'জুনাপুর স্টীল (পূর্ব ও উত্তরখণ্ড) একটি ইস্পাত কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্পনগরী এবং কারখানার মালিক, উচ্চস্তরের কর্মচারী আর শ্রমিকশ্রেণির সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিচিত্র বর্ণে উজ্জ্বল বিশাল এক উপন্যাস। ইস্পাত কারখানায় অশোধিত লৌহ-আকরিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শোধিত হয়ে ওঠে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত। এই কারখানার শ্রমিকনেতা উপন্যাসের নায়ক শিবলাল তেমন করেই ধাপে ধাপে হয়ে উঠেছে যথার্থ শ্রমিক নেতা। সাম্যবাদকে সে গ্রহণ করেছে শ্রমিক-স্বার্থ পূরণের যথার্থ পন্থা হিসেবে।

শিবলালের মানবিক সত্তাও বাস্তব হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। সে লেবার অফিসারের লালসার শিকার বলে যাকে দুর্নাম দেওয়া হয়েছে সেই লীলাকে গ্রহণ করেছে। কারখানার শ্রমিক বনমালী পালের ভাইঝি লীলা। তাকে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত যে সে মানুষের সত্তার পবিত্রতায় বিশ্বাস করে। এভাবেই শিবলাল হয়ে ওঠে প্রকৃত মানুষ।

আবার কারখানার দেশি ও বিদেশি মালিকপক্ষের স্বার্থজনিত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পণ্যভিত্তিক আধুনিক বণিক সভ্যতার প্রতি ঔপন্যাসিকের সংশয়ের দিকটি ফুটে উঠেছে। কারখানার লেবার অফিসার অমরেশ ব্যানার্জি, জেনারেল ম্যানেজার—প্রভৃতি উচ্চপর্যায়ের কর্মচারী এবং তাদের পরিবার—এদের জীবনের উজ্জ্বলতা আর শূন্যতা—দুটি দিকই গুণময় মান্নার নিপুণ বিশ্লেষণে বাস্তব হয়ে উঠেছে।

চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা আর শিল্পনগরী এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত পরিবেশ চিত্রণের নৈপুণ্য—উভয়ের সম্মিলনে কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও 'জুনাপুর স্টীল' (পূর্ব ও উত্তর খণ্ড) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসের সীমা করেছে বিস্তৃত এবং বিষয়ে এনেছে বৈচিত্র্য। শিল্পনগরী এবং কারখানার বাস্তব চিত্রণের ক্ষেত্রেও উপন্যাসটির মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

গুণময় মান্নার উপন্যাসের বিশেষ লক্ষণ বাস্তবের নিপুণ উপস্থাপন। অলীক কল্পনার রোমান্টিক বিলাসের ক্ষেত্র নয় তাঁর উপন্যাস; আশা-নিরাশায় বোনা জীবনের যথার্থ রূপই তিনি শব্দশিল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে নিপীড়িত মানুষের প্রতি প্রীতি এবং সমতার আদর্শে বিশ্বাস তাঁর উপন্যাসকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষদের জীবন অঙ্কনে ঔপন্যাসিকের শক্তির পরিচয় স্পষ্ট। বাস্তবনিষ্ঠ মানবিক মূল্যবোধে দৃঢ় আস্থার কারণে গুণময় মান্নার উপন্যাস হয়ে উঠেছে স্ব-বিশেষত্বে স্বতন্ত্র এবং বিভাময়। অনেক সময় সমস্যার সরলীকরণের প্রবণতা তাঁর আছে। তথাপি সামগ্রিক বিচারে সেই ত্রুটি ততটা বড়ো হয়ে ওঠে না। কারণ তাঁর জীবনদৃষ্টি মানুষের প্রতি আস্থার উজ্জ্বল।

৩.১৩ মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-   )

মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৯২৬ সালে ঢাকায়। তাঁর পিতা ছিলেন 'কল্লোল' যুগের সুপরিচিত কবি এবং কথাসাহিত্যিক

মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)। মা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন লেখিকা। অতি সুশিক্ষিত পরিবারের সন্তান মহাশ্বেতা। শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় স্কুলের পাঠ শেষ করেন। বিশ্বভারতী থেকে বি. এ. এবং কিছুকাল পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করে শিক্ষকতার জীবিকা গ্রহণ করেন। বিজয়গড় যতীশ রায় কলেজের ইংরেজির অধ্যাপিকার পদ থেকে ১৯৮৪ সালে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন।

সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং গণনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, 'নবান্ন' নাটকের লেখক বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহসূত্রে মহাশ্বেতা দেবী সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা এবং দরিদ্রবর্গের মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ নিয়ে নিজের সাহিত্যসৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

অল্প বয়স থেকেই তাঁর লেখালেখি শুরু হয়। এবং লিখে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা তিনি প্রথম থেকেই করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি ইতিহাস-নির্ভর জীবনীগ্রন্থ 'ঝাঁসির রাণী' (১৯৫৬)। মহাশ্বেতা দেবী পঞ্চাশটির অধিক উপন্যাস এবং বহু ছোটো গল্প লিখেছেন। ছোটোদের জন্যও অনেক লেখা আছে তাঁর। বিচিত্র বিষয় নিয়ে লিখলেও তাঁর উপন্যাসধারাকে মোটামুটিভাবে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নটী' (১৯৫৭) থেকে শুরু করে ১৯৬৬ পর্যন্ত প্রথম পর্ব। কোথাও কোথাও উপন্যাসের উপাদান রূপে ইতিহাস ব্যবহৃত হলেও এই পর্বের উপন্যাসে বিচিত্র ধরনের প্লট এবং মানুষ নিয়ে আখ্যান নির্মাণের আগ্রহই প্রধান। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে 'আঁধারমাণিক' (১৯৬৬) উপন্যাসটি থেকে। এই সময় থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তিনি যত উপন্যাস লিখেছেন সেখানে বিষয়ের ক্ষেত্রে বিচিত্র পথ-পরিক্রমা থাকলেও সামগ্রিকভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া বর্গের মানুষের অবস্থান এবং ইতিহাসের গতিপথ তাঁর উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন।

বহু সংখ্যক উপন্যাসের মধ্য থেকে আমরা মহাশ্বেতা দেবীর প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি উপন্যাস নির্বাচন করে নেব—'নটী' (১৯৫৭), 'মধুরে মধুর' (১৯৫৮), 'প্রেমতারা' (১৯৫৯), 'বায়স্কোপের বাক্স' (১৯৬০), 'আঁধারমাণিক' (১৯৬৬), 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৬), 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭), 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' (১৯৮২), 'বিশ-একুশ' (১৯৮৬), 'গণেশ মহিমা' (১৯৮৭), 'টেরোড্যাকটিল পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৯০), 'ব্যাধখণ্ড' (১৯৯৭)।

'ঝাঁসির রাণী' লেখাটি থেকেই মহাশ্বেতা দেবীর ইতিহাস-আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। 'নটী' উপন্যাসটিতে ইতিহাসের পটভূমিতে স্থাপিত এক প্রেমকাহিনি বর্ণিত। ঝাঁসির রাজদরবারের নর্তকী মোতি আর পাঠান সৈনিক খুদা বক্স-এর প্রেমের উপাখ্যান এই উপন্যাস। কিন্তু একদিকে সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বিলাস অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন—এর মধ্যে সিপাহি বিদ্রোহের অশনিসংকেত—উপন্যাসটিকে বহু বর্ণময় এবং অতি সুপাঠ্য করেছে। কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয় এ উপন্যাস।

'মধুরে মধুর' এবং 'প্রেমতারা'—এই দুটি উপন্যাসই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য। প্রথম উপন্যাসটিতে ভ্রাম্যমান এক নৃত্যশিল্পীদলের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরেছেন লেখক। প্রধানত মধ্যভারতের শিল্পী তারা, সঙ্গে আছে চট্টগ্রামের যুবক সাধন। উপন্যাসটিতে শিল্পের জন্য উৎসর্গিত-জীবন একগুচ্ছ চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাদের সুখদুঃখ, প্রেম-প্রীতির কাহিনী 'মধুরে মধুর'। পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য থাকলেও উপন্যাসটিতে ততটা প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি। 'প্রেমতারা' উপন্যাসটি সার্কাসের শিল্পীদের নিয়ে রচিত। এখানেই প্রথম মহাশ্বেতা দেবী সমাজের শোষক ও শোষিত সম্পর্কটিকে তুলে ধরেছেন। পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে তার বাবা রেখে দিয়ে যায় সার্কাসের দলে। তারপর নিজের জীবনের দায় নিজের হাতে নিয়ে প্রেমতারা নামের মেয়েটির বড়ো হওয়ার কাহিনি এই উপন্যাস। সার্কাসের অন্য খেলোয়াড় মনোহরের সঙ্গে তার প্রণয়। কিন্তু বাঘের আক্রমণে পঙ্গু হয়ে যাওয়া মনোহর মালিকের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। প্রেমতারাকেও এই শোষণের শিকার হতে হয়। সার্কাসের পরিবেশের মধ্যে যে বিচিত্রতা আছে এবং নিষ্ঠুরতাও আছে তাকে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা। বিশেষ করে

সার্কাসের মেয়েদের যে অতিরিক্ত নিপীড়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে।

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের উপাদানের মধ্যে অভিজাত রুচির, উচ্চবিত্ত পরিবারেরও স্থান আছে। এই আভিজাত্য অনেক সময় কেবলই বিত্তের বিলাস, আবার কোথাও তা প্রকৃত আভিজাত্যের রুচি ও ব্যক্তিত্বের উদ্‌ভাসন। 'বায়স্কোপের বাক্স' উপন্যাসটি তেমনই এক নিঃসঙ্গ মহিলার স্মৃতিচারণ-সূত্রে বিধৃত একটি পরিবারের শাখাপ্রশাখার গল্প। পুরোনো অ্যালবাম হয়ে ওঠে তাঁর বায়স্কোপের বাক্স। বিগত দিনের জীবনযাপনের বিচিত্র কারুকাজ এবং স্মৃতির সৌরভ উপন্যাসটিতে জড়িয়ে আছে। কেবলই বর্ণনার উপর নির্ভর এই উপন্যাস কোনো কোনো পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু এইজাতীয় উপন্যাসের রচনারীতিতে ওই স্মৃতিচারণের কথকতাই যথার্থ শিল্পরীতি।

'আঁধারমাণিক' উপন্যাসটিকে মহাশ্বেতা দেবী নিজে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করেছেন। তার কারণ এই উপন্যাসেই প্রথম ইতিহাসের বিশাল রথচক্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে যথার্থভাবে তিনি সংলগ্ন করতে পেরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একটি গ্রামের নাম 'আঁধারমাণিক'। বর্গিদের আক্রমণ আর বাংলার নবাবী রাজত্বের চিত্র। সেই সঙ্গে গ্রামের মানুষের সংস্কারজীর্ণ অসহায় জীবনযাপন, গ্রামের মানুষদের মধ্যে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ থেকে পিছিয়ে পড়া বর্গের মানুষজন সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই উপন্যাসে মহাশ্বেতা ইতিহাসের বিশালত্বকে যথার্থভাবে উদ্‌ভাসিত করতে পেরেছেন বলে তিনি নিজেও মনে করেছেন এবং আমরাও তাই মনে করি।

মহাশ্বেতা দেবীর ইতিহাসচেতনা এই সময়ে একটি বিশেষ পথ পরিক্রমা করতে শুরু করেছিল। রাজাদের রাজত্বকাল, রাজবংশের বিবরণ এবং রাজকীয় কীর্তিসমূহের বাইরে কোনো দেশের পুরাণ, লোকশ্রুতি এবং প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও ইতিহাসের যে উপাদান সংরক্ষিত থাকে সে দিকে দৃষ্টি পড়ল তাঁর। আমরা অমিয়ভূষণ মজুমদারকেও এ বিষয়ে সচেতন দেখেছি। মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠল মহাশ্বেতা দেবীর প্রিয় ইতিহাস-উপাদান। বাংলার এই মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আর্য এবং অন-আর্য সংস্কৃতির যে একটি সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া সাধিত হয়েছিল তা যেমন তাঁকে আকর্ষণ করল, তেমনই বর্ণাশ্রম-শাসিত সমাজে আদিবাসীরা এবং পিছিয়ে-পড়া বর্গের মানুষেরা কী কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাঁচে তার চিত্র তিনি দেখিয়েছেন। এই ধারার একাধিক উপন্যাসের প্রথমটি হল 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু'। মেদিনীপুরের অরণ্যবাসী আদিবাসী গোষ্ঠী হল চুয়াড়। সেই চুয়াড়দের এক বালক লেখাপড়া শিখেছিল এবং কবি হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাকে লালন করেছিল। স্থানীয় রাজ্য ভীমাদলের রাজার সাধ ছিল প্রতিবেশী রাজা বাঁকুড়া রায়ের সভাকবি মুকুন্দের মতো তাঁরও এক সভাকবি থাকবে। চুয়াড় যুবকটি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে ভীমাদলের রাজার সভাকবিপদে অধিষ্ঠিত হল এবং লিখল এক অপূর্ব দেবীমঙ্গল কাব্য। রাজকন্যা ফুল্লরার সঙ্গে তার প্রণয় এবং বিবাহেরও দিন স্থির। এই সময় সহসা আবিষ্কৃত হল তার আসল পরিচয়। আরণ্যক মানুষগুলি সদলে এসে কবিকে নিয়ে যেতে চায়। রাজার স্নেহ পরিণত হয়েছে ঘৃণায়। সাধারণ মানুষ কাব্যটির গুণগান করেও জাতি-পরিচয় গোপন করাকে অন্যায় বলে মানল। চুয়াড় যুবকের কবি হবার স্বপ্নের কথা কেউ-ই ভাবল না। চুয়াড়দের গোষ্ঠীদেবতার প্রতীক হল হাতি। হাতির পায়ের তলায় মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত হল কবির। উপন্যাসটিতে রাজা, অভিজাতবর্গ, উচ্চবর্ণ এবং আদিবাসীদের মধ্যের চিরকালীন সন্দেহ ও বিরোধের সম্পর্কটি ফুটে উঠেছে। উচ্চবর্ণের মানুষ না হলে আদিম জীবন থেকে পরিশীলিত জীবনে যাবার অধিকার সমাজ অস্বীকার করে। উপন্যাসটিতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত।

'হাজার চুরাশির মা'—সম্পূর্ণত একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। রক্তাক্ত উত্তাল সত্তরের দশকের জীবন্ত দলিল এ উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত ব্রতী আর তার মা সুজাতাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। উচ্চবিত্ত সমাজের স্বার্থসর্বস্ব-ভোগকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় ব্রতী যোগ দিয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনে। তার সহযোদ্ধারা অনেকেই এসেছিল উদ্বাস্তু পরিবার থেকে। রাষ্ট্রশাসন অতি সুকৌশলে গণসন্ত্রাস জাগিয়ে অথবা বলা যায় তথাকথিত মস্তানদের কাজে লাগিয়ে বীভৎস নির্মমতায় হত্যা করেছিল এই যুবকদের অনেককে। ব্রতী সেই নিহতদের একজন। মা সুজাতা ভিন্ন তার পরিবারের কেউ তার জন্য শোক করেনি। বরং নিজেদের সামাজিক অবস্থানে যাতে আঘাত না লাগে—এ নিয়েই

ব্যস্ত ছিল তার বাবা, দাদা। ব্রতীর মৃত্যুদিনে সুজাতার স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে প্রায় পুরো কাহিনিটি বিবৃত। ব্রতীর স্মৃতি নিয়ে সুজাতা দিন কাটাতে পারে না। সেদিন তার বিলাসিনী কন্যার বিবাহ স্থির হওয়ার পার্টি। সে পার্টিতে নিমন্ত্রিত নৃশংস সেই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পক পুলিশ অফিসার। তার হাতে খাদ্যপ্যাকেট তুলে দিতে গিয়ে সহসা ব্রতীর নাম নিয়ে চিৎকার করে পড়ে যায় সুজাতা। তার ছিল ক্রনিক অ্যাপেনডিক্স। স্বামী দিবাকরের উক্তি 'তা হলে অ্যাপেনডিক্স ফেটে গেছে'—দিয়ে উপন্যাস সমাপ্ত।

এই সমাজকাঠামোর মধ্যের অসুস্থতা, বাহ্যিক আর মানসিক দমন-পীড়নের যে প্রতিবাদ যে ফেটে পড়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনে; ছিঁড়ে দিয়েছিল স্থিতাবস্থার মুখোশ—এই বাস্তব সত্যের সরাসরি এবং প্রতীকায়িত উপস্থাপনে উপন্যাসটি পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। এখানেই এর গুরুত্ব।

মহাশ্বেতা দেবীর বহু পরিচিত ও বহু পঠিত উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার'। একই সঙ্গে এক তীব্র ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ভারতের চিরকালীন শোষিত আদিবাসীদের বিদ্রোহের জীবন্ত চিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দের একেবারে শেষের দিকে ছোটোনাগপুরের মুন্ডা উপজাতিরা বিদ্রোহ করেছিল বিরসা মুন্ডা নামে এক প্রতিভাবান ও বীর মুন্ডা যুবকের নেতৃত্বে। এই বিদ্রোহ প্রত্যক্ষত ইংরেজ শাসকেরই বিরুদ্ধে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে স্বদেশীয় ভদ্রলোক শ্রেণির মানুষেরা দরিদ্র, নিরক্ষর আদিবাসীদের যেভাবে শোষণ করেছে সেই যৌথ সামাজিক নিষ্ঠুরতাও এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। লেখকের উপলব্ধির আন্তরিকতা, প্রগাঢ় সহমর্মিতা এবং ঐতিহাসিক তথ্যকে ব্যবহার করবার কুশলতা উপন্যাসটিকে অসামান্য শিল্পরূপ দান করেছে। আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবীর আগ্রহ আগেও ছিল। কিন্তু এই সময় থেকে সেই আগ্রহ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসে শিল্পিত হতে শুরু করেছে। পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির বিদ্রোহকে তিনি ঐতিহাসিক গৌরবের আলোকমণ্ডিত করে একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। যেমন—'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২) আর 'তিতুমীর' (১৯৮৬)।

এই ধারায় যে উপন্যাসটি পরিকল্পনার দিক থেকে অভিনব সেটি হল 'চোট্টিমুন্ডা আর তার তীর'। উপন্যাসের নায়ক চোট্টি মুন্ডা জনজাতি গোষ্ঠীর এক যুবক। পুরুষানুক্রমিক ভূমিদাস তারা। সেই শোষণচক্রের বিস্তৃত ইতিহাস তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা। চোট্টি তির চালনা শিক্ষা করেছে, অসামান্য তিরন্দাজ সে। তার লক্ষ্য ভেদের ক্ষমতা নিয়ে গড়ে ওঠে অলৌকিক সব কাহিনি। চোট্টি মুন্ডা হয়ে উঠতে থাকে যেন এক মিথের নায়ক। উপন্যাসটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আদিবাসী সমাজের এক সামগ্রিক বিবর্তনের রূপ, বিশেষ করে বিপ্লবের ধারাবাহিকতাকে প্রতিষ্ঠা করায়। ১৮৫০ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে আদিবাসীদের উত্থান উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে। ফলে সমগ্র ভারতের জনজাতি গোষ্ঠীর অস্তিত্বের যেন এক সংহত রূপচিত্র হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস।

ষাটের দশকের শেষ লগ্ন থেকে সমগ্র সত্তরের দশক জুড়ে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিস্তৃত প্রভাবের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাত্ত্বিক দিক থেকে এই রাজনীতিকে সমর্থন না জানালেও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার দুর্নীতি ও দুর্বলতাকে আঘাত করবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন সকলেই। উজ্জ্বল তরুণদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ তাঁদের মুগ্ধ করেছিল আর প্রশাসনের হিংস্র অত্যাচার দেখেও তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এবং আদর্শবাদী তরুণদের সমাজ বদলে দেবার এই স্বপ্ন; সেই সঙ্গে জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মমর্যাদা-বোধের উন্মেষ—এই বিষয়-ভাবনাগুলি সত্তরের দশকের কথাসাহিত্যে অনেক সময়ই পরিস্ফুট হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী বিশেষভাবে এই আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলির প্রতি সহমর্মী ছিলেন। 'বিশ-একুশ' উপন্যাসে এমনই এক আত্মগোপনকারী বিপ্লবী তরুণকে কেন্দ্রে রেখে এক আদিবাসী পরিবারের সঙ্গে সেই যুবকটির একাত্ম হয়ে যাবার আখ্যান তিনি শুনিয়েছেন।

অনেকগুলি ছোটো উপন্যাস বা নভেলেট লিখেছিলেন মহাশ্বেতা আশির দশকে। প্রায় প্রত্যেকটিরই বিষয় তথাকথিত নিম্নবর্গের দরিদ্র মানুষের প্রতি বর্ণহিন্দু ও বিত্তশালী সমাজের ধারাবাহিক অত্যাচার। 'গণেশ মহিমা' উপন্যাসটিতে জমিদারের ধনী কর্মচারীর গৃহে যে শিশুপুত্রের জন্ম হয় তাকে গণেশ দেবতার অবতার বলে প্রচার করা হয়। তাকে পালন করবার জন্য বহাল হয় হরিজন নারী লছিমা। অতঃপর উপন্যাসটি লছিমার প্রতি এবং হরিজনদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের ধারাবাহিক অত্যাচারের চলচ্চিত্র। শেষে অবশ্য মহাশ্বেতা হরিজনদের বিদ্রোহ এবং অত্যাচারী গণেশের মৃত্যু দেখিয়েছেন। 'গণেশভগবান'কে হত্যা করে পিছিয়ে-পড়া বর্গের মানুষ তাদের উপর আরোপিত শাস্ত্রীয় শাসন এবং নিজেদের অন্ধ সংস্কারকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

উপন্যাসে অলৌকিক উপাদানের ব্যবহার সাধারণভাবে খুব সমর্থিত হয় না। কারণ উপন্যাস বাস্তব জীবনের কাহিনি। কিন্তু ভক্তি ও বিশ্বাস থেকে নয়, উপন্যাসের বাস্তবতাকে তুলে ধরবার প্রয়োজনেই অলৌকিতার উপাদানকে আধুনিক উপন্যাসে ব্যবহার করবার এক শিল্পকৌশল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্থে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে শতাব্দীর শেষ দুই দশকে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মহাশ্বেতা দেবীর 'টেরোড্যাকটিল পূরণ সহায় আর পিরথা' উপন্যাসটি এই শিল্পরীতির একটি তাৎপর্যময় নিদর্শন। মধ্যপ্রদেশে পিরথা নামে আদিবাসীদের এক গ্রাম আছে। সেখান থেকে এসেছে অলৌকিক সংবাদ—জীবন্ত এক প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী দেখা দিয়েছে সেই গ্রামে। খবরের তদন্ত করতে সাংবাদিক পূরণ সহায় সেই গ্রামে গিয়ে পরিচিত হল সেই আদিবাসীদের সঙ্গে। সত্যিই উড়ে এসেছে এক প্রাচীন টেরোড্যাকটিল। জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা তার মধ্যে দেখেছে নিজেদেরই পূর্বপুরুষদের সম্মিলিত আত্মাকে। নিজের সময় থেকে, পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এক আদিম সত্তা—একা, অসহায়, ক্ষুধাতুর। তার প্রাণ তাকে ধীরে ধীরে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই টেরোড্যাকটিলটিকে অসীম মমতায় নিরাপত্তা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে তারা। যে তরুণটি তাকে জল আর খাবার জোগায় সে অনুভব করে যে আদিবাসীদের যৌথ সত্তার এই শেষ অস্তিত্বের প্রাণ বিলুপ্ত হয়ে যাবেই। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এই বিপুল ট্র্যাজেডির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে তারা। সম্মিলিত অবসান, কিন্তু সেই অবসানের মধ্য দিয়েই নতুন রূপে জেগে ওঠার অন্তর্গত প্রস্তুতি।

মহাশ্বেতার ইতিহাসবোধ যে ক্রমে পুরাণ, মিথ কাহিনি—ইত্যাদির মধ্যে নিহিত যথার্থ ইতিহাসকে খুঁজে পেতে চাইছে তারই প্রমাণ 'ব্যাধখণ্ড'। তিনি এখানে আশ্চর্য বিন্যাসকৌশলে বাংলাদেশের মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক শাসন, সাধারণ জীবন, সে জীবনে উচ্চবর্ণের অবস্থান তারই সঙ্গে বাংলার যথার্থ ভূমিপুত্র অরণ্যনির্ভর আদিবাসী শবরদের অসহায়তা—বাস্তব করে তুলেছেন।

চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম কাহিনি আখেটিক খণ্ড এবং এই মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা মুকুন্দ তাঁর উপন্যাসের ভিত্তি। উপন্যাসটিতে মুকুন্দ ও তাঁর স্ত্রী উচ্চবর্ণের মানুষ হয়েও পিছিয়ে-পড়া শবর তথা ব্যাধদের সহানুভূতি এমনকী কিছুটা যেন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেও দেখেছেন। স্বীকার করেছে তাদের বিদ্যা, তাদের জীবনাচরণের সহজ বলিষ্ঠতাকে। সময় তাদের চুর্ণ করে দিচ্ছে; ইতিহাসের গতিকে তারা স্বীকার করতে পারেনি, তাই কেবলই অরণ্য উৎসাদিত হয় আর এই ব্যাধেরা চলে যায় নতুন অরণ্যের খোঁজে। মুকুন্দ সরল সৎ চরিত্রের মানুষ। কিন্তু তিনি ইতিহাসকে মেনে নিয়েছেন। তাই তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ আরড়ারাজের আশ্রয়ে এসে সমৃদ্ধির উৎস হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষটি হৃদয়হীন ছিলেন না। আশ্রয়চ্যুত, অধিকারচ্যুত ব্যাধদের দুঃখ তিনি অনুভব করেছিলেন। তাদের নিয়ে কাব্য রচনায় তাই কুণ্ঠা জাগেনি তাঁর মনে। এভাবেই ইতিহাস আর পুরাকাহিনির মিশ্রণে বাংলার আদি বাসিন্দাদের জীবন নতুন তাৎপর্য পেয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতে।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনি নিয়ে 'বেনে বউ' নামে আরও একটি উপন্যাস লিখেছেন মহাশ্বেতা। চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডে নারীর অবমাননা তার বিষয়বস্তু।

মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন ধরনের যে উপন্যাসগুলি আলোচিত হল তা থেকে বোঝা যায় যে বিষয় নিয়েই তিনি উপন্যাস লিখুন, যে শিল্পকৌশলই অবলম্বন করুন—তাঁর সমগ্র রচনাকর্মে সমাজের উপেক্ষিত, অবদমিত শ্রেণির প্রতি গভীর সহমর্মিতাই প্রধান প্রবণতা। এজন্য তিনি তথ্য সংগ্রহের কাজে এবং অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করেছেন গভীরভাবে। এখনও সৃষ্টিশীল মহাশ্বেতা দেবী স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের প্রধান লেখকদের অন্যতম।

৩.১৪ অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬)

অসীম রায়ের জন্ম পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারে। অল্প বয়স থেকেই শিক্ষা ও সাহিত্য-অনুরাগের পরিবেশ পেয়েছিলেন। দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলায় আসেন এবং বামপন্থী রাজনীতির প্রতি প্রথমাবধি আকৃষ্ট হন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই পাঠকের বিনোদন-উপকরণ জাতীয় উপন্যাসের পরিবর্তে বুদ্ধি ও বিশ্লেষণপ্রধান গভীর সমাজ-মনস্ক উপন্যাস রচনার কথা ভেবেছিলেন এবং সেই চেষ্টাও করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে সকলেই একমত যে চেতনাকে প্রদীপ্ত করে তোলে এমন উপন্যাসই তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র। প্রথম জীবনে কবিতা লিখেছেন; লিখেছেন বেশ কিছু ছোটো গল্প। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অসীম রায় বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকেন বিস্তৃত সমাজ-প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিমানুষের অবস্থানজনিত সংকট ও সংকট-উত্তরণ প্রয়াসের মানুষের ভাবনালোকের গভীরশায়ী তলকে স্পর্শ করবার চেষ্টা অনুভব করা যায়। তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'একালের কথা' (১৯৫৩), 'গোপালদেব' (১৯৫৫), 'একদা ট্রেনে' (১৯৭৬), 'আবহমান কাল' (১৯৭৬), 'অসংলগ্ন কাব্য' (১৯৭৩), 'দ্বিতীয় জন্ম' (১৯৫৭), 'শব্দের খাঁচায়' (১৯৭০), 'রক্তের হাওয়া' (১৯৬২), 'দেশদ্রোহী' (১৯৬৭), 'নবাব বাঁদী' (১৯৮১) ইত্যাদি।

'একালের কথা' তাঁর প্রথম উপন্যাস। ভারতের ইতিহাস ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল—এই তিন বছর সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে বাঙালি-জীবনে। দেশ বিভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার বিপন্নতায় বাঙালির জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে ওই সময়। দুই বন্ধু নিত্যগোপাল ও হাশেম উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব উপন্যাসের একটি অবলম্বন। সময়ের নিষ্ঠুর আবর্তে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার বলি হতে হয় হাশেমকে। মানুষ যখন মানুষের শত্রু, তখন অস্তিত্বের অর্থ কী—এই বেদনার্ত জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে শেষ হয়েছে উপন্যাস।

'গোপালদেব' উপন্যাসটি নিত্যগোপালের জীবনের পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে লেখা। একটি ত্রিপর্বিক উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন অসীম রায়। তাঁর শিল্পভাবনায় বৃহতের সন্ধান ছিল—এখান থেকেও তা বোঝা যায়। নিত্যগোপাল নিজের নামের পূর্বাংশ বর্জন করে শেষে দেব সংযুক্ত করে নিজেকে গোপালদেব নামে অভিহিত করেছে। নামটি নামমাত্র নয়, অতীত ইতিহাসে দেখা যায় গোপালদেবকে বাংলার মানুষ নির্বাচন করেছিল নিজেদের রাজা বলে। রাজা গোপালদেব জনজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এক সু-শাসকের নাম। অসীম রায়ের উপন্যাসের গোপালদেবও তার সমাজ-বোধ ও রাজনীতি-চেতনাকে জাগ্রত রেখে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে চারদিকের হতাশ ও ভেঙেপড়া জীবনের মধ্যে এক আনন্দময় জীবনবোধে পৌঁছোতে চেয়েছে। চারদিকের খণ্ডিত বিমুখ পরিস্থিতি তাকে মনে মনে সংকুচিত করছে, কিন্তু তার মধ্যেই নিত্যগোপাল তথা গোপালদেবের মনের অনুসরণে কোনো এক মহত্তর জীবনসত্তার সন্ধান উপন্যাসটিকে পৃথক তাৎপর্য দিয়েছে। পরবর্তী পর্ব 'একদা ট্রেনে' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুবোধ। মধ্যবিত্ত সুখী জীবনের আকাঙ্ক্ষা তার। তাদের সঙ্গে নিত্যগোপাল এবং তার দাদা সত্যগোপালের

সম্পর্ক ও তাদের ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং প্রগতিশীলতার ভাবনা কীভাবে তাদের স্পর্শ করছে, সেই ভাবনা কোথাও কোনো তাৎপর্য সৃষ্টি করছে কিনা—এমনই একটি প্রশ্ন এই উপন্যাসে অনুভব করা যায়। প্রথম দুই পর্বের মতো তৃতীয় পর্বটি ততটা সার্থক হতে পারেনি।

পুরোপুরি মহাকাব্যোচিত উপন্যাস লেখেননি অসীম রায়। কিন্তু এপিক-নভেলের উপাদান আছে তাঁর ‘আবহমান কাল’ উপন্যাসটিতে। দীর্ঘ তিন দশকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের এক বিবর্তনকে তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন এ উপন্যাসে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে ঐতিহাসিক নির্লিপ্ততা। এসেছে অসংখ্য চরিত্র, বহু মত ও বহু দলের সংঘাত। অনিন্দ্য বা টুটুল উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। জীবন ও সময়ের সংকটের মধ্য দিয়ে সে পথ হাঁটে। সময়টি হল ১৯৩০ থেকে ১৯৬০। অর্থাৎ স্বাধীনতাকে মাঝখানে রেখে বাঙালির জীবনযাপনের বিবর্তন। ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরীর পুত্রকন্যাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এ কালের জীবন। টুটুল মেধাবী ছাত্র বইয়ের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে সাম্যবাদের শিক্ষাগ্রহণ করে। রাজনীতির প্রকৃত শক্তি ঢুকে যায় তার চরিত্রের অন্তরতর স্তরে। লেখার মধ্যে টুটুল নিজেকে খুঁজে পায়। আত্মক্ষয়ী বিপ্লবের নাশকতায় তার ডানহাত অকেজো হয়ে গেলে সে তার প্রেমিকাকে বলে বাঁ হাতে লিখব। সমাজের বিচিত্ররূপী চেহারা তুলে ধরেছেন লেখক। সেখানে টুটুলের ছোটো ভাই চতুর বাণিজ্যিকতাকে আত্মস্থ করে বিত্তবান হয়ে যায়। তবু অনিন্দ্য বা টুটুলই অসীম রায়ের নায়ক।

‘অসংলগ্ন কাব্য’ উপন্যাসটি নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা। শিল্পকে কখনই রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন বলে ভাবতে পারেননি অসীম রায়। তবে, তিনি যে কমিউনিজম্-এ বিশ্বাসী ছিলেন, সেখান থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের রাজনীতিতে আস্থা স্থাপন করা সহজ নয়। তিনি তা করতে পারেননি। সত্তরের দশকের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার আখ্যানই তিনি লিখেছেন। তবে স্বীকার করেছেন বিপ্লবের প্রয়োজন, সমাজ বদলে দেবার গুরুত্ব এবং কৃষি-বিপ্লবের আবশ্যকতা। নকশালবাড়ি আন্দোলনকে এত স্পষ্টভাবে আর কোনো ঔপন্যাসিক কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাত করেননি। এই আন্দোলনের তাত্ত্বিকতার দিকটি এত গুরুত্বের সঙ্গে আর কোনো ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যাও করেননি।

‘দ্বিতীয় জন্ম’ উপন্যাসটি একটু অন্যরকম। এখানে মানুষের জীবনে মৃত্যুর আগ্রাসন হল মূল বিষয়। অন্যতম চরিত্র সুনীল ছিল সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু তার হয়েছে ক্ষয় রোগ। মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা, মৃত্যুর দর্শন আচ্ছন্ন করেছে তাকে। সুনীলের মা, তার বড়দা—সকলেই রোগজীর্ণ, যেন আছে মৃত্যুর অপেক্ষায়। পরিবারের অন্যদেরও যেন ঘটে গেছে মানসিক মৃত্যু। উপন্যাসটি অসীম রায়ের রচনাধারায় একটু ব্যতিক্রম।

‘শব্দের খাঁচায়’ উপন্যাসটি প্রবলভাবে বুদ্ধিবৃত্ত এবং বাংলা সাহিত্যে একান্ত অভিনব। মানুষের ভাষা কত বিচিত্র এবং কী রহস্যময় আর কত জটিল—বিভিন্নভাবে যেন এটাই তুলে ধরতে চান লেখক। ভাষার কত বিচিত্ররূপ—রাজনীতির ভাষা, অর্থনীতির ভাষা, সাংবাদিকের ভাষা, আইনজীবীর ভাষা, মন্ত্রীর ভাষা, প্রেমিকের ভাষা—সব একই বাংলা ভাষা হয়েও পরস্পরের কী বিপুল পার্থক্য! শব্দকে যে আয়ত্ত করেছে সমাজে তার সম্মানের জায়গা বাঁধা। ভাষা আর মানুষের সম্পর্ক সন্ধানের এই বিচিত্র উপন্যাসটি অসীম রায়ের কল্পনা-প্রতিভার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন ‘নবাব বাঁদী’ নামে ইতিহাস-চিত্রণময় ভিন্ন ধরনের একটি উপন্যাস—পটভূমি অষ্টাদশ শতাব্দী।

অসীম রায় ঔপন্যাসিক হিসেবে খুব বেশি পরিচিতি অর্জন করতে পারেননি সাধারণ পাঠকের কাছে। কারণ তাঁর মনোভঙ্গি পুরোপুরি সু-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠেছে। তাঁর ভাষা এবং ভাবনা কোনোটাই সাধারণ শিক্ষিত, সাহিত্য-বিনোদন-পিপাসু গণপাঠকের কাছে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্ত উপন্যাসের ধারায় তাঁর রচনা বহুমূল্য সংযোজন।

৩.১৫ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-)

মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে ১৯৩০ সালে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম। পিতা সৈয়দ আবদুর রহমান ফিরদৌসী ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী; মা আনোয়ারা বেগম ছিলেন লেখিকা। পরিবারে শিক্ষা-সংস্কৃতির আবহ ছিল প্রথম থেকেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সংযোগ ছিল বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে। ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের লোকনাট্য আলকাপের দলের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল পরবর্তী কালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় যোগ দেন এবং নিয়মিত গ্রন্থ প্রকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন। ফলে বহু ধরনের উপন্যাস তিনি লিখেছেন। যে সব উপন্যাস কেবল পাঠকচিত্ত বিনোদনের জন্যে রচিত; তাদের মধ্যে আছে অনেক গোয়েন্দা উপন্যাস এবং ছোটোদের জন্যে লেখা অনেক আখ্যান।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সেই উপন্যাসগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যেগুলি তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রকৃতি, মানুষ, এবং সীমান্ত অঞ্চলের বিপজ্জনক প্রবণতা নিয়েই তাঁর উপন্যাস। তাঁর অধ্যয়ন ও বৈদগ্ধ্যের পরিসীমা বহু বিস্তৃত। অভিজ্ঞতা, অধীত বিদ্যা, ইতিহাসবোধ ও জীবনদর্শনের সমন্বয়ে 'অলীক মানুষ' নামের যে উপন্যাসটি তিনি লিখেছেন সেটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এক উপন্যাস বলে অভিহিত করা যায়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের যে উপন্যাসগুলিকে আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরব, সেগুলি হল—'তৃণভূমি' (১৯৭১), 'পেছনের আততায়ী' (১৯৮৩), 'মায়া মৃদঙ্গ' (১৯৮৪), এবং 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮)।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসগুলিকে অনেকে গ্রাম-পটভূমিতে লেখা এবং নগর-পরিবেশে লেখা—এইভাবে ভাগ করেন। অঞ্চল-পটের দিক থেকে এই বিভাজন অযৌক্তিক নয়। তবে তাঁর উপন্যাসের প্রকৃত পটভূমি হল সমগ্র জীবন। গ্রাম অথবা নগর—দু-দিক থেকেই মানুষের পথ এসে মেলে সেই বৃহৎ বিস্তারে। 'অলীক মানুষ' সেই বিশালতারই আখ্যান-রূপ। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'নীলঘরের নটী' (১৯৬৬)। প্রথম পর্বের আর একটি উপন্যাস 'কিংবদন্তীর নায়ক'। কিন্তু এই পর্বের 'তৃণভূমি' নামক বিস্তৃত পটভূমির উপন্যাসটিতে তাঁকে বিশেষভাবে চেনা যায়। পটভূমি মুর্শিদাবাদের লোকজীবন; দ্বারকা নদীর দুই তীরের বসতি, হিজরোল গ্রাম পেরিয়ে সোনাটিকুরির মাঠ। এই নদীতীর, গ্রাম, মাঠ আর তৃণভূমির বর্ণনায় লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার সত্য নিবিড় হয়ে আছে। নিজের চোখে দেখা ছবি, কানে শোনা শব্দ আর ঘাসের শিশির, রোদের তাপ, গোরুর খুরের ধুলো, বেড়ার গাছের কাঁটা—ইত্যাদি এমনভাবে উঠে আসে যে পাঠক যেন নিজেই নিজের অভিজ্ঞতাতে পেয়ে যান এই সব কিছু। কিন্তু উপন্যাসটিতে অঞ্চলের মানুষ ও তাদের জীবনের বিবর্তন প্রধান হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের নায়ক নিশানাথ অঞ্চলের আধা-জমিদার আদিনাথ চৌধুরীর ছেলে। নিশানাথকে ঘিরে তার বাবা, বিমাতা, গ্রামের বিচিত্র স্তরের মানুষ, গ্রামে আগত নগরবাসীরা আবর্তিত হয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা অন্তরের মধ্যে লালন করে রহস্যময় হনন-ইচ্ছা। বিরোধী পক্ষকে তারা হত্যা করতে উদ্যত হয় যে কোনো সময়। হত্যা, মৃত্যু আর আত্মহত্যা বার বার সংঘটিত হয় তাঁর উপন্যাসে। ব্যক্তির অন্তঃচরিত্র যেন বশ না মানা হিংস্র পশুর মতো। সে ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু যখন জাগে তখন রক্তের স্বাদ চায়। জীবনের অন্তর্গত হিংস্রতাকে শিল্পরূপ দিতে পারেন লেখক। এমন হতে পারে যে দুই রাষ্ট্রে সীমান্ত অঞ্চল মুর্শিদাবাদে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরিমণ্ডল এত তীব্র যে, খুন-জখম সেখানে প্রায় নৈমিত্তিক বলেই মানব-স্বভাবের এই দিকটার পরিচয় লেখককে ভাবায়।

আদিনাথের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সরযূ নিশানাথকে চাবুক মারে, নিশানাথ পিতা আদিনাথকে মারতে বন্দুক তোলে, আদিনাথ আত্মহত্যা করে বন্দুকের গুলিতে। জঙ্গলের মধ্যে রাখাল কবিরাজের মৃত্যু হলে কেউ বলে শঙ্খচূড়ের দংশন, কেউ বলে খুন। সুখময় বসু পরামর্শ করতে আসে ডাক্তার পরমেশ চ্যাটার্জির সঙ্গে। পরমেশের নাতনি

মাধবী সুখময়কে ভালোবেসেছিল বলে মাধবীর বাবা সৌমেন মেয়েকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে। শহর থেকে গ্রামে এসে ফার্ম বানায় বিত্তবান শুভেন্দু আর গ্রামের বড়োলোক পরাশর। গ্রামের মানুষের সঙ্গে বাধে তাদের সংঘর্ষ। শেষকালে শুভেন্দুকে গুলি করে মারে নিশানাথ। একটি উপন্যাসে এতগুলি মৃত্যু আর হত্যা সত্যিই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এমন করে সেগুলিকে বিবৃত করেন, যেন তা প্রকৃতির জীবনধারারই অঙ্গ। সেগুলির সাংসারিক বাস্তবতা নিয়ে পাঠকের মনে তেমন প্রশ্ন ওঠে না। এ ছাড়াও উপন্যাসটির সময়কাল ১৯৬৭ বলে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার ছায়াপাত ঘটেছে উপন্যাসটিতে।

গোপন হত্যা, হত্যারহস্য এবং রহস্যের উদ্‌ঘাটন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসে জীবন-উপলব্ধির অংশ রূপে বার বার আসে বলে তাঁর বহু লেখাতে এই হত্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বোনা হয়েছে কাহিনি। সেদিক থেকে এক ধরনের রহস্য উপন্যাসের ছকের মধ্যে তাঁর একটি স্বাভাবিক বিচরণ আছে। 'পেছনের আততায়ী', 'রানীর ঘাটের বৃত্তান্ত'— ইত্যাদি উপন্যাসে তার দৃষ্টান্ত দেখি। কিন্তু 'তৃণভূমি' উপন্যাসে মানুষের মহত্তর জীবনবোধের সঙ্গে এই হত্যা বিষয়টিকে লেখক প্রগাঢ় শিল্পমাত্রায় মেলাতে পেরেছেন।

লেখকের একটি উপন্যাসের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে যেটি নগর-পটভূমিকায় লেখা। প্রথমে নাম ছিল 'প্রেম ঘৃণা দাহ'; পরে নাম হয় 'লাল নক্ষত্র'। এই উপন্যাসের প্লট নির্মাণেও আছে কিছুটা বৈশিষ্ট্য। চারজন নারী—রুচি, অশ্রু, বিবি এবং ঋতু। বিবির ভালো নাম বৈজয়ন্তী। বয়সেরও পার্থক্য আছে—বিবি বয়স্ক, তার ছোটো অশ্রু, তার পরে ঋতু এবং রুচি। ঋতু মুসলমান। অশ্রু খ্রিস্টান। চারজনই থাকে মেয়েদের একটি মেসে। রুচির বয়স মাত্র আঠারো। এই চারটি চরিত্রের অন্তর্গত চিন্তাস্রোতের প্রবহমানতাকে তুলে ধরা এই উপন্যাসের গঠনের বৈশিষ্ট্য। চেতনাপ্রবাহ রীতির ব্যবহার আছে। এই চারজন মেয়ে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমন মোটেই নয়। চারটি চরিত্রই স্বতন্ত্র। তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আকর্ষণ, আদর্শ আর জীবনযাপন—সবই আলাদা। তারা নিজেদের নিয়ে ভাবে, অন্যদের নিয়েও ভাবে। অনেক সময় একজনকে অন্যজনের ভালো লাগে না। এ জন্যই উপন্যাসের নাম ছিল 'প্রেম ঘৃণা দাহ'। রুচির রিসেপশনিস্ট-এর চাকরি তাকে বিপথে নিয়ে যায়। সামাজিক সমর্থন ছাড়াই শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। অথচ সে সত্যিই স্বার্থপর ধরনের চরিত্র নয়, সুবিধাবাদীও নয়, কেবল অন্য রকম একটি মেয়ে। জীবন তার কাছে জিজ্ঞাসা আর সংশয়ের সমষ্টি। ঋতুর পরিণতি করুণতম। ক্যানসার হওয়াতে তাকে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়। মৃত্যুর আগে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে আঁকড়ে ধরেছিল মাঠের সজীব ঘাস। অশ্রুর জীবন ছিল রিক্ত এবং শূন্য। সে খানিকটা দার্শনিকতার মনোভঙ্গিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চায়। সবার বড়ো বিবি শান্ত, স্নিগ্ধ সকলের নির্ভর। কিন্তু সে স্বামীবঞ্চিত; মনের মধ্যে অ-তৃপ্ত কাম নিয়ে বাস করে। এই উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন ধর্মের চারজন নারীকে দেখিয়েছেন কিন্তু ধর্মীয় পরিচয় কোথাও প্রাধান্য পায়নি। মানুষগুলি পুরুষ না নারী সেটাই হয়ে উঠেছে শেষকথা। এ ভাবেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মানুষকে দেখেন।

সব শেষে 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটির কথা বলা যায়। এই উপন্যাস ভারতীয় মুসলমান সমাজের দুশো বছরের ইতিহাসের এক সংহত প্রতিবিম্ব। ভারতের মুসলমানরা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাস করছেন এ দেশে। প্রথমাবধি তাঁদের মধ্যে আছে বিভিন্ন সামাজিক স্তর। দেশের শাসক মুসলমান, অভিজাত শ্রেণির মধ্যে অনেকে মুসলমান। কিন্তু মধ্যবিত্তদের মধ্যে মুসলমান কম। দরিদ্র মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগ থেকে ইংরেজের হাতে রাজত্ব চলে যাবার ফলে মুসলমান সমাজে দেখা দিল নানা ধরনের অ-স্থিরতা। এক দিকে তারা নিজেদের রীতিনীতি সংস্কারকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চাইল জাতিধর্মের গৌরবে; অন্যদিকে আধুনিক জীবন, আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হল তাদের। সেই সংঘাত ইংরেজের সঙ্গে, সংঘাত হিন্দুর সঙ্গে, আবার নিজেদের সমাজেরও বিভিন্ন স্তরে। এরই মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় সময়। উনিশ শতকের ফরায়েজি এবং ওয়াহাবি আন্দোলন, হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণের আন্দোলনের সঙ্গে সংঘাত, জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের পরিস্থিতি; ব্রাহ্মদের উত্থান এক দিকে পিরতন্ত্র, আর একদিকে শুদ্ধ আদি ইসলামে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন, অন্যদিকে আধুনিকতার আকর্ষণ। উনিশ শতক এবং বিশ শতক, ভারতের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল, নকশাল আন্দোলনের কাল পর্যন্ত এই উপন্যাস বিস্তৃত। কিন্তু উপন্যাসটিতে সময়-অনুক্রমিক বিবৃতি নেই। এক এক সময় এক এক জনকে কথন-বৃত্তের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এবং তাঁর সময়কে তুলে ধরা হয়েছে। মিশে গেছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দু-জন মানুষ—পিতা ও পুত্র উপন্যাসটির দুই কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। একজন বদিউজ্জামান, ফরায়েজি আন্দোলনের সমর্থক। তিনি একজন ধর্মগুরু, ধর্মীয় অ-লৌকিকতায় বিশ্বাসী। তাঁর পুত্র সফিউজ্জামান পড়েছিল মক্তব মাদ্রাসায় নয়, ইংরেজি স্কুলে। শিখেছিল ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, পালি। সে নাস্তিক। সে বিদ্রোহী এবং সে কোনো শাসন মানে না। মানুষ সম্পর্কে পিতা ও পুত্র দু-জনের ধারণা সম্পূর্ণ দু-রকম। মানুষ প্রকৃতপক্ষে কী? মানুষ নিজেকে যেভাবে গ্রহণ করে, নিজেকে যা ভাবে—মানুষ তাই-ই। এ জন্যই লেখক উপন্যাসটির নাম দিয়েছেন 'অলীক মানুষ'। তিনি নিজে অলীক মানুষ বলতে 'মিথিক্যাল ম্যান', অর্থাৎ 'পুরাণ মানব' বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ মানুষকে নিয়ে মানুষ নিজে, এবং অপর মানুষেরা যে সমূহ মিথ গড়ে তোলে, মানুষ হচ্ছে তাই-ই। দুটি চরিত্রই অ-সামান্য কুশলতায় প্রাণময় হয়ে উঠেছে লেখকের কলমে। নারী চরিত্রগুলি যদিও পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল, তবু তাদের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য তাদের আলাদা মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। বিশেষত বদিউজ্জামানের স্ত্রী সাইদাকে তার প্রগাঢ় সুখ-দুঃখের স্পন্দন নিয়ে কিছুতেই যেন ভোলা যায় না। 'অলীক মানুষ' একই সঙ্গে দেশের, কালের, ইতিহাসের এবং ব্যক্তির উপন্যাস। প্রতিটি স্তরই উজ্জ্বল হয়ে থাকে, অ-বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, আবার স্বাতন্ত্র্য-দীপ্তও হয়ে থাকে। উপন্যাসের শেষে লেখক তাঁর নিজের মানবতাবোধকে প্রচ্ছন্ন রাখেন না। তাঁর মানুষ জাতি-ধর্ম-দেশ-কাল-রাজনীতির দ্বারা চিহ্নিত মানুষ নয়। সে এক মানবতাবাদী মানব। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষভাবে সফল হয়েছেন এই ধরনের উপন্যাসেই। যেখানে তিনি দেশকালের সত্যতার সঙ্গে মানুষকেও তার শুদ্ধ মননের সত্যতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। যে মানুষ জাত-ধর্ম নিয়ে ভাবে না সে-ই প্রকৃত মানুষ। অলীক মানুষ নয়। লেখকের জীবন-দর্শন এখানেই পরিস্ফুট।

৩.১৬ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম খুলনায়। আদি বাড়ি বরিশাল। মধ্যবিত্ত পরিবার কিন্তু পরিবারে স্বাধীনতা-সংগ্রামী সদস্য ছিলেন, আবার ছিলেন যাত্রাভিনেতা পিতামহ। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় পূর্ব বাংলায় সেই ভৈরব নদের প্রান্তে স্থিত খুলনা জেলা স্কুলে। কলকাতার কলেজে ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলায় চলে আসা পরিবারে অর্থ সংকটের কারণে স্কুলের শিক্ষকতা থেকে ইস্পাত কারখানার ফারনেস-কর্মী হিসেবেও কাজ করেছেন। পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'অমৃত' এবং 'আজকাল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন ১৯৬০ সাল থেকে অবসর নেবার কাল পর্যন্ত। বিভিন্ন সময় স্ব-নামে ও ছদ্মনামে (বলরাম, বৈকুণ্ঠ পাঠক) নানা ধরনের ফিচার লিখেছেন। মাছের চাষ, গো-পালন, বাগান তৈরি—বিভিন্ন ধরনের চাষের কাজের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে ভালোবাসতেন। আবার কলকারখানা, মোটরগাড়ি সারাই ধরনের কাজেও আগ্রহ ছিল। প্রায় পঞ্চাশটি উপন্যাসের লেখক; এইসব বিচিত্র বিষয় স্থান পেয়েছে উপন্যাসে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আলোচনার সূত্রে তাঁর লেখক-পরিচয় তুলে ধরা হবে। উপন্যাসগুলি হল, 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬), 'সওদাগর' (১৯৮১), 'হাওয়াগাড়ি' (প্রথম খণ্ড ১৯৭৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৯), 'শাহজাদা দারাশুকো' (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯১)।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'বৃহন্নলা' (১৯৬১, পরে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' নামে পরিচিত)। উপন্যাসের নায়ক প্রমথ মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার যুবক। তার প্রেমের ভবিষ্যৎ নেই। নিজেকে সব সময় সে পাঁক অবধি

ডুবে থাকা এক মহিষের মতো মনে করে। গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস নয়। ষাটের দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তের হতাশাগ্রস্ত মনের প্রতিফলন এখানে আছে। কিন্তু 'কুবেরের বিষয় আশয়' থেকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজের শিল্পী-প্রতিভার গভীরতাগুলিকে অনুভব করতে থাকেন, এবং টেনেও আনতে থাকেন বাইরে। কুবের এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাড়ির সন্তান। সাধারণ চাকরি করে। কিন্তু স্বপ্ন দেখে জমি কিনে পরিবারের সকলকে নিয়ে নিজের নামে গড়ে তুলবে নগর। কুবেরের এই আকাঙ্ক্ষার প্রসারণ এবং সেই অনুসারে তার বিস্তর জমিজায়গা কেনা—যেখানে আছে মাটি, নদী, পুরোনো দুর্গ, বিশাল চর, বিশাল আবাদ—তার মধ্যেই ধীরে ধীরে কুবেরের মগ্ন হয়ে যাওয়া এই নিয়েই উপন্যাস।

ক্রমেই কুবের সাধু খাঁ জল-জঙ্গলের মানুষ হয়ে ওঠে। পরিবারের সকলকে ভালোবাসলেও সে এক আশ্চর্য টানে চলে যেতে থাকে দূর। মনের মধ্যে তার আরও চাহিদা—নারীর জন্য, প্রেমের জন্য, শিশুর জন্য আর ভূ-সম্পত্তির ওই আশ্চর্য আকর্ষণ। এই আকর্ষণের রহস্যময় রূপচিত্র এঁকেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কুবেরের স্বপ্ন দেখা দৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

কিন্তু নেশা, নেশাই। ক্রমশই তাকে নাগপাশে বাঁধতে থাকে তা। সারা শরীরে ছড়িয়ে যায় অদ্ভুত ধরনের কালো দাগ। কিছু কিছু রহস্যময়তার স্পর্শ নিয়ে আসা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনার কৌশল। এই নেশায় শিথিল হয় তার সংসারবন্ধন, নারীর নেশা এসে জড়ায় তাকে। কিন্তু কোনো কিছুতেই তার অন্তরের শূন্যতা দূর হয় না। ধনতন্ত্রের বিপুল বিস্তার যেমন মানুষকে অন্তরের দিক থেকে অ-পূর্ণ রাখে, তেমনই নেশাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, শূন্যতাবোধে আক্রান্ত কুবের চাঁদ ধরতে গিয়ে প্রাচীন দুর্গের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। এই উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ ওই জল-জঙ্গল মাটির রহস্যে বাঁধা জীবনের বিচিত্র ছবি।

'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনাথবন্ধু বসু। নিতান্ত মধ্যবিত্ত মানুষ, বয়স উনচল্লিশ। অফিসে আঠারো বছর চাকরি করবার পর সে এক মাঝারি মাপের কেরানি। কিন্তু অফিসের কাজের জন্য রোজ কলকাতায় গেলেও তার মন পড়ে থাকে তার গ্রাম ঈশ্বরীতলায়—যেখানে পাতিহাঁস, রাজহাঁস, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, গোরু, বাছুর, আর মুরগি নিয়ে তার বিশাল সংসার। এই ঈশ্বরীতলার বাড়িই তার অন্তরের আশ্রয়। তার স্ত্রী আছে, কন্যা আছে, কাজের লোকজন আছে। কিন্তু এই প্রকৃতি আর পশুপাখি নিয়ে তার অন্তরের যে অনির্বচনীয় আনন্দ তার সন্ধান অপর লোকে পায় না। অনাথবন্ধুর চরিত্রের এই ভালোবাসাকে অবলম্বন করে একটি প্রতীকী অলৌকিকতা এখানেও এনেছেন লেখক। সে পশু-পাখির কথা বুঝতে পারে এবং পশু-পাখিরাও বোঝে তার কথা। গল্প এইটুকুই। অনাথবন্ধু সাধারণ হয়েও অ-সাধারণ।

মফস্‌সল শহর বা আধাগ্রামের এক ধরনের ভূমিপট রচনার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। ফসল, মাঠ, নদী, গাছ, আকাশ, চাঁদ, ঘাস,—সব কিছুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন। তাঁর বর্ণনায় প্রকৃতি সত্যিই কথা বলে মানুষের সঙ্গে। অঞ্চলের পথ-ঘাট, পাড়া-গলি, ভাঙাবাড়ি, কারখানার শেড কিংবা বস্তি—এই মানচিত্র নিজেও যেমন জীবন্ত দেখতেন, তেমনই পাঠককেও অনুভব করাতে পেরেছেন। মানুষ এবং প্রকৃতির যে নিবিড় নৈকট্য তিনি মূর্ত করে তুলতে পারেন, তাঁর আগে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেই কেবল তা পেয়েছি। দুই লেখকের ভাষা আলাদা, কিন্তু প্রকৃতি-ভালোবাসার ধরনটি একই রকম। আর একটি পার্থক্য এই, বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে দেখেন আধ্যাত্মিক আশ্রয়। আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দেখেন আদিম জান্তব প্রাণধর্মের প্রসুপ্ত শক্তি। যে কোনো সময় সে ফুঁসে উঠতে পারে আহত ডাইনোসরের মতো। এই মানসিকতার একাধিক উপন্যাসই তিনি লিখেছেন। যেমন 'চন্দনেশ্বর জংশন' 'স্বর্গের আগের স্টেশন'—ইত্যাদি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকটি আমাদের আকর্ষণ করে। 'সওদাগর' নামের উপন্যাসটিতে মানুষের অর্থ-লোভের বিচিত্র এবং ভয়ংকর ছবি ফুটে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তরকাল থেকেই পণ্য-শাসিত বিশ্বায়নের পথ খুলে গিয়েছিল। ভোগ্যপণ্যের অভ্যাসকে কেবল স্বাভাবিক নয়, সমুচিত মনে করা এখন প্রায় জীবনাদর্শ বলে গণ্য।

মানুষের রক্তে নিহিত ভোগ-বাসনা, বিত্ত-বাসনা, লোভ আর আত্মকেন্দ্রিকতা এখন স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়। এই লোলুপতার ফলে মানুষ কিন্তু সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যায়। মানুষের লোভের দুর্বলতাকে অবলম্বন করে চতুর ব্যবসায়ী সুদে টাকা বাড়িয়ে দেবার ব্যবসায় মানুষকে টেনে আনে এবং এক সময় তাকে একেবারে রিক্ত করে দেয়। সাধারণ মানুষের এই দুর্বলতা নিয়ে ব্যাবসা করে যারা, এই উপন্যাসে তাদের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে একজন ব্যক্তি; রবীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যাংকের চেয়ারম্যান। একজন সৎ মানুষ। তার চেয়েও বড়ো কথা—তিনি বোঝেন কোন পদ্ধতিতে একটি দেশের প্রকৃত বিত্ত সঞ্চিত ও বর্ধিত হয়। তিনি চান মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখুক। কিন্তু চতুর অর্থ-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহজে এঁটে ওঠা যাবে না। তাই তিনি গোয়েন্দার মতো ওই অ-সাধু অর্থ-ব্যবসায়ীদের জালিয়াতি ফাঁস করে দেবার চেষ্টায় নামলেন। কিন্তু পরিণামে তাকে কৌশলে হত্যা করে সেই অ-সাধু ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি ভবেন বসু। ততদিনে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন কোনো লেখাপড়া ছাড়াই এত মানুষ তাদের কষ্টসঞ্চিত অর্থ কেন তুলে দিচ্ছে এইসব প্রাইভেট ইন্‌ভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে। অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের এই দেশের মানুষ বিনা পরিশ্রমে টাকা উপার্জনের নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করতে পারে না বলেই এই ব্যাবসা চলে। ‘সওদাগর’ উপন্যাসে লেখক অশুভ শক্তিকে জিতিয়ে দেন কিন্তু তাকে হতাশা না বলে মানব-চরিত্রের বাস্তবতা বলাই সংগত। অন্যায় লোভকে মানুষ তো জয় করতে পারেনি কোনো দিন। উপন্যাসটিতে মানব-চরিত্রের এই আত্মদর্পণ ভয়াবহ কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য হিসেবে দেখা দেয়।

অন্য ধরনের একটি উপন্যাস ‘হাওয়া গাড়ি’। তাঁর উপন্যাসের বৈচিত্র্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। কখনও কারখানা-কোলিয়ারি, কখনও ঘর-বাড়ি বিষয়-আশয়, খেলার জগৎ, মাঝি-জেলে, চাষির জীবন—ইত্যাদি। অনেক সময় তাঁর উপন্যাসগুলির নায়ক চরিত্রদের সাদৃশ্য আছে। তারা গৃহ-পরিজনকে ভালোবাসে, কিন্তু মনে মনে তারা বৃহৎ কিছু গড়ে তোলবার নেশার টানে নিবেদিত। ‘হাওয়া গাড়ি’ উপন্যাসের নায়ক দিলীপ বসু প্রথমে কয়লাখনি, পরে গাড়ি কেনা-বেচার ব্যাবসাতে জড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে তার নেশাটি কিছু বিচিত্র। পুরোনো এবং ফেলে রাখা গাড়ি কিনে, সারিয়ে বাতিল গাড়িগুলিকে নিজস্ব মর্যাদায় দাঁড় করানোই তাঁর নেশা। যা জীর্ণ, তাকে আবার ব্যবহার-যোগ্যতায় দাঁড়াবার জায়গায় ফিরিয়ে দেবার মধ্যে জীবন গড়ার এক নেশা আছে। দিলীপ বসু সেই নেশাতেই মগ্ন। এখানেও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একটি ভাঙা গাড়ির মৃত চালককে প্রেত রূপে নিয়ে এসেছেন উপন্যাসটিতে। আধুনিক উপন্যাসে অ-লৌকিককে ব্যবহার করবার রীতি নতুন করে দেখা দিয়েছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

‘শাহজাদা দারাশুকো’ লেখকের বহু প্রশংসিত উপন্যাস। ইতিহাসের প্রতি চিরকালই তাঁর আকর্ষণ। মোগল ইতিহাসের চরিত্রদের কখনও তিনি রূপায়িত করেছেন; কখনও গান্ধি, নেহরু, জিন্না হয়েছেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্র। ইতিহাসে দারাশুকো খুব প্রধান চরিত্র নন। এক প্রশাসনে হিন্দুস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করবার স্বপ্ন দেখছিলেন আকবর। রাজকীয় শক্তিবলে সমস্ত দেশকে অধীন রাখতে চেয়েছিলেন শাহজাহান। কিন্তু দারাশুকোর চোখে ছিল এক ভিন্ন হিন্দুস্তানের স্বপ্ন। তিনি চেয়েছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ী ঔদার্যের বন্ধনে বাঁধা হিন্দু-মুসল্‌মান-খ্রিস্টান-পারসিক সব মানুষের সম্মিলিত হিন্দুস্তান। কিন্তু প্রেমের বন্ধনে মানুষকে বাঁধবার স্বপ্ন প্রায়শই সফল হয় না। তাঁর ক্ষেত্রেও হয়নি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের মুখবন্ধে লিখেছেন—“শাহাজাদা দারাশুকো হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমানের ধর্মচিন্তায় মিলন বিন্দুটি খুঁজতে গিয়ে সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যান। তাই তিনি হিন্দুস্তানের ইতিহাসে একটি কালো গোলাপ। ব্যথা, সৌন্দর্য, কালের ইতিহাসের সঙ্গে এই গোলাপ জড়িয়ে গেছে।”....—এই জন্যেই দারাশুকো হয়েছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নায়ক। ভালোবাসার এক দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিতে, জীবন-ভাবনার বৈচিত্র্যে, এবং জীবন-দৃষ্টির গভীরতায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এক অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক। তাঁর রচনা-কৌশলের বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কিংবা বিমল করের মতো বিবৃতির রীতি তাঁর একতম রীতি নয়। খুব সহজেই তিনি মিশিয়ে দিতে পারেন বিবৃতি আর

সংলাপ; চিত্রধর্ম আর নাট্যধর্ম; বাস্তব, প্রতীক আর অ-লৌকিকতা। মানুষকে ঘিরে থাকা পার্থিব জীবন বাস্তবেরই প্রকাশ। কিন্তু তার খাঁজে খাঁজে বহু রহস্যের আলো-ছায়া চমকায়। শিল্পের নির্মাণে সেই অ-ধরা আভাসগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য শিল্পী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রহণ করেছেন অ-লৌকিক উপাদানকে প্রয়োগ করবার কৌশল। প্রযুক্তির নৈপুণ্যে তা অসামান্য হয়েছে। এই অ-লৌকিক অ-বাস্তব নয়। বাস্তবেরই ভিন্ন মুখ—যা জীবনের নিহিত রূপকে চেনায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে বাংলা উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব সিংহাসনে বহুকাল আসীন থাকবেন।

৩.১৭ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-)

ঢাকা জেলার রাইনাদি-হিজাদি গ্রামে ১৯৩৪ সালে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পূর্ববাংলার নদী এবং শ্যামল প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে। তাঁর কথাসাহিত্যে এই নৈকট্যের যথেষ্ট পরিচয় উঠে এসেছে। দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলায় এসে আরও পাঁচটি উদ্বাস্তু পরিবারের মতোই কঠিন জীবন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন জীবিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য জাহাজের নাবিকের বৃত্তি গ্রহণ। বাংলা সাহিত্য কিছু বেশি পরিবার-জীবন এবং সামাজিক-জীবন নির্ভর। ঘরের বাইরের যে পৃথিবী, তার বিশালত্ব মানুষের জীবনের গৃহ-বহির্ভূত অ্যাডভেঞ্চার—এসবের কোনো কিছুই বাংলা উপন্যাসে বিশেষ স্থান পায় না। বাঙালি লেখকেরাও সাধারণত ওই নিরাপদ গৃহজীবন যাপন করেন বলেই বাইরের জীবন এমনকী কর্মসূত্রেও বাংলা উপন্যাসে ততটা পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন এবং তাঁর রচিত উপন্যাস দুই-ই বাংলা উপন্যাসের ধারায় কিছুটা ব্যতিক্রম।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আমরা দুটি বিষয়বস্তু পাই। সেই বিষয়বস্তুকে ঘিরে মানুষের চিন্তন-মনন-আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি হল একদা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, পরে পূর্ব বাংলা ত্যাগ-করে-আসা হিন্দু বাঙালির স্মৃতিতে সেই স্বদেশের প্রীতি-মধুর চিত্রের উদ্‌ভাসন। এইভাবে প্রাক্-দেশবিভাগ অবিভক্ত বাংলার নদীবিধৌত পূর্ব প্রান্তের গ্রামজীবনের রূপ এবং এক ধরনের যৌথ জীবনধারা সযত্ন চিত্র তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। আর একটি দিকও তাঁর উপন্যাসে ফুটে ওঠে। উদ্‌বাস্তু মানুষ নতুন করে ঘর বাঁধছে অচেনা কোনো এলাকায়, নতুন পাওয়া কোনো জমিতে। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিতে হচ্ছে নতুন করে। যে জমিতে পূর্বপুরুষদের বাসের কোনো স্মৃতি নেই, সেই জমিকেই স্বভূমি করে তোলবার সাধনা তার। প্রতিদিন নতুন একটি ঘর তোলার জন্যে একটি বাঁশ জোগাড় করা, অথবা একটি চারাগাছ লাগানো—এর ভেতর দিয়েই গড়ে ওঠে মানুষের নতুন স্বদেশ। ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানব জীবনের এই বাস্তুহারা হওয়া এবং বাস্তু গড়ে তোলার রূপকার হিসেবে পাঠক মনে রাখেন। তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি উপন্যাসের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৭১); 'অলৌকিক জলযান' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৭৫); এবং 'ঈশ্বরের বাগান' (১৯৮১)। এই তিনটি উপন্যাস একই পরিবার এবং একই চরিত্রদের নিয়ে লেখা। একটিই কাহিনির সম্প্রসারণ। এ-ছাড়াও আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মানুষের ঘরবাড়ী' (১৯৭৮)।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটির জন্যেই পাঠক তাঁকে বিশেষভাবে চেনেন। বিশাল উপন্যাস। শীতলক্ষ্যা আর মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে অনেক গ্রাম-মাঠ-খাল-বিল-চর। সমগ্র অঞ্চলটিতে হিন্দু ও মুসলমানেরা মিলিতভাবে থাকেন। ধনী, মধ্যবিত্ত এবং গরিব। কলকারখানা নেই। সব শ্রেণির মানুষেরই জীবিকার অবলম্বন ভূমি এবং কায়িক শ্রম। এই গ্রামগুলির মধ্যে একটি গ্রাম—রাইনাদি লেখকের অবলম্বন। উল্লেখ্য যে লেখকের নিজের গ্রামেরও এই নাম ছিল। উপন্যাসটি কেবল স্মৃতি-নির্ভর নয়, লেখকের জীবনের বেশ কিছুটা প্রতিফলনও এতে আছে।

উপন্যাসের কেন্দ্র এক সচ্ছল পরিবার। গৃহকর্তা মহেন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী, চার পুত্র, দুই পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনিদের নিয়ে সংসার। বৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক আর বালক-বালিকা—এই তিন প্রজন্ম কেমনভাবে জড়িয়ে আছে সমগ্র পট-পরিবেশের সঙ্গে—তাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। উপন্যাসের গঠন সরল ও বিবৃতিমূলক। লেখাটিতে বালক সোনার দৃষ্টিকোণ কিছু বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এই প্রথম অংশে চরিত্রগুলি স্বাধীনভাবে মূর্ততা পায়।

উপন্যাসটির বয়নরীতিতে আছে দুটি স্তর। একটি স্তরে বর্ণিত হয়েছে মহেন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনযাত্রা, তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিদেশিনীর প্রতি প্রেম, জোর করে তার বিবাহ দেওয়া, বিবাহের পর তার উন্মাদ হয়ে যাওয়া; আর এক পুত্রের নিরীহ সাংসারিক জীবনযাপন; অপর এক পুত্রের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া—এই সব নিয়ে তার পরিবারে সংকট দেখা দেয়। অন্য দিকে ছোটোরা বড়ো হয়ে উঠছে; কিশোর-কিশোরীদের মনে জাগছে ভালোবাসার তরঙ্গ। সেই ভালোবাসা হিন্দু-মুসলমান মানে না। আর আছে জল-মাটি-আকাশ-বৃক্ষ-লতার নিবিড় পরিমণ্ডল। উপন্যাসের এই জীবন-স্বাদ পাঠকের ভালো লাগে। হিন্দু এবং মুসলমানের সমাজ ও জীবনযাত্রা আশ্চর্য স্বাভাবিকতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, উপন্যাসটির অপর এক প্রবাহে প্রাক্-দেশবিভাগ, ভারতীয় রাজনীতির যে চিত্র বাংলা দেশে দেখা দিয়েছিল তার পূর্ণ চিত্র আছে। কেমনভাবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল, দেশের মানুষ কীভাবে এই বিদ্বেষের বিষ-স্পর্শে বন্ধু থেকে শত্রু হয়ে যায় তারই সংক্ষোভ-কাতর বিবরণ এই উপন্যাস। এরই মধ্যে দিয়ে বালক সোনার বড়ো হওয়া। এরই মধ্যে দিয়ে এক প্রতীকী নীলকণ্ঠ পাখি জড়িয়ে আছে তার স্বপ্নে, তার অন্বেষণে। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে নায়কের ভূমিকায় যুবক সোনা। পূর্ববঙ্গের গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় উদ্‌বাস্তু জীবন এবং জাহাজের শিক্ষার্থী হয়ে ওঠা বর্ণিত। তৃতীয় পর্বে সোনা জাহাজের কাজ নিয়ে সারা পৃথিবী ঘোরে। চিনতে শেখে বিস্তৃত, বিশ্ব-ব্যাপ্ত জীবনকে; তার মনের মধ্যে স্নিগ্ধ আবহ সঞ্চারিত করে তার ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি। তবে এই পর্ব দুটিতে সোনার চরিত্র নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে। একটি গ্রামীণ কিশোরের সমগ্র বিশ্ব আবহের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়ার উপন্যাস 'ঈশ্বরের বাগান'।

'মানুষের ঘরবাড়ী' উপন্যাসটিও এক উদ্‌বাস্তু কিশোরের চোখ এবং মনকে তুলে ধরে। এক পরিবার পূর্ব বাংলার দেশ-ঘর ছেড়ে ছিন্নমূল হয়ে এসে নিজের ঘর গড়ে নেবার জায়গা খুঁজে ফেরে। বেশ কিছুদিন পরে খবর আসে যে একটি নির্জন অন্-উর্বর জংলাজমি তারা পেতে পারে। এবং সেখানেই সেই পরিবারটি বাড়ি বানাতে থাকে নতুন করে। জনবসতি থেকে অনেকটা দূরের জমি, কাছাকাছি বিশেষ লোক নেই। বেশ কিছুটা পথ পার হয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে বাস চলে, সাইকেল চলে, দূরের শহর থেকে যাওয়া আসা করে লোকজন। সেই পথের মোড়ে একটি চা-এর দোকান। এখানেই গড়ে ওঠে ঘর-বাড়ি। অতি সামান্য আয়োজন—বেড়ার ঘর, মাটির দাওয়া, খড়ের চাল। কিন্তু সেখানেই তুলসীমঞ্চের প্রতিষ্ঠা আর বেছে বেছে গাছ এনে লাগানো। আবার সংসারের শেকড়-বাকড় মাটিতে ছড়ায়। অনুভূত হয় যে, মানুষ মানুষকে উৎখাত করে, আবার মানুষই তাকে আশ্রয় দেয়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রধান সুর এটাই। জীবনের আঘাতকে চিনলেও তাঁর বাগ্-ভঙ্গি তিক্ত-প্রখর নয়; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আস্তিক্য বোধকে ত্যাগ করেনি। ছোটো জায়গা থেকে মানুষ অ-প্রতিরোধ্যভাবে বড়ো পৃথিবীর বৃহৎ বলয়কে উপলব্ধি করার পথে অগ্রসর হবে—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস এই বাণীই বহন করে।

৩.১৮ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে ১৯৩৪-এ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। পৈতৃক নিবাস মাদারিপুর। পিতা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। যে-কোনো শিক্ষিত পরিবারের মতোই বাড়িতে ছিল গল্প-উপন্যাস পাঠ ও

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের পরিবেশ। দেশ-বিভাগের পর কলকাতায় এসে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত হয়। কলেজে গড়বার সময় থেকেই গৃহশিক্ষকতা করেন, ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লেখেন। তরুণ কবিদের নিজেদের পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'-এর (১৯৫৩) সঙ্গে প্রথমাবধি জড়িত। কলেজের পাঠ শেষে বাংলা সাহিত্য নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছিলেন কিন্তু এম.এ. পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি নেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশনা সংস্থায় যোগ দেন পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে। দীর্ঘকাল সেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

অত্যন্ত সক্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য-চর্চার আগ্রহ যেমন প্রবল তেমনই চাকরি সূত্রেও তাঁকে অবিরত লিখে যেতে হয়েছে সংস্থার জন্য। ফলে যে বিপুল সংখ্যক লেখা তিনি লিখেছেন তার অনেকগুলিই কেবলই সাধারণ পাঠকের গল্প-তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ও পাঠক-বিনোদনের জন্য লেখা। কিন্তু বড়ো মাপের সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একই সঙ্গে এমন কিছু উপন্যাস লিখেছেন যা বাঙালি সমাজের দেশ-কালের ইতিহাসকে ধারণ করেছে। বিশেষ করে উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম পাদের বাংলার ইতিহাসকে তিনি সাফল্যের সঙ্গে উপন্যাসে শিল্পরূপ দিয়েছেন। ছোটোগল্প, উপন্যাস, কিশোরদের জন্য গল্প-উপন্যাস—বিশেষ করে গোয়েন্দা-কাহিনি, রম্যরচনা, ভ্রমণকথা—সব ধরনের লেখাই তিনি লিখেছেন। বিভিন্ন সময়ে নীললোহিত, নীল উপাধ্যায়, সনাতন পাঠক ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় তাঁর যে উপন্যাসগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় সেগুলির উল্লেখ এখানে করা হবে।

উপন্যাসগুলি হল—'আত্মপ্রকাশ' (১৯৬৬), 'জীবন যে রকম' (১৯৭১), 'অর্জুন' (১৯৭১), 'আমিই সে' (১৯৭৪) , 'একা এবং কয়েকজন' (১৯৭৪), 'সেই সময়' (১ম খণ্ড ১৯৮০, ২য় খণ্ড ১৯৮১), 'পূর্ব-পশ্চিম' (১ম খণ্ড ১৯৮৮, ২য় খন্ড ১৯৮৯), 'প্রথম আলো' (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৯৭)। নীললোহিত নামে কল্পনাপ্রধান, রোমান্টিকতা ও বাস্তবের মিশ্রণে তিনি যেসব উপন্যাস লিখেছেন সেগুলি আলোচনার পরিসর থেকে সরিয়ে রাখা হল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' অনেকটা আত্মজৈবনিক উপাদানে রচিত। মধ্যরাতে কলকাতা শাসনের দুঃসাহসিকতা নিয়ে এসেছিল উত্তমপুরুষে উপস্থাপিত এ উপন্যাসের নায়ক এবং তার বন্ধুরা, নায়কের মধ্যে একদিকে আছে শুদ্ধতার প্রতি, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ যা সদ্য তরুণী যমুনার প্রেমের মধ্যে রূপায়িত। অন্য দিকে সে বিদ্রোহী। তথাকথিত নীতিকে, সামাজিক অনুশাসনকে ভেঙে ফেলতে চায় সে। তাই সে নানারকম নেশা করে, স্বেচ্ছাবিহারিণী নারীর সঙ্গে মিলিত হতে চায়। যমুনার পুলিশ-অফিসার বাবা আপন পরিবারে তার প্রবেশের সাহসকে প্রশাসনিক অবস্থানের শক্তি ব্যবহারে দণ্ডিত করতে চেষ্টা করে। যন্ত্রণা আর রাগে তপ্ত তার সত্তা তারই টেবিল থেকে ভারী পেপার ওয়েট তুলে নিয়ে উচ্চারণ করতে পারে 'খুন করে ফেলব'-র মতো প্রবল সাহসী বাক্য। এক যুবকের সত্তার সফল সন্ধানের কাহিনি, সুনীলের সাহিত্যিক সত্তার পূর্ণ বিকাশের কাহিনি হিসেবে এই উপন্যাসটির একটি পৃথক মূল্য রয়েছে। প্রথম উপন্যাস হলেও শিল্পরীতির বিচারে উপন্যাসটি প্রায় নিখুঁত বলা যায়।

'জীবন যে রকম'-কে একটি প্রেমের উপন্যাসই বলা যায়। এক তরুণ ও তরুণী কীভাবে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক বাধা অতিক্রম করে মিলিত হল সেই আখ্যানটুকুই উপন্যাসের একতম প্রতিপাদ্য নয়। উপন্যাসটির পটভূমি বিস্তৃত। স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের প্রথম বিপর্যয়ের ঝড় কিছুটা প্রশমিত। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কিছুটা স্থিত হয়েছে, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে সমাজে। সপ্রতিভতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদায় এক ধরনের ব্যক্তিত্বও অর্জন করেছে তারা। এই উপন্যাসে পরিবারে ও সমাজে সর্বত্র তাদের নিজেদের জায়গা খুঁজে নেবার প্রয়াস দেখানো হয়েছে। মধ্যবিত্তের বিপর্যয় ও মূল্যবোধের ভাঙন এই উপন্যাসের লক্ষ্যবস্তু নয়। বাঙালি মধ্যবিত্তের নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, নতুন মূল্যবোধের প্রত্যয়ই যেন এখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'অর্জুন' উপন্যাসটি সরল এবং সবল। বক্তব্য, রচনারীতি এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা—কোনোদিক থেকেই খুব বেশি কিছু বলবার না থাকলেও উপন্যাসের বিবরণ-চিত্র পাঠককে আকর্ষণ করে। দেশ বিভাগের পর যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি

অনেকটাই সব সম্পদ হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তারা প্রাণপণে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে নিজেদের। পড়ে থাকা জমিতে জোর করে বসতি স্থাপন করেছে। বিভিন্নভাবে উপার্জনের চেষ্টা করেছে; একে অপরকে বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত। তেমনই একটি কলোনি ও সেই কলোনির বাসিন্দা উজ্জ্বল যুবক অর্জুন এই উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থিত। একদা উদ্‌বাস্তুদের এই নতুন বাস্তু সন্ধানের চিত্রটি অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে উপস্থিত করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে পূর্ববাংলা থেকে আগত এই নতুন নাগরিকদের সম্পর্কের দিকটিও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ফুটে উঠেছে।

পুরাণ, পুরাকথা বা মিথ ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক সুনীল খুব বেশি লেখেননি। সম্ভবত একটিই লিখেছেন। সেটির নাম 'আমিই সে' (১৯৭৪)। আর্য জাতির একটি গোষ্ঠীর আক্রমণে অথবা বন্যায় ধ্বংস হয়েছিল দ্রাবিড় বা অন্‌-আর্য জাতির গড়ে তোলা সিন্ধু সভ্যতা; যার প্রাণকেন্দ্র ছিল মহেঞ্জোদাড়ো আর হরপ্পা—এই সম্ভাব্য ইতিহাস-সত্যের সঙ্গে পুরাণ-কথার মিশ্রণে নির্মিত হয়েছে এই উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক ইন্দ্র। সে পশুপালক, সভ্যতার দিক দিয়ে অনগ্রসর আর্য জাতিগোষ্ঠীর এক সাহসী যুবা। আপাতভাবে প্রমোদপ্রিয়, নারীবিলাসী এই যুবার ছিল চিরন্তন বাধানিষেধকে অমান্য করার দুঃসাহস। এভাবেই নিজেকে চিনে নিতে চেয়েছিল সে। তার এক ভাই সুদূরের আহ্বানে চলে গিয়েছিল সিন্ধু কূলের নগর-সভাতায় যেখানে সে নিহত হয়। সেই ভাইয়ের সন্ধানে বের হয় ইন্দ্র। এ জন্য পথ খুঁজতে গিয়ে প্রবল বলে পাথর সরিয়ে তীব্রগতি এক নদীর পথ উন্মুক্ত করে। ক্রমে দেখা যায় তার নেতৃত্বে একদল যুবা অভিযান করে সুদূর ভারতের দিকে। মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার নগরে নিহত ভ্রাতার প্রতিরূপ পূজিত হতে দেখে হিংস্র হয়ে ওঠে সে। ইতিমধ্যে তার উন্মুক্ত নদীর জলস্রোত বন্যা হয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে সেই বিলাসী অকর্মণ্য অধিবাসী অধ্যুষিত নগরটিকে। ফলে ইন্দ্র সহজেই অধিকার এবং ধ্বংস করে দেয় সেই নগর। দুঃসাহসী আর বলিষ্ঠ যুবা ইন্দ্র ক্রমে হয়ে ওঠে গোষ্ঠীনায়ক। তার পরের যুগে সুদৃঢ় আর্যসভ্যতায় সে হয়ে যায় শত্রুপুর-ধ্বংসকারী, সমৃদ্ধির দেবতা, সুরাবিলাসী ঋগ্‌বেদের দেবতা ইন্দ্র। মানুষের, মানবজাতির যে অভিযাত্রী, নতুনের সন্ধানে যাওয়ার সাহসী মনোভাব সভ্যতাকে স্থবির হতে দেয়নি সেই চিরন্তন সত্তার প্রতীক ইন্দ্র। এইভাবে চিরকালীন সত্য, সম্ভাব্য ইতিহাস আর পুরাকথা মিথের ব্যবহারে 'আমিই সে' উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অসামান্য।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'একা এবং কয়েকজন'। অনেকের মতে এই উপন্যাসেই ব্যক্তি-জীবনকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে বিপুল দেশকাল ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের উদ্‌ঘাটন দেখিয়েছেন লেখক। বৃহৎ পরিকল্পনা ও বৃহৎ আয়তনকে দক্ষতার সঙ্গে এই উপন্যাসে মিলিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকে স্বাধীনতার কয়েক বছর পর পর্যন্ত যে জটিল, বহু বিরোধী স্রোতের আবর্ত-সংকুল সময়—তারই প্রেক্ষিতে বিন্যস্ত এই উপন্যাস। উপন্যাসের বক্তা বাদল। এক অর্থে প্রধান চরিত্রও সে-ই। কিন্তু সমুজ্জ্বল রাজপুত্রের মতো প্রদীপ্ত আর এক নায়ক আছে উপন্যাসটিতে—তার নাম সূর্যকুমার। নির্ভীক, বিপ্লববাদী কিন্তু সৌন্দর্যকামনা-তাড়িত সূর্য শেষ পর্যন্ত কোথাও পৌঁছোয় না। নারীশরীরের রূপবাসনার শৃঙ্খল তাকে মহৎ আত্মোৎসর্গে উপনীত হতে দেয়নি। ঘটনাচক্রে ঘটেছে তার মৃত্যু। কিন্তু ধীর-স্থির, আপাত নিষ্প্রভ কিন্তু শান্ত, উদারমনের বাদল এবং অতীব সুন্দর মনের মেয়ে রেণুর প্রেম ও মিলনের মধ্যে দিয়ে সমাজের নবীন প্রজন্মের প্রতি এক আশা-স্পন্দিত আশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসটিতে সময় ও সমাজের চিত্রণ সযত্ন ও সু-চিন্তিত।

'সেই সময়'—সুবৃহৎ দুই খণ্ডে রচিত এই উপন্যাসটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ও খ্যাতিকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীত্ব দিয়েছে। বাংলার উনিশ শতকীয় নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে রচিত অনন্যস্বাদী এই উপন্যাসের নির্মাণে বিস্তৃত ইতিহাস-গবেষণা এবং ঐতিহাসিক তথ্য সমূহকে অপরিসীম নৈপুণ্যে ব্যবহার করবার দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয়। লেখক এই উপন্যাসের প্রথমেই একটি চমক দিয়েছেন। উনিশ শতকের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহকে নবীনকুমার নাম দিয়ে উপন্যাসের নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। এই বিষয়টি প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল কারণ

নবীনকুমারকে তিনি উপন্যাসে অবৈধ সন্তান রূপে দেখিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের কল্পনার নবীনকুমার তার বত্রিশ বছরের জীবনে যা যা করেছিল সেগুলি সবই কালীপ্রসন্ন সিংহের বিশ্রুত কীর্তি, যেমন বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা, মধুসূদনের সম্মাননার আয়োজন, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রণয়ন, মহাভারত অনুবাদের প্রয়াস ইত্যাদি। বিতর্ক সরিয়ে রেখে বলা যায় 'সেই সময়' উপন্যাসটি উনিশ শতকের বাংলার নবজাগ্রত মনন-বিস্ফোরণের বিশ্বস্ত লিপিচিত্র। উপন্যাসে জীবন্ত চরিত্র হয়ে বিচরণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার, বেথুন সাহেব, রানি রাসমণি, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, দীনবন্ধু। এঁদের পাশাপাশি লেখকের কল্পনাসম্ভব সাধারণ মানুষের চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটি।

'সেই সময়' উপন্যাসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উনিশ শতকীয় বাংলার রেনেসাঁস-এর আংশিকতার জায়গাটি পরিস্ফুট করা। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, সমাজ-সংস্কার, সংস্কৃতিচর্চার বুদ্ধিজীবী-সুলভ কর্ম-উদ্যম চলেছে। বিলাস-ব্যসনের স্রোত অব্যাহত। কিন্তু সমাজের দরিদ্র শ্রেণি, পশ্চাদ্‌পর বর্গের মানুষ, কৃষক ও কায়িক শ্রমিকদের অবস্থার একবিন্দু পরিবর্তন হয়নি। তারা প্রত্যক্ষত শোষিত হচ্ছে স্বদেশীয় ধনীবর্গের ব্যক্তিদের দ্বারা। বাংলার নীল-চাষিদের পরিস্থিতি ও নীল-বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উপন্যাসটিকে দৃঢ়তর ঐতিহাসিক ভিত্তি দিয়েছে। কল্পনা আর ইতিহাসের এত তাৎপর্যময় ও শিল্পসম্মত সমন্বয় খুব বেশি দেখা যায় না। 'সেই সময়' বাংলা উপন্যাস-সম্ভারে এক কালোত্তীর্ণ সংযোজন।

'পূর্ব-পশ্চিম' লেখকের আর একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাস। এই উপন্যাসের স্থান ও কালের পটভূমি হল বাংলার বিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ। আজকের মানুষ খানিকটা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে বাধ্য। 'পূর্ব-পশ্চিম' নামটির ব্যঞ্জনা দ্বি-মাত্রিক। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা প্রাথমিকভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই—বৃহত্তর বলয়ে অনুপ্রবিষ্ট। দেশ বিভাগকে উপন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর গণতান্ত্রিক ভারতের গড়ে ওঠ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্বের পরম্পরা, নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্থান, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধ—এই সবকিছু এসে গেছে উপন্যাসের পরিসরে। আবার দুই বাংলা থেকেই শিক্ষিত যুবকেরা, যুবতীরাও চলে যাচ্ছে আমেরিকাতে, জার্মানিতে বা ইংল্যান্ডে। তা-ও ভারতীয় সমাজেরই একটি চেহারা। এখানে দেখা দেয় আরও একটি সমস্যা। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও দেখা যায় পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে, নর-নারীর প্রেম ও যৌনতা বিষয়ে সামাজিক ব্যবহারের ধারণা সম্পর্কে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ব্যবহারগত বিধি-নিষেধ প্রত্যাশা ও উচিত অনুচিতের ধারণা অনেকখানি আলাদা। তার ফলে দুই সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ মিলন ঘটে না। এই সব কিছু নিয়ে 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসটি যেন আধুনিককালের বঙ্গীয় জীবনের এক বিশ্বস্ত চলচ্চিত্র। তবে, 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের পরিসর সুবৃহৎ। অনেক সময় তরুণ-তরুণীদের আচরণ নিয়ে লিখিত অংশগুলিতে কিছু বাহুল্য এবং চাপল্যের লিপিকৌশল লেখক প্রয়োগ করেছেন। আধুনিক জনপ্রিয় উপন্যাসের বিপুল সংখ্যক পাঠক ছড়িয়ে আছে তরুণবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। সে জন্য অল্পবয়সীদের চালচলনকে জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখকেরা একটু বেশি গুরুত্ব দেন, উপন্যাসের প্রকৃত গুরুত্ব এতে কিছুটা লঘু হয়ে যায়। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসেও এই দুর্বলতা আছে। এই প্রবণতা অধিকাংশ জনপ্রিয় উপন্যাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

'প্রথম আলো' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি বড়ো মাপের উপন্যাস। একই সঙ্গে মহৎ এবং বিতর্কমূলক। ভারতীয় কথাসাহিত্যে এই জাতীয় উপন্যাস আর লেখা হয়নি। এই উপন্যাসের দুই নায়ক বলা যেতে পারে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে দু-জন যুগ মানবের আবির্ভাব ঘটেছিল। যাঁরা দু-জনেই নিজেদের প্রতিভাবলে ভারতীয় মনীষাকে সমগ্র বিশ্বে কেবল পরিচিত নয়, সম্প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। তাঁরা হলেন বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ। এই দু-জন মানুষকে তাঁদের প্রতিভাকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েও সাধারণ

মানুষের মতো করেই উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। লেখককে আমরা ধন্যবাদ জানাতে পারি এই কারণে যে সাধারণ ভারতীয় মনের গুরুবাদী প্রবণতাকে তিনি কেবল অস্বীকার নয়, আঘাতও করতে চেয়েছিলেন। বেশ সচেতন-ভাবেই লেখক বিবেকানন্দের ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে নারীদের আগমন ও উপস্থিতিকে বিবৃত করেছেন। তাঁর চিত্রণে কোথাও কোনো অনুচিত ইঙ্গিত নেই। স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্ককেই দেখিয়েছেন তিনি। আধুনিক মনের শিক্ষিত পাঠক এখানে কোনো দোষ দেখবেন না।

অন্যদিকে, প্রগাঢ় মননশীল উপলব্ধির বলে লেখক রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দের প্রতিভার সূক্ষ্মতা, বিপুলতা এবং স্বাতন্ত্র্যকে আশ্চর্যভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। অতি সহজ, স্বচ্ছন্দ, প্রাত্যহিক বাচনের ভাষায় সেই অ-লৌকিক প্রতিভাবান দু-জন মানুষকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতেও তিনি সক্ষম হয়েছেন। 'সেই সময়' উপন্যাসের মতোই এখানেও জগদীশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নিবেদিতা, তিলক, অবনীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ওকাকুরা, ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ—এই চরিত্রগুলির পাশাপাশি সাধারণ মানুষ—হিন্দু কলেজের ছাত্র, রাজার অবৈধ সন্তান, ওড়িশি ক্রীতদাসী, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নব উন্মোচিত আধুনিকতার বোধ—সবই উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। সমুজ্জ্বল মনীষীরা আর অতি সাধারণ নাগরিকেরা—কেউই কাউকে ঢেকে ফেলতে পারেনি.। 'প্রথম আলো' উপন্যাসটিকে উপেক্ষা করা বাংলা সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। এই উপন্যাস কালক্রমে অনেক বেশি করে পাঠকমনে গৃহীত হবে বলে মনে হয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অবস্থান বাংলা কথাসাহিত্যের দুটি ধারার সংযোগবিন্দুতে। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি অসাধারণ সফল। জনপ্রিয়তার কলা-কৌশলগুলি তিনি দক্ষতায় আয়ত্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু সব উপন্যাসে না হলেও তাঁর অনেক উপন্যাসেই তিনি শাস্ত্রীয় অনুশাসন, সংস্কার এবং লোকাচারের সংকীর্ণ বন্ধনের বাইরে মানুষের মানবিক হৃদয়কে প্রগতি ভাবনার উজ্জ্বলতায়, মুক্তবুদ্ধির আকাশে বার করে নিয়ে গেছেন। তাঁর উপন্যাসে অতি স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে জাতিভেদ এক বর্জনযোগ্য সংস্কার; ধর্মভেদ মানুষের ভালোবাসায় কোনো বাধা হতেই পারে না; অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদে মানুষ কখনও ছোটোবড়ো হয় না; সমাজঅনুমোদন-বহির্ভূত জন্মের জন্যে কোনো মানুষের একবিন্দু লজ্জিত হবার কারণ নেই। নীললোহিত নামে লেখা উপন্যাসগুলিতেও, একটু সরলীকৃতভাবে—এই অভিমতই মূর্ত হয়েছে। তাঁর প্রত্যেকটি লেখায় বর্তমান মানুষের; শুদ্ধ, পরিস্রুত মানবতার জ্যোতির্ময় উদ্‌ভাস।

৩.১৯ প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪-   )

ঢাকা জেলায় প্রফুল্ল রায়ের জন্ম। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান প্রফুল্ল রায় দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলায় আসেন। তিনি প্রধানত বিভিন্ন সাময়িকপত্রে সাংবাদিকের কাজ করেছেন। এই কাজের সূত্রেই তাঁকে ভ্রমণ করতে হয়েছে প্রায় সারা ভারত। তার মধ্যে আছে বিহার ও বর্তমান ঝাড়খণ্ড, অসম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, চেন্নাই ইত্যাদি স্থান। তাঁর উপন্যাসে বিশেষ করে বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের দরিদ্রবর্গের মানুষ এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ আছে। প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে একদিকে ছেড়ে আসা পূর্ববাংলার জীবনের স্মৃতিরস, অন্য দিকে আধুনিক ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে শোষিত দরিদ্র বর্গের মানুষ সম্পর্কে সচেতনতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হতে দেখা যায়।

প্রফুল্ল রায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'পূর্ব পার্বতী' (১৯৫৭), 'কেয়াপাতার নৌকা' (১ম ও ২-য় পর্ব ১৯৭০), 'জন্মভূমি' (১৯৭১), 'আকাশের নীচে মানুষ' (১৯৮১), 'রামচরিত্র' (১৯৮৫), 'যুদ্ধযাত্রা' (১৯৯১)।

পাঁচের দশকে ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায়ের আত্মপ্রকাশ। 'পূর্ব পার্বতী' উপন্যাসটি তাঁকে পাঠকের কাছে পরিচিত করেছিল। বর্ত্তমান নাগাল্যান্ড অঞ্চলের জনজাতি জীবন, ইতিহাস এবং ভূপ্রকৃতির সমগ্রতা নিয়ে রচিত এই

উপন্যাসটি লেখার জন্য তাঁকে বেশ কিছু দিন ওই অঞ্চলে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। উপন্যাসটিতে আছে জনজাতি-জীবনের লোকাচার, উৎসব-অনুষ্ঠান—এসবেরই অনুপুঙ্খ বিবরণ। আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে উপন্যাসটি প্রশংসিত। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এই জনজাতি গোষ্ঠীগুলি কীভাবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল তার তথ্যভিত্তিক রূপায়ণ আছে এই উপন্যাসে। যদিও শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটি মানব-জীবনালেখ্য রূপে খুব হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারেনি। ওই পর্বে রচিত 'নাগমতী' (১৯৫৭) উপন্যাসে এক বিশেষ ধরনের বেদে সম্প্রদায়ের জীবনকে সাহিত্যরূপ দেওয়া হয়েছে।

'কেয়াপাতার নৌকা' উপন্যাসটি প্রফুল্ল রায়কে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নিঃসংশয়ে স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে। এই উপন্যাস তাঁর স্বদেশের প্রতি স্মৃতি-অর্ঘ্য। পূর্ববঙ্গে ধলেশ্বরী নদীর তীরে ছোটো শহর রাজদিয়া। এই শহরটি ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে কীভাবে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়েছে আর্থিক সংকট এবং রাজনৈতিক আঘাতের চাপে—সেই ইতিহাসই লিপিবদ্ধ করেছেন প্রফুল্ল রায়। তাঁর অবলম্বন একটি পরিবার। অবনীমোহনবাবু কলকাতা থেকে সপরিবার শ্বশুরবাড়ি রাজদিয়া এসেছিলেন এক পুজোর ছুটিতে। জায়গাটি তাঁর ভালো লাগে। ছুটি শেষে আর তিনি ফিরে যাননি। সঙ্গে এসেছিল বালকপুত্র বিনু। বারো থেকে বাইশ বছর বয়স সে কাটিয়েছিল এই রাজদিয়াতেই। বিনুর চোখে দেখা এই রাজদিয়া, বালক বিনুর কিশোর থেকে যুবক হয়ে ওঠার কাহিনি 'কেয়াপাতার নৌকা'। পূর্ব বাংলার গ্রামপ্রকৃতি বিনুর সামনে খুলে দিয়েছে জীবনের সজীব প্রাণময়তার বাতায়ন। ধলেশ্বরী নদী, গোয়ালন্দ থেকে স্টিমার যাত্রা, মাঝি-মাল্লার গান, পূর্ব বাংলার নদী, নালা, খাল, গাছ, পাখি, মাঠ, জনবসতি, বিশাল দিঘি নিয়ে এই ভুবন যেন দু হাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিয়েছে বিনুকে। তার দাদু হেমনাথ রাজদিয়া শহরের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। সেই আধা সামন্ততান্ত্রিক অথচ একান্ত নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পূর্ব বাংলার জনজীবন বিনু এবং বিনুর বাবা—দুজনকেই মুগ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধের বাজারে ব্যাবসায় বড়োলোক হবার জন্য আদর্শভ্রষ্ট হন অবনীমোহন। মিলিটারি ক্যাম্প পড়ে রাজদিয়ার নদীর ধারে। দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, চোরা কারবার। আসে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের দিনগুলি, দেখা দেয় পাকিস্তানের জন্য দাবি এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানি। তারপর দেশবিভাগ, দেশত্যাগ। এক ধর্ষিত কিশোরীকে দেখিয়েছেন লেখক। তাকে নিয়ে যুবক বিনু আবার ফিরে যায় কলকাতায়। বিশাল প্রেক্ষাপটের উপন্যাসটিকে নিপুণ কৌশলে সংবদ্ধ রেখেছেন প্রফুল্ল রায়। যা তিনি 'পূর্ব পার্বতী'-তে পারেননি তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পেরেছেন এই উপন্যাসে। তাই ভারত তথা বঙ্গভূমির সবচেয়ে আলোড়িত এবং যন্ত্রণাকাতর দশকটিকে তার সমগ্র ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক তাৎপর্যে তুলে ধরবার পরেও ব্যক্তিমানুষের সুখদুঃখ আর ভিতরের মনটিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন তিনি। অবশ্য এই উপন্যাসের পট-পরিবেশ লেখকের আবাল্য পরিচিত এ সত্যও মনে রাখতে হবে।

'জন্মভূমি' (১৯৭১) উপন্যাসের সময়কাল ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়। স্বাধীন ভারতের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি বাস্তবচিত্র এখানে প্রতিফলিত। স্বাধীন দেশের যুবকেরা উচ্চশিক্ষা পেয়েছে। এবং আরও উচ্চশিক্ষা পাবার জন্য তারা গেছে বিদেশে—আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানিতে। ধনী দেশের ভোগসুখ-সাচ্ছল্যের স্বাদ পেয়েছে তারা। দেশে আর তাদের মন বসে না আবার বিদেশেও তারা পরবাসী। এই নিয়েই রচিত 'জন্মভূমি'। দশ বছর জার্মানি প্রবাসের পর মায়ের কঠিন পীড়ার সংবাদে কলকাতায় এসেছে সন্দীপ। বহু কষ্টেই এই পরিবার তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে ভুলেছিল তার পরিবারকে। পরিবারটি সম্পূর্ণ মুমূর্ষু। সন্দীপের দমবন্ধ হয়ে আসে। ভাবে, দ্রুত ফিরে যাবে জার্মানিতে—স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি একটু ভাবাবেগ-স্পৃষ্ট। প্রফুল্ল রায়ের লেখায় এই মানবীয় ভাবাবেগকে খানিকটা প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়।

ক্রমশ প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের পটভূমিতে, জোতদার, জমিদার উচ্চবর্ণের হাতে দরিদ্র ও দলিতবর্গের মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার চিত্র প্রাধান্য পায়। 'আকাশের নীচে মানুষ' উপন্যাসের প্রধান

চরিত্র ধর্মা বা ধন্মা একজন বেগার-খাটা ভূমিদাস। বাপ-পিতামহের নেওয়া ধার তাকে খেটে শোধ করতে হবে। কিন্তু ধার ক্রমশই হিসেবের ফেরে বেড়ে যায়। বহুবিধ পীড়নের চিত্র আছে উপন্যাসটিতে। অবশেষে জোতদার রঘুনাথ সিং চুনাও বা নির্বাচনে জিতে এসে যখন এই ভূমিদাসদের বলেন—আমি তো তোদেরই লোক—তখন হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে চিরকালের বঞ্চিত ধর্মা—'ঝুট ঝুট ঝুট। তু হামনি কো আদমী নেহি।' এই প্রতিবাদী বাক্যটিতে পৌঁছতে তার কেটে গেছে সারা জীবন—এমনকী কয়েকটি প্রজন্ম।

এই প্রতিবাদ প্রকৃত সংগ্রামে পরিণত হয়েছে 'রামচরিত্র', 'যুদ্ধযাত্রা', 'মহাযুদ্ধের ঘোড়া' প্রভৃতি উপন্যাসে। বিভিন্ন দিক থেকে এই উপন্যাসগুলিতে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে সাম্প্রতিক কালে এই প্রতিবাদী ধারাই প্রবল হয়ে উঠেছে। যদিও লক্ষণীয় যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁর পটভূমি বহির্বঙ্গ এবং হিন্দিভাষী এলাকা। অবশ্য তিনি যে এই অঞ্চল এবং তার মানুষগুলিকে চেনেন তার পরিচয় উপন্যাসগুলিতে আছে। বিশেষত আঞ্চলিক হিন্দি ভাষার প্রয়োগে দক্ষতার সঙ্গে সত্যের স্বাদ সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈষৎ ইচ্ছাপূরক ধরনের সরল সমাধান যেন তিনি দেখিয়েছেন। লেখকের উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ। কিন্তু সত্যের রূপ হয়তো বা নিষ্ঠুরতর। তা সত্ত্বেও বলা যায় বর্তমানে দরিদ্র জনজীবনের এবং দলিতবর্গের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনার চিত্র যাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম লেখক প্রফুল্ল রায়।

৩.২০ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-   )

বর্তমান বাংলাদেশে ময়মনসিংহে ১৯৩৫ সালে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের পৈতৃক বাস ছেড়ে লেখকের কিশোর বয়সেই পরিবারটি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে চলে আসেন। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করে শিক্ষকতা দিয়ে তিনি জীবন শুরু করেন। ছোটোগল্প লেখক হিসেবে ক্রমে তিনি পরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে। তার পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশন সংস্থায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করলে তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়। এই জাতীয় প্রকাশন সংস্থায় যুক্ত সাহিত্যিককে তাঁর জীবিকার শর্ত হিসেবে প্রতি বছর একাধিক উপন্যাস লেখার অভ্যাসের মধ্যে থাকতে হয়। বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতা-উত্তর কালে, বিশেষ করে ষাটের দশক থেকেই কথাসাহিত্যের ধারায় পাঠকের বিনোদনের মূল লক্ষ্য সামনে রেখে বহুল পরিমাণে উপন্যাস উৎপাদিত হবার যে প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায় সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতোই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ষাট, সত্তর, আশি দশকের বাংলা উপন্যাসে এই ধারাটিকে অস্বীকার করা অবাস্তব হবে। ঈষৎ পূর্ববর্তী সময়ে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন সেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর প্রমুখ লেখকও এই ধারার অন্তর্গত। রমাপদ চৌধুরী, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—সকলেরই জীবন ও জীবিকা মোটের উপর এই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে জনপ্রিয় ও মনোরঞ্জন উপন্যাসের বিপুল সম্ভার জমে উঠেছে বাংলা কথাসাহিত্যে।

উল্লেখিত লেখকেরা সকলেই প্রতিভাবান এবং সাহিত্যচর্চাকে দায়িত্বের সঙ্গে তাঁরা গ্রহণ করেছেন বলেই প্রকৃত সৎ-সাহিত্যও তাঁদের হাতে রচিত হয়েছে। কিন্তু যত তাঁরা লিখেছেন তার অনেক অংশই সুপাঠ্য উপন্যাস হলেও গভীরতার দিক থেকে কালোত্তীর্ণ হবে না।

এই ধারায় বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে এবং ইতিহাস-সচেতনতার প্রগাঢ়তায় নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতম লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ততটা বৈচিত্র্য, বিষয়গত বিস্তার এবং ঐতিহাসিক তথ্যের নিপুণ ব্যবহারে জীবনের রূপাঙ্কন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী বা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখায় পাওয়া যাবে না। তাঁদের সৃষ্টি-প্রতিভা ঐতিহাসিক চালচিত্র নির্মাণ অথবা বিচিত্র বিষয় সন্ধানের দিকে না গিয়ে নিজেদের প্রবণতা অনুসারে জীবনের একটি বা দুটি দিককে নির্বাচন করে নিয়েছে। বিশেষভাবে বলা যায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কেন্দ্রীয় ভাববস্তু তথা মানুষের মনোদর্শন প্রধানত মানুষের গৃহ-আকাঙ্ক্ষা আর বহির্জীবনের আকর্ষণের টানাপোড়েনের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে এই একই বিষয়-ভাবনা রূপায়িত হয়েছে। রমাপদ চৌধুরী বেছে নিয়েছেন মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও তাই। কিন্তু দুজনের পার্থক্য হল এই—যেখানে রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের, বিশেষ করে নাগরিক মধ্যবিত্তের স্খলন, ত্রুটি, সীমাবদ্ধতার সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের মনস্তত্ত্বের সংযোগ দেখাবার চেষ্টা করেছেন, সেখানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই জীবন সম্পর্কে কিছু দার্শনিক জিজ্ঞাসাকে প্রোথিত করে দিয়েছেন চরিত্রগুলির মনের মধ্যে। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের সাংসারিক জীবনযাপনের মধ্যেই জীবনের তাৎপর্য সন্ধান, জীবনের রহস্য অনুভব এবং জীবন-উপলব্ধির গভীরতম তলকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাসও তাঁর জীবনজিজ্ঞাসারই অন্তর্গত। কিন্তু এই প্রবণতার ফলে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে বৈচিত্র্যের অবকাশ বিস্তৃত নয়। তিনি নাগরিক মধ্যবিত্তের এবং উচ্চবিত্তের জীবন নিয়ে লেখেন; গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপনও তাঁর লেখায় সার্থকভাবে চিত্রিত হয়। কিন্তু তাঁর লেখায় সামাজিক শ্রেণি-বিভাজন ও শ্রেণি-শোষণ জনিত দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পায় না, বড়ো হয়ে ওঠে ব্যক্তির জীবনদর্শন ও আত্মজিজ্ঞাসা।

তবে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক পটচিত্রটি তার জটিলতা, আবর্ত এবং স্বার্থান্বেষী চতুরতার আবহমণ্ডল সহ তাঁকে আকৃষ্ট করে। ব্যক্তিমানুষ, রাজনৈতিক-ক্ষমতাসম্পন্ন-গোষ্ঠী-সমুহের স্বার্থান্ধ ক্ষমতার সামনে কত অসহায়; তা তাঁর লেখায় প্রায়শই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিশোরদের জন্যও অনেক উপন্যাস লিখেছেন। সব মিলিয়ে একশোর কাছাকাছি তাঁর উপন্যাস। কিন্তু নিতান্ত সাধারণ পাঠকের বিনোদনের উদ্দেশ্যে রচিত উপন্যাসগুলি বাদ দিলে সর্বকালের প্রকৃত পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করবে এমন উপন্যাস যতগুলি আছে সেগুলির মধ্যেও বৈচিত্র্য কম। আমরা তাঁর কয়েকটি উপন্যাস সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি।—‘ঘুণপোকা’ (১৯৬৭), ‘যাও পাখি’ (১৯৭৬), ‘কাগজের বউ’ (১৯৮৩), ‘দূরবীণ’ (১৯৮৬), ‘শ্যাওলা’ (১৯৮৭), ‘পারাপার’, ‘মানব জমিন’ (১৯৯৩), ‘আশ্চর্য ভ্রমণ’, ‘ফজল আলি আসছে’।

‘ঘুণপোকা’ উপন্যাসটি তরুণ লেখকের প্রথম উপন্যাসরূপে যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লেখার বিষয়বস্তু এবং লিখনশৈলী—দুদিক থেকেই উপন্যাসটি সেই সময়ের পক্ষে ছিল বেশ কিছুটা অভিনব। উপন্যাসের নায়ক শ্যাম চক্রবর্তী। অনেকটাই আত্মমগ্ন ভাবনাস্রোত এবং স্বীকারোক্তির আঙ্গিকে উপন্যাসটি প্রবাহিত হয়েছে। আত্মকথন আছে অনেকখানি। শ্যাম নামের যুবকটির আত্মআবিষ্কারের তাড়নাই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সে আধুনিক নগর-সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতায় নৈরাশ্যের যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে বার বার চাকরি ছেড়ে দেয়, ভবঘুরে জীবন-যাপন করে এবং সন্ধান করে জীবনের গভীরতর তাৎপর্য। এই উপন্যাসে যে নৈরাশ্যজনিত আবহ, ব্যক্তির অন্তঃচরিত্রের অস্থিরতা এবং আত্মচিন্তনমূলক শৈলীর প্রয়োগ তা ১৯৬৭ সালে যথেষ্টই অপরিচিত ছিল সাধারণ পাঠকের কাছে।

এর পরে আমরা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘শ্যাওলা’ উপন্যাসটিকে গ্রহণ করছি। কারণ এই উপন্যাসে লেখকের

মানবমনের চিন্তামগ্ন গভীরতর তলের সন্ধান এবং তাঁর প্রখর রাজনৈতিক সচেতনতা একসঙ্গে মিশেছে। রাজনীতির স্বার্থশক্তি কীভাবে মানুষকে চূর্ণ করে দেয় তা তিনি অন্য কয়েকটি উপন্যাসেও দেখিয়েছেন। কিন্তু 'শ্যাওলা' উপন্যাসটিতে তিনি এই রাজনীতি আর ব্যক্তির আত্মনিমজ্জন—এই দুটি দিককে সার্থকভাবে মেলাতে পেরেছেন। নকশাল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই উপন্যাস। হিরন্ময় নামের যুবকটি জড়িয়ে গিয়েছিল এই আন্দোলনের সেই প্রথম পর্বের সঙ্গে। সত্তরের দশকের একেবারে শুরুতে যখন প্রশাসনের হত্যানীতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে যুবকদের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত। প্রকাশিত হল মৃতের নামের তালিকা। সেই সময়েই হিরন্ময়ের বসবাসের উঞ্চল বিজয়গড়ে তার মৃত্যুর খবর রটে যায়। জীবিত হিরন্ময় সকলের কাছেই ছিল কিছুটা কাঁটার মতো। তার পরিবার, তার প্রেমিকা রূপালি এবং কোনো কোনো রাজনীতি সূত্রের বন্ধুও তার মৃত্যুতে আশ্বস্ত হয়। কিন্তু হিরন্ময় মরেনি। যখন সে আত্মপ্রকাশ করে তখন অস্বস্তি এবং বিরুদ্ধতা ছড়িয়ে যায় সর্বত্র। রাজনৈতিক বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে শুরু করে রূপালি পর্যন্ত। রূপালির পারিবারিক পরিবেশে নৈতিক শাসন ছিল অত্যন্ত শিথিল। প্রথম যৌবনের আবেগে হিরন্ময়কে গ্রহণ করলেও পরে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কোনো সুপাত্রের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল সে। হিরন্ময়ের ফিরে আসা তার কাছে ক্ষতিকারক। হিরন্ময়ের জীবনের এই দ্বিতীয় পর্বটি—স্রোতের সজীবতার উপর চাপ চাপ শ্যাওলার মলিন ভারের মতো নৈরাশ্য জমিয়ে তুলেছে। সে অনুভব করে রাজনীতির আদর্শ আর কোথাও নেই। সর্বত্রই আত্মকেন্দ্রিক গঠনমূলকতা মানুষকে গ্রাস করে নিয়েছে। এই উপন্যাসটিকে নির্দিষ্টভাবে নকশালবাড়ি রাজনীতির বিরুদ্ধে লিখিত মনে করা ঠিক হবে না। যে কোনো রাজনীতি সম্পর্কেই হিরন্ময়ের অনুভবের সত্যতা অনুভূত হতে পারে। পাঠক সেভাবেই উপন্যাসটিকে গ্রহণ করে।

মধ্যবিত্ত, সচ্ছল মধ্যবিত্ত, নাগরিক মধ্যবিত্ত এবং গ্রামজীবন স্পর্শী মধ্যবিত্ত—এই সমাজকে নিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর অধিকাংশ সার্থক উপন্যাস লিখেছেন। অনেকগুলি উপন্যাসই সুলিখিত এবং অনুভূতির গভীরতার স্পর্শে পাঠকের কাছে প্রকৃত জীবনদর্পণরূপে সমাদৃত। এগুলির মধ্যে আছে 'পারাপার', 'যাও পাখি', 'মানব জমিন' ইত্যাদি উপন্যাস। এগুলির মধ্যে প্রতিনিধি হিসেবে 'মানব জমিন'-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক চরিত্রের সমাবেশে, বহু মানুষের স্বতন্ত্র কথাবৃত্তের সমবায়ে পরিকল্পিত প্রশস্ত পরিসরের উপন্যাস 'মানব জমিন'। অনেক চরিত্রের মধ্যে দীপনাথ, তৃষা, বোসসাহেব, মণিদীপা ইত্যাদি চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। কলকাতা, কলকাতার শহরতলি মফস্‌সল, শিলিগুড়ি—ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে কাহিনির শাখা-প্রশাখা। দীপনাথকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায়। শান্ত, কিছুটা বিষণ্ণ স্বভাবের দীপনাথ বর্তমান সভ্যতার জটিলতায়, স্বার্থপরতায় এবং তথাকথিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার চাপে নিরানন্দবোধ করে। সে মানুষকে ভালোবাসতে চায়; শুদ্ধ, মানবীয়, প্রীতির সম্পর্ক গড়তে চায় কিন্তু ব্যর্থতাবোধ তাকে প্রায়শই গ্রাস করে। সে একা এবং নিঃসঙ্গ। নারীচরিত্রগুলির মধ্যে তৃষা এবং মনিদীপা—দুজনেই বেশ বিশিষ্ট। তৃষার আত্মবিশ্বাসী, জোরালো, জীবনাগ্রহী এবং সংস্কারবিহীন চরিত্রটি একধরনের ইতিবাচক জীবনীশক্তিকে ধারণ করেছে। আবার মণিদীপার বালিকাসুলভ সারল্যের মধ্যেও এক ধরনের স্নিগ্ধ স্বচ্ছতা দীপনাথের মনে ভালোবাসাকে পল্লবিত করেছে। এই রোমান্টিক সম্পর্কটিও উপন্যাসের অন্যতম সম্পদ। মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে যে উপন্যাসগুলি লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সেগুলিতে আধুনিক সভ্যতার জটিলতা, ব্যর্থতাবোধ এবং নৈরাশ্যের বোধ সত্ত্বেও জীবনের আনন্দ উপভোগ্যতা এবং মানুষের আস্তিক্যবোধে উত্তরণ আছে।

রাজনীতি এবং ব্যক্তিমানুষকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে 'দূরবীণ' উপন্যাসটির পরিকল্পনা করেছিলেন লেখক। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপট উপন্যাসটির প্রধান আকর্ষণ নয়। সেই রাজনীতির দিকটি ততটা

অনুপুঙ্খতায় বর্ণনাও করেননি লেখক। এই উপন্যাসে তিন পুরুষের জীবন এক চালচিত্রে সংহত। সে দিক থেকে বাংলার বিশ শতকের প্রায় পূর্ণ একটি কালপ্রেক্ষাপট উপন্যাসে পাওয়া যায়। গ্রামের বিত্তশালী ভূস্বামী গ্রামের মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন সুখে-দুঃখে। পুত্রকন্যাদের মানুষ করবার সঙ্গে গ্রামের মানুষকেও দেখেন। তার পুত্র কৃষ্ণকান্ত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, রাজনীতিবিদ এবং মন্ত্রী। রাজনীতির স্বার্থের খেলায় আর সকলের মতো তিনিও জড়িত। দোষে-গুণে, ব্যক্তিত্বের দাপটে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ রূপে চরিত্রটিকে অত্যন্ত আকর্ষক করে এঁকেছেন লেখক। কিন্তু তার পুত্র ধ্রুব তাকে ঘৃণা করে। কারণ সে মনে করে তার মার মৃত্যুর জন্য তার পিতাই দায়ী। এই ঘৃণা থেকে সে এক ভাঙবার নেশায় মেতে ওঠে। স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর হয়, অতিরিক্ত মদ্যপান করে। বিশ শতকের শেষের দিকে বাংলার যুব সমাজের এক অংশের বিলাসী আত্মক্ষয়ের প্রবণতাকে ধ্রুবর মধ্যে দেখিয়েছেন লেখক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীর ভালোবাসা তাকে কিছুটা স্থিতি দেয়, সন্তানের স্নেহে সে জড়িয়ে পড়ে এবং পিতার মৃত্যুর পর জীবনের দায়িত্ব বোধের বৃত্তে আবার ফিরে আসে।

এই ব্যাপারটি আলোড়িত করে সারা পৃথিবীকে। ক্ষুধাকে হাতিয়ার করে যে সব ক্ষমতালোভী মানুষ মানবগোষ্ঠীর উপর দেশে দেশে চালিয়েছে নিপীড়ন, তারা আতঙ্কিত হয়। কারণ ফজল আলি ঘোষণা করেছে সে তার মতো উপায়হীন মানুষগুলিকে শিখিয়ে দেবে বেঁচে থাকার এই উপায়। সে একা নয়, তার সঙ্গে আসছে শোষিত নিরুপায় মানুষের দল। অত্যাশ্চর্য এই আগমনে মনুষ্যত্বের, মানব-অস্তিত্বের বিজয়ই যেন ঘোষণা করেছেন লেখক। উপন্যাসটি মনে পড়ায় পরশুরামের (রাজশেখর বসু) ‘পরশপাথর’ গল্পটির কথা। সোনার সহজ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় সেখানে ভয় পেয়েছিল শাসকশক্তি আর ব্যবসায়ীর দল। ‘ফজল আলি আসছে’-তে ক্ষুধাজয়ের উপায় জেনে-নেওয়া মানুষগুলি একইভাবে শঙ্কিত করেছে তাদের। ফজল আলি এক সাংকেতিক চরিত্র। তার আসার সম্ভাবনায় খরার দেশে জলের প্রত্যাশা জাগে। মানুষের হৃদয়ে, সমাজে, সংসারে, নৈরাশ্যে, বিপন্নতায় এই অদ্ভুত মানুষটি এসে সহায়কের ভূমিকা নেবে এমন বিচিত্র প্রত্যাশার বিভিন্ন টুকরো টুকরো দৃশ্য ও বর্ণনা এই উপন্যাস। সুনির্দিষ্ট কাহিনি নেই, সুনির্দিষ্ট পরিণতিও নেই। আছে কেবল মানুষের প্রত্যাশার এক প্রতীকী রূপ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে খুব নতুন কিছু না দিলেও স্বচ্ছন্দ ও সুপাঠ্য মধ্যবিত্তের কাহিনিবৃত্তের মধ্যেই জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবন-অনুভবের গভীরতাকে সঞ্চার করতে পেরেছেন।

কোনো কোনো উপন্যাসে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রচনারীতির বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাও করেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য ‘ফজল আলি আসছে’। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের আশ্চর্য এক প্রতীকধর্মী ঈষৎ কল্পবিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগা উপন্যাস ‘ফজল আলি আসছে’। উপন্যাসটিতে মানুষের অস্তিত্বের অনিবার্য অঙ্গ ক্ষুধাকে নিয়ে অর্থগৃধ্নু শক্তিমান শ্রেণির যে ঘৃণা ষড়যন্ত্র চলে—তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বেশ স্পষ্ট। এক বন্ধ কারখানার শ্রমিক ফজল আলি। কারখানা খোলার দাবি নিয়ে কিছু শ্রমিকের সঙ্গে করে অনশন। তার অনশন-সঙ্গীরা ক্রমে পিছু হটে। কিন্তু ফজল আলি অনড়। সবাই যখন তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে তখন দেখা যায় অত্যাশ্চর্য এক ঘটনা। ফজল আলি ধীরে ধীরে জীবনের দিকে ফিরে আসতে থাকে। অভিনন্দন জানাতে তাকে দেওয়া হয় টাকাগাঁথা ফুলের মালা। ফজল আলি তখন ব্যক্ত করে তার জীবনপ্রাপ্তির রহস্য। গাছের মতো, লতার মতো, সে পরিপার্শ্ব থেকে, আবহ থেকে আহরণ করছে জীবনরস। ফুলের মালা থেকে তার দেহ টেনে নিচ্ছে উদ্ভিদের মতো জীবনীশক্তি। ফলে তার আর কোনো শোষকের অধীনে কাজ করার দরকার নেই।

৩.২১ দেবেশ রায় (১৯৩৬-)

পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে এক সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে দেবেশ রায়ের জন্ম। বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ ছিল বিস্তৃত দেবেশ রায় বালক বয়সেই চলে আসেন জলপাইগুড়িতে এবং স্নাতক স্তর পর্যন্ত তাঁর লেখাপড়া সেখানেই সম্পন্ন হয়। ফলে উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, উত্তরবঙ্গের মফস্‌সল শহর এবং সেখানকার দরিদ্রবর্গের মানুষকে ঘনিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। এই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দেবেশ রায়ের লেখক-জীবনকে বহুল স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। সেই সময় থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং তখনই তাঁর ছোটো গল্প কলকাতার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করে দেবেশ রায় পুনশ্চ জলপাইগুড়িতে অধ্যাপনার বৃত্তি নিয়ে ফিরে যান এবং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সেই জীবিকায় স্থির থাকেন। অতঃপর তাঁর কলকাতায় বসবাস। লেখা এবং গবেষণাজাতীয় বৃত্তির সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত রেখেছেন আজীবন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ অল্প বয়স থেকেই। রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন জীবনের কথা কখনও ভাবেননি। পরিবারের সাহিত্যচর্চার আবহও ছিল।

দেবেশ রায় প্রথম থেকেই ভিন্নধর্মী কথাসাহিত্যিক। কোনো সময়েই তিনি পাঠকের কাছে সরল এবং সুবোধ্য হয়ে উঠবে এমন উপন্যাস লেখার কথা চিন্তাও করেননি। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য, উপন্যাসের উপাদান, উপন্যাসে লেখকের দৃষ্টিকোণ এবং উপন্যাসের ভাষা—এই সবকটি দিক সম্পর্কেই তাঁর নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র অভিমত আছে। তিনি মনে করেন উপন্যাসের উপাদান অবশ্যই বাস্তবতা। কিন্তু সেই বাস্তবতার কোনো সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় আকার-প্রকার নেই। বাস্তবতাও ব্যক্তিবিশেষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উদ্‌ভাসিত হয়। বাস্তবতাকেও মানুষ গড়ে নেয় নিজের মতো করে। দ্বিতীয় যে মতটি তিনি পোষণ করেন তা হল এই—আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত যে কথাবৃত্ত উপন্যাসের প্লট হিসেবে ধরে নিতে আমরা অভ্যস্ত সেই গড়নটি এসেছে উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্য উপন্যাস—বিশেষত ইংরেজি উপন্যাসের আদর্শ থেকে। এই অনুসরণকে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পগুণমণ্ডিত এবং আকর্ষক করে তুলতে পেরেছিলেন বলে বাংলা উপন্যাসের প্লট-পরিকল্পনা অতঃপর ওই একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে প্রায় দেড়শো বছর ধরে। এর ফলে বৈচিত্র্যও যেমন হারিয়ে গেছে, তেমনই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে ভারতের দেশজ আখ্যান কথনের ধারা। দেবেশ রায়ের মতে এই দেশজ আখ্যানের বৈশিষ্ট্য হল সুনির্দিষ্ট কোনো পরিণামে আখ্যান সমাপ্ত না করে কালপ্রবাহের মতো আখ্যানের নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলা। এই এগিয়ে চলার অর্থ সব সময়ে সম্মুখযাত্রা নয়। আখ্যানের বয়ন এখানে আপাতত-শিথিল। একটি কথাবৃত্তের সূত্র ধরে আর একটি কথাবৃত্ত এসে যাওয়া, বাস্তবের যৌক্তিক পারম্পর্য মেনে চলা সেখানে অর্থহীন। এদেশের মহাকাব্যগুলিতে, পুরাণকথায় যেমন আখ্যানের মধ্যে আখ্যান ঢুকে থাকে; একটি কথাবৃত্তের সমান্তরালে আর একটি কথাবৃত্ত চলতে থাকে, যে কোনো বিন্দু থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এক পার্শ্ব-কথাবৃত্ত—এরকমভাবেই লেখা হতে পারে এদেশের উপন্যাস।

দেবেশ রায়ের এই অভিমত সম্পর্কে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের বয়নে তাঁর নতুন পথের সন্ধান নিশ্চয়ই হতে পারে উপন্যাসের একটি বিকল্প গঠনপদ্ধতি। বস্তুত দেবেশ রায় নিজেই বেশ কয়েকটি উপন্যাসে অসম্ভব কুশলতায় এই পদ্ধতির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’, ‘তিস্তাপুরাণ’, ‘শিল্পায়নের প্রতিবেদন’ ইত্যাদি রচনা উল্লেখ্য।

দেবেশ রায়ের উপন্যাসের সংখ্যা তিরিশের কাছাকাছি। আমরা কয়েকটি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

দেবেশ রায়ের প্রথম দিকের একটি উপন্যাস ‘যযাতি’ (১৯৭৩)। উপন্যাসের অবলম্বন এক মফস্‌সল শহরের একটি পরিবারের চিত্র। একদা নিম্নবিত্ত পরিবারটি বর্তমানে উচ্চবিত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেখান থেকেই দেখা দিয়েছে উপন্যাসের সংকট। পিতা গিরিজামোহন, মা রেণু এবং ছেলে খোকা। এই তিন জনের আত্মকথন-সূত্রে উপন্যাসটি গ্রথিত।

এই রীতি অবশ্য বাংলা উপন্যাসে নতুন নয়। কিন্তু উপন্যাসটির মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন বেশ নতুন ধরনের কেন্দ্রীয় ঘটনা একটাই—গিরিজামোহনের বিত্ত অসৎ উপায়ে অর্জিত জেনে বড়োছেলে খোকা ক্ষোভে ও ঘৃণায় বাড়ি থেকে চলে গেছে। গিরিজামোহন ভাবেন তাঁর উদ্ধত পুত্র যৌবনের দর্পে তাঁকে তুচ্ছ করে গেছে। তাঁর বার্ধক্য পুত্রের যৌবনের তেজে বিপন্ন আর পিষ্ট। খোকা তার সতেজ, সবল, স্বচ্ছ যৌবনের উজ্জ্বলতায় পিতার উত্তরাধিকার অস্বীকার করে মনে মনে ঘেষণা করে—''আমরা উত্তরাধিকার তোমাকে স্বীকার করতে হবে''। এখানেই 'যযাতি' নামকরণের তাৎপর্য বোঝা যায়। মহাভারতে পুত্রের যৌবন পিতা গ্রহণ করেছিল। এখানে পিতা পুত্রের যৌবনভারে পীড়িত। পুরাণকাহিনিতে মায়ের কোনো ভূমিকাই ছিল না। কিন্তু এখানে মা তাঁর অবহেলিত সত্তার যন্ত্রণা নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। স্বামীর কাছে তিনি উপেক্ষিত ছিলেন। সন্তানও তাঁকে মূল্য দেয়নি। এই উপন্যাসে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট কথাবৃত্ত এবং নাটকীয়তাও লক্ষণীয়।

কয়েক বছর পরে লেখা উপন্যাস 'মফঃসলী বৃত্তান্ত' (১৯৮০)-তে লেখক কাহিনির পারম্পর্যময় ছক থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন, ভাষাকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তুতেও সরে এসেছেন মধ্যবিত্ত জীবন থেকে দরিদ্র রাজবংশীয়দের জীবনে। এই বিষয়ে তিনি পরবর্তীকালে বার বার ফিরে গেছেন। দরিদ্র মানুষ বাস করে তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণার মধ্যে। বাবুদের রাজনীতি আর ঘিরে থাকা প্রকৃতি তাদের দুঃসহ যন্ত্রণাকে সহনযোগ্য করতে পারে না। সমগ্র জীবনটাই দরিদ্র আদিবাসীদের কাছে এক বিপুল ক্ষুধার প্রান্তর। উপন্যাসটি সাহিত্যরসিক যথেষ্টই আলোড়িত করেছিল।

আমরা চলে আসব একটি ভিন্নধরনের উপন্যস 'বেঁচে বত্‌তো থাকা' (১৯৮৪)-র প্রসঙ্গে। এক দম্পতির কাহিনি। বিজিত আর স্বপ্না পরস্পরকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে। তাদের সম্পর্ক আপাত স্বাভাবিক। এবং জীবন আধুনিক কালোপযোগী বিলাসিতামুখী। পরস্পরের প্রতি ঘাত-প্রতিঘাতেও তারা মেতে ওঠে। স্বপ্নার বার বার গর্ভপাত হয়। সন্তানহীনতার শূন্যতা তাদের ঘিরে ধরে। জীবনে ভোগসুখ আসে আরও। ক্রমশই তারা বিবাহিত সম্পর্কের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আলাদা ব্যক্তিসত্ত্বা হয়ে ওঠে। দুজনেই একা হয়ে যায়। লেখক হিসাবে দেবেশ রায় সুশিক্ষিত, সাহিত্যমনস্ক গভীরস্বভাব পাঠকদের জন্যই লেখেন তা স্পষ্ট হয়ে যায় এই সময় থেকেই।

লেখকের এক অসামান্য কীর্তি ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। সুপরিসর উপন্যাসটিতে আছে উত্তরবঙ্গের তিস্তাতীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা রাজবংশী সম্প্রদায়ের পাঁচশো বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। কিন্তু কেবলই জাতিগোষ্ঠীর বিবরণ নয়, এই উপন্যাস সেই অনাদি অনন্ত শোষণের গল্প। এক জন্মদাস—তার কোনো নামও নেই। বাঘ মেরেছিল বলে বাঘারু বর্মন বলেই তার পরিচিতি। জোতদার গয়ানাথের সম্পত্তি। গয়ানাথের আদেশে বন্যায় ভেসে যাওয়া তার গাছগুলিকে রক্ষা করবার জন্য গাছগুলির সঙ্গে নাইলনের দড়িতে নিজেকে বেঁধে সে ভেসে যায় তিস্তার বন্যায়। উপন্যাসটিতে আছে আরও বহু শাখাপ্রশাখা। শেষ পর্যন্ত বাঘারু তার শোষিত অতীত এবং রাজবংশীদের রাজনীতি—সব কিছু ত্যাগ করে আর একটি অনাথ বালককে সঙ্গে নিয়ে বিশাল বিশ্বে নিজের জায়গা খুঁজে নেবার পথে পা বাড়ায়।

ক্রমশই দেবেশ রায় ওই বৃত্তায়িত ঘটনানির্ভর প্লটের বন্ধনগুলি ছেড়ে এসেছেন। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি লেখে। কখনও বন্যা, খরা, দাঙ্গায় বিধ্বস্ত দেশকে নিয়ে, কখনও মধ্যবিত্ত সমাজ-সংসারের মানব সম্পর্ক নিয়ে; কখনও শোষক ও শোষিতের বিভিন্ন সম্পর্ক বিন্যাস নিয়ে। একটি চাবাগান বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সহসা জীবিকাহীন হয়ে যাওয়া আদিবাসী চা-শ্রমিকদের রিক্ততা নিয়ে লেখা 'শিল্পায়নের প্রতিবেদন' (১৯৯৬) একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কখনও আবার বিদেশবাসী ভারতীয়ের সঙ্গে এদেশের মানুষের সম্পর্কের বিচিত্র বিন্যাস নিয়ে লেখেন উপন্যাস। 'স্বদেশ বিদেশ' (১৯৯৩) উপন্যাসটি সেই এক ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হয়ে এদেশের মানুষের আর

এক ঔপনিবেশিকতায় বাঁধা পড়বার কাহিনি। 'তিস্তাপুরাণ' (১৯৯৭) উপন্যাসটি তুলনায় আদিবাসী জীবনের কিছুটা স্থিতি লাভের কাহিনি। শোষণের চাকা এখানেও দৃশ্যমান। কিন্তু সেই শোষণ এখানে মানবাত্মাকে গ্রাস করতে পারেনি। নিজেদের জীবন-অস্তিত্বের ইতিবাচক অর্থ এখানে আদিবাসীরা খুঁজে পায়। হয়তো বা বহু ঘাটতি আর ফাঁকফোকর থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে আদিবাসীদের অন্তত কিছু অংশে উন্নয়নের নীতি কিছুটা কার্যকর হয়েছে। এই সত্যই উপন্যাসটিতে পরিস্ফুট। 'তিস্তাপুরাণ' আসলে জীবনেরই আবহমান পুরাণকথা।

দেবেশ রায় বর্তমানের নিত্য নবীন সৃষ্টিশীল লেখক। তাঁর জীবনদৃষ্টির পরিসরে দেশের, বিশ্বের এবং সর্বমানবের বাস্তবতা আর মনোরাজ্যের রহস্যের বহু দিক এখনও উন্মোচিত হতে পারে। এখনও পর্যন্ত তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' (২০১৫)।

৩.২২ অনুশীলনী

১। স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু সমস্যা একটি বিষয়রূপে দেখা দিয়েছে। প্রাসঙ্গিক কিছু উপন্যাস অবলম্বনে এই সামাজিক সংকটের চিত্রটি বিবৃত করুন।

২। বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উপন্যাসের মূল উপজীব্য। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৩। অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য ও দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।— মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করুন।

৪। সময়ের গতির সঙ্গে সমরেশ বসুর উপন্যাসের বিষয়-সন্ধান ও রূপকর্ম বার বার নবীন হয়ে উঠেছে।— এবিষয়ে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৫। স্বাধীনতা-উত্তরকালে যাঁরা রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন ননী ভৌমিক ও সাবিত্রী রায়।—রাজনৈতিক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে এই দুই লেখকের সাফল্যের পরিমাপ করুন।

৬। দেশবিভাগের ঠিক পরেই মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে কলকাতা শহর একই সঙ্গে হয়ে উঠেছিল জীবন-সংগ্রামের কঠিন ক্ষেত্র এবং ব্যক্তির আশ্রয়। বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে এই সত্যের উদ্‌ঘাটন আছে।—আলোচনা করুন।

৭। পূর্বভারতের শোষিত জনজাতি গোষ্ঠীর সংকট নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর এ-জাতীয় উপন্যাসগুলির পরিচয় দিন।

৮। সমাজ-সচেতনতার পাশাপাশি প্রগাঢ় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লিখতেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ঔপন্যাসিকেরা।— উদাহরণ সহ এই মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করুন।

৯। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ছেড়ে আসা পূর্ববঙ্গের স্মৃতি একাধিক বাংলা উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রফুল্ল রায় ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রসঙ্গে বিষয়টি পরিস্ফুট করুন।

১০। সত্তর-আশির দশকে অস্থির ও বিভ্রান্ত যুব-সমাজকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন অনেকেই। প্রাসঙ্গিক উপন্যাসের উল্লেখ করে এই বিষয়টি আলোচনা করুন।

১১। বিষয়বস্তু, দৃষ্টিকোণ এবং বক্তব্যের নতুনত্বে 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের এক অসামান্য সৃষ্টি।—অভিমতের সপক্ষে যুক্তি দেখান।

১২। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় উপন্যাসের একটি ধারা সৃষ্ট হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস প্রসঙ্গে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

১৩। স্বতন্ত্রভাবে কয়েকজন ঔপন্যাসিকের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ধারণা করে রাখতে হবে—

(ক) বিমল কর

(খ) মহাশ্বেতা দেবী

(গ) জ্যোতিরিন্দ্র মজুমদার

(ঘ) অমিয়ভূষণ মজুমদার

(ঙ) সমরেশ বসু

(চ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(ছ) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

১৪। গুণময় মান্নার উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের যে জীবন চিত্রিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

১৫। অসীম রায় ব্যতিক্রমধর্মী ঔপন্যাসিক।—আলোচনা করুন।

৩.২৩ গ্রন্থপঞ্জি

বইয়ের নাম	**লেখকের নাম**	**প্রকাশনা**	**প্রকাশ কাল**
দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী রায়চৌধুরী	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৫
বাংলা ছোটগল্প	শিশিরকুমার দাস	,,	
বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	ভূদেব চৌধুরী	মডার্ন	১৯৯৯
বাংলা গল্পবিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	প্রকাশভবন	১৯৯৫
সাহিত্যে ছোটগল্প	,,	ডি.এম.লাইব্রেরি	১৯৬১
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	প্রমথনাথ বিশী	মিত্র ও ঘোষ	
রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজতত্ত্ব	ক্ষেত্র গুপ্ত	গ্রন্থনিলয়	
অন্য রবীন্দ্রনাথ	,,	,,	
রবীন্দ্র ছোট গল্পের শিল্পরূপ	তপোব্রত ঘোষ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৪
কালের পুত্তলিকা	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	,,	১৯৯৫
কালের প্রতিমা	,,	,,	১৯৭৪
মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে	,,	,,	১৯৯৫
কল্লোলিত ছোটগল্প	রবীন পাল	বুক ট্রাস্ট	১৯৮৮
ভাঙা কাচের শিল্প	অর্জুন রায় সম্পাদিত	প্রয়াস	১৯৯৪
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মডার্ন	
উপন্যাসের উজানে	রবীন পাল	চ্যাটার্জি পাবলিশার্স	
সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য	আলোক রায় সম্পাদিত	সাহিত্যলোক	
উপন্যাস নিয়ে	দেবেশ রায়	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৭
বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	গ্রন্থালয়	

বইয়ের নাম	লেখকের নাম	প্রকাশনা	প্রকাশ কাল
আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস	অশ্রুকুমার শিকদার	অরুণা	১৯৮৮
প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস	অরুণ সান্যাল সম্পাদিত	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯১
পঞ্চাশৎ পরিক্রমা	ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত	বিশ্বভারতী	
বাংলা উপন্যাস : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি	অলোক রায়	পুস্তক বিপণি	২০০০
সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন	পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন	১৯৮৯
আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী	জগদীশ ভট্টাচার্য	ভারবি	১৯৯৪
অন্তর্বয়ন : কথাসাহিত্য	পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	একুশে	১৯৯০
প্রবন্ধ : কতিপয়	সমরেশ মজুমদার	রত্নাবলী	১৯৯৫
কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা	অলোক রায়	সাহিত্যলোক	১৯৯২
উপন্যাসের ঘরবাড়ি	জহর সেনমজুমদার	পুস্তক বিপণি	২০০১
উপন্যাসের বর্ণমালা	সুমিতা চক্রবর্তী		২০০৩
বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস	ক্ষেত্র গুপ্ত	গ্রন্থনিলয়	২০০৮
বাংলা উপন্যাসের কালান্তর	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	দে’জ পাবলিশিং	২০০৪
বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ	,,	প.ব.বাঃ.আ.	১৯৯৬
বিভূতিভূষণের কথাশিল্প	পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুশায়েরা		২০০১
বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস	দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়	পুস্তক বিপণি	২০০২
গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ	২০০৯

একক ৪ ❑ ছোটোগল্প—ভাগ ১

গঠন

৪.১ শরৎচন্দ্রের ছোটোগল্প
৪.২ প্রভাতকুমারের ছোটোগল্প : শ্রেণিবিভাগ
 ৪.২.১ নির্মল হাস্যরসের গল্প
 ৪.২.২ মনস্তাত্ত্বিক ও সমস্যামূলক গল্প
 ৪.২.৩ বিদেশি পটভূমিকায় রচিত গল্প
৪.৩ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪.৪ প্রমথ চৌধুরী
 ৪.৪.১ প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প : বৈশিষ্ট্য
 ৪.৪.২ প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প শ্রেণিবিভাগ ও আলোচনা
৪.৫ পরশুরাম
৪.৬ প্রেমেন্দ্র মিত্র
৪.৭ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৪.৮ জগদীশ গুপ্ত
৪.৯ মনীশ গুপ্ত
৪.১০ কাজি নজরুল ইসলাম
৪.১১ জীবনানন্দ দাশ
৪.১২ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
৪.১৩ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৪.১৪ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৪.১৫ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৪.১৬ শিবরাম চক্রবর্তী
৪.১৭ বনফুল
৪.১৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪.১৯ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৪.২০ অনুশীলনী
৪.২১ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ শরৎচন্দ্রের ছোটোগল্প

বাংলা ছোটোগল্পের প্রকৃত স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। ছোটোগল্পের সঠিক আস্বাদ প্রথম তাঁর গল্পেই পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) মূলত ঔপন্যাসিক। তাঁর যেসব গল্প ছোটোগল্প হিসাবে প্রচলিত আছে, তাদের অনেকগুলিই প্রকৃতিতে ঠিক ছোটোগল্পের মতো নয়। তবে ছোটোগল্প বলা যেতে পারে, এমন রচনাও তিনি কিছু উপহার দিয়েছেন।

'বিন্দুরছেলে' (১৯১৪) এবং 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭) গল্প দুটির ছক প্রায় একইরকম। সরলা বড়জা, শিবতুল্য বড়দা, সরল অন্তঃকরণযুক্ত অথচ মেজাজি ছোটবউ—মেজভায়ের বউ এসে পড়াতেই সুখের সংসারে অশান্তির দাবানল, এবং শেষপর্যন্ত শান্তির প্রতিষ্ঠা। বিন্দুর ছেলেতে ছোটোবউয়ের ফিটের অসুখ ভালো হয়েছে বড়জার ছেলে অমূল্যচরণকে নিজের ছেলে করে নিতে পারে। সেই ছেলেই তার ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু মেজোবউয়ের ছেলে নরেন এসে সব গোলমাল করে দেয়। নিষ্কৃতি গল্পেও মেজছেলে হরিশ এবং তার স্ত্রী নয়ন তিনভায়ের একান্নবর্তী সংসারকে প্রায় তছনছ করে দেয়। এখানে একমাত্র ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র ছোটোবউ শৈল।

'রামের সুমতি' (১৯১৪) বা 'মেজদিদি' (১৯১৫) গল্প প্রায় ছোটো উপন্যাসের মতো। 'রামের সুমতি' গল্পে দুরন্ত রামের প্রতি বৌদি নারায়ণীর অপত্যস্নেহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে নারায়ণীর মা। তাঁর প্রচুর বিরোধিতার পর রাম অবশ্য আচার-আচরণে কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। 'মেজদিদি' গল্পে আবেগের প্রাবল্য অত্যন্ত বেশি। মা মারা যাবার পর দরিদ্র অথচ স্নেহে লালিত কেষ্টকে সম্পর্কিত দিদির আশ্রয়ে এসে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়। নিঃসম্পর্কিত মেজদিদির কাছে তার সেই অপত্যস্নেহের সম্পর্কই গল্পের মূল আকর্ষণ।

শরৎচন্দ্রের কিছু গল্প অবশ্য সঠিকভাবে ছোটোগল্পেরই লক্ষণাক্রান্ত। এগুলির মধ্যে 'একাদশী বৈরাগী' (১৯১৮), 'অভাগীর স্বর্গ' (১৯২৬), 'মহেশ' (১৯২৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'একাদশী বৈরাগী' গল্পে একটি অসাধারণ চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। কুসীদজীবী এই মানুষটিকে একেবারেই অর্থলোলুপ শয়তান বলে আমাদের মনে হয়। পাওনা পয়সা আদায় করবার জন্য তিনি মানুষকে যেভাবে নির্যাতন করেন তাতে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আমাদের প্রায় কোনো সন্দেহই থাকে না। অথচ গল্পের শেষের দিকে একটি নিঃস্ব বিধবার প্রায় তামাদি হয়ে যাওয়া সম্পত্তি তিনি যেভাবে স্মরণ করেন ও ফেরত দেন তাতে মনুষ্যত্বের দিকটি অকস্মাৎই উন্মোচিত হয়ে চরিত্রটি এক অসাধারণ দীপ্তি পায়।

'অভাগীর স্বর্গ' এবং 'মহেশ' দুটি গল্পেই সমাজের নিম্নশ্রেণির প্রতি উচ্চতর সমাজের শোষণ ও বঞ্চনার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম গল্পে বাউরির মেয়ে কাঙালির মা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে একটিমাত্র আশা পোষণ করতো, মৃত্যুর পর ছেলের হয়তো আগুন পাবে এবং স্বর্গ থেকে রথ এসে তার আত্মাকে ওপরে তুলে নিয়ে যাবে। সে আশাও যে তার মৃত্যুর কেমন করে নির্মূল হয়ে যায়, এই ভাবাবেশের ওপরই গল্পটির বিস্তার। 'মহেশ' গল্পে মুসলমান চাষা গফুরের গরুর নাম মহেশ। অতি প্রিয় এই জীবনটিকে সে নিজেই কীভাবে হত্যা করতে বাধ্য হয় এবং তারপরে সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করে ফুলবেড়ের চটকলের শ্রমিক হতে যায় মেয়ের হাত ধরে, তারই একটি অশ্রুসজল গল্প এটি।

সঠিকভাবে বলতে গেলে শরৎচন্দ্র ছোটোগল্পের শিল্পী ছিলেন না, তবে উচ্চশ্রেণির সাহিত্যপ্রতিভা যেকোনো ক্ষেত্রেই যে উৎকর্ষ দেখাতে পারেন, সে উৎকর্ষ তাঁর ছোটোগল্পেও আমরা দেখি।

৪.২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে বাংলা ছোটোগল্পের একজন বড় শিল্পী বলা যেতে পারে। উপন্যাসও তিনি কিছু লিখেছিলেন, কিন্তু ছোটোগল্পেই তাঁর প্রতিভা সঠিকভাবে নিজের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে নিতে পেরেছে। তাঁর গল্পের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ার কল্পনার ঝোঁক পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই'।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিশেষ এক ধরনের গল্প সম্পর্কেই এ মন্তব্য করেছেন, কিন্তু সব ধরনের গল্পের পক্ষেই এ বক্তব্য প্রযোজ্য। গল্পের মধ্যে গল্পাংশকে, তার নাটকীয়তাকে এবং সেই নাটকীয়তা ফুটিয়ে তুলবার জন্য যে বিন্যাস গড়ে তোলা দরকার, তার ওপরেই তিনি বেশি জোর দিয়েছেন একথা সত্য বটে, কিন্তু ভাষানির্মিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত, একথা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই।

প্রভাতকুমারের ছোটোগল্প : শ্রেণিবিভাগ

প্রভাতকুমারের ছোটোগল্পকে আমরা মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি :

(১) নির্মল হাস্যরসের গল্প,

(২) মনস্তাত্ত্বিক ও সমস্যামূলক গল্প এবং

(৩) বিদেশি পটভূমিকায় রচিত বাংলা গল্প।

এই তিন ধরনের গল্প রচনাতেই প্রভাতকুমার যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আমরা একে একে এই তিনশ্রেণির গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেব।

৪.২.১ নির্মল হাস্যরসের গল্প

প্রভাতকুমারের হাসির গল্পগুলি একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এগুলির মধ্যে কোনো জটিল সমস্যা নেই, তীক্ষ্ণধার শ্লেষ বা সামাজিক কুপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সমালোচনাও নেই, শুধুই উদ্ভট পরিস্থিতি দ্বারা এবং চরিত্রের কোনো অসঙ্গতির অতিরেকের দ্বারা কৌতুক সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। কয়েকটি গল্পের দৃষ্টান্ত দিলেই একথা বোঝা যাবে।

'বলবান জামাতা' গল্পে দেখি, নলিনী নিজের নারীসুলভ কমনীয়তার জন্য বিস্তর লজ্জিত ছিল। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে শুরু হয় তার সাধনা, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে যেন সে বিষয়ে কেউ অবহিত ছিল না, সুতরাং ভুল বোঝা শুরু হয়ে যায় এবং এই ভ্রান্তিবিলাসই গল্পের মুখ্য উপকরণ। 'রসময়ীর রসিকতা' ও প্রভাতকুমারের আর একটি বিখ্যাত গল্প, কিন্তু স্বাদে এই গল্প সম্পূর্ণ পৃথক। দজ্জাল স্ত্রী রসময়ী জীবিতকালেই বুঝে গিয়েছিল স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করবেই। এ বিবাহ অটকাবার জন্য পাত্রী দেখার বিভিন্ন অনিবার্য স্তর কল্পনা করে, সে উপযোগী পত্র রচনা করেই গিয়েছিল। পত্রগুলি যে রসময়ীরই লেখা, তার অনন্য বর্ণনাই তার প্রমাণ। থিওজফিস্ট মহলে এই ভৌতিক পত্রাবলি নিয়ে আলোড়ন উঠে গিয়েছে। 'পোস্টমাস্টার' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্প থাকা সত্ত্বেও প্রভাতকুমার নিজেও এই নামে একটি গল্প লিখেছেন। সেখানে পোস্টমাস্টার প্রেমের পরোক্ষ আস্বাদন গ্রহণ করার জন্য খাম খুলে গোপনে প্রেমপত্র পড়ে। পরিণতি অবশ্য বিষাদান্ত না হয় মিলনান্ত হয়ে ওঠে, কারণ চিঠি খোলা ও টাকা চুরির অজুহাত হিসাবে সে দেখাতে পারে স্বদেশি ডাকাতি রোধ! এমনকী চাকরিতে তার উন্নতি হয়ে যায়।

'প্রতিজ্ঞাপূরণ' গল্পে নব্যযুবক ভবতোষ হঠাৎ পণ করে বসে, সুন্দরী স্ত্রী সে বিবাহ করবে না, করবে কুরূপা স্ত্রী। কন্যা-নির্বাচন পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অটল ছিল ভবতোষ, কিন্তু বিবাহের দিন যত এগিয়ে আসে তত তার মন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে পাত্রীর মুখচোখের চেহারা স্মরণ করে। পরিণতিতে গল্পটি অবশ্য সুখেরই হয়ে ওঠে, কারণ জানা যায় ভবতোষের খামখেয়ালির কথা চিন্তা করেই একটি কুরূপা মেয়ে তাকে দেখানো হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত পাত্রী মোটেই অসুন্দরী নয়। 'নিষিদ্ধ ফল' গল্পটিও প্রণয় সংক্রান্তই। পুত্রবধূর ষোলো বছর বয়স হবার আগে পুত্রের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাত হতেই পারে না বলে ফতোয়া জাহির করেছিলেন পুত্রের সমাজসংস্কারক পিতা! কিন্তু প্রকৃতির আকর্ষণ দেখা গেল দোর্দণ্ডপ্রতাপ সমাজসংস্কারকেরও নিয়ম মানে না, সুতরাং তাঁকে মত পরিবর্তন করে 'চৌদ্দ' করতে হয়েছে।

অবশ্য এই কটি গল্প থেকে প্রভাতকুমারের হাস্যরস সৃষ্টিতে অনায়াস দক্ষতা বোঝা শক্ত। তাঁর 'মাস্টার মহাশয়', 'লেডি ডাক্তার', 'সচ্চরিত্র', 'সারদার কীর্তি, 'খুড়া মহাশয়', প্রভৃতি গল্পও বেশ উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি।

৪.২.২ মনস্তাত্ত্বিক ও সমস্যামূলক গল্প

মনস্তত্ত্ব যদিও প্রভাতকুমারের অনেক গল্পেরই অবলম্বন, তবু বিশেষভাবে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও সামাজিক সমস্যমূলক বেশ কিছু গল্প তিনি লিখেছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম করতে হবে 'দেবী'র। শাক্ত মতাবলম্বী এবং অন্ধ বিশ্বাসী শ্বশুড় হঠাৎ স্বপ্ন পান, তাঁর পুত্রবধূর বেশে স্বয়ং দেবীই তাঁর সংসারে এসেছেন। শ্বশুরমশাই পুত্রবধূকে দেবীজ্ঞানে পূজা করতে শুরু করেন। এবিষয়ে কারো আপত্তিই গ্রাহ্য হয় না। উত্তক্ত পুত্র শেষ উপায় হিসাবে স্ত্রীকে নিয়ে পালাতে চায়, কিন্তু ততদিনে পুত্রবধূর মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া পূর্ণ হয়েছে—হাজার হাজার লোকের জয়ধ্বনি ও দেবীদর্শন। শ্বশুরমশাইয়ের পূজা তার নিজের সম্বন্ধে ধারণাকেও পালটে দিয়েছে, সে যেতে পারে না। সে ভুল যে ঘটনায় ভাঙে, সেই পরিণতি বড় নির্মম।

মনুষ্যেতর প্রাণী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক ভালো গল্প লেখা হয়েছে—শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়', পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' তার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র, প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' গল্পটিও এই তালিকায় সংযোজিত হতে পারে। মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের অতি প্রিয় হাতি 'আদরিণী'-কে নিয়ে গল্প আজও আকর্ষণীয় হয়ে আছে।

প্রভাতকুমার এই জাতীয় গল্প আরও কিছু লিখেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'বাল্যবন্ধু', 'কাশীবাসিনী', 'ভুল শিক্ষার বিপদ' প্রভৃতি। প্রসঙ্গত কিছু রাজনৈতিক গল্পের নামও করা দরকার, এগুলি—'উকিলের বুদ্ধি', 'হাতে হাতে ফল', 'খালাস', 'মাদুলি' ইত্যাদি।

৪.২.৩ বিদেশি পটভূমিকায় রচিত গল্প

প্রভাতকুমার ইংল্যান্ডের পটভূমিকায় এবং ইংরেজ চরিত্র নিয়ে কিছু কিছু গল্প লিখেছেন যেগুলি বাংলাভাষার সম্পদবিশেষ। গল্পগুলির বেশির ভাগই অত্যন্ত মানবিক সুখ-দুঃখ নিয়ে রচিত, কিন্তু শুধুমাত্র আবেগনির্ভর নয়—তাদের শাশ্বত মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। এইসব গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মুক্তি', 'পুনর্মূষিক', 'ভিখারি সাহেব', 'বিলাতফেরতের বিপদ', 'কুকুরছানা', 'কুমুদের বন্ধু' 'ফুলের মূল্য', 'সতী', 'প্রবাসিনী' প্রভৃতি। কয়েকটি গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই এগুলির স্বাদ কেমন ছিল তা বোঝা যাবে।

'পুনর্মূষিক' গল্পে মুখ্য চরিত্র মিস টেম্প্‌ল্‌। হিন্দুধর্ম এবং এই ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর আবেগমিশ্রিত অনুরাগ অনেক বঙ্গযুবকেরই আমোদের বস্তু ছিল। একদিকে সেই আমোদ এবং অন্যদিকে অনুরাগের আন্তরিকতা শেষপর্যন্ত একটি হিন্দু যুবকের মধ্যে কেমন ক্ষণস্থায়ী জটিলতার সৃষ্টি করেছিল সেটাই গল্পের বিষয়। 'ভিখারি সাহেব' গল্পে পাই ভারতপ্রবাসী এক স্মৃতিভ্রষ্ট বিশিষ্ট ইংরেজকে যিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় বা পূর্বেকার কোনো কিছুর কথাই মনে রাখতে পারেন না, কিন্তু হাভানা চুরুটের যে নেশা ছিল, সেই নেশাটির কথা ভুলতে পারেন না কিছুতেই। পরে অবশ্য ইমার্জেন্সি চিকিৎসায় জড়িয়ে পড়ায় সকলে বুঝতে পারেন তিনি কত বড় চিকিৎসক এবং তাঁর প্রকৃত পরিচয়ও জানা যায়।

এই জাতীয় প্রেমের ও স্নেহসম্পদের গল্পগুলি এককথায় অনবদ্য। 'কুমুদের বন্ধু' গল্পে একটি নিম্নবিত্ত দাসীবৃত্তি করা স্ত্রীলোকের নিঃস্বার্থ প্রেমের ছবি আছে। 'ফুলের মূল্য' গল্পে দেখি ব্যাকুল এক ইংরেজতনয়ার প্রেম, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলেও যিনি ভুলতে পারেন না ভারতবর্ষে চলে যাওয়া তাঁর প্রিয়জনকে। 'মাতৃহারা' গল্পে দেখি ইংল্যান্ডপ্রবাসী একটি বাঙালি যুবেকের প্রতি বর্ষীয়সী এক ইংরেজরমণীর কী গভীর অপত্য প্রেম। এই ধরনের মর্মস্পর্শী

করুণ গল্প বাংলাসাহিত্যে অল্পই হয়েছে। 'সত্যি' গল্পে প্রেমের তীব্রতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই যেখানে বসন্তরোগে আক্রান্ত এক বাঙালি প্রেমিকের জন্য ইংরেজ প্রেমিকা জীবন বিসর্জন দিয়েছে। মোট কথা ইংরেজ-বাঙালির এই প্রেমবিষয়ক গল্পগুলিতে প্রভাত কুমার দেখিয়েছেন প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো ভৌগোলিক বা জাতিগত সীমারেখার কোনো মূল্য নেই।

৪.৩ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)

ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৩৮) খ্যাতি মূলত তাঁর উপন্যাসের জন্য। এক সময় তাঁর 'যমুনা পুলিনের ভিখারিনী' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এছাড়াও 'স্রোতের ফুল', 'পরগাছা', 'হেরফের', 'দোটানা' প্রভৃতি উপন্যাসও বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। রবীন্দ্রচর্চামূলক গ্রন্থ, দুখণ্ডে সমাপ্ত 'রবি-রশ্মি' ও সমালোচনাক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত।

ছোটোগল্পকার হিসাবেই কিন্তু চারুচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'মরমের কথা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটো গল্প। 'প্রবাসী' পত্রিকার পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবেও তিনি অনেক দিন কাজ করেন। তাঁর ছোটোগল্পগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল কিনা বলা শক্ত, তবে তিনি প্রচুর গল্প রচনা করেছেন এবং ছোটোগল্পের সংকলনও তাঁর অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি হল—'পুষ্পপাত্র', 'সওগাত', 'চাঁদমালা', 'পঞ্চদশী', 'বরণ-ডালা' প্রভৃতি।

৪.৪ প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' একটি বুদ্ধিবাদী আন্দোলনের নাম। এই আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষকেও প্রভাবিত করেছিল। বাংলা গদ্যে চলিতরীতির একনিষ্ঠ সমর্থক প্রমথ চৌধুরীর এই চিন্তাধারাকে যাচাই করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে দুটি উপন্যাস শুরু করেছিলেন—ঘরে-বাইরে এবং চতুরঙ্গ। বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী প্রমথ চৌধুরী জীবনে ছোটোগল্প লিখেছেন প্রচুর, প্রবন্ধ লিখেছেন অনেক, কবিতার চর্চা—বিশেষ করে সনেটজাতীয় কবিতার সংখ্যাও তাঁর কম নয়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, একটি উপন্যাসও তিনি রচনা করেননি। সফল ছোটোগল্পকার অথচ ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টা একটিও নেই, এমন সাহিত্যিক বোধহয় বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত হবে।

৪.৪.১ প্রমথ চৌধুরীর ছোটোগল্প : বৈশিষ্ট্য

আঙ্গিকের জন্যই প্রমথ চৌধুরীকে পরবর্তীকালে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়, সেই আঙ্গিক চমৎকারিত্ব এবং রূপসিদ্ধ প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় কোনো সন্দেহ নেই, বাগ্‌ভঙ্গির বিশেষ তির্যকতা, সরস মন্তব্য ও তীক্ষ্ণ মননশীলতা তার গল্পকে যে একটা ভিন্ন স্বাদ দান করেছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তবে সেই সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে বিষয় এবং উপস্থাপনাতেও প্রমথ চৌধুরী অনেক নতুনত্ব এনেছিলেন। গল্পে আবেগের প্রাধান্য প্রায় নিশ্চিত করেছিলেন তিনি, মানবজীবনের সমস্ত কিছুকেই বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন তিনি, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। সুতরাং বলতেই হবে, বাংলা ছোটোগল্পের ধারার বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও তিনি নতুনত্ব আনতে পেরেছিলেন।

একটি কথা প্রমথ চৌধুরী বেশ কয়েকবার বলেছেন, তিনি যখন রসিকতা করেন, লোকে মনে করে তিনি গুরুগম্ভীর কথা বলছেন—যখন গুরুগম্ভীর কথা বলেন, লোকে মনে করে তিনি রসিকতা করছেন। হতে পারে, তাঁর গাম্ভীর্যেও রসিকতার ভঙ্গিতে প্রভেদ হয়তো খুব বেশি কিছু নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, তার গল্পে এবং

প্রবন্ধে ভেদরেখাটা আরও ছোটো। অনেক গল্পেরই উপস্থাপনা প্রবন্ধের মতো এবং যুক্তিনিষ্ঠ। এ কথাটি মনে রাখলে তাঁর গল্পপাঠ অনেক সহজ হবে।

৪.৪.২ প্রমথ চৌধুরীর ছোটোগল্প : শ্রেণিবিভাগ ও আলোচনা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'তাঁদের গল্পের শ্রেণিবিভাগের প্রয়াস অনেকটা পণ্ডশ্রম', কারণ এক শ্রেণির মধ্যে অন্য শ্রেণি ঢুকে পড়া এবং তারপর বুদ্ধির আরকে সবটাই নেড়েচেড়ে নেওয়া প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য। তবু সাধারণভাবে একটা চেষ্টা করলে বলা যায় মোট চাররকমের গল্প তিনি লিখেছেন—

(ক) প্রণয় রসাত্মক গল্প,

(খ) তর্কমূলক ব্যঙ্গাত্মক গল্প,

(গ) উদ্ভট ও অতিরিক্ত গল্প এবং

(ঘ) গুরুগম্ভীর গল্প।

সব গল্পেই কিন্তু বুদ্ধিপ্রাধান্য অব্যাহত এবং প্রকৃত ও অতিপ্রাকৃত চরিত্র, প্রত্যেকেই বৌদ্ধিক জগতের অধিবাসী। আমরা প্রত্যেকটি শ্রেণিবিষয়ে সামান্য আভাস দেব।

প্রথম ধরনের গল্পে যে আবেগ এবং মিষ্টতা থাকে, প্রমথ চৌধুরীর গল্পে তার খুবই অভাব। 'ট্র্যাজেডির সূত্রপাত' গল্পে দেখি, এক প্রৌঢ় অধ্যাপক তাঁর পুত্রের সফল শিক্ষাজীবন সম্বন্ধেও সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, কারণ সে প্রকৃতির সংযম শেখেনি। প্রসঙ্গত নিজের জীবনের একটি প্রণয়ের ঘটনাও তিনি বিবৃত করেছেন। গল্পে পরিহাস অনেক আছে, কিন্তু এত প্রণয়ের কথাতেও কোনো কবিত্ব আসেনি। 'সহযাত্রী' গল্পেও এই কোমল মানবিকতার পরিবর্তে অতিরঞ্জিত ব্যক্তিত্ব-বিলাস গল্পের কমনীয়তা নষ্ট করেছে। সহযাত্রী সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুরের প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রণয়জীবন এমনই চড়া পর্দায় আঁকা যে, এখন তিনি বন্দুক হাতে ট্রেনে খুঁজে বেড়ান তাঁর অবিশ্বাসিনী স্ত্রীকে— এই হাস্যরসাত্মক চিত্রই বড় হয়ে উঠেছে, এর মধ্যে ব্যর্থ প্রণয়ের করুণ ইতিহাস চাপা পড়ে গিয়েছে। অথচ অন্য গল্পে যখন প্রণয়ের চিত্র সত্যিই এসেছে, আজও তা এত বেশি অতিরঞ্জিত যে প্রণয়ের মহিমা তাতে অন্তর্হিত, যেমন 'বড়বাবুর বড় দিন' গল্প। বড়বাবুর চরিত্র এবং স্ত্রীর প্রণয়াসিক্ত এমন পর্যায়ে গিয়েছে যা আমাদের তীব্র হাস্যোদ্রেক করে কিন্তু অনুভূতির গভীরে যেতে দেয় না।

ব্যঙ্গাত্মক গল্পই প্রমথ চৌধুরীর বেশি, যদিও 'বজ্রশক্তি'র মতো সাধারণ গল্পও তিনি লিখেছেন। 'রাম ও শ্যাম' গল্পে রাজনৈতিক নেতাদের সংঘর্ষ কড়া ব্যঙ্গের ভাষায় আঁকা হয়েছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং সমালোচনার ঝাঁঝ গল্পের মধ্যে প্রচুরই আছে, কিন্তু মুশকিল এই যে, গল্পের মধ্যে গল্পাংশ প্রায় কিছুই নেই। মনে হতে পারে 'অ্যাডভেঞ্চার স্থলে ও জলে' গল্পে অ্যাডভেঞ্চারের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তা যে একেবারেই নেই এমন না, কিন্তু রোমাঞ্চ ফুটিয়ে তোলা যাঁর লেখার উদ্দেশ্যই নয়, তাঁর লেখায় রোমাঞ্চের পরিবর্তে ব্যঙ্গ-রসিকতা বেশি পাওয়া যাবে, এটাই স্বাভাবিক। শেষপর্যন্ত নীতি-উপদেশ দিয়ে গল্পের রোমাঞ্চকর পরিবেশকে একেবারেই শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। 'ভাববার কথা' গল্পে ভাবনা অনেক আছে। গল্প তেমন নেই। বরং নাম '‘অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' হলেও গল্পাংশ তাতে অনেক বেশি। অবনীর জীবনকথা বিচিত্রই বটে—অল্পবয়সে সে ছিল মেধাবী ও দৃঢ়সংকল্প, দেশাত্মবোধের বীজ তার মধ্যে ছিল। এই ছেলে যৌবনে জীবন ও সৌন্দর্য উপভোগের নাম করে বণিতাবিলাস ও বেশ্যাসংসর্গ শুরু করবে, এটা ভাবা একটু শক্তই ছিল। অথচ শেষ বয়সে দেখা গেল সেই মানুষই আন্তরিক সাধনার দ্বারা উপনীত হয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনার চরম সার্থকতায়।

'নীললোহিত' ছদ্মনামে প্রমথ চৌধুরী যে গল্পগুলি লিখেছেন, সে জাতীয় গল্প বাংলা সাহিত্যে পাওয়া শক্ত। এরকম উদ্ভট গল্প ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন ডমরুর চরিত্র বা লুল্লু জাতীয় রচনায়, পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলিয়েছেন এমন গল্প তাঁর অবিস্মরণীয় চরিত্র ঘনাদার মুখ দিয়ে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এই ছদ্মনামে যে গল্প লিখেছেন তার তুলনা পাওয়া বিশেষ শক্ত। ঘনাদার মতোই নীললোহিত তার অসাধারণ উদ্ভট গল্পগুলি এমনভাবে বলে যায় যে অবিশ্বাসের বিশেষ কোনো সুযোগ থাকে না, অথচ বিশ্বাসযোগ্য বস্তুর অভাবও যে সেখানে অত্যন্ত প্রকট, গল্প শেষ করে তা আমরা বুঝতে পারি। এরকম চারটি দীর্ঘ কাহিনি প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—'নীললোহিত', 'নীললোহিতের আদি প্রেম', 'নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা' এবং 'নীললোহিতের স্বয়ংবর'।

গুরুগম্ভীর গল্প প্রমথ চৌধুরী বিশেষ লেখেননি, তবে রঙ্গ-রসিকতা বাদ দিয়ে কিছু গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন, যেমন 'দিদিমার গল্প', 'আহুতি' বা 'ভূতের গল্প'। কিন্তু সেসব গল্পেও উদ্দিষ্ট রস কতটা ফুটেছে সন্দেহ আছে। 'ভূতের গল্পে', বাসনা হয়তো ছিল ভৌতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলবার, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর কলমে তা হওয়া ভ্যারি শক্ত। বরং বলতে পারি, শ্রেণিবিভাগের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী কেমন স্বতন্ত্র গোত্রের লেখক, তা বুঝবার জন্য তাঁর 'চার-ইয়ারী কথা' গ্রন্থটি পড়াই ভালো। কেউ কেউ একে উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও একে চার বন্ধুর চারটি বিচ্ছিন্ন গল্প বলাই ভালো। এক দুর্যোগের রাতে চার বন্ধু ক্লাবে আটকা পড়ে গিয়েছে। পরিবেশের এই মেদুরতার জন্যই নিজেদের জীবনের গভীরগোপন প্রেমকাহিনি তারা বলতে শুরু করেছে। প্রথম গল্প সেনের। কাব্যিক প্রেমের প্রায় অধরা মাধুরীর গল্প, যদিও শেষে তাকে বাস্তব সীমার মধ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় গল্প 'সীতেশের কথা'। লন্ডনের পটভূমিতে রোমান্টিক এই প্রেমকাহিনির পরিণতি অবশ্য অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সে। নায়িকা পরিবর্তিত হয়েছে প্রতারিকায়। 'সোমনাথের কথা' তৃতীয় গল্প। অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী চরিত্র সোমনাথ প্রণয়বিদ্বেষী তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে রিনি সোমনাথকে ব্যবহার করেছিল মাত্র। চতুর্থ গল্পে বাড়াবাড়িটা চূড়ান্তরকমের হয়েছে, যখন লন্ডনে থাকাকালীন সেবাদাসীর কণ্ঠ ভারতে এসেও টেলিফোনে পাওয়া গেছে এবং জানা গেছে সে প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। টেলিফোনে প্রেম, ব্যাপারটা অভিনব বটে, কিন্তু যখন জানা যায়, সেই দেবদাসীর প্রেতাত্মাই টেলি-যোগাযোগ করেছে, তখন আর সেটা নির্ভুলভাবে প্রেমের গল্প থাকে না।

৪.৫ পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০)

বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় হাস্যরসাত্মক গল্পের ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলা সাহিত্যে নির্মল হাস্যরসের গল্প যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে পরশুরাম নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

পরশুরাম ছদ্মনামের আড়ালে যিনি আছেন, তাঁর প্রকৃত নাম রাজশেখর বসু। কিছুটা বেশি বয়সেই তিনি সাহিত্যসাধনা শুরু করেন। কিন্তু প্রথম গল্প-সংকলন 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হবার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন করেছিলেন। গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য হল, কোনো সবিশেষ চেষ্টার দ্বারা চরিত্রগুলিকে অপরিজ্ঞাত জগৎ থেকে আহরণ করতে হয়নি, তারা আমাদেরই বিশেষ পরিচিত চরিত্র; এবং বিশেষ পরিচিতি সৃষ্টি করে বা কাউকে তীব্র ব্যঙ্গের দ্বারাও আমাদের হাস্যোদ্রেক করতে হয়নি, সরল সরজভাবে সামান্য অতিরঞ্জনের দ্বারাই তারা এক অনাবিল হাস্যরসের উৎস হয়ে আছে। কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করলেই সে কথা বোঝা যাবে।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে গণ্ডেরিরাম বাটপেরিয়া ভেজাল ঘিয়ের ব্যাবসা করে, কিন্তু সেজন্য কোনো পাপবোধ তার নেই। সে বলে 'পাপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। আমি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথরাসমে।' সুতরাং তার পাপের কোনো কারণ নেই। 'চিকিৎসা-সংকটে' ট্রাম থেকে পড়ে পায়ে সামান্য চোট পাবার পর অ্যালোপ্যাথ-হোমিওপ্যাথ-কবিরাজ-হেকিমি এবং শেষপর্যন্ত লেডি গায়নোকলজিস্টের কাছে পর্যন্ত

পাঠানো হয়েছে গল্পের নায়ককে। গল্পের কিছু সংলাপ এখনও পর্যন্ত সজীব হয়ে আছে, যেমন তারিণী কবিরাজের 'হয় হয়, Z-ন্তি পারো না', কিম্বা 'দেলাম ঠুকে এক দলা চ্যবনপ্রাশ।' 'কচি-সংসদ' গল্পে স্পষ্টই বোঝা যায়, একদল অপদার্থ মানুষ যারা রাবীন্দ্রিক হবার জন্য বিশেষ ঢঙে কথা বলতেন ও বিশেষ জীবনযাত্রা পছন্দ করতেন—তাঁদেরই ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই গল্পে। অথচ ব্যঙ্গের জ্বালা কোথাও নেই, দার্জিলিঙের 'মুন-সাইন ভিলা'র কচিরা যে ধুন্দুমার কাণ্ড বাধিয়েছে, তা বরং আমাদের নির্ভেজাল কৌতুকের বিষয় হয়।

'গড্ডলিকা' ছাড়াও হাসির গল্পের সংকলন ছিল পরশুরামের প্রধান বই 'কজ্জলী'। এখানেও প্রচুর ভালো গল্প আছে। আসলে 'লম্বকর্ণ', বিরিঞ্চিবাবা', উলট পুরাণ', 'দক্ষিণ রায়', 'জাবালি' প্রভৃতি প্রচুর গল্প এখনও অনেক পাঠকেরই মনে থাকার কথা। রায়বাহাদুর বংশলোচন চাটুজ্যের বৈঠকখানা, লম্বকর্ণের বিশাল উদার ও ভোজনক্ষমতা, দক্ষিণরায়ের অনবদ্য পাঁচালি ভোলা খুব শক্ত। তেমনি শক্ত ডাক্তার তপাদার, স্যার গবসন টোডি, লালিমা পাল (পুং) কিম্বা জিনীষা দেবী প্রভৃতি চরিত্রকে ভোলা। সরস বাংলা ছোটোগল্পে পরশুরাম এক অবিস্মরণীয় শিল্পী, কোনো সন্দেহ নেই।

৪.৬ প্রেমেন্দ্রমিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি বিশেষ স্থান আছে। সাহিত্য আধুনিকতা ও বাস্তবতার প্রবর্তনে কল্লোলযুগের বিশিষ্ট ভূমিকা এখন সকলেই স্বীকার করেন। কল্লোলের কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। একদিকে তিনি কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত করেছেন, 'পাঁক' উপন্যাসে বস্তিজীবনের চিত্র এঁকেছেন, অন্যদিকে প্রচুর ছোটোগল্পে সরল আবেগ ও বাহ্যিক ভাবনার অবসান ঘটিয়ে বাংলা ছোটোগল্পে আবেগমুক্ত ব্যস্তবতার প্রবর্তন ঘটিয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটোগল্পের উল্লেখযোগ্য সংকলনগুলি হল 'বেনামী বন্দর', পুতুল ও প্রতিমা', 'মৃত্তিকা', 'ধূলিধূসর' ও 'মহানগর'। সংকলনগুলির উল্লেখ কালানুক্রমিকভাবেই করা হল বটে, তবে বিশিষ্ট কিছু গল্পের উল্লেখে এই কালানুক্রম জানা হবে না। আমরা তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির কথা বলে তাঁর মানসিকতার বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

একেবারে প্রথম দিকে 'শুধু কেরাণী' গল্পটি লিখলেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। একটি নিম্নবিত্ত কেরানি-যুবকের নববিবাহিত জীবনে সুখী দাম্পত্যের সাধ দারিদ্র কীভাবে ধ্বংস করে দেয়, এটি তারাই আবেগবর্জিত চিত্র—এমনই আবেগজনিত যে, নায়ক-নায়িকার নাম পর্যন্ত নেই। এই আবেগযুক্ত জীবনচিত্রেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের পতিতাপল্লীর গল্প 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' স্বাতন্ত্র্য ও অসাধারণত্ব লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রীয় উত্তরাধিকারপুষ্ট সাহিত্যধারা থেকে এটি স্পষ্ট ব্যতিক্রম। মানুষের সাধ্যের সীমা, তার আকাঙ্খার সীমাবদ্ধতা, তার বাস্তব চেহারাটাই লেখক বিভিন্ন গল্পে ধরতে চেয়েছেন, যেমন 'লজ্জা', 'সুরু ও শেষ' প্রভৃতি গল্পে। গল্পের শেষে লেখক যে মন্তব্য করেছেন সেটি মনে রাখবার মতো—'দেবতার মহত্ত্ব মানুষের নাই, মানুষ পিশাচের মতো নিষ্ঠুরও নয়, মানুষ শুধু নির্বোধ।' প্রকৃতিও যে মানুষকে নিষ্পেশিত করার জন্য কত ব্যকুল, 'মৃত্তিকা' গল্পে নির্মম চিত্র আছে।

মানুষের ছোটো প্রেম, ছোটো দুঃখ, ছোটো সুখ, ছোটো অশান্তি—এ সবের মিলিত লীলায় যে প্রেম ও প্রেমহীনতার সংঘর্ষ চলেছে প্রতিদিন, অনেক গল্পে তা ধরা পড়েছে। 'হয়ত' গল্পে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল মহিম ও লাবণ্যের সন্দেহ জর্জর প্রেমহীনতা, অথচ একদিন আকস্মিক অনুরাগের স্রোতে তা কোথায় ভেসে যায়। সেই একই সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি চিত্রিত হয়েছে 'শৃঙ্খল' গল্পে। প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমরা পাই 'শরতের প্রথম কুয়াশা', 'একটি রাত্রি', 'ব্যাহত রচনা', 'পরিত্রাণ', 'নিশাচর' প্রভৃতি গল্পে।

প্রেমের ও অপ্রেমের এক শ্রেণির গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি বিশিষ্ট উপস্থাপন রীতির সৃষ্টি করেছেন। ধূলিধূসর এক আবরণ, কিছু আলো-আঁধারি, কিছু সাংকেতিকতায় করা গল্পগুলি এক অভিনব মাত্রা ও ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। 'ধূলিধূসর' গল্পগ্রন্থের নাম গল্পটিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'যাত্রাপথ' গল্পে অজয় ও মলিনার প্রথম প্রেমের আবেগ দিনে দিনে ক্ষীয়মান হয়ে এসেছে। 'অমীমাংসিত' গল্পে মূলত নবপরিণীতা স্ত্রীর অলীক ভয় ও অভিমান সম্পর্কটিকে পঙ্গু করে ফেলেছে। 'ভস্মশেষ' ও শেষপর্যন্ত প্রেমের ভস্মশেষে পরিণত হয়েছে, আর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' রূপকথার আঙ্গিক নিয়েও মানুষের প্রেমহীনতা ও ছলনার কথাই নতুন মোড়কে প্রকাশ করেছে।

'তেলেনাপাতা আবিষ্কার' গল্পে কিছু সাংকেতিকতাও ছিল এবং এই সাংকেতিকতাও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। বিশেষত 'মহানগর' গল্পসংগ্রহের অনেকগুলি গল্পে এর প্রয়োগ আছে।

৪.৭ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)

কল্লোলযুগের অন্যতম কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে উপন্যাসে এবং আরও পরবর্তীকালে জীবনীসাহিত্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও প্রথম দিকে তিনি ছোটোগল্পই রচনা করতেন এবং সেগুলি পাঠকদের খুব প্রিয় ছিল, 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

একেবারে প্রথম দিকে অচিন্ত্যকুমারের যে ছোটোগল্পের সংকলনটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'টুটা-ফুটা'। গল্পগুলি বেশির ভাগই এক বহেমিয়ান আবেগ নিয়ে রচিত। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বেশ মানানসই, কিন্তু গল্প হিসাবে তাদের খুব উচ্চাঙ্গের বলা যাবে না। 'দুইবার রাজা' গল্পটি সে সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

অচিন্ত্যকুমারের পরবর্তী দুটি সংকলন 'ইতি' এবং 'অকালবসন্ত'। এই সংকলন দুটিতে অনেক গল্প আছে এবং সেগুলির মধ্যে যৌবনের উচ্ছ্বাস বহুল পরিমাণে চলে এসেছে। গল্পে মনস্তত্ত্ব বেশি এসেছে এবং কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত স্থান করে নিয়েছে। 'যে কে সেই' এবং 'দিনের পর দিন' গল্পটিতে অবশ্য পুরনো ধারার একটা আভাস রয়ে গেছে। গল্প বয়নদক্ষতার প্রমাণ পাই 'বিবাহিতা' গল্পে। বাল্যপরিচিতা বিমলা তার স্বামীগৃহে উৎপীড়ন সহ্য করে, এ সংবাদ পেয়ে নিতান্ত সহানুভূতির বশে রাখাল তার কাছে গিয়েছিল, কিন্তু গিয়ে যে তারই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যাবে, এ তার ধারণারও বাইরে ছিল। 'সারেঙ' গল্পে লেখক দেখেছেন জগৎজুড়ে একটা শোষণের বিস্তৃত জাল—সেখানে অত্যাচারী স্বামী, সারেঙ, ঈশ্বর সব যেন এক অভিন্ন সূত্রে জুড়ে যায়। অবশ্য এ থেকে ক্ষণিক মুক্তির স্বাদও আমরা পাই 'ইতি'গল্পে। এখানে এক তুচ্ছ গণিকা অভিনয়সূত্রে যে চরিত্রের সঙ্গে একাত্মবোধ করে, ক্ষণকালের জন্য হলেও তার সঙ্গে নিজেকে এক করে নিজের বিষময় জীবনকে ভুলতে পারেন। 'ছায়া' গল্পটিকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প, সেকথা বলতে আমাদেরও বিশেষ আপত্তি হবে না বোধহয়। এখানে প্রেমে ব্যর্থ নায়ক হিমাদ্রি হৃদয়ের বেদনা ভুলতে না পেরে এমন এক বাড়ি ভাড়া নিয়েছে যেখানে একটি তরুণী আত্মহত্যা করেছে। তার প্রতীক্ষায় অনেক দিন থাকার পর প্রেতমূর্তিকে সে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু পেয়ে অবাক হয়েছে—এ মূর্তি তো তার পরিচিত ঊর্মিলা, যাকে সে একদিন প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখন যে মুহূর্তে প্রেতমূর্তির সঙ্গে বিবাহে সে রাজি হয়, মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ছায়া আসলে তার প্রেমের স্বপ্নমাত্র।

৪.৮ জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)

সমকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা না পেলেও একালের সমালোচকগণ স্বীকার করেছেন যে কল্লোলযুগের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী এবং ছোটোগল্পকার বলা যায় জগদীশ গুপ্তকেই। জগদীশ গুপ্তের ছোটোগল্পের সংকলনের সংখ্যা বারো, এর বাইরেও অবশ্য কিছু গল্প ছড়িয়ে আছে যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প-সংকলনগুলির নাম—

‘অঞ্জনশলাকা’, উদয়লেখা’, ‘উপায়ন’, জগদীশ গুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প’, ‘তৃষিত সৃজ্জণী’, ‘পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক’, ‘বিনোদিনী’, ‘ভৃঙ্গার’, ‘মেঘাবৃত অশনি’, ‘রূপের বাইরে’, ‘শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী’ এবং ‘শ্রীমতী’।

জগদীশ গুপ্ত নির্মোহ বস্তুবাদী লেখক ছিলেন। আবেগকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে জীবনের বাস্তব রূপটিই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জীবনের প্রায় সব কটি ক্ষেত্রেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে এবং সেখান থেকেই মানুষের আবরণহীন সত্যকার চেহারা উদ্ধার করতে পেরেছেন।

জগদীশ গুপ্তের প্রথম সংকলন ‘বিনোদিনী’-র সব কটি গল্পই ‘কল্লোল’ ও ‘কালি-কলমে’ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘তোমার গল্পে নূতন রূপ ও রস দেখিয়া খুশি হইলাম’। নূতন যে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ‘দিবসের শেষে’ গল্পে রূপকের মাধ্যমে অন্ধ নিয়তির আক্রোশ দেখিয়েছেন, ‘....পয়োমুখম্’ গল্পে দেখিয়েছেন উৎকট অর্থলালসায় মানুষ কত নীচে নামতে পারে। ‘তৃষিত আত্মা’ আসলে মানুষেরই কদর্যতার অন্য রূপ।

প্রথাগত সংস্কার ভাঙার দুর্মর ব্রত যে জগদীশ গুপ্তের কীরকম ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ‘ঠিকানায় বুধবার’ গল্পে। শরৎচন্দ্রের গল্পে যেসব সতীসাধ্বী গণিকা চরিত্র আমরা পাই, তার প্রতিবাদেই যেন একেবারে পেশার পক্ষে স্বাভাবিক চরিত্র লেখক এঁকেছেন এখানে।

জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই জগদীশ গুপ্ত তাঁর নির্মোহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। জ্যোতিষবিদ্যার ভণ্ডামি নিয়ে লিখেছেন ‘যাহা ঘটিল তাহাই সত্য’, ‘দৈবধন’, ‘উপলক্ষ’ প্রভৃতি গল্প; মানুষের নীচতা ও বর্বরতা নিয়ে লিখেছেন ‘এক যে ছিল খুল্লতাত’, ‘প্রতিক্রিয়া’, মানুষ ও কুকুর’; শিশুমনের বিচিত্র গতি দেখিয়েছেন ‘আলুনী সাজু’-তে; দারিদ্রের অসহ ছবি দেখিয়েছেন ‘সবার শেষে গয়া’ এবং ‘চার পয়সায় এক আনা’-তে; গূঢ় মনস্তত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন ‘পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক’, ‘শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী’, ‘উর্মিলার মন’ প্রভৃতি।

৪.৯ মণীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯)

যুবনাশ্ব ছদ্মনামে বেশি পরিচিত মণীশ ঘটককে বলা হত ‘কল্লোলের প্রথম মশালচি’, কারণ বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের যে ব্রত কল্লোলীয় সাহিত্যিকরা নিয়েছিলেন তার প্রথম সচেতন ফসল মণীশ ঘটকের কলমেই দেখা যায়, বইটির নাম ‘পটলডাঙার পাঁচালি’। মণীশ ঘটক ‘মান্ধাতার বাবার আমল ও ‘কনখল’ নামে দুটি সমর্থ উপন্যাস রচনা করলেও পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থটির জন্যই তাঁর বেশি নাম। অবশ্য তাঁর লেখা কবিতাগুলিও, বিশেষত ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলি, ছিল রীতিমত আকর্ষণীয় এবং সেগুলিকেও তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বলা চলতে পারে।

‘পটলডাঙার পাঁচালি’-তে বেশ কিছু গল্প যদিও পটলডাঙার বস্তির দলেরই গল্প, তবু সব গল্পই তাই নয়। এখানে গল্প আছে মোট ন-টি—গোষ্পদ, পটলডাঙার পাঁচালি, কালনেমি, মহুশেষ, মৃত্যুঞ্জয়, রাতবিরেতে, ভূখা ভগবান, দুর্যোগ এবং স্বাহা। শুধু বস্তিবাসী বলেও নয়, যেসব মানুষ একেবারে জৈবিক স্তরে পড়ে আছে—মানবিক মূল্যবোধ যাদের প্রায় শূন্য, এইরকম সব চরিত্র নিয়েই মূলত গল্পগুলি লেখা। চরিত্রগুলির মধ্যে আছে মোড়লনি খেঁদি পিসি, কুৎসিত দর্শন সদি, কুঠে, নুলো, নফর ইত্যাদি। অত্যন্ত সচেতনভাবে এদের অমানুষ চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করলেও মাঝে মাঝে এদের মধ্যেও কিন্তু মনুষ্যত্ব ধরা যায়।

৪.১০ কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

কাজি নজরুল ইসলামের খ্যাতি প্রধানত তাঁর অগ্নিক্ষরা কবিতার জন্যই। এছাড়া তিনি যে তিন হাজারের মতো সংগীত রচনা করেছেন, সেগুলিও তাকে দীর্ঘদিন অমর করে রাখবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পরিচালন ক্ষেত্রে তাঁর

সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও কথাসাহিত্যিক হিসাবে তাঁর অবদান বিশেষ স্মরণীয় নয়।

সাহিত্যসাধনার সূচনা অবশ্য নজরুল ইসলামের কথাসাহিত্য দিয়েই হয়েছিল। এটা অবশ্যই বিস্ময়ের কথা যে, আবাল্য দুই প্রিয়বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নজরুল ইসলাম লেখালেখি শুরু করেছিলেন যথাক্রমে কবিতা ও গল্প দিয়ে। তাও বলবো নজরুল ইসলামের কথাসাহিত্য সাধনা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। শিশুসাহিত্যে কিছু অবদান তাঁর আছে, কিছু চলচ্চিত্র যেমন 'বিদ্যাপতি', 'সাপুড়ে', 'ধ্রুব' প্রভৃতির কাহিনিও তিনি রচনা করেন। ছোটোগল্পের মধ্যে উল্লেখ করা যায় 'ব্যথার দান' ও 'হেনা' নামে দুটি গল্পের। গল্প দুটি ছাপা হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়। গল্প দুটিতে লেখকের উদার আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিচয়ও যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় দেশপ্রেমের ছাপ।

৪.১১ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

জীবনানন্দ দাশ মুখ্যত কবি হিসাবেই বেশি পরিচিত এইজন্য যে, জীবিতকালে তাঁর গল্প উপন্যাস কিছুই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু একবার সেগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করলে বোঝা গিয়েছে যে কবিতার তুলনায় গল্প-উপন্যাস তিনি অনেক বেশি লিখেছেন। সব গল্প-উপন্যাস এখনও প্রকাশিত হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না।

কথাসাহিত্যের মধ্যে জীবনানন্দের উপন্যাসই বেশি পরিচিত, ছোটোগল্প তেমন নয়। অথচ আজ পর্যন্ত তাঁর যতগুলি ছোটোগল্পের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয় এবং সেগুলি এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা সম্ভবও নয়। এককথায় বলতে গেলে বলা যায়, জীবনানন্দের গল্পগুলি আধুনিক যুগের এক বিক্ষত কবির কলমে লেখা গল্প। এতে বাইরের ঘটনা খুবই অল্প, কখনো কখনো গল্প প্রায় নেই বললেই হয়, কিন্তু ভেতরের গল্প অনেক বেশি। অনুভূতিপ্রধান এই গল্পগুলি চিন্তাশীল ও বোধসম্পন্ন পাঠকের চিত্র আলোড়িত করবেই, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জীবনানন্দের প্রথম যে গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে, তার নাম 'জীবনানন্দ দাশের গল্প'। তাতে গল্প ছিল তিনটি—১৯৩২ সালে লেখা 'ছায়ানট', ১৯৩৬ সালের লেখা 'গ্রাম ও শহরের গল্প' এবং ১৯৪৭ সালে লেখা 'বিলাস'। জীবনানন্দের প্রথম নিষ্ঠ সমালোচনা গ্রন্থের লেখক শ্রীঅম্বুজ বসু কয়েকটি স্তবকে বিন্যস্ত করেছেন তার গল্পসমগ্র। আমরাও সেইভাবেই সেগুলিকে সাজিয়ে দিলাম।

প্রথম স্তবক : এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এগারোটি গল্প—'কুয়ালার ভিতর মৃত্যুর সময়', মেয়ে মানুষের ঘ্রাণে', 'মাংসের ক্লান্তি', 'উপেক্ষার শীত' প্রভৃতি।

দ্বিতীয় স্তবক : 'পাতা তরঙ্গের বাজনা', 'মহিষের সিং', 'হাতের তাস', বেশি বয়সের ভালবাসা' প্রভৃতি বারোটি গল্প।

তৃতীয় স্তবক : এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে চোদ্দটি গল্প, যথা—'মেয়েমানুষ', 'হিসেবনিকেশ', 'হৃদয়হীন গল্প', 'বিবাহ ও অবিবাহ' প্রভৃতি।

এইভাবেই মোট আটটি স্তবকে জীবনানন্দের প্রচুর গল্পের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

৪.১২ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নাম। কল্লোলের সাহিত্য-আন্দোলনের প্রধান শরিক ছিলেন তিনি, তবে তাঁর গল্পগুলির অধিকাংশ প্রকাশিত হত কালি-কলম পত্রিকায়। বাংলা ছোটোগল্পে বাস্তবতার প্রবর্তনে যেসব সাহিত্যিকের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হতে পারে, তার মধ্যে তিনি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবেন।

সমাজের একেবারে নীচুতলার মানুষ, যাদের মধ্যে জৈব বৃত্তিই প্রবল, প্রথম দিকে মূলত সেইসব মানুষদের নিয়েই গল্প লিখেছিলেন শৈলজানন্দ। নিজে ছিলেন কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষ, এই অঞ্চলের বস্তিবাসী মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও ছিল। তাই নিয়েই প্রথম গল্প লিখতে শুরু করেন, সেগুলি সংকলিত হয় 'কয়লাকুঠির গল্প' নামক গ্রন্থে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'নারীমেধ', 'বধূবরণ', 'পূর্ণচ্ছেদ', 'অপরাধী', 'হোমানল', 'শোভাযাত্রা' প্রভৃতি গল্প সংকলন। প্রথম দিকে শুধুমাত্র অতিনিম্নবিত্ত মানুষকে নিয়ে গল্প লিখলেও পরে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ ও তাদের মনস্তত্ত্ব অবলম্বন করেও বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। কয়েকটি গল্পের সামান্য পরিচয় দেওয়া যায়।

'কয়লাকুঠির গল্প' সংকলনে পাঁচটি গল্প ছিল—মা, ঝুথরু, নারীর মন, মরণবরণ এবং জোহানের বিহা। 'নারীর মন' গল্পের মুখ্যচরিত্র সাঁওতাল রমণী ভুলি। তার বড় দুঃখ তার স্বামী কীরু মাঝি তার চেয়ে বেশি আসক্ত তার বোন টুরনীর প্রতি। প্রচণ্ড ক্ষোভে এর শোধ নেবার জন্য পূর্বপ্রণয়ী ভোলাকে কাজে লাগায় ভুলি। কিন্তু কীরুর কাছে ভোলা পরাজিত হয়। আশ্চর্য, এতে খুশিই হয় ভুলি। স্বামীর স্নেহবঞ্চিতা ভুলি আসামের চা বাগানে চলে যায়, কিন্তু আশ্চর্য, চলে যাবার সময় তার সবচেয়ে বেশি খুশি হয় বোন টুরনীর জন্য।

'নারীমেধ' শৈলজানন্দের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। ব্যবসায়ী পরাশর এবং নয়নতারার সংসারে নয়নতারার ভাই পঞ্চু ও তার স্ত্রী মায়া ছিল আশ্রিত। কিন্তু পঞ্চুর আচার-আচরণ ঠিক আশ্রিতের মতো ছিল না। গুরুদেব মারা যাওয়ার পর গুরুপত্নী ছবি নামে একটি গরীব বিধবা মেয়েকে তাদের সংসারে প্রতিপালনের জন্য দিয়ে যায়। সুন্দরী ছবিকে দেখে পঞ্চুর লালসা অদম্য হয়ে ওঠে। নয়নতারার শানিত দৃষ্টি এড়িয়ে ছবিকে সে উপভোগ করে। ছবি গর্ভবতী হওয়ার পর এক হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় পঞ্চু, তাতে কাজ না হলে ছবির ডেডবডি গায়েব করে ফেলে। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে এই গোটা অপরাধের দোষ চাপিয়ে দেয় পরাশরের ওপর। অন্যান্য যেসব গল্পে মনস্তত্ত্ব বড় হয়ে উঠেছে সেসব গল্পের মধেও উল্লেখযোগ্য—ধ্বংস পথের যাত্রী এরা', 'ভঙ্গুর', 'ইহাদের ঘিরি ঘুরিছে পৃথ্বী', 'বদ্‌লী মঞ্জুর', 'বধূবরণ' প্রভৃতি।

৪.১৩ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

ছোটোগল্প এবং উপন্যাস উভয় ধারাতেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিসম্ভার প্রভূত এবং প্রকৃষ্ট। সাহিত্য সংসদ থেকে তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে জগদীশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়, তিন খণ্ডে। এর মধ্যে অনেক গল্পই প্রথম শ্রেণির। গল্প-সংকলন যেগুলি তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল—'জলসাঘর', 'রসকলি', 'হারানো সুর', 'বিষপাথর', 'আলোকাভিসার' প্রভৃতি।

এতো বিভিন্নরকমের গল্প লিখেছেন তারাশঙ্কর যে সংক্ষেপে প্রত্যেকটি শ্রেণির পরিচয় দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কেবল কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) গ্রামবাংলার বৈষ্ণবীয় গল্প :

এই ধরনের উপন্যাস প্রথম জীবনে লেখার চেষ্টা করেছিলেন তারাশঙ্কর। ছোটোগল্পেও তার কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এই জাতীয় গল্পের মধ্যে আমরা 'রসকলি' বা 'রাই-কমলের' নাম করতে পারি।

(খ) অতি নিম্নবিত্ত মানুষের গল্প :

অতি নিম্নবিত্ত এবং প্রায় জৈবিক স্তরের মানুষ নিয়ে অনেক গল্প তারাশঙ্কর লিখেছেন। 'সমুদ্র-মন্থন' গল্পে পাই জীর্ণ কঙ্কালসার এক সোনা বউকে, যে তার ততোধিক রুগ্ন স্বামীর জন্য খাবার চুরি করে আনে। 'ইমারত' গল্পে পাই রাজমিস্ত্রিকে, যে সারা জীবন অন্য লোকের জন্য বাড়ি বানিয়ে এসেছে, নিজের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা একটা করতে পারেনি। আমরা পাই সাপুড়ে, মাঝি, চোর ভিখারি—সমস্তরকমের চরিত্র।

(গ) ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র :

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা এবং তার প্রতি একটা গোপনলালিত ভালোবাসা তারাশঙ্করের বেশ কিছু গল্পের অবলম্বন, যেমন 'রাজা, রানি ও প্রজা' গল্পে আমরা দেখি নিতান্ত মধ্যবিত্ত একটি মানুষ দেশের বাড়িতে গিয়ে সামান্য জমির সূত্রে রাজার সম্মান পেয়ে রাজকীয় মেজাজ দেখাতে শুরু করে। 'জলসাঘর' গল্পের জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের গল্প সম্ভবত অনেকেরই অজানা নেই।

(ঘ) দৈব প্রবৃত্তির গল্প :

মানুষের আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে বেশ কিছু গল্প তারাশঙ্কর লিখেছেন, উল্লেখ করা যায় 'বেদেনী গল্পটির। রাঢ় অঞ্চলের বেদে সম্প্রদায়কে নিয়ে এই গল্প মেলায় যারা বাজিকরের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। শিবুর সঙ্গিনী রাধিকা প্রথমে কিষ্টোর খেলা বেশি জমেছে বলে তার তাঁবুতে ঢুকেছিল তাকে মেরে ফেলার জন্যে। কিন্তু কিষ্টোর উদগ্র যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে নিজে ধরা দেবার পর যখন কিষ্টোর সঙ্গে পালিয়ে যায়, তখন নিতান্ত বিনা কারণে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারে শিবুকে।

এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গল্প বোধহয় 'তারিণী মাঝি'। প্রেম যতো বড় ব্যাপারই হোক, যখন জীবনরক্ষা ও প্রেমের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়, একটিকে ত্যাগ করতেই হবে—এরকম সঙ্কটময় পরীক্ষা যখন আসে, মানুষ তখন নিজের প্রাণটাকেই বেশি মূল্যবান মনে করে। তারিণী মাঝি তার বউ সুখীকে যে অত্যন্ত ভালোবাসতো, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; সুখীও তাই। কিন্তু প্রবল বন্যায় ভেসে যাওয়ার সময় যখন নিজের জীবন সংশয় হয়ে ওঠে, তারিণী সুখীকে সঙ্গে নিয়ে সাঁতার কাটতে পারেনি, বরং গলা টিপে তার শ্বাসরোধ করেছে।

(ছ) গভীর মনস্তত্ত্বনির্ভর গল্প :

গভীর মনস্তত্ত্বের গল্পও তারাশঙ্কর অনেক লিখেছেন, উল্লেখ করা যায় 'তাসের ঘর', 'নুটু মোক্তারের সওয়াল', 'না' প্রভতি। 'তাসের ঘরে' শৈল মেয়েটি অন্যান্য দিক থেকে একেবারে নির্দোষ চরিত্র, শুধু একটাই তার দোষ—বাপের বাড়িতে শ্বশুরবাড়ির কথা বাড়িয়ে বলা এবং শ্বশুরবাড়িতে বাপের বাড়ির কথা। 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পে জমিদারের অন্যায় শোষণের প্রতিবাদ করার জন্যই নুটুবিহারী মোক্তারি পাশ করে, কাজে নামযশও হয়; কিন্তু যে মুহূর্তে তার প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, জমিদারের ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে আপ্যায়ন করে, অর্থাৎ দু'জনের শ্রেণিই এক হয়ে যায়। 'না' গল্পে ব্রজরানি স্বামীর হত্যাকারীকেও মুক্তি দেয় অনুকম্পায়, কারণ যে সবল লোকটি তার স্বামীকে মেরেছে, একটি ক্ষীণ নির্জীব লোকের মধ্যে তাকে সে দেখতে পায় না।

এইগুলি ছাড়াও তারাশঙ্করের গল্পে শ্রেণিবিভাগ আরও হতে পারে। লোকসংস্কারের অনবদ্য কিছু গল্প তিনি লিখেছেন, যেমন 'বরমলাগের মাঠ', 'ডাইনী' প্রভৃতি। অতি নির্মম গল্প লিখেছেন, যেমন 'অগ্রদানী'। একেবারে কোনো প্লট নেই, এমন গল্প লিখেছেন, যেমন 'মুহূর্ত'। আসলে ভালো গল্প তো তারাশঙ্কর প্রচুর লিখেছেন এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন বহু চরিত্র উপহার দিয়েছেন যেগুলি আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, যেমন 'অ্যাকসিডেন্ট' গল্পের ভূপতি, 'ছলনাময়ী' গল্পের ম্যানেজার, 'শ্রীনাথ ডাক্তার' গল্পের শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অগ্রদানী' গল্পের চক্রবর্তী, 'মাটি' গল্পের মেওয়ালাল। সন্দেহ নেই, তারাশঙ্কর এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার।

৪.১৪ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোগল্পেরও বড় শিল্পী ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের গল্পে ন্যাচারালিস্ট লেখকদের মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়—একেবারে জৈবস্তরের মানুষ (প্রাগৈতিহাসিক), আপাতসভ্য মানুষের মধ্যেও আদিম যৌন ও অর্থলিপ্সা (সরীসৃপ), অন্ধ নিয়তির অপরিহরণীয় ভবিতব্য (টিকটিকি) প্রভৃতি। কিন্তু

পরবর্তী জীবনে মার্কসবাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বিশ্বাসে পরিণত হলে যে গল্পগুলি তিনি লিখেছিলেন তাতে প্রাধান্য পায় ধনিক শ্রেণির শোষণ (দুঃশাসনীয়), দুঃস্থ শিল্পীর নির্যাতন (শিল্পী) রাজনৈতিক আন্দোলন ও দিনবদলের ইঙ্গিত (হারানের নাতজামাই) প্রভৃতি। অর্থাৎ এই স্তরের সাহিত্যে একটা দায়বদ্ধতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পের সংকলনগুলি হল—'অতসী মাসী', 'সরীসৃপ', 'মিহি ও মোটা কাহিনী', প্রাগৈতিহাসিক', 'ভেজাল' প্রভৃতি। 'অতসী মাসী'-তে যে গল্পগুলি আছে সেগুলি হল নেকী, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, আগন্তুক, মহাসঙ্গম, বৃহত্তর ও মহত্তর প্রভৃতি। গল্পগুলির মধ্যে মনে রাখবার মতো সর্পিল, যেখানে জটিল ও বিকারগ্রস্ত দাম্পত্য সম্পর্ক লেখকের 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের কথা মনে পড়ায়। আগন্তুক গল্পে দীর্ঘ প্রবাসের পর গৃহে ফিরে এসে মুকুলের নিজেকে আগন্তুক ভাবা, বা মহাসঙ্গম গল্পে অতিবৃদ্ধ পশুপতির মানসিকতা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

'সরীসৃপ' গ্রন্থের প্রধান গল্পগুলির নাম মহাকালের জটার জট, বিষাক্ত প্রেম। সরীসৃপ, মমতাদি প্রভৃতি। প্রথম গল্পে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণকে যৌনতা দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে, দ্বিতীয় গল্পে ক্লেদাক্ত জীবনে মানবতার আকস্মিক স্ফূরণ দেখা যায় অনেকটা বদলেয়ারের 'ফ্লুর দ্য মাল' কবিতার মতো। সরীসৃপ গল্পে বনমালী কীভাবে তার এককালের মালিক-কন্যা চারু ও পরিকে শোষণ করে, তার চিত্র।

'মিহি ও মোটা কাহিনী'-তে পাই শৈলজ শিলা, খুকি প্রভৃতি গল্প এবং 'প্রাগৈতিহাসিকে' পাই প্রকৃতি, ফাঁসি' প্রভৃতি গল্প। এদের মধ্যে বিকৃতকামের আশ্চর্য শিল্পরূপায়ণে 'শৈলজ শিলা' একটি বিস্ময়কর গল্প হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। 'ভেজাল' গল্প সংগ্রহে বেশ ভাল কিছু গল্প আছে, যেমন, প্রকাশকের নিবেদন, ভয়ংকর, রোমান্স, ধনজনযৌবন, মুখেভাত, মেয়ে, 'মৃতজনে দেহ প্রাণ', যে বাঁচায় প্রভৃতি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়বদ্ধ গল্পগুলির মধ্যে মাসি-পিসি, যাকে ঘুষ দিতে হয়, হারানের নাতজামাই, ছোটো বকুলপুরের যাত্রী প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়। বউ-সিরিজের কিছু গল্প লেখক লিখেছেন, সেগুলিও আকর্ষণীয়, যেমন, লেখকের বউ, কুষ্ঠরোগীর বউ প্রভৃতি।

৪.১৫ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৮৭)

বাংলা সাহিত্যে উন্নতমানের হাসির গল্পের লেখক খুব বেশি আবির্ভূত হননি, যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কোনো সন্দেহ নেই। শিবপুরের গন্‌শা-ঘোঁতনা-গোরাচাঁদ-কে গুপ্ত-রাজেনদের দলকে তাঁর বরযাত্রী' উপন্যাসের মাধ্যমে অনেকেই ভালোভাবে চেনেন। বিভূতিভূষণ শিশুদের জন্যও প্রচুর গল্প লিখেছেন, সেগুলি সংকলিত হয়েছে 'রাণুর প্রথম ভাগ', রাণুর তৃতীয় ভাগ', 'রাণুর কথামালা' প্রভৃতি গ্রন্থে। আমরা মূলত বড়দের জন্য তাঁর হাসির গল্পের কথাই উল্লেখ করবো।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ সংকলনগুলির উল্লেখযোগ্য 'বসন্তে', 'হৈমন্তী', 'কায়কল্প' প্রভৃতি। বিচিত্র ধরনের গল্প তিনি লিখেছেন, সংখ্যাতেও সেগুলি অল্প নয়। কয়েকটি শ্রেণির গল্পের উল্লেখ আমরা করতে পারি।

'বরযাত্রী' নামে উপন্যাস হলেও আসলে কিছু খণ্ড আখ্যানই তার উপজীব্য। বিবাহবিভ্রাট, গণ্‌শার বিয়ের জন্য পাত্রী স্থির করা ইত্যাদি নিয়েই সেখানে রঙ্গরস জমেছে। প্রণয়, বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে আরও অনেক গল্প বিভূতিভূষণ লিখেছেন যেমন মেঘদূত, বিপন্ন, বসন্তে প্রভৃতি। মেঘদূত গল্পে প্রেমের দৌত্যকার্যে মেঘকে লাগানো হয়নি, হয়েছে জিমি কুকুরকে। বিপন্ন গল্পে নববিবাহিত বিহারি ছাত্র বাঙালি অধ্যাপকের কাছে পরিশীলিত প্রেমকলা শিখতে গিয়ে

বিপর্যস্ত হয়েছে। যুগান্তর গল্পে পঞ্চাশ বছর আগেকার বিবাহপ্রথা এবং আধুনিক বিবাহপ্রথার মধ্যে তুলনায় কৌতুকরস ফুটেছে।

চরিত্রের বিচিত্র আচরণ এবং পরিস্থিতি বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে হাস্যরস ফুটেছে, এরকম গল্পের সংখ্যাও কম নয়। 'নোংরা' গল্পে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে প্রায় শুচিবায়ুগ্রস্থ একটি যুবক প্রেমে পড়েছে নোংরা থাকায় অভ্যস্ত মেয়ের। 'হোমিওপ্যাথি' গল্পে খুড়োর সর্বদা অসুখের অভিনয় সেরে হোমিওপ্যাথির নীতি অনুসরণে খুড়ির উগ্রতার অভিনয়ের গুণে। অব্যবহিতা-য় প্রেমের সঞ্চার ঘটেছে প্রতিবেশসূত্রে, 'তীর্থফেরত' গল্পে দীর্ঘ তীর্থফেরত বৃদ্ধা ধুলো পায়েই পাড়ায় ঝগড়া করতে বেরিয়ে পড়েছে। 'কস্মৈ হবিষা' বিধেয়, 'মধুলিড়', 'পূর্ণচন্দ্রের নষ্টামি' প্রভৃতি গল্পও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

গভীর সুরে কিছু হাসির গল্পও আমরা বিভূতিভূষণের হাতে পেয়েছি। এগুলিরি মধ্যে নাম করা যেতে পারে 'ননীচোরা', 'প্রশ্ন', 'মাতৃপূজা', 'আশা' প্রভৃতি গল্পের।

হাসির গল্প লেখার জন্য যে পরিশীলিত দৃষ্টি, মাত্রাজ্ঞান এবং সংযম প্রয়োজন হয়, তা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছিল বলেই সমালোচকগণ তাকে প্রথম শ্রেণির রসসাহিত্যিক বলে মনে করেন।

৪.১৬ শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০)

প্রধানত রসসাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত শিবরাম চক্রবর্তী ছিলেন মূলত কিশোরদের লেখক। সুতরাং সাধারণভাবে ছোটোগল্পকার রূপে তাঁর মূল্যায়ন না করাই ভালো। জীবন তিনি শুরু করেছিলেন অবশ্য কবি হিসাবেই, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মানুষ'। হাসির কলাম ও টুকরো হাসির গল্প লিখতেন আনন্দবাজারে 'বিসংবাদ' ও 'অল্পবিস্তর' শিরোনামে। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'-ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লেখকের প্রধান আকর্ষণ 'পান' রচনার শক্তি, অর্থাৎ একই কথাকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা। কিশোরদের গল্পে প্রধান চরিত্র ছিল দুইভাই হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন এবং তাদের বোন বিনি। এদের নিয়ে প্রচুর গল্প আছে তাঁর, যাদের বর্ণনা দিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ তাঁর অননুকরণীয় কলমে না লিখলে এদের স্বাদ বোঝা যাবে না। কিশোরদের জন্য লেখা উপন্যাস 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

৪.১৭ বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)

বনফুল ছদ্মনামে ডা. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যেমন প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, ছোটোগল্পেও তাঁর মূল্যবান পরীক্ষা হল অত্যন্ত ছোটো আকারের ছোটোগল্প রচনা। তিনি প্রথম 'একটি পোস্টকার্ডের গল্প' নাম দিয়ে এত ছোটো একটি গল্প লেখেন যার একটি পোস্টকার্ডের স্থান সংকুলান হয়ে যাবে। সেইজন্য এরপরে যে অসংখ্য এই ধরনের গল্প তিনি লিখেছেন সেগুলি 'পোস্টকার্ড স্টোরি' হিসাবেই প্রাথমিকভাবে পরিচিত হয়েছিল।

বাংলায় এই ধরনের গল্প অভিনবই বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সামান্য কিছু এই স্বল্পায়তন গল্প লিখলেও পরে তা অনুসৃত হয়নি। ইংরেজি ও আমেরিকান সাহিত্যে এই রকম গল্পের চল আছে। সেখানে এগুলিকে বলে যথাক্রমে ফাইভ মিনিট স্টোরি এবং শর্ট-শর্ট স্টোরি। বাংলায় এর কয়েকটি প্রতিশব্দই এখন চলছে, যেমন অণু গল্প, গল্পাণু, ছোট্ট ছোট্টগল্প প্রভৃতি।

বনফুলের এই অণুগল্প সংখ্যায় খুব বেশি, না পড়লে এর স্বাদও বোঝা যাবে না। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে আছে 'সমাধান', 'মুহূর্তের মহিমা', 'নিমগাছ' প্রভৃতি। অবশ্য আকারে প্রমাণ মাপের ছোটোগল্পও তিনি অনেক লিখেছেন এবং সেগুলিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে, যেমন—'দুধের দাম', 'তিলোত্তমা',

‘ফকির শাজাহান’, ‘আলোবাবু’, ‘বিশ্বাসমশাই’ প্রভৃতি। কয়েকটি গল্পের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

অণুগল্পের কথাই প্রথমে। ‘সমাধান’ গল্পে নায়কের মেয়ে মামার বাড়িতে গিয়েছে। অত্যন্ত কুরূপা বলে সকলেই ভীষণ চিন্তিত, এই মেয়ের বিয়ে হবে কী করে। মেয়ের বাবাও চিন্তিত কম নয়। প্রবল চিন্তার মধ্যেই চিঠি আসে, দু-দিনের অসুখে মেয়েটি মারা গেছে। ‘মুহূর্তের মহিমা’ গল্পে দুর্ধর্ষ লম্পট গুরগণ খাঁ একটি মেয়েকে উপভোগের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায়। একটি ক্ষীণজীবী প্রেমিককে মেয়েটি ভালোবাসে। সেই প্রেমিককে খতম করে দেবার ভয় দেখালে মেয়েটি গুরগণ খাঁর কাছে রাতে আসতে রাজি হয়, আসেও; কিন্তু এসেই জিজ্ঞাসা করে, তার প্রেমিক এবার নিরাপদ তো! গুরগণ খাঁর মনে একটা কিছু হয়ে যায়, মেয়েটিকে যেতে বলে দেয় সে। ‘নিমগাছ’ গল্পে অসাধারণভাবে নিমগাছের সঙ্গে বাড়ির বউয়ের তুলনা করা হয়।

সাধারণ মাপের ছোটোগল্পের মধ্যে অসাধারণ মানবিক গল্প ‘দুধের দাম’। এক অসহায় বৃদ্ধার মালপত্র সরিয়ে দিয়ে অশিক্ষিত এক কুলি বলে মায়ের দুধের দাম সে শোধ করে গেল। গরিব ভিখারি এক মুসলমান তার গলিত স্থবির স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে আসে আগ্রার হাসপাতালে। অসহ্য কষ্ট স্বীকার করেও তাকে বাঁচানো যায় না। বাইরে ছোট্ট মাটির টিপি তোলে কবরের ওপর। তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, ‘ফকির শাজাহান’। ‘আলো বাবু’-তে পাই পশুপ্রীতির এক আন্তরিক ও সংরক্ত গল্প। কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের ভাইকে নিয়ে লিখেছেন ‘বিশ্বাসমশাই।’

৪.১৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

সহজ মানুষের সরল জীবনকাহিনি রচনাটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। সহজ কথা সহজে বলা যায় না, একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। বিভূতিভূষণের গল্প পড়লে বোঝা যায় এই সহজভাবে গল্পবলার ক্ষমতাটা কত কঠিন। বিভূতিভূষণের কোনো বিষয় দরকার হয় না, কী বিষয় দিয়ে গল্প লেখা যায়, এ নিয়ে চিন্তারও কোনো দরকার হয় না। যা নিয়ে লিখবেন মনে করেন, তাই নিয়েই তিনি অনায়াসে কয়েক পাতা লিখে যেতে পারেন।

প্রচুর গল্প লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ, কয়েকটি গল্প-সংকলনের নাম ‘মেঘমল্লার’, ‘মৌরীফুল’, ‘যাত্রাদল’, ‘কিন্নরদল’ প্রভৃতি। যে ধরনের গল্পের জন্য বিভূতিভূষণের পরিচিতি, একেবারে প্রথম জীবনেই সেরকম গল্প তিনি লিখেছিলেন, যেমন—‘উমারাণী’, ‘উপেক্ষিতা’, ‘মৌরিফুল’ প্রভৃতি। একটি পল্লীবধূর অপরিসীম স্নেহের গল্প উমারাণী, উপেক্ষিতা-য় আছে নিঃসম্পর্কিত একটি পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্ক গড়ে ওঠার গল্প, ‘মৌরীফুলে’ একটি বাস্তব জ্ঞানবর্জিত কোমল গৃহবধূর কথা আছে। বিচিত্র ধরনের তিনটি গল্প আছে ‘মেঘমল্লার’ গ্রন্থে। ‘মেঘমল্লার’ গল্পে পাই মন্ত্রশক্তির দ্বারা দেবী সরস্বতী বন্দিত্বের কাহিনি। বৌদ্ধ যুগের পটভূমিতে সুনন্দা-প্রদ্যুম্নের প্রেমকাহিনিও আকর্ষণীয়। ‘প্রত্নতত্ত্ব’ গল্পে পাই দীপঙ্করের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ছায়াদৃশ্য।

অতিপ্রাকৃত ও অতীন্দ্রিয় জগতের গল্প বিভূতিভূষণের হাতে শিল্পোৎকর্য লাভ করেছে। ‘বউচণ্ডীর মাঠ’, ‘জলসত্র’, ‘খুঁটি দেবতা’, ‘অভিশপ্ত’, ‘হাসি’, ‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’ প্রভৃতি বহু গল্পে এই অতিপ্রাকৃত পরিবেশ আছে।

বিভূতিভূষণের অবিস্মরণীয় গল্পগুলির মধ্যে ‘আহ্বান’, ‘কিন্নরদল’, অনুশাসন’, ‘পুঁইমাচা’ প্রভৃতির নাম করতেই হবে।

৪.১৯ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)

গোয়েন্দাকাহিনির যাদুকর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যত গোয়েন্দাকাহিনি ও ঐতিহাসিক কাহিনির রূপকার হিসাবেই বিখ্যাত হয়ে আছেন। সদাশিব নামে একটি চরিত্রকে অপ্রিয় করে কিশোরদের কিছু হাস্যরসাত্মক গল্পও তিনি উপহার

দিয়েছেন। গোয়েন্দাকাহিনিগুলি প্রায় সবই দীর্ঘ, তবে অসাধারণ কিছু ঐতিহাসিক ছোটোগল্প তিনি লিখেছেন, যেমন—'অমিতাভ', 'রক্তসন্ধ্যা', 'বেরা রোধসি', 'চন্দনমূর্তি', 'মৃৎপ্রদীপ', 'অষ্টম সর্গ', 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ', 'ইন্দ্রতূলক', 'শঙ্খ-কঙ্কন', 'চুয়াচন্দন' প্রভৃতি।

৪.২০ অনুশীলনী

১। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে শরৎচন্দ্রের ছোটোগল্প সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) শরৎচন্দ্রের উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত ছোটোগল্পগুলির পরিচয় দিন।

(খ) নিম্নশ্রেণির সুখদুঃখ নিয়ে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটি ছোটোগল্পের কথা বলুন।

৩। বাংলা ছোটোগল্প রচনায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাফল্য বিচার করুন।

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্মল হাস্যরসের গল্পগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫। বিদেশি পটভূমিকায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিছু গল্প লিখেছিলেন। কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করে এজাতীয় গল্পে প্রভাতকুমারের দক্ষতা বিচার করুন।

৬। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প সম্পর্কে যা জানেন বলুন।

৭। প্রমথ চৌধুরীর ছোটোগল্পের কী বৈশিষ্ট্য ছিল বুঝিয়ে বলুন।

৮। প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক গল্পের পরিচয় দিয়ে এজাতীয় গল্পে তাঁর দক্ষতা বিচার করুন।

৯। হাস্যরসাত্মক গল্পে পরশুরামের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিন।

১০। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটোগল্প রচনায় সার্থক হয়েছেন কিনা আলোচনা করুন।

১১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ছোটোগল্প বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১২। জগদীশ গুপ্তকে অনেকেই ব্যতিক্রমী লেখক মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত, কয়েকটি ছোটোগল্প আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

১৩। কবি জীবনানন্দ দাশের ছোটোগল্পগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১৪। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দিন।

১৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প সৃষ্টিতে দুটি পর্যায় ভেদ করা সম্ভব কি? কয়েকটি করে গল্প অবলম্বন করে বিচার করুন।

১৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প বিষয়ে লিখুন।

১৭। বনফুল একটি নতুন ধরনের ছোটোগল্প সৃষ্টি করেছেন—কয়েকটি আলোচনা করে এই নতুন শ্রেণিটি বুঝিয়ে দিন।

১৮। হাসির গল্পে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কতটা শক্তিশালী, কয়েকটি গল্প অবলম্বনে বুঝিয়ে বলুন।

৪.২১ গ্রন্থপঞ্জি

১। রথীন্দ্রনাথ রায়, ছোটোগল্পের কথা, ১৯৫৯।

২। শিশিরকুমার দাশ, বাংলা ছোটোগল্প, ১৯৬৩।

৩। ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প ও গল্পকার, ১৯৬২।

একক ৫ ❑ ছোটোগল্প—ভাগ ২

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ সুবোধ ঘোষ
৫.৪ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৫.৫ নরেন্দ্রনাথ মিত্র
৫.৬ নবেন্দু ঘোষ
৫.৭ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৫.৮ সোমেন চন্দ
৫.৯ সন্তোষকুমার ঘোষ
৫.১০ ননী ভৌমিক
৫.১১ বিমল কর
৫.১২ রমাপদ চৌধুরী
৫.১৩ সমরেশ বসু
৫.১৪ মহাশ্বেতা দেবী
৫.১৫ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
৫.১৬ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫.১৭ দেবেশ রায়
৫.১৮ তপোবিজয় ঘোষ
৫.১৯ দিব্যেন্দু পালিত
৫.২০ অনুশীলনী

৫.১ উদ্দেশ্য

বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভব ঊনবিংশ শতকে এবং এই ধারা ক্রমে বহুব্যাপ্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন সারা পৃথিবীর শিল্পী-সাহিত্যিকেরা বিচলিত ও আলোড়িত হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক বাস্তব পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল কঠিন ও বিপন্ন। যুগের মানসিকতার পরিবর্তন বিশ্বের ছোটোগল্পে যে প্রভাব ফেলেছিল বাংলা সাহিত্যেও পড়েছিল তার ছাপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত কালপর্বে বাংলা ছোটোগল্প ধারার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমগ্র রূপরেখা তুলে ধরা এই পাঠের উদ্দেশ্য।

৫.২ প্রস্তাবনা

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট তখন হয়ে উঠেছিল আলোড়িত আর সংকটসংকুল। ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের

সূচনা, বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে মুসোলিনির নেতৃত্বে। ১৯৩৩-এ জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় আসার পরই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের ভয়ংকরত্ব তীব্র হয়ে ওঠে। মানবশ্রেণির প্রতি ঘৃণা (গ্রন্থদাহ), বিশেষ মানবশ্রেণির প্রতি অমানুষিক নির্যাতন—ফ্যাসিবাদকে করে তোলে সভ্যতার কলঙ্ক। পৃথিবী জুড়ে তখন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে সংগঠিত প্রতিবাদ। তার সঙ্গে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনও যুক্ত হয়ে গেল। বাংলা ছোটোগল্পেও দেখা গেল সাহিত্যিকদের এই সমাজচেতনার প্রতিফলন। পূর্বতন বাংলা ছোটোগল্প শিল্পীদের শিল্পকর্মেও সমাজচেতনা অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু প্রায়শ তা ব্যক্তিমনের বিশ্লেষণের দিক থেকে উপস্থাপিত হত। কিন্তু আলোচ্যপর্বে শ্রেণি-সংঘাত এবং শোষিতবর্গের প্রতিবাদের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে লাগল ছোটোগল্প।

আবার স্বাধীনতা-উত্তরকালে পঞ্চাশ আর যাটের দশকের গল্পে শ্রেণিচেতনার পাশে ব্যক্তিচেতনার পুনরাবির্ভাব দেখা গেল। দেশবিভাগের পরের শরণার্থী সমস্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জটিলতা—কোনো কিছুতেই উপেক্ষা করেনি বাংলা ছোটো গল্পে।

সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক পরিস্থিতি সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল জঙ্গি মানসিকতার নকশালবাড়ি আন্দোলনের আবর্তে। এই আন্দেলন বাংলার দারিদ্র এবং সামাজিক শোষণের বহু দিক উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল নতুনভাবে। রাজনৈতিক প্রশাসনের স্বার্থপরতাও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। বাংলা ছোটোগল্পে এইসব কিছুই এসেছে অতি জীবন্ত এবং তীক্ষ্মভাবে। একই সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের বাণিজ্যিক-বিপনন-অভিমুখী পাঠক-মনোরঞ্জক ধারা যাটের দশক থেকে বাংলা ছোটোগল্পে ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। আলোচ্য পর্বের বাংলা ছোটোগল্প তাই এইসব নিয়ে সম্মিলিত বৈচিত্র্যে হয়ে উঠেছিল দীপ্তিময়।

এই সময়-পর্বের সতেরোজন নির্বাচন গল্প-রচয়িতার গল্প-বিশেষত্ব নিয়ে শুরু হবে আমাদের আলোচনা।

৫.৩ সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)

সুবোধ ঘোষ সেই গল্পকার, যাঁর প্রথম ছোটোগল্পের মধ্যেই পরিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিহারের হাজারিবাগের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সুবোধ ঘোষ।

শিক্ষা ও কর্মজীবন : হাজারিবাগ জেলা তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। মোটামুটি ভালো ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাসের পর হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ভরতি হয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক কারণে পড়াশোনা ছেড়ে চাকরি খুঁজে নিতে হয় তাঁকে পনেরো বছর বয়সেই। তাঁর প্রথম চাকরি ছিল কলেরা-আক্রান্ত বস্তিতে প্রতিষেধকটিকা দান। এই কাজ করতে গিয়ে সমাজের নিম্নতম শ্রেণির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। হাজারিবাগের লাল মোটর কোম্পানিতে কনডাকটরের কাজ তাঁর দ্বিতীয় চাকরি। এ চাকরি করার সময়ে নৈশ অরণ্য আর বিচিত্র যাত্রীসাধারণ তাঁর অভিজ্ঞতার সীমা বাড়িয়ে দেয়। তাঁর বিচিত্র জীবিকার মধ্যে ছিল মাল গুদামের স্টোরকিপার ও সুপারভাইজার, ট্রাকচালক, শিকারিদলের সঙ্গী, সার্কাস দলের মালবাহক, ট্রাপিজ ও হরাইজেন্টাল বার-এর খেলোয়াড়, হজযাত্রীদের টিকা দেওয়ার জন্য মুম্বই হয়ে এডেন-অভিমুখী জাহাজের যাত্রী, মুম্বই পৌরসভার ঝাড়ুদার, পাউরুটি-বিস্কুট যোগানদার, অভ্রখনির ওভারসিয়ার—এইসব কাজ। বাইরের জগৎ, অরণ্য প্রকৃতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল তাঁর। একাধিকবার সন্ন্যাসীর বেশ নিয়ে গৃহত্যাগ করেছেন। যাযাবর জিপসিদের নিয়ে গড়া কার্নিভ্যাল কোম্পানিতে কাজ নিয়ে একবার গিয়েছিলেন উত্তরভারত।

১৯৩৫-৩৬-এ সুবোধ কলকাতায় আসেন জীবিকার সন্ধানে। এখানে এসে তিনি চা ও হোটেল ব্যাবসা ছাড়াও মুরগিপালন করেছিলেন; দিয়েছিলেন মিষ্টি আর মাখনের দোকান। এর সঙ্গে সঙ্গে চলছিল টিউশনি। শেষপর্যন্ত ১৯৪০-এ কোনো সূত্রে সুবোধের অগ্রজ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় অন্যতম স্থাপয়িতা সুরেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে

ভাইয়ের একটি চাকরি করে দেওয়ার অনুরোধ করেন। সুরেশচন্দ্র এই পত্রিকার মুদ্রণালয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস-এ সুবোধকে প্রুফ রিডারের কাজ দেন। অচিরে স্বযোগ্যতায় তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরীয়' বিভাগের কর্মী নিযুক্ত হন।

এই সময় মূলত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সাহিত্য-অনুরাগী সাংবাদিকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি সাহিত্য সংঘ—'অনামী সংঘ'। এঁদের মধ্যে ছিলেন—অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, মন্মথ স্যান্যাল, নৃপেন চক্রবর্তী, বিজন ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, মনোরঞ্জন রায়, পুলকেশ দে সরকার প্রমুখ। প্রতি মাসের দুটি রবিবারে কোনো সদস্যের গৃহে হত এই সভার অধিবেশন। সদস্যদের লেখা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ পাঠ আর আলোচনা ছিল অধিবেশনের বিষয়। সুবোধ ঘোষের ভূমিকা ছিল কেবল শ্রোতার। শেষে বন্ধুদের বিশেষত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের চাপে পড়ে তিনি রচনা করেন ও পাঠ করেন 'অযান্ত্রিক' গল্পটি। গল্পটি প্রশংসা পায়। সুবোধ ঘোষ 'সেদিনের আলোছায়া' ('দেশ', ১৫ মার্চ, ১৯৮০) নামের স্মৃতিকথাতে লিখেছেন—পড়া শুরু করলাম। আধঘণ্টারও কম। পাঠ শেষ। ....কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রশংসার জলোচ্ছ্বাস। আজও মনে পড়ে সেই গুঞ্জনধ্বনি। সেই গল্পের নাম—'অযান্ত্রিক'। ১৯৪০-এ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র বার্ষিক ('দোল') সংখ্যায় মুদ্রিত হয় এই গল্প।

এই সফল সাহিত্য রচনারও ছিল একটি প্রেক্ষিত। মেধাবী সুবোধ প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার সুযোগ পাননি। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত। এবিষয়ে হাজারিবাগ জেলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুপণ্ডিত দর্শনবিদ মহেশচন্দ্র ঘোষ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বহু বিষয়ের ও ধ্রুপদী সাহিত্যের গ্রন্থে সমৃদ্ধ আপন গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে। তাঁর স্বল্পকালের কলেজ জীবনে সহপাঠী ছিলেন রাঁচিবাসী নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের পুত্র রমেশচন্দ্র। গল্প-উপন্যাস ভিন্ন ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থপাঠের আগ্রহ আগে থেকেই তাঁর ছিল। সহপাঠির সহায়তায় বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা-গ্রন্থ পড়ার সুযোগ পেলেন তিনি।

সুবোধ ঘোষের পরিবার বিত্তহীন হলেও সংস্কৃতিশূন্য ছিলনা। পিতামহ কালীচরণ শেষ জীবনে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন এবং বিনা বাধায় পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত। পাশাপাশি পূজার্চনাও চলতো অবাধে।

সাংবাদিক হিসেবেও তিনি কৃতী ছিলেন। সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন ভিন্ন 'কালপুরুষ' ছদ্মনামে 'সাত-পাঁচ' নামে বিচিত্র বিষয়ে ফিচার লিখেছেন তিনি। ১৯৬২ সালে চিন আক্রমণের পর স্বেচ্ছায় তিনি সাংবাদিক হিসেবে গিয়েছিলেন নেফা। দুর্গম ও বিপজ্জনক সীমান্ত অঞ্চল থেকে পাঠানো তাঁর প্রতিবেদন সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন পাঠকগণ।

রাজনৈতিক জীবন : প্রথম যৌবনে এক বিপ্লবী দলের সঙ্গে সামান্য যোগ ছিল সুবোধের। পরে তিনি তৎকালীন প্রধান রাজনৈতিক নেতা গান্ধিজির অনুরাগী হয়ে ওঠেন।

তাঁর কলকাতায় থাকার সময় (১৯৩৫-৩৬) ফ্যাসিবাদ-বিরোধী চেতনা ও সাম্যবাদী মানসিকতা শিক্ষিতজনের মধ্যে প্রবল ছিল। তাঁর 'অনামী সংঘে'র বন্ধুরা অনেকেই—অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ ছিলেন সাম্যবাদের অনুরাগী। সুবোধ ঘোষকে বলা যায় মুক্তমনা মানবতাবাদী। তথাপি প্রগতিমনস্ক পুঁজিবাদ ও শোষণবিরোধী মানুষগুলির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

তাঁর প্রথম দুটি গল্প 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল'-এ সংগ্রামী শ্রমিক-মানস, জমিদার শিল্পপতি-মহাজনের শোষণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ রয়েছে শিল্পসম্মতভাবেই। ১৯৪০-এর শেষের দিকে সুনীল চট্টোপাধ্যায়কৃত 'ফসিল'-এর নাট্যরূপ 'অঞ্জনগড়' ওভারটুন হলে অভিনীত হয়।

সাম্যবাদী তরুণ লেখক সোমেন চন্দের হত্যার প্রতিবাদে লেখক-শিল্পীদের যৌথ বিবৃতিতে (২৩ মার্চ, ১৯৪২) সুবোধ ঘোষও স্বাক্ষর করেন। ১৯৪২-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রতিরোধ' নামের সাম্যবাদীদের পত্রিকাতেও তিনি

লিখতেন। তবে নানা কারণে তিনি পরে সাম্যবাদীদের সম্পর্কে ঈষৎ বিরূপ হয়ে ওঠেন।

গল্পগ্রন্থ : ১৯৪০-১৯৮০— এই দীর্ঘ সময়ে তিনি লিখেছিলেন তেইশটি গল্পগ্রন্থ। এর মধ্যে একটি 'পুতুলের চিঠি' কিশোরদের জন্য চিঠির আকারে লেখা ছ-টি ছোটোগল্পের সংকলন। বাকি সংকলনগুলির নাম যথাক্রমে— (১) 'ফসিল', ১৯৪০; (২) 'পরশুরামের কুঠার', ১৯৪০; (৩) 'শুক্লাভিসার', ১৯৪৪; (৪) 'জতুগৃহ', ১৯৫০; (৫) 'থিরবিজুরি', ১৯৫৫; (৬) 'নিতসিঁদুর', ১৯৫৮; (৭) 'মনভ্রমরা', ১৯৬০; (৮) 'ভোরের মালতী'; (৯) 'কুসুমেষু'; (১০) 'গল্প মণিঘর'; (১১) 'মণিকর্ণিকা'; (১২) 'গল্পলোক'; (১৩) 'অর্কিড'; (১৪) 'সায়ন্তনী'; (১৫) 'নিকষিত হেম'; (১৬) 'রূপনগর'; (১৭) 'পলাশের নেশা'; (১৮) 'গ্রাম যমুনা'; (১৯) 'দিগঙ্গনা'; (২০) 'কিংবদন্তীর দেশ'; (২১) 'ভারত প্রেমকথা'; (২২) 'ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো' (মৃত্যুর পর মুদ্রিত)।

বিশেষত্ব : বাংলা ছোটোগল্পের ভূগোলকে বিস্তৃত করেছেন সুবোধ ঘোষ। কলকাতা থেকে হাজারিবাগ, রাঁচি, গিরিডি, পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর গল্পের ভূমি। তিনি বাস্তবের নতুন রূপ চিত্রিত করেছেন তাঁর গল্পে। সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দের নতুন ব্যাখ্যা, মানুষের মনোগহনের জটিলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর গল্পে। মধ্যবিত্ত মনের দোলাচলতা, দ্বিধা, স্বার্থপরতা নানাভাবে উদঘাটিত হয়েছে তার রচনায়। মোহহীন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন তিনি। মানুষের শুভ বুদ্ধিতে তাঁর আস্থা কখনও শিথিল হয়নি।

কয়েকটি গল্প আলোচনায় সুবোধ ঘোষের স্বতন্ত্র মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক'-এ রয়েছে এই নিজস্বতার চিহ্ন। বিশ শতকের যন্ত্রযুগে মানুষ যন্ত্রকে করে নিয়েছে বন্ধু তার সঙ্গে স্থাপন করেছে মানবিক সম্পর্ক। মালিক আর চালক বিমল তাই তার পুরোনো গাড়িকে নাম দিয়েছে 'জগদ্দল'। কৃষি-নির্ভর জীবনে জীবনধারণের তথা কৃষিকর্মের সহায়ক পালিত পশু আর মালিকের মধ্যে গড়ে উঠত এমনই হৃদয়ের সম্পর্ক। প্রসঙ্গত মনে করা হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়' গল্পটির কথা। পালিত মহিষের সঙ্গে চাষি রঙ্গলালের এমনই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

জগদ্দল বিমলের পনেরো বছরের সঙ্গী। সমব্যবসায়ীরা গাড়িটিকে বিদ্রুপ করে বুড়ঢা ঘোড়া, খোঁড়া হাঁস এইসব নাম দিয়ে। বিমল ক্রুদ্ধ হয় কিন্তু জগদ্দলকে ত্যাগ করার চিন্তাও মনে আনে না। গাড়িটার ক্লান্তি, অভিমান, চাহিদা পলকমাত্রে বুঝে যায় সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে জগদ্দল। তাকে পুরোনো লোহার দরে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় বিমল। আসলে জগদ্দল হয়ে গিয়েছিল বিমলের সত্তার অংশ। আর সর্বগ্রাসী সময় যেমন মানুষকে ক্রমশ গ্রাস করে তেমনই করে জগদ্দল পতিত হয়েছে কালের গ্রাসে। আর এক ভাবে বলা যায় মহাযুদ্ধের আগ্রাসন মানুষকে, তার মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দেয়; হৃদয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে কঠিন বাস্তব। তাই আগত মাড়োয়াড়ি বণিক বিমলকে বলে, ''লড়াই লেগেছে, এই তো মৌকা; ঝেড়েপুঁছে সব দিয়ে ফেলুন বাবুজি। আর বিমলের উত্তর ''হাঁ সব দেব আমার ঐ গাড়িটাও।'' সময়ের কাছে মানুষের এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে 'অযান্ত্রিক' হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র।

সুবোধ ঘোষের দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল'। শোষিত শ্রমজীবী আর শোষক দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বিদেশি শিল্পপতির দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে 'ফসিল'। দেশীয় রাজ্য অঞ্জনগড়ে চলে শক্তির শাসন। লাঠির জোরে মহারাজা ছিনিয়ে আনেন গরিব ভিল, কুর্মি প্রজাদের শরীরপাত করা শ্রমের ফসল ভুট্টা, যব, জোনার। তাঁর শ্রেষ্ঠ অশ্বগুলির পুষ্টি জোগায় এই শস্য। এই দুই শ্রেণির মধ্যে এসে দাঁড়ায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত মহারাজার ল-এজেন্ট তরুণ মুখার্জি। অদর্শবাদী এই তরুণ বন্ধ করে প্রজাদের উপর অত্যাচার। তার উদ্যোগে ভূতাত্ত্বিক সন্ধানে অঞ্জনগড়ের খানিজ সম্পদ অভ্র আর অ্যাসবেস্টস আবিষ্কৃত হয়। এবার আসে বিদেশি শিল্পপতিগোষ্ঠী, নির্মিত হয় মাইনিং সিন্ডিকেট, কুর্মি চাষিরা হয়ে যায় খনির কুলি। মুখার্জি ভেবেছিল এভাবেই মহারাজার ধনপিপাসাতৃপ্ত হবে, দরিদ্র প্রজারা রেহাই পাবে অত্যাচার থেকে। বাস্তবে তা ঘটে নি। প্রথমে দ্বন্দ্ব বাধে শিল্পপতি আর সামন্ততন্ত্রের মধ্যে। শোষিত সাধারণ মানুষকে দুপক্ষই চায় ব্যবহার করতে। খনির মালিকগোষ্ঠী মনে করে কুলিরা তাদের সম্পত্তি, মহারাজার ধারণা

এরা তারই অধীন, তার কথা মানতে বাধ্য। কিন্তু ক্রমে এই শোষিত মানুষগুলি চাইতে শিখল আপন শ্রমের মূল্য। মরিশাস-প্রত্যাগত দুলাল মাহাতো নিয়ে এসেছিল শ্রমিক-জাগরণের বার্তা। তারই প্রেরণায় কুর্মি প্রজা আর শ্রমিক দল পেশ করল দাবিপত্র। তখনই খনিতে ধ্বংস নেমে চাপা পড়ল নব্বইজন নারী-পুরুষ। আবার রিজার্ভ ফরেস্টে বিনা টিকিটে কাঠ কাটতে গিয়ে রক্ষকের গুলিতে মারা পড়েছে বাইশজন কুর্মি। এই সংকট-সময়ে এক হয়ে গেল দুই শোষক শ্রেণি—মাইনং সিন্ডিকেট আর মহারাজা। উভয়ের পরামর্শে খুন করা হল দুলালকে। তার মৃতদেহ আর জঙ্গলে পড়ে থাকা লাশগুলি তুলে এনে 'ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরের মুখে' 'দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিল'। জয়ী হল শোষক সম্প্রদায়।

তরুণ আদর্শবাদী মুখার্জি রোধ করতে পারলো না এই চক্রান্ত। স্বীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সে নীরব থেকে গেল। না ছাড়ল চাকরি, না করল প্রতিবাদ। শোষিত দরিদ্র আর শোষক ধনীর সংগ্রামে মধ্যবিত্তগণ প্রায়শ নেয় ধনীর পক্ষ। মুখার্জিও তাই করেছে। কিন্তু তার বিবেকের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটেনি। তাই সে শ্যাম্পেনের পাতলা নেশার ঘোরে চুরুট টানতে টানতে ভাবে—

'লক্ষ বছর পরে, এই পৃথিবীর কোন একটা জাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে, দেখছে কতগুলি ফসিল। অর্ধপশু গঠন, অপরিণত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাব-হিউম্যান শ্রেণির পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল। আর ছেণী, হাতুড়ী, গাঁইতি; কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত হাতিয়ার। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধহয় একদিন আকস্মিক কোন ভূবিপর্যয়ের কোয়ার্টস আর গ্রানাইটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফসিল, তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই।''

এই শিল্পসম্মত সমাপ্তিতে হতভাগ্য শ্রমজীবীদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারই সঙ্গে রয়েছে মানুষের জ্ঞানসাধনার প্রতি ঈষৎ তির্যক ব্যঙ্গ।

আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তশ্রেণির দ্বিধান্বিত মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচনা দেখা যায় সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম', 'গোত্রান্তর', 'নির্বন্ধ', 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ', 'তিন অধ্যায়' প্রভৃতি গল্পে। মানুষের মনোগহনের গূঢ় জটিলতার বিশ্লেষণে আশ্চর্য নিপুণ, সুবোধ ঘোষ। 'স্নানযাত্রা', 'গরল অমিয় ভেল', 'বারবধূ' প্রভৃতি গল্পের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আমরা আলোচনা করব 'সুন্দরম' গল্পটি। তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বর্ণাভিমান, বিত্তলোভ, ছদ্ম আধ্যাত্মিকতা কৃত্রিম সৌন্দর্যচেতনা আর স্বার্থসর্বস্ব মানসিকতা লেখকের নির্মম বিশ্লেষণে হয়ে উঠেছে স্পষ্ট। কৈলাস ডাক্তারের ছেলে সুকুমারের জন্য চলছে সুন্দরী কন্যার সন্ধান। সে সুন্দরের মানদণ্ড বর্ণের শুভ্রতা—স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য সেখানে অবান্তর। আর ময়না ঘরের শব-ব্যবচ্ছেদক ডাক্তার কৈলাসের কাছে এই বহিঃসৌন্দর্য মূল্যহীন। তাঁর মতে যথার্থ সৌন্দর্য কখনও দেহবর্ণের উপর নির্ভর করে না। তাঁর ক্ষুব্ধ উক্তি 'তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ডু কিছু নেই।...চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে কালি দিয়ে?....বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে?....''

মধ্যবিত্তের এই মিথ্যাচার প্রকট হয়েছে সুকুমারের চরিত্র উদ্ঘাটনে। নিজেকে সে ব্রহ্মচারী বলে প্রচার করে। কিন্তু কুৎসিত এবং মলিন ভিখারিনি তুলসীর যৌবনপুষ্ট অসুন্দর দেহ দিয়ে যৌনক্ষুধা তৃপ্তিতে তার সংকোচ নেই। আবার তারই ফলে গর্ভবতী তুলসীকে বিষাক্ত খাদ্য দিয়ে অনায়াসে হত্যা করে সে।

অপঘাতে মৃত তুলসীর শব ব্যবচ্ছেদের ভার পড়ে কৈলাসের উপর। তিনি মুগ্ধ হয়ে যান তার স্বাস্থ্যে সুন্দর অন্তরঙ্গ রূপে—''প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মতো বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মতো হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মতো শত শত ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশিক জাল।....থরে বিথরে সাজানো সারি সারি রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মতো

অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নালীর প্রবাহিকা। খণ্ড স্ফটিকের মতো পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রকাণ্ড মুকুটধমনী। সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা ঝাঁপি খোলা রত্নমালার মতো আলোয় ঝলমল করে উঠলো।''

তৎসম শব্দের সুষম প্রয়োগে, চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো দেহকোষ জ্ঞানের ব্যবহার—কৃষ্ণাসুন্দরীর দেশ এই ভারতবর্ষকে দিয়েছে নতুন রূপদৃষ্টির সন্ধান। আবার সহায়হীনা নারীর উপর শক্তিমানের অত্যাচারের দিকটি গল্পটিতে ফুটে উঠেছে শেষ পঙ্‌ক্তিতে কৈলাসের সহকারী যদু ডোমের তীব্র মন্তব্যে—''শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।' কারণ কৈলাসের ছুরির মুখে ধরা পড়েছিল হত্যারহস্য : পাকস্থলীতে পাওয়া বিষাক্ত খাদ্য আর জরায়ুতে মৃত শিশুর অস্তিত্ব।

তাই এই বিদ্রুপ মধ্যবিত্তের সুন্দর-চেতনার গর্বের উপর প্রবল আঘাত হয়ে ওঠে। সুবোধ ঘোষের গল্পে যেমন আছে ভাষার ঐশ্বর্য তেমনই আছে 'ঐকসংকটের' নিপুণ উপস্থাপনা।

'কালাগুরু' বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। আগস্ট বিপ্লবের শিল্পসম্মত রূপায়ণ-সমৃদ্ধ গল্পটিতে শাসক ইংরেজের চতুরতা আর নিষ্ঠুরতা উপস্থাপিত হয়েছে।

সেখপুরার মহকুমা শাসক জেরোম টি. এল. টেনব্রুক ভারতবিদ্যাবিদ এবং ভারতপ্রেমিক। তিনি জানেন এদেশের ভাষা, পড়তে পারেন দেবনাগরি, প্রবন্ধ রচনা করেন ভারত-সংস্কৃতি নিয়ে। তাঁর পড়ার ঘরে রাজগিরের মাঠে কুড়িয়ে পাওয়া লালচে বেলেপাথরের ফোটা পদ্মের মতো ধূপদানে পোড়ে প্রাচ্যের সুগন্ধ কালাগুরু।

সাধারণের সঙ্গে সহজভাবে মিশে, স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে ফুটবল খেলে, শান্তি কমিটি গড়ে তিনি সেখপুরাকে মুক্ত রাখলেন আন্দোলনের তরঙ্গ থেকে। কিন্তু ভোর রাতের জাগরণ-গীতি গেয়ে যাওয়া কিশোরবাহিনী ক্ষান্ত হল না। টেনব্রুক এবার আরও ক্রুর হয়ে উঠলেন। শহরের প্রান্তে ১৮৫৭-এ একদল বিদ্রোহীকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তোপের মুখে। জেলা গেজেটিয়ারের এই মুদ্রিত তথ্যের উপর তিনি স্বকল্পিত একটি পুরাকাহিনি টাইপ করে সেঁটে দিলেন। সন্দেহভাজন কিশোরনেতা বলাই এবং কিশোরদের সন্ধ্যায় শহর প্রদক্ষিণ করালেন স্বরচিত গান গেয়ে। তবুও কিন্তু থামল না প্রভাতফেরি। এবার আত্মপ্রকাশ করল শাসকের পশুশক্তি। টেনব্রুক-এর হুকুমে শহর ঘিরে পাহারা দিয়ে বন্দি করা হল বিদ্রোহী কিশোরদের।

গল্প শেষে আদালত প্রাঙ্গণে বন্দিবাহী মোটরলরি থেকে নামতে দেখা যায় আহত শৃঙ্খলিত বলাইকে, শোনা যায় ডি. এস. পি.- র হুকুম 'চার্জ'। তবু যে আন্দোলন থামে না তার আভাস রয়েছে গল্পটিতে।

মধ্যবিত্তের অসার অহমিকার স্বরূপ উন্মোচনে ক্লান্তিহীন ছিলেন সুবোধ ঘোষ। 'তিন অধ্যায়', 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', 'হৃদঘনশ্যামে' তার প্রমাণ।

'স্নানযাত্রা' আর 'বারবধূ'-তে গণিকার অমোঘ আকর্ষণকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তের অবচেতনের ব্যসনায় প্রকাশ ঘটেছে বিচিত্রভাবে।

সুবোধ ঘোষের বেশ কয়েকটি গল্পে দেখা যায় প্রেমের বিচিত্র জটিল প্রকাশ। 'গ্রাম-যমুনা', 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'ঠগিনী', 'শুক্লাভিসার'—এইসব গল্পে ভালোবাসা আর দাম্পত্য প্রেমের ঐকান্তিকতার আশ্চর্য সব দিক উন্মোচিত হয়েছে। আমরা আলোচনা করব 'ঠগিনী' গল্পটি। সনাতন আর সুধা—এই পিতা-কন্যা জীবনধারণের জন্য বেছে নিয়েছিল বিচিত্র এক প্রতারণার পথ। বিপত্নীক কোনো বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিকে ভুয়া পরিচয় দিয়ে সনাতন তারই খরচে তার সঙ্গে দিত সুধার বিয়ে। তারপর যথাসম্ভব গহনা ও অর্থ আত্মসাৎ করে পালাত সুধা। তাদের তিনটি সফল শিকারের পর শিকারি বাঁধা পড়ল শিকারের কাছে। রাণাঘাটের অল্পবয়সী যুবা সিনমার দেওয়ালে চিত্র-আঁকিয়ে

রমেশের সঙ্গে সনাতনের বিবাহ দিল সুধার। নাম দিল তার করবী। এবার সুধা বাগবাজারের গলিতে গড়া দুদিনের বাসা ছেড়ে পালাতে পারল না। বরং অশ্রুজলে স্বরূপ উন্মোচন করল। কারণ রমেশকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। রমেশও যথার্থ ভালোবেসেছিল বধূকে। তাই এবার সুধা পলায়ন করল স্বামীকে নিয়ে। এবার প্রতারিত হল এতদিনের প্রতারক পিতা সনাতন।

সুবোধ ঘোষের বেশ কিছু গল্প চলচ্চিত্রায়িত হয়। তাদের মধ্যে 'ফসিল', ('অঞ্জনগড়') 'জতুগৃহ', 'অযান্ত্রিক', 'পরশুরামের কুঠার' প্রভৃতির নাম করা যায়। হিন্দি ছায়াছবির মধ্যে 'সুজাতা ('আত্মজা'), 'ইজাজৎ' ('জতুগৃহ'), 'এক আধুরি কহানি' ('গোত্রান্তর') উল্লেখযোগ্য।

সুবোধ ঘোষ শেষ জীবনে পশুপাখির সঙ্গে মানুষের হৃদয়-সম্পর্ক নিয়ে লিখেছিলেন কিছু গল্প। সেইসব গল্প ('হরেনবাবুর হরিণী মেয়ে', 'তিন পাহাড়ীর, বুড়ো বট', 'জগোয়তির পাহাড়ী ময়না' প্রভৃতি) সংকলিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর মুদ্রিত 'ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো' সংকলনে।

সুবোধ ঘোষের গল্প বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর মার্জিত সংকেতময় ভাষার প্রয়োগে। বাচনভঙ্গি ঈষৎ নাটকীয় হলেও অলংকারের সার্থক প্রয়োগে অমূর্ত ভাবকে সহজেই মূর্ত করে তুলতে পারত তাঁর ভাষা। গল্পের বিষয়ভেদে ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতা সুবোধ ঘোষের বিশেষত্ব। 'ভারত প্রেমকথা'র পুরাণ-কাহিনিতে ব্যবহৃত তৎসম শব্দবহুল কাব্যময় ভাষা 'আলোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে পূর্ব গগনের ললাটে। সূক্ষ্ম অংশুক কিনারের মতো ধীরে ধীরে অপসৃত হয় খিন্ন কুহেলিকা; আর বিগলিত দুকূলা কামিনীর মতোই শরীর শোভা প্রকট করে ফুটে ওঠে কুলমালিনী এক নদীর রূপ।''

চলিত শব্দ ব্যবহারেও তিনি ছিলেন দক্ষ—''কখনও বা এক ঝাঁক রসিকতার মাছি ভন্‌ভন্‌ করে উঠতো। অহিও হেসে হেসে মাথা নেড়ে মন্তব্য করতো—ডোবালে ডোবালে, ভদ্রসমাজের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে ছুঁড়ি।' ('তিন অধ্যায়') বিষয়ের প্রয়োজনে তিনি ভাষাকে আবেগবর্জিত তীক্ষ্ণতায় মণ্ডিত করতে পারতেন অনায়াসে।

ছোটোগল্পের শিল্পরূপ নির্মাণেও নিপুণ ছিলেন সুবোধ ঘোষ। ঈষৎ চমকের মধ্য দিয়ে তিনি কাহিনিকে ঐক্যবদ্ধ পরিণতির সুষমায় অন্বিত করে দিতেন।

তাঁর অনেক গল্পকেই নানা দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি কাহিনির মধ্যে একাধিক ভাবনার এমন সুমিত প্রকাশে সক্ষম ছিলেন খুব কম বাঙালি গল্পকার। এদিক দিয়ে তিনি অনন্য।

৫.৪ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৬)

১৯১২-র আগস্ট মাসে মাতুলালয় কুমিল্লা শহরে আইনজীবী পিতার সন্তান জ্যোতিরিন্দ্রের জন্ম। তাঁর পৈতুক আবাস ছিল কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া-য়।

স্বভাব-বিশেষত্ব : শৈশব থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন অন্তর্মুখী, চিন্তাশীল। প্রকৃতির প্রতি ছিল তাঁর আশ্চর্য এক আকর্ষণ। ফোটা গোলাপ, স্ফুটনোন্মুখ গোলাপকুঁড়ি যেমন তাঁর মনকে আলোড়িত করত তেমনই বালক মামাদের উপহার দেওয়া নুড়ি, রঙিন পাখির পালক আর শুকনো বকুল ফুলের গন্ধ তাঁকে আমূল আন্দোলিত করত। অতি প্রখর ছিল এই সংবেদনশীল মানুষটির ইন্দ্রিয়চেতনা। তিনি নিজে বলেছেন তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছিল বেশ প্রখর।

শিক্ষা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাইনর স্কুলে আট বছর বয়সে তাঁর পাঠ আরম্ভ হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাইস্কুল থেকে ১৯৩০-এ। আই-এস. সি. পাশ করেন ভিক্টোরিয়া কলেজ (কুমিল্লা) থেকে ১৯৩২-এ। ১৯৩২-এ বি. এ. পাঠকালে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, চার মাস জেলে এবং এক মাস স্বগৃহে অন্তরীন ছিলেন তিনি। একারণে তিনি বি. এ. পাশ করেন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে ১৯৩৫-এ।

কর্মজীবন : স্নাতক হওয়ার পর তিনি কলকাতায় আসেন চাকরির খোঁজে। কোনো সুস্থিত জীবিকা ছিল না তাঁর। প্রথমে করতেন গৃহশিক্ষকতা। ১৯৩৬-এ 'বেঙ্গল ইমিউনিটি' (ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থা)-র হিসেব বিভাগে তিন মাস কাজ করেন। ১৯৩৭-এ কয়েক মাস 'দৈনিক যুগান্তর'-এর সহ-সম্পাদক ছিলেন। এরপর তিন বছর 'দৈনিক আজাদ'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর টাটা এয়ারক্রাফট-এর স্টোর-এ তিন বছর কাজ করেন। পাঁচ বছর আংশিক সময়ের কর্মী ছিলেন বিজ্ঞাপন সংস্থা জে. ওয়াল্টার টমসন-এ। 'জনসেবক' পত্রিকার সূচনা থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিছেন সহ-সম্পাদক। সামান্য কিছুদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কাজ করার পর অবসর নিয়ে তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

১৯৮৩-র ১ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর।

সাহিতচর্চা : তীক্ষ্ণ অনুভবশক্তির অধিকারী, মিতবাক, অন্তর্মুখী স্বভাবের বালক জ্যোতিরিন্দ্রের ডাকনাম ছিল ধনু। প্রকৃতিপ্রীতি তাঁকে টেনে এনেছিল শিল্পের জগতে। প্রথমে ছবি আঁকতেন। অন্নদা হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় এগারো বছর বয়সে শিক্ষক বিপিনবিহারী গুপ্তের প্রেরণায় তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। ভালো আবৃত্তি করতেন জ্যোতিরিন্দ্র। এই সূত্রে সপ্তম শ্রেণিতে পাঠকালে তিনি পুরস্কার পান একখণ্ড রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। এই গ্রন্থ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে গল্প রচনায়। কবিতার পরিবর্তে তিনি চলে আসেন গদ্যসাহিত্যে। বাড়িতে সাহিত্যচর্চার তেমন আবহ না থাকলেও পিতার সস্নেহ আনুকূল্য তিনি পেয়েছিলেন। এসময় তিনি পড়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', জলধর সেনের 'বিশুদাদা', 'পাগল', 'অভয়া', যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা'—এসব বই। তবে তাঁকে বেশি আকর্ষণ করেছিল সামাজিক রচনাগুলি।

কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে আই-এস. সি. পাঠকালে ঢাকার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বঙ্গবাণী'-তে মুদ্রিত হয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অনুদিত মোপাসাঁর গল্প 'জার্নালিস্ট'। এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা।

একমাস পরে ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর একটি মৌলিক গল্প। গল্পটির নাম জানা যায়নি। এসময়ই কলেজের পত্রিকায় বের হয় তাঁর একটি গল্প 'অন্তরালে'। তারপরে ঢাকা ও কলকাতার নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর নানা গল্প। যেমন 'সোনার বংলা', সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী' (ঢাকা), 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক 'সংবাদ' (কলকাতা)। তখন তিনি একবেলার মধ্যে লিখে ফেলতেন একটি গল্প। তবে লিখে পাওয়া যেত না অর্থ। যখন সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে তিনি কারাবাসের পর সবগৃহে বন্দি তখন নিষিদ্ধ হয় তাঁর লেখা। তখন তিনি জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর তাঁর রচনার পরিমাণ বেড়ে যায়। স্নাতক হওয়ার পর (১৯৩৫) তিনি কলকাতায় আসেন। গৌণ উদ্দেশ্য চাকরি, মুখ্য উদ্দেশ্য—''আমাকে লেখক হতে হবে, বড় সাহিত্যিক হব। খ্যাতিমান হব। রাতদিন কেবলই এই স্বপ্ন।'' ('আমার সাহিত্যজীবন', 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প', পৃ. ২৯৯)

ক্রমে তাঁর লেখা সমকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—'নবশক্তি', 'পূর্বাশা', 'অগ্রগতি', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'ভারতবর্ষ' পরিচয়-এ বের হতে থাকে। তাঁকে সবচেয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন 'নবশক্তি' সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং 'পূর্ব্বাশা' সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

'সূত্র' ('পূর্বাশা') 'নদী ও নারী' ('পরিচয়'), 'অনাবৃষ্টি' ('দেশ') সমকালে সাড়া তুলেছিল। এইসব পত্র-পত্রিকায় বের হয় তাঁর 'রাইচরণের বাবড়ি' ('দেশ', ১৯৩৬) 'মঙ্গলগ্রহ', 'পালিশ', 'কমরেড', 'রাধিকা', 'শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি', 'বনানীর প্রেম', 'শালিক কি চড়ুই'—প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প।

রচনাকে বার বার মার্জনা করা ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি লিখতেন 'নিজের মতো' করে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন—''পূর্বসূরীদের সাহিত্যে যথাযথ তৃপ্তি আমি পাইনি, যেন আরও কি দেবার রয়ে গেছে। তা দিতে হবে

আমাদের, তাই আমার সাহিত্যমঞ্চে প্রবেশ।''

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা—সতেরো।

(১) 'খেলনা', ১৩৫৩; (২) 'চন্দ্রমল্লিকা', ১৩৫৩; (৩) 'শালিক কি চড়ুই', ১৩৬১ : নায়ক-নায়িকা, খুকী চড়ুইভাতি, বধির, ভোলাবাবুর ভুল, খেলোয়াড়, চামচ, বেঙ্গমা-ব্যঙ্গমী; (৪) 'চার ইয়ার', ১৩৬১; (৫) 'বন্ধুপত্নী', ১৩৬২; (৬) 'ট্যাক্সিওয়ালা', ১৩৬৩'; (৭) 'বনপ্রাণীর প্রেম', ১৩৬৪; (৮) 'প্রিয় অপ্রিয়', ১৩৬৪ : কৈশোর, গিরগিটি, আটপৌরে, বুটকি-ছুটকি; (৯) 'পার্বতীপুরের বিকেল', ১৩৬৫; (১০) 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর', ১৩৬৭ : কেষ্টনগরের পুতুল, পঙ্গু, মাছ ধরার গল্প, নীল পেয়ালা, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর; (১১) 'পতঙ্গ', ১৩৬৭ (১২) 'মহিয়সী' : ১৩৬৭; (১৩) 'আজ কেথায় যাবেন', ১৩৬৭ : সোনালি দিন, আম কাঁঠালের ছুটি, দুই শিশু, লেডিজ ঘড়ি, আরশোলা, গোধূলি, ভালো ছেলে খারাপ ছেলে, চশমখোর, জিয়নকাঠি মরণকাঠি, আজ কোথায় যাবেন, গোপন গন্ধ; (১৪) 'পাশের ফ্লাটের মেয়েটা; ১৩৬৮ : তিন বুড়ী, গোঁয়ার, বৃষ্টির পরে, আপেল, সমুদ্র, উপহাস, মৌসুমী, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা; (১৫) 'শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা' (১৩৭০) : শ্বাপদ, গন্ধ, শয়তান, রূপালী মাছ; (১৬) 'ছিদ্র', ১৩৮৩ : ছিদ্র, সোনার চাঁদ, বুনোওল, ক্ষুধা, হিংসা; (১৭) 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প' ১৩৯৮ : কালো বৌদি, আপন ভাই, ম্যাজিক, ফোটার দিন, রূপকথার রাজা।

রচনা-বিশেষত্ব : প্রাকরণিক চমকহীন নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ও বিষয় নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তারপরের যুগের লেখক। তিনি মূলত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে লিখেছেন। এই সময়ের মধ্যে কালোবাজার, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্‌বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে এই সমাজে দেখা দিয়েছিল অবক্ষয়। বিপন্ন হয়েছিল চিরন্তন মূল্যবোধসমূহ। কেনোমতে টিকে থাকাটাই হয়ে উঠেছিল কাম্য। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে আছে এই বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মানুষগুলির চিত্র।

তাঁর ছোটোগল্পের দ্বিতীয় বিশেষত্ব মনস্তত্ত্বের নিপুণ চিত্রণ। প্রায়শ মনোবিকলনের বিচিত্র আর ভয়ঙ্কর রূপায়ণ লক্ষিত হয় তাঁর গল্পে। এরই সঙ্গে আছে প্রকৃতিপ্রীতি, সৌন্দর্যপিপাসু মানবমনের ছবি। প্রেম বা ভালোবাসার প্রতি তাঁর গাঢ় বিশ্বাস বিকৃত যৌনবাসনার সঙ্গে সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে তাঁর গল্পে। বিশেষত প্রকৃতি তাঁর গল্পে মাঝে মাঝেই হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র সত্তা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা, ইন্দ্রিয়বোধ বিশেষত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা নবীনভাবে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর রচনাকে।

একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন 'পূর্ব্বাশা'য় গল্প লেখার সময় জীবনানন্দের কবিতা পড়তে শুরু করেন। জীবনানন্দের কবিতার বুদ্ধিগ্রাহ্য শিল্পসুন্দর শব্দ-বিন্যাস তাঁকে গল্প রচনার প্রেরণা দিয়েছে।

তাঁর রচনায় আছে স্বতঃস্ফূর্ততা। তাঁর জানা ছিল অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার সংযোগে গড়ে ওঠে সার্থক সাহিত্য। সমাজ-সমস্যা বা রাজনীতি তাঁকে ততটা আলোড়িত করেনি। তিনি বলেছেন মানুষের কথা, তার সার্থকতা, বিফলতা আর প্রবৃত্তির হাতে অসহায়তা তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর রচনার বিশেষত্ব। তিনি অতিরেক পছন্দ করতেন না। তাঁর গল্পে সর্বদা রক্ষিত হয়েছে ভারসাম্য।

এবার আমরা প্রতিটি শ্রেণির গল্পের একটি করে উদাহরণ দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনাবিশেষত্বকে আরও স্বচ্ছ করে তোলার প্রয়াস করব।

১. প্রথমেই আমরা বলব—অর্থনৈতিক সংকটে বিপন্ন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের সার্বিক বিনষ্টির কথা। এই

ধরনের গল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'তারিণীর বাড়ি বদল।' গল্পটিতে চরম দারিদ্র্য, মধ্যবিত্তের পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা এবং অন্যের দুঃখ দেখে আত্মতৃপ্তি প্রকাশরূপ লাভ করেছে। গল্পটি তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর উৎস।

যুদ্ধশেষের উচ্চমূল্য আর দুর্ভিক্ষের বাজারে চাকরি যায় সামান্য প্রেসকর্মী আট-দশটি সন্তানের পিতা তারিণীর। তাই এক দুপুরে দুটি কোঠাঘরের সচ্ছল পাড়া ছেড়ে সে কলকাতার সবচেয়ে দুঃস্থ দুর্গম স্থান বেলেঘাটার দিকে যাওয়ার জন্য ঠেলায় জিনিস তুলতে থাকে। তখন পাওনাদারের দল ঘিরে ধরে তাকে। এক অবাঙালি পাওনাদার অপমান করে তাকে—'তুম শালা চোট্টা আছো।' তারিণী প্রতিবেশীদের দিকে তাকায়। কিন্তু ভিত্তিহীন সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়ে কিছু বলতে পারে না। প্রতিবেশীদের মধ্যে কাজ করে একই ধরনের মধ্যবিত্ত অভিমান। নিচুগলায় তারা বলে 'ঋণের দায়ে পালাচ্ছে, সরে যাচ্ছে এখান থেকে আমরা কি আগে জানতাম, না কোনোদিন এসেছিল ও কারো কাছে।' এলে তারা নিশ্চয় সাহায্য করতো। পাওনাদারেরা মুদি, কয়লাওয়ালা আর গয়লানি শুধু বিদ্রুপ করে না। তার জিনিসপত্র ফেলে নষ্ট করতে থাকে নিষ্ঠুরভাবে। মধ্যবিত্ত বাঙালির সহায়হীনতা রূপ পায় তারিণীর অক্ষম আস্ফালনে—''টাকা পাবে কোর্টে গিয়ে নালিশ করো, খবরদার মালপত্রের গায়ে হাত দিয়ো না, ফ্যামিলিম্যান আমি ভদ্রলোক,....।' এই 'ভদ্রলোক' শব্দটিতে ফুটে উঠেছে মধ্যবিত্তের দীনতা। ঠেলাওয়ালা গাড়ি চালাতে চায় না তারিণীর পাওনাদারদের ভয়ে। তখনও তারিণী কারও কাছে সাহায্য চায় না। নিজেই টানতে থাকে মালবোঝাই গাড়ি। পিছন থেকে গাড়ি ঠেলতে থাকে তার বাক্যহীন স্ত্রী-সন্তানেরা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারিণীরা যেতে পারে না তাদের অন্য বাড়িতে। পথে গাড়ি উলটে সপরিবারে মারা যায় সে।

গল্পটিতে নিষ্ঠুর, উদাসীন, অনুভূতিশূন্য স্বার্থপর আধুনিক সমাজের ছবিও রয়েছে। গল্প শেষে দেখা যায়—''...লম্বা টর্চ হাতে তারিণীর পরিত্যক্ত ঘরের তালা খুলতে খুলতে বাড়িওলা নতুন কোনো এক ভাড়াটেকে বাড়ির জলকল পায়খানা ও রসুইঘরের চমৎকার ব্যবস্থার কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনাচ্ছে।'' মানবিকতার সার্বিক ক্ষয় ফুটে উঠেছে লেখকের এই নির্মোহ, নিরাসক্ত বর্ণনায়।

মানব-মনস্তত্ত্বের নিপুণ ব্যবহার দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে। 'চোর' গল্পে প্রকৃতির প্রতীকী ব্যবহারে আকার পেয়েছে এক কিশোরের মানসিকতার বিচিত্র রূপ।

সম্পন্ন ব্যারিস্টার-পুত্র সহপাঠী সুকুমারদের বাড়ির পাশেই ছিল মিন্টুদের টিনের ঘর। তার মনে দারিদ্র্য-ভিত্তিক কোনো দুঃখ ছিল না। সুকুমারদের ছিল রোদে ভরা বিশাল বাগান আর মিন্টু নর্দমার পাশ থেকে তুলে এনে পেঁপে চারা বসিয়েছিল তাদের উঠোনে। সুকুমারদের বহু ভৃত্যের মধ্যে বরখাস্ত হয় মদন নামের দশ টাকা মাইনের চাকরটি। সে মিন্টুদের বাড়ি কাজ নিলে মিন্টু সাগ্রহে বরণ করে নেয় তাকে। সহপাঠী হলেও সুকুমার কথা বলত না দরিদ্র মিন্টুর সঙ্গে। তাই মদনের চাপা ক্রোধের সঙ্গে সে এক হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু মদন সুকুমারদের বাড়িতে আবার বহাল হতেই পালটে যেতে থাকে পরিস্থিতি। ঝড়ের রাতে মদন মিন্টুর পেঁপে চারা চুরি করে পুঁতে দেয় সুকুমারদের রোদালো বাগানে। অনুকূল পরিবেশে শীঘ্র বেড়ে ওঠে গাছটি। ঐশ্বর্যময় সেই প্রকাশের আকর্ষণে মিন্টু বার বার ছুটে যায় সুকুমারদের বাড়ি। এর মধ্যে সুকুমার হয়েছে তার বন্ধু। ক্রমে ঐশ্বর্যের মোহে জারিত হয় মিন্টুর মন। সুকুমারের সুন্দরী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মায়ের দেওয়া সাদাপাথরের বাটিভরা ফলের আপ্যায়ন, তাকে ভুলিয়ে দেয় নিজের শীর্ণ জননীর স্নেহমধুর ব্যবহার।

হঠাৎই মিন্টুর চেতনা ফেরে, সে বুঝতে পারে 'চোর' হচ্ছে ওই পেঁপেচারা। সে ''....মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কেবল মদনকে না, আমাকেও, না হলে আমাদের ছোটো উঠোন, টিনের ঘর, ছায়াঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন।''

এভাবে একটি গাছকে কেন্দ্র করে আর্থিক বৈষম্যজাত শ্রেণি-বৈষম্য এবং সে সম্পর্কে এক সরল কিশোরের সচেতনতা গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে।

মনোবিকলনজাত গল্পগুলিতে জ্যোতিরিন্দ্র প্রায়শ এনেছেন হিংস্র কোনো হত্যার বিবরণ। মনোবিকলনের একটি সুন্দর গল্প 'সমুদ্র'। প্রকৃতির বিশালতার সামনে মানুষের অসহায়তা, তার মানসিকতার আমূল রূপান্তর এ গল্পের বিষয়।

স্ত্রীসহ পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল গল্পবক্তা। সমুদ্রের ব্যাপ্ত বিস্তৃত রূপ তার মনকে পালটিয়ে দিতে থাকে। তার মনে জাগে বিশালতার অনুভব। স্ত্রী হেনাকে তার মনে হয় বোধহীন মাংসস্তূপ। কারণ সে সমুদ্রের মহিমা বোঝে না—''বলতে কি প্রথম রাত্রেই মনে হয়েছে আমি বড়—অনেক বড়; সৃষ্টি ও লয়ের গূঢ় গম্ভীর শব্দ শোনার অধিকার আমারই আছে, তোমার নেই; তুমি ছোট অনেক ছোট; সমুদ্রকে তুমি বোঝ না চেন না।....'' ক্রমে সমুদ্র তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় জীবন্ত এক অস্তিত্ব। তার এ অনুভব গাঢ় হয় বিচিত্র এক চরিত্র 'মামা'-র সংস্পর্শে। কুড়ি বছর ধরে সমুদ্রকে দেখছে 'মামা'। তার কল্পনায় সমুদ্র শুধু জীবন্ত নয় ক্ষুধার্ত এক অস্তিত্ব। সাদা ফেনা তার কাছে সমুদ্রের 'সাদা শক্ত ধারালো দাঁত।' তাই সমুদ্রকে সে খেতে দেয় মাছভাজা, ডিমের বড়া, সিঙাড়া, রুটি, কেক। ভাগ্নের প্রিয় অ্যালসেসিয়ান, এমনকী শেষপর্যন্ত স্ত্রীকেও সে সঁপে দেয় সমুদ্রের ক্ষুধার গর্ভে। এই বিকৃতি সঞ্চারিত হয় নায়কের মনে। সে স্ত্রী হেনাকে সমুদ্রের গ্রাসে ঠেলে দিতে চায়—''বালুর শেষপ্রান্তে চলে গেছি আমরা। আমাদের সামনে ধু ধু সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই; সাদা কঠিন হিংস্র দাঁতের হাঁ নিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে আসে ঢেউ, পিছনে আর একটা। ....আর একটা।....।''

প্রকৃতি এখানে যেমন জীবনের বিশালতাকে স্পষ্ট করেছে তেমনই সুস্থ স্বাভাবিক অনুভূতিকে করে দিয়েছে বিকৃত। চেনাকে গ্রাস করেছে সে। শেষপর্যন্ত অবশ্য মানুষটি রক্ষা করতে পারে নিজেকে। হেনা বেঁচে যায়। সৌন্দর্য উপভোগের সুস্থ মানসিকতায় স্থিত হতে পেরে অবিলম্বে পুরী ছেড়ে যায় তারা।

প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। তাই গাছ, ফুল, পাতা, আগাছা, জঙ্গল, পতঙ্গ, তাঁর গল্পে নতুন ব্যঞ্জনা এনে দেয়। প্রকৃতি আর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'বনের রাজা' নামের বিস্ময়কর গল্পটি। ইঞ্জিনিয়ার সারদারঞ্জন অবসর নেওয়ার পর ষাট বছর বয়সে ছেড়ে এসেছেন নগরসভ্যতা। গ্রাম্য প্রকৃতির জনহীন বিস্তৃতির মধ্যে তিনি পেয়েছেন যথার্থ মুক্তির স্বাদ। সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি উপভোগ করেছেন এই প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধকে। বালক পৌত্র মতিকে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে আদিম নগ্নতায় ফিরে গিয়ে জীবনকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন দুজনে। নাতির কাছে সারদারঞ্জন হয়ে উঠেছেন 'বনের রাজা'। দীর্ঘসন্তরণ শেষে পুকুর থেকে উঠে আসা নগ্ন, সিক্ত শরীর দাদুকে দেখে নাতির মনে হয়েছে—''একটা পুরনো, গাছ। অনেক দিন জলের নীচে থাকার পর এখন উঠে এসেছে।'' তার মনে হয়েছে ''দাদুর গায়ের গন্ধ চামড়ার গন্ধ তার নাকে লাগছে। মাছের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না। কোমল ঠান্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা।'' এভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে বৃদ্ধ সারদা খুঁজে পেয়েছেন জীবনের নতুন উৎস।

প্রকৃতি স্বতন্ত্র সত্তা হয়ে উঠেছে 'পঙ্গু' আর 'গাছ' গল্পে। 'পঙ্গু'-তে খঞ্জ শুভেন্দুর সঙ্গে প্রকৃতির উষ্ণ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। তার বিছানায় এসে পড়েছে হেমন্তের বেলাশেষের রোদ শুভেন্দু দেখছে—''রূপসী রোদের হলুদবর্ণ গাঢ় হয়ে এখন কমলা রং ধরেছে। লম্বা আঙুল বাড়িয়ে বিছানা ছুঁই ছুঁই করছে। আর দশ মিনিটের মধ্যে ও এসে বিছানায় উঠবে, শুভেন্দুর বুকের ওপর কাটা পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়বে। রক্তহীন শীতল একটা দেহকে উৎসাহিত করতে রূপসীর চেষ্টা কি কম। কৃতজ্ঞ গাঢ় দৃষ্টি মেলে শুভেন্দু অনেকক্ষণ ধরে উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন রৌদ্ররেখাটি দেখল।''

'গাছ' গল্পের নায়ক একটি গাছ। কঠিন নগরের বুকে সে বেড়ে উঠেছিল। মানুষ তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল শান্তি। সকালে তার ছায়ায় বসত বয়স্কদের আসর ও মধ্যাহ্নে জমত মহিলা মজলিস। আর বিকালে গাছটিকে ঘিরে চলত শিশুদের হুল্লোড়।

হঠাৎ গাছটিকে শত্রু বলে ভাবতে লাগল পুবের বাড়ির এক মেয়ে। তার ভাবনা হয়ত প্রভাবিত করত মানুষগুলিকে। কিন্তু গাছের পশ্চিমের বাড়ির এক যুবক এল তাকে রক্ষা করতে। সে গাছের অস্তিত্বের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরল। ফলে দ্বিধায় পড়ল আশপাশের মানুষগুলি।

শেষে রাতের অন্ধকারে গাছটিকে ধ্বংস করতে এল কুডুল হাতে মেয়েটি। ছেলেটি লাঠি হাতে এগিয়ে এল বৃক্ষটিকে রক্ষা করার জন্য। পরিণামে উভয়ের হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্র। প্রেমের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল দুই নরনারী। আনন্দ আন্দর তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে এলে গাছের, সে এখন ঘুমোবে।

সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ : জীবনের কুৎসিত দিক, অবনমনের দিক সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন সচেতন। তবুও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের মন থেকে মুছে যেতে পারে না এ সত্য মাঝে মাঝেই উঠে এসেছে জ্যোতিরিন্দ্রের কলমে! তাঁর ব্যক্তিমনের সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণই হয়তো এভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'সামনে চামেলি' গল্পটির কথা আমরা এপ্রসঙ্গে বলে নিতে পারি।

গল্পের নায়ক সাতাশ বছরের এক যুবক। দুর্ঘটনায় তার একটি পা গেছে। ক্রাচ দিয়ে তাকে হাঁটতে হয়। একারণেই স্কুল ফাইনালের পর আর পড়তে পারেনি সে। বৃদ্ধ পিতামাতা আর তিন ভাইবোন সমেত ছ-জনের ভার তার উপর। তাই একশ কুড়ি টাকা বেতনের কর্পোরেশন-প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নায়ক দু-বেলা দুটি টিউশন করে।

দুর্ঘটনার পর হাসপাতাল থেকে আসার সময় চিকিৎসকেরা বলেছিলেন পুষ্টিকর খাবার আর মালটিভিটামিন ট্যাবলেট খেতে। অর্থাভাবে তা সম্ভব হয়নি। রক্তশূন্য দুর্বল চেহারার মানুষটি অত্যন্ত ভীরু আর লাজুক।

তবু তার মধ্যে আছে সুন্দরের তৃষ্ণা, পরিচ্ছন্নতার মোহ, রূপকামনা। সুন্দর রাস্তা, বাড়ি, গাছপালা, ফুল, পাখি তার প্রিয়। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল পরিচ্ছন্ন শ্রীসম্পন্ন জগতে উপনীত হওয়া। তা সম্ভব হয়নি।

কৈশোরে এক ভদ্রলোকের হাতের গোলাপতোড়া তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে। কাজ ফেলে সে দেখত ময়ূরের পেখম ধরা। গাড়ি, সুন্দরী কিশোরীদের দেখে বার বার সে ওই স্থানে যেত।

এখনও নষ্ট হয়নি তার সেই রূপপিপাসা। স্কুলের পর বাড়ি না গিয়ে ক্ষুধার্ত শরীরে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে চলে আসে অভিজাত পাড়ার সুন্দর নির্জন রাস্তায়। রাধাচূড়া, মে-ফ্লাওয়ার ইউক্যালিপটাস গাছে সাজানো রাস্তার দু-পাশে উঁচু উঁচু বাড়ি আর ফুলে ভরা ব্যালকনি দেখতে দেখতে সে হেঁটে যায়। হেনা, বেল, চাঁপা, বকুলের গন্ধ তাকে তৃপ্ত করে। হঠাৎ উপরে চেয়ে সে দেখতে পায় মাধবীলতা ভরা ব্যালকনিতে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে এক সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। যুবকের জগৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য হয়ে যায় শব্দহীন। তারপরেই তার কানে আসে পয়সা ফেলার শব্দ। যুবক বোঝেনি তাকেই ভিক্ষুক ভেবে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ওই মুদ্রা। তাই সে হেঁটে যায়। এবার আসে আঘাত, ওই বাড়ির ভৃত্য তাকে ডেকে জানতে চায় কেন সে পয়সা নিল না। তার দিদিমণি জানতে চাইছে সে কি পুরনো জামাকাপড় নেবে? এতেও বিচলিত হয় না নায়ক। সে জেনেই গেছে এসব তার পাওনা। তার রূপতৃষ্ণা বুঝবে না অন্য কোনো মানুষ। তাই হেসে মাথা নেড়ে সে যেন সামনে চামেলির গন্ধ পেয়ে এগিয়ে চলে।

বিকৃত মানসিকতার একটি গল্প 'হিংসা'। জগদীশ ও রেবা তাদের সন্তান হারিয়ে শপথ নিয়েছিল প্রাণীহিংসা ত্যাগের। তাই জগদীশ ছেড়েছিল তার পাখি শিকারের নেশা।

রেবার প্রতিবেশিনী মীরা ছিল গর্ভবতী। ডিমওয়ালা-মুরগি কাটা, সে মাংস খাওয়ার মধ্যে অদ্ভুত এক তৃপ্তি অনুভব করত সে। রেবার মনে মীরার প্রতি বিতৃষ্ণা এভাবেই উদ্ভূত হয়। মীরা আসত প্রতিবেশী রেবার বাড়ি। দরিদ্র রেবা

শুনত মীরার স্বামীর অফিসে মাইনে বাড়া, প্রমোশন, বিলেত যাওয়া আর মীরার জন্য অলংকার নির্মাণের কথা। এসবের ক্রমপরিণতিতে রেবার মনের বিতৃষ্ণা হয়ে যায় হিংসা। কুটিল সেই হিংসা তাকে প্রাণিত করে মীরার হত্যায়। জীবহত্যার পাপকে রেবা ঘৃণা করত। অথচ গর্ভবতী নিরপরাধ মীরাকে মেরে ফেলার জন্যই সে পাঠিয়ে দেয় শ্যাওলা পিছল কলতলায়। অজুহাত দেয় তাদের ঘরের বাথরুমের মেঝে নতুন করা হয়েছে বলে এখন তা ব্যবহার করা যাবে না। মীরা চলে গেলে, রেবা প্রত্যাশিত মৃত্যু-আর্তনাদ শোনার জন্য ''......দরজা ছেড়ে রেবা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেছে ওর, যেন দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে, কান খাড়া রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ও।......''

রেবার মনের কুটিলতাই এই হত্যা-পরিকল্পনার মধ্যে প্রকাশিত।

যৌনবাসনার শিকার এক তরুণের করুণ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে 'পতঙ্গ' গল্পে। বত্রিশ বছর বয়সী অধ্যাপক চক্রবর্তী মেটাতে পারেননি তরুণী সুন্দরী পত্নী রূপার বাসনাবহ্নি। স্বামীর অনুপস্থিতিতে রূপা স্বামীর ছাত্রদের দিয়ে মেটাতো তার দেহবাসনা। চতুর্থ বর্ষের যুবক ছাত্র নিশীথের প্রতি ছিল তার প্রবল টান। অধ্যাপক চক্রবর্তী প্রথম বর্ষের সতেরো বছরের তরুণ পলাশের মাধ্যমে রূপাকে প্রহরা দেওয়ার চেষ্টা করল। কুহকিনী রূপার যৌবনবহ্নি জাগিয়ে তোলে পলাশের শরীরী অনুভূতিকে। এর আগে প্রকৃতিই ছিল তার প্রিয়। এখন 'গোলমোহরের সোনাকে পিতল করে দিয়ে রূপা হাসির মুক্তা ছড়িয়ে দিয়েছে জানালার এপারে যখন তখন।'' পতঙ্গের মতো পলাশ কুড়ি বছরের রূপার বাসনার আগুনে আহুতি দিয়েছে নিজেকে।

হঠাৎ পলাশ বুঝতে পারে রূপা একইভাবে নিশীথকে ব্যবহার করেছে আপন কামনাপূরণের জন্য। ফলে পলাশের মন হয় বিপর্যস্ত। কারণ সে ভালোবেসেছিল রূপাকে। এইজন্যই নিশীথ চলে যাওয়ামাত্র পাউরুটি কাটা ছুরি রূপার তলপেটে বিঁধিয়ে দেয় সে। প্রেমিক হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর হত্যাকারী।

কয়েকটি গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখক-প্রকৃতির বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। 'গোপন গন্ধ' এরকম একটি গল্প। গল্পটির বিষয় দৃষ্টিহীন এক মানুষের ঘ্রাণ দিয়ে সব কিছু অনুভবের অদ্ভুত বর্ণনা। স্বভাবতই গল্পটি মনে করায় জ্যোতিরিন্দ্রের স্বীকারোক্তি যে তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় খুব প্রবল।

'ইষ্টিকুটুম' গল্পে স্বার্থের জন্য বাপ-মা হারা রুগ্ন গণেশকে তার মেসো বিক্রি করে দিয়েছে লস্করের কাছে। প্রকৃতির স্নেহছায়া থেকে সে চালান হয়েছে 'গুদামের মতো গুমগুমে' অন্ধকার ঘরে। সে ঘরে ছোটো ছেলেমেয়েদের বিকলাঙ্গ করে ভিক্ষুক বানানো হয়। গণেশেরও পরিণাম তাই। তবুও মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস মুছে যায় না জ্যোতিরিন্দ্রের মন থেকে। তাই রচিত হয় 'ভাত'-এর মতো গল্প। ছেলে শেষ সম্বল পয়সাকটি নিয়ে চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে গেছে সকাল আটটায়। তার জন্য ডাল, ভাত, কুমড়োর তরকারি আগলে অপেক্ষা করছেন বাবা। ক্ষুধা দহন করছে তাঁকে। খাবার ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য তিনি একটু তরকারি, একটু ডাল, দু-এক দানা ভাত খেয়ে দেখেছেন। ফলে তীব্র হয়েছে ক্ষুধা। তবু তিনি দাঁতমুখ চেপে অপেক্ষা করছেন পুত্রের আগমনের।

অনেক রাত; আশাহীন ব্যর্থ ছেলে ফিরল। বাবা আর ছেলে দুজনেই পরস্পরকে খিদে না থাকার অজুহাত দিয়ে খেয়ে নিতে বলে অপ্রচুর আহার্য। শেষপর্যন্ত তেল ফুরিয়ে নিভে যায় আলো আর অন্ধকারে বসে সেই সামান্য খাদ্য ভাগ করে খেতে থাকে পিতাপুত্র।

পারস্পরিক প্রীতির স্নিগ্ধতায় এখানে দারিদ্র্য অনেকটাই প্রশমিত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বেশি লেখেননি। তুলনায় স্বল্প হলেও তাঁর লেখা মেনে চলেছে সময়ের দাবি। অসুস্থ সময়ের হাতে মনুষ্যত্বের সার্বিক সর্বনাশ যেমন তিনি দেখেছেন তেমনই দেখেছেন অশুভ, অমঙ্গলের-ঊর্ধ্বে মানবিকতার উজ্জ্বল প্রকাশ। কোনো সাহিত্য-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি তিনি। তথাপি কাহিনিহীন অনুভূতি নির্ভর আশ্চর্য কয়েকটি ছোটো গল্প লিখেছেন তিনি—''তাঁকে নিয়ে গল্প', 'চন্দ্রমল্লিকা', 'সুখী মানুষ' ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প যে বাংলা ছোটোগল্প শাখাকে নানাদিক দিয়ে পুষ্পিত করেছে একথা না মেনে উপায় নেই পাঠক-সমালোচকের।

ভাষা : তাঁর ভাষা ব্যঞ্জনাগভীর, সূক্ষ্ম কাব্যময়তায় মণ্ডিত। ভারহীন শব্দবিন্যাস, তীক্ষ্ণোজ্জ্বল সংলাপ, ঘটনা ও চরিত্রের নিখুঁত অনুপুঙ্খ বর্ণনা, দক্ষ অলংকরণ তাঁর রচনাকে করেছে বিশিষ্ট।

সংলাপ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি বিষয় এবং চরিত্রের সামগ্রিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতেন। প্রথম যুগে তাঁর ভাষা ছিল উপমা, প্রতীক ও চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ। ক্রমে তিনি সাধারণ সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহারের দিকে, ভাষার কৌশলগত বিন্যাসের দিকে জোর দিয়েছিলেন। সামান্য কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

চিত্রকল্প : 'শ্বাপদ' গল্পে সুন্দরী রুবি ঘর ছাড়ে সরল গ্রাম্য যুবক গণেশের সঙ্গে। এই ঘটনাটি উপস্থাপিত হয়েছে অরণ্যের চিত্রকল্পে। গণেশকে গাছের সঙ্গে তুলনা সেই চিত্রকল্পকে দিয়েছে সার্থকতা—''যাকে বুনো বলতাম, গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সেই অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।''

প্রতীক : 'পঙ্গু' গল্পে কেন্দ্রচরিত্র পঙ্গু শুভেন্দুর সংসারে কর্মহীন অবস্থান নির্ণীত হয়েছে অচল ঘড়ির কাঁটার প্রতীকে—''উত্তর দেয় না শুভেন্দু। চোখ ঘুরিয়ে আবার সে এক সঙ্গে নিশ্চল ঘড়ির কাঁটা ও মেয়ের মুখ দেখল।''

উপমা : 'সামনে চামেলি' গল্পে (ক) গন্ধের উপমা হয়েছে। **শব্দ :** 'কানে কানে কথা বলার মতন মূল্যবান গন্ধটুকু' (খ) গন্ধের উপমা হয়েছে দৃশ্য : 'মেয়েদের মুচকি হাসির মতন একটু সময়ের জন্য ঠান্ডা পরিচ্ছন্ন জুঁই-এর গন্ধও টের পাই।' এখানে শুভ্র ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ বোঝাতে 'ঠাণ্ডা' ও 'পরিচ্ছন্ন' দুটি বিশেষণ অসাধারণ এবং সার্থক হয়ে উঠেছে।

সংলাপ : অ্যাডভোকেট জগদীশের ছেলে বস্তির মেয়ে হিমিকে সাইকেল শেখাচ্ছে—তা দেখে তার মা শোভনা ও বাবার সংলাপ—

''অ্যাঁ, এত বড় মেয়ে! শোভনা কাঁদতে আরম্ভ করল।—ফুটবলের মতন মেয়েটাকে বাবলু ঠেলতে পারে! কত শক্তির দরকার। খুব বেশি বড় নয়। জগদীশ নাকে হাসল। উঠতি একটু ফুলে উঠেছে।

বাবলুর পনের। হিমির চৌদ্দ-পনেরর বেশি কিছুতেই নয়।

ইস, বস্তির মেয়ে, লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

ওরা দুটিতে বন্ধু। বাবলু হিমিকে সাইকেল শেখাচ্ছে।

অ্যাঁ, বাবলু কত বড় একটা অ্যাডভোকেটের ছেলে, আর খোলার ঘরের ওই ধুমসি মেয়েটা!

ওরা বন্ধু। জগদীশ আবার রেলিঙে ঝুঁকল।

তুমি ওকে ডাক।—হেই বাবলু। শোভনা রাগে কাঁপতে থাকে।'' ('হিমির সাইকেল শেখা')

ব্যঞ্জনাগভীর অনুপুঙ্খসমৃদ্ধ বর্ণনার দৃষ্টান্ত 'শয়তান' গল্পে ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোভী ধনী চৌধুরী সাহেবের আহারের বিবরণ—''কথা না কয়ে চৌধুরীসাহেব আর একটা পাত্র থেকে একটা আপেলের টুকরো তুলে তাতে কামড় লাগাবেন। বঙ্কু পরিষ্কার দেখতে পেল বাঁধান দাঁতের পাটি থিকথিক করে কাঁপছে। কিন্তু তা হলেও সাহেব ফলের টুকরোটা চমৎকার চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে শেষ করেন। তারপর ওই পাত্র থেকে একসঙ্গে তিনি-চারটি আঙুল তুলে মুখে গুঁজে দেন। এখন আর দাঁতের কাজ তেমন করতে হয় না। যেন আঙুরকটা তালুর সঙ্গে ঠেকিয়ে জিবের ডগা দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে রস বার করেন। আঙুরের রস জিব বেয়ে সরাসরি গলনালীর দিকে ছুটে যাচ্ছিল বুঝি, থুঁতনিটা উঁচু করে ধরে ছোটো একটা ঢেঁকুর তুলে গলার কাছ থেকে ফলের রসটুকু মুখগহ্বরে ফিরিয়ে এনে চোয়াল

দুটো চেপে ধরে মধুর স্বাদটা একটু সময় অনুভব করেন সাহেব। পরে বড়ো করে একটা ঢোক গেলেন। তারপর ভিজে তুলোর পুঁটুলির মতন আঙুরের ছিবড়েটুকু জিবের ডগা দিয়ে ঠেলে ঠোঁটের কাছে সরিয়ে আনেন ও বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ঠোঁট থেকে আলগোছে সেটা তুলে আনেন।''

উদ্ধৃত অংশটিতে কোনো কঠিন অপরিচিত শব্দ নেই, বাক্যবিন্যাসেও নেই জটিলতা। তবু বিত্তবান অথচ অক্ষম ভোগবাসনা অংশটিতে জীবন্ত, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৫.৫ নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭০)

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সদরদি গ্রামে ১৯১৬-র ৩০ জানুয়ারি মহেন্দ্রনাথের পুত্র নরেন্দ্রনাথের জন্ম।

ভাঙ্গা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। এসময় তাঁর বৃত্তি ছিল গৃহশিক্ষকতা। স্নাতক হওয়ার পর দু-একটি অস্থায়ী চাকরি করে তিনি সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। বালকবয়স থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। ১৯৭৫-র ১৬ সেপ্টেম্বর মারা যান নরেন্দ্রনাথ।

১৯৩৬-এ 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর 'মূক' নামে কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। এই বছরেই 'মৃত্যু ও জীবন' নামের গল্পটি 'দেশ'-এ ছাপা হয়। এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প। পরে অবশ্য কবিতার পরিবর্তে গল্প-উপন্যাস রচনায় মন দিয়েছিলেন। চার দশক ধরে প্রায় পাঁচশো গল্প লিখেছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সমকালীন জীবন চরিকালের হয়ে উঠেছে সেই সব গল্পে। উল্লেখযোগ্য গল্প 'রস', 'পালঙ্ক', 'সংসার' প্রভৃতি। গ্রন্থ—(১) 'অসমতল', (২) 'হলদে বাড়ি', (৩) 'উলটোরথ', (৪) 'পতাকা'।

গল্প-বিশেষত্ব : নরেন্দ্রনাথ গল্প লিখতে শুরু করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে। ১৯৪৫-এ মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। মৃত্যুর প্রায় আগে পর্যন্ত গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ। ফলে, যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্‌বাস্তু সমস্যা,—এই সব সমস্যা কেমন করে জীবনকে ভেঙে দিচ্ছে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন নিয়েই লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ। কারণ সেই জীবনকে তিনি দেখেছিলেন, চিনেছিলেন গভীরভাবে। কিছু কিছু গল্পে অবশ্য এসেছে নিম্নশ্রেণির মানুষ। কিন্তু সব ধরনের গল্পেই তাঁর মূল অবলম্বন মনস্তত্ত্ব। মানুষের মনের জটিলতাকে তিনি শল্যবিদের মতো বিশ্লেষণ করেননি। অসীম সহানুভূতি দিয়ে তিনি মানবমনের প্রতিটি স্তর উন্মোচিত করেছেন। তাঁর নিজের কথায়—''ঘৃণা, বিদ্বেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বৈরিতা আমাকে লেখার প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতিপ্রেম সৌর্হাদ্য, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডির ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি।''

তাঁর গল্প ঘটনাপ্রধান নয়, চরিত্রপ্রধান। ঘটনার চমক নেই তাঁর গল্পে। কবিমনের অধিকারী হলেও কোনো গল্পই নয় ভাবপ্রধান। বিচিত্র জীবিকার, আশ্চর্য মনের অসফল-সফল নরনারী নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পজগৎ। এই মানুষগুলি আমাদের চেনা জগতের সাধারণ মানুষ। তাদের আশা, আশাভঙ্গজনিত হতাশা, সাধ ও সাধ্যের দূরত্ব বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে।

নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে আমরা—(ক) মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক গল্প, (খ) শিল্প সম্পর্কিত গল্প, (গ) নারীচরিত্রমূলক গল্প এবং (ঘ) সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের নিয়ে লেখা গল্প—এই চার শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। সর্বত্রই কিন্তু তাঁর গল্পে মনোবিশ্লেষণ এসেছে সহজভাবে।

(ক) মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক গল্প—এই ধরনের গল্পের একটি গল্প 'টিকিট'। গল্পের নায়ক শীতাংশু দরিদ্র কিন্তু সৎ। কিন্তু একদিন অফিস থেকে ফেরার সময় তার সঙ্গে দেখা হয় প্রাক্তন সহপাঠিনীর। মধ্যবিত্তসুলভ মর্যাদা বজায় রাখার ভাবনায় চিড় ধরে তার সততায়। সে দ্বিতীয় শ্রেণির বদলে উঠে বসে ট্রামের প্রথম শ্রেণিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি খরচের যন্ত্রণা তাকে বিদ্ধ করে। এবং সে ভাড়া ফাঁকি দেয়। আর এই পয়সা বাঁচানোর আনন্দে বিড়ির বদলে সে কিনে ফেলে সিগারেট।

কিন্তু সংকট আসে এরপর। মাসের প্রথমদিকে বালক পুত্রের জন্য বিস্কুট-লজেন্স আনতে পারলেও শেষ মাসে ছেলেকে সে ভোলায় ট্রাম-বাসের টিকিট দিয়ে। দুটি টিকিট না দিতে পেরে ছেলের অনুযোগের সামনে চুপ করে থাকে শীতাংশু। অসততার গ্লানি এবার তাকে পীড়িত করে। আসলে এই বেদনা দারিদ্রজনিত সহায়হীন অবস্থার বেদনা। এ বেদনা থেকে মুক্তির পথ জানা নেই বাঙালি মধ্যবিত্তের।

টিকে থাকার চাপ কীভাবে বদলে দেয় চিরাচরিত মূল্যবোধ তারই গল্প 'অবতরণিকা'। নিতান্ত ঘরোয়া মেয়ে আরতিকে চাকরি নিতে প্রাণিত করেছিল তার স্বামী সুব্রত। কারণ তাতে জীবন হবে একটু স্বস্তির। পার্ক স্ট্রিটের মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ফার্মে চাকরি পায় আরতি। এতে তার শ্বশুর প্রিয়গোপালের অহম্ আহত হয়। তাঁর মতে বধূর স্থান গৃহে, কর্মক্ষেত্রে নয়। সে যদি চাকরি করে, তবে তাঁদের বিশেষত স্বামীর অক্ষমতা প্রমাণিত হয়। চাকরি করতে করতে উন্নতিও হয় আরতির। ফলে পরিবর্তন আসে সুব্রত এবং অরিতির মনে। মানবমনের জটিল গতি এরপর ফুটে উঠেছে নরেন্দ্রনাথের সহৃদয় লেখনীতে। সুব্রতর স্বামীত্বের অধিকারবোধ আহত হয় স্ত্রীর আর্থিক স্বনির্ভরতায়। আবার আরতিও যে আত্মস্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত হয়েছে তা এই চাকরির ফলে। দম্পতির মধ্যে দেখা দেয় মনোমালিন্য। দুটি-একটি কথা কাটাকাটি পরিণত হয় তীব্র বিরোধে।

এই সংকটমুহূর্তে চাকরি যায় সুব্রতর। অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন আসতেই আরতি পেতে থাকে আলাদা মূল্য। কারণ তার চাকরি এখন সংসারের একমাত্র আয়। আরতির মন থেকে কিন্তু চিরাগত মূল্যবোধ মুছে যায়নি। তাই সহকর্মী এডিথের অপমানের প্রতিবাদে সে চাকরি ছাড়ে। এই সংকটক্ষণে সে স্বামীর কাছে আশা করেছিল নৈতিক সমর্থন আর সান্ত্বনা। কিন্তু সুব্রতর কাছে এখন এইসব আদর্শ মূল্যহীন। তাই স্ত্রীকে সে বলে—'সত্যি সত্যি যাকে অপমান করেছে সে হয়তো দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অফিসে হাজির হয়ে এতক্ষণে কাজও শুরু করে দিয়েছে। সে তো আর সেন্টিমেন্টাল বাঙালি মেয়ে নয়।' এভাবেই আরতির কাছে এক হয়ে যায় তার অফিস-বস আর স্বামী। উভয়েই তাকে ব্যবহার করে। তার অনুভব, তার যন্ত্রণা—সবকিছুই তাদের কাছে উপহাসের বস্তু। এই অসহায়তা মধ্যবিত্ত জীবনের চারপাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। টিকে থাকার জন্য হারিয়ে যাচ্ছে আদর্শ আর নীতির চিরন্তন বোধগুলি।

সাধারণ নিম্নবিত্ত জীবনের কঠিন বাস্তব উদঘাটিত হয়েছে 'রাণু যদি না হত' গল্পে। চার সন্তানের পিতা কেরানি হেমাঙ্গের বড়ো মেয়ে রানু। অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিল রানু শ্রীপতি দত্তের ডাক্তারখানায়। সেখানে বৃদ্ধা দাই সারদা তাকে বলে তার বাবা-মার ইচ্ছা ছিল না সে জন্মায়। নিজেকে অবাঞ্ছিত সন্তান জেনে দুলে ওঠে রানুর পৃথিবী। যন্ত্রের মতো ওষুধ নিয়ে আসে সে। জীবন তার কাছে হয়ে যায় অর্থহীন।

হঠাৎই তার কাছে ধরা পড়ে এই কামনার যথার্থতা। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা সংসারের দারিদ্রক্ষত চিত্র আর মায়ের অনুতাপ শুনে সে বুঝতে পারে ভালোবাসাহীনতা তাকে অবাঞ্ছিত করেনি, করেছে বিত্তহীনতা। প্রিয় প্রথম সন্তানকে তাঁর অর্থহীনতার যন্ত্রণায় দীর্ণ করতে চাননি জননী। কিন্তু যখন সে এসেই পড়েছে তখন তো স্নেহের অভাব হয়নি। মায়ের শ্রীহীন ক্ষীণ পাণ্ডুর চেহারায়, শুকনো ঠোঁটে তারই জন্য ফুটে আছে বাৎসল্যের স্নিগ্ধ হাসি। মায়ের কাছে সে শোনে তার সংসার গড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। রানুর মন থেকে মুছে যায় সব বেদনা। আনন্দের মৃদু আভায় ভরে যায় তার মন। সে যে মূল্যহীন নয় এ উপলব্ধি তাকে আপ্লুত করে এক সুখে। এভাবেই

মানুষের মনোরহস্য উদঘাটিত হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে।

(খ) **শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কিত গল্প**—গায়ক, বাদক, চিত্রশিল্পী, কবি—এই সব শিল্পীদের নিয়ে নানা ধরনের বেশ কিছু গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ। আমরা আলোচনা করব 'অনধিকারিণী' গল্পটি—সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সুলতা ভালোবাসত গান। বিয়ের পরেও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সে সংগীতসাধনা বজায় রাখে। বড়ো আসরে গাওয়ার সুযোগও সে পায়। তখনই কিন্তু ধরা পড়ে এই রূঢ় সত্য যে উঁচু দরের শিল্পী হওয়ার ক্ষমতা তার নেই। তবু গানের প্রতি তার টান ক্ষুণ্ণ হয় না। সারা রাত ধরে চলা গানের অনুষ্ঠান সে বাইরে দাঁড়িয়েই শুনে যায়। উপভোগের এই শক্তি তার একমাত্র তৃপ্তি।

আবার এরই পাশে আছে 'সেতার'। অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করে তোলার আর সংসার চালানোর আর্থিক প্রয়োজনে নীলিমা শুরু করেছিল গানের টিউশনি। এক ছাত্রীর বাড়িতে সেতার দেখে তার ছেলেবেলার সেতার শেখার ইচ্ছা জেগে ওঠে। তার চেয়ে বড়ো এই চিন্তা যে—সেতার শিখলে টিউশনির এলাকা যাবে বেড়ে। তবু সহজাত ক্ষমতায় নীলিমা হয়ে ওঠে শিল্পী। কিন্তু যেদিন বড়ো আসরে তার ডাক পড়ে, সেদিনই সুস্থ হয়ে ঘরে আসে স্বামী সুবিমল। তার দাবি তার জন্য ঘরেই নীলিমাকে বাজাতে হবে সেতার। শিল্পের আহ্বান, আর স্বামীর দাবি—দুইয়ের দ্বন্দ্বে বিক্ষত নীলিমার অসহায়তা মধ্যবিত্তজীবনে নারীর অবস্থানকে জীবন্ত করে দেয়। শক্তিমান পুরুষের অহম্ এভাবেই নারীকে আয়ত্তে রেখে তৃপ্ত হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রের মতো সংসারসাম্রাজ্যে সম্রাটের আসনটি কোনো মতেই খোয়াতে চায় না সে। মধ্যবিত্ত সমাজে পুরুষের দুই মনোভাব নিয়ে নির্মিত নরেন্দ্রনাথের এই গল্পটি।

(গ) **নারীমনোস্তত্ত্ব তথা নারীসমস্যার গল্প**—তাঁর এই ধরনের গল্পে প্রধান হয়েছে নারীর অধিকার অর্জনের, স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার সমস্যা।

'ছদ্মনাম' গল্পে নমিতা-রাজেশ্বরের প্রেম পূর্ণতা পায়নি। কারণ রাজেশ্বরের ধৈর্যহীন অধিকারবোধ মেনে নিতে পারেনি নমিতা।

'কুমারী শুক্লা' গল্পের শুক্লাও প্রেমিক প্রশান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে এই অধিকার-প্রবণতার জন্যই। তার মনে হয়েছিল প্রশান্ত আপন ইচ্ছানুরূপ করে গড়তে চাইছে তাকে; তার উপরে চাপিয়ে দিতে চাইছে নিজের রুচি। এর বিরুদ্ধেই শুক্লার প্রতিবাদ। সে বলে, 'মেয়েদের......স্বাধীনতা মানে—ওদর রুচি অনুযায়ী চলা।'

'স্বাধিকার' গল্পে এই নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার আর একটি রূপ এঁকেছেন নরেন্দ্রনাথ। মা আশালতা সংস্কারাচ্ছন্ন শ্বশুরবাড়ির বিরোধিতা সত্ত্বেও মেয়ে বীথিকাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সমর্থন করেছেন তার চাকরি করা। কিন্তু বীথিকা মায়ের নির্বাচিত পাত্র অরুণের পরিবর্তে প্রেমিক খ্রিস্টান শিল্পী অসীমকে বিয়ে করতে চায়। তখনই মা ও মেয়ের দ্বন্দ্ব বাধে। মা মনে করেন বীথিকাকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে বহির্জগতে বিচরণের অধিকার দিয়েছেন। অতএব বীথিকা তাঁর কথা শুনতে বাধ্য। বীথিকার ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য তিনি স্বীকার করেন না। শিক্ষিতা, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন বীথিকা এই আদেশ মেনে চলার বিরোধী। নিজের জীবন সে নিজেই গড়ে নিতে চায়। তার মত এই যে, ''......তোমাদের কথামতো বিয়ে করতে পারব না মা।'' স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এই মনোভাব এসেছে সময়ের অনিবার্য গতিতে। নরেন্দ্রনাথ তা সমর্থন করেছেন সর্বতোভাবে।

নারী-মনস্তত্ত্বের বিবিধ জটিলতা স্থান পেয়েছে নরেন্দ্রনাথের গল্পে। 'নাম' গল্পের রসো কুরূপা, মলিন তার সজ্জা, আচরণও পুরুষালি। এই রসোর কাছে একদিন প্রেম নিবেদন করেছিল প্রৌঢ় কবিরাজ। রসো তাকে দৈহিক নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু রসোর নিভৃত নারীসত্তা সাড়া দিয়েছিল পুরুষের এই নিবেদনে। কলেরার প্রতিরোধক ইনজেকশন দিতে এসেছিল স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাদের প্রশ্নের উত্তরে মেয়েরা বলেছিল তাদের পোশাকি নাম। রসো জানিয়েছিল তার নাম 'রসমঞ্জুরী', 'পোড়ারমুখো কবরেজ' ওই নামেই তাকে ডেকেছিল যে। এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের দ্বারা রসোর মনটিকে স্বচ্ছ করে তুলেছেন নরেন্দ্রনাথ।

বিধবা মেয়ের পুনর্বিবাহ এবং তৎসংক্রান্ত মানসিক সমস্যা নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ। সেরকমই একটি গল্প 'শাল'। বিজয়ের মৃত্যুর পর বীথিকা বিয়ে করেছিল অনিমেষকে। উভয়ের সম্পর্কে বিজয়ের কোনো ছায়া পড়েনি। শীতের এক রাতে কাজে যাওয়ার সময় আর কিছু না পেয়ে বীথিকা বিজয়ের শাল বের করে জড়িয়ে দেয় অনিমেষের গায়ে। অনিমেষের সিগারেটের আগুনে ফুটো হয় সেই শাল। হয়তো বিজয়ের প্রতি গোপন ঈর্ষা রয়েছে এর মধ্যে। এই শালকে কেন্দ্র করে দম্পতির জটিল মানসিক দ্বন্দ্ব যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনিমেষ বলে ফুটো আগেই ছিল শালটিতে। বীথিকা জানায় বিজয় সিগারেট খেত না। তার উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে যায় তার মনের গহনে লুকোনো বিজয়ের প্রতি টানটুকু। বিজয়কে যে বীথিকা ভোলেনি তারই প্রমাণ এই তথ্য। যার সঙ্গে জীবনের একটি অধ্যায় কেটেছে। তাকে যে পুরোপুরি মন থেকে মুছে ফেলা যায় না—এই কথাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে এ ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়া যায় না। নতুন নতুন প্রথার প্রচলন যে মনোগহনে নিত্য নতুন জটিলতার জট পাকিয়ে তোলে—এই সত্যই গল্পটিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

(ঘ) **নিম্নবর্গীয় তথা গ্রামীণ জীবনের গল্প :** নরেন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধ কেটেছিল গ্রামে। তাই গ্রামের মানুষ, গ্রাম্যসমাজ তাঁর অভিজ্ঞতার গণ্ডিতে ছিলই। সেই স্মৃতি নিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন 'রস' গল্পটি। গল্পের নায়ক মোতালেফের বৃত্তি খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা। কিন্তু রস থেকে গুড় বানানোর জন্য চাই কোনো নারীর শ্রম। এজন্যই মোতালেফ বিয়ে করে রাজেক মৃধার স্ত্রী শ্রমপটু নারী মাজু খাতুনকে। উদ্দেশ্য মাজুর বানানো গুড় বিক্রি করে লাস্যময়ী রূপসী ফুলবানুকে বিয়ে করার দেনমোহর সংগ্রহ। প্রয়োজন মেটার পরই নির্মমভাবে মাজুকে তালাক দিয়ে ফুলবানুকে ঘরে আনে সে। মাজু তার পুনর্বিবাহ প্রস্তাবের উত্তরে তীব্র বিতৃষ্ণায় জানায় বিয়েতে তার আপত্তি নেই, তবে পাত্র যেন 'গাছি' (খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহকারী) না হয়। মোতালেফের চরিত্রকে এখানে মমতাহীন স্বার্থসর্বস্ব বলেই মনে হয়। ফুলবানু-মোতালেফের প্রেমের জোয়ারে ভাটা পড়ে শীঘ্রই। কারণ গুড় তৈরির মরশুমে প্রমাণিত হয় বিলাসিনী ফুলবানুর অকর্মণ্যতা। তার তৈরি গুড় হয় বিস্বাদ। মোতালেফ বিরক্ত হয়। যত না আর্থিক লোকসানের জন্য তার চেয়ে বেশি তার শিল্পশ্রমের ব্যর্থতায়। খেজুর গাছের শীর্ষদেশের নরম অংশ সন্তর্পণে চেঁছে রস সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই গাছ মরে যায়। একটানা রস সংগ্রহ করা যায় না। মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হয়। তেমনই রস জ্বাল দেওয়ার নানা নিয়ম আছে। কাজটির প্রতি প্রীতির টান না থাকলে কখনই শ্রম সার্থক হয় না। গাছ থেকে রস সংগ্রহের ওস্তাদ মোতালেফ। এখানেই সে শিল্পী। তার সে শ্রম সফল হয় না বলেই হতাশা গ্রাস করে তাকে। শেষ পর্যন্ত সে কিছুটা রস নিয়ে যায় মাজু খাতুনের স্বামীর বাড়ি। আতিথেয়তায় ত্রুটি হয় না। আর তার আহরিত রস থেকে গুড় ভালো না হওয়ার বৃত্তান্ত আর ওই রস থেকে গুড় করার প্রস্তাবে ছলছল করে ওঠে মাজু খাতুনের চোখ। সেও তো গুড় তৈরির দক্ষ শিল্পী। শিল্পীর বেদনা স্পর্শ করে শিল্পীকে। এভাবেই 'রস' গল্পের মোতালেফ নিছক পাষণ্ডের পরিবর্তে হয়ে ওঠে ট্র্যাজিক নায়ক।

'পালঙ্ক' গল্পে দেশভাগের পটভূমিতে দরিদ্র মুসলমান মকবুল আর রাজমোহনের অবস্থা চিত্রণের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতির জয় ঘোষিত হয়েছে। দেশভাগের পর সব স্বজন ভারতে চলে গেলেও 'ধলাকর্তা' রাজমোহন আঁকড়ে আছেন পৈতৃক ভিটে। হঠাৎ পুত্রবধূ চিঠি দিয়ে জানায় তার বাপের বাড়ির সম্পত্তি সুন্দর পালঙ্ক বিক্রি করে টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। রাজমোহন ক্রোধে অপমানে উন্মত্ত হয়ে বিক্রয় করে দেন পালঙ্ক। দরিদ্র মুসলমান মকবুল শেখ সর্বস্ব দিয়ে ক্রয় করে পালঙ্কটি। পরিণামে তার দৈন্য হয়ে ওঠে চরম। এদিকে অপমানের প্রথম জ্বালা কেটে যেতেই শূন্য হয়ে যায় রাজমোহনের মন। তিনি পালঙ্কটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। মকবুল দারিদ্র্যের এবং রাজমোহনের আঘাত সহ্য করেও রক্ষা করে পালঙ্ক। ভগ্নমন রাজমোহনকে গ্রাস করে ব্যাথি। তখনই তিনি খবর পান ধনী আতাবুদ্দি কিনে নিচ্ছে পালঙ্ক। রুগ্ণ দেহে বৃষ্টির রাতে তিনি ছুটে আসেন মকবুলের বাড়ি। তাঁর দৃষ্টি পড়ে দুর্মূল্য পালঙ্কে শুয়ে আছে দুটি নিরন্ন শিশু। এবার মকবুল ফিরিয়ে দিতে চায় পালঙ্ক। কারণ পরে যদি

সে পালঙ্ক রক্ষা করতে না পারে। রাজমোহন অসম্মত হন কারণ—''আমার পালং খালি না। আইজ আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর......দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে।''

শিল্পপ্রীতির সূত্রে দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি এভাবেই মানবিকতার উদার প্রকাশে শেষ হয়েছে। আবার মকবুলকে কেন্দ্র করে দীনতার ব্যাপ্ত চিত্রও এসেছে। বিশেষভাবে মনে করা যায় মকবুলের একটি উক্তি 'গরীবের হিন্দুস্থান নাই, পাকিস্তান নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে।'

'পালঙ্ক'টিকে কেন্দ্র করে ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে মানুষের সৌন্দর্যপ্রীতির দিকটিই উদ্ভাসিত হয়েছে নরেন্দ্রনাথের সহমর্মী লেখনীতে।

যৌনকর্মীদের নিয়েও দু-তিনটি গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ। গল্পগুলিতে মেয়েদের গৃহজীবন-তৃষ্ণাই রূপ পেয়েছে। 'বিদ্যুৎলতা' গল্পের নায়িকা বিদ্যুৎলতা রূপজীবনী। শহরের ভিতর থেকে পতিতাপল্লি উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের কোনো সুব্যবস্থা হয় না। অন্য যৌনকর্মীরা বিচলিত হলেও এটা মেনে নেয়। একমাত্র বিদ্যুৎলতাই সংগ্রাম করে এর বিরুদ্ধে। কারণ ব্যাপারটি তাদের জীবিকা এবং অধিকারে আঘাত করছে—এটা সে বুঝেছিল। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সে দারোগার কাছে আবেদন করে, উকিলের কাছে যায়। অবশ্য তার অবস্থা ছিল ভালো। অনায়াসে সে নিজেকে অন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। তার বদলে সে সবার জন্য লড়াই করে। শেষে মিউনিসিপ্যালিটি-কমিশনার পূর্ণ চৌধুরীর কাছে যায় বিদ্যুৎ। তাদের সমস্যার মানবিক দিকটি বোঝেন পূর্ণবাবু। জয় হয় বিদ্যুৎদের।

কিন্তু এই সূত্রে গৃহজীবনের সংস্পর্শ তার অবচেতনের গৃহ-কামনাকে জাগিয়ে দেয়। উকিল ভুবনবাবুর বাড়ির কমবয়সী বউটির মাধুর্য, পূর্ণ চৌধুরীর 'মা' ডাক সেই কামনাকে প্রবল করে। কিন্তু তার বাসনা পূর্ণ হওয়ার কোনো পথ নেই। বিদ্যুৎ নিজেদের উচ্ছেদ রোধ করেছে, রোধ করতে পারেনি তাদের অনিবার্য নিয়তি। পুরুষের ভোগবাসনা তৃপ্ত করাই তাদের একমাত্র কাজ। তাদের নিজস্ব বাসনা বা ইচ্ছার কোনো দাম এই সমাজে নেই। বিদ্যুৎলতার মানসিকতা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই শ্রেণির মেয়েদের নিরুপায়তা ফুটিয়ে তুলেছেন নরেন্দ্রনাথ।

গঠনশৈলী ও ভাষা : সাধারণ মানুষের জীবন আর মনকে নানাভাবে দেখেছেন নরেন্দ্রনাথ। সেই দর্শন থেকেই নির্মিত হয়েছে তাঁর গল্প-রচনারীতি। তিনি যখন গল্প লিখছেন তখন বাংলাসাহিত্যে হয়ে গিয়েছিল নতুন রীতির গল্প রচনার আন্দোলন। গল্পের গঠনে এসেছিল নানা বৈচিত্র্য। ঘটনাহীন গল্প রচনার প্রয়াসও দেখা দিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ এই নতুন রীতি বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি পুরোনো ধরনেই গল্প রচনা করেছেন। আমাদের পরিচিত মানুষগুলিই নানারূপে এসেছে তাঁর সাহিত্যে। উত্তেজনাহীন তাঁর লেখার ধরন।

তাঁর ভাষা সাধারণ, নিরলংকার, প্রতিদিনের ব্যবহারে ভাষা। নেই দীপ্তোজ্জ্বল শব্দের কারুকাজ সংলাপে ব্যবহৃত স্বাভাবিক শব্দই তাঁর ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। তবে জীবনের স্বপ্নমদির মুহূর্তগুলির রূপায়ণকালে তাঁর ভাষা হয়ে ওঠে ঈষৎ কাব্যময়।

মনোবিশ্লেষণের সময়ও তাঁর ভাষায় আসে না কোনোরকম তীব্রতা। ছোটো ছোটো মুহূর্তের বিশ্লেষণ করেছেন নরেন্দ্রনাথ স্থির সমাহিত ভঙ্গিতে। সজ্জিত শব্দসমাহার নেই তাঁর ভাষায়। সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মুখের ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তাঁর ভাষা। দীপ্তি না থাকলেও নিজস্বতার স্বাদ এই ভাষায় সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন নরেন্দ্রনাথ।

অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি যে, কোনো নতুন রীতির অনুসারী না হলেও মানুষের প্রতি প্রীতি নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে এনে দিয়েছে অন্য একমাত্রা। বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে নরেন্দ্রনাথ তাই অবিস্মরণীয় একটি নাম।

৫.৬ নবেন্দু ঘোষ (১৯১৬-   )

নবদ্বীপ ঘোষের পুত্র নবেন্দুর (পুরো নাম নবেন্দুভূষণ) জন্ম ১৯১৬ ঢাকা শহরে। পৈতৃক নিবাস অখণ্ড বাংলার ফলাতিয়া গ্রাম।

সংস্কৃত ও ইতিহাসে এম. এ. বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞ দক্ষ কীর্তনগায়ক নবদ্বীপ বি. এল. পাসও করেছিলেন। ১৯১২-তে তিনি ওকালতিকে জীবিকা করে পাটনা (বর্তমান পটনা) শহরে বাস শুরু করেন। তবে প্রতি বছর পুজোর সময় তিনি সপরিবারে ফলাতিয়া যেতেন। নবেন্দুর কৈশোর ও শিক্ষাজীবন কাটে পাটনা শহরে।

শিক্ষা : ১৯২৮-এ পাটনা শহরের রামমোহন রায় সেমিনারি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন নবেন্দু। বিধিবদ্ধ শিক্ষায় কৃতী নবেন্দু ছিলেন স্কুলের সেকেন্ড বয় এবং বাংলায় তিনি হতেন প্রথম।

ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৩৭-এ বি. এ. পাস করে নবেন্দু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এম. এ. ক্লাসে ভরতি হন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪০-এ এম. এ. পাশ করার পর বিহার সেক্রেটারিয়েট-এর এ. আই. জি. পুলিশ দপ্তরে চাকরি পান। কিন্তু বিয়াল্লিশের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের সমকালে রাজদ্রোহাত্মক উপন্যাস লেখার প্রেক্ষিতে ১৯৪৩-এ তিনি পদত্যাগ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৪-এ কলকাতায় নবেন্দু পান চিত্রনাট্যকারের কাজ। নবেন্দু ছিলেন নিপুণ অভিনেতা এবং নৃত্যশিল্পী। তাই এ কাজ তাঁর খারাপ লাগেনি। দেশভাগের পর কলকাতায় চলচ্চিত্র জগতে মন্দা দেখা দেয়। বাংলার চলচ্চিত্র জগতের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এই সংকট এড়াতে চলে যান বোম্বাই (বর্তমান মুম্বই)। নবেন্দুও ‘বম্বে টকিজ’-এর চিত্রনাট্যকার হিসেবে ১৯৫০-এ চলে যান বোম্বাই। দীর্ঘকাল তিনি একাজ করেছেন। প্রায় সত্তর-আশিটি ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ। ১৯৬৭ সালে পুনে ফিল্ম রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ তিনি শিক্ষার্থীদের চিত্রনাট্য বিষয়ে পাঠ দিতেন। পরে তিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে ‘তৃষাগ্নি’ নামে একটি হিন্দি ছবি পরিচালনা করেন। ছবিটি জাতীয় পুরস্কার ‘স্বর্ণকমল’ পায়। তাঁর আর একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ‘নেত্রহীন সাক্ষী’ অসমের সাহিত্যিক অরূপকুমার দত্তের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত। শেষ জীবনে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

সাহিত্যজীবন : নবেন্দুর বাড়িতে একটি সাংস্কৃতিক আবহ ছিল। অভিনয় আর সাহিত্য সম্বন্ধে পিতারও আগ্রহ ছিল। ছোটো থেকেও নবেন্দুরও এই দুই বিষয়ে ছিল আকর্ষণ। ছোটোদের ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’, ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ ভিন্ন ‘অলিভার টুইস্ট’, ‘লে মিজারেবলস্’, ‘থ্রি মাস্কেটিয়ার্স’—প্রভৃতি গ্রন্থের কিশোর সংস্করণ পড়ে নিয়েছিলেন নবেন্দু। এগারো বছর বয়সে বঙ্কিম গ্রন্থাবলি পড়ে তিনি ‘নবাবনন্দিনী’ নামে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। তাঁর পিতা সেটি পড়ে পুত্রকে তিরস্কার করেন না, বরং বলেন লেখাটি বঙ্কিমের অক্ষম অনুকরণ। যথার্থ সাহিত্য হবে মৌলিক; নতুবা লেখক হবেন উপহাসের পাত্র। পিতার উপদেশ মেনেছিলেন নবেন্দু। নষ্ট করেছিলেন ‘নবাবনন্দিনীর’র পাণ্ডুলিপি। রামমোহন সেমিনারি স্কুলে পড়ার সময় নবেন্দু সহপাঠীদের নিয়ে ‘ঝরণা’ নামে একটি ত্রৈমাসিক হাতে লেখা সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেন। পরে পত্রিকাটি ওই স্কুলের দশম শ্রেণির হাতে লেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘প্রভাতী’-র সদস্য হন। নবেন্দুর বহু লেখা ‘প্রভাতী’-তে বের হয়। এরমধ্যে গোপনে নিষিদ্ধ ‘পথের দাবী’ পাঠ তাঁর অন্তরে জ্বালিয়ে দেয় দেশপ্রেমের আগুন।

১৯৩৪ থেকে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে ‘প্রভাতী’-র বার্ষিক সংখ্যা মুদ্রিত হতে থাকে। ওই সম্মেলনে ‘প্রভাতী সংঘ’-এর সদস্যরা যোগ দিতেন এবং বার্ষিক সংখ্যাটি বিতরণ ও বিক্রি করতেন। এভাবে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নবেন্দু। পরিণত হয় তাঁর সাহিত্যবোধ। প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিকদের যথা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বনফুল (ভাগলপুর), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (মুঙ্গের), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (দ্বারভাঙ্গা)—এঁদের স্নেহ-শুভেচ্ছা লাভ করেন তিনি।

মানুষের দুঃখ-বেদনা তাঁকে কৈশোর থেকেই কষ্ট দিত। শ্রেণিভেদ, জাতিভেদ, অসাম্য আর শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল তাঁর মনে। তারই সঙ্গে ছিল সংসার ও জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তা। এই চিন্তা 'প্রভাতী'- তে প্রকাশিত তাঁর 'ময়নাগঞ্জের হাট' রচনার উৎস। কলেজে পড়ার সময় নবেন্দুর লেখা 'একটি বর্ষার সন্ধ্যা ১৯৩৬-এ 'শনিবারের চিঠিতে' মুদ্রিত হয়। পরে 'মানভূম সংবাদ, 'রাজপথ' (দিল্লি), 'শ্রীহর্ষ' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পত্রিকা), 'পরিচয়' প্রভৃতিতে মুদ্রিত হয়। ১৯৩৯-এ তিনি হন 'বেহার হেরাল্ড'-এর অবৈতনিক সহ-সম্পাদক। এখান থেকে 'প্রভাতী' মুদ্রিত করার অনুমতি পাওয়া যায়। এই 'প্রভাতী' হয় মাসিক পত্র। সেখানে বের হয় নবেন্দুর ধারাবাহিক উপন্যাস 'নায়ক ও লেখক'। ১৯৪০-এ সেটি গ্রন্থরূপ পায় এবং অন্নদাশঙ্করের প্রশংসা লাভ করে। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রভাবে নবেন্দু 'প্রভাতী'-তে লিখতে শুরু করেন 'ভগ্নস্তূপ' উপন্যাস। ধারাবাহিক উপন্যাসটি সমাপ্তির পর মনোজ বসুর প্রকাশন সংস্থা বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে 'ডাক দিয়ে যাই' নামে মুদ্রিত হয় এবং সাহিত্যিকরূপে নবেন্দু প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত 'ফিয়ার্স লেন'ও অনুরূপ খ্যাতি পায়। জীবিকার জন্য চিত্রনাট্যকারের কাজ করলেও নবেন্দুর সাহিত্যিক মন ছিল সজীব। তিনি মনে করতেন "......সাহিত্যবোধ না থাকলে সিনেমাবোধ অসম্পূর্ণ। সাহিত্যই সিনেমার আদিপর্ব।" (পৃ. ২৫, 'আমার সাহিত্যজীবন', 'শ্রেষ্ঠগল্প', দে-জ পাবলিশিং, ১৯৯৭)।

তাই প্রচুর চিত্রনাট্য লেখার মধ্যেই দশটি গল্পসংকলন এবং উনিশটি উপন্যাস লিখে ফেলেছিলেন তিনি।

গল্পসংকলন তালিকা : (১) 'এই সীমান্তে'; (২) 'মানুষ'; (৩) 'পোস্ট মর্টেম'; (৪) 'ইস্পাত'; (৫) 'কান্না'; প্রকাশকাল ১৯৪৬-১৯৪৯। (৬) 'পঞ্চম রাগ'; (৭) 'পাপুই দ্বীপের কাহিনী'; (৮) 'সুখ নামে শুকপাখি'; (৯) 'সিঁড়ি'; (১০) 'রাতের গাড়ি'।

গল্প-বৈশিষ্ট্য : চল্লিশের দশকের ছোটোগল্পকার নবেন্দু ঘোষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, দেশভাগ—সবই ছিল তাঁর সংবেদী সাহিত্য-মানসের অভিজ্ঞতার উৎস। মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণায় বিচলিত হত সেই মন। তদুপরি যুদ্ধকালে তিনি 'প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'গণনাট্য সংঘ'-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচনাকর্মে এসবের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তিনি নিপীড়িত দরিদ্র মানুষদের জীবনচিত্র রচনা করেছেন, লিখেছেন দাঙ্গা, দেশভাগ, মন্বন্তরভিত্তিক গল্প। জীবনমৃত্যুর বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনোল্লাসও মূর্ত হয়েছে তাঁর লেখনীতে। কখনও বা বিপন্ন মানবতার সপক্ষে সক্রিয় হয়েছে তাঁর লেখনী। সাধারণ মানুষের দুঃখসুখ, প্রেম-বিরহভিত্তিক গল্প যেমন তিনি লিখেছেন তেমনই লিখেছেন রূপক গল্প। তবে সব গল্পেই তাঁর মানবপ্রীতি তথা জীবনমুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে নানা আকারে।

তাঁর ভাষা সরল অথচ বলিষ্ঠ। প্রচলিত রীতির অনুসরণে সাধুভাষায় শুরু হয়েছিল তাঁর সাহিত্যসাধনা। পরে তাঁর রচনামাধ্যম হয়ে ওঠে চলিতভাষা। শুধু বাংলার গ্রাম বা শহর নয় মহারাষ্ট্রের পল্লি ও নগর তাঁর রচনায় এসেছে সহজভাবে। গল্পের প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন স্থানীয় ভাষা। বাংলা গল্পের ভূগোলকে তিনি দিয়েছেন বিস্তৃতি। হীনবিত্ত শ্রমিক থেকে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত—সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়েই গল্প লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ। মহৎ কোনো আদর্শের রূপায়ণের অভীপ্সা তাঁর অনেক গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইসব কারণের জন্যই বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে নবেন্দু ঘোষ স্মরণযোগ্য একটি নাম।

গল্প আলোচনা : নবেন্দুর গল্পগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। (১) নরনারীর আকর্ষণভিত্তিক বিয়োগান্ত এবং মিলনান্ত গল্প। (২) মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগজনিত গল্প। (৩) নিপীড়িত মানুষের গল্প। (৪) বিপন্ন মানবতা সম্পর্কিত রূপক কাহিনি। প্রসঙ্গত বলা দরকার তাঁর সব গল্পই কাহিনিমূলক। আখ্যানহীন অনুভবতবেদ্য গল্প কমই লিখেছেন নবেন্দু। তবে তাঁর গল্পের উপস্থাপনভঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসেছে নূতনত্ব।

(১) নরনারীর আকর্ষণ সংক্রান্ত গল্প : এই ধরনের একটি গল্প 'মাঝি'। বিয়োগান্ত এই গল্পটিতে বহুগামিনী নারী এবং তার আকর্ষণে অনুরাগী পুরুষের মৃত্যুবরণের কাহিনি নিরাসক্ত দর্শকের দৃষ্টিতে রচনা করেছেন নবেন্দু। দুরন্ত

পদ্মা নদীতে খেয়া পারাপার করা ভৈরবের জীবিকা। নিঃসন্তান সুন্দরী স্ত্রী সদু অর্থাৎ সৌদামিনীকে সে ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে। কিন্তু জীবিকার জন্যই মাঝি ভৈরবকে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয়। একাকীত্ব থেকে মুক্তির জন্যই হয়ত সৌদামিনী আকৃষ্ট হয় অন্য পুরুষের প্রতি। ভৈরব মাঝে মাঝে সন্দেহ করে সদুকে। কিন্তু সরল মাঝির মন সহজেই ভুলিয়ে দিতে পারে সদু। তার সন্দেহ অঙ্কুরেই লুপ্ত হয়।

একদিন ভৈরব স্ত্রীকে জানায় আজ সে যাত্রী নিয়ে দূরে যাবে; রাতে ফিরবে না। তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে কেঁপে যায় সদুর স্বর। কিন্তু ঘটনার পাকে পড়ে ভৈরব ঠিক করে তাকে ফিরতে হবে। সদুর জন্য তার মনে কেমন একটা অস্বস্তিভরা আকুলতা জেগে ওঠে। প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নদী পাড়ি দিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে ভৈরব। আর চমকে দেখে ঘরের মধ্যে জ্বলছে আলো। বেড়ার ছিদ্রে চোখ রাখতেই তার চোখে পড়ে গাঁয়ের নামকরা চরিত্রহীন সাধুচরণের সঙ্গে সদু মিলিত হয়েছে। তাদের হাসি-কথায় ভরে গেছে ঘর। ক্রুদ্ধ ভৈরবের সাড়া পেতেই সাধুচরণ পালায়। তার লাথিতে দরজা কেঁপে উঠতেই সদু খুলে দেয় দরজা। ভৈরবের রোষ সদুকে শঙ্কিত করে। তবু সে অস্বীকার করে সাধুচরণের আসার কথা। স্বামীর গালি ও প্রহার সত্ত্বেও সে কিছু বলে না। শেষে ভৈরবের কণ্ঠপীড়নে চেতনাহারা সদু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ভৈরব ভাবে সদু মরেছে। স্ত্রীকে সে ভালোবেসেছিল একান্তভাবে তাই সদুর দেহে অসীম বেদনায় 'সে হাত বুলাইল'। আর তার পরপুরুষ স্পর্শে কলঙ্কিত বক্ষে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে মৃত্যুকামনায় ঝড়বৃষ্টিতে উত্তাল পদ্মার বুকে নৌকা ভাসিয়ে দেয় ভৈরব। গল্পশেষে দেখি সদু জীবিত আর তাকে ভালোবাসার দাম প্রাণ দিয়ে মিটিয়ে দিয়েছে ভৈরব।

'ঈশানপুরের মশান'-এ মৃত্যুময় শ্মশানের প্রেক্ষিতে শ্মশানচর নীলকান্ত আর শ্মশানডোমের কন্যা মতির ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের রূপ ফুটে উঠেছে। নীলকান্ত শ্রীনাথের কর্মচারী। সে শ্মশানযাত্রীদের কাঠ বিক্রয় করে আর মৃতদের নামধাম, মৃত্যুর কারণ লিপিবদ্ধ করে। আগে সে বিনা বেতনে আহার-আশ্রয়ের বিনিময়ে কাজ করত। আজকাল সে রান্না করে খায় আর আট দশ টাকা মাইনে পায়। শ্রীনাথের দোকানে বৃদ্ধদের দাবার আসর বসে। মৃত্যুর মধ্যে জেগে উঠতে চায় জীবনের উল্লাস। কিন্তু শবের আগমনে থেমে যায় সব কোলাহল। ভেঙে যায় তাদের আসর। অকস্মাৎ মারা যায় শ্রীনাথ। এই মৃত্যুর আঘাতে নীলকান্ত যেন আরও তীব্রভাবে জড়িয়ে ধরতে চায় জীবনকে। শ্মশানডোম ভোলার মেয়ে মতিকে সে ভালোবাসত। আজ সেই ভালোবাসা প্রকাশ পায়। মতিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় সে। এবার ঠিক করে থানার দারোগার কাছে চেয়ে নেবে সে শ্রীনাথের কাজ। আর চাষ করবে। তাই মৃত্যুকে সামনে রেখে সে মদের পাত্রে চুমুক দেয়; জীবন অনিশ্চিত ঠিকই। কিন্তু মৃত্যু যতদিন না আসে ততদিন সে জীবন ভোগ করবে "......সংসার গড়িবে শ্মশানের মধ্যে, তাহার সন্তানদের মধ্যে নিজের ক্ষয়িষ্ণু যৌবন ও জীবনকে নবীনবেশে মূর্ত করিয়া যাইবে।"

'সুখের ঠিকানা'-র রচনারীতি নতুন ধরনের। গল্পটির শুরু সাধারণ বিবৃতির রীতিতে। পরে আরতি আর আদিত্যর স্মৃতিচারণ রূপেও কাহিনি এগিয়েছে। এবং চারটি শিরোনামাঙ্কিত অধ্যায়ের শেষ হয়েছে গল্প। 'হ্যাপিনেস' নামের দোতলা বাড়ির মালিক আরতি। মৃতা মাসির দৌলতে তার কোনো জাগতিক অভাব নেই। কিন্তু তার মনে নেই সুখ। একদা সে ভালোবেসেছিল তাদের ভাড়াটে বিবাহিত আদিত্য রায়কে। সে প্রেম মিলনে সার্থক হয়নি। কারণ জানাজানি হতেই আদিত্য স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায় বাড়ি ছেড়ে। মাসি মারা যায়, উইল করে আরতিকে সে দিয়ে যায় সব সম্পত্তি। আরতি জীবনকে বেঁধে ফেলে একটা রুটিনে। সেই রুটিনের একটি অঙ্গ প্রতি বিকালে রেস্তোরাঁয় চা-পান। এখানেই একদিন আদিত্য রায়ের সঙ্গে দেখা হয় আরতির। আদিত্য জানায় তাদের গোপন প্রেম ধরা পড়েছিল স্ত্রী সীমার চোখে তাই সে আদিত্যকে ডিভোর্স করে আবার বিবাহ করেছে। আদিত্যও আরতির মতোই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছে। এবার আরতি সংকোচ করে না। আদিত্যকে সে আহ্বান করে নিজের বাড়িতে। এখন এই বিড়ম্বিত মানুষ দুটি পৌঁছে যাবে সুখের ঠিকানায় এই শান্ত আশ্বাসে শেষ হয়েছে গল্পটি।

আবার ‘প্রমীলার প্রেমিক’-এর মতো ভয়ংকর গল্প লিখেছেন নবেন্দু। গল্পটি মনে করায় ইংরেজি কবিতা ‘পরফিরিয়াজ লাভার’-এর কথা। সেয় কবিতা মিলন শেষে প্রেমিক পরফিরিয়াকে হত্যা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই প্রেমকে অক্ষয় করে রাখা।

‘প্রমীলার প্রেমিক’ আত্মকথন রীতিতে রচিত। গল্পকথক সোমনাথ দত্ত উন্মাদের মতো ভালোবেসেছিল প্রমীলা গুপ্তকে। কিন্তু প্রমীলা সোমনাথকে ভালোবাসতে পারেনি। সে ভালোবেসেছিল দেবতোষকে। সোমনাথ অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রমীলা যখন দিল্লি থেকে ফোনে তার আর দেবতোষের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করে সোমনাথকে, তখন তার মনে জেগে ওঠে আদিম হিংস্রতা। কৌশলে সে প্রমীলার বাড়ি যায় আর তার অলংকারাদি খুলে হাত-পা মুখ বেঁধে রান্নাঘরের চেয়ারে বসিয়ে গ্যাস খুলে দরজা বন্ধ করে পালায়। তার হাতে ছিল দস্তানা। পিটার বিশ্বাস নামে সে দিল্লি গিয়েছিল। আর বাড়িতে সে জানিয়েছিল নিজের গাড়িতে সে চলেছে কৃষ্ণনগর। পথে চেনা গ্যারেজে গাড়ি সার্ভিসিং করাতে দিয়ে প্লেনে গিয়েছিল দিল্লি। আর স্ত্রীকে ফিরে এসে জানিয়েছিল গাড়ি খারাপ হওয়ায় তার কৃষ্ণনগর যাওয়া হয়নি। ফলে পুলিশ তাকে কোনো দিক দিয়েই সন্দেহ করতে পারেনি।

প্রেমকেন্দ্রিক এই কাহিনিগুলিতে মনের বিচিত্র জটিল গতিই বিশ্লেষণ করা হয়েছে অসাধারণ সাবলীলতার সঙ্গে।

কয়েকটি গল্পে মন্বন্তর, দাঙ্গা আর দেশভাগজনিত বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে কথাবৃত্ত। ‘কল্কি’-র বিষয় মন্বন্তর। একই সঙ্গে বর্ণনা আর পাঠক-সম্বোধনাত্মক পুরোনো বাংলা কথাসাহিত্যরীতির সাহায্যে নিরন্ন নারীপুরুষের মৃত্যু, যন্ত্রণা আর সমৃদ্ধ সমাজমানুষের সুখী প্রমোদমূলক জীবনের রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্পটি। বস্তুত পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলায় দেখা গিয়েছিল এই চিত্র। একদিনে গ্রামগঞ্জের অন্নহীন মানুষ দলে দলে কলকাতায় এসে মারা পড়ছিল। অন্যদিকে বিত্তবান মানুষগুলির দিন কাটছিল আনন্দে। বরং এই আর্ত মানুষগুলি সহায়তার জন্য তারা আয়োজন করেছিল প্রমোদানুষ্ঠানের। কোনো কোনো ধনী অন্নহীনকে অন্ন দেওয়ার পুণ্য অর্জন করছিলেন তাদের কিছু অংশকে খাবার দিয়ে। কিন্তু তা ছিল অপ্রচুর। সহৃদয় সাধারণ মানুষের দেওয়া অপ্রচুর খাদ্যের ভাগ সন্তান দিতে চায়নি মাকে। যুবতী কন্যাকে মা-বাপ সামান্য অন্নের জন্য ঠেলে দিচ্ছিল পাপের পথে। অন্নাভাবের নির্মম চিত্র নবেন্দু ঘোষের কলমে হয়ে উঠেছে বাস্তব।—‘‘তাহারা শুইয়াছিল সারি সারি, অসংখ্য—নগ্নগাত্র অর্ধোলঙ্গ নর ও নারী, শিশু ও বৃদ্ধ—রক্তহীন শুষ্কচর্মে আবৃত, জীবন্ত কঙ্কালের সারি। তাহারা শুইয়াছিল। নিদ্রার জন্য নয়, দুর্বলতার জন্য। ক্ষুধা।’’ এরইপাশে উচ্চবিত্ত সমাজের নির্লিপ্তির চিত্র [‘‘পাঠক! আজ রবিবার, আজ একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছ তো? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমাদের প্রতিপত্তি আছে, তোমার সেই ডেপুটি বন্ধুটিকে চাল আর তেলের ব্যবস্থাটা করে দেবার জন্য কাল একবার বলো। আর যদি প্রমথ দারোগার সঙ্গেও দেখা করতে পার তো ভাল হয়। সত্যি, ঈশ্বর আছেন বলেই আমরা খেয়ে বেঁচে আছি। তা না হলে কি হত?.......’]

শুধু দাঙ্গা নিয়ে লেখা গল্প ‘ত্রাণকর্তা’। আর মজুরদের লড়াই আর দাঙ্গা মিশে গেছে ‘উলুখড়’ গল্পে।

‘ত্রাণকর্তা’-তে উচ্চবিত্ত বর্ণহিন্দু ধনী মানুষেরা মুসলমান গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরণ নিয়েছে অস্পৃশ্য অশুচি ডোম জোয়ানদের। তাদের সর্দার ঝগরুকে ব্যারিস্টার মি. বোস ডেকে পাঠায়। তার হাত ধরে বসানো হয় চেয়ারে; দেওয়া হয় মদ্যপানের টাকা। শর্ত একটাই মুসলমান আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে তাদের কারণ ঝগরুও হিন্দু, মি. বোসও হিন্দু। ‘‘হিন্দুকে হিন্দু না বাঁচালে কে বাঁচাবে বল?’’ এইভাবে বাক্যে-অর্থে ডোমদের আয়ত্তে এনে তাদের লাগানো হয় মুসলমান আক্রমণ রোধ করার কাজে। সে কাজ তারা সুষ্ঠুভাবেই করে। ঝগরুর দল আক্রমণকারীদের পরাস্ত করে। মারা যায় ঝগরু আর অন্য কয়েক জন ডোম যুবক। ধনী মি. বসু সপরিবারে মিলিটারি এসকর্ট নিয়ে পলায়ন করেন। গল্পশেষের বর্ণনার নিষ্করুণ বাস্তবের নগ্নরূপ উদ্ঘাটন করেছেন লেখক। ‘‘তখন ডোমপাড়ায় মহাভারতের নারীপর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বহু নারী হারিয়েছে তাদের বাপ, ভাই, স্বামী ও পুত্রদের। ‘‘আগুনের শিখার মতো কাঁপতে কাঁপতে একটা

বিলাপের ধ্বনি আকাশের দিকে উঠছে।

.......হ্যাঁ, ঝগরু মারা গেছে, কারণ মিঃ বোসদের বাঁচাবার জন্যই তো ঝগরুর মতো মানুষেরা চিরকাল জন্মায় আর মরে। পঞ্চনিষাদ প্রাণ না দিলে তো রাজপুত্র গাণ্ডবেরা বাঁচতে পারত না।'' মানবসমাজে ক্ষমতাবানগণ কর্তৃক ক্ষমতাহীনদের স্বীয় স্বার্থে ব্যবহারের পদ্ধতির চিরকালীন রূপটি স্পষ্ট হয়েছে গল্পের শেষের বাক্যে।

'উলুখড়'-এ আছে দাঙ্গা ও সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণি সম্পর্কের নগ্ন প্রকাশ। আজিজ ছিল ট্রাম কোম্পানির অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের একজন। তার বুকে লাল অক্ষরে লেখা 'ধর্মঘটী ট্রাম শ্রমিক' কাগজ আটকানো থাকত। সে ভেবে নিয়েছিল এটাই তার রক্ষাকবচ। বস্তুত সমপর্যায়ের মানুষগুলি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল সাহায্যের হাত। ফুটপাতে জিনিস বিক্রি করতে বসে আজিজ যখন পুলিশের ঝামেলায় পড়ে, তখন পাশের লাইসেন্সধারী ফিরিওয়ালা তাকে বাঁচার নিজের কর্মচারী পরিচয় দিয়ে। কিন্তু দাঙ্গা যারা করে তারা শোষক দলের হাতিয়ার। তারা নিঃশেষ করে দিতে চায় প্রতিবাদী শোষিতদের। তাই অসুস্থ মেয়ের জন্য পুতুল কিনতে এসে আজিজকে মরতে হয় ছোরার ঘায়ে।

'কান্না'-তে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিবাদে চিত্র আরও স্পষ্ট এবং তীব্র। বরিশালের গ্রামের ছেলে বিপিন ষোলো বছর বয়সে ঢুকেছিল লোহার কারখানায়। মাইনে পেত আটত্রিশ টাকা। স্ত্রী মালা একটি ছেলে আর বুড়ি শাশুড়িকে নিয়ে এ টাকায় তার বস্তির ঘরের সংসার চলছিল না। ক্ষুধা তাকে হিংস্র করে তুলছিল। সহকর্মীদের মনেও ছিল একই ভাব। যুদ্ধের বাজারে কারখানা প্রচুর লাভ করেছে। অথচ শ্রমিকদের মাইনে বাড়েনি। বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে ধর্মঘট করল তারা। ফলে বিপিনের সংসার হয়ে উঠল দুর্বহ। ক্ষুধা তাদের দগ্ধ করে, শাশুড়িকে কটু কথা বলে বিপিন। সংযম হারিয়ে মালা আরও ভাত চাওয়ায় ছেলেকে মারে। আর মালাকে মারে বিপিন। ছেলে আর শাশুড়ির কান্না অসহ্য হয়ে ওঠে তার কাছে। শাশুড়ি চলে যায় তাদের বাড়ি থেকে। আর ছেলেটা খিদেয় কাঁদে। শেষে অসুস্থ হয় ছেলেটি। নিরুপায় মালা শুধু কেঁদেই যায়। বুড়ি হঠাৎ ফিরে আসে আর কেঁদে বলে তার অনাহারের কথা। ক্ষিপ্ত বিপিন তাকে মারতে উদ্যত হলে চলে যায় বুড়ি।

ক্রমে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দেয় বিভেদ। একদল কাজে যোগ দিতে চায়, অন্যদল চায় তাদের বাধা দিতে। ফলে তাদের মধ্যে শুরু হয় মারামারি। পুলিশ আসে, গুলি চলে, আর কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়। অধিকাংশ শ্রমিকই কাজে যোগ দেয়। যারা নামেমাত্র চালু রাখে ধর্মঘট, বিপিন তাদেরই একজন। আহত সে ঘরে ফিরে শোনে মালার তিরস্কার আর ছেলের খিদের কান্না। এদিকে সংবাদ আসে তার শাশুড়ি মারা গেছে। তারপর থেকেই শুরু হয় মালার অবিরাম কান্না আর অসুস্থ ছেলের কান্না তাতে বেড়ে যায়। বিপিন তার ছেলের কান্নার মধ্যে শুনতে পায় আরও অসংখ্য ক্ষুধার্ত শ্রমিক সন্তানের কান্না।

একদিন ধর্মঘট পুরোপুরি ভেঙে যায়। সবাই যোগ দেয় কাজে। শুধু বরখাস্ত হয় কুড়ি-বাইশ জন। বিপিন তাদের একজন। ঘরে ফিরে দেখে ছেলের অসুখ বেড়ে গেছে। ধার করে টাকা নিয়ে ডাক্তার ডাকল সে। কিন্তু মারা গেল ছেলে। আর মালার অভিযোগ ভরা কান্না তাকে খেপিয়ে দিল। কান্না থামাতে গলা টিপে মালাকে খুন করে বিপিন। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয় তার। ফাঁসির আগে জেলার তার কাছে শেষ কথা জানতে চাইলে বিপিন জানায় যারা ছেলে-বউয়ের দুঃখ দূর করার জন্য লড়াই করছে তারা যেন তার মতো ভুল না করে। তারা যেন বুঝতে পারে গলা টিপে কান্না থামানো যায় না। তারা যেন এভাবে সংগ্রাম থেকে সরে না আসে। গল্পটিতে লেখকের শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি স্পষ্ট।

দেশভাগ কেমন করে বিপর্যস্ত করে মানুষের জীবন—তারই গল্প 'চাকা'। মহাপণ্ডিত শ্রীধর ভট্টাচার্য একদা বিধান দিয়েছিলেন মুসলমানের হাতে ধর্ষিতা পুত্রবধূকে গৃহে তুলে নিতে পারবে না মনোহর কুণ্ডু। তারপর এল দেশভাগ। আরম্ভ হল দাঙ্গা। শ্রীধরের বিবাহিতা কন্যা গৌরী হল অপহৃতা। শ্রীধর এবং দাক্ষায়ণী আর গৌরীর শ্বশুর ও স্বামী, পালিয়ে আসেন এপারে। হঠাৎ একদিন শিয়ালদহ স্টেশনে বোরখা পরা বন্দি গৌরীকে আবিষ্কার

করেন শ্রীধর। পুলিশের সহায়তায় উদ্ধার করা হয় তাকে। মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসেন শ্রীধর। তারপর জামাতা আর বৈবাহিককে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁরা কিন্তু সব শুনে ফিরে যান। মুসলমানের উচ্ছিষ্ট কন্যাকে তাঁরা গ্রহণ করেন না। শ্রীধর ঠিক করেন কন্যার বিবাহ দেবেন। ধর্ম শাস্ত্র, সমাজনীতি সব কিছু মিথ্যা হয়ে যায় পিতৃহৃদয়ের কাছে। তাই তিনি দগ্ধ করে ফেলেন সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ। গল্পটি ততটা সার্থক হতে পারেনি।

নিপীড়িত নিরুপায় নরনারীর কোনোমতে বেঁচে থাকার অন্তহীন কাহিনি লেখা হয়েছে 'তলানি' আর 'জীবিকা' গল্প দুটিতে। 'কাকভূশণ্ডি কথা' প্রায় একই ধরনের গল্প।

'তলানি' এক ট্রাম কনডাকটরের জবানিতে বলা গল্প। গল্পটিতে বেঁচে থাকার জন্য আদিম বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হওয়া বাসনা নামে একটি মেয়ের কথা আছে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫—এই কঠিন সময় গল্পটির পটভূমি। মেয়েটি কৈশোর থেকে টিকে থাকার জন্য গ্রহণ করে এই বৃত্তি। কারণ মাতৃহীনা মেয়েটি পিতার মৃত্যুর পর আশ্রয় পেয়েছিল ভগ্নীপতির সংসারে। সেই মানুষটিও কিছুদিন পরে মারা যায় কলেরায়। তখন দুই বোনই গ্রহণ করে গণিকাবৃত্তি। ক্রমে মেয়েটি একটি মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার চেষ্টা করে। সে ঘর ভেঙে যায়। শুধু একটি সন্তান লাভ করে সে। শেষে মেয়েটি মারা যায়। আর ছেলেটি কোনো মতে বেঁচে থাকে। তারপর কনডাকটরের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে বাসনার বয়সী একটি মেয়ে উঠেছে বাসে। তারও বৃত্তি দেহব্যবসায়। 'বাসনা মরলেও ওদের দল বাড়ছে। সবংশে।' মানুষের এই ক্রমপতন ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ করে মানুষটিকে। কিছু করার থাকে না তার।

'জীবিকা' গল্পেও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষের ক্রমাবনতির ছবি রয়েছে। এ গল্পের পটভূমি মহারাষ্ট্রের গ্রাম। অভাব আর শক্তিমানের অত্যাচার মানুষকে ঠেলে দিয়েছে পাতালপথে। 'তলানি'-তে পরিস্থিতির চাপে মানুষের পতনের কথা আছে।

দরিদ্র সুখন কাঠ কেটে চালায় স্ত্রী তুলসী আর এক বছরের ছেলে নিয়ে গড়া তার সংসার। কারণ আধ বিঘে জমি তার সম্বল। অসুস্থ হয়ে পড়ায় জঙ্গলে যেতে পারেনি; তাই 'খেটে' অর্থাৎ জমিদারের দখল করা বনে কাঠ কেটেছিল সে। জমিদারের লোকেরা তাকে ধরে ফেলে। জমিদার তাকে প্রহার করে আর মার খেতে খেতে মরিয়া সুখন ঝাঁপিয়ে পড়ে জমিদারের উপর। কিন্তু ব্যর্থ হয় তার আক্রমণ। জমিদারের লোকেরা তাকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে দিয়ে যায় পাহাড়ি পথে। ক্রমে চেতনা ফেরে তার। বাড়ি ফিরে সে দেখে বাচ্চার অসুখ আরও বেড়েছে। নুনভাত খেয়ে কালকের সম্বল নেই তা জেনে নেয় সুখন। সন্ধ্যায় সমবেদনা নিয়ে আসে তারই মতো কয়েকজন। রাতে তাদের ঘরে আগুন দেয় জমিদারের লোক। কোনোমতে স্ত্রী আর ছেলেকে ঘর থেকে বার করতে পারে সে। বন্ধু গঙ্গুয়া আশ্রয় দেয় তাকে। কিন্তু জমিদারের লোক তাকে শাসিয়ে দিয়ে বলে সুখনকে তাড়িয়ে দিতে। তারপর সুখনকেও তারা বলে দেয় গাঁ ছেড়ে না গেলে তাকে মরতে হবে।

উপায়হীন সুখনকে গঙ্গুয়া পরামর্শ দেয় আফিং নিয়ে মুম্বই যেতে। এর জন্য মহাজন বিঠল দাসকে তার জমি লিখে দেয় সুখন। আর আফিং নিয়ে যাওয়ার সময় চোরাচালানদার ইব্রাহিম সাবধান করে দেয় ধরা পড়লে তার হবে জেল এবং আর নাম প্রকাশ করে দিলে হত্যা করা হবে তাকে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে ভোরে তারা হেঁটে রওনা দেয় মুম্বই-এর দিকে। পথে মারা যায় বাচ্চাটি। সুখন বাচ্চাকে কবর দিতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে আড়ালে নিয়ে গিয়ে মৃতদেহের পেট চিরে লুকিয়ে রাখে আফিং। আর তুলসীকে বলে ছেলেকে শহরে নিয়ে গিয়েই কবর দেবে সে; ওরও তো শহরে যাবার কথা ছিল। শহরে ঢোকার মুখে পুলিশ তল্লাস করে তার পোঁটলা। মরা ছেলেকে দেখে তাদের চোখে জাগে সহানুভূতি। আর কবর দিতে গিয়ে ছেলের পেট থেকে আফিং বের করে নেয় সে। তারপর মর্মান্তিক বেদনায় বিদ্ধ হতে হতে সে উপলব্ধি করে তার এক বছরের ছেলে পিতৃঋণ শোধ করেছে মৃত্যুর পরেও। গল্পটিতে শক্তিমানের অত্যাচার আর উপায়হীন মানুষের বাঁচার সংগ্রামের যে বিবরণ আছে তার মধ্য দিয়ে নিপীড়িতের প্রতি লেখকের সহানুভূতির স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষিত হয়।

'কাকভূশণ্ডি কথা' গল্পটিতে এক বৃদ্ধ কাকের দৃষ্টিতে মানবজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস রূপায়িত হয়েছে। গল্পটির পটভূমি মহারাষ্ট্রের গ্রাম। এ গাঁয়ের চামার মগনলালের যুবতী বধূ চম্পাবতী। সে তার স্বামীকে ভালোবাসতো প্রাণ দিয়ে। তবে স্বামীর প্রহারের বদলে তাকেও দু ঘা বসিয়ে দিতে ইতস্তত করত না সে। শাশুড়ি জীউবাঈ-এর সন্দেহ আর গালাগালিকে গ্রাহ্য করত না সে। গাঁয়ের কুচরিত্র গুণ্ডা বামুনের ছেলে চিমনলাল ভট্টের নজর পড়ে চম্পার দিকে। পরিণামে মগনলাল মারা পড়ে তার হাতে। প্রসঙ্গত গল্পটিতে গ্রীষ্মদাহে দগ্ধ গ্রামে জলকষ্ট, অস্পৃশ্যদের জল সংগ্রহের করুণ প্রচেষ্টাও চিত্রায়িত হয়েছে।

বর্ষায় গ্রামটিতে আসে বন্যা। আর চিমনলাল চম্পা জলস্রোতে ভেসে গিয়ে আশ্রয় পায় একই টিলায়। চিমনের সঙ্গে ছিল রামদা আর চিঁড়ের পুঁটলি। সেই অবস্থায়ও সে চম্পাকে ভোগ করতে চায়। চম্পা কৌশলে তাকে ঠেকিয়ে রাখে। তার পুঁটলির চিঁড়ে খেয়ে মৃত্যুর বাসনায় পান করে বন্যার বিষাক্ত জল। তারপর মিলনের আশ্বাস দিয়ে চিমনলালকে ভুলিয়ে তারই রামদা দিয়ে হত্যা করে স্বামীঘাতককে। তারপরই মারা যায় চম্পা।

ক্রমে বন্যার জল নেমে যায়। চম্পা-মগনলালের ভিটেতে বাস করতে থাকে কামিনী নামের এক বধূ। স্বামী আর দেবরের অনুপস্থিতিতে মিলিত হয় অবৈধ প্রণয়ীর সঙ্গে। এই ভাবেই এগিয়ে যায় জীবনপ্রবাহ। তার বাঁকে বাঁকে ঘটে যায় নতুন ঘটনা।

এ কাহিনীতে রয়েছে পীড়নের চিত্র। কিন্তু তা প্রধান হয়ে ওঠেনি। বড়ো হয়ে উঠেছে জীবনের বিরামহীন গতি—যে গতিতে তুচ্ছ হয়ে যায় পাপপুণ্য-অন্যায়-অবিচার আর সুখদুঃখময় ব্যক্তিজীবন।

'পাপুইদ্বীপের কাহিনী' পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষায় বিপন্ন পৃথিবী আর মানুষের প্রতি লেখকের উদ্বেগ আর প্রীতি নিয়ে নির্মিত একটি রূপক কাহিনি। কাহিনির বক্তা এক প্রেত। সে প্রেম আর শান্তির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এসেছে জাপানের পুব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম অংশে সভ্যতা থেকে দূরে অবস্থিত পাপুই দ্বীপে। ছোট্ট এই দ্বীপে এখনও সভ্যতার কালিমা ছড়িয়ে পড়েনি। শান্তি আর প্রীতি নিয়ে বেঁচে আছে এ দ্বীপের পাঁচশো মানুষ।

গল্পটিতে আছে অসৎ প্রেতেদের কথা। এই প্রেতের দল অশুভের বার্তাবহ। তারা মানুষকে ঠেলে দেয় পাপের পথে। আরও আছে উপনিষদ বর্ণিত আত্মার জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত।

গল্পবক্তা প্রেত জন্মাতে চায় না এই পাপময় পৃথিবীতে। কিন্তু ক্রমে পাপুই দ্বীপেও হানা দেয় বিদেশির দল। তারা পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করে দ্বীপটিকে। দ্বীপের মানুষগুলিকে তারা মদ আর উপহার দিয়ে বশ করতে চায়। তাদের একাংশ মেনে নেয় তাদের কথা। একদল বিদ্রোহ করে। দমিত হয় তাদের বিদ্রোহ। অন্যদের শ্রম দিয়ে তারা স্থাপন করে বোমাটি। আর শেষে সব মানুষকে তারা দ্বীপ ছেড়ে যেতে বলে। মানুষগুলি সে কথা মানে না। বিদেশিরা চলে যায় দ্বীপ ছেড়ে। তাদের সঙ্গে যায় দ্বীপের কিছু মেয়ে।

তারপর একদিন বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বোমাটির। চূর্ণ হয়ে যায় পাপুই দ্বীপ। সৃষ্টি হয় বিশাল এক অগ্নিঝড়। মহাসাগরের তলদেশ পর্যন্ত জর্জরিত হয় মৃত্যুবিষে। বোমার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে।

উদ্বিগ্ন সৎ আত্মার দল সমবেত হয় ছায়াপথের নিকটে। কারণ ''সমস্ত প্রাণশক্তির লক্ষ্য যে মানুষ তারা জীবনকে চাইছে না, চাইছে মৃত্যু। ঘৃণা আর হিংসা তাদের মৃত্যুর উপাসক করে তুলেছে।'' প্রেতেরা চিৎকার করে মানুষকে বলতে চায় তারা যেন পরস্পরকে ভালোবাসে। কেবল ভালোবাসাই তাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে। প্রেতদের এই ভাষা শুনতে পায় না মানুষেরা। তবু ক্ষান্ত হবে না এই সৎ আত্মার দল। আর জন্মগ্রহণে অনিচ্ছুক বক্তা-প্রেত মানবজাতির কানে এই প্রেমের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য, তাদের ভালোবাসার দীক্ষা দেওয়ার জন্য আবার জন্ম নিতে চায় পৃথিবীতে। মানবজাতির প্রতি নবেন্দুর আন্তরিক ভালোবাসাই এই গল্পটির ভিত্তি।

এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি গভীর মানবপ্রীতিই নবেন্দুর সাহিত্যকর্মের উৎস। তার সঙ্গে রয়েছে গল্পনির্মাণ কৌশলের অভিনবত্ব এবং বিষয়বৈচিত্র্য। বাংলা ছোটোগল্পের পরিমণ্ডলে নবেন্দু ঘোষ স্বীয় শক্তিতে অধিকার করেছেন নিজস্ব স্থান।

৫.৭ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ছদ্মনাম সুনন্দ সেন। ১৯১৮-র ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের বালিয়াডাঙ্গিতে জন্ম। মৃত্যু ৮ নভেম্বর, ১৯৭০, কলকাতা। পৈতৃক নিবাস—বাসুদেব পাড়া, বরিশাল।

শিক্ষা : প্রবেশিকা, দিনাজপুর জেলা স্কুল ১৯৩৩, ১ম বিভাগ। আই. এ. ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ, ১৯৩৬। বি. এ. বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, ১৯৩৮। এম. এ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১। বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। ডি. ফিল, ১৯৬০।

জীবিকা : অধ্যাপনা জলপাইগুড়ি কলেজ, ১৪৮২, সিটি কলেজ, কলকাতা, ১৯৪৫। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৫৬-১৯৭০।

পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দারোগা হলেও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। নিয়মিত বই ও পত্র-পত্রিকা কিনতেন। বাড়িতে ভালো গ্রন্থাগার ছিল। মাতৃহীন আট পুত্রকন্যার জন্য বালকপাঠ্য পত্রিকা আনাতেন। ফলে কৈশোরেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন সাহিত্যানুরাগী। ক্রমে সাহিত্য রচনারও আকাঙ্ক্ষা জাগে তাঁর মনে। বার করেন সচিত্র হস্তলিখিত পত্রিকা 'চিত্র-বৈচিত্র্য'। সেখানে কবিতা, গল্প, রহস্য-উপন্যাস—সবই লিখেছিলেন।

পরে তিনি কবিতা লেখাতেই মন দেন। তাঁর 'আষাঢ়ে' কবিতাটি মুদ্রিত হয় কিশোর মাসিক পত্রিকা 'মাসপয়লা'-তে। প্রথম যৌবনে সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ মুদ্রিত হয় তাঁর কবিতা। ক্রমে 'দেশ'-এর তৎকালীন সহ-সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের তাগিদে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প 'নিশীথের মায়া'।

প্রথম যৌবনে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পরিণামে তাঁকে কিছু দিনের জন্য অন্তরীন হতে হয়। বিঘ্নিত হয় তাঁর পাঠক্রম। 'প্রগতি সাহিত্য সংঘ'-এর সঙ্গে সক্রিয় যোগ ছিল তাঁর। তবে তিনি সবার উপরে স্থান দিতেন মানুষকে এবং স্বদেশকে। তাঁর মত ছিল 'মানুষের জন্য রাজনীতি, রাজনীতির জন্য মানুষ নয়।'

এ পর্যন্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একশো বাইশটি গল্প মুদ্রিত হয়েছে। আরও কিছু গল্প সম্ভবত পত্রিকার পাতায় থেকে গেছে। তাঁর লেখা গল্পগ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হল :

(১) 'বীতংস, ১৯৪৫; (২) 'দুঃশাসন', ১৯৪৫; (৩) 'ভাঙ্গা বন্দর', ১৯৪৫; (৪) 'জন্মান্তর', ১৯৪৬; (৫) 'ভোগবতী', ১৯৪৭; (৬) 'কালা বদর', ১৯৪৮; (৭) 'গন্ধরাজ', ১৯৫৫; (৮) 'উর্বশী', ১৯৫৬; (৯) 'ভাটিয়ালী', ১৯৫৭; (১০) 'সাপের মাথার মণি', ১৯৫৯; (১১) 'রূপমতী', ১৯৫৯; (১২) 'একজিবিশন', ১৯৬১; (১৩) 'রাতের মুকুল', ১৯৬৪; (১৪) 'শিলাবতী', ১৯৬৪; (১৫) 'ছায়াতরী', ১৯৬৬; (১৬) 'বনজ্যোৎস্না', প্রকাশকাল জানা যায়নি; (১৭) 'বনজ্যোৎস্না' ১৯৬৯ (নামগল্প ভিন্ন দুটি সংস্করণ সম্পূর্ণ আলাদা); (১৮) 'ঘূর্ণি', ১৯৭১; (১৯) 'লক্ষ্মীর পা', ১৯৭৭; (২০) 'অষ্টাদশী', ১৯৭৯; (২১) 'আলেয়ার রাত', ১৯৮১।

কিশোর গল্প : (১) 'সপ্তকাণ্ড', ১৯৪৮; (২) 'ছুটির আকাশ', ১৯৫৬; (৩) 'খুশির হাওয়া', ১৯৫৮; (৪) 'গল্প বলি গল্প শোনো', ১৯৬১; (৫) 'রাঘবের জয়যাত্রা', ১৯৬৩; (৬) 'হনোলুলুর মাকুদা', ১৯৬৫; (৭) 'কম্বল নিরুদ্দেশ', ১৯৬৭; (৮) 'পঞ্চাননের হাতী', ১৯৬৮; (৯) 'টেনিদার গল্প', ১৯৬৮; (১০) 'পটলডাঙ্গার টেনিদা', ১৯৭০; (১১) 'টেনিদা দি গ্রেট', ১৯৭১; (১২) 'ঘণ্টাদার কাবলুকাকা', ১৯৭২; (১৩) 'অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং', ১৯৭৪; (১৪) 'টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা', ১৯৮১; (১৫) 'ক্রিকেটার টেনিদা', ১৯৮৬; (১৬) 'টেনিদার কাণ্ডকারখানা', ১৯৯০।

রচনাবৈশিষ্ট্য : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যতটা ব্যক্তিচেতনার কথা বলেছেন তার চেয়ে বেশি বলেছেন যুগচেতনার কথা। তাঁর প্রথম যুগের লেখায় মূলত প্রধান হয়েছে যুগচেতনা। তিনি যখন লিখতে শুরু করেন তখন দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত মানবজীবন, কালোবাজার, মন্বন্তর, দাঙ্গা ধ্বংস করে দিচ্ছিল সাধারণ মানুষকে আর কিছু মানুষ, মানুষের দুর্দশাকে, দুঃখকে কাজে লাগিয়ে হয়ে উঠছিল ধনী। তাঁর ছোটোগল্পে এসবই ধরা পড়েছে। অনেক সময় তা এসেছে কুচক্রীদের ভীত মানসিকতার বিশ্লেষণে।

'নক্রচরিত' এমনই একটি গল্প। গোলাপাড়া হাটের মহাজন নিশিকান্ত কর্মকার, একই সঙ্গে চালের আড়তদার, চোরাইমালের ক্রেতা আর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। চাল মজুত করে চালের দর বাড়িয়ে দেয় তার মতো স্বার্থপর মানুষগুলি। হাহাকার পড়ে যায় গ্রামে গ্রামে। না খেলে মরে মতি পাল, তার বউ আত্মহত্যা করে। তখনও বিকারহীন নিশিকান্ত ইব্রাহিম দারোগাকে তুষ্ট করার জন্য নিযুক্ত করে নিজের সেবাদাসী রাধাকে। কিন্তু এই কৃতকর্মের শাস্তি সে পায়; অন্ধকার রাতে কপট বৈষ্ণব নিশি ভয়ে কাঁপে। হরিনাম তাকে রক্ষা করতে পারে না। সে অনুভব করে বঞ্চিত, বুভুক্ষু, মৃত মানুষের আত্মারা ঘিরে ধরেছে তাকে। এই ভীতি থেকে সে মুক্তি পায় না কোনো মতে।

১৯৪২-৪৩-এ বাংলায় অন্নাভাবের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল বস্ত্রাভাব। কন্ট্রোল দোকানে লাইন দিয়ে কিনতে হত কাপড়। কিন্তু অনেক সময়ই মজুতদার মহাজন আরও বেশি দাম পাওয়ার লোভে মজুত করত কাপড়। ধনীরা চড়া দামে সংগ্রহ করত লজ্জানিবারণের উপকরণ। অন্নহীন দীন মানুষগুলি বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণের উপায় খুঁজে পেত না। মেয়েরা অনেক সময় বেছে নিত আত্মহননের পথ। এমনই এক কাপড়ের আড়তদার দেবীদাস। এসব ঘটনা তাকে বিন্দুমাত্র নাড়া দিত না। সে দেখতে গিয়েছিল 'দুঃশাসন' নামের যাত্রা। অকারণে তার বুকের মধ্যে শির শির করে। দেবীদাস ও তার ভাইপো গৌরদাস অনুভব করে তাদের একদিন করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত। আবার ফেরার পথে আলপথে শ্রমিকদের কাজ করতে যেতে দেখা যায়। তাদের হাতে ধারালো হেঁসো ''অকারণে—অত্যন্ত অকারণে বড় বেশি ভয় করতে লাগল গৌরদাসের। অমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোতে শাণ দেয় ওরা।''

'পুষ্করা' গল্পে দেখা যায় দুর্ভিক্ষের পরবর্তী অনিবার্য মহামারীর গ্রাসে সম্বলহীনের করুণ মৃত্যুর জীবন্ত চিত্র। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের মানুষ মড়ক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আয়োজন করেছিল শ্মশানকালীর পূজার। সদ্য নির্মিত মূর্তির সামনে নিবেদিত ভোগ শিবারূপে গ্রহণ করবেন দেবী। তবেই বোঝা যাবে তিনি তুষ্ট, রক্ষা পাবে মানুষ নতুবা পুষ্করার কোপে ধ্বংস হবে সবাই। পুরোহিত তর্করত্ন ভয় পান শিবার আগমনের বিলম্ব দেখে। শেষ রাতের অন্ধকারে আচমকা দেখা যায় অর্ধনগ্ন ঝাঁকড়া চুল কৃষ্ণা এক নারী দুহাতে গ্রহণ করছে ভোগ। পুরোহিত পুলকিত হন দেবীর আবির্ভাবের কথা ভেবে। কিন্তু পরদিন উদ্‌ঘাটিত হয় নির্মম সত্য। ডোমপাড়ার সব হারানো অনাহারশীর্ণ মেয়েটি মারা গেছে কলেরায়। বোঝা যায় সেই গ্রহণ করেছিল শিবাভোগ লেখকের মন্তব্য বিদ্ধ করে পাঠককে ''মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই তো নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।''

নিপীড়িত সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের গল্পও লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'সৈনিক' তার উদাহরণ। পালগ্রামে একদা ছিল রাজবংশ। তাদের অতীত ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে টিলা, জঞ্জাল আর মজা দিঘির মধ্যে। রাজবংশের উত্তরাধিকারী চন্দ্র চৌধুরীর আমলে একদল সাঁওতাল এসে তাঁর অনুমতি নিয়ে বসতি স্থাপন করে টিলাটিতে। তাদের সততা, সরলতা আর নিষ্ঠায় মুগ্ধ চন্দ্র চৌধুরী মাপ করে দিয়েছিলেন খাজনা। তাঁর বাহন আসাম-জঙ্গল থেকে ধরে আনা হাতি নীলবাহাদুরের সঙ্গে সাঁওতালদের একটি হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু চন্দ্র চৌধুরীর পুত্র ইতিহাসে এম. এ. ইন্দ্র চৌধুরীর আমলে পালটে গেল এই ছবি। নতুন যুগের মানুষ সে; কিনেছে বেবি অস্টিন। নীলবাহাদুর পড়ে থাকে অনাদরে। হঠাৎ তার খেয়াল চাপে সাঁওতালদের উৎখাত করে টিলা খনন করাবে। কারণ এর ফলে আবিষ্কারক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যাবে সে। এই কাজে লাগানো হল নীলবাহাদুরকে। দু-দিনের উপোসী নীলবাহাদুরকে ছেড়ে দেওয়া হল সাঁওতালদের পাকা ধানের খেতে। নীলবাহাদুর এখন শুধু শক্তিমানের সৈনিক। তাই মুছে গেল প্রীতির বিন্দু। সাঁওতালদের বিষাক্ত পর বিদ্ধ শর বিদ্ধ করল তাকে।

তার পিছনে বেবি অস্টিন-এ বন্দুক হাতে ছিল ইন্দ্র চৌধুরী। ঘটোৎকচের কুরুসৈন্য পিষ্ট করে পতনের মতোই মরণাতুর নীলবাহাদুরের দেহ আছড়ে পড়ল বেবি অস্টিন-এর উপর। ধনতন্ত্রভিত্তিক যন্ত্রসভ্যতা এভাবেই যে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে এই ইঙ্গিতে শেষ হয়েছে এ গল্প।

ক্রমে কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তির চিত্র অঙ্কনেই মনোযোগী হয়েছেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি হয়ে উঠেছে সমষ্টির প্রতিরূপ। এই সময়ের গল্প 'টোপ'। একদিকে সামন্ততন্ত্রের নির্মম হিংস্রতা অন্যদিকে মধ্যবিত্তের সুবিধা-অন্বেষী মনোবৃত্তির রূপায়ণে গল্পটি হয়ে উঠেছে তীব্র। তরাই-এর জঙ্গলে স্থানীয় এক রাজা বাহাদুরের বাঘ শিকার দেখার আমন্ত্রণে এসেছিলেন গল্পবক্তা। শিকার-বাংলোর পিছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়ের নিচে কপিকল দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয় টোপ। এ টোপ গোবৎস বা ছাগশিশু নয়, গোপনে সংগৃহীত গরিব ঘরের মানবশিশু। চমকে ওঠা অতিথির প্রতিবাদ থেমে যায় রাজা বাহাদুরের উদ্যত বন্দুকের সামনে। কলকাতায় ফেরার কিছু দিন পরে ডাকে তাঁর কাছে আসে বাঘের চামড়ার চটি। রাজা বাহাদুরের সফল শিকারের উপহার সে চটি বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেন গল্পবক্তা। এভাবেই মধ্যবিত্তের দুর্বলতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় পাঠকের কাছে। স্বদেশ আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা এইসব গল্পের উৎস।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল একটি রোমান্টিক কবি মন। উত্তরবঙ্গের অরণ্য-প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে সেই মন আত্মপ্রকাশ করেছে নানা গল্পে। 'বন-জ্যোৎস্না' এই শ্রেণির গল্প। গল্পটির পটভূমি ভুটান-ভারতের সীমান্ত প্রদেশের অরণ্য। জলঢাকা নদীর তীর ধরে একদিন বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পলাতক বিপ্লবী মহীতোষ সঙ্গীদের হারিয়ে এসে সীমান্তের এই জঙ্গলে পৌঁছোল। এখানে অরণ্য-প্রকৃতি একই সঙ্গে সুন্দর আর ভীষণ—'জঙ্গলের বুকে একটা গভীর ক্ষতচিহ্নের মতো বিসর্পিত রেখায় ঝোরার জল যেখানে বয়ে গেছে, সেখানকার ঘন-বিন্যস্ত ঝোপের ভিতর উঠছে বুনো ফুলের গন্ধ। জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে ডেকে চলেছে হরিয়াল—পূর্ণিমা রাত্রির মায়ায় তারও চোখ থেকে ঘুম দূর হয়ে গেছে। শুধু থেকে থেকে কোথায় তীব্র স্বরে চিৎকার করছে একটা ময়ূর—পাখা ঝটপট করছে, হয়তো বেকায়দায় পেয়ে কোথাও আক্রমণ করেছে শিশু একটা পাইথনকে। অকৃপণ পূর্ণিমা আর অনাবরণ সৌন্দর্যের মধ্যেও আরণ্যক আদিম হিংসা নিজেকে ভুলতে পারেনি—হরিয়ালের সুরে আর ময়ূরের ডাকে রুদ্র মধুরের ঐকতান বেজে চলেছে।'' এই বন-জ্যোৎস্নায় সঙ্গী-হারানো মহীতোষ দেখা পেল শিউকুমারীর। পিতা কুলবীর আর কন্যা শিউকুমারীর সেবায় সুস্থ হয়ে উঠল মহীতোষ। দুজনের মধ্যে জন্ম নিল প্রেম। কিন্তু এসে দাঁড়াল শয়তান বলদেও। শিউকুমারীকে তার চাই নতুবা সরকারি দফতরে সে পৌঁছে দেবে মহীতোষের খবর। মহীতোষ আর শিউকুমারী ঠিক করে তারা পালিয়ে যাবে ভুটানে। পলায়নের জন্য প্রয়োজন অর্থের। সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য শিউকুমারী বলদেওর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই সময়েই দলের নির্দেশ আসে মহীতোষের কাছে। চলে যেতে বাধ্য হয় সে। অরণ্যে তার ব্যর্থ সন্ধানে গিয়ে দাবাগ্নির গ্রাসে পড়ে শিউকুমারী। বন-জ্যোৎস্নায় জন্ম যে প্রেমের, অরণ্য-অগ্নি নিঃশেষ করে দিয়েছে তাকে। এ গল্পটিকে বলা যায় ডুয়ার্সের অরণ্য-সৌন্দর্যের মতোই ভয়ংকর সুন্দর।

দেশ ভাগের ফলে ভেঙে গিয়েছিল অনেক সম্পর্ক; গড়ে উঠেছিল নতুন সম্পর্ক, নতুন সমাজ, তার বাস্তব চিত্র আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে। 'রাঙামাসি'-কে আমরা বেছে নিতে পারি উদাহরণ হিসেবে। পুব বাংলায় সচ্ছল সংসার ছিল রাঙা মাসির। তিনি হয়েছিলেন গল্পবক্তার ভিক্ষেমা; টাইফয়েড-আক্রান্ত তাঁর সুস্থতার জন্য দেবতার কাছে বুক চিরে দিয়েছিলেন রক্ত। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু রাঙামাসিকে গ্রাস করেছে দারিদ্র্য। পরীক্ষার ফি জোগাড়ের জন্য সন্তানকে পাঠিয়েছেন তিনি বক্তার কাছে। তার সঙ্গে সাধ্যমতো খাদ্যসম্ভার পাঠাতেও ভোলেননি তিনি। বাস্তুচ্যুত গল্পবক্তারও সামর্থ্য নেই এই ফি দেওয়ার। কিন্তু রাঙামাসির ঠিকানা তিনি জানতে চান না। কারণ সেই সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যে-র অংশ ভাগ হওয়ার ভয়।

আবার দেশভাগের ফলে কীভাবে অভিজাতের অকারণ দম্ভ লুপ্ত হয়ে যায়, রাজপুত্র হয়ে যায় সাধারণ মানুষ

তার চিত্র আছে ‘রাজপুত্র’ গল্পে। দেশবিভাগের ফলে সর্বহারা রাজপুত্র প্রতাপেন্দ্রনারায়ণ। তার আশ্রয় বেহালার ভাড়াবাড়ি। রাজা পিতা শেয়ালদহে আদালতে ওকালতির বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। টিউশনি সহায়ে বি. এ. পাশ করে প্রতাপেন্দ্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে পায় অকুলীন সরকারি চাকরি। এই সূত্রে দার্জিলিঙ-এ এসে সে পরিচিত হয় সাধারণ স্কুল-শিক্ষিকা মাধবী দাশগুপ্তের সঙ্গে। পরিচয় পরিণতি পায় প্রেমে। আর প্রতাপেন্দ্রনারায়ণ নবজন্ম পায় প্রতাপরূপে।

পুরোনো সহপাঠী বীরেশ এই সময়ই এসে যায় গল্পের মধ্যে। অনভিজাত বীরেশ প্রতাপকে রাজপুত্র বলে আনন্দ পেত। আজ সে অর্থ আর চাকরি-কৌলীন্যে হয়ে উঠেছে অভিজাত। কিন্তু তার নকল আভিজাত্যের দর্প ভেঙে যায়। মাধবী থামিয়ে দেয় দুই বন্ধুর সংঘাত। আর মাধবীর প্রেমে প্রতাপ হয়ে ওঠে নতুন জীবনের ‘রাজা’।

মনস্তত্ত্বের জটিলতা রূপায়িত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু গল্পে। ‘দুর্ঘটনা’ গল্পে স্টোভ দুর্ঘটনার শিকার কুরূপা স্কুল-শিক্ষিকা ইন্দিরা চৌধুরির ঘর বাঁধার স্বপ্ন সফল হয়নি। তাই স্টিমারে পরিচিত তরুণ দম্পতি বিভাস ও ইলার জীবনে সে বুনে দেয় সন্দেহের বীজ। তাদের শোনায় কল্পিত এক বিভাসের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি। মনোগহনের কুটিল জটিলতা রূপ পেয়েছে ‘অমনোনীতা’ গল্পে। লোকেন তার সুন্দরী স্ত্রী মণিকাকে নিয়ে সুখেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ সে জানতে পারে তার সহপাঠী ধনী দুলাল পাত্রী হিসেবে নাকচ করেছিল মণিকাকে। মণিকা কেন অমনোনীতা এই প্রশ্নটি হঠাৎ বড়ো হয়ে ওঠে লোকেনের কাছে। তার মনে জেগে ওঠে সন্দেহ। দুলাল এর মধ্যে মারা গেছে দুর্ঘটনায়। তাই জানার উপায় নেই বাতিল করার কারণ। মিথ্যা সন্দেহের বিষে পোড়ে লোকেনের মন। সরল শান্ত মণিকার আন্তরিক সেবায় তৃপ্তি পায় না সে। কারণ তার ভেতরে বাসা বেঁধেছে সন্দেহের জীবাণু। এই জীবাণু ধীরে ধীরে দিনে দিনে তাকে গ্রাস করবে। কিছুতেই এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই তার।

নারীর মনের জটিলতার একটি প্রকাশ দেখা যায় ‘কাণ্ডারী’ গল্পে। বয়স্ক ব্যবসায়ী অখিল ঘোষের সন্দেহ ছিল তরুণী পত্নী অলকার মনে তার স্থান নেই। সে স্থান দখল করেছে তার সহকারী প্রতাপ। একদা পাহাড়ি রাস্তায় মোটরে চড়ে চলেছিল তিনজন। স্টিয়ারিং ছিল প্রতাপের হাতে। তার সতর্কতার ত্রুটিতে দেখা দিল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। তখনই অখিল বুঝতে পারে অলকা একমাত্র তাকেই ভালোবাসে। প্রতাপ তার সময় কাটানোর সঙ্গীমাত্র। কারণ অলকা প্রতাপকে তিরস্কার করে অখিলকেই গাড়ি চালাতে বলেছিল, জানিয়েছিল একমাত্র তার উপরই আছে তার নির্ভরতা। অখিলের কাছে তাই সূর্যাস্তের রক্তিমাভার সঙ্গে মিশে যায় অনুরাগের আভা।

মানবমনের প্রতিশোধ-লিপ্সু হিংস্রতাও দেখা গেছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে। ‘ঘাসবন’ গল্পে প্রতারিত প্রেমিকের হিংস্র প্রতিশোধ পাঠককে ভীত করে। মহিষবাথানের মালিক শ্যামলালের সঙ্গে ঘাটোয়ালের সম্পর্ক মধুর ছিল না। ঘাটোয়ালের বিবাহিতা মেয়ে রুকনি সত্য গোপন করে শ্যামলালের প্রণয় নিবেদনে সাড়া দিয়েছিল। সত্য জেনে হিংস্র হয়ে উঠেছিল শ্যামলাল। লাল শাড়ি পরা রুকনির দিকে সে ছেড়ে দিয়েছিল খ্যাপা মহিষের পাল আর ঘাটোয়ালের চাওয়া সেরা ঘিরে মিশিয়েছিল গোখরোর বিষ।

পরিস্থিতির শিকার অনেক মানুষ কিন্তু নিতে পারে না অবিচারের প্রতিশোধ। বরং তারা নিজেরাই নিঃশেষ হয়ে যায়। বৃত্তিতে শিক্ষক লেখক, শিক্ষক আর ছাত্রকে নিয়ে লিখেছেন তেমন গল্প। ‘ভাঙা চশমা’ গল্পে বেশি অর্থের জন্য শিক্ষকতা ত্যাগ করে বক্তা বেছে নিয়েছিলেন সাবডেপুটি পদ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে হয় তাঁকে সরকারি দাক্ষিণ্য বিতরণের কাজে। এভাবেই তিনি দেখতে পান মাইনর স্কুলের অপ্রকৃতিস্থ এক প্রধানশিক্ষককে। ছাত্র চলে গেলেও পরম মমতায় তিনি আঁকড়ে আছেন নিজের গড়া বিদ্যালয়। বক্তা সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। তাঁর মনে হয় বিদ্যার এই তীর্থে ব্রতভ্রষ্ট, স্বার্থপর তাঁর থাকার অধিকার নেই।

‘মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু’ চিঠির আকারে লিখিত মর্মন্তুদ এক গল্প। পরীক্ষার হলে উত্তরের খাতায়

নিরুপায় এক ছাত্র লিখে গেছে তার জীবন কাহিনি। বিয়াল্লিশের বিপ্লবে প্রাণ দিয়েছিলেন মেদিনীপুরের বাসিন্দা এই ছেলেটির পিতা। মাইনর পরীক্ষার বৃত্তিচাষি-ঘরের বালকের মনে জাগিয়েছিল উচ্চশিক্ষার আশা। সুযোগ আর অর্থের অভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে পেয়েছে থার্ড ডিভিশন। তবুও দমেনি সে; এসেছে নগর কলকাতায় কিন্তু তার আশ্রয়দাতা কেড়ে নিয়েছে তার পাঠের সময়। আশ্রয়ের বিনিময়ে তাদের আয়কর ফাঁকির নকল খাতা তৈরিতে চলে গেছে সময়। স্বাধীন ভারত ছাত্র স্বাধীনকুমারকে দেয়নি বেঁচে থাকার সুযোগ। সে আত্মহত্যা করেছে এই ক্ষীণ আশা নিয়ে যে একদিন হয়তো এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

লেখক-জীবনের বেদনা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'দোলনচাঁপার বৃন্ত' গল্পটি। বক্তার কৈশোরের প্রিয় কবি আজ বিত্তহীন, অসুস্থ। সরকারি মুষ্টিভিক্ষা তাঁর সম্বল। তারই জন্য দরকারি সুপারিশপত্রের আশায় তিনি এসেছেন বক্তার কাছে। এরপর তাঁকে যেতে হবে শহরের অন্যপ্রান্তে পরিচিত এক কবির কাছে প্রশংসাপত্রের জন্য। সাহিত্যিকের এই দুর্দশা; এই নির্মম সংসারের নগ্নচিত্র ব্যথিত করেছে তাঁকে। কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণের উপায়ও তাঁর জানা নেই।

তবু কিন্তু অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ থেমে যায়নি কোনো কালে। 'রেকর্ড' গল্পটি তার প্রমাণ। গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের নির্মাণ-শিল্পেরও চমৎকার উদাহরণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটোগল্পে আদি, মধ্য, অন্ত্য যুক্ত কাহিনিবৃত্ত নির্মাণে বিশ্বাসী ছিলেন। নাটকীয় চমক এবং নাটকের গঠনরীতির প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর অনেক গল্পে। 'রেকর্ড' এ সবেরই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গল্পটি শুরু হয়েছে বউবাজার স্ট্রিট আর শেয়ালদহ মোড়ের সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা রেকর্ড নিয়ে। নারায়ণবাবুর অধিকাংশ গল্পের মতো এটিও উত্তমপুরুষে উপস্থাপিত। বক্তা যে রেকর্ডটি কিনলেন তার গান অচেনা, সুর আর ভাষাও চেনা নয়। তবুও যেন তার মধ্যে রয়েছে বহু শ্রুত সংগীতের আভাস।

ক্রমে গল্প এগিয়ে যায়। শুরু হয় ঘটনার ক্রমোন্নয়ন। রেকর্ড ঘিরে দানা বাঁধে নানা কল্পনা। বক্তার অধ্যাপিকা স্ত্রী করুণার মনে রেকর্ড এনেছে অস্বস্তি। কারণ বহুদিনের চেনা মনে হলেও তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কখনও মনে হয়েছে এ রেকর্ড খাসিয়াদের গান, কখনও ব্রহ্মপুত্রের গর্জন, নাগাদের ঢাকের শব্দ আর বন্য হাতির হুংকার মিশে গেছে সেই গানে। রেকর্ড বক্তার মনে এনেছে বিয়াল্লিশের আন্দোলনকালের সাঁওতালদের টিকারার শব্দ-স্মৃতি। করুণার গান-জানা বান্ধবী আইভিও ঠিক করে বলতে পারে না রেকর্ডের পরিচয়।

সবশেষে এসেছে গল্পের চরমক্ষণ, নাটকের ক্লাইম্যাক্স। এক ভূপর্যটক জানিয়েছেন ইউরোপের এক ছোট্ট রাষ্ট্রের মুক্তি-সংগীত এই রেকর্ড। নাৎসি অধিকারের সময় প্রাণ গেছে এর প্রতি শিল্পীর। নষ্ট করা হয়েছে রেকর্ডের সমস্ত কপি।

মুক্তিযোদ্ধাদের এই গান এবং তার পরিণতি শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে তুলেছে শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাব। হঠাৎ রাস্তায় ছাত্রমিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার শব্দ মিশে গেছে রেকর্ডের সংগীতের সঙ্গে। ব্রহ্মপুত্রের গর্জন, নাগাদের ঢাক, সাঁওতালদের টিকারা, বন্যহাতির হুংকার—সব কিছুর মধ্যে রয়েছে বন্ধনের বিরুদ্ধে শাশ্বত প্রতিবাদ। এ সুর আছে সব মানুষের রক্তে। দেশে, দেশে, কালে, কালে বয়ে গেছে এই প্রতিবাদের সুর।

গল্প শেষ হয়েছে করুণার কথায়—"এ রেকর্ডকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না। তাই দূর ইউরোপের থেকে এ সুর ভেসে এসেছে বাংলার শহরে।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দু-একটি অম্লান হাসির বয়স্কপাঠ্য গল্প লিখেছেন তপন নামের চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। বিশেষত কিশোর সাহিত্যে তিনি নতুন করে এনেছেন গ্লানিহীন মুক্ত হাসির অবাধ উল্লাস। পটলডাঙার টেনিদা আর তার তিন সাগরেদ পেটরোগা প্যালা, ঢাকাই বাঙাল হাবুল, আর বুদ্ধিমান ফ্যাবলা সেই সব আখ্যানের প্রধান চরিত্র।

টেনিদার প্রতাপে আর গুলগপ্পে তিনজনেই মুগ্ধ। টেনিদা স্কুলের ক্লাস টেনে 'অনড়' হয়ে আছে বহু দিন ধরে। তা মতে ক্লাসে দু-একটা পুরোনো ছেলে থাকা ভালো, নইলে নতুন ছেলেদের ম্যানেজ করবে কে? টেনিদা উল্লসিত হলে বলে 'ডিলা গ্রাণ্ডি মেফিস্টোফেলিস ইয়াক ইয়াক।' বিরক্ত হলে তার সংলাপ 'ফের কুরুবকের মতো বক বক করবি তো এক চড়ে কান কানপুরে পাঠিয়ে দেবো।' কখনও টেনিদা ঢাউস ঘুড়ির সঙ্গে উড়ে যায় ('ঢাউস') কখনও পাল্লা দেয় ইয়েতির সঙ্গে। তার মতে কাকেরা খুব ভালো, কারণ তারাই টেনিদাকে পিসিমার ভয়ংকর তিলের নাড়ু থেকে রক্ষা করেছিল পিসেমশাইয়ের টাকে ওই নাড়ু ফেলে দিয়ে। টক আমের গুণে যে বেতো সাহেবের বাত সেরে যায় আর আমপ্রদাতা পেয়ে যায় চাকরি ('পেশোয়ার কি আমীর')—এ তথ্য টেনিদা ভিন্ন বাঙালি আর কার কাছেই বা জানত?

এই চারমূর্তির কাহিনি ছাড়াও কিশোরদের জন্য আরও আশ্চর্য সুন্দর কৌতুক গল্প লিখে গেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'ঘোড়ামামার পাল্লায়' গল্পটির কথা আমরা মনে করতে পারি। ঘোড়ামামা রোজ চান করেন না কারণ, যেমন গামছা সাত দিন জলে ভিজলে পচে যায় তেমন রোজ চান করলে শরীরও পচে যায়। এই ঘোড়ামামার পাল্লায় পড়া গল্পবক্তা কিশোরের দুর্গতি পাঠক-মনে যে স্নিগ্ধ হাসির অনুভব জাগায় বাংলা কিশোরসাহিত্যে তা খুব সুলভ নয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ গল্পই উত্তমপুরুষে উপস্থাপিত। এ ছাড়া শোনা গল্প, পত্রগল্প, প্রথমপুরুষে রচিত গল্প তাঁর গল্পের আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের নিদর্শন। 'দ্বৈত' গল্পটি রচিত হয়েছে টেলিফোন-মাধ্যমে।

প্রথম দিকের কিছু গল্পে সাধুভাষা ব্যবহার করলেও তাঁর অধিকাংশ গল্প কলকাতার কথ্য ভাষায় লেখা। বিষয় অনুযায়ী ভাষা নির্মাণে নিপুণ ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ আর বাগ্‌ভঙ্গিমা দিয়েই তিনি বর্ণনাকে করে তুলেছেন বাস্তব। ব্যবহার-কৌশলে এই ভাষাতেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে পরিবেশ। কোনো কোনো গল্পে তাঁর ভাষা কাব্যমাধুর্যে মণ্ডিত কখনও কঠিন বাস্তব প্রকাশের প্রয়োজনে কঠোর।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেননি নিজেকে। মানুষের প্রতি, মানবিকতার প্রতি তাঁর প্রীতি আর শ্রদ্ধা নানাভাবে তাঁর গল্প-মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। অনুভবের অকৃত্রিম প্রকাশে আর গ্রন্থনৈপুণ্যে তাঁর ছোটোগল্পগুলি হয়ে উঠেছে হীরকের মতোই দ্যুতিময় অথচ প্রাণস্পর্শী।

৫.৮ সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)

পৈতৃক নিবাস পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ সাব ডিভিশনের বালিগঞ্জ থানার বালিয়া গ্রামে। সোমেন চন্দের জন্ম মাতুলালয় আশুলিয়ায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১০ জ্যৈষ্ঠ। মা হিরণবালা। সোমেন চার বছর বয়সে মাকে হারান। পিতা নরেন্দ্রকুমার দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন সরযূকে। বিমাতা সোমেনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পিতা প্রথম জীবনে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। পরে বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কাজ তাঁর মনে দ্বিধা জাগায় এবং তিনি ধীরে ধীরে এই দল থেকে সরে আসেন। অত্যন্ত সৎ ছিলেন। ফলে পরিবারে দেশপ্রেমের একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পৃথিবীর ইতিহাস, বিপ্লবী নায়কদের কথা বাবার কাছ থেকে শুনতেন তিনি। তারই সঙ্গে গানের প্রতি আকর্ষণ ছিল। অর্থাৎ নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরের পরিবার হলেও তাঁর পরিমণ্ডলে একটি সাংস্কৃতিক আবহ ছিল।

শৈশব থেকেই পাঠে আগ্রহ ছিল তাঁর। জ্যাঠতুতো দিদি সংযুক্তার গৃহশিক্ষক অশ্বিনীকুমার দত্তের নিকটে তাঁর পাঠ শুরু হয়। পরে তিনি ঢাকার পেগোজ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৬-এ প্রথম বিভাগ থেকে এগারো নম্বর কম পেয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেন সোমেন। এবং ঘটনাচক্র তাঁকে ডাক্তারিতে পড়ার সুযোগ

করে দেয়। সম্ভবত ধনী সহপাঠীদের আচরণ এবং সাহিত্য-সাধনার আকর্ষণে তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেন। এখানেই তাঁর বিধিবদ্ধ পড়াশোনার ইতি।

ইতিমধ্যে তাঁর বাবা বাসা বদলে চলে এসেছেন দক্ষিণ মৈশুন্ডিতে। এখানে এককালের সশস্ত্র বিপ্লবী পরবর্তীকালে সাম্যবাদে বিশ্বাসী কিছু মানুষ গড়ে তুলেছিলেন 'প্রগতি পাঠাগার'। সময়টি ছিল ১৯৩৮। আন্দামান ফেরত বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী, ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী, সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ এটি চালাতেন। সোমেনের মধ্যে রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ ছিল। 'প্রগতি পাঠাগার'-এর আবহে তা সঞ্জীবিত হয়েছিল। তার আগেই অবশ্য তিনি লেখা শুরু করেছেন এবং সতেরো বছর বয়সে ১৯৩৭-এর 'দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে তাঁর গল্প 'শিশু তপন'। এছাড়া তিনি লিখেছেন 'ভালো না লাগার শেষ' আর 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন' ('সাপ্তাহিক অগ্রগতি', ১৯৩৭)। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮-এ সময়টিতে ইউরোপে নানা রাজনৈতিক ঘটনা ঘটছিল। সোমেন সেগুলিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। ১৯২৯-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ফ্যাসিবাদের চরিত্র এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি গৃহীত হয়েছিল। কারণ তার আগেই ইতালিতে মুসোলিনি ক্ষমতা অধিকার করেছে। ১৯২৭-এ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'মুক্তচেতনার প্রতি আবেদন'-এ স্বাক্ষর করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৭-এ লখনউতে স্থাপিত হয় 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ'। এবছরই স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ করেন। গণতান্ত্রিক সরকারকে সাহায্য করার জন্য গঠিত হয় আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। তাতে যোগ দিয়েছিলেন বহু লেখক-সাহিত্যিক। ১৯৩৭-এর ২১ সেপ্টেম্বর জাপান আক্রমণ করে চিন। ১৯৩৮-এ হিটলার অস্ট্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে। ইউরোপের অন্যান্য শক্তি এ অন্যায় নীরবে মেনে নিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে সোমেন নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিলেন সাহিত্য ও রাজনীতি সাধনার জন্য। তিনি পড়ছিলেন টি. এস. এলিয়ট, অডেন, স্টিফেন স্পেন্ডার—এইসব কবির রচনা, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, অলডাস হাক্সলি, ই. এম. ফরস্টার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ম্যাক্সিম গোর্কি, মিখাইল শলোখভ, আঁদ্রে জিদ, টমাস মান, আপটন সিনক্লেয়ার, পার্ল বাক প্রমুখ ঔপন্যাসিকের রচনা। শুধু পড়ছিলেন না, নিজস্ব নোটবুকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি লিখে রাখতেন। তাঁর এসব গ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বসমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং লেখক হিসেবে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। রালফ ফক্স-এর 'নভেল অ্যান্ড দি পিপল' আর ক্রিস্টোফার কডওয়েল-এর 'ইলিউশন অ্যান্ড রিয়েলিটি' সোমেন চন্দ পড়েছিলেন। মার্কসবাদ সম্পর্কেও ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে গভীরভাবে পড়াশোনা করেছিলেন। ঢাকার কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে তিনি ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয়েছিলেন। ফলে মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর আস্থাও দৃঢ় হয়েছিল। এছাড়া তিনি নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি এবং ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কেও পড়াশোনা করেছিলেন। একই সঙ্গে চলছিল তাঁর সাহিত্যসাধনা। ১৯৩৭-৩৮-এর মধ্যে তাঁর এগারোটি ছোটোগল্প 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা', 'অগ্রগতি', 'সবুজ বাংলার কথা' প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯৩৮-এর শারদীয় 'নবশক্তি'তে মুদ্রিত হয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস। এটি পাওয়া যায়নি।

সোমেনের ক্লান্তিহীন শ্রমের ক্ষমতা, সাংগঠনিক শক্তি, মানুষকে আকর্ষণ করার শক্তি ক্রমে তাঁকে কমিউনিস্ট দলের কাছের মানুষ করে তোলে। ১৯৩৭-এ তিনি কমিউনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৮-এ তিনি 'প্রগতি পাঠাগার'-এর সম্পাদক হন। ঢাকার লেখকদের নিয়ে গঠিত 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর (১৯৩৯) অন্যতম সংগঠক ছিলেন সোমেন। ১৯৪১-এ তিনি ঢাকার ই. বি. আর. রেলওয়ে শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এবং অচিরে ঢাকার ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর সম্পাদক হন। ২২ জুন, ১৯৩৯-এ হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১-এ হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে। এতদিন কমিউনিস্ট দল ছিল ইংরেজের বিপক্ষে। কিন্তু সোভিয়েট ভূমি আক্রান্ত হওয়ার পর তারা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। ২১ জুলাই ১৯৪১-এ কলকাতায় গড়ে ওঠে 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'। ওই বছরেই ঢাকায় স্থাপিত

হয় এই দলের শাখা। এই সময় কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে আর. এস. পি., ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী দলগুলির বিরোধ বাধে। এরা কমিউনিস্টদের ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক বলে মনে করত। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২-এর ৮ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন। বিকেল তিনটে নাগাদ এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য রেলওয়ে শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল করে আসছিলেন সোমেন চন্দ। মিছিলের সামনে ছিলেন সোমেন। একরামপুরের কাছে উগ্র জাতীয়তাবাদী দলের কিছু মানুষ সশস্ত্র আক্রমণ চালায় মিছিলের উপর। তাদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন সোমেন চন্দ। অকালে শেষ হয়ে যায় একটি সম্ভাবনাপূর্ণ সাহিত্যপ্রতিভা। দলমতনির্বিশেষে বাংলার সব লেখক নিন্দা করেন এই হত্যার। প্রায় বাইশ বছরের জীবনে সোমেন লিখেছিলেন চব্বিশটি ছোটোগল্প, দুটি উপন্যাস ('বন্যা' ও একটি পাওয়া যায়নি), দুটি নাটিকা এবং একটি কবিতা।

গ্রন্থতালিকা : সোমেন চন্দের জীবৎকালে মুদ্রিত হয়নি তাঁর কোনো গল্প-সংকলন। তাঁর মৃত্যুর পর ডিসেম্বর ১৯৪২-এ ঢাকার প্রতিরোধ পাবলিশার্স প্রকাশ করে 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' নামে একটি সংকলন। ছটি গল্প ছিল এ সংকলনে। ১৯৪৫-এ কলকাতার মডার্ন পাবলিশার্স প্রকাশ করে সোমেন চন্দের এগারোটি গল্পের সংকলন 'বনস্পতি'।

সাহিত্য সম্পর্কে সোমেন চন্দের ধারণা সম্পর্কে আমরা একটি পত্রাংশ উদ্ধার করতে পারি। পত্রটি বন্ধু অমৃত দত্তকে লেখা (সম্ভবত ১৯৪০-৪১-এ) একটি চিঠির কিছু অংশ। ''গত কয়েকদিন রেল-শ্রমিকদের নিয়ে বেশ ঝামেলায় ছিলাম। লেখার জন্য একটুও সময় পাই না। তবু লিখতে হবে, মেহনতী মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য, আমাদের লিখতে হবে। র‍্যালফ ফক্স-এর বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই অনুপ্রেরণা না হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়?'' তবু কিন্তু তাঁর রচনা কখনও প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি। কারণ তাঁর সাহিত্যস্রষ্টা মনটি ছিল অতি সতর্ক এবং বিচক্ষণ।

তাঁর গল্পগুলিকে দুটি সময়পর্বে ভাগ করা যায় ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৯-১৯৪১। প্রথমপর্বের গল্পের মধ্যে আছে 'শিশু তপন', 'ভালো না লাগার শেষ', 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন', (তিনটি গল্পই ১৯৩৭-এ লেখা) ১৯৩৮-এ মুদ্রিত হয় তাঁর 'স্বপ্ন', 'সংকেত', 'মুখোশ', 'অমিল', 'রাণু ও স্যার বিজয়শঙ্কর', 'এক্স সোলজার', 'পথবর্তী' ও 'সত্যবতীর বিদায়'। 'মুখোশ' গল্পটি মুদ্রিত হয় সাপ্তাহিক 'নবশক্তি'-তে। কিন্তু গল্পটি পাওয়া যায় নি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে সোমেন কমিউনিস্ট দলের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ সময়ের লেখা গল্পগুলিতে রয়েছে তার চিহ্ন। 'সিগারেট' (১৯৩৯), 'একটি রাত', 'বনস্পতি' (১ম প্রকাশ 'ক্রান্তি' সংকলন : ১৯৪০)। 'মহাপ্রয়াণ' (১৯৪০), 'দাঙ্গা' (১৯৪২), 'ইঁদুর' (১৯৪২)।

গল্প-বিশেষত্ব : চল্লিশের দশকের সমাজতন্ত্রবাদীগণ সাহিত্যকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সোমেন চন্দের গল্প-বিশেষত্ব আলোচনায় তা জেনে নেওয়া দরকার। কারণ সোমেন অনেকটা সেই সাহিত্যদৃষ্টি মনে রেখেই গল্প-রচনা করেছিলেন।

সমাজতন্ত্র সাহিত্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। কারণ সাহিত্যের জনসংযোগের বিশাল সম্ভাবনা কোনো সময়ে উপেক্ষা করা যায় না। তবে তাঁরা চাইতেন সাহিত্যে থাকবে নতুন যুগের বার্তা, নিপীড়িতের উত্থান, প্রতিবাদ, লড়াই আর জয়ের কাহিনি। কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা যায়নি এই প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারণাটিকে। কারণ প্রতি স্রষ্টাই নিজের মতো করে সাহিত্যে ব্যবহার করেছিলেন এই ধারণা। নতুবা সাহিত্য হয়ে উঠতে পারত কৃত্রিম শিল্পগুণশূন্য, প্রচারমাত্র।

সাহিত্য সৃষ্টি করতে চায়। সেজন্য স্রষ্টার স্বাধীনতা কিছুটা দরকার। সমাজচেতনার সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভবের সুমিত অন্বয় ভিন্ন সার্থক সাহিত্য রচিত হতে পারে না।

সোমেন চন্দের পাঠপরিধির বিস্তৃতির কথা আমরা আগেই বলেছি। তা থেকে বোঝা যায় দোষগুণ-আদর্শ-শ্রেণি-বিশ্বাস সব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষের চিত্র উপস্থাপিত করে সাহিত্য—এসত্য তিনি জেনেছিলেন। রচনারীতিতে স্রষ্টার বিশেষ মনোভাবের পড়তে পারে। কিন্তু তা কখনই সাহিত্যকে ছাপিয়ে উঠবে না—বিশ্বাস করতেন সোমেন।

সাহিত্যের শিল্পগুণ সম্পর্কে সোমেন চন্দ সব সময় সচেতন ছিলেন।

মানবতাধর্মী শুদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদী সাহিত্যিকদের অসহিষ্ণু সমালোচনার উত্তরে তাঁর অভিমত ছিল যথার্থ রচনা দ্বারা প্রগতিসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। তাঁর গল্পে রাজনীতি এসেছে কিন্তু কখনই তা গল্পের নিজস্ব দাবিকে ছাপিয়ে ওঠেনি। ফলে তাঁর গল্প প্রচারধর্মী নয়। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা এসেছে তাঁর গল্পে। তা এসেছে চরিত্র-ঘটনা এবং পরিবেশের সুষম অন্বয়ে। কখনই তা রচনার শিল্পগুণকে বিঘ্নিত করেনি।

তাঁর গল্পের উপস্থাপনায় আছে বিবৃতিধর্মিতা। নির্মাণকৌশল গল্পনির্ভর তবে ঘটনাপ্রধান নয়। কিছু পরিমাণে পরিবেশনির্ভরতা তাঁর গল্পের লক্ষণ। 'শিশুতপন', 'ভালো না-লাগার শেষ', 'এক্স-সোলজার', 'ইঁদুর'—এই চারটি গল্পে তিনি ব্যবহার করেছেন উত্তমপুরুষের উপস্থাপন-পদ্ধতি। অন্যান্য গল্পের আশ্রয় বিবৃতিমূলক পদ্ধতি। তবে গল্পের চরিত্র ও ঘটনা সম্বন্ধে স্রষ্টার যে সহানুভূতি ও একটি আসক্তিহীনতার দূরত্ব থাকা প্রয়োজন; তা সোমেন চন্দের ছিল।

তাঁর অনেক গল্পেই আপন জীবনের ছাপ পড়েছে। বিশেষত 'একটি রাত' ও 'ইঁদুর' গল্প দুটির নায়ক সুকুমার যে স্বয়ং লেখকের প্রতিরূপ—সচেতন পাঠক তা সহজেই বুঝতে পারেন।

তিনি প্রথম দিকের গল্পেই ব্যবহার করেছেন সাধু গদ্য পরে তাঁর গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে সরল চলিত গদ্য। আছে চরিত্রের উপযুক্ত সংলাপ। দুটি উদাহরণ দেওয়া হল।

প্রথমটিতে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ইংরেজি শব্দবহুল বাক্যরীতি, অতীত সম্পর্কে গর্ব এবং স্বপরিবারজনিত অহংকার সংলাপকে করেছে সহজ এবং স্বাভাবিক—

"পৃথিবীতে যত গ্রেট মেন দেখতে পাচ্ছো, সকলের ভোরে ওঠবার অভ্যেস ছিল। আমার বাবা, মানে তোমার ঠাকুরদার এমনি অভ্যেস ছিল। আমরা যত ভোরেই উঠি না কেন, উঠেই শুনতে পেতাম বাইরের ঘরে তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে।" এটি 'ইঁদুর' গল্পে সুকুমারের পিতার সংলাপ। রচনাকাল ১৯৪২।

দ্বিতীয় সংলাপ প্রৌঢ়া, বিধবা স্বল্পশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলা সত্যবতীর, গল্পের নাম 'সত্যবতীর বিদায়' রচনাকাল ১৯৩৮, "আ-মর মাগি, ছুঁয়ে দিলি যে? কেন ছুঁয়ে দিলি বল্? ও মা গো, আমায় ছুঁয়ে দিলে গো। আমি এইমাত্র চান করে এলাম, আর অমনি ঝি-মাগি—আমায় ছুঁয়ে দিলে..."

এরপর আমরা সোমেন চন্দের দু-একটি গল্প বিশ্লেষণ করে তাঁর লেখকসত্তাটিকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথম গল্প 'শিশু তপন'-এর নায়ক একটি মাতৃহীন বালক তপন। কামাখ্যায় বেড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় পাণ্ডার মেয়ে বাসন্তীর। তাকে নিয়ে সে বেড়াতে যায়। পাহাড়ের গায়ে তাকে দাঁড় করিয়ে ফটো তোলার চেষ্টা করে সে আর একটু পিছিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। পিছনে যে অতলান্ত খাদ—তা দুই বালক-বালিকার মনে ছিল না। ফলে বাসন্তী খাদে পড়ে মারা গেল। শোকে আচ্ছন্ন হয় তপন। এখানেই গল্পটি শেষ। বিবরণভঙ্গির পরিবর্তে কথনরীতি গ্রহণ করায় গল্পটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে স্রষ্টার নৈর্ব্যক্তিকতার আভাসে।

'ভালো না-লাগার শেষ' মধুর প্রেমের গল্প। শিক্ষিত কর্মরত আধুনিক দুটি নরনারী বিবাহ করেছিল। কিন্তু শর্ত ছিল কেউ কারও উপর জোর করবে না। শেষপর্যন্ত মেয়েটি বিরহ সহ্য করতে না পেরে গর্ব দূরে ফেলে নিজে এসে মিলিত হয় স্বামীর সঙ্গে। সুন্দর একটি প্রেমের গল্প—"এখানে এই খোলা মাঠে, নরম ঘাসে গাছের ছায়ায়, আকাশের নিচে বসলে পর চোখে কেমন নেশা লাগে, হাত দুটি যেন কাকে হাতড়ায়।"

'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন' গল্পে পুরুষের আধিপত্যপ্রিয়তা তীব্রভাবে প্রকাশিত। তার সঙ্গে স্ত্রীর উপার্জনে জীবন কাটানোর জন্য এক ধরনের গোপন হীনমন্যতা আছে নায়ক শ্রীবিলাসের অবচেতনে। তাই সে তার ক্রোধ, স্বার্থপরতা আর ভোগবাসনা চাপিয়ে দেয় স্ত্রীর উপরে। স্ত্রী বিন্দু সারাদিন ধনী-গৃহে দাসীর কাজ করে। ফিরে এসে তাকে মেটাতে হয় স্বামীর দাবি। খুব নিপুণভাবে সোমেন সমাজে নারীর অধিকারহীন অসহায়তার দিকটি রূপায়িত করেছেন। বিন্দুর প্রশ্ন 'মেয়েমানুষের ঘুমে চোখ টাটায় না ঘুম বুঝি শুধু পুরুষের।'' অক্ষম শ্রীবিলাস অনিচ্ছুক স্ত্রীকে বাধ্য করে তার কামনা মেটাতে। এভাবেই তার অহং তৃপ্ত হয়। তার ভোরে ওঠা না-দেখা সূর্যকে প্রণাম আর পরলোক সম্বন্ধীয় গানের মধ্যে তার সে তৃপ্তি প্রকাশিত।

মনোগহনের জটিলতার সঙ্গে কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস কেমন করে মানুষকে ধ্বংস করে 'স্বপ্ন' তারই সার্থক শিল্পরূপ। তারই সঙ্গে বাস্তবচিত্রের নির্মমতা মিশে গেছে। গাঁয়ের ছেলে শঙ্কর তামাকের আড্ডায় শুনেছিল স্বপ্নে নৌকা দর্শন বিশেষত নৌকায় আরোহণ আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়। কথাটি তার মনকে বিদ্ধ করে। সে মরতে চায় না; প্রবলভাবে বাঁচতে চায়। গাঁয়ে তখন লেগেছে কলেরার মড়ক। এ অবস্থায় খালি পেটে থাকা অনুচিত—এরকমই শোনা ছিল তার। ফলে সে নিয়ম না মেনে যা খুশি তাই খেতে শুরু করে। এর মধ্যে সে স্বপ্নে দেখে কয়েকজন সবল মাঝি তাকে জোর করে তুলে নিয়েছে নৌকায়। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন শঙ্কর ধরে নেয় তার মৃত্যু নিশ্চিত। স্ত্রীর বিস্ময় উপেক্ষা করে সে নিজের ইচ্ছামতো খেয়ে যায়। হাটের দিন প্রচুর তেলেভাজা, জিলাপি খেয়ে সিগারেট টানতে টানতে ঘরে ফেরে শঙ্কর। এই যথেচ্ছাচারের পরিণামে সেই রাতেই মারা যায় সে। শেষ সময়ে সে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করে নৌকার স্বপ্নকে। জীবনতৃষ্ণার প্রবলতা, মৃত্যুর অনিবার্যতা এবং মানুষের সহায়হীনতা গল্পটিতে সঠিকভাবে সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন লেখক।

১৯৩৮-এ লেখা গল্পগুলির মধ্যে 'অমিল' আর 'রাণু ও স্যার বিজয়শঙ্কর' গল্প দুটিতে—সাম্যবাদী মানসিকতা এবং সামাজিক শ্রেণিভেদ চিত্রিত হয়েছে। 'অমিল' গল্পের গঠন বেশ সরল। সুন্দরী অথচ দরিদ্র সহপাঠিনী ভারতীকে ধনীকন্যা রেখা অভিনয়ের প্রয়োজনে দিয়েছিল শাড়ি ও স্বর্ণালঙ্কার। অভিনয় শেষেই সে ফিরে নিতে চায়নি ওগুলি। কিন্তু পরদিন ফেরত নেওয়ার সময় একটি হার না পেয়ে সে অন্য মেয়েদের সামনেই বন্ধুকে চোর বলে আপন বিশ্বাস প্রকাশ করে। পরদিন সে নিজের ঘরেই হার ফিরে পায়। কিন্তু ততক্ষণে ভারতী সচেতন হয়েছে নিজের অবস্থান সম্পর্কে। ফলে ভেঙে যায় দুজনের সম্পর্ক।

'রাণু ও স্যার বিজয়শঙ্কর' গল্পটি কিন্তু এমন সরল নয়। পার্কে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়ে রাণুকে সস্নেহে নিজের ঘরে এনেছিলেন ধনী অথচ সুখহীন স্যার বিজয়শঙ্কর। রাণুর মুখে তিনি শোনেন তার বাবা বলেন 'বড়লোকেরা দস্যি, ডাকাত অন্যের সর্বস্ব লুঠ করে নেয়।' তখন তিনি ক্রুদ্ধ হন। তাঁর ক্রোধের উত্তাপে অসহায় মেয়েটি তাঁর বাড়ি ছেড়ে নেমে যায় পথে। তাকে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর রাতের স্বপ্নে বার বার দেখা দেয় এই সরল বালিকা। স্যার বিজয়শঙ্কর শোষক-শ্রেণির প্রতিভূ, কিন্তু মানবতা মুছে যায়নি তাঁর মন থেকে। কোনো মানুষ যে নিছক মন্দ বা কেবল ভালো হয় না—ভালো-মন্দ মিশে গড়ে ওঠে মানুষের সত্তা—এই সত্যটি জানতেন সোমেন। এই গল্প তার প্রমাণ। এ ধারার শ্রেষ্ঠ গল্প 'সংকেত'। শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ না করেই লেখক সংগ্রামী মানুষের চেতনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন গল্পটিতে।

মালিকের শোষণের প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছে কাপড়ের কলের শ্রমিকগণ। তাদের ধর্মঘট ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলের ম্যানেজার দালাল বাচ্চা মৌলবির সহায়তায় গাঁ থেকে কর্মহীন চাষিদের নিয়ে যায় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে। এদের একজন রহমান। সে ঘরে ফেলে এসেছে নতুন বউকে। চোখে তার আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপ্ন। কিন্তু মিলের সামনে এসে তারা সম্মুখীন হয় শ্রমিকদের। তাদের নেতার বক্তৃতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাস্তব। শ্রমিকদের অহিংস প্রতিরোধ চূর্ণ করে দেয় পুলিশ। কিছু কৃষক যোগ দেয় তাদের দলে। কিন্তু রহমান ফিরে যায়।

যে নদীপথে তারা এসেছিল সেই নদীর দিকে চেয়ে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিতে তার চোখে আসে জল। অত্যাচারিত শোষিত শ্রমিকদের প্রতি সমবেদনা তার অশ্রুর কারণ। সকল শোষিতের সব নিপীড়িত শ্রমিকের অবস্থানগত ঐক্যের সংকেত রয়েছে এই চোখের জলে। গল্পের নামে রয়েছে সেই ভাবের ব্যঞ্জনা। একটি নির্দিষ্ট মতবাদকে শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত করার কঠিন কর্মে সফল হয়েছেন সোমেন, গল্পটি তারই নিদর্শন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধকালীন অবস্থার ব্যবহার করে ভারতীয়রা বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে—এমন আশঙ্কা ছিল ব্রিটিশ শাসকের। তাই তারা নানাভাবে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির চেষ্টা করত। তাদের সেই চেষ্টার একটি ফল ১৯৪০-৪১-এ অনুষ্ঠিত ঢাকার দাঙ্গা। কমিউনিস্ট কর্মীগণ প্রথম থেকেই দাঙ্গার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিল। গল্পের নায়ক অলোক এমনই এক কমিউনিস্ট কর্মী। সে তার সাম্প্রদায়িকতায় উন্মত্ত হিন্দু সোসালিস্ট ভাই অজয়কে বোঝাতে চায় এই দাঙ্গার অমানবিক দিকটি। কিন্তু সে বুঝতে চায় না। বরং পুড়িয়ে ফেলে কমিউনিস্ট দলের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সংক্রান্ত ইস্তাহারগুলি। রাজনৈতিক আদর্শবাদ আর এর উন্মত্ত প্রয়োগ কেমন করে নষ্ট করে দেয় মানুষের সাধারণ শুভবোধ—অজয় তারই দৃষ্টান্ত। গল্পটি রাজনৈতিক গল্প হিসেবে সার্থক এবং এখনও সমভাবে সত্য।

গল্পটির সমাপ্তিতে রয়েছে মানবিক অনুভব। পথে বের হয়ে অশোক দেখতে পায় তখনও না শুকোনো কাঁচা রক্ত। তার মনে হয় "কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে?" তার কাছে এ রক্ত কোনো শ্রেণিভুক্ত মানুষের নয়—কেবল অসহায় মানুষের নিরুপায় মৃত্যুর বাহক এই রক্তের দাগ।

নিরাসক্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পটিতে দাঙ্গার ভীষণতা বাস্তব করে তুলেছেন সোমেন—"সব শূন্য, মরুভূমির মতো শূন্য, দূরে পিচঢালা পথের ওপর দিয়ে মাঝে-মাঝে দু-একটা সুদৃশ্য মোটরকার হুস্ করে চলে যায় বটে, কিন্তু এত তীব্রবেগে যায় যে মনে হয় যেন এইমাত্র কেউ তাকেও ছুরি মেরেছে, আর সেই ছোরার ক্ষত হাত দিয়ে চেপে ধরে পাগলের মতো ছুটে চলেছে।" এ গল্পটি সোমেনের মৃত্যুর পর মুদ্রিত হয় ঢাকার 'প্রতিরোধ' পত্রিকায়। এটি বাংলায় লিখিত প্রথম দাঙ্গাভিত্তিক গল্প।

সোমেন চন্দের সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প 'ইঁদুর'। তাঁর মৃত্যুর পর 'পরিচয়' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অশোক মিত্র। ভারতের নানা প্রদেশে গল্পটি প্রচারিত হয়েছে।

'ইঁদুর' গল্পের ইঁদুরগুলি হয়ে উঠেছে একাধিক মনোভাবের প্রতীক। সব মিলিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণির আত্মবিরোধ, আত্মপ্রতারণা এবং অন্যান্য ক্ষয়প্রবণ দিকগুলির প্রতীক ইঁদুর। মধ্যবিত্ত সমাজ এদের ভয় পায় কিন্তু নির্মূল করতে সমর্থ হয় না। কারণ তারা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শিকার। এই ব্যবস্থা চূর্ণ না হলে আসবে না কোনো পরিবর্তন। গল্পটি নায়ক সুকুমারের জবানিতে উপস্থাপিত। নিম্নমধ্যবিত্ত একটি পরিবার ইঁদুরের উপদ্রবে সন্ত্রস্ত। সামান্য তাদের চাহিদা, কিছু বাড়তি পয়সা। সেই অর্থ দিয়ে তারা সব দুঃখ মেটানোর চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তাদের কষ্টে সংগৃহীত দুধ ফেলে দেয় ইঁদুরবাহিনী। পরিণামে পরিবারকর্তা নায়ক সুকুমারের পিতা কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করেন পত্নীকে। অথচ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার অভাব নেই তাঁর মনে। খুব সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে এই নিরুপায় প্রেমকে রূপ দিয়েছেন সোমেন কয়েকটি ছত্রে। সুকুমার মাঝরাতে শোনে বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে। তার "ভারি চমৎকার মনে হল, মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম, আর আমার প্রতি ভালোবাসা কামনা করতে লাগলুম।"

সুকুমার এই কঠিন তিক্ত বৃত্ত ভাঙার স্বপ্ন দেখে। সে রেলশ্রমিক সংগঠনের সক্রিয় সংগঠক। শ্রমিকদের মধ্যে সে নবযুগের কর্মী-মানুষের রূপ দেখেছে। গল্পের শেষে দেখি রেল ইঞ্জিনের সারির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সুকুমার রোমাঞ্চিত হয়। তার কয়েকদিন পরে দেখা যায় ইঁদুর মারা কল কেনা হয়েছে আর কলে বন্দি ইঁদুরগুলিকে মারবার জন্য ছেলেরা উৎসুক।

সোমেন বলতে চেয়েছেন নতুন যন্ত্রযুগের মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ যন্ত্র আর কর্মের সমন্বয়ে হয়ে উঠবে বলশালী। আর তখনই দূর হয়ে যাবে ব্যক্তিজীবনের শান্তি আর সুখের সমস্ত বাধা।

সুকুমারের মধ্যে সোমেনের আত্মপ্রকাশ রয়েছে। কারণ তিনি নিজেও ঢাকার রেলশ্রমিকদের মধ্যে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন।

গল্পটিতে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব জীবন্ত রূপ অনায়াস দক্ষতায় অঙ্কিত হয়েছে। বিশেষ একটি মতবাদও গল্পের শরীরে গেছে অন্তর্গত প্রাণের মতোই। তবু বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্যপ্রবণ হয়ে ওঠেনি 'ইঁদুর'। এখানেই গল্পটির জোর। প্রসঙ্গত স্মরণীয় গল্পটি শুধু ইংরেজিতে নয়, পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ পাঠক তা পড়েছেন। একুশ-বাইশ বছরের এক তরুণের গল্পনির্মিতির দক্ষতা এর দ্বারা প্রমাণিত।

৫.৯ সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫)

১৯২০-র ৯ সেপ্টেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মহকুমা শহর রাজবাড়িতে মাতুলালয়ে সুরেশচন্দ্র-সরযূবালার দ্বিতীয় পুত্র সন্তোষকুমার ঘোষের জন্ম। মাতামহ রামচন্দ্র ধরের এবং পরে প্রতিবেশি সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনের প্রধানশিক্ষক ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্যের অভিভাবকত্বে এবং মায়ের স্নেহ-সতর্ক শাসনে তাঁর শৈশব কাটে। খেয়ালি বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ততটা গাঢ় ছিল না তাঁর।

শিক্ষা : সন্তোষকুমারের শিক্ষা শুরু হয় রাজবাড়ি শহরের সূর্যকুমার ইনসটিটিউশন-এ। ১৯৩৬-এ তিনি গোয়ালন্দ হাইস্কুল থেকে অঙ্কে ও বাংলায় 'লেটার' পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। এসময় তিনি এক গলির মধ্যে মা-বাবার সঙ্গে থাকতেন। তাঁর সাহিত্যে বারবার এসেছে এই গলি। ১৯৪০-এ রিপন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন সহ বি. এ. পাশ করেন তিনি। অর্থনীতিতে এম. এ. পড়া শুরু করেও আর্থিক কারণে তা অসমাপ্ত রেখে তিনি কেরানির চাকরি নিয়েছিলেন।

কর্মজীবন : মূলত সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর বৃত্তি। এ বৃত্তির শুরু 'প্রত্যহ' পত্রিকায়। এরপর 'জয়হিন্দ', 'মর্নিং নিউজ', 'নেশন' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৪২-এ তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগ দেন। পরে যোগ দেন 'স্টেটসম্যান'-এ। ১৯৫১-র ডিসেম্বর-এ তিনি 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'-এর চিফ সাব এডিটর হিসেবে দিল্লি যান। পরে তিনি এ পত্রিকার নিউজ এডিটর হয়েছিলেন। ১৯৫৮-তে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র জয়েন্ট নিউজ এডিটর হিসেবে। ১৯৬৪-তে তিনি হন এ পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক। ১৯৮৪-র অক্টোবরে অসুস্থতার পূর্বপর্যন্ত তিনি এ পদেই ছিলেন। এ বছর তিনি গলার ক্যানসারে আক্রান্ত হন। ১৯৮৫-র ২৬ ফ্রেব্রুয়ারি সে রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়। সাংবাদিকতাকে তিনি সাহিত্য করে তুলেছিলেন। কিন্তু এর ফলে তাঁর সাহিত্যচর্চা কিছুটা বাধা পেয়েছিল।

সাহিত্যজীবন : সন্তোষকুমারের পরিবারে কিছুটা সাহিত্যমনস্কতা ছিল। মা ভালো বাংলা জানতেন। বাবা নানা বৃত্তির মধ্যে 'কেশরী', 'বন্দে মাতরম'—পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছিলেন। মাতামহের বাড়িতে ছিল বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলি। স্কুলে ভালো ছাত্র হয়েও তিনি এসব বই পড়েছিলেন। স্থানীয় উডহেড পাবলিক লাইব্রেরি থেকে অন্যের কার্ড-এ বই এনে তিনি আধুনিক বাংলাসাহিত্য বিশেষত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল আর অন্নদাশঙ্করের লেখার সঙ্গে পরিচিত হন। এসময়েই স্কুলের এক প্রধান শিক্ষক তাঁকে ইংরেজি সাহিত্য বিশেষত শেক্সপিয়র-এর রচনার সম্পর্কে পাঠ দিয়েছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি বন্ধু জগৎ দাসের সঙ্গে গড়ে তোলেন 'মিলন সঙ্ঘ' নামে একটি সাহিত্য-সংঘ। এভাবেই কলকাতার সাহিত্য এবং সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

সন্তোষকুমারের সাহিত্যজীবন শুরু হয় কবিতা দিয়ে। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'পৃথিবী' নামের কবিতা, প্রকাশিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নবশক্তি' পত্রিকার ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ সংখ্যায়। দ্রুত কিন্তু তিনি কথাসাহিত্য রচনায় মনোযোগী হন। প্রথমে তিনি লিখতেন সাধুভাষায়। তাঁর প্রথম গল্প 'বিলাতি ডাক' বের হয় ১৯৩৮-এর মাঝামাঝি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। তখন তিনি কলেজের ছাত্র। এরপরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদসংখ্যা, 'দেশ', 'স্বদেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর গল্প বের হয়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় মুদ্রিত চলতি গদ্যে লেখা গল্প 'দক্ষিণের বারান্দা' থেকেই তাঁর গল্পে আধুনিকতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সন্তোষকুমার অসামান্য ধী ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর সমান দখল ছিল। দেশি-বিদেশি সব স্মরণীয় সাহিত্যিকদের রচনার মনোযোগী পাঠক ছিলেন। প্রিয় বিদেশি লেখক ছিলেন ডি. এইচ. লরেন্স, সমারসেট মম, জাঁ পল সার্ত্র, আলবেয়ার কামু, অলডাস হাক্সলি প্রমুখ। অসামান্য রবীন্দ্র-অনুরাগী এবং রবীন্দ্র-রচনার মনোযোগী পাঠক। কিন্তু তাঁর রচনায় ক্বচিৎ বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব পড়লেও রবীন্দ্র-প্রভাব একেবারেই নেই। বরং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাময় রচনা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠিন বাস্তবের রূপায়ণ আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃতি তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল প্রথম দিকে। তাঁর ভাষায় রবীন্দ্ররচনার পঙ্‌ক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার দেখা যায়। তবে শীঘ্রই তিনি নিজস্ব শৈলী খুঁজে নিয়েছিলেন।

ছোটোগল্প-সংকলন তালিকা : (১) 'ভগ্নাংশ', প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। যুগ্মপ্রকাশ বন্ধু জগৎ দাসের সঙ্গে। সাতটি গল্পের মধ্যে তিনটি সন্তোষকুমারের লেখা। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ তিনি নিজেই করেন। প্রকাশকাল ১৯৩৯; (২) 'শ্রেষ্ঠগল্প', ১৩৫৯; ১৯৫২; (৩) 'চীনেমাটি', ১৯৫৩; (৪) 'শুক-সারী', বইটি পাওয়া যায়নি। তাই প্রকাশকালও দেওয়া গেল না; (৫) 'পারাবত', ১৩৬০; ১৯৫৩; (৬) 'কড়ির ঝাঁপি', ১৩৬৩; ১৯৫৬; (৭) 'পরমায়ু', ১৩৬৪; ১৯৫৭; (৮) 'দুই কাননের পাখি', ১৩৬৬; ১৯৫৯; নামটিতে 'তুমি কোন কাননের ফুল' এই রবীন্দ্র-সংগীত পঙ্‌ক্তিটির ঈষৎ অনুরণন আছে যেন); (৯) 'চিররূপা', ১৩৬৬; ১৯৫৯; (১০) 'কুসুমের মাস', ১৩৬৬; ১৯৫৯; (১১) 'ছায়াহরিণ', ১৯৬১; (১২) 'বহে নদী', ১৩৭০; ১৯৬৩; (১৩) 'যুবকাল', ১৯৭৬; (১৪) 'সন্ধ্যা-সকাল', ১৯৭৯; (১৫) 'দুপুরের দিকে', ১৯৮০; (১৬) 'কুসুমাদপি', ১৯৮৪।

রচনা-বিশেষত্ব : চল্লিশের দশকের শেষদিকে সন্তোষকুমার ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ষোলো। এছাড়া বহু গল্প পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা আর ভগ্নবাস্তু মানুষের জীবনধারণের যন্ত্রণা তিনি দেখেছিলেন। মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই এসব তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। সমাজ আর ব্যক্তিজীবনের বিবিধ অবক্ষয়, মানবমনের জটিল গভীরতার রূপায়ণ তাঁর গল্পের মৌল লক্ষণ। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে জীবনকে দেখার মৌলিক দৃষ্টি ছিল তাঁর। হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের মিলনের জন্যই তাঁর গল্পে এসেছে দীন মানুষের জীবনযাপনের প্রাণান্তকর গ্লানির জীবন্ত চিত্র। তাঁর গল্পে ব্যঞ্জনার সঙ্গে প্রায়শ মিশেছে রূঢ় বাস্তব চিত্র। ব্যক্তিমানুষের নিজস্বতাকেই তিনি বড়ো করে দেখেছেন। সমাজ, রাজনীতি, সমকাল—সবই এসেছে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের প্রয়োজনে। অবশ্য অনেক সময় তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে প্রতীকী, মননশীলতার ঋদ্ধ। ফলে তিনি পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি।

তাঁর গল্পগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রতি ভাগের বিশেষত্ব সহ দু-একটি করে গল্পের উদাহরণ সন্তোষকুমারের গল্প সম্পর্কে ধারণাকে স্বচ্ছ করে দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সন্তোষকুমারের সব গল্পই নগরজীবনভিত্তিক।

প্রথম ভাগ : সূচনা থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত এসময়ের বিস্তৃতি। এসময়ের লেখা গল্পগুলির মাধ্যমে তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গল্পগুলিতে যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে বিধ্বস্ত মূল্যবোধ, পারস্পরিক প্রীতিহীনতা, বিকৃত জীবনবোধ—এসবের প্রাণময় সহৃদয় চিত্রণ লক্ষিত হয়।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা কেমন করে চিরাগত মূল্যবোধকে ভেঙে দেয় তারই চিত্র ‘কানাকড়ি’। সদাগরি অফিসের কর্মী মন্মথ স্ত্রী সাবিত্রী আর শিশুকন্যা মিলিকে নিয়ে আহিরিটোলার গলিতে ভাড়াবাড়িতে থাকে। তার পাশের ঘরে থাকে রূপসী অবিবাহিতা মল্লিকা। তার ঘরে বহু পুরুষের আসা-যাওয়া, পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে সে বেড়াতে যায়। মন্মথ-সাবিত্রী তাকে ঘৃণা করে এবং নিজেরা গর্ব করে ‘‘আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি।’’ ক্রমে মল্লিকার সঙ্গে সাবিত্রীর ঘনিষ্ঠতা হয়। তবে কিছুটা দূরত্ব রেখে চলে সাবিত্রী। হঠাৎ পরিস্থিতি বদলে যায়। মন্মথ ছাঁটাই হয়। সাবিত্রী মৃত সন্তান প্রসব করে বাপের বাড়ি থেকে ফেরে। শেষে আর্থিক দুর্গতি ঘোচানোর জন্য মল্লিকার কাছে যেতে বাধ্য হয় সাবিত্রী। উদ্দেশ্য যে সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব একদিন সে ফিরিয়ে দিয়েছিল তার ব্যবস্থা করা। মল্লিকা এইজন্য তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় শশাঙ্কের। শশাঙ্ক তাকে নিয়ে সিনেমা দেখে কিন্তু সাবিত্রী অভিনয়ের সুযোগ দেওয়ার কথা বললে শশাঙ্ক সম্মত হয় না। কারণ তার স্বাস্থ্যহীনতা। এদিকে বিফল সাবিত্রীকে তিরস্কার করে ক্রুদ্ধ মন্মথ। কারণ সে দেহকে মূলধন করে কাজ আদায় করতে পারেনি। অর্থনৈতিক কারণে কীভাবে মূল্যবোধ ভেঙে পড়ে গল্পটিতে রয়েছে তারই চিত্র।

‘দ্বিজ’ গল্পের পটভূমি দেশভাগ। এ গল্পে কিন্তু মানুষের নতুনভাবে বেঁচে ওঠার আশাময় ছবিই ফুটেছে। ব্রাহ্মণ সন্তান উপনয়নের পর দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে; তখন সে হয় ‘দ্বিজ’। এগল্পে ব্রাহ্মণ নিশিকান্ত চক্রবর্তী উদ্বাস্তু। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সে নিয়েছে বিড়ি বাঁধার কাজ। তারপর সহকর্মীদের সঙ্গে গড়ে তুলেছে একটি পানের দোকান। এতে তার লজ্জা নেই। কিন্তু তার স্ত্রী নয়নতারা উদ্বাস্তু ক্যাম্পের প্রতিবেশীদের জানিয়েছে সে ‘পান সাজনের মতো ছোটো কাম করে না, পরিচিত জনের পানের দোকান দেখাশোনা করে মাত্র।’ স্ত্রীর একথায় ক্ষুব্ধ হয় নিশিকান্ত। কারণ ‘‘আমারে পান-আলা কইয়া যত না অপমান করছে মন্মথ, পান সাজনেরে নিচা কাম কইয়া তার থিকা কম অপমান করলা না তুমি।’’

রবীন্দ্রনাথকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছিলেন সন্তোষকুমার। তাঁর সেই প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে কখনও গল্প-নামে কখনও গল্পপঙ্‌ক্তিতে। তার একটি উদাহরণ ‘কস্তুরীমৃগ’ গল্পটি। গল্পটির নামটি মনে করায় ‘‘পাগল হইয়া ফিরি বনে বনে আপন গন্ধে মম/কস্তুরীমৃগ সম/’’ এই রবীন্দ্ররচিত পঙ্‌ক্তি দুটি। বিধবা নির্মলা দাদার সংসারের গলগ্রহ; দোতলার ভাড়াটে অধ্যাপক অজয়ের মধ্যে পেয়েছিল সহানুভূতি। ক্রমে তা পারস্পরিক প্রেমে পরিণতি পায়। গোপন সেই প্রেম স্নিগ্ধ করেছিল নির্মলার জীবন। হঠাৎ সেরিব্রাল হেমারেজ হয়ে মারা যায় অজয়। নির্মলা দগ্ধ হয় শোকে। কিন্তু তার শোক প্রকাশ পায় না। গোপন রাখতে হয় শোক। শুধু মেঝের উপরে তার রান্না-শেষের উনুনের কয়লা দিয়ে সে লিখে যায় তার গোপন ব্যথা—‘‘......আমার অসহ সুখের ভারও তো একাই বহন করেছি। এই দুঃসহ দুঃখও না হয় আমার একার।......’’ তারপরে কারো চোখে পড়ার আগেই নিজে হাতে তাকে মুছে ফেলতে হয় সেই লিপি। এভাবেই নির্মলা একা হয়ে যায় যেমন গভীর অনুভবের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ একা।

‘কান্নার মানে’ গল্পেও আছে মনস্তত্ত্বের জটিল বিচিত্র প্রকাশ। একান্নবর্তী সংসারে বেকার প্রমথর বউ কুসুম। তাকেই করতে হয় সব কাজ। বাড়ির অন্য সবাই তার সঙ্গে কাজের লোকের মতোই ব্যবহার করে। একদিন বিহারের দিকে স্টিমার ডুবির খবর বের হয় কাগজে। ওই দিকেই চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল প্রথম। তার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে বাড়ির সবাই কুসুমের সঙ্গে অতি মমতাময় আচরণ করে তাকে কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হয়। তার জন্য আসে গ্লাস ভরা গরম দুধ।

গভীর রাতে ফিরে আসে প্রমথ। ডুবে সে গিয়েছিল। কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনো মতে সে বেঁচে ফিরেছে। প্রথমে বিহুল হয়ে যায় কুসুম। তারপর হঠাৎ সে নতুন করে কাঁদতে থাকে। প্রমথর অভিমান হয়। ভাবে তার ফেরাতে সুখী নয় কুসুম, তাই সে কাঁদছে। কিন্তু কুসুমের কান্নার মানে অন্য। তার কান্নার আছে মানুষের নিহিত হৃদয়বৃত্তির জাগরণ দেখার আনন্দ এবং সেই মহত্ত্ব-উদারতার বিলুপ্তি দেখার দুঃখ। কারণ, রাত পোহালেই জীবিত

প্রমথকে দেখে পরিবারের মানুষগুলি হয়ে যাবে আগের মতোই ঈর্ষাতুর, কুটিল আর (ুদ্র। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মনোগহন সম্পর্কে সন্তোষকুমারের স্বচ্ছ ধারণার প্রমাণ এগল্প।

দ্বিতীয় ভাগ   এই সময়ে, স্বাধীনতার দশ বছর পরে সন্তোষকুমারের অভিজ্ঞতার বৃত্ত হয়েছে প্রসারিত, গল্পশৈলী হয়ে উঠেছে পরিণত। কলকাতা থেকে তিনি কাজের জন্য গেছেন দিল্লি, আবার ফিরেছেন কলকাতায়। নিম্নবিত্ত জীবনের গণ্ডি অতিত্র(ম করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই জীবন-পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে তাঁর ছোটোগল্পে। এই সময়ের লেখা গল্পে ঘটনার পরিবর্তে প্রধান হয়েছে মনোবি(-ষণ। প্রধানত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শি(িত নাগরিক জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে এসময়ের গল্প। সন্তোষকুমার পঞ্চাশ দশকের ছোটোগল্পে নব আঙ্গিক নির্মাণের আন্দোলনের সঙ্গে যুত্ত(ছিলেন না। তথাপি তাঁর গল্প আখ্যানের পরিবর্তে বি(-ষণকেই অবলম্বন করেছে। এ পর্বে তিনি কিছু রূপক গল্প লিখেছেন।

‘বিবাহবার্ষিকী’ গল্পটির নায়ক-নায়িকা উভয়েই শি(িত উচ্চবিত্ত। ‘বিবাহবার্ষিকী’ পার্টিতে এই দম্পতি মিলিতা-নীলেশ সুখী মানুষ হিসেবে নিজেদের উপস্থাপিত করে। অতিথিরা তাদের সন্তানহীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। নীলেশ জানায় তাদের শারীরিক ত্রুটিই এর কারণ। কিন্তু মিলিতা জানে তাদের দুজনেরই এব্যাপারে কোনো ত্রুটি নেই। মিলিতার কলেজ-জীবনের পদস্খলনের ফল বড়ো হচ্ছে তার এক মাসির কাছে। মাসতুতো বোন প্রীতির সঙ্গে নীলেশের শারীরিক সম্পর্কের ফসল পালিত হচ্ছে কোনো মিশনারি-পরিচালিত আশ্রমে। বর্তমানে নীলেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে শোভনা নামের মেয়েটির সঙ্গে—এ তথ্যও অজানা নয় মিলিতার। এভাবেই সন্তোষকুমার ধনী এক দম্পতির জীবনের ফাঁকির দিকটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আবার ‘দুই কাননের পাখি’ আশ্চর্য এক মানসজটিলতার গল্প। গল্পটি বিবৃত হয়েছে বিচ্ছেদ-প্রার্থী স্বামী-স্ত্রীর উকিলের জবানিতে। ডাত্ত(ার সুভদ্র রায় আর নার্স করবী কাজ করত একই নার্সিং হোমে। এই সূত্রেই উভয়ের প্রেম ও বিবাহ। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে দুজনেই অনুভব করে পেশা বিস্তারিত হয়েছে তাদের মনের গভীরে। প্রেম তাকে অতিত্র(ম করতে পারেনি। করবী বুঝতে পারে—‘সব মেয়েই ওর কাছে রোগিণী’ আর সুভদ্র অনুভব করে ‘আমি একজন পাশ করা পেশাদার ধাত্রী বা সেবিকাকেই বিয়ে করে এনেছি, ও কোনদিন রত্ত(মাংসের স্ত্রী হতে পারবে না।’

এই পর্বের লেখা রূপক গল্পের মধ্যে উল্লেখ্য ‘অলীক পৌত্তলিক’, ‘শবানুগমন’, ‘সেই মৃত লোকটি’। ‘অলীক পৌত্তলিক’ গল্পে খুব সূক্ষ্মভাবে মহিষাসুরদলনী দুর্গার পুরাণ কাহিনিটি মিশে আছে। গল্পের নায়ক অলীক নামে এক অসুর। অসুস্থকে সুস্থ করতে পারে সুধা। সেই স্বর্গীয় সুধার সন্ধানে বের হয়ে সে দেখা পায় দেবী দেবিকার। কিন্তু সক(ণ প্রার্থনা সত্ত্বেও দেবিকা সুধা দিতে পারে না অলীকাসুরকে কারণ সুধা অসুরের প্রাপ্য নয়। দেবিকা আলোড়িত করে অলীকের মন। দেবিকাকে ঘিরে গড়ে ওঠে তার স্বপ্ন, আর মেয়েটির মূর্তি নির্মাণ করে সে। দেবিকার দর্শনকামনার প্রবল টানে সে একদিন পৌঁছে যায় সুরলোকে। কিন্তু এখানে সে দেখা পায় সুরামত্ত লীলাপটু এক ত(ণীর। তার দেখা দেবিকার সঙ্গে মিল নেই সে নারীর। স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায় তার গড়া মূর্তি। সে মূর্তি সে তুলে দেয় দেবিকার হাতে, প্রার্থনা করে—‘আমি তো পারলাম না, তোমার প্রতিমা তুমি ফিরে নাও, জুড়ে এনে দাও।’

অলীকাসুরের রূপকে সন্তোষকুমার মানুষের অদম্য অপূর্ণ জীবনাকাঙ(াকেই রূপায়িত করেছেন। তার কামনা পূর্ণ হয় না। এমনকী স্বপ্নেও তৃপ্ত হয় না বাসনা। তার নির্মিত স্বপ্নপ্রাসাদ বারেবারেই ভেঙে যায়। এই না পাওয়ার বেদনাই আধুনিক মানুষের যন্ত্রণার উৎস।

তৃতীয় ভাগ   এসময়ে সন্তোষকুমার সচ্ছল, বয়স্ক, পদমর্যাদাবান, প্রতিষ্ঠিত এক ব্যত্তি(। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন নজর এড়ায়নি গল্পশিল্পী সন্তোষকুমারের। এসময়ের গল্পে যেমন আছে অভিজাত সমাজের অব(য়ের চিত্র তেমনই আছে জীবনসম্পর্কিত গভীর বোধের শিল্পায়ন। এসময়ের গল্পের প্রধান ল(ণ অন্তর্মুখীনতা এবং চরিত্রের মানসিক সংকটের রূপায়ণ। প্রতিষ্ঠিত বিত্তবান মানুষের অন্তর্লীল বিষাদ

সঙ্গহীনতার যন্ত্রণা আর বিচ্ছিন্নতাবোধ নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে এই পর্বের গল্পে। এরই সঙ্গে প্রায়শ তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে আখ্যানপ্রধান। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচিত হল একটি গল্প। 'নিহতের নাম' গল্পে শচীপতি প্রথম প্রেমিকা প্রতিমার মৃত্যুশয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখনই সে অনুভব করে নগরসভ্যতা কেড়ে নিয়েছে তার সমস্ত বোধ। সে দুঃখ পায় না, সুখও অনুভব করে না। সে এখন একমাত্র 'আপনার মধ্যেই ডুবে যাওয়া, আর কিছু ভালো লাগে না, সঙ্গ না, সান্নিধ্য না, কিছুতেই আর দা(ণভাবে উল্লসিত হই না, না সমুদ্র-পর্বত ইত্যাদি প্রাকৃতিক শোভায়, না প্রাকৃতিক সমাজে।' তাই সে ছুটে যায় ডাক্ত(ারের কাছে, জানায় তার আর্ত প্রার্থনা—''......আমার চাই দুঃখ। চাই বেঁচে আছি সেটা বি(াস করতে।''

শেষে সে যায় থানায়। জানায় সে সারেনডার করতে এসেছে। বড়োবাবু জানতে চান কাকে সে খুন করেছে। শচীপতি বলতে পারে না নিহতের নাম। তবে জানায় খুন করেনি সে, লাশ লুকিয়ে রেখেছে। বলেই উদ্দেশ্যহীন উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ে সে। আর অনুভব করে তার অনুভূতিও এবার বেঁচে উঠছে ধীরে ধীরে। এমনই করে সন্তোষকুমার আধুনিক মানুষের আত্মোপলব্ধিকে রূপ দিয়েছেন।

'নজরবন্দী' গল্পে রয়েছে আখ্যান। তার সঙ্গে মিশে আএছ মনের জটিল প্রকাশ। পুরন্দর ভালোবাসত স্ত্রী কেতকীকে। সেই ভালোবাসা থেকেই এসেছিল সন্দেহ—কেতকী ভালোবাসে মৃগাঙ্ককে। কেতকী স্বামীকেই ভালোবাসত। তাই স্বামীর সন্দেহের কথা জেনে সে আত্মহত্যা করে.। এর কারণ নিজের মুক্তি(শুধু নয় স্বামীকেও সে এভাবেই মুক্ত(করতে চেয়েছিল সন্দেহব্যাধি থেকে।

'শূন্যযান' কিছুটা রূপকধর্মী গল্প। অনীতা আর লোকনাথ এগল্পে শূন্যযানে যেতে চায় ইহলোকের পারে অন্যলোকে। ইহলোকের বাসনা, মোহ, ভালোবাসা, শোক—সকল অনুভূতি জমা দিয়ে তাদের এগোতে হয়। কিন্তু যখন তারা জানতে পারে অন্যলোকে জীবনস্বাদ বর্ণগন্ধহীন, তখন তারা ফিরে আসতে চায় ইহলোকে—'যেখানে আমি আছি, তুমি আছ, নদীতে স্রোত আছে, সমুদ্রে লবণ'—জীবনকে লেখক বড়ো করে তুলেছেন এগল্পে।

'পাখি মরে গেলে' গল্পটিতে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে আত্মীয়হীনতার বোধ জন্মায় তারই চিত্র রয়েছে। নিখিলেশের বালিকা কন্যা খুকু তার পোষা ময়না মরে গেলে দুঃখিত হয়। কারণ সে যে তাকে ডাকত 'খু-কু খু-কু' বলে। অর্থাৎ তার সঙ্গে মেয়েটির গড়ে উঠেছিল একটি মনের সম্পর্ক। নিখিলেশ বুঝতে পারে না মেয়ের মন। কিন্তু অফিসে তার কাছে আসে সীতা মাসির মৃত্যুর খবর। এর সঙ্গে অবসান হয় তার কৈশোরের, তাকে ডাক নাম ডাকার মতো ভালোবাসার জন কেউ যে আর রইল না—এই বোধ ব্যথায় আপ্-ুত করে দেয় তাকে। তখনই সে বুঝতে পারে ময়নার মৃত্যুতে মেয়ের শোকের কারণ। এভাবেই বি(-ষণের দ্বারা পিতা-কন্যার মনোগহনের মধ্যে একটি সমতা প্রতিষ্ঠা করেছেন সন্তোষকুমার। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কয়েকটি বিশেষ অনুভবের (ে ত্রে সব মানুষই সম-মনোভাব বহন করে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় সন্তোষকুমার নানা ধরনের গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্প নির্মাণের মধ্যেও আছে বৈচিত্র্য। চিঠি, ('লেখকের চিঠি', 'প্রেমপত্র') নাট্যভঙ্গি ('দুটি ঘর একটি নাটক', 'না-লেখা নাটক'), ডায়েরি ('দিনপঞ্জি'), বেতারভাষণ ('এই ছুটিতে')—প্রভৃতি বিচিত্র আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর গল্পে। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্ত—তিন শ্রেণির মানুষকে নিয়েই তিনি লিখেছেন গল্প। তবে তাঁর সব গল্পেরই পটভূমি নগর। গ্রাম, গ্রামবাসী তাঁর গল্পে নেই বললেই হয়। সন্তোষকুমার আখ্যাননির্ভর গল্প লিখেছেন। কিন্তু মনোবি(-ষণই তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষত মধ্য পর্বের গল্পে আখ্যানের চেয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে মানবমনের রহস্যময় গভীরতার বি(-ষণ।

প্রকৃতির বর্ণনা সন্তোষকুমারের অনেক গল্পেই আছে। প্রায় প্রতিটি বর্ণনাই লেখকের নিজস্বতায় দীপ্তিময়। 'ওপরে আকাশে মেঘের ঝোপেও অনেক জোনাকি জ্বলছিল আর তলার বি(স্ত নীল নদী অবিকল, তাই টুকে

রাখছিল', ('সেই মৃত লোকটি') 'তেরাস্তার ত্রিবেণী, মধ্যিখানে ঠিক গোল নয় ডিমেল, একটি চর। কতকাল ৌরী হয়নি, একমাথা ঘাস নিয়ে জেগে আছে।' ('স্থান কাল পাত্র') 'এক ঝাঁক বক সাদা পাখা মেলে তখনই হাসিতে হলুদ একটা বাবলা গাছের তলায় বসল।' ('দুই রাত্রি')।

ভাষা : সন্তোষকুমারের ভাষা ইঙ্গিতময়, প্রতীকী আর ব্যঞ্জনাঋদ্ধ। বিষয়ের প্রয়োজনে তাঁর ভাষা পরিবর্তিত হয়। যখন তিনি কঠিন বাস্তব জীবনের পরিচয় দিয়েছেন তখন ভাষা হয়েছে সরল স্বচ্ছন্দ অথচ হৃদয়স্পর্শী। একটি উদাহরণ 'কানাকড়ি' থেকে, বিষয় নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের বর্ণনা—''বাবুরা বাজারে বেরিয়েছেন, এখন তবে সাড়ে সাতটা। কুচো চিংড়ি আর পুঁইশাক থলে ভর্তি করে ফিরছেন ঃ আটটা। কলতলায় মগ হাতে ঠেলাঠেলি, না ছুঁই পানি স্নান ঃ সাড়ে আট। নমোনমো খাওয়া ঃ ন'টা। রেকাব থেকে তুলে নেওয়া মিঠে একখিলি পান, রাস্তার দড়ি থেকে ধরানো আয়েসী একটা কাঁচি—সারাদিনের বরাদ্দ দুটির মধ্যে একটি—সাড়ে নটা, দৌড়—দৌড়—দৌড়।'' কোনো ব্যক্তি(উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও কেবল ত্রি(য়ার বর্ণনায় ব্যস্ত দরিদ্র চাকুরের জীবনের ছবিটি এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বি(-ষণমূলক গল্পের (্ত্রে তাঁর ভাষা ব্যঞ্জনা আর প্রতীকে সমৃদ্ধ। ''আর সময় নেই, ঘড়িতে সময় কত সেটা স্থির না দেখেও স্পষ্ট টের পাওয়া যায় সময় নেই। বাইরের আকাশটা এ(ণি তার গায়ের ঘোর কালো বাসী কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে দেবে, প্রথম আলোর জলে চোখ মুখ কপাল ধুয়ে মুছে নতুন হবে শুচি হবে। আমরা এরকম পারি না। রোজ নতুন হওয়া অসম্ভব। খালি হওয়ার একটা আশাই, শেষরাতে যদি ঘুম ভাঙে তবেই বেঁচে থাকা নামে তিরতিরে কায়ক্লিষ্ট নদীটির কিনারে লেগে থাকে।'' ('শেষ রাত তোমাকে')

ক্বচিৎ তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে কৌতুকসমৃদ্ধ। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে ওয়েটিং (মে নিদ্রিত স্থূলতনু বৃকোদর সিং-এর নাক ডাকছে 'ঘরর' শব্দে। তার বর্ণনা—''ওই মগজে ঘুমও থাকতে চায় না, ফাঁক পেলেই পালাতে চায় তাই নাকের মুখে একটা কুকুর পুষে রাখা হয়েছে, সে ঘর্-ঘর্ করে তাড়া দেয়, ঘুম ফের সুড় সুড় করে মগজে গিয়ে ঢোকে। ''

ভাষার উপর কী অসম্ভব দখল ছিল সন্তোষকুমারের, কী প্রখর ছিল তংার কল্পনা(মতা—উদাহরণগুলি তা স্পষ্ট করে দেয়। চরিত্র নির্মাণে, আখ্যানবয়নে ভাষা ব্যবহারে—ছোটোগল্পের সব দিকই ঝলসে উঠেছে তাঁর প্রতিভার তীব্র দ্যুতিতে। বাংলা ছোটো গল্পের ইতিহাসে সন্তোষকুমার ঘোষ আপন শক্তি(তে উজ্জ্বল স্বতঃসিদ্ধ এই সত্য।

৫.১০ ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯৯৭)

১৯২১ সালে বিভাগপূর্ব বাংলার রঙপুরে ননী ভৌমিকের জন্ম।

শিক্ষা : তাঁর বিদ্যালয় শি(া শু(হয়েছিল রঙপুর শহরে। রঙপুর কলেজ থেকে আই-এসসি. আর পাবনা কলেজ থেকে বি. এসসি. পরী(ায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ননী ভৌমিক এম. এসসি. পড়া শু(করেন। কিন্তু আর্থিক কারণে স্নাতকোত্তর পাঠ তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি। পাবনা কলেজে কবি মণীন্দ্র রায় তাঁর সঙ্গে পড়তেন।

দেশবিভাগের পর তাঁর পরিবার পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় বাস শু(করে।

কর্মজীবন : সম্ভবত স্নাতকোত্তর পাঠগ্রহণের সময় কলকাতায় তিনি সাম্যবাদী দলের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত(হয়েছিলেন। ১৯৪৪-এ ডিসেম্বরে 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী (পরের নাম 'প্রগতি') লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ পাঠ করেন 'একটি দিন, ১৯৯৪' নামের গল্পটি।

ননী ভৌমিকের বৃত্তি ছিল সাংবাদিকতা। প্রথমে তিনি কাজ করতেন 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক পত্রিকায়। পরে 'স্বাধীনতা' নামের দৈনিক পত্রের সঙ্গেও তাঁর যোগ স্থাপিত হয়। 'পরিচয়'-এর যুগ্ম সম্পাদক রূপেই তিনি বেশ কিছুকাল কাজ

করেন। ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে ননী ভৌমিক মস্কোর 'আন্তর্জাতিক প্রকাশন সংস্থায়' (শ সাহিত্যের বাংলায় অনুবাদের জন্য চুক্তি(বদ্ধ হয়ে সোভিয়েত রাশিয়া গিয়েছিলেন। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন কবি সমর সেন, কামা ীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়(অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য, শুভময় ঘোষ প্রমুখ। চুক্তি(র মেয়াদ ছিল তিন বছরের। সময়টি শেষ হলে অন্য সবাই ভারতে চলে আসেন। কিন্তু ননী ভৌমিক ফিরে আসেননি। তিনি এক (শ মহিলাকে বিবাহ করে হয়ে যান মস্কোর স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁদের একটি পুত্রও হয়। মস্কোবাসের কালে ননী ভৌমিক অনুবাদ ভিন্ন স্বাধীন কোনো রচনায় আকর্ষণ বোধ করেননি। একমাত্র ব্যতিত্র(ম একটি ভ্রমণকথা 'ম(ও মঞ্জরী'।

সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর ননী ভৌমিক বস্তুত কর্মহীন হয়ে গিয়েছিলেন। এরমধ্যে মারা গিয়েছিল তাঁর পুত্র। বলা যায় ১৯৯৭-এ মৃত্যুর পূর্বে শেষ জীবন খুব একটা স্বস্তিতে কাটেনি তাঁর।

গল্প-সংকলন : একটিমাত্র ছোটোগল্প সংকলন আছে ননী ভৌমিকের। দশটি গল্পের সংকলনটির নাম 'ধানকানা', প্রকাশকাল ১৯৫৩। গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬। গল্পগুলির নাম যথাত্র(মে (১) 'একটি দিন ১৯৪৪', (২) 'কাফের', (৩) 'খুনীর ছেলে', (৪) 'ক্যানিং স্ট্রীট', (৫) 'কেলেপাথরী', (৬) 'একতলা', (৭) 'গিরস্তি', (৮) 'ধানকানা', (৯) 'চোর', (১০) 'হটাবাহার'।

গল্প-বিশেষত্ব : স্বচ্ছ অথচ ব্যঞ্জনাগাঢ় ভাষায় তিনি গল্পগুলিতে চিত্রিত করেছেন গ্রাম আর শহরের নানা শ্রেণির শ্রমজীবীদের জীবন। তবে 'একতলা' গল্পে আছে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র। অনুভবগাঢ়তার প্রকাশ তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গল্প-আলোচনা : 'ধানকানা' কংকলনের প্রথম গল্প 'একটি দিন—১৯৪৪'—গল্পটিতে কোনো নিটোল কাহিনি নেই। টুকরো টুকরো কয়েকটি দৃশ্য দিয়ে দুর্ভি(পরবর্তী যুদ্ধকালীন বাংলার নগর আর মফসস্‌লের জনজীবন উপস্থাপনায় গল্পটি হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র। ছোটো ছোটো সরল বাক্যে গঠিত গল্পটিতে লেখকের পূর্ণায়ত জীবনচেতনার স্বা(র রয়েছে। গল্পটি শু(হয়েছে সকালে, শেষ হয়েছে রাতে।

ক্যামেরা হাতে ওরিয়েন্টাল বিষয় খুঁজে ফেরা মিত্রপ(র সৈন্য, ধনী, অভিজাত, কর্মহীন শকুন্তলা, ব্যাঙ্কের চাকুরে মধ্যবিত্ত নিখিল, চরিত্র অস্থায়ী চাকরি পাওয়া ভদ্রযুবকদল, ফেলে দেওয়া পচা চালের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসা তিন নারী, বিড়ি-শ্রমিক ইয়াসিন, সমাজসেবিকা মহিলাগোষ্ঠী, বউকে কলকাতা দেখাতে নিয়ে আসা সবজি-ব্যবসায়ী, কবি আর কম্পোজিটর নীলমণির স্বরচিত গ্রন্থ মুদ্রণ বিত্র(য়ের প্রয়াস। সবার চিন্তা আর সংলাপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সমকাল। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে রয়েছে সাম্যবাদী দলের সংগঠন আর কর্মের ছোটো ছোটো ছবি। যেমন বস্তির বাচ্চা ছেলেরা খেলতে খেলতে চিৎকার করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। ''অনেক(ণ আগে এই পথ দিয়েই একটা মিছিল চলে গিয়েছিল কোথায়। মিছিলের (ে-াগানগুলো কেমন যেন ভাল লেগে গেছে বাচ্চাগুলোর।''

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক যেন ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন আসন্ন ভবিষ্যতের। সে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে ত(ণের দল। শ্রমিকশ্রেণির চাপা ত্রে(াধ স্ফুরিত হয় ইয়াসিনের কথায়—'খালে বিলে মর যাও তুম গরিব'। গল্প-সমাপ্তিতে রয়েছে আশার আলো—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট থেকে সভা ভেঙে বেরিয়ে আসে একদল লোক। আর কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে ঘুমিয়ে থাকা দুটি লোকের একজন উঠে বসে। এই জাগরণের মধ্যে হয়তো রয়েছে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

বাকি ন-টি গল্পের মধ্যে 'কাফের'-এ আছে মড়কের বি(দ্ধে অসহায় দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা। 'খুনীর ছেলে' নিপীড়িত মানুষের ব্যর্থ প্রতিরোধের কাহিনি। 'ক্যানিং স্ট্রীট' আর 'খুনীর ছেলে'—দুটিতেই আছে ঘোড়ার গাড়ি-চালকদের কথা। 'কেলেপাথরী', 'গিরস্তি' আর 'ধানকানা' ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের গল্প। 'চোর' বি(দ্ধ

শ্রমজীবীদের বৃত্তান্ত, 'হটাবাহার' চা-বাগানের কুলি-কাহিনি। শেষ দুই গল্পে আছে বিদ্রোহের প্রতিবাদের স্পষ্ট প্রকাশ। 'কাফের' অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণপণ প্রয়াসের ক(ণ কাহিনি।

কাফের-এ মড়ক নেমে আসে গ্রামে। ওষুধ পাওয়া যায় না কোথাও। সরকারি ডাক্ত(ারখানায় মেলে শুধু লালরঙের জল। বসন্ত, কলেরা আর ম্যালেরিয়ায় মারা যায় দরিদ্র মানুষ। কেউ কেউ সংস্কারের আশ্রয়ে খোঁজে আ(াস। তাই নমশূদ্র পাড়ার এক বউ স্বপ্ন দেখে 'লাল শাড়ী পরা টক্‌টকে সিঁদুর-কপালী' আলতারাঙা পা দেবী গঙ্গার। তিনি নির্দেশ দেন মাঠের ডোবার জলে পুবমুখো হয়ে তিনটে ডুব দিলেই সুস্থ হবে তার অসুস্থ স্বামী। সকালে বউটি তাই করে। আর হয়তো বি(াসের শক্তি(তে অথবা নিছক শারীরিক নিয়মেই সেরে ওঠে তার স্বামী। তারপরে প্রচার হয় এই স্বপ্নের। পুজো দেওয়া হয় দেবীর আর ডোবার জলে স্নানের ধুম পড়ে।

নৌকা বানানোর দ(কারিগর বৃদ্ধ মুসলমান এন্তাজ আত্র(ান্ত হয় ম্যালেরিয়ায়। একই সঙ্গে জ্বরে পড়ে তার বিধবা মেয়ে সায়েরার একমাত্র কিশোর ছেলে। জ্বর গায়েও কাজে বের হয় এন্তাজ, ফিরে আসে আরও বেশি জ্বর নিয়ে। সুস্থ হওয়ার জন্য সে ঈ(রের শরণ নিতে চায়, পান করতে চায় কাবার পবিত্র কূপের জল। কারণ ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন তারা পাবে না, তার দাম আড়াইশ টাকা পাউণ্ড। সায়েরার ছেলে মারা যায়, মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে পারে না এন্তাজ শোকও অনুভব করে না সে। ''ভয়! ঠান্ডা ধূসর এক স্পর্শ আস্তে আস্তে অবশ করে দিল ওর হাত। বুকের ওপর মড়কের অন্তিম নখ বিঁধে যাওয়ার পরে পেছনকার অন্ধকারে সহসা দেখা গেল কোথাও কোন অভয় নেই।''

বাঁচার প্রবল আগ্রহে জ্বরাত্র(ান্ত এন্তাজ নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও গোপনে ডুব দিয়ে আসে সেই ডোবায়। আর মুমূর্ষু তার বিকৃত স্বরে উচ্চারিত হয় আর্ত প্র(—ডোবায় স্নান করে ''নমোদের অসুখ তো বালো অয় শুনি, আমার হোবে না ক্যান্?'' জীবনর(া যে মানুষের কাছে স্নেহ আর ধর্ম বি(াসের চেয়েও বড়ো এই সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গল্পটিতে।

'খুনীর ছেলে' আর 'ক্যানিং স্ট্রীট'—দুটি গল্পের নায়ক ঘোড়ার গাড়ি-চালক, অসীম শ্রমের দ্বারাও জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না বিত্তহীন এই মানুষগুলি। ফলে কখনও তাদের মনে জাগে প্রতিশোধের অ(ম আকাঙ(া, কখনওবা মানবিক অনুভূতির চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে উপার্জন।

'খুনীর ছেলে' রহিমের ফিরিওয়ালা বাবা বউয়ের সোনাবাঁধা বালা বন্ধক রেখেছিল এককুড়ি টাকার বিনিময়ে কালীচরণ সরকারের কাছে। এককুড়ি টাকা সংগ্রহ করে বালা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে সে শোনে সুদের জন্য তাকে দিতে হবে আরও অনেক টাকা। কারণ ইতিমধ্যে চলে গেছে তিন বছর। এই হিসেবের কৌশল বুঝতে পারে না মানুষটি। কিন্তু তাকে যে প্রতারণা করা হচ্ছে তা সহজেই বুঝে যায় সে আর ক্যাশবাক্সের আঘাতে হত্যা করে প্রতারক কালীচরণকে। হত্যাপরাধে তার হয় দ্বীপান্তর। তবে ছেলে রহিম দেলুয়া তেওয়ারির ছ্যাকরা গাড়ির আড়তে খুঁটিনাটি কাজ করতে করতে একসময় পেয়ে যায় একটি গাড়ির চালকের পদ। তার মনে থাকে না যে গাড়ি-ঘোড়া কিছুই তার নয়। পাগলের মতো ভালোবাসে সে তার গাড়ির একটি ঘোড়াকে। এদিকে যুদ্ধ বাধে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। রহিম আর তার প্রিয় ঘোড়া প(িরাজ—দুজনে ঠিকমতো খাবার পায় না। রহিমের পরামর্শে গাড়োয়ানেরা সবাই মিলে গাড়ির ভাড়া দেয় বাড়িয়ে। কিন্তু তাতে ফল হয় না কিছু কারণ দেলুয়া তেওয়ারি পাঁচসিকের বদলে দু টাকা করে দেয় জমার অর্থ। রহিম নিজের টাকা থেকে ছোলা কিনে খাওয়াতো তার প্রিয় ঘোড়াকে। সেই চানা চুরি করে খায় তার বৃদ্ধ অথর্ব চাচা। ত্রু(দ্ধ রহিম তাকে প্রহার করে বের করে দেয় রাস্তায়। কিন্তু তবু সে চাচাকে খুন করতে পারে না। কারণ 'কেমন যেন টের পেয়েছে প(িরাজের আসল দুশমন ও নয়। আর প(িরাজের যে দুশমন, সেই তো ওরও দুশমন। অনেকবার সে আত্র(ান্ত হয়েছে, অনেকবার আহত হয়েছে সে নিজে।''

এরপর আসে শেষ আঘাত—দেলুয়া ঠিক করে সব ছ্যাকরা গাড়ি আর ঘোড়া বিত্রি(করে কিনবে সাইকেল রিকশা। এরমধ্যে দুটো কিনেওছে সে। শুনে রহিমের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন ঝলসে ওঠে। জাল পাঁচ টাকার নোট দিয়ে ছুরি কেনে সে আর এজন্য পায় তিনটে টাকা। হঠাৎ তার মন থেকে নিভে যায় সেই আগুন। সে পণ্যা নারীর সঙ্গে মত্ত হয়ে ভুলতে চায় নিজের ব্যথা-বেদনা। কিন্তু তখনই সে বোঝে তার প্রাণশত্তি(এতই ৗেণ করে দিয়েছে দুর্ভি(, যে দৈহিক তৃপ্তি আহরণের (মতাও তার নেই। তাই বারাঙ্গনা বিরত্ত(হয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেল দেয় আর 'ময়লা বিছানাটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইল রহিম।''

(ুধা কেমন করে মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়, হরণ করে তার দেহের শত্তি(র শেষ বিন্দুটুকু—তারই বাস্তব বর্ণনায় গল্পটি হয়ে উঠেছে হৃদয়স্পর্শী।

'ক্যানিং স্ট্রীট' গল্পে ঘোড়ার গাড়ির চালক জলিল একাত্ম হয়ে গেছে তার গাড়ির সঙ্গে। তারই গাড়ির ঘোড়া খেপে গিয়ে পিষে মারে তার চার বছরের ছেলেকে। ছেলের আবদারে সে তাকে এনেছিল গাড়িতে চড়িয়ে। ক্যানিং স্ট্রিটের ব্যস্ত ভিড়ে আহত ছেলের দিকে চেয়েও দেখে না সে। বরং তার চোখ পড়ে পাগলা ঘোড়ার শিরদাঁড়ার অস্পষ্ট কম্পনের দিকে।

আশপাশের সবাই ছুটে আসে ছেলেটির কাছে। আর এক গাড়িচালক ইসমাইল ঘোড়াটিকে মারতে শু(করতেই কঠিন সুরে নিষেধ করে জলিল। তারপর ঘোড়াটি শান্ত হলে তাকে আদর করে খেতে দিয়ে গাড়ি সরিয়ে রেখে তবে তার ছেলের জন্য শোক করার অবকাশ পায়। স্ত্রী রাবেয়া বোরখা ছাড়াই ডেকচি কিনতে বেরিয়েছিল। এই অপরাধে তাকে ঘরে ফেরা জলিল ঘোড়ার চাবুক দিয়ে নির্মমভাবে প্রবাহ করে। হয়তো সন্তানের জন্য সুপ্ত শোকই আত্মপ্রকাশ করে এভাবে। রাবেয়া কাঁদে আঘাতের বেদনায় নয়, ছেলের শোকে।

গল্পশেষে দেখি জলিল সঙ্গী ইসমাইলকে নিয়ে মদ খেয়ে ফিরছে, আর খুব জ(রি যেন একটা কথা মনে করতে চাইছে। আসলে সে মনে করতে চাইছিল আহত সন্তানের কথা। কিন্তু সকালে মালিকের টাকা দেওয়ার ভাবনায়, মদের নেশায় বিস্মৃত হয়েছে সে এই সত্য। অথচ যখন এক ফুলবাবু আর প্রসাধনকটু মেয়ে তাদের ইশারায় ডাকে তখন মাতাল হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না জলিলের। ''কোচম্যানের বাক্‌সে উঠে বসল জলিল। গাড়ী যে ভাড়া হবে এখন।'' জীবিকার দায় যে হৃদয়বৃত্তিকে গ্রাস করে নিতে পারে সেই নির্মম সত্য গল্পটিতে আকার লাভ করেছে।

'কেলেপাথরী', 'গিরস্তি' আর 'ধানকানা'—তিনটি গল্পেই ভূমিহীন চাষির জীবনচিত্র এঁকেছেন ননী ভৌমিক। তিন গল্পেই নির্যাতিত শোষিত মানুষগুলির নি(পায় প্রাণধারণের গ্ৱানি প্রকট।

ভূমিহীন খেতমজুরের কাছে সবচেয়ে কঠিন সময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। তখন তারা গাঁ ছেড়ে দূরে যায় কাজের খোঁজে। ফিরে আসে আষাঢ়ে। তখন বৃষ্টি নামবে। জলসিত্ত(জমি দেখে গাঁয়ের বড়ো চাষি-মহাজন ধান কর্জ দেবে। সেই ধানের ভাতে পেট ভরিয়ে মনের আনন্দে তারা মহাজনের জমি চাষ করবে। রাঢ়ের এমনই একটি গাঁ 'কেলেপাথরী'। এ নামের গল্পটিতে ভূমিহীন খেতমজুরদের তীব্র (ুধার রূপ স্তম্ভিত করে পাঠকদের। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের কর্মহীন দিনের উপবাসে তারা অভ্যস্ত। কিন্তু যখন অনাবৃষ্টি আসে, আষাঢ়-শ্রাবণেও বৃষ্টি নামে না, চাষ হয় না বলে গাঁয়ের বড়ো চাষি মহাজন বাগদিপাড়ার মানুষগুলিকে দেয় না ধান কর্জ। অনাহারের জ্বালায় গাঁয়ের জোয়ান পু(ষগুলি চলে যায় পুবের দিকে। সেখানে খাটনি মিলবে—মিলবে খাদ্য এই তাদের বি্বাস। তাদের মেয়েরা কাঁদে, আবার কোনো মতে চাল জোগাড় করে, গুগলি তুলে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে। তাদের দেবতা ধর্মরাজের পূজারী গুনিন যেতে চায় না গাঁ ছেড়ে। এদিকে যারা যেতে পারেনি তারা চুরি করে, অচেনা পথিককে হত্যা করে কোনো মতে টিকে থাকতে চায়। মহাজন চৌকিদার নিয়ে এসে খানিকটা ভীতভাবেই তাদের শাসিয়ে যায়। কারণ সে যেন অবচেতনায় অনুভব করে এরা যদি আত্র(মণ করে তবে চূর্ণ হয়ে যাবে সে। কিন্তু সে প্রতিবাদ ওঠে না কোথাও। গুণিনের সদ্য জোয়ান সদা (ুধার্ত ছেলে বাবাকে জোর করে পিঠে চাপিয়ে চলতে থাকে পুবের দিকে যেখানে মিলবে খাটনি আর খাবার।

পথে দয়ালু এক পথিক তাকে কিছু মুড়ি দেয়। সুচাঁদ বাবাকে না দিয়ে একাই তা খেয়ে ফেলে এবং আরও চায়, পথিক ভয় পেয়ে পালাতে চায় কারণ তার কাছে ছিল না আর কোনো খাবার। সুচাঁদের—''ঘেঙানো হাত দুটো কোন্ সময় সাপের জাপটের মতো এঁটে গিয়েছিল লোকটার গলায়।'' এমন করেই (ুধা গ্রাস করে মানুষের মনুষ্যত্বকে। কারণ এ হত্যা সুচাঁদের মনে জাগায় না কোনো প্রতিত্রি(য়া। এমনকী সে যখন বোঝে পিঠের উপর তার বাবার দেহেও প্রাণ নেই—তখনও দুঃখ, শোক কিছুই অনুভব করে না সে। নির্বিকারভাবে মৃত পিতার দেহ পথে ফেলে একাই হেঁটে যায় অন্ধকারে। 'গিরস্তি' আর 'ধানকানা' গল্পদ্বয়ে এই জমিহীন চাষিদের চাষের বাসনা, ধান ফলানোর কামনার তীব্রতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'গিরস্তি' গল্পে দেনার দায়ে সমি(দ্দিন জোতদারকে সব জমি বিত্রি(করে দিতে বাধ্য হয় বানসর। তারপর সে জানায় ওই জমি 'আধি' অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক জোতদারকে দেওয়ার শর্তে চাষ করার বাসনা। উত্তর আসে চাষের যন্ত্রপাতি গো(—সবই সে বিত্র(য় করেছে অতএব তাকে জমি দেওয়া যাবে না সে 'কিরষিকাম করবু কি দিয়া', নীরবে ফিরে যায় বানসর। আর পতিত জমিগুলির দিকে চেয়ে আফসোস করে।

বুদ্ধিহীন এই মানুষগুলি ধান উঠলে ভুলে যায় দুঃখদিনের কথা। দালালদের কথায় মোহিত হয়ে কম দামে ধান দেয় তারা আর খাজনা শোধ করে, নতুন জমি নেওয়ার চেষ্টা করে। বানসর এদেরই একজন। সে ধানের মরশুমে কাজ করে কিছু টাকা জমায় তার মেয়ে ময়ালীকে একশ পনেরো টাকা পণের বিনিময়ে বিয়ে দিয়ে সংগ্রহ করে গো(কেনার টাকা। তারপর জোতদারের কাছে গিয়ে আধাআধি ভাগ ভিন্ন আরও নানাভাবে ধান দেওয়ার কথা বলে চমি বন্দোবস্ত করে। চাষের মরশুম শু(হলে বানসর সেই জোতদারের কাছেই গো(বাঁধা দিয়ে ধান নিয়ে আসে। শর্ত—ধান উঠলে দিতে হবে নেওয়া ধানের দ্বিগুণ নতুবা ত্রে(াক হবে গো(-বাছুর। চাষ শু(হয়। কিন্তু হঠাৎ আসা বন্যায় ভেসে যায় বানসরের খেত। দেনার দায়ে মহাজন কেড়ে নিয়ে যায় তার গো(।

বানসর তবু দমে না। মেয়ে ময়ালীকে সে (শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসে। তার গোপন বাসনা নতুন দেশে গিয়ে অপরিচিত লোকের সঙ্গে পণ নিয়ে বিয়ে দেবে ময়ালীর। আর সেই টাকায় আবার কিনবে গো(, শু(করবে চাষ।

''আবার তো হইবে'' এই স্বপ্ন চোখে নিয়ে কন্যাসহ বানসর হেঁটে চলে।

'একতলা' গল্পে পাশের ঘরের অসুস্থ বউটির স্বামীর চাকরি গেছে শুনে মিনতি বেদনাবোধ করে। তাদের ব্যথা লাঘবের (ীণ চেষ্টা করে সে জামাকাপড় কেচে দিয়ে আর বধূটির দেবর সুধীরকে তার কাছে খেয়ে নিতে বলে।

ত্র(মে অভাবের সঙ্গে লড়াই করে অভ্যস্ত হয় মিনতি। পুষ্টির অভাবে তার আর সন্তান হবে না শুনেও বেদনায় ভেঙে পড়ে না সে। বরং শ্রেণিগতভেদের কথা বিস্মৃত হয়ে মেয়ের জন্য দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের টিকিট করে দেওয়ার কথা বলে স্বামীকে। মেয়ের দুধ খাওয়ার ইচ্ছা মেটাতে পারেনি বলে একদিন কেঁদেছিল মিনতি। আজ সে আর কাঁদে না। কারণ অকস্মাৎ সে অনুভব করেছে এই সত্য যে দরিদ্রের মধ্যে শ্রেণিভেদ হয় না। তারা সবাই এক স্তরের মানুষ। তাই দুধ বিতরণের টিকিট মেয়েকে করে দেওয়ার কথা বলে সে স্থিরভাবেই। অবস্থার চাপে মানুষ নিজেকে বদলায়, বদলে নিতে বাধ্য হয়। এই পরিবর্তনের বাস্তব আকৃতিটি ননী ভৌমিক গঠনকৌশলে সজীব করে তুলেছেন। 'চোর' গল্পটিতে আছে শ্রমজীবীদের সঙ্গে শাসক সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের ইঙ্গিত। সম্প্রদায়গত ভেদ চূর্ণ হয়ে গেছে এই সংগ্রামের আবহে। শাসক ইংরেজদের গাড়ি পুড়েছে, দগ্ধ হয়েছে মিলিটারি লরি। গুলি চলেছে, মারা গেছে বহু মানুষ। এই পরিবেশে লেখক এনেছেন মোটরমিস্ত্রি পাঁচুকে। গাড়ির যন্ত্রপাতি চুরি করে বিত্র(য় করে দেয় সে। বলা যায় এটাই তার আসল জীবিকা। কিন্তু শাসক আর শাসিতের লড়াই চোর পাঁচুর মধ্যেও আনে পরিবর্তন। পোড়ানোর আগে সে খুলে নেয় গাড়ির যন্ত্রপাতি—কারণ 'ওর বহুত দাম আছে বাজারে'। খলিল তাকে গালাগাল দেয় চোর বলে। কিন্তু আবার যখন সৈন্য আসে, গুলি চলে তখন এই চোরই প্রত্যাঘাতের জন্য গাড়ির চোরাই কলকব্জার পুঁটলি ছুঁড়ে মারে গোরা সৈন্যকে ল(করে। পরিণামে গুলি লাগে তার গায়ে। অন্যান্য আহতদের সঙ্গে ঠেলায় চাপিয়ে খলিল তাকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। আর আহত পাঁচু 'ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে' বলে যায় ''......উ গাড়ী কার আছে,

না আমার আছে, না ইংরেজদের আছে? তো জ(র খুলে লিয়ে আসব—তামাম গাড়ী ইঞ্জিন খুলে লিয়ে আসব......’’

নিজের মতো করে তস্কর পাঁচু সাজিয়ে নিয়েছে তার রণকৌশল। সে গাড়ি পুড়িয়ে দেবে না, বরং যন্ত্রপাতি চুরি করে সেটিকে অকেজো করে দেবে। এবার সে নিজের স্বার্থে চুরি করবে না(করবে বৃহত্তর এক উদ্দেশ্য নিয়ে।

‘হটাবাহার’ গল্পটিতে চা-বাগানের নিপীড়িত শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিরোধের আন্দোলনের সূচনাকে ভাষারূপ দিয়েছেন ননী ভৌমিক আশ্চর্য কুশলতায়। ভূমিহীন মানুষগুলিকে ঠিকাদার কৌশলে পনেরো বছরের জন্য চুক্তি(বদ্ধ করে নিয়ে এসেছিল চা-বাগানে। মানুষগুলি ভেবেছিল শ্রমের বিনিময়ে এখানে পাওয়া যাবে উপযুক্ত(খাদ্যবস্ত্র, বাসস্থান। ঠিকাদারের ভাষায়ও ছিল সে আ⁄াস। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অসীম শ্রমেও উপযুক্ত(মজুরি মেলে না। তুলে আনা পাতার মাপে কারচুপি করে ওজন কম দেখিয়ে কম মজুরি দেওয়া হয় তাদের। এদিকে দ্বিতীয় বি⁄যুদ্ধ শু(হওয়ায় জিনিসপত্র বিশেষত ধানের দাম যায় বেড়ে। বাগানের মধ্যে চাল্লের লুকোনো গুদাম গড়ে ওঠে। রাতের অন্ধকারে সেখানে ধান আসে আর কোথায় যেন চালান যায়। বেশির ভাগ কুলি ওই দরে বাধ্য হয়ে ধান কিনে নিয়ে যায়। কেনে না শুধু শুকরা মুণ্ডা তার বদলে সে হাড়িয়া খেয়ে আসে। তার স্ত্রী মুংলী কাজের মধ্যেই সন্তান লাভ করে। শুকরা ঠিক করে দুজনের মতো পাতা সে একলা তুলে ফেলবে।

এদিকে তিন দিনের মধ্যে কুলিদের সবার খাদ্য শেষ হয়ে যায়। এই সময় স(ম স্বামীরা অ(ম বউকে ফেলে পালায়। বুড়ো বাপকে ফেলে চলে যায় সবল মেয়ে। কিন্তু শুকরা বউকে ফেলে পালায় না। বরং খাসমহলের চাষিরা যে চালের গাড়ি থামিয়ে তাদের টাকায় সাত সের করে চাল বিত্রি(করতে বাধ্য করেছে আর ইয়ংটাং বাগানে কুলিরা করেছে বিদ্রোহ—সে খবর ছড়িয়ে দেয় ঘরে ঘরে। একটা চাপা ত্রে(াধে জেগে থাকে কুলিরা।

কাঁচা পাতার ওজন কম লিখে হাজিরাবাবু কুলিদের ঠকায়। তার মতে কোম্পানি চালান দেবে শুকনো চা-পাতা আর কুলিরা তুলেছে সরস কচিপাতা অতএব বাদ দিবে সেই জলের ওজন। তাই শুকরার তিনটুকরি পাতার কুনি সের ওজন কেটে নিয়ে তাকে আটআনা মজুরি দেয় বাগানবাবু। ত্রু(দ্ধ শুকরা বাগানবাবুর গলা টিপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা (দ্ধ আত্রে(াশে ফেটে পড়ে কুলিরা। আবার বড়োসাহেবের বন্দুকের গুলিতে একটি কুলি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় সব গণ্ডগোল।

সন্ধ্যাবেলায় শুকরাকে ধরে আনে দুজন চৌকিদার। তাকে চাবুক মেরে দূর করে দেওয়া হয় বাগান থেকে—একে বলে ‘হটাবাহার’। শুকরা রক্ত(াক্ত(দেহে নীরবে চলে আসে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাগান ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। চৌকিদারেরা ভেঙে দেবে তার ঘর। সব বাগানে চলে যাবে এ বাগানের চিঠি। কেউ চাকরি দেবে না ‘হটাবাহার’ কুলিকে। শুকরার সঙ্গে আরও কুড়ি জন একই শাস্তি পায়। শোনা যায় অন্য কুলিরা বলেছে তারা কেউ কাজে যাবে না। সাহেবরা ডেকে পাঠায় কুলিদের। দুআনা করে বকশিস আর হাঁড়িয়া পেয়েও সেকথা ভোলে না কেউ। বরং প্র⁄ তোলে ধান দেওয়া হল না কেন তাদের? শুকরা পালায় মানসিং-এর দোকানের কাজের মেয়েটিকে নিয়ে। এদিকে বাগানের কুলিরা খেপে ওঠে। সাহেব আর বাবুরা কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে তিনজন কুলিকে হত্যা করে পালায়। ধানের গুদাম দখল করতে গিয়ে ত্রু(দ্ধ কুলিরা দেখে রাতারাতি সরিয়ে ফেলা হয়েছে শস্য। সবাই বোঝে সাহেবরা আবার ফিরবে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে। গুলি চালিয়ে মারা হবে তাদের। তারা জানে হেরে যেতে হবে। তবু কুলিরা তৈরি হয় সংগ্রামের জন্য। মেয়েরা চা-পাতার তোলার টুকরি ভরে পাথর এনে সাজিয়ে রাখে কুলি লাইনের সামনে। পাথর নিয়ে পাহারা দিয়ে ফেরে পু(ষেরা।

তারপর পালাতে পালাতে শুকরা শোনে গুলির শব্দ আর বিস্মিত হয়ে বলে, ‘কি হল বাগানটার......’ কারণ সে বুঝতে পারেনি এবার এসেছে বদলা নেওয়ার দিন।

ননী ভৌমিক তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে যেন রচনা করেছেন শোষিত অসহায় মানুষের ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস। সে ইতিহাসের সূচনায় ছিল নীরবে অত্যাচার সয়ে যাওয়া। ত্র(মে তাদের মধ্যে আসে প্রতিরোধের বিদ্রোহের,

প্রতিবাদের মনোভাব। কোনো কাহিনিতেই এইসব মানুষগুলির জয় ঘোষিত হয়নি। কিন্তু তাদের আসন্ন বিজয়ের ইঙ্গিত যেন ছড়িয়ে আছে শেষ দুটি গল্পে। তাঁর চরিত্রেরা কেউ মতবাদের বাহক নয়, রক্ত(মাংসের উষ(তামাখা জীবন্ত মানুষ। তাদের সংলাপে তিনি এনেছেন স্বাভাবিকতা। কাহিনিবৃত্ত নির্মাণেও আছে কুশলী শিল্পীর স্পর্শ। তাই ননী ভৌমিক যে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের অন্যতম সার্থক গল্পকার একথা মেনে নিতে দ্বিধা নেই আমাদের।

৫.১১ বিমল কর (১৯২১-২০০৩)

১৯২১-এর ১৯ সেপ্টেম্বর জ্যোতিষচন্দ্র-নিশিবালার সন্তান বিমল করের জন্ম হয় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শঙ্খচুর বা শাঁখচুরো গ্রামে(মামাবাড়িতে। পৈতৃক নিবাস ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের নলকোড়া গ্রাম। তবে বিমল করের ঠাকুরদা দুর্গাদাস কোনো কারণে স্ত্রী শরৎকুমারী সহ চলে যান বাংলার বাইরে। তাঁর বাবা, জ্যাঠামশায়, সেজোকাকা কাজ করতেন রেলে, ইঞ্জিনিয়ার ছোটো কাকা কাজ করতেন কোলিয়ারিতে। তাই বিহার-আসানসোল অঞ্চলের রেলশহরে আর কোলিয়ারিতে কেটেছে বিমল করের বাল্য-কৈশোর।

বাড়িতে সাহিত্যের আবহ ছিল। শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলি, 'পথের পাঁচালী' প্রভৃতি সমকালের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের নানা বই ছিল। নিয়মিত নেওয়া হত নানা মাসিকপত্র আর খণ্ডশ প্রকাশিত মহাভারত। সেজোকাকিমা কবিতা লিখতেন আবার গানও গাইতেন। বিমল করের সঙ্গে চলত তাঁর সাহিত্য-আলোচনা। এই পরিবেশ বিমল করের সাহিত্যিক-মনকে গড়ে তোলার সহায়ক ছিল এবিষয়ে সংশয় নেই।

শিক্ষা : ধানবাদ লোয়ার প্রাইমারি স্কুলে বিমল করের শি(া শু(হয়। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি সুখলতা রাও-এর 'আরো গল্প' পড়েন। এর পরে তিনি ভরতি হন ধানবাদ একাডেমি হাইস্কুলে। এসময়ে তিনি পাঠ্য বইয়ের বাইরে পড়েছেন প্রচুর কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থ এবং বড়োদের বই। সেগুলির মদ্যে আছে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'রামায়ণ', 'মহাভারত' আর 'টুনটুনির বই', দ(িণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', সুকুমার রায়ের প্রায় সব বই, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'চালিয়াৎচন্দর', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যখের ধন', দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত বিভিন্ন বই। এছাড়া পড়েছেন 'গালিভার ট্রাভেলস', 'অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টিন ডেজ' আর টারজান-এর নানা গল্পের অনুবাদ। তাঁর পড়া বইয়ের মধ্যে ছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, 'সন্দেশ', 'শিশুসাথী', বসুমতী সাহিত্যভাণ্ডার প্রকাশিত নানা লেখকের গ্রন্থাবলি।

যাত্রা-থিয়েটার, ফুটবল খেলা—সবই দেখতেন বিমল কর। ধানবাদ একাডেমি হাইস্কুলে দু বছর পড়ার পর তাঁকে ভর্তি করা হয় আসানসোল রেল স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে। থাকার ব্যবস্থা হয় হস্টেলে। দু বছর অর্থাৎ সপ্তম আর অষ্টম শ্রেণি এই স্কুলে পড়েন বিমল কর। দ্বিতীয় বছরে মারাত্মক থাই অ্যাবসেসে আক্র(ান্ত হয়ে ছ-মাস শয্যাশায়ী ছিলেন বিমল। কালীপাহাড়ি কোলিয়ারিতে ছোটো কাকার কোয়ার্টারে এই সময়টি কাটিয়েছিলেন তিনি.। তখন তাঁর সময় কাটত বই পড়ে। মহাভারতের বেশ কিছু খণ্ড, রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সিন্দূর কৌটা', 'রত্নদীপ', চা(চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু-একটি উপন্যাস(বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা'—এসময়ই তিনি পড়েন। শেষের তিনটি আলোড়িত করেছিল বিমল করের রোমান্টিক মনটিকে। বিভিন্ন মাসিকপত্রও এসময়ে তাঁর পাঠ্যতালিকায় ছিল। অসুস্থতার এই দীর্ঘ সময়ে এভাবেই তাঁর মন সাহিত্যরস সম্পৃক্ত(হয়। তার সঙ্গে সঙ্গহীনতা আর দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা তাঁর মনকে দিয়েছিল একটি বিশেষ গড়ন। সুস্থ হয়ে তিনি ভরতি হন কুলটি ম্যাকমিলান স্কুলে। বরাকরে সেজোকাকার বাসা থেকে যাতায়াত করে নাইন-টেন দুটি ক্লাস তিনি এখানে পড়েন। সেজোকাকার বাড়িতে প্রচুর বাংলা-ইংরেজি বই ছিল। যথা—বাইবেল, শেক্সপিয়র গ্রন্থাবলি, দু-চার খণ্ড লন্ডন মিস্ট্রি, বাংলা বইয়ের মধ্যে ছিল বাইবেলের অনুবাদ, ওমর খইয়াম ও 'মেঘদূতম্'-এর অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও কিছু কবিতা-সংকলন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজ(লের

কিছু কবিতার বই, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎ গ্রন্থাবলির কিছু খণ্ড। বাঁধানো 'প্রবাসী', 'মাসিক বসুমতী' আর 'প্রবর্তক'। ফলে বিদ্যালয়ে পাঠকালেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক ধারার সঙ্গে গভীর পরিচয় হয়েছিল তাঁর। এসময় তিনি এক পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃতও পড়েন। ১৯৩৯-এ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন বিমল কর। অভিভাবকদের ইচ্ছায় ডাত্ত(ারি পড়ার প্রস্তুতি হিসেবে তিনি কলকাতার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের আই. এস. সি. ক্লাসে ভর্তি হন। থাকার ব্যবস্থা হয় হস্টেলে। এসময়ে তিনি পড়াশোনার চাইতে ইংরেজি-বাংলা সিনেমা আর থিয়েটার দেখাতেই মন দিয়েছিলেন বেশি। এসময় তাঁর একটি ছোটো লেখা বন্ধুরা জোর করে চাঁদা তুলে ছাপিয়ে দেন। সেটি এখন আর পাওয়া যায় না। আই. এস. সি. পরী(ার পর জামডোবা কোলিয়ারিতে ছোটোকাকার কোয়ার্টারে চলে আসনে বিমল কর। নিকটেই ছিল ভাগা রেল লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরি থেকে তিনি নুট হামসুন, ইবসেন, তুর্গেনিভ, বুনিন, টলস্টয়, মার্ক টোয়েন প্রমুখ বিদেশি বিখ্যাত লেখকদের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল টলস্টয় রচিত 'হোয়াট মেন লিভ বাই' গ্রন্থটি। এভাবেই তাঁর লেখকজীবনের ভিত গড়ে ওঠে।

পরী(ার ফল ভালো হয়নি। তাই ডাত্ত(ারির বদলে তিনি শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজে ভর্তি হন। পাঠ্য বিষয় ভালো লাগেনি তাঁর। তাই পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে যান বাবার কাছে হাজারিবাগে। আবার শু(হয় সাহিত্যপাঠ। আনাতোল ফ্রাঁস, লরেন্স, হাক্সলি, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বই এসময়ই তিনি পড়েছিলেন। অবশ্য ম্যাট্রিকুলেশন পরী(ার সময়েই তিনি বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া' উপন্যাসটি পড়েছিলেন। এবার কলকাতায় গিয়ে বিমল কর ভরতি হন বিদ্যাসাগর কলেজের বি. এ. ক্লাসে। ১৯৪৩-এ কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের স্নাতক হন বিমল কর।

কর্মজীবন : দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধকালে কলেজ অনিয়মিত হওয়ায় পড়া ছেড়ে তিনি ডাইরেকটরেট অফ ডিফেন্স-এর অধীন আসানসোলের অ্যামিউনিশান প্রোডাকশন ডিপো-য় চাকরিতে যোগ দেন।

স্নাতক হওয়ার পরে রেলওয়ে ট্রাফিক অ্যাকাউন্টস-এর বেনারস অফিসের টি. সি. বিভাগে চল্লিশ টাকা বেতন, ষোলো টাকা ডি. এ. অর্থাৎ মোট ছাপান্ন টাকা বেতনের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। এসময়ে তিনি থাকতেন গোধুলিয়ার মডার্ন বোর্ডিং-এ। অবসর সময়ে বেনারসের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গিয়ে বইপত্র পড়তেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' এখানেই তিনি পাঠ করেন। নাটক লেখার চেষ্টাও করতেন। কিছুকাল পরে তিনি রেলের আসানসোল বিভাগের অ্যাকাউন্টস বিভাগে বদলি হন। এখানে ঘুষ নেওয়া ছিল সুপ্রচলিত। বিমল করের তাতে আপত্তি ছিল। পরিণামে সহকর্মীদের সঙ্গে মনকষাকষি এবং পদত্যাগ।

এবার তিনি চাকরির সন্ধানে কলকাতায় আসেন। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরাগ' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের পদ পান বিমল কর। কিন্তু 'পরাগ' বেশি দিন চলেনি। এরপর তিনি প্রেস চালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয় তাঁর প্রয়াস। কিছুদিন 'দৈনিক পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় একশো টাকা বেতনে কাজ করেন বিমল কর। পরে এ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি এবং জীবিকার জন্য এসময় কলেজপাঠ্য বায়োলজি গ্রন্থের অনুবাদ, 'সিওর সাকসেস' ধরনের প্র(োত্তর ভিত্তিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। পরে গৌরকিশোর ঘোষের চেষ্টায় কয়েক মাসের জন্য 'দৈনিক সত্যযুগ' পত্রিকায় কাজ পান তিনি। এসময়ই অর্থের জন্য তিনি দুটি বিদ্যালয়-পাঠ্য বই 'পুরাণের গল্প' আর 'নীল আকাশের কোলে' (বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ) লিখেছিলেন। আবার তিনি 'দৈনিক পশ্চিমবঙ্গ'-এ কাজ পান। কিন্তু সে কাজ ছেড়ে পুনরায় চলে আসেন 'সত্যযুগ'-এ। হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় 'দৈনিক সত্যযুগ'। বিমল কর 'জনসেবক' পত্রিকায় 'বারো ভূতের গল্প' নামে একটি সাপ্তাহিক ফিচার লিখতে শু(করেন।

১৯৫৪ সালে তিনি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়, সাগরময় ঘোষের আহ্বানে কাজে যোগদান করেন। ১৯৮২-তে 'দেশ' থেকে অবসরের পর তিনি কিছুকাল 'শিলাদিত্য' (প্রথমে মাসিক পরে পা(ক) সম্পাদনা করেন। কিছুকাল (প্রায় ছ-সাত মাস) তিনি 'আজকাল' পত্রিকার রবিবারের পাতা দেখাশোনা করেছিলেন। অতি সম্প্রতি (২৬/৮/২০০৩) বিমল কর পরলোক গমন করেছেন।

সাহিত্যসাধনা : খুব ছেটোবেলায় তিনি 'মেঘনাদ বধ' বিষয়ে একটি নাটক লিখেছিলেন। তা ছাড়া কলেজে পড়ার সময় তাঁর ছোটো একটি লেখা বন্ধুরা প্রকাশ করেন। এটি এখন পাওয়া যায় না। বেনারসে কর্মকালে তিনি নাটক লেখার চেষ্টাও করতেন।

'পরাগ' পত্রিকায় যোগ দিয়ে কলকাতায় আসার পর ধীরে ধীরে উন্মেষ ঘটে তাঁর সাহিত্যিক সত্তার। সম্পাদক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে অন্যের নামে তিনি লিখে দিয়েছিলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজের ডায়েরি' নামের বইটি। পরে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি'-র অনুকরণে বিপ্লবী জীবন অবলম্বনে রচনা করেন একটি কিশোর উপন্যাস। বইটি প্রকাশিত হয় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে, তবে ভূমিকায় ছিল বিমল করের নাম। এজন্য তিনি সামান্য অর্থ পান। ১৯৪৬-এ তিনি 'রহস্য রোমাঞ্চ' নামে একটি মাসিকপত্র করেছিলেন। এটি বেশি দিন চলেনি। স্বাধীনতার পর প্রকাশিত 'ছোটোদের শরৎচন্দ্র' বিমল করের স্বনামে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ। তার পরের বই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'হ্রদ'। ১৯৫২-তে তিনি যোগ দিয়েছিলেন 'উত্তরসূরী' পত্রিকায়। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় বের হয় তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি। কিছুদিনের মধ্যেই সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ বের হয় 'বরফ সাহেবের মেয়ে' আর 'মানবপুত্র' গল্প দুটি। দুটি গল্পের জন্য যোগ্য দক্ষিণার সঙ্গে প্রশংসাও পান। এভাবেই বিমল করের নিয়মিত লেখকজীবনের সূচনা। শারদীয় 'দেশ' ১৯৫৩-তে বের হয় তাঁর 'দুই বোন' গল্পটি। ১৯৫৪-র মার্চ-এ 'দেশ'-এ মুদ্রিত হয় তাঁর বিখ্যাত গল্প 'আত্মজা' গল্পটির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি'-তে। আত্মজা আর আঙুরলতা' দুটি গল্পের জন্য তিনি যথেষ্ট নিন্দিতও হয়েছিলেন।

বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে বিমল কর স্মরণীয় 'এই দশকের গল্প' নামের সমকালের তরুণ লেখকদের গল্প সংকলন আর 'ছেটোগল্প ঃ নতুন রীতি' নামের পত্রিকা প্রকাশের জন্য। যাটের দশকের শুরুতে বের হয় পত্রিকাটি। এই পত্রিকায় সম্পাদকের নাম ছিল না। অনিয়মিতভাবে মোট পাঁচটি সংখ্যা মুদ্রিত হলেও পত্রিকাটি স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র ছিল। প্রতি সংখ্যায় বের হত নামী শিল্পীর আঁকা লেখকের স্কেচ সমেত একটি গল্প। গল্পের পরিচিতি সহ মন্তব্যও মুদ্রিত হত। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন', দ্বিতীয় সংখ্যায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' এবং নতুন রীতির ছোটোগল্প সম্বন্ধে বিমল করের দীর্ঘ একটি নিবন্ধ। তিনি লিখেছিলেন ''......ছোটোগল্পের প্রচলিত তাত্ত্বিক কোনও ধারণায় আমরা বিশ্বাসী নই। 'ছোটো' কথাটির কোনও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা অক্ষম। কোনও ধরনের লেখা সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনও তত্ত্ব থাকতে পারে না।'' তাঁর মতে নতুন কালের কবিতার মতো অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত তিনি বহু স্বদেশি ও বিদেশি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করলেন সাহিত্যের বিবিধ বিষয় নিয়ে। সমাপ্তিতে নতুন রীতির ছোটো গল্পের সমর্থনে তিনি লিখলেন—''আমরা যে অন্তর্মুখী হয়েছি, বহির্ঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের নিভৃত কোণে আন্তর ঘটনার বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছি, অনেক বেশি স্পর্শাতুর উদাস একাকী হয়েছি—একথা অস্বীকার করা যায় না।......ছোটোগল্পের হৃদয়গত পরিবর্তনের কারণ আমাদেরই জীবনের পরিবর্তন।''

এই লেখাটি সে সময়ে তরুণ লেখকদের উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাড়া জাগানো গল্প 'বিজনের রক্তমাংস', চতুর্থ সংখ্যায় মিহিরকুমার গুপ্তের 'অনামা' নামের নতুন ধরনের গল্প এবং আধুনিকতার চরিত্র বিষয়ে দিব্যেন্দু পালিতের একটি লেখা। পঞ্চম তথা শেষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'কালবেলা'।

এই পাঁচটি সংখ্যা বাংলা গল্পসাহিত্যের ধারাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করেছিল। 'দেশ', 'পরিচয়', নতুন সাহিত্য'—এইসব পত্রপত্রিকায় সমর্থিত হয়েছিল এই নতুন রীতি।

ছোটোগল্প ছিল বিমল করের প্রিয়তম সাহিত্যমাধ্যম। তাই গল্পসাহিত্যের ধারাকে প্রাণবন্ত করার জন্য সত্তরের দশকে তিনি বের করেন 'গল্পবিচিত্রা' পত্রিকাটি। ক্ষণজীবী এই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আর বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ছিল।

গল্পপ্রাণ বিমল করের শেষ উদ্যোগ 'গল্পপত্র'। ১৯৮৮ সালে সম্পাদক হিসেবে স্বনামে তিনি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। প্রবীণ-নবীন গল্পকারদের সহায়তা, বিজ্ঞাপনদাতাদের কিছু আনুকূল্য সত্ত্বেও কয়েক বছর পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বিমল কর নানা সময়ে কয়েকটি ছদ্মনামেও কিছু লিখেছেন, যেমন বিদুর, অভিনন্দ, হর্ষদেব। পারিজাত নন্দী ছদ্মনামে একদা তিনি লিখেছিলেন কিছু রহস্যগল্প। বয়স্কপাঠ্য গল্পের সঙ্গে সঙ্গে বিমল কর বিচিত্র বিষয়ে বেশ কিছু কিশোরপাঠ্য গল্প লিখেছেন। সেগুলির মধ্যে—গোয়েন্দা গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কৌতুক-গল্প—সবই আছে।

বিমল করের ছোটগল্পের সংখ্যা দুশোর কিছু বেশি। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'আপনি যদি একান্তই প্রেমে পড়েন'।

গল্প সংকলন তালিকা :

(১) 'বরফ সাহেবের মেয়ে', ১৯৫৩; (২) 'পিঙ্গলার প্রেম', ১৯৫৭; (৩) 'আঙুরলতা', ১৯৫৭; (৪) 'সুধাময়', ১৯৫৯; (৫) 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভূবন', ১৯৬৮; (৬) 'মোহনা', ১৯৭৩; (৭) 'প্রেমশশী ', ১৯৭৬; (৮) 'গুণেন একা', ১৯৮৪; (৯) 'উপাখ্যানমালা', ১৯৯২; (১০) 'বালিকাবধূ', ১৯৯২; (১১) 'সরস গল্প', ১৯৯৮; (১২) 'গোলাপকাঁটা'; রহস্যগল্প সংকলন।

গল্প-বিশেষত্ব : বিমল করের গল্পের মূল অবলম্বন মানুষ। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মনোজগতের রহস্যজটিলতার নিপুণ উন্মোচনেই তাঁর ছোটগল্প হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। মানবমনের অন্ধকার দিকসমূহ, তার লোভ, স্বর্থপরতা, অবিশ্বাস তাঁর গল্পে উঠে এসেছে বারবার। মনোজগতের বহুকৌণিক উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পমালা। অবসাদ, বিষাদ আর মৃত্যুচেতনা ঘুরে ঘুরে এসেছে তাঁর গল্পসাহিত্যে। ধীরলয়ে অনুচ্চস্বরে তিনি নির্মাণ করেন বোধের, অনুভবের বিচিত্র ভুবন। আমরা বিমল করের গল্পসম্ভারকে এইভাবে বিন্যস্ত করতে পারি—

(১) নারীর বিচিত্র মানসিকতার গল্প; (২) মানবতার উদ্‌ভাসে দীপ্ত কাহিনি; (৩) প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্কের কাহিনি; (৪) প্রেম; (৫) জটিল মনোভুবনের চিত্রণভিত্তিক গল্প; (৬) মৃত্যুচেতনা; (৭) রূপক গল্প; (৮) সরস গল্প।

(১) নারীর বিচিত্র মানসিকতার গল্প—মানব-মানবীর আকর্ষণ যেমন মানবসমাজের একটি নিত্য সত্য তেমনই গল্পবিশ্বে তার বিচিত্র প্রকাশও অবশ্যস্বীকার্য। বিমল করের রচনায় পাই এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিত্তিতে মনের বিবিধ স্তরের বিচিত্র উদ্‌ঘাটন। 'ইঁদুর' গল্পটি আমরা উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। মলিনা-যতীন—এই দম্পতির মধ্যে প্রীতির অভাব ছিল না। তবে মলিনার মনের জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে ইঁদুরের প্রতি তার তীব্র ঘৃণায়। বস্তির একটি ঘরে তারা সংসার পেতেছিল। কিন্তু মলিনার অক্লান্ত প্রয়াসে ঘরটি ইঁদুর তথা সর্বনিম্ন মালিন্য থেকে মুক্ত হয়েছিল। বোঝা যায় সুন্দরের প্রতি কালো মলিনার ছিল সহজাত আকর্ষণ। যতীন আর মলিনার মসৃণ দাম্পত্যে হঠাৎ হানা দিল ইঁদুর। মলিনা কিনে আনল ইঁদুরকল। অল্পের জন্য সেই কলে কাটা পড়ল না যতীনের আঙুল। আবার এই সময়ই সে সংসারে অতিথি হয়েছিল ব্যর্থ প্রেমে সংসার-বিরাগী যতীনের সুপুরুষ বন্ধু বাসুদেব। স্পষ্ট না বললেও যতীন যে সুশ্রী নয় তার ইঙ্গিত রয়েছে 'ক্ষুদে ক্ষুদে' চোখের বর্ণনায়। দেখা যায় ধীরে ধীরে মলিনার মনে বাসুদেবের প্রতি আকর্ষণ জেগে উঠেছে। কল্যাণেশ্বরী থেকে যখন বাসুদেব ফেরে তখন তার মুণ্ডিত মস্তক সৌম্যরূপ দেখে তার হাত থেকে পড়ে যায় ইঁদুরকল। সন্ধ্যায় বাসুদেবের সঙ্গে আশ্রমে যাওয়ার বাসনায় সে সাজগোজ করে। অবশ্য যতীনও থাকবে তাদের সঙ্গে। কিন্তু সন্ধ্যায় যতীন এসেই বলে অফিসের কাজে তাকে যেতে হবে কলকাতা। তাই শুনে গম্ভীর হয়ে যায় মলীনা, চোখে আসে জল। বোঝা যায় যতীনকেও সে চায়। রাতে মলিনা দরজায়

খিল দেয়। বারান্দায় আছে বাসুদেব। হঠাৎ তার মনে হয় খিলটা বড়ো পলকা; খুলে ফেলা যায় সহজে। তাই দরজার সামনে পেতে রাখে ইঁদুরকল। যাতে অনধিকার প্রবেশকারী ধরা পড়ে সেই কলে। কিন্তু কিছু ঘটে না। আসলে সবটাই মলিনার মলিন মনের কল্পনা। তার নিজের মনের কালি ঢেকে দিয়েছে তার দৃষ্টি। তাই পরের রাত্রে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাসুদেবকে বারান্দায় রেখে খিল আঁটে মলিনা। দরজার মাঝখানে ইঁদুরকল পাততেও ভোলে না সে। ভোরে দরজা খুলে কোমর পর্যন্ত জলে ডোবা বাসুদেবকে দেখে অনুতপ্ত হয় মলিনা। তার মনে হয় ''......বড্ড ছোটো ঘরে ও বাস করে, বড্ড ছোটো মন নিয়ে। নোংরা মন। ইঁদুর কি?'' এইভাবে ব্যাখ্যা করায় কিন্তু গল্পের ব্যঞ্জনা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অনুতপ্ত মলিনা বাসুদেবের হাত ধরে টানে ঘরে আনার জন্যই।

তৃতীয় রাতে যতীন ছিল ঘরে তবুও মলিনা পেতেছিল ইঁদুরকল। আর মাঝরাতে হয়তো বাসুদেবের কাছে যেতে গিয়েই মলিনা ধরা পড়ে সেই কলে। অপরাধী মন মলিনার, তাই প্রাণপণে যন্ত্রণা চেপে রাখে। পরদিন জ্বর গায়ে চলে যায় বাসুদেব। হয়তো সে বুঝেছিল মলিনার মনের যন্ত্রণা। তাই সরে যায়। মলিনা বাসুদেবের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলে। আর যতীনের প্রশ্নের উত্তরে জানায় তার পা কেটেছে ইঁদুরকলে, সেই যন্ত্রণা তার চোখে এনেছে জল। সে আরও বলে ইঁদুরকল সে ফেলে দিয়েছে। আর ভাবে ''ওর ইঁদুর তো বাইরে নেই ঘরেই রয়েছে। কুরকুর করে কাটছে দিনরাত—...কিন্তু যতীন একটুর জন্য বেঁচে গেছে, এই তার ভাগ্যি।''

(২) মানবতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল কাহিনি—'মানবপুত্র' আর 'আঙুরলতা' গল্প দুটোকে আমরা এই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারি।

'মানবপুত্র'-তে রয়েছে খ্রিস্টের পুনরাবির্ভাবের ধর্মবিশ্বাসের আবরণ। চার্চের আবহে বেড়ে ওঠা কেষ্ট, বুড়ো পাদরির মুখে শুনেছিল পৃথিবী পাপে ভরে গেলে আবার আসবেন সেই মানবপুত্র। বড়ো হয়ে সে কাজ নিয়েছিল একটি রেস্তোরাঁয়। তার ঘরের দেওয়ালে ছিল ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের ছবি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কঠিন সময়ে সে গঙ্গামণি নামের মেয়েটিকে নিজের ভাগের থেকে যা পারত খেতে দিত। এদিকে অন্নের জন্য গঙ্গামণির দেহদানেও আপত্তি ছিল না। সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তৃপ্তির জন্য সে কেষ্টর কাছে চাইত 'মাছের চপ' : 'মাংসের চপ। একদা বিয়েবাড়িতে সুখাদ্য জোগানোর 'অর্ডার' পেয়ে যায় রেস্তোরাঁ-মালিক মদনবাবু। তার কর্মচারীরাও পায় সেই সুখাদ্যের ভাগ। কেষ্ট একা উপভোগ করতে পারে না সেই সুখাদ্যগুলি। সে ডেকে আনে গঙ্গামণিকে। আশাতীত সুখাদ্য দেখে জান্তব লালসায় গঙ্গামণি সেগুলো গিলতে থাকে। আচমকা এসে যায় মদনবাবু তার ফেলে যাওয়া টাকাভরতি ব্যাগের সন্ধানে। ব্যাগ সে পায়। কিন্তু গঙ্গমণির ভোজনদৃশ্য দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠে কেড়ে নিতে চায় তার হাতের চপ। টানাটানিতে প্রায় খুলে যায় তার শাড়ি। প্রায় নগ্ন গঙ্গামণিকে দেখে বোঝা যায় সে গর্ভবতী, তার পেটে পড়ে মদনের লাথি। গরম উনুনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গঙ্গামণি। জলভর্তি টিন উলটে পড়ে তার কোমরে। যন্ত্রণায় লুটোপুটি খায় সে। রক্ত পড়তে থাকে তার উরু বেয়ে। মদনবাবু মানিব্যাগটা থেকে কিছু নোট বের করে ব্যাগটা ছুঁড়ে দেয় কেষ্টর বিছানায় আর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পুলিশ ডাকতে যায়। হঠাৎ কেষ্ট চমকে দেখে গঙ্গামণির পায়ের কাছে অস্পষ্ট এক মাংসপিণ্ড। বিমূঢ় কেষ্ট এক মগ জল নিয়ে গঙ্গামণির মুখে মাথায় ঢেলে দেয়। হঠাৎ সেই প্রাণপিণ্ড কোন অজেয় শক্তিতে কেঁদে ওঠে। শিহরিত কেষ্ট পথ-ভোলা মানুষের মতো আলোর খোঁজে এদিক-ওদিক তাকায়। সহসা তার চোখ পড়ে দেওয়ালের ধূলি-ধোঁয়ায় মলিন বিবর্ণ জিশুর ছবির উপর; মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায় সে—''আজ এই মুহূর্তে কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ছবিটা। উনুনের আঁচের লাল আভার খানিকটা তির্যক রেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে ছবির গায়—সেই আভায় জিশু আজ আলোকিত।'' সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে পাদরির বক্তৃতায় বলা মহামানবের পুনরাবির্ভাবের কথা। এই যুগলসংকটকালে, শতসহস্র নিরন্নের মৃত্যুমুহূর্তে উপায়হীন মানুষ চেয়েছিল কোনো মহামানবের আবির্ভাব। এমন করেই দিশাহারা অন্ধকার থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন লেখক। লেখকের মানবতায় দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ এই গল্প।

'আঙুরলতা' গল্পে গতযৌবনা প্রায় নিঃস্ব বেশ্যা আঙুরলতার ঘরে এসে উঠেছিল মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত নন্দ। এই নন্দই তাকে টেনে এনেছিল পাপের পথে। তবু তাকে নিয়েই আঙুরলতা কদিন খেলেছিল স্বামী-স্ত্রী হওয়ার খেলা। তাই গালি দিলেও নন্দকে সে তাড়িয়ে দেয় না। প্রাণপণে তার চিকিৎসা করে। তবুও নন্দ মারা যায়। পাড়ার বেদানামাসি তারে উপদেশ দেয় মেথর-মুদ্দোফরাসকে টাকা দিয়ে শব ভাগাড়ে ফেলে দিতে। আঙুরের মনে পড়ে নন্দ বামুন, তার উপাধি চক্রবর্তী। ''কেমন যেন শিউরে উঠল আঙুর, বুকের মধ্যে সত্যি সত্যি একটা অদ্ভুত ব্যথা আর অসহায়তা জমে উঠতে লাগল।'' শেষে চৌকির তলায় মৃতদেহ ঢুকিয়ে কুৎসিত কুরূপ প্রভুলালকে দেহ দিয়ে আঙুরলতা নন্দর শব সৎকারের টাকা জোগাড় করে। শ্মশানে মুখাগ্নি করার আগে গঙ্গার জলে স্নান করতে গিয়ে সে পায় পচা গন্ধ । এই গন্ধ সে পেয়েছে বেশ্যাপল্লির মেয়ে-মাসি-খদ্দেরদের গায়ে। তার মনে পড়ে তার মতো বহু পাপিষ্ঠা নিত্য গঙ্গায় অবগাহন করে। তারা কি পবিত্র হয়েছে? অকস্মাৎ আঙুরের কাছে মহৎ এক সত্য উদ্‌ভাসিত হয়। তার কোনো পাপ হয়নি। তার আত্মা মানবিক কর্তব্য আর প্রেমের শুদ্ধতায় পবিত্র। তাই গঙ্গাজলে লাথি মেরে আঙুর ছুটে এসে নন্দর মুখে গুঁজে দেয় জ্বলন্ত পাঁকাটি। সেই চিতার আগুন যেন তার দেহমন জুড়ে জ্বলতে থাকে। ''......সব কিছু তার আলোয় ঝকঝক হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এখানের ভালোবাসা, ঘরগড়া, ঘরভাঙা, মানুষ, মানুষের ব্যবহার, মন।'' এইভাবে 'আঙুরলতা হয়ে উঠেছে মানবিকতার উজ্জ্বল গল্প।

(৩) প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্কের কাহিনি—অনেক গল্পে বিমল কর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিবিধ সম্পর্কের বিচিত্রতাকে দিয়েছেন ভাষা-রূপ। যেমন, 'বকুলগন্ধ' গল্পটি প্রেম আর প্রকৃতি মিশে গেছে। অঞ্জনা প্রেমিক শোভনের সঙ্গে মিলিত হত বকুলগাছের ছায়ায়। বিয়ের পর তাই সে সহ্য করতে পারে না বকুলফুল আর তার গন্ধ। বিবাহিত তার সঙ্গে শোভনের দেখা হয় বকুলগন্ধের বন্যার মধ্যে। ঝরা বকুলের দিকে তাকিয়ে সে শোভনের সঙ্গে কথা বলে। শোভন চলে যায়। সেদিনই খবর আসে তার প্রবাসী স্বামী ফিরে আসছে। হর্ষবিষাদে বিহ্বল অঞ্জনা মেয়ে মিন্টুর গাঁথা বকুলমালা জঞ্জাল বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় স্বামী সুধাংশুর বকুলউপহার সে নিতে পারে না। কারণ এই ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার প্রথম প্রেমের স্মৃতি। আজ তা মৃত এবং তাই বকুল গন্ধে বিষিয়ে ওঠে তার নাক-কান-গলা। তার মনের দ্বিধা বকুলের প্রতি আকর্ষণ আর ঘৃণার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই শেষ রাতে নিদ্রিত সুধাংশুর পাশ থেকে উঠে সে নেমে আসে বকুলতলায়। বকুলের মিষ্টি গন্ধ তার মন ভরে দেয়। 'সে মুঠি ভরে বকুল কুড়িয়ে নেয়' আশ্চর্য নরম; একমুঠো সোহাগ। আস্তে আস্তে ঠোঁটের কাছে হাত নিল, পাগড়ি খোলার মতন আঙুলগুলো খুলে গেল, নাকে ঠোঁটে ছোঁয়া লাগল......'' বকুলের নীচে প্রায় স্থির অঞ্জনাকে সুধাংশু এসে জড়িয়ে ধরে। তার শিথিল হাতের মুঠি থেকে, আঁচল থেকে ঝরে পড়ে একরাশ বকুল। সুধাংশু বিস্মিত চোখে দেখে অঞ্জনার বকুলের মতো সাদা মুখ। অঞ্জনার পুরোনো প্রেমের স্মৃতি আর বেদনায় গল্পটি হয়েছে মধুর।

'অশ্বত্থ' আশ্চর্য এক প্রকৃতিপ্রীতির কাহিনি। নববিবাহিতা রেণু যে বাড়িতে সংসার পেতেছিল তার পাশে ছিল এক অশ্বত্থ গাছ। সে গাছটিকে ভালোবেসেছিল। তার মনে হত গাছও তাকে ভালোবাসে। স্বামী নবনীর কথায় রেণু যেন সেই সত্য অনুভব করে। এরপর রেণু যখন সন্তানসম্ভবা তখন গাছটিকে সে উপেক্ষা করে। জননী হওয়ার পর তার মনে জাগে অদ্ভুত এক ভাবনা। গাছটা যেন তার খোকনকে সহ্য করতে পারছে না। তাই উঠোন জুড়ে সে ছড়িয়ে ফেলেছে ডাল, পাতা, পাখির পায়ে মুখে-আসা সাপের খোলস, নোংড়া হাড়। আতঙ্কিত রেণু বাড়ি বদল করে। তবু বাঁচে না তার সন্তান। শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় রেণু। তার মনে হয় অশ্বত্থই কেড়ে নিয়েছে তার শিশুকে।

তবুও কোন টানে এক তপ্ত দুপুরে রেণু যেন কারও ডাকে সাড়া দিতে পথে নামে। অশ্বত্থের দিকে এগিয়ে যায় আচ্ছন্নের মতো। গাছের কঠিন গুঁড়ির মধ্যে সে যেন অনুভব করে কোমল এক শিশুর হৃদ্‌স্পন্দন। তার বুকে জমে থাকা দুধ সে ঢেলে দেয় শিশুর মুখে। মুক্তি পায় সে। গাছটির প্রতি রেণুর মমতা তার মনোগহনে নিহিত সন্তান-কামনা থেকে উঠে এসেছিল। তাই সন্তান পাওয়ার পর ছেদ পড়েছিল রেণুর ভালোবাসায়। সন্তান হারিয়ে

সে প্রীতি হয়ে উঠেছিল আরও গভীর। প্রকৃতির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ এভাবেই রেণুর মনের গভীরে জন্ম দিয়েছিল আশ্চর্য এক ভালোবাসার।

(৪) **প্রেম**—প্রেম নানাভাবে এসেছে বিমল করের গল্পে। 'সম্পর্ক' গল্পে ভালোবাসার এক বিচিত্র রূপ আঁকা হয়েছে। অনিলা শৈলেশের মাসতুতো ভাই মনোরঞ্জনের স্ত্রী। আট-ন-বছর আগে সে মেয়েটিকে বিয়ে করে এনে তুলেছিল এ বাড়িতে। তিন মাসের মধ্যেই দুর্ঘটনায় মারা যায় মনোরঞ্জন, অনিলা থেকেই যায়। শুধু তাই নয়, পরস্পরকে তারা আঁকড়ে ধরে গভীরভাবে। শৈলেশের মা মারা যায়। তবুও অনিলা মারা যায় না। হঠাৎ চল্লিশ পার হয়ে শৈলেশ এক 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠি দেয়। আহত অনিলা শৈলেশের সঙ্গে কলহ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তখনই শৈলেশ বুঝতে পারে অনিলকে সে কতটা ভালোবেসেছে। উপায়হীন যন্ত্রণায় যখন শৈলেশ কাতর, তখনই ফিরে আসে অনিলা। শৈলেশ মুক্ত হয় সকল ভাবনা আর অসহায়তা থেকে। এভাবেই সম্পর্কহীন দুই নরনারীর গভীর ভালোবাসা অনুচ্চারিত হয়েও গল্পটিকে করে তুলেছে ব্যঞ্জনাময়।

'সুখ' গল্পে নবীন দম্পতি শুভেন আর মীনা নির্জনতার সন্ধানে গিয়েছিল স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এক প্রান্তিক শহরে। ডাকবাংলোয় পাশের ঘরে বৃদ্ধ দম্পতি বরদাকান্ত আর সুবর্ণকে দেখে তারা একটু বিরক্তই হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে তারা বুঝতে পারে এই দুটি মানুষ কী নিবিড় ভালোবাসায় আঁকড়ে আছেন পরস্পরকে। মীনার মনে হয় তাদের ভালোবাসা কী এত গাঢ় যে ইন্দ্রিয়বন্ধন ছাড়াও তা টিকে থাকবে। এক রাতে সে শুভেনকে প্রশ্ন করে সে যখন বুড়ি হবে তখনও কি পাবে স্বামীর এমন ভালোবাসা। শুভেন উত্তর দিতে পারে না সে প্রশ্নের। এত ভালোবাসার দায় কি সে বইতে পারবে সারা জীবন? প্রেমের এই বিশাল বিকাশের সামনে তুচ্ছ হয়ে যায় এই নবদম্পতির দেহভিত্তিক ভালোবাসা। আর তাদের মধ্যে জাগে আত্মশুদ্ধির আকুলতা।

(৫) **মানব মনের অতলে নিহিত জটিলতার চিত্রণ ভিত্তিক গল্প**—এই শ্রেণির শ্রেষ্ঠ গল্প 'আত্মজা'। পিতাকন্যার ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে মনের তপোময় দিকটাই যেন চিত্রিত হয়েছে গল্পটিতে। হিমাংশু তার পনেরো বছরের কিশোরী কন্যাকে ভালোবাসত গভীরভাবে। তার স্ত্রী যূথিকা ষোলো বছর বয়সে এই কন্যা পুতুলের জন্ম দিতে গিয়ে হারিয়েছেন স্বাস্থ্য আর যৌবন। তাই ছত্রিশ বছরের হিমাংশুর প্রাণোজ্জ্বল কন্যাপ্রীতিকে সে সন্দেহের চোখে দেখত। তার স্বজনরাও সে সন্দেহে যোগাত ইন্ধন। একদিন সে যখন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে আদর করছিল পুতুলকে, তখন যূথিকার সঙ্গে শিপ্রাও এসে দেখে সে দৃশ্য। যূথিকার কাছ থেকে টাকা ধার নিতে এসেছিল শিপ্রা। হয়তো সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যূথিকাকে যে জানিয়ে দেয়—এভাবে মেয়েকে আদর করা মোটেই ভালো নয়। এ এক ধরনের কমপ্লেক্স ''......এই ধরনের রুচি— ......খুব খারাপ, নোংরা।'' ফ্যাকাশে হয়ে যায় যূথিকা; না খেয়েই সে শুয়ে পড়ে। পুতুলও ঘুমিয়ে থাকে মায়ের পাশে। অনেক রাতে এসে হিমাংশু ঘুমন্ত পুতুলের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে তার জমার বোতাম আটকে দেয়, টেনে দেয় গায়ের লেপ। যখন সে চলে আসবে তখনই যূথিকা উঠে আসে—তীব্র তিক্তভাবে সে অভিযুক্ত করে হিমাংশুকে—''তুমি বাপ হতে পার, কিন্তু সে মেয়ে; তার রূপ আছে বয়স আছে তার কী নেই, কী হয়নি। জানো না তুমি।......ছি, ছি, ছি। কোন আক্কেলে তুমি ওর বুকে মুখ গুঁজে থাক, কোমর জড়িয়ে ধরো।'

এক মুহূর্তে হিমাংশু ছিটকে পড়ে এক অতল অন্ধকারে। তার মনে পড়ে পুতুলের বুকে মুখ গুঁজে হাসার সময় একটা সুধার স্পর্শ তো সে পেয়েছিল। ''অস্বীকার করবে কি হিমাংশু, পুতুলের চুল, চোখ, সর্বাঙ্গের ঘ্রাণ ওর চিত্তে যে শিহরণ জাগিয়েছে তার মধ্যে কোনো আনন্দের স্বাদ ছিল না?'' যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় হিমাংশু। বাথরুমের আয়নায় সে দেখতে পায় পিতা নয়, পশুর ছায়া। সেই পশুকে হত্যা করবার জন্য সে মণিবন্ধের শিরায় খুরের টান দেয়। ''ছত্রিশ বছরের অমিত-তাপে তপ্ত একটি যৌবনের উষ্ণ শোণিত ফিনকি দিয়ে ছুটে এলো। আঃ কী টনটনে আরাম! কী শান্তি! যেন হুহু করে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে।'' মৃত্যুমুহূর্তে তার মনে হয়—তার মনে কোনো পাপ ছিল না। সে

চেয়েছিল "পুতুল, আমার পুতুল আমার কাছে ছোটোটি থাক চিরকাল—ঈশ্বর। তুমি ওকে যৌবন দিয়ো না, প্রজাপতির রং ছুঁয়ো না ওর মনে। ওয়ে আমার সেই ছোটোবেলা, আমার সেই সুখ, সেই মন আর আনন্দ।"

ফলত পাঠকের মনে সংশয় থেকে যায় হিমাংশু আর পুতুলের সম্পর্কের মধ্যে কি পড়েছিল কামনার কলুষ ছায়া; অথবা পুতুলকে কৈশোরের আনন্দে মগ্ন রেখে দেওয়ার চেষ্টায় হিমাংশু মেয়ের সঙ্গে শিশুর মতো, বালিকার মতো ব্যবহার করত? তবে এটা অনিবার্য যে অকালে হৃতযৌবন উদ্‌ভিন্ন যৌবনা কিশোরী কন্যাকে ঈর্ষা করত। তার সেই ঈর্ষার ক্লিন্নতা থেকে উঠে এসেছিল সেই কলুষ অভিযোগ যা হিমাংশু অস্বীকার করতে পারেনি। কারণ মন যতই কলুষহীন হোক দেহের আহ্বানে দেহ সাড়া দেবেই। তাই-ই হিমাংশুকে বেছে নিতে হয় আত্মহননের পথ।

(৬) মৃত্যুচেতনা—মৃত্যু আর জীবনের রহস্য সন্ধানের ব্যাকুলতায় বিভ্রান্ত মনের চিত্র 'সুধাময়' (১৯৫৭)। এই গল্পটি লেখার সময় থেকেই তিনি অন্তর্জগতের চিত্রায়ণে মন দেন। চেতনার গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের তলদেশ পর্যন্ত দেখে নেওয়া ও তার প্রকাশের তাগিদে লেখা 'সুধাময়'। আত্মজৈবনিক সুর গল্পটিকে পাঠকের প্রিয় করে তোলে। সুধাময় জন্মেছিল কোজাগরী পূর্ণিমার আলোকময় রাতে, আনন্দের মধ্যে। তারপর বড়ো হয়ে সে সন্ধান করেছিল আনন্দের। পড়াশুনা সে শেষ করেনি, কারণ যে নিজেকে জানার চেষ্টা করেছিল, সন্ধান করেছিল আনন্দের। তাই সে হয়ে উঠেছিল একা।

এসময়ই বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার বাবাকে। সে আরও সম্বলহীন হয়ে যায়। তার মনে হয় মৃত্যুই একমাত্র সত্য "যে ঘরে আমরা রাত কাটাতে এসেছি, যদি সে ঘরের দীপশিখা সবসময় বাতাসে কাঁপে, নিভু-নিভু হয় তবে আর আশ্বাস কোথায়? যে কোনো সময় অন্ধকার আসতে পারে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে যে ক'মুহূর্ত আছি—আমরা কি মানুষের মতন বাঁচতে পারি?"

ক্রমে সে মৃত্যুকে ভয় করতে থাকে। অসুস্থ মায়ের ঘরে ঢুকত না সে। কারণ মায়ের হয়েছিল যক্ষ্মা। শেষে একদিন সে জয় করে এই ভয়কে। মায়ের কাছে গিয়ে বসে। মায়ের পায়ে মুখ রাখে। সে মৃত্যুকে উপেক্ষা করল। তারপর মারা গেলেন তার মা। সে একা হয়ে গেল অথচ শান্তিতে তার মন ভরে গেল। পরে সে কলকাতায় আসে লঘু সামাজিকতার আনন্দে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়। তখনই তার পরিচয় হয় অগ্নিশিখার মতো সুন্দরী রাজেশ্বরীর সঙ্গে। রাজেশ্বরী তাকে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু সুধাময় তাকে যথার্থ ভালোবাসতে পারেনি। বরং প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ সে বুঝেছিল দেহকেন্দ্রিক ভালোবাসা তার অন্বিষ্ট আনন্দের উৎস হতে পারে না।

সুধাময় এবার "বৃহৎ সংসারে, বৃহৎ মায়ায় ভালোবাসায় এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে চাইছিল।" তাই সে মিহিরপুর টি. বি. স্যানিটোরিয়ামে সামান্য এক কাজ নিয়ে রোগীদের আনন্দ দিয়ে তৃপ্তি পেতে চাইছিল তার মনে হয়েছিল—"সৎকে রক্ষা করো, সত্তাকে রক্ষা করো—জীবন পূর্ণ হবে।" এরপরে তার জীবনে এল হৈমন্তী। ফিমেল ওয়ার্ডের বিশ বছরের এক তরুণী। তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সুধাময়। তার মনে হয়েছিল "ও যেন হিমভেজা ছোট্ট পাখির দিকে তাকিয়ে আছে।" হৈমন্তীকে ভালোবেসেছিল সুধাময়। কিন্তু হৈমন্তীর মৃত্যুর সম্ভাবনা তার মনে জাগায় প্রশ্ন। তার মনে হয় ভালোবাসা তবে কি দেহবদ্ধ। দেহহীন কোনো অস্তিত্ব নয়? ফলে আবার তার মধ্যে জাগে সংশয় জগতে কি মৃত্যুই সত্য? সে রাজেশ্বরীর মধ্যে তার দেহের আলোর ভুবন খুঁজেছিল, পায়নি। "......হৈমন্তীর মধ্যে তার মনের আলোময় অস্তিত্ব অনুভব করে সারবস্তু পেয়েছি ভেবেছিলাম। কে জানত—তার দেহের সঙ্গে এত গভীরভাবে সে অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। আমার ভালবাসা অন্ধকারের মতন, প্রদীপের কাছে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলোকিত। একে ভালোবাসা বলি না। যে-আনন্দ এত চঞ্চল, ভঙ্গুর—সে-আনন্দ মিথ্যে।"

একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সুধাময় মৃত্যু-কীর্ণ জগতে মৃত্যুপারের সুধার সন্ধান করেছিল। সে সন্ধান আসলে লেখকেরই অন্বেষণ।

বাল্যে এক সহোদর-সহোদরার আকস্মিক মৃত্যু, নিজের দীর্ঘ অসুস্থতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুময় আবহ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা—এইসব থেকে উঠে এসেছে বিমল করের মৃত্যুচেতনা এবং ক্রমে তা বিস্তৃত হয়েছে। তাঁর লেখায় জীবনের সঙ্গে অনিবার্য মৃত্যু প্রায়শ জড়িয়ে আছে। অন্তর্মুখী লেখক বিমল কর আপন চেতনায় উপলব্ধি করেছিলেন মৃত্যুর সত্যতা। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ। তবে দৈহিক মৃত্যুকে তিনি একমাত্র সত্য বলে মনে করেননি। তিনি বুঝেছিলেন আশা আর উদ্যমের মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু। আত্মার দীনতা, হতাশা, ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় না তাঁর চরিত্রেরা। 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি'-তে ব্যাধিগ্রস্ত হেমাঙ্গকে ত্যাগ করেছিল তার স্ত্রী পায়রা। কিন্তু হেমাঙ্গ তার ঘরবাড়ির পরিচর্যা করে পোষা নেড়ি কুকুরের যত্ন করে জীবনের এক ধরনের মানে খুঁজে বের করেছিল। একদিন কুরূপা চরিত্রহীনা পায়রা ফিরে এল মেয়েকে নিয়ে। সে ঘনিষ্ঠ হতে চাইল হেমাঙ্গের সঙ্গে। এই স্বার্থপরতা সহ্য করতে পারে না হেমাঙ্গ। তাই সে মদের বোতলের ভাঙা কাচে গলার নালি কেটে আত্মহত্যা করে। নতুবা তার কাছে পরিত্রাণের কোনো পথ ছিল না।

'নিষাদ' গল্পে আছে মৃত্যুর নিষ্ঠুর রূপ। এখানে একটি হত্যা ডেকে এনেছে একটি মৃত্যু। গল্পের শিরোনামের নীচে আছে 'You begin by killing a cat you end by killing a man' আর 'ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ......কিংবা কাল......।'' গল্পটিতে গানের ধুয়ার মতো ঘুরে ঘুরে এসেছে পঙ্ক্তিটি। কৃষ্ণবর্ণ বারো বছরের কিশোর জলকু ভালোবেসেছিল ছাগলছানা মানিককে। তার প্রতিবেশী যুবা যার জবানিতে গল্পটি উপস্থাপিত ভালোবাসত গাছপালা। মানিক চিবিয়ে খেয়েছিল তার ডালিয়া গাছ। তরু আর তার প্রেমের মধ্যেও বাধা হয়ে উঠেছিল মানিক। তাই এক দুপুরে গ্রামোফোনের দম দেওয়া হ্যান্ডেল ছুঁড়ে মেরেছিল সে মানিককে। সে বোঝেনি এই সামান্য আঘাতে মারা যাবে মানিক '......একটুতেই কত কি যে মরে যায়! আশ্চর্য।' জলকু ভেবে নেয় রেলে কাটা পড়ে মরেছে মানিক। তাই রেললাইনে নেমে নিষ্ঠুর আক্রোশে পাথর ছুঁড়ে মারত সে লাইনের গায়ে। একমাত্র বক্তাই তাকে ধরে আনতে পারত। কারণ জলকুর বাবা পঙ্গু আর বাড়িতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই। জলকুর সঙ্গী ছিল না, একমাত্র ছাগলছানা মানিক ছিল তার সাথী, বন্ধু সব কিছু। তাই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা অব্যর্থ নিশানায় জলকু বার বার রেললাইনের লোহার ধারালো ধাতব হিংস্রতাকে আঘাত করে যায়। বক্তা বার বার তাকে ধরে আনে দুপুরে তীক্ষ্ণ তাপ উপেক্ষা করে। বক্তা তাকে নিষেধ করে। জলকু শোনে না।

এক বিকেলে বক্তা যখন স্নানের আরাম শুষে নিচ্ছিল সারা দেহে তখনই জলকু চলে যায় লাইনের দিকে। স্নান সেরে সেজেগুজে বাইরে বেরোতেই তার পিসি তরু দেয় জলকুর পলায়নের সংবাদ। হঠাৎ তার মনে হয় একটু আগে চলে গেছে একটা মালগাড়ি। তখন সে স্নান করছিল। সম্ভবত সেই গাড়ি কেড়ে নিয়েছে জলকুর প্রাণ। তবুও সে এগিয়ে যায়। সূর্যাস্তের শেষ আলো তার চোখে, হয়ে যায় ''অসহ্য গাঢ় আশ্চর্য রকম লাল।'' সেই আলো টিলার তলার রেললাইনের মুখে পড়েছিল সেই ভাষাময় আলোক ''আমার চোখের সাড়া পেয়ে আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাল তারপর উড়ে গেল। ছায়ার মধ্যে তালগোল পাকানো কালো জামাপরা জলকুর একটু চিহ্ন। পাথরের গায়ে গায়ে আর সব নিশ্চিহ্ন। স-ব''

ফলে বক্তার সত্তায় এসে চাপে আর একটি হত্যার ভার। অনেক রাতে সেই অপরাধী যুবক টিলার কাছে গিয়ে জলকুকে ডেকে স্বীকার করে নিজের অপরাধ।

গল্পটিতে আশ্চর্য নিপুণতায় প্রবল শক্তিমানের নির্মমতার হাতে দুর্বল প্রাণ এবং তার প্রবল ভালোবাসার মৃত্যুর কঠিন নিষ্ঠুর চিত্র এঁকেছেন লেখক।

(৭) রূপক গল্প—বিমল করের গল্পে প্রায় প্রথম থেকেই আছে রূপকের ব্যবহার। 'রামচরিত' গল্পে জ্বরাক্রান্ত পরিতোষ নিজে জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে অনুভব করেছিল রামের মতোই সে পিতাকে শোক আর মৃত্যুর

হাতে সমর্পণ করে একা চলেছে দীর্ঘ বনবাসে। ‘নরেন গতি’ গল্প মনোমোহনের জ্বলন্ত চিতার সামনে রহস্যময় এক মানুষ এসে দাঁড়ায় তিনটি কাঠি নিয়ে আর সেই কাঠি দিয়ে বলে দেয় সচ্চরিত্র ভদ্র বলে পরিচিত মনোমোহনের আত্মা নরকে। কারণ সেটাই তার আসল পরিচয়।

১৯৯০-এর ৩ নভেম্বর সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন চার-পাঁচটি রূপক ধরনের গল্প লেখার কথা। ‘‘লেখাগুলো পড়লে আপাতত মনে হবে, কোনও গ্রাম্য কিংবা অলৌকিক কাহিনি। কিন্তু আমি সে চেষ্টাগুলোর মধ্যে আধুনিক মনের একটি পরিচয় এবং একটা চরম বা পরম মানবসত্যের কথা প্রকাশ করতে চাই।’’ এই চিন্তার ফলেই লেখা হয় ১৯৯০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১-এর এপ্রিল-এর সাপ্তাহিক ‘দেশ’ এ প্রকাশিত পাঁচটি গল্প—‘সত্যদাস’, ‘কাম ও কামিনী’, ‘ফুটেছে কমলকলি’, ‘যুধিষ্ঠিরের আয়না’ এবং ‘নদীর জলে ধরা ছোঁয়ার খেলা’ এই পাঁচটি গল্প নিয়ে মুদ্রিত হয়েছিল ‘উপাখ্যানমালা’ সংকলনটি।

আমরা আলোচনা করব ‘যুধিষ্ঠিরের আয়না’ গল্পটি। এখানে প্রতীকী জিনিসটি হল পুরোনো এক আয়না। মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত গগনচন্দ্রের জীবন বাঁচিয়েছিল সৎ যুধিষ্ঠির। কৃতজ্ঞ গগন তাকে বাড়িতে রেখেছিল পরম মমতায়। নানা কাজে পটু যুধিষ্ঠির গগনের বাড়ির অনেক কিছু সারিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গগনচন্দ্রের বউ রোহিণী তাকে সহ্য করতে পারত না। তার নামে দিত নানা মিথ্যা অপবাদ। তাই সে একদিন নীরবে ছেড়ে চলে যায়; যাওয়ার আগে একটি পুরোনো পারা-ওঠা আয়না সরিয়ে দিয়ে যায়। সেই আয়নায় মুখ দেখে ভয় পায় রোহিণী। তার আতঙ্ককম্পিত হাত থেকে পড়ে যায় আয়না। সেই ভাঙা কাচে গগনের বিধবা বোন কমলার হাত বিপজ্জনক ভাবে কেটে যায়। এসব জেনে যুধিষ্ঠির গগনকে বলে আয়নাটি আসলে হৃদয়। সেই মন বা হৃদয় ভালোবাসা মায়ামমতা দিয়ে ধুয়ে নির্মল করে রাখতে হয় নতুবা তার থাকে না ভালোবাসার অধিকার। ‘‘হৃদয় যদি নির্মল না হয়—একটি শিশুকেই তুমি চুম্বন করতে পার না।’’ রোহিণী আর কমলার মন নির্মল ছিল না। তাই আয়না তাদের ভয় আর বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বোঝা যায় বিমল কর ভালোবাসা, দয়া প্রভৃতি গুণকে শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য দিতে চেয়েছেন।

(৮) সরস গল্প—এইসব গভীর রচনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মধুর সরস গল্প লিখেছেন বিমল কর। যেমন ‘বসন্ত বিলাপ’, ‘কেমিস্ট্রি ও কালিদাস’, ‘অভিনব প্রেম’, চারতাস, ‘প্রেমশশী’ প্রভৃতি। গল্পগুলি চারিত্রিক অসংগতি থেকে উঠে এসেছে নির্মল স্নিগ্ধ কৌতুক।

‘কেমিস্ট্রি’ ও ‘কালিদাস’ গল্পে মফস্‌সল শহরে কো-এডুকেশন কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ফুলরেণু ছেলেমেয়েদের সহজ মেলামেশাকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি। বিশেষত সংস্কৃতের অধ্যাপক আর তার পড়ানোর বিষয় সম্পর্কে তার ছিল তীব্র ক্রোধ। সমাজ আর নারীর সম্মান রক্ষার জন্য স্বর্ণকমলের বিরুদ্ধে সে অধ্যাপিকা আর ছাত্রীদের মধ্যে প্রচারে নামে। কিন্তু কিছুই ফল হয় না। বরং তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে মেয়েরা। ফুলরেণু স্বর্ণকমলের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ক্রমে তার রাগ পরিণত হয় অনুরাগে। আর উভয়ের পরিণয় সম্ভাবনায় শেষ হয় কাহিনি। গল্পটি গ্লানিহীন শুদ্ধ কৌতুক আমাদের মনে এনে দেয় দুর্লভ আনন্দের স্নিগ্ধতা।

ভাষা : বিমল করের ভাষা ধীর অথচ আকর্ষক। তাঁর বাক্‌রীতি সংহত এবং ইঙ্গিতময়। সংকেত আর চিত্রকল্প তাঁর ভাষার বিশেষত্ব। ‘নিষাদ’ গল্পের ভীষণ পরিণতির ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই চিত্রকল্পে—‘‘অনুভব করতে পারছিলাম—টিলা, পাথর, লাইন, মাঠ, লোহা, স্লিপার সবই—, সমস্ত কিছু এক ভয়ঙ্কর দহনের ঝলসানিতে জ্বলছে। অবোধ্য আকারহীন এবং নির্মম কোনো হিংস্রতা তার বিরাট করতলে আস্তে আস্তে গুটিয়ে মুঠো করে নিচ্ছে।’’

তাঁর ভাষায় রয়েছে নিজস্বতা—‘চাঁদের আলোয় উঠোন সারা ভেজা।’ (ইঁদুর) বাক্যটিতে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা যেন বাস্তব হয়ে ওঠে।

ভাষা-বিন্যাসে অভিনবত্ব তাঁর রচনার আর এক বিশেষত্ব। বিকালের বর্ণনায়—"......যাবার আগে যেন দিনের আলো তার শুকোতে দেওয়া টুকরো জিনিসগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে। শিরীষ গাছের তলা থেকে আলো চলে গেছে, ছায়াগুলো কালচে হয়ে এসেছে, পাখিরা পালাচ্ছে একে একে, জল সারি নিয়ে বুড়ো মালি চলে যাচ্ছে।" (গগনের অসুখ')

বিষয়, বর্ণনাভঙ্গি, ভাষাবিন্যাস, উপস্থাপনা—সব কিছু মিলিয়ে যথার্থই বিমল কর বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে নতুন প্রকারণের সার্থক শিল্পী।

৫.১২ রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-)

১৯২২-এর ২৮ ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর শহরে তারাপ্রসন্নের পুত্র রমাপদ চৌধুরীর জন্ম।

শিক্ষা : রেল শহর খড়গপুরেই কেটেছিল তাঁর কৈশোর। খড়গপুর রেলওয়ে স্কুল থেকে ১৯৩৯-এ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং প্রেসিডেন্স কলেজে ভরতি হন। সম্ভবত ইংরেজি নিয়ে তিনি বি. এ. পাশ করেন ১৯৪২-এ। এসময় তিনি থাকতেন ইডেন হিন্দু হস্টেলে। সম্ভবত ১৯৪৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন। নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব আর বিজ্ঞানে ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ।

কর্মজীবন : রমাপদ চৌধুরীর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৪৬-এ রাঁচির রেলিগাড়া কোলিয়ারিতে। পরে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৪৮-' ৫১ তে তিনি 'ইদানিং' এবং 'রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা' সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯৫৮-তে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদনার ভার পান। কর্মজীবনের অবশিষ্ট সময় তিনি এই পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক হিসাবে কাজ করছেন।

সাহিত্যজীবন : যখন রমাপদ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখনই তাঁর লেখা গল্প 'ট্রাজেডি' মুদ্রিত হয় 'সাপ্তাহিক আজকাল' পত্রিকায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। অর্থাৎ ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য,জীবনের সূচনা। তবে সেই সময়ের লেখা বেশিরভাগ গল্পেরই কপি পাওয়া যায় না। ১৯৪৩-এর রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বের হয় তার 'বারো ঘোড়ার আস্তাবল' গল্পটি। পরে এ গল্পের নাম বদলে হয় 'শান্তা'। এবছরেই 'যুগান্তর সাময়িকী'তে মুদ্রিত হয় তাঁর 'উদয়াস্ত' গল্পটি। দুটি গল্পের জন্য সম্মান-দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল পাঁচ টাকা করে। ১৯৪৪-এ 'পূর্ব্বাশা'-য় মুদ্রিত হয় রমাপদ চৌধুরীর বেশ কিছু গল্প। ১৯৪৬-এ 'শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বের হয় তাঁর 'বাবুই' গল্পটি। ১৯৪৭-এ ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে পাঁচটি গল্প—'আড়াল', 'শিশুমেধ', 'তিন তারা', রমাপদ চৌধুরী ছোটো গল্পের জগতে নিজের আসন পাকা করে নিচ্ছিলেন। তাই এই সময়ের 'শনিবারের চিঠি' আধুনিক সাহিত্যের প্রবণতা ব্যখ্যা প্রসঙ্গে রমাপদ চৌধুরীর 'আড়াল' গল্পের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পের উদ্ধৃতির সঙ্গে। দুর্ভাগ্যের বিষয় 'আড়াল' গল্পেরও কপি পাওয়া যায় না। একসময় 'পত্রনবীশ' ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। একদা অন্তর্মুখীন সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। সিন্ধি, মালয়ালম, তামিল, হিন্দি আর ইংরেজি ভাষায় তাঁর বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস অনুদিত হয়েছে। সাহিত্য অকাদেমী থেকেও তাঁর কিছু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গল্পসংখ্যা একশোরও বেশি; গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা উনিশ।

গল্প-সংকলন তালিকা :

(১) 'তিন তারা' ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ : ১৯৪৮

(২) স্বর্ণমারীচ' ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ : ১৯৫০

(৩) 'অভিসার রঙ্গনটী' ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ : ১৯৫১

(৪) ‘দরবারী’ ১৯৫৩
(৫) ‘কখনো আসে নি’ ১৯৫৮
(৬) ‘পিয়াপসন্দ’ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ : ১৯৫৫
(৭) ‘আপন প্রিয়’ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ : ১৯৫৭
(৮) ‘কথাকলি’ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ : ১৯৫৯
(৯) ‘মুক্তবন্ধ’ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ : ১৯৫৯
(১০) ‘চন্দনকুঙ্কুম’ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ : ১৯৬১
(১১) ‘দেহলী দিগন্ত’ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ : ১৯৬২
(১২) ‘যদিও সন্ধ্যা’ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ : ১৯৬৬
(১৩) ‘সুখের পায়রা’ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ : ১৯৬৬
(১৪) ‘রুমাবাই’ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ : ১৯৬৬
(১৫) ‘লজ্জাবতী’ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ : ১৯৬৬
(১৬) ‘ত্রয়োদশী’ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ : ১৯৬৭
(১৭) ‘ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য গল্প’ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ : ১৯৬৯
(১৮) ‘দিনকাল’ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ : ১৯৭১
(১৯) ‘স্বর্ণলতার প্রেমপত্র’ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ : ১৯৭২
(২০) ‘আমরা সবাই একসঙ্গে’ ১৩৮০ : ১৯৭৩
(২১) ‘পোস্টমর্টেম’ ১৯৮২

গল্প-বৈশিষ্ট্য : রমাপদ চৌধুরী অন্তর্মুখী লেখক। ঘটনাবাহুল্যহীন অথচ মননদীপ্তিতে উজ্জ্বল তাঁর গল্প। মূল ভাবের অনুযায়ী ঘটনা আর চরিত্র রয়েছে তার রচনায়। নিপুণ বিশ্লেষণে তিনি চরিত্রগুলির মনোজটিলতা স্পষ্ট করে তোলেন। কঠিন বাস্তবের নির্মম চিত্র রমাপদ নিরাশক্ত চিত্তে ভাষায় রূপায়িত করেন। তাঁর গল্পের পটভূমি বিস্তৃত, চরিত্রসমূহ বিবিধ শ্রেণির। প্রথম যুগে তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবে এসেছে আদিবাসী জীবন। এগুলি রাঁচি-হাজারিবাগের পটভূমিতে রচিত। তাঁর প্রথম কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে এইসব কাহিনি। গল্পগুলির অলংকৃত ভাষা মনে আনে সুবোধ ঘোষের রচনার স্মৃতি। পরে তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালির আশা-নিরাশা, দুঃখ-যন্ত্রণা, ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রধান হয়ে উঠেছে। আবার যে সময়ের মধ্য দিয়ে তিনি এসেছেন, সেই যুদ্ধ-দাঙ্গা-দেশভাগ কলঙ্কিত সময়ের অক্ষরচিত্র স্পষ্ট হয়েছে তাঁর লেখনীতে।

অতএব আমরা রমাপদ চৌধুরীর গল্পগুলিকে চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারি (১) আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক গল্প, (২) যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, রাজনীতি-মূলক গল্প, (৩) মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক গল্প, (৪) মনস্তত্ত্বনির্ভর গল্প।

(১) আদিবাসী জীবন-নির্ভর গল্প : রমাপদ চৌধুরীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে নৃতত্ত্বের জ্ঞান মিশে গড়ে উঠেছে এই গল্পসমূহ। এগুলির মধ্যে বিখ্যাত ‘দরবারী’ আর ‘রেবেকা’ সোরেনের কবর’।

‘দরবারী’ প্রথম মুদ্রিত হয় শচীন ভৌমিক সম্পাদিত ‘সূচীপত্র’ মাসিক পত্রে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। পরে লীলা রায় গল্পটি অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ বের হয় শারদীয় ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’য়। শুধু এই গল্পটি নিয়ে একটি গ্রন্থও বের হয়েছিল। বইটির ভূমিকায় লেখক জানান গল্পটির ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। তিনি প্রতীকী ব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছিলেন গল্পটির মধ্যে—“......জোনাথনের মুন্ডা মেয়ে বিয়ে করা; আসলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের সমন্বয় বোঝাবার জন্যে।...ম্যাক বা ক্লারাকেও চেয়েছি ইঙ্গভারতীয়ের প্রতীক বানাতে। জোনাথন ও শোনিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুও আসলে সেই সমন্বয়-স্বপ্নের মৃত্যু’।

রেলের ছোটো স্টেশন লাপরা। তার কাছে ছিল মুন্ডাদের ছোটো একটি গাঁ। একদিন এই স্টেশনে এসে পড়ে জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি। সে ভারতবর্ষকে ভালোবেসে ভারতীয় হতে চায়, থেকে যেতে চায় দেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তাই একটি পাহাড়ের গাঁয়ে সে বানায় সুন্দর বাংলো, বিয়ে করে মুন্ডা মেয়ে শোনিয়াকে। তাদের মান্ডা পরবের খরচ দেয় সে। প্রসঙ্গত লেখক মুন্ডাদের পৃথক গিতিওড়ায় যুবক-যুবতীদের রাত কাটানো, নৃত্যগীত, মহুয়া পান—প্রথাগুলির কথা বলেছেন কৌশলে। এই বিয়ে উপলক্ষে জোনাথন নিমন্ত্রণ করে তার বন্ধুবান্ধবদের। কিন্তু আসে শুধু রাঁচির ছোটো গির্জার রেভারেন্ড ব্রাউন আর প্রৌঢ়া মেম মিসেস ক্যাসল্, অষ্টাদশী ফ্লোরা এবং দুটি কিশোর। তাদের বিস্মিত করে গোরুর গাড়ি চালিয়ে এসে পড়ে নগ্নগাত্র জোনাথন। অবজ্ঞায় তারা ফিরে যেতে চায়। ট্রেন না থাকায় তারা জোনাথনের বাড়ি থেকে যায়। এমনকী মান্ডা পরবও দেখতে যায় সবাই।

ক্রমে লাপরায় গড়ে ওঠে একটি ইঙ্গভারতীয় উপনিবেশ। নির্মিত হয় গির্জা, স্কুল, রেস্টহাউস, দোকানপাট। মুন্ডারা দলে গ্রহণ করে খ্রিস্ট ধর্ম। জোনাথন এ উপনিবেশের স্রষ্টা হিসাবে শ্রদ্ধা পেল। তার মুন্ডা স্ত্রীর পুত্র-কন্যাকে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করল না কেউ। কিন্তু জোনাথন খুশি হল না। সে চেয়েছিল মুন্ডা হয়ে যেতে, তাদের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে। কিন্তু তার বদলে গড়ে উঠেছে 'এ ব্রিটিশ ভিলেজ হিয়ার ইন ইন্ডিয়া'। পরিণামে তার সন্তান ম্যাক ঘৃণা করেছে মুন্ডা মাকে। কারণ শ্বেতাঙ্গিনী ইভা হাগিন্স প্রত্যাখ্যান করেছে তার প্রেম। মুন্ডা মায়ের এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একত্রিত হয় মুন্ডারা। তারা ঠিক করে শ্বেতাঙ্গদের তারা "...কাঁইটা সাফ করবো বটে," শ্বেতাঙ্গরাও প্রস্তুত হয় আসন্ন সংগ্রামের জন্য। বাস্তবে ঘটে এর বিপরীত ঘটনা। এক সকালে গির্জার অলটারের সামনে জোনাথন আর শোনিয়ার পর আবিষ্কার করেন মি. ব্রাউন। দেখা যায় অলটার থেকে গির্জার দরজা পর্যন্ত দুটি দীর্ঘ রক্তের রেখা। রেভারেন্ড ব্রাউন বললেন হয়তো আসন্ন দুর্বিপাক থেকে কলোনিকে রক্ষার জন্যই এই দম্পতি আত্মহত্যা করেছে। পুলিসি তদন্তেও তিনি বাধা দেন তিনি। আসলে রেভারেন্ড ব্রাউন হত্যা করেছিলেন তাদের। তিনি চাননি সাহেবরা হবে ভারতীয়। তাঁর কাম্য ছিল এই 'হিদেন'রা খ্রিস্টের আলোয় আলোকিত হবে। তাঁর বাসনাই পূর্ণ হল। জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি চেয়েছিলেন লাপরার মানুষ হতে। কিন্তু হল তার বিপরীত। লাপরাই বদলে গেল, তাঁর মৃত্যুর সম্মানে তার নাম হল ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ। ধর্মের কাছে, তথাকথিত সভ্যতার কাছে পরাস্ত হল মানবতা, মুছে গেল জোনাথনের ইঙ্গ-ভারতীয়ের 'সমন্বয়-স্বপ্ন'।

'রেবেকা সোরেনের কবর' ১৩৬০ সালে লেখা এক আদিবাসী মেয়ের একনিষ্ঠ প্রেমের গল্প। কোলিয়ারির পটভূমিতে রচিত গল্পটির মূল বিষয় কোল এজেন্ট ফার্ন হোয়াইট-এর ছেলে ম্যাকুর সঙ্গে কয়লাখাদানের সাঁওতাল কামিন রূপমতির প্রেম। প্রসঙ্গত কাহিনিতে এসেছে আদিবাসী সমাজের বহিষ্করণ প্রথা 'বিটলা'। রূপমতি কিন্তু ভালোবাসতো লালোয়া কুডুকে। লালোয়াও ভালোবাসতো তাকে। হঠাৎ রঙ্গগীতিনাট্যের আসরে তাকে নিয়ে শুরু হল গান। বাধল দাঙ্গা। আর প্রেমিক লালোয়াকে বাঁচানোর জন্য, আত্মরক্ষার জন্য ম্যাকু সাহেবের সঙ্গে অন্ধকার মাঠে আত্মগোপন করল রূপমতী।

তাই পঞ্চায়েত বিচার করে 'বিটলা' করে রূপমতী আর তার বাব মাধো সোরেনকে। সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা মাদল বাজিয়ে ঘিরে ধরে রূপমতীকে। আরম্ভ হয় ঠাট্টা, অশ্লীল গান আর দৈহিক আক্রমণ। রূপমতীর ডেরার সামনে বাঁশ পুঁতে তার আগায় গেঁথে দেওয়া হয় পোড়া কাঠ, পুরনো ঝাঁটা আর এঁটো শালপাতা। ভেঙে ফেলা হয় তারা উনুন, হাঁড়িকড়াই। রূপমতীর সখি সোনামিরুর মুখে খবর পেয়ে ম্যাকু এসে তাকে উদ্ধার করে চরম অসম্মানের হাত থেকে। তাকে নিয়ে গেল নিজের বাংলোয়। বাবাকে সে বলল সব কথা। জানাল রূপমতীকে বিয়ে করবে সে। তবুও রূপমতী আশা করেছিল লালোয়া এসে বাঁচাবে তাকে। কিন্তু লালোয়া আসে না পঞ্চায়েতের ভয়ে। গভীর অভিমান আর কৃতজ্ঞতায় খ্রিস্টান হয় রূপমতী; তার নাম হয় রেবেকা। ম্যাকু সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হয় তার খ্রিস্টীয় মতে। সে বিশ্বাস করে ম্যাকুসাহেব তার হাসবাঁধ। তাকে রক্ষা করেছে অপমান থেকে, দিয়েছে ঘরণীর সম্মান।

হঠাৎ চাকরি যায় ফার্নহোয়াইটের। আর চাকরির জন্যও বটে আবার রূপের আকর্ষণেও বটে ম্যাকু সিলভিয়াকে বিয়ে করবে বলে চলে যায়। যাওয়ার আগে টাকার সঙ্গে আবার প্রতিশ্রুতিও দেয় সে। সরল আদিবাসী মেয়ে গভীর বিশ্বাস করে সেই প্রতিশ্রুতিতে। আর হাসবাঁধের সম্মান রক্ষার জন্য সে না নেয় খাদে কাজ, না শোনে লালোয়ার ঘর বাঁধার প্রার্থনা। এর মধ্যে ম্যাকুর ছেলের জননী হয়েছে সে। ম্যাকু আসে না আর। দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তা গ্রাস করতে থাকে তাকে তিলে তিলে। লালোয়া আর সোনামিরু শুধু আসত তার কাছে। শেষে মারা যায় রেবেকা বা রূপমতী। সোনামিরু নেয় তার ছেলেকে পালনের ভার। চাঁদা করে খ্রিস্টান মতে কবর দেওয়া হয় রূপমতীকে; আড়াআড়ি কাঠ বেঁধে ক্রুশ দেওয়া হয় সে কবরে। লালোয়া আর সোনামিরু এসে বসতো কবরের পাশে প্রতি সন্ধ্যায় জ্বেলে দিত প্রদীপ। লালোয়ার প্রতি সোনামিরুর গোপন প্রেমেই হয়তো এর কারণ। ক্রমে রূপমতীর কবরের পাশে মুরগি বলি, পৌষপরবে নাচ শুরু হল। শেষে ওঁরাও, মুন্ডা সাঁওতাল, হো—সবাই মিলে পাথরে বাঁধিয়ে দিল একদা সমাজবহিষ্কৃত মেয়েটির কবর। তার কবরের পাথরে খোদাই করা হল মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের নাম।

স্থানীয় এক কিংবদন্তীর ভিত্তিতে নির্মিত গল্পটিতে আদিবাসিদের আদিম সমাজবিন্যাস, কয়লাখনির আবহে তাদের জীবনযাত্রার বাস্তব উপস্থাপনা ভিন্ন কৃতজ্ঞতা, প্রেম—এবং তার স্বীকৃতির মানবিকতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এ গল্প।

যুদ্ধ দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বদেশের রাজনৈতিক-নৈতিক আবহ, হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক—সমকালের এসব সমস্যা রূপ পেয়েছে রমাপদ চৌধুরির সহৃদয়, বিশ্লেষণাত্মক ইঙ্গিতগর্ভ কিছু গল্পে।

‘রক্তবীজ’ আর ‘ভারতবর্ষ’ দুটি গল্পের পটভূমি যুদ্ধ। যুদ্ধ কেমন করে মানুষের মন থেকে মুছে দেয় মনুষ্যত্ব তারই মর্মান্তিক চিত্র ‘রক্তবীজ’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিদেশি সৈনিক আব্রাহাম ম্যালিওনেস্কা আর স্টিফেন হিউজেস নীলিমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তার দাদা সুধাকান্তের বন্ধুত্বের সুবাদে। কিন্তু এক রাতে হঠাৎ এই দুই সৈনিক হয়ে গেল শয়তান। ট্রাক ভর্তি সৈন্য নিয়ে সে আক্রমণ করল পরিবারটিকে। ধর্ষণ করল নীলিমা, তার বিধবা দিদি, গর্ভবতী বউদিকে। বাধা দিতে গিয়ে পিস্তলের গুলিতে মারা গেলেন তাদের বাবা, আহত হল সুধাকান্ত। পরে দিদি পাগল হয়ে ঘর ছাড়ল, বউদি অসুখে ভুগে মারা গেল। সুধাকান্ত মিলিটারি ট্রাকের তলায় নিঃশেষ করে দিলে নিজেকে। দীর্ঘদিন পরে সেই দুই বিদেশি সৈন্যের একজন ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। জানিয়েছিল ‘যুদ্ধ’ নামের বড়ো শয়তান যা মানুষকে করে তোলে পশু—তাকে মুছে দেওয়াই হবে তার ব্রত। মানুষের পারস্পরিক প্রীতি গল্পশেষে জয়ী হয়েছে। ধনী প্রতিবেশী এগিয়ে এসেছে নীলিমার অসুস্থ স্বামী মৃণালের চিকিৎসার সহায়তায়। জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রেরণা পেয়েছে নীলিমা। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে লিখিত গল্পটির সমাপ্তি একটু দুর্বল। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে লিখিত ‘ভারতবর্ষ’ তুলনায় আরও সংহত এবং শিল্পসার্থক।

অস্থায়ী এক ফৌজি স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য থামত সৈন্যবাহী ট্রেন। বিদেশি সৈন্যরা কৌতুকের জন্য কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে জমাট বাঁধা মাহাতো গাঁয়ের চাষি মানুষগুলির দিকে ছুঁড়ে দিত পয়সা। প্রথমে সংকোচভরে তুলে নেয়নি কেউ সে পয়সা। ক্রমে দেখা গেল শ্রমলব্ধ অন্নের পরিবর্তে বিনাশ্রমে অর্থলাভের লোভ গ্রাস করেছে তাদের। বিদেশিদের দেখলেই তারা চিৎকার করে ‘বকশিশ’ চায়। বিদেশিদের চোখে তারা ‘ব্লাডি বেগার্স’। গাঁয়ের মোড়ল তাদের নিষেধ করত বৃথাই। শেষে একদিন দেখা গেল সেও যোগ দিয়েছে এই ভিখারিদের দলে। একদিন যুদ্ধ থামল, উঠে গেল সেই বকশিশ, কিন্তু গাঁয়ের মানুষগুলিকে যুদ্ধ করে দিয়ে গেল অলস, ভিক্ষুক।

দাঙ্গা, দেশভাগ অথবা দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষভাবে আসে নি রমাপদ চৌধুরীর গল্পে। এসেছে তার পরে মানুষগুলির অবস্থার কথা। ‘অঙ্গপালী’ (রচনাকাল ১৩৫৬) আর ‘করুণকন্যা’ (রচনাকাল ১৩৫৮)—দুটি গল্পেই দেশভাগের সময়ের দাঙ্গায় অপহৃতা দুই মেয়ে সন্তানসহ ফিরে এসেছে স্ব-পরিবারে। পুলিশ তাদের পৌঁছে দিয়েছে স্বজনের কাছে। কিন্তু পরিবার আর সমাজ মন থেকে আপন করে নিতে পারেনি তাদের। ‘অঙ্গপালী’ হৃতা কন্যা সবিতাকে সসন্তান ফিরে পেয়ে পরিবারে জেগেছে আনন্দ। শিশুটিও অনাদৃত হয়নি। কিন্তু অনেক রাতে মেয়েটির মা অসুস্থতা

সত্ত্বেও স্নান করেছেন। কারণ—সারাদিন সেই শিশুটিকে নাড়াচাড়া করেছেন, যে 'কোলে করে মানুষ করছে বলে তো আর আমাদের ছেলে নয় বাপু।'

'করুণকন্যা'-তেও নায়িকা অরুন্ধতী অপহৃত হয়েছিল দেশভাগ কালের দাঙ্গায়। অপহারকের ঘর করেছিল; তার সন্তানকে ধারণ করেছিল গর্ভে। হঠাৎ এল দারোগাপুলিস। সন্তানসহ অরুন্ধতি ফিরে এল ঘরে। কিন্তু পরিবার আর সমাজ তাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারল না। মা কখনও তাকে বললেন ছেলেকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে মানুষ করতে, কখনও দিলেন থান পরার পরামর্শ। অরুন্ধতী সবই উপেক্ষা করল তার পরিবারের জন্য খুঁজতে বের হল চাকরি। সেই খোঁজার পথেই সে দেখা পেল পূর্ব প্রেমিক সুবিমলের। কিন্তু তাকে কিছুতেই বলতে পারল না আপন অবস্থার কথা।

তখনই তার অপহারক মানুষটি চিঠি দিল তাকে ফিরে পাওয়ার, অন্তত সন্তানটি ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে। উত্তর পেল না সেই দুর্বৃত্ত। অরুন্ধতী শেষে সুবিমলকে সত্য জানিয়ে দেওয়া স্থির করে। এ সময়ই সুবিমল বলে তার অপহৃতা বোন মাধুরীর কথা। হরণকথা গোপন করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার। মাধুরী স্বামীর কাছে কপটতার মুখোশ খুলে ফেলেছিল। তাই স্বামী হয়েছিল নিরুদ্দেশ। পিতৃপরিবারও গ্রহণ করেনি তাকে। ফলে মাধুরীকে গ্রহণ করতে হয়েছে আদিম ব্যবসায়। এরপর সুবিমল জানায় 'মন শরীরের বল। শরীর অশুচি হলে...'। এসময়ে সেই দুর্বৃত্তের শুধুমাত্র সন্তানকে দেখতে চাওয়ার কামনা নিয়ে লেখা চিঠি পায় অরুন্ধতী। ততদিনে আপন অবস্থান চিনে নিয়েছিল সে। তাই গভীর রাতে সন্তানকে নিয়ে সেই মানুষটির সঙ্গেই চলে যায় সে সানন্দে নয়, বাধ্য হয়ে। কারণ 'সমস্ত পৃথিবীই যে ফিরে চলেছে আদিম সংস্কারের কাছে। পিছনের পথে তাকে, সব মানুষকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।'

সংস্কারজীর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজের রূপটি এভাবেই উঠে এসেছে রমাপদ চৌধুরীর লেখনীতে। যুদ্ধপরবর্তী স্বাধীন ভারতবর্ষে সুবিধাবাদী, স্বার্থপর একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এরাই এনেছে উৎকোচ-সংস্কৃতি। 'একটি হাসপাতালের জন্ম ও মৃত্যু' (১৩৭১ বঙ্গাব্দ) পত্রাকারে লিখিত গল্পটিতে আদর্শবাদী গ্রাম্যতরুণ, সুবিধাবাদী কন্ট্রাকটর গুণময় সেন, উৎকোচ-প্রত্যাশী সরকারি কর্মচারী, স্বার্থপর কর্মচারী নেতা—সকলের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। মোট তেত্রিশটি ছোটোবড়ো চিঠির সবগুলিরই লেখক গুণময় সেন। প্রথম চিঠিতে সে গাঁয়ের ছেলে অনন্তকে তাদের গাঁয়ে হাসপাতাল গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। ক্রমে চিঠিতে সে মন্ত্রী আর সংশ্লিষ্ট সকলকে এব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। কারণ এ ব্যাপারে তার নিজের অর্থলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের কর্মচারী শিবেনকে লেখা চিঠিতে সে প্রয়োজনীয় উৎকোচ দানের নির্দেশ ইঙ্গিতে দিয়ে দেয়। কখনও নিজেই সে কথা লিখে দেয় প্রয়োজনীয় মানুষটিকে। যেমন বারো সংখ্যক চিঠিটিতে দেখি সে বসন্তবাবুকে অনুরোধ করেছে 'কে কে টেন্ডার দেবে আন্দাজ পেলে অনুগ্রহ করে জানাবেন। আর চিনি চাই?' তারপর হাসপাতার তৈরি হয়। কন্ট্রাক্টর গুণময় সেন টাকা পেয়ে যান ঠিকই। কিন্তু যথোপযুক্ত তদ্‌বিরের অভাবে আসে না ডাক্তার, নার্স বা যন্ত্রপাতি। অনন্তের চিঠিতে সে খবর পেয়েও অবিচল থাকে গুণময়, বরং ব্যঙ্গ করে "....ডাক্তার নার্স যোগাড় করার কাজটার জন্যেও যদি টেন্ডার ইন্‌ভাইট করে তবেই কাজ হবে।" হাসপাতাল বিল্ডিং এর দেওয়াল ধসে পড়ার সংবাদে সে জানায় 'ইনসপেকশনের' সময় তো ত্রুটি পাওয়া যায়নি। যন্ত্রের অভাবই এর কারণ।

গল্পটির শেষ চিঠিতে গুণময় কর্মচারী শিবেনকে নির্দেশ দিয়েছে অনন্তের চিঠি এলেই ছিঁড়ে ফেলে দিতে। কারণ তার স্বার্থ পূর্ণ হয়েছে। তাই কৃতকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে সে রাজি নয়। ক্ষমতাবান স্বার্থপর সমাজ কাঠামোয় কেমন করে বিধ্বস্ত হয়ে যায় দুর্বলের সৎ কর্মের উৎসাহ তার নিষ্ঠুর রূপটি ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে এই নিটোল গল্পটিতে।

(৩) মধ্যবিত্ত সমাজভিত্তিক গল্প—এই ধরণের অসংখ্য গল্প লিখেছেন রমাপদ চৌধুরী। মধ্যবিত্তের উপায়হীনতা, অসহায়তা, বিত্তহীনতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা—ভালো-মন্দ মেশানো তাদের জীবনের প্রতিটি বিন্দু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রমাপদ চৌধুরীর লেখায়। মধ্যবিত্তের স্বার্থপর, সংকীর্ণতা, অহেতুক মিথ্যা বীরত্বের মিথ্যা আস্ফালন—সঠিকভাবে চিত্রিত করেছেন লেখক 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পে। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে রচিত গল্পটি

নায়িকার জবানিতে উপস্থাপিত। বিয়ের পর মেয়েটি পুরী বেড়াতে গিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে। স্বামী গৌতম নুলিয়া না নিয়েই সমুদ্রে নেমে যায়। সঙ্গে নেয় স্ত্রীকে। একটি নুলিয়া তাকে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু পত্নীর কাছে বীরত্ব দেখানোর মিথ্যা গর্বে নুলিয়াটির সতর্কতা 'কারিন্ট আছে বাবু' কানেই ঢোকে না তার। গৌতম স্ত্রীকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেও ভীত মেয়েটি উঠে আসে তীরে। হঠাৎ স্রোত গৌতমকে টেনে নিয়ে যায় দূরে, মেয়েটি বুঝতে পারে ডুবে যাচ্ছে তার স্বামী। সে ছুটে এসে সেই নুলিয়ার হাতে হাতের বালাদুটো গুঁজে দিয়ে ব্যাকুল কান্নায় জানায় স্বামীকে বাঁচাবার প্রার্থনা। নুলিয়াটি হয়ত দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পরিচিত ছিল এই মনোভাবের সঙ্গে, অথবা সে ছিল নিতান্ত সাধারণ একটি মানুষ—যে কিনা মানুষের প্রাণ বাঁচানোকে কর্তব্য বলে চিনেছিল। তাই মেয়েটির খুলে দেওয়া বালা তারই হাতে তুলে দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রে; তুলে আনে অবসন্ন গৌতমকে।

এরপর যখন নুলিয়াটির সঙ্গে দেখা হয় নায়িকার তখন সে বালা দুটো দিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে অথচ দেয় না। কারণ তখন তার মন হয়ে উঠেছে সচেতন। স্বামীর প্রাণের চেয়ে এখন তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে সোনার বালা। সে ভাবে বালা দিয়ে দিলে হয়তো শ্বশুরবাড়িতে তিরস্কৃত হতে হবে। চুড়ি দেওয়ার কথা মনে ওঠে তার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে দিদির পছন্দ এই চুড়ির গড়ন। আর দিদিই বলেছিল এ গয়নাগুলিই তাদের ভবিষ্যৎ; নিষেধ করেছিল বিক্রি করতে। এর মধ্যে এক বধূর মুখে সে শোনে—ডুবন্ত মানুষকে বাঁচানো নুলিয়াদের কাজ। সরকার থেকে তারা এজন্য টাকা পায়। সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায় তার মন—'সে ভাবে দিতে আমারই তেমন ইচ্ছে এখন আর হচ্ছে না।' সঙ্গে সঙ্গে এ ভাবনাও তার মনে থাকে যে নুলিয়াটি না থাকলে এই বাইশ বছর বয়সেই মুছে যেত জীবনের সব রং। বালা, চুড়ির পর সে ভাবে আংটি দেওয়ার কথা। অবশেষে যাওয়ার মুহূর্তে নুলিয়াটিকে দশটাকার চার পাঁচটি নোট থাকা সত্ত্বেও একটি মাত্র টাকাই দেয় নায়িকা নুলিয়াটির হাতে। তাতেই সে খুশি হয়ে চলে যায়। আর বাড়ি ফিরে মেয়েটি ভাবতে থাকে সত্যিই কি সে বালা দিতে চেয়েছিল? নিশ্চয়ই নয়। তখন তার মাথার ঠিক ছিল না। এছাড়া সে বলার আগেই হয়ত নুলিয়াটি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল কারণ—'কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানোই তো ওদের কাজ।'

আবার ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির চাপে মধ্যবিত্তের দুঃসহ অবসরজীবনের কথাও বিস্মৃত হননি রমাপদ চৌধুরী। 'টাকার দাম' তার নমুনা। নায়ক শিবতোষবাবু চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার বছর কয়েক আগে থেকেই কলকাতায় বাড়ি করার কথা ভেবেছিলেন। স্ত্রী হেমলতা আর ছেলেমেয়েরা তাড়া দিচ্ছিলেন। কিন্তু শিবতোষের চিন্তায় ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি তৈরির মালমশলা আর জমির দাম কমে যাবে। তখনই তিনি তৈরি করবেন বাড়ি। তা আর হয় না। জিনিসপত্র, জমি সবকিছুরই দাম বেড়ে যায়। আর সংসারের দায় মেটাতে গিয়ে কমে যায় তাঁর সঞ্চয়। নিজের মনেই ভাবেন তিনি জমি, বাড়ি আসবাব—এদের দাম আর টাকার দাম কমে যায়। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় বর্ধিত দ্রব্যমূল্যের চাপে—যেমন করে বৃষ্টির জল ফুটফুটে সাদা পায়রাকে কালো করে দেয় তেমনি করেই।

(৪) মনস্তত্ত্বনির্ভর গল্প—মানবমনের বিচিত্র প্রবণতা তার রহস্যময় জটিল গতি অন্যান্য ছোটো গল্পকারদের মতো রমাপদ চৌধুরীকেও আকৃষ্ট করেছিল। তারই জন্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে 'তিতিরকন্নার মাঠ', ঠগ', 'ঈর্ষা', 'রায়', 'শুধু কেরানী'—এইসব গল্প। নারী মানসিকতার আশ্চর্য এক চিত্রায়ণ 'তিতির কান্নার মাঠ' গল্পটি। দুই বন্ধুর একজন সুনীতকে প্রত্যাখ্যান করে অসীমেন্দুর ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়েছিল অরুণিমা সান্যাল। আবার লাইম ফ্যাকটরির অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার সুনীত অসীমেন্দুকে চাকরি করে দেয় সেই ফ্যাকটরিতে। তিতির কান্নার মাঠ গ্রামের পাশে মহুয়ামিলন স্টেশনে নেমে যেতে হয় সেই ফ্যাকটরিতে। তারপর দুই বন্ধু মিলে সাজিয়ে তুলেছিল অরুণিমার ঘরসংসার। কিন্তু অসীমেন্দুকে এবার ফিরিয়ে দিল অরুণিমা। অসীমেন্দু চুনের চাঙড় খসাবার জন্য ডিনামাইট ফাটার মুহূর্তে সেখানে গিয়ে আত্মহত্যা করে। এরপর অসুস্থ অরুণিমা স্বামীপুত্রকে নিয়ে ট্রেন থেকে

নেমে দাঁড়ায় মহুয়ামিলন স্টেশনে। তারা ওঠে টিংলি টুডাঙের লালাবাবুর বাড়িতে। সেখানে সুনীতকে সে ফিসফিস করে বলে 'মেয়েরা যাকে প্রত্যাখ্যান করে তারই দয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে বড়ো লজ্জা যে তাদের নেই সুনীতদা।' তখনই পাঠক সুনীতের মতোই অনুভব করে '....স্বামীর উজ্জ্বল সোহাগের আড়ালে ফুটফুটে একটি ছোট্ট শিশুর হাসি আদরের নীচে আনন্দ আর উদ্দাম প্রগল্‌ভতার অন্তরে একটি ব্যর্থ পরাজিত তিতির শুধুই কাঁদছে, সারা দিন, সার রাত নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে।'' সেই নীরব বেদনাই টি. বি. হয়ে অরুণিমাকে শেষ করে দেয়। সুনীতই বোঝে এ '...মৃত্যু নয়, আত্মনিঃশেষ।' গীতিকবিতার মতো আবেশমধুর এরকম গল্পের সঙ্গে 'আমি একটি সাধারণ মেয়ে'-র মতো গল্পও লিখেছেন রমাপদ চৌধুরী। গল্পটিতে সাধারণ বাঙালি সংসারের মেয়েদের মনোজটিলতা নিপুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্‌ভাসিত হয়েছে। উত্তমপুরুষে বলা গল্পের নায়িকা বালিকাকালে পেয়েছিল মায়ের স্নেহযত্ন, কিন্তু বয়স বাড়তেই তার ভাগ্যে জোটে মায়ের তিরস্কার। এসময় তার দাদার বিয়ে হয়। বউদি এসে ভালোবেসেই তার হাত থেকে কাজ কেড়ে নেয়। কিন্তু বউদি পুরোনো হয়ে যেতেই এই মেয়ে কাজ না করার মধ্যেই পেত সুখ। কাজ করতে হলেই বিরক্ত হত সে। আবার বউদির প্রতি সহানুভূতিতে মাঝে মাঝে কাজ করতে গেলে তার মা তিরস্কার করতেন বউদিকে। তার মধ্যে মেয়ের বিয়ে না হওয়া নিয়ে তীক্ষ্ণ ক্রোধও মিশে থাকত।

আবার মেয়েটির বিয়ের ঠিক হতেই ফিরে আসে মায়ের আদর যত্ন। মাছের টুকরো হয়ে যায় দুটি। জোটে দুধের বাটি। শ্বশুড়বাড়িতে প্রথম প্রথম সবাই ভালোবাসতো মেয়েটিকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কপালে জুটতে লাগল তিরস্কার। তার মনে পড়ে গেল বউদির সঙ্গেও একই ব্যবহার সে করেছে। তাদের খুশি করার জন্য মেয়েটি দ্বিগুণ করে দিল তার কাজ। শেষে দেখা গেল সংসারের সব কাজ তারই ঘাড়ে পড়েছে। অথচ তার কপালে জুটছেনা মাছ বা দুধ। বিবাহিতা বড় ননদ বাপের বাড়ি দু-দশ দিন বিশ্রাম নিতে আসে। শাশুড়ি তার জন্য ভালো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন। নায়িকা বধূটি শ্রমে, মনের কষ্টে শীর্ণ হয়ে যায়। এরই জন্য তার মেলে বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি। এখানেও দেখা যায় একই ছবি। বউদির খাটনি বাড়ে আর বিরক্ত হতে থাকে সে। মেয়েটির মনে বউদিকে সাহায্য করার ইচ্ছাও হয়। কিন্তু তখনই কঠোর বাস্তব চোখ রাঙায় তাকে। বাপের বাড়ি দু-চার দিন বিশ্রাম নিয়ে দুটো মাছ এক বাটি দুধ না খেলে শ্বশুরবাড়িতে অবিরাম শ্রমের শক্তি সে কোথায় পাবে। তবু বউদির বিরক্তি সে টের পেত। তাই স্বামীকে চিঠি লিখে সে ফিরে আসে শ্বশুরবাড়িতে। আবার তুলে নেয় শ্রমের ভার। তার মতো সাধারণ মেয়ের এটুকু ভাবার সময় নেই যে ''বাপের বাড়িতে যা করে এসেছি, শ্বশুরবাড়িতে তাই ফিরে পাচ্ছি।'' ভেবে দেখার সময় আরও নেই এজন্য যে সাধারণ মেয়ে সে আর একটি সাধারণ স্বপ্ন দেখছে যা সব মেয়েই দেখে। অর্থাৎ মেয়েটি এবার বধূ থেকে হবে জননী। সাধারণ বাঙালি ঘরে বধূ আর কন্যার সঠিক অবস্থান গল্পটিতে নির্ণয় করেছেন লেখক নিপুণভাবে।

'বড়বাজার' রমাপদ চৌধুরীর একটি অন্য ধরনের গল্প। ১৯৭৩-এ লেখা গল্পটি রয়েছে গঠনকৌশলের মৌলিকতা। বর্তমান বিপণনমুখী সমাজব্যবস্থা কীভাবে মানুষের চিন্তনশক্তি, কর্মক্ষমতা, সবই গ্রাস করে তারই ভাবচিত্রণ গল্পটি। উত্তমপুরুষে উপস্থাপিত গল্পটির নায়ক বিশাল এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে খাদ্যবস্ত্র-আশ্রয় প্রভৃতি মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য একে একে বিক্রি করে করে তার হাত-পা আর মগজ। শুধু থাকে তার হৃৎপিণ্ড। এক মেয়ের হাতে গিয়ে পড়ে সেই হৃদয়। তার সহানুভূতির অশ্রুর স্পর্শে রক্তগোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে সেই হৃৎপিণ্ড। শেষ পর্যন্ত যে ভালোবাসই জয়ী হবে তারই ইঙ্গিতে সমাপ্ত হয়েছে গল্পটি।

ভাষা : প্রথম দিকে রমাপদ চৌধুরীর ভাষায় ছিল অলংকার-বাহুল্য। তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আন্তরিকতা। যেমন—সদ্য ঘুম ভাঙা একটি তরুণীর বর্ণনা ''শরীরের জড়তা ভাঙানো যেন সমস্ত দেহে নুপূরের ছন্দ বাজিয়ে মুজরা শুরু হবার আগে এযেন নৃত্যনটীর পায়ে কাঁপা কাঁকনের ঝঙ্কার। যৌবনের কুঁড়িতে লোভানির পাপড়ি ফুটে ওঠা।'' ('অভিসার রঙ্গনটী' : ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) ধীরে ধীরে এই অলংকার-বহুলতা কমে আসে। তাঁর ভাষা হয়ে ওঠে

শাণিত, ব্যঞ্জনাঋদ্ধ অথচ আন্তরিক—''ছেলে দুটো অবাক অবাক চোখ মেলে কাঁটাতারের ওপারে দাঁড়িয়ে আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিল। প্রথম দিনের বাচ্চাটার চোখে একটু ভয়, হাঁটু তৈরি, কেউ চোখে একটু ধমক মাখালেই সে চট করে হরিণ হয়ে যাবে।'' ('ভারতবর্ষ' : ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)

বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে নায়ক, সস্ত্রীক। তাদের দেখে ছুটে আসে বন্ধুর স্ত্রী উমা—'এক গাছ ফুলের মতো মুখ নিয়ে।' ('বসবার ঘর' : ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) উপমার অভিনবত্বে আকর্ষক হয়ে উঠেছে ভাষা।

''রাস্তা পার হওয়ার আগে সকলেই যেমন একবারটি থমকে দাঁড়ায়, চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে তেমনিভাবে থেমে পড়ে কার ভাবতে ভালো লাগে, ভুল পথে এসেছি! ভুল পথ? জানি না। আজকাল এক-একসময় মনে হয় কাঁটা, জঞ্জাল, বোলতা, বিছুটি যেন আমার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই যেন কুটকুট করে ওঠে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা করে ফেলতে ইচ্ছে করে।'' ('আলমারিটা' : ১৩৭৪) পরিবেশের শিকার ভদ্র মধ্যবিত্ত একটি মানুষের অসহায়তা এই ভাষা ব্যবহারে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় তাঁর ছোটো গল্পে আছে গভীর অনুভবের দীপ্তি। বক্তব্য, বিষয়, উপস্থাপনা—কোনোটিতেই তাঁর রচনায় নেই গতানুগতিকতা। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন আছে বাঙালি জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, তেমনই আছে আদিবাসী সমাজ, কোলিয়ারি অঞ্চলের জীবনযাপনের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিলিপি। আসলে জীবনকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন রমাপদ চৌধুরী, ভালোবেসেছেন মানুষকে। সেই প্রীতিই তাঁর রচনাকে করে তুলেছে অসামান্য।

৫.১৩ সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)

বাংলা সাহিত্যের বহুবর্ণময় সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ এর ১১ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার মুনসিগঞ্জ মহকুমার রাজানগর গ্রামে। মোহিনীমোহন-শৈবলিনীর এই পুত্রের পারিবারিক নাম সুরথনাথ। পরিবারে কিছুটা সাংস্কৃতিক আবহ ছিল। বাবা ভালো গান গাইতেন, উৎসব-কেন্দ্রিক অলংকরণেও ছিলেন দক্ষ। ছোটোকাকা ছিলেন শিল্পী। মিশুক স্বভাবের বালক সমরেশ গানবাজনা, অভিনয়ে যতটা উৎসাহী ছিলেন, ততটাই অমনোযোগী ছিলেন বিধিবদ্ধ পাঠে। গিরিশ মাস্টারের পাঠশালা ও গ্যান্ডারিয়া গ্রাজুয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর তাঁকে দাদা মন্মথনাথের কাছে নৈহাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৯-এ তিনি নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময় বন্ধুদের সঙ্গে বের করেন হাতেলেখা পত্রিকা 'বীণা'। নিজের নাম তাতে দিয়েছিলেন সমরেশকুমার বসু। অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য সমরেশকে ফিরতে হয় ঢাকায়। এবার অভিভাবকেরা তাঁকে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ট্রেনি হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সমরেশের স্বভাবের মধ্যে হয়ত ছিল বন্ধনহীনতার দিকে টান। তাই দেখা গেল স্কুলের মতো কারখানা পালানো শুরু করছেন তিনি; মিশছেন বয়সে বড়ো নিম্নশ্রেণির ছেলেদের সঙ্গে। ধূমপানে হয়েছেন আসক্ত। তাই ১৯৪১-এ আবার তাঁকে পাঠানো হল নৈহাটিতে বড়দার কাছে। কিন্তু তিনি যথারীতি হাতেলেখা পত্রিকা 'বাণীপ্রকাশ'/গল্প রচনা, গানবাজনা আর অভিনয়ে মত্ত থাকেন।

এ সময় সতেরো বছর বয়সে তিনি আক্রান্ত হন ম্যালেরিয়া আর জন্ডিস-এ। বিরক্ত দাদা যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থায় উদাসীন ছিলেন। বন্ধু দেবশঙ্করের স্বামীবিচ্ছিন্না বড়দি গৌরীর প্রীতি-আর্দ্র ব্যবস্থায় সুস্থ হন সমরেশ। এরপর চার বছরের বড়ো গৌরীকে নিয়ে তিনি চলে আসেন আতপুরের বস্তিতে। জীবিকার জন্য শুরু করেন ডিম-মুরগি সবজি বিক্রির কাজ। তবে বেশি দিন একাজ তিনি করে উঠতে পারেন নি। জগদ্দলের কমিউনিস্ট দলের নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর জন্য সমরেশ-গৌরী কমিউনিস্ট দলের কাছাকাছি আসতে পারেন। সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য সত্যপ্রসন্ন তাঁকে দলের পোস্টার লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় সমরেশ উঠে আসেন আতপুরের তরফদার পাড়ায়। ১৯৪২-এ ব্রজেন ভট্টাচার্যের সহায়তায় সমরেশ-গৌরী আইনসম্মত দম্পতি হতে পেরেছিলেন। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে শুভার্থী সত্যপ্রসন্নের প্রভাবে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাকটরির পৃথক বিভাগ ড্রয়িং

অফিসে দৈনিক একটাকা চার আনা বেতনে ট্রেসার-এর কাজ পান।

এমন করেই সমরেশ কমিউনিজম-এর সংস্পর্শে আসেন। চাকরি পাওয়ার পর আবার তিনি শুরু করেন হস্তলিখিত পত্রিকা। একই সঙ্গে বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'উদয়ন পাঠাগার' নামের গ্রন্থাগারটি। এর আগে সমরেশ রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' ভিন্ন আর কিছু পড়েছেন বলে মনে হয় না। এই পাঠাগারের মাধ্যমে তিনি দেশি-বিদেশি বরেণ্য সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত হন। মার্কস-অনুসারী সাহিত্যিকগণের রচনাও তিনি পাঠ করেন। তৈরি হতে থাকে সাহিত্যিকের মনোভূমি।

১৯৪৬-এ 'পরিচয়' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় মুদ্রিত 'আদাব' সমরেশকে বিখ্যাত করে তোলে। তার আগেই 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'শের সর্দার' গল্প। অতএব তাঁর প্রথম মুদ্রিত লেখা 'শেরসর্দার'। এ সময়ই তিনি লিখেছিলেন 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসটি।

এদিকে ১৯৪৪-এ তিনি এবং পরে তাঁর স্ত্রী গৌরী কমিউনিস্ট দলের সদস্য হন। তিনি নিজে বলেছেন— "কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই আমার চার পাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে। ('প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি', 'দেশ' ২২ নভেম্বর, ১৯৮৬)। তিনি রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে লেখা আর পড়াও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জগদ্দলের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে তিনি কাজ করতেন। পার্টির প্রতি অত্যন্ত আনুগত্য ছিল সমরেশের। কিন্তু পার্টি-নেতাদের স্বার্থপরতা, হীনতা ধীরে ধীরে তাঁর মনকে বিরূপ করে তুলল। বিশেষত সত্যপ্রসন্নর বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুকে তাঁর অন্তর্দলীয় অন্তর্ঘাত বলেই সন্দেহ ছিল। স্বাধীনতার পরে কমিউনিস্ট দলের স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে দলের কর্তৃত্ব মানেননি। ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়। এরপরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জেলে বসে তিনি লিখেছিলেন 'উত্তরঙ্গ' নামের উপন্যাস এবং 'লেবার অফিসার' (পরে 'প্রেত') নামের তিন অঙ্কের নাটক। নাটকটির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়; উপন্যাসটি পরে মুদ্রিত হয়। ১৯৫১-তে কারামুক্ত সমরেশ রাজনীতি না করার শর্তে বন্ড লিখে দিতে অসম্মত হওয়ায় রাইফেল কারখানার চাকরি ফিরে পেলেন না। তখন তিনি 'সাহিত্য'-কেই জীবিকা করা ঠিক করেন। কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে সমরেশ সাহিত্যজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয় এবং ১৯৫৫ সালে নিষ্ক্রিয়তার কারণে খারিজ হয় সমরেশের সদস্যপদ।

'প্রবাহ' পত্রিকার ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় মুদ্রিত 'ভোটদর্পণ' নামের রচনায় সমরেশ 'কালকূট' ছদ্মনামটি ব্যবহার করেন। কিছু কিছু রচনায় তিনি ব্যবহার করেন 'ভ্রমর' ছদ্মনাম। ১৯৫৩-তে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কয়েকটি ফিচার লিখেছিলেন তিনি। ১৯৫৪-তে কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য অর্থসাহায্যের সূত্রে সমরেশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'দেশ' গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৯৬৫-তে শারদীয় 'দেশ'-এ মুদ্রিত তাঁর 'বিবর' উপন্যাস ঘিরে আলোড়ন শুরু হয় সাহিত্যজগতে। ১৯৬৭-তে কনিষ্ঠ শ্যালিকা ধরিত্রী দেবীকে বিবাহ করায় পারিবারিক জীবনে শুরু হয় সংঘাত। ১৯৬৮-তে অশ্লীলতার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হয় তাঁর 'প্রজাপতি' উপন্যাসটি। 'আনন্দবাজার গোষ্ঠী' এসময় তাঁকে সর্ববিধ আইনি সহায়তা প্রদান করেন। ১৯৮৫-তে সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তি হয় এই মামলার। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে মুক্ত হয় 'প্রজাপতি'। ১৯৮৮ মার্চে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন হৃদ্‌রোগী সমরেশ। ১২-র মার্চ শেষ হয়ে যায় বিতর্কিত এই সাহিত্যিকের জীবন।

গল্পগ্রন্থ-তালিকা : সমরেশ বসু গল্প-উপন্যাস, ভ্রমণকথা, কিশোরসাহিত্য—সবই লিখেছেন সমান দক্ষতায়। তবে তাঁর কিশোরসাহিত্য মূলত গোয়েন্দা-উপন্যাসে সীমিত। এখানে কেবল ছোটোগল্প-সংকলনগুলির যথাসম্ভব কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

১) ‘মরশুমের একদিন’, ১৯৫৩
২) ‘অকাল বৃষ্টি’, ১৯৫৩
৩) ‘ঋতু’, ১৯৫৩
৪) ‘পশারিণী, ১৯৫৫
৫) ‘ষষ্ঠ ঋতু’, ১৯৫৬
৬) ‘ফুলবর্ষিয়া’, ১৯৫৭
৭) ‘মনোমুকুর’, ১৯৫৮
৮) ‘দেওয়াল লিপি’, ১৯৫৯
৯) ‘পাহাড়ী ঢল’, ১৯৬১
১০) ‘সুবর্ণা, ১৯৬১
১১) ‘বনলতা’, ১৯৬৭
১২) ‘পাপপুণ্য’, ১৯৬৭
১৩) ‘ছেঁড়া তমসুক’, ১৯৭১
১৪) ‘চেতনার অন্ধকার’, ১৯৭২
১৫) ‘ধর্ষিতা’, ১৯৭২
১৬) ‘কামনা বাসনা’ ১৯৭২
১৭) ‘হ্রেযাধ্বনি’, ১৯৭৩
১৮) ‘বিদ্যুল্লতা’, ১৯৭৪
১৯) ‘রজকিনী প্রেম’, ১৯৭৪
২০) ‘বনের সঙ্গে খেলা’, ১৯৭৪
২১) ‘বিপরীত রঙ্গ’, ১৯৭৫
২২) ‘নাচঘর’, ১৯৭৬
২৩) ‘কীর্তিনাশিনী’, ১৯৭৬
২৪) ‘কুন্তীসংবাদ’, ১৯৭৬
২৫) ‘ছোট ছোট ঢেউ’, ১৯৭৭
২৬) ‘মাসের প্রথম রবিবার’, ১৯৭৮
২৭) ‘আলোর বৃত্তে’, ১৯৭৮
২৮) ‘অন্ধকারের গান’, ১৯৮০
২৯) ‘ও আপনার কাছে গেছে’, ১৯৮০
৩০) ‘বিবরমুক্ত’, ১৯৮০
৩১) ‘বিকেলে শোনা’, ১৯৮০
৩২) ‘বিবেকবান ভীরু’, ১৯৮৬
৩৩) ‘আমি তোমাদেরই লোক’, ১৯৮৬

—এই তেত্রিশটি গ্রন্থে সমরেশ বসুর দুশোরও বেশি ছোটোগল্প সংকলিত হয়েছে।

গল্পবৈশিষ্ট্য : সমরেশ বসুর ছোটোগল্পের অন্বিষ্ট মানুষ এবং মানুষের জীবন। জীবনকে জানতে জানতে তিনি নিজেকে চিনেছেন। আর নিজেকে জানতে জানতে পৌঁছে গেছেন জীবনের গভীরে। বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনকে

তিনি জেনেছেন, দেখেছেন; সাহিত্যে তাকেই দিয়েছেন ভাষারূপ। তাঁর বিশ্বাস, 'সাহিত্যের যা কিছু দায়, সে তো জীবনের কাছে। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়ো, এ সত্যের জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না, তা সততই অতি জীবন্ত।' ('নিজেকে জানার জন্যে', 'গল্পসংগ্রহ ১', সমরেশ বসু পৃ. ১৩, ১৯৭৮)।

রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর মানুষের প্রতি এই বিশ্বাসকে গাঢ় করে তুলেছে।—''সমস্ত তত্ত্ব বাদ দিয়ে, একান্তভাবে মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে দেশ ও কালকে সম্যক জেনে মানবিকতাই হবে মূল তত্ত্ব। এসব সিদ্ধান্ত নিতে পার্টির অতীতের অভিজ্ঞতাই কাজ করেছে। পার্টির কাছে আমার কৃতজ্ঞ না থাকার কোনো কারণ নেই।'' (সমরেশ বসু, 'দেশ', ২২ নভেম্বর, ১৯৮৬)

সৃষ্টিক্ষম বড়ো লেখক কখনও একটি সীমায় বদ্ধ থাকতে পারেন না। জীবনকে নানাভাবে নানারূপে দেখে সঞ্চিত হয় তাঁর অভিজ্ঞতা। সাহিত্য গড়ে ওঠে সেই অভিজ্ঞতার ভূমিতে। সমরেশের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। তিনি জীবনকে, বিশেষত মানুষকে দেখেছেন নানাভাবে। তাঁর দৃষ্টির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার সাহিত্য রূপায়ণের কাঠামো। মানুষের সত্তার সন্ধান মানে তিনি বুঝেছেন টিকে থাকার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম। কখনও তার সে সংগ্রাম অতি আদিম; তবে মানবসমাজের বিকাশের শক্তি সেখানেই। এই সংগ্রামের কথা এসেছে তাঁর ছোটোগল্পে বিচিত্ররূপে।

তাঁর ছোটোগল্পেই প্রথম উত্তর চব্বিশ পরগনার চটকলকেন্দ্রিক শ্রমিকদের আর নিম্নবিত্তদের জীবন জীবন্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন আতপুরের বস্তিতে বাস সম্ভবত তাঁর এ অভিজ্ঞতার উৎস। তাঁর বেশির ভাগ গল্পই প্রতিষ্ঠানবিরোধী গল্প। এবং এই বিরোধিতা কখনও আক্রমণাত্মক বা প্রত্যক্ষ নয়; সহজভাবে তা গল্পে এসেছে। বর্তমান সমাজে শিশু-কিশোরের শোষিত-নির্যাতিত জীবন তাঁর অনেক গল্পে এসেছে খুবই বাস্তবভাবে।

নারী তাঁর গল্পে প্রায় সর্বদাই আশ্রয়দাত্রী, মঙ্গল-উৎস। বিচিত্র বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসামান্য তথ্যজ্ঞান অনুপুঙ্খ ব্যবহারে নিপুণতা এবং জীবন সম্পর্কে সহানুভূতি আর শ্রদ্ধা তাঁর গল্পকে করে তুলেছে অনন্যসাধারণ। মধ্যবিত্ত, ক্বচিৎ উচ্চবিত্তের ব্যক্তিজীবনও তাঁর ছোটো গল্পে সমান জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভাষা : তাঁর গল্পের ভাষা সর্বদাই পরিস্থিতি এবং চরিত্রের উপযোগী। তাঁর ভাষা সম্বন্ধে চিন্তা এরকম—''জীবন আর সাহিত্যের মাঝখানে কোন আড়াল সৃষ্টি করা যায় না। তথাকথিত গল্প-উপন্যাসের ছকের ভাষা, মিষ্টি কথা বা কিছু ভাবালুতার সৃষ্টি কোনো কিছু দিয়েই, এ দুয়ের মাঝখানে কোন আড়াল সৃষ্টি করা যায় না,...... চরিত্র পরিবেশ বাদ দিয়ে, সাহিত্যের প্রয়োজন মেটে না। একজন কুষ্ঠরোগীর বর্ণনা যেমন নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি তার রক্তের যন্ত্রণাটাও যতখানি তীব্র ততখানি প্রকাশ হওয়া উচিত। দেখা-অদেখার মানুষটা তাতেই পরিস্ফুট।'' ('আর রেখ না আঁধারে', সমরেশ বসু, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৫)। তাঁর গল্পে চরিত্রের ভাষা যে সর্বদা চরিত্র অনুযায়ী তার দৃষ্টান্ত 'সোনাটর বাবু' গল্পে কনসারভেন্সি সুপারভাইজার প্রায় অশিক্ষিত সোনাটর বাবুর সংলাপের ভাষা—''তা এবার আমার ওই ডেকিজনেশন না ডেকচিনেশনে সোপারভাইজারটা কেটে ডোম করেই দেওয়া হোক।'' 'কিমলিস' গল্পে চটকলের বিহার থেকে আসা হিন্দিভাষী মজুরের ছেলে বেচনের ভাষা—'টাইম যব আ যায়ে গা, ক্রান্তিওকার যব হো যায়গা একদম ঠিকসে তব কামনিস বন যায়গা। হাঁ কোই রোজ বন্ যায় গা।''

যে যে অঞ্চলের মানুষ এসেছে তাঁর গল্পে, সেই সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে চরিত্রের মুখের কথায়।

১) ঢাকা—'কিন্তন আমি কইছি বাপজানরে যে, মোক্তারি আমি পড়ুন না। এম.এ. পাশ কইরা আমি কইলকাতায় বড়ো চাকরি করুম।'' ('জয়নাল')

২) বর্ধমান—''বঁইচি হল গে আপনার ইস্টিশনের নাম। সেখান থেকে আপনার পচ্চিমে, গাংটাং রোড পার

হয়ে বেরেলা গাঁ,.... তা এবার ফসলটা মন্দ হয়নি, বুইলেন, আগনে যে র'ম মেঘ দেখা দিইছিল, হলে আর রক্ষে ছিল না। সেটা দক্ষিণে ঢেলেছে, আমাদের বদ্ধোমানে ফলনটা ভালোই হইছিল।'' ('সহযাত্রী')

৩) বীরভূম—''ভিটে খানিক আছে তুমার গিয়ে বোলপুরে। কিন্তুক আমি বারোমাসই ঘুরে ঘুরেই বেড়াই মেলায় বাজারে। প্যাটের লাগি বারোমাস কাটে। তা......মানুষ জনার যা অবস্থা হবার লাগছে, মেলাগুলান সব পড়ে যাবেক্।'' ('শেষ মেলায়')

ব্যক্তিরূপ বর্ণনায়ও তিনি অনায়াসে তুলে আনেন তার চরিত্রটিকে। ''তার বয়স হয়েছে, বয়সের দাগটা পড়েনি, যেন পাতিহাঁসটার হাজারবার জলে ডোবানো, তবু ঝরঝরে শরীরটার মতো। মুখটা কাঁচাটে, অর্থাৎ রূপের যদি কোনো কাঁচামিঠে স্বাদ থাকে, তবে তাই।'' ('সোনাটর বাবু')

প্রকৃতির বর্ণনা তাঁর ছোটোগল্পে মূল বিষয়কে পরিস্ফুট করেছে। 'পাড়ি' গল্পের বিষয় মেঘে ঢাকা দুর্যোগ-সম্ভাবনা যুক্ত আকাশের নীচে, আষাঢ়ের উদ্দাম গঙ্গায় করে উনত্রিশটি শূকর পার করা। দায়িত্বটি নিয়েছিল কর্মহীন অভুক্ত এক দম্পতি। তাদের অবস্থানের আদিমতা আর আসন্ন সংগ্রামের ভয়ংকরত্ব দুটি জিনিসই সংকেতিত হয়েছে প্রকৃতি বর্ণনায়—

''কাজ নেই তাই বসেছিল দুটিতে। ....বেঁটে ঝাড়াল্লো এক বটের তলায়।.... আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের অগাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট-অশ্বত্থ-পিটুলি-সজনে, সব আপনি-গজানো গাছ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে, যেন নিচের কচি-কাঁচা ঝোপঝাড়গুলির খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বন-ঝোপ....হামা দিয়ে দিয়ে উঁচুতে উঠেছে পুবে।... আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্ত-ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। দুটিতে দেখছিল। মেঘ জমেছে মেঘের পরে। বড়ো বড়ো মেঘের চাংড়া নেমে এসেছে স্রোতের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায়।'' ('পাড়ি')

ওই দুটি মেয়ে-পুরুষ এই গঙ্গা পার করে দেয় উনতিরিশটি শূকরকে। মজুরি দিয়ে তারা কিনতে পারে খাদ্য আর পরস্পরের শারীরিক মিলনের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। 'দুটিতে' শব্দের বার বার ব্যবহারে, বড়ো গাছেদের ছোটো ঝোপঝাড়ের শাসন করার কথায় তাদের এই যুগ্ম দায়িত্বের ইঙ্গিত আছে। আর আষাঢ়ের গঙ্গার 'মা হওয়া', 'স্রোতের ঠোঁটে', 'ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে' শব্দগুলিতে রয়েছে সমাপ্তির মিলনের ইঙ্গিত। প্রসঙ্গত আর একটি বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়। সমরেশ বসুর রচনার বিরুদ্ধে প্রায়শ যৌনতার তথা শারীরিক ঘনিষ্ঠতার অতিরেকের অভিযোগ তোলা হয়। কিন্তু কখনও কী তেমনভাবে শরীরসর্বস্ব হয়ে উঠেছে তাঁর রচিত ছোটোগল্প। শরীরমিলনের বর্ণনা। তাঁর গল্পে এসেছে জীবনের অনিবার্য অঙ্গরূপে। কোথাও নেই তেমন অতিরেক।

বস্তুত ভারতের সাহিত্য এবং শিল্প দেহমিলনকে জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছিল। সংস্কৃত সাহিত্য আর মন্দির-ভাস্কর্য থেকে পাওয়া যায় তার প্রমাণ। দৈহিক শুচিতা সম্বন্ধে তীব্র সচেতনতা এদেশে এসেছে ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের রুচির অনুসরণে। বিংশ শতকের বিশের দশকে 'কল্লোল'-এর সাহিত্যিকরা তার প্রতিবাদের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনা অনেকটাই ছিল কৃত্রিম, আড়ষ্ট।

সমরেশ বসুর রচনায় শরীর-মিলনের অতিরেক নেই কোথাও-ই। গল্পের প্রয়োজনে তা এসেছে এবং কখনই তা অশ্লীল বলে মনে হয় না আমাদের। উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা যায় 'পাড়ি' গল্পের সমাপ্তি অংশটি। প্রাণান্ত শ্রমে এক দম্পতি উনতিরিশটি শুয়োরকে বর্ষার ভরা গঙ্গা পার করে দিয়েছে। যে মজুরি পেয়েছে তা দিয়ে দীর্ঘ উপবাস ভেঙেছে তাদের। তারপর—''খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরশুদিনের

রাত্রের মতো ওদের দুজনের রক্তেই ভাটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।'' এ বর্ণনাকে কোনোভাবেই অশ্লীল বলা যায় না।

সমরেশ বসুর ছোটোগল্পগুলিকে আমরা (১) শ্রমজীবী নিচুতলার মানুষের গল্প, (২) নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনি, (৩) মধ্যবিত্ত জীবন কথা, (৪) রাজনৈতিক গল্প, (৫) বিত্তহীন শোষিত কৈশোরের গল্প, (৬) সমকালীন সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প—এভাবে দেখতে পারি।

(১) **নীচের তলার নিঃস্ব মানুষের গল্প :** এ সব গল্পে প্রায়শ টিকে থাকার জন্য মানুষের প্রাণপণ লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। 'পাড়ি' এরকম একটি গল্প। এ গল্পে সামান্য মজুরির বিনিময়ে দুটি নিরন্ন নারীপুরুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আষাঢ়ের গঙ্গা পার করে দিয়েছে উনতিরিশটি শুয়োর। মূলত তাদের সংগ্রামের দিকটি চিত্রিত হয়েছে গল্পে। 'খেতে পাওয়া যাবে সেই আশায় শক্ত হল হৃৎপিণ্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।'' তারা লাফ দিয়ে পড়ে জলে শুয়োরের সঙ্গে। জলের ভয়ংকর টানের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণপণে। ''জলের ধাক্কায় ওদের হাতে, পায়ে মাথায় শিরাগুলি টান টান হয়ে উঠেছে। জল ঠান্ডা কিন্তু ওদের গা থেকে গরম বেরুচ্ছে। ঘাম ঝরছে। মেশামেশি হয়ে যাচ্ছে ঘামে জলে।'' শেষ পর্যন্ত তারা জেতে এই সংগ্রামে। শুয়োরগুলি পারে তুলে দেয়। আর মজুরি দিয়ে কিনে আনে খাদ্য। মেয়েটির কাপড় কিন্তু কেড়ে নিয়েছে নদী। পুরুষটির দেওয়া কাপড় তার পুরো শরীর ঢাকতে পারেনি তাই লজ্জায় সে কাঁদছে। তাকে সান্ত্বনা দেয় তার ভালোবাসার জন। এ ভাবেই পরস্পরকে জড়িয়ে তারা বেঁচে থাকে।

কিন্তু টিকে থাকার জন্য অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই অনেক সময় ব্যর্থ হয়। তেমন একটি গল্প 'লড়াই'। গল্পটিতে 'মাছমারা' নিতাইয়ের মাছ ধরতে গিয়ে মৃত্যু আর তার কিশোর পুত্র বদির অনাহারে অচিকিৎসায় মৃত্যুর কথা আছে। অসুস্থ বদির স্বপ্নে কিন্তু ফিরে ফিরে এসেছে তার বাবার কথা বাবার মৃত্যুদৃশ্য। স্বপ্নে সে গেছে মাছ মারতে। সেই সময় মনে পড়ে তার বাবার কথা—''মাছ' 'সেও বাঁচবার জন্য আসে। আমিও বাঁচবার জন্যে আসি।'' ....'কিন্তন্ আমি মাছমারার ছেলে, তোর সঙ্গে আমার এই হারজিতের খেলা।' ...কথাগুলি সব মনে পড়তে লাগল বদির।'' তার স্বপ্নে জালে আটকে পড়া বড়ো বড়ো পাঙাস মাছ মারতে থাকে সে শালকাঠের ভারী মুগুর দিয়ে। এই সংগ্রামের সময় বিরাট এক পাঙাস লাফ দিয়ে পড়ে বদির ঘাড়ে। তার কানের কাছের কাঁটা বিঁধে যায় বদির কণ্ঠায়। মৃত্যু-মুহূর্তে তার মনে পড়ে বাবার কথা—''আমরা দু-জনেই লড়ি। আমরা দু-জনেই মরি। আগে আর পরে, বু ইলে বাবা।'' বদি যে অসুস্থ কল্পনার মধ্যে লড়াই করে মরেছে এখানেই গল্পটির বিশেষত্ব। মানুষের সংগ্রামই যেন এখানে মূর্ত। বদি আসলে মারা পড়েছিল ডাঙায়, গুদামঘরে, অসুস্থ অবস্থায়। তাকে দাহ করতে আসে মালো পাড়ার লোকজন। তাদের সংলাপে জানা যায় সত্য। বদির বাবা নিতাই মারা পড়েছিল দেড় মন ওজনের পাঙাস মাছের কাঁটা কণ্ঠায় গিঁথে। তার মহাজন সে মাছ বিক্রি করেছিল গঞ্জে। ''তবু নাকি মহাজনের পাওয়ানা মেটে নাই। সকলে চুপ করল। তারপরে বাঁশটা নিয়ে একজন এল।'' কিন্তু এ সংগ্রামে জয়ী হয়নি মানুষ। পরিবেশ আর প্রকৃতি, দুজনে মিলে তাকে মেরেছে।

২) **নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবন :** এ জীবন অভাব আছে। কিন্তু সে অভাবের সঙ্গে সংগ্রামের মনোভাব নেই। আছে কোনোমতে ভদ্রতার আবরণ বজায় রেখে টিকে থাকার মর্মান্তিক প্রয়াস। 'পকেটমার' এমনই একটি গল্প। জীবনভর সৎ থেকে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন চটকলের দরিদ্র কেরানি গৌরমোহন। সংসারে দারিদ্র্য ছিল প্রবল, পঙ্গু বাক্শক্তিহীন স্ত্রী সুনয়নী, বিধবা পুত্রবধূ আর প্রবাসী চাকুরে মেজো ছেলের তরুণী স্ত্রী মালতীকে নিয়ে তাঁর সংসার। মালতী তার নিজস্ব গহনা নতুন করে গড়ানোর জন্য তুলে দিয়েছিল শ্বশুরের হাতে। অভাবের চাপে এবার ভেঙে গেল গৌরমোহনের সততা। তিনি বিক্রি করলেন অলংকার আর নিজের পকেট নিজে কেটে বাড়ি এসে বললেন পকেটমারের কাহিনি। মালতী কাঁদল অলংকারের শোকে। তার মনের দিক থেকেও নিঃস্ব হয়ে যাওয়া গৌরমোহনের

দিকে মূক স্ত্রী বাড়িয়ে দিলেন সান্ত্বনার হাত। তিনি বুঝেছেন সত্য ঘটনাটি আর স্বামীর উপায়হীনতাও তিনি অনুভব করেছেন। তাই "....কোনও রকমে হাত দিয়া গৌরমোহনের মুখখানি তাহার মরিয়াও না-মরা বুকে টানিয়া লইলেন এবং রোগবশত মাথার উপর হাতদুটি কাঁপিতে লাগিল। জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল তাহার স্থির অপলক সাপের মতো চোখ জোড়া হইতে।"

গল্পটিতে নারীর শ্রান্ত প্রাণের আশ্রয়দাত্রীর রূপটি ফুটে উঠেছে।

৩) **মধ্যবিত্তজীবন কথা :** এ ধরনের গল্পে মূলত মনের জটিলতাই বড়ো হয়ে উঠেছে। 'নররাক্ষস' গল্পটির কথা আমরা মনে করতে পারি। বেকার যুবক তারকের নররাক্ষসের খেলা দেখে তাকে ভালোবেসেছিল নিরীহ স্কুলশিক্ষকের মেয়ে মিনতি। তারকের এই খেলার মধ্যে সে যেন খুঁজে পেয়েছিল বলিষ্ঠ পৌরুষের প্রবল প্রকাশ। তারকের চোখে মুগ্ধতা এনেছিল এই নির্ভীক তরুণীটি। তারপরে সে পেয়ে যায় স্টেশনমাস্টারের চাকরি। বিয়ে হয় দুজনের। তারক স্থির করে নররাক্ষসের খেলা সে আর দেখাবে না। মিনতি হতাশ হয়েছিল, কারণ তার খেলাটি 'বেশ তো লাগে'। তারক বোঝেনি মিনতি বিষণ্ণ হয়েছে তার সিদ্ধান্তে। মিনতিও বোঝেনি তার বিষাদের কারণ। ক্রমে সময়ের টানে দুজনেই ভুলে গিয়েছিল এ কথাটি।

হঠাৎ মাঘ মাসে রাঢ়ের এক রেলস্টেশনের কোয়ার্টারে বসে মিনতি আর তারক দুজনেই শুনতে পায় মাইকে ঘোষিত হচ্ছে নররাক্ষসের আগমনবার্তা। দুজনেরই মনে পড়ে পুরোনো কথা। তবে মিনতির মতো অতটা আত্মহারা হয় না তারক।

মিনতি ঠিক করে তারক আর মেয়েদের নিয়ে সে দেখতে যাবে নররাক্ষসের খেলা। স্ত্রীর চাপে তারক যায় খেলা দেখতে। নররাক্ষসের পেশল শরীর, ভয়ংকর মুখ আর খেলা দেখে মিনতি মুগ্ধ বিস্ময়ে। তারক কিন্তু ততটা মুগ্ধ হয় না। বরং বলে 'বিচ্ছিরি'। সে খেলা দেখানো ছেলেটিকে চিনতে পারে। তার খেলার পর তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় তার দেশের ছেলে নররাক্ষস পিনাকীর। কিন্তু মিনতি আর পিনাকীর প্রথম দর্শনেই ঈষৎ মুগ্ধ অনুরাগের সৃষ্টি হয়। মিনতির "....বুকের মধ্যে একটা পুরনো তাল কেন বেজে উঠছে।" ভদ্রতা বোধে মিনতি-তারক পিনাকীকে নিমন্ত্রণ করে। ক্রমে দেখা যায় মিনতির মনে দোলা লাগে। পিনাকীও বিহ্বল হয়ে পড়ে। মিনতি বুঝতে পারে পিনাকীর আবেশমুগ্ধতা। কিছুটা প্রশ্রয়ও সে দেয়। কারণ তার মনের মধ্যে ঘন হয়েছে আশ্চর্য এক আবেশ। "কিন্তু সাতাশের দেহে একি আঠারোর ঘূর্ণি। মিনতির মৃত্তিকা যে কাঁপে। দেহে যে প্লাবনের উচ্ছ্বাস উপচে পড়তে চায়।"

এই পরিস্থিতিতে তারকের ডাক পড়ে কলকাতায়। সংবাদ শুনে "ওর প্রাণের ভিতরটা যেন আবর্তিত হয়ে একটা বাধাবন্ধহীন মুক্তির বেগে ছুট দিতে চাইল। আর একটা মুগ্ধ বিস্ময়ের ঘোর ওর ভিতরে চুপি চুপি বলে উঠল এ কিসের ইঙ্গিত! কিসের! ....চোখের সামনে পিনাকীর ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসি মুখটি ভেসে উঠল।"

এই সময় পিনাকী এসে রাতে থাকার প্রস্তাব করে। মিনতি সম্মতি তো দেয়ই উপরন্তু যেন আহ্বান করে পিনাকীকে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু মিনতি নিজেকে সংযত করে। পিনাকীকে কিছু না বলেই তারকের সঙ্গে চলে যায় কলকাতা। কারণ তারককে সে ফাঁকি দিতে চায় না। পিনাকী খুঁজে নিক তার প্রিয়াকে। পূর্ণ হোক তার নীড় বাঁধার বাসনা। তবে মিনতি তার সঙ্গে জড়াতে চায় না নিজেকে। 'পুনরাবৃত্তিতে কী লাভ'। তারক হয়তো বুঝেছিল তার; দ্বন্দ্ব তাই তার গায়ে রাখা মিনতির হাতে চাপ দিয়ে নিশ্বাস ফেলে। সে নিশ্বাস যেন প্রিয়াকে নতুন করে ফিরে পাওয়ার শান্তির নিশ্বাস। গল্পটিতে মিনতির মনের দ্বন্দ্বই প্রধান।

৪) **রাজনৈতিক গল্প :** রাজনীতি একদা জড়িয়েছিল সমরেশকে গভীরভাবে; তার চিহ্ন পড়েছে তাঁর অনেক গল্পে। আমরা আলোচনা করব 'কিমলিস' আর 'স্বীকারোক্তি' গল্প দুটি। 'কিমলিস' এক শ্রমিকের কমিউনিস্ট হওয়ার কাহিনি। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে সমরেশ একসময় কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে চটকল-মজুরদের মধ্যে কাজ করেছেন।

উত্তর চব্বিশ পরগনার চটকল-মজুরদের বস্তি আর চটকল রয়েছে গল্পটির প্রেক্ষিতে। দরিদ্র বনোয়ারি কাহারের পুত্র নিরক্ষর বেচন ছিল চটকলের স্পিনার। কিছুটা বাহাদুরির লোভে সে যোগ দিয়েছিল কারখানার রেশন হরতালে—''কারখানার সকলের মুখে খালি বেচন, আরে এ কৌন বড়ি বাত, লেবার অফসার, মানিজারের মুখেও নামটা শুনে, তার প্রতি সকলের দরদ দেখে, গোপনে তার দিল একরকমের বেহুশ হয়ে গিয়েছিল।'' তার দেড় বছরের জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে আসে এক নতুন বেচন। কথাবার্তা, আচার সবই তার বদলেছে, সে 'কিমলিস বনকে আয়া।' বস্তির কেউ জানে না 'কিমলিস' বা 'কামনিস' কী বস্তু। তবু বেচনের মা-বাবা আর অন্য সব বস্তিবাসী যেন বেচনের বিরোধী হয়ে যায়। বেচন যদিও জেল থেকে আসার সময় এনেছে মার্ক্স-এর 'কমিউনিজম', লেনিন-এর 'মার্কসবাদী শিক্ষা' আর রামনরেশ গুপ্তের 'ভুখা মজদুর' বই তিনটি, তবু সে ও জানে না 'কামনিস' কি। সে জানে না বামপন্থা আর দক্ষিণ পন্থার বিভেদ কোথায়, কমিউনিস্ট নেতা নারায়ণবাবুর ব্যাখ্যায় সে আরও বিভ্রান্ত বোধ করে। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস—'টাইম যব আ বায়ে গা, ক্রান্তিওকার যব হো যায়গা, একদম ঠিক সে তব কামনিস বন যায়গা। হাঁ কোই রোজ বন যায়গা।'' সে বোঝে কেবল প্রতিবাদের ভাষা—''ছাঁটাই নোটিস অফিসকে টেবিল পর জমা কর দো। কাহে? মজদুর ... সব মর যায়গাতো জামানা কৌন বদলেগা।'' এভাবেই যথার্থ রাজনৈতিক গল্প হয়ে উঠেছে 'কিমলিস'। 'প্রতিরোধ' গল্পটির ভিত্তি ১৯৪৬-১৯৪৯-এর তেভাগা আন্দোলন। তাই এটিকেও বলা যায় রাজনৈতিক গল্প। 'মানুষ'ও একটি রাজনৈতিক গল্প। আর একটি ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক গল্প 'স্বীকারোক্তি'। গল্পটিতে প্রকৃত বিপ্লবীর অনমনীয় বলিষ্ঠতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচল। গল্পটি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে; সমালোচকেরা গল্পটিতে চরিত্র, বিবরণ আর ঘটনার সংগতিহীনতা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু গল্পটিতে রয়েছে বন্ধনহীন এক স্বাধীন প্রাণের কথা। কৈশোর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো রকম চাপের কাছে সে নত হয়নি। বাবা, মা, বিপ্লবী দলের বন্ধুরা, স্ত্রী রেবা, পার্টির লোকাল অ্যাকশন কমিটির সদস্য, প্রেমিকা নীরা, এস.বি. সেলের পুলিশ কেউই তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। কারণ এই বন্দিত্ব, একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য সারাজীবন সে চেষ্টা করেছে। ''এই বোধই কি সমষ্টির সঙ্গে জীবনকে ভাগ করে ভোগ করার বাসনাকে ব্যক্ত করেনি?'' যারা কোথাও ঠেকে গিয়েছে তাদের বোধ কোথাও নিঃশেষে মুছেছে। আর মিথ্যুকেরা উত্তরণের কথা বলে, কারণ একাকিত্ব কখনো নিষ্ক্রিয় থাকেনা, বন্দিত্ব কখনো নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। সে সন্ধান দেয় জ্ঞান, মুক্তি আর মৈত্রীর নতুন নতুন পথের।'' কিছু মানুষ আছে যারা এভাবেই নিজেকে টিকিয়ে রাখে। কিছুতেই তাদের কাছ থেকে আদায় করা যায় না স্বীকারোক্তি। তাই গল্পটির শুরু ও শেষে আসে 'তারপর....'' শব্দটি যা অন্তহীন অত্যাচার আর নিরবচ্ছিন্ন অনম্যতার ইঙ্গিত দেয়।

'মানুষ' (১৯৬৯) গল্পটির পটভূমি ১৯৫২-র নভেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ের বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা। বামপন্থী রাজনীতি ঝিমিয়ে পড়েছে অনেকটাই। এই সময়ে পার্টির লোকাল কমিটির নেতা দুটি ফ্যাকটরি ইউনিয়নের সেক্রেটারি ধীরেশকে সদ্য কারামুক্ত সুজিত নিয়ে যাচ্ছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। কারণ পার্টির নাম করে সে জনপ্রিয় নেতা ধ্রুবকে খুন করিয়েছে। কারণ তারা ''ধরেই নিয়েছে রাজনীতি আর বিপ্লব করতে হলে, নেতা হতে হলে, মনুষ্যত্বের কোনো দরকার নেই।'' গল্পের প্রয়োজনে অবশ্য ধীরেশের মধ্যে জেগে উঠেছে অনুতাপ এবং তাই তার মধ্যে মনুষ্যত্বের পুনর্জাগরণ ঘটেছে এবং তাকে মুক্তি দিয়েছেন ভগবতী দেবী আর সুজিত।

৫) **নির্যাতিত অবহেলিত কৈশোরের কাহিনি :** শোষণভিত্তিক অর্থনির্ভর এ সমাজ কেমন করে নির্মল কৈশোরকে ব্যবহার করে, হত্যা করে তারই কাহিনি 'নিষিদ্ধ ছিদ্র', 'পেলে লেগে যা' আর 'মরেছে প্যালগা ফরসা'।

প্রথম দুটি গল্পের নায়ক কান্তকুণ্ডুর মুদি দোকানের কিশোর কর্মচারী বৃন্দাবন বা বেন্দা, তাকে দোকানের সবাই ডাকে 'শুয়োরের বাচ্ছা', 'কাকের বাচ্ছা' বলে, বেন্দা মুখে কিছু বলে না। কিন্তু তার দৃষ্টিতে ওরা সবাই ইঁদুরের বাচ্ছা। ''তার কোনো খেলার অবসর নেই, তার মাইনে নিয়ে যায় তার মা। সে এখন তার বাবাকে ছেড়ে অন্য

লোকের সঙ্গে থাকে। ('নিষিদ্ধ ছিদ্র') ছুটির দিনে তাকে নিয়ম করে ফিরতে হয় সেই বাড়িতে আর বি-পিতার ফরমায়েশ খাটতে হয়। এমনিপ্তেত তার খাওয়ার ব্যবস্থা কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে। সেখানে ভরপেট খাওয়া জোটে না তার। রাতে গুদামঘরে চাবিবন্ধ অবস্থায় ঘুমোতে হয় তাকে, এই সময়টি তার একমাত্র মুক্তির সময়। সে মুগুরের মতো মোটা লাঠি দিয়ে মারতে থাকে ইঁদুর। এজন্য কান্ত তাকে পয়সাও দেয়—ছোটো ইঁদুর পাঁচ ও বড়ো ইঁদুর দশ পয়সা হিসেবে। কিন্তু অর্থের জন্য সে ইঁদুর মারে না, মারে অবরুদ্ধ ক্রোধের মুক্তির জন্য। তার কাছে—''সারাদিন নামহীন জীবনের দুর্জয় পরিশ্রমের পরে, অনেক অপমান আর অপূর্ণ খাওয়ার পরে এ এক সুখের খেলা।'' কিন্তু ক্রমে এ পথেই নেমে আসে নির্মম নিয়তি। 'পেলে লেগে যা' তার নিষ্ঠুর পরিণামের কাহিনি। বিজয়া দশমীর দিন নতুন জামাকাপড় পরে বাড়ি না যেতে পেরে খুশি হয় বেন্দা। কুন্ডু মশাইয়ের বাড়িতে নানা ফাই-ফরমাশ খাটে আনন্দিত মনে। এ সময়ই সে বাড়ির লোকেরা মজা দেখার জন্য তাকে গিলিয়ে দেয় অনেকখানি সিদ্ধি। নেশাতুর তার লাফঝাঁপ দেখে আনন্দ পায় সবাই। উত্তেজিত মত্ত বেন্দা খাওয়ার পর ভালোকরে মুখ-হাত ধুতে পারে না। তার সারা গায়ে লেগে থাকে খাবার। 'পেলে লেগে যা' অর্থহীন এই শব্দগুলি উচ্চারণ করে সে নেচে যায়। কান্ত কুণ্ডুর লোকেরা তাকে টেনে এনে গুদামে পুরে চাবি দিয়ে যায়। নেশায় অচেতন তার দেহ ঘিরে ইঁদুরদের উৎসব শুরু হয়।

সকালে দেখা যায় মর্মন্তুদ এক দৃশ্য। বেন্দার চোখ থেকে শুরু করে শরীরের সমস্ত নরম অংশ কুরে খেয়েছে ইঁদুরেরা। ডাক্তার জানান অল্প আগেই মারা গেছে সে। তার এ মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কিন্তু কান্ত কুণ্ডুর মতো ধনীর দল। তারাই তাকে ভাঙ খাইয়েছে আর তার অচেতন দেহ পুরে দিয়েছে গুদামে।

'মরেছে প্যালগা ফরসা'—একই অত্যাচারের চিত্র। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ আর স্বাধীনতা দিবসের প্রেক্ষিতে বড়ো করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে একদল নামগোত্রহীন ভিখারি কিশোর। তাদের বাপ-মা নেই। পোড়ো এক বাড়িতে সবাই মিলে তারা থাকে—''তাদের পেছনে কিছু নেই, সামনেও কিছু নেই। দিন আসে রাত যায়, তাদের জীবনটাও কাটে।'' একদিন সেই জীবনগুচ্ছ দেখলো তাদেরই সঙ্গী প্যালগা ফরসা মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে চাতালের এক কোণে। বস্তা থেকে মুড়ি খাওয়ার অপরাধে মুড়িওয়ালা কদম সার নির্মম প্রহারে তার মৃত্যু হয়। কোনো প্রতিরোধ নেই এভাবেই এরা মরে, এদের মরতে হয়। তবু এ ঘটনা নজরে পড়ে পুলিশের। পুলিশের কথায় তারা মৃত প্যালগা ফরসাকে নিয়ে অপেক্ষা করে। তারা দেখে দশ-বারোজন লোক নিয়ে কদম সা থানায় ঢুকল আবার চলেও গেল। বোঝা যায় দারোগা অর্থের বিনিময়ে রেহাই দিয়েছে কদমকে। শুধু এটুকু করুণা সে করে পরের দিন প্যালগা ফরসার সব দাহের ব্যবস্থা করে। ভিখারি ছেলেগুলো যেন নতুন একটা মজা পেয়ে যায়। তারা প্যালগার শব বাঁশে বেঁধে কাঁধে করে নিয়ে যায় আর শ্লোগান দেয় 'মরেছে প্যালগা ফরসা দে হরিবোল।' শুধু সিনেমাহলের সামনে জড়ো হওয়া খোকাখুকুদের জন্য বাবুরা একবার তাদের থামিয়ে দেয়। একটিমাত্র ছেলে কোড়ের চোখে দেখা যায় জল। সে কাঁদে আর বলে—কদম সার ভুঁড়ির মাংস সে একদিন কামড়ে ছিঁড়ে খাবে।'' আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ আর স্বাধীনতা দিবসের উল্লেখে গল্পটিতে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে সমরেশের শ্লেষ।

তবু এই তুচ্ছ প্রাণকণাদের তিনি অবজ্ঞা করেননি। তাদের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন মনুষ্যত্বের ক্ষণিক উদ্ভাস। কোড়ে নামের ছেলেটির কান্না আর সক্রোধ ঘোষণায় রয়েছে তারই ইঙ্গিত।

৬) **সমকালীন সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প :** সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভিত্তিতে লেখা গল্প 'আদাব' নিয়েই সমরেশ পা দিয়েছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে। 'পরিচয়' পত্রিকার ১৯৪৬-এর শারদ সংখ্যায় মুদ্রিত গল্পটি খ্যাতি এনে দিয়েছিল সমরেশকে। গল্পটির ঘটনাস্থল কলকাতার রাস্তা, দুটি গলির সংযোগস্থল। সেখানে এক ডাস্টবিনের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে এক মুসলমান মাঝি আর সুতাকলের হিন্দু শ্রমিক। সন্দিগ্ধ আতঙ্কের মধ্য দিয়ে পরিচয় হয় দুজনের। তারপর তাদের আলাপে নিজেদের আসন্ন বিপদ, পরিবারের পরিণাম—সবই প্রকাশ পায়। তারা বিস্মিত হয়ে ভাবে এ দাঙ্গার কারণ কী—''এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসাহাসি কথা কওয়াকওয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—

একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে? কি অভিশপ্ত জাত! সুতা-মজুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।'' সাধারণ মানুষ দাঙ্গার কারণ খুঁজতে চায় না। তাই লেখকও এর কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। শুধু তাদের বিস্ময় আর হতাশাকে তিনি প্রাণময় করে তুলেছেন। মাঝির মতে এই নিধনযজ্ঞের ফলে ''তুমি মরবা, আমি মরুম আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব।......নেয়তারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুমজারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরেত মরলাম আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি, নাইলে এমুন কামড়াকামড়িটা লগে কেমবায়?—নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দুহাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।'' গল্পের শেষে মরিয়া মাঝি বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করে। পারস্পরিক হৃদতা নিয়ে উচ্চারিত হয় বিদায়সম্ভাষণ 'আদাব'। কিন্তু বাড়ি যেতে পারে না মাঝি। টহলদার সৈন্যের গুলিতে মারা যায় সে। মৃত্যুর আগে তার অসহায় আর্তির কথা সে বলে যায় হিন্দু মানুষটির কাছে—''পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না অগো কাছে।'' এমন করেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয়েছে মানুষের সহৃদয় সহমর্মিতায়।

দাঙ্গার মতো দেশভাগ আর তার ফলে মনুষ্যত্বের বিনাশ হয়ে উঠেছে সমরেশের 'বিনিময়' গল্পটিতে। আদর্শবাদী দেশসেবক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল—সব নেতারাই তাঁর বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার পাত্র। তাই দেশ ছাড়তে চাননি তিনি। কিন্তু কঠোর বাস্তব ভেঙে দিল তাঁর বিশ্বাস। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধল পুববাংলা জুড়ে। দেশভাগ হয়ে এলে স্বাধীনতা। স্তব্ধ বেদনায় মাস্টারমশাই গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হলেন। আশ্রয় মিলল চব্বিশ পরগনার শিল্পাঞ্চলের এক কলোনিতে। বিনিময়ে তীব্র অনিচ্ছায় প্রিয় কন্যা স্বর্ণকে বিবাহসূত্রে সমর্পণ করতে হল শক্তিমান লেবার অফিসার বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর হাতে। কারণ তার অনুগ্রহেই আশ্রয় পাওয়া গেছে; হয়তো পাওয়া যেতে পারে একটি কেরানির চাকরি। তবু সম্প্রদানের সময় তাঁর চোখ ফেটে বের হয় জল, ''হাহাকার করে উঠল বুকের মধ্যে। কী অপরাধ করেছি আমি! আজ কেন আমি দেশ ছাড়া, ভিটা ছাড়া বল,—

চোখের উপর ভেসে উঠল প্রাণের চেয়ে প্রিয় সেই তাঁদের মূর্তিগুলি। বল, আজ কেন এ বিসর্জন দিতে হল আমাকে?''

চিরকাল এভাবেই রাজনীতি গ্রাস করে সাধারণ মানুষের ছোটো ছোটো শান্তির নীড়গুলি। ধ্বংস হয়ে যায় মনুষ্যত্ব। তাদের অশ্রুর খোঁজ রাখে না কেউ। মানুষকে ভালোবেসেছিলেন সমরেশ, শ্রদ্ধা করেছিলেন জীবনকে। 'শহীদের মা', 'ফটি চার', 'সেনেটের বাবু', 'দুলে বাড়ির ভাত' গল্পগুলিতে—তাঁর সেই মানবপ্রীতি, জীবনানুরাগের চিহ্ন রয়ে গেছে। আপাত সাধারণতার মধ্যেই তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত হয় মানবিকতার চিরদিনের সত্য। ব্রাহ্মণবধূ শিবানী দুলে বউ মন্দোদরীর ঘরে ভাত খেয়েছে বলে নিন্দিত হয়। স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলে মন্দোদরী বলেছিল তার শাশুড়ি বড়ো ননদ সবাই তার ঘরে লুকিয়ে ভাত খেয়ে যায়। তাই ক্ষুধাকাতর সে-ও খেয়েছে। বলেই সে কাঁদতে থাকে তখন বৃন্দাবনের মুখে উচ্চারিত হয় একটি অতি বাস্তব সত্য—''দুলেদের আমি চিনি। ওদের ভাত আমাদের থেকে খারাপ না। ওদের একটাই দোষ, ওরা দুলে।'' মানুষের নির্মিত জাতিভেদের অর্থহীনতা এভাবেই স্বচ্ছ করে দেন সমরেশ বসু। কোনো নিবিষ্ট পাঠকের মনে পড়তে পারে উপনিষদের বাণী অন্নই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের কোনো জাতিবর্ণ নেই। আরও মনে পড়বে দুর্ভিক্ষের সময় নির্দ্বিধায় চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেছিলেন ঋষি; যাঁর মতে প্রাণ বা আত্মাকে যে কোনোভাবে রক্ষাই ধর্ম।

সমরেশ বসুর জীবনদৃষ্টির মধ্যে ছিল জীবনকে শ্রদ্ধা আর সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখার মন এবং তাকে সাহিত্যে রূপায়িত করার সাহস। তাই তাঁর গল্প আমাদের ফিরে ফিরে পড়তে হয়। আর প্রতি পাঠেই বহুপল হীরকের মতো

ঝলসে ওঠে জীবনের নিত্য উজ্জ্বল নতুন রূপ। এখানেই তাঁর সাহিত্যের সার্থকতা।

৫.১৪ মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-)

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক বাস্তবতার সার্থক শিল্প-রূপকার মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি। জন্মস্থান ঢাকা, পৈতৃক আবাস পাবনা জেলার ভারেঙ্গা গ্রাম। পিতা মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) ছিলেন কবি, সাহিত্যিক এবং 'বর্তিকা' নামে বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) থেকে মুদ্রিত পত্রিকার একদা সম্পাদক। মাতা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন সাহিত্যিক, লিখতেন 'জয়শ্রী' ও 'পরিচয়' পত্রিকায়। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় তিনি পার্ল বাক-এর রচনার অনুবাদ করেছিলেন। সমাজসেবাও সাম্যমতো করতেন। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক ছিলেন তাঁর পিতৃব্য।

শিক্ষা : মহাশ্বেতার শিক্ষা শুরু হয় ১৯৩০-এ ঢাকার ইডেন মন্তেসরি স্কুল-এ। ১৯৩৬ সালে তিনি মেদিনীপুর মিশন স্কুলে পড়েন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮—এই তিন বছর পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি—শান্তিনিকেতনে পড়েন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১—এই দু বছর অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি পড়াশোনা করেন বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে। আবার ১৯৪২-এ রাজশাহি থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন মহাশ্বেতা। আই. এ. পাশ করেন আশুতোষ কলেজের মহিলা বিভাগ থেকে ১৯৪৪-এ। সাম্মানিক ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে স্নাতক হন বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৪৬-এ। ১৯৬৩-তে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী রূপে মহাশ্বেতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন।

ব্যক্তিজীবন : ১০.২.১৯৪৭-এ অভিনেতা নাট্যকার, 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর অন্যতম পুরোধা বিজন ভট্টাচার্যকে বিবাহ করেন মহাশ্বেতা। ২০.৬.১৯৪৮-এ পরবর্তীকালের কবি-লেখক-অভিনেতা একমাত্র সন্তান নবারুণের (বাপ্পা) জন্ম। ১৯৬২ সালে বিচ্ছিন্ন হয় এই বিবাহ। ১৯৬৬-তে দ্বিতীয় বিবাহ অসিত গুপ্তের সঙ্গে। ১৯৭৬-এ হয় বিবাহ বিচ্ছেদ।

জীবিকা : ১৯৪৮-১৯৪৯—এই এক বছর কলকাতার পদ্মপুকুর ইনস্টিটিশন-এর প্রাতবিভাগে শিক্ষকতা করেন মহাশ্বেতা। ১৯৪৯-১৯৫১—এই দুবছর কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসে আপার ডিভিশন ক্লার্ক-এর চাকরি করেন। কমিউনিস্ট সন্দেহে তাঁকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি কাপড় রং করার সাবান ও কাপড় রং করার গুঁড়ো বিক্রি, টিউশনি ইত্যাদি কাজ করেন। এই সময়েই 'সচিত্র ভারত' নামের ব্যঙ্গমূলক সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীসুমিত্রা দেবী, শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী, সুমিত্রা দেবী—এইসব ছদ্মনামে ভৌতিক, কৌতুক প্রভৃতি নানা ধরনের কাহিনি রচনা করেন। এই সময়েই তিনি সৃষ্টি করেন অনবরত বাগচী নামের আজগুবি গল্পের বক্তাকে। এ সময় অনবরত বাগচী বয়স্কপাট্য গল্পের বক্তা। এসব লেখার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন। ১৯৫৭ পর্যন্ত চলেছিল এই জীবিকা-বিচিত্রা। ১৯৫৭-তে তিনি রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে এক বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৪-তে তিনি বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে পড়ানো শুরু করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি গ্রহণ করেন স্বেচ্ছাবসর। এরপরে আদিবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ, গল্প-উপন্যাস রচনা এবং সাংবাদিকতা ও তদন্তমূলক রচনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এইসব কাজের সূত্রে তিনি বহুবার পৃথিবীর নানা দেশে গিয়েছেন, স্বদেশ তাঁর কাজের স্বীকৃতি জানিয়েছে 'পদ্মশ্রী', 'জ্ঞানপীঠ' প্রভৃতি পুরস্কার দিয়ে। মহাশ্বেতার পরিবারে ছিল সাহিত্য মনস্কতা। তাই বেলতলা গার্লস স্কুলে পাঠের সময়ই সহপাঠিনী পরবর্তীকালের কবি রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে তিনি একটি হাতেলেখা পত্রিকা 'ছন্দছাড়া' (১৯৩৯) প্রকাশ করেছিলেন। খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' পতিত্রকায় ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইটি নিয়ে মুদ্রিত লেখাটিই মহাশ্বেতার প্রথম প্রকাশিত রচনা।

তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ঝাঁসির রাণী' নামের জীবনীটি। ১৯৫৬ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশের পরই তিনি গ্রন্থ রচনাকে

জীবিকা নির্বাহের অন্যতম পথ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাসের নাম 'নটী' (১৯৫৭)।

১৯৮০ থেকে 'বর্তিকা' নামের ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করে চলেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর মুদ্রিত গল্প-গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ইংরেজি ছাড়া জাপানি, ফরাসি এবং হিন্দি, তেলেগু, ওড়িশি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনা। বড়োদের জন্য রচনার পাশাপাশি কিশোরদের জন্যও তিনি বিবিধ রসের বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন। এখানে তাঁর উভয়বিধ গল্প-সংকলনের একটি তালিকা দেওয়া হল।

(১) 'সোনা নয় রূপো নয়', ১৯৬০; (২) 'সপ্তপর্ণী', ১৯৬১; (৩) 'অগ্নিগর্ভ'—('বসাই টুডু, দ্রৌপদী, জল, এস. ডবলিউ বনাম লখিন্দ্য'; (৪) 'অনবরতর অবিশ্বাস্য', ১৯৭২; (৫) 'সুভগা বসন্ত', ১৯৮০; (৬) 'সুরুজ গাগরাই' (৭) 'বেহুলা', ১৯৮১; (৮) 'মায়ের মূর্তি', ১৯৮২; (৯) 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প', ১৯৮২; (১০) 'মূর্তি', ১৯৮৩; (১১) 'পাঁকাল', ১৯৮৩; (১২) 'দৌলতি' (দৌলতি, পালামউ, গোহুমণি), ১৯৮৪; (১৩) 'নৈর্ঋতে মেঘ' (জগমোহনের মৃত্যু, শিশু, বিছন, শিকার, ধৌলী, ডাইন); (১৪) 'ইটের পরে ইট', ১৯৮৭; (১৫) 'কি বসন্তে কি শরদে' (১৬) 'প্রথম পাঠ', ১৯৮৮; (১৭) 'ঘাতক', ১৯৮৯; (১৮) 'তালাক ও অন্যান্য গল্প', ১৯৯২।

কিশোর গল্প-সংকলন : (১) 'গল্পের গরু ন্যাদোশ' (২) বাঘা শিকারী' (৩) 'হারে রে রে' (৪) 'জাতকের গল্প' (৫) 'কিশোর সঞ্চয়ন', ১৯৮৫; (৬) 'মুনেশ্বর', ১৯৮৭।

রচনা-বিশেষত্ব ঃ মহাশ্বেতা দেবী একই সঙ্গে লেখক এবং মননদীপ্ত গবেষক। বহু বিস্তৃত তাঁর কর্মক্ষেত্র। আদিবাসীদের মধ্যে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করেছেন। আবার এই অবহেলিত মানুষগুলি, পিছিয়ে থাকা জনগণ, অবহেলিত, উপেক্ষিত, অত্যাচারিত মানুষগুলি তাঁর লেখার বিষয়। বস্তুত জিনিসটি তাঁর রিক্‌থ—পৈতৃক ধন। তাঁর পিতা মনীশ ঘটক (ছদ্মনাম যুবনাশ্ব) চোর, ভিখিরি, পকেটমার, রূপজীবী—সমাজবিন্যাসের এই নিম্নস্তরের মানুষগুলিকে নিয়ে লিখেছিলেন 'পটলডাঙার পাঁচালী'। তাঁর মা ধরিত্রী দেবী নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সমাজসেবাও করেছেন। বলা যায় যারা সভ্যতার 'পিলসুজ মাথায় নিয়ে' যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জীবনকে লেখার বিষয় করার বা তাদের জন্য কাজ করার প্রেরণা ছিল তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত।

বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে কেটেছিল তাঁর শৈশব। সে পরিবারে কেউ-ই ছিল না অবাঞ্ছিত। ভৃত্য-পরিচারিকারাও সেখানে হয়ে গিয়েছিল পরিবারের সদস্য। তাই তাঁর মনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। মহাশ্বেতা দেবীর লেখকজীবনকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটি অধ্যায়। সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আর একটি অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে নির্যাতিত, নিপীড়িত অন্ত্যজ মানুষগুলির জীবনচিত্র ততটা প্রবল নয়। তবে এ অধ্যায়েও ভারতবর্ষের বিচিত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন মানুষকে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর মনে। আর বিভিন্ন স্তরের নরনারীর উপর অত্যাচারের দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি এসময়ের রচনায়। এই সময়েও তাঁর ইতিহাসবোধ প্রবল। তিনি যে অভিজ্ঞতার সত্যতার ভিত্তিতে নির্মাণ করছেন সাহিত্য—এটা তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্বে তিনি অভিজ্ঞতা-অর্জনকে করে নিয়েছেন জীবনের অঙ্গ এবং রচনা করেছেন সেই জীবনের ভাষারূপ। ষাটের দশকের শেষ দিক থেকেই আদিবাসী, অন্ত্যজ, নিপীড়িত, ভূমিদাস, মানুষগুলির দুঃখদীর্ণ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। এজন্য তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন বিহার আর বাংলার দরিদ্র, আদিবাসী-অধ্যুষিত স্থানগুলি। তাদের সঙ্গে বাস করেছেন দীর্ঘকাল। স্বাধীনতার অর্ধশতক পরেও যে মানুষগুলি জীবনধারনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারেনি, বরং উচ্চবর্ণের শোষণ, লালসার শিকার হয়ে আছে—সেই লোধা, শবর, গঞ্জু, দুসাদদের জীবনচিত্র বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। চরিত্র এবং তার প্রেক্ষিত—উভয়ই তাঁর রচনাগুণে

হয়ে উঠেছে বলিষ্ঠ এবং সুন্দর। তাঁর গল্পের কেন্দ্রবিন্দু বিত্তহীন অন্ত্যজ শ্রেণির অনন্ত দুঃখ, যন্ত্রণা এবং অত্যাচারী বিত্তবান উচ্চবর্ণের মানুষ।

মহাশ্বেতার গল্পে বার বার আসে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা আর পক্ষপাতিত্ব কীভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির জীবনকে আশাহীনতায় নিমজ্জিত করে রাখে তার চিত্র। তাদের জন্য খাতায়-কলমে প্রণয়ন হয় আইন, তৈরি হয় নানা প্রকল্প। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় না তার প্রয়োগ। শোষকশ্রেণি বুঝিয়ে দেয় কলেরার ইনজেকশন নিলে তাদের পুরুষত্ব নষ্ট হবে ('জগমোহনের মৃত্যু ও তারপর') লেখাপড়া শিখতে চাইলে তাদের উপরে নেমে আসে মৃত্যু।

আবার এই অজ্ঞতার কারণে ডাইনি-সংস্কার, উপদেবতায় বিশ্বাস, গোষ্ঠীর ধর্মগুরুদের প্রতি অযৌক্তিক অতিবিশ্বাস বিন্দুমাত্র টলে না। ফলে তারা একে অপরকে নির্যাতন করে। 'বাঁয়েন' এমনই একটি গল্প। ডোমের মেয়ে চণ্ডী, জীবনধারণের জন্য তাকে গ্রহণ করতে হয় পিতার বৃত্তি শিশু-সব সমাধি দেওয়ার কাজ। ক্রমে মলিন্দর ডোম তাকে বিবাহ করে। সন্তানের মা হয় সে। পুত্র ভগীরথের অমঙ্গল-আশঙ্কায় সে আর ওই কাজ করতে চায় না। পরিণামে গোষ্ঠীর মানুষগুলি তাকে চিহ্নিত করে 'বাঁয়েন' নামের অপসত্তা হিসেবে। তাকে নির্বাসিত করা হয় গ্রামসীমার বাইরে। তার জন্য নির্দিষ্ট সিধা ঘরের রেখে দ্রুত পালিয়ে আসে মানুষ। পথে বের হতে হলে তাকে টিন বাজিয়ে যেতে হয়, যাতে মানুষ সরে যেতে পারে। কারণ বাঁয়েন চোখের দৃষ্টিতে শুষে নিতে পারে মানুষের রক্ত। এই চণ্ডী কিন্তু প্রাণ দিয়ে ট্রেন থামিয়ে বন্ধ করে, স্বীয় গোষ্ঠীর ট্রেন ডাকাতির পরিকল্পনা। দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য সরকারের দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে ভগীরথ। বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করে যে তার মা চণ্ডী দাসী। এভাবেই সন্তানের স্বীকৃতির মধ্যে সংস্কারের অসত্যটি প্রতিষ্ঠা পায়।

গল্পটিতে ডোমেদের ট্রেন ডাকাতির কারণ স্পষ্ট নয়। কিন্তু অনেক গল্পে মহশ্বেতা নিম্নবর্ণের অপরাধের কারণ যে নিতান্তই জৈবিক, উদরপূর্তির প্রয়াস তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। 'ভাত' এমন একটি গল্প। গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে সচ্ছল মানুষ আর চির-ক্ষুধার্ত মানুষের সংঘাত। সম্পন্ন এক পরিবারের কর্তা ক্যানসারে মুমূর্ষু। চিকিৎসার সঙ্গে নিরাময়ের আশায় ধর্মীয় বিধান অনুসারে কাজ চলেছে। এই সময়ে পরিচারিকা বাসিনী নিয়ে আসে উচ্ছব নাইয়াকে, কাজে সাহায্যের জন্য। পেট ভরে ভাত খাওয়ার আনন্দ উচ্ছবের কাছে ছিল স্বপ্ন। ধনীগৃহে রান্না হয় নানা ধরনের চালের ভাত—উচ্ছব চোখ-কান দিয়ে যেন গ্রহণ করতে চায়—এই স্বাদ—''ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়বাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, মেজ আর ছোটোর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন-চাকর-ঝিদের জন্য মোটা সাপটা চাল।''

ধর্মীয় নিরাময় ক্রিয়ার পরিচালক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ নির্দেশ দিয়েছেন নিরাময়-যজ্ঞ চলাকালে বাড়িতে কারও আহার করা চলবে না। প্রবল হয়ে ওঠে উচ্ছবের ক্ষুধা। যজ্ঞ-শেষের পরমুহূর্তে মৃত্যু হয় কর্তার। প্রচলিত সংস্কারমতে মৃতের বাড়ির রান্না করা খাদ্য ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ব্যাপারটি বোঝামাত্র হিংস্র হয়ে ওঠে তার ক্ষুধা। পিতলের বিশাল ভাতের হাঁড়ি নিয়ে সে পালিয়ে আসে স্টেশনে। তারপর প্রাণভরে ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে উচ্ছব। কিন্তু যারা জানে না ক্ষুধা কি—সেই বাড়ির মানুষগুলি ভাত নয়—ভাতের হাঁড়ি চুরির জন্য তাকে মারতে মারতে তুলে দেয় পুলিশের হাতে।

শক্তিমানের শোষণ আর নিরুপায় অত্যাচারিতের অপরাধের আর একটি গল্প 'নুন'। চিরকাল বানিয়া উত্তমচাঁদের বাড়িতে 'বেঠবেগারি' দিয়েছে ঝুঝার গ্রামের মুন্ডারা। সাতাত্তর সালে নির্বাচনের আগে গ্রামকর্মীরা তাদের বোঝায় এই প্রথা সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। তারা যেন আর 'বেঠবেগারি' না দেয়। মুন্ডারা মেনে নেয় এই কথা। শক্তিমান উত্তমচাঁদ তখন কৌশলে শাস্তি দিতে চায় মুন্ডাদের। তার নির্দেশে গ্রামের দোকানদারেরা খাদ্যকে স্বাদু করার আর শরীরকে সুস্থ রাখার অত্যাবশ্যক উপাদান নুন মুন্ডাদের বিক্রি করে না। তবু নত হয় না মুন্ডারা। নেতা পূর্তির কথায় বনের মধ্যে হাতির চাটার নুনমাটি (সল্টলিক) থেকে মাটি তুলে এনে তা খেয়ে বেঁচে থাকতে চায় তারা। এই নুনমাটি

আনতে গিয়ে দল-ছাড়া একলা হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যায় তিন মুন্ডা। সভ্য পৃথিবীর মানুষ তখন জানতে পারে একথা এবং বিস্মিত হয় ''নুনমাটি চুরাতে এসে মরল? নুনমাটি......নুন হেন সস্তা জিনিস।''

হাতির পদদলিত হয়ে মরে আদিবাসী, মানুষের গুলিতে মরে বনের প্রাণী। সবই সামান্য নুনের জন্য অথচ উত্তমচাঁদ বানিয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না।

মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, 'সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাসপ্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোন লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না।' ('ভূমিকা', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রমা')

মহাশ্বেতা দেবী স্বয়ং ছিলেন অসামান্য ইতিহাসবিদ; 'ঝাঁসির রাণী' তার প্রমাণ। ১৯৬৭ সালের উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি গ্রাম থেকে শুরু হয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। তা অত্যাচারিত পিছিয়ে পড়া মানুষগুলিকে দিয়েছিল প্রতিবাদ, প্রতিরোধের শক্তি। আবার এর বিরুদ্ধে ক্ষমতাবানদের, অন্যায়ের পোষক প্রশাসনের নির্মম অত্যাচার সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। মহাশ্বেতার যেসব গল্পে এই ইতিহাস জীবন্ত হয়ে আছে তাদের একটি 'দ্রৌপদী'। সাঁওতাল মেয়ে দ্রৌপদী মেঝেন হয়ে উঠেছিল দক্ষ নকশালকর্মী। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে ধরে ফেলে সেনাবাহিনী। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দু হাত, দু পা খুঁটোয় বেঁধে সারা রাত তাকে ধর্ষণ করে সেনারা; অবশ্যই অধিনায়কের নির্দেশে।

সকালে তাকে সেনানায়কের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে কাপড় ও প্রক্ষালনের জন্য জলের ঘটি দেওয়া হয়। দ্রৌপদী কাপড় দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। ঘটির জল মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর ক্ষতবিক্ষত রক্তময় নগ্ন শরীরে মাথা উঁচু করে সে এসে দাঁড়ায় সেনানায়কের সামনে। সেনানায়কের তার সাদা বুশশার্টে ছুঁড়ে দেয় রক্তমাখা থুতু। নিরুপায়ের উপর প্রশাসনের অত্যাচারের ভীরুতা উদ্‌ঘাটিত হয় তার আকাশচেরা ঘোষণায়—''হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব, কাপড় মোরে পরাতে দিব না।''

আবার শক্তিমান উচ্চবর্ণের অত্যাচার সহ্য করে যাওয়ার ধারাবাহিক ইতিহাস উন্মোচিত হয়েছে 'ধৌলী' গল্পে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মিশ্রীলাল প্রেমের ছলনায় ভোগ করেছিল ধৌলীর দেহ। ধৌলী সব জেনেও বাধা দিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল পতিতাবৃত্তি। 'বিছন' আর 'বেহুলা' গল্প দুটিতে নির্যাতিতের প্রতিবাদ তীব্র হয়ে উঠেছে। প্রথম গল্পটির ঘটনাস্থল বিহার। এখানে উচ্চবর্ণের ধনী লছমন সিং চিরকাল শোষণ করে এসেছে দুলন গঞ্জুদের মতো মানুষগুলিকে। সর্বোদয় কর্মীদের ভূদান আন্দোলনকালে খ্যাতি পাওয়ার জন্য সে দুলনকে দান করে একখণ্ড অনুর্বর জমি। এই জমির জন্য সরকারের কাছ থেকে দুলন আদায় করে ধানের বীজ 'বিছন' আর গোরু কেনার টাকা। বিছন থেকে সে সপরিবারে চাল বানিয়ে খায়। টাকার একই সদ্‌গতি হয়। এ যেন ন্যায়হীন প্রশাসনের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ।

এদিকে দীর্ঘ নিপীড়ণের বিরুদ্ধে ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে বিদ্রোহ। লছমন সিং প্রশাসনের সহায়তায় একে একে খুন করে বিদ্রোহী করণ, বুলাকি, আসরফি, হাজাম, মোহর, মহুবন, পারশকে। রাতের অন্ধকারে তাদের সে দুলনের জমিতে পুঁতে দেয়। দুলনকে আজ্ঞা দেয় পাহারা দেওয়ার। ফলে দুলন ওই পতিত জমিতে মাচা বেঁচে রাত কাটাতে থাকে। দুলনের ছেলে ধাতুয়া গান বাঁধে এই অত্যাচার নিয়ে। ক্রমে সেও হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। আর তাকেও লাশ হয়ে যেতে হয়। পিতার জমিতে পুঁতে ফেলা হয় তার লাশ।

এবার লছমন ঈষৎ ভীত হয়। কারণ দুলন পুলিশকে দিয়ে দিতে পারে প্রোথিত দেহগুলির হদিস। তাই একরাতে ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক হাতে সে সম্মুখীন হয় দুলনের। উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেওয়া ধাতুয়ার মৃত্যুতে তার কোন দায় নেই। পাথর ছুঁড়ে, পাথরে মাথা ছেঁচে দুলন খুন করে লছমনকে। খাদে পেলে দিয়ে তার দেহ পাথরে চাপা দেয়। ঘোড়া তাড়িয়ে দেয় দূরে। পরে ব্যাপারটা জানাজানি হলেও লছমনের জ্ঞাতি দৈতারি সন্দেহ-বশে ধৃত হয়।

দুলন এবার সেই জমিতে করে ধানের চাষ। শহিদের দেহমাংসের সারে উৎপন্ন হয় সুপুষ্ট ধান। এই ধান সে 'বিছন' হিসেবে বিলিয়ে দেয় প্রতিবেশীদের। যেন সে চায় বিদ্রোহ থেমে থাকবে না। বীজ থেকে উৎপন্ন ধানের মতোই তা ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠবে। তাই গল্প শেষে দুলনের মন প্রসন্ন—'ধাতুয়া—বলতে গিয়ে দুলনের গলা কেঁপে গেল। ধাতুয়া তোদের হম বিছন বন দিয়া।'

মাতৃত্ব মূলত একটি জৈব প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে নানা দিক দিয়ে দেখেছেন মহাশ্বেতা। 'জাহ্নবী মা'-তে ধর্মীয় শঠতার জালে বন্দি করে মাকে নির্যাতন করেছে তারই সন্তানেরা। 'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পে নিম্নবর্গের সুন্দরী জটি আপনাকে আর সন্তানকে বাঁচানোর জন্য দিনে গ্রহণ করে ঠাকরুন রূপ। এইভাবে দিনভর চাল সংগহ করে সন্ধ্যায় তার বয়স্ক বোধহীন সন্তানকে ভাত রেঁধে খাওয়ায় সে।

'স্তনদায়িনী' গল্পে বাঁচার তাগিদে মাতৃত্বকে পণ্য করতে বাধ্য হয়েছিল যশোদা। ধনীঘরের দুগ্ধহীন মায়ের সন্তানদের সে স্তন্য দান করে বড়ো করে তুলত। বিনিময়ে জুটত প্রাণধারণের উপকরণ। এই কারণে বার বার সন্তান ধারণে বাধ্য হত সে। যশোদা শেষে মারা যায় ব্রেস্ট ক্যানসারে; বর্ণনাহীন যন্ত্রণা সহ্য করে। এ গল্প একই সঙ্গে নারী নির্যাতনেরও কাহিনি। কারণ তার বক্ষসম্পদকে পুরুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। তার স্বামী কামনাতৃপ্তির জন্য তাকে ব্যবহার করেছে। আবার সংসার চালানোর জন্যও তাকেই ব্যবহার করেছে।

পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যোগ নেই মহাশ্বেতার সৃষ্টি নারীদের। ঋজু বলিষ্ঠ ভাষায় মেয়েদের সুখ-দুঃখ, শোষণ, বঞ্চনা মূর্ত হয়েছে তাঁর রচনায়। মেয়েদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ আর সংগ্রামের শক্তিও মূর্ত হয়েছে তাঁর গল্পে। মেয়েরা তাঁর রচনায় সময়ের অংশ, বাস্তব পৃথিবীর শরিক। নারীর এই বলিষ্ঠ সংগ্রামের রূপ রয়েছে 'রুদালী' গল্পে। স্বামী, সন্তান, পৌত্র সকলকে হারিয়েছে গল্পের নায়িকা শনিচরী। শেষে সে সম্পন্ন পরিবারে মানুষের মৃত্যুতে কান্না বিক্রি করে বেঁচে থাকার পথ বেছে নিয়েছে। কারণ এইসব ধনী পরিবারের কর্তা মারা গেলে সবাই ঐশ্বর্য হস্তগত করতে ব্যস্ত হয়। শোকের সময় থাকে না তাদের। তারা ভাড়া করে কান্নার লোক 'রুদালী'। যে যত বেশি রুদালী জোগাড় করে জমকালো কান্নার আয়োজন করে, ততই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

'এজাহার' গল্পের মুসাম্মিন দুসাদীর মধ্যে দিয়েও মহাশ্বেতা এঁকেছেন নারীর প্রতিবাদী রূপটি। উচ্চবর্ণের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে না সে। দারোগাকে বলে গ্রামের সকল মেয়ে হাঁসুয়া নিয়ে ঘোরে এখন "......মালিক লোক ইজ্জত নিতে আসবে মার ডালো। মেয়েদের থানায় এনে এজাহার নেওয়ার অর্থ সে এখানে জানে। "ধরমনাশ করে বলওতি করার নাম ইজাহার নেওয়া......" তাই বলে সে চায় না কারও অনুকম্পা। তাকে সহায়তার জন্য আগত সমাজকর্মীটিকে ফিরিয়ে দেয় এই বলে—"রেন্ডি হব না তোমাদের কলেয়ান মিশনে যাব না। আমার অন্য কাজ আছে। হাঁসুয়াটি কোমর থেকে নিয়ে ও হাত বুলায়।"

তাঁর গল্প জীবন থেকে নেওয়া। চরিত্রগুলি রক্তমাংসের মানুষ। মূল্যবোধহীন জীর্ণসমাজের শোষণ আর কুশাসনের বলি। এই সমাজে পিতা করালী স্বার্থের জন্য হত্যা করে পুত্রবধূ আর পুত্রকে। কারণ সে চেয়েছিল পুত্রবধূকে 'সতী' হিসেবে ব্যবহার করে অর্থ লাভ করতে। সফল হয় তার পরিকল্পনা। ময়না লোকের মনে মহাসতী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পত্নীর মৃত্যুতে শোকার্ত স্বামী পিতাকে আঘাত করতে চেয়েছিল। পরিণামে পিতার হাতে মরল সেই যুবক। আর ময়নাসতীর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা উঠল করালীর তহবিলে—পুজোয়—মন্দির প্রতিষ্ঠায়—মেলায়। ('ময়নাসতী অথবা একটি অলৌকিক কাহিনি')। সমকালের 'সতী'-উন্মাদ ভারতের একটি চিত্রও এখানে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতিকেন্দ্রিক আদিবাসীদের জীবনচিত্র এঁকেছেন মহাশ্বেতা। তাই প্রকৃতি-সচেতনতা উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। সভ্য মানুষের লোভ একই সঙ্গে অরণ্য আর অরণ্য-নির্ভর মানুষগুলিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে এই বোধ তাঁর মনে প্রকৃতির শুদ্ধতা, বিরাটত্বের ব্যাপ্ত মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চার করেছে। লোধা-শবরদের জীবনের সঙ্গে অরণ্য জড়িয়ে আছে আগাগোড়া। তাই নিষাদ কালকেতুর উপকথায় দেবী চান ব্যাধের দেওয়া নীল গন্ধরাজের মালা। এজন্যই

লোধা শবরদের মানসলোকে পবিত্র মুহূর্ত নীল গন্ধরাজ দেখা। লোধা নারী কুড়োনির কাছে ক্ষুধাতৃপ্তিই শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষণ। তাই 'যখন সে জঙ্গলে ঢোকে আর তখন যদি তুঙ্গা আলু মিলে তো কুড়োনি সেটা পেটকাপড়ে বেঁধে নেয়। তারপর, যদি কেউ কাছে না থাকে, শুধু থাকে কুড়োনি আর কুড়ন, তখন ধীরে, অলক্ষে নীল গন্ধরাজের গন্ধ তার মনের তৃণভূমি ব্যাপ্ত করে। এ গন্ধ মেঘের মতো ঘন ও মমতাময়' ('কুড়োনির বেটা')। প্রকৃতি এ গল্পে পরম প্রশান্তির প্রতীক।

'অন্ন অরণ্য' গল্পে অবাস্তব সংঘটনের আড়ালে বিবৃত হয়েছে বাস্তব সত্য; স্বার্থপর সভ্য মানুষের লুব্ধ কামনার সঙ্গে অরণ্য-নির্ভর আদিবাসীজীবনের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের আখ্যান। সরকারের সৃষ্ট বনে লাগানো হয় ইউক্যালিপ্‌টাস। ফলে ভেঙে যায় বনভিত্তিক জীবনশৃঙ্খল; কারণ এ বনে 'ঝাঁটি জঙ্গল, কন্দমূল, ফল, ছোটো জীবজন্তু যা আদিবাসীদের জীবনধারণের উপায়—তাদের কিছুই জন্মায় না। 'অন্ন অরণ্য' গল্পের ইউক্যালিপ্‌টাসরা মানুষের মতোই চিন্তা করতে পারে, তারা জানে যে তাদের স্বীকার করে না অরণ্যের আদিবাসীরা—''আদি বাসুলি ফরেস্টের শাল, পিয়াল, সিধু, মহুল, আসান, অর্জুন, কেঁদ, পলাশ, শিমূল, কুসুম, জাম, আমলকী, বহেড়া—বনতলের ঝোপ ও ঝাঁটিজঙ্গল—তুঙ্গাপানি, বিবিধ কন্দ গাছলতা—বেঁহুড়, লোনা, তেঁতুল, এসব গাছ উচ্ছেদ করে ওরা এসেছে বলে ইউক্যালিপটাসেরা মনে মনে স্ব-স্ব বিবেকের কাছে বড় অপরাধী......। আমরা সমাজ-অরণ্য, কিন্তু অরণ্যজীবী মানুষ আমাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে না।

''—কাটে জ্বালায়, কাটে জ্বালায়।

''—সারহুল পরবে বনে ঢুকে না।

''—আমরা সিম্‌পলি নট অ্যাকসেপ্টেড। বনবিভাগের নয়, জনগণের ভালোবাসা চাই।'' এই সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে বিস্তৃত এক সমাজজীবনের ঐতিহ্য।

যৌনতা আর হিংসা যথেষ্ট আছে মহাশ্বেতার গল্পে। এখানে শোষিত নিপীড়িত মানুষগুলির বিদ্রোহ থামিয়ে দেয় উচ্চবর্ণের মানুষগুলি এক বা একাধিক হত্যর দ্বারা। সেসব হত্যার কোনো তদন্ত হয় না। 'বিছন', 'জগমোহনের মৃত্যু তারপর', 'জল', 'দ্রৌপদী' প্রভৃতি অসংখ্য গল্পে রয়েছে তার প্রকাশ। নিম্নবর্ণের নারীরা উচ্চবর্ণের পুরুষদের লালসা মেটাবে এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। তারই দৃষ্টান্ত 'ধৌলী', ও 'এজাহার' গল্প দুটি। 'আজীর' গল্পে যৌনতা আর হিংসার আশ্চর্য প্রয়োগ দেখি। আত্মবিক্রয়কারী দাসের পুত্র পাতনও দাস। সে মণিবপত্নীর অতৃপ্ত যৌনতা, গৃহবাসনা মেটাতে তার সঙ্গে গৃহত্যাগে সম্মত হয় 'আজীর পাট্টা' (আত্মবিক্রয়ের দলিল) পাওয়ার বিনিময়ে। ঘর ছেড়ে মাঝমাঠে এসে মনিবানি জানায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায়নি সে দলিল; অতকালের পুরনো কাগজ হয়ে গেছে ধুলো। পাতনের বিশ্বাস হয় না এ কথা। সে মণিবপত্নীকে হত্যা করে ছুটে যায় আজীর পাট্টার সন্ধানে। কারণ সেই দলিলই তাকে নিয়ে যেতে পারে মুক্ত পৃথিবীতে, যেখানে 'দলমলে' যৌবন নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে বহু মেয়ে। শেষপর্যন্ত সে ব্যর্থ হয়; ধরা পড়ে এবং শাস্তি পায়।

'অন্ন-অরণ্য' গল্পে চাষি বাবা মহাজনের ধার শোধের জন্য কিশোরী আত্মজাকে করে দেয় মহাজনের 'ভাতুয়া'। মহাজন মেয়েটিকে দাসী এবং গণিকা—উভয়ভাবে ব্যবহারের অধিকার লাভ করে। এমন স্বীকৃত সহজ হিংসা আর যৌনতার পূর্ণ যে সমাজ তার চিত্র গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। ভাতুয়া মেয়েটি মনিবপুত্রের ভোগবাসনা মেটাত। কারণ এটা তার কর্তব্য বলেই গ্রহণ করেছিল সে। কিন্তু যখন লোকটি তাকে প্রতারণা করে তখন দা দিয়ে মণিবপুত্রের পুরুষাঙ্গে ভয়ানক আঘাত করে সে পলায়ন করে অরন্যে। আবার এই গল্পেই সামাজিক অরণ্যের ইউক্যালিপটাস গাছের ফরেস্ট অফিসারকে বিভ্রান্ত করে চাল চুরি করে পলায়ন করে। দুটি গল্প বাঁধা আছে অরণ্য এবং তৎসংক্রান্ত অতিকথার সূত্রে। বাস্তব আর প্রতীক এক হয়ে গেছে এই গল্পে।

কিশোর গল্প ঃ মহাশ্বেতা ছোটোদের জন্য কিছু গল্প লিখেছেন। এই গলল্পগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১)

পারিবারিক আবহে রচিত কৌতুক গল্প, (২) বঞ্চিত নিপীড়িত শ্রেণির মানুষদের কাহিনি, (৩) নিছক কৌতুক গল্প।

(১) **পারিবারিক আবহের গল্প ঃ** গল্পগুলি প্রায়শ সত্যভিত্তিক। একটি উদাহরণ 'গল্পের গোরু ন্যাদোশ'। এ গল্পের ন্যাদোশ কাল্পনিক জীব নয়। মহাশ্বেতা দেবীদের বহরমপুরের বাড়িতে সত্যই ছিল ওরকম একটি ল্যাগব্যাগে চেহারা ছ্যাতরান চার ঠ্যাঙ আর হিংস্র দৃষ্টির গোরু। সব কিছু—যথা—বই-খাতা, জামাকাপড়, মাছমাংস তার খাদ্য ছিল। উপরন্তু তার ছিল সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠার ক্ষমতা। নির্ভেজাল হাসির গল্প।

(২) **সমাজের নিম্নস্তরের দীন মানুষদের গল্প ঃ** এই ধরনের গল্পে কোনো মতবাদের প্রচারের প্রচেষ্টা নেই। সরল, সহজ ভাষায় তিনি ছোটোদের চিনিয়ে দিতে চাইছেন প্রকৃত বাস্তবকে। 'ভাইয়াসাহেব' গল্পটি তার উদাহরণ। একটি অশিক্ষিত লোক সাদা কাগজে টিপসই দিয়ে সামান্য টাকা ধার করে। কিন্তু কিছুতেই শোধ হয় না সেই টাকা। গোরু, ছাগল, জমি—সব দিয়েও শোধ হয় না ঋণ। শেষে লোকটি এই ধার শোধের জন্যই আর একটি সাদা কাগজে টিপসই দিয়ে ঋণদাতার ভূমিদাস হয়ে যায়।

(৩) **বিশুদ্ধ কৌতুক গল্প ঃ** কল্পনার অবাধ বিচরণ দেখা যায় তাঁর এ শ্রেণির গল্পে। 'ভূতানন্দ কলোনি' তার উদাহরণ। এ গাঁয়ের বাসিন্দারা যে মানুষ নয় তা বোঝা যায় কালিপুজোর রাতে। তখন তারা মুন্ডু খুলে জলে ধুয়ে পরে নেয়। এসময় মুন্ডুতে মুন্ডুতে একটু খোসগল্পও হয়।

অনবরত বাগচী নামের পেটানো শরীরের আজগুবি গল্প বানানোর ওস্তাদ মানুষটিকেও মহাশ্বেতা ছোটোদের গল্পে এনেছেন। তার গল্পে ঘনাদার মতো বিজ্ঞান-তথ্য ব্যবহৃত হয়নি। টেনিদার মতো বিশুদ্ধ মজা করার জন্যই মহাশ্বেতা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। অনবরত যোগবলে বারদশেক এভারেস্টে উঠেছেন, সাহেবরা প্রচার করেনি বলে কেউ জানতে পারেনি। তাঁর শিবাজির ঘোড়ায় চড়া নিয়ে গড়ে উঠেছে 'শিবাজির ঘোড়া' গল্পটি। তিন ধরনের গল্পের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির গল্পেই মহাশ্বেতা সবচেয়ে সফল হয়েছে। অন্য দু শ্রেণির গল্প কাটিয়ে উঠে পারেনি ফরমায়েশি লেখার ক্লান্তি।

গল্পভাষা ঃ মহাশ্বেতা দেবীর গল্পভাষা দুই ধরনের বিবৃতিমূলক এবং চরিত্রের সংলাপ। বিবৃতির ভাষায় তিনি সরলতার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন সাংকেতিকতা। বাস্তব আর প্রতীকের মিশ্রণে তাঁর ভাষা হয়ে ওঠে ঐতিহ্যলালিত এই ভারতবর্ষের যথার্থ উপস্থাপনার মাধ্যম। 'বেহুলা' গল্পের বিষয় সর্প ভয়-জারিত এর গ্রাম্যসমাজ। সেখানে 'বেহুলা' নামের শীর্ণ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় সর্পদষ্ট শব। সেই নদীর বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীপদ বলে একটি পুরাণাশ্রিত লোককথা—''বেহুলার ওপর অভিশাপ নামে। দেবতারা বলেন দেবভাষায় লাস্য দেখিয়ে নেচেছিল বেহুলা। তার ফলে যে পাপ হয়, সে পাপ খণ্ডাতে বেহুলাকে, কলিকালে নদী হয়ে বয়ে যেতে হবে!......সেই থেকে বেহুলা নদী হয়ে বইছে।'' সর্প-ভয়ক্লিষ্ট গ্রামের আবহ রচিত হয় 'বেহুলা', 'অভিশাপ', 'পাপ', 'কলিকাল' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে শীর্ণ অথচ একটি ঘূর্ণি বিশিষ্ট নদীটি হয়ে ওঠে গ্রামটির ক্লিষ্ট জীবনের উপমা।

গল্প শেষে মৃত্যুদূত কালাজ সাপের আস্তানা গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী হেদো নস্করের পুরোনো ইটভাটা জ্বালিয়ে দেয় গ্রামের মানুষ—তাদের সাহস জোগায় বসন্ত নামের মানুষটি। সে অপুষ্টিজনিত দুর্বল মানব শরীরে কালাজ সাপের বিষক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কারণে এসেছিল এই গ্রামে। গ্রামের ভরসা আধুনিক-মনস্ক সাপের ওঝা শ্রীপদর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় বসন্তের। শ্রীপদ কলাজের দংশনে মৃত্যুজনিত হতাশা-শোকের সঙ্গে শোকাহত বসন্তের উত্তেজনা মিশে গিয়ে সৃষ্টি হয় এই সর্প মন্দির ইটভাটা জ্বালানো আগুনের। গল্পের শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তিতে আগুন হয়েছে সার্থক একটি চিত্রকল্প—''আগুনের তাপে ছিটকে পড়ে কালাজ। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, নতুন উদ্দীপনা পায়।......সাপ বেরোতে থাকে। মরতে থাকে। গ্রামের লোকগুলির শোক, কালাজ বিষয়ে ভয় হেদা নস্করের ওপর রাগ সব উত্তরিত হয় তাৎক্ষণিক প্রজ্বলন্ত ক্রোধে। আগুন তাই ভীষণ জ্বলে।''

সাংবাদিকতার নৈর্ব্যক্তিক তথ্যবহুল ভাষা মহাশ্বেতা গল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। ফলে দেশের অবস্থা স্পষ্ট আর বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে।—''হারিয়া ঘাসের আঁশ অত্যন্ত শক্ত ছাগলে চিবোতে পারে না। বৃদ্ধরা বলোয়া দিয়ে ফলাগুলির ধার চেঁছে ফেলে পাতা চিরে চাট্টি বানায়। আগে কেউ কিনত না হাটে। গত বছর থেকে আদিবাসী কুটির শিল্প সহায়ক সংস্থা হাট থেকে এ চাট্টি কেনে চার-পাঁচ টাকায় এবং আড়াইয়ের লোকরা জানে না যে ব্যাপারটিকে উক্ত সংস্থার বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার প্রকল্প হিসাবে দেখানো হচ্ছে, সংস্থার অফিসাররা মাসে পঁচিশ হাজার টাকার বাটোয়ারা পাচ্ছেন।'' ('ভারতবর্ষ')

গল্পের প্রয়োজনে বুদ্ধিশাণিত ব্যঙ্গধর্মী হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার বিবৃতি। উদ্ধৃত হল 'রাখদার' গল্পের দুটি অংশ—(১) ''ফানডেড এজেন্সির আর্থ-সামাজিক নৃতাত্ত্বিকরা নিছক সমীক্ষা করে যান গভীর দরদে এবং শবর সন্তানদের দুরবস্থা ও ঝোপড়ি দেখে 'ও মিজারি! ও হিউম্যানিটি' গোছের আন্তরিক মন্তব্য করে থাকেন।......কাজ হাসিল হলেই 'অ্যারাইভেদটি' বা 'আদিয়োস' বা 'বিদায়' বলে দামি স্টেশন ওয়াগনে দ্রুত অদেখা হয়ে যান। এঁদের রিসার্চ ফলাফল সাধারণত আমেরিকা, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে ডেনমার্ক সুইডেনে প্রকাশিত হয়।' (২) ''সহদেব মণ্ডল বলেছিল, আসন আর এখানে নেতাজি পাট্টি করুক। আমার কালে এক কংরেস আর কমনিস ছিল। এখন দিকে দিকে পাট্টি। জনা জনা দিকে দিকে যাও। সাহেবদের লা বা লাক্ষা ব্যাবসা ছিল। তখন ভারতীয় লা-র বিদেশে বাজার ছিল। লাক্ষা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা করে সহদেব পাঁচ ছেলেকে থিতু করে গিয়েছে। আসন ও আসর অবশ্য বেশিদিন 'নেতাজি জীবিত কি মৃত' কেচালে থাকেনি। তারা এখন মার্কোসবাদী ও মৃত পিতাকে বর্জুয়া বলে।''

এদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের এবং সাধারণ গ্রামের অবস্থা জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই বিদ্রুপশানিত বাচনভঙ্গিতে।

মাঝে মাঝে গল্পের প্রয়োজনে মহাশ্বেতার ভাষায় এসেছে কাব্যময়তা—''দুজনেই বৃষ্টিপাত দেখে। তারা যেখানে বসে থাকে, তার সামনে অনতিদূরে মহাবরষার রাঙা জলে ফেনিল কোটাল''। ('গণপতি কোটাল')

সংলাপের ভাষায় তিনি চরিত্রটির নিজস্বতা বজায় রাখতে চান অথচ তা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে—এটাও তাঁর কাম্য নয়। তাই তিনি বাংলাভাষাকে মণ্ডিত করেন আঞ্চলিকতায়। দেওয়া হল কয়েকটি উদাহরণ—(১) দক্ষিণ ২৪-পরগনার সাধারণের মুখের ভাষা—'আমাদের কাজটি নক্কী কাজ। লেডি ডাগদার ঝে কারণেই হোক আমারে ঝে কী চক্কে দেখল। ঝে দিনে এক বছর হল, সে বলল, তুমি বাচা তোমার মতো কটা মেয়ে নে এসো। এই রকুম গেরস্ত ভাব হবে, দয়ামায়া থাগবে।'

(২) পুববাংলার উদ্‌বাস্তুর সংলাপ—'ঘরের বাসন তৈজস তো দেখত্যাছি। ঠাইকরেনের ঘরেও চোর পড়ে না, আমার ঘরেও না আহন তো ঘর বান্ধার মানুষ বিস্তর। বানায়ও কইতরের খাঁচা। আমি কাম পাই না।'

(৩) শবরের ভাষা—'জল দিছে বটেক আকাশ! এমন জল্যে যাব্যি বা কুথাক? লদীতে হড়পা ডাক্যে?'

(৪) হিন্দিভাষী জঙ্গল-অফিসারের উক্তি—'কুটকাট্টি ফরেস না হ্যায়। এক সাগোয়ান খতম, এক আদমি খতম। ক্যা শসী, শুনা তু?

(৫) পালমৌ-এর বানিয়ার উক্তি—'কংগ্রেস কো মদত দিয়েছি, যখন যে সরকার চালায় তাকে মদত না দিলে আমার মতো গরিব গেঁয়ো বেনে বাঁচে না। আপনারা বললেন, আমি বৈঠবেগারি বন্ধ করে দিলাম ফসলে হকও ছেড়ে দিলাম।......তবে এখন যা বলছেন, তা কী করে? যে চিজে নাফা নেই, তা বেচতে বললে জবরদস্তি হয়ে যায়।'

(৬) সাধারণের ভাষায় ইংরেজির মিশ্রণ—নানা কারণে ইংরেজি ভাষা এদেশে দৃঢ়মূল। ফলে শিক্ষিত জনের মুখের ভাষায় যেমন এসেছে, তেমনই অল্পশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষগুলির কথায়ও এসে গিয়েছে ইংরেজি শব্দের

প্রয়োগ । ঈষৎ বিকৃত ইংরেজি শব্দাবলি গরিব মানুষগুলির শব্দভাণ্ডারে ঢুকে গেছে। 'গতিগঙ্গা যুগীদাস নাইয়া' থেকে উদাহরণ গ্রহণ করা হয়েছে এখানে। যুগীদাস অর্থের বিনিময়ে অঞ্চলের সব সৎকার করে সঙ্গীদের নিয়ে। আবার নিঃস্ব মানুষের মৃতদেহ অর্থ সংগ্রহ করে দাহ করে দেয় সে। এই যুগীদাসের সংলাপ—''ঝারা দেখবি তেমন কাতর নয়, সেকানে জোরসে স্লোগান। ঝেতা দেকবি দাগা খেয়েচে, হাপসে গেচে, সেকানে রেসপেট দিয়ে স্লোগান।'' যুগীদাস তার সহকারীদের নাম রেখেছে হিন্দি ফিল্‌ম্-এর নায়কদের নামে—''তা'লে বুজলেন ঝে ছেলেরা সবার জন্যে কী সার্ভিসটা দিচ্ছে। ওই সব নাম নিজেদের একটা জোস্ বাড়ে......ওদের ঘরে দেখুন, ঝার ঝা নাম তার তার পিকচার দে সাইজে রেখেচে।''

এদেশের সমস্ত নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষদের ভাষায় মিশে গেছে এমন অজস্র ইংরেজি শব্দ—ডেইলি, টাইম, ডিউটি, কমিশন, পার্টি, পাবলিক প্রভৃতি। এই সত্যটি, এই পরিবর্তন মহাশ্বেতার গল্পসমষ্টি স্পষ্ট করে দেয় আমাদের চোখের সামনে।

বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্য এবং কর্মজীবন দিয়ে যে স্থান অধিকার করেছেন তার তুলনা কমই আছে। তাঁর লেখার মধ্যে ধরা পড়েছে গোটা ভারতবর্ষের একটি সমগ্র চিত্র। সে চিত্রে পীড়ন যেমন আছে তেমন আছে দু-এক জন সৎ তরুণ সমাজসেবক; কোনো সহৃদয় ও সৎ এবং সততা বজায় রাখার সচেষ্ট সরকারি অফিসার, বিবেকবান সাংবাদিক, নীরবকর্মী বিদ্যালয়-শিক্ষক—প্রায়শ এসে যান তাঁর লেখায়। সমাজের নীরন্ধ্র কালিমালিপ্ত রূপ তাঁকে হতাশাপীড়িত করে তোলেনি। জীবনের যথার্থ রূপে যে আশার উৎস আছে তাকে তিনি অস্বীকার করেননি। মাঝে মধ্যেই তিনি লিছেছেন বিত্তহীনতার মধ্যেও স্নিগ্ধ প্রেমভিত্তিক গল্প ('কবিপত্নী', 'কাগাবগা কথা' 'জান্নাথির মুক্তি') যথার্থই মহাশ্বেতা এই যুগের শিল্পী—এই সময়ের কথাকার।

৫.১৫ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-)

১৯৩০-এর ১৪ অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম। শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে বড়ো হয়েছিলেন তিনি। প্রথম শিক্ষা সম্ভবত স্থানীয় বিদ্যালয়েই হয়েছিল। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন।

লোকায়ত তথা গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন সিরাজ। তাঁর রচনায় আছে তার চিহ্ন। সিরাজের পাঠসীমা বহুবিস্তৃত। বিচিত্র বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান তাঁর রচনায় ছায়া ফেলেছে। উদাহরণ হিসেবে 'গোঘ্ন' গল্পটির কথা মনে করতে পারি। বৈদিক সাহিত্যে অতিথির নাম ছিল 'গোঘ্ন'। কারণ গো বধ করে সেই মাংস দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়িত করা হত। এই তথ্যের সঙ্গে সুন্দরভাবে গল্পবিষয় মিশিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই আশ্চর্য ছোটোগল্পটি।

কর্মজীবন ঃ প্রথম জীবনে স্বাধীন সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর উপজীবিকা। পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। এখন তিনি অবসর নিয়েছেন সেই জীবিকা থেকে।

একসময় মুর্শিদাবাদের স্থানীয় লোকনাট্য আলকাপ দলের পালা রচয়িতা হিসেবেও কাজ করেছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার ফসল 'মায়া মৃদঙ্গ' উপন্যাস। তিনি শ্রীমুকুল, শ্রীকান্ত রায় ছদ্মনামেও একদা সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

সাহিত্যচর্চা ঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যজীবনের শুরু কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর সংযোগ গড়ে ওঠায় এই সময়ে তিনি উত্তর রাঢ়ের লোকনাট্যদল 'আলকাপ'-এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। ফলে নীচের তলায় সাধারণ মানুষের জীবনের

যথার্থ পরিচয়ে সমৃদ্ধ হয় তাঁর সৃষ্টিশীল মন। কবিতার পরিবর্তে গল্প-উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নীলঘরের নটী' (১৯৬৬)। গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে প্রায় দুশোরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। রহস্য কাহিনি আর কিশোরসাহিত্য রচনাতেও নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। তবে ছোটো গল্প রচনায় তিনি স্ববৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

গল্প-সংকলন তালিকা ঃ (১) 'রাণীঘাটের বৃত্তান্ত'—৩য় মুদ্রণ; ১৯৮৬, (২) 'দারুব্রহ্ম কথা' ১৯৮৭, (৩) 'কালের প্রহরী', (৪) 'একালের বাংলা গল্প', ১৯৭৫, (৫) 'মোতিবিবির দরগা', ১৯৮৬৬, (৬) 'ছবির মানুষ', ১৯৮৯।

কিশোর গল্প-সংকলন ঃ (১) 'কলকাতায় কেঁদো', ১৯৭২, (২) নান্টুমামার গাড়ি', ১৯৭৫, (৩) 'বনের আসর' ১৯৬৮, (৪) 'নিঝুম রাতের আতঙ্ক', ১৯৭৯, (৫) 'ভয় ভুতুড়ে' ১৯৮০, (৬) 'অলৌকিক চাকতি রহস্য', ১৯৮১, (৭) 'ম্যাজিশিয়ান মামা', ১৯৮৩ (৮) 'বলে গেছেন রামশর্মা', ১৯৮৭, (৯) 'রহস্য রোমাঞ্চ', ১৯৮৯, (১০) 'এককুড়ি ভূতের গল্প', ১৯৯০, (১১) 'ভালুক ভায়া আর ভুড্ডু নাপিত', (১২) ভূত নয়, অদ্ভুত', ১৯৯২, (১৩) 'ভূত বনাম গোয়েন্দা', ১৯৯৩।

গল্প-বিশেষত্ব ঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটো গল্পের প্রধান বিশেষত্ব, জীবন সম্পর্কিত অনুভবের বিচিত্র, বিস্তৃত রূপায়ণ, প্রকৃতি আর মানুষ এবং মানবনির্মিত সমাজের বিচিত্র উদ্‌ভাসে দীপ্ত তাঁর রচনা। মানুষের নানারূপ দেখেছেন তিনি, দেখেছেন তার লোভ, বাসনা, হিংস্রতা আবার তারই মধ্যে মানবিকতার আশ্চর্য প্রকাশ।

রাঢ় বাংলার সীমান্তবর্তী এক বিশেষ অংশের গ্রামীণ প্রকৃতি আর নরনারীর জীবন বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। এখানে আছে বিশাল নদীর আদিম সৌন্দর্য। তারই সঙ্গে মানবনির্মিত সমাজের কালিমা ঘন হয়ে উঠেছে। ভারত আর বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে এই অঞ্চলে। ফলে চোরাচালান হয়ে উঠেছে জীবনযাত্রার অঙ্গ। আইন এখানে চলে না। সাধারণ মানুষ পায় না তার শ্রমের মূল্য। কোনোমতে বেঁচে থাকাই এখানে অধিকাংশ মানুষের কাছে একমাত্র সত্য। সভ্যতা এখানে মানবপ্রকৃতির আদিম প্রকাশের কাছে পরাজিত। সভ্য সমাজের নীতিনিয়ম এখানে অর্থহীন হয়ে যায় মানুষের টিকে থাকার রক্তাক্ত সংগ্রামের কাছে। এই বিশেষ অঞ্চলেই তিনি বড়ো হয়ে উঠেছেন এবং এই অঞ্চল-বিশেষত্ব উপলব্ধি করেছেন গভীরভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৩৮৩ (১৯৭৬) বঙ্গাব্দের 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় মুদ্রিত এই অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বিবৃতি। তাঁর মতে— এখানে মানুষের মনে আছে সভ্যতাপূর্ব কালের আদিম স্বাধীনতা। ''প্রকৃতি সঞ্জাত এই স্বাধীনতার স্বাদ মানুষকে প্রেমিক করে দার্শনিক করে আবার যোদ্ধাবেশধারী হত্যাকারীও করে। মানুষ তখন রাষ্ট্র ও অন্যের প্রভুত্ব অস্বীকার করে। সে তখন নিজেকে এমন এক বিশ্বের বাসিন্দা করে যেখানে রাষ্ট্র নেই, শাসন নেই, সমাজ নেই, তথাকথিত ধর্ম নেই, তার ঈশ্বর সে নিজে। এবং সে প্রকৃতির সন্তান বলে তার কাছে শ্লীলতা অশ্লীলতা নেই। শুধু আছে জীবন— মুক্ত উদ্দাম জীবন। এই জীবন আমি দেখেছি ভালোবেসেছি। তাদের কথাই বলতে চেয়েছি।'' নগর আর নাগরিক মানুষের তুলনায় পল্লি আর মফস্‌সলের মানববৃত্তান্ত রচনায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। এই মানবকাহিনির মধ্যে জীবনের আদিম উপলব্ধিই নানাভাবে বিচিত্র শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্রের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। এই মানুষগুলির মধ্যে আছে প্রচুর ভূমি অধিকারী জোতদার, তার বেতনভুক রক্ষীবাহিনী, ধনী এবং মাঝারি মাপের ব্যবসায়ী, বিত্তহীন শ্রমজীবী, নিরন্ন ভিক্ষুক, আর গণিকা। এই বিবরণে শ্রেণিসংঘর্ষ, শক্তিমানের শোষণ-পীড়ন, বলহীনের অসহায়তা—সবই স্থান পেয়ে যায়। কিন্তু বিশেষ মতবাদ তাঁকে চালিত করে না। নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম দিয়ে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না এ সত্য উপলব্ধি করেছেন এবং সাহিত্যে তাকেই রূপ দিয়েছেন সিরাজ।

বিভূতিভূষণ, মানিক আর তারাশঙ্কর—এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে সিরাজের রচনা-বিশেষত্বের তুলনা করা যায়।

বিভূতিভূষণেরও অবলম্বন প্রকৃতি এবং গ্রামীণ মানুষ। কিন্তু তাঁক রচনায় নিসর্গের শান্ত মহিমময় বিরাট রূপই প্রধান। তাঁর নির্মিত মানবচরিত্রের মধ্যেও আছে উত্তেজনাহীন স্নিগ্ধতার প্রকাশ। সিরাজ প্রকৃতির রূপের নানা স্তর লক্ষ করেছেন, বিশেষ করে তার আদিম হিংস্রতা আর রহস্যময়তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর গল্পের মানুষগুলি প্রবৃত্তিতাড়িত, প্রবৃত্তি-চালিত এবং অশান্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রবৃত্তির নগ্ন রূপের প্রকাশ দেখেছেন মানুষের মধ্যে। তবে তাঁর সেই সব গল্পে চরিত্রগুলি মানবতার আদর্শ থেকে সরে এসেছে। আর সিরাজের গল্পে যৌনতা, হিংস্রতা এসেছে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ রূপেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলি পরিবেশ-নির্ভর নয়, স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল আর সিরাজের গল্পের মানুষগুলি একান্তভাবে পরিবেশনির্ভর। তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো মতাদর্শগত বিশ্বাসকে সাহিত্যে রূপায়িত করেননি। তাঁর ছোটো গল্পে দেখা যায় না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচারের পৃথক প্রয়াস। হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক গ্রামীণ সম্পর্কই রূপায়িত হয়েছে তাঁর গল্পে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের প্রাকৃতির পরিবেশে লালিত মানুষগুলির জীবনের বিশেষ গড়নকে ভাষারূপ দিয়েছেন। তারাশঙ্করের অবলম্বন তাঁর সময়ের রাঢ় বাংলার অন্তর্গত বীরভূমের নিসর্গ আর মানুষ। সিরাজের অবলম্বন রাঢ় বঙ্গের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের সমকালীন জনজীবন আর প্রকৃতি। প্রকৃতির মোহন আর ভীষণ রূপ—উভয়ই সম দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন। প্রবৃত্তির নিরুপায় শিকার মানুষের কথা দুজনেই প্রাণময় করে তুলেছেন তাঁদের কথাসাহিত্যে। কারণ উভয়েরই উৎস ছিল নিবিড় অভিজ্ঞতা। তবে তারাশঙ্করের রচনায় আদর্শপ্রীতি, বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত প্রেমমাধুর্যের প্রতি ঈষৎ পক্ষপাত দেখা যায়। মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর রচনায় চিরাগত আদর্শের অবলম্বনে চিত্রিত। মানবচরিত্রের ভীষণ সুন্দর প্রবৃত্তিতাড়িত রূপের প্রকাশ অনুন্নত স্তরের মানুষগুলির মধ্যেই তিনি দেখেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের চিত্রিত মানুষগুলি বিশেষ কোনো আদর্শের সম্পর্কে সচেতন নয়। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত আর অনুন্নত—সমাজের সব স্তরেই তিনি দেখেছেন জীবনের বিচিত্রসুন্দর আর ভীষণ গম্ভীর রূপ। তারই সঙ্গে গ্রামীণ মুসলিম সমাজবিন্যাসের অন্তরঙ্গ চিত্র আছে সিরাজের বহু গল্পে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পের একটি লক্ষণ মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাস্তব চিত্রণ। এগুলির মধ্যে আছে কাম, আধিপত্য-স্থাপন স্পৃহা, ক্ষুধা প্রভৃতি।

সমস্ত জীবের মতোই কাম অর্থাৎ বংশধারার মধ্য দিয়ে টিকে থাকার আদিম স্পৃহা মানুষের মধ্যে প্রবল। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তার আকর্ষণের এটাই মৌল কারণ। কিন্তু মানব সমাজে প্রায়শ দেখা যায় কেবল যৌনতা প্রধান হয়ে উঠেছে। এরই সঙ্গে আছে ভূমির উপর অধিকার স্থাপনের আকাঙ্খা—যেখানে সে বাস করবে, বংশবৃদ্ধি করবে এবং আহার সংগ্রহ করবে। এই দুই প্রবৃত্তির সঙ্গে মস্তিষ্কশক্তি অর্থাৎ চিন্তাক্ষমতা মিশে গিয়ে মানুষকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র। তাকে কোনো নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা যায় না। যৌনতার সঙ্গে লোভ, প্রতিশোধকামনা, হিংসা, হতাশা, স্বার্থপরতা, হিংস্রতা—সব মিলে গড়ে উঠেছে সিরাজের গল্পের চরিত্রসমূহ। 'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ' এমন একটি গল্প। গাঁয়ের গরিব পিতৃহীন একটি মেয়ে নতুন ধানের নবান্নের নিমন্ত্রণে মাসির বাড়ি চলেছিল মাঝবয়সী গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে। জনহীন মাঠের পথে কিশোরী মেয়েটিকে ঘিরে কামনাতুর হয়ে ওঠে মোড়লের মন। মুড়ি-পাটালির লোভ দেখিয়ে মেয়েটির শরীরের স্বাদ নেয় সে। কিন্তু মোড়ল যখন তাকে পূর্ণরূপে ভোগের চেষ্টা করে তখন সে বাধা দেয়। মোড়লের শক্তির কাছে হয়ত হার মানতে হত তাকে। ঘাস কাটতে আসা একটি মানুষ তারে রক্ষা করে। 'মা-জননী' বলে ডেকে মেয়েটিকে সে পৌঁছে দেয় মাসির বাড়ি। তার শরীর আর আচরণ—কিশোরীটির মনে জাগিয়ে তোলে তার বাবার স্মৃতি।

কিন্তু কোনো গল্পে যৌনতার সঙ্গে মিশে গেছে সত্তার স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্খা। 'লালীর জন্য' গল্পটির নায়িকা লালী নারীর জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক নিষেধ চূর্ণ করে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা চেয়েছিল। কিশোর অমিতের মুগ্ধতা স্পর্শ

করেনি তাকে। কারণ সমাজনির্দিষ্ট নিয়ম ভাঙার মানসিক শক্তি তার ছিল না। আদিবাসী যুবক সীতু তাকে দিয়েছিল সে স্বাধীনতার স্বাদ। প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সীতুর কুশল আনতে গিয়ে বন্যায় ভেসে যায় লালী। চরে আটকানো তার নগ্ন মৃতদেহের সংবাদে ক্রোধে উন্মাদ তার পিতা সীতুকে হত্যা করে। লালীর প্রাকৃতিক স্বাধীনতার অন্বেষণ তীব্র হয়ে বেঁচে থাকে অমিতের স্মৃতিতে—'লালী ভালোবাসত কুঁচফল, বিষাক্ত ধুঁধুল, লালপোকা, নীলপোকা নির্জন বালিয়াড়ির পাখি, জ্যোৎস্নারাতে পরীর নাচ, মাঠের বিশালতা......আমি ভাসতে পারিনি। সভ্যতায় আছি পোশাকে, কার্পেটে, ফুলদানিতে.....'

আদিম রিপুর টানের মর্মান্তিক গল্প 'বৃষ্টিতে দাবানল', বৃষ্টির মেঘময় দিন, দিনমজুর নারানের মধ্যে জাগে বাসনার জোয়ার। সে সন্ধান করে নারীশরীর। প্রতিবেশী ধাই সল্লা (সরলা) এরকম বহুজনের পিপাসা মিটিয়েছে। কিন্তু নারানকে সে ফিরিয়ে দেয়। কামতুর নারান সরলার মূক আর মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েটির শরীর ভোগের তৃপ্ত খুঁজে পায় কিন্তু সরলা থানায় ডায়েরি করে তার নামে। ধরা পড়ে নারান নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হয়। মননহীন শরীরসর্বস্ব মনুষের শারীরিক কামনা এবং তার সংকট নিয়ে এমন অনেক গল্প লিখেছেন সিরাজ। মানুষের পশুস্বভাব সে সব গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আবার কিছু গল্পে নারীর প্রতি পুরুষের টানের রহস্যময়তা নিয়েও সিরাজ লিখেছেন গল্প। 'বিভ্রম' তার উদাহরণ। নিঃস্ব দিনমজুর গন্ধহরির ছিল সজীব মন। মেলার ভিড়ে তাকে দেওয়া হয় একটি যুবতীকে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব। মেয়েটিকে দেখে নারীবর্জিত গন্ধহরি আলোড়িত হয়—''ই কী চোখের দৃষ্টি! ই কী নাকমুখের গড়ন'' কপালের লাল টিপখানা কি আগুনজ্বলা জ্বলছে দাউ দাউ। মাঠের মানুষ গন্ধহরির মেঠো অত্মা হঠকারী চৈতালী ঘূর্ণির ভেতরে শুকনো পাতার মতো ভেসে যাচ্ছে।'' শেষ পর্যন্ত তার আসতে দেরি হওয়ায় মেয়েটি চলে গেছে একাই। গন্ধহরি কল্পনার চোখে লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পায় দুটি আলতারাঙা পায়ের চলে যাওয়া। তার অনুসরণ করে না সে। বরং এই স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে। এই গল্পের নাগরিক রূপ 'নন্দিনী'। আকাশ ভ্রমণের ক্ষণসঙ্গিনী মেয়েটিকে ছেলেটি কোনোদিন ভোলে না। কিন্তু ঠিকানা পেয়েও তার সঙ্গে দেখা করে না সে। তার কল্পনায়, তার স্মৃতিতে মেয়েটি বেঁচে থাকে চিরকাল।

নারীপুরষের জটিল সম্পর্কের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে দু-একটি মধুর প্রেমের গল্পও লিখেছেন সিরাজ; 'মহারাজা' তার উদাহরণ। প্রাক্তন সেনানী মহারাজার বর্তমান জীবিকা অর্থের বিনিময়ে বলপ্রয়োগে প্রদাতার কাজ করা। তার কাজ তাই অনেক সময় হয়ে যায় মস্তানসদৃশ। কিন্তু তার মন সেরকম নয়। একটি মানুষ বাপের বাড়ি থেকে ফিরতে না চাওয়া বউকে তুলে আনার কাজ দেয় মহারাজকে। কাজটি করতে গিয়ে মহারাজা বোঝে লোকটি শ্বশুড়বাড়ি দীনতার সুযোগে বউকে ভাড়া খাটাতে চায়। এবার মহারাজা লোকটিকে বাধ্য করে স্ত্রীকে তালাক দিতে। মেয়েটিকে মহারাজা নিয়ে আসে তার মায়ের কাছে নিজের বাড়িতে। নিয়ম মতো একুশ দিন কেটে গেলে সে বিয়ে করবে মেয়েটিকে; ঘর গৃহহীন মেয়েটি পাবে।

প্রাণীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্ষুধার ভীষণতার চিত্র আছে 'দারু ব্রহ্মকথা'-তে। কাহিনির নায়ক ব্রজগোপাল কাজ করতেন সদর শহরের অফিসে। কিন্তু রিটায়ার করার পর তিনি পেনশন পাননি। নাকি ফাইল হারিয়ে গেছে। তাঁর দুই ছেলে সাধন-স্বপনের একজন সাধন হিংসার রাজনীতি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ এবং 'মৃত্যুরোগাক্রান্ত'। অন্য ছেলে স্বপন হছে ওঠে সমাজবিরোধী। এবং বোমা তৈরি করতে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। ক্ষুধা তাদের এ পরিণতির কারণ। বিপত্নীক ব্রজগোপালকে এরপর বেঁচে থাকার জন্য গ্রহণ করতে হয় ভিক্ষাবৃত্তি। প্রথমে গাঁয়ের চাষিদের কাছে মাঠে মাঠে ঘুরে চলত তাঁর ভিক্ষা করা। পরে রেলস্টেশনে দশ পয়সা-বিশ পয়সার ভিক্ষা আর নিমন্ত্রণবাড়িতে ক্বচিৎ পূর্ণাহার—এই নিয়ে কাটতে থাকে তার দিন। নিতান্ত নির্বিরোধী এই মানুষটির বার্ধক্যভাতার আবেদন মঞ্জুর হয় না। কারণ তাঁর দুই ছেলের একজন ছিল সমাজবিরোধী অন্যজন কারাবাসী। শেষে এই ''....ভিক্ষুকে পরিণত এবং অ্যান্টিসোশ্যালদের জন্মদাতা-হেতু বার্ধক্যভাতায় বঞ্চিত, পেনশন আটকে থাকা এমনকী অ্যান্টিসোশালদেরও কদর্য

গাল খাওয়া....'' ব্রজগোপাল রেলের চোরাই লোহা লুকিয়ে রাখেন চোর হড্ডুলালের দেওয়া দুটি আধুলির লোভে। সেই অর্থে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন তিনি। এরপর উপায়হীন অনাহারী ব্রজগোপাল যিনি কিছুতেই বিচলিত হতেন না বলে পত্নীর কাছে পেয়েছিলেন দারুব্রহ্ম আখ্যা; ওয়াগন থেকে ইস্পাতপিণ্ড চুরির চেষ্টা করেন। বৃদ্ধ ক্ষুৎকাতর ব্রজগোপালের অভিজ্ঞতাহীন এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয় আর রেলরক্ষীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাঁর দেহ। এমন করেই অবসান হয় নির্বিরোধী সৎ একটি জীবনের, ক্ষুধা যাঁকে তস্কর করেছিল। তাঁর এ পতনের কারণ বিশ্লেষণ করে না কেউ। এমনকী তাঁর বন্ধু চক্রধারীও মেয়ের নিউট্রিশন সেন্টারে চাকরি যাওয়ার ভয়ে বন্ধুর স্মৃতিতে লেখা ছড়ায় বলেন না মানুষটির পেনশন আটকে থাকার কথা। ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটিতে মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থপরতাও বাস্তব হয়ে উঠেছে।

মাতৃত্বের মতো জৈবিক সম্পর্ক নিয়েও গল্প লিখেছেন সিরাজ। মায়ের প্রতি ছেলের, আর ছেলের প্রতি মায়ের টান কোনো সময়েই লুপ্ত হয় না। বিবিধ কারণে মা-ছেলের বিচ্ছেদ ঘটে। তথাপি বিনষ্ট হয় না আকর্ষণ। 'হরবোলা ছেলেটা' আর 'বাগাল'—দুটি গল্প তার প্রমাণ। 'হরবোলা ছেলেটা' গল্পে দেড় বছরের ছেলে নাদেরালিকে ফেলে গরিব সাদেরালির স্ত্রী চলে গিয়েছিল সচ্ছল সুলেমান ঠিকেদারের ঘরে। সেই ত্যক্ত ছেলে এখন দশ বছরের বালক। পত্নীর হেঁসোর আঘাতের পরিণামে খঞ্জ সাদেরালি ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটায়। কিন্তু পত্নীর প্রতি অসীম ঘৃণায় কখনও যায় না সুলেমান ঠিকেদারের বাড়ি যে গাঁয়ে সেই কাঁকড়গড়ায়। ছেলেকেও বারণ করেছিল সে। কিন্তু বিবিধ জন্তুর ডাক অনুকরণে ওস্তাদ ছেলেটি একদিন চলে যায় সেই গাঁয়ে আর ঘুঘুর ডাক ডাকতে গিয়ে দেখা পায় জননীর। মায়ের স্নেহ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দুটাকার একটি নোট নিয়ে সে ফিরে আসে। এই নোটের সূত্রে সাদেরালি জেনে যায় তার অভিযানের কথা। নির্মমভাবে সন্তানকে প্রবাহ করে সাদেরালি। গল্পশেষে দেখি হরবোলা ছেলেটি ভুলেছে মায়ের সঙ্গে মিলনের সংকেত ঘুঘুর ডাক। আর নির্জন মধ্যাহ্নে সুলেমানের বউ বৃথাই প্রতীক্ষা করে ছেলের। তার ক্ষোভ ফেটে পড়ে প্রকৃত ঘুঘুর ডাক শুনে 'মর মর' গালিতে।

'বাগাল' গল্পেও স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণে রাঙাদাসী ছেলে হরিবোলাকে ফেলে শহরে গিয়ে গ্রহণ করেছে গণিকাবৃত্তি। হরিবোলা হয়েছে পেটভাতার বাগাল। মোড়লের গোরু চরানো তার কাজ। একদিন গাঁয়ের একটি মানুষের হাত দিয়ে মা তার জন্য পাঠিয়ে দেয় জামা-প্যান্ট-লজেন্স। কিন্তু মোড়ল তাকে নিতে দেয় না সেইসব অশুচি দ্রব্য। আসল কারণ অবশ্য বিনা বেতনের বাগালটিকে হারানোর ভয়। কিন্তু মায়ের প্রতি সন্তানের আকর্ষণ লুপ্ত হয় না এত সহজে। মায়ের আহ্বানে গাঁয়ের সেই মানুষটির সঙ্গে মাঠে গোরু ফেলে হরিবোলা চলে যায় মায়ের কাছে। মায়ের আদর আর উপহার সহ ফিরে এসে সে পড়ে গভীর সংকটে। তার অনুপস্থিতিতে মোড়লের গোরুগুলি খোঁয়াড়ে গেছে। সেগুলিকে মুক্ত করতে মোড়লের পনেরো-যোলো টাকা খরচ হয়ে যায়। এবারও সন্তানকে সইতে হয় নিষ্ঠুর প্রহার। উপরন্তু পেয়ারাগাছে গোরুবাঁধা দড়ি দিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত বেঁধে রাখা হয় তাকে। শেষে মুক্তি পায় সে আর খড়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমের মধ্যে ছেলেটি ফিরে পায় মায়ের স্নেহক্রোড়।

প্রথম রিপুর মতো তৃতীয় রিপুও মানুষকে প্রায়শ করে ফেলে তার দাস। তখন মানুষ খুন করতে তার হাত কাঁপে না। 'সোনার পিদিম'-এ আছে সেই সত্যের মূর্ত রূপ। গাঁয়ের স্বচ্ছল গৃহস্থ বারিকদের পুরনো চাকর জনাই গ্রাম্য কালীমন্দিরের সাধুর শিষ্য হয়ে যায়। একদিন দেখা যায় না সেই সাধুকে। তার জনাই ক্রমশ সাধু হয়ে যেতে থাকে। তার মাথায় দেখা যায় জটা। তার ভর হয়। আচ্ছন্নতার মধ্যে সে বলে সাধুর কথা। একদিন সে বারিক বাড়ি ছেড়ে মন্দিরে গিয়ে ওঠে। বারিকদের বুড়ো কর্তা মাঝে মাঝে যান তার কাছে, চমকে ওঠেন তার কথায় তিরিশ ভরি সোনায় তৈরি প্রদীপ লুকানো আছে কোথাও। সেটি খুঁজে পেলেই জনাই আবার দেবীপ্রতিষ্ঠা করে সমৃদ্ধ করে তুলবে কালীপাটকে। এরপর এক রাতে নিহত হয় জনাই। আর জানা যায় সেই সোনার প্রদীপের লোভে সাধুকে বিষ দিয়ে মেরেছিল বারিকবাড়ির ছেলেরা। জনাইকেও খুন করেছে তারা। কিন্তু পাওয়া যায়নি সে প্রদীপ। কারণ

সেটি মন্দিরের গর্ভগৃহে নয়, পোঁতা আছে লালদিঘির পাঁকে। দুটি হত্যাতেই সম্মতি ছিল বুড়ো কর্তার। তথাপি জনাইয়ের জন্য কিঞ্চিৎ শোক প্রকাশ করতেই ছেলে তিরস্কার করে তাঁকে—'থামুন। রাত দুপুরে আদিখ্যেতা করবেন না তো।' মানুষের কুৎসিত লোভের স্বরূপ বাস্তব হয়ে উঠেছে গল্পটিতে, অর্থাভাব নয়, অর্থপ্রাপ্তির জন্য নয়, নিছক সম্পদপ্রাপ্তির আশায় এখানে তথাকথিত ভদ্রলোক বারিক বাড়ির ছেলেরা খুন করেছে এবং তারপরেও তাদের মধ্যে দেখা যায়নি অনুতাপ। মানুষের সম্পত্তিলিপ্সা আর রাজনৈতিক ক্ষমতালোভের আকাঙ্ক্ষা মিলিত হয়ে দুটি হত্যা ঘটিয়েছে 'ডালিম গাছের জিনটি' গল্পে। চন্দ্র সিং দুগার ভূমির লোভে খুন করিয়েছিলেন মির্জা জেরাত আলিকে। বেশ কিছু সময় পরে ভোটের সময় সেই জেরাত আলির কন্যা দিলবাহার হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর মাঠের ফসল-রক্ষক নাসির খুন করেছিল জেরাত আলিকে। চন্দ সিং সেই নাসিরকে দিয়ে দিলবাহারকে দমন করতে চান। কিন্তু ফল হয় বিপরীত। নাসির দিলবাহারের সঙ্গে ঘর গড়ার অলীক স্বপ্নে বিহ্বল হয়ে চন্দ্র সিংকে খুন করতে যায়। কিন্তু শক্তিমানের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহের ফল সঙ্গে সঙ্গে পায় সে। তাকে হত্যা করা হয় এবং এই হত্যার নেপথ্যনায়িকা হিসেবে গ্রেপ্তার হয় দিলবাহার। এইভাবে ক্ষমতাশালীর লোভের কাছে পরাস্ত হয় মানুষ।

মানুষের লোভের জন্যই জন্ম হয়েছে জুয়া খেলা আর চোরা চালানের। সিরাজ তাঁর চোখের সামনে দেখেছেন এই দুটি প্রক্রিয়া; দেখেছেন কীভাবে এইসব প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে যায় নীচের স্তরের মানুষগুলি। 'জুয়াড়ি' আর 'প্যাডলার' গল্পদুটি তার দৃষ্টান্ত। 'প্যাডলার' গল্পটি রিকশাচালক প্যাডলারদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। এরা চোরাচালানের প্রত্যক্ষ সহায়ক। এই ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুলিশ, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা আর সমাজবিরোধীর দল। কিন্তু যখন ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়, তখন ওই ত্রিশক্তির মিলিত প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এই প্যাডলারের দল।

সাধারণ মুসলমান সমাজের সুখদুঃখ নিয়ে গড়ে উঠেছে সিরাজের অনেক গল্প। 'জুলেখা', 'বুঢ়াপীরের দরগাতলায়' তার দৃষ্টান্ত। এইসব গল্পে সিরাজ সাধারণ মুসলমান গৃহস্থের রীতিনীতি, আচার ব্যবহারের প্রাণময় চিত্র এঁকেছেন।

গরিব গাঁয়ের মানুষের ভালোবাসার উজ্জ্বল গল্প 'গোঘ্ন'। বৈদিক ভারতে অতিথি আপ্যায়নের জন্য গোবধ ছিল আবশ্যিক। তাই অতিথির এক নাম ছিল গোঘ্ন। সেই স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের বাস্তব জড়িয়ে নির্মিত হয়েছে এ গল্প। বর্তমানে গরিব চাষির কাছে গোরু শুধু সম্পদ নয় সন্তানতুল্য প্রীতিস্নেহভাজন। তেমনই এক চাষি হারাই বা হারুণ মিঞা। হারাই কলাই আর কুমড়ো নিয়ে দুই গোরু ধনা-মনাকে গাড়িতে জুতে এসেচে চারু মাস্টারের বাড়ি। চারু মাস্টারের বেহালা মুগ্ধ করেছিল তার ভাই দোলাইকে। সে কথা দিয়েছিল মাস্টারের 'বেটির বিভায়' কুমড়ো আর কলাই দেবে সে। দোলাই মারা গছে। আর মৃত ভ্রাতার কথা রাখতে সে এসেছে চারু মাস্টারের বাড়ি। চারু মাস্টার তাকে দিয়েছেন তিন বস্তা দুর্লভ রাঢ়ের ধান আর কিছু খড়। ফেরার পথে সহসা অসুস্থ হয় ধনা নামের বলদটি। যথাসাধ্য চিকিৎসা করেও সুস্থ হয় না সেই গোরুটি। কসাই দিলজান কিনতে চায় বলদটিকে। প্রথমে তীব্র আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত হারাই গোরুটিকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এবার গোরুর মতো একদিকে নিজেকে জুড়ে গাড়ি টানতে থাকে সে। সহৃদয় সমৃদ্ধ গৃহস্থ বদর হাজি সেই অবস্থায় তাকে দেখে আমন্ত্রণ করেন। আর এই অতিথির সম্মানে পরিবেশিত হয় সেই গোরুটির মাংস। কথাপ্রসঙ্গে হারাই জেনে যায় সে সত্য। খাওয়া ফেলে ছিটকে যায় হারাই আর মর্মভেদী যন্ত্রণায় জবাই করা জন্তুর মতো ছটফট করে। চিৎকার করে বলে 'হামাকে হামারই বেটার গোস্ত খাওয়ালেন'। তার দুচোখে বাড়ি ফেরা শুধু স্বপ্ন হয়ে লেগে থাকে।

গ্রামের সমাজ-সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের সহজ মিলনের দিকটি সিরাজের গল্পে বর্তমান। সিরাজ দুভাবে তা দেখেছেন। প্রথমত গ্রামে বাস করার অভিজ্ঞতায়, দ্বিতীয়ত লোকনাট্য আলকাপ দলের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সূত্রে এই সম্মিলনের মানসিক দিকটিও ধরা পড়েছে তাঁর অনুভবে। সেই অনুভব আর উপলব্ধিজাত কাহিনি 'সাজ ভেসে

গেছে'। বেহুলা পালা গাওয়া দলের সাজপোশাক সমেত বাক্সটি ভেসে গেছে বন্যায়। তাই তারা সরকারি সাহায্যের আশায় মতি চৌকিদারের সঙ্গে এসেছে ব্লক অফিসে। দলনায়ক মইলোবাস—যার আসল নাম মওলাবকস সাজে চাঁদ সদাগর। বেহুলা হয় মেয়েলি চেহারার অমূল্য বাউরি। লখিন্দর হয় আকাশ আলি। বউ চলে গেছে তার অভিনয়প্রীতির জন্য। শ্বশুর ফরাজি সম্প্রদায়ের মানুষ। গানবাজনা তাদের কাছে হারাম তাই সে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে। এই দলে আছে ব্রাহ্মণ বাড়ির বয়ে যাওয়া ছেলে নারানবাবু তবলচি। প্রম্পটারের নাম এ দলে 'বৈয়াল'। মতি চৌকিদারও এ দলে আছে। সে সঙাল। সঙ দেয় 'কমিক পাট' করে। এদলের পালা-লেখকও মুসলমান, নাম নিবাস আলি। তিন পুরুষ আগের সেই পালা নিয়ে এতদিন অভিনয় করে এসেছে দলটি। কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হয় না। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সাহায্যদান এখন বন্ধ। হতাশ দলটি ফিরে যায় আঘাতটি সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করে মইলোবাস। কারণ চাঁদসদাগর হয়ে সে ভুলে যেত অসুস্থতা আর অবস্থানজনিত দুরবস্থাকে। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের মধ্যে সে খুঁজে পেত তৃপ্তি। তাই তার প্রিয় রং ছিল লাল। পথেই তার অসুস্থতা বেড়ে যায়। পড়ে যায় সে; শক্তিহীন মুমূর্ষু তাকে বয়ে নিয়ে যায় সঙ্গীরা। তার ''.....শরীর থেকে গভীরতর দুঃখের মতো রক্ত গড়ায় কষ বেয়ে। এবার প্রকৃতি নিজের হাতে তাকে শেষবার লাল পোশাক পরিয়ে দিচ্ছেন। তবু সে বিড়বিড় করে বার বার—সাজের বাকসোটা ভেসে গেল হে! সাজের বাকসোটা......'' যেন কঠিন বাস্তব তাদের সামনে থেকে মুছে নিল আনন্দ আর আশার শেষ বিন্দুটুকু। মানুষের উপায়হীনতা গল্পটিকে করে তুলেছে মর্মস্পর্শী।

প্রকৃতি সিরাজের গল্পে প্রাণময় প্রবল এক অস্তিত্ব। মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রীতি আর অপ্রীতিতে মিশে গড়ে উঠেছে। পরিস্থিতির শিকার অসহায় মানুষ প্রকৃতির উদার বিস্তৃতির মধ্যে অনুভব করে অবাধ স্বাধীনতা। 'বাগাল' গল্পের কিশোর বাগাল হরিবোলা দ্বারকা নদীর পারে মাঠে এসে পালটে যায়। এখানে সে স্বাধীন, কারও চাকর নয়—''গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলেই সে নদীপারের এই ব্যাপকতায় উড়ে বেড়ায় পাখপাখালির মতো। এখানে অবাধ স্বাধীনতা তাকে চিতাবাঘের বাচ্চা করে ফেলে। তার চলার ভঙ্গি যায় বদলে। চাহনিতে ফুটে ওঠে বন্য প্রাণীর চাঞ্চল্য।

আবার এই প্রকৃতি মানুষের শত্রুও। প্রকৃতি আর মানুষ সর্বদা পরস্পরকে পরাস্ত করে বিস্তৃত করতে চায় স্ব স্ব অধিকার—'ঘাস আগাছা গাছগাছালি পোকামাকড় সবাই ওত পেতে আছে, খালি পেলেই চলে আসে।'' ('বুনো হাঁসের মাংস') 'গাছটা বলেছিল'-তে মূর্ত হয়েছে এই ধ্বংসাত্মক প্রকৃতি। অদ্ভুত এই গাছে ফুল ফোটে না ফল ধরে না। হাওয়ার শন শন আর পাতার মর্মর ধ্বনিতে এ গাছ বলে 'মর মর'। যে সব ভাগ্যহীন মানুষ তা শোনে তারা মারা যায়। এই মৃতদের মধ্যে আছে বৃদ্ধা ঝুরন, অবিশ্বাসী প্রৌঢ় নোলেবাবু, চোর পাঁচু, তদন্তে আসা দারোগাবাবু, শিক্ষিত চিকিৎসক অসীম। শেষ পর্যন্ত এই গাছকে নিয়ে চলে ব্যাপক খুনোখুনি। ''গাছটা বার বার বলে থাকবে মর, মর, মর। কারণ লোকগুলি বার বার মরছিল। চাপ চাপ রক্ত।'' এমন করেই যেন পরাস্ত প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়।

সিরাজের গল্পে মাঝে মাঝে এসেছে এমনই কিছু অলৌকিকতা। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাস নেই তাঁর রচনায়। তিনি জীবনের শিল্পী, জীবন-অনুভবের শিল্পী। প্রকৃতি, সমাজ আর মানুষ তাঁর অবলম্বন।

ভাষা বৈশিষ্ট্য : তাঁর ভাষা সরল, বলিষ্ঠ, ইঙ্গিতময় এবং আকর্ষক। সর্বদা বিষয় আর চরিত্রের অনুসারী হয় বলেই তাঁর ভাষা হয়ে ওঠে বাস্তব। যেমন মুর্শিদাবাদের গাড়োয়ান হারাই-এর ভাষা—''চণ্ডীতলার চারু মাস্টারের বিটির বিভা হবে ফাগুন মাসে। হামার একটা ভাই আছিল। তিনি কথা দিয়ে এসেছিল, বিভার কুমড়া-কলাই যা লাগে দিবে। ভাইয়ের জবান, বাপজি হাজিসাহেব। সেই ভাই হামার এখুন গোরে!'' ('গোঘ্ন')

অশিক্ষিত গাঁয়ের মানুষের অশুদ্ধ ইংরেজি মিশ্রিত ভাষা—'গাড়ি বেঁধে-ছেঁদে এডি করলুম।'' ('অক্রুরের গল্প')

কখনও বা আশ্চর্য উপমায় ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে ভাষা। অনেক দিনের বদ্ধঘর, যে ঘরে আত্মহত্যা করেছিল একটি মানুষ; সেখানে সুইচ টিপতেই আলো জ্বলে ওঠে—''ঘরে যেন জীবন ঘুম থেকে উঠে দাঁড়াল একমুখ হাসি নিয়ে।'' ('বর্ণপরিচয়')।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বেশ কিছু অতিপ্রকৃত গল্প এবং গোয়েন্দা গল্পও লিখেছেন। এ ছাড়া কিশোরদের জন্য ভূতের গল্প, গোয়েন্দা-গল্প আর কৌতুককাহিনির স্রষ্টা হিসেবে সিরাজ স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

অনুভব, প্রকাশভঙ্গি, ভাষাব্যবহার দক্ষতা—সব কিছু মিলে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ হয়ে উঠেছেন যথার্থ জীবনশিল্পী; ছোটোগল্পের সার্থক রূপকার।

৫.১৬ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯)

পূর্বপুরুষের বাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। কিন্তু বহুদিন থেকেই দীপেন্দ্রনাথের পরিবার কলকাতার শিয়ালদায় বাস করছিলেন। এখানেই ১৯৩৩-এর ১০ নভেম্বর দীপেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পরিবারের ছিল রাজনীতির প্রভাব। পিসি পূরবী মুখোপাধ্যায় ছিলেন কংগ্রেসি সাংসদ এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী। দিদি মায়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এবং এ রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার সদস্যা ছিলেন।

দীপেন্দ্রনাথের দৈহিক গঠন ছিল অস্বাভাবিক। সম্ভবত এজন্যই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল দেওঘরে; বৈদ্যনাথ ধামের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে। ১৯৫২ সালে প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইনাল পাশ করে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। সম্ভবত এসময়েই তিনি কমিউনিস্ট দলের সক্রিয় সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৫৪-তে আই. এ. পাশ করেন দীপেন্দ্রনাথ। কিন্তু রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বি. এ. পড়তে পারেননি। ১৯৫৪-তে স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়া শুরু হয় তাঁর। ১৯৫৬-তে বি এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৫৮-তে এম. এ. পাশ করেন তিনি এবং কমিউনিস্ট দলের কাজে পূর্ণ মনোযোগ দান করেন। ১৯৬১-তে অবিভক্ত কমিউনিস্ট দসের সর্বসময়ের কর্মী হয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। ১৯৬২-র চিন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট দল বিভক্ত হয়। দীপেন্দ্রনাথ থেকে যান সি. পি. আই দলে। ১৯৬৩ সালে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দীর্ঘ অসুস্থতার পরে তিনি 'সাপ্তাহিক বসুমতি'তে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। ১৯৬৭ থেকে তিনি 'দৈনিক কালান্তর' পত্রিকায় (কমিউনিস্ট দলের মুখপত্র) যোগ দেন। তিনি সম্পাদনা করতেন এ পত্রিকার 'রবিবারের পাতা' নামের সাহিত্য বিভাগটি। 'কালান্তর'-এর শারদ সংখ্যা তাঁর সম্পাদনাতেই মুদ্রিত হত। ১৯৬৮ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 'পরিচয়'-এর যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন।

সাহিকত্যকর্ম : ১৯৭৯-র ১৪ জানুয়ারি দীপেন্দ্রনাথ মারা যান। কৈশোর থেকেই সাহিত্যচর্চায় ব্রতী ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'আমার দেশের মানুষ'। পনেরো বছর বয়সে তাঁর এই লেখাটি মুদ্রিত হয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত দৈনিক 'কিশোর' পত্রিকার পৌষ ১৩৪১ সংখ্যায়। এরপর থেকে তিনি 'শিশুসাথী' 'রামধনু', 'মৌচাক' প্রভৃতি কিশোর পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'আগামি' নামের একটি উপন্যাস। তাঁর এই প্রথম উপন্যাসের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের সংখ্যা মোট চারটি 'কাছের যারা', ১৯৫৪, 'চর্যাপদের হরিণী', ১৯৬০, 'অশ্বমেধের ঘোড়া' ১৯৬৩, 'হওয়া না হওয়া' ১৯৭২। শেষ গল্প সম্ভবত 'শোকমিছিল' ১৯৭৩।

মোট গল্প—গ্রহণ, বৃত্ত, সানাই, মডেল; কিন্তু, মহাকাব্যের ভূমিকা ('কাছের যারা' সংকলন), ভাসান, কয়েকটি পৃথিবী ('তিন ভুবন') ঘাম, নরকের প্রহরী, চর্যাপদের হরিণী ('চর্যাপদের হরিণী সংকলন), মৃত শহর, বসন্ত জটায়ু, অশ্বমেধের ঘোড়া, স্বয়ম্ভর সভা, প্রহরা ('অশ্বমেধের ঘোড়া' সংকলন), ফুল ফোটার গল্প, অশোকবন, পরিপ্রেক্ষিত, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, নির্বাসন, উৎসর্গ হওয়া না হওয়া, ('হওয়া না হওয়া' সংকলন) শোকমিছিল (১৯৭৩) মোট চব্বিশটি।

গল্পবিশেষত্ব ঃ দীপেন্দ্রনাথ মূলত অপরাজিতা মানবতা আর মানুষের কথা বলেছেন তাঁর প্রায় সব গল্পে। সমাজ

আর সমকালের সমগ্ররূপটি আঁকতে চেয়েছেন দীপেন্দ্রনাথ। প্রতিটি গল্পেই জীবনের গভীর রহস্য অপমানিত, আশ্রয়হীন মধ্যবিত্ত, পরিস্থিতির শিকার নিম্নবিত্ত—দুটি শ্রেণির জীবনসংগ্রাম তাঁর তীব্র অন্তর্দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে বার বার। পরিশ্রম, মেধা, সমকাল আর জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি তাঁর রচনাকে করেছে অসাধারণ। কমিউনিস্ট দলের কথা এসেছে তাঁর কোনো কোনো রচনায়, কিন্তু কখনই তা পার্টি সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস রক্ষা করার উপায় খুঁজে ফিরেছেন তিনি তাঁর গল্পে। অর্থনীতির চাপে বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত সমাজ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে কীভাবে মানবিক চেতনা সমূহ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—সূচনা থেকেই জীবনের এইসব দিক তাঁর লেখায় স্থান করে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে শুভ, মঙ্গল, সৎ বিশ্বাসসমূহের জয় সম্বন্ধে আস্থার ভাব ছিল তাঁর লেখায়। কখনও তা এসেছে পুরাণ-চিত্রকল্পের ব্যবহারে, কখনও সংগ্রামী মানুষের বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে আদি, মধ্য, অন্ত্য যুক্ত নিটোল কাহিনিবৃত্তের কথাকার ছিলেন না দীপেন্দ্রনাথ। সহজ পরিচ্ছন্ন হলেও ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনামুখ্য ছিল তাঁর ভাষা।

ক্রমে কিন্তু দীপেন্দ্রনাথ শুভবোধের বিজয় সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে থাকেন। বিকার আর বিনাশের চিত্র প্রবল হয়ে উঠেছিল তাঁর রচনায়। উপায়হীন মধ্যবিত্ত মানুষের নিরুদ্ধ বেদনার বাস্তবচিত্র হয়ে উঠেছিল তাঁর গল্প।

গ্রাম ও নগর—দুটি জীবনই দীপেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ছোটো গল্প ছিল। কিন্তু ক্রমে তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতার বৃত্তে নগরজীবন আর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের ছবি আঁকার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন নিজেকে।

পুরাণ-চিত্রকল্প : দীপেন্দ্রনাথের কৈশোর কেটেছিল দেওঘর বৈদ্যনাথধামের রামকৃষ্ণ মিশনে। আশ্রমজীবনের আবহে ছড়িয়ে থাকা ধর্ম আর শাস্ত্রপুরাণের আবেশ থেকে দীপেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারেননি নিজেকে। পরে নিজেও হয়ে উঠেছিলেন মহাকাব্যের নিষ্ঠাবান পাঠক।

পুরাণ-কাহিনি দ্বারা নিজস্ব অভিপ্রায়ের রূপায়ণ আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ একটি প্রবণতা। বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত কাব্য, নাটক আর কবিতায় সীমিত ছিল এই ব্যবহার। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক', রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ', 'চিত্রাঙ্গদা', মন্মথ রায়ের 'কারাগার' প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে মনে করা যায়। সর্বত্রই কিন্তু পুরাণ-কাহিনির নতুন ব্যঞ্জনা দানের প্রয়াসই প্রধান। অবশ্য ঈষৎ ব্যতিক্রমও আছে। তারাশঙ্করের 'জটায়ু' গল্পটি পুরাণ-চিত্রকল্পের দ্বারা গদ্য কাহিনি নির্মাণের দৃষ্টান্ত বলা যায়। কিন্তু তুলনায় দীপেন্দ্রনাথ অধিক সফল। দীপেন্দ্রনাথ পুরাণ কথা নয়, পুরাণ কথা নয়, পুরাণ-কথার চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন এবং সে প্রয়োগ সর্বদাই গদ্য-কাহিনিতে। প্রথমেই স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার কাকে বলা হবে চিত্রকল্প।

সাহিত্যে চিত্রকল্পের অর্থ ভাষায় অঙ্কিত চিত্র নয়; শব্দবিন্যাসে নির্মিত একটি অবয়ব যার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের বিশেষ উপলব্ধি মূর্ত হয়ে ওঠে। দীপেন্দ্রনাথ পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে আবহমান বিন্যাসনির্ভর গল্প লিখতে শুরু করেন। তখনই তিনি ব্যবহার করেন পুরাণ-চিত্রকল্প। বিমল কর 'ছোটো গল্প নতুন রীতি' নামে পাঁচটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাদের একটিতে স্থান পেয়েছিল দীপেন্দ্রনাথের 'জটায়ু'। এ গল্পে মহাকাব্য রামায়ণের বীর জটায়ুর বৃত্তান্ত ব্যবহার করা হয়েছে খুব সূক্ষ্মভাবে। অত্যন্ত ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ সেই ব্যবহার। দীপেন্দ্রনাথ পুরাণকে অতীতের সমাজ-চিত্র হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

পুরাণের প্রকৃত মূল্য কিন্তু বিস্মৃত যুগের সমাজ-ইতিহাস হিসাবেই। সে যুগেও অসহায় নারীকে ভোগ করত বলবান পুরুষ। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ তারই দৃষ্টান্ত। এই বিবেকরহিত পাপকর্ম রুখতে গিয়েছিল জটায়ু। পরিণামে তার দুটি পক্ষ ছেদন করে রাবণ। অসহ যন্ত্রনায় প্রাণ যায় সেই বীরের। দীপেন্দ্রনাথের গল্প দুর্গা-নিত্যচরণ এই নিম্নবিত্ত দম্পতির বৃত্তান্ত। দুটি হাতই নেই যে নিত্যচরণের সে কালীমূর্তির সামনে আগুনের মালসা দাঁতে আর মাথায় নিয়ে অগ্নিবৃত্তের মধ্যে নাচবে। দুর্গা বাধ্য হয়েছে নিত্যচরণের এই নাচ দেখতে। নাচের স্তরে স্তরে দুর্গার মনের মধ্যে বেঁচে

উঠছে অতীত। কাটা কাটা বাক্যে শব্দের ভাবময় ব্যবহার দীপেন্দ্রনাথ বাস্তব দেশভাগের সঙ্গে যুক্ত হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণের বিষময় আবহটি। দুর্গার কথক পিতাকে জ্বলন্ত বাসগৃহে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করেছিল দুর্বৃত্তরা। তারপর একই সঙ্গে ধর্ষণ করেছিল দুর্গা আর তার মাকে। এ পারে আসা দুর্গাকে আশ্রয় দিয়েছিল নিত্যচরণ। কিন্তু সুপারির চোরাচালান কালে ট্রেনে কাটা পড়ে তার দুটি হাত। দুর্গা বাধ্য হয় এক রেস্তোরাঁয় কাজ নিতে। সেখানে তাকে শরীরও দিতে হত। সন্দেহে দীর্ণ হয় নিত্যচরণ—'বউ, এত রাইত্ অব্দি তুই কি করস্ বউ, তুই পান খাইয়া আসছস্ ক্যান্? বউ, তুই নয়া শাড়ি পাস্ ক্যামতে? বল, আমি তরে ছাড়া কিছু জানি না।'

আর দুর্গাকে সব সময় তাড়া করে একটা ভয়। প্রতিটি পুরুষের মধ্যেই সে দেখতে পায় তার ধর্ষণকারীকে। তবুও তাকে যেতে হয় রেস্তোরাঁয়; বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর দাবি তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। এই চিরন্তন ন্যায়হীনতার বিরুদ্ধে নিত্যচরণের বিদ্রোহ। সে হাত দিয়ে ট্রেনের চলা থামাতে গিয়েছিল তাই যন্ত্র ছিঁড়ে নিয়েছিল তার হাত। সেদিন সে মরতে পারেনি। আজ আগুনের বেড়ার মধ্যে নাচতে নাচতে মাথা আর দাঁত থেকে আগুনের মালসা ফেলে দিয়ে সে মরতে চায়। অসম্মানের মধ্যে বাঁচতে চায় না সে। দুর্গাকেও সে এই মহিমময় মৃত্যু বরণ করে নিতে ডাকে। কিন্তু দুর্গা পারে না। 'এইভাবে বাচুম? হগো। তবু তো আমরা বাচুম।' গল্প শেষে দেখা যায় 'নিত্যচরণ এলোমেলো পা ফেলে নাচতে নাচতে চলেছে। যে কোনো মুহূর্তে বুঝি টলে পড়ে যাবে। কাটা কনুই দুটো অদ্ভুত দেখাচ্ছে। একটা ক্লান্ত অতিপ্রাকৃত আত্মা কোনো রকমে ডানা ঝাপ্টাচ্ছে।'

এই মৃত্যু -মুহূর্তে সে কিন্তু শুধু পুরুষ। নারীর জন্য মৃত্যু বরণ করতে হচ্ছে তাকে। দুর্গাকে যে ধর্ষণ করেছে, করে যাচ্ছে সেও পুরুষ। চিরদিনের প্রবল পুরুষের মতো সে নারীকে দায়ী করে যায় তার পতনের জন্য। আশ্চর্য ইঙ্গিতময় এ গল্পটির সমাপ্তি—'তারপর দুর্গা স্পষ্ট দেখল আগুনের বেড়ার ভেতর তার নিয়তি এসে দাঁড়িয়েছে। যে শত্রুর চেহারা সে স্পষ্ট করে চিনত না অথচ প্রতি মুহূর্ত যার ভয়ে কাঁপত—সে নিত্যচরণের চেহারায় তার ভাঙা ডানাটা উঁচিয়ে দুর্গাকে দেখিয়ে বলেছে, এই যে, এই যে, এই খানে।'

'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে পরিস্থিতির শিকার মধ্যবিত্ত এক দম্পতি। তাদের সহায়হীনতা স্পষ্ট করে দিয়েছে একটি ঘোড়ারগাড়ি আর তার চালক। পুরাণে মহাকাব্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্প করে ছেড়ে দেওয়া হত বেগবান তেজস্বী অশ্বকে। সাধারণত শক্তিমান রাজাই করত এ যজ্ঞ; তার অশ্বের গতি যে রুদ্ধ করত সে শত্রুকে পরাস্ত করে ঘোড়া এনে সমাপ্ত হত যজ্ঞ। বলিদত্ত অশ্বের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিছু যৌনাচার। একালে সেই শক্তিময় অশ্ব হয়ে গেছে ঘোড়ার গাড়ির পোষমানা ঘোড়া। চালকের চাবুক তাকে চালায়।

বিয়ে করেও প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে যৌথ জীবন গড়ে ওঠেনি কাঞ্চন আর রেখার। বিবাহের বার্ষিকী দিনে তারা চড়ে বসে একটি ঘোড়ার গাড়িতে। তার আগে রেখা কিনেছে একটি ফুলের মালা এবং চালকের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কথাও বলেছে। কিন্তু গাড়িতে উঠে তারা মুহূর্তের জন্য পেল কাঙ্খিত নিভৃতি। গাড়োয়ান নিজেই পরদা ফেলে দেয়। কারণ সে এদের নিষিদ্ধ প্রমোদলুব্ধ যুগল ভেবেছিল। আর দুটি নরনারী ভাবে 'একি আশ্চর্য ঘটনা। আমরা নির্জনতা খুঁজতাম, যেখানে ঘনিষ্ঠ বসা যায়। কলকাতা শহরে নির্জনতা নেই। আমরা অবসর খুঁজতাম, যেখানে নিবিড় হওয়া যায়। আমাদের জীবনে অবসর পাই না। আমরা পরিমণ্ডল খুঁজতাম, যেখানে আমরাই অধীশ্বর। আমাদের সময় সে পরিমণ্ডল দেয় না। অথচ আজ, অথচ একি, অথচ এভাবে—বন্ধ গাড়ি চলছে, বাইরে বৃষ্টি, আজ আমাদের বিবাহের প্রথম বার্ষিকী। আমার স্ত্রী রেখা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে—ধর্মপত্নী.....।' গর্বে আনন্দে রেখা রাজেন্দ্রাণীর মতো বসে থাকে। কাঞ্চন তাকে ডাকে 'বউ' বলে। কাঞ্চনের অনুরোধে রেখাও তাকে ডাকে 'স্বামিন্' বলে। তাদের ক্ষণিকের গাঢ় ভালোলাগা স্থায়ী হয় না। কাঞ্চনের ভাবনায় আসে—অশ্বসংক্রান্ত কিছু ভয়ংকর ঘটনার স্মৃতি 'অশ্বমেধযজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড়-কন্যা আর্য ঘোড়-সওয়ারের পায়ের তলায় হা হা করে কেঁদে উঠল। তারপর চেঙ্গিস খাঁর অশ্বারোহীদল

শেকল বেঁধে দাসদের টেনে নিল।.....কাঞ্চন চোখ বন্ধ করে ক্ষুর এবং হ্রেষাধ্বনি শুনতে লাগল।'' সত্য যে, দিগ্বিজয়ী অশ্বের শোণিত যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হয়। একসময় রেখা তাকে মালাটি পরিয়ে দিতে বলে। তখনই থেমে যায় গাড়ি। কাঞ্চন মালা পরিয়ে দিচ্ছে এসময় পরদা উঠেই নেমে যায়। দুজনে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। ঠিক করা ভাড়া আড়াই টাকা দিতে যেতেই ক্রুদ্ধ চালক দাবি করে পাঁচ টাকা—কারণ 'ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দেবেন না।' এই চরম আঘাতে ভেঙে যায় দুজনের মন। কাঞ্চন তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারে না। রেখা চমকে কান চেপে ধরে। তার হাত থেকে মালা পড়ে যায় রাস্তায়। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে তারা হেঁটে যায় কিন্তু কাঁদেনা। কারণ একান্তে কাঁদবার মতো কোনো আশ্রয় তাদের জানা ছিল না। সময়ের হাতে, পরিবেশের হাতে, সমাজের নিকট এভাবেই নিহত হয় হৃদয়ের সমস্ত শুভ অনুভব। নিত্যচরণ নিজেকে হত্যা করে। দুর্গার প্রবল জীবনাকাঙ্খা কোনোভাবেই পূর্ণতা পায়না। আবার কলেজের শিক্ষক কাঞ্চন অর্থনৈতিক আর সামাজিক কারণে স্ত্রীকে দিতে পারে না পত্নীর মর্যাদা। পরন্তু তাকে অপমানে বিধ্বস্ত হতে দিতে হয়। প্রতিবাদের ক্ষমতাও তার থাকে না।

এভাবেই দীপেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটোগল্পে সময়, জীবন আর সমাজকে রূপায়িত করেছেন। জীবনকে তিনি দেখেছেন নানাভাবে। নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তের জীবন, তাদের দুঃখ, সহায়হীনতা, তথাপি বেঁচে থাকার প্রবল প্রয়াস হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের উপকরণ। আবার সমকালের রাজনৈতিক উপদল-দল সংঘাতের নির্মমতা তাঁর নজর এড়ায়নি। 'শোকমিছিল' (১৯৭৩) গল্পটি তারই দৃষ্টান্ত। বাবা মা দুই ছেলে—এই চার চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্প। বাবা বিনয়ভূষণ, মা পারুল কমিউনিস্ট। তাদের দুই ছেলে অজয় বিজয়। এক ভাই বিজয় বা বিজু যোগ দেয় সি.পি. আই এম (দল) দলে। আর তার ছোঁড়া বোমায় মারা যায় অজয়। ''কে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম।' বিনয়ভূষণ চোখের পলক ফেলার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। তাঁর মনে হল বিজুর গলা, তিনি দেখলেন, পরেশ যেন জানত, তৈরিই ছিল স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে সরে গেল, আর বোমার শব্দ—অজয় পড়ে গেছে।'' এরপর দেখা যায় শ্রমিক শশী বলেছে সে এই খুলের বদলা নেবে। তার বিশেষ ভাষাভঙ্গি গড়ে দিয়েছে তার চরিত্র। ''ইয়াদ রাখবেন কমরেড দাদা। মজদুর তৈয়ার আছে।' একজোড়া টাঙির ফলা সূর্যের আলোয় ঝকঝক করে উঠল।'' সেই সময়ের রাজনীতির চরিত্রকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিশেষ করে এই হত্যাকে কেন্দ্র করে পরেশের শোকমিছিল বের করার পরিকল্পনা রাজনীতিকে কাজে লাগানো সুবিধাবাদী মানসিকতাকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। 'ঘাম' গল্পের জন্য একদা দীপেন্দ্রনাথ নিন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু গল্পটি এক দরিদ্রের স্বপ্ন দেখার কাহিনি। বস্তিবাসী বিষ্টুচরণ সহসা হ্যাপি ভ্যালি রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের চাকরি পায়। এ চাকরি তার কাছে ''মোড়ক খোলা পনিরের মতো একটা তাজা বউ পাওনার সামিল।'' এরপর তার জীবন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদা বেশ্যা এলোকেশীকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো টালিগঞ্জের নোংরা বস্তির ছোট্ট গুমোট ঘরে বাস আর হ্যাপি ভ্যালির শীতল আরামে সুশোভিত জীবন। সে এই শোভনতা আনতে চায় বস্তির জীবনে। তার স্বপ্ন, তার চেষ্টা সফল হয় না। তবু এলোকেশী ধারণ করেছে তার সন্তান। তার শ্রান্ত শরীরের ঘাম শুকিয়ে দেয় এলোকেশীর হাতপাখার বাতার। তাই এলোকেশীর পাশে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখে মুক্ত আলোবাতাসে ভরা তার গাঁয়ে সে ফিরে গেছে। 'একটা শিশু ছেলে খেতের আল দিয়ে টলে টলে হাঁটছে। একজনা দৌড়ে এসে তাকে তুলে নিল। তারপর স্ত্রীলোকটি হাঁপাচ্ছে। তার নাকের ডগায় সিঁদুরের মতো বিনি বিনি ঘাম জমছে।'

গল্পটিতে জীবন যে তুচ্ছ নয়, ভালোবাসায় জীবন পায় তার যথার্থ মূল্য—এই অস্ত্যর্থক চিন্তাই রূপায়িত। ভাষা ব্যবহারে দীপেন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্য-ভাস্বর। তাঁর বাক্য বিস্তৃত নয়, টুকরো-টুকরো ভাঙা ভাঙা। সম্পূর্ণ নিজস্ব আর নতুন তাঁর উপমা—'হিম পড়ছে, যেন ফোঁটা ফোঁটা অন্ধকার।' বিধাতার মতো সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে হল। এখানে ওখানে ছুলি হয়ে চাম উঠেছে, যেন উইয়ে খেয়েছে।'

দীপেন্দ্রনাথ নতুন সময়ের, নতুন রীতির গল্পকার। তিনি মানবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাস নিয়ে দৈহিক,

মানসিক, পরিস্থিতিগত সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন মনুষ্যত্বের জয়কে। এই লেখককে ভোলা যায় না। তাঁকে বাদ দিয়ে লেখা যায় না বাংলা গল্প সাহিত্যের ইতিহাস।

৫.১৭ দেবেশ রায় (১৯৩৬-)

১৯৩৬-এর ১৭ ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে দেবেশ রায়ের জন্ম। দেশভাগের পর তাঁদের পরিবার চলে আসে উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ি শহরে। এখানেই দেবেশ রায়ের পড়াশোনা, রাজনীতি আর সাহিত্যচর্চার সূচনা। দাদা দিনেশচন্দ্র রায়ের প্রভাবে স্কুলে পড়ার সময়ই দেবেশ রায় কমিউনিস্ট দলের সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট দল বেআইনি ঘোষিত হলে তিনি বাইরে থাকার সুবাদে কিছু কাজ করেছিলেন। এই রাজনীতি চর্চার ফলে তিনি জলপাইগুড়ির গ্রাম্য রাজবংশী অধিবাসী, তাদের মুখের কথা, চা বাগানের শ্রমিক, ডুয়ার্স অরণ্যের জীবজন্তু, মানুষজন, তিস্তা নিয়ন্ত্রিত জলপাইগুড়ির জনজীবন—এইসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। তাঁর ছোটো গল্পগুলি এর ফলে হয়েছিল সমৃদ্ধ। 'সাংবাদিকতা আমাকে টানে' বলেছেন দেবেশ রায় এবং স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই তিনি জলপাইগুড়ির কাগজ 'জনমত' ও 'ত্রিস্রোতা'-য় সাংবাদিক লেখা লিখতে শুরু করেছিলেন। জলপাইগুড়িতে চাকরি করার সময় তিনি কমিউনিস্ট দলের দৈনিকপত্রে সংবাদ পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৭৫-এ কলকাতায় আসার পর তিনি 'দৈনিক কালান্তর', 'প্রতিক্ষণ', 'পয়েন্টকাউন্টার পয়েন্ট' আর দৈনিক 'আজকাল'-এ সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন। যদিও সাহিত্য ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন।

দীর্ঘকালের সাংবাদিকতা তাঁর লেখাকে করে তুলেছে তথ্যনির্ভর। তিনি বলেন 'সাংবাদিকতা তথ্যের সেই ভিত্তিটা তৈরি করে দিতে পারে, যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গল্প-উপন্যাসে তথ্যের একটা মানবদলিল নির্মাণ করা যায়।

শিক্ষা ও কর্মজীবন ঃ জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে দেবেশ রায়ের ছাত্রজীবন শুরু হয়। বি. এ. পড়েন এই শহরের আনন্দচন্দ্র কলেজে। ১৯৫৮-তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি কিছু সময় আনন্দচন্দ্র কলেজে (জলপাইগুড়ি) বাংলার অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৫-এ তিনি এ কাজ ছেড়ে 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সায়েন্স'-এ যোগদান করেন। এরই সঙ্গে 'দৈনিক কালান্তর', 'প্রতিক্ষণ', 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট', 'আজকাল'—এইসব পত্রিকায় সম্পাদনা, সাংবাদিকতা সূত্রে কাজ করেছেন দেবেশ রায়।

গল্পসংকলন তালিকা—

১) 'দেবেশ রায়ের গল্প', ১৯৭২
২) 'দুই দশক', ১৯৮২
৩) 'দেবেশ রায়ের ছোটগল্প', ১৯৮৮
৪) 'স্মৃতিহীন বিস্মৃতিহীন', ১৯৯১
৫) 'স্বদেশ বিদেশ', ১৯৩৩
৬) 'দেবেশ রায়ের গল্প সংগ্রহ' ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৯৯১-১৯৯৫

গল্প-বৈশিষ্ট্য : কোনো খ্যাতনামা সাহিত্যপত্রে খুব বেশি মুদ্রিত হয়নি দেবেশ রায়ের ছোটোগল্প। কাহিনিবৃত্ত প্রধান গল্প রচনা করেন না তিনি। নির্মম জটিল বাস্তব তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে নানাভাবে। আবার অনুভবগাঢ় কাহিনি নির্মাণেও তিনি দক্ষ। তাঁর গল্পে সমকালের রাজনীতির সজীব রূপায়ণ আছে। উত্তরবাংলার রাজবংশী সমাজের জীবন-সংগ্রাম, ভাষা আর পরিবেশ সমেত উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। আবার মধ্যবিত্ত মানুষের ভীরু, আত্মপরায়ণ জীবনের চিত্রও তিনি এঁকেছেন বলিষ্ঠ ভাষায়। সময়ের পরিবর্তন কেমন করে বদলে দিচ্ছে মানুষকে,

বিশ্বায়নের ধাক্কায় কীভাবে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে জীবনের চিরাচরিত কাঠামো তার বিবরণ রয়েছে দেবেশ রায়ের গল্পে। দেবেশ রায়ের গল্পের মূল বিষয় মানুষ। অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে মানুষ আর পরিপার্শ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের লিপিচিত্র নির্মাণে নিপুণ দেবেশ রায়।

দেবেশ রায়ের সাহিত্য রচনা রাজনীতির মতো ছাত্রজীবনেই শুরু হয়েছিল। তবে তা জলপাইগুড়ি শহরেই সীমিত ছিল। যখন তিনি জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র—তখন তাঁর 'হাড়কাটা' গল্পটি ছাপা হয় ১৯৫৫-র 'দেশ' পত্রিকায়। মিউনিসিপালিটির বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত কসাই নানকু কাহার। পশুহনন তার তাদের মাংস বিক্রি করাই তার জীবিকা। আমিষাশী মানুষেরা সারা দিন ঘিরে থাকে তার দোকান। তার সঙ্গে মাংসলিপ্সু কুকুরের দল আর একটি পাগল। সাধ্যাতিরিক্ত শ্রমেও দূর হয় না তার দারিদ্র্য। তাই বউ গাধূলি রুপোর হাঁসুলি চেয়ে প্রহৃত হয় তার হাতে। তার 'মাংসল' গালে ফুটে ওঠে হাড়সর্বস্ব দেহ নানকুর আঙুলের দাগ। তারপর অনুশোচনা জাগে নানকুর মনে। তার স্মৃতিতে ফিরে আসে গাধূলির সঙ্গে অতীত অনুরাগের দিনগুলি। বর্তমানে ফিরে এসে সে দেখতে পায় তার বাসাবাড়ির সরু গলির দুপাশে দণ্ডকলস আর সেঁয়াকুলের গাছে পুষ্পোল্লাসের সঙ্গে মিলে গেছে মৌমাছির মুগ্ধ গুঞ্জন। এ দৃশ্য যেন নানকুর মনকে কোমল করে দেয়। পরের দিন দ্রুত কাজ শেষ করে সে। কুকুরদের দেয় মাংস। আর গাধূলির জন্য মাংস নিয়ে ঘরে ফেরে প্রেমিক নানকু। গাধূলির সঙ্গে হয় তার তার প্রেমের মিলন।

গল্পটির বিশেষত্ব তথ্যপ্রাধান্য। মানুষ আর তার পারিপার্শ্বিক সমাজবিন্যাসের প্রতিটি বস্তুগত দিক নির্ভুলভাবে স্থান পেয়েছে দেবেশ রায়ের গল্পে। কসাইদেরও পৌরসভার অনুমতিপত্র দরকার এ তথ্য সম্বন্ধে তাঁর আগে কোনো বাঙালি লেখক সচেতন ছিলেন না। পঞ্চাশের দশকে কাহিনিনির্ভরতা থেকে গল্পকে মুক্তি দেওয়ার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল দেবেশ রায় সে আন্দোলনের সার্থক শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অনেক গল্পে। 'দুপুর' এরকমই একটি গল্প। তেমন কোনো ঘটনা নেই। শুধু কয়েকটি মানুষের অনুভব দিয়েই নির্মিত হয়েছে গল্পটি। প্রখর তাপে দগ্ধ জ্যৈষ্ঠের দুপুরে এক পরিবারের কর্তা প্রৌঢ় যতীনবাবু ও তাঁর স্ত্রী রেণুবালা, বড়ো ও ছোটো দুই মেয়ে মায়া ও সতী আর তরুণ পুত্র মুকুল—এই পাঁচটি মানুষের অনুভব নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্পটি। স্নানাহার শেষে তাপক্লান্ত অবসন্ন পাঁচটি মানুষ আধো তন্দ্রায় তলিয়ে আছে নিজের নিজের ভাবনার গভীরে। বাইরে শোনা যাচ্ছে মাটির বেহালার ক্লান্ত সুর। মানুষগুলির ভাবনার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে তাদের শরীর-মনের গোপন বাসনা। যেমন যতীনবাবু : "মাটির কলসী করে বয়ে-আনা জলে লুপ্ত হবার ইচ্ছায় যতীনবাবুর সারা শরীরটা জ্বলছে। আর এই প্রজ্বলন্ত মানুষটির দিকে তাকিয়ে বসে আছে দুপুর, এই শ্লথযৌবন দুপুর।.......অফিসপাড়ার দুপুরবেলার পানওয়ালীর মতো নেশাতুর এই দুপুরের চোখ। যতীনবাবু চোখ বুজে থাকলেন। একটা ভাঙা, অস্পষ্ট আধো চেনা সুর যতীনবাবুর কানে গেল। অফিসের হিসেবকষা দুপুরে পাশের ছোকরার গুনগুন গানের মতো।.....মাটির কলসী নিয়ে নদীর ঘাটে যে জল আনতে গেছে, সে এত দেরি করছে কেন? অফিসের বসন্ত ত প্রতিদিন দুপুরে ঠিক এই সময় এক গ্লাস জল নিয়ে যেতে ভোলে না। বেহালার সুরটা পূর্ণ হচ্ছে না কেন? পুরোটা বাজাও পুরোটা বাজাও।....দেহের চর্বিটা গলে গলে যাক, সুরটা এসে বুকে ঘা দিক।....বড় তৃষ্ণা এ-দেহের, এ-মনের। জল দাও, সুর দাও।"

এভাবেই রেণুবালা মায়া, মুকুল আর সতীর অনুভব চিত্রিত হয়েছে। চরিত্রানুযায়ী তাদের মধ্য অনুভবগত প্রভেদও রয়েছে। ক্রমে মাটির বেহালার সুর বাজাতে বাজাতে চলে যায় দূরে। দুপুর গড়িয়ে হয় বিকেল।

গল্প এখানে আখ্যানের বন্ধনে আবদ্ধ নয়, অথচ অনুভবের ঐকতার জন্য ছোটো গল্প হিসেবে হয়ে উঠেছে সফল।

দেবেশ রায়ের গল্পে আছে মানবসম্পর্ক-ভিত্তিক বাস্তবতার রূপায়ণ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বা পরিবার, বা দেশের রাজনৈতিক আবহের এবং আঞ্চলিকতার সংযোগ—সমস্ত খুঁটিনাটি সমস্ত বিবৃত হয়েছে তাঁর রচনায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছোটো গল্পে এই মানবসম্পর্কের বিস্তৃতি এসেছে। যন্ত্র-জগৎ, সংবাদবিশ্ব,

উপভোগী সমাজ, বিজ্ঞাপননির্ভর বিশ্ব কেমন করে মানবসমাজকে করে দিচ্ছে মূলহীন, বিপন্ন হচ্ছে তার অস্তিত্ব—বিভিন্ন দিক থেকে তা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।

১৯৬১ থেকে ১৯৬২—এই সময়টিকে দেবেশ রায়ের গল্পের প্রথম পর্ব বলা যায়। এখানে মানব সম্পর্কের পারস্পরিকতার নানা দিক বিশ্লেষিত হয়েছে। স্বাধীনতাপরবর্তী দেশের অবস্থা, পরিবর্তমান সমাজ, অনড় শাসন-ব্যবস্থা আর ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কের 'গুণগত পরিবর্তনের' অস্থির যুগে শুরু হয়েছিল দেবেশ রায়ের সাহিত্যকর্ম। মানব-সম্পর্কের পারস্পরিক জটিলতা নিয়ে দেবেশ রায় যেসব গল্প লিখেছেন তারই একটি 'আহ্নিকগতি ও মাঝের দরজা'। পঙ্গু অক্ষম তটিনীর স্বামী, কিন্তু তার দেহমনের বৈধ অধিকারী ওই মানুষটি। তটিনীর স্বামীর ঔরসে জন্ম নিয়েছিল কয়েকটি সন্তান। এখন তাদের ভার তটিনীর অকৃতদার দেবর শিশিরের উপর। তটিনী আর শিশির দুজনেই দুজনের দেহমনের সব চাওয়া-পাওয়ার কথা জানে। কিন্তু সমাজ আর সংসারের চাপে তাদের বাসনাগুলি নিহিত থাকে স্মৃতির অতলে। উভয়ের ঘরের মাঝের দরজা থাকে অগলিত। একদিন দরজা খুলে যায় কিন্তু ঘোচে না মনের বাধা। ''আর পৃথিবীটা নিজের মেরুদণ্ডের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে দিনরাত—রাতদিন লিখে লিখে মুছে-মুছে সূর্যের চারদিকে ঘুরে ঘুরে শীতল হবে। আরো আরো শীতল।'' এমনইভাবে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের তাপ কেমন করে ক্ষয়িত হয়ে যায়।

এককচরিত্র-নির্ভর কিছু গল্পও দেবেশ রায় এসময় লিখেছেন। একটি মানুষ নিজস্ব ভূমিতে সহায়হীন বিপন্নতা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কেমন করে নিজেকে টিকিয়ে রাখে—তার চিত্র অনন্যসাধারণ দক্ষতায় এঁকেছেন দেবেশ রায়। ব্যক্তিমনের ভাবনা তাঁর ভাষায় মূর্ত হয় অনায়াস স্বচ্ছন্দতায়। ঘটনার দ্রুততার পরিবর্তে অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি নির্মাণ করেন পরিস্থিতি বা মনোভাব। তাই তেমন আখ্যান-নির্ভরতা দেখা যায় না তাঁর লেখায়। 'পা' গল্পে রয়েছে তার উদাহরণ। আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল বাড়ির বড়ো আর ছোটো বউ। বড়োজন মারা যায়। ছোটো বউ বেঁচে যায়, কিন্তু কেটে ফেলতে হয় তার একটি পা। তাদের আত্মহত্যার কারণ ব্যাখ্যাত হয়নি। বরং খঞ্জ মেয়েটির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং তাঁর বর্ণনাকৌশলের জন্য আত্মহত্যার কারণ জানার কৌতূহল থাকে না পাঠকের। পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে এসেছে এ গল্পের সংকট। ছোটো বউয়ের যখন দুটি পা ছিল তখন অন্য সবার মতো তারও ছিল বিবিধ অভাববোধের বেদনা যা তাকে ঠেলে দিয়েছিল আত্মহত্যার পথে। অথচ আজ পা হারিয়ে বেঁচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সংসারে স্ব-অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য মানসিক সংগ্রাম শুরু করে। এখন সে লোকের হাঁটা দেখে বুঝতে পারে তার চরিত্র, তার উদ্দেশ্য। এক ঘুঁটেওয়ালি হাঁটছে ঘুঁটের বোঝা নিয়ে। সে ''দুহাত একটু পাশে ছড়িয়ে তাল সামলাচ্ছে। সমস্ত পিঠটা দুলছে, পেছনটা সপসপ করছে এক সুমিত ছন্দে।.....ঘাড় থেকে ঢেউটা পিঠ ভেঙে নেমে এসে কোমরের নীচে একবার উঁচু হয়ে দু-ভাগ হয়ে গেছে।'' ছোটো বউ বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে ঘুঁটেওয়ালির উরু দুটো এখন শক্ত হয়েছে। অথচ তার নিজের হাঁটা শুধুমাত্র ক্রাচের দোলন। তার লজ্জা-রাগ-অভিমান কিছুই আর ফোটে না তার হাঁটায়। তবু এই মেয়েটির অস্তিত্বের লড়াই শেষ হয় চমক লাগানো এক শারীরিক স্বীকৃতির উদ্ভাসে—''এক বছর পর ছোটো বউয়ের একটা দু-পা ওয়ালা বাচ্চা হল।'' অর্থাৎ সংসার ছোটো বউকে, তার জৈবিক সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে বা নিতে বাধ্য হয়েছে।

ষাটের দশকে দেবেশ রায়ের ছোটোগল্পে দেখা যায় রাজনীতির দৃঢ় ভিত্তির প্রকাশ। ক্রমে সত্তরের হত্যা-উন্মাদ সময়কেও তিনি গল্পের কাঠামোয় রূপ দিয়েছেন।

ছাত্রবয়স থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন দেবেশ রায়। রাজনীতি তাঁর কাছে মানব-চেতনার দীপ্ত এক প্রকাশ। তাঁর রাজনীতির সঙ্গে এদেশের স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতির কোনো সাদৃশ্য নেই। তাঁর মতে—''রাজনীতি মানে ত আমাদের এই দৈনন্দিনের ভিতর এক স্বপ্নের সঞ্চার, তারপর সেই স্বপ্নকেই দৈনন্দিন করে তোলার ইচ্ছে আর কাজ। (পৃ. ৩ 'ভূমিকা', 'গল্প সমগ্র', দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২) অবস্থান জনিত কারণে উত্তরবঙ্গ

সহজেই হয়ে উঠেছে রাজনীতি-সচেতন। পূর্ববঙ্গ আর অসম সীমান্ত কাছাকাছি হওয়ায় দেশবিভাগজনিত রাজনীতি এখানে ছিল প্রবল। শাসনকেন্দ্র থেকে দূরত্ব, ডুয়ার্স-অরণ্য আর দার্জিলিং-এর পার্বত্যাঞ্চল নিকটস্থ হওয়ায় সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন এখানে হয়েছিল শক্তিশালী। নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন এখানেই বিকশিত হয়েছিল। তাঁর কিছু রাজনৈতিক গল্পের পটভূমি উত্তরবঙ্গ।

রাজনীতির ইতিবাচক দিকটি উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে রচিত 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার' গল্পে সুষ্ঠুভাবে ফুটেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের বিবাহিতা বড়ো মেয়ে যক্ষাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল আরোগ্যকেন্দ্রে। সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। তার পরিবার তাকে দূরে রাখেনি, আবার আপন করেও নিতে পারেনি। কোথায় যেন থেকে গেছে অদৃশ্য এক বাধা।

এই অবস্থায় মেয়েটির ভাই এসে তাকে কিছু রুটি করে নিতে বলে। কোথায় এক প্রতিবাদী আন্দোলনের জন্য এসেছে অনেক মানুষ; তাদের জন্য চাই খাবার। এই কাজের সূত্রে চূর্ণ হয়ে গেছে অদৃশ্য সেই বেড়া। সুস্থ ভাইবোনের সঙ্গে আরোগ্যশালা-প্রত্যাগত মেয়েটির সম্বন্ধ হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক। ক্ষমতাসীন রাজনীতি কেমন করে বিপন্ন করে দেয় সাধারণ মানুষের জীবন—তারই গল্প 'উদ্‌বাস্তু'। সরকারি কাগজপত্রে পরিচয়পত্রের জটিলতা হেতু দেশভাগের পর ওপার থেকে আসা দুটি নরনারীর অস্তিত্ব হয়ে ওঠে সংশয়সংকুল। এখন তারা যে তারাই তা প্রমাণ করতে হবে দম্পতিটিকেই। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম বাঙলায় চলে আসা মানুষগুলির সংকট গল্পটিতে হয়ে উঠেছে বাস্তব।

সত্তর দশকের রক্তাক্ত রাজনীতি নিয়ে লেখা অসংখ্য গল্পের একটি 'মানুষ রতন'। উনচল্লিশটি মৃতদেহ পাওয়ার পর তদন্ত কমিশনের বিশ্লেষণ এবং তার রায় দেওয়া নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্প। রাস্তায়, ঘাটে, যেখানে-সেখানে পাওয়া গেছে মৃতদেহ। ডাক্তাররা অস্বাভাবিক মৃত্যুর শব ব্যবচ্ছেদ করতে চাইছে না। কারণ—"প্রতিদিনই যদি মড়া আসতে থাকে, আর প্রতিদিনই যদি আর বেশি শবব্যবচ্ছেদ করতে হয় তাহলে ডাক্তারদের ত মড়া নিয়েই কাটাতে হবে, জিন্দা মানুষকে আর দেখা যাবে না। বারাসতে নয়, ডায়মন্ডহারবারে দশ, বহরমপুরে সাত, নোয়াপাড়ায় সাত, কৃষ্ণনগরে, খড়গপুরে, জলপাইগুড়িতে সর্বত্র রাতভোর যদি মড়া পড়ে থাকে ডাক্তাররা তাহলে কী করে?" (পৃ. ৯৩, 'মানুষরতন', 'গল্পসমগ্র' ৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩)। গল্পটিতে মানবদেহের প্রতি অঙ্গে চাপ-বোধের তালিকা দেওয়া আছে। এটি দেবেশ রায়ের তথ্যপ্রিয়তার প্রমাণ। প্রশাসনের প্রতি তীব্র বিদ্রুপ রয়েছে গল্পটিতে। কারণ এখানে প্রস্তাব করা হয়েছে সরকার যেন 'মারা ও মরা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি' প্রকাশ করেন। সেখানে হননকারীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে তারা যেন তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্র দিয়ে 'হৃৎপিণ্ড থেকে উদর পর্যন্ত অংশে একটিমাত্র আঘাত করে।' তাহলে মৃত্যু হবে বেদনাহীন। আর জনগণকে বলা হয়েছে তারা যেন জাঙিয়া বা গেঞ্জি না পরে। কারণ তাহলে হত্যাকারীর আঘাত বাধা পাবে এবং হত মানুষটি মৃত্যুর আগে বোধ করবে তীব্র যন্ত্রণা।

গল্পটি শেষ হয়েছে মস্তিষ্ক থেকে সেরিব্রাল করটেকস অংশটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে। কারণ তাহলে সবাই দ্রুত ক্রুদ্ধ হবে, প্রতিরোধ করতে পারবে ঘাতককে। আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলি আয়ত্তে এনে সবাই হয়ে উঠবে খুনি। এবং এভাবেই একদিন মানুষ বন্ধ করতে পারবে অকারণ হত্যা।

অকর্মণ্য প্রশাসন, দেশের মানুষের ভীরুতা ওই সময়ে একদল খুনিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল। সরকার আপন বিবেক আর জনতার ক্রোধ শান্ত করতে নিযুক্ত করেছিল তদন্ত কমিশন। তার ফলে কাজ কিছু হয়নি, থেমে যায়নি রক্তস্রোত। সেই ভয়ানক অবস্থাটি তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে বিদ্ধ করে বাস্তব করে তোলা হয়েছে গল্পটিতে। আরও লক্ষণীয় শুধু বর্ণনার দ্বারা, অনুপুঙ্খময় বিবৃতিমূলক ভাষা ব্যবহারে লেখকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। এ গল্পেও আখ্যান-নির্ভরতার পরিবর্তে অনুভবক্ষমতাকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে 'ঐকপ্রতীতি'।

প্রশাসনের দুর্বলতা মধ্যবিত্ত মানুষগুলিকে করে তোলে ক্লীব, আত্মবঞ্চক। 'নিরস্ত্রীকরণ কেন' গল্পটি তার প্রমাণ।

চলন্ত ট্রেনের বন্ধ কামরার দরজা ধরে ঝুলে থাকা একটি মানুষের কাতর প্রার্থনায় কান দেয়নি কামরাভরতি নানা শ্রেণির বিভিন্ন বয়সের মানুষগুলি। একটি ভয়ই এর কারণ—মানুষটি যদি ডাকাত হয়। শুধুমাত্র সন্দেহনির্ভর শঙ্কার জন্যই একটি জীবন্ত মানুষের কাতর প্রার্থনা শুনতে চায়নি অতগুলি মানুষ। ফলে মানুষটি ট্রেন থেকে পড়ে মারা যায়। এবং এই সত্য অনুভব করেও কামরার মানুষগুলি বিচলিত হয়নি।

মানুষের কার্য প্রণালির ঘনিষ্ঠ চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে অনেক গল্পে আপন প্রতিপাদ্য বিষয়কে নিপুণ আন্তরিকতায় উদ্‌ভাসিত করেছেন দেবেশ রায় অনেক গল্পে। 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' তার উদাহরণ। উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে রচিত রাজবংশী মানুষের মুখের ভাষায় শ্রম দিয়ে বিরূপ প্রকৃতিকে পরাস্ত করার উল্লাস মূর্ত হয়েছে এ গল্পে। বর্ষায় 'নদী বিপজ্জনক ফেরি বন্ধ' বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সরকার বন্ধ করে দেয় পারাপার। কিন্তু মানুষের কাজ থেমে থাকতে পারে না, তাদের যেতেই হয় নদী পার হয়ে। রাজবংশী মানুষগুলি তখন হাজির হয় তাদের নৌকা নিয়ে। এরকম দুটি দলের মধ্যে যাত্রী ধরা নিয়ে একটু মনোমালিন্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু যাত্রা শুরু হতেই প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় তুচ্ছ হয় বিঘ্নময় নদীপথ। আর সফল যাত্রার শেষে মানুষগুলিকে পারে নামিয়ে দিয়ে দুই নৌকার মাঝির দল মেতে ওঠে রসিকতায়। এক নৌকার মাঝির রসিকতায় হেসে ওঠে দুটি নৌকার উনিশ জন মাঝি। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা ব্যঞ্জিত হয়েছে গল্পের উপস্থাপনায়।

বর্তমান শতাব্দী প্রযুক্তির শতক। বিশ্বায়ন এবং প্রবল প্রযুক্তির পটভূমিতে বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যক্তিকে। ফলে মানুষের নিজস্বতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে তার মানবিকতা। মানুষ নিজেই নিজেকে করে তুলছে বিপণনযোগ্য পণ্য। দূরদর্শন এমনই একটি বাণিজ্যসংস্থা। কীভাবে তার দাবি অনুযায়ী ব্যক্তিমানুষ নিজেকে পালটে ফেলছে সেই বাস্তব সত্য নিয়ে গড়ে উঠেছে 'জীবনানন্দের মুখ' গল্পটি। বিজ্ঞাপন পুরো পৃথিবীকে একই বিলাসস্তরে স্থাপিত করতে সমর্থ। বিজ্ঞাপনের প্রচারদীপ্তি মোহিত করে মানুষকে। 'জীবনানন্দের মুখ'-এ মধ্যবিত্ত পরিবার সেই মোহে মুগ্ধ হয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে তরুণী আনন্দ। দূরদর্শনে ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হবে তার মুখ। তার এক আত্মীয় যুবক তুলবে সেই ছবি। মেয়ের শরীরের কতটা প্রদর্শিত হবে এ প্রশ্ন মাকে চিন্তিত করে। কিন্তু তিনি মেয়েকে বারণ করতে পারেন না। তবে পরিবারটির ভরসা বিজ্ঞাপন হবে মার্জিত সুন্দর, কারণ বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হবে জীবনানন্দের কবিতার পঙ্‌ক্তি—'দেখিবে মেয়েলি হাত সকরুণ—সাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে/শঙ্খের মত কাঁদে; সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে,/খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন্ কাহিনীর দেশে—'। দেখা যাচ্ছে উন্নত প্রযুক্তি মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে জীবিকার নতুন উৎস এনে দিয়েছে। অন্য দিকে বিপণন-মূলক বিজ্ঞাপন নিজেকে মার্জিত সাহিত্য বলে দাবি করছে। সে দাবি স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। এখানেই রয়েছে আশঙ্কা। পরিণামে সাহিত্য-উপভোগের মানসিকতা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ সম্ভাবনা থেকেই যায়।

আবার বাণিজ্যমনস্ক, এই সময়, বিজ্ঞাপন-মাধ্যমের ব্যবহার—কেমন করে মানুষের মনকে নীতি-দুর্নীতি বিষয়ে উদাসীন করে দিয়েছে তারই তীব্রতা রয়েছে 'বৃষ্টিবদল' গল্পে। গল্পটি শুরু হয়েছে আকাশ-ছাপানো প্রবল বৃষ্টির পটভূমিতে। এই বৃষ্টির মধ্যে নির্মল ঘোষ, দূরদর্শনের প্রোডাকশন ম্যানেজার বেরিয়েছে প্রসাদের সন্ধানে। সে বিদেশি সহায়তায় মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দূরদর্শনের জন্য একটি বিজ্ঞাপনমূলক প্রচারচিত্র নির্মাণ করবে। এজন্য চাই এমন মেয়ে যারা বাচ্চাকে বুক খুলে দুধ খাওয়াবে। নির্মল প্রসাদের কাছে পৌঁছোয় তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। আর আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আশ্চর্য এক আলোর ছটা। এই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে নির্মল ঘোষ প্রসাদকে জানায় তার প্রয়োজনের কথা। প্রসাদ জানায় মেয়ে, বাচ্চা সবই পাওয়া যাবে। কিন্তু টাকা দিতে হবে ব্লু ফিল্মের রেটে। নির্মল বোঝাতে চায় সে ব্লু ফিল্ম করছে না। কিন্তু প্রসাদ জানায় 'বুক দেখানোর রেট ব্লু ফিল্মের রেট।' কারণ—'আপনারা এই বুক তুলে নিয়ে বাচ্চাটাকে কেটে দিয়ে ব্লু ফিল্মে লাগিয়ে দিলে সে ত আর আমরা

জানতেও পারব না। আর বাচ্চা নিয়েও ত ওই সব ফিল্ম হয়....। তার উপর অ্যাডভারটাইজে এখন বুকের খুব ডিম্যান্ড। ব্রেসিয়ার কোম্পানিগুলি বুক চায়, কোম্পানি বুক চায়। আপনারা সেই সব কাজেও তলাগাতে পারেন। তাই আমরা রেট বেঁধে দিলাম—বুক দেখালে ব্লু ফিল্মের রেট আর না দেখালে অন্য রেট।'' শুধু তাই নয় কাপড়চোপড় ছাড়া শরীরের কোনো শো দিতে হলে ওই ব্লু-র রেটেই দিতে হবে।'' কারণ এখন জুতো মোজার বিজ্ঞাপনে উরু পর্যন্ত পা লাগে। পাউডারের জন্য পিঠ লাগে—সবেরই ওই ব্লু-র রেট। ফলে এ ছবি তুলে চুরি করে ব্লুফিল্ম বানালেও তাদের কোনো 'লস' হয় না।

দুই ব্যক্তির এই কথোপকথন নিতান্ত ব্যবসায়িক। বিন্দুমাত্র অশ্লীলতা এই আলোচনায় নেই। নির্মল ঘোষ মেনে নেয় যোগানদার প্রসাদের যুক্তি আর ভাবে—''রেটটা যখন ব্লুরই দেবে তখন বাচ্চা ছাড়া কিছু বুকের ছবিও তুলে স্টকে রাখবে—এসব টুকরো শটের ত বেশ ভালো একটা বাজার তৈরি হচ্ছে।''

বাণিজ্যমনস্ক এই যুগ মানুষকে কোন অনুভূতিহীন পণ্যসর্বস্বতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে—তার চিত্র গল্পটিতে রয়েছে। হয়ত এজন্যই গল্পটির নাম 'বৃষ্টিবদল'। বৃষ্টি যেমন পালটে দেয় পরিবেশকে; তেমন করেই বিপণনমনস্কতা বদলে দিয়েছে মানুষের মন। তাই মেয়েদের খোলা বুক হলেই ব্লু ফিল্মের দর দিতে হয়। সে বুক মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার মহৎ প্রচারচিত্রে লাগছে কী ব্লু ফিল্ম তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে—বিক্রেতা তা বিচার করে না, সে শুধু দাম পেলেই খুশি।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন নন দেবেশ রায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে লেখা হয়েছে 'ছেলেরা করে খেলা' গল্পটি। দময়ন্তী মুখোপাধ্যায় আর রহিমউদ্দিনের সন্তান বলেই ঠিকঠাক পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও স্কুলে ভরতি হওয়া ছেলেদের তালিকায় নীলের নাম থাকে না। আর এই অকৃতকার্যতার কথা দময়ন্তী-রহিমউদ্দিন গোপন রাখতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত নীল সে কথা জেনে যায়। আর রহিমউদ্দিন ভাবতে থাকে সাম্প্রদায়িকতা শুধু স্থানবিশেষে নেই; তা ছড়িয়ে পড়েছে তথাকথিত উদার শহর কলকাতাতেও।

তবু দেবেশ রায়ের গল্পে নেই সার্বিক হতাশার অবক্ষয়। তরুণ প্রজন্মের শক্তিতে তাঁর আস্থা গভীর। 'অসংরক্ষণ'-এ তারই চিহ্ন স্পষ্ট। অমল-সুমিতার ছেলে অমিত মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর নিজের স্কুলের একাদশ শ্রেণিতে ভরতি হয়। এই শ্রেণিতে ভরতি হয় ৭৭৪ নম্বর অর্থাৎ শতকরা ছিয়াশি শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করে আসা উত্তর বাংলার আদিবাসী কিশোর রামসাই বসুমাতারি। মুগ্ধ সহপাঠীদের এই ফরসা ছোটো চোখ ছেলেটি জানিয়েছে বিশাল রামসাই অরণ্য থেকে এসেছে তার নাম রামসাই। আর বসুমতীর অর্থাৎ পৃথিবীর সন্তান বলেই তার পদবি বসুমাতারি। তার সগর্ব ঘোষণা—''আমরা আদিবাসী—আমরা নদী বন পাহাড়ের সন্তান''—আপ্লুত করে দেয় তার সহপাঠীদের। রামসাইয়ের মাধ্যমে তারা অনুভব করে এক বিরাট দেশের বিপুল বিস্তার। সেই সীমাহীন বিস্তৃতির অনুভব সমস্যাসংকুল সংশয়ী-নাগরিক সভ্যতার ফাঁকিকে ভেঙে দেবে। গড়ে উঠবে উজ্জ্বল এক মানবভবিষ্যৎ—এই আশার ইঙ্গিতে শেষ হয়েছে গল্পটি।

আধুনিক বিশ্বে কোনো মানুষই নিজের বৃত্তে সীমিত হয়ে থাকতে পারে না। তাকে বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত হতেই হয় কোনো না কোনোভাবে। তবু তার মধ্যে মানুষ সন্ধান করে হৃদয়ের সান্নিধ্য। সমস্যাকীর্ণ, সংশয়ী, অন্বেষণপ্রবণ, সংগ্রামী মানবমানসকে বিশ্বপ্রেক্ষিতে চিত্রিত করার কঠিন কর্মে রত দেবেশ রায়। তাঁর ছোটো গল্পগুলি সেই কর্মপ্রবাহের স্তরগুলি ধরে ফেলেছে। স্ববিশ্বাস আর স্বীয় অভিজ্ঞতায় জারিত বলেই তাঁর গল্প বাংলা সাহিত্যে হয়ে উঠেছে অনন্য। এখানেই তাঁর শিল্পসফলতা।

ভাষা-বিশেষত্ব : ভাষার মাধ্যমে বাস্তবকে রূপায়িত করেছেন দেবেশ রায় তাই তাঁর ভাষা হয়েছে প্রতিবিম্বের মতো। তিনি ব্যাখ্যা করেন না, বিশ্লেষণের দিকেও তাঁর টান নেই। তিনি শুধু সর্ববিধ অনুপুঙ্খ তথ্যসহ ঘটনা বা জীবনের ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে যান। তাই তাঁর ভাষার মধ্যে আছে এক ধরনের নির্লিপ্তি। মানবচিত্তের রূপ তিনি শব্দ দিয়ে অঙ্কন করেন। ফলে একটি সীমাহীন বিস্তারের আভাস থাকে তাঁর রচনাভঙ্গিতে।

আবার উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা তাঁর সে স্থানের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলিতে স্বাভাবিকতার স্বাদ এনে দেয়। দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্বচ্ছ করে তোলার চেষ্টা করা হল।

(১) "প্রথমে খুব আস্তে-আস্তে দুবার, আর যেন প্রায় আদেশের মতো 'দরজাটা খুলুন।' কথাটা সবাই শুনেছিল, কেউ সাড়া দিল না। বারকয়েক ঐ কণ্ঠস্বর শান্ত নির্দেশের মতো থেকে 'দরজাটা খুলুন' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ট্রেন তার ক্ষণবিরতির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তখন আবার বেগ নিচ্ছে। ডাক্তারবাবু উঠে বসলেন। সেই একই কণ্ঠস্বরে 'দরজাটা খুলুন' শুনে ডাক্তারবাবু দাঁড়ালেন।" (নিরস্ত্রীকরণ কেন')

(২) "ছোয়াপোয়া নিদ আসে,
যাউক, নিদ যাউক,
জল না কমে হে, বাতাস কমে না,
জল কমিয়ে না হে
বাড়ছে কি তাড়াতাড়ি না ধীরত?
অন্ধকার থেকে জিজ্ঞাসা।
কায় জানে, কায় ত দেখে নাই
কখুন বানা—"

('বানা')

তিস্তার বন্যার বর্ণনা রাজবংশীদের আঞ্চলিক ভাষায় হওয়ায় পরিস্থিতি বাস্তব হয়ে উঠেছে।

(৩) প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে দেবেশ রায় অনুভবের সত্যতা সঞ্চার করেছেন সহজে। বৃষ্টি থামার পরের বর্ণনায় এসেছে এই সত্যতা—"বৃষ্টিটা হুট করে থেমেই গেল শুধু না, থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা কচি কচুপাতা রঙের আলো, টারকুইজ ব্লু ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। আলোটাকে ঠিক চিনে নেওয়া যায় না, দেখাও যায় না, কিন্তু বোঝা যায় আর সেই আলোর আভা ভেজা রাস্তায়, ভেজা বাড়িতে প্রতিফলিত হয়ে ছড়িয়ে গেছে। চারপাশে কীরকম একটা জেল্লা এসেছে।" ('বৃষ্টিবদল')

ভাষা-নির্মাণ দক্ষতা, অনুভূতির রূপায়ণ-নিপুণতা এবং কাহিনিবৃত্ত রচনাক্ষমতা—সব মিলিয়ে দেবেশ রায় হয়ে উঠেছেন বর্তমানের অন্যতম শক্তিমান ছোটোগল্প রচয়িতা।

৫.১৮ তপোবিজয় ঘোষ (১৯৩৭-১৯৯০)

অখণ্ড বাংলার ময়মনসিংহ জেলার নারায়ণপুর গ্রামে ১৯৩৭ সালে ধনঞ্জয় ঘোষ ও জ্ঞানদাদেবীর পুত্র তপোবিজয়ের জন্ম। পিতা ছিলেন শিক্ষক। ফলে পরিবারে কিছুটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল। ন-বছর বয়সে মাতৃহারা তপোবিজয়ের কৈশোর কেটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), পঞ্চাশের মন্বন্তর, বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পটভূমিতে (১৯৪৩)। দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতার (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭) একবছরের মধ্যে তপোবিজয় সপরিবারে দেশত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় আসেন ১৯৪৮-এর ২৫ জুন। ১৯৪৯-এর ১ অক্টোবর মৃত্যু হয় ধনঞ্জয়ের।

শিক্ষা : পিসতুতো দাদা শশিশেখরের তত্ত্বাবধানে বড়ো হয়ে ওঠেন তপোবিজয়। ইনি ছিলেন বীরভূমের ইরিগেশন বিভাগের কর্মী। তাই তপোবিজয়ের স্কুল-শিক্ষা হয় রামপুরহাট স্কুলে। ১৯৫৩-তে স্কুল-শিক্ষা সমাপ্তির

পর তিনি ভরতি হন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে। এ সময়েই তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৮-তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভরতি হন। পরে পি-এইচ.ডি. করেন 'উনিশ শতকের নীল আন্দোলন ও বাংলার সারস্বত সমাজ' নিয়ে।

কর্মজীবন : আর্থিক প্রয়োজনে কন্ট্রাকটরি, গৃহশিক্ষকতা, স্কুল-শিক্ষকতা করতে হয় তপোবিজয়কে। বীরভূমের পাঁচড়া স্কুলে কয়েক মাস পড়ানোর পর ১৯৬১ সালে তিনি সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। চিনের ভারত আক্রমণ-কালে চিনকে সমর্থন করায় চাকরি যায় তাঁর। ১৯৬৩-তে তিনি কাটোয়া কলেজে কাজ পান। ১৯৬৬ সালের শেষভাগে তিনি যোগ দিয়েছিলেন শিবপুর কলেজে। ১৯৭০-এর মার্চ থেকে ১৯৭৭-এর এপ্রিল—এই সময়ে তিনি ছিলেন 'চতুষ্কোণ' পত্রিকাটির সম্পাদক। ১৯৭২-এ তিনি গঠন করেন 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী।' ১৯৮০ সালে তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। ক্রমে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপিত হয় তাঁর। ১৯৯০-এর আগস্ট মাসে ক্যানসার রোগে মৃত্যু হয় তপোবিজয়ের।

সাহিত্যজীবন : সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময়েই গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন তপোবিজয়। নানা পত্র-পত্রিকায় সেগুলি মুদ্রিত হতেও শুরু করে। কলেজ-পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর সনেট 'প্রার্থনা' ১৯৫৫-তে পুরস্কৃত হয়। এই বছরের জুলাই মাসে 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবারের সাময়িকীতে বের হয় তাঁর নিবন্ধ 'রহস্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর'। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবারের সাময়িকীতে মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম গল্প 'মা'। এরপর থেকে 'স্বাধীনতা', 'লোকসেবক', 'হিমাদ্রি', 'পরিচয়', 'দৈনিক বসুমতী'—এসব পত্রিকায় মুদ্রিত হয় তাঁর নানা গল্প, প্রবন্ধ আর কবিতা। (গল্প 'পাখির বাসা' (১৯৫৬), 'ঊষাভাস' (১৯৫৬), 'সতু মাস্টার (১৯৫৬), 'শ্মশান-বসন্ত' (১৯৫৬), 'দাগ' (১৯৫৭) প্রভৃতি। প্রবন্ধ : 'আগমনী গান ও বাঙ্গালি' (১৯৫৬), 'মীর মশার্‌রফ হোসেন' (১৯৫৭), 'সমালোচনার দায়িত্ব' (১৯৫৭), 'বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাংলা' (১৯৫৭), 'কবি কৃষ্ণদাস ও সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সংবাদ প্রভাকর ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৮)

সাহিত্যের সর্ব বিভাগে নিপুণতার জন্য সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের শারদ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি লাভ করেন বিশেষ পুরস্কার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা 'একতা'-য় মুদ্রিত হয় তাঁর 'উত্তাপ' নামের গল্পটি। কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর ষাট ও সত্তরের দশকে 'নন্দন', 'চতুষ্কোণ', 'লেখা ও রেখা', 'বাংলাদেশ', 'বসুমতী', 'সত্যযুগ'—এই সমস্ত পত্রিকায় মুদ্রিত হয় তাঁর 'সীতনাথের বাজার', 'ক্ষুৎকাতর', 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা', 'উত্তরের জানলা, 'নক্ষত্রের আলো, 'পথ হাঁটতে মানুষ', 'আমেরিকার চন্দ্রযান ও পতিতপাবন' এই সব গল্প আর 'সামনে লড়াই' (শারদীয় 'নন্দন' : ১৯৭০, গ্রন্থরূপ : ১৯৭১), 'রাত জাগার পালা' (শারদীয় 'নন্দন' : ১৯৭২) উপন্যাস।

তালিকা : গল্প-সংকলন—

১) 'কালচেতনার গল্প' : ১৯৮১

২) 'নির্বাচিত গল্প' ১৯৮১

৩) 'ইতিহাসের মানুষ' ১৯৮২

গল্প বিশেষত্ব :

প্রায় একশোর মতো গল্প লিখেছিলেন তপোবিজয়। গল্পগুলিতে তাঁর ছাত্রজীবন থেকে চর্চিত রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব বেশ প্রকট। তারই সঙ্গে মিশে গেছে মানবিকতার চিরকালীন উত্তাপ। যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষের ভীষণতার ভেতর দিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন তপোবিজয়। তাঁর রচনাতে পড়েছে সেসবের রক্তাক্ত প্রভাব। রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আর মানবিক মূল্যবোধের ধ্বংসোন্মুখিতা, কর্মহীনতা, দারিদ্র্যের সার্বিক বিস্তার, শক্তিমানের

শোষণ ও শাসনের ফলে ধ্বস্ত মানবজীবনের চিত্র বার বার এসেছে তাঁর ছোটো গল্পে। তবুও সমবেত মানুষের সংগ্রাম যে একদিন সকল বৈনাশিক কৃষ্ণ শক্তিকে পরাস্ত করে জ্বেলে দেবে প্রীতি-প্রেমের আলো—সে বিশ্বাস প্রবল ছিল তপোবিজয়ের। তাঁর বহু ছোটোগল্পেই লক্ষিত হয় তার প্রভাব। তাঁর গল্পে গ্রাম, গ্রামজীবন, শিক্ষক-জীবন, বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব রূপ অঙ্কিত হয়েছে। সে জীবন খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, বলবানের সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা, বীভৎস বিনাশ-উল্লাসের দ্বারা আলোড়িত, পীড়িত। এই পীড়নের চিত্র রয়েছে তপোবিজয়ের গল্পে। এইসব গল্পের অনেকগুলিতেই তাঁর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। তাঁর গল্পগুলিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি : (১) প্রেমের গল্প, (২) সংগ্রামের গল্প, (৩) অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবিরাম সংগ্রামের গল্প। প্রায় সব গল্পেই মিশে আছে তপোবিজয়ের প্রগাঢ় মানবপ্রীতি আর বলবানের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রবণতা।

(১) প্রেমের গল্প : তিনি এধরনের গল্প নির্মাণ করেছেন সাধারণ মানুষকে নিয়ে। তাই সে সব গল্প মিশে আছে সমকালের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ পরিবেশ। আবার কেবলমাত্র প্রেমের অপরূপ প্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অনেক গল্পে। প্রথম শ্রেণির গল্পের উদাহরণ 'এখন প্রেম'। একাত্তরের প্রবল সন্ত্রাসের আবহ গল্পটির পটভূমি। কেরানি সীতেশ আর স্কুলশিক্ষিকা কৃষ্ণা অনেকদিন ধরেই পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু সংসারের নানা কর্তব্যের চাপে বিয়ে করে উঠতে পারেনি তারা। সীতেশের মতে—'সার্কাসে দেখোনি? একটা সরু তারের ওপর দিয়ে ছাতা হাতে মেয়েরা কেমন সন্তর্পণে হেঁটে ওপারে পৌঁছে যায়? আমাদের বাঁচাটাও তেমনি, রকমারি সমস্যার সরু তারের ওপর দিয়ে হাঁটা-চলা, বেড়ে ওঠা। আর ওই রঙচঙে ছাতাটা আমাদের ভালোবাসা, জীবনের ব্যালান্স রাখে!'

মাসের প্রথম রবিবারে কৃষ্ণাকে নিয়ে সীতেশ সিনেমা দেখে। এটাই তাদের একমাত্র বিনোদন। এক রবিবার কৃষ্ণা আসতে পারে না নির্দিষ্ট স্থানে। টিকিট বিক্রি করে হতাশ ক্রুদ্ধ সীতেশ ফিরে যায়। পরের দিন তার অফিসে আসে কৃষ্ণার ফোন। বোমাবাজি খুনোখুনি পুলিশি তাণ্ডব চলেছিল পাড়ায়। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বাস, তাই সে আসতে পারেনি। রাতে আবার শুরু হবে। তাই আজও সে আসবে না। অফিস ছুটির পরে সীতেশ কী মনে করে যায় কৃষ্ণাদের বাড়ি। কৃষ্ণা সীতেশকে দেখে আনন্দিত হয় না। বরং গম্ভীর হয়ে তিরস্কার করে বলে তার আসা উচিত হয় নি। তার ভাই মন্টু আর তার বন্ধুরা অনেকেই চলে গেছে পাড়া ছেড়ে। কারণ রাজনীতি করে বলে পুলিশের খাতায় নাম আসে মন্টুর। সীতেশ ঠিক করে চা খেয়েই চলে যাবে সে। কিন্তু কৃষ্ণা চা নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় বোমার শব্দ, নিভে যায় রাস্তার আলো। তবুও সীতেশ যেতে উদ্যত হয়। তখনই শোনা যায় গুলির শব্দ। শোনা যায় খুন হয়েছে পুলিশ, থানায় পড়েছে বোমা। মিলিটারি কারফিউ জারি করে ঘিরে ফেলেছে এলাকা। এবার শুরু হয় চিরুনি তল্লাসি। কৃষ্ণা আর তার মা দুজনেই তাকে থেকে যেতে বলে। গোলমাল বাড়তে থাকে। কৃষ্ণা মা আসন্ন সেনাতল্লাসির আশঙ্কায় সীতেশকে অবলম্বন বলেই মনে করেন। মন্টুর ঘরে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হয় সীতেশের। কৃষ্ণা জল দিতে আসে সে ঘরে। তখন বাইরে নেমেছে নীরবতা। দুজনে এই নির্জনতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চায়—'একটি ওষ্ঠাধর আরেকটি ওষ্ঠাধরের কাছে এসে পৌঁছায়....'' তখনই গর্জে ওঠে রাইফেল, শোনা যায় আকুল তীব্র চিৎকার। ভীত কম্পিত কৃষ্ণা ছিটকে সরে যায়। জানলা দিয়ে পুলিশের গাড়ির সার্চ লাইটের আলো দেখা যায়। আবার বোমা আর রাইফেলের শব্দ ওঠে। তারপরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে শোনা যায় বুটের শব্দ। দেখা যায় ছুটে আসছে কয়েকজন পুলিশ। তাদের হাতে রাইফেল, মুখে জান্তব উল্লাস। তাদের দুজন থ্যাঁতলানো-মুখ এক তরুণের রক্তাক্ত দেহ দুপা ধরে টানতে টানতে আনছে। রাস্তার পিচে রক্তের ছাপ ফেলে 'ঘষা খেতে খেতে' আসছে তার মাথা। গাড়ির মধ্যে তারা ছুঁড়ে দেয় তার দেহটি। সম্ভবত ছেলেটা তখনও মরেনি। তাই শোনা যায় তীব্র ক্রুদ্ধ একটা গোঙানি। এই ভয়ানক দৃশ্য দুজনের মন থেকে মুছে দেয় মধুর প্রেমের অনুভূতি। প্রবল ভয় আচ্ছন্ন করে তাদের। সারা রাত তারা কোনো কথা বলে না। ''সাররাত্রি পরস্পরের দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। ঠান্ডা নীল পাংশু মুখে শক্ত কঠিন শরীর নিয়ে এই দুই যুবক-যুবতী ভাঙাচোরা বাড়িটার তিনতলার একটি অন্ধকার ঘরে সারারাত্রি তন্দ্রাহীন নির্ঘুম চোখে নিঃশব্দে বসে থেকে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

'' ১৩৭৮-এর 'শারদীয় লেখা ও রেখা' পত্রিকায় মুদ্রিত গল্পটিতে ভয়ংকর সেই সময়ের বাস্তব-আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে।

'রক্ত-বিষয়ক' কিন্তু কেবল প্রেমচেতনার গল্প। প্রেমের জটিল মনস্তত্ত্বগত রূপায়ণ গল্পটিকে বিশিষ্ট করেছে। সমরেশ এক বিবাহিত যুবক তিন-চার মাস বাদে বাদে নিয়মিত রক্ত দান করত। তার ব্লাড গ্রুপ ছিল 'ও'। এই গ্রুপের রক্ত সব গ্রুপের রক্ত বহনকারীর শরীর গ্রহণ করে। তাই তাদের বলা হয় ইউনিভার্সাল ব্লাড ডোনার। প্রতিবার রক্ত দেওয়ার পর তার মুখে দেখা যেত মুগ্ধ আবেশ নতুবা মহান কর্তব্য সম্পাদনের তৃপ্তি। গল্পের বক্তা ছিল তার বন্ধু। তার একান্ত অনুরোধে সমরেশ জানায় তার এই রক্তদানের উৎসকথা। কলেজে পড়ার সময় সে ভালোবেসেছিল সহপাঠিনী জ্যোৎস্নাকে। সেই তার প্রথম প্রেম। সেই সুন্দরী মিষ্টি মুখের মেয়েটি প্রায়ই অসুখে পড়ত। একবার এক জটিল মেয়েলি অসুখে তার শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে যেতে থাকে। হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাকে। কিন্তু রক্ত বন্ধ হয় না। জ্যোৎস্নার গ্রুপের রক্ত পাওয়া যায়নি। হাসপাতালে রক্তের স্টকও ছিল না। শেষ পর্যন্ত তার রক্ত দেওয়া হয় জ্যোৎস্নাকে। সে রক্তের পরিমাণ ছিল কয়েক বোতল। তারপরেও কয়েকবার জ্যোৎস্নাকে রক্ত দিয়েছে সে। এটাই তার প্রথম রক্ত দান। সুস্থ হয়ে জ্যোৎস্না তাকে বলেছিল তার দেহের অর্ধেক রক্তই সমরেশের। সমরেশের সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়নি নানা কারণে, বিয়ে হয়েছিল অন্য একজনের সঙ্গে।

এর বছর পাঁচেক পরে জননী জ্যোৎস্নার সঙ্গে ট্রেনের মধ্যে দেখা হয় সমরেশের। জ্যোৎস্না তার শিশুপুত্রকে সমরেশের কোলে তুলে দিয়ে তার হাত ছুঁয়ে নরম গলায় বলেছিল—''....শুধু আমার শরীরে না, এই শিশুর শরীরেও তোমার রক্ত আছে! আমি সেসব কথা ভুলিনি। রক্ত তো এক দেহে থেমে থাকে না, বংশ ধারায় গড়িয়ে চলে....এজন্যই রক্তের ঋণ কখনো শোধ হয় না....'' জ্যোৎস্নার এই আবেগময় স্বীকৃতি সমরেশকে আপ্লুত করে দিয়েছিল আশ্চর্য এক বেদনা আর আনন্দের মিশ্রিত অনুভূতিতে। জ্যোৎস্নার চোখে ঝরেছিল জল। তারপর থেকেই সে হয়ে উঠেছে নিয়মিত রক্তদাতা। কারণ পরে রীতাকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও প্রথম প্রেম ভুলতে পারেনি। রক্তদানের মধ্য দিয়ে সে যেন তার সেই আদি প্রেমকে ফিরে ফিরে বারে বারে নতুন করে পায়।

১৯৮২-র 'শারদীয় সত্যযুগ'-এ প্রকাশিত এ গল্পের মতো আবেশস্নিগ্ধ প্রেমের গল্প তপোবিজয় কমই লিখেছেন।

(২) **শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনি :** এই ধরনের গল্পে গ্রাম আর শহর, দলীয় আর ব্যক্তিগত উভয়বিধ সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ প্রাণময় বিবরণ আছে, মানুষের প্রতি তপোবিজয়ের গভীর মমত্ববোধ গল্পগুলিকে করে তুলেছে হৃদয়স্পর্শী।

সংগ্রাম ও প্রতিবাদের গল্প : একাত্তরের নকশালবাড়ি আন্দোলনের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা আলোচনা হয়েছে এবং এখনও তা থেমে যায়নি। তবে এসত্য স্বীকার করতেই হবে আন্দোলনটি বহু যুগ ধরে নির্যাতিত দীন শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রতিবাদী মানসিকতা জাগিয়ে তুলেছিল। বর্তমানে এপার বাংলার কৃষিশ্রমিকদের অবস্থা পরিবর্তনের মূলে ওই আন্দোলনের পরোক্ষ ভূমিকা অস্বীকার করতে পারে না কেউ। রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় যোগ ছিল তপোবিজয়ের। তাই তাঁর ছোটো গল্পে সেই সময়ের গ্রাম ও শহরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দিকটি রূপায়িত হয়েছে নানাভাবে। আমরা দুটি গল্প আলোচনা করব। প্রথম গল্প 'টুকুন বউ'। এ গল্পে স্থানীয় জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামের নিম্নশ্রেণির মানুষগুলির রুখে দাঁড়ানোর চিত্র রয়েছে। ঘটনাস্থল বীরভূমের একটি গ্রাম। স্মরণীয় তপোবিজয়ের কৈশোর আর প্রথম তারুণ্যের কাল কেটেছিল বীরভূমে। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ আছে গল্পটির শ্রমিক মানুষগুলির সংলাপে আর পরিবেশ নির্মাণে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গিয়ে চালু হয়েছিল রাষ্ট্রপতির শাসন। গল্পের পটভূমি এই সময়। যুক্তফ্রন্টের আমলে গ্রামের কৃষিশ্রমিকেরা দখল করেছিল কিছু বেআইনি জমি। তার কিছু পেয়েছিল গল্পের নায়িকা বাউড়ি মেয়ে টুকুন বউ আর সিধু। রাষ্ট্রপতি শাসনকালে গ্রামের জোতদার করুণায় সিংহ মিথ্যে নালিশ করে কৃষকসমিতির বিরুদ্ধে। ফলে গ্রামে আসে সি.আর.পি। কৃষক-সমিতি ভেঙে, কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে, কিছু বাড়িতে আগুন দিয়ে তারা চলে যায়। পরদিন গাঁয়ের কৃষকসমিতির সব দরিদ্র মানুষ লাঠি, বর্শা, বল্লম

দা আর লাল নিশান নিয়ে বের করে মিছিল। মিছিলের সামনে দা নিয়ে ছিল টুকুন বউ কৃষকসমিতির নেতা বৃন্দাবনের পাশে। তারা আক্রমণ করে করুণাময়ের বাড়ি। বন্দুক হাতে বেরিয়ে আসে তার বড়ো ছেলে মণিময়, সঙ্গে দুই ভাই, ছোটোমামা ব্রজেশ্বর আর কিছু আশ্রিত। সবাই সশস্ত্র। কিছু কথাকাটাকাটির পর বন্দুক চালায় মণিময়। আহত হয় বৃন্দাবন। সঙ্গে সঙ্গে মিছিলের মানুষ আক্রমণ করে তাদের। টুকুন বউ দা-এর প্রথম আঘাতে কেটে দেয় ব্রজেশ্বরের ডান হাত। দ্বিতীয় আঘাত পড়ে ব্রজেশ্বরের মাথায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ব্রজেশ্বর। টুকুন বউ-এর রুদ্র মূর্তি চমকে দেয় মিছিলের মানুষদের। পরদিন এল সি.আর.পি.। পুরুষেরা পালিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে। বাচ্চা আর মেয়েদের আক্রমণ করল তারা। টুকুনের ঘর দিল পুড়িয়ে। করুণাময়রা তাদের ট্রাকে তুলে দিল বিদেশি পানীয়ের বাক্স।

সকালে ফিরে এল পলাতকেরা। অত্যাচারের দৃশ্য দেখে তারা ভয় পেল না। বরং টুকুন বউয়ের নেতৃত্বে বাবুদের ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে, তাদের খামার থেকে খড় নিয়ে তারা পোড়া ঘর নতুন করে তৈরি করে নিল। বাবুদের ধান লুট করল। তৈরি হল মুখোমুখি আক্রমণের জন্য। মণিময়, ব্রজেশ্বর ভালো হয়ে উঠল হাসপাতালে। তবে ব্রজেশ্বরের ডান হাত কেটে বাদ দিতে হল। আর মাথায় আঘাতের ফলে সে হয়ে গেল মূক ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। মূল কাহিনিটিকে এখানে থামিয়ে দিয়ে লেখক ফিরে গেছেন ঘটনার পশ্চাৎপটে। বলা দরকার গল্পটি উত্তমপুরুষে উপস্থাপিত। ব্লকডেভলাপমেন্ট অফিসের কর্মী হিসেবে বক্তা স্ত্রী সুধাকে নিয়ে কিছুদিন ছিলেন সেই গ্রামে। তখনই তাঁর পরিচয় হয় বিধবা বাউড়ি বউ টুকুনের সঙ্গে। টুকুন বউ অতি পরিশ্রমী নারী। কখনও সে বসে থাকে না। কিন্তু তার জীবনে ঘটেছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী টুকুন যখন পাঁচ মাসের গর্ভবতী তখনই সে বিধবা হয়। আর তখনই ব্রজেশ্বর তাকে জোর করে ধর্ষণ করে। ফলে তার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। টুকুন ভোলেনি সেই শোক। তাই ব্রজেশ্বরকে মারার পর সে তার রক্তাক্ত দেহ পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বিকারগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে বলেছিল 'বুলি নাই, একদিন শোধ লিব! এই দেখ লিলম! লে ইবারে গুলি কর, জিবটা টেনে ছিঁড়ে লে, গতরে কত জোর হলছে সব্বাইকে দেখা—''

হয়তো নিপুণ বিশ্লেষণে এ ভাষার মধ্যে ধরা পড়বে কিছু ত্রুটি। কিন্তু একটি নির্যাতিতা শ্রমিক-নারীর ক্রোধ এ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। গল্পটি সম্বন্ধেও আমরা একথাই বলতে পারি। শৈল্পিক বিচারের নিখুঁত নয় এ গল্প। কিন্তু মানবমনের সুনিপুণ উপস্থাপনায় আর বিদ্রোহের প্রবলতার বস্তুনিষ্ঠ সজীব রূপায়ণের জন্য গল্পটি হয়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১-এর 'শারদীয় উত্তরযুগ'-এ প্রকাশিত গল্পটিকে তাই সহজে ভুলতে পারা যায় না। মধ্যবিত্তশ্রেণির সমষ্টিগত প্রতিবাদের একটি নিপুণ উপস্থাপনা হিসেবে নাম করা যায় ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের (১৯৭১) 'লেখা ও রেখা' পত্রিকায় মুদ্রিত 'কপাটে করাঘাত' গল্পটির। এগল্পে শাসকশ্রেণির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কেমন করে দানা বেঁধেছে এক প্রৌঢ়ের মনে এবং তা তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন কাছের মানুষগুলির মধ্যে তারই কথাচিত্র পাই আমরা।

বিশাল একটি বাড়ির ঘরে ঘরে ভাড়া থাকত নানা ধরনের নানা বৃত্তির মানুষ। একাত্তরের উন্মাদ সময়ে যখন পথে-ঘাটে পড়ে থাকত তরুণদের শব তখন; বিপ্লবীদের ভয়ে সবাই মিলে বাড়ির সদর দরজায় লাগায় নতুন কপাট। কিন্তু একদিন মাঝরাতে পুলিশ এল সেই বাড়িতে। বাসিন্দাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়ে তারা তিন তলার ভুবন মাস্টারের বড়ো ছেলেকে চুলের মুঠি ধরে পশুর মতো ধরে নিয়ে যায়। পরের দিন এ বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি মাঠ আর পুকুরের মাঝখানে আর একটি তরুণের সঙ্গে দেখা যায় তার গুলিবেঁধা মৃতদেহ। ছেলেটি নাকি ছিল নকশালপন্থী বিপ্লবী। এত সবের উৎস পাড়ায় পুলিসের চর এক দাগি গুন্ডার হত্যা। শোকে-দুঃখে-ভয়ে বিমূঢ় হয়ে যায় বাড়ির মানুষগুলি। তার পরেও তারা শঙ্কিত মনে প্রতি রাতে শোনে বোমা, ক্র্যাকার রাইফেলের শব্দ। যখন বোঝা যায় বাড়ির আশপাশে উঠছে না পুলিশি বুটের শব্দ তখন তারা '.....অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে অথচ বুকের গভীরে সন্দেহজনক একটা আতঙ্ক গোপন রেখে আবার ঘুমিয়ে...' পড়তে চায়। তার কিছু দিন পরে আবার

নড়ে ওঠে সদর দরজার কড়া। সে শব্দে ঘুম ভেঙে যায় বয়স্ক ভূধরবাবুর। রাত তখন আড়াইটে-তিনটে। হয়তো সবাই জেগেছে, শুনেছে সবাই কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

এবার দরজায় ঘন ঘন পড়ে ক্রুদ্ধ লাথি। আর এতক্ষণ ধরে ‘‘.....ভয় পেতে পেতে এখন ভয়ের অনুভূতিটাই যেন ভোঁতা হয়ে....’’ যায় ভূধরবাবুর। আলো জ্বালেন তিনি। তাঁর মনে হয় সেবার যদি বাড়ির সব বাসিন্দা জোট বেঁধে ছেলেটার সঙ্গে থানায় যেত, প্রমাণ চাইত, মামলা করার দাবি জানাত তাহলে কি অমন করে মরত তরুণটি। অন্তত সব জানাজানি তো হত! আজ কপাটে করাঘাত কার জন্য? কার ছেলেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা? কোন ঘরের?

ভুবন মাস্টারের ছেলের রক্তমাখা মুখটা মনে পড়ল আবার। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলের। তিনি যেন শুনতে পান ভুবন মাস্টারের স্ত্রীর কান্না। তিনি শক্তহাতে খোলেন দরজা। দরজার খিল হাতে নিয়ে বাইরে এসে ‘‘....অস্থির উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে ডাক দিলেন, ‘কে দরজা ধাক্কায়? কে? আমি ভূধর বলছি, ওঠো দেখি তোমরা, ওঠো সব...’’ অসহায়ের মতো অত্যাচার সহ্য করা নয়, সংহত শক্তিতে নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যঞ্জনায় গল্পটি হয়ে উঠেছে ঐক-প্রতীতিতে সংহত সফল ছোটোগল্প।

(৩) সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক সংগ্রামের কাহিনি :

‘সময় আমার সময়’ মুদ্রিত হয় ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের (১৯৭৯) ‘শারদীয় ক্রান্তিক’ পত্রিকায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের টিকে থাকার, কষ্টক্লিষ্ট জীবনধারণের দিকটি গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে নতুন একটি আঙ্গিকে। কাল অর্থাৎ সময় সর্বদা মানুষকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই দার্শনিক সত্য মনে করায় গল্পটি।

গল্পের নায়ক শিবেন কলকাতার কলেজে পড়তে আসার সময় বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল তাঁর পুরোনো হাতঘড়ি। সঠিক সময় দেওয়া সেই ঘড়িটি নিয়ে সংসার-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিল সে। বিয়ে করেছিল সুধাকে।

আজ শিবেন দরিদ্র এক কেরানি। ঘড়িটি আর দেয় না সঠিক সময়। ফলে শিবেনের অফিসে পৌঁছোতে দেরি হয় প্রায়ই। দেশে জরুরি অবস্থা চলেছে। ফলে ‘‘জরুরি অবস্থায় জারি-করা মহারানির হুকুমনামা মেনে সেনসাহেবের বিশ্বস্ত অনুচর ঘোষালমশাই হাজিরাখাতা তাঁর টেবিলে পৌঁছে দিয়েছেন। লাল কালিতে পাকাপাকি এবসেন্ট মার্ক পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।’’ অথচ মাইনে তার কম। ওভারটাইম, সকাল-সন্ধ্যা টিউশনি করেও সামলাতে পারে না সে। উপার্জনের চারদিক ঘিরে খরচ-খরচার কালো হাত কঙ্কালের মতো থাবা নাচিয়ে কেবলই চিৎকার করছে। ‘‘আরো আনো, আরো চাই।’’ সেই হাড়ের আঙুলের শব্দে ভয় পেয়ে তার ‘‘....সুখের বাসা থেকে ভালোবাসার পাখিরা দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। .....সমস্ত সংসার ঘিরে ফণিমনসা আর কাঁটাগাছের ঝোপ প্রতিমুহূর্তে বেড়ে উঠছে!’’

এদের ঠেকাতে হলে বাড়াতে হবে উপার্জন। আর উপার্জন বাড়ানোর জন্য চাই সময়। ‘সময়কে বাঁধা দিয়ে তবেই তো উপার্জন।’’ তার একটুও অবশিষ্ট রাখেনি সে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সময়ের কাছে সে বলি প্রদত্ত। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আলাপ তো দূরের কথা নিজের আত্মজদের নিয়ে নিজের মতো করে একটু অবসর-যাপনের সময়ও তার নেই। নির্দিষ্ট সময়ের ট্রেন ধরার জন্য সে ভিখিরি শিশুর বাটি উলটে মানুষের পা মাড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে ট্রেনের ভিড়ে নিজেকে ছুঁড়ে দেয়। কটু মন্তব্য তাকে গ্রাস করে। সে ভাবে ভিড়ের মানুষগুলোর স্বার্থপরতার কথা। সে কারও জামা আঁকড়ে, কারও হাত ধরে, দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। পারে না। কারণ অফিসযাত্রী সবাই। তাদের সবার মাথার উপর ভারতরক্ষা-আইন, বিশ দফা কর্মসূচি আর জরুরি অবস্থার খাঁড়া।

তবুও প্রায়ই লেট হয় শিবেনের কারণ তার ঘড়ি পুরোনো; সঠিক সময় আর দিতে পারে না। আর নতুন ঘড়ি কেনার সামর্থ্য তার নেই। তাই প্রতি মুহূর্ত তাকে বিদ্ধ করে এসব প্রশ্ন কেন এমন হবে? কার? কার কাছে তার অপরাধ? কার রক্তচক্ষু তার ভালোবাসার সংসার ভেঙে দিচ্ছে? মিলছে না ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল। গল্পের শেষে

দেখি ধীরে চলা ঘড়ির জন্য সময়কে ধরতে পারেনি শিবেন। তবুও চাকরি বজায় রাখার জন্য দম বন্ধ করে তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ছুটে সব ভুলে সে ঝাঁপ দেয় চলন্ত নির্দিষ্ট ট্রেনের শেষ কামরার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় বহু মানুষের চিৎকার; শিবেনের শরীর আধখানা বাইরে, আধখানা ভেতরে। তবু সে অনুভব করে সে পড়ে যাচ্ছে না অনেকগুলো হাত সবলে টেনে তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। তাকে দাঁড়াবার জায়গা করে দেয়। বোধহীন ইন্দ্রিয় মন সক্রিয় হওয়ার পর সে শুনতে পায় সমবেদনা আর সহানুভূতি-মিশ্রিত বহু কণ্ঠের তিরস্কার। সে বুঝতে পারে আজ কয়েক মুহূর্তের এদিক-ওদিক হলেই সে হয়ে যেত একতাল মাংসপিণ্ড। সময় এবার তার অস্তিত্ব গ্রাস করার জন্য হাঁ করে আছে। তখনই সে ঠিক করে সময়ের এই ঘড়ি সে ভাঙবে। তখনই সে যেন দেখতে পায় সময়ের ব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় রূপ। তার মনে হয় সে কি পারবে হিংস্র সময়ের এই চক্রান্ত চূর্ণ করতে। ট্রেনের ধাতব ইস্পাতের চাকায় সে যে শুনতে পায় 'শব্দ ঠিকরে উঠছে, পারব, পারব কি, পারব, পারব কি; পারব, পারব কি....ভয়ে আনন্দে উত্তেজনায় উদ্বেলিত অস্থির শিবেন সংশয় ও প্রত্যয়ের আবেগে গলতে গলতে অসংখ্য মানুষের ভিড় মানুষের মমতা ও উত্তাপে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল'।

ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ গল্পটিতে সময়কে যারা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে; সমবেত শক্তিতে তার চক্রান্ত ভেঙে ফেলার প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে ইঙ্গিতময় ভাষায়। এ কাহিনি লেখকের মানবশক্তিতে দৃঢ় প্রত্যয়ের কাহিনি।

অসহায় মানুষের, সাধারণ মানুষের টিকে থাকার প্রাণপণ প্রয়াসের একটি অনবদ্য চিত্র 'সীতানাথের বাজার'। অজস্র ভোগের উপাদান থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে সে সব মানুষকে শুধু দৃষ্টিভোগেই তৃপ্ত থাকতে হয় তাদেরই একজন বৃদ্ধ সীতানাথ। যাদের সাধ আছে অথচ সাধ্য নেই সেই মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধি সীতানাথ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সীতানাথ অবসর নিয়েছেন সতেরো বছর আগে। তিন ছেলের একজন ছাঁটাই হয়ে বেকার। বড়ো ও মেজো ছেলে বিবাহিত। স্ত্রী লাবণ্য মারা গেছেন। ছেলে আর ছেলের বউরা তাঁকে তেমন গ্রাহ্য করে না।

এক বিকেলে মুড়ি খেতে চেয়েছিলেন ক্ষুধার্ত সীতানাথ। দাঁতের ব্যথা বেড়ে গেছে বলে সেদিনের জলখাবার রুটি খাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেউ গ্রাহ্য করল না তাঁর কথা। কেউ দিল না সামান্য মুড়ি। তাই অনেকটা অভিমান নিয়ে তিনি বের হয়ে এলেন। তারপর ঘুরতে লাগলেন বাজারে। পুঁই ও পটলের শোভায় তিনি মুগ্ধ হলেন। ফুলকপি, বাঁধাকপি দেখে খিচুড়ি আর বাঁধাকপির তরকারি, ফুলকপির বড়া খাওয়ার স্বপ্ন দেখলেন। ডিমের দোকানে ডিম হাতে করে তাঁর মনে পড়ে কড়াইশুঁটি আর টমেটো দিয়ে রান্না ডিমের ঝোলের কথা। তরিতরকারির দোকানকে আজীবন দরিদ্র অতৃপ্ত-বাসনা সীতানাথের মনে হয় গয়নার দোকান। মাছের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ইলিশমাছ ভাতের গন্ধ পান তিনি। ''যেন অনেকদূরে কোথাও কচি কলাপাতায় সরষেবাটা মাখা ইলিশ ভাতে সেদ্ধ হচ্ছে। ঝোল থেকে উঠছে সোনামুখী কাঁচা লঙ্কার গন্ধ।''

শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ক্লান্ত সীতানাথ পরখ করার ছলে দুটি দোকানে চিঁড়ের বস্তার থেকে কাঁচা চিড়ে তুলে নিয়ে খেয়ে গেলেন। তারপর মাঝবয়সী এক গ্রাম্য মহিলার ডালা থেকে গুড় ভেঙে মুখে দিয়ে চমকে ওঠার ভান করে বলে 'আরে রামো! এযে তালগুড়, আমি ভাবলাম খেজুরের—'' মেয়েটি বিরক্ত হয়ে তিরস্কার করে। সে সব কানে আসে না সীতানাথের। তিনি স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকেন। 'এবার একটু জল খাবেন তিনি।' ১৩৭৫-এর 'শারদীয় চতুষ্কোণ'-এ মুদ্রিত নিরুপায় মানুষের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত জীবনের বেদনা গল্পটিতে যে নিরুচ্চার বিষণ্ণতার সঞ্চার করেছে—তা পাঠককে আপ্লুত করে।

তপোবিজয়ের মূল অবলম্বন বঞ্চিত মানুষ, অত্যাচারিত মানুষ। কখনও তাদের বেদনাজীর্ণ জীবনের ছবি ফুটেছে তাঁর রচনায়। কখনও এই মানুষগুলির প্রতিবাদ-ভাস্বর রূপচিত্র রচনা করেছেন লেখক। বিশেষ করে সত্তর দর্শকের নকশালবাড়ি আন্দোলন আর তা দমনের জন্য শাসকশ্রেণির সৃষ্ট সন্ত্রাস তাঁর অনেক গল্পের কেন্দ্রবিন্দু।

তাঁর গল্পে গ্রাম আর গ্রামের মানুষ যেমন আছে তেমনই আছে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ আর তাদের নাগরিক জীবন।

তিনি সতত প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের গল্প লেখার প্রয়াসী ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, সত্তর থেকে সাতাত্তর—এদেশের রক্তাক্ত ভীতির দিনগুলিতে—'রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দর্শন অনুযায়ী সাধ্যমত চেষ্টা করেছি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সাহিত্য-রচনার।'' 'ভূমিকা', তপোবিজয় ঘোষ, 'কালচেতনার গল্প'। কিন্তু এই রাজনৈতিক আদর্শ তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি।

ভাষা-বৈশিষ্ট্য ঃ তপোবিজয়ের গল্পের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতায় উজ্জ্বল। চরিত্রের সংলাপে আছে স্বাভাবিকতা। 'বাসুদেব এবং ইত্যাদি' গল্পের চরিত্রগুলি বীরভূমের মানুষ। তাদের ভাষায় আছে সেই আঞ্চলিক স্বাভাবিকতা। যেমন বাসুর সংলাপ ''মুনিষ বটে বাবু প্যাটে ভাত জুটে না ঘড়ি কুথাকে পাব? ওই-ওটাই আমাদের ঘড়ি বটে। '' বলে 'কাঁসার থালার মতো টকটকে সূর্যটা দেখিয়ে দেয় বাসু।'' সূর্যকে নানাভাবে দেখেছেন আবহমান কালের শিল্পীসাহিত্যিক। কিন্তু গ্রাম্য শ্রমিকের দৃষ্টিতে মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য ঝকঝকে কাঁসার থালার মতো, এ তুলনাটি স্বাভাবিকতার সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। প্রখর রাজনৈতিক বোধ আর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল শিল্পীমানস—উভয়ের সুমিত অন্বয়ে গড়ে উঠেছে তপোবিজয়ের গল্পগুলি। তাই অনেক সময় গল্প-ভাষায় এসেছে কবিতার স্পন্দন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'রক্তবিষয়ক' গল্পে তারই রক্তদানে বেঁচে ওঠা প্রাক্তন প্রেমিকার সন্তানকে কোলে নিয়ে নায়ক সমরেশের অনুভবের কথা—''রক্তের মধ্যে যেন হাজার ফুল ফুটেছিল, হাজার পাখির গান বেজে উঠেছিল, নদীতে বান ডাকার মতো কলকল শব্দে একটা খুশির জোয়ার বইতে শুরু করেছিল.....অথচ ভেতরে ভেতরে গভীর বেদনা, অসম্ভব একটা কষ্ট, বড় যন্ত্রণা!''

প্রায়শ তাঁর গল্পের শেষে দেখা যায় মহৎ কোনো অনুভূতির; উদার মানবিকতার সত্যের উজ্জ্বল উদ্ভাস। কিন্তু তার ফলে তাঁর গল্পের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে কমক্ষেত্রেই। এইসব কারণে প্রায় শতাধিক গল্পের লেখক তপোবিজয় ঘোষকে বাংলা ছোটো গল্পের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়।

৫.১৯ দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯-)

পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট গল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম ১৯৩৯-এর ৫ মার্চ। জন্মস্থান ভাগলপুর (বিহার)। আদি বাস বাঁকুড়ার বেতুড় গ্রামে। বগলাচরণ-নীহারবালার সন্তান দিব্যেন্দু পিতৃবিয়োগের পর একবারই ওই গ্রামে গিয়ে দু রাত বাস করেন। এছাড়া গ্রামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। এগারোটি ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম দিব্যেন্দুর শিক্ষা শুরু ভাগলপুরের দুর্গাচরণ হাইস্কুলে। মাড়োয়াড়ি কলেজ (ভাগলপুর) থেকে অর্থনীতি ও বাণিজ্যে স্নাতক দিব্যেন্দু তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. করেন ১৯৬১-তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

১৯৫৮-তে পিতার মৃত্যুর পর দিব্যেন্দু চলে আসেন কলকাতা। তখন জ্বালানি ব্যবহারের সমীক্ষা কর্মী, অডিট ফার্ম-এ দৈনিক বেতনে অ্যাসিস্ট্যান্ট—প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ করেছেন। যথার্থ কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিক রূপে বর্তমানে লুপ্ত ইংরেজি দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে ১৯৬১-তে। ১৯৬৫-তে তিনি গ্রহণ করেন বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজ। এই কাজের সূত্রে তিনি বহুদিন কাজ করেন 'ক্লারিয়ন-ম্যাকান অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস, 'আনন্দবাজার' সংস্থা, 'দি স্টেটসম্যান'-এর সঙ্গে। এই সূত্রে কিছুদিন 'অমৃতবাজার', 'যুগান্তর'-এ কাজ করে ছিলেন। ১৯৭৭-এ তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সিনিয়র অ্যাসিস্টান্ট এডিটর হিসেবে কাজে যোগ দেন। দীর্ঘকাল তিনি এ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অল্প বয়সেই তাঁর রচনাকর্মের সূচনা। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প 'ছন্দপতন'। প্রকাশিত হয়েছিল ৩০ জানুয়ারি ১৯৫৫-তে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয়-এর প্রথম পৃষ্ঠায়। ভাগলপুরের মাড়োয়াড়ি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র দিব্যেন্দুর বয়স তখন ষোলো পূর্ণ হয়েনি। পরের বছর সাপ্তাহিক 'দেশ'-এর ১০ চৈত্র, ১৩৬২ সংখ্যায় (১৯৬৫)

মুদ্রিত হয় 'নিগম' গল্পটি। এরপর আরও কিছু গল্প কলকাতার নানা পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। সব গল্পই তিনি ডাকে পাঠিয়ে দিতেন।

১৯৫৮-তে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এসেছিলেন দিব্যেন্দু। এর ফলে তাঁর লেখা হয়েছিল আরও নিয়মিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পাঠকালে ১৯৬০-এ মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম গল্প-গ্রন্থ 'শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি'।

গল্প ভিন্ন দিব্যেন্দু উপন্যাস, কবিতা এবং প্রবন্ধ দক্ষতার সঙ্গে রচনা করেছেন। চলচ্চিত্র আর নাটকের নিপুণ সমালোচক দিব্যেন্দুর অনেক গল্প ইংরেজি ও ভারতের নানা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। দূরদর্শন ও বেতারেও তাঁর কিছু গল্প প্রচারিত হয়েছে অবশ্যই রূপান্তরে। মুদ্রিত হয়েছে 'দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি', 'স্টেটসম্যান' এবং অন্যান্য পত্রিকায়। সাহিত্যসূত্রে বেশ কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণও করেছেন এই লেখক। ১৯৯২-এর সার্ক (SAARC) সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করেন দিব্যেন্দু পালিত। এই সব বিদেশ ভ্রমণের ছাপ পড়েছে তাঁর সাহিত্যে।

এখন তাঁর ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রকাশিত গল্পসংকলন সমূহের একটি তালিকা সন্নিবেশিত হল।

১) 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি', ১৯৬০
২) 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', ১৯৭৩
৩) 'প্রিয়জন', ১৯৭৭
৪) 'মূকাভিনয়', ১৯৮২
৫) 'চিলেকোঠা', ১৯৮৩
৬) 'শুক্রে শনি', ১৯৮৪
৭) 'আলমের নিজের বাড়ি', ১৯৮৪
৮) 'রুথ ও অন্যান্য গল্প', ১৯৮৮
৯) 'রাইন নদীর জল', ১৯৮৮
১০) 'মুখগুলি', ১৯৮৮
১১) 'দিব্যেন্দু পালিতের ছোটোগল্প', ১৯৯২
১২) 'রজত জয়ন্তী', ১৯৯২
১৩) 'দুই নারী', ১৯৯৩
১৪) 'পুরুষ', ১৯৯৪
১৫) 'হিন্দু', ১৯৯৪
১৬) 'গ্রহণ পূর্ণিমা', ১৯৯৬

গল্প-বৈশিষ্ট্য ঃ সমকালে সমাদৃত হয়েছিলেন দিব্যেন্দু পালিত। ১৯৬০-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ছোটোগল্প সংকলন 'সিন্ধুর স্বাদ'-এ অন্তর্ভুক্ত হয় তাঁর ছোটোগল্প। তাঁর প্রথম গল্প সহ প্রথম দিকের বহু গল্প মুদ্রিত হয় 'দেশ' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। 'দেশ' আর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রচারসংখ্যা বাংলা পত্রপত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। দিব্যেন্দু যখন লিখতে শুরু করেন তখন বেশ কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রশংসিত লেখক 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই বিশেষ পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনা-সমালোচনায় দিব্যেন্দু হয়ে উঠেছিলেন আত্মবিশ্বাসী। তাই অল্প বয়সেই তিনি সাহিত্যরচনার নিজস্ব ভুবন গড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিষয় আর প্রকরণ নিয়ে তাঁর ছোটোগল্প হয়ে উঠেছিল বিশিষ্ট। সমকালের বিশিষ্ট গল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতে—''ইমোশন ওর লেখায় কমই থাকে। ...খামোখা জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টায় নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়নি কখনো। তাই প্রতিটি গল্পে এবং উপন্যাসে সে তার একক নিঃসঙ্গ পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারছে।''

দিব্যেন্দুর নিজের কথায় ''আমার প্রথম প্রকাশিত বা প্রথম দিকের রচনার সঙ্গে কোনো পরিশীলিত মন ও পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির সম্পর্ক ছিল বলে মনে করি না। তাদের পিছনে যত আবেগ সবই ছিল কৈশোরক এক ধরনের শখ থেকে উদ্‌ভূত।'' ('কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান' ১ম প্রকাশ 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৩ পরে 'সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)।

এখানে তিনি আরও বলেছেন, প্রথম মুদ্রিত গল্প 'নিয়ম'-এর ভাষাবিন্যাসে সুবোধ ঘোষের প্রভাব ছিল। সম-সময়ের অন্যান্য খ্যাতনামা গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রও তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। পরে কেবল বিমল করের প্রভাবই প্রবল ছিল। এরপরে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কোনো লেখকের হয়ে ওঠার স্তরগুলি—''খুব কম লেখকই আছেন যাঁরা সাহিত্য জীবনের সূচনায় কোনো-না কোনো প্রভাব ছাড়াই উপস্থিত করেন নিজেকে কিন্তু অভীপ্সা সৎ হলে একদিন-একদিন তাঁকে ভাবতেই হয় পরিবর্তনের কথা, নিজস্ব উপলব্ধির কথা। এই ভাবনার সময়টা সোজা সিঁড়ি ওঠার মতোই দুরূহ—এই পথে এসে হাল ছেড়ে দেন বা হাঁকিয়ে ওঠেন এমন লেখকের সংখ্যাও অনেক। আমার সান্ত্বনা আমি হাল ছাড়িনি; অন্যের ব্যবহৃত পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাকটি চিনে নেবার চেষ্টা করেছি প্রাণপণ—। ফলও যে পাইনি তা নয়। এরই ফলে সূচনার দিন থেকে এ পর্যন্ত আমি যা লিখেছি, তাকে পরিষ্কারভাবে ভাগ করা যায় দুটি পর্বে—১৯৬৪-৬৫'র আগে এবং ওই সময়ের পরে। ভালো হোক বা মন্দ, দ্বিতীয় পর্বের রচনাগুলি যে একান্তভাবেই আমার পরিবর্তনের চিহ্ন বাহক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।'' এভাবেই সচেতন চেষ্টায় নিজেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছেন দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু পালিতের ছোটোগল্পের অন্যতম বিশেষত্ব নগর-মনস্কতা। তিনি প্রথম যৌবনে অর্থাৎ গড়ে ওঠার বয়সে এসেছিলেন নগর কলকাতায়। তাই তাঁর অনুভূতিপ্রবণ চেতনা কলকাতার নাগরিকতাকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল। সভ্যতার ইতিহাসে নগর প্রায় সব সময়েই ছিল, কিন্তু ছিল না নগর-মনস্কতা। এই মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক বিপণন-ভিত্তিক সভ্যতার প্রভাবে জন্ম নিয়েছে।

যথার্থ নগরায়ণের বিশেষত্ব (১) আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। যেমন রেডিও দূরদর্শন, দূরভাষ এরা মানুষকে তার আবেষ্টন থেকে বের করে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। (২) নগরায়ণ তথা নাগরিক বোধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ। সব মানুষের নিজের জীবন নিজের মতো করে নির্মাণের অধিকার আছে। প্রত্যেকের আছে প্রাপ্য লাভের অধিকার। আপন ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ প্রতি মানুষের পাওয়া উচিত। ভারতে এসবই নীতি হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় গ্রামদেশে সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তিত রূপ, পরিবারতন্ত্রের চাহিদা, রাজনৈতিক সংগঠন—এরা সবাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমস্ত প্রাপ্যের অন্তরায়। তুলনায় নগরের মানুষ অনেক বেশি অধিকার-সচেতন। ব্যক্তিগত উচ্চাশা নিজস্ব নৈতিকতা, আপন কর্তব্য সম্বন্ধে কোনো চাপ তাকে ততটা দমিত করতে পারে না কারণ নাগরিক মানুষের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবল। এই স্ব-স্বাতন্ত্র্যবোধের গভীরতা থেকেই উঠে আসে নগর-মনস্কতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নিঃসঙ্গতাবোধ। এইসব নানা কারণে নগরের মানুষ একা হয়ে যায়। যেমন—সহায়হীনতার বোধ, জীবনের দ্রুততার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে না-পারার অক্ষমতা; উচ্চাশার অতিরেক এবং আত্মসচেতনতার প্রবলতা। এর সঙ্গে রাজনীতি এবং অর্থনীতি; বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন ও প্রবণতার ধারা সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

দিব্যেন্দু পালিতের বেশকিছু গল্পে আছে এই নাগরিক মানসিকতার ব্যবহার। অবশ্যই সেইসব গল্পের পটভূমি বহু ত্রুটি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নগর। 'সিঁড়ি' গল্পটির আলোচনা থেকে জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী অসীম-নীলার সংসার। তাদের বালিকা কন্যা টিনির উল্লেখ আছে কিন্তু গল্পে শিশুটি তেমন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। অসীম মাঝারি মাপের চাকরি করে। নীলাও চাকরি করে আর তার বস শ্যামলেন্দুর কামনাকে ব্যবহারের মাধ্যমে-উঠে যেতে চায় উপরে। অসীম শ্যামলেন্দুকে ঠিক পছন্দ করে না। তাই নীলার উপরও ক্রমে সে বিমুখ হয়ে ওঠে।

শ্যামলেন্দুর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, নিজের উচ্চাশা আর অসীমের বিরাগ—তিনি মিলে নীলা ঝুঁকে পড়ে বসের দিকে।

গল্পটিতে মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ আছে। এই মানসিকতাও আবার নগরায়ণের ফসল। টাকার বিনিময়ে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের ইচ্ছা রয়েছে নীলার। এই কামনা মধ্যবিত্তের নগরজীবনের অন্যতম শর্ত। কোনটা বিলাস-পণ্য আর কোনটা দরকারি বস্তু—তারও মাপকাঠি নগর-মনস্কতা। মেয়েরা যখন নিয়মিত কর্মে নিজেকে নিয়োগ করে তখন ফ্রিজ, গ্যাস, বিলাস-দ্রব্যের বদলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়ে ওঠে। আবার কর্মক্ষেত্রে নারী উন্নতির জন্য অভ্যস্ত নৈতিকতা থেকে সরে যাচ্ছে—এটাও নগরের সৃষ্টি। নীলার ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। স্বামীর সঙ্গে যে ফ্ল্যাটে এসেছে নীলা, তার সব আসবাব সে নিজেই কিনেছে, অসীমের উপর নির্ভর করেনি। নারীর অধিকার-সচেতনতা ভারতীয় স্বামী অসীমকে নিস্পৃহ করে তুলেছে। তার মনে এসেছে জটিলতা। পাশ্চাত্যে হয়তো এটা হত না। কারণ সেখানে নগর-মনস্কতা স্পষ্ট ও দৃঢ়। ভারতীয়রা এই নগর-মনস্কতার সঙ্গে চিরাগত অধিকারবোধের দ্বন্দ্বে বিক্ষত। নীলার ভাবনার একটি অংশ জিনিসটিকে আরও স্বচ্ছ করে দেয়—"মুখ ফুটে কোনওদিন কিছু না বললেও একটা অলিখিত শর্তে ইতিমধ্যেই সই দিয়েছে সে—শ্যামলেন্দু তার ওপরে ওঠার সিঁড়ি। এখন ওঠার মুখে তরতর করে উঠছে শ্যামলেন্দু সে এগোলে নীলাও এগোবে। তার মানে আরও টাকা, আরও সুখ, আরও স্বাচ্ছন্দ্য। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে সে দিশাহারা বোধ করতে চায় না। অসীমের এটা বোঝা উচিত।"

নীলার মতো মেয়ের অস্তিত্ব, যে উন্নতির জন্য নৈতিকতার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছে—বর্তমানের নগর-জীবনেই সম্ভব। মানুষের বিচিত্র মানসিকতা, নরনারীর সম্পর্ক-জটিলতা বার বার এসেছে দিব্যেন্দুর গল্পে। বিশেষ করে নগরবাসী উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের জীবন্ত ভাষা রূপ দিয়েছেন তিনি নিপুণভাবে। এদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতিটি স্তরকে তিনি অনুভবগাঢ়তার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। মনস্তত্ত্বের বিচিত্র জটিলতা তাঁর লেখাকে প্রায়শ বেদনাতুর করে তুলেছে। ঘটনা তাঁর গল্পে প্রধান নয়—প্রধান মানুষ এবং তার পরিবেশ। নাটকীয় চমকসৃষ্টি সাধারণভাবে দিব্যেন্দু গল্পের বিষয় করেননি। 'বাবা' এর ব্যতিক্রম। গল্পটিতে এক কিশোরীর বিপর্যস্ত মানসিকতা দিব্যেন্দুর শান্ত, শাণিত বিশ্লেষণ-মুখ্য ভাষায় প্রাণময় হয়ে উঠেছে। একটি কন্যাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সংসার। বাবার কারখানায় হয়েছে লক আউট। মায়ের চাকরির উপর নির্ভর করে আছে এই সংসার। ফলে শুরু হয় অশান্তি। ক্রমে তা বিচ্ছেদের দিকে গড়িয়ে যায়। বাবার সহায়হীন যন্ত্রণা কিশোরী কন্যাকে নিয়ত ক্লিষ্ট করে। বাবা শেষে বেছে নেয় আত্মহননের পথ। স্কুল ফেরত মেয়ে দেখে ফ্যানের রড থেকে ঝুলছে বাবার প্রাণহীন শরীর। তার মনে হয়—"বড় সুন্দর দেখতে লাগছে বাবাকে।" কারণ তার বাবা এখন প্রত্যহের অসহায় যন্ত্রণার আঘাত, হীনম্মন্যতার বেদনার পারে চলে গিয়েছে। সেখানে তাকে কেউ আঘাত করবে না, বেদনা দেবে না। যে গাঢ় প্রশান্তি তার বাবা জীবনে পায়নি, মরণ তাকে দিয়েছে সেই শান্তি আর স্বস্তির সুখ। বাবার প্রতি প্রীতির গাঢ়তার জন্যই এরকম ভেবে নিয়েছে সে। তাই বাবার প্রাণহীন মুখে সে দেখতে পেয়েছে হাসির চিহ্ন আর তার চোখে বাবা হয়ে উঠেছে সুন্দর।

'মাড়িয়ে যাওয়া' গল্পের কেন্দ্রেও আছে শিশু। গল্পটিতে সুবিধাবাদী আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের আর্তির নিপুণ চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। গল্পের নায়ক অফিসে ঠিক সময়ে যাওয়ার জন্য মাড়িয়ে দেয় একটি শিশুর পা। কারণ সেদিন এম. ডি.-র কাছে কর্মচারীদের যারা দাবি জানাতে যাবে, তাদের একজন সে। কিন্তু তাকে তাড়া করে শিশুটির উদ্যত আঙুল; প্রশ্নের উত্তরে যে আঙুল তাকে চিহ্নিত করেছিল। 'ইস্ রক্ত পড়ছে যে'—এই কথাগুলিও সে ভুলতে পারে না। ফলে বলিয়ে-কইয়ে হিসেবে খ্যাতি থাকলেও এম. ডি.-র সামনে কিছুই বলতে পারে না। তার কেবল মনে হয় জুতোর নীচে লেগে আছে নিষ্পাপ শিশুর রক্ত। সহকর্মীকে অন্যের নাম দিয়ে ঘটনাটি বলে সে উত্তর পায় এমন বদমাস লোকদের শাস্তি দেওয়া দরকার।

প্রবল শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা নিয়ে সময়ের আগেই বাড়ি ফেরে নায়ক। দেখা পায় নিজের বালক

পুত্রের। তার মা গেছে বাজারে। কোন অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে পুত্র সেন্টুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে জুতোপরা পায়ে চেপে ধরে তার খোলা পা। ক্রমে চাপ বাড়ায়। শেষে যন্ত্রণাবিবর্ণ পুত্রের আর্তনাদ শুনে উচ্চারিত হয় তার কাতর স্বীকারোক্তি ‘‘খুব লেগেছে? আমি দেখতে পাইনি বাবা।’’

এভাবেই সে কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে এবং স্বস্তি খুঁজে পায় যেন। গল্পটিতে ঘটনা নামমাত্র—বাস ধরার ব্যস্ত মুহূর্তে অসতর্কতায় পা মাড়িয়ে যাওয়া। দ্রুতগতির নগরজীবনে এ ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। শুধু ব্যতিক্রম এখানে আহত হয়েছে নিষ্পাপ একটি বালক। তাই এ কাজের জন্য শোচনায় যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়েছে নায়ক। কিন্তু প্রকাশ্য স্বীকারোক্তির সাহস নেই এই আত্মপরায়ণ মধ্যবিত্তের। শেষ পর্যন্ত আর একটি শিশুকে আঘাত করে যেভাবে নায়ক অনুশোচনা ব্যক্ত করেছে তার মধ্য দিয়ে চরিত্রের সুবিধাবাদী দিকটিই উদ্‌ভাসিত। কারণ তখন শিশুর জননী বাড়িতে নেই। এবং নিজের ছেলে বলে কোনো বৃহত্তর প্রতিবাদের মুখোমুখিও তাকে হতে হবে না।

নগরজীবনের সঙ্গহীনতার যন্ত্রণা নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ দম্পতির পুত্র বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। ক্বচিৎ সে দেশে ফিরলেও কাজের চাপে দেখা করা হয় না পিতা-মাতার সঙ্গে। প্রতীক্ষাব্যাকুল দুটি মানুষের সময়যাপনের উপায় দু-টি একটি চিঠি এবং অতীতের স্মৃতিচারণা। তবু এসব গল্পে দুটি মানুষ একত্রে থাকে, ভাগ করে নেয় বেদনা বা সুখ। কিন্তু আধুনিক নগরজীবন যখন বৃদ্ধ পিতামাতাকে বাহুল্য বলে মনে করে তখন গড়ে ওঠে বৃদ্ধাবাস। এ ধারণাটি ক্রমে স্বীকৃত হচ্ছে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি সমাজে। কিন্তু জড়িয়ে আছে অপরাধবোধ আর বঞ্চিত হওয়া; বঞ্চিত করার চিন্তা। এই জিনিসটিও রূপ পেয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে। বঞ্চিত এক মায়ের গল্প বলেছেন তিনি। বৃদ্ধাবাস-নিবাসী সেই বৃদ্ধার খোঁজ নিত না কোনো সন্তান। তিনি কিন্তু প্রতি সন্তানের কাছে চিঠি দিতেন অন্যদের তাঁকে উপহারসহ দেখতে আসার বার্তা দিয়ে। মায়ের মৃত্যুর পর জানা যায় এই করুণ সত্য—কেউ-ই যায়নি তাঁর কাছে। তবু তিনি কল্পিত স্নেহের চিত্র এঁকে গেছেন সারা জীবন।

দারিদ্র্যজীর্ণ মানুষগুলির কথাও খুবই বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। কিন্তু এ ধরনের গল্প সংখ্যায় কম। আবার পাশ্চাত্য-প্রবাসী মানুষের কথা নিয়েও তিনি লিখেছেন গল্প। সে সব গল্পে ঘটনার পরিবর্তে মানব-অনুভূতি আর মনস্তত্ত্বের বিচিত্র দিকগুলি সূক্ষ্মতার সঙ্গে বলা হয়েছে।

দিব্যেন্দু পালিত নিছক শয়তান বা নিপাট ভালোমানুষের কথা তেমন বলেননি। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি আমাদের আশে-পাশের চেনা মানুষ। তাদের কেউ জটিল, কুটিল, নীচ মনের অধিকারী। কেউ বা আবার তীক্ষ্ণ অনুভূতিসচেতন। সৎ উৎসাহী সক্রিয় মানুষ যেমন আমাদের জীবনে নেই, তেমনই অনুপস্থিত দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে। রাজনীতি কীভাবে ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তারই গল্প ‘আলমের নিজের বাড়ি’, দেশভাগের সংকটমুহূর্তে দুই বাংলার দুই চিকিৎসক বন্ধু মুসলমান ও হিন্দু বিনিময় করেছিলেন বাড়ি। এপার বাংলার বাসিন্দা মুসলিম চিকিৎসকের পুত্র আলমকে ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষটি পাঠ সমাপ্তি পর্যন্ত নিজের বাড়িতে সাদরেই রেখেছিলেন। ক্রমে তাঁর মেয়ে রাকার সঙ্গে আলমের গড়ে ওঠে নিবিড় হৃদয়ের সম্পর্ক। শিক্ষাশেষে আলম ফিরে যায় বাংলাদেশে কিন্তু চিঠিতে সম্পর্কটি ধরে রাখে দুজনেই। কিন্তু অনেক কষ্টে আলম যখন আবার ফিরে আসে এ বাড়িতে তখন রাকা চলে গেছে দিল্লি। আলমের জন্য রাখা তার চিঠিতে উদ্‌ভাসিত রয়েছে বেদনাময় এক সত্য। সম্পর্কটিকে রাকা অস্বীকার করতে পারছে না। কিন্তু তার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করার মতো মনোবল তার নেই। আলম-রাকার অমলিন সম্পর্ক এভাবেই শেষ হয়ে যায় ভেদনীতিবাদী কূটনীতির চাপে। আলম দীর্ঘকাল পরে উপলব্ধি করে এ বাংলার বাড়ি তার নিজের বাড়ি নয়। গল্পটিতে মানবিকতার দিকটিই বিন্যাসকৌশলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দিব্যেন্দু পালিতের গল্পের এই দিকটি যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ তা এই গল্প দ্বারাই প্রমাণিত।

গল্পভাষা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ দিব্যেন্দু পালিতের ভাষা প্রবল আবেগময় নয়। কিন্তু অন্তর্নিহিত অনুভবের স্পর্শে প্রাণময় তাঁর ভাষা। স্বচ্ছ সাবলীল তাঁর ভাষা। এই ভাষা দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেন মানুষের মনের নানা

বর্ণমিশ্রিত মাকড়সার জালের মতো বিবিধ ধরনের জটিল বৈচিত্র্যময়। বুদ্ধিদীপ্ত পরিমিতিবোধ তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চরিত্রের ছোটোখাটো আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি মনের একমাত্রিক ও বহুমাত্রিক দিকগুলিকে ফুটিয়ে তোলেন। তাই হাত নাড়া, বারান্দায় আসা, জানালা খুলে দেওয়া প্রভৃতি সাধারণ আচরণ তাঁর গল্পে হয়ে উঠেছে অর্থময়।

সংক্ষেপে বলা যায় স্বস্তিহীন আধুনিক মানুষ আর বিক্ষুব্ধ নগরজীবনের কথাশিল্পী দিব্যেন্দু পালিত।

৫.২০ অনুশীলনী

১। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন আলোড়িত সময় বাংলা ছোটো গল্পকে কীভাবে সমাজমনস্ক করে তুলেছে তা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

২। স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রধান তিনজন গল্পকার বিমল কর, সমরেশ বসু ও মহাশ্বেতা দেবী। এই তিনজনের ছোটোগল্পের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩। বাংলা ছোটোগল্প প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনের চলচ্চিত্র। এই অভিমতের যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৪। বাংলা ছোটোগল্পের নতুন রীতির আন্দোলন কবে, কার প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল? এই রীতির নতুনত্ব কোথায়?

৫। বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের বাংলা ছোটোগল্পের বিষয় ও শিল্প-শৈলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

৬। পাঠ্য প্রত্যেক গল্পকার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করে রাখতে হবে।

একক ৬ ❑ প্রবন্ধ—ভাগ ১

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ প্রমথ চৌধুরী

৬.৩ জগদীশ চন্দ্র বসু

৬.৪ জগদানন্দ রায়

৬.৫ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৬.৬ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

৬.৭ মোহিতলাল মজুমদার

৬.৮ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬.৯ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৬.১০ প্রমথনাথ বিশী

৬.১১ সুশীলকুমার দে

৬.১২ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬.১৩ রাজশেখর বসু

৬.১৪ সুকুমার সেন

৬.১৫ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৬.১৬ গোপাল হালদার

৬.১৭ কাজি আবদুল ওদুদ

৬.১৮ নীরেন্দ্রনাথ রায়

৬.১৯ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬.২০ নীহাররঞ্জন রায়

৬.২১ সৈয়দ মুজতবা আলী

৬.২২ আবু সয়ীদ আইয়ুব

৬.২৩ বুদ্ধদেব বসু

৬.২৪ বিনয় ঘোষ

৬.২৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৬.২৬ ক্ষুদিরাম দাস

৬.২৭ অনুশীলনী

৬.২৮ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে কতটা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন এবং সাহিত্যের ইতিহাসে অবদান রেখেছেন সে বিষয়ে জানা যাবে। প্রাবন্ধিকগণের প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য, চিন্তা-ভাবনা ও রচনারীতি সম্বন্ধে ধারণা হবে।

বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাঙালির মনন-চিন্তনের গভীরতা ও ব্যাপ্তির পরিচয় ধারাটিতে সুস্পষ্ট। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে প্রাবন্ধিকেরা আলোচনা করেছেন, যার পরিমাণ-প্রাচুর্য বিস্ময়কর। পরবর্তী আলোচনায় যার প্রমাণ লভ্য।

৬.২ প্রমথ চৌধুরী ঃ (১৮৬৮-১৯৪৬)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকা ‘সবুজপত্র’ কে (১৩২১-১৩৩৪) কেন্দ্র করে প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক নব্যরীতির সূচনা করলেন। সাহিত্যে চলিত ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দানের জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। চলিত ভাষায় যে লঘু-গুরু সর্বপ্রকার ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ সম্ভব তা প্রমাণ করবার জন্য তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েই নব্যরীতির দলভুক্ত হলেন। আধুনিক সাহিত্যে চলিত ভাষারীতির যে সার্বিক প্রয়োগ তার উৎস বিন্দুতে ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় সক্রিয়তা উল্লেখ্য।

অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করে, বিদেশে শিক্ষালাভের পর দেশে ফিরে সম্পূর্ণভাবে বাংলাসাহিত্যের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ‘সবুজপত্র’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ভাষাসংস্কার ও সংস্কার বর্জিত আধুনিক মনোভাব গঠনে তিনি স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন এবং চলিত ভাষায় একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল বিষয়ভাবনা, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ অভিমত তরুণ সাহিত্যিক মহলে বিশেষ আদৃত হল। যা কিছু স্থবির, জীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে বর্জন করে সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে যা কল্যাণজনক তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। যথার্থ আধুনিকতা ও সংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্তি—বাংলা সাহিত্যে এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর নিজস্ব ভাষায় চলিত রীতির প্রবর্তনে একটি স্বকীয় স্টাইলের অবতারণা করেছেন। তাঁর ভাষায় রয়েছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য, মননের তীক্ষ্ণ চমক, রোমান্টিক আবেগের বিরোধিতা, ক্বচিৎ রঙ্গ ও ব্যঙ্গের হাসি, বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস ও বাকচাতুর্য।

তাঁর প্রবন্ধগুলি ‘তেল-নুন-লকড়ী’ (১৯০৬), ‘বীরবলের হালখাতা’ (১৯১৭), ‘নানাকথা’ (১৯১৯) ‘নানাচর্চা’ (১৯৩২) নামে সংকলিত হয়েছিল। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলির বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সর্বত্রই তিনি স্বকীয়তার চিহ্ন রেখেছেন। শুধু বাংলা নয়, ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বহু পঠনশীল সাহিত্যিক ছিলেন। এই অধ্যয়ন-প্রাচুর্য ও জ্ঞানের গভীরতা তাঁর প্রবন্ধগুলিকে আরও ক্ষুরধার করে তুলেছিল। তিনি বিদগ্ধ প্রবন্ধের পাশাপাশি অনেক হাল্কা প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ‘বীরবল’ থেকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট বীরবলী রীতির প্রবর্তন হয়। তিনি স্যাটায়ারিস্ট বা বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনায় বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন।

সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিশেষভাবে স্বীকৃত। তিনি মনে করতেন ভাবের প্রাধান্য নয়, তার রূপনির্মিতিই সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য এবং সাহিত্যিকের প্রখর বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্যের রূপনির্মাণ নির্ভর করে। এর সঙ্গে চাই লেখকের একনিষ্ঠ সাধনা।

বাংলাসাহিত্যে চলিত রীতিকে যে কোনো মননকর্মে ব্যবহারের গৌরব প্রমথ চৌধুরী'র প্রথম প্রাপ্য। এতে সাহিত্য গুণ কিছুটা কম থাকলেও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, নির্মল পরিহাস; বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক ও মার্জিত প্রকাশ ভঙ্গিমার দ্বারা বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্য যে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে একথা অনস্বীকার্য। তাই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী নবধারা সৃষ্টির সম্মান দাবি করতে পারেন।

প্রমথ চৌধুরী ছোটোগল্পের লেখকও ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রকল্পের মধ্যে যেন সূচিত হল এক নতুন যুগ। তিনি ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক। বিভিন্ন সম্পাদকীয় লেখাতে তাঁর সমাজচিন্তা, শিল্পচিন্তা, ভাষাচিন্তা এবং সমকালের বাঙালির মনন-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের সবচেয়ে বড় গুণ তাঁর বিশ্বমুখীন আধুনিকতা। স্বচ্ছ বুদ্ধির চর্চায় এবং যুক্তিবাদের প্রবর্তনায় তাঁর আগ্রহ ছিল। যে কোনো বিষয়কে স্বতন্ত্র চিন্তার আলোকে মণ্ডিত করতে পারতেন। তাই তাঁর কোনো কোনো প্রবন্ধ যেমন জয়দেব, ভারতচন্দ্র প্রমুখ— প্রচলিত মতকে উপেক্ষা করেছে। কবিকে তিনি সামাজিক নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করেননি। শিল্পরূপের স্রষ্টা হিসাবেই দেখেছেন। তাই তাঁর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে, প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ সামাজিক অভিমতগুলির বিপরীতে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের জাগ্রত বিশ্লেষণমুখী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রবন্ধে সংস্কার বড় হয়ে ওঠেনি। প্রধান হয়েছে আধুনিক মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিকোণ।

সেইসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে স্বাদেশিকতার ভাবনাও অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিস্তৃত ও ঘনীভূত সময়ের সাক্ষী তিনি। বিভিন্ন দিক থেকে তখন স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশকে গড়ে তোলবার একটি ভাবনা কাজ করছিল অনেকেরেই মনে। প্রমথ চৌধুরীর লেখার বৃত্তে আছে রায়তের কথা নামে প্রবন্ধ। প্রজা জমিদার সম্পর্ক নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তিনি কৃষকদের সম্পর্কে তাঁর ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) থেকে রুশ বিপ্লব (১৯১৭) এই দীর্ঘ সময় জুড়ে মানব সাম্যের যে ধারণা গড়ে উঠেছিল প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে তার উজ্জ্বল উদ্ভাষণ লক্ষ করা যায়।

প্রমথ চৌধুরীর চিন্তায় ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বাংলা ভাষার বিবর্তনের এক নিয়ন্ত্রক শক্তি উঠে এসেছে। ভাষাকে গুরুগম্ভীর শব্দ, অলংকৃত বাগ্বাহুল্য এবং সাধুক্রিয়াপদের প্রাচীনত্বের মধ্যে আটকে রাখলে আধুনিক যুগচিন্তা যে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যাবে না তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই সরসতা ও যুক্তিবাদের সংমিশ্রণে চলিত ভাষার পক্ষে যে সব সওয়াল তিনি ঐ প্রবন্ধগুলিতে করেছিলেন তারই ফলে আধুনিক বাংলা ভাষায় অলংকার বহুল, জাঁকজমকপূর্ণ গদ্য লেখার রীতি প্রায় অদৃশ্য হল, তির্যক, সরস, এপিগ্রামাটিক এবং বৈদগ্ধ্যদীপ্ত, বুদ্ধিমার্জিত যে গদ্যরীতি তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন—তা-ই বাংলা-সাহিত্যে প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ দান।

৬.৩ জগদীশ চন্দ্র বসু ঃ (১৮৫৯-১৯৩৭)

জগদীশ চন্দ্র বসু'র বাংলা রচনা 'অব্যক্ত' (১৩২৮) নামক গ্রন্থে তাঁর সৌন্দর্য পূজারি শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার দিকটিও উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার আগে 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথও জগদীশচন্দ্রের পরস্পরকে লিখিত পত্রাবলিতে গবেষক ও সাধক জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানজগতের নিঃসঙ্গ পদক্ষেপের অনুপম কাহিনি পরিস্ফুট হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছেন এবং এ বিষয়ে যথার্থ একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন তাঁদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু অন্যতম। যদিও তাঁর প্রবন্ধ সংকলন মাত্র একটি, সেই সংকলনের প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটিই বাঙালি পাঠকের কাছে প্রবন্ধ পাঠের এক অ-স্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানগবেষণার ক্ষেত্র বহুদিকেই বিস্তৃত ছিল কিন্তু দুটি দিকে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন তা সার্বিকভাবে বহুস্বীকৃতি হয়ে আছে। একটি হল উদ্ভিদের প্রাণ বিষয়ক গবেষণা। বহুদিক থেকে তিনি উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন এবং উদ্ভিদের অনুভূতির দিকটি প্রমাণ করেছিলেন। জড়ের চেতনা সম্পর্কিত গবেষণাও তিনি করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় বিশিষ্ট গবেষণা ক্ষেত্র হল কোনো মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াও রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ সম্পর্কিত কাজ। সেই সঙ্গে পর্যাবরণ (এনভায়রনমেন্ট) , ভূপ্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর গভীর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছিল।

বিজ্ঞানী অনেকেই হন, কিন্তু তাঁরা সকলে সাহিত্যিক হন না। জগদীশচন্দ্র বসু একজন উচ্চমানের বাংলা ভাষা শিল্পী ছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণা-প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের আকারে রূপ দিয়েছেন এবং 'অব্যক্ত' নামের সংকলনে সেগুলি গ্রথিত হয়েছে। উদ্ভিদের প্রাণ এবং অনুভূতি, উদ্ভিদের উপর পঞ্চভূতের প্রভাব, রেডিওতরঙ্গ এবং ভূ-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু ধারণা অত্যন্ত সহজ এবং সরসভাবে পাঠকের মনের মধ্যে গেঁথে যায়। একবার পড়লে সহজে তা ভোলা যায় না। 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' নামক প্রবন্ধটিতে ভূপ্রকৃতিতে এবং পর্যাবরণে জলীয় পদার্থের আবর্তন-চক্র সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধের একটি বাক্য এবং তার প্রত্যুত্তর—'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' এবং 'নদীর উত্তর মহাদেবের জটা হইতে'—বাংলাসাহিত্যের দুটি প্রবাদ প্রতিম বাক্য। ভারতীয় পুরাণ, প্রকৃতি সম্পর্কে মুগ্ধতা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং সত্য সংমিশ্রিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে। দৃষ্টান্ত রূপে 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধারযোগ্য ঃ "দেখিলাম অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই ক্ষুদ্র তুষার মূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়, মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন; যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্ব্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই সহচর্যে গ্রথিত।" বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধে দার্শনিক মনোভঙ্গি এবং সহজ কবিত্বের সাবলীল প্রকাশের যে দৃষ্টান্ত জগদীশচন্দ্রের রচনায় লক্ষিত হয় তা বাংলার বিরল।

৬.৪ জগদানন্দ রায় ঃ (১৮৬৯-১৯৩৩)

বাংলাভাষার বিজ্ঞানসাহিত্যের ধারায় জগদানন্দ রায়ের নাম স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। তিনি বাংলা সাহিত্যে সহজবোধ্য বিজ্ঞান রচনার অন্যতম প্রবর্তক। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে ১৮৬৯ খ্রিঃ ১৮ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। শৈশবে কিছুকাল স্থানীয় স্কুলে ও পরে কৃষ্ণনগর কলেজে পাঠগ্রহণ করেন। বি. এ. পাঠকালে তিনি বিজ্ঞান ও গণিতই প্রধান পাঠ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই সহজাত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রাবন্ধিকরূপে পরিচিত করে, এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "বাল্যকাল হইতে বিজ্ঞানচর্চায় আমার বড় আমোদ, এজন্য বহু চেষ্টায় কতগুলি বিজ্ঞানগ্রন্থ এবং পুরাতন এবং বিক্রেতার দোকান হইতে দুই-চারিটি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। একটি ভগ্ন-পরকলা দাগী হাত দূরবীণ, একটি ক্ষুদ্র আনিরয়েড ব্যারোমিটার এবং দুইটি ছোটো বড় তাপমানযন্ত্র আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবলম্বন ছিল। এতদ্ব্যতীত একটি তন্ত্রিহীন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, কয়েকটি কাচের নল, একটি সচ্ছিদ্র ইনকানভেসান্ট বৈদ্যুতিক দীপ, একটি বুনসেনের সেল এবং কয়েকহাত রেশম মোড়া তার ইত্যাদিও সংগ্রহ ছিল।" (শুক্রভ্রমণ ঃ প্রাকৃতিকী ৪র্থ সং, পৃঃ ২৮৬)।

কৃষ্ণনগর কলেজে পাঠকালে জগদানন্দ নদিয়ার মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের কাছে বিজ্ঞান আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—''কৃষ্ণনগরের বর্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, আমাকে বড় স্নেহ করেন—তিনি তৎকালে বিজ্ঞানালোচনায় অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতেন। আমাকে বিজ্ঞানানুরাগী দেখিয়া রাজবাটির সুবৃহৎ পরীক্ষাগারে নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি লইয়া, আমাকে সযত্ন বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। '' (জন্মভূমি, ফাল্গুন, ১৩০৩ পৃ ৮১)

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সূত্রে এর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং প্রথমে শিলাইদহে জমিদারি সেরেস্তায় কর্মচারী, পরে কবির পুত্রকন্যাদের বিজ্ঞান ও গণিতের গৃহশিক্ষক ও শেষে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন (১৯০১)। তিনি সেখানে গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও বিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জগদানন্দ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন—''শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল।'' (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পৃঃ ২৯-৩০)। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আদর্শে সরলবাংলায় বিজ্ঞানের সত্য প্রচার তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ ছিল। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ছিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ 'প্রকৃতি পরিচয়' (১৩১৮), 'বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' (১ম-৪র্থ খণ্ড) ১৩১৯, 'বৈজ্ঞানিকী' (১৩২০), 'প্রাকৃতিকী' (১৩২১), 'গ্রহক্ষেত্র' (১৩২২), 'পোকামাকড়' (১৩২৬),........(১৩৩০), 'বাংলার পাঠশব্দ' (১৩৩১), 'আলো' (১৩৩৩), 'চুম্বক' (১৩৩৫), 'তাপ, গ্রহ, নক্ষত্র' (১৩৩৫) ইত্যাদি। এছাড়া বিদ্যালয়ের কিছু পাঠ্যপুস্তকও লিখেছিলেন, যথা—'জ্ঞানসোপান' (১৩২১), 'বিচিত্রসন্দর্ভ' (১৩২৪), 'সাহিত্যসন্দর্ভ' (১৩২৪), 'সাহিত্য সোপান', 'সুকুমার পাঠ' (১৩২৫), 'চয়ণ' (১৩২৬), 'বিজ্ঞান-প্রবেশ (১৩৩২), 'বিজ্ঞান পরিচয়' (১৩৩২), 'ছুটির বই' (১৩৩৫), 'সাহিত্য সৌরভ' (১৩৩৭) 'সঞ্চয়ন' (১৩৩৭), 'বিজ্ঞান প্রকাশ' (১৩৩৭) প্রভৃতি।

'ভারতী', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'বঙ্গদর্শন', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'ভারতমহিলা', 'ভারতবর্ষ', 'শান্তিনিকেতন', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক বহু প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর বিচিত্র কৌতূহলী মনের পরিচয় এগুলিতে পাওয়া যায়। যেমন, 'প্রকৃতি পরিচয়' গ্রন্থে ইথর, বিদ্যুতের উৎপত্তি, পদার্থের মূল উপাদান, জ্যোতিষ্কের জন্মকথা, উল্কাপিণ্ড, হ্যালির ধূমকেতু, পৃথিবীর পরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। শ্বাসযন্ত্রের বৈচিত্র্য, বন ও বৃষ্টি, মাখন, ভূ-কম্পন, পৃথিবী ও সূর্যের তাপ, শ্রম ও অবসাদ প্রভৃতি 'বৈজ্ঞানিকী'র আলোচ্য বিষয়। 'প্রাকৃতিকী'-তে জীবনটা কি? ঘ্রাণতত্ত্ব, বৃক্ষের চক্ষু, কেরোসিন তৈল, মঙ্গলগ্রহ, পৃথিবীর শৈশব ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত। 'গ্রহ-নক্ষত্র' গ্রন্থে পৃথিবী, গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য, চাঁদ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, নক্ষত্র, নীহারিকা, সৌরজগতের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গ স্থানপ্রাপ্ত। 'পোকামাকড়' গ্রন্থে পোকামাকড়দের প্রধান সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করে তাদের পরিচয় ও জীবনবৈচিত্র্য নির্দেশিত। 'বিজ্ঞানের গল্প'-এ সূর্য, সূর্যের তাপ ও আলো, আলোর উৎপত্তি, শব্দের উৎপত্তি, রঙিন আলো, মেঘ ও বৃষ্টি, গাছের ঘুম, ব্যাঙাচি, ব্যাং, মাছ ইত্যাদি প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত। 'গাছপালা'য় শ্রেণিনির্দেশ করে গাছের দেহ গঠন আয়ু ও জীবনধর্মের আলোচনা, ফুল ফল পাতার বিবরণ, পরগাছা, পোকা-খেকো গাছ, ফার্ণ, শেওলা, ব্যাঙের ছাতার আলোচনা। 'মাছ ব্যাং সাপ' গ্রন্থে ছটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, কুমির, টিকটিকি ও গিরগিটি, সাপ প্রভৃতি প্রাণীর জীবন পর্যালোচনা। প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগ, আকৃতি, শরীরের গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আহার-বিহার, কাক-বক-খঞ্জন-মাছরাঙা প্রভৃতি পাখি, পাখির বাসা, পাখিদের দেশভ্রমণ, বেশভূষা, নাচগান ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে 'পাখি'তে।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। বিজ্ঞান-বিষয়কে কেমন সহজ ও সরলভাবে তিনি তাঁর প্রবন্ধে পরিবেশন করতেন তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—

'বক, চিল, শকুন, বাজ, পেঁচা, ইহারা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির পাখি। চেহারা দেখিলেই ভয় পায়। কিন্তু খঞ্জন দোয়েল চড়ুইদের চেহারা সে-রকম নয়। ইহাদের চাল-চলনে এবং চেহারায় এমন একটা কি আছে যে, দেখিলেই মনে হয়, তাহাদের সঙ্গে মিশিলে ভয় নাই। পায়রারাও ঠিক সেই রকমেরই পাখি,—তাহাদের চাল-চলন ও চেহারায় যেন স্ফূর্তি লাগিয়াই আছে।' (বাংলার পাখি)

৬.৫ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ (১৮৬৮-১৯৪২)

বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতার হাটখোলায় ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮93 খ্রিঃ তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। সেকালের বহু পত্র পত্রিকায় তাঁর দর্শন সম্বন্ধীয় রচনা প্রকাশিত হত। তিনি 'পন্থা' ও 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত অসংখ্যগ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—'গীতায় ঈশ্বরবাদ' (১৯০৫), 'উপনিষদ-ব্রহ্মতত্ত্ব' (১৯১১), 'জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব' (১৯১৬), 'নারীর নির্বাচন অধিকার', 'অবতার তত্ত্ব' (১৯২৮), 'বেদান্ত পরিচয়' (১৯২৪), 'বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা' (১৯৩৬), যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ' (১৯৩৬), 'প্রেমধর্ম' রাসলীলা, সাংখ্য পরিচয়, বুদ্ধি ও বোধি, দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৪০), 'উপনিষদ—জড় ও জীবতত্ত্ব' (১৯৫২), 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ' (১৯২৫), প্রভৃতি। এছাড়া তিনি বাংলায় সংস্কৃত 'মেঘদূত' কাব্যের অনুবাদ করে খ্যাত হয়েছিলেন।

হীরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গ্রন্থই দার্শনিকতা সমৃদ্ধ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অধিকার ছিল প্রবল। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্বকে তিনি সহজ ভাষায় উপস্থিত করেছেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দর্শনের সহজ ব্যাখ্যাতা তিনি। আবার পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে গভীর পরিচয় হেতু তুলনামূলক আলোচনাতেও তিনি স্বচ্ছন্দ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন-ভাবনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। একথা ঠিক, প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের মূল অবলম্বন, কিন্তু তা নিছক পুরাতনের চর্বিতচর্বণ নয়। তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা এবং উপলব্ধির দ্বারা এগুলি সমৃদ্ধ। গ্রন্থগুলিতে তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও মনস্বিতার পরিচয় লভ্য।

'গীতায় ঈশ্বরবাদ' তাঁর প্রথম গ্রন্থ। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃত। গ্রন্থটিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অভিনবত্ব প্রতিপাদন করেছেন। ভারতীয় ষড়দর্শনের বিস্তৃত আলোচনাক্রমে সেগুলির ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নির্দেশ করে গীতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। হীরেন্দ্রনাথের মতে ঈশ্বরবাদই গীতাকে ত্রুটিমুক্ত করেছে।

তাঁর উপনিষদের আলোচনাও মনোযোগের দাবি রাখে। 'উপনিষদ-ব্রহ্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত রূপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। এ কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

তাঁর বক্তব্যবিষয়কে তিনি সর্বত্র তথ্য ও যুক্তি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এজন্য প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদি থেকে তিনি অজস্র শ্লোক উদ্ধার করেছেন। বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিনি।

তাঁর গদ্য নৈয়ায়িক গদ্য। ঋজু ও সুস্পষ্ট। আবেগ-উচ্ছ্বাসবর্জিত। বুদ্ধিদীপ্ত। জটিলতামুক্ত। দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা যে কতখানি সহজগ্রাহ্য হতে পারে তাঁর গদ্য তার নিদর্শন।

বাংলা ভাষায় দর্শনের আলোচনা যাঁদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে হীরেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম।

৬.৬ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ঃ (১৮৭৯-১৯৪০)

বহু ভাষাবিদ ও বাংলা কোশগ্রন্থ রচনার আন্দোলনে পুরোধা পুরুষ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৯ খ্রিঃ ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় (বিডন স্ট্রিটে) তাঁর জন্ম। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলেজের পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরে সুস্থ হয়ে বারাণসীতে সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষান্তে সেখান থেকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন।

অল্প বয়স থেকেই ভাষাশিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি স্বগৃহে মৌলভীর কাছ থেকে উর্দু, ফারসি এবং জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ' এর ভাষাশিক্ষক এডওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে গ্রিক ভাষা শিক্ষা করেন। এরপর তিনি ক্রমে অসমিয়া, আরবি, ইংরেজি, ইটালীয়, উর্দু, ওড়িয়া, গ্রিক, জাপানি, জার্মান, তামিল তেলেগু, পোর্তুগিজ, নেপালি, প্রাকৃত, ফরাসি, ফারসি, রুশ, লাতিন, সংস্কৃত, হিন্দি প্রভৃতি মোট ২৬টি ভাষা আয়ত্ত করেন। সমসাময়িক বিদ্বজ্জন মহলে তিনি হরিনাথ দে'র পরে উল্লেখযোগ্য ভাষাবিদরূপে পরিগণিত হতে থাকেন। ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, প্রত্নবিদ্যা, লিপিতত্ত্ব, বৈষ্ণব সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, এমনকি নাট্যশাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল।

অমূল্যচরণ বহু সাময়িক পত্রর সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছিলেন। বস্তুত তাঁর সম্পাদিত সাময়িকপত্রগুলির মান এমন উন্নত ছিল যে তাঁকে সে সময়ের অন্যতম সফল সম্পাদক বলা চলে। তাঁর সম্পাদিত সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাণী' (১৩২১ বঙ্গাব্দ, মাসিক পত্রিকা), 'ভারতবর্ষ' (১৩২০-২১ বঙ্গাব্দ, মাসিক পত্রিকা), 'সঙ্কল্প' (১৩২১ বঙ্গাব্দ, মাসিক পত্রিকা), 'মর্মবাণী' (১৩২২ বঙ্গাব্দ, সাপ্তাহিক, যুগ্মসম্পাদনা) 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক' (১৩২৫ বঙ্গাব্দ মাসিক পত্র), 'কায়স্থ পত্রিকা' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ, মাসিক পত্রিকা), 'কায়স্থ সমাজ' (১৩৩২ বঙ্গাব্দ, মাসিক পত্র), 'পঞ্চপুষ্প' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, মাসিক পত্র), 'শ্রীভারতী' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, মাসিক পত্রিকা)।

কোশ গ্রন্থ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে তিনি একটি বহুমুখী কোশগ্রন্থ সংকলনের জন্য তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করেন। অমূল্যচরণ ও চারুচন্দ্র মিত্রের যুগ্ম সম্পাদনায় 'শিলাকোষ' নামক শিলাবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোশগ্রন্থটির ১ম খণ্ডের ৩টি সংখ্যা ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়। 'বিশ্বকোষ' (২য় সংস্করণ) ১৯৩৩ খ্রিঃ অমূল্যচরণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় মহাকোষ' ১ম খণ্ড ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় ও ২য় খণ্ড ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল অতৃপ্ত। মানবিকী বিদ্যার সমস্ত ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। ফলে তাঁর আলোচনাসমূহে যুগপৎ ব্যাপ্তি ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায়।

অমূল্যচরণের প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। অধিকাংশই পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করে আছে। গ্রন্থবদ্ধ হয় নি।

তাঁর মৃত্যুর বহু পরে ১৯৬২-তে প্রকাশিত হয় 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য'। দশটি প্রবন্ধের সংকলন। এগুলির মধ্যে রয়েছে ' প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি', 'মহাকাব্য যুগে শিক্ষার ধারা', 'প্রাচীন যুগে অলঙ্কার', 'প্রাচীন ভারতে পুঁথি ও পুঁথিশালা' ইত্যাদি প্রবন্ধ। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে। 'সংস্কৃতি ও সাহিত্য', 'দর্শন, ধর্ম ও সম্প্রদায়' এবং 'নাটক ও নাট্যশালা' এই তিনটি পর্যায়ে প্রবন্ধগুলি বিন্যস্ত। তাঁর অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ হল ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', 'জৈনজাতক', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', 'সরস্বতী' ইত্যাদি। 'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী'-র একাধিক খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮২-তে প্রকাশিত প্রথম পত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক ৩৬টি প্রবন্ধ এবং ১৯৮৪-তে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতীয় দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কিত ৪৪টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত।

এ সমস্ত প্রবন্ধ থেকে বেশ বোঝা যায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় অধিকার ছিল। প্রয়োজনে ভারততত্ত্ববিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিরোধিতাও তিনি করেছেন।

অমূল্যচরণ জ্ঞানমার্গের পথিক। তাঁর প্রবন্ধসমূহ গবেষণাধর্মী। উদ্ধৃতিও মূল সূত্র নির্দেশের ব্যাখ্যা তার প্রবন্ধসমূহকে প্রায়শই জটিল করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর অধ্যয়ন বিপুলতা ও মনস্বিতা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁকে মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছে।

ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অনুরাগ আমাদের মনে যে সম্ভ্রম জাগায় তাতে সন্দেহ নেই।

৬.৭ মোহিতলাল মজুমদার ঃ (১৮৮৮-১৯৫২)

বাংলা সাহিত্যে কবি ও সমালোচক রূপেই মোহিতলাল মজুমদার সমধিক প্রসিদ্ধ। ইং ১৮৮৮ খ্রিঃ ২৬ অক্টোবর নদিয়া জেলার কাঁচরাপাড়ায় মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। ১৯০৮-এ কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন।

কিশোর বয়স থেকেই মোহিতলাল সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সমালোচক-খ্যাতি গড়ে ওঠার আগেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবার পর সমালোচক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'ভারতী' পত্রিকায় 'মাসকাবারী' শিরোনামে (১৩২৬, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র) যে সমালোচনা প্রবন্ধগুলি লিখতেন, তার মধ্যে দিয়ে তাঁর সমালোচনা-শক্তির পরিচয় মেলে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৩২, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৩৩ আষাঢ়-আশ্বিন) 'কাব্যকথা' নাম দিয়ে তিনি কাব্যতত্ত্ব রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরে 'শনিবারের চিঠি'-তে তিনি সাহিত্যের প্রীতি, আদর্শ, প্রেরণা, কবিধর্ম ইত্যাদি নানাবিষয়ে যেসব ভাবগম্ভীর রচনা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলি তাঁর—'সাহিত্যকথা (১৩৪৫), 'সাহিত্য-বিজ্ঞান' (১৩৪৯) 'সাহিত্য বিচার' (১৩৫৪), প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর কবি ও অন্যান্য লেখকদের সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১৩৫২), 'কবি শ্রীমধুসূদন' (১৩৪৫), 'বঙ্কিমবরণ' (১৩৫৬), 'রবি প্রদক্ষিণ' (১৩৫৬), 'বাংলার নবযুগ' (১৩৫২), 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' (১৩৫৭), 'জীবন-জিজ্ঞাসা' (১৩৫৮), 'বাংলা ও বাঙালী' (১৩৫৮), 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' (১ম খণ্ড ১৩৫৯, ২য় খণ্ড ১৩৬০), 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' (১৩৬৮), 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' (১৩৬৯) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি মোহিতলালের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলালের দ্বিবিধ পরিচয়। প্রথমত তিনি কবি, দ্বিতীয়ত প্রাবন্ধিক। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা কোনও অংশে ন্যূন নয়। তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা বিপুল। বিচিত্র ভাবসম্পদে এ সমস্ত প্রবন্ধ পরিপূর্ণ। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য তাঁর লেখনী-স্পর্শে সমৃদ্ধ।

তাঁর প্রবন্ধসমূহের একটি অংশ সাহিত্য, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব আশ্রয়ী। অপর অংশটি সমাজ, সামাজিক আলোড়ন, উদ্দীপনা ও সমাজ-প্রতিভূ কোনও ব্যক্তিবিশেষ আশ্রয়ী। প্রথম পর্যায়ে পড়ে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্য কথা', 'সাহিত্য-বিতান', বাংলা কবিতার ছন্দ', 'কবি শ্রীমধুসূদন', সাহিত্য-বিচার', বঙ্কিম বরণ', 'রবি-প্রদক্ষিণ', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য', 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' জাতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে 'বাংলার নবযুগ', 'জয়তু নেতাজি', 'বাংলা ও বাঙালি', 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' জাতীয় গ্রন্থগুলি।

'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' তেরটি প্রবন্ধের সংকলন—আধুনিক বাংলা সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্যের ভাষা, আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবধারা, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, শরৎচন্দ্র, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও মধুসূদন। আলোচ্য গ্রন্থে একদিকে তিনি যেমন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনের রচনাকর্মের পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে তিনি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যকেই বুঝিয়েছেন। মোহিতলাল স্বয়ং সৃষ্টিশীল কবি। পূর্বোক্ত কবিদের বিচার-বিশ্লেষণে তাই সমালোচকের সঙ্গে স্রষ্টা একজন কবিরও মিলন ঘটেছে। কাব্য-কবিতার রস-রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁর কবিমন তাঁকে সহায়তা করেছে। একথা ঠিক, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সাহিত্যের অভিঘাতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্ভব। কিন্তু তা যে কবি-সাহিত্যিকদের বাঙালিত্বকে মুছে ফেলতে পারেনি, তাও তিনি আবিষ্কার করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সতর্ক অনুসন্ধিৎসু মনে পরিচয় মেলে।

'সাহিত্য-কথা'য় রয়েছে চোদ্দটি প্রবন্ধ। এগুলি হল ঃ সাহিত্যের আদর্শ, নিত্য ও সাহিত্য, সাহিত্য-বিচার ও সাহিত্যের আয়ুষ্কাল, কাব্য ও জীবন, সাহিত্যের ছোটো ও বড়, রস ও রূপ, কবিতা ও বৈরাগ্য, সাহিত্যের স্বরাজ, সাহিত্যে সমস্যা, সাহিত্যে সুনীতি, সমাজ ও সাহিত্য, সাহিত্যে অশ্লীলতা, কাব্যপাঠ, সাহিত্যের স্টাইল। প্রবন্ধগুলিতে প্রাবন্ধিক মূলত তাত্ত্বিকের ভূমিকা নিয়েছেন। যে তত্ত্বদৃষ্টির দ্বারা সমালোচক মোহিতলাল নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন প্রবন্ধগুলিতে সেই তত্ত্বদৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। মোহিতলালের এই তত্ত্বদৃষ্টি পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বের প্রভাবজাত। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে তিনি যে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। অবশ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সুগভীর রসবোধেরও সমন্বয় ঘটেছে। মোহিতলালের বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির দৃষ্টান্তরূপে 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' প্রবন্ধ থেকে স্বল্প উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

'অশ্লীলতা কেবল একটা শব্দার্থগত দোষ নয়, কেবল বর্ণনাবিশেষ বা ভাববিশেষের জন্যই রচনা অশ্লীল হয় না; পরন্তু, কল্পনার মিথ্যাচারই নানা ভঙ্গিতে অশ্লীল হইয়া উঠে। যাহা কুৎসিত বা অকথ্য, তাহাই যদি অশ্লীল হয় এবং যাহা মিথ্যা বা কুকল্পিত, ভাষার সৌষ্ঠবে, বর্ণনার পরিপাট্যে তাহাই যদি শ্লীল হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের অশ্লীলতা- দোষ নিতান্তই রুচিঘটিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়—কাব্যের যাহা প্রাণ, সেই রস-সত্যের সন্ধান লওয়া হয় না।'

'সাহিত্য-বিতান' গ্রন্থে রয়েছে পঁচিশটি প্রবন্ধ। এর কয়েকটি সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত। যেমন, সাহিত্য বিচার, বাংলা সাহিত্যে ট্রাজেডি, হাস্যরস ও হিউমার, সাহিত্য ও যুগধর্ম ইত্যাদি। আর কয়েকটি প্রবন্ধ বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখের সাহিত্যকৃতির আলোচনা। প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলালের প্রবল উপস্থিতি লক্ষণীয়।

'বাংলার নবযুগ' মোহিতলালের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। উনিশ শতকের বাংলায় যে নবযুগের সূচনা হয় আলোচ্য গ্রন্থে মোহিতলাল তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। যে মানবতাবাদ নবযুগের মূল লক্ষণ সেই লক্ষণ মিলিয়ে মোহিতলাল এ যুগের সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদির বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের নানাবিধ প্রয়াস-প্রচেষ্টায় কীভাবে বাঙালির প্রাণ-মনের পূর্ণ জাগরণ ঘটালো তা নির্দেশ করেছেন। নবযুগের প্রেরণা প্রকৃতি ও পরিণাম তাঁর আলোচনায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

'জয়তু নেতাজি'র উপজীব্য এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। মোহিতলাল তাঁর এই গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের দুর্জয় সাহস, বিপুল শক্তি, সুগভীর দেশপ্রেম ও ইস্পাত-দৃঢ় মনের পরিচয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন।

'কবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থটি মোহিতলালের সমালোচনা শক্তির অপর বিশিষ্ট নিদর্শন। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠতম কাব্য 'মেঘনাদবধ' অবলম্বনে মোহিতলাল মধুসূদনের কবি স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করেছেন। কাব্য ও কবি, কবিচরিত্র ও যুগপ্রভাব, কল্পনা-কবি-মানস, গঠন ও রচনাকৌশল, কবি-ভাষা প্রভৃতি পর্যায়ে আলোচনাটি সুবিন্যস্ত। মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব সবিস্তারে আলোচিত। এককথায়, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সামগ্রিক পরিচয় দানে সমালোচক বিরল সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। মোহিতলালের মতে, ''যে একখানি কাব্যে তিনি নিজের কবি-স্বপ্ন ও কবিশক্তি নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা 'মেঘনাদবধ'। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে বাঙালির যে ভাব-জাগরণ তাহার সাহিত্যে ঘটিয়াছিল, তাহাকে যদি আজ বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন থাকে, তবে মেঘনাদবধে'র কবিকে ঐতিহাসিক ও কাব্যরসিক—উভয়ের দৃষ্টিতে চিনিয়া লইতে হইবে।''

'বঙ্কিমবরণ' গ্রন্থে মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্ব ও প্রতিভার অনন্যতা নির্ণয় প্রয়াসী। কবি বঙ্কিম, ভাবুক বঙ্কিম, মনীষী বঙ্কিমের স্বরূপ উদঘাটন। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' আর একটি অসাধারণ গ্রন্থ। মোহিতলালের কবি ও সমালোচক সত্তার যুগল মিলন ঘটেছে এ গ্রন্থে। আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্কিমের ট্রাজেডি ভাবনার যে বিবর্তন তিনি দেখিয়েছেন তাতে বিরল নৈপুণ্যের পরিচয় লভ্য।

'রবি-প্রদক্ষিণ' ও 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' তাঁর উল্লেখযোগ্য আর দুটি গ্রন্থ। সমালোচক মোহিতলালের তীক্ষ্ণ-নিপুণ সমালোচনা শক্তির নির্দশন।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে মোহিতলালের দান অসামান্য। বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর, কবিত্বমণ্ডিত। সমালোচক হিসেবে তিনি শক্তিমান পৌরুষদীপ্ত। কবি মোহিতলালের পাশাপাশি প্রাবন্ধিক মোহিতলালও যে বাংলা সাহিত্যে অনন্য মহিমায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাতে সন্দেহ নেই।

৬.৮ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : (১৮৯২-১৯৭০)

বাংলা সাহিত্যধারায় সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বীরভূমের হাতিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। পৈত্রিক নিবাস বীরভূমের কুশামা গ্রামে। ১৯১২ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজিতে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯২৭ খ্রিঃ তিনি ''রোমান্টিক থিওরি—ওয়ার্ডসওয়ার্থ এ্যান্ড কোলরিজ''—এই বিষয়ের উপর গবেষণা করে পি. এইচ. ডি বা 'ডক্টরেট' ডিগ্রি পান। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় রিপন কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ঢাকার রাজশাহী কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসাবে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি পুনরায় কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিরে আসেন। এরপর তিনি সরকারি চাকরি ত্যাগ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাদি : 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (১৯৩৯), 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' (১৯৪৬), 'বাংলা উপন্যাস' (১৯৪৭), 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' (১ম ও ২য় খণ্ড : ১৯৫৯), 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' (১৯৬২), 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা' (১ম খণ্ড : ১৯৬৫, ২য় খণ্ড : ১৯৬৯)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সহযোগে যে অধ্যাপকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত পাঠ শৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্গবিদ্যা চর্চার মানের উন্নয়ন সাধন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনার উচ্চতম মান সম্পর্কে তাঁর শ্রেষ্ঠ ধারণা ছিল। সেইসঙ্গে ছিল প্রগাঢ় সাহিত্যবোধ। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৩৯) নামে যে বৃহৎ উপন্যাস আলোচনার গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এখনও বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সেটি প্রয়োজন হয়। যখন তিনি এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেছিলেন তখন এই ধরনের সমগ্রতা সন্ধানই সাহিত্য ধারার আলোচনা বাংলাভাষায় আর একটিও ছিল না। পরবর্তী বহু গ্রন্থের আদর্শরূপে তাঁর এই বইটির স্থান অমর হয়ে থাকবে এবং বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এখানেই তাঁর অনতিক্রম্য কীর্তি। যখন তিনি এই বইটি লিখেছিলেন তখন বাংলা ভাষায় সাহিত্য বিশ্লেষণের যথার্থ পরিভাষাও ভালোভাবে তৈরি হয়নি। অথচ তাঁর লেখা পড়লে এই অভাব আজও অনুভূত হয় না। সেইসঙ্গে তাঁর সাহিত্যবোধের এমন একটি রসস্বাদী দৃষ্টিকোণ ছিল যার ফলে সমালোচনা পাঠে সাহিত্যপাঠের আনন্দ পাওয়া যায়। এ ধরনের লেখা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। বাংলা উপন্যাসকে মুহূর্তের মধ্যে যেন অতীব সম্মানীয় এক আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি।

বৈষ্ণব সাহিত্যের সাহিত্যিক সৌন্দর্য বিশ্লেষণে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসবোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি খুব উল্লেখযোগ্য। তাঁর দুটি প্রবন্ধ সংকলন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' (১৯৪৭) এবং 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' (১৯৬২)। এই দুটি গ্রন্থে সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ সঙ্কলিত। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে নিয়ে আলোচনা আছে। বিদ্যাপতির মৈথিল ও অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত লেখার আলোচনা তাঁর পূর্বে বাংলা ভাষায় আর কেউ করেননি। টেক্‌সট্‌ অনুসরণ করে তিনি কবিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই রীতিও তখন বাংলা সাহিত্যে অচেনা ছিল। তিনি আলোচনা করেছেন মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের রচনা নিয়ে (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে)।

প্রগাঢ় রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজিতে রচিত তাঁর গবেষণা গ্রন্থের বিষয় ছিল পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যের বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথের রচনার রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রস্থল এবং বিস্তার তিনি সহজেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। 'রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষা' (প্রথম খণ্ড ১৯৬৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭০) গ্রন্থে সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে চিত্রা পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের অত্যন্ত সুন্দর রসবিচার ও শিল্পবিচার করেছেন তিনি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা পদ্ধতি প্রধানত ব্যক্তিগত রসাস্বাদনবাদী (ইম্‌প্রেশনইস্টিক)। এই পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী মোটের উপর এই ধারারই সমালোচক। কিন্তু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি এই রসাস্বাদী মনোভঙ্গির সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক (এ্যাকাডেমিক) অধ্যয়নের শৃঙ্খলাকেও যথাযথভাবে যুক্ত করেছিলেন। যদিও এ্যাকাডেমিক আলোচনায় অনেকসময় যে তথ্যসংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যবহৃত হয়; বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিতর্কের অবতারণা করা হয় তা তিনি তাঁর আলোচনায় কোথাও-ই আনেননি। এক্ষেত্রে তাঁর নিজের কথাই আমরা গ্রহণ করতে পারি—''আমি জ্ঞাতসারে কোনও বিশেষ সমালোচনারীতি অনুসরণ করি নাই প্রাথমিক সূত্রের আলোচনা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ কবি বা সাহিত্যিকের মধ্যে এই সূত্রসমূহের ব্যাবহারিক প্রয়োগ, তাঁহাদের সৌন্দর্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের নির্ধারণ ও রসোপভোগ প্রয়াসই আমার নিকট অধিক প্রয়োজনীয় ও আদরনীয় বলিয়া মনে হয়। কাজেই যাঁহারা সাহিত্যলোচনায় সৌন্দর্যতত্ত্ব বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেন, তাঁহারা হয়ত এই রচনাগুলিতে পূর্ণ পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারিবেন না।''—[ভূমিকা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, দোল পূর্ণিমা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবেই এই সমালোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের রোমান্টিক ও ভিক্টরীয় কাব্যধারা ছিল তাঁর প্রিয়। বাংলা সাহিত্যের আলোচনাতেও তিনি তাঁর এই মনোভঙ্গিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইম্‌প্রেশেনিস্টিক সাহিত্য সমালোচনার কিছুটা ভিন্ন ধরনের একটি রীতি তিনি প্রবর্তিত করতে পেরেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

৬.৯ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : (১৯১১-১৯৬৪)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বনামধন্য সাহিত্যিক হলেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ১৯১১ খ্রিঃ অধুনা পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার চন্দ্রহার অঞ্চলে তাঁর জন্ম। ১৯৩৫ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রিঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯৩৯ খ্রিঃ তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রিঃ তিনি বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপক হন এবং ১৯৫৫ খ্রিঃ বাংলাভাষার 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। তিনি তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ও সংবাদপত্রের লেখক ছিলেন।

শশিভূষণ রচিত গ্রন্থগুলি হল : 'উপমা কালিদাসস্য' (১৯৩৮), 'বাংলা সাহিত্যের নবযুগ' (১৯৩৮), 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩), 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' (১৯৪৪), 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' (১৯৪৫), 'ত্রয়ী' (১৯৪৬), 'শিল্পলিপি' (১৯৫১), 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে' (১৯৫২), 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পর্যায়' (১৯৫৫), 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' (১৯৬০), অধ্যাপনা বৃত্তির সঙ্গে নিয়মিত অধ্যয়ন এবং গবেষণাকে যাঁরা আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করতেন শশিভূষণ তাঁদেরই একজন। ইংরেজি এবং বাংলা দুই ভাষাতেই তাঁর উচ্চ মানের গবেষণা গ্রন্থ আছে। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তবে প্রাচীন ভারতের ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণা তাঁর বিশেষ ক্ষেত্র ছিল।

শশিভূষণের প্রথম গবেষণা গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা 'Obscure Religious Cults as background of Bengali literature'. প্রকাশ কাল ১৯৪৬। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি এবং অনেক ক্ষেত্রে বিষয় ছিল বাংলার বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম। এই লৌকিক ধর্মের যথার্থ ব্যাখ্যা ভিন্ন প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ব্যাখ্যা অসম্ভব। এ বিষয়ে পূর্ণায়ত আলোচনার অভাব ছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'—নামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বিষয়টির আংশিক আলোচনা আছে। এবং সেখানে উপনিষদের পটভূমিকায় 'রবীন্দ্র মানস' (১৯৬১), 'টলস্টয়, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬২), 'ঘরে বাইরের সাহিত্যচিন্তা' (১৯৬২) এবং 'ক্ষণদর্শন' (১৯৬৩) পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের সংগৃহীত তথ্যই ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন তথ্য খুব কমই আছে।

শশিভূষণ তাঁর উল্লেখিত গবেষণা গ্রন্থে বাংলায় প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম এবং এই ধর্মের একটি বিশেষ শাখার ভিত্তিতে গঠিত সহজিয়া ধর্মের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার ভিত্তি ছিল পূর্ববর্তী মনীষী মণীন্দ্রমোহন বসুর মতোই দার্শনিক। এই গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে নাথধর্ম এবং ধর্মঠাকুর উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁর মৌলিক চিন্তনের চিহ্ন লক্ষিত হয়।

তাঁর অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে আছে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা, ভারতীয় ধর্মচিন্তার বিভিন্ন দিক এবং প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ভারতীয় সংস্কৃতি।

চোদ্দোটি বাংলা সমালোচনা গ্রন্থ লিখেছিলেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত। তার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় দর্শন ছাড়াও আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন দিকও আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা প্রাচীন ধর্ম দর্শনের দিকগুলিকে তিনি আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। বিশেষ উল্লেখ্য 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ', 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' এবং 'বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগীতি'। আলোচনার বিষয়বস্তু গ্রন্থগুলির নামেই প্রকাশ। প্রথম দুটি গ্রন্থের ক্ষেত্রেই দেখা যায় শাস্ত্র-উল্লিখিত তথ্য, দার্শনিকতার উপাদান এবং তার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ কথা ও শাক্ত সাধনার লৌকিক দিকটিকে শশিভূষণ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই লোকায়ত ধারাটিকে ভারতীয় ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানেই শশিভূষণ দাশগুপ্তের চিন্তা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর দৃষ্টি কোনো জায়গাতেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল না। বিশেষত শক্তিসাধনা সম্পর্কিত গ্রন্থটি প্রধানত লোকসাহিত্যকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পৃথক গ্রন্থ ছাড়াও টলস্টয়, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক তুলনাত্মক আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রবন্ধের কয়েকটি সংকলনে তাঁর সাহিত্য সংক্রান্ত আগ্রহের নানা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়' গ্রন্থটি। রবীন্দ্র-উত্তর পর্বের কবিতা সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ কত জীবন্ত এবং ধারণা কত স্বচ্ছ ছিল এই বইটিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬.১০ প্রমথনাথ বিশী : (১৯০১-১৯৮৫)

বাংলাসাহিত্যে সুসাহিত্যিক ও সুসমালোচকরূপে প্রমথনাথ বিশীর নাম উল্লেখযোগ্য। অধুনা পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলার জোয়াড়ী গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন বনেদী জমিদার নলিনীনাথ বিশী। বালক বয়সে প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। সেখানে তিনি অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রেরণাদাতা রূপে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন (১৯১৯ খ্রিঃ)। এরপর রাজশাহী কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯২৯ খ্রিঃ বি. এ. এবং ১৯৩২ খ্রিঃ বাংলায় এম. এ.-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৬ খ্রিঃ থেকে দশবছর তিনি রিপন কলেজে পড়িয়েছেন। এ সময় তিনি ১৯৪২ খ্রিঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন ও বছরতিনেক কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৪৬ খ্রিঃ তিনি সাংবাদিকতায় চলে আসেন। ১৯৫০ খ্রিঃ তিনি লেকচারার হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ও পরে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হন।

প্রমথনাথ বিশী ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বত্রচারী। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ— সবই তিনি লিখেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এটাই যে এই প্রতিটি ধারাতেই তাঁর নাম ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে। প্রাবন্ধিক প্রমথনাথ বিশী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা এই দুই মহৎ লেখক সম্বন্ধে যে কোনো গবেষণায় অবশ্য পাঠ্য। সাহিত্যবোধ, সাহিত্যজ্ঞান এবং সাহিত্যসৃষ্টির মৌলিক প্রতিভার সম্মিলনে রচিত তাঁর বিশেষ ধরনের নিবন্ধ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি। এছাড়াও সরস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি।

তাঁর রবীন্দ্র-চর্চার কথাই সর্বপ্রথমে উল্লেখ্য। শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্বের ছাত্র প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথকে নিবিড়ভাবে জেনেছিলেন। অথচ প্রগাঢ় রবীন্দ্র-অনুরাগ সত্ত্বেও স্পষ্টভাষী এবং নিজস্ব চিন্তনের অধিকারী প্রমথনাথ তাঁর প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ'-তেই (১৯৩৯) তার পরিচয় দিয়েছেন। 'রবীন্দ্রকাব্যে দোষ' নামে একটি অধ্যায় সংযোজন করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি এবং সেখানে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথের অতিকথন প্রসঙ্গ। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্য-বোধের কত গভীরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর পরিণত বয়সে লেখা 'রবীন্দ্র সরণী' গ্রন্থে (১৯৬২)। অতঃপর তিনি দুই খণ্ডে 'রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ' (১৯৪৯) নামক বিশাল গ্রন্থ লিখেছেন; 'রবীন্দ্র বিচিত্রা' (১৯৫৪) নামক গ্রন্থে আছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার আলোচনা। এছাড়াও 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (১৯৫৪) অবশ্য পাঠ্য এক গ্রন্থ। বহু জিজ্ঞাসাকেই তিনি তুলে ধরেছেন এখানে। 'মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১), 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭২), 'মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৪), ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর তথ্য-সন্ধানী গবেষকচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও প্রমথনাথ বিশী স্বকীয় উপলব্ধি নির্ভর অর্থাৎ ইমপ্রেশনিস্টিক প্রবন্ধই লিখেছেন সারা জীবন, তবু যে কোনো সমালোচককেই যে তথ্য-সন্ধানী হতে হয় তার পরিচয়ও আমরা তাঁর লেখায় যথেষ্ট পরিমাণে পাই। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' (১৯৪৪), লেখকের স্মৃতিসরস আত্মজীবনের অংশ। কিন্তু লেখক অনেকটাই বজায় রেখেছেন নৈর্ব্যক্তিকতা। নিজের কথায় জায়গায় শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট মানুষদের কথা, প্রকৃতির কথা এবং উৎসব অনুষ্ঠানের কথাই তিনি বেশি করে লিখেছেন। সেদিক থেকে লেখাটিকে খানিকটা

আকরগ্রন্থ বলা যায়। তাঁর বিশেষ আকর্ষক গ্রন্থ হল 'বাংলা সাহিত্যে নরনারী' (১৯৫৩)। এক একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে এক একটি নিবন্ধ।

অক্লান্ত লেখক ছিলেন তিনি। সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের আলোচনায় ছিল তাঁর আনন্দ। তাই একদিকে যেমন লিখেছেন 'মাইকেল মধুসূদন : জীবনভাষ্য' (১৯৪১), 'চিত্রচরিত্র' (১৯৪৮) নামক গ্রন্থে উনিশ শতকের বাংলার মণীষীদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমুজ্জ্বল জীবনকথা, অন্যদিকে 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' (১৯৫৩) গ্রন্থে সাহিত্যের কাল্পনিক চরিত্রদের নিয়ে রচনা করেছেন মনোরম বিবরণী। এই চরিত্রগুলির মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত, ঠকচাচা, মুচিরাম গুড় ইত্যাদি চরিত্র আলোচিত হয়েছিল। লেখকের দৃষ্টিকোণের একটি পরিচয় এর মধ্যে পাই।

'বিচিত্র উপল' (১৯৫২) নামক প্রবন্ধ সংকলনে তাঁর বহু পঠন ও চিন্তন-সমৃদ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় বিদ্যা-জীবিতাই ছিল তাঁর আনন্দের উৎস। এখানে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিচিত্র। যেমন 'গোরুর গাড়ি', 'মহাত্মা গান্ধির লাঠি', 'গদ্যকবিতা', 'উজ্জয়িনীর গলি', 'সিঁদকাটা', 'শোনপাপড়ি' ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে শিক্ষা পরিস্থিতি বিষয়ক অনেক প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। এই গ্রন্থে হাস্যরসাত্মক লেখাও আছে অনেকগুলি। প্রমথনাথ বিশী একজন বিরল লেখক যিনি প্রবন্ধের গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিগত রসোপভোগের কৌতুকরম্য দৃষ্টিকে সুন্দরভাবে মেলাতে পেরেছিলেন এবং ভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধস্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বঙ্কিমপ্রীতি এবং বঙ্কিম-সাহিত্যের নিবিড় পরিচয় আছে। কিন্তু বিশেষ উল্লেখ্য 'বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল' (১৯৭৭) গ্রন্থটি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈষৎ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী প্রমথনাথ বিশীর ভাবনার জগতে আধুনিকতার প্রতি আগ্রহ কতটা ছিল তার প্রমাণ 'যানযন্ত্র ও সাহিত্য', 'সংস্কৃতি ও বেকার', 'নবস্বাক্ষর' ইত্যাদি প্রবন্ধ।

জীবনী রচনার দিকে তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল। 'জওহরলাল নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' (১৯৫১), 'গান্ধি জীবনভাষ্য' (১৯৭১) প্রভৃতি বই যেমন লিখেছেন তেমনই 'বাংলার লেখক' (১৯৫০) ও 'বাংলার কবি' (১৯৫৯) গ্রন্থদ্বয়ে উনিশ শতকের সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'বিচিত্র সংলাপ' বইটি খুবই অভিনব ধরনের। পুরাণের ও ইতিহাসের চরিত্রগুলিকে এক জায়গায় এনে তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে জগৎ, জীবন ও মানুষকে সার্বিকভাবে রূপায়িত করবার প্রয়াস এই লেখাগুলিতে। এখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেছেন জাবালি, মেনকার সঙ্গে বিশ্বামিত্র। আবার যিশুখ্রিস্ট ও জুলিয়াস সিজার, মোহনলাল ও মিরজাফর, মধুসূদন ও ভারতচন্দ্র এঁদের কথাও আছে। এই রচনাশৈলি পরবর্তী কালে একাধিক লেখক গ্রহণ করেছিলেন।

প্রমথনাথ বিশীর কোনো লেখাই অযত্নে কৃত বা অকিঞ্চিৎকর নয়। সবগুলির মধ্যেই তাঁর সজীব ও সাহিত্য-প্রীতি নিষিক্ত মনের পরিচয় পাই। 'কমলাকান্ত শর্মা' ছদ্মনামে তিনি ধারাবাহিক রস্য-নিবন্ধ (ফিচার) লিখেছিলেন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে তিনি বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

৬.১১ সুশীলকুমার দে : (১৮৯০-১৯৬৮)

সুশীলকুমার দে-র প্রধান পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের গবেষক রূপে। যদিও তাঁর নিয়মিত অধ্যয়নের বিষয় ছিল ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য। তিনি ইংল্যান্ড-এ গিয়ে সংস্কৃত রসশাস্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করেন। পরে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর প্রধান কীর্তি সংস্কৃত সাহিত্য এবং অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় এবং তত্ত্ববিশ্লেষণে। সেইসঙ্গে বাংলার বৈষ্ণবধর্মে প্রামাণিক ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন। মহাভারত সম্পাদনায় তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। বাংলাসাহিত্যের এক বিশেষজ্ঞ সমালোচক রূপে তিনি

পরিচিত। সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিভিন্ন বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে একটি প্রাচীনপন্থী গবেষণার ধারা বাঙালিদের মধ্যে ছিল। যে কোনো প্রাচীন পন্থার মতোই সেই গবেষণায় সংস্কৃত গ্রন্থাবলির অভিমত ও বিধানকেই শিরোধার্য করা হত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে সংস্কৃত চর্চা শুরু করেন প্রধানত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই। এই পদ্ধতিতে পুথির, পাঠ, কাল উৎস ইত্যাদির নির্ণয়; শিলালেখ মুদ্রা কুলজি ইত্যাদি উপাদানের পরিগ্রহণে বৈজ্ঞানিকভাবে সংস্কৃতচর্চা শুরু হল। এই ধারা গ্রহণ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সুশীলকুমার দে হরপ্রসাদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ যাতায়াতের সূত্রে। আধুনিক পদ্ধতিতে গবেষণার আগ্রহ তিনি সেখান থেকে পেয়েছিলেন।

লন্ডন এর স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ সংস্কৃত রসসাহিত্যের ইতিহাস ও তত্ত্ব নিয়ে সুশীলকুমার আলোচনা করেছিলেন। আলংকারিক কুন্তকের মৌলিকতা প্রতিষ্ঠায় তাঁর সার্থকতা উল্লেখযোগ্য। তাঁর কীর্তি হিসেবেই এ কাজটিকে ধরা হয়। সেইসঙ্গে ধ্বন্যালোক-এর অভিনব গুপ্ত রচিত লোচন টীকার সম্পাদনাও তিনি করেছিলেন। পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত মহাভারত সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় মণীষা ও পাণ্ডিত্যের আদর্শ রূপে সমাদৃত। এছাড়াও অন্যান্য সংস্কৃত কাব্য তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যে গবেষণামূলক সম্পাদনার আদর্শ হিসেবে সেগুলি উল্লেখযোগ্য।

এখানে বলে রাখা ভাল যে সুশীলকুমারের অধিকাংশ লেখাই ইংরেজি ভাষায় রচিত। কিন্তু বাংলার সমাজ সাহিত্য এবং ধর্মতত্ত্বই তাঁর আলোচনার বিষয় বলে তাঁকে বাঙালি প্রবন্ধকারদের মধ্যেই গ্রহণ করা হয়।

ইংরেজিতে লেখা এরকম দুটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ ‘Bengali Literature in the Nineteenth Century 1800-1825’ এবং ‘Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal’। বাংলা ভাষায় রচিত সুশীলকুমারের দুটি সমালোচনা গ্রন্থ আছে—শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা রূপে প্রদত্ত ‘দীনবন্ধু মিত্র’ (১৯৫১) বইটি নামাঙ্কিত লেখাতে জীবন ও কর্মের আলোচনা। অন্য বইটির নাম নানা নিবন্ধ—নির্বাচিত প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রবন্ধগুলি বিভিন্নধরনের। যেমন আছে বৈদিক সাহিত্যের ব্রহ্মবাদিনী নিয়ে লেখা তেমনই আছে গীতগোবিন্দ নিয়ে প্রবন্ধ আবার অক্ষয়কুমার বড়াল ও মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত কিন্তু সুশীলকুমারের সাহিত্যিক রুচি আজকের বিচারে ঈষৎ রক্ষণশীল মনে হবে। ব্যক্তিমনের অভিক্ষেপণমূলক রোমান্টিক ধরনটি তিনি খুব বেশি পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। তিনি ছিলেন মোহিতলাল মজুমদারের বন্ধু। মোহিতলালের সাহিত্যিক অভিমতের সঙ্গে তাঁর মতামতের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

বাংলাসাহিত্যে সুশীলকুমার দে-এর অসাধারণ কীর্তি ‘বাংলা প্রবাদ’ (১৯৪৫) সংকলন। এই মণীষীরা স্বদেশীয় লোকায়ত জীবনের প্রতি কতটা অনুরাগ পোষণ করতেন তা এইসব কাজ থেকেই বোঝা যায়। সংস্কৃত সাহিত্য আর বৈষ্ণবদর্শন নিয়ে কাজ করবার পাশাপাশি বাংলার প্রবাদ নিয়েও তাঁর গভীর ভাবনা আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। তাঁর আগেও এ ধরনের কাজ কেউ কেউ করেছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বোঝা যায় তাঁর ভূমিকাটি থেকে।—

“জাতির যে রসচেতনার উপর বাংলা ভাষার এই অধুনা বিরল প্রকাশ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, তাহার একটি বিশিষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাই বাংলা প্রবাদগুলির মধ্যে। ইহা এত সহজ ও স্বভাবানুগত যে অসংখ্য প্রবাদ বা প্রবাদের টুকরা বাংলা idiom বা বাক্যরীতিতে অবাধে মিশিয়া গিয়া ভাষার ভিত্তিমূল গঠিত করিয়াছে।.....জাতির ভাষা ও জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। আধুনিক তথাকথিত অভিজাত সাহিত্যের ভাষায় মনের সৌখিনতা আছে, কিন্তু জীবনের স্পন্দন নাই।”

বাংলা ভাষায় রচিত মনন সাহিত্যে এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সংস্কৃতি-সম্পর্কিত গবেষণা গ্রন্থে দুদিক থেকেই সুশীলকুমার দে বাঙালির চিন্তাজগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেইসঙ্গে বাংলার সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিয়েছেন গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে। 'দীনবন্ধু মিত্র' (১৯৫১) ও 'নানা নিবন্ধ' (১৯৫৩) তাঁর রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

৬.১২ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : (১৮৯০-১৯৭৭)

বঙ্গবিদ্যাচর্চার বৃত্তে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্মানিত পরিচয় হল 'ভাষাচার্য'। তিনি প্রধানত ছিলেন গবেষক। তাঁর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালির ভাষা এবং নির্মীয়মান যুগের বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় পরিস্ফুট হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রধান কয়েকজন মনীষীর সঙ্গেই তুলনীয়। ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়া আর যে-বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলি দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পূর্ব এশিয়া ভ্রমণে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত' বইটি তার উদাহরণ। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান কীর্তি তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা। তাঁর আগে বাংলা ভাষায় ভাষা-বিষয়ক গবেষণা এইভাবে আর কেউ করেননি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আর এক বাঙালি ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন অনুজ সহধর্মী এবং বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন; প্রথম পর্বে সুকুমার সেন ছিলেন সুনীতিকুমারের ছাত্রের মতোই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে উজ্জ্বল ছাত্র সুনীতিকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিরই অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু প্রথম থেকেই গবেষণার জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন তুলনাত্মক ব্যাকরণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে ভাষা নিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক আলোচনার একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে উঠেছিল বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন অগ্রণী। সুনীতিকুমার ভাষাচর্চা বিষয়টিতে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন বিশেষভাবে। তাই বাঙালির ভাষাচর্চায় বিজ্ঞানমনস্কতার স্থান তিনিই প্রথম নির্দেশ করেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ODBL (১৯২৬)-তারই নিদর্শন।

উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে যাঁরা ভাষাচর্চা করতেন তাঁরা প্রধানত সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিনীতিকেই অনুসরণ করতেন। এই ধারা থেকে আলাদা করে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপের বিচার বিস্তৃতভাবে সুনীতিকুমারই করেন। বাংলা উচ্চারণ নীতিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টায় যে গ্রন্থ (The sounds of modern Bengali) তিনি লিখেছিলেন তা সে যুগে কেউ কল্পনাও করতে পারত না। বাংলা ভাষাকে তুলনাত্মক ভাবে বিশ্বের অন্যান্য ভাষাগুলির সমান্তরালে স্থাপন করাও তাঁর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

সুনীতিকুমারের গবেষণার এক যুগান্তকারী দিক হল বাংলাভাষার গঠনে ইন্দো ইউরোপীয় এবং আর্য ভাষাগুলির উপাদান ছাড়া দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গলয়েড প্রভৃতি জাতির ভাষাগত উপাদান সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। নিজেদের আর্য ভাবতে অভ্যস্ত বর্ণহিন্দু বাঙালি এই দিকটিকে কখনও গুরুত্ব দেয়নি। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এই সত্যের স্বীকৃতি ছিল। তিনি এ বিষয়ে যা লিখেছেন তার মূল কথাটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'আর্য-অনার্য' (সাংস্কৃতিকী, তৃতীয় খণ্ড ১৯৮২) নামক প্রবন্ধে।—

'বাঙালি জাতি হচ্ছে মূলত মিশ্র অন-আর্য জাতি, আর্যভাষা আর আর্য সভ্যতা নিয়েছে মাত্র, তাও খুব প্রাচীনকালে নয়। বাঙলাভাষার রীতিনীতি হচ্ছে আর্যেতর উপাদান, অর্থাৎ ধাতু শব্দ প্রভৃতি আর্যভাষার, কাঠাম বা রূপ হচ্ছে অনার্য। বাঙলা ভাষার ঠিক ইতিহাসটি বার হলে যে জাতের মধ্যে এ ভাষার উদ্ভব, সেই বাঙালি জাতের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হবে। বাঙলার অনার্য ভাষীর মুখে মাগধী অপভ্রংশ বদলে বাঙলা ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে। বাঙলা ভাষার চর্চার প্রাকৃত সংস্কৃত পড়া দরকার, কিন্তু কোল্-দ্রাবিড়-বোড়োর চর্চাও বাঙালির ভাষার

আর জাতীয় উৎপত্তির আলোচনার পক্ষে খুব বিশেষভাবে উপযোগী,....'—এই ভাষা গবেষণার সূত্র ধরেই বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং নৃতাত্ত্বিক বিচারে ভারতীয়দের বহুজাতিকতা সংক্রান্ত সত্যটিকে তিনি প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তাঁর গবেষণার ফলেই দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় সভ্যতার যথার্থ স্থানটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রথম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে পারি আর একটি প্রবন্ধে— 'যতদিন থেকে হিন্দু সভ্যতা বললে যা বুঝি, যে মনোভাব, যে-চিন্তাপ্রণালী বুঝি, তা সৃষ্ট হয়ে রূপ ধরে মূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভারতের আর্য আর অনার্যের সভ্যতা রীতিনীতি ধর্ম আর মনোভাবের অপূর্ব মিশ্রণের ফলে, আর আর্য ভাষা সংস্কৃত আর পালি প্রভৃতি তথা দ্রাবিড় ভাষা তামিল ইত্যাদিকে অবলম্বন করে ক্রমে তার ভাবগুলি আর তার শাস্ত্র জমাট বেঁধে উঠেছে....'

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলিতে তাঁর জাগ্রত মনের পরিচয় বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানের বহুবিচিত্র শাখার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। ভারতীয় বাতাবরণে বহু ধর্মের যে সমন্বয় ঘটেছে তারও বিজ্ঞানমনস্ক আলোচনা তিনি করেছিলেন। কোনো ক্ষেত্রেই কূপমণ্ডুকতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। জ্ঞানচর্চাকে বিশ্বমনস্কতার সঙ্গে সম্মিলিত করাই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। সুনীতিকুমার রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল : 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' (১৯২৯), 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৯৩৮), 'ইউরোপ' (১ম খণ্ড : ১৯৩৮), 'পশ্চিমের যাত্রী' (১৯৩৮), 'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০), 'বৈদেশিকী' (১৯৪৩), 'ভারত-সংস্কৃতি' (১৯৪৪), 'ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা' (১৯৪৪), 'সাংস্কৃতিকী' (১ম খণ্ড : ১৯৬২, ২য় খণ্ড ১৯৬৫, ৩য় খণ্ড : ১৯৮২), 'পথ-চলতি' (১ম খণ্ড : ১৯৬২, ২য় খণ্ড : ১৯৬৪), 'মণীষী-স্মরণে' (১৯৭২), 'সংস্কৃতি, শিল্প, ইতিহাস' (১৯৭৬) ইত্যাদি।

৬.১৩ রাজশেখর বসু : (১৮৮০-১৯৬০)

বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসু বা পরশুরাম এক স্বনামধন্য স্রষ্টা। তাঁর অসাধারণ রসরচনা বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধিদান করেছিল। তাঁর জন্ম নদিয়া জেলার বীরনগরে। পিতা ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার দার্শনিক পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বসু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম হন (১৯০০ খ্রিঃ)। ১৯০৩ খ্রিঃ বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে সামান্য বেতনে নিযুক্ত হয়ে কালক্রমে উক্ত সংস্থার পরিচালক হন।

রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল : 'লঘুগুরু' (১৯৩৯), 'ভারতের খনিজ' (১৩৫০), 'কুটীর শিল্প' (১৩৫০), 'বিচিন্তা' (১৩৬২)। অনুবাদ : বাল্মীকি রামায়ণ' (১৩৫৩), 'মহাভারত' (১৩৫৬)।

রাজশেখর বসু পরশুরাম নামে প্রখ্যাত ছোটোগল্পকাররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু রূপেও তিনি কম পরিচিত হন। তাঁর গবেষণামূলক কাজের মধ্যে সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত থেকে করা স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর প্রধান পরিচিত ভাষা চিন্তা সংক্রান্ত রচনার জন্য। আমরা দেখেছি যে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত চিন্তার একটি পরম্পরা সৃষ্টি হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্ন থেকেই বিংশ শতাব্দীতে সেই ধারা আরও জোরালো হয়। বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার, বাংলা পরিভাষা নির্মাণ, বাংলা বাক্যগঠনের রীতি, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা অভিধান—সবদিকেই পণ্ডিতজনের অনলস প্রয়াস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পরম্পরারই প্রতিভাবান ধারক ও বাহক ছিলেন রাজশেখর বসু। তাঁর সংকলিত অভিধান চলন্তিকা সর্বদা ব্যবহার যোগ্য, সংক্ষিপ্ত, একখণ্ড বাংলা অভিধান হিসেবে এখনও বাংলা অভিধানগুলির অগ্রগণ্য। বাংলা পরিভাষা সংকলনের জন্য যে সমিতি

স্থাপিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি পরিভাষা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে পরিভাষার সংজ্ঞা, লক্ষণ এবং সমস্যাবলির আলোচনায় তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভাষারীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায় যে তিনি চলিত ভাষার পক্ষে ছিলেন। যদিও সেই চলিত ভাষা একান্ত লঘু হয়ে যায় তা তিনি সমর্থন করেননি। তাঁর মতে—''এমন লৈখিক ভাষা চাই যাতে প্রচলিত সাধুভাষা আর মার্জিত জনের মৌখিক ভাষা দুই এরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্‌সংকোচ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিকভাষার সহজ প্রকাশশক্তিও হারাতে চাই না। চলিত ভাষার লেখকরা একটু অবহিত হলেই সর্বগ্রাহ্য সর্বপ্রকাশক লৈখিকভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করবে। বলা বাহুল্য, গল্পাদি লঘু সাহিত্যে পাত্রপাত্রীর মুখে সবরকম ভাষারই স্থান আছে, মায় তোতলামি পর্যন্ত।''—মার্জিত চলিত ভাষাই যে বাংলা মনন সাহিত্যের স্বাভাবিক বাহন হতে চলেছে এই সত্যটি যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠা করায় তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে দেখা যায় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। রম্যপ্রবন্ধের সরসভঙ্গিতে অনেক প্রবন্ধই তিনি লিখেছেন যেগুলিতে সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা এবং ঔচিত্য বোধের পরিচয় আছে। ভেজাল সম্পর্কে, ধর্মবিশ্বাসের নামে মনের স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বিষয়ে সাহিত্যের নব্যধারা সম্পর্কে মানবচরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন টিপ্পনীসহ লিখিত রচনায় তাঁর মনের এই দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিকেই বাংলাসাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট সংযোজন বলা যেতে পারে।

রসরচনা ছাড়াও 'লঘু গুরু' (১৯৩৯), 'বিচিন্তা' (১৩৬২), 'ভারতের খনিজ' (১৩৫০), 'কুটির শিল্প' (১৩৫০) নামে প্রবন্ধগ্রন্থাদিও বিখ্যাত। ১৯৩৭ খ্রিঃ তাঁর অসামান্য কীর্তি বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হয়। তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত', হিতোপদেশের গল্প' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৬.১৪ সুকুমার সেন : (১৯০১-১৯৯২)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় ও বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে সুকুমার সেন এর নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় তাঁর আচার্যদেব বা শিক্ষাগুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসের তথা রসজ্ঞানের সমাবেশ হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক বিষয় বলে বিবেচনা করলে তাঁকে বৈজ্ঞানিকই বলা উচিত। তাঁর পাণ্ডিত্য কেবল বিশেষ একটা পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, ইংরেজি, বাংলা ও নানাভাষায় এবং ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি নানাদিকে বিস্তৃত। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন সহৃদয়, সুরসিক ও বন্ধুবৎসল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ও বিভাগীয় অধ্যক্ষরূপে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' (১৯৩৯), 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ : ১৯৪০, ১ম খণ্ড অপরাধ : ১৯৪২, ২য় খণ্ড : ১৩৫০, ৩য় খণ্ড : ১৩৫৩, ৪র্থ খণ্ড : ১৩৬৫) ও 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৬) গ্রন্থ দুটি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য আকর গ্রন্থ। এ ব্যতীত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪), 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি' (১৯৪৩), 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি' (১৯৪৫), 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' (১৯৫১), 'বিচিত্র সাহিত্য' (১৯৫৬), 'পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রবিকাশ' (১৯৬২), 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ' (১৯৭০), 'রামকথার প্রাক্ ইতিহাস' (১৯৭৭), 'ভারতকথার গ্রন্থিমোচন' (১৯৮১), 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৬১), 'বঙ্গভূমিকা' (১৯৭৪), 'রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু', বনফুলের ফুলবন' (১৯৮৩), 'নট, নাট্য, নাটক' (১৯৬৫), 'ক্রাইমকাহিনীর কালক্রান্তি' (১৯৮৮), প্রভৃতি। তাঁর রচিত বিখ্যাত আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ 'দিনের পরে দিন যে

গেল' (১ম পর্ব : ১৯৮২, ২য় পর্ব : ১৯৮৬)—এটি শুধু আত্মজীবনীই নয়, আমাদের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং শিক্ষা পরিবেশের এক ব্যাপ্ত ও জীবন্ত চলচ্চিত্র এই সূত্রে উন্মেচিত হল আমাদের চোখের সামনে। তাঁর 'রামকথার প্রাক ইতিহাস' গ্রন্থটিতে রামায়ণ সম্পর্কিত তুলনামূলক আলোচনা। 'ভারতকথার গ্রন্থিমোচনে' মহাভারতকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যে সকল অনূদিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা এবং মহাভারত সম্পর্কিত 'Myth' গুলির তথ্যানুসন্ধান এতে রয়েছে। 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' ভারতীয় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার সাহিত্য কোশের তুল্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' পাঠ করে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে স্মর্তব্য—''বাংলাসাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়িনি। গ্রন্থকার তাঁর বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত পুস্তকগুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তাতে করে তাঁর গ্রন্থ একসঙ্গে ইতিহাস এবং সংকলনে সম্পূর্ণ হয়েছে.....এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্যবৃদ্ধি করেছে।''

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর গবেষণার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—

(১) কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীর সত্যাসত্য বিচার।

(২) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির ও কাব্যের প্রাচীনত্ব নির্ণয়।

(৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে অপর নবীন আর্য ভাষার সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির তুলনা।

(৪) মনসামঙ্গলের সবচেয়ে পুরনো কবির ও তাঁর কাব্যের পরিচয় উদঘাটন।

(৫) ব্রতগীত পাঞ্চালি শাখার অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী ভাবনা ও রূপকল্পনার বিবরণ দান।

(৬) সভাসাহিত্যের স্বরূপ নির্ধারণ।

(৭) চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল নির্ণয় ও চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থের গুরুত্ব নির্ধারণ।

(৮) বৈষ্ণব পদাবলির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস নির্ণয়।

(৯) ইসলামি বাংলা সাহিত্য পরিচয় দান।

(১০) ধর্মকথা ও ধর্মমঙ্গলের স্বরূপ উদঘাটন।

প্রাবন্ধিক সুকুমার সেনের আগ্রহ ছিল বহুদিকে বিস্তৃত। তিনি প্রধানত ভাষাতত্ত্ববিদ এবং সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতা রূপেই প্রতিভাত হন। ইন্দো-ইরানীয় ভাষা, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা এবং মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে যে গবেষণা-গ্রন্থগুলি তিনি প্রকাশ করেছেন সেগুলি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। তাঁর রচিত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' বইটির প্রধান গুরুত্ব হল বাংলা ভাষার নিজস্ব বিশিষ্টতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এখন সংস্কৃতের বিধিবদ্ধ আদর্শ ছাড়িয়ে মৌলিক বাংলা ব্যাকরণ রচনার যে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে তার আভাস সুকুমার সেনের লেখাতেই পাওয়া যায়। 'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দটির পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন 'শব্দবিদ্যা'। বিশেষভাবে বাংলা ভাষার পদবিধি এবং রূপপ্রক্রিয়ার আলোচনা তাঁর মৌলিক ভাবনার দৃষ্টান্ত। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার কথা তিনিই প্রথম বলেছিলেন।

সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাসও তাঁর অন্যতম কীর্তি। সাহিত্যের ইতিহাস একটি দেশের সার্বিক ইতিহাসের ধারণা থাকলে তবেই রচনা করা যায়। সেভাবেই সাহিত্যের ইতিহাস লেখবার চেষ্টা করেছেন সুকুমার সেন। তাঁর ইতিহাস ধারণা কোনো ধর্মবিশ্বাস বা পরম্পরাগত লোকশ্রুতি জাতীয় ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়। মুক্ত বৈজ্ঞানিক মন নিয়েই তথ্য সন্ধান এবং সেই তথ্য বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য যে তিনি প্রধান সাহিত্যিক এবং অপ্রধান সাহিত্যিক বলে কোনো বিভাজনকে বড়ো করে দেখেননি। জাতির মনোবিবর্তনের ধারা

প্রধানত অপ্রধান সব রচনার মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে সাহিত্যের ইতিহাসকারকে হতে হবে নিবাসক্ত এবং তুলে ধরতে হবে যে কোনো খুঁটিনাটি তথ্য। সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস এই আদর্শেই রচিত।

সাহিত্যের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের যবনিকা উন্মোচনে মিথ ও পুরাণের গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছেন। রামায়ণ এবং মহাভারতের সৃষ্টিকর্ম এবং কাব্য দুটির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে সুকুমার...সেনের আলোচনা ('রাম-কথার প্রাক্ ইতিহাস, 'ভারতকথার গ্রন্থিমোচন') বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

সুকুমার সেনের বৈদগ্ধ্য ভাষাতত্ত্ব থেকে সমাজতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের প্রাঙ্গণে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিচরণ করেছে। বঙ্গবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি প্রখর মণীষা ও গভীর আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন। ইসলামি বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ মুসলমান রচয়িতাদের লেখা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা সুকুমার সেন যেভাবে করেছেন তা পশ্চিমবাংলার অন্য লেখক করেছেন কিনা জানা নেই। বাংলায় নারীর ভাষা দিয়ে এই আগ্রহের সূচনা। অতঃপর বাংলা ধর্মচর্চা এবং আধ্যাত্মিক চর্যা নিয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ', 'বিদ্যাপতি গোষ্ঠী', 'চৈতন্যচরিতামৃত সম্পাদনা' 'বৈষ্ণব পদাবলীর ভূমিকা', 'চৈতন্যাবদনা'। এছাড়াও প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি', 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি', 'বঙ্গভূমিকা' ইত্যাদি গ্রন্থের উৎপত্তি ঘটেছে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর জানবার ও জানাবার আগ্রহ থেকে।

লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁকে একজন পথিকৃৎ বলা যায়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। বাংলার স্থাননাম নিয়ে লিখেছেন বই।

রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে তাঁর অনেক লেখাই পাওয়া যায় যেগুলিতে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের প্রমাণ।

মান্য সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলার লোককথা এবং উপকথাকে অবলম্বন করে যে গল্প সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল সেদিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল সুকুমার সেনের। এজন্য তিনি ভূতের গল্প, উপকথা, রূপকথা জাতীয় গল্পগুলির ভিত্তিতে অনেক আলোচনা করেছেন।

'ক্রাইম কাহিনীর কাল ক্রান্তি' নামে তাঁর অসামান্য প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি বিশ্বের গোয়েন্দা কাহিনি সম্পর্কে পরিচয় দান করবার চেষ্টা করেছেন। লিখনশৈলী সরস গল্পের মতো। কিন্তু বইটির উপাদান এবং উপকরণ বিশ্বকোশ ধরনের বইকে স্মরণ করায়। কেবল বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও এ ধরনের গ্রন্থ বিরল।

সুকুমার সেনের আত্মজীবনী 'দিনের পর দিন যে গেল' (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব) একই সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের কথা এবং বিংশ শতাব্দীর এক চিত্রময় বিবরণী হয়ে উঠেছে।

এছাড়াও তিনি লিখেছেন রেলগাড়ি সংক্রান্ত রস রচনা 'রেলের পা-চালি', এবং 'বটতলার ছবি ও ছড়া', 'কলিকাতার কাহিনী' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সাহিত্যরস সমৃদ্ধ প্রবন্ধ গ্রন্থ। সুকুমার সেনের প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানেই যে তিনি গল্পের মতো সরস করে প্রবন্ধ লিখতে পারেন।

৬.১৫ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (১৮৯৪-১৯৬১)

বাংলা সাহিত্য জগতে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন প্রথিত যশা সাহিত্যিক, চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়ায় তাঁর জন্ম। পিতা ভূপতি নাথ মুখোপাধ্যায়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এস. সি. পড়েন, পরের বছর রিপন কলেজ থেকে ইংরাজি অনার্স নিয়ে পড়া শুরু করেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পরের বছর বি. এ. পাশ করেন ও ১৯১৮ খ্রিঃ

এম. এ পাশ করে আইন পড়তে থাকেন। ১৯২০ খ্রিঃ অর্থনীতিতে এম. এ পাশ করেন। প্রথমে কিছুকাল বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২২ খ্রিঃ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। এরপর তিনি 'রীডার' ও বিভাগীয় প্রধান পদে উন্নীত হন। তিনি কিছুকাল আলিগড় (১৯৫৪-৫৯) বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিঃ হল্যান্ডের 'হেগ' শহরে ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সমাজতত্ত্ব বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর রূপে যোগ দেন। ১৯৫৩-৫৪ সেখানে 'Sociology of Culture' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় খুব বেশি প্রবন্ধ লেখেননি। তাঁর প্রবন্ধের সংকলন দুটি 'বক্তব্য' (১৯৫৭), ও 'চিন্তয়সী' (১৯৩৪), রম্য প্রবন্ধের সংকলন তিনটি। 'আমরা ও তাঁহারা' (১৯৩১), 'মনে এলো' (১৯৫৬) এবং 'কিলিমিলি' (১৯৬৫)। সেইসঙ্গে তিনি সংগীত বিষয়ক দুটি বই লেখেন—'সুর ও সঙ্গীত' (১৯৩৭), অপরটি 'কথা ও সুর' (১৯৩৮)। পারিবারিক পরিবেশেই তিনি অর্জন করেছিলেন সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি অনুরাগ, সেইসঙ্গে একটি মননশীল আলাপ আলোচনার পরিবেশ। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের আসরে তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সদস্য। তাঁর স্বভাবজ শিল্পসংস্কৃতির বোধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা প্রমথ চৌধুরী এবং সমমনস্ক অন্যান্য পণ্ডিতজনের সান্নিধ্যে উন্মুক্ত ও বিকশিত হয়েছিল।

তাঁর চিন্তন ও মননের ক্ষেত্র ছিল ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংগীত। তথা শিল্প সংস্কৃতি। বাংলা এবং ইংরেজি—দুই ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক যেসব প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন সেখানে উল্লেখযোগ্য সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণের অভিক্ষেপণ এবং মার্ক্সবাদের প্রয়োগ। রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী কালে যে শিক্ষিত বাঙালি যুবকেরা সাম্যবাদের তত্ত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং নিজেদের চিন্তন প্রক্রিয়ায় সাম্যবাদকে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদেরই একজন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেখানেও নিজেকে তিনি মার্কসিস্ট বলে দাবি করেননি। কারণ তাঁর মতে ব্যাবহারিক রাজনৈতিক প্রয়োগ ব্যতীত মার্ক্সবাদের তত্ত্বের যথার্থ মূল্য থাকে না। যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না তাই নিজেকে মার্ক্সবাদী না বলে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মনে করতেই তিনি পছন্দ করতেন। ক্রিয়া ও মতাদর্শের সর্বক্ষেত্রে তিনি মুক্তবুদ্ধির চর্চা ভালোবাসতেন এবং স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন।

তাঁর রচনার বিষয় ছিল সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র। সমাজের শ্রেণিবিভাজন সত্য সেই সত্যকে মেনে নিয়েও প্রতিটি শ্রেণির মধ্যে আদান প্রদান প্রয়োজন, গ্রাম ও শহরের মধ্যে সঙ্গতি সাধনের প্রয়োজন ইত্যাদি অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর আলোচনায় সমাজের যুবশ্রেণির প্রতি বিশেষ প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে এবং চিন্তার সচলতাকে তিনি বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। সামাজিক প্রগতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। মার্ক্সবাদের শিক্ষায় সমাজমন এবং ব্যক্তিমনের সমুন্নতি সাধিত হতে পারে—একথাই তিনি বলেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন রাজনীতির উত্তেজনার প্রতি কিছুটা অনীহাই প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে ভারতীয় রাজনীতি ভাবাবেগ ও উত্তেজনার স্থান ছিল গভীর। অথচ ধূর্জটিপ্রসাদের পছন্দ ছিল নিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্ত বিশ্লেষণ। তাই তিনি সমকালীন রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে তেমন পছন্দ করতে পারেননি। রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের মন মুক্ত ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠুক এমনই তিনি চাইতেন।

তাঁর মন্ময় প্রবন্ধের সংকলনগুলিতে কিছু কিছু সাহিত্য আলোচনা আছে। কোথাও কোথাও তিনি বিতর্কমূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। সর্বত্রই উজ্জ্বল বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং সুশিক্ষিত মনের আলোক রচনাগুলিকে আস্বাদ্য করেছে।

সংগীত সম্পর্কে রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলি বাংলাসাহিত্যের সম্পদ। প্রথম সবুজপত্রের আখরেই সংগীত সম্পর্কে বাংলা প্রবন্ধ স্থান পেতে শুরু করেছিল একথা উল্লেখ্য। মার্গ সংগীতের চর্চা তাঁদের পরিবারে ছিল। পরে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রসংগীতকে সামগ্রিক ভারতীয় সংগীতের চালচিত্রে উপস্থাপিত করে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছিলেন। এভাবেই ধূর্জটিপ্রসাদ বাংলা প্রবন্ধকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বাংলা প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের দান বিস্মৃত হবার নয়। একইসঙ্গে সাম্যবাদের দীক্ষা এবং ব্যক্তিমনের মুক্তবুদ্ধির স্বাধীনতা—এই দুটিকে তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন। এটাই তাঁর চিন্তা পদ্ধতির নবীনতা। সেইসঙ্গে সংগীত সম্পর্কে রচিত বাংলা প্রবন্ধের ধারায় তিনি অবশ্যই পথিকৃত রূপে মান্য।

৬.১৬ গোপাল হালদার : (১৯০২-১৯৯৩)

বাংলা কথা সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপকার ছিলেন গোপাল হালদার। ছাত্রজীবনের সূচনা পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে জুবিলী স্কুলে ১৯২২ এ ইংরাজি অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পাশ করেন। এরপর ইংরাজিতে এম. এ পাশ করেন। ১৯২৯-৩০ তিনি ফেনী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর কাছে কাজ শুরু করেন—'A short sketch of Noakhali Dialect of South Eastern Bengali'।

তৎকালীন 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'প্রগতি' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন।

তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে বৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার বিরল সমন্বয় ঘটেছিল। সাহিত্য, গবেষণা গ্রন্থ, ইতিহাস, রাজনীতি—সর্বত্রই তাঁর অনায়াস বিচরণ ছিল সাহিত্য জীবন ও রাজনীতি জীবন দুটিই তাঁর কাছে সত্য টানে।

বাংলা সাহিত্যের এক বিরল প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন গোপাল হালদার। কর্মব্যস্ত জীবন ছিল তাঁর। জীবনের বেশ কিছুটা অংশ কাটিয়েছিলেন কারাবাসে। তা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক সাহিত্যকৃতি তিনি রেখে গেছেন। তার মধ্যে যেমন আছে উপন্যাস তেমনই আছে প্রবন্ধ। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যাই বাইশটি। এছাড়া রম্যরচনার সংকলন আছে চারটি, আত্মজীবনী দু খণ্ড, নিছক গবেষণা-নিবন্ধ দুটি—ইংরেজি ভাষায় লেখা। বাইশটি প্রবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত বই, সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থ, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভারতের সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক বেশ কিছু লেখাও আছে। তাঁর এই মনন-সাহিত্যের সম্ভার বিভিন্ন দিক থেকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রথমেই তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির আলোচনা করা যেতে পারে। 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (দুখণ্ড : ১৯৫৭ ও ১৯৬৮), 'বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা' এবং 'ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা' (১৯৬১) ছাড়াও তিনি লিখেছেন 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা' (১৯৬৬), 'বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ' (১৯৮৬)। তিনি যেভাবে সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন সেভাবে সাধারণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয় না। বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মকে তুলে ধরাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি। কিন্তু গোপাল হালদার বিশেষভাবে আর্থ-সামাজিক পটভূমিকে প্রাধান্য দিয়ে তার সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয় করবার দিকে জোর দিয়েছেন। এইদিক থেকে গোপাল হালদারের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বাংলা ভাষায় ব্যতিক্রমী হয়ে আছে।

সংস্কৃতির যে কোনো একটি দিককে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস এমন কী ভূ-প্রকৃতি ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্বিত করে দেখবার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বলে গোপাল হালদার বাংলার সংস্কৃতির রূপ এবং সংস্কৃতির রূপান্তর বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার দিকে মনোযোগী হতে পেরেছিলেন। তিনি যে সময় বাঙালির সাংস্কৃতিক সমগ্রতাকে বোঝবার এবং লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন তা সেই সময়ের পক্ষে খুবই অভিনব ছিল। 'ভারতের ভাষা', 'বাণিজ্য জিজ্ঞাসা', 'জাতীয় সংহতি ও ভারতের ভাষাসমস্যা' ইত্যাদি প্রবন্ধে সমকালের বাস্তব প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বাঙালির সমস্যাকে সম্পর্কযুক্ত করে দেখবার প্রয়াসে সফল হয়েছিল তাঁর মনীষা।

এছাড়াও তিনি বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজি নজরুল ইসলাম এবং সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

'রূপনারানের কূলে' (তিন খণ্ড : ১৯৬৯ ও ১৯৭৯, ১৯৮৪—৮৫) গোপাল হালদারের আত্মজীবনীমূলক রচনা। রচনার ভঙ্গি এখানে সরস। প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সুর। পূর্ব বাংলার দেশ-ঘর, পরিবেশ, পারিবারিক জীবনের বিবরণ থেকে শুরু হয়েছে এই আত্মজীবনী। তিনটি খণ্ড পরিব্যাপ্ত করে (তৃতীয় খণ্ডটি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছিল, শেষ হয়নি।) এই আত্মজীবনী গোপাল হালদারের রাজনৈতিক জীবনকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছে এবং সেই সূত্রে স্বাধীনতার সমকালের ভারতীয় রাজনীতির প্রায় সম্পূর্ণ আলেখ্য উঠে এসেছে এই লেখায়। 'রূপনারানের কূলে' কেবল আত্মজীবনী নয়, এই রচনা এক অর্থে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের সমতুল্য।

গোপাল হালদারের রম্য রচনা পাঠ করলে তাঁর জ্ঞানের পরিধি প্রথমেই পাঠককে বিস্মিত করে দেয়। ভালো রম্য রচনা লিখতে গেলে লেখকের মণীষা ও বৈদগ্ধ্য দুই-ই গভীর ও প্রখর হওয়া দরকার। কেবলই হাস্যরসাত্মক ভঙ্গি ও কৌতুকপ্রবণতা দিয়ে যথার্থ মন্ময় প্রবন্ধ রচনা করা যায় না। এ কথার সত্যতা বুঝতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী ও গোপাল হালদারের লেখার দিকে তাকালে। বিশ্বসাহিত্য, বিশ্বসংস্কৃতি এবং আধুনিক পৃথিবীর সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির সম্পূর্ণ চালচিত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থেকেই প্রকৃত রম্যরচনা রচিত হতে পারে। গোপাল হালদারের 'বাজে লেখা', 'স্বপ্ন ও সত্য', 'আড্ডা' এবং 'বনচাঁড়ালের কড়চা'-য় আমরা বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন, জটিল পৃথিবীর পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ, অথচ অত্যন্ত সরস ও সংস্কৃতিমান মনের একজন মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। তাঁর এই রম্য মন্ময় প্রবন্ধগুলি বাঙালি পাঠকের চিত্তলোককে একই সঙ্গে সরস ও শিক্ষিত করে তোলে।

গোপাল হালদারের সব ধরনের প্রবন্ধই বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অভিনিবেশ পাবার যোগ্য। প্রবন্ধের যা উদ্দেশ্য, পাঠকের মননকে মুক্তিদান করা—তা গোপাল হালদারের রচনাগুলির দ্বারা সর্বাংশে সিদ্ধ হয়।

তাঁর অন্যান্য রচনা : 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪২), 'বাঙালি সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭), 'বাঙালি সংস্কৃত প্রসঙ্গ' (১৯৫৬), 'বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি' (১৯৫৬), 'বাঙালির আশা ও বাঙালির ভাষা' (১৯৭২), 'ভারতের ভাষা' (১৯৬৭)। সতীনাথ ভাদুড়ী : 'সাহিত্য ও সাধনা' (১৯৭৮), 'জাতীয় সংহতি ও ভারতের ভাষা সমস্যা' (১৯৮৬), 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' (১৯৮৬)। রম্য রচনা : আড্ডা।

৬.১৭ কাজি আবদুল ওদুদ : (১৮৯৬-১৯৭০)

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে কাজি আবদুল ওদুদ এক স্বাতন্ত্র/চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৮ সালে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করেন। অল্পবয়সেই বাংলাসাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করেন। প্রথমে ঢাকার ইন্টার মিডিয়েট কলেজে বাংলার অধ্যাপনা করেন এবং পরে টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারী হন। সুবক্তারূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলমান সমাজে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'অভিমান', 'শিখা', 'জয়তী', 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'জাগরণ', 'মোয়াবিজন', 'সওগাত', 'সঞ্চয়', 'বুলবুল', 'ছায়াবীথি', 'বিচিত্রা' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্বনামে ছাড়াও 'আবদুল্লাহ আলি আজাদ' ও 'শ্রীদীক্ষিত' ছদ্মনামে তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর লেখা প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল : ১. নব পর্যায়, ১ম খণ্ড (১৯২৬), ২য় খণ্ড (১৯২৯) ২. রবীন্দ্র কাব্যপাঠ (১৯২৮) ৩. সমাজ ও সাহিত্য (১৯৩৪) ৪. হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (১৯৩৫) ৫. আজকের কথা (১৯৪১) ৬. কবিগুরু গ্যেটে ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯৪৬) ৭. নজরুল প্রতিভা (১৯৪৯) ৮. স্বাধীনতা দিনের উপহার (১৯৫১) ৯. শাশ্বত বঙ্গ (১৯৫১), ১০. বাংলার জাগরণ (১৯৫৬) শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর (১৯৬১) ১২. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড (১৯৬২), ২য় খণ্ড (১৯৬৯), ১৩. হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম (১৯৬৬)।

ওদুদের মানস-গঠন মোহম্মদ, কামাল পাশা এবং রামমোহনের চিন্তা-ভাবনার পাশাপাশি গ্যেটে-তলস্তয়-রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনার বিচিত্র সহাবস্থান লক্ষণীয়। ওদুদ যুক্তিনিষ্ঠ, প্রগতিশীল, পরিমিতি-বোধের অধিকারী। সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বপথিক। তাঁর এই মানসিক ঔদার্য যে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। জন্মসূত্রে মুসলিম হলেও সমাজের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামিকে তিনি সমর্থন করেন নি। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পায়নি। উদার মানবিকতাবোধে বিশ্বাসী তিনি। একহিসেবে তাঁকে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁর জাতক বলা যায়। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন।

তাঁর 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থের ছকে রচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা-আশ্রয়ে তাঁর জীবনের মর্ম-রহস্য উদঘাটনই ওদুদের লক্ষ্য। আর এ বিষয়ে তিনি সফলকাম।

'বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা' প্রবন্ধ থেকে তাঁর রচনারীতির কিছু নির্দশন দেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন :

'সাহিত্য-সমস্যা বাস্তবিকই কোনো সমাজের সত্যকার সমস্যা নয়। সাহিত্যের বিকাশ যখন কোনো সমাজের ভিতরে মন্দগতি অথবা হতশ্রী হয়ে আসে তখন বুঝতে হবে, হয়ত তার এক মৌসুম শেষ হয়ে গেছে। তারপর কিছুদিন কতকটা নিষ্ফলভাবেই কাটবে।—অথবা, তার জীবনায়োজনে বড় রকমের ত্রুটি উপস্থিত হয়েছে।—এই শেষের অবস্থা কোনো সমাজের পক্ষে মারাত্মক।

বাংলার মুসলমান সমাজে এ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের উদগম হয়নি, শুধু এই ব্যাপারটিই তার আত্মসম্মানের পক্ষে হয়ত মারাত্মক নয়। কিন্তু সে-সমাজের লোক যে এপর্যন্ত জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তেমন গৌরবের আসন লাভ করতে পারেনি, বরং তাদের মর্যাদা সম্বন্ধে আশঙ্কা আপনা থেকে এসে পড়ে। আর, তার অবস্থা ভালো করে চেয়ে দেখতে গেলে চোখে পড়ে, সত্যই বাংলার মুসলমানের জীবনায়োজন মারাত্মক ত্রুটিতে পরিপূর্ণ, যাতে করে মনুষ্যত্বের বিকাশই যেখানে সম্ভবপর হচ্ছে না,—সাহিত্য সৃষ্টির কথা আর সেখানে ভাবা যায় কি করে।' (শাশ্বত বঙ্গ, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, পৃঃ ৩২৩-৩২৪)।

৬.১৮ নীরেন্দ্রনাথ রায় : (১৮৯৬-১৯৬৬)

বাংলাসাহিত্যে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলায়। এম. এ. পাশ করে স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেলেও ধুতি ছেড়ে কোট প্যান্ট পরে যাবার শর্ত শুনে চাকরি ত্যাগ করেন। পরিবর্তে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনার চাকরি নেন। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানিকতলা অবৈজ্ঞানিক শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়ান। ১৯৬৪ তে তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন।

নীরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন মেধাবী ছাত্র এবং অল্প-বয়স থেকেই তিনি সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করার পর বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা কালে ১৯১৮ সাল নাগাদ তিনি গান্ধির রাজনীতিতে ও মতবাদে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার পর্বেই ১৯৩৫-৩৬ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি রাধারমণ মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মার্কসবাদ সম্পর্কে অবহিত হন। তারপর থেকে বাকি জীবন মার্কসবাদী চিন্তাবিদ রূপেই নীরেন্দ্রনাথ রায় পরিচিত ছিলেন। মার্কসবাদ গ্রহণের আগে থেকেই সাহিত্য, রাজনীতি এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁর যে প্রগাঢ় অধিকার ছিল তার সঙ্গে মার্কসবাদী বীক্ষণের মিশ্রণে তাঁর এক ধরনের মানস পরিণতি অর্জিত হয়, যা প্রায় সব যুগেই বিরল। অকৃতদার এবং সারা জীবন মননচর্চায়

অতিবাহিত করেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ। সেই তুলনায় তিনি কমই লিখেছেন। তিনি যুক্ত ছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে। তরুণতর আগ্রহী সদস্যদের তিনি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এবং শিক্ষকরূপে গৃহীত হয়েছিলেন।

তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'পরিচয়' পত্রিকায়। বিশেষভাবে বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন যশস্বী লেখকদের নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। যেমন শেক্সপিয়র, পুশকিন, তলস্তয়, ম্যাক্সিম গোর্কি, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

এই প্রবন্ধগুলিতে লেখক কেবল বিস্তৃতভাবে এই মনীষীদের জীবনকেই তুলে ধরেননি, তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন বড়ো মাপের শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বদাই চিত্তনিহিত এক প্রগতিশীলতা থেকে যায়। এই প্রগতিমনস্কতার প্রকাশ ঘটে তাঁদের লেখায়। সেই সঙ্গে তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, যে কোনো সাহিত্যে যদি লেখক সচেতনভাবে না-ও দেখিয়ে থাকেন, তাহলেও সামাজিক শ্রেণিবিভাজন ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য এবং অভিনব। এছাড়াও তিনি লিখেছেন 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা', 'সাহিত্যের বিচারে মার্কসবাদ' ইত্যাদি প্রবন্ধ। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ সংকলন 'সাহিত্য বীক্ষা' (১৯৫৫)-তে এই প্রবন্ধগুলির কয়েকটি সংগ্রথিত হয়েছে।

৬.১৯ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (১৯০১-১৯৬০)

বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবি ও প্রাবন্ধিক রূপে বিশেষভাবে খ্যাত। পিতা দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে প্রবেশিকা (১৯১৮), স্কটিশচার্চ কলেজে থেকে ১৯২২ এ বি. এ. পরীক্ষা দেন। তিনি এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করেন। তাঁর কর্মজীবন বৈচিত্র্যময়। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ও 'সবুজপত্র' সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকায় ভ্রমণ করেন (১৯১৯), চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৫৭-৫৯) ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন (১৯৫৯-৬১)।

খুব বেশি প্রবন্ধ লেখেননি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। দুটি মাত্র প্রবন্ধ-সংকলন তাঁর—'স্বগত' (১৩৪৫) এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৩৬৪), প্রথম সংকলনে 'সূচনা' সহ প্রবন্ধের সংখ্যা সতেরো; দ্বিতীয় বইটিতে 'মুখবন্ধ' সহ আছে কুড়িটি লেখা। এই কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেই সুধীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকার করেছেন। তার কারণ তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং দেশ বিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান। সেই সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্যও উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই সাহিত্য ও সাহিত্যিক নিয়ে লেখা। কোনো কোনো প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবসমাজের সাধারণ আদর্শ নিয়ে—যেমন 'মনুষ্যধর্ম', 'বিজ্ঞানের আদর্শ', 'অনার্য সভ্যতা', 'আঠারো শতকের আবহ' ইত্যাদি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৩১ সালে 'পরিচয়' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল বিংশ শতাব্দীতে, প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তরকালে ইউরোপের সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং মননচর্চার বিভিন্ন দিকে যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল তার সঙ্গে বাঙালির চিত্তের সংযোগ ঘটানো এবং তার সমান্তরাল আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এই পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। অনেক গ্রন্থ-সমালোচনাই প্রায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হয়ে উঠত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধগুলির প্রায় সবই 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত। কয়েকটি মাত্র 'কবিতা' ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। অনেক লেখা গ্রন্থ-সমালোচনা রূপে প্রকাশ পেলেও সম্পূর্ণ প্রবন্ধই হয়ে উঠেছে।

‘স্বগত’ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ও সাহিত্য নিয়ে লেখা। ডি. এইচ. লরেন্স, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, উইলিয়ম, ফকনার, বার্ণার্ড শ, ম্যাকসিম গর্কি, বোরার্ড ম্যানলি হপকিন্স-কে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ আছে। কোনো কোনো প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশিষ্ট কোনো দিককে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে কোনো সাহিত্যিকের প্রসঙ্গ সহযোগে। যেমন—‘ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট’, ‘ডব্লুও. বি. য়েট্স্ ও কলাকৈবল্য’। এই সংকলনের ‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধটি বিভিন্ন দিক থেকে কাব্য ও কবিতাকে বোঝার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাজীবীদের কাছে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিতকদের পৌঁছে দেবার কাজটি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন সুধীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গেও পাঠক পরিচিত ও সমৃদ্ধ হবেন প্রবন্ধগুলির সাহায্যে।

‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ। বাংলা সাহিত্যের কিছু আলোচনা এবং অন্যান্য বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধের চিন্তন-মননের মান সমুচ্চ। সংস্কৃতি-সম্পন্ন যে-কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই তা আকর্ষণ করবে। তবে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেই ভাষা কিছু দুরূহ বলে মনে হবে। তাঁর প্রবন্ধের অন্যতম গুরুত্ব বাঙালি পাঠক-সমাজের সামনে সেই সময়ের পক্ষে সর্বাধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরায়। আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও মননের জগৎকে তিনি বাঙালির মনের কাছাকাছি এনে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

৬.২০ নীহাররঞ্জন রায় : (১৯০৩-১৮৯১)

বাংলা সাহিত্যসেবী রূপে নীহাররঞ্জন রায় এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, সাংবাদিকতা, ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিষয়ক গবেষণায়, তুলনামূলক, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ও নানা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯২৪ খ্রিঃ সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। ১৯২৬ খ্রিঃ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম. এ. তে. প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। গবেষণা কাজে লিপ্ত হয়ে একাধিক পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রিঃ তিনি সাহিত্যে প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি পান। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। বিদেশে সাইভেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘ডক্টরেট’ (১৯৩৫) ও লন্ডন থেকে গ্রন্থাগার পরিচালনার ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রিঃ দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রধান নিযুক্ত হন। আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৩-৭৬ খ্রিঃ ইউনেস্কোর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ব্রহ্মসরকারের সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।

‘চতুরঙ্গ’, ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’, ‘বিশ্বভারতী’, ‘জিজ্ঞাসা’, ‘বারোমাস’, ‘ক্রান্তি’, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ‘ক্রান্তি’ পত্রিকার অন্যদম সম্পাদন ছিলেন তিনি। পত্রিকাটি ছিল মাসিক। সুভাষচন্দ্র বসুর ‘লিবার্টি’ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ছিলেন তিনি।

তাঁর অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ হল : ‘বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ’ (১৯৪৫), ‘প্রাচীন বাংলা দৈনন্দিন জীবন’ (১৯৪৭), ‘বাংলার নদনদী’ (১৯৪৮), ‘কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি’ (১৯৭৯) ইত্যাদি।

নীহাররঞ্জনের দৃষ্টিভঙ্গি সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। তাঁর প্রবন্ধসমূহে অবশ্য যুক্তি ও আবেগের সুষ্ঠু মিশ্রণই দেখা যায়। নিছক মস্তিষ্কের চর্চা তিনি করেননি, তিনি ছিলেন হৃদয়েরও কারবারি।

‘রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা’ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক আলোচনায় তিনি রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিবর্তনটি লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-

সমসাময়িক দেশকাল সম্পর্কেও তাঁর অভিনিবেশ লক্ষণীয়। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ছোটোগল্প, নাটক ও উপন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে। কবিতার আলোচনায় তিনি 'পূরবী'-তেই ছেদ টেনেছেন। ছোটোগল্পের আলোচনা শেষ করেছেন 'নামঞ্জুর' গল্পে। নাট্যালোচনার সীমা 'রক্তকরবী' পর্যন্ত। উপন্যাস-আলোচনার সমাপ্তি ঘটেছে 'শেষের কবিতা'য়। তাঁর পর্যবেক্ষণকুশলতা ও রসোপলব্ধির দৃষ্টান্ত হিসেবে 'চোখের বালি'র প্রাসঙ্গিক আলোচনা উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখেছেন : লেখক বিনোদিনীকে একটা অনিবার্য পরিণামের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন পাঠকের মনের একান্ত বাস্তবানুভূতির মধ্য দিয়া, কিন্তু শেষ সীমায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বে হঠাৎ সামাজিক বাস্তবনিষ্ঠা তাঁহার শিল্পীমানসকে অভিভূত করিয়া দিল, বিনোদিনীর অনিবার্য পরিণাম না ঘটাইয়া তাহাকে তিনি কল্পলোকের ভাবাদর্শের মধ্যে বিসর্জন দিলেন। জীবন যাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে শিল্পী রবীন্দ্রনাথও তাহাকে বঞ্চনা করিলেন।'

'বাঙালির ইতিহাস : আদি পর্ব' গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালি-জীবনের ইতিহাস লিখেছেন। গ্রন্থটি পনেরোটি অধ্যায় সমন্বিত। বাংলার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে তিনি বাংলার জনজীবন ও জনবিন্যাস এবং উৎপাদন ব্যবস্থা, ধর্মবৈচিত্র্য, ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্পকলা, খাদ্যাভাস, বেশভূষা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি দিক নিয়ে যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তাঁর নিজের কথায় : আমার বাঙালাদেশ ও বাঙালি জাতি প্রাচীন পুঁথির পাতায় নাই, রাজকীয় লিপিমালায়ও নয়; সে-দেশ ও জাতি আমার চোখের সম্মুখে ও হৃদয়ের মধ্যে বিস্তৃত ও বিচরমান। প্রাচীন অতীত আজিকার সদ্য বর্তমানের মতোই আমার কাছে সত্য ও জীবন্ত। সেই সত্য জীবন্ত অতীতকে আমি ধরিতে চাহিয়াছি এই গ্রন্থে, মৃতের কঙ্কালকে নয়।' বাঙালি জাতির যথার্থ প্রথম ইতিহাসটি তাঁরই লেখা।

নীহাররঞ্জনের বহুধা ব্যাপ্ত পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা, নৈয়ায়িক দৃষ্টি, বিচার-বিশ্লেষণ-দক্ষতা ও প্রসাদ গুণবিশিষ্ট গদ্য রচনার জন্য তাঁর প্রবন্ধসমূহ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরস্থায়ী সম্পদ রূপেই বিবেচিত হবে।

৬.২১ সৈয়দ মুজতবা আলী : (১৯০৪-১৯৭৪)

বাংলাসাহিত্যের এক প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকরূপে সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯২১-২৬ খ্রিঃ শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন শুরু করেন ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করেন। শিক্ষা শেষে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮-৩০ খ্রিঃ জার্মানি থেকে 'হোমবোল্ড' বৃত্তি পেয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। তারপর সমস্ত ইউরোপ এবং জেরুসালেম, দামাস্কাস প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। মাঝে একবছর তিনি কায়রোতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৬ খ্রিঃ তিনি বরোদা রাজ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ভারত-বিভাগের পর বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। তিনি বিশ্বভারতীর ইসলামি সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত, উর্দু, মারাঠি, গুজরাটি, ইতালিয়ান, ফরাসি, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, উপন্যাস ও রম্যরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

'দেশ বিদেশে' (১৩৫৬), 'পঞ্চতন্ত্র' (১৩৫৯), 'ময়ূরকণ্ঠী' (১৯৫৩), 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (১৯৫৬), 'জনি ডাডায়' (১৯৫৭), 'ধূপছায়া' (১৯৫৮), 'চাচাকাহিনী' (১৯৫৯), 'চতুরঙ্গ' (১৯৬০), 'ভবঘুরে ও অন্যান্য' (১৯৬২), 'বহুবিচিত্র' (১৯৬২), 'টুনিমেম' (১৯৭০), 'বড়বাবু' (১৩৭২), 'দু-হারা (১৯৬৬), 'হিটলার' (১৯৭১), 'মুসাফির' (১৯৭১), 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' (১৯৭৬)।

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধের সীমা বিস্তৃত এবং বিষয়ও বিচিত্র। ম্যালাড থেকে সাহিত্য; হিটলার থেকে ভাষাতত্ত্ব, সবকিছুই হয়েছে তাঁর প্রবন্ধের বিষয়। বহু ভাষাবিদ এই পণ্ডিত তাঁর প্রবন্ধে বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলার

জন্য অনায়াসে ব্যবহার করেছেন গ্রাম্য চলিত ভাষাভঙ্গি এবং শুদ্ধ উচ্চারণ সহ আরবি, ফার্সি, জার্মান, ফরাসি শব্দ। শব্দ এবং ভাষার উপর অসাধারণ দখল ছিল মুজতবা আলীর। তাই তাঁর প্রবন্ধ একই সঙ্গে মননগ্রাহ্য এবং হৃদয়স্পর্শী।

মুজতবা আলীর প্রবন্ধসমূহকে মোটামুটি আমরা রসনিবন্ধ, ব্যক্তিগত নিবন্ধ এবং বস্তুনির্ভর প্রবন্ধ—এই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। তাঁর অনেক প্রবন্ধ বিশেষত 'পঞ্চতন্ত্র' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বেশিরভাগ নিবন্ধই সমকালীন ঘটনার অভিঘাতে নির্মিত। কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর পরিবেশনা-কৌশলে সেগুলি সমকালীনতার বাধা অতিক্রম করে হয়ে গেছে চিরকালের সাহিত্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 'পঞ্চতন্ত্র'-এর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সম্পর্কিত রচনাটির কথা। সমসময়ে কথাসাহিত্যিকদের ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস রচনার প্রবণতা এবং ইতিহাস জ্ঞানের অভাব আর তথ্য-সন্ধিৎসার অনীহা হেতু সে সব উপন্যাসের যে ত্রুটি থাকতো—সে সবের আলোচনায় এবং সংশোধনে প্রবন্ধটি তাঁর বিপুল জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

ব্যক্তিগত নিবন্ধ তাকেই বলা হয় যে রচনায় তথ্য অপেক্ষা স্রষ্টার ব্যক্তিমনের নিবিড় পরিচয় প্রদান হয়ে ওঠে। 'সুখী হবার পন্থা' 'শেষ চিন্তা' (টুনিমেম : ১৩৭০ : ১৯৬৩) 'আড্ডা'—রাজা উজীর (১৩৭৬ : ১৯৬৯) এই শ্রেণির নিবন্ধ। সুখী কেমন করে হওয়া যায় এবিষয়ে বিভিন্ন মনীষার নানা চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা তিনি করেছেন। শেষে আছে একটি সংস্কৃত শ্লোক—যার অর্থ জম্বীরনীর পূরিত মৎস্যখণ্ডই সুখের চরম। শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যার পর লেখক যোগ করেছেন আপন মন্তব্য—যে এই শ্লোক নিশ্চয়ই বাঙালির রচনা নতুবা মাছের মর্যাদা বুঝবে আর কোন জাতি।

'শেষ চিন্তা : উল্টা রথ'-এ সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের আপন চিন্তার মনোজ্ঞ উপস্থাপন রয়েছে। কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে সর্বজনীন কোনো তত্ত্ব এখানে অনুপস্থিত। অতএব এটিকে আমরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্যায়েই রাখব।

'আড্ডা' রচনার সময়ের একটি সংবাদের ভিত্তিতে রচিত। আড্ডা মুজতবা আলীর মতো আশ্চর্য আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বিন্যস্ত হয়েছে। রচনাটি শুরু হয়েছে উত্তম পুরুষের জবানিতে। সমাপ্তিতে আছে আড্ডাসুলভ গল্প। আড্ডা কী? তার বিশেষত্ব কীরূপ তার রসস্নিগ্ধ আলোচনা নিবন্ধটিকে একাধারে ব্যক্তিনিবন্ধ আর রসরচনা করে তুলেছে।

বেশ কিছু বিষয়মুখী প্রবন্ধও লিখেছেন মুজতবা আলী। সেই প্রবন্ধগুলি তাঁর সরস বাচনভঙ্গির গুণে অতিশয় রম্য হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধসমূহের মধ্যে আছে সাহিত্য আর সাহিত্যিক সম্বন্ধে আলোচনা, ভাষা সমস্যার মতো রাজনৈতিক বিষয়, ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ঘটনা হিটলারের নাৎসি নিধন, হিটলার সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি। এছাড়া আছে গল্পরসাশ্রিত বিবিধ বিষয় ভিত্তিক রম্য রচনা।

'কবিরাজ চেখফ' নামের প্রবন্ধটিতে রুশ লেখক আন্তন চেখফ-এর জীবন বর্ণনা আর সাহিত্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে অতি দক্ষতায়। নাৎসি নির্যাতন সম্পর্কিত লেখাগুলিতে সরল বলিষ্ঠ ভাষায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে হননোৎসবের সেই হৃদয়হীন দিনগুলি। আবার 'হিটলারের প্রেম' প্রবন্ধটিতে ব্যক্তি হিটলারকে প্রাণময় করে তুলেছেন লেখক। এই কঠিনকর্মে তিনি সফল। তাই প্রবন্ধটিতে পাঠান্তে নরদানব সদৃশ হিটলারের হৃদয়স্পন্দন পাঠককে বাক্যহারা করে দেয়। ভাষা সমস্যায় জালে বদ্ধ ভারতবর্ষের যথাযথ চিত্র পূর্ণরূপ পেয়েছে তাঁর রচনায়।

তবে সমকালীন রাজনীতি নিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ একাত্তরের যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের লিপিচিত্রণ।

পরিশেষে সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধের ভাষাসৌন্দর্য সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা দরকার। মুজতবা আলীর ভাষা গম্ভীর নয়, অথচ চটুলও নয়। তাঁর ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বৈধকের ভাষা। ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে যে কোনো শব্দব্যবহারে তাঁর কুণ্ঠা নেই। তাই 'নেপকঁ্যাতা'-র মতো গ্রাম্য শব্দ, 'কোজ্জাব মা'-র মতো মেয়েলি কথনভঙ্গি।

'আড্ডা' থেকে উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া হল কিছু অংশ—'অত্যুৎকৃষ্ণ (কৃষ্ণ যদি 'কিষ্ট' বা 'কেষ্ট' হয় তবে উৎকৃষ্ণই বা হবে না কেন?) আড্ডা প্রতিষ্ঠানটি হালফিল পুরো-হাতা ব্লাউজের মতো ডাইয়িং ইন্ডাস্ট্রি—মৃতপ্রায়।

আর একটি উদাহরণ—'তরুণ লেখককে সাবধান করে দি, তিনি যদি ইহজগতে অজরামর যশ অর্জন করতে চান তবে যেন তিনি হাস্যরসের বেসাতি না করে ঢালেন অঢেল করুণ রস। আর বাঙালির হৃদয়ের উপর যদি 'জগরনটের' মতো তিনি মোক্ষম আসন চেপে বসে থাকতে চান তবে যেন সেটিকে চেপটে, থেঁৎলে, নিংড়ে, একদম সমূচহ্ তিক্কের চেয়েও তেতো করে পরিবেশন করেন' (হাসি-কান্না, টুনি মেম)।

একইসঙ্গে মনন, সরসতা আর সহৃদয়তার যে ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটেছে সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধাবলিতে তার তুলনা বাংলায় কমই আছে।

৬.২২ আবু সয়ীদ আইয়ুব : (১৯০৬-১৯৮২)

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যপ্রেমী ও রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীতের রসজ্ঞ ব্যাখ্যাতা রূপে আবু সয়ীদ আইয়ুব এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই অবাঙালি পরিবার তিনপুরুষ ধরে কলকাতায় বাস করে বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কিশোর বয়সে তিনি উর্দু সাহিত্য পত্রিকা 'কাহকুশান' এ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র গদ্যানুবাদ পড়ে এমন মুগ্ধ হন যে রবীন্দ্রনাথকে জানতে ১৬ বছর বয়সে বাংলা শিখলেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে এম. এস. সি. পড়তেন। এসময় তিনি কিছুদিন সি. ভি. রমনের সঙ্গে গবেষণার সুযোগ পান। কিন্তু শেষাবধি অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাননি। পরের বছর তিনি দর্শনবিভাগের ছাত্র হন। ১৯৩৩ খ্রিঃ দর্শনশাস্ত্রে এম. এ পাশ করার পর হোয়াইটহেড এর 'ফিলজফি অব বিউটি'র উপর গবেষণা করেন।

পরবর্তীকালে তিনি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা 'পরিচয়' এর সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'বুদ্ধি বিভ্রাট ও অপরোনুভূতি' এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'কবিতা' ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় তিনি অনেক সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

উর্দুভাষী উত্তরপ্রদেশীয় মুসলমান পরিবারের অতীব মেধাবী ছাত্র আবু সয়ীদ আইয়ুব হয়ে উঠেছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাবন্ধিক। এটি একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ছাত্র থাকাকালীন 'গীতাঞ্জলি'-র উর্দু অনুবাদ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রথম আগ্রহ বোধ করেন তিনি। মূল গীতাঞ্জলি পড়বার জন্য শিখতে শুরু করেন বাংলা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙালি ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আরম্ভ করেন বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে আরও ভালো করে জানবার জন্য। তাঁর বিষয় ছিল দর্শন। কিন্তু ক্রমেই তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে যান। কিছুকালের জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে আসেন। সেই সময়েই আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে গৌরী দত্তের পরিচয় হয়। তিনি ছিলেন দর্শনবিদ্যার ছাত্রী। আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং গৌরীর বিবাহের পর কিছুদিন তাঁরা কলকাতায় বসবাস করেন, কিছুদিন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন-এ আবু সয়ীদ আইয়ুব অধ্যাপনা করেছিলেন।

অধিকাংশ সময়ই তাঁর স্বাস্থ্য ভালো থাকত না। কিন্তু তারই মধ্যে আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সেই প্রবন্ধের কেন্দ্রে আছেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁর প্রতি অমোঘ আকর্ষণে আবু সয়ীদ আইয়ুব হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ভাষার প্রাবন্ধিক।

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই তাঁর তিনটি প্রবন্ধের বই—'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৮), 'পান্থজনের সখা' (১৯৭৩) ও 'পথের শেষ কোথায়' (১৯৭৭)। এই প্রবন্ধগুলিতে আমরা অনুভব করি লেখকের রবীন্দ্র-সাহিত্য

পাঠের গভীরতা, রবীন্দ্রনাথের লেখায় নিবিড় দার্শনিকতা বোধের সন্ধান এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন কিছু ভাবনার অভিপ্রকাশ। তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখায় দুঃখবোধের দিকটি অনুভব করেছিলেন, এমনকী তিনি রবীন্দ্র-চেতনায় অমঙ্গলবোধের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। সাধারণভাবে বাঙালি লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে অমঙ্গল বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখেন না। রবীন্দ্র-চেতনায় এই দুঃখবোধের কাঠিন্য, অমঙ্গলবোধের বিপন্নতা এবং আধুনিক জীবনের জটিলতার দিকটি তুলে ধরার ক্ষেত্রেই আবু সয়ীদ আইয়ুবের স্বাতন্ত্র্য।

রবীন্দ্রনাথের গান, তাঁর নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' নিয়ে আইয়ুবের আলোচনা, সাহিত্যবোধ দার্শনিক চেতনা এবং গভীর জীবনবোধের সমন্বয়ে গঠিত। স্বাধীনতা-উত্তর কালে রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আবু সয়ীদ আইয়ুব এক অবিস্মরণযোগ্য নাম।

৬.২৩ বুদ্ধদেব বসু : (১৯০৮-১৯৭৪)

বাংলাসাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিকরূপে বুদ্ধদেব বসু'র নাম সর্বজনবিদিত। অল্পবয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল' নামে দুটি পত্রিকায় লেখার অভিজ্ঞতা সম্বল করে যে কয়জন তরুণ বাঙালি লেখক রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে সরে দাঁড়াবার দুঃসাহস করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম।

তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫), 'সমুদ্রতীর' (১৯৩৭), 'আমি চঞ্চল হে' (১৯৩৭), 'সব পেয়েছির দেশে' (১৯৪১), 'উত্তর তিরিশ' (১৯৪৫), 'কালের পুতুল' (১৯৪৬), 'সাহিত্যচর্চা' (১৯৫৪), 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' (১৯৫৫), 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' (১৯৫৭), 'জাপানি জর্নাল' (১৯৬২), 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩), 'দেশান্তর' (১৯৬৬), 'কবি রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৬), 'আমার ছেলেবেলা' (১৯৭৩), 'মহাভারতের কথা' (১৯৭৪), 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' (১৯৭৪), 'আমার যৌবন' (১৯৭৬) প্রভৃতি।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন বাংলা সাহিত্যে এক বহুমুখী লেখক। কবি, ছোটোগল্পকার এবং ঔপন্যাসিক রূপে যেমন তাঁর পরিচিতি, তেমনই প্রাবন্ধিকরূপে তিনি খ্যাতিমান। তাঁর প্রবন্ধ পাঠকের চিত্তে এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে পাঠক তা সহজে ভুলতে পারেন না। বুদ্ধদেব বসু সারা জীবনে যতো প্রবন্ধ লিখেছেন, তা সবই সাহিত্য বিষয়ক। বুদ্ধদেব বসুর মেধা ও মননের একতম অবলম্বন ছিল সাহিত্য এবং সাহিত্যিক। সমাজ অথবা রাজনীতি সম্পর্কে আর পাঁচজন মানুষের মতো সাধারণ আগ্রহ থাকলেও (তাঁর কথা সাহিত্যে তার প্রমাণ আছে।) তিনি সে সব বিষয়ে আলোচনা তর্ক বা মত-বিনিময়ে আদৌ কালক্ষেপ করতেন না। মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া মননের সাহিত্য যা তিনি সৃজন করেছেন তারও অবলম্বন সাহিত্য এবং সাহিত্যিক।

অনেক লেখাই লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। রবীন্দ্র অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও একজন বিদগ্ধ পাঠকের সমালোচনা করবার অধিকারে তিনি অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার—বিশেষত তাঁর কথা-সাহিত্যের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। তাঁর কাছে 'চোখের বালি' কাঁচা লেখা, 'নৌকাডুবি' কৃত্রিম, 'ঘরেবাইরে', আতিশয্যদুষ্ট, 'চার অধ্যায়', অভিজ্ঞতা বহির্ভূত, এবং 'শেষের কবিতা' দুর্বল। তবে 'গোরা, 'চতুরঙ্গ' আর 'যোগাযোগ'—এই তিনটি উপন্যাস তাঁর মতে সার্থক সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, তাঁর মন্তব্যগুলির সঙ্গে সহমত হবেন না অনেকেই। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব এখানেই—তাঁর আলোচনা মৌলিক, সজীব এবং নিজস্ব সাহিত্যবোধ সমৃদ্ধ। তিনি গতানুগতিক ভাবে চিন্তা করেন না বলেই পাঠকদের কাছে সমাদৃত। তাঁর প্রবন্ধ পাঠকের মনে নতুন ভাবনা সঞ্চারিত করে। এখানেই তাঁর সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনায় তাঁর রবীন্দ্রপ্রীতি পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ বিষয়ে সর্বপ্রথম সু-চিন্তিত এবং কাব্যবোধ সমৃদ্ধ আলোচনা করেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য আলোচনার দুটি দিক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-উত্তর তিরিশ ও চল্লিশের দশকে যখন নবীন কবিরা নবতর কাব্যবোধ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন অধিকাংশ পাঠকই তাঁদের নতুনত্বের স্বরূপ বুঝতে না পেরে তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন। যে কয়েকজন প্রাবন্ধিক নিরন্তর লেখনী চালনায় আধুনিক কবিদের কাব্যগুণকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। জীবনানন্দ বিষয়ে প্রথম রস-উপভোগের দৃষ্টান্ত দেখি তাঁর প্রবন্ধে। মাত্র একুশ বাইশ বছর বয়সে জীবনানন্দের প্রথম কবিতাগ্রন্থকে যে সতেজ সাহসে তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন, তা আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে সতেজ সাহসে তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন, তা আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সমর সেনের মতো অতি তরুণ কবিদের কবিতার আলোচনা করে তিনি তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি কেবল উৎসাহব্যঞ্জক শংসা বাক্য নয়, এ গুলি যথার্থ কবি প্রাণের অধিকারী এক আলোচকের রসাস্বাদনের নিদর্শন আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলন এবং বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে। এই ধরনের কাজ সারা জীবন ধরেই করেছেন বুদ্ধদেব বসু। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর সমধিক গুরুত্ব অনুভব করি যখন দেখি পাশ্চাত্য কবি ও কথা সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ বহু প্রবন্ধে পরিস্ফুট হয়েছে এবং বাঙালি পাঠককে প্রতীচ্যের কবিদের সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে। বোদল্যের এবং রিলকে হ্যেল্ডার্লিন সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ এখনও আমাদের কাছে তুলনারহিত। বিভিন্ন আলোচনায় দান্তে, মালার্মে, এলিয়ট, পাউন্ড সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক উক্তি পাঠক সমাজকে স্বভাবতই শিক্ষিত করে তোলে।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সম্পর্কিত আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না, যদিনা তাঁর 'মহাভারতের কথা'—গ্রন্থটির কথা বলা হয়। প্রাচীন ভারতের এই মহাকাব্যটির প্রাণকেন্দ্র কোথায়, কোথায় এর মূল শিক্ষা, কে এই আখ্যানের নায়ক—ইত্যাদি প্রশ্নের অন্তরে প্রবেশ করে তিনি তুলে এনেছিলেন তাঁর নিজের উপর। এখানেও সহমত হওয়া বড়ো কথা নয়, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা আমাদের মুগ্ধ করে।

স্মরণ করা যায় 'মেঘদূত'-অনুবাদের ভূমিকাটিও। কালিদাস সম্পর্কে অতি শ্রদ্ধার ধারণাগুলিকে তিনি ভেঙেছেন, কিন্তু কোথাও পূর্ববর্তী-কবির প্রতি অশ্রদ্ধা নেই।

বুদ্ধদেব বসু স্মৃতিকথা এবং ভ্রমণকথাও লিখেছেন। বিশেষ উল্লেখ্য—'আমার ছেলেবেলা', 'আমার যৌবন', 'আমাদের কবিতা ভবন'—ইত্যাদি। 'সব পেয়েছির দেশে'—নামে লিখিত তাঁর শান্তিনিকেতন ভ্রমণের লিপিচিত্র অসাধারণ সুপাঠ্য একটি রচনা। এ ছাড়াও তিনি মন্ময় রচনা লিখেছেন। ঢাকা বাসের স্মৃতিরস জারিত রমনার মাঠ-এর চিত্র অথবা শৈশবে পঠিত 'ছোটোদের রামায়ণ'-এর আশ্চর্য সুখকর অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ ভাবেই প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য পাঠকের কাছে অ-পরিহার্য হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রবন্ধ লেখার শৈলীকে ইম্‌প্রেশ্‌নিস্টিক বা স্বকীয় ধারণা নির্ভর বলা যায়। সব সময় নিশ্ছিদ্র যুক্তি বিন্যাসের চেষ্টা তিনি করেন না। তিনি নিজের অনুভব, নিজের উপলব্ধি, নিজের রসোপভোগকেই ভাষায় মূর্ত করে তুলতে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠকের শিল্প বোধকে, সাহিত্য বোধকে উদ্রিক্ত করে এবং সমৃদ্ধ করে—এখানেই তাঁর প্রবন্ধের অপরিসীম সার্থকতা।

৬.২৪ বিনয় ঘোষ : (১৯১৭-১৯৮০)

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্য সমালোচক, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষত লোকসংস্কৃতির গবেষকরূপে বিনয় ঘোষের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাংলাসাহিত্যের পাশাপাশি ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কিত পর্যালোচনাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।

বিনয় ঘোষের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে উনবিংশ শতকের বাংলা ও বাংলার নবজাগরণ যেমন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা লাভ করেছে তেমনি 'সোভিয়েট সভ্যতা' ও বাংলার সাহিত্য সম্ভারকে পরিপুষ্ট করেছে। কলকাতাকে ইতিহাসের আলোকে নতুন রূপ দিয়ে, নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে বাংলার লোকশিল্পের সমাজতত্ত্বও তাঁর রচনায় সন্নিবেশিত হয়েছে। সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়েছিল।

'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'বসুমতী', 'পরিচয়', 'দেশ', 'শনিবারের চিঠি', 'অলকা', 'চতুরঙ্গ', 'তত্ত্বকৌমুদী', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'উত্তরসূরি', 'অরণি', 'এক্ষণ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়।

শুধু গ্রন্থরচনাই নয় 'ফরওয়ার্ড', সাপ্তাহিক অরণি, দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর প্রভৃতি বহু পত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘে তাঁর লেখা 'ল্যাবরেটরী' নাটক অভিনীত হয়েছে এবং তিনি এই গণনাট্য সংঘের গানের দলের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। তিনি 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ' (১৯৪০), 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা' (১৯৪০), রাজনীতি বিষয়কও কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন, যেমন—'আন্তর্জাতিক রাজনীতি', (১৯৪১), 'সোভিয়েট সভ্যতা' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'ফ্যাশিজম ও জনযুদ্ধ' (১৯৪২), 'সোভিয়েট সমাজ ও সংস্কৃতি' ইত্যাদি। পরবর্তীকালে তিনি রাজনীতি থেকে সরে এসে পরিপূর্ণ ভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালায়' তিনিই প্রথম বক্তারূপে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। ১৯৫৮-৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রকফেলার রিসার্চ স্কলার ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭) গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। তিনি যে গ্রন্থটির জন্য বিদগ্ধ মহলে বিশেষ খ্যাতকীর্তি হয়েছিলেন তা হল 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালিসমাজ' (১ম খণ্ড ১৯৫৭, ২য় খণ্ড ১৯৫৭, ৩য় খণ্ড ১৯৫৯)।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'নববাবু চরিত' (১৯৭৯), 'সংস্কৃতির দুর্দিন' (১৯৪৫), 'বাংলার নবজাগৃতি' (১৯৪৮), 'বরণীয় বাঙালি' (১৯৫০), 'কালপেঁচার নক্সা' (১৯৫১), 'কালপেঁচার দু'কলম' (১৯৫২), 'কলকাতা কালচার' (১৯৫৩), 'জনসভার সাহিত্য' (১৯৫৫), 'কালপেঁচার বৈঠকে' (১৯৫৭), 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' (১৯৬১), 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' (১৯৭৩), 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' (১৯৭৩), 'অটোমেটিক জীবন ও সমাজ' (১৯৭৮) , 'মেহনত ও প্রতিভা' (১৯৭৮), 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' (১৯৭৯), 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (১ম—৫ম খণ্ড : ১৯৬১-১৯৬৮) ইত্যাদি।

সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি সব বিষয়েই বিনয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিনয় সমাজ-সংস্কৃতির পর্যালোচনা করেছেন। শিল্প-সংস্কৃতির আলোচনায় তিনি তাই সমাজ-ভিত্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বহুবিচিত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ভেতর দিয়ে যে সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতির অগ্রগতি সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের সহায়তায় তিনি তাঁর আলোচনাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছেন।

লোকসংস্কৃতি ও শহর সংস্কৃতি সংস্কৃতির উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ স্বচ্ছন্দ। লোকসংস্কৃতি তাঁর চোখে অতীতের মৃত ফসিল নয়, তার মধ্যে জীবনের বিচিত্র প্রাণপ্রবাহকে তিনি আবিষ্কার করেছেন।

'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' এবং 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থত্রয় তাঁর অতুলনীয় কীর্তি। প্রথম গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিকগুলি নির্দেশিত। ক্ষেত্র-সমীক্ষা তাঁর আলোচনাকে জীবন্ত ও প্রামাণ্য করে তুলেছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে বহু দুর্লভ নথিপত্র সহায়তায় বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মকাণ্ডকে তিনি নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী প্রতিভা, সংগ্রামশীলতা, মানবিকতাবোধ প্রভৃতি দিকগুলি তাঁর আলোচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় লভ্য। 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি পুরনো বহু বিলুপ্ত বিস্তৃত পত্রিকার জীর্ণ পাতা থেকে তিনি যে তথ্যরাশি আহরণ করেছেন তা তাঁর অসাধারণ গবেষণাকর্মরূপেই স্বীকৃত হবে।

অন্যদিকে কালপেঁচা ছদ্মনামে কেলপঁর লঘু রসাত্মক প্রবন্ধাবলি তাঁর সত্তার আর একটি দিক উদঘাটন করে। এগুলিতে তাঁর মর্জি ও মেজাজের স্বতন্ত্র একটি রূপ লক্ষণীয়। যেমন—''জন্মালেই যেমন মানুষকে একদিন মরতেই হবে, তেমনি লিখলেই একদিন সেই বই ফুটপাথে আসবেই। ব্যাপারটা একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মতন ক্রমেই এমন অকাট্য হয়ে উঠেছে যে, অনেক গ্রন্থোন্মাদকে পর্যন্ত এই নিয়ম অনুযায়ী আমি বই কালেক্ট করতে দেখেছি। কলকাতা শহরে যে কয়েক শ্রেণির 'উন্মাদ' বা বাতিকগ্রস্ত' লোক আছেন তার মধ্যে গ্রন্থোন্মাদরা অন্যতম। ফুটপাতের বইয়ের প্রধান ক্রেতা তাঁরাই।''

৬.২৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : (১৯১৮-১৯৭০)

বাংলাসাহিত্যের ধারায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক। ১৯৪১ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাসাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন। বাংলাসাহিত্যে ছোটো গল্প বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের জন্য তিনি ডি. ফিল উপাধি পান এবং প্রথমে কলকাতার সিটি কলেজে ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কর্মে ব্রতী হন।

তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল : 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' (১৯৫৬), 'সাহিত্যে ছোটগল্প' (১৯৫৬), 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' (১৯৫৮), 'কথা কোবিদ্ রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৬), 'সুনন্দর জার্নাল' (১৯৬৬) এবং 'ছোটোগল্পের সীমারেখা' (১৯৭০)।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার ছিলেন তেমনই তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক। তাঁর রচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়। কিন্তু অন্তত একটি প্রবন্ধের বই তিনি রেখে গেছেন যা বাংলাসাহিত্যের পাঠকের কাছে চিরকালীন মূল্য পাবে। বইটির নাম—'সাহিত্যে ছোটোগল্প'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত সফল ও জনপ্রিয় অধ্যাপক। অধ্যাপনার সূত্রেই তিনি ছোটো গল্প বিষয়ে পঠন-পাঠনের যে বিস্তার ও আনন্দের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেখান থেকেই তাঁর প্রাবন্ধিক হয়ে ওঠার সূচনা। কিন্তু নিজের অন্তরের প্রবণতা থেকে যে ধরনের রচনা তিনি লিখতে আগ্রহ বোধ করতেন তাহল—রম্য প্রবন্ধ এবং মন্ময় প্রবন্ধ। মন্ময় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে খুব গম্ভীর ধরনের বিষয়ের চর্চা তিনি করেননি। সমাজচেতনা, রসবোধ এবং ব্যক্তিমনের উপলব্ধির মিশ্রণে, বিদগ্ধ ও পরিশীলিত মনের স্বচ্ছ দৃষ্টির দর্পণে জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন তাকেই প্রকাশ করেছিলেন এজাতীয় রচনায়। এজন্যই সুনন্দ ছদ্মনামে রচিত 'সুনন্দর জার্নাল' নামের রচনাগুচ্ছের লেখকরূপে তিনি সমধিক খ্যাতিমান।

মন্ময় রসনিবন্ধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'সুনন্দর জার্নাল'। যেকোনো বিষয়—বেকার সমস্যা, কলকাতার যানজট, একালে রচিত কৃত্রিম পল্লীগীতি অথবা ভারতীয়দের খাদ্যাভ্যাস—সবকিছু নিয়েই মিতপরিসর সরস নিবন্ধ লিখতেন তিনি। ভাষার সাবলীলতা এবং মননের দীপ্তিতে সরসতা জারিত কৌতুকদৃষ্টি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত। 'সুনন্দর জার্নাল' বাংলা রসনিবন্ধ-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত।

'সাহিত্যে ছোটোগল্প'—সমালোচনার গ্রন্থটিও বিভিন্ন দিক থেকে স্বাতন্ত্রের দাবি রাখে। সাধারণত যেভাবে সমালোচনা গ্রন্থ লেখা হয় ঠিক সেভাবে এটি রচিত নয়। এখানে সমগ্র বিশ্বের ছোটোগল্পের আবির্ভাবের কাল এবং বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে বিশ্ব ছোটোগল্প সম্পর্কে রসগ্রাহী মনের সমগ্র আস্বাদনকে তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পাশাপাশি কখনও মোঁপাসা, কখনও চেকভ কখনও গোর্কি কিংবা আলাতোল ফ্রাঁস—এইভাবে রসাবেদনের তুলনামূলক বিচারে তিনি ছোটোগল্পের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। সর্বদাই সাল-তারিখ এবং সময়ের অনুক্রম মান্য করে তিনি চলেননি। সেভাবে গ্রন্থটি পরিকল্পিতই হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন

ছোটোগল্পের শিল্পরূপটি বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিতে বাঙালি পাঠকের মনে যেন তার সমগ্র রসাবেদন নিয়ে উদ্ভাসিত হয়। এই উদ্দেশ্য এই গ্রন্থে সর্বতভাবে সার্থক হয়েছে।

'বাংলা গল্পবিচিত্রা' এবং 'ছোটোগল্পের সীমারেখা' নামে অন্য যে দুটি ছোটোগল্পের সমালোচনা গ্রন্থ তিনি লিখেছেন সে দুটিতে তুলনামূলকভাবে প্রথাসিদ্ধ রীতিতে ছোটোগল্পের আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য বিষয়ে 'কথা কবিদ রবীন্দ্রনাথ' নামে যে আলোচনার গ্রন্থটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন সেটি রবীন্দ্র-উপন্যাস ও ছোটোগল্পের বিশিষ্ট এক দিগ্‌দর্শনরূপে গৃহীত হতে পারে। বিশেষ করে কোনো কোনো উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি বিরল অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। প্রাবন্ধিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আরও বেশি সৃষ্টিশীল হলে বাংলা মনন সাহিত্য সমৃদ্ধতর হত।

৬.২৬ ক্ষুদিরাম দাস : (১৯১৩-২০০২)

বাংলাসাহিত্য জগতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড়ে। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. তে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে পরে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে বৃত হন। তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থরাজি হল—রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় (১৯৫৩), বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি (১৯৫৮), চিত্রগীতিময়ী রবীন্দ্রবাণী (১৯৬৬), 'বৈষ্ণব রস প্রকাশ' (১৯৭০), 'সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৩), 'রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার' (১৯৮৪), 'বানান বানানোর বন্দরে' (১৯৯৩), 'চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি' (১৯৯৪), 'দেশ কাল সাহিত্য' (১৯৯৫), 'বাছাই প্রবন্ধ' (২০০০) ইত্যাদি।

ক্ষুদিরাম দাস ছিলেন কিংবদন্তীতুল্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী। সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকার, নন্দনতত্ত্বে ছিল তাঁর অগাধ অধিকার।

'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থটির জন্য ১৯৬২-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট ডিগ্রি প্রাপ্ত হন তিনি। আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ বিকাশ ও পরিণামের ইতিহাসটি বিধৃত। তাঁর মতে, রবীন্দ্র কবিধর্মের বিশেষত্ব হল অন্তর্নিহিত গতিশীলতা। বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যসহ যা ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর। রবীন্দ্রনাথকে এক মহৎ রোমান্টিক-মিস্টিক কবিরূপে ও গ্রন্থে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার সঙ্গে গভীর রসবোধ ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সুষ্ঠু সমন্বয় এ গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়।

'বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি' গ্রন্থে অধ্যাপক দাস মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা কাব্য-কবিতার কলাবিধির আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ে তিনি প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনায় প্রবৃত্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা কাব্য-কবিতার ছন্দের প্রকৃতি-বিচার। তৃতীয় পর্যায়ে বাংলা কাব্য-কবিতায় সন্নিবেশিত অলংকারসমূহের যাথার্থ্য বিচার। কাব্যসৌন্দর্য-সৃষ্টিতে ছন্দ ও অলংকার কীভাবে সহায়তা করে তা উপযুক্ত উদাহরণ যোগে দেখিয়েছেন।

'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্ররচনা'-তে নির্বাসিত রবীন্দ্র-কবিতা ও গীতির নান্দনিক ব্যাখ্যাতা তিনি। কাব্য-সৌন্দর্যের মূল তত্ত্বগুলির সাহায্যে রবীন্দ্রের কবিতা ও গীতির কবিত্ব-সৌন্দর্য বিচার ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত তিনি। দৃষ্টান্ত সহায়তায় রবীন্দ্র-কবিতায় চিত্র ও সংগীতের বিপুল প্রভাব প্রদর্শন করেছেন সমালোচক।

'বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ' গ্রন্থে চৈতন্য প্রবর্তিত আন্দোলনের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটটি সবিস্তারে নির্দেশিত। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে সুফী প্রভাবের পরিমাণ ও গুরুত্ব প্রদর্শিত। বৈষ্ণবপদসমূহের রসপর্যায় সম্পর্কে

নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রয়োগ। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নির্ণয়ে অনালোচিত তথ্যসমূহের সন্নিবেশ। লৌকিক রসশাস্ত্রের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ এবং রবীন্দ্র-ভাবুকতার সঙ্গে বৈষ্ণব-ভাবুকতার প্রভেদ নিরূপণ।

'সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্র-জীবন ও রচনায় সমাজ-মনস্কতার পরিচয় প্রদত্ত। গ্রাম পুনর্গঠনে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন, আগ্রহী ছিলেন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষজনের উন্নয়নে। অধ্যাপক দাস দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, যে সমাজতন্ত্র অবশ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নয়। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই আত্মকল্পনাবিলাসী কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রগতিশীল সমাজ-ভাবনার অংশীদার।

'রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার' গ্রন্থে রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে পরমাণু বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান ও নভোবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রটি প্রদর্শিত।

'চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত চব্বিশটি প্রবন্ধের সংকলন।

'দেশ কাল সাহিত্য' পঁচিশটি প্রবন্ধের সংকলন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বিভিন্ন প্রসঙ্গ প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু।

'বাছাই প্রবন্ধ'-এ রয়েছে চোদ্দটি প্রবন্ধ। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। 'রাজা-প্রজা পরিস্থিতি—প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের বাঙলায়', 'কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ', 'মহাপ্রভুর বার্তা-ব্যক্তিত্ব ও নামপ্রীতি সংগতি', 'শহর কলকাতায় আরবী-ফারসী উর্দু-সংস্কৃত' 'অথ বিবেকানন্দ রবীন্দ্র-কথা', 'কবি টমাস হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', 'কথাকার মাণিকের ইতিকথা' ইত্যাদি প্রবন্ধ তার নিদর্শন।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, তাঁর সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' (১৯৭৭) বহু পুরনো ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অধ্যাপক দাসের 'সাঁওতালি-বাংলা সমশব্দ অভিধান' (১৯৯৮) এক অসামান্য কীর্তি।

ক্ষুদিরাম দাসের গদ্য সংস্কৃতগন্ধী, সন্ধি ও সমাসবহুল তাঁর ভাষা। তাঁর দৃষ্টি নৈয়ায়িকের। বক্তব্য ঋজু সংহত, তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ।

৬.২৭ অনুশীলনী

১। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করুন।

২। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় জগদীশচন্দ্র বসু ও জগদানন্দ রায়ের কৃতিত্বের পরিমাপ করুন।

৩। সাহিত্য সমালোচক মোহিতলালের পরিচয় দিন।

৪। সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব বিচার করুন।

৫। শশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর গুরুত্ব নির্দেশ করুন।

৬। সাহিত্য-সমালোচনাও যে সৃষ্টিধর্মী হতে পারে প্রমথনাথ বিশীর রচনাকর্ম তার নির্দশন।—মন্তব্যটির যাথার্থ্য বিচা করুন।

৭। রাজশেখর বসুর প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিকের যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যিকের রসদৃষ্টির কীভাবে সমন্বয় সাধিত হয়েছে তার আলোচনা করুন।

৮। সুকুমার সেনের প্রবন্ধ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং তাঁর প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করুন।

৯। প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন।

১০। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধে কবির সঙ্গে প্রাবন্ধিকের মিলন ঘটেছে।—আলোচনা করুন।

১১। সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি ও সুগভীর রসবোধের পরিচয় লভ্য।—যাথার্থ্য বিচার করুন।

১২। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনায় ক্ষুদিরাম দাসের অনন্যতার পরিচয় দিন।

১৩। নীহাররঞ্জন রায়ের প্রবন্ধে যে ইতিহাসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

১৪। নিম্নোক্ত প্রাবন্ধিকদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন—

গোপাল হালদার, কাজি আবদুল ওদুদ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিনয় ঘোষ।

১৫। অন্তরঙ্গতা, সরসতা ও প্রসাদ গুণ সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধের বিশেষত্ব।—আলোচনা করুন।

৬.২৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯৯

২. অধীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১

৩. অধীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, তৃতীয় খণ্ড, ২০০১

৪. তরুণ মুখোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, ১৯৯৫

৫. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১৩শ খণ্ড, ১৩৮৮

৬. নিরঞ্জন সরকার, জগদানন্দ রায়, ঐ ১২শ খণ্ড, ১৩৮৩

৭. শিবদাস চক্রবর্তী, রাজশেখর বসু, ঐ ১৭শ খণ্ড, ১৩৯৮

৮. অনন্তকুমার চক্রবর্তী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ, ঐ, ঐ

৯. ভবতোষ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, ঐ, ঐ, ঐ

১০. ভবতোষ দত্ত, সুশীলকুমার দে, ১৯৯০

১১. সরোজ দত্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯৬

একক ৭ ❑ প্রবন্ধ—ভাগ ২

গঠন

৭.১ মন্মথ রায়
৭.২ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৭.৩ বিধায়ক ভট্টাচার্য
৭.৪ বনফুল
৭.৫ রবীন্দ্র মৈত্র
৭.৬ বিজন ভট্টাচার্য
৭.৭ তুলসীদাস লাহিড়ী
৭.৮ দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৭.৯ সলিল সেন
৭.১০ ধনঞ্জয় বৈরাগী
৭.১১ উৎপল দত্ত
৭.১২ বাদল সরকার
৭.১৩ মনোজ মিত্র
৭.১৪ রতনকুমার ঘোষ
৭.১৫ মোহিত চট্টোপাধ্যায়
৭.১৬ অনুশীলনী
৭.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)

মন্মথ রায় বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের উজ্জ্বল পুরুষ। তাঁকে আধুনিক বাংলা শ্রেষ্ঠ নাট্যপুরুষ রূপে অভিহিত করা যায়। মন্মথ রায় চলমান জীবনধারার শিল্পী : জীবনের জটিলতা বক্রকুটিল ভাবনা দ্বন্দ্বসংক্ষোভ তার নাটকে রূপ পেয়েছে। তিনি প্রগতিশীল নাট্যভাবনার শরিক। অর্থনৈতিক শোষণে ক্লিষ্ট, সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত, রাজনৈতিক শাসনে জর্জরিত মানুষের ছবি এঁকেছেন বিভিন্ন নাটকে। অন্যদিকে মানবমনের গভীর রহস্য অনন্ত বিস্ময় সীমাহীন জটিলতার উন্মোচন তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। সমালোচক বলেছেন—'সূক্ষ্মতম অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটি পরদা ইনি অতি নিপুণ হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবিরাম সংঘাতে ইহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মর্মস্থল ছিড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়' (ড. অজিতকুমার ঘোষ)। আনন্দেরও উজ্জ্বল প্রভাব দেখা গেছে তাঁর নাটকে। মন্মথ রায়ের নাটকের শিল্পরূপও অসামান্য—নিটোল গাঁথুনি, রূপের দ্যুতি, সংলাপের ঝকঝকে শাণিত প্রকাশ তার নাটককে অসামান্য সমৃদ্ধ করেছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, দেশাত্মবোধক, জীবনী নাটক ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের প্রায় ৬০টি নাটক তিনি লিখেছেন। আধুনিক অর্থে একাঙ্ক নাটকের তিনি প্রথম ও অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর রচিত একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা প্রায় ২৫০টি।

রবীন্দ্র উত্তর যুগের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার। বাংলা একাঙ্ক নাটক রচয়িতাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ—যাকে অনেকেই একাঙ্ক নাটকের প্রকৃত জনক হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তার রচিত ‘মুক্তির ডাক’ (১৯২৩) নাটকটিকেই প্রথম প্রকৃত একাঙ্ক নাটক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি ১৯২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের প্রযোজনায়, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায়—স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। সেই সময়ে নাটকটি বড্ড ছোট্ট আকারের হওয়াতে বড় নাটক দেখতে অভ্যস্ত দর্শক সাধারণের কাছে খুব সমাদৃত না হলেও ‘মুক্তির ডাক’ বাংলা নাট্যধারায় এক চিরস্মরণীয় দিক্ চিহ্ন। এরপর তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য লেখেন ‘চাঁদ সদাগর’ (১৯২৭) এবং ‘কারাগার’ (১৯৩০)। ‘কারাগার’ নাটকটি ব্রিটিশ সরকারের ৩.২.১৯৩১ তারিখের নিষেধাজ্ঞায় বন্ধ হয়ে যায়।

মন্মথ রায় যদিও প্রচলিত নাট্যধারা অনুসরণ করে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা শুরু করেন পরে অবশ্য সামাজিক নাটকও লিখেছিলেন যেগুলিও উন্নত শিল্পরূপে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল। তার পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তুগুলি পুরাণ থেকে নেওয়া হলেও চরিত্রচিত্রণে ও ভাবাদর্শে সমসাময়িক যুগের সমস্যাজনিত চিত্রের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। নাটকগুলিতে যেমন ছিল ধর্মীয় পরিবেশ এবং ভক্তিরসের উপস্থিতি তেমনই ছিল পরাধীন ভারতের পটভূমি আভাস-যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস। ‘কারাগার’ নাটকটিই মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকের প্রধান চরিত্র বসুদেবকে তিনি একটি পরাধীন নিপীড়িত জাতির মুক্ত সংগ্রামের নায়ক হিসেবে উপস্থিত করেছেন। কংসের কারাগারে যেন তিনি এক একটি সন্তানকে আহুতি দিয়েছেন মুক্তি সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে—অবশেষে তার জয় হয়ছে। কিন্তু প্রতিনায়ক কংস চরিত্রকে তিনি এ নাটকে অন্য এক মাত্রা দিয়ে তাকে ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে উপস্থিত করেছেন। কারণ কংসই এ নাটকে গতিসঞ্চারকারী চরিত্র। মন্মথ রায় পুরাণের এক শয়তান চরিত্রকে এ নাটকে এক মহৎ ট্র্যাজিক চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন। আবার একই রকম ভাবে মনসামঙ্গলের সুপ্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে ‘চাঁদসদাগর’ নাটকে মনসাকে তিনি নীচ এবং অনিষ্ঠান্বেষীরূপে উপস্থিত করেননি। এসময় তিনি ঐতিহাসিক নাটকও লিখেছিলেন—‘খনা’ (১৯৩২), ‘অশোক’ (১৯৩৩) ও ‘মীরকাশিম’ (১৯৩৮)।

১৯৩১ সালে মন্মথ রায়ের আটটা নাটক নিয়ে প্রকাশিত হয় প্রথম একাঙ্ক নাট্যসংকলন—এতে ছিল ‘রাজপুরী’, ‘বহুরূপী’, ‘উইক’, ‘বিদ্যুৎপর্ণা’, ‘স্মৃতির ছায়া’, ‘উপাচার’, ‘পঞ্চভূত’ ও ‘মাতৃমূর্তি’। এরমধ্যে ‘রাজপুরী’ বহুল প্রচলিত এবং প্রশংসিত।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে মন্মথ রায় নবনাট্য আন্দোলনের শরিক হয়ে পড়েন—এবং তার নাটকে স্থান পায় সাধারণ মানুষ—নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে সমসাময়িক ঘটনাবলি। তার এই পর্বে লেখা নাটকগুলি ‘জীবনটাই নাটক’ (১৯৫২), ‘মমতাময়ী হাসপাতাল’ (১৯৫২), ‘পথে বিপথে’ (১৯৫২), ‘ধর্মঘট’ (১৯৫৩), ‘চাষীর প্রেম’ (১৯৫৩), ‘বন্দিতা’ (১৯৫৩), ‘মহাভারতী’ (১৯৫৩), ‘বন্যা’ (১৯৬১) প্রভৃতি।

এই সময় তিনি দু’টো ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করেছিলেন—১৮৫৪ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ অবলম্বনে সাঁওতাল বিদ্রোহ’ (১৯৫৮) এবং অষ্টম শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের রাজা গোপাল দেবকে অবলম্বন করে ‘অমৃত অতীত’ (১৯৬০)।

১৯৬২ সালের চিনভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পটভূমিকায় চিনা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতের সীমান্তবর্তী একটি ছোটো গ্রামের মানুষদের বীরত্ব কাহিনি নিয়ে রচিত নাটক ‘মহাপ্রেম’ (১৯৬২)। নাটকটি সেই উত্তাল অবস্থার বিশেষ এক মর্যাদা পেয়েছিল সাধারণ মানুষের মনে।

১৯৫৮ সালে দশটি একাঙ্ক নাটক নিয়ে প্রকাশিত হয় তার ‘নব একাঙ্ক’ নাট্য সংকলন। নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—‘অর্কেস্ট্রা’, ‘কামধেনু কবচ’, ‘অসাধারণ’, ‘বলো হরি হরি বোল’ এবং টোটোপাড়া’।

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় তার 'ফকিরের পাথর' নাট্যগুচ্ছ। যার মধ্যে 'ফকিরের পাথর' বাংলা নাট্য সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এরপর পনেরোটি নাটক নিয়ে প্রদর্শিত হয় তার 'বিচিত্র' একাঙ্ক' (১৯৬১)।

তিনি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চ নাট্যসম্মান দীনবন্ধু পুরস্কার তিনি প্রথম পান (১৯৮৪)। সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান ১৯৬৭ তে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধাংশুবান নাট্যপুরস্কার পান ১৯৭২ সালে। এছাড়া আছে অজস্র পুরস্কার। বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটকের মহৎ স্রষ্টা এবং একাঙ্ক সম্রাট মন্মথ রায়ের অবদান কোনোদিন বিস্মৃত হবার নয়।

৭.২ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৬১)

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যুগনাট্যকাররূপে অভিহিত হয়েছেন। তিনি নাট্যকার, সংগঠক এবং নাট্যচেতনা। উদ্বোধকও বটেন। তিনি নাটক লিখেছেন; তার সঙ্গে নাট্যবিষয়ক আলোচনা, নাট্যকর্মীদের নির্দেশদান, নাট্যকার নাট্যপ্রযোজক নাট্যশিল্পী প্রমুখদের সঙঘবদ্ধ করার প্রয়াস ইত্যাদির মধ্যে তাঁর সৃজনমূলক কাজ প্রকাশ পেয়েছিল। এর ফলে বাংলার নাট্যআন্দোলন সমৃদ্ধ হয়। নবনাট্যআন্দোলনের বিশিষ্ট পুরুষ শচীন্দ্রনাথ ক্রমশ তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগুরু হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভারতীয় গণনাট্য সঙেঘর সভাপতি ছিলেন। বিশ্বশান্তি পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, পরে সেখানকার অধ্যাপকও হন। শচীন্দ্রনাথ সাংবাদিকরূপে ছিলেন সার্থক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পত্রিকার তিনি ছিলেন লেখক। তিনি 'বৈকালী'র সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। তাছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। বিজলী, আত্মশক্তি, নবশক্তি, নটরাজ, ঘরে বাইরে, কৃষক, ভারত প্রভৃতির সম্পাদক হিসাবে শচীন্দ্রনাথের সাংবাদিক জীবনের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বদেশ, রূপমঞ্চ, বঙ্গবাণী, বাতায়ন, বাঙালি, ভগ্নদূত, দীপালি, ভারতবর্ষ, খেয়ালী, মডার্ন রিভিয়ু, গল্পভারতী প্রভৃতি এবং আনন্দবাজার, যুগান্তর ছাড়াও অসংখ্য ছোটোবড় পত্র-পত্রিকায় তাঁর সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ছড়িয়ে আছে।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও পাণ্ডিত্যের প্রতি সে সময়ের শিক্ষিত তরুণ সমাজ খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত দ্বিধাহীন মন তাঁকে কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করেছিল। শুধু তাই নয়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সংস্কারমুক্ত শিল্পী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশেছিল অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামী মননশীলতা। আর সেকারণেই দ্বিধাহীন চিত্তে অঙ্কুরিত প্রতিভা ও সম্ভাবনাময় যুগসন্ধিক্ষণকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন নিজের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাকে তুচ্ছ করেও, সর্বজনবিমুখ পরিবর্তিত শিল্প চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন।

'বৈকালী' পত্রিকায় সম্পাদক থাকাকালীন শচীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে থিয়েটারে যাতায়াত শুরু করেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে তা পর্যবেক্ষণ করতেন। আর তখন থেকেই তাঁর মনে নাট্যরচনার ইচ্ছা, মঞ্চ ও নাটকের ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চকে 'আধুনিক' করে গড়ে তুলবার আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ শচীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে আধুনিক মঞ্চ সফল—নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুরুষের কাছে প্রেমহীন বশ্যতাকে অস্বীকার করে উদার মানবিকতায় নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে নতুন যুগের নতুন চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তথাপি তাঁর প্রথম নাটক 'রক্ত-কমল' নবীন দর্শকদের আকৃষ্ট করলেও প্রাচীনপন্থীদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়নি, তার কারণ

নাটকের বিষয়বস্তু ও আয়তন। এরকম আরও দুটি নাটক 'জননী' ও 'কালের দাবী' (১৯৩৮) প্রচলিত সামাজিক সংস্কারে আঘাত হানার ফলে বেশিদিন চলেনি। তবে অপরাধপ্রবণ সামাজিক নাটকে শচীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। এই সমস্ত নাটকের কাহিনি নির্মাণে শচীন্দ্রনাথের উপর চলচ্চিত্রের প্রভাব ভীষণভাবেই প্রকট হয়েছে। ঝড়ের রাতে, তটিনীর বিচার, সুপ্রিয়ার কীর্তি, নার্সিং হোম প্রভৃতি নাটকগুলিতে শহরজীবনের জটিলতা, কৃত্রিমতা এবং তৎকালীন চলচ্চিত্রসুলভ অভিনয়কে মনে রেখে রচিত নাট্যসংলাপ তাঁর নাটকে যে গতির সঞ্চার করেছে জনপ্রিয়তার মূলে তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিও জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও রুচি অনুসরণ করেছে। তাঁর দ্বিতীয় নাটক ও প্রথম মঞ্চ-সফল ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা'য় (১৯৩০) জাতীয়তাবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে মহারাষ্ট্রবীর দেশপ্রেমের প্রতিমূর্তি রাজা শিবাজির মধ্যে। 'সিরাজউদৌলা' (১৯৩৮) আর একখানি স্মরণীয় ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নাট্যকারের ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শ ও সে কালের দর্শকরুচি। শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনিশ্চয়তা অস্থিরতা হতাশা কম-বেশি প্রতিফলিত হয়েছে 'আবুল হাসান', রাষ্ট্রবিপ্লব, ধাত্রীপান্না প্রভৃতি নাটকে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা নাটকীয় দ্বন্দ্ব-মুহূর্তগুলি সৃষ্টি করেছে। দর্শকরুচির কথা মনে রেখে নাট্যকার এইসব নাটকেও দীর্ঘ বক্তৃতাধর্মী সংলাপ মানসিক উদ্বেগ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন এবং নাটকের শেষ দৃশ্যগুলি করুণরসাত্মক অতিনাটকীয় ও আবেগাপ্লুত করে তুলেছেন।

নাটক রচনায় শচীন্দ্রনাথ দর্শকরুচিকে অস্বীকার করেননি কেননা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন : '....নাটক ছাড়া নাট্যশালাকে জাতির সঙ্গে যুক্ত রাখবার আর কোনো মাধ্যম নাট্যশালার নেই।'

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকে গণ-চেতনার যে স্পষ্ট রূপ সর্বপ্রথম 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটকে দেখা গেল, শচীন্দ্রনাথের তৎকালে রচিত নাটক 'কালো টাকা', 'এই স্বাধীনতা', 'সবার উপর মানুষ সত্য', 'জয়নাদ ও আর্তনাদ', প্রভৃতিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। নিপীড়িত মানবাত্মা ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় কুসংস্কার ও সংকীর্ণ স্বার্থ প্রণোদিত রাজনৈতিক মুনাফার বিরুদ্ধে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের সুতীব্র ঘৃণা কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে এই সমস্ত নাটকে। সরস সংলাপ নাটকের বিতর্কিত বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

শচীন্দ্রনাথের নাটকে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বক্তব্যের বলিষ্ঠতা বিশেষ করে তাঁর শেষ পর্যায়ের নাটকগুলিতে দেশ সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে স্বাধীন মত ও চিন্তার পরিচ্ছন্নরূপে দেখতে পাওয়া যায়। 'এই স্বাধীনতা' নাটকখানিতে নাট্যকারের সত্যকথনের স্পষ্টতা অপূর্ব বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে নাট্যবিষয়ে ও নাট্যকারের স্বাধীন ভাবনায় একটি বিশেষ মাত্রা (ডাইমেনশান) আনতে সক্ষম হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্পের উদ্দেশ্য যে নিছক আনন্দ ও শিল্পরস পরিবেশন করা নয় দেশ ও জাতির প্রতি তার নৈতিক দায়িত্ব আছে শচীন্দ্রনাথ তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। শেষ জীবনে শচীন্দ্রনাথ শিল্পের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও স্বাধীন মত ব্যক্ত করে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন শিল্পীর দৃষ্টি তখনই সার্থক হয় যখন তাঁর শিল্পে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ ও সংগ্রামের কথা রূপায়িত হয়। 'All art belongs to the common man''. নামক একটি বক্তৃতা সংকলনে এ বিষয়ে শচীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অভিমত : 'Today, everyone the artist, the literature, the Philosopher, the Scientist, the progressive politician—everyone has learnt that it is only the common man who can keep the lamp burning. Art, literature, Philosophy, Science and everything besides, may only remain alive at the touch of the hand of the common man. This truth has learnt by all at a heavy cost.

শচীন্দ্রনাথ যুগের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। এর মূলে ছিল তার অন্তর্দৃষ্টি ও মনীষা—সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে এটাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রখ্যাত কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, '....তিনি নাট্য সাহিত্যের সাধনার সঙ্গে তাঁর নিজের আত্মিক সাধনাকে সমগতিতে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তি যেমন সমাদরের সামগ্রী, তিনি নিজে স্বকীয় মনুষ্যত্বের জন্য তেমনি শ্রদ্ধার প্রাত্র।'

৭.৩ বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬)

বিধায়ক ভট্টাচার্য সমাজকেই তার নাটকের প্রধান চরিত্র করেছেন—সমাজস্থিত মানুষের দুঃখবেদনা সমস্যা সংকট তাঁর নাটকে আন্তরিক রূপ লাভ করেছে। সমাজ সমস্যার গভীরে তিনি প্রবেশ করেছেন এবং গভীর অনুভবে তা ব্যক্ত করেছেন। সুদক্ষ রূপশিল্পী বিধায়ক তার ভাবনাকে যথাযথ অঙ্গ-বাঁধনে সৃজিত করেছেন। বক্তব্যের আন্তরিকতা, প্রকাশভঙ্গির নৈপুণ্য বিশেষত সংলাপের আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি এবং হাসিকান্নার মনোরম প্রকাশ তার নাটককে অত্যন্ত জনপ্রিয় করেছে।

বিধায়ক ভট্টাচার্য পারিবারিক সূত্রেই পেয়েছেন নাটকের ভাবনা। তাঁর পিতার 'বালুকর নাট্য সমাজ' ও 'ভারতীয় নাট্য সমাজ' নামে দুটি সখের নাটকের দল ছিল। তিনি সু-অভিনেতা ছিলেন। প্রখ্যাত অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিনয় ক্ষমতা দেখে তাঁকে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। পরবর্তীকালে তিনি শৌখিন থিয়েটারে মাঝে মাঝে মহিলা চরিত্রে রূপদান করেছেন। যেমন, 'সেই তিমিরে' নাটকে সন্ধ্যাতারা, 'চিত্রগুপ্ত' নাটকে হেলেন প্রমুখ চরিত্র। তবে চলচ্চিত্রে ও পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে উনি পুরুষ চরিত্রাভিনেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগার 'শিশিরকুমার ইনস্টিট্যুট-এ সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য ইস্যুয়িং অফিসার রূপে তিনি নিযুক্ত হন। বই পড়ার নেশা ছিলই, এলেন বই-এর জগতে। কিছুদিন পর অনিল ভট্টাচার্যের সঙ্গে রচনা করেন 'অতি আধুনিক' ও 'পুনর্মূষিকোভব' নামে দুটি নাটক। 'পুনর্মূষিকোভব' নাটকটি পরবর্তীকালে 'সেই তিমিরে' নামে রঙমহলে অভিনীত হয়।

এ দুটি নাটকের মঞ্চসাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি স্বতন্ত্রভাবে লেখেন 'মেঘমুক্তি'। এই প্রথম তাঁর নাটক পেশাদারি মঞ্চে অভিনীত হওয়ার জন্য মনোনীত হয়। এরপর তাঁর এগিয়ে চলার ইতিহাস। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি উদ্দামগতিতে নাটক, চলচ্চিত্রের কাহিনি, উপন্যাসের নাট্যরূপ, চিত্রনাট্য লিখে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ সুবিধামত মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় ও পরিচালনা করেছেন।

নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা কম নয়। যথা :

(ক) থিয়েটারি নাটক—মেঘমুক্তি, মাটির ঘর, বিশবছর আগে, মালা রায়, কুহকিনী, রক্তের ডাক, তাইতো, তেরশো পঞ্চাশ, খবর বলেছি, অন্ধ দেবতা, সেই তিমিরে, পিতাপুত্র, ক্ষুধা, তোমার পতাকা, মন্দাক্রান্তা/জয় পরাজয়, অতএব, এন্টনী কবিয়াল, দ্বিধা প্রভৃতি।

(খ) যাত্রা নাটক—সুরানারী সিংহাসন, রাষ্ট্রবিপ্লব, মাইকেল মধুসূদন, কালভৈরব/ভক্ত-ভৈরব, গিরিশচন্দ্র।

(গ) একাঙ্ক নাটক—তাহার নামটি রঞ্জনা, সরীসৃপ, নিবেদয়ামি।

বিধায়ক ভট্টাচার্যর কয়েকটি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে জটিলতা এলেও শুভপ্রয়াসে আবার তাদের মিলন সাধিত হয়—'মেঘমুক্তি' (১৯৩৮) নাটকের তাই

প্রতিপাদ্য। ত্রিমুখী প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং প্রেমিক নারী ও পুরুষের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির অবাঞ্ছিত উপস্থিতি যে সর্বনাশের সৃষ্টি করে 'বিশ বছর আগে' (১৯৩৯) নাটকের সেটাই বিষয়বস্তু। 'তাইতো' (১৯৪৪) নাটকে নারীপ্রগতির কথা বলা হয়েছে—নারীরা বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে এলে বিবাহ-সমস্যার সমাধান। অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক 'ক্ষুধা' (প্রথম অভিনয় ৬ বৈশাখ ১৩৬৪ বিশ্বরূপা) একাদিক্রমে ৫৭৩ রজনী অভিনীত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখ দারিদ্র্য বেদনা তার শোচনীয় দুরবস্থা নাটকে রূপ পেয়েছে। দুঃখ বেদনা পীড়িত জগৎ চ্যাটার্জীর পরিবার একদিকে, অন্যদিকে তার ভাড়াটে বাসা, গজা আর রমার ভাগ্যবিড়ম্বিত বেকার জীবনের যন্ত্রণা—দুটো কাহিনিকে নাটকে গাঁথা হয়েছে। অনেক দ্বন্দ্ব জটিলতার পর কাহিনি পরিণতির দিকে আসে, কিন্তু অসহ্য মর্মচ্ছিন্ন করা বেদনা কাহিনিকে সুখান্তক হতে দেয় না। 'কাল ভৈরব/ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র' (১৩৭৬) নাটকে দেখানো হয়েছে কিভাবে ভক্তিহীন রুদ্রস্বভাব গিরিশচন্দ্র ভক্তসাধকে রূপান্তরিত হন। রামকৃষ্ণদেবের মহিমার কথা নাটকে আন্তরিক রূপ পেয়েছে। এছাড়াও আছে তাঁর অভিনীত মুদ্রিত কিন্তু বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য পূর্ণাঙ্গ দুটি নাটক—'চিরন্তনী', 'তুমি আর আমি'।

সুন্দর সুমিষ্ট নাট্য সংলাপের জন্য নাট্যজগতে বিধায়ক ভট্টাচার্য 'মধুসংলাপী' বিধায়ক নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নাটক রঙমহল, মিনার্ভা, কালিকা, শ্রীরঙ্গম, বিশ্বরূপা, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, শীশমহলে অভিনীত হয়েছে। তিনি সুদীর্ঘকাল আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একজন সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে সেখানে প্রথম প্রবেশের সুযোগ পান। এরপর তিনি বেতারনাট্য, অভিনয়, আলোচনা প্রভৃতি বিষয়দ্বারা 'বেতার জগৎ'কে সমৃদ্ধ করেছেন। সেইসূত্রে তিনি কতগুলি বেতারনাট্যও লিখেছিলেন।

মৌলিক নাটক—কৃষ্ণাতিথির চাঁদ, জীবনজয়া—বেতারের রজত জয়ন্তী বর্ষে (১৯৫৩) সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসবে প্রথম স্থানাধিকারী নাটক, রাহুর প্রেম, মৃগতৃষ্ণা, গ্রীণরুম, মিলনতীর্থ, ডাক দিয়ে যাই, তাহার নামটি রঞ্জনা, সরীসৃপ।

(এটি অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় ও বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচিত হয়), সে, মন্দাক্রান্তা, বসন্ত বনের হরিণী।

বেতার নাট্যরূপ দিয়েছেন—বহ্নিশিখা (গজেন্দ্র কুমার মিত্র), রাধা (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়); বিচারক (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), রাজকন্যার স্বয়ম্বর (মনোজ বাবু), সীমাস্বর্গ (শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়), আধারে আলো (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), বহ্নিকন্যা (গজেন্দ্র কুমার মিত্র), দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

নাট্যকার বিধায়ক তাঁর নাটকে বাস্তবরীতি সম্মত দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। পেশাদারি থিয়েটারে সাধারণত এই রীতিই গৃহীত হয়ে থাকে। এর সঙ্গে আলো ও ধ্বনি প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন সময় (সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর ইত্যাদি), কাল (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত ইত্যাদি)-এর উল্লেখ করেছেন এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ, পরিমণ্ডল বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

'বিশ বছর আগে'র প্রথম দৃশ্য

"দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল, মঞ্চের উপর সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোতে পিছনে একটি পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। সদর দরজাটা জীর্ণ, তাহার উপর ততোধিক জীর্ণ একখানি 'ভাড়া দেওয়া যাইবে' লেখা পিচবোর্ড ঝুলিতেছে। বাড়িখানা একটি বাগানের মধ্যে অবস্থিত। বাড়ির গা ঘিরিয়া মেহেদীর বেড়া....

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া মঞ্চে গভীর রাত্রি নামিল। ঝিঁঝিঁ ডাক শোনা গেল এবং এখানে সেখানে জোনাকি জ্বলিতে লাগিল।"

ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবহার : 'বিশ বছর আগে' নাটকে নাট্য ঘটনা পরিবেশনের ক্ষেত্রে দ্রুততা আনয়নের জন্য নাট্যকার ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবহারের কথা বলেছেন—''মঞ্চ ঘুরিতে ঘুরিতে দোতলায় একটি জরাজীর্ণ'' ড্রয়িং রুমে আসিয়া থামিল। (২য় দৃশ্য ইত্যাদি)।

পূর্বে 'Flash back' রীতি উল্লেখ করা হয়েছে। বিধায়ক ভট্টাচার্য 'বিশ বছর আগে' নাটকে Flash back' রীতি গ্রহণ করেছেন। এটি বাংলা নাট্য প্রয়োজনার ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন।

আলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'shadow' ব্যবহার : ব্যক্তির মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে বিধায়ক ভট্টাচার্য 'রক্তের ডাক' নাটকে shadow ব্যবহারের কথা বলেছেন।

Multiple set এর ব্যবহার : বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'দ্বিধা' নাটকে দেখা যায়, মঞ্চকে দুভাগে বিভক্ত করে কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। যখন যে অংশে অভিনয় হয় তখন সেই অংশে আলো জ্বলে ওঠে, অন্য অংশ অন্ধকার থাকে। আবার কখনো কখনো প্রয়োজনানুসারে দুটি অংশ আলোকিত হয়।

মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বিষয় ব্যতীত বিধায়ক ভট্টাচার্য অজস্র উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি বহু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'যশোধর মিশ্র' ছদ্মনামে তিনি কিছু সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদ করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি নাটকের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাঁর ভাষায়—

''নাটক আমি ভালবাসি, এই ভালোবাসার টানেই মঞ্চ, অভিনেতা—এদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলাম এবং নিজেকে যথাসাধ্য উৎসর্গ করেছি নাটক রচনায়।''

৭.৪ বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন দ্বিতীয় পরীক্ষাধর্মী সৃজনকর্মে। তাঁর নাটকও এই বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল। বিষয়ের ব্যাপকতা সেখানে আছে, মানবজীবনের বিস্তার ও বিস্ময় তার নাটকে বিশেষভাবেই দেখা যায়; সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকের নানারূপতাও তার নাটক ও অন্যান্য সৃজনকর্মকে আকর্ষণীয় করেছে। তিনি চরিত্রের উদ্ভটত্ব ও অসংগতির মধ্য দিয়ে তার অন্তরধর্মকে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। বনফুলের বিভিন্ন রচনার মধ্যে নাট্যগুণের স্ফুরণ দেখা যায়—নাটকীয় উপাদান ও নাট্যধর্মে তাদের মধ্যে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমালোচক মনে করেন যে, যে অবজেকটিভিটি অথবা বস্তুনিষ্ঠা নাট্যকারের প্রধান লক্ষণ তা বনফুলের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। চিকিৎসক বনফুল ল্যাবরেটরিতে বসে 'জীবের কোষে ধমনীতে ও রক্তপ্রবাহে অনন্ত রহস্যের সন্ধান' করেছেন; নাটকেও তাই দেখা গেছে। বনফুল সংখ্যায় স্বল্প হলেও বেশ চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয়। জীবনী নাটক, সামাজিক নাটক, কাল্পনিক বা স্বপ্ন নাটক, রূপক নাটক, একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি ভাব ও প্রকরণের বৈচিত্র্যে তাঁর নাটক সমৃদ্ধ।

শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) বনফুলের লেখা জীবনী-নাটক, এটি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনী-নাটকও বটে। এর ভিত্তি যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' নামক অসাধারণ গ্রন্থটি। মধুসূদনের আঠারো বছর বয়স থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপ্ত কালসীমায় নাটকের কাহিনি প্রসারিত। কালগত বা স্থানগত ঐক্য এতে রক্ষিত না হলেও ভাবগত ঐক্য এতে আছে। এক আবেগময় বর্ণবিচিত্র প্রতিভাশালী জীবনের চিত্র নাটকে অঙ্কিত হয়েছে ও তাকে সংহত শিল্পমূর্তি দান করতে প্রয়াসী হয়েছেন নাট্যকার। কাহিনির বিন্যাসে নাটকীয়তা আছে, সংলাপ এবং বাক্য কথনরীতিও হয়েছে উজ্জ্বল ঝকঝকে। 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪৫) নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন যে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের আলেখ্য একটা নাটকে অঙ্কিত করা

শক্ত। সেইজন্য তিনি বিদ্যাসাগরের 'জীবনের একটি কার্যকে মূলসূত্র রূপে গ্রহণ করে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার প্রয়াস' পেয়েছেন। এই কার্যটি হল বিধবা-বিবাহ প্রচার। নাটকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হওয়াতে কাহিনিতে গতি ও একমুখীনতা এসেছে। তবে বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি পরদুঃখকাতরতা দানশীলতা ইত্যাদি প্রসঙ্গও স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। সংগ্রামরত ও স্বজনপরিত্যক্ত বিদ্যাসাগরের একক নিঃসঙ্গ রূপটি তীব্র বেদনা সঞ্চার করে। 'আসন্ন' (১৯৬৫) নাটকের মধ্যে লেখক স্বাধীনতা-উত্তর দেশে পরিব্যাপ্ত দুর্নীতি অবিচার ভ্রষ্টাচারের চেহারা তুলে ধরেছেন এবং এসবের অবসান না ঘটলে আমাদের ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত বিপন্ন সে সত্যও ব্যক্ত করেছেন। অন্ধকাররূপিণী এক কালী আবার আসবেন যিনি শত্রুদমনী বরাভয়দায়িনীও বটেন যিনি সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত মিথ্যা, দুর্নীতি, অনাচার ইত্যাদি দূর করবেন। লেখকের ক্রোধ ও জ্বালা নাটকে প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'ঠুংরি' (১৯৭৬) এক কল্পনাময় স্বপ্ননাটক যা প্রবহমান সমাজজীবনের চলচ্ছবি হয়ে উঠেছে : এটা দ্বন্দ্বগতি জটিলতায় টান টান নাটক নয়—তা শিথিলছন্দে গ্রথিত উপন্যাসধর্মী স্বপ্নপূরণের কাহিনি। 'চবৈতুহি' (১৯৭৬) রূপকের মধ্য দিয়ে বর্তমান দেশের অবস্থা ও রাজশোষণের পরিচয়টি বাঙ্গে বিদ্রূপে তুলে ধরা হয়েছে। 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৯৩৮), 'কঞ্চি' (১৯৪৫) ইত্যাদি নাটকে বনফুলের সৃষ্টিক্ষমতা বিশেষভাবে ধরা পড়েছে।

বনফুলের 'দশ ভাণ' একাঙ্ক নাট্যসংকলনে কয়েকটি অসাধারণ একাঙ্ক গ্রথিত হয়েছে। বনফুলের নাট্যসৃজনদক্ষতা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে। আদি হাস্য করুণ বীভৎস ইত্যাদি রসসৃজনে তার পারঙ্গমতা অদ্ভুত উদ্ভট চরিত্রসমূহকে অবলম্বন করে বিচিত্র রূপাঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে এই নাটক সমূহে। 'শিককাবাব' সমাজবোধে প্রখর ও তীব্র; 'কবয়ঃ' প্রণয় ও কবিত্বের অপরূপ মিলন; 'অন্তরীক্ষে' একাঙ্কে উর্ধ্বলোকে সংগ্রাম বিপর্যস্ত পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য বিশ্বকবিদের সম্মেলন এবং দেবলোকে নবাগত রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিপদে বরণ; 'নবসংস্করণ' প্রবল কৌতুককর ঘটনার মধ্য দিয়ে অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন। একাঙ্কর শ্রেষ্ঠ শিল্পময় প্রকাশ ঘটেছে বনফুলের আলোচ্য 'দশভাণ ও আরও কয়েকটি একাঙ্ক' (১৯৬২) গ্রন্থে।

৭.৫ রবীন্দ্র মৈত্র (১৩০৩ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৬ খ্রিঃ—ফাল্গুন বঙ্গাব্দ)

রবীন্দ্র মৈত্র মাত্র একটি নাটক লিখে প্রকৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। স্বল্পায়ু এই মানুষটি বিরল প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন এবং কয়েকটি গল্প (দিবাকর শর্মা ছদ্মনামে লেখা 'থার্ডক্লাস' ও 'নিধিরামের বেসাতি') ও একটি মাত্র নাটক লিখে তার দক্ষতার পরিচয় রাখেন। তাঁর অন্যান্য গল্প উপন্যাস আছে, কাব্যগ্রন্থও। 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রকাশিত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' রবীন্দ্র মৈত্রকে একজন সুরসিক সুদক্ষ নাট্যকাররূপে প্রকাশ করে।

বেকার সমস্যা তখনও ছিল প্রবল। গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াত উদভ্রান্তের মতো। এই সমস্যা অবলম্বন করে রবীন্দ্র মৈত্র লিখেছেন কৌতুক-মধুর রসের নাটক 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। মনমোহন ও নীহারিকা দুই বেকার গ্র্যাজুয়েট একটা স্কুলের কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখতে পায় যেখানে একমাত্র স্বামী স্ত্রী-কেই চাকরি দেওয়া হবে। বেঁচে থাকার দায়ে এরা দুজন অপরিচিত হলেও স্বামী-স্ত্রীরূপে চাকরি করে। নীহারিকা নারী হয়ে এই অভিনয় মেনে নিতে পারে না, সে মিথ্যা বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। নিরুপায় মানসও তাকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। বিদায়ের মুহূর্ত আসন্ন; কিন্তু নীহারিকার নিভৃত নারীহৃদয় জেগে উঠেছে। সে কখন মানসকে ভালোবেসে ফেলেছে, তার গোপন নিভৃত হৃদয় সে মানসকে দিয়ে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত মিলনে কাহিনির অবসান। এই সাধারণ কাহিনিকে কৌতুক রসিকতায় হাস্যময়তায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করেছেন নাট্যকার। তার সঙ্গে মিলেছে প্রেমের মাধুর্যমণ্ডিত ভাবনা। রহস্যের আকর্ষণও ছিল প্রবল। একটি উপকাহিনিকে, নাট্যরসকে আরো উজ্জ্বল করেছে। কাহিনিটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। এটি মঞ্চেও প্রবল সাফল্য অর্জন করে।

উত্তর চল্লিশের বাংলা। ইতিহাসের আগুন-ঝরা সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়াল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে—সুনীল আকাশে বোমারু বিমানের আনাগোনা আর নির্বিচার বোমাবর্ষণ, নির্মম মানব হত্যা। জনপদের ধ্বংসসাধন যেন সভ্যতার অপমৃত্যু আসন্ন করে তুলেছে। দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তর করাল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে, মৃত্যু ভয়ংকর থাবা বিস্তীর্ণ করেছে মানুষের প্রাণের ওপর—কালোবাজারি আর মজুতদারের দল মনুষ্যসৃষ্ট এই বর্বরতাকে আরো ভীষণ করে তুলেছে, সেই তামস অন্ধকারে তারা ধনসঞ্চয়ের পাশব উল্লাসে মত্ত, তাদের প্রাসাদে কত মৃতমানুষের হাড় জমেছে কে তার হিসেব রাখে। মুমূর্ষু বিষণ্ণ সময়ে অন্ন নেই পণ্য নেই। আবার ৪২-এর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার অবসান চাইছে। এরই মধ্যে প্রগতিশীল আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মতো দীপ্যমান হচ্ছে—সমাজসচেতন কবিশিল্পীরা এই অসহায় অবস্থার প্রতিকার চাইছেন প্রবলভাবে। সেই সময় কলকাতার রাজপথে দেখা গেল অদ্ভুত একদল জীব যারা ঠিক মানুষ নয় কিন্তু মানুষের মতো যেন মানুষের ক্যারিকেচার, যারা নড়ে চড়ে আর্ত গোঙায়, ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া একটুকরো খাবারের জন্যে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে, আর যাদের তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকার ইঁটকাঠপাথরের দেওয়ালকে ভেদ করে মানুষের বুকে কাঁপন তোলে—একটু ফ্যান দিবি মা!

এই যুগ এই জীবন, এই যন্ত্রণা এই দাহকে রূপায়িত করতে এগিয়ে এলেন নাট্যকাররা, ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হল বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন'।

রচিত হল ইতিহাস।

অবশ্য পরবর্তীকালে গণনাট্য কথাটা নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়। গণনাট্য আন্দোলন সারা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল। এর আদর্শ ছিল মার্কসবাদ, উদ্দেশ্য ছিল সমাজের পরিবর্তন, উপায় ছিল নাটককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। গণনাট্য সংঘ বিপুল মহিমায় আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নাট্যবিদরা অনেকেই এই আদর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁরা মনে করলেন এতে দলের বাধন আছে, এতে শিল্পীর স্বাধীনতা খর্ব হয় এবং ফলে ভালো কাজ করা যায় না। এবং এতে মানুষকে সামগ্রিকরূপে চিত্রিত করা যায় না; শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি হয় অসম্পূর্ণ। গণনাট্য সঙ্ঘের মানুষরা কেউ কেউ বেরিয়ে এলেন এবং তাঁরা যে আন্দোলনের শরিক করলেন তার নাম দিলেন নবনাট্য আন্দোলন। যেমন শম্ভু মিত্র। বহুরূপী বললেন—আমরা ভালো নাটক অভিনয় করতে চাই, যে নাটকে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবন গঠনের প্রয়াস আছে। আবার এর থেকে গঠিত হল সৎ নাট্য আন্দোলন—honest intellect theatre এইসব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন অনেক নাট্যব্যক্তিত্ব। আধুনিক কালের এই আন্দোলন রূপ নিয়েছে গ্রুপ থিয়েটারে। অবশ্য কেউ মূল ভাবনা থেকে কোনো সময়েই সরে আসেননি হননি তা হল সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলা ও মানবতার জয় ঘোষণা করা। এখনও গণনাট্যের আদর্শ নাটকের মূল রূপে বিদ্যমান।

এই প্রগতিশীল জীবননিষ্ঠ সমাজপ্রত্যয়মূলক আদর্শে দীক্ষিত হয়ে নাট্য সৃজনে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ নাট্যকার। গণনাট্য আন্দোলনের এরাই মহৎ প্রবক্তা। মন্মথ রায় এদের গোষ্ঠীভুক্ত না হয়েও মানবিক আদর্শ ও প্রত্যয়ে নিষ্ঠ হয়ে নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটকের পটভূমি—সমাজ, কুশীলব-মানুষ, তাঁর উদ্দেশ্য—সামাজিক কল্যাণ বিধান। পরবর্তীকালে গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরা এঁদের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে নাটক রচনা করে মহৎ সামাজিক ও শৈল্পিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

৭.৬ বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮)

বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ যিনি বাংলার 'প্রথম বিপ্লবী লোকায়ত নট ও নাট্যকার' রূপে (রণেশ দাশগুপ্ত) অভিহিত হয়েছেন। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তিনি 'একটা যুগের প্রতীক'। অভিনয় পরিচালনা ও নাটক রচনা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন অতীব দক্ষ। তাঁর নাটক দিয়েই ভারতীয় গণনাট্য সঙেঘর জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রবলভাবেই সমাজ সচেতন—তিনি ছিলেন মাটির মানুষের নাট্যকার, বাংলার কৃষকসমাজের আবেগ আকুলতা, সমস্যা সংকট তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছেন ও নাটকে তাকে যথাযথ রূপ দিয়েছেন। তিনি প্রগতিশীল ভাবনার শরিক ছিলেন—অন্যায় অবিচার শাসন শোষণের অবসান চেয়েছেন নিশ্চিত প্রত্যয়ে। বিজন ভট্টাচার্য বাংলা নাটকের একটা গতিপথ নির্ণয় করে দিয়েছেন : 'দেবী গর্জন' এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য। জোতদার মহাজনের অপরিসীম লোভ ও লালসা, কৃষকদের ওপর অত্যাচার, নারী নির্যাতন, অসহায় চাষিকৃষকদের জোট বাধা ও মহাজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং তাদের হাতে অত্যাচারীর মৃত্যু : শ্রেণি সংগ্রামের এই আদর্শ বিজন ভট্টাচার্যই প্রথম নির্মাণ করেন এবং সেই অর্থেই প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের তিনি অগ্রণী পুরুষ। বিজন ভট্টাচার্যের বিশিষ্ট নাটক হল—'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দি' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৪), 'গোত্রান্তর' (১৯৫৭), 'মরাচাঁদ' (১৯৬০), 'দেবী গর্জন' (১৯৬৬), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৬৯), 'লাস খুইরা যাউক' (১৯৭০), 'হাঁসখালির হাঁস' (১৯৭৭) ইত্যাদি।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' আধুনিক বাংলা প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের প্রথম উল্লেখ্য সৃষ্টি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি নতুন এবং মঞ্চ আঙ্গিকের দিক থেকেও এটি অভিনব। নাটকের পরিচালক ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র এবং গণনাট্যের শিল্পীরাই ছিলেন এর কুশীলব। বেয়াল্লিশের পটভূমিকায় নাটকটি লেখা। নাট্যকার বলেছেন—''ঘরে যেদিন অন্ন ছিলনা, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি 'নবান্ন' লিখেছিলাম। নাটক আরম্ভ করেছিলাম ১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে''। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য যেন মাতঙ্গিণী হাজরার লড়াইয়ের অগ্নিময় রূপ; পরবর্তী দৃশ্যসমূহ প্রধান সমাদ্দরের পরিবার ও গৃহজীবনের চিত্র। ২য় ও ৩য় অঙ্ক কলকাতায় আসা গ্রামবাসী কৃষকদের শোচনীয় জীবনচিত্র। ৪র্থ অঙ্কে নবান্ন উৎসব। কাহিনিতে সংহতি সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নেই। এক অন্ধ দোতারা বাদককে নিয়ে সংগ্রামের ছবি আঁকা হয়েছে 'মরাচাদ' নাটকে। পূর্ব বাংলা থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষদের ভাগ্য বিপর্যয় ও শোচনীয় দুরবস্থার কথা বলা হয়েছে 'গোত্রান্তর' নাটকে। নাট্যকার ভূমিকায় জানিয়েছেন যে 'উষর লালমাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষিদের কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে, শত্রুকে পরাহত করে, জননীকে খুঁজে পাবার সংগ্রামী সাধনা', রূপবদ্ধ হয়েছে 'দেবী গর্জন' নাটকে যে নাটকটি ভাবনায় ও আঙ্গিকে বাংলা প্রগতিশীল নাটকের একটা প্যাটার্ণ তৈরি করে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ব্যথিত শিল্পীচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে 'লাল খুইরা যাউক' নাটকে। 'নীলদর্পণ' (দীনবন্ধু মিত্র) ও 'জমিদার দর্পণ' (মীর মশাররফ হোসেন)-এর সার্থক উত্তরসূরী বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' ও 'দেবীগর্জন' : এ সিদ্ধান্ত অযথার্থ হবে না।

৭.৭ তুলসীদাস লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯)

সৃষ্টির বহুমুখী বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত শিল্পপ্রতিভা। তাঁর সৃজনদক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন নট নাট্যকার নাট্যপরিচালক। সঙ্গীতে ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা। তিনি গীতিকার ও সুরস্রষ্টা, তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কমলা ঝরিয়া, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, আশ্চর্যময়ী দাসী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী। তিনি এইচ এম ভি ও

মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। নাটকেও তিনি সুর দিয়েছিলেন, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শচীন সেনগুপ্ত রচিত 'স্বামী-স্ত্রী' নাটক। কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে তার রচিত, অভিনীত নাটকের সংখ্যা অন্তত পঞ্চাশ। এগারোটি চলচ্চিত্র তাঁর কাহিনিতে ও পরিচালনায় সমৃদ্ধ। সিনেমায় কৌতুক শিল্পীরূপে তিনি বিশেষ আকর্ষণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের অবিস্মরণীয় পুরুষ তুলসী লাহিড়ী নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তার রচিত নাটক সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু ভাব ও রূপের বিচারে তারা অনন্য। তিনি বাংলার ব্রাত্য ও অবহেলিত জীবনের রূপকার। প্রখর সমাজসচেতন শিল্পী সামাজিক সমস্যা-সংকটকে দেখেছেন, সেই যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত মানুষের দুরবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করে এবং সেসবের অবসানও তিনি চেয়েছেন। তবে রাজনৈতিক দর্শন অপেক্ষা মানবিক প্রত্যয়ই তাঁর কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ, সমাজতত্ত্বের চেয়ে জীবনসত্যই তার কাছে কাম্য ও প্রয়োজনীয়। আঞ্চলিকতা তাঁর নাটকের এক বিশেষ ধর্ম। নিচুতলার মুসলমানের সমাজের চিত্র অঙ্কনে তিনি দক্ষ; সামাজিক অর্থনৈতিক শাসন-শোষণে ক্লিষ্ট মানুষগুলির দুর্বিষহ যন্ত্রণাকে তিনি গভীর মমতায় ও সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে এবং চরিত্রগুলি অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতেও প্রস্ফুটিত হয়েছে : 'ছেঁড়া তার' নাটকের কথা প্রসঙ্গতই মনে পড়বে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহতাও তিনি এঁকেছেন নাটকে। বণিক প্রাধান্য ও শোষণ স্ফীত ধনিকের মুনাফার অঙ্ক বাড়ানোর প্রয়াসে যে সর্বত্র বৃত্তির ব্যভিচার প্রকট হয়ে উঠেছে তার প্রবল প্রতিবাদ করেছেন তুলসী লাহিড়ী ও নাটকের দর্শক-পাঠকের অন্তরে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন : 'কল্যাণধর্মী না হলে নাটকের যুগোত্তীর্ণ হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই'। সেই বিচারেই তুলসী লাহিড়ীর নাটক কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াল পটভূমিকায় লেখা তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' নাটকটিই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সর্বপ্রথম নতুন যুগের নতুন নাটক। 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭) নাটকের বিষয় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—''ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতর দল, যারা ধনলোভীর লোভের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল তাদের ছবি আঁকতেই এই পাঠকের সৃষ্টি।'' এই ভয়ংকরের মধ্যে থেকেও তাদের মনুষ্যত্ব লুপ্ত হয়নি, ক্ষণিক বিদ্যুৎচমকের মতো তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নাটকটি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয়ে (প্রথম ভাবনায় ১২. ১২. ১৯৪৭) ইতিহাস রচনা করে।

পরের নাটক পথিক (১৯৪৮) গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের সন্নিকট কয়লাখনি অঞ্চলের বিচিত্র জীবনধারাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। নাটকের পট একটি চায়ের দোকানে আসা-যাওয়া কয়লাখাদের বাবু ও মজুরদের উল্লাস-তিক্ত জীবন, হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ দোকান মালিকের পৌত্রী লেখাপড়া জানা সুমিত্রাকে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দান ও তার বিধবা হয়ে ফিরে আসা ও প্রেমপ্রত্যাশী বাবুদের তার প্রত্যাখ্যান; শ্রমিক-মালিক সংগাত, কলকাতা থেকে আসা সাহিত্যিক অসীম রায়ের কুলিদের পক্ষ নিয়ে মালিকদের সঙ্গে আলোচনা ও মালিকদের ষড়যন্ত্রে তার প্রাণনাশের প্রয়াস এবং সুমিত্রার আকর্ষণে মুমূর্ষু অসীমের সেখানে থাকা—নাটকের কাহিনি। অনন্ত কামপ্রবাহে জটিল শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বক্রকুটিল আবর্তন, মানুষের অবিরাম চলা এবং জীবনপথিকের আগমন ও ব্যক্তিমনের গভীর উদ্ভাস— নাটকে লেখকের ভাব ও আদর্শ বড় হলেও তার রূপায়ণে সার্থকতার পরিচয় কম। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' (১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। উত্তর বাংলার সাধারণ নিরক্ষর অথচ সৎ আদর্শনিষ্ঠ মুসলমান কৃষক সমাজের জীবনচিত্র এখানে নিখুঁত বাস্তবতায় ও গভীর আন্তরিকতায় চিত্রিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের জ্বালায় দগ্ধ অনাহার ক্লিষ্ট রহিমদ্দি পরিবারকে বাঁচাতে স্ত্রী ফুলজানকে তালাক দেয় ও সে গ্রামের

মাতব্বর অত্যাচারী হাকিমদ্দির ঘরে চলে যায়। সুদিন এলে রহিম ফুলজানকে আনতে যায় কিন্তু হাদিসের বাধনে ফুলজান মুক্তি পায় না যদিও তার মন কেঁদে ওঠে। রহিমদ্দি আত্মহত্যা করে। তার প্রিয় বাদ্য দিলরুবার তারই ছেঁড়ে না, রহিম-ফুলজানের জীবনের বীণার তারও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। হৃদয়ভাবনা ও তথাকথিত ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ফুলজানের আত্মার ক্রন্দন মর্মস্পর্শী। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে লেখক দক্ষতা দেখিয়েছেন। বহুরূপী প্রয়োজিত 'ছেঁড়া তাঁর' নাট্যপ্রয়োজনার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে।

দেশবিভাগের অব্যবহিত পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের এক হিন্দু পরিবারের সমস্যা সংকট নিয়ে লেখা 'বাংলার মাটি' হয়েছে ভাঙ্গা বাংলার ভাঙ্গা মনের আদর্শনিষ্ঠ অথচ মর্মস্পর্শী কাহিনি। দেশবিভাগোত্তর বাংলার অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতার মধ্যবিত্ত পরিবারের বিপর্যয়ের কাহিনি তুলসী লাহিড়ীর শেষ নাটক 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৯৫৯) যদিও নাটকের শেষে হার না মেনে এগিয়ে চলবার কথাই বলা হয়েছে। তুলসী লাহিড়ীর একাঙ্ক নাটকগুলিও উচ্চমানের রচনা। 'গ্রীণরুম', 'ওলটপালট', 'মণিকাঞ্চন', 'চৌর্যানদ', 'দেবী' ইত্যাদি জীবনচিত্রণে ও শিল্পরূপময়তার বাংলা একাঙ্ক নাটকের গৌরব।

৭.৮ দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯৫)

আজীবন সংগ্রামী দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন; উত্তরকালেও তার প্রতিবাদী চেতনা ছিল তীব্র প্রখর এবং সর্ববিধ অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন। স্বাধীন দেশেও তাঁর নাটক বাজেয়াপ্ত হয়েছে ('তরঙ্গ'), তিনি কর্মচ্যুত হয়েছেন, ('গোলটেবিল' নাটক লেখার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে তাঁর চাকরি যায়), অসহনীয় দারিদ্রের মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছে। তবু তিনি আদর্শচ্যুত হননি। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, মার্কসবাদ তাঁর মানস পরিমণ্ডল গঠন করেছে এবং এই প্রত্যয়ে তিনি নাটক লিখেছেন। এই বৈপ্লবিক ভাবনাই তাঁকে মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছে। মহাকবির মতো তাঁরও প্রত্যয় ছিল যে 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। যুদ্ধোত্তর বাঙালি জীবনের সমস্যা সংকট, দেশবিভাগজনিত বিপর্যস্ত অবস্থা, অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর দুঃসহ পীড়ন, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ ইত্যাদি বিষয় তাঁর নাটকে রূপে পেয়েছে; কিন্তু আঘাতে বিপর্যয়, শাসন শোষণ, অত্যাচার অবিচারকে তিনি শেষ কথা মনে করেন নি। তমিস্রাবচ্ছন্ন ঘন অন্ধকারের অতিক্রান্তে আলোকের উজ্জ্বল প্রকাশ তিনি দেখেছেন, মানবতার অনিবার্য জয় ঘোষিত হয়েছে তাঁর নাটকে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে 'নাটক রচনা তাঁর পক্ষে আর্টের ললিতবিলাস নহে, তাহা দুঃখবৃত সত্যসন্ধিৎসা'। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি ১৮টি পূর্ণাঙ্গ, ৩৬টি একাঙ্ক ও ১৮টি শিশুনাটক রচনা করেন। প্রথম নাটক 'অন্তরাল'-এ (রচনা ১৯৪২, প্রথম অভিনয় ১৯৪৪) কানীন পুত্রের সামাজিক অধিকার প্রসঙ্গটি এসেছে ও লেখক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার পর্যালোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক সংকটের কথা ও ব্যক্তিমনের বেদনাহত চিত্রও নাটকে দেখা গেছে প্রবলভাবে। পরবর্তী নাটক 'দীপশিখা' (প্রথম অভিনয় রঙমহল, ১৯৪৩) পঞ্চাশের মন্বন্তরের ওপর ভিত্তি করে লেখা বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' নাটকের যেন প্রাক্ভাষ এটি। 'তরঙ্গ' (১৯৪৬) রাজনৈতিক নাটক; অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা-সংকটও প্রবল রূপ পেয়েছে। গরীব কৃষকদের ওপর জোতদার জমিদার মহাজন প্রবল অত্যাচার করলে কৃষককুল বিক্ষুব্ধ হয় ও তাদের নেতৃত্ব দেয় দেশপ্রেমিক যুবক অমর। অর্থনৈতিক সংগ্রাম জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে মিলে যায়। চলে দমন পীড়ন, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ হয়; শেষপর্যন্ত মানুষের জয়ের বার্তা ঘোষিত হয়। দেশবিভাগের

পর পাকিস্তানে হিন্দুদের সংকট ও বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে ‘বাস্তুভিটা’ (১৯৪৭) নাটকে যেখানে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যেও মানবতার সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাঙালি জীবনের দুঃখবেদনার ছবি আঁকা হয়েছে ‘মোকাবিলা’ (১৯৪৯) নাটকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন মানবতার ক্রন্দন নিয়ে লেখা হয়েছে ‘মশাল’ (১৯৫৪) যেটি চেক ভাষায় অনূদিত হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়। দিগিন্দ্রচন্দ্রের অন্যান্য নাটক হল ‘কেউ দায়ী নয়’ (১৯৬১), ‘নয়া শিবির’ (১৯৬৪), ‘অমৃত সমান’ (১৯৬৯) ইত্যাদি। শেষ পর্যায়ের লেখা ‘স্বর্গের সিঁড়ি’ (১৯৮২) নাটকে সৌন্দর্য (Aesthetics) ও প্রয়োজনীয়তার (utility) দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত। অপরিমিত ধনসঞ্চয় ও ভোগবাসনার শোচনীয় পরিণাম নাটকে দেখানো হয়েছে যদিও জীবননিষ্ঠ মানবতাবাণী নাট্যকারের ভাবনায় ঘন অন্ধকারের মধ্যেও প্রাণের দীপশিখা অনির্বাণ জ্বলে। একাঙ্ক নাটকেরও তিনি অতি সার্থক স্রষ্টা।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ দিগিন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন ‘যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র’, ‘রণ ও রাষ্ট্র’ ‘বিশ্বসংগ্রামের গতি’ ইত্যাদি। মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের বিশিষ্টতম প্রবক্তা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যতত্ত্বগ্রন্থগুলি শিল্পবিচারের সঠিক পথ নির্দেশ করে। ‘নাট্যচিন্তা শিল্প জিজ্ঞাসা’, ‘শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রবন্ধ’ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রসঙ্গতই স্মরণীয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা ‘দুরন্ত পদ্মা’র জন্য তিনি পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধাংশুবালা স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৪), গোর্কীয়র উপন্যাস অবলম্বনে ‘মা’ নাটকের জন্য পান সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার (১৯৬৮); ১৯৮৫ সালে তিনি লাভ করেন দীনবন্ধু পুরস্কার। মার্কসবাদ তথা মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক ও নাট্যবিষয়ক গ্রন্থাবলি।

৭.৯ সলিল সেন (১৯২৪-১৯৯৯)

সলিল সেন নাট্যকাররূপে প্রথম শ্রেণিভুক্ত হবেন। অভিজ্ঞতা একটা মানুষকে সমৃদ্ধ করে যা তার শিল্পসৃষ্টির ভিত্তিমূলে বিশেষ কার্যকরী হয়। সলিল সেনের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আকীর্ণ যে অভিজ্ঞতা নাট্যরূপে তাঁকে ঋদ্ধ করেছে। পূর্বকালের মানুষকে তিনি দেখেছেন—এদের সহজ সরল আন্তরিক জীবনযাত্রা প্রাণের গভীর স্পন্দন অনুভব করা যায়; আবার এই সব নিঃস্ব রিক্ত ছিন্নমূল সর্বহারা মানুষদের অসহ্য বেদনা ও যন্ত্রণা শিল্পীর মনে গভীর অনুরণন তোলে। মুর্শিদাবাদের দুঃখপীড়িত গ্রামের মানুষ তাঁর নাটকে এসেছে, আবার সুন্দরবনের অরণ্যঘেরা অঞ্চলে জীবিকার তাগিদে ভয়ংকরের মুখোমুখি দাঁড়ানো মানুষজনের বেঁচে থাকার নিদারুণ মর্মজ্বালা লেখককে প্রাণিত করেছে জীবনমুখী নাটক সৃষ্টিতে। এত বিচিত্র ধরনের মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের বেঁচে থাকার লড়াই, দুঃখে নিমজ্জমান তাদের দুঃখের করুণ প্রবাহ, এরই মধ্যে তাদের প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা অনুরাগের উচ্ছলতা সলিল সেনের নাটকে এঁকেছে সৃষ্টির আলিম্পন। সলিল সেন ছিলেন রাজনীতির মানুষ—এক বামপন্থী দলের তিনি সদস্য ও বামপন্থার প্রতি তাঁর অনুরাগ। রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছেন যা জীবনচর্চায় সমাজবোধে মানুষের প্রতি ভালোবাসায় উৎসারিত। সলিল সেনের নাটক একদা পেশাদার ও অপেশাদার—সব ধরনের মঞ্চেই জনপ্রিয় হয়েছিল।

‘নতুন ইহুদী’ (১৯৫৩) সর্বহারা ছিন্নমূল মানুষদের বেদনা গভীর মমতায় ব্যক্ত করেছে। বাংলা তথা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছিল বটে কিন্তু রক্তস্নাত দ্বিখণ্ডিত দেশ সেই স্বাধীনতাকে পরিত্রাত্ররূপে পেলনা : সব বাসনা বিপর্যস্ত সব আশা নিঃশেষ হল, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত নিঃশেষিত হয়ে গেল। স্বাধীনতার পথ নিষ্ঠুর

নির্মমভাবে প্রবাহিত হয়ে দেশকে দ্বিখণ্ডিত ও রক্তাক্ত, সভ্যতাকে ধ্বংস ও মানুষদের ভয়ংকর সর্বনাশে নিঃশেষিত করে দিল। দেশবিভাগের পর এপ্রান্তে চলে আশা ছিন্নমূল মানুষদের বিপর্যস্ত জীবনের কথা মর্মস্পর্শীভাবে বলা হয়েছে 'নতুন ইহুদী' নাটকে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শিক্ষক মনোমোহন ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবারের বেদনাময় কাহিনির মধ্য দিয়ে।

'মৌচোর' (১৯৫৭) সুন্দরবন অঞ্চলের মধুসংগ্রহের এক জটিল দ্বন্দ্বময় সংকটপূর্ণ কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। লেখক নাটকের পূর্বাভাসে জানিয়েছেন—'আঠার ভাটি (সুন্দরবন) বাদা অঞ্চলের অসহায় মানুষের দুঃখ কষ্ট আনন্দ ভালোবাসা, সমবেদনার সাথে অঙ্কিত করেছি মৌ-চোর নাটকের মাধ্যমে। কাঠুরে, পেতেল, মৌলী আর অজস্র ভূমিহীন মজুর যারা অন্নহীন, একটা সুন্দর সুখী ঘর বাঁধবার আশায় প্রাণ হাতে করে যারা এগিয়ে যায় বাঘ-সাপ-লুটপাটের দেশে, নিরামনিষ্যির জঙ্গলে ভরসা করে নিয়ে যায় ''মোবরা গাজীর বেলা''দের কিস্তি নৌকার ''বাউলী''-কার, তাদের কথাই নাটকের উপজীব্য। দক্ষিণবাংলার মৌ-সংগ্রহকারী মানুষদের জীবন, তাদের দুঃখদারিদ্র প্রেমভালোবাসা ও লড়াকু মানসিকতা এবং মহাজনদের ভয়ংকর স্বরূপ নাটকে যথাযথ ফুটেছে। আবর্তসংকুল দ্বন্দ্বসংঘাতময় নাটকীয় দৃশ্যাবলি নাটককে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছে।

'ডাউন ট্রেন' (১৯৫৯) নাটকে দেখানো হয়েছে কঠিন কর্তব্যবোধ ও অভাবের তাড়নায় বিপর্যস্ত মানুষের লোভ ও লালসার দ্বন্দ্ব কেমনভাবে শোচনীয় বিপর্যয় এনে দেয় মানুষের জীবনে। অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ স্টেশনমাস্টার সত্যভূষণ অসুস্থ রুগ্ন স্ত্রীকে বাঁচাবার তাগিদে অর্থের বাসনায় এক ব্যক্তিকে রাতের অন্ধকারে খুন করে ও তার মৃতদেহ রেললাইনের ওপর ফেলে রাখে। পরের দিন দেখা গেল যে সত্যভূষণ তার সন্তানকেই হত্যা করেছে। ঘটনার তীব্র গতি, ভাবনার দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত এক নিষ্ঠুর নির্মম পরিণতির চমক 'ডাউন ট্রেন'কে অত্যন্ত নাটকীয় করেছে।

'দিশারী' (১৯৫৯) নাটকে মানবজীবনের আদর্শবাদের কথা বলা হয়েছে—মিথ্যা মর্যাদাবোধকে বাদ দিলে স্বল্পবিত্ত বাঙালি ব্যবসার কর্মের দ্বারা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে। 'দর্পণ' (১৯৬০) নাটকে লেখক সামান্য বা অজ্ঞাতপরিচয় তরুণদের আত্মত্যাগের কথা বলা হয়েছে যারা গণআন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। 'স্বীকৃতি' (১৩৭১ বঙ্গাব্দ) স্নেহভালোবাসাপূর্ণ মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের আবেগময় প্রকাশ। এই কঠিন নির্মম সময়েও এই একান্নবর্তী পরিবারকেন্দ্রিক নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। সলিল সেনের 'সন্ন্যাসী' ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতময় রোমান্টিক নাটক। ব্যারিস্টার সত্যর ভাবী স্ত্রীর শ্রীমতী হঠাৎ সন্তান সম্ভবিতা হলে সত্য তাকে খুন করে নিজে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। সে মরলেও শ্রীমতী মরে না তাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায় এদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ডাক্তার মণিমোহন। মৃত্যুপথযাত্রী সত্য তাদের তৃতীয় প্রিয় বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার শঙ্করকে সব জানিয়ে মারা যায়। শঙ্কর দীর্ঘদিন পর মণি ও শ্রীমতীকে খুঁজে পেয়ে তাদের হত্যা করতে গেলে শ্রীমতী জানায় যে তার মেয়ে সত্যেরই কন্যা এবং মণিমোহন এতকাল সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করে তাদের বাঁচিয়েছে।

নবনাট্য আন্দোলনের বরেণ্য শিল্পী সলিল সেন জীবনের বহুবিচিত্র রূপকে নাটকের অঙ্গীভূত করেছেন। ব্রাত্য জীবন, অমার্জিত অসংস্কৃত গ্রাম্য জীবন, ভয় ও রহস্যমণ্ডিত অরণ্যজীবন, মধ্যবিত্ত সমাজ এবং এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিচিত্র অগণিত চরিত্র তাঁর নাটকে এসেছে নিখুঁত যথাযথরূপে। ফলে তার নাটক হয়েছে লোকজীবনের শিল্পভাষ্য। তিনি ছিলেন সংলাপনিপুণ আঙ্গিক সচেতন শিল্পী, সার্থক রূপলোকও নির্মাণ করেছেন তিনি। তাঁর প্রায় সব নাটকই বিস্ময়কর মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছে। সামগ্রিকভাবে সলিল সেন এক অনন্য নাট্যপুরুষ রূপেই সম্মানিত হয়েছেন বাংলার নাট্যলোকে।

৭.১০ ধনঞ্জয় বৈরাগী (তরুণ রায় ১৯২৭-১৯৮৮)

ধনঞ্জয় বৈরাগী বাংলা প্রচলিত নাট্যধারায় ঈষৎ ব্যতিক্রম। আধুনিক বাংলা নাটকে বামপন্থী আদর্শ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে—মার্কসীয় ভাব ও দর্শন নাট্যকারদের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু তরুণ রায় এই মতাদর্শ দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হননি, যদিও সমাজবোধ তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল। মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের রূপ তার নাটকে যথাযথ প্রকাশ পেয়েছে। সমসাময়িক সামাজিক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ভাবনাকে তিনি আদৌ পরিহার করেন নি, সেই সব সমস্যা বিচিত্র ভাবে তাঁর নাটকে এসেছে। তাঁর সামাজিক ভাবনা রূপ ঋদ্ধ হয়েছে ‘ধৃতরাষ্ট্র’, ‘রজনীগন্ধা’ প্রভৃতি নাটকে; অর্থনৈতিক সংকটের রূপায়ণ পাই ‘রূপোলি চাঁদ’-এ; রাজনীতির রূপায়ণ ‘পরাজিত নায়ক’, ‘অথচ সংযুক্তা’ ইত্যাদি। রোমান্টিক ভাবাবেগের প্রকাশ তাঁর নাটকে আছে। ‘‘তাঁহার রচনা রোমান্টিকধর্মী—এই যুগের নাট্যকারদিগের মধ্যে তাহার ইহাই স্বাতন্ত্র্য’’ (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড)। ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাকি ‘ওয়েল মেড’ জাতীয় শিল্পের সার্থক নিদর্শন। দৃশ্যসংস্থাপনায় তিনি অধিকাংশ নাটকে ইবসেনীয় রীতি গ্রহণ করেছেন বলে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন। ‘ধৃতরাষ্ট্র’ (১৯৫৭) ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রথম নাটক। স্বদেশি কব্য বিশিষ্ট বিপ্লবী ধীরাজ ঘোষের বড় ছেলে স্বরূপ ব্যবসায়ে বড় হয় এবং লোভে লালসায় জর্জরিত হয়ে অন্যায় অপরাধ পাপ এমন কি খুন করেও নিজের সর্বনাশকে ডেকে আনে নাটকে তাই বলা হয়েছে। বৃদ্ধ পিতা ধীরাজ ঘোষ মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধ পুত্রস্নেহে সন্তানকে আগলে রাখতে চেয়েছে। ‘রূপোলী চাঁদ’ (১৯৫৮) এক নিম্নবর্গীয় পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক ও জীবনযাপনের সমস্যাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তথাকথিত সম্মান ও মর্যাদাবোধকে অতিক্রম করে সাধারণ জীবনচর্যা ও কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে এটা নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। ‘এক পেয়ালা কফি’ রহস্য নাটক। রূপগুণ বিদ্যা ও বুদ্ধি সমন্বিত এক নারী জীবনের অসহায় করুণ পরিণামের ছবি ফুটেছে ‘রজনীগন্ধা’ (১৯৬০) নাটকে। উচ্ছল উজ্জ্বল আশা চৌধুরীকে স্বামী পরিত্যাগ করেছে, পুত্রও মাতৃসান্নিধ্য চায়নি; সে উন্মাদের মতো ছুটে চলে সর্বনাশের দিকে সিনেমার আকর্ষণে, ববি দত্তর ঐশ্বর্যময় জীবনের টানে আর খ্যাতির মোহে। সর্বনাশের শেষ মুহূর্তে সে ভালোবাসার স্বাদ পেল কিন্তু তখন ঘনিয়ে আসছে অন্তিম পরিণতি। সুখের আশায় ছুটে চলা এক উদ্দাম জীবনের বেদনার্ত অবসান এক গভীর কারুণ্যের সঞ্চার করে।

‘আর হবে না দেরী’ (১৯৬১) রূপকধর্মী নাটক। প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত একটা পোড়ো বাড়িতেই কাহিনির মূল অধিষ্ঠান যেখানে অসহায় অনিকেত রিক্ত সর্বহারা মানুষরা। এদের কাছে মুক্তির বাণী নিয়ে এসেছিলেন যে মানুষটি তিনি আজ রক্তকরবীর রাজার মতো প্রতিক্রিয়াশীল ও পুঁজিপতিদের হাতে যেন বন্দি। তিনি এখনও জেগে উঠতে চান। নাটকে স্বাধীনতাপরবর্তী ভারতবর্ষের চিত্র যেন ফুটে উঠেছে যেখানে ভারতবর্ষের কর্ণধার আজীবন সংগ্রামী নেহরু অর্থবান ব্যবসায়ীদের দ্বারা অবরুদ্ধ, তবুও তিনি জেগে উঠতে চান, মানুষের কাছে যেতে চান। মানুষের জাগরণের কথাও বলা হয়েছে যারা একদিন অর্জন করবে সব অধিকার।

‘পরাজিত নায়ক’ (১৯৭১) নাটকে রাজনীতিবিদদের অন্তঃসার শূন্যতা ও দ্বিচারিতার কথা বলা হয়েছে। এক নেতা ভোটে হেরে গিয়ে তার রাজনৈতিক ভাবনার অকিঞ্চিৎকরত্বের কথা বুঝতে পারে ও তার প্রকৃত মন জেগে ওঠে। কিন্তু পুনর্গণনায় ভোটে তার জেতার খবর এলে সে আবার মোহাচ্ছন্ন ও নীতিহীন হয়ে ওঠে—জিতেও সে হয় পরাজিত নায়ক। নাটকে বর্তমান সময়ের রাজনীতি ও সামাজিকতার নির্মম ছবি ফুটেছে। ‘অথচ সংযুক্তা’ (১৯৭৩) নাটকে নকশালবাড়ির আদর্শে বিশ্বাসী এক যুবক অযথার্থ নীতি ও মিথ্যা হত্যার রূপ উপলব্ধি করে ও গ্লানি জর্জরিত হয়ে ভয়ংকরের মুখোমুখি দাঁড়ান। এটা রাজনীতি তথা জীবনের সত্যানুসন্ধানের নাটক।

তরুণ রায় সুদক্ষ অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক। তার প্রায় সব নাটক পেশাদারি মঞ্চে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মঞ্চে দ্বৈত ভূমিকায় অবতরণ তাঁর বিশেষ উল্লেখ্য কাজ (আগন্তুক)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ডীন ছিলেন। সংগীত-নাটক একাডেমিসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মান তিনি পেয়েছেন।

৭.১১ উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩)

উৎপল দত্ত আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভা। তিনি প্রথম শ্রেণির নট, নাট্যপরিচালক এবং নাট্যকার। নাট্যপ্রবন্ধগ্রন্থ রচনায়ও তিনি বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এর ওপর আছে তাঁর চলচ্চিত্রের অধিকার। এমন সার্বিক প্রতিভা বাংলায় তো নেই, ভারতবর্ষেও তুলনারহিত। নাটক তথা শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপল দত্তর নিজস্ব দর্শন আছে—তা হল মার্কসীয় তত্ত্বে গভীর আস্থা। উৎপল দত্ত নিজেকে partisan বা দলীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী বলে মনে করতেন; তিনি বলতেন—I am a partisan not neutral, and I believe in political struggle. The day I cease to participate in political struggle, I shall be dead as an artist too (Towards a Revolutionary Theatre) রাজনৈতিক থিয়েটারে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত চিরকাল লড়াই করেছেন নাটকের মাধ্যমে—অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; অন্যদিকে তার সংগ্রাম মানবতার প্রকাশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নিয়োজিত ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎপল দত্ত তার সাধনাকে নিয়ে গেছেন সার্থকতার তুঙ্গশীর্ষে। কালজয়ী এক মহৎ প্রতিভারূপেই উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যলোকে চিরভাস্বর চিরপ্রদীপ্ত হয়ে থাকবেন।

বিভিন্ন রূপ ও আকৃতি, ভাব ও রসের শতাধিক নাটক লিখেছেন উৎপল দত্ত যার প্রায় প্রতিটিই শিল্পের হিরণ্যদ্যুতিতে ভাস্বর। নাটকগুলির মধ্যে যেমন তীক্ষ্ণ ধারালো সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য আছে, তেমনি আঙ্গিকের বিচারেও তারা ঋদ্ধ ও জোরালো। প্রথম কটি নাটক অনুবাদ। তাঁর প্রথম মৌখিক নাটক 'ছায়ানট' (১৯৫৮) চিত্রতারকাদের জীবনের চমকপ্রদ কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত। 'অঙ্গার' (১৯৫১) খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের নিয়ে লেখা। মালিকদের উৎকট লোভ ও লালসার জন্য শ্রমিকদের জীবনে কি চরম দুঃখ নেমে আসে নাটকে দেখানো হয়েছে। নাটকের আঙ্গিক চাতুর্যও অসাধারণ। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়ে 'অঙ্গার' প্রবল আলোড়ন ফেলে। 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১) উৎপল দত্তের এক অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী নাটক যা বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জীবন ও আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠেছে। 'কল্লোল' (১৯৬৫) নাটক ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নৌ-বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। নাটকে ইংরেজ শাসক ও তাদের লেজুড় কংগ্রেসের প্রতিকূলতার কথা যেমন আছে তেমনি নাবিকদের অসামান্য বীরত্বের কথাও বলা হয়েছে। মঞ্চে প্রায় সম্পূর্ণ বিরাট জাহাজকে জানা হয়েছে তা নাটকের দৃশ্যপট রচনা করেছে। 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭১) উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত। এই নাটকের বিষয় ইংরেজদের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট বানিয়াবৃত্তি করে বড়লোক হওয়া বাবুদের নীতিহীন কাজকর্ম ব্যভিচার এবং থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষতার নামে বেলেল্লাপনা করা অভিনেত্রীদের কিনে রাখা ও শিল্পীদের দাস মনে করা এবং শেষ পর্যন্ত দেশি বিদেশি মালিকদের বিরুদ্ধে শিল্পীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের তীব্রতা। বর্ণাঢ্য আবেগময় অথচ প্রবল সমাজচেতন ও সামগ্রিক অভিনয় সমৃদ্ধ নাটকটি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত।

উৎপল দত্ত বারবার পালটেছেন নিজেকে, উদ্ভাসিত হয়েছেন নতুন প্রত্যয়ে, রচনা করেছেন অভিনব নাটক, তাদের প্রত্যেকটির প্রয়োজনাই বাংলা রঙ্গলোকের সৃজনভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ আসন পাবে। এর পর তিনি লিখে চলেন 'সূর্যশিকার' (১৯৭১), 'ব্যারিকেড' (১৯৭২), 'লালকেল্লা' (১৯৭৩), 'দুঃস্বপ্নের নগরী' (১৯৭৪), 'লেনিন কোথায়' (১৯৭৬), 'তিতুমীর' (১৯৭৮), 'স্তালিন' (১৯৭৯)। 'দাঁড়াও পথিকবর' (১৯৮০) মধুসূদন দত্তর জীবনের ওপর

আধারিত। মধুসূদনের প্রখর শিল্পপ্রতিভা, তীব্র সমাজচেতনা এবং শেষপর্যন্ত পারীতে নানাসাহেব সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তার নাটকের মোটামুটি বিষয়। একজন সামাজিক মানুষ, সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পী এবং মানবিক প্রত্যয়দীপ্ত স্রষ্টারূপে মধুসূদনের জীবন ও কর্মসাধনা অন্য মাত্রা পেয়েছে নাটকে।

নিরলস ও অক্লান্ত শিল্পসাধক উৎপল দত্ত লিখেই চলেছেন—'একলা চল রে' (১৯৮২—দেশবিভাগে ও গান্ধিহত্যার অনুদঘাটিত ইতিহাস), 'মালোপাড়ার মা' (১৯৮৩—কংগ্রেসীদের অত্যাচার ও তাণ্ডব), 'শৃঙ্খল ছাড়া' (১৯৮৩—কার্ল মার্কস মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত : জার্মানিতে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের বাডেন বিপ্লবের কাহিনি), 'লালদুর্গ' (১৯৯০—যার আলোচ্য পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র কি চূর্ণ?), 'জনতার আফিম' (১৯৯১—যার বক্তব্য মানুষই রাষ্ট্রব্যবস্থার মাপকাঠি) ইত্যাদি। প্রত্যেকটিই বিস্ময়কর শিল্প। এছাড়া আছে উৎপল দত্তর কালজয়ী যাত্রা—'রাইফেল' (১৯৬৮), 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' (১৯৬৯), 'দিল্লি চলো' (১৯৭০), 'নীলরক্ত' (১৯৭০), 'সন্ন্যাসীর তরবারি' (১৯৭২), 'ঝড়' (১৯৭৩), 'বৈশাখী মেঘ' (১৯৭৪), 'তুরুপের দাস' (১৯৭৬), 'কুঠার' (১৯৮০) ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও উৎপল দত্ত শুধু অনন্য নন, অনতিক্রম্যও বটেন।

উৎপল দত্ত সমাজসচেতন শিল্পী। দেশের কাছে জাতির কাছে মানুষের কাছে তিনি দায়বদ্ধ। তিনি প্রোপাগান্ডিস্ট, তিনি রাজনীতিতে বিশ্বাসী—শাসনশোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর সাধনব্রত। সেজন্যই তিনি কলম ধরেছেন নাটক লিখেছেন, রঙ্গমঞ্চকে রণক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। তাঁর নাটকে যে বৈপ্লবিক চেতনা আছে, সংগ্রামী আদর্শের প্রকাশ আছে, মানবিকতার গভীর প্রত্যয় আছে তা তার সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ ঋদ্ধ করে তুলেছে। উৎপল দত্ত নাট্যইতিহাসের এক মহান সৃজনশিল্পী রূপেই বন্দিত হয়েছে।

● **এ্যাবসার্ড নাটক**

জীবনের এক সীমাহীন অবক্ষয়, এক দুঃসহ অবক্ষয়, অস্তিত্বের জ্বালা যন্ত্রণা দাহ, মানবিক নৈরাজ্যের অধিষ্ঠান, আর্তি নৈরাশ্যের বর্ণহীন স্বপ্ন—এ্যাবসার্ড বা কিমিতিবাদী নাটকের কায়াকল্প নির্মাণ করেছে। এ্যাবসার্ড নাটকের দর্শন শূন্যতার দর্শন—উদ্দেশ্যহীন পারম্পর্যবর্জিত সামঞ্জস্যবিহীন জীবনবোধ অথবা বোধহীনতাই এ্যাবসার্ডিটির বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার Eugene Ionesco বলেছেন—Absurd is that which is devoid of purpose. Cut of from his religious, metaphysical and transcendal roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd, useless যুদ্ধোত্তর ইউরোপের যন্ত্রণাকাতরতা, নিরালম্ব শূন্যতার ভয়াবহতা, মানবচৈতন্যের উদভ্রান্ত বিমূঢ় নিশ্চৈতন্য রূপ এ্যাবসার্ড নাটকের সৃষ্টির মূলে কার্যকরী হয়েছে। অনেকটা এই আদর্শেই গড়ে উঠেছে বাংলার এ্যাবসার্ড নাটক যার নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বাদল সরকার, রতন কুমার ঘোষ, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকার যদিও তাঁদের এ্যাবসার্ডিটির মধ্যে আছে রূপকের বিস্ময়, প্রতীকের দ্যুতি, কাব্যিকতার সৌরভ।

৭.১২ বাদল সরকার (১৯২৫)

আধুনিক নাট্য আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ বাদল সরকার (১৯২৫) বিচিত্র কর্মসাধনায় ব্রতী। যন্ত্রবিজ্ঞানী (ইঞ্জিনিয়র), নগর-স্থপতি, ভাষাবিদ, চিত্রশিল্পী ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মে তাঁর প্রতিভা বিকশিত। নাট্যচর্চায়ও তিনি কৃতী। বাদল সরকার সুদক্ষ নট নাট্যকার নাট্যপরিচালক। বাংলার নাট্যজগতে তিনি প্রধানত দুটি কারণে অগ্রণী পথিকের সম্মান পাবেন। তিনি থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং এ্যাবসার্ড নাটকেরও প্রথম প্রবক্তা। এছাড়া হাসির

নাটক ও সমাজ-সমস্যামূলক নাটকেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্রে সারা বিশ্ব তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। সংগীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কারে এবং পদ্মশ্রী সম্মানে তিনি ভূষিত।

বাদল সরকারের এ্যাবসার্ডধর্মী নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট হল 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'বাকি ইতিহাস' যে দুটি নাটক বাংলার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে অভিনব সংযোজন। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫) নাটকে জীবনের ক্লান্তি উদ্দেশ্যহীনতা ও অকারণ অর্থহীন পথচলার কথা বলা হয়েছে। অমল বিমল কমল এবং ইন্দ্রজিৎ আশা-আনন্দহীন জীবনের একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাদের জন্ম শিক্ষা চাকরিলাভ বিবাহ বার্ধক্য মৃত্যু—পুরুষাণুক্রমে জন্মজন্মান্তরে একইভাবে আশাহীন উদ্দেশ্যহীন পথ চলা ও বেঁচে থাকা যে অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই, যে বেঁচে থাকা কেবল ক্লান্তি আর বিষণ্ন যে জীবনের থেকে মৃত্যু অনেক মোহময় আকর্ষণীয়।

'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৭) নাটকেও জীবনের অর্থহীনতা ও মৃত্যুর কামনার কথা বলা হয়েছে। তাদের পরিচিত এক ব্যক্তির আত্মহত্যার সংবাদে বিস্মিত শরদিন্দু ও তার স্ত্রী বাসন্তী এই ঘটনা নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করে। তাদের কথিত গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিকার ও জটিলতার কথা আছে এবং আত্মহত্যার অনিবার্যতার কথা বলা হয়েছে। জীবনের প্রকৃত কোনো অর্থ নেই—দুঃশাসনের রক্তপান, মিশরে চাবুকের সামনে ক্রীতদাসদের পিরামিড নির্মাণ, হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পা ও গ্যাস চেম্বার, জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যা, হিরোশিমা, ভিয়েতনাম : 'এই তো ইতিহাস। জীবনের ইতিহাস। বাকি ইতিহাস'। এই অর্থহীন জীবন রক্তাক্ত ইতিহাসের ভার বহন করার চেয়ে আত্মহত্যা অনেক কাম্য। 'পাগলা ঘোড়া' (১৯৬৭) একটি মৃত মেয়ের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের জ্বালা যন্ত্রণা এবং ব্যর্থ অর্থহীন মহাশূন্যে বিলীয়মান অস্তিত্বের অসহ্য মর্মদাহের কথা বলা হয়েছে। বাস্তব-অবাস্তব, বর্তমান-অতীত, কায়া-কায়াহীনতার মিশ্রণে উদ্ভট জীবনরূপ নির্মিত হয়েছে। মমতাকে দাহ করতে আনা এক মৃত নারী ও দাহকারী চার বন্ধুকে নিয়ে এক উদ্ভট প্রায় অলৌকিক এ্যাবসার্ডধর্মী নাটক নির্মিত হয়েছে।

বাদল সরকারের হাস্যরসাত্মক নাটকের মধ্যে খ্যাত হল 'বড়ো পিসীমা' (১৯৬১), 'রাম শ্যাম যদু' (১৯৬২), 'কবি কাহিনী' (রচনা ১৯৬৪, প্রকাশ ১৩৭৭) ইত্যাদি। বাদল সরকার মনে করেন 'আমরা চরম দুঃখেও হাসতে পারি, চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি ও হাসি দিয়ে ফোটাতে পারি, জটিলতম সমস্যাও হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে হেসে তার মোকাবিলা করতে পারি' (নাট্যকারের বক্তব্য—কবিকাহিনী)। হাস্যরসের উচ্ছল উজ্জ্বল প্রকাশ বাদল সরকারের হাসির নাটককে আস্বাদ্য করেছে। বিদেশি চলচ্চিত্রের ছায়া অবলম্বনে রচিত 'বল্লভপুরের রূপকথা' (সঞ্চায়ন ১৯৭০, প্রকাশ ১৩৮১) নাটকীয় দ্বন্দ্বসংঘাতে, ভৌতিক প্রতিবেশ সৃজনে, গভীর রহস্যময়তায়, হৃদয়ে উন্মীলনে এবং কৌতুকরসরসিকতার প্রসন্নতায় অসামান্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

বাদল সরকারের 'ভোমা', 'মিছিল' প্রভৃতি নাটক সমাজবোধ প্রখর। থার্ড থিয়েটার নাট্যরীতির প্রবক্তা জীবনশিল্পী বাদল সরকারের নতুন পরিচয় এই সব নাটক।

বাদল সরকারে নাটক সারা ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন ভাষায় তার প্রায় সব নাটক অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে। তার থার্ড থিয়েটার রীতিও গৃহীত হয়েছে সর্বত্র। বিশ্বের নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি বাংলার নাট্যচর্চাকে যুক্ত করেছেন মূলত এ্যাবসার্ড নাট্যসৃজনের মধ্য দিয়ে এ সত্যও বিস্মৃত হবার নয়।

৭.১৩ মনোজ মিত্র (১৯৩৮)

আধুনিক বঙ্গরঙ্গলোকের উজ্জ্বল পুরুষ মনোজ মিত্র (১৯৩৮) নট নাট্যপরিচালক নাট্যকার রূপে আপন সৃজনক্ষমতার বিস্ময়কর পরিচয় রেখেছেন। পেশায় তিনি অধ্যাপক—দর্শনশাস্ত্র ছিল তার অধীত বিষয়। পরবর্তীকালে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। চলচ্চিত্রেও তিনি অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

মনোজ মিত্র-র প্রতিভার চূড়ান্ত সিদ্ধি নাটক রচনায়। ছোটোবড় মিলিয়ে যাটটিরও বেশি নাটক তিনি লিখেছেন যা বিচিত্র ভাব ও আঙ্গিকে সমুজ্জ্বল। তাঁর নাটক কখনো হাস্যরসে উচ্ছল (অবসন্ন প্রজাপতি); কখনো তীব্র ট্যাজিক বেদনায় মর্মস্পর্শী ('নীলকণ্ঠের বিষ'); রূপকথার বর্ণাঢ্য পরিবেশ তাঁর নাটকে নির্মিত হয় ('মেঘ ও রাক্ষস'); অর্থনৈতিক সামাজিক টানাপোড়েন দ্বন্দ্বসংক্ষোভ কখনো তাঁর নাটকের প্রতিবেশ রচনা করে ('পাখি', 'মহাবিদ্যা', 'নৈশভোজ'); কখনো পরিবেশ পরিস্থিতির প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও মানব-হৃদয়ের বিস্ময় ও গভীরতা ধরা পড়ে গভীর অনুভবে ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা'); কোনো কোনো সময়ে মনোজের হাতে নাটক হয়ে ওঠে অস্ত্র যা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভয়ংকরতায় ঝলসে ওঠে ('চাক ভাঙা মধু'); কখনো চোখের জল আর হাসির মিশ্রণে শিল্পের রামধনু সৃজিত হয় ('পরবাস')। মনোজ মিত্রর নাটকের বিষয় হল মানুষ যে অনুরাগে অভিমানে হৃদয়ের উন্মীলনে উজ্জ্বল এবং যে অবহেলা অপমান সত্ত্বেও 'তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে'; এই মানুষকেই তিনি খুঁজেছেন, 'মানুষের এই সংগ্রামকেই ধরতে' চেয়েছেন নাটকে। মনোজ মিত্রর প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল' প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। এক বয়স্ক রোগগ্রস্ত বিধ্বস্ত মানুষের অসহায় আকুলতা ও যন্ত্রণার ছবি নাটকে ফুটেছে যার স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার অন্তরালে আছে বার্ধক্যের বিমূঢ় উদভ্রান্তিও বাঁচবার আকুলতা। এটি একাঙ্ক নাটক। প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক **'নীলকণ্ঠের বিষ'** (১৯৬১) এক ক্যাথলিক পাদরি লংম্যানকে নিয়ে গড়ে উঠেছে যিনি এক নারীকে ভালবাসার অপরাধে এক অত্যন্ত নির্জন গির্জায় নির্বাসিত হন যেখানে অনিকেত ভবঘুরে রোগগ্রস্ত লোকদের নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কুষ্ঠ হওয়ায় তিনি আবার পরিত্যক্ত হন—তিনি কুষ্ঠ রোগীকেই বাঁচাতে চেয়েছিলেন। নিঃস্ব রিক্ত মানুষটি যিশুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

মনোজ মিত্রর **'চাক ভাঙা মধু'** (১৯৬৯, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৭২) শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের ভাবনায় তীক্ষ্ণ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নাট্যকারের ক্রোধ তীব্র ও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। সুদখোর মহাজন অঘোর ঘোষ সর্পদংশনে মৃতপ্রায় হলে তারই খাতক ও তার অত্যাচারে নিষ্পেষিত মাতলা ওঝা ও তার মেয়ে বাদামি তাকে বাঁচায়; কিন্তু প্রাণ পেয়েই অঘোর তার লালসাপিচ্ছিল কলুষ কামার্ত হাত বাদামির দিকে বাড়ালেন সড়কির খোঁচায় অঘোরকে হত্যা করে। দরিদ্র অসহায় মানুষদের দুরবস্থার চিত্রণে, মহাজনের ভয়াল রূপ অঙ্কনে, নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গর্ভস্থ সন্তানের জন্য ব্যাকুলতায়, মুমূর্ষু মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য আন্তরিকতায় ও শোষণ মহাজনের বর্বরতায় তাকে প্রত্যাঘাতের হিংস্রতায় বাদামি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা পেয়েছে। মহাজনের কদর্য লোলুপতা ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় বাদামির অসহ্য অস্থিরতা ও কান্নায় ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে বিষাক্ত গোক্ষুরকে আছড়ে মারা ও সড়কির নির্মম আঘাতে মহাজনকে খুন করা—শেষাংশে নাটকটি ঘটনার দ্রুততা আকস্মিকতা ও ভয়ংকরতায় এক শ্বাসরোধকারী মুহূর্ত নির্মাণ করে এবং দর্শকের চেতনায়ও যেন আগুন সঞ্চারিত হয়।

'পরবাসে' (১৯৭০) এক অসহায় বৃদ্ধ মানুষের নিঃসঙ্গ একাকীত্বের বেদনা কৌতুক-বেদনা হাসি-কান্নার ইন্দ্রধনু নির্মাণ করে। একক মানবজীবনের অন্তহীন বেদনা গভীর হৃদয় ব্যাকুলতা ও সুখকামনার করুণ রাগিনী স্বপ্নের বিলাসে নিবিড় হয়ে ওঠে এই অসামান্য শিল্পকর্মটি। **'কেনারাম বেচারাম'** ('বাবাবদল' নামে মঞ্চস্থ হয় ১৯৭১-এর ১ জানুয়ারি) বৃদ্ধদের প্রতি পরবর্তী প্রজন্মের অনাদর অবজ্ঞা অবহেলা ঝকঝকে সংলাপ ও মজাদার ঘটনা সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রাম্য থেটার তথা যাত্রার রীতি নীতি নিয়ম কানুনের যথাযথ ছবি ফুটেছে **'কিনু কাহারের থেটার'** (১৯৮৮) নাটকে যার মধ্যে বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সকলের পাপ বহনকারী অবহেলিত উপহসিত অথচ মানুষের মহিমায় উজ্জ্বল ঘণ্টাকর্ণ চরিত্রটি। সংসারের জটিলতা সমাজের ভাঙন পরিস্থিতির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জীবনের জয় ঘোষিত হয়েছে **'অলকানন্দের পুত্রকন্যা'** (১৯৯০) নাটকে। তাঁর

অন্যান্য নাটক হল ‘নরক গুলজার’, ‘শোভাযাত্রা’ (১৯৯১), ‘গল্প হেকিমসাহেব’, দর্পণে শরৎশশী’, ‘মুন্নি ও সাত চৌকিদার’ ইত্যাদি। শেষ নাটকটিও কৌতুকে ব্যঙ্গে মজাদার ঘটনা সংস্থাপনে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

সমালোচক বলেছেন যে ‘মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা বা alienation মনোজের কাছে প্রিয় ও বেদনাময় একটি প্রসঙ্গ এবং এই বিচ্ছিন্নতার ছবিটি তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেও তার বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি, আমাদের অবিশ্বাসী শূন্যের মধ্যে নিক্ষেপ না করে একটি কোনো আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চান। কখনও কখনও দু-একটি শারীরিক ও মানসিকভাবে পার্শ্বিক ও উৎকেন্দ্রিক চরিত্র সৃষ্টি করে এই বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি আরেকটু গভীরভাবে যেন তিনি বুঝতে চান (ড. পবিত্র সরকার—মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র ১)। নিজের বক্তব্য প্রকাশের জন্য মনোজ মিত্র আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সংলাপেও এনেছেন বৈচিত্র্য। সত্তরের হানাহানির সময়ে পুনর্লিখিত ‘অশ্বত্থামা’র হাহাকার মনে পড়ে—

অশ্বত্থামা।। (গভীর ক্লান্তিতে) এই চৈত্র-নিশীথ আমার মর্মে মর্মে কী দাহ ছড়ায়! কী ঘোর চতুর্দশী নিশি...প্রবল বায়ু...মহারাজ, আমাকে উদ্ধার করা...আমি বড় একা! (থেমে) একটা পাহাড়, কয়েকটা নদী, শুষ্ক প্রান্তর...কী দুর্গম অন্তহীন পথ অতিক্রম করে এসেছি....দুচোখে তপ্ত বালুকা...

...কে, কে বলে রে হত্যা...কে বলে রে গুপ্তঘাতক আমি....নীতিহীন অবিবেচক? ওরে মূর্খ, মানুষেরই দেখিস নীতি নেই...দেখিস না এই ধরণীর গাছে একটি পাতা নেই....তড়াগে নেই জলকণা! কাতারে কাতারে মৃতদেহ, শ্মশান শকুনি! এমন রিক্ত নিঃস্ব বিধবা ধরিত্রী। ওরে কোথা হতে আসে নীতি...কোথায় বাস করে পুণ্য! (থেমে) মহারাজ, বলো মহারাজ, এই শেষ রক্ত! বলো মহারাজ, আর হিংসা নয়, আর ধ্বংস নয়, সৃজন!...বলো মহারাজ, যতো প্রাণ নাশ করেছি আমরা তত প্রাণ সৃজন করবো আমরা! বলো মহারাজ এই ধরণীর তৃণমূলে জল দেব! তাকে লালন করব! অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে...

এই গভীর মর্মভেদী হাহাকার যেমন পাওয়া যায় তেমনি কৌতুক ও হাস্যরসের মজাদার সংলাপের দ্যুতি তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। ভাব গভীরতায় ও রূপনির্মিতিতে মনোজ মিত্র এভাবেই হয়ে উঠেছেন আধুনিক নাটকের অনন্য সৃজন ব্যক্তিত্ব।

৭.১৪ রতন কুমার ঘোষ (১৯২৯)

এসময়ের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। তার নাটকে ভাবনার বৈচিত্র্য ও গভীরতা আছে, আঙ্গিকেও তিনি নিরীক্ষাধর্মী। তার নাটকে দার্শনিকতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়—মানব জীবনের রহস্য অস্তিত্বের সার্থকতা তিনি অন্বেষণ করেছেন। ভারতীয় ঔপনিষদিক ধারায় তিনি স্নাত এবং তাই মহত্তম ভাবনায় তিনি দীপ্যমান। তাঁর দর্শন মানবতাবাদী দর্শন; তিনি মানুষে মানুষে ভালোবাসার যোগসূত্র নির্মাণ করতে চান। তিনি আশাবাদী; দুঃখবেদনাকেই তিনি জীবনের সারসত্য মনে করেন না—তিনি বিশ্বাস করেন দুঃখ আঁধার অতিক্রম করে মানুষ সূর্যলোকিত প্রভাতে জেগে উঠবেই। তাই তাঁর নাটকে ব্যর্থতা নেই, গ্লানিময় অবসান নেই, মৃত্যুর জয় ঘোষণা নেই। আছে মানবতার উজ্জ্বল উদ্ভাস ও মনুষ্যত্বের জ্যোতির্ময় উদ্বোধন। রতন কুমার ঘোষের অধিকাংশ নাটকই রূপকাশ্রিত ও প্রতীকধর্মী যার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের সত্য বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁর নাটকে আঙ্গিকের বৈচিত্র্য আছে—কোরাস, মাইক, সম্মেলক ভাষণ, বিচ্ছিন্ন দৃশ্যময় চিত্রকল্প, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি নতুনত্ব আনতে চেয়েছেন নাটকে। রতন কুমার ঘোষ প্রায় ২৮টি পূর্ণাঙ্গ ও ৩৮টি একাঙ্ক লিখেছেন যাতে তাঁর সৃজন প্রতিভা উৎকীর্ণ হয়েছে।

রতনকুমার ঘোষের trilogy বা ত্রয়ী নাটক 'অমৃতস্য পুত্রা' (১৯৬২), 'সম্রাট' (১৯৬৩) এবং 'ফেরা' (৬৪) তাঁকে বিপুল খ্যাতি এনে দেয়। মানুষ অমৃতের সন্তান এবং সেই অমৃতময় রূপ সে অন্বেষণ করছে। 'অমৃতস্য পুত্রা'র ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন—'যুগ-যুগব্যাপী মানুষের অমৃতলাভের সেই সাধনা, সেই সংগ্রাম—এক প্রবহমান ইতিহাস'। এই নাটকে শিল্পী সেই সাধনায় রত, সে অমৃতের সন্তানের চিত্র আঁকতে চাইছে। সেই রূপ যখন যে গভীর রাতে মনের মধ্যে পেল, তখন তার মৃত্যু হল। শিষ্যের মধ্যে সে রেখে গেল সাধনার উত্তরাধিকার। দ্বিতীয় নাটক 'সম্রাট'-এ ৫০০০ বছর আগের মানুষ মাটি কেটে বাঁধ বেঁধে শস্য ফলিয়েও সেই অমৃতকে পেল না। পাথর সরিয়ে আলো আনতে গেল, কিন্তু নিষ্ঠুর মানুষের আঘাতে যে ক্ষতবিক্ষত হল, পেল না পরমকে। তৃতীয় নাটক 'ফেরা'র সময় ২০০০ বছর পর। বিজ্ঞানী বলল, যে সূর্য নির্মাণ করবে যেটা তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বিস্ফোরণ হল, ঘটল হিরোসিমা—তবু পেল না মানুষ অমৃতের পরিচয়। বিজ্ঞানী নতশির, আবার সে চেষ্টা করবে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে দর্শন ইতিহাস আর মানবপ্রেম। রতনকুমার ঘোষের তিনটি নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছে—প্রথমটি করে শৌভনিক শতাধিক বার; দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাটক করে যথাক্রমে রূপদক্ষ ও রূপচক্র নাট্যসংস্থা অভিনয় করে। রতনকুমার ঘোষের 'জনকজননী' নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা পূর্ণাঙ্গ রেডিও নাটক যা বিশেষ আলোড়ন ফেলেছিল। 'সীতাহরণ' প্রাচীন ভাবনার সঙ্গে আধুনিককে মিলিয়ে দেয়, শোষণ শাসন অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধ মানুষের প্রতিবাদ তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে নাটকে। তাঁর অন্যান্য নাটক হল—'সকালের জন্য', 'ভোরের মিছিল', 'সিঁড়ি', 'ভূমিকম্পের আগে', 'ভূমিকম্পের পরে' ইত্যাদি। তিনি অনেক উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন সেগুলিও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়, যেমন 'গণদেবতা', 'জটায়ু', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'জাগরী', 'মঞ্জরী অপেরা' ইত্যাদি।

রতনকুমার ঘোষের একাঙ্ক নাটকগুলিও অত্যন্ত শিল্প সফল রচনা। এরা যে কত অগণিতবার অভিনীত হয়েছে তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এসব নাটকেরও অধিকাংশ স্থলে নাট্যকার রূপক বা প্রতীকের আঙ্গিকে কঠিন সংগ্রামের বাণী উচ্চারণ করেছেন। 'সমুদ্র সন্ধানে', 'পাপপুণ্য', 'শেষ বিচার', 'মহাকাব্য', 'তৃতীয় কণ্ঠ', 'আলোকিত যৌবন' ইত্যাদি অবিস্মরণীয় তাঁর একাঙ্ক নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

রতনকুমার ঘোষ পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন অনেক। রঙ্গসভা পুরস্কার, দিশারি পুরস্কার, তারাশঙ্কর পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সুধাংশুবালা পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার ইত্যাদি অজস্র সম্মানে তিনি ভূষিত। অগণিত নাট্যপ্রেমী মানুষের ভালোবাসা তাঁর সৃজনকর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

৭.১৫ মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪)

মোহিত চট্টোপাধ্যায় এ্যাবসার্ড নাট্যধারার বিশিষ্ট লেখকরূপে বাংলা নাট্যক্ষেত্রে এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। এ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণসমূহ তাঁর নাটকে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। জীবনের অর্থহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা, ঘটনার অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকত্ব, ভাবনায় যুক্তিশৃঙ্খলার অভাব অথচ গভীর সত্যের দ্যোতনা, নেতিবাদের নিঃসীম অন্ধকারে আত্মার নিমজ্জন ইত্যাদি যে এ্যাবসার্ড নাটকের প্রেক্ষণীয় লক্ষণ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকসমূহে সেসবের প্রকাশ দেখা গেছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় কবিরূপেই খ্যাতিমান ছিলেন এবং তার নাটকে অধিবাস্তব তত্ত্বের সঙ্গে কবিত্বের সংযোগ ঘটায় তারা ভিন্ন মাত্রা পায়। কল্পনার প্রসার, কবিত্বের দ্যুতি, শব্দের যাদু, সংকেত তির্যকভাষণ তাঁর নাটকের বিরল ধর্ম। কবিতাই তাঁকে প্রণোদিত করেছে নাটক লিখতে—গভীরতা ও গতি, আবেগময় অন্তরমন্থন ও দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ বহিঃসংগ্রামে তাঁর নাটক স্বাতন্ত্র্যময়। অবশ্য মোহিত ক্রমে এ্যাবসার্ডিটি পরিহার করে রূঢ় কঠিন বাস্তব জগতে নেমে এসেছেন, মাটির ছোঁয়া লেগেছে নাটকের গায়—জীবনের কঠিন সংগ্রাম,

শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শোষিত মানুষের জয়গান সেখানে শোনা গেছে। তিনি দক্ষ চিত্রনাট্যকারও। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার, গিরিশ পুরস্কার, নান্দীকার পুরস্কার, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার, জ্যোৎস্নামাথা দাস স্মারক সম্মান: ইত্যাদি বিবিধ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। 'কণ্ঠনালিতে সূর্য (১৯৬৪) মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক যাতে এ্যাবসার্ড তত্ত্ব যথাযথ রূপ পেয়েছে। নিষ্ঠুর নির্মম হৃদয়হীন পৃথিবীতে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল প্রাণের অসহায়তা ও যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে নাটকে। একটা লোকের কণ্ঠনালিতে সূর্য আটকে গেছে যে কাশলে সূর্যটা ভেঙে সাবান ফেনার বেলুনের মতো গোল গোল অসংখ্য পিং-পং বল চারদিকে গড়িয়ে পড়ে। সূর্যের মতো বড় উজ্জ্বল ভাবনা তার মনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে যাকে সে প্রকাশ করতে পারছে না। বরং সে লোভলালসা স্বার্থপরতায় ভর্তি পৃথিবীতে সে অসহায় হয়ে পড়ে; সে যেন ভীতত্রস্ত তাড়া খাওয়া কুকুর—অভাবে লোভে অপমানে তাচ্ছিল্যে অসম্মানে রাস্তার কুকুরের মতো চারপাশে হাঁটছে, এবং শেষ পর্যন্ত যেন কালো পোষাক পরা ভয়ংকর মানুষেরা সাঁড়াশি হাতে তাকে পিষে ফেলে : একটা আপাষ উদ্ভট অথচ গভীর সংবেদ্য চেতনার এভাবেই বিনাশ ঘটে।

'মৃত্যুসংবাদ (১৯৬৯) নাটকের বিষয়ও এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সংবেদনশীল মানুষের বেঁচে থাকার দুঃসহ যন্ত্রণা। একটি লোক মনের দিক থেকে আহত ক্ষতবিক্ষত, সে পৃথিবীতে হারিয়ে গেছে, লস্টনেসে সে নিঃশেষিত। পৃথিবীতে তাকে আনার জন্য তার বাবাকে সে হত্যা করতে চায় যদিও বাবাই তাকে স্নেহ ভালবাসায় আবেগে রাখে। আর তার ক্রোধ ঈশ্বরের প্রতি সব সৃষ্টির জন্য সে দায়ী। যদিও সে ভালোবাসা কামনা করে নারীর জন্য সে ব্যাকুল হয়—একটা সুন্দর প্রজাপতি ভালবাসার রঙিন রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় জ্যোৎস্নায়, ফুলের বাগানে, ভোরের রোদে, আকাশের নীলে আর প্রিয় নারীর মুখে চোখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নির্মম জগতেই ফিরে যায়। লোকটির উদ্ভট অস্বাভাবিক আচরণ, অস্তিত্বের শূন্যতা, বেঁচে থাকার অর্থহীন ভাবনা, মৃত্যু চেতনার প্রবণতা এ্যাবসার্ডিটি নির্মাণ করেছে। 'ক্যাপ্টেন হুররা' (১৯৭২) নাটকের বিষয় এক নতুন দেশের সন্ধান সেখানেই যেন জীবনের পূর্ণতা। 'নিষাদ' (রচনা ১৯৬৮) নাটকে এ্যাবসির্ডিটি বা প্রতীকধর্মিতা জীবনের কঠিন প্রত্যয়ের সঙ্গে মিশে মানবতার মহৎ মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। লোভলালসা-আকাঙ্খার মায়ায় মানুষ মুগ্ধ হয়ে মানুষ আত্মসুখ ও উন্নতির দিকে ছুটে যায় আত্মাকে কলুষিত করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের জয় হয়, পরাজিত হয় পাপের আধার ভয়ংকর নিষাদ। রাজা চিরকাল মানুষকে শোষণ করেছে নির্মমভাবে কিন্তু সেই অত্যাচারের অবসান ঘটবে—রাজার রক্তের জন্য শুরু হয় মানুষের জাগরণ ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম : 'রাজরক্ত' নাটকের এটাই বিষয়বস্তু। মানুষ লোভ ও কামনার বশীভূত হলেও শেষ পর্যন্ত তার চেতনা ফেরে ও সৎ জীবনে তার প্রত্যাগমন ঘটে : 'তোতারাম' (১৯৮৬) নাটকে এই সত্য প্রতিপাদিত।

জীবনের সুন্দর মধুর রাগিনীর সুর বেজেছে 'তখন বিকেল' নাটকে। যৌবনমদিরসোচ্ছল পুরোনো দিনগুলি ফেলে এলেও স্যানিটোরিয়ামের এক কটুভাষী বয়স্ক ডাক্তার ও অপগত যৌবন এক স্বাস্থ্যপ্রার্থিনী নারী বিকেলের মধুর প্রসন্ন আলোয় জীবনের আকর্ষণ ফিরে পায় ও মিলন প্রত্যাশী হয়। কারখানার পটভূমিকায় লেখা 'আকরিক' একটি পরিবারের আদর্শের সংঘাত ও প্রেমভালবাসার বিচিত্র রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে। দৃষ্টিহীন ও বাকশক্তিরহিত হেলেন কেলারের জীবনী অবলম্বনে লেখা 'জন্মদিন' জীবনীমূলক নাটকের সুন্দর নিদর্শন। বিশেষত শিশু হেলেনের জেদ ও আক্রোশ এবং তাকে ঠিকভাবে গড়ে তোলার শিক্ষিকার প্রয়াস অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দেশি-বিদেশি নাটকের ভাব নিয়ে মোহিত অনেক নাটক লিখেছেন যাদের মধ্যে বিশিষ্ট হল 'আবুহোসেন', 'আলিবাবা', 'মুচ্ছকটিক', 'গ্যালিলিওর জীবন', 'সোক্রাতেস' ইত্যাদি। তাঁর সব নাটকই মঞ্চসাফল্য লাভ করেছে।

মোহিত প্রথম পর্যায়ে প্রবল এ্যাবসার্ডধর্মী, দ্বিতীয় পর্যায়ে তীব্র সমাজসচেতন এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনেকটাই গভীর প্রজ্ঞাময় যেখানে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না প্রত্যাশা-প্রাপ্তিতে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সর্বত্রই কবিত্বের দ্যুতি ও সংকেত তির্যক ভাষণ তাঁর নাটককে দীপ্ত উজ্জ্বল করেছে এবং মানবিক চেতনা তার নাটককে করেছে মহিমমণ্ডিত।

৭.১৬ অনুশীলনী

১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্তক নাটক কোনটি? নাটকটির আলোচনা করুন ও নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২। 'ভদ্রার্জুন' বাংলার প্রথম সার্থক নাটক'—আলোচনা করুন।

৩। প্রাক-মধুসূদন যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে এবং কেন?

৪। মধুসূদন আধুনিক নাটকের জনক—এই অভিমতের বিচার করুন।

৫। দীনবন্ধু মিত্র-র নাট্যসাধনার পরিচয় দাও। নীলদর্পণ-এর প্রতিবাদী ভাবনা শুধু সেকালকেই নয়, একালকেও সমভাবে আন্দোলিত করে—এই অভিমত কতটা যথার্থ।

৬। প্রহসন রচিয়তারূপে শ্রেষ্ঠ কে, মধুসূদন না দীনবন্ধু? আলোচনা করুন।

৭। বাংলা পৌরাণিক নাটকের প্রথম রচিয়তা কে? তাঁর নাট্য সাধনার পরিচয় দিন।

৮। গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বাংলার শ্রেষ্ঠনাট্যপুরুষ বলা সঙ্গত কিনা আলোচনা করে দেখান।

৯। গিরিশচন্দ্র সামাজিক ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক সব ধরনের নাটক রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন—এই অভিমতের যাথার্থ্য নির্ণয় করুন।

১০। বিভিন্ন ধরনের নাটক লিখলেও প্রহসন রচনাতেই অমৃতলাল বসু অধিকতর পারঙ্গম—আলোচনা করুন।

১১। 'ঐতিহাসিক নাটকেই তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম সিদ্ধি'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক সম্বন্ধে এই অভিমত কতটা ঠিক আলোচনা করে দেখান।

১২। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর নাট্যসাধনার পরিচয় দিন।

১৩। বিধায়ক ভট্টাচার্যর নাটকে আঙ্গিকেরও বেশ কিছু নতুনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করুন।

১৪। মন্মথ রায় পৌরাণিক কাহিনিকে আধুনিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করে প্রকাশ করাতে কতটা সার্থক হয়েছেন আলোচনা করে দেখান।

১৫। গণনাট্য আন্দোলনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে বাংলা নাটকের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

১৬। বিজন ভট্টাচার্যকে গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ বলা হয় কেন?

১৭। 'দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, মার্কসবাদ তাঁর মানস পরিমণ্ডল গঠন করেছে'—এই অভিমতের বিচার করুন।

১৮। উৎপল দত্ত বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—আলোচনা করুন।

১৯। এ্যাবসার্ড তত্ত্ব ও দর্শনের পরিচয় দিয়ে বাংলা নাটকে তার প্রভাব নির্ণয় করুন। বাদল সরকার ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে এ্যাবসার্ড রীতির নাট্যকার কলা কতদূর সঙ্গত।

২০। মনোজ মিত্রের নাট্যপ্রতিভার বিচার করুন। 'চাক ভাঙা মধু' তাঁর এক বিরল ও অসামান্য নাটক—আলোচনা করুন।

৭.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১৯৯৯

২। অজিতকুমার ঘোষ—নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ

৩। অজিত মণ্ডল—যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১৯৮৫

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য়), ১৯৬১

৫। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নাট্যচিন্তা : শিল্পজিজ্ঞাসা, ১৯৭৮

৬। দীপক পোদ্দার—বাংলা থিয়েটারে সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটক, ১৯৯৮

৭। দেবকুমার রায়চৌধুরী—দ্বিজেন্দ্রলাল

৮। পবিত্র সরকার—নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ (১ম ও ২য়), ১৯৯৯

৯। পুলিন দাস—বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, ১৩৯০

১০। বাসন্তী চাকী—বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাট্যকার বিধায়ক, ২০০১

একক-৮ ❑ বাংলা সাময়িক পত্র

গঠন

৮.০ প্রস্তাবনা

৮.১ প্রবাসী

৮.২ ভারতবর্ষ

৮.৩ সবুজপত্র

৮.৪ কল্লোল

৮.৫ শনিবারের চিঠি

৮.৬ উত্তরা

৮.৭ কালি-কলম

৮.৮ বিচিত্রা

৮.৯ প্রগতি

৮.১০ পরিচয়

৮.১১ কবিতা

৮.১২ চতুষ্কোণ

৮.১৩ পূর্ব্বাশা

৮.০ প্রস্তাবনা

সাময়িক পত্র চিরকালই একটি নির্দিষ্ট ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত শ্রেণির পরিচায়ক ধারণ করে। একটি জাতি, দেশ, রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর মানুষেরা সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্রীয় ভাবনা, নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে যা ভাবেন তা একটি ঘনীভূত প্রতিবিম্ব ধারণ করে সাময়িকপত্র।

সাময়িক পত্র একটি সংখ্যায় শেষ হয় না। তবে চরিত্রের মধ্যেই আছে সময়ের সঙ্গে প্রবাহিত হবার প্রবণতা। ফলে দেশ-কালের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তনের চিহ্ন সাময়িক পত্রের অনুসরণে চমৎকার বোঝা যায়।

সাময়িক পত্র যেহেতু সপ্তাহে, পনেরো দিনে, মাসে, দু মাসে, তিন মাসে বা ছ মাসে প্রকাশিত হয় সে জন্য সমকালীন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলির উপর গুরুত্ব দেওয়া তার পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অতীতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাধারার প্রবাহটি বুঝতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাময়িক পত্রের সাক্ষ্য ছাড়া আমাদের কোনো উপায় থাকে না। সাময়িক পত্রের পরিচালকেরাও এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন বলে সাধারণত সাময়িকপত্রে সমকালীন সংবাদ সম্পর্কিত বিভাগ থাকে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আলোচিত হয়, সমকালীন বহু আলোচিত বিষয়গুলির উপর লিখিত হয় প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

সাময়িক পত্র কোনো একজনের লেখা নয়। একটি সময়ের অনেক লেখক বিচিত্র ধরনের লেখা নিয়ে এখানে সমবেত হন। তাই একটি সময়ের সামাজিক রুচির এবং শিক্ষিত মানুষের চিন্তন-বলয়ের বিস্তার ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা তৈরি হয়। বস্তুতই সাময়িক পত্র জাতীয় সংস্কৃতির এক প্রকাশমুখ। সাময়িক পত্রের ইতিহাস না জানলে কোনো জাতিগোষ্ঠীর বা দেশের ইতিহাস সম্পর্কিত বোধ অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা এখানে বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রধানত সাহিত্য কেন্দ্রিক পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব। সাময়িক পত্রের আর একটি চরিত্র হল সব যুগেই তা বহুল পরিমাণে এবং বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার সবগুলিই স্থায়িত্ব পায় না, অনেকগুলির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না, অনেক পত্রিকাই অন্য দু-তিনটি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার অক্ষম অনুসরণ মাত্র হয়। কাজেই সাহিত্যের ও সময়ের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চমানসম্পন্ন পত্রিকাগুলি এখানে নির্বাচিত হল। কালানুক্রমিকভাবে বিংশ শতাব্দীর এই সাময়িক পত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধের সাহিত্য, শিল্প ও সমাজমনস্কতার একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারবে বলে মনে হয়।

৮. ১ 'প্রবাসী' (১৯০১—১৯৬৫-১৯৬৬)

ক. প্রকাশকাল এবং পত্রিকা-সংক্রান্ত তথ্য :

বিংশ শতাব্দীর একেবারে সূচনায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (এপ্রিল ১৯০১) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মালিকানায় এবং সম্পাদনায় এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র বাংলা মাসিক পত্র 'প্রবাসী'। প্রবাস থেকে প্রকাশিত হত বলে 'প্রবাসী' নামকরণ হলেও পরে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চল্লিশ বছর ধরে আ-মৃত্যু পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন—১৯০১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত। তারপর যথাক্রমে সম্পাদক হন তাঁর দুই পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৩-১৯৬৫) এবং অশোক চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৫-)।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের শেষ বিংশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের এই সজ্জন ব্যক্তি অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং প্রগতিমনস্ক ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন দেশব্রতী, সমাজসেবক, উদার এবং কর্মী চরিত্র মানুষ। রবীন্দ্রনাথের এবং সমকালীন মনীষীবৃন্দের সকলের সঙ্গে তাঁর স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা মিশ্রিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে যদি বলা হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালির মনন-সাধনার পরিচয়-জ্ঞাপক সাময়িক পত্র, তাহলে 'প্রবাসী'-কে বলা যাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের শিক্ষিত বাঙালি মানসের চলচ্চিত্র সদৃশ্য এক সাময়িক পত্র।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'প্রবাসী'-তে কাজ করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বগেল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, গোপাল হালদার, সজনীকান্ত দাস, পুলিনবিহারী সেন প্রমুখ বিদ্বজন। প্রথম সংখ্যাটিতেই প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটির নামকরণের সঙ্গে সংগতি রেখে রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' নামে কবিতা—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া',

এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা। দুটি নিয়মিত বিভাগ ছিল 'বিবিধ প্রসঙ্গ', আর 'পঞ্চশস্য'। 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-তে সমকালে সংঘটিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাহিত্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ স্থান পেত। 'পঞ্চশস্য' বিভাগে থাকত প্রধানত বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা এবং দেশবিদেশের বিবিধ সমকালীন আবিষ্কার সম্পর্কিত তথ্য। এই দুটি বিভাগ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল। প্রথম দিকে আরও কয়েকটি নিয়মিত বৈঠক—'বেতালের বৈঠক'।

কষ্টিপাথর', 'মহিলা মজলিস', 'ছেলেদের পাততাড়ি' আলোচনা ইত্যাদি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকেই লেখকদের পারিশ্রমিক দেওয়া সুনিশ্চিত করেছিলেন। 'প্রবাসী'-তে থাকত গ্রন্থ পরিচয়।

'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম থেকেই চিত্রকলা সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ করা যায়। প্রচ্ছদ ছিল সযত্নে নির্বাচিত আলোকচিত্র, অথবা চিত্রসমৃদ্ধ, প্রচ্ছদে বিভিন্ন সময়ে অমরাবতীর গুপ্তমন্দির, আগ্রার তাজমহল, বর্মার প্যাগোডা, দিল্লির কুতুব মিনার, বুদ্ধ গয়ার মন্দির, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, ওড়িশার ভুবনেশ্বর মন্দির, সাঁচির তোরণ ইত্যাদির চিত্র পাওয়া যায়। বহুবর্ণ প্রচ্ছদ ছিল। পত্রিকার লেখা শুরু হবার সূচনায় বিভিন্ন প্রখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবির রঙিন প্রতিলিপি মুদ্রিত হত। ভারতীয় স্থাপত্য, শিল্পকলা এবং নব্য ভারতীয় চিত্রকলার প্রসারে এইভাবে সাহায্য করেছিল 'প্রবাসী'। প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদকের নিজের লেখা, বহু চিত্রশোভিত 'অজন্টা গুহাচিত্রাবলী' নাম প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। সমকালীন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রবি বর্মার ছবি সম্বন্ধে বাঙালিদের বিশেষভাবে পরিচিত করেছিল 'প্রবাসী'।

খ. পত্রিকার উদ্দেশ্য :

অধিকাংশ সম্পাদক যেমন করে থাকেন সেভাবে রামানন্দ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বিস্তৃতভাবে কিছু লেখেননি। তিনি লিখেছিলেন—''প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্যের বিচার হওয়া ভালো। এইজন্য আমরা আপাতত আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।''

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

সেকালের সব সাময়িক পত্রেই ধারাবাহিক উপন্যাস মুদ্রিত হত। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং 'শেষের কবিতা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক উল্লেখযোগ্য। সমকালীন প্রায় সব লেখকই 'প্রবাসী'-তে ছোটো গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্র সমকালীন সব গল্পকারদের লেখা ত ছিলই, পরবর্তী সময়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, পরশুরাম, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়মিত প্রকাশ হয়েছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তন হয়, লেখাকে যুগোপযোগী হয়ে উঠতে হয় তা জানতেন বলেই 'প্রবাসী'-তে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাকুঠির শ্রমিকদের নিয়ে এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিবর্ণ মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লেখা গল্প স্থান পেয়েছিল। একমাত্র শরৎচন্দ্রের লেখা 'প্রবাসী'-তে কখনও মুদ্রিত হয়নি।

ঘ. প্রবন্ধ স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনি :

প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি ছিল 'প্রবাসী' পত্রিকার অন্যতম সম্পদ। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ, শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়, সাহিত্যতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অতি গুরুত্বের সঙ্গে বার বার 'প্রবাসী'-র প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। নৃতত্ত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায়। বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন জগদীশ চন্দ্র বসু। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'ক্ষীরোৎ কুম্ভ'। বহু প্রবন্ধই হত সচিত্র।

ভ্রমণকাহিনিগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি'(ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাশিয়াতে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অভিনন্দিত করেছিলেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় তাঁর লেখা 'রুশিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব' উল্লেখ্য।

ঙ. কবিতা :

কবিতা প্রসঙ্গে বলা যায় সমকালীন প্রতিষ্ঠিত কবিদের সকলের লেখাই 'প্রবাসী'-তে মুদ্রিত হত। কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকার কবিতা রুচি ছিল প্রথাসিদ্ধ ধরনের। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ নির্বাচন ও আঙ্গিকের নবীনতা 'প্রবাসী'র কর্তৃপক্ষকে আকর্ষণ করেনি।

'প্রবাসী' পত্রিকায় রামানন্দ দেশ ও জাতির কল্যাণ ও মননের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন যথাসাধ্য। তিনি 'প্রবাসী বাঙালিদের পরিচয় এবং ইতিহাস উদ্ধারমূলক প্রবন্ধের জন্য স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। সেই সূত্রেই রচিত হয়েছিল জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের প্রবন্ধ 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালি'।

'প্রবাসী' পত্রিকা বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কেবল সমৃদ্ধই করেনি, আজ এই পত্রিকাটি অনেকটা ইতিহাসের আকর রূপেও পরিগণিত হতে পারে।

৮.২ 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩-১৯৫৬)

ক. প্রকাশকাল এবং পত্রিকা সংক্রান্ত তথ্য :

'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটির পরিকল্পনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পত্রিকাটির নামটিও তাঁরই প্রদত্ত। পত্রিকাটিকে আর্থিক সহায়তা দান করেছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স-এর হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র)। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদক হবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে যুগ্ম সম্পাদক হলেন জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে)। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। প্রথম সংখ্যাটির পরিকল্পনা, রচনা নির্বাচন এবং সম্পাদকীয় লিখন—তিনটি কাজই সম্পন্ন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পত্রিকাটি ছিল সচিত্র। প্রথম সংখ্যায় ছিল সমুদ্র থেকে উত্থিত ভারত-জননীর ছবি। চিত্রশিল্পী দ্বিজেন্দ্র গোস্বামী। ছবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পত্রিকায় স্বরলিপি সহ মুদ্রিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত গান 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ'। এ পত্রিকার প্রচ্ছদে অনেক সময় থাকত বিখ্যাত বাঙালিদের রঙিন চিত্র। পত্রিকাটির মুদ্রিত অংশ যেখানে শুরু হত সেই প্রারম্ভিক পৃষ্ঠায় হংসবাহিতা বীণাবাদিনী সরস্বতীর ছবি থাকত। সরস্বতীর শিরোদেশে থাকত মন্দির ও প্রাকৃতিক দৃশ্য। এছাড়াও ছিল তিনটি নারীর আলেখ্য যাদের নাম 'বিশ্বাস' 'আশা' এবং 'বদান্যতা'। এই নারী মূর্তিগুলি অঙ্কন করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর জ্যাটকার। প্রতিটি সংখ্যাতেই অন্তত তিন-চারটি করে রঙিন ছবি থাকত। এক বছর পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সরে যান এবং আসেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তৃতীয় বছরের প্রথম দিকে তিনিও চলে যাওয়াতে জলধর সেন এককভাবেই সম্পাদক ছিলেন। নরেন্দ্র দেব এই পত্রিকার সম্পাদনা কর্মে বিশেষ সাহায্য করতেন। জলধর সেনের মৃত্যুর পর ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৫৯ পর্যন্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, ১৩৫৯ থেকে ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় এককভাবে কিছুকাল ভারতবর্ষ সম্পাদনা করেছিলেন।

পত্রিকাটির সূচনাপত্রে থাকত ঋগ্‌বেদীয় স্বস্তিবাচন। নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। তাতে থাকত চিত্র সহ সমর্থিত দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানের বিবরণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

'সংকলন' নামের আর একটি বিভাগে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ও পত্রিকা থেকে বিচিত্র, তথ্যবহুল, জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে লেখা পুনর্মুদ্রিত করা হত। 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে থাকত সাহিত্য জগতের সংবাদ-কণিকা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাই নিয়মিত সংগীত বিভাগ প্রকাশিত হত। স্বরলিপি করতেন রজনীকান্ত রায় দস্তিদার। আরও দুটি বিভাগ ছিল 'নিখিল প্রবাহ' এবং 'বৈদেশিকী'। এ দুটিতে বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশের বিচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হত। বিশেষ একটি বিভাগ ছিল 'শোকসংবাদ'। তাতে প্রয়াত বিশিষ্ট বাঙালিদের সচিত্র জীবনী মুদ্রিত হত।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখকদের সম্মান-দক্ষিণা দেওয়া হত।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা বিশেষভাবে মহিলাদের লেখা মুদ্রিত করবার ব্যাপারে সচেতন ছিল। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের (১৯২০) কার্তিক সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' 'মহিলা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় সেই সময়কার লেখিকাদের রচনা একত্রে পাওয়া যাবে—যেমন সুনীতি দেবী, কাঞ্চনমালা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, মৃণালিনী সেন, অমলা দেবী, ঊর্মিলা দেবী প্রমুখ।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি বিধানে সক্রিয় ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনো অবস্থান কখনও গৃহীত হয়নি। তার প্রমাণ হিসেবে বলা চলে যে প্রধানত এই পত্রিকাটি সম্পাদনার কৃতিত্বের জন্যই তাঁকে ১৯২২ সালে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

খ. পত্রিকার উদ্দেশ্য :

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সেখান থেকে তাঁর উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারি—"আমরা আশাকরি যে এই রাজপুরুষগণ যাহারা বাংলা ভাষা পড়েন না, তাহাদিগকে এই বাংলা ভাষা সাহিত্য পড়াইব এবং প্রাচ্য ভাব সম্পদে প্রতীচ্যকে সমৃদ্ধিশালী করিব।...আমাদের অভিলাষ যে জনসাধারণকে ভাব ও রুচির অধঃস্তর হইতে এক মায়াময় রাজ্যে টানিয়া তুলিব...আমাদের সাধনা যে আমাদের মাতৃভাষাকে সমবেত মানবমণ্ডলীর সম্মুখে গৌরবের সিংহাসনে বসাইয়া তাহার মাথায় মহিমার রাজমুকুট পরাইয়া দিব...আমরা বঙ্গভাষার সেই সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে স্বাগত ভাষণ দিতে আসিয়াছি।"

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও ছোটো গল্প। জলধর সেন ছিলেন শরৎচন্দ্রের বন্ধু। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'বিরাজ বৌ' (পৌষ ও মাঘ ১৩২০ বঙ্গাব্দ) সহ অন্যান্য রচনা 'পণ্ডিত মশাই', 'মেজদিদি', দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো', 'দেওঘরের স্মৃতি', 'পল্লীসমাজ', বৈকুণ্ঠের উইল', অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'একাদশী বৈরাগী', 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'নববিধান', 'শেষ প্রশ্ন', 'অনুরাধা', 'শেষ প্রশ্ন', 'অনুরাধা', 'শেষের পরিচয়' (অসমাপ্ত) প্রকাশিত হয় এখানে। অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের লেখাকে পাঠকের সামনে নিয়মিত উপস্থিত করবার কৃতিত্ব ছিল জলধর সেনের। বাংলা সাহিত্য তার ফলে বহু সম্পদ অর্জন করতে পেরেছে।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ', ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা তার সম্পর্কে বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করে। সেখানে লিখেছিলেন— রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, সি. এফ, অ্যান্ড্রুজ, বি. গোপাল রেড্ডি, সুভাসচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, দিলীপকুমার রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, লর্ড ব্রাবোর্ণ, নরেন্দ্রনাথ দেব, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ।

মাসিক পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ উপন্যাস প্রকাশিত হত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বহু বিখ্যাত লেখকের ছোটো গল্প প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। বিশেষ উল্লেখ্য রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) প্রথম ছোটো গল্প 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী' লিমিটেড' মুদ্রিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে।

কিছু কিছু নাটকেও প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। বিশেষ মর্যাদাসহ মুদ্রিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাঁশরী' ১৩৪০ বঙ্গাব্দের (১৯৩৩) কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায়।

ঘ. প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি স্মৃতিকথা :

সমকালীন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিতে ভালো প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। যোগেশচন্দ্র বাগল, চারুচন্দ্র ভট্টাচায', মুনীন্দ্র দেবরায়, বিনয়কুমার সরকার, মন্মথনাথ ঘোষ, শিবরতন মিত্র, শশাঙ্কমোহন সেন, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রমুখ

প্রাবন্ধিকরা সমৃদ্ধ করেছেন 'ভারতবর্ষ'-এর পৃষ্ঠাকে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে বিরল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন সম্পাদক। রসিকলাল রায় রচিত 'হিন্দি-সাহিত্য ও তাহার সেবকগণ', এবং 'গুজরাতী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩২২ বঙ্গাব্দের মাঘ এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখে।

তবে ভ্রমণমূলক রচনা প্রকাশের দিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল সম্পাদকের। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর অনেকগুলি মূল্যবান ইউরোপ ভ্রমণকথা এখানে স্থান পেয়েছিল।

'ভারতবর্ষ'-এ প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময়ই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

অত্যন্ত মূল্যবান একটি লেখা নিস্তারিণী দেবীর স্মৃতিচারণ 'সেকেলে কথা' প্রকাশিত হয় এখানে। তিনি ছিলেন রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পিসিমা।

ঙ. কবিতা :

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কবিতার বিশেষ সমাদর ছিল। সেই সময়ের প্রখ্যাত কবিরা লিখতেন। চিত্তরঞ্জন দাশের 'সাগর সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও নরেন্দ্র দেবের শোক-কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী সহ বহু বিশিষ্ট কবির লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

যদিও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পত্রিকার মুদ্রিত রূপ দেখে যেতে পারেননি; কিন্তু জলধর সেনের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা তাঁর স্বপ্নকে যে সফল করেছিল—তাতে সন্দেহ নেই।

৮.৩ 'সবুজপত্র' (১৯১৪-১৯২৮)

ক. প্রকাশকাল এবং পত্রিকাসংক্রান্ত তথ্য :

'সবুজ পত্র' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (মে, ১৯১৪)। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রচ্ছদ ছিল নন্দলাল বসুর আঁকা; হালকা সবুজ পশ্চাৎপটে গাঢ় কালচে সবুজে আঁকা দীর্ঘবৃন্ত তালপাতার ছবি। পত্রিকাটিতে কোনো বিজ্ঞাপন থাকত না; কোনো ছবিও থাকত না। মনে হয়, সমকালীন পত্রিকাগুলির রঙিন ছবি প্রমথ চৌধুরীর রুচিতে একটু লঘু মনে হয়েছিল। পাশ্চাত্য সিরিয়াস পত্রিকাগুলিতে এই ধরনের ছবি থাকত কম। 'সবুজপত্র'-ই প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র যা পাশ্চাত্য পত্র বা পাশ্চাত্য রুচির স্পর্শে একটু নতুন রকম হয়েছিল।

সমকালীন অন্য পত্রিকাগুলির মতো বিভিন্ন ধরনের ফিচার বা বিবিধ প্রসঙ্গ বৈদেশিক জাতীয় বিভাগেও এই পত্রিকায় থাকত না। তবে গ্রন্থ সমালোচনার বিভাগ ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সচেতনভাবে প্রমথ চৌধুরী বাংলা এবং ইউরোপীয় সাহিত্য ও চিন্তনমূলক গ্রন্থগুলিকে বাঙালি পাঠকের পরিচয়ের বৃত্তে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। মাঝে মাঝে 'টীকা টিপ্পনী' বলে তিন চারটি লেখা বেরিয়েছে যেগুলিতে কোনো লেখক এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন।

খ. পত্রিকার উদ্দেশ্য :

প্রমথ চৌধুরী যথেষ্ট চিন্তা করেই এই পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটির নাম ছিল 'মুখপত্র'। প্রবন্ধের সূচনায় উদ্ধৃত হয়েছিল 'ওঁ প্রাণায় সাহা'। এই লেখাটিকেই সম্পাদকীয় বক্তব্য বলে ধরে নেওয়া যায়। রচনাটির নীচে লেখা ছিল 'সম্পাদক' কথাটি। কাজেই পত্রিকার উদ্দেশ্য এই লেখাটিতে বিশদভাবে

ব্যাখ্যাত হয়েছে। আমরা সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে সম্পাদকের বক্তব্য উপস্থিত করছি—''সাহিত্য মানব জীবনের প্রথম সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে জাগরূক করে তোলা।...ইউরোপের স্পর্শে আমরা...মানসিক ও ব্যাবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি।

এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে দিতে পারে তবেই তা পরে সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি, আমাদের এই স্বল্প পরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম।

ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীতে ভারতের ক্ষেত্রে প্রথম বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে। নইলে স্বদেশি সাহিত্যের ফুল ফুটবে না।...দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপরই আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সাহিত্য সাধনায় ব্রতী এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় তাই কোনো শিক্ষা প্রচার বা অসংযত মনোভাব প্রকাশ করা হবে না।...আমাদের বাংলা ঘরের খিড়কি দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের গৌড় ভাষায় মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে হবে।'' সবুজপত্র চেয়েছিল বাঙালি মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, সংস্কারের টান থেকে মুক্তি, ভাবালুতা অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি, থেকে সাহিত্যের মুক্তি। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর প্রয়াস ছিল মার্জিত মনন আর যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ সাহিত্য নির্মাণের। তারই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের বিশেষত ইউরোপীয় সাহিত্যের শক্তিসমৃদ্ধ প্রাণলীলার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তথা সাহিত্যিকদের সংযোগ সাধনও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। একমাত্র তরুণদলই করতে পারে এই দুঃসাধ্য সাধন। তাই পত্রিকার নাম 'সবুজপত্র'। কারণ সবুজ তারুণ্যের রং যৌবনের বর্ণ। তালপাতা অন্য পাতার মতো নমনীয় নয়, দৃঢ় এবং উর্ধ্বমুখ তার বিস্তার। তাই প্রাণের বলিষ্ঠ প্রকাশ।

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

বাংলা সাহিত্যে গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে যে নব দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছিল তার প্রকাশক্ষেত্র ছিল 'সবুজ পত্র'। 'চতুরঙ্গ', উপন্যাসের অভিনবত্ব, 'ঘরে-বাইরে'-র প্রথা ভাঙার দুঃসাহস এবং 'হালদার গোষ্ঠী', 'স্ত্রীর পত্র', 'হৈমন্তী ইত্যাদি নতুন স্বাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের গল্পগুলি এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত।

বাংলা কথা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী স্বাতন্ত্র্যে একক। তাঁর 'চার ইয়ারী কথা', এবং 'ফরমায়েশি গল্প' এই পত্রিকায় প্রকাশিত। 'সবুজ পত্র'-এর নিয়মিত লেখকদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও অনেকে নতুন ধরনের গল্প লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের কন্যা মাধুরীলতা দেবীর গল্প 'সুরো' (আষাঢ় ১৩২২ বঙ্গাব্দ) এবং আরো কিছু গল্প ও সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের আঞ্চলিক ভাষায় গল্প 'ইরা' (ফাল্গুন ১৩২৪ বঙ্গাব্দ)।

'সবুজপত্র' নাটককে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা 'স্বর্গ-মর্ত্য (ফাল্গুন ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল 'সবুজপত্র'-এ।

ঘ. প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনি, স্মৃতিকথা :

'সবুজপত্র' প্রবন্ধের জন্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকার আর একটি দিক ছিল সিরিয়াস সাহিত্য রচনার মাধ্যম রূপে চলিত ভাষায় প্রতিষ্ঠা। যদিও তার আগে কেউ কেউ কোথাও কোথাও চলিত ভাষায় লিখেছেন, তবু গুরুগম্ভীর বিষয়নিষ্ঠ রচনায় চলিত গদ্যের প্রয়োগকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। সেই উদ্দেশ্যে ভাষা

সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিয়মিত প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি এবং প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং। সাহিত্য-সমালোচনা, সাহিত্যতত্ত্ব, সমাজ-ভাবনা ইত্যাদি বিষয় প্রবন্ধগুলিতে প্রধান হয়েছে।

স্মৃতিকথা বা ভ্রমণ-কাহিনি প্রকাশের দিকে সম্পাদকের খুব একটা প্রবণতা ছিল না।

ঙ. কবিতা :

প্রমথ চৌধুরী কবিতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর নিজের লেখা নতুন ধরনের কবিতা, বিদেশি ছন্দের অনুসরণে লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংখ্যাতেই ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা 'সবুজের অভিযান' এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সবুজ পাতার গান'। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-পর্বের প্রাণময় ও সমুজ্জ্বল কবিতাগুলি প্রধানত 'সবুজপত্র'-তেই প্রকাশিত হয়েছিল।

'সবুজপত্র' পত্রিকাটি সব দিক থেকেই শিক্ষিত বাঙালির মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। একদিকে নির্মোহ যুক্তি ও সরস বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের দিকে মনকে চালিত করা এবং ভাবাবেগের পরিহার পরবর্তী কয়েকটি পত্রিকার আদর্শ রূপেও বিবেচিত হয়েছিল। নতুন ধারায় সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহিত করেছিল কোনো কোনো লেখক ও সম্পাদককে। বিশেষ করে অন্নদাশঙ্কর রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমথ চৌধুরীকেই গুরু বলে মান্য করতেন। অন্নদাশংকর রায় যখন সতীর্থ ওড়িয়া বন্ধুদের সঙ্গে ওড়িয়া সাহিত্যে নতুন যুগ নিয়ে আসার আন্দোলন শুরু করেন, তখন নিজেদের গোষ্ঠীকে 'সবুজ দল' নামে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'পরিচয়' (১৯৬১) ত্রৈমাসিক পত্রিকার পরিকল্পনা কিছুটা 'সবুজপত্র'-এর আদলে করা হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী 'পরিচয়'-এর উপদেষ্টাও ছিলেন। খুব স্পষ্টভাবেই বলা যায় বাংলা সাহিত্যে 'সবুজপত্র'-এর দান হল—লেখার রীতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা, মার্জিত চলিত গদ্যকে সিরিয়াস সাহিত্যের মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠা করা, আধুনিকতম পাশ্চাত্য চিন্তন-মননের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং চিরাচরিত পন্থা বহির্ভূত নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টিকে উৎসাহ ও মর্যাদা দান করা। এই সব কারণে 'সবুজপত্র' স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৮.৪ 'কল্লোল' (১৯২৩-১৯৩০)

ক. প্রকাশকাল এবং পত্রিকা সংক্রান্ত তথ্য :

'কল্লোল' পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিলেন এক দল তরুণ সাহিত্যিক, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও গতানুগতিক রবীন্দ্রানুসরণের পথ ত্যাগ করে, কিছুটা নব্য ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে বাংলা ভাষায় আধুনিকতা, বাস্তবতার বোধ এবং প্রগতি চিন্তাকে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাস এবং গোকুলচন্দ্র নাগ। পত্রিকা প্রকাশের অনতিকাল পরেই গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক প্রমুখ।

'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দীনেশচন্দ্র দাস, সহকারী সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ। দুজনেই ছিলেন শিক্ষিত, শিল্পমনস্ক, মধ্যবিত্ত, ব্রাহ্মপরিবারের সন্তান এবং অকৃতদার। গোকুলচন্দ্রের অকাল মৃত্যু ঘটে ১৯২৫-এ, তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত দীনেশরঞ্জনই এককভাবে সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে।

খ্রিস্টাব্দ হিসাবে ১৯২৯-এর ডিসেম্বর এবং ১৯৩০-এর জানুয়ারি মাসের দুই অর্ধাংশ মিলে পৌষ মাস। কাজেই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ শেষ হবার আগেই 'কল্লোল' পত্রিকা বন্ধ হয়েছিল বলা যায়।

পত্রিকাটি প্রথমে ছিল ডিমাই আকারের। পরে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে আকার হয় ডবল ক্রাউন। দাম প্রথমে ছিল চার আনা পরে হয় পাঁচ আনা। 'কল্লোল'-এর প্রচ্ছদে যে ছবি থাকত তা মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু সর্বদাই নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমুদ্রের তরঙ্গ দেখা যেত ছবিতে।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ঘোষিত হয়েছিল—''কল্লোল—মাসিক গল্প-সাহিত্য।'' কিন্তু এই ঘোষণা অনুযায়ী পত্রিকাটি চালানো সম্ভব হয়নি। সমকালীন সব জনপ্রিয় পত্রিকাই ছিল পাঁচমিশালি ধরনের। কাজেই প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে গিয়ে 'কল্লোল'-কেও তাই হতে হয়। তারপরে এই পত্রিকায় বহু উল্লেখযোগ্য কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, অনুবাদ-গল্প এবং অনুবাদ-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

এই পত্রিকার বেশ কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ ছিল। 'সংগ্রহ' বিভাগে থাকত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে তাৎপর্যময় উদ্ধৃতির সংকলন। লেখগুলির নাম থাকত কিন্তু লেখকের নাম থাকত না। 'সমাচার' বিভাগে প্রকাশিত হত দেশ-বিদেশের সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ। সঙ্গে থাকত মন্তব্য। 'আলোচনা' বিভাগটি ছিল বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকা এবং নাটকের আলোচনার জন্য। সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ এবং সংক্ষিপ্ত ভাবনাও এই বিভাগে প্রকাশিত হত। 'পরিচয় লিপি' নামক বিভাগে এই পত্রিকার উল্লেখযোগ্য কোনো লেখা বা কোনো বিশেষ সংখ্যা সম্পর্কে পরিচিতিমূলক কয়েকটি ছত্র থাকত। খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল 'ছবি' নামে বিভাগটি। বিভাগটিতে ছবি নয়, থাকত চিত্রধর্মী একটি বর্ণনা অংশ সঙ্গে সামান্য অলংকরণ।

'কাহিনি' নামক একটি বিভাগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য চিন্তা বিষয়ে কিছু কিছু করে লেখা হত। লিখতেন প্রধানত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কখনও কখনও এই বিভাগে সাহিত্যিকদেরও পরিচয় থাকত।

তৃতীয় বর্ষ থেকে 'ডাকঘর' নামে একটি ফিচার প্রবর্তিত হয়—যার মধ্যে থাকত পূর্ব প্রচলিত ফিচারগুলি থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ। 'ডাকঘর'-এর নাম পরে হয় 'প্রবাহ'। অবশ্য কোনো বিভাগই খুব নিয়মিত ছিল না।

'কল্লোল' পত্রিকার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। 'কল্লোল'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন ইউরোপীয় এবং রুশ সাহিত্যিকদের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের লেখার পরিচয় ছাপা হত।

খ. পত্রিকার উদ্দেশ্য :

'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। অল্প কিছু কাল পরে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় সম্পাদকেরা ব্যাখ্যা করেছিলেন পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য—''এখন সময় আসিয়াছে বিভিন্ন আদর্শ লইয়া বিভিন্ন কাগজের সৃষ্টি করা।...সাহিত্য বা কাব্যরসের প্রবাহকে সর্বঙ্গ-সম্পন্ন শান্তির মধ্যে মিলিত করিয়া যে মহান পরিণাম তাহাই ভারতবর্ষের আদর্শ ও আকাঙ্খার বস্তু। এই বিশ্ব প্রবাহের অন্তরের কথাকে সমাজের রূঢ়তার সমক্ষে গল্পের আকারে কবির চিন্তাকে নির্বিকভাবে প্রকাশ করা 'কল্লোলে'র একটি উদ্দেশ্য। মানুষের প্রেমের মধ্যে যে ধ্রুবত্ব ও সৌন্দর্য, কামনার মধ্যে যে অশান্তি ও বেদনা তাহারই কথা সাহিত্যের আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা 'কল্লোলে'র।'' এই ঘোষণাকেই পত্রিকার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'কল্লোল' প্রকাশিত হয়েছিল গল্পসাহিত্যের মাসিক পত্রিকা হিসাবে এবং বেশ কিছু ভালো গল্প প্রকাশিতও হয়েছিল 'কল্লোল'-এ। খুবই সচেতনভাবে এই পত্রিকার লেখকেরা নব্য ইউরোপীয় বাস্তবতা এবং যৌন চেতনার

সঙ্গে বাঙালি মনের রোমান্টিক উচ্ছ্বাসকে মিলিয়ে ছিলেন। দরিদ্র শ্রমজীবী, ভিক্ষুক, দেহজীবিনী, চোর ইত্যাদি চরিত্র নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করেন তাঁরা। আবার নাগরিক মানসিকতা, আত্মভাবনা-ময় গল্প-গৌণ লেখাও প্রকাশিত হয়েছে 'কল্লোল'-এ। 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত অনেক গল্পই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়েছে। যেমন— প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', মণীশ ঘটকের 'পটলডাঙার পাঁচালী'র গল্পগুলি ছাপা হয়েছিল এই পত্রিকাতেই।

উপন্যাসের লেখার দিকেও ঝুঁকে ছিলেন 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকেরা। গোকুলচন্দ্র নাগের লেখা নতুন ধরনের মনন প্রধান উপন্যাস 'পথিক'-কে অনেকেই বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকীয় আধুনিকতার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত মনে করেন। এছাড়া অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল', বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া' যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। রোমা রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ 'কল্লোল'-এর উল্লেখযোগ্য কাজ। সমকালের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি, দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক মন্দা, নগরমুখী মানসিকতা ও স্থিতির অভাব, মধ্যবিত্তের আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে দ্বন্দের সংকট বিশেষভাবে 'কল্লোল'-এর গল্পগুলিতে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনীতি দেবী, কেতকী দেবী, রাধারানি দত্ত প্রমুখ মহিলারা এই পত্রিকায় গল্প লিখেছেন। আর দুজন বিশিষ্ট গল্পকার ছিলেন জগদীশ গুপ্ত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ঘ. প্রবন্ধ স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনি :

'কল্লোল' পত্রিকা কথাসাহিত্যের জন্যই বিশিষ্ট ছিল। গদ্য সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপ বিশেষ স্থান পায়নি। তবে বিদেশি সাহিত্যিকদের সম্পর্কিত লিখনগুলিকে প্রবন্ধের বিকল্প বলা যায়, নানা ধরনের কথিকাও প্রকাশিত হত 'কল্লোল'-এ।

ঙ. কবিতা :

গল্প পত্রিকা হিসেবে ঘোষিত হলেও প্রথম থেকেই কিন্তু 'কল্লোল'-এ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই ছিল দীনেশরঞ্জন দাসের 'কল্লোল' নামের কবিতা এবং দীপঙ্কর ছদ্মনামে লেখা কালিদাস নাগের 'বসন্ত বিলাপ'। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার মুদ্রিত হয় নজরুলের 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হলেও আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট প্রকাশমুখ ছিল 'কল্লোল'। যদিও গদ্য কবিতা বিশেষ প্রকাশিত হয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কবি নাস্তিক', 'বেনামী বন্দর', 'ওরা ভয় পায়' ইত্যাদি কবিতা জীবনানন্দের 'নীলিমা' এবং আরও অনেকের কবিতাই কাব্যচর্চায় এক নতুন যুগের পূর্বাভাস বহন করে এনেছিল।

প্রায় সাত বছর চলবার পর পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। দীনেশরঞ্জন দাস 'নিবেদন' অংশে জানিয়েছিলেন—আর্থিক অসামর্থ্য ও শারীরিক অসহায়তার কারণে পত্রিকাটিকে আর বাঁচিয়ে রাখা গেল না।

উপসংহার ঃ—

'কল্লোল' পত্রিকা নিশ্চিতভাবেই বাংলা কথাসাহিত্য, কবিতা, বাঙালির পাশ্চাত্য সাহিত্যচিন্তা এবং সমাজমনস্ক মানসপ্রবণতার দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

৮.৫ 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৪-১৯৬৩)

ক. প্রকাশকাল ও পত্রিকা সংক্রান্ত তথ্য :

'শনিবারের চিঠি পত্রিকাটি বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে পরিকল্পনা অভিনবত্বের কারণে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ব্যঙ্গমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে এই পত্রিকা

প্রকাশ করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের (১৯২৪) ১০ শ্রাবণ। ক্ষুদ্র একটি সাপ্তাহিকী হিসাবে প্রত্যেক শনিবার পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। খামে মোড়া থাকত যোলো পেজি ডভল ক্রাউন আকারের চব্বিশ পৃষ্ঠার পত্রিকা। খামের উপরে থাকত সবুজ কালিতে আঁকা চাবুক হাতে এক বীরপুরুষের ছবি। এই ছবিটি এঁকেছিলেন দীনেশরঞ্জন দাস। 'প্রবাসী' প্রেসে মুদ্রিত পত্রিকাটি প্রথম সম্পাদক ছিলেন ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র যোগানন্দ দাস। দাম ছিল প্রতি সংখ্যা এক আনা।

পত্রিকাটির শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিয়মাবলিতে লেখা থাকত—''লেখা চাই না। টাকা পাঠাবার ঠিকানা...'' ইত্যাদি। ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্যরসের এই ধরনটি ছিল সমস্ত পত্রিকাটি জুড়ে।

প্রথম ছয় মাস অর্থাৎ মোট সাতাশটি সংখ্যা সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। শেষ সাপ্তাহিক সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৯ ফাল্গুন। এরপর মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হয়ে ১৩৩৪ (১৯২৭) বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে যোগানন্দ দাসের পরিবর্তে সম্পাদক হলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন সজনীকান্ত দাস। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস থেকে সম্পাদক হলেন সজনীকান্ত দাস। তাঁর সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এবং সজনীকান্তের পত্রিকার রূপেই কাগজটি পরিচিত হয়ে ওঠে। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'—র মলাটে থাকত তিন রঙে আঁকা একটি মোরগের ছবি। তার গলায় থাকত মেল ব্যাগ এবং বাঙালি প্রেমিকার লেখা একটি চিঠি—তাতে লেখা 'যাও পাখি বোলো তারে'। এই প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন বিনয়কৃষ্ণ বসু। পত্রিকাটিতে বিভিন্ন ধরনের কার্টুনচিত্র থাকত।

মাসিক 'শনিবারের চিঠি'-র উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছিল 'সংবাদ সাহিত্য' এবং 'মণি মুক্তা'। 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগটিতে সমকালীন সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে ব্যঙ্গ-তীব্র টিপ্পনি সহ পরিবেশিত হত। এই বিভাগটি তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অভিমতগুলিতে রুচির শালীনতা সর্বদা বজায় থাকত না।

'মণি-মুক্তা' বিভাগে 'ডুবুরি' ছদ্মনামের আড়ালে সংকলক কেবল বিভিন্ন সমকালীন রচনার অংশ উদ্ধৃত করতেন। সেগুলিও জনপ্রিয় ছিল।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের পর 'শনিবারের চিঠি' সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'—র একটি পৃষ্ঠা দেওয়া হয়েছিল 'শনিমণ্ডল'-এর জন্য। তবে এই ব্যবস্থা টিকে ছিল মাত্র কয়েক সপ্তাহ। মাসে একবার বেতারে 'শনিমণ্ডল'-এর আসর বসানো হত। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে আবার সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৩৩৯ থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক হলে 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক হন পরিমল গোস্বামী। দু বছর পরে সজনীকান্ত আবার 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ (১৯৬২) পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কিছুকাল পত্রিকাটি চালিয়েছিলেন তাঁর পুত্র রঞ্জন দাস।

খ. পত্রিকার উদ্দেশ্য :

'শনিবারের চিঠি' ছিল বিশেষ ধরনের পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার মুখবন্ধ রচনা করেন 'শঙ্করাচার্য' ছদ্মনামে অশোক চট্টোপাধ্যায়। সেখানে লেখা ছিল—''আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই, এমনকি উদ্দেশ্যহীনতাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য যদি কখনো আপনাআপনি ফুটে ওঠে, তাহলে আশা যে তা আপনাআপনি ঝরেও পড়বে। ...উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যহীনতার খাতিরে আমরা নিজেদের বিসর্জন দেব না...নিজেদের স্বভাব, জীবন ও আগ্রহের ক্রমবিকাশের পথ ধরে চলতে চলতে আমাদের যা ভাল মনে হবে আমরা তারই অনুসরণ করব—কোন নির্দিষ্ট পলিসির অনুসরণ করতে গিয়ে জীবন ভাব জীবন ভাব ও চিরপরিবর্তশীল হৃদয়াকাঙ্খাগুলিকে আকৃষ্ট ও প্রাণহীন করে ফেলব না।...ধর্মজগতে আমরা কোন কিছুতেই অভ্রান্ত চিরসত্য অথবা শেষ বলে স্বীকার করব না।

...ভৌগোলিক ক্ষেত্রে যেমন দূর দেশকে মানব না, সময়ের ক্ষেত্রেও তেমনি অতীতকে মানব না। অনেক রকম গোলমালই আমরা বাঁধাব, কিন্তু 'অলমতি বিস্তারেন'।...রাষ্ট্রীয়তা আমাদের একটা শক্ত রোগের মতো চেপে ধরে রয়েছে, সেই রোগটাকে তাড়িয়ে বা দাবিয়ে আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। একে অবাধে বেড়ে উঠতে আমরা দেব না।''

আবার যখন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ নব পর্যায়ের 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হয় তখন তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল—''সাহিত্য সমাজ ও রাষ্ট্রে আমরা সকল প্রকার ন্যাকামি ও ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিয়াছি এবং সত্যকথা বলিতে গিয়া বৃহৎ কাহাকেও রেয়াৎ করি নাই।''

সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'-তে এ সম্পর্কে আরও লিখেছেন—'''শনিবারের চিঠি' হাস্যরসের কাগজ তবে তাহার হাস্যরস, হাস্যরসের একটিমাত্র রূপ—Humour-এই আবদ্ধ নয়। আমাদের দেশে যাহা কিছু ঠাট্টা, বিদ্রূপ, রঙ্গ অথবা নিছক হাসির উপযুক্ত তাহাকে লইয়া হাস্যরস সৃষ্টি করাই 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য''। (সজনীকান্ত দাস : 'আত্মস্মৃতি' পৃ ১৮৪-১৮৫)

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাটি প্রথম থেকেই ব্যঙ্গাত্মক রচনার দিকে নিজেদের পক্ষপাত প্রদর্শন করেছিল। পত্রিকাটিতে প্রথম দিকে গল্প-উপন্যাস খুব কমই প্রকাশিত হত। তবে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'-তে নিয়মিত গল্প লিখেছেন পরিমল গোস্বামী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রমুখ লেখকরা।

ঘ. প্রবন্ধ স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনি :

প্রবন্ধ এবং ব্যঙ্গমূলক গদ্য রচনা প্রকাশে আগ্রহ ছল 'শনিবারের চিঠি'র। সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক অনেক প্রবন্ধই এই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সাপ্তাহিকের সাতাশটি সংখ্যার মধ্যেই রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রসুন আলি' ছদ্মনামে। তাছাড়াও প্রবন্ধ লিখতেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুশীল কুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, শান্তা দেবী, মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, এবং গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে গোপাল হালদার, অচ্যুত গোস্বামী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ প্রাবন্ধিকেরা এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন। শেষ পর্বে পত্রিকাটির প্রবন্ধ বিভাগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং গঠনমূলক হয়ে ওঠে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগদানে। বাংলা সাহিত্যের অনেক লুপ্ত রত্ন পুনরুদ্ধারমূলক প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্রিকাটির সমাজমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উল্লেখযোগ্য। দাঙ্গা এবং মন্বন্তর বিষয়ক গল্প ও প্রবন্ধ দুই-ই প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে 'জুবিলী' সংখ্যা, 'বিরহ' সংখ্যা এবং 'ভোট' সংখ্যা রূপে। প্রথমটির বিষয়বস্তু ছিল কলকাতার দাঙ্গা, দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু ছিল বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন আধুনিকতা এবং যৌনতা সম্পর্কিত প্রবণতার বিরুদ্ধে আক্রমণ, তৃতীয়টিতে ছিল ভোট সম্পর্কিত অনেক রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনা।

বহু ব্যঙ্গমূলক রচনা প্রকাশিত হত বলে এই পত্রিকায় ছদ্মনামধারী লেখকদের আধিপত্য ছিল। অনেকে লিখতেন একাধিক ছদ্মনামে। যেমন অশোক চট্টোপাধ্যায়—শঙ্করাচার্য, মধুকরকুমার কাঞ্জীলাল, ভঞ্জনরাম পাহাড়িয়া, গাজী আব্বাস বিটকেল, ক্ষীণেন্দ্র খেয়াল গায়, বঙ্গসন্তান নটনারায়ণ, শুভগ্রহ, সজনীকান্ত দাস—গাজী আব্বাস বিটকেল, ভাবকুমার প্রধান, কেবলরাম গাজনদার, গোলকচন্দ্র ধাঁধা, ক্ষীণেন্দ্র ধ্রুপদ গায়।

ঙ. কবিতা :

কবিতার জন্য খুবই বিখ্যাত ছিল 'শনিবারের চিঠি' বিভিন্ন ধরনের ব্যঙ্গ কবিতা লেখা হত। কাজী নজরুল ইসলামকে ব্যঙ্গ করে অনেকগুলি কবিতা মুদ্রিত হয়। সেগুলির মধ্যে বিখ্যাত হল 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারডি 'ব্যাং' লিখেছিলেন সজনীকান্ত দাস। নজরুল মনে করলেন এটি মোহিতলালের লেখা। মোহিতলালকে লক্ষ করে 'সর্বনাশের ঘণ্টা' নামে একটি কবিতা লিখলেন 'কল্লোল' পত্রিকায়। উত্তরে ক্ষুব্ধ মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি'-তে লিখলেন 'দ্রোণ-গুরু'। এইভাবে কবিতার রণাঙ্গনে পরিণত হল 'শনিবারের চিঠি'।

অসাধারণ সুন্দর প্যারডি রচনা করতে পারতেন সজনীকান্ত দাস। রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ করে রচিত তাঁর 'শ্রীচরণেষু', হেঁয়ালি', 'ভ্রান্তি', ইত্যাদি ব্যঙ্গ কবিতার জন্য রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

সজনীকান্তের নেতৃত্বে 'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠী প্রধানত রবীন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, কাজী নজরুল ইসলাম এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়কে ধারাবাহিকভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে যেতেন। সেই সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসু সহ আধুনিক কবিরা ছিলেন তাঁর তীব্র ব্যঙ্গের লক্ষ্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাশ ও স্বরাজ্য পার্টির বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরা।

বাংলা সাহিত্যে 'শনিবারের চিঠি' ব্যঙ্গ আক্রমণের যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিবাদে প্রকাশিত হয়েছিল 'মহাকাল' এবং 'রবিবারের লাঠি' নামে দুটি পত্রিকা। কিন্তু সজনীকান্ত দাসের মতো ব্যঙ্গ রচনার প্রতিভাধর শিল্পী না থাকায় দুটি পত্রিকাই হয়েছিল স্বল্পায়ু।

যেভাবেই হোক সমকালের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিবিষয়ক প্রায় প্রতিটি প্রশ্ন নিয়েই শানিত আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের সূত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং মননপ্রধান সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

৮.৬ 'উত্তরা' (১৯২৫-১৯৬৩)

ক. পত্রিকার প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্য :

প্রবাসী বাঙ্গালিদের বিশিষ্ট একটি পত্রিকা ছিল 'উত্তরা'। কাশী চিরকালই বাঙালিদের বসবাসের একটি কেন্দ্র। সেখানে সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে সমবেত হতেন প্রবীণ ও নবীন কয়েকজন বাঙালি সাহিত্যিক। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। মাঝে মাঝে বেড়াতে এসে যোগ দিতেন শরৎচন্দ্র। একদা সেই আসরেই একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লখনউবাসী আইনজীবী এবং প্রখ্যাত সংগীতরচয়িতা অতুলপ্রসাদ সেনও পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

লখনউতে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৩৩১ (১৯২৫) বঙ্গাব্দের ২৮ ও ২৯ চৈত্র। সেখানে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের আলোচনা অন্তে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। গঙ্গাতীরবর্তী কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী, তাই অতুলপ্রসাদ পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন 'উত্তরা'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩২ (১৯২৫) বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে মহালয়ার দিনে, কাশীর ভেলপুরা থেকে। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা, পরে হয় সাঁইত্রিশ পয়সা। রয়াল সাইজ পত্রিকাটি ভালো কাগজে মুদ্রিত হত। ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদে এবং বহু বর্ণের চিত্রে সজ্জিত থাকত। ভ্রমণকাহিনি এবং প্রবন্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকচিত্র মুদ্রিত হত। মাঝে মাঝে অনিয়মিত হলেও একচল্লিশ বছর চলেছিল পত্রিকাটি। প্রথম কয়েক বছর কার্যালয় ছিল লখনউ পরে হয় কাশী।

'উত্তরা'-র যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সহ সম্পাদক ছিলেন

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং কোষাধ্যক্ষ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ষষ্ঠ বর্ষ থেকে সম্পাদক হয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। পরিচালক সমিতির প্রধান পাঁচ জন ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রলাল দে এবং সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। এঁরা ছাড়াও মন্ত্রণা পরিষদে ছিলেন সরলা দেবী, গোপীনাথ কবিরাজ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং মেঘনাদ সাহা।

পত্রিকাটি প্রথম থেকেই 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর মুখপাত্র রূপে পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রচ্ছদে লেখা থাকত পরিচালক 'প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন'। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছিলেন অসিতকুমার হালদার। অসিতকুমার হালদারের সূত্রে বহু প্রতিষ্ঠিত চিত্রশিল্পীর ছবি প্রকাশিত হত 'উত্তরা'-য়, যেমন সারদাচরণ উকিল, অজিতকৃষ্ণ বসু, যামিনীপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, আবদার রহমান চাঘতাই, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

অতুলপ্রসাদ সেনের সূত্রে 'উত্তরা'য় নিয়মিত প্রকাশিত হত গান এবং গানের স্বরলিপি। অতুলপ্রসাদ সেন, দিলীপকুমার রায়, 'সাহানা দেবী, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ গীতিকারদের গান ও স্বরলিপিকারদের স্বরলিপি প্রকাশ ছিল 'উত্তরা'-র বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির জন্য যে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন তা মুদ্রিত হয়েছিল 'উত্তরা'-র প্রথম সংখ্যায়। সেই আশীর্বাণী-সনেটের প্রথম পঙ্‌ক্তি ছিল—'বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল'। শেষের পঙ্‌ক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য—

'....আজি পূর্ব বায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণ ধারা যাক না ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দ বেগে পশ্চিমে উত্তরে
দিল বঙ্গ-বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
চিত্ত জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।'

'উত্তরা'-র নিয়মিত বিভাগ ছিল 'সপ্তধারা' এবং 'আহরণী'। 'সপ্তধারা' বিভাগে হিন্দি, উর্দু, মারাঠি, তামিল ইত্যাদি অবাঙালি সাহিত্যিকদের রচনা অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হত। 'আহরণী' বিভাগে সমকালীন বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকা থেকে রচনার সার-সংকলন প্রকাশিত হত। আর একটি বিভাগ ছিল 'প্রবাসী বাঙালী'। তাতে প্রবাসী বাঙালিদের কৃতিত্ব, বিভিন্ন কার্যক্রম, সভা-সমিতির সংবাদ এবং অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত হত।

পত্রিকাটির আর্থিক দায়িত্ব প্রধানত বহন করতেন অতুলপ্রসাদ সেন। ১৯৬৩ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

খ. উদ্দেশ্য :

'উত্তরা'-র প্রথম সংখ্যায় মুখবন্ধে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন—"বাঙালি ভারতবাসী হউক, তবেই বাংলার সার্থকতা—ভারতের রক্ষা, প্রবাসী বাঙালির এই আদান প্রদানের সূত্র 'উত্তরা'র একমাত্র আশ্রয় ও সম্বল।"

পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও খানিকটা ধারণা করা যায় অতুলপ্রসাদ সেনের বক্তব্য থেকে। তিনি ১৩৩১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে লখনউতে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এ প্রদত্ত ভাষণ একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—উত্তর ভারতে একাধিক খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী, সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শী শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন এবং এদেশের তীর্থাদি, জনপ্রসাদ, লোকাচার যা আছে সব অবলম্বন করলে দেখা যাবে সাহিত্য সেবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এখানে যথেষ্ট বিদ্যমান। এইসব উৎকৃষ্ট উপকরণ দিয়ে

একটি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশের আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন—'তাহা হইলে বহির্বঙ্গীয় বাঙ্গালিগণের মাতৃসাহিত্য সেবার পক্ষে সহায়তা করা হইবে। সাহিত্যসেবীদের মাতৃভাষা প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালিদিগকে রক্ষা ও উন্নতি সাধন বিষয়ে চিন্তাশীলেরা এ পত্রিকায় আলোচনা করিতে পারিবেন।'

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'উত্তরা' পত্রিাকায় ছোটো গল্পের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। তখন 'কল্লোল' পত্রিকার নবীন আদর্শ অন্যান্য পত্রিকাগুলোকেও উৎসাহিত করেছিল। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন আধুনিক সাহিত্যের অনুরাগী। তাই 'উত্তরা'-য় গল্প লিখেছেন জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশালতা দেবী, নরেন্দ্র দেব, রাধারানি দেবী, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, বনফুল, শক্তিপদ রাজগুরু, মাণিক ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ঘ. প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও স্মৃতিকথা :

'উত্তরা' পত্রিকার প্রবন্ধ বিভাগটি ছিল খুবই সমৃদ্ধ। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, গোপীনাথ কবিরাজ, বিনয়কুমার সরকার, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ফনিভূষণ অধিকারী, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। বঙ্গীয় সম্মেলনের অভিভাষণগুলিও 'উত্তরা'-য় মুদ্রিত হত। কাশী ও লখনউ সহ উত্তর ভারতের বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবৃন্দ, 'উত্তরা'-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে বেশ কিছু উচ্চ মানের প্রবন্ধ 'উত্তরা'-য় প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু কিছু ভ্রমণকাহিনিও 'উত্তরা'-য় প্রকাশিত হত।

ঙ. কবিতা :

'উত্তরা'-য় কবিতার প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং রবীন্দ্রানুসারী কবিতার সঙ্গে আধুনিক কবিদের রচনাও 'উত্তরা'-য় মুদ্রিত হত কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবীর সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রতিভা দেবীর কবিতাও মুদ্রিত হয়েছে। 'দরবেশ' ছদ্মনামে একজন কবির লেখাও পাওয়া যায়।

'উত্তরা'-র সম্পাদক মণ্ডলী বিশেষভাবে রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। 'রবীন্দ্র সংখ্যা' রূপে। 'উত্তরা'-য় পূর্বপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও পত্রাবলি সংখ্যাটিতে মুদ্রিত হয়েছিল।

'উত্তরা' পত্রিকাটি উত্তর ভারতের বাঙালি সম্প্রদায়ের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ধারক রূপেই প্রকাশিত হয়েছিল। সমকালীন ইতিহাস ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রতিও 'উত্তরা' উদাসীন ছিল না। সব মিলিয়ে প্রবাসী বাঙালির মননশীলতা, এবং লোকায়ত অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণের এক সুন্দর দর্পণ হয়ে উঠেছিল 'উত্তরা'। শেষ পর্যন্ত সুরেশচন্দ্র শারীরিক প্রতিকূলতায় এবং আর্থিক সংকটের জন্য পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু সাময়িক পত্রের ইতিহাসে প্রবাসী বাঙালির শিল্প, সাহিত্য এবং জ্ঞান চর্চার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে আছে 'উত্তরা'। সেই সঙ্গে বাংলার সাহিত্যচর্চার সঙ্গেও তার সংযোগ ছিল। পত্রিকাটি যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই।

৮.৭ 'কালি-কলম' ১৩৩৩-১৩৩৬ (১৯২৬-১৯৩০)

ক. পত্রিকা প্রকাশ ও অন্যান্য তথ্য :

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দলকে আবির্ভূত 'কল্লোল' (১৯২৩-১৯৩০) পত্রিকা দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী নতুন ধারার সাহিত্য-প্রবণতাকে প্রতিষ্ঠিত করে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—'কালি-কলম' পত্রিকাকে তারই একটি সম্প্রসারিত

রূপ বলা যায়। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের কারও কারও মধ্যে বিভিন্ন কারণে কিছু মতভেদ দেখা দিলে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মিলে অন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবেন, সেই পত্রিকাই 'কালি-কলম'। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৩ (১৯২৬) বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। এটি ছিল মাসিক সাহিত্য-পত্র। প্রথম বছরে সম্পাদক ছিলেন তিনজন—মুরলীধর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু প্রথম বছরের পর প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং দ্বিতীয় বছরের পর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও সম্পাদনার কাজ থেকে সরে আসেন। তারপর থেকে একা মুরলীধর বসুই সম্পাদক ছিলেন চার বছর স্থায়ী পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা (মাঘ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত। সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা 'বরদা এজেন্সী'-র মালিক শিশিরকুমার নিয়োগী এই পত্রিকার প্রকাশক ও কর্মসচিব ছিলেন। 'বরদা এজেন্সী'-র অর্থানুকূল্য পাওয়া যাবে—এই প্রত্যাশা ও 'কালি-কলম' গোষ্ঠীকে নতুন পত্রিকা প্রতিষ্ঠায় কিছুটা প্ররোচিত করেছিল। যদিও সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি।

পত্রিকাটি অ্যান্টিক কাগজে ডবল ক্রাউন সাইজ-এ ছাপা হত, দাম ছিল প্রতি সংখ্যা চার আনা। পত্রিকাটি ছিল সচিত্র। বিভিন্ন লেখক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আলোকচিত্র মুদ্রিত হত তাঁদের স্বাক্ষর সহ। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ। তাছাড়া চারুচন্দ্র রায়, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেবীপ্রসাদ রায়, সারদাচরণ উকিল প্রমুখের আঁকা ছবি ছাপা হত প্রধানত এক রঙে।

বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটিতে সংযোজিত হয়েছে বিভিন্ন বিভাগ। 'সংগ্রহ' বিভাগে বিদেশি রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হত। প্রথম সংখ্যায় এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল ম্যাক্সিম গোর্কির 'In the World'-এর অংশবিশেষের অনুবাদ ও সুবোধ রায় কৃত ন্যুট হামসুন-রে 'ম্যাক্সিম গোর্কি'।

যোহান বোয়ার-এর The Great Hunger-এর অনুবাদও এখানে বের হয়। প্রথম বছরের পর এটি বন্ধ হয়। 'চয়নিকা' বিভাগে সমকালের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকা থেকে প্রবন্ধ, আলোচনা, রসরচনা ইত্যাদি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'চিত্র' বিভাগে এক একটি ভাব নিয়ে লেখারম্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' বিভাগে থাকত সাহিত্য আলোচনা। মাসিক সাহিত্য বিভাগে থাকত সমকালের পত্রিকার সমালোচনা। 'বিচিত্র' বিভাগে সমকালীন ঘটনাবলির আলোচনা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হত। 'আর্টের আটচালা' বিভাগটি শুরু হয় ১৩৩৪ থেকে। সম্পাদক মুরলীধর বসু, বিরুপাক্ষ শর্মা ছদ্মনামে এখানে সেই সময়ের সাহিত্যের আলোচনা করতেন।

খ. উদ্দেশ্য :

উদ্দেশ্যের দিক থেকে 'কালি-কলম' পত্রিকার প্রবণতা এবং অভিপ্রায় এবং 'কল্লোল' পত্রিকার থেকে পৃথক ছিল না। যেভাবে 'কল্লোল'-এ তৎকালীন আধুনিক রুচি অনুসারে কিছুটা সমাজমনস্কতা, মনস্তত্ত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীকে নিয়ে আসবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল—'কালি-কলম'—এও ছিল তাই। উপরন্তু যৌনতা বিষয়টি এই পত্রিকায় স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল বলে অশ্লীলতার অভিযোগ মাঝে মাঝেই উঠত। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের পত্রাকারে লেখা এক সাহিত্য আলোচনায় লেখক পত্রিকার নীতি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"শয়তানের নিন্দা করব না, ভগবানের প্রশংসাও না। আমরা আমাদের নব উন্মীলিত দৃষ্টি দিয়ে জীবনের যাত্রা দেখব, আর বলে যাব।"

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'কালি-কলম' পত্রিকায় প্রচুর ছোটো গল্প প্রকাশিত হয়েছে। কঠিন বাস্তব ও মনস্তত্ত্বের সম্মিলনে সমকালের পক্ষে যথেষ্ট ও মনস্তত্ত্বের সম্মিলনে সমকালের পক্ষে যথেষ্ট সাহসী এবং আধুনিক ছোটো গল্প প্রকাশিত হয়েছে

এই পত্রিকায়—যার কোনো কোনোটি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীত্ব অর্জন করেছে। এগুলির মধ্যে আছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'জোহানের বিহা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'ভবিষ্যতের ভার', 'সায়েব বিবি গোলাম', 'নীপুদা'। জগদীশ গুপ্তের একুশটি গল্প প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। জগদীশ গুপ্তকে প্রতিষ্ঠা দেবার মঞ্চ হিসেবে 'কালি-কলম' উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়াও নিয়মিত গল্প লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পরশুরাম, প্রবোধকুমার সান্যাল, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মুরলীধর বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিয়া চৌধুরী, সরোজকুমারী দেবী প্রমুখ লেখক-লেখিকা।

উপন্যাসের প্রকাশেও 'কালি-কলম' উল্লেখযোগ্য। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা' এবং নিরুপম গুপ্তের (মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের ছদ্মনাম) 'শ্রাবণ ঘন-গহন-মোহে' নামক গল্পের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ফলে দ্বিতীয় বছরের দুই সম্পাদক মুরলীধর বসু এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সেই সঙ্গে প্রকাশক শিশিরকুমার নিয়োগীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশ্য প্রমাণাভাবে তাঁরা ছাড়া পেয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'রূপের অভিশাপ' এবং আরও তিনটি ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়।

গ. প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনি, স্মৃতিকথা :

প্রবন্ধের বিভাগও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। বহু ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন লিখেছেন অরবিন্দ ঘোষ ও তেমনই লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী এবং অন্নদাশংকর রায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনই পেয়েছি মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের 'সাহিত্য পতিতা' নামের প্রবন্ধ। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'বাঙ্গলার তরুণ হামসুনদের প্রাণের কথা' নামের প্রবন্ধটি নবীন সাহিত্যিকদের সমর্থক একটি রচনা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ রায়, সুবোধ রায় প্রমুখ প্রাবন্ধিকদের নামের তালিকা থেকেই বোঝা যায় প্রবন্ধের উপর কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হত এই পত্রিকায়।

ঙ. কবিতা :

'কালি-কলম'-এর কবিতা বিভাগটিকেও ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই স্থান দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পুনর্মুদ্রণ অতুলপ্রসাদ সেনের গান, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতার মুদ্রণে যেমন প্রথানুসরণ ছিল তেমনই বিদ্রোহের মনোভাব ছিল কাজী নজরুল ইসালমের 'মাধবী-প্রলাপ', মোহিতলাল মজুমদারের 'নাগার্জুন' কবিতার প্রকাশে। দুটি কবিতাই অভিযুক্ত হয়েছিল অশ্লীলতার দায়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মানুষের মানে চাই' এবং আরও কিছু বিশিষ্ট কবিতা এখানে প্রকাশিত হয়। অন্নদাশঙ্কর রায়ও এখানে নিয়মিত কবিতা লিখতেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীবনানন্দ দাশের বারোটি কবিতার প্রকাশ। জীবনানন্দের প্রথম কবিতা-সংকলন 'ঝরা পালক', 'কালি-কলম' পর্বের মধ্যেই প্রকাশিত (১৯২৭)। নবীন কবির স্বতন্ত্র ধরনের কবিতাকে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের অনেকদিন আগেই গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছিলেন মুরলীধর বসু।

'কালি-কলম' পত্রিকা স্বল্পস্থায়ী হলেও প্রতিটি সংখ্যাই পাঠকদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলত। শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিতর্ক এবং নতুন খাদের লেখা প্রকাশের প্রয়াস নিয়ে পত্রিকাটি সব সময়েই কিছু না কিছু আলোড়ন জাগিয়েছে। গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস—এই তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যের রুচি পরিবর্তনের প্রধান পতাকাধারী হিসেবে 'কল্লোল' এবং 'কালি-কলম'-এর নাম একই সঙ্গে করতে হবে।

৮.৮ 'বিচিত্রা' (১৯২৭-১৯৩৯)

ক. প্রকাশ ও অন্যান্য তথ্য :

বাংলা সাহিত্যের একটি ঐশ্বর্যময় এবং অভিজাত রুচি সম্পন্ন পত্রিকা ছিল 'বিচিত্রা', প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ (১৯২৭) বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। সম্পাদক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সহকারী রূপে প্রথমে ছিলেন অমল হোম, কান্তিচন্দ্র ঘোষ এবং যতীনাথ ঘোষ। পরে অমল হোম চলে যান এবং আসেন সতীশচন্দ্র ঘটক। অন্যান্য অনেক পত্রিকার মতো 'বিচিত্রা'-র তেমন অর্থাভাব ছিল না। কারণ উপেন্দ্রনাথ বৈবাহিক যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী—তিনি আর্থিক দায়িত্ব বহন করতেন। কর্তৃপক্ষ এবং সম্পাদকের ইচ্ছা ছিল 'বিচিত্রা' হবে প্রথম শ্রেণির কাগজ। প্রকাশের পূর্বেই বহু পোস্টারে 'বিচিত্রা'-র বিজ্ঞাপন কলকাতায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ডবল ক্রাউন, আট পেজি একুশ ফর্মার কাগজ এবং পাঁচ ফর্মা বিজ্ঞাপন। প্রাকাশের আগে একটি 'জমি' বার করেছিলেন পত্রিকাগোষ্ঠীর সদস্যারা। বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে 'বিচিত্র'-র আগে কিংবা পরে আর কখনও পত্রিকা-জমি প্রকাশিত হয়নি। 'বিচিত্রা'-র প্রথম সংখ্যার বহুরঞ্জ প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন চিত্র-শিল্পী চারু রায়, দ্বিতীয় প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা ব্লক করে মুদ্রিত হয় তাঁর 'বিচিত্র' কবিতাটি। প্রথম সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল পৃথক প্রচ্ছদ সহ রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' কাব্য-নাটকটির ষাট পৃষ্ঠা ব্যাপী মুদ্রণ। সঙ্গে ছিল নন্দলাল বসুর অপরূপ অলঙ্করণ। গানগুলির স্বরলিপি করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বিচিত্রা' প্রথম থেকেই প্রবীণ ও নবীন সব লেখককেই সম্মান-মূল্য প্রদান করত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রথম গল্পের জন্যও যেমন টাকা দেওয়া হয়েছে তেমনই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত লেখককে সেকালের তুলনায় যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হত। এজন্য রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই অন্য পত্রিকার জন্য লেখা শুরু হলেও শেষপর্যন্ত বেশি টাকা দিয়ে নিয়ে যেতেন 'বিচিত্রা'-র সম্পাদক। একটি উপন্যাসের জন্য দুই থেকে তিন হাজার টাকা দেবার কথা সেই সময় অন্য পত্রিকায় ভাবাই যেত না।

'বিচিত্রা' পত্রিকার নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল 'সহযোগী সাহিত্য'। 'সংকলন' বিভাগে ইংরেজি ও বাংলা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনার আলোচনা থাকত।

'বিবিধ সংগ্রহ' বিভাগে থাকত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত নানাধরনের আলোচনা। যেমন 'স্পার্টার অতীত', 'কাইজারের বাল্য ও আবাল্য', 'র‍্যাফেল ম্যাডোনার আদর্শ পাইয়াছিলেন কোথায়'? এগুলি লিখতেন হিরণকুমার সান্যাল, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ।

'সাহিত্য-শ্রুতি' বিভাগে থাকত দেশ-বিদেশের সাহিত্য জগতের খবর। পরে যুক্ত হয় 'বিতর্কিকা'। এখানে থাকত বাদ-প্রতিবাদমূলক লিখন।

'পুস্তকপরিচয়' বিভাগ ছিল গ্রন্থ সমালোচনার জন্য।

'বিচিত্রা' প্রথম থেকেই চিত্র ও অলংকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল। 'বিচিত্রাচিত্রশালা' বিভাগ থাকত এদেশের ও বিদেশের এক এক জন চিত্রশিল্পীর পরিচয়। তাঁর চিত্রাঙ্কনের ইতিহাস এবং চিত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি। এই বিভাগে ইউরোপীয় চিত্রকরদের সম্পর্কে ছোটো ছোটো প্রবন্ধ লিখতেন বিষ্ণু দে। সম্ভবত আধুনিক ইউরোপীয় ছবি নিয়ে বাংলায় আলোচনা এই প্রথম।

অলংকরণ, প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত এই পত্রিকায়। ছবি তো থাকতই, মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্রও প্রকাশ পেয়েছে। গান, গানের স্বরলিপি এবং সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধও নিয়মিত প্রকাশ পেত 'বিচিত্রা'-য়।

ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সমস্যা 'বিচিত্রা'-য় গুরুত্ব পেত না। তবে কোনো রকম অভিমতের প্রকাশেই সম্পাদকের দিক থেকে কোনো বাধা ছিল না। পত্রিকাটি চলেছিল বারো বছর।

খ. উদ্দেশ্য :

'বিচিত্রা' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী মননশীল এবং নান্দনিক বোধ সম্পন্ন পত্রিকার প্রকাশ। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সহ-সম্পাদক অমল হোম সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'-তে লিখেছিলেন—''বৈচিত্র্য অনেক সময়ে নিজের স্বরূপ সাধারণ পরিচ্ছদে ঢেকে রাখে। সূর্যি-রশ্মি সাধারণত শাদা, কিন্তু কাচ-কলমের মধ্যে প্রবেশ করলে তা একেবারে ভেঙেচুরে বার হয় বিচিত্র সপ্ত বর্ণে। মানুষের জীবন, যা এমনি অনেক সময়ে বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়, একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় তা বিবিধ রসসম্ভারে বিচিত্র। কল্পনা এবং বাস্তবের উভয় লোকে 'বিচিত্রা' কাচ-কলমের কাজ করলে তার অস্তিত্ব সার্থক হবে।....

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম সীমান্তরেখা আছে সাহিত্যিকের সতর্ক দৃষ্টি থেকে তা লুপ্ত হওয়া উচিত নয়।....সাহিত্য সাধনায় শক্তি ও সংযম সম্বন্ধে জাগ্রত অথচ উদার দৃষ্টি রাখতে পারলে 'বিচিত্রা'-র একটা অভিপ্রায় সফল হবে।''

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'স্মৃতিকথা'-তেও 'বিচিত্রা' সম্বন্ধে লিখেছেন—''আমার কল্পনার কাগজকে একান্তই যদি বাংলা দেশের প্রথম কাগজ করতে না পারি, অন্তত প্রথম শ্রেণির করতে হবেই।....

'বিচিত্রা'-কে করতে চেয়েছিলাম হিন্দু মুসলমান লেখকের চিন্তাপ্রেরণের এবং হিন্দু-মুসলমান পাঠকের চিন্তা গ্রহণের যন্ত্র, এবং সেই উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের মননশীলতার ক্ষেত্রে একটা সাংস্কৃতিক একতার বীজ উৎপন্ন করতে কতকটা সফলও হয়েছিলাম।''

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'বিচিত্রা' পত্রিকায় সাহিত্যের সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রকাশ করবার দিকে প্রথমাবধি লক্ষ্য ছিল সম্পাদকের। 'বিচিত্রা'-য় একই সঙ্গে লিখতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সব বিভাগেই রবীন্দ্রনাথের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি 'তিন পুরুষ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল এখানে। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছিল 'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চ'। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথের ভাগিনেয়। 'শ্রীকান্ত (চতুর্থ পর্ব) এবং 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হয় এখানে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সুবিশাল পটভূমিতে পরিকল্পিত ছয় খণ্ডের উপন্যাস 'সত্যাসত্য' প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' প্রকাশ করে সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব অর্জন করেছিল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে 'অভিজ্ঞান' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন যার প্রধান চরিত্রেরা ছিলেন মুসলমান। উপন্যাসটি বাংলার মুসলমানদের অভিনন্দন লাভ করেছেন।

বিভিন্ন ধরনের ছোটো গল্প—বিশেষ করে তরুণ লেখকদের গল্প নির্বাচনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সম্পাদক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের (জরাসন্ধ) প্রথম ছোটো গল্প এখানেই প্রকাশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসীমামী'-র পর 'নেকী', 'জন্মের ইতিহাস', 'ধাক্কা', ব্যথার পূজা' প্রভৃতি গল্প পর পর প্রকাশ করে তাঁকে এরকম প্রতিষ্ঠিতই করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ। এ ছাড়া নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, আশালতা দেবী, বিমল মিত্র জ্যোতির্ময়ী দেবী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার গল্প লিখেছেন এখানে। বিশেষ উল্লেখ্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প 'বাঁধাঘাট'-'বিচিত্রা'-তে মুদ্রিত হয়েছিল।

গ. প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও স্মৃতিকথা :

অতি উচ্চমানের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'বিচিত্রা'-য় বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ক মুদ্রণে আগ্রহী ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক অত্যন্ত মূল্যবান সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন নীহাররঞ্জন রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শান্তিদেব ঘোষ, দিলীপকুমার রায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার। ফিলাডেলফিয়া ও প্যারিসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন 'বিচিত্রা'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রবন্ধ ও নিবন্ধ জাতীয় রচনা লিখতেন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিলীপকুমার রায়, শিশির মিত্র, সুফী মোতাহার হোসেন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, হুমায়ুন কবির, জসীমউদ্দিন, মৌলভী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, এম. আবদুল আলী, মোহাম্মদ এনামুল হক, এম. এ. ওয়াহিদ প্রমুখ বহু লেখক। প্রমথ চৌধুরী এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও প্রবন্ধ লিখতেন।

'বিচিত্রা'-য় প্রকাশিত অনেকগুলি ভ্রমণ কথাই বাংলা সাহিত্যে স্মরণযোগ্য। তাদের মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের 'পারস্যভ্রমণ' এবং 'জাভা যাত্রীর পথ'। সেই সঙ্গে আছে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম আকর্ষক রচনা 'পথে-প্রবাসে'। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 'ইন্দ্রোচীন ভ্রমণ' এবং সতীনাথ ঘোষের আরব ভ্রমণকথা ও প্রকাশিত হয়েছে এখানে। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু চিঠিও 'বিচিত্রা'-য় প্রকাশিত হয়েছিল।

ঙ. কবিতা :

কবিতার ক্ষেত্রে 'বিচিত্রা' সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলবার থাকে না। এই পত্রিকার প্রধানতম কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা 'বসন্ত আবাহন'। প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশিত হত তাঁর কবিতা ও গান। অন্যান্য কবিতা যা প্রকাশিত হত, তাতে নৈপুণ্য ছিল; স্বাতন্ত্র্য ছিল না। তবে উল্লেখযোগ্য কান্তিচন্দ্র ঘোষের ওমর খৈয়াম-এর 'রুবাইয়াৎ' শীর্ষক কবিতাগুলির অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ডা. বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্ব-চিত্রিত ব্যঙ্গ কবিতা 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' মুদ্রিত হয় 'বিচিত্রা'-তেই।

চ. চিত্রকলা :

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাময়িক পত্রগুলিতে চিত্রকলা সম্পর্কে সাধারণভাবে আগ্রহই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছবি সম্পর্কে ছিল মননশীল সচেতনতা। তারই অঙ্গ হিসেবে সুচিন্তিতভাবে নির্বাচিত ছবি মুদ্রিত হত 'বিচিত্রা'-য় যেমন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'ভোরের আলো', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'কুমারী'। আর একটি ছবি অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত 'নটরাজ লিখনরত রবীন্দ্রনাথ'। অনেক সময় প্রচ্ছদে 'বিচিত্রা' নামটির সঙ্গে থাকত চারুচন্দ্র রায়ের আঁকা সুন্দর সূক্ষ্ম আলপনা। তা ছাড়াও বহুভাবে রেখাচিত্র, অলংকরণ এবং ছবি 'বিচিত্রা' আমরা পেয়েছি।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'সম্পাদক হিসেবে রামানন্দ বাবুর পরেই তাঁর স্থান। লেখক তৈরি করে নেওয়ার রহস্য তিনি জানতেন।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলগ্নের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাজনিত পরিস্থিতিতে বন্ধ হয়ে গেলেও সকল গোষ্ঠীর আর বিচিত্র মেজাজের লেখকদের সমন্বয় ঘটিয়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকা সমুন্নত শিল্পরুচির যে অসামান্য দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন তার তুলনা বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে কমই আছে।

৮.৯ ‘প্রগতি’ ১৩৩৪-১৩৩৭ (১৯২৭-১৯৩০)

ক. প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্য :

‘প্রগতি’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৩৩৪ (১৯২৭) বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। তাঁরা তখন বসবাস করতেন ঢাকার রমনা অঞ্চলে। প্রথমে প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগী কলেজ-ছাত্র বুদ্ধদেব বসু হাতে লেখা পত্রিকা হিসেবে ‘প্রগতি’ প্রকাশ করেন। পরে নিজের বৃত্তির টাকায় তিনি পত্রিকাটির মুদ্রিত রূপ দেন। পত্রিকাটি চলেছিল ১৩৩৭ (১৯৩০) বৈশাখ মাস পর্যন্ত। মুদ্রিত ‘প্রগতি’-র প্রচ্ছদে ছিল হলুদ রঙের উপর চিত্রিত সমুদ্র থেকে উত্থিত ঊর্ধ্বমুখী একটি নারীমুখ। ভিতরের পাতায় আর একটি ছোটো ছবি থাকত শ্মশ্রুশোভিত এক বৃদ্ধের মুখ। হাতে কলম। পটভূমিতে হেলে পড়া একটি জাহাজের রেখাচিত্র।

প্রথম বছর নিয়মিত প্রকাশিত হলেও আর্থিক সংগতির অভাবে পত্রিকাটি কিছু অনিয়মিত হয়।

‘প্রগতি’ পত্রিকার নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল ‘সওদা’। এখানে থাকত বিদেশি সাহিত্যিকদের কবিতা ও গল্পের অনুবাদ। আর একটি বিভাগ ছিল ‘মাসিকী’। সেই সময় কোনো কোনো পত্রিকার তরফ থেকে তরুণ লেখকদের বার বার অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হত। ‘মাসিকী’-তে সাহিত্য সমালোচনা থাকত এই তরুণ লেখকদের সমর্থনে। এছাড়া পত্রিকাটি গল্প কবিতা-প্রবন্ধের সংমিশ্রণে সমকালীন অন্যান্য পত্রিকার মতোই ছিল।

খ. উদ্দেশ্য :

‘প্রগতি’ পত্রিকার উদ্দেশ্য বুঝতে গেলে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর তরুণ বয়সের মনটিকে বুঝতে হবে। তিনি ছিলেন মহাযুদ্ধ-উত্তর আধুনিক সাহিত্যের অনুরাগী এবং পক্ষপাতী। বাংলা সাহিত্যেও সেই আধুনিকতার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। ‘প্রগতি’-র প্রথম সংখ্যাতেই বলা হয়েছিল দুটি কথা—প্রথমত, ব্যক্তির উপর সমাজের অনুশাসন বা সামাজিক প্রত্যাশাকে বড়ো করে না দেখে ব্যক্তির যুক্তি এবং স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেওয়া। সামাজিক বিধান এবং বিচারের পরিবর্তে মানুষের অসংকোচ প্রবৃত্তিকে মূল্য দিতে চাওয়া হয়েছিল এখানে। বিধি-শাসিত সমাজের বিদ্রোহে ছিল তার বিদ্রোহ—‘‘এই বিদ্রোহকে সহস্রের নিষ্পেষণের নাগপাশ থেকে ব্যক্তির মুক্তির এই প্রচেষ্টাকে আমরা গ্রহণ করেছি। তাই আমাদের মুখপত্রের নাম ‘প্রগতি’।’’

দ্বিতীয়ত, ‘প্রগতি’ পত্রিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল যে ‘প্রগতি’ গোষ্ঠী চায় বিশ্বের শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে বাংলার যোগ স্থাপন করতে। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিমের সংস্কৃতিকে যুক্ত করতে হবে না। না হলে জাতি হিসেবে বাঙালি বড়ো হতে পারবে না। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল—‘‘সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথাটাই খাটে। পাশ্চাত্য আর্ট ও সাহিত্যের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা না জন্মাতে পারলে আমাদের সাহিত্যের কখনও পূর্ণ বিকাশ হতে পারবে না।’’’

এক বছর পরে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ‘প্রগতি’-র ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল—‘‘অধুনা বাংলা একটি পরম বিস্ময়কর ও অভিনব movement শুরু হয়েছে। একথা আমরা বিশ্বাস করি এবং সেই নবরসের আস্বাদ বাঙলার প্রত্যেক শিক্ষিত সন্তানকে গ্রহণ করাবার ভার ‘প্রগতি’ নিয়েছে। নানা রূপ ন্যাকামিতে আচ্ছন্ন এ দেশে এখনো যদি এমন কেউ থাকেন, যিনি স্বদেশোদ্ধার, সমাজ-সংরক্ষণ, ধর্মান্ধতা বা অন্য কোনো অনুরূপ বাই বিসর্জন দিয়ে সাহিত্যকে কেবল সাহিত্য হিসাবেই দেখতে পারেন এবং শুধু তাঁকে আমরা নির্ভয়ে জোর করে বলতে পারি যে ‘প্রগতি’-র আদর্শের সঙ্গে তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়েই পারবেন না।’’

গ. কথাসাহিত্য এবং নাটক :

প্রতিভাবান তরুণ সাহিত্যিকেরা গল্প লিখেছিলেন 'প্রগতি'-তে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র গুপ্ত, বালারানি গুহ প্রমুখ লেখকদের ছোটোগল্পে যথাক্রমে মানুষদের দারিদ্র ও ক্ষুধা, গণিকাদের জীবন ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসু নিজে লিখতেন মনস্তত্ত্ব-প্রধান, প্রবৃত্তির কুণ্ঠাহীন অভিব্যক্তির গল্প। শ্যামল রায় ছদ্মনামে বিষ্ণু দে আধুনিক মননশীল রীতির কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন অনেকটা ধূর্জটিপ্রসাদের অনুরূপ শৈলীতে।

উপন্যাসের দিক থেকে অবশ্য 'প্রগতি'-তে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকাশিত হয়নি। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্র'-তে যেমন করেছিলেন তেমনই চার জন লেখক চার কিস্তিতে একটি সম্মিলিত উপন্যাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন 'প্রগতি'-তে। উপন্যাসটির নাম ছিল 'চৌরঙ্গী', প্রথম খণ্ডটি লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থাকায় অনেক বিদেশি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রগতি'-তে। যেমন নুট বামসুন, চেখফ, মোপাসাঁ।

ঘ. প্রবন্ধ স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনি :

যে পত্রিকায় বিশেষভাবে একটি সাহিত্য-নীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছিল তাতে সেই নীতির পক্ষে প্রবন্ধ থাকা স্বাভাাবিক। 'প্রগতি' তেও তা ছিল। নিয়মিত প্রকাশিত হত বিদেশি সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা। লুইজি পিরানদেল্লাকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন প্রভু গুহঠাকুরতা। বিভিন্ন প্রবেন্ধে বার বার রুশ সাহিত্য, ফরাসি সাহিত্য, জাপানি নাটক ইত্যাদি প্রসঙ্গত আসত। এভাবেই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের বাঙালি পাঠকদের যোগ স্থাপিত হয়েছিল 'প্রগতি'-তে। বুদ্ধদেব বসু 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে যুবনাশ্বের (মণীশ ঘটক) 'ভুখা ভগবান' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্প দুটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন— ''জীবনের যে দিকটা অসুন্দর ও অপ্রিয় ভাগ্যবিধাতার এমনি পরিহাস যে তারই সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যিকদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। চোখের উপর তাঁরা দেখলেন নগ্ন বীভৎসতা, মনের হীনতা আর উপবাসী লালসার লোলুপতা—তাই তাঁদের অভিজ্ঞতার পরিব্যাপ্তি পূর্বতন লেখকদের চাইতে বেশি।'' এই প্রবন্ধটি জনপ্রিয় হয়েছিল এবং পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল 'কল্লোল'-এ।

ঙ. কবিতা :

'প্রগতি'র কবিতা বিভাগ ছিল খুবই সমৃদ্ধ। জীবনানন্দকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছিল এই পত্রিকা। তাঁর বেশ কিছু কবিতার মধ্যে ছিল সুপরিচিত 'পিপাসার গান', 'বোধ' এবং 'অবসরের গান'। জীবনানন্দের কবিতার সপ্রশংস সমালোচনাও লিখেছিলেন বুদ্ধদেব। দুই সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু এবং অজিতকুমার দত্তের বহু কবিতা প্রকাশিত হয়, মুদ্রিত হয় বুদ্ধদেবের 'বন্দির বন্দনা' সংকলনের এবং অজিতকুমার দত্তের 'কুসুমের মাস' সংকলনের অধিকাংশ কবিতা। এছাড়াও বিষ্ণু দে এবং মণীশ ঘটকের আধুনিক ধরনের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, হেমচন্দ্র বাগচী, পরিমল রায়ের কবিতাও প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটি ছিল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা।

বেশ কিছু অনুবাদ-কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। মণীশ ঘটক অনেক ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। জাপানি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত।

'প্রগতি' পত্রিকাটিকে ঠিক এককভাবে দেখলে পত্রিকাটিকে বোঝা যাবে না। 'কল্লোল', 'কালি-কলম' এবং 'প্রগতি'—এই তিনটি পত্রিকা মিলে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যের একটি বৃত্ত গড়ে তুলেছিল যাদের সঙ্গে রক্ষণশীল 'শনিবারের চিঠি' এবং আরও কয়েকটি পত্রিকার বিরোধ হয়ে উঠেছিল তীব্র। সাহিত্যে আধুনিকতা, শরীর

বর্ণনা, অবদমিত কামনাগুলির প্রকাশ, প্রবৃত্তিতাড়িত মানসিকতার রূপায়ণ কতটা দেখানো যেতে পারে তাই নিয়ে ওই সময়টিতে বিভিন্ন পত্রিকায় ('প্রগতি', 'কল্লোল', 'শনিবারের চিঠি', 'উত্তরা', 'বিচিত্রা') উত্তপ্ত বাদানুবাদ চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেও কখনও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন এই বৃত্তের তরুণ সাহিত্যিকেরা। এর মধ্যে থেকেই 'প্রগতি'-র যথার্থ গুরুত্ব স্বপ্রকাশ হয়। বাংলা সাহিত্যকে নতুন পথে প্রবাহিত করবার শক্তি এই লেখকেরা দেখিয়েছিলেন এবং অনেকটাই সফল হয়েছিলেন।

সর্বাধিক আক্রমণাত্মক ছিল 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা। সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে 'প্রগতি' যে জবাব দিয়েছিল সেখানেই উদ্‌ভাসিত হয় 'প্রগতি' পত্রিকার স্বকীয়তা। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পত্রিকার পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছিল রক্ষণশীলদের আক্রমণের জবাব—"'প্রগতি' যে সবাইকে খুশী করতে পারেনি, এ প্রমাণ আমরা পেয়েছি এবং পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। কারণ এতে এই জিনিসটি প্রতিভাত হয়েছে, যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য অন্ততঃ আংশিকরূপে সফল হয়েছে। আমাদের কপাল গুণে আজকাল বাংলাদেশের অবস্থা যা হয়েছে তা হল এই যে,—যে কেউ রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার নিখুঁত অনুকরণ করতে পেরেছে বা দুখানা ফ্রেঞ্চ নভেল পড়েছে সেই নিজেকে সাহিত্য সমালোচনার অধিকারী বিবেচনা করে গায়ে পড়ে দু-চার কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না। বাংলাদেশের এই সব যেদো, মেধো, বোকা এবং ন্যাকারা 'প্রগতি' পড়ে বাহবা দেবে—এই লাঞ্ছনা যেন আমাদের না ঘটে। একথা জানি যে, সংখ্যায় এরাই বেশি...তবু একথা বলতে বাধবে না যে 'প্রগতি' তাদের জন্য নয়।"

৮.১০ 'পরিচয়' (১৯৩১-)

ক. প্রকাশকাল এবং অন্যান্য তথ্য :

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে চিন্তন-মনন প্রধান পত্রিকার যে পরম্পরা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা থেকে সূচিত হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় আমরা পেয়েছিলাম প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' (১৯১৪) এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৮ (১৯৩১) বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে, কলকাতা থেকে। এই পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিলেন কলকাতার বিদ্বৎ-সমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, দর্শনবিদ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। টি. এস. এলিয়ট সম্পাদিত 'ক্রাইটেরিয়ন' (Criterion) নামক প্রবন্ধ পত্রিকার আদর্শে 'পরিচয়' কিছুটা পরিকল্পিত হয়েছিল। তিনি নিজেও ছিলেন সুপণ্ডিত এবং অভিজাত রুচির মানুষ। পত্রিকাটির আর্থিক দায়িত্ব হীরেন্দ্রনাথ দত্তই বহন করতেন। পত্রিকাটি প্রথমে ছিল ত্রৈমাসিক; পাঁচ বছর পরে হয় মাসিক। বারো বছর পরে ১৩৫০ (১৯৪৩) বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস থেকে পত্রিকাটির স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়। প্রধানত বিভিন্ন পারিবারিক কারণে এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পর কিছুটা আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করবার মানুষের অভাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সরে আসেন। তারপর 'পরিচয়' দীর্ঘকাল যাবৎ ভিন্ন গোষ্ঠীগত পরিচালনায় এখনও সজীব আছে। কিন্তু আমরা প্রধানত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' নিয়েই আলোচনা করব।

প্রথম প্রকাশকালে পত্রিকাটির আকার ছিল ডাবল ক্রাউন এবং দাম ছিল এক টাকা। সেকালের পক্ষে দাম একটু বেশি। কিন্তু কাগজ এবং মুদ্রণ ছিল একবারে প্রথম শ্রেণির। এই পত্রিকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল 'পুস্তকপরিচয়' অংশটি। সুপরিসর প্রবন্ধের আকারে অর্থাৎ রিভিউ আর্টিকল রূপে গ্রন্থসমালোচনার রীতি 'বঙ্গদর্শন'-এর পর 'পরিচয়' পত্রিকাতেই দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের সঙ্গে সমালোচিত পুস্তকের মধ্যে বেশি গুরুত্ব পেত পাশ্চাত্য গ্রন্থ। সেখানেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অত্যন্ত উচ্চমানের চিন্তন-মনন প্রধান পাশ্চাত্য গ্রন্থ নির্বাচন করতেন।

আর একটি নিয়মিত বিভাগ ছিল 'পাঠকগোষ্ঠী'। এ বিভাগে প্রকাশিত হত পাঠকদের চিঠি।

খ. উদ্দেশ্য :

'পরিচয়' পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল—''আজ মানুষের প্রধান কাজ ভাষা-সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগ যুগ সঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন-পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ হিংসা ও অবজ্ঞাকে সংকীর্ণচিত্ততার রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ।

বাংলাদেশে 'পরিচয়' আজ এই ভারই লইতে চাহে। তার উদ্দেশ্য প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালি পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মূল ভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া; কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলানুগ মন্তব্য করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদা জাগ্রত রাখিবে। কবিতা, কথাশিল্প, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব—পরিশীলনের সকল বিভাগগুলি যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, এবিষয়ে 'পরিচয়' সাধ্যমতো চেষ্টা করিবে।'' অর্থাৎ 'পরিচয়' চেয়েছিল মানুষের সভ্যতার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিসমূহকে বাঙালি পাঠকের চেতনায় প্রবাহিত করে দিতে। শিক্ষিত বাঙালির মনকে মুক্ত করতে চেয়েছিল গোষ্ঠীবদ্ধতা, গ্রাম্যতা, স্বল্প জানার আত্মসন্তোষ এবং একান্ত নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে।

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কথাসাহিত্যের নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। যে লেখা একেবারে নতুন ধরনের নয় তা তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন না। রীতির দিক থেকে বিশেষভাবে বুদ্ধিদীপ্ত, তৎকালীন সর্বাধিক কথনশৈলীর দিকে তাঁর নজর ছিল। এজন্য 'পরিচয়' পত্রিকার নাম করলেই যে উপন্যাসটির কথা প্রথম মনে হয় সেটি হল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা'। চেতনাপ্রবাহ রীতির অভিনবত্ব যা ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রথম দেখা দিয়েছিল ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে, তার প্রথম বাংলা অনুসৃতি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'অন্তঃশীলা'-তে পাওয়া যায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এটি একটি মাইল-ফলক।

সম্পাদকের উদ্দেশ্য কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যখন দেখি মার্সেল প্রুস্ত্-এর উপন্যাস থেকে কিছুটা অংশ বিষ্ণু দে অনুবাদ করেছেন 'বিচ্ছেদ' নামে।

প্রমথ চৌধুরীর ছোটো গল্প স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রিত হয়েছে এখানে। 'নীললোহিতের স্বয়ংবর'-এর নাম করা যায়। এছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প।

ঘ. প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনি, স্মৃতিকথা :

'পরিচয়' পত্রিকার প্রধান অভিমুখীনতাই ছিল প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ-সমালোচনার দিকে। প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ-সূচি দেখলেই তা বোঝা যায়। প্রকাশিত হয়েছিল হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ', প্রবোধচন্দ্র বাগচী রচিত 'বৌদ্ধধর্মের দান', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যের মুক্তি', সুশোভন সরকারের 'রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা', সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'বিজ্ঞানের সঙ্কট', সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'শিল্পীর ব্যথা', হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'হিন্দুস্থানী ও বাংলা গান'। এই লেখকেরা নিয়মিত প্রবন্ধ লিখেছেন 'পরিচয়'-এ। সেই সঙ্গে আরও লিখেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিষ্ণু দে, শ্যামাপদ চক্রবর্তী। এই পত্রিকার উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আধুনিক কাব্য'(প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা) এবং 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' (প্রথম বর্ষ; তৃতীয় সংখ্যা)।

গ্রন্থ পরিচয় বিভাগটিকেও প্রবন্ধ বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এখানেও আমরা নমুনা হিসেবে প্রথম বর্ষের প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে সামনে রাখছি। প্রথম সংখ্যার গ্রন্থের মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি',

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে', বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দির বন্দনা', যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থের 'অদ্বৈতসিদ্ধি'। বিদেশি লেখকদের মধ্যে আঁদ্রে মালবো, আঁদ্রে জিদ, আঁদ্রে মরোয়া, আঁরি ফোকনিয়ে লিওনার্ড ফ্রাঙ্ক, রবার্ট গ্রেভ্‌স্ প্রমুখ লেখকদের সাম্প্রতিকতম লেখা। মূল জার্মান গ্রন্থের আলোচনা করেছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু। মূল ফরাসি বই সমালোচনা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। দ্বিতীয় সংখ্যার বিশেষ উল্লেখ্য বাংলা গ্রন্থ সমালোচনা ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা জগদীশ গুপ্তের 'লঘু-গুরু' উপন্যাস।

বাংলা বইয়ের আলোচনা থাকলেও পাশ্চাত্য গ্রন্থের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি ছিল 'পরিচয়' পত্রিকার। কেবল সাহিত্য নয়, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জীববিদ্যা এবং বিজ্ঞানের বইয়েরও আলোচনা করা হত। আর কোনো ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রে যোগ্য জনের দ্বারা এত উৎকৃষ্ট সমালোচনা একত্রে মুদ্রিত হয়নি।

ঙ. কবিতা :

বহু উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হয়েছে 'পরিচয়' পত্রিকায়। বিশেষভাবে তিরিশের দশকের কবিদের লেখাই মুদ্রিত হত। লিখতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধীরকুমার চৌধুরী। জীবনানন্দের কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বজ ধারার অনুসৃতিও ছিল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং জসীম উদ্দীনের কবিতায়।

এককথায় বলা যেতে পারে 'পরিচয়'-কে ঘিরে সুধীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল অত্যন্ত বিদগ্ধ এক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা বিশ্ব সংস্কৃতির নির্যাসকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করবার সংকল্পের মধ্যে দিয়ে মাতৃভাষার সেবা করেছিলেন।

বারো বছর সম্পাদনা করবার পর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পত্রিকার দায়িত্বভার হস্তান্তরিত করেন তাঁর সাম্যবাদে বিশ্বাসী বন্ধুবর্গের কাছে। তখন পত্রিকাটির সম্পাদক হয়েছিলেন হিরণকুমার সান্যাল। 'পরিচয়' পত্রিকা তারপরেও একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ছিল। কিন্তু মতামতের দিক থেকে তা বহু মতের সমাবেশের পরিবর্তে একমুখীন চিন্তাবিশিষ্ট দলীয় মুখপত্রের চেহারা নেয়।

৮.১১ 'কবিতা' (১৯৩৫-১৯৬৫)

ক. প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্য :

কবিতার প্রতি, বিশেষ করে আধুনিক কবিতার প্রতি বুদ্ধদেব বসুর গভীর ভালোবাসা থেকেই ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার জন্ম। বুদ্ধদেব বসু তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন একদা 'পরিচয়'-এর বৈঠকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে ইট রঙের মলাট বিশিষ্ট একটি ইংরেজি কবিতা-পত্রিকা দেখে তাঁর মনে অনুরূপ একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছে জাগে। যেখানে থাকবে কেবল কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক আলোচনা। উক্ত পত্রিকাটি ছিল আমেরিকীয় কবি হ্যারিয়েট মনরো সম্পাদিত সুবিখ্যাত-সাময়িকী 'পোয়েট্রি' (আমাদের কবিতা ভবন' শারদীয় দেশ, ১৩৮১, পৃ. ১৪-১৫)।

এরপরে বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার পরিকল্পনা করেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালের ১ অক্টোবর (আশ্বিন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। ডিমাই আকারের পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক। প্রথম দু বছর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহকারী সম্পাদক ছিলেন সেই সময়ের তরুণ কবি সমর সেন। দ্বিতীয় বছরের পর প্রেমেন্দ্র মিত্র সরে আসেন এবং যুগ্ম সম্পাদক হন বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন। তৃতীয় বছরের শেষে সমর সেন ও সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ) পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এককভাবে বুদ্ধদেব বসু। 'কবিতা' প্রকাশিত হত বুদ্ধদেব বসুর বাসভবন ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে, প্রকাশনা-সংস্থাটির নাম তিনি রেখেছিলেন 'কবিতা ভবন'।

কবিতা পত্রিকার প্রচ্ছদ-চিত্র মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে কিউবিক ছাঁদে বড়ো হরফে হলুদ রঙে পত্রিকার নাম লেখা ছিল।

কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাড়া এই কবিতায় অন্য কোনো বিভাগ ছিল না। কেবল 'শোকবার্তা' নামক একটি বিভাগে দেশ-বিদেশের গুণী মানুষদের প্রয়াণ উপলক্ষে তাঁদের প্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সযত্ন বিশ্লেষণ থাকত। এই বিভাগের প্রধান লেখক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। এছাড়া বিভাগ হিসেবে বিজ্ঞাপিত না হলেও প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই থাকত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক সমালোচনা এবং তরুণ আধুনিক কবিদের সম্পর্কে কোনো না কোনো নিবন্ধ। প্রথম দিকে বিজ্ঞাপন থাকত না। পরে কিছু কিছু শোভন ভাষায় রচিত বিজ্ঞাপন স্থান পেয়েছে।

'কবিতা' পত্রিকাটিকে নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করতেন বুদ্ধদেব বসু। প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'রবীন্দ্র সংখ্যা'—যা প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই ১৯৪১ সালের মে মাসে, রবীন্দ্রনাথের আশি বছরের জন্মদিন উপলক্ষে। এছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে স্মৃতিসংখ্যা; জীবনানন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে প্রকাশিত স্মৃতিসংখ্যার নাম করা যায়। 'কবিতা'-র শততম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সংখ্যা বা 'International English Language number'।

খ. উদ্দেশ্য :

'কবিতা' পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'আমাদের কবিতা ভবন' রচনাটিতে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—'...বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা কাজটি হয়ে উঠেছে শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের উপায় নয়, রীতিমতো একটি 'আন্দোলন' যার মুখপত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছে 'কবিতা' পত্রিকা।...লগ্ন ছিল অনুকূল ও পত্রিকাটি ভাগ্যবান।...মোটের উপর আমি ঠিক ঠিক ঘোড়াগুলিকেই ধরেছিলাম।' (পৃ. ১৬)।

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বা দ্বিতীয় সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো ঘোষণা ছিল না। কিন্তু ভিন্ন সূত্রে আমরা পত্রিকার উদ্দেশ্য বিষয়ে দুই সম্পাদকের স্বাক্ষরিত একটি লেখা পেয়ে যাই। 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৪২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় 'নানা কথা' বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাক্ষরিত একটি চিঠি। সেই চিঠির কিছু অংশ লক্ষণীয়—"...অন্নিবাস মাসিকপত্রের পাঁচ মেশালি ভিড়ের মধ্যে সত্যিকারের ভালো কবিতারও কেমন একটা বাজে বা তুচ্ছ চেহারা যেন হয়ে যায়। কবিতাকে যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে ছেপে থাকে এমন সাময়িক পত্র বর্তমানে দেশে বেশি নেই।...এই কারণে আমরা একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্র বার করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার নাম হবে কবিতা এবং তাতে থাকবে শুধু কবিতা। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিরা এতে তাঁদের রচনা প্রকাশ করবেন। নবীন কবির ভালো কবিতাও যতটা পাওয়া যায় প্রকাশিত হবে।"

বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার আদর্শ বিষয়ে আশ্চর্য রকম স্থিরলক্ষ্য ছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকার বিংশ বর্ষের (আশ্বিন ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) সম্পাদকীয় রচনা 'কবিতার কুড়ি বছর'-এর এক অংশে তিনি লিখেছিলেন—"আদর্শ কথাটা বড্ড কড়া, আটোসাঁটো গম্ভীর, কবিতা বের করার সময় বা পরবর্তীকালে আমাদের সামনে কোনো স্পষ্ট আদর্শ ছিল, একথা বললে অতিরঞ্জিত হবে। যেটা ছিল সেটা মনের একটা ইচ্ছামাত্র, খুব বড়ো কোনো ইচ্ছেও নয়,—কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন আর নিভৃত একটু স্থান করে দেবো, যাতে তাকে ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসের পদপ্রান্তে বসতে না হয়, কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে না। রংবেরঙের পসরার মধ্যে—অনেক বেশি জোরওলা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে—যাতে তারই জন্য নির্দিষ্ট খেয়ায় স্বধর্মীর সঙ্গে সসম্মানে সে পৌঁছতে পারে স্বল্প সংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে—এইটুকুমাত্র ইচ্ছে করেছিলাম।"

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'কবিতা' পত্রিকায় কথাসাহিত্য নিয়ে কখনই আগ্রহ প্রকাশ করা হয়নি। কবিতার পত্রিকা এবং কবিদের পত্রিকা—এই ছিল 'কবিতা' পত্রিকার পরিচয়।

ঘ. প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, স্মৃতিকথা :

'কবিতা' পত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ, সমালোচনা-প্রবন্ধ এবং বেশ কিছু পত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি সবই কবিতাবিষয়ক আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে আলোচনা থাকত প্রায় প্রতি সংখ্যায়। প্রকাশিত হয়েছিল 'বীথিকা' সংকলনের আলোচনা (পৌষ ১৩৪২)। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত কবিতা-সংকলন 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এর বুদ্ধদেব বসু কৃত দীর্ঘ বিরূপ সমালোচনাটিও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

'কবিতা' পত্রিকার বিশেষ প্রবন্ধ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। রবীন্দ্রনাথ সহ কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন আট জন কবি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জীবনানন্দ দাস, অজিত দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছদ্মনাম) এবং হুমায়ুন কবির। আরও প্রবন্ধ লিখেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হ্যামফ্রি হাউস।

অষ্টম বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'কবিতা' (আষাঢ় ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) পরিকল্পিত হয়েছিলেন সমালোচনা সংখ্যা হিসেবে। এখানেই সমালোচনা বিষয়ক আলোচনা লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী ('সমালোচনার জল্পনা')। প্রকাশিত হয়েছিল অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, আবু সয়ীদ আইয়ুব ('আধুনিক কাব্যের সমস্যা') এবং বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ ('বাংলা ছন্দ ও মিল')। ছন্দ এবং কবিতার প্রকরণ নিয়ে অনেক মতামত প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা'-য়। কবিতার আলোচনা এবং সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসু সব ধরনের মতামতকেই যথাযোগ্য স্থান দিতেন।

ঙ. কবিতা :

কবিতা প্রকাশ করাই ছিল সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষভাবে বাংলা কাব্যধারার তিরিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিরা এই পত্রিকায় অবিরল কবিতা লিখেছেন। প্রথম পর্বের প্রধান কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, অজিতকুমার দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং বিষ্ণু দে। প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা। সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ কবির প্রথম পর্বের প্রধান আশ্রয় ছিল কবিতা।

এছাড়াও এই পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন—অবন্তী সান্যাল, অরুণ ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র বাগচী, কাজী নজরুল ইসলাম, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমল হোম, অশোক মিত্র, অসীম রায়, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, আল মাহমুদ, আহসান হাবিব, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি, প্রতিভা বসু, নরেশ গুহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তিনশো পঁয়তাল্লিশ জন কবি। 'কবিতা' পত্রিকার জীবৎকালে এই পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হওয়া তরুণ কবিদের কাছে শ্লাঘাস্বরূপ বিবেচিত হত।

বিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে বাংলা কবিতা যখন বিশেষভাবে গতিপথের পরিবর্তনের একটি বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছিল; প্রবাহিত হতে চলেছিল নতুন নতুন পথে; দেখা দিয়েছিল আধুনিক বোধের বিচিত্র নবীন উন্মেষ—সেই সময়ে এই পর্বান্তরের স্বাক্ষর এবং নব তরঙ্গের অভিঘাত সর্বাধিক প্রযত্নে ধারণ করেছিল 'কবিতা' পত্রিকা।

৮.১২ ‘চতুষ্কোণ’ (১৯৪৮-)

ক. প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্য :

স্বাধীনতা-উত্তর কালে যে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সৎ সাহিত্যের বাহক রূপে চিহ্নিত হয়েছিল ‘চতুষ্কোণ’ তাদের মধ্যে একটি। অনেক সাহিত্য-সাময়িকী বিশেষভাবে একজন সম্পাদকের পরিকল্পনার ফসল রূপে দেখা দেয়। ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকার সেই সম্পাদক ছিলেন শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। কুমিল্লার মানুষ শিবপ্রসাদ ছিলেন পঠন, পাঠন এবং সাহিত্য রচনায় আগ্রহী। বেঙ্গল ইমিউনিটির স্বত্বাধিকারী ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে কোম্পানির প্রচার-অধিকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। অবসর গ্রহণের পর শিবপ্রসাদ নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রদত্ত ‘চতুষ্কোণ’ নামে প্রকাশ করেন এই মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। ১৩৫৫ (১৯৪৮) বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ডিমাই সাইজে পাঁচ বা ছয় ফর্মার কাগজটির অপর সম্পাদক ছিলেন সুনীল পালরায়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সহযোগী সম্পাদক থাকলেও ‘চতুষ্কোণ’ ছিল শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীর নিজস্ব পত্রিকা।

১৯৬১ সাল থেকে ‘চতুষ্কোণ’ ত্রৈমাসিক হয়; ১৯৪৬-তে আবার হয় মাসিক; অবশেষে ১৯৮৫ সাল থেকে আবার হয় ত্রৈমাসিক। বিভিন্ন সময়ে সহযোগী সম্পাদক রূপে এসেছিলেন—কৃষ্ণ ধর, সুনীল ঘোষ, ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ গুহ, নির্মল ঘোষ, সরোজ দত্ত, অশোকসঞ্জয় গুহ, গিরীন চক্রবর্তী, অরুণকুমার রায়, তপোবিজয় ঘোষ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, পল্লব সেনগুপ্ত, সাধন চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটি এখনও জীবিত আছে। ১৯৯৭ সালে শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর সম্পাদক হয়েছেন তাঁর জামাতা সমরেন্দ্র মৈত্র।

‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকা রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও প্রগতি-ভাবনা তথা বামপন্থী মানসিকতার প্রতি ঝোঁক মাঝে মাঝেই পত্রিকাটিতে প্রধান হয়ে উঠেছে। গল্প-কবিতা থাকলেও চিন্তামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের দিকেই আগ্রহ ছিল শিবপ্রসাদের। পুরোনো এবং লুপ্ত পত্রিকার ভালো প্রবন্ধ খুঁজে বার করে ছাপানো হত এখানে।

একটা সময় প্রায় প্রতি সংখ্যায় আর্ট প্লেটে বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের রঙিন ও সাদা-কালো ছবি মুদ্রিত হত। চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুল বসু, গোপাল ঘোষ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, গোবর্ধন আশ, রণেনআয়ন দত্ত, প্রমুখ।

‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত গ্রন্থ সমালোচনা। মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত সুপরিকল্পিত বিশেষ সংখ্যা। যেমন ‘বঙ্গদর্শন সংখ্যা’, মধুসূদন সংখ্যা ইত্যাদি।

সম্পাদকীয় লিখন কোনো কোনো সংখ্যায় থাকত, আবার কখনো থাকত না।

খ. উদ্দেশ্য :

‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় প্রথম দিকে উদ্দেশ্য বলে কিছু ঘোষিত হয়নি। চতুর্থ বর্ষের শুরুতে ‘পাঠকদের প্রতি’ শিরোনামে সম্পাদকের একটি লিখন প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। সেই লিখনটিতে প্রথমে অনিয়মিত প্রকাশের জন্য সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তারপর যা লিখেছেন সেখান থেকে পত্রিকাটির আদর্শ সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়—“চতুর্থ বর্ষের জন্য আমরা কোনো চটকদার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরতে পারছি না। এ প্রসঙ্গে শুধু একটা কথাই বসতে চাই—জৌলুষে চোখ না ধাঁধাক, চতুর্থ বর্ষে চতুষ্কোণ-এর বক্তব্য ওজনে বাড়বে নিশ্চয়ই।

চতুষ্কোণ প্রকাশ করা হয়েছিল পত্রিকা—শিশুর অকাল মৃত্যু-হার-বাড়াবার জন্যে নয়—আদর্শের তাগিদে। সে উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ ও রস সম্পৃক্ত সাহিত্যের প্রচার। সকলেই জানেন, আদর্শ দিয়ে কারবার করতে গেলে বৈষয়িক সাফল্য নৈব নৈব চ। চতুষ্কোণ-এ নীতির কিছু ব্যতিক্রম নয়। তবু আদর্শ নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের হঠকারিতা গত তিন বছর ধরে সম্ভব হয়েছে শুধু পাঠক সমাজের সস্নেহ প্রশ্রয়ে। আমরা তাঁদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি মাত্র দিচ্ছি যে তাঁদের আমরা অমর্যাদা করবো না।

আর একটা কথা, এখন থেকে চতুষ্কোণ-এর নীতি হবে তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তত্ত্বমূলক আলোচনাই হবে অতঃপর চতুষ্কোণ-এর বৈশিষ্ট্য। অবশ্য গল্প কবিতা তাই বলে একেবারে বাদ পড়বে না।''

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত গল্প এবং উপন্যাসকে। শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক চেনবার ক্ষমতা ছিল অসামান্য। 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় মাঝে মাঝে একটি সংখ্যাতেই প্রকাশিত হত একটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এরকম কয়েকটি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে এই পত্রিকার বিশিষ্টতা। প্রকাশিত হয়েছে গোলাম কুদ্দুসের 'বাঁদী' (১৩৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দ), সমরেশ বসুর 'শ্রীমতি কাফে' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন), নির্মাল্য আচার্যের 'জীবন জ্যোতি' (কার্তিক ১৩৬১), নবেন্দু ঘোষের 'চাঁদ নাই' (অগ্রহায়ণ ১৩৬১)। ধারাবাহিকভাবে (১৩৭১ বঙ্গাব্দ থেকে) মুদ্রিত হয়েছিল অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'রাঙামাটি'। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তরু দত্তের একটি উপন্যাস 'অসমাপিকা' নামে অনুবাদ করেছিলেন পল্লব সেনগুপ্ত 'চতুষ্কোণ'-এর ১৩৭১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। কিছু কিছু বিদেশি গল্পের অনুবাদও এখানে মুদ্রিত হত।

এই পত্রিকায় ছোটো গল্প লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী, প্রদ্যোৎ গুহ, সুলেখা সান্যাল, সমরেশ বসু, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির আচার্য, শচীন ভৌমিক, অমলেন্দু চক্রবর্তী, ইলা মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, কার্তিক লাহিড়ী, সন্তোষকুমার ঘোষ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি নন্দী, চিত্র ঘোষাল এবং আরও অনেকে। অর্থাৎ শিবির বিভাজন নির্বিশেষে, সমকালের প্রদীপ ও নবীন সব সব শক্তিমান গল্পকারই গল্প লিখতেন এই পত্রিকায়। মাঝে মাঝে বিদেশি ভাষার এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গল্পের অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনি স্মৃতিকথা :

'চতুষ্কোণ' পত্রিকার প্রবন্ধের উচ্চমান এবং বিষয়বৈচিত্র্য ছিল ঈর্ষণীয়। বিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, স্বাস্থ্য, লোকজীবন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পকলা, প্রাচীন সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হত প্রবন্ধ। কয়েকটি প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিকের নাম উল্লেখ করলেই তা বোঝা যাবে। 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা'—ভবানী সেন (কার্তিক ১৩৬১), 'বাংলার লোকসাহিত্যে গণচেতনা'—আনন্দ দে (কার্তিক ১৩৬১), 'মার্কসবাদ ও নেহরু'—সরোজ আচার্য (সমাবর্তন সংখ্যা ১৩৬১), 'মাতৃকাচর্যা ও শক্তিতত্ত্ব'—নৃপেন্দ্র গোস্বামী (কার্তিক, ১৩৬৮), 'আধুনিক বাংলা চিত্রকলার উৎস সন্ধানে'—অশোক মিত্র (কার্তিক ১৩৬৯)।

'চতুষ্কোণ'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হত গবেষণা-মূলক প্রকাশিত হয়েছিল বিষ্ণু দে-র 'একালের কবিতা', জীবনানন্দ সম্পর্কে সুনীলকুমার নন্দীর আলোচনা, বিনয় ঘোষের 'সংবাদ প্রভাকর ও সেকালের বাঙালি সমাজ' (প্রবন্ধটির সঙ্গে সম্পাদকীয় টীকায় শিবপ্রসাদ লেখকের আসন্ন প্রকাশ সংবাদপত্র সম্পর্কিত গবেষণা নিবন্ধের পরিচয় দিয়েছিলেন)। 'চতুষ্কোণ'-এ মুদ্রিত ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল 'উত্তরা'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মূল্যবান প্রবন্ধ। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবাসে বাংলা সাহিত্য (১৩৭১-৭২ বঙ্গাব্দ; ১৯৬৪-৬৫)। এ প্রবন্ধের বিষয় ছিল সুরেশচন্দ্রকে লেখা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সটীক পত্রাবলি। এছাড়াও প্রবন্ধ লিখেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নেপাল মজুমদার এবং নারায়ণ চৌধুরী।

মাঝে মাঝে দুর্লভ পুরোনো প্রবন্ধ লুপ্ত হয়ে যাওয়া পত্রিকা থেকে তুলে এনে মুদ্রিত করা হয়েছে এই পত্রিকায়। একটি দৃষ্টান্ত—১২৯৮ বঙ্গাব্দের 'জন্মভূমি' পত্রিকা থেকে দীনেশচন্দ্র সেনের 'শেক্সপীয়র বড় কি কালিদাস বড়' নামের প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। সঙ্গে ছিল উৎসের উল্লেখ এবং সম্পাদকের মন্তব্য। বোঝা যায়, সম্পাদকের ছিল একটি গবেষণাধর্মী মন।

যে সময়ে 'চতুষ্কোণ' প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময় উচ্চ মার্গের শিল্পকলারূপে চলচিত্রের প্রতি বাঙালির আগ্রহ জাগতে শুরু করেছে। চলচিত্র বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ছিল 'চতুষ্কোণ'-এর একটি বড়ো আকর্ষণ। বহু খ্যাত, রেনোয়া পরিচালিত 'রিভার' ছবিটিকে কেন্দ্র করে কে. এম. সিমহাচলম্ লিখেছিলেন 'রীভার ছবির ইতিবৃত্ত' (চৈত্র ১৩৫৮) 'বাংলা সিনেমার সংকট' (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৯) প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সুধী প্রধান।

ঙ. কবিতা :

কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় খুব নির্দিষ্ট কোনো নির্বাচনের ভিত্তি না থাকলেও আধুনিক কবিতাই প্রকাশিত হত 'চতুষ্কোণ'-এ। কবিদের নামের তালিকা থেকে বোঝা যায় পঞ্চাশের দশকে প্রাধান্য ছিল সমাজমনস্ক কবিদের। ষাট-সত্তরের দশকে এজাতীয় কোনো স্বতন্ত্র প্রবণতা লক্ষ করা যায় না। সমকালের প্রধান কবিরাই লিখেছেন এবং লেখেন 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায়। কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট নাম—বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, সরোজ আচার্য, কৃষ্ণ ধর, ধনঞ্জয় দাশ, রাম বসু, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অরবিন্দ গুহ, শঙ্খ ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকে।

'চতুষ্কোণ' পত্রিকা সবদিক থেকেই আধুনিক এবং উদার, মননশীল এবং শিল্পবোধ-সমৃদ্ধ মনোভাব ও রুচির বাহক হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রগতিশীল বামপন্থী মানসিকতার দিকে পত্রিকার পরিচালকগোষ্ঠীর ঝোঁক থাকলেও তা সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হয়নি। উদার মানবতাবাদকে স্বীকৃত জানিয়েছে এই পত্রিকা। এখনও এটি প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যাশিত মানও যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ আছে।

৮.১৩ পূর্ব্বাশা

ক. পত্রিকার প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্য :

বর্তমান বাংলাদেশে এবং তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা শহর থেকে ১৯৩২ সালে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'পূর্ব্বাশা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই সময় কুমিল্লায় একত্র হয়েছিলেন কয়েকজন শিক্ষিত এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিমনস্ক তরুণ। তাঁদের উৎসাহে এবং কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যান নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের আর্থিক সহায়তায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সহ-সম্পাদক ছিলেন অজিত গুহ, কর্মাধ্যক্ষ সত্যপ্রসন্ন দত্ত এবং প্রকাশক নারায়ণ চৌধুরী। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। প্রথম দু-বছর প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হলেও তৃতীয় বছর থেকে পত্রিকাটি অনিয়মিত হয়ে যায়। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে ছিল সূর্যের প্রতীক রূপে সাতটি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত। তার উপরে জ্যামিতিকভাবে লেখা 'পূর্ব্বাশা'। পূর্ব দিক নির্দেশক 'পূর্ব্বাশা' শব্দটির বানান চিরকালই যুগ্ম 'ব' দিয়ে লেখা হত। পত্রিকাটির মাপ ছিল রয়াল অক্টেভো এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চৌষট্টি।

'পূর্ব্বাশা'-র প্রকাশ কালকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্ব—১৯৩২ এপ্রিল থেকে ১৯৩৯ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় পর্ব—১৯৪৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ এপ্রিল। তৃতীয় পর্ব—১৯৪৬ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭ এপ্রিল।

দ্বিতীয় বছর থেকে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

'পূর্বাশা'-র দুটি নিয়মিত বিভাগ ছিল 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' এবং 'দুর্ব্বাসা'। প্রথম বিভাগে থাকত সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য। দ্বিতীয় বিভাগটিতে থাকত সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে তির্যক টীকা-টিপ্পনী। তৃতীয় বছরের পর 'দুর্ব্বাসা' বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়।

এই পত্রিকায় চিত্রকলার দিকে সম্পাদকের অনুরাগ লক্ষ করা যায়। মুদ্রিত হত দেশি ও বিদেশি বিখ্যাত চিত্রের অনুকৃতি এবং ভারতীয় ভাস্কর্যের বিভিন্ন মূর্তির ছবি।

দ্বিতীয় বছরের 'পূর্ব্বাশা' ইংল্যান্ডের বিখ্যাত 'স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন'-এর আদলে পরিকল্পিত হয়।

আর্থিক সংকটের কারণে—'পূর্ব্বাশা' প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় ১৯৩৫ সালে। তখন সরকারি প্রেস অফিসার কিরণচন্দ্র বসু বিজ্ঞাপন দেবার এবং তিনশো কপি করে কিনে নেবার প্রস্তাব দেন। শর্ত ছিল পত্রিকাটি হবে সচিত্র সাপ্তাহিক। তখন কিছু কাল 'পূর্ব্বাশা' চলচিত্র-সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও সেটি সাহিত্যিকদের কাছে রুচিকর মনে হয় নি।

'পূর্ব্বাশা'-র দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে সঞ্জয় ভট্টাচার্য একটি হিটলার-বিরোধী সংখ্যা প্রকাশ করেন। যদিও সেই সময় জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজবিরোধী বলে হিটলারকে স্তুতি করেছিলেন এবং সাম্যবাদীরা স্ট্যালিন-এর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি থাকার কারণে হিটলারকে শত্রু বলতে নারাজ ছিলেন। ফলে সংখ্যাটিকে সকলেই অপছন্দ করেন এবং ক্ষুব্ধ সম্পাদক সব কটি কপিই বিনষ্ট করে দেন।

আর একটি মূল্যবান বিশেষ সংখ্যা ছিল ১৯৪১-এর আশ্বিন মাসে প্রকাশিত রবীন্দ্রস্মৃতিসংখ্যা। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রসহ সমকালের প্রধান কবি ও প্রাবন্ধিকদের রচনায় সমৃদ্ধ সংখ্যাটি দাম বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রভূত জনপ্রিয় ছিল।

'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার খরচ খানিকটা উঠে আসত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব্বাশা' প্রেস থেকে।

ঙ. কবিতা :

'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য বলে পৃথকভাবে কিছু বলা হয়নি। বস্তুত কোনো সংখ্যাতেই খুব নির্দিষ্টভাবে ঘোষিত হয়নি পত্রিকার উদ্দেশ্য। 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার নবপর্যায়ে মাঘ ১৩৭০ বঙ্গাব্দের (১৯৬৪) সংখ্যাটিতে বিস্তৃতভাবে পত্রিকার পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। তাঁর লেখায় পত্রিকাটির আদর্শের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম যখন 'পূর্ব্বাশা'-র সূত্রপাত হয় তখন যে আলোচনা হয়েছিল তার স্মৃতি—''পত্রিকার চরিত্র হবে কেমন? অজয় ভট্টাচার্য বললেন : 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' এখন আর নেই। তাদের স্থান নিতে হবে।'' তারপর যখন 'পূর্ব্বাশা'-র কার্যালয় কলকাতায় উঠে এল তখনকার বিবরণ সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন—''অচিন্ত্যকুমার এবং বুদ্ধদেব বসু খুব আনন্দিত হলেন। কারণ আমরা ত কল্লোল-প্রগতির সাহিত্যাদর্শই অনুসরণ করব। কল্লোল-প্রগতির সাহিত্যাদর্শ বলতে বুঝেছিলাম যৌনমুক্তির চিত্র আর য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।''

এই আদর্শ কিছুটা বদলায় ১৯৩৬-৩৭ সালে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছিলেন ''আবার যখন আমরা পূর্ব্বাশা বার করবার জন্য তৈরি হলাম, তখন মার্কসীয় ধারার সাহিত্য পরিবেশনই আমাদের সংকল্প ছিল।''

'পূর্ব্বাশা'-র আদর্শ সম্পর্কে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের আরও কিছু কথা শুনতে পাই একটি সাক্ষাৎকারে। 'সারস্বত' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় (১৯৬৮) সম্পাদক দিলীপকুমার গুপ্ত ও অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন—''আমরা চেয়েছিলাম, দেশের মধ্যে একটা হার্ড থিঙ্কিং আসুক। আমরা বুঝেছিলাম স্বাধীনতা আসবেই। স্বাধীনতার জন্য মানসিক প্রস্তুতি দরকার। সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সব ক্ষেত্রে।''

সব মিলিয়ে বোঝা যায়, একদিকে আধুনিকতা, অন্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তনযোগ্য বিষয়ের প্রতি পাঠককে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

গ. কথাসাহিত্য ও নাটক :

'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার সাহিত্য রুচির সঙ্গে মিল ছিল 'কল্লোল' পর্বের লেখকদের। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নিয়মিত লিখেছেন এই পত্রিকায়। প্রথম পর্বেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বারোটি গল্প। দ্বিতীয় পর্বে উপন্যাস 'যে যাই বলুক'।

'কল্লোল যুগ'-এর প্রাথমিক প্রকাশও এই পত্রিকায়। বুদ্ধদেব বসু প্রথম পর্বের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই গল্প বা নাটক লিখেছিলেন। ১৯৫২-তে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'শীতের শিকল' এবং 'কবি কাহিনী' উপন্যাস। বহু গল্প লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

'বিচিত্রা'-র পরই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দেয় 'পূর্ব্বাশা'। তাঁর সুবিখ্যাত 'প্রাগৈতিহাসিক' প্রকাশিত হয় এখানে। তাছাড়াও প্রকাশিত হয় বহু গল্প যেমন—'কষ্টিপাথর', 'দেবতা', 'মঙ্গলা', 'রাসের মেলা', 'হারানের নাতজামাই', 'স্থানে স্থানে'। শৈলজানন্দ, জগদীশ গুপ্ত এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রও লিখেছেন পূর্ব্বাশায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'চিন্তামণি' উপন্যাসের প্রথম রূপ 'রাঙামাটির চাষি' প্রকাশিত হয় পূর্ব্বাশায়। নতুন লেখকদের মধ্যে অমিয় ভূষণ মজুমদারকে প্রতিষ্ঠা দেয় 'পূর্ব্বাশা'। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'-র একটি অপ্রকাশিত অংশ প্রকাশিত হয় এখানে।

খুবই উল্লেখযোগ্য এরিখ মারিয়া রোমার্ক-এর 'রোড ব্যাক' উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয় প্রথম বছরের বারোটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে। অনুবাদ করেন অজয়কুমার ভট্টাচার্য।

একক নাটকও প্রকাশিত হত 'পূর্ব্বাশায়'। নিয়মিত লিখতেন মন্মথ রায়। প্রকাশিত হয়েছে স্ট্রিন্ডবার্গ-এর নাটকের অনুবাদ।

প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, স্মৃতিকথা—প্রবন্ধের দিকে সবিশেষ মনেযোগ ছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্যের। সর্ব মতের সমন্বয় ঘটানোর ইচ্ছাও ছিল তাঁর। তাই নলিনীকান্ত গুপ্ত ও দিলীপকুমার রায় যেমন প্রবন্ধ লিখেছেন—তেমনই লিখেছেন প্রতিভা বসু। শ্রীঅরবিন্দ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, প্রভু গুহঠাকুরতা। নিটশে আর কোপেনহাওয়ার সহ দর্শনবিদদের চিন্তন ব্যাখ্যামূলক একাধিক প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে 'পূর্ব্বাশা'য়। বিভিন্ন দেশের কাব্য, নাটক, উপন্যাস নিয়ে রচিত হয়েছে প্রবন্ধ।

কবিতা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিজে কবি ছিলেন। আধুনিক কবিতার অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ—এমনকী শেষ পর্বে ষাটের তরুণ কবিদেরও তিনি আন্তরিক আশ্রয় দিয়েছেন এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। বাংলা কবিতার ইতিহাসে পূর্ব্বাশা-র নাম উল্লেখ তাই অপরিহার্য। কবিতার ব্যাপারে তিনি বুদ্ধদেব বসু-র মতোই কোনো শিবির বিভাজন মানতেন না। রসোত্তীর্ণ কবিতাই তাঁর বিবেচ্য ছিল। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে তিরিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের মধ্যে 'পূর্ব্বাশা'-য় কখনও লেখেননি—এমন কবি প্রায় ছিলেনই না।

চিত্রকলা :

'পূর্ব্বাশা'-র ক্ষেত্রে চিত্রকলার স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকা দরকার। বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের ছবি তো থাকতেই—বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর ছবি। সেইসঙ্গে থাকত বহু মূল্যবান আলোচনা। ম্যাডোনা মূর্তির ব্যাখ্যা নিয়ে প্রবন্ধ, বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনীর বিবরণ, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অভ্ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর কার্যকলাপ বিষয়ে লেখা, জাপানি ছবির আলোচনা—সবই থাকত পূর্ব্বাশায়।

উপসংহার :

'পূর্ব্বাশা' পত্রিকা, মাঝে মাঝে বিরতি সহ প্রকাশিত হয়েছিল দীর্ঘদিন। তাই বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত একটি পরিসরের প্রতিবিম্ব আমরা পত্রিকাটিতে পাব। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির সব দিকেই এই পত্রিকার ভূমিকা অতীব উল্লেখযোগ্য।

NOTE